ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

দ্বিপঞ্চাশত্তম বর্ষ, প্রথম খণ্ড ; আষাঢ়—অগ্রহায়ণ ১৩৭২

লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

ক'লকাতায় ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের রবীন্দ্র সরোবর ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় খেলায় রাশিয়া ২-০ গোলে ভারতবর্ষকে পরাজিত করে। প্রথমার্দ্ধের ২৪ মিনিটে উইংহাফ আলেকসান্দার গোলোচুবক প্রায় ৪০ গজ দূর থেকে প্রচণ্ড সটে দলের প্রথম গোলটি করেন। দ্বিতীয়ার্দ্ধের ২৩ মিনিটে ইনসাইড-লেফট-ভ্লাদিমির ভানকিন দ্বিতীয় গোল দেন।

মাদ্রাজের তৃতীয় খেলায় রাশিয়া ৩-১ গোলে জয়ী হয়। রাশিয়ার পক্ষে গোল দেন গেনাদি গুকভ দুটি এবং আদমভ একটি। ভারতবর্ষের প্রদীপ ব্যানার্জি খেলার শেষ দিকে একটা গোল শোধ করেন।

শোক সংবাদ :

বাংলা তথা ভারতীয় টেবিল টেনিস্ ক্রীড়ার অন্যতম প্রবর্ত্তক ও পুরোধা, ক্রীড়ানুরাগী মুনিব চট্টোপাধ্যায় শোচনীয় দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন। গত ২রা ডিসেম্বর সন্ধ্যায় মুনিব বাবু যখন তাঁর স্কুটারে করে রেড রোডের উপর দিয়ে বেঙ্গল বাস্কেট বল এসোসিয়েসনের ময়দানে যাচ্ছিলেন তখন বিপরীত দিক থেকে আগত একটি মোটর গাড়ীর প্রচণ্ড ধাক্কায় গুরুতররূপে আহত হন। তাঁকে সত্বর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়, কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স বাট বৎসর হয়েছিল।

অবিবাহিত ক্রীড়ানুরাগী মুনিব চট্টোপাধ্যায় আজীবন খেলাধূলা প্রযোজনায় লিপ্ত ছিলেন। বেঙ্গল টেবিল এসোসিয়েসনের গোড়াপত্তন করে তিনি বাংলা দেশে টেবল টেনিস খেলাকে জনপ্রিয় করে তোলেন এবং বহুদিন এই এসোসিয়েসনের সম্পাদকরূপে কার্য্য করেন। পরে সহ-সভাপতিরূপেও এসোসিয়েসনকে কার্য্যকরী সাহায্য করেন। অল্ ইণ্ডিয়া টেবল টেনিস ফেডারেসনেরও তিনি এক সময় সম্পাদক ছিলেন। বেঙ্গল বাস্কেট বল এসোসিয়েসনেরও তিনি কার্য্যকরী সভ্য ছিলেন এবং বাস্কেট বল খেলার উন্নতির জন্যও সর্ব্বসময় সচেষ্ট থাকতেন।

১৯৫২ সালে বোম্বাই অনুষ্ঠিত টেবল টেনিস বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ানসিপে মুনিববাবু প্রধান রেফারীরূপে কার্য্য করেন। ১৯৩৬ সালে টেবল টেনিসের যাদুকর বিশ্বখ্যাত ভিক্টর বার্ণা ও লেজলো বেলাক্কে ভারতে আনয়ন করেন এবং কলিকাতায় তাঁদের খেলার ব্যবস্থা করে কলিকাতাবাসীদের আধুনিক টেবল টেনিস খেলার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। এর পরেও তিনি উদ্যোক্তা হয়ে আরও অনেক বিখ্যাত টেবল টেনিস খেলোয়াড়দের কলিকাতায় আনয়ন করেছেন।

মুনিব চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে বাংলাদেশ একজন সত্যকার ক্রীড়ানুরাগী, বন্ধুবৎসল ও স্পষ্টবক্তা ক্রীড়া-প্রযোজককে হারাল।

—শঃ কঃ চঃ

সম্পাদকদ্বয়—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,) কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে ১৮।১২।৬৫ তারিখে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মাসানুক্রমিক—চিত্রসূচী

বাৎসরিক ও ষাণ্মাসিক গ্রাহকগণের প্রতি

অগ্রহায়ণ মাসে যে সকল বাৎসরিক ও ষাণ্মাসিক গ্রাহকের চাঁদার টাকা শেষ হইয়াছে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক ১০ই পৌষের পূর্বে মনিঅর্ডার যোগে বাৎসরিক ১৫৲ টাকা অথবা ষাণ্মাসিক ৭·৫০ টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা চাঁদা পাঠাইয়া দিবেন। টাকা পাঠাইবার সময় গ্রাহক নম্বরের উল্লেখ করিবেন। ডাকবিভাগের নিয়মানুযায়ী ভি, পি,তে কাগজ পাঠাইতে হইলে, পূর্বাহ্নে আদেশপত্র পাওয়া প্রয়োজন। ভি, পি, খরচ পৃথক লাগিবে। যাঁহারা নূতন গ্রাহক হইবেন তাঁহারা মনিঅর্ডার কুপনে 'নূতন গ্রাহক' কথাটি উল্লেখ করিবেন।

কর্মাধ্যক্ষ—ভারতবর্ষ

পদ্ম পলাশ

চিত্র
অমিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

—সৌখিন সমাজে অভিনয়যোগ্য উচ্চপ্রশংসিত নাটকসমূহ—

শরৎচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে

বিরাজ-বৌ ২৲ কাশীনাথ ২৲

বিন্দুর ছেলে ১-৫০

রামের সুমতি ১-৫০

গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত

জনা ২-৫০ প্রফুল্ল ৪৲, বিল্বমঙ্গল ঠাকুর ১-৫০, নল-দময়ন্তী ২৲,
বুদ্ধদেব-চরিত ২৲

রমেশ গোস্বামী প্রণীত

কেদার রায় ২-৭৫

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত

ইরাণের রাণী ১-৫০
কর্ণার্জ্জুন ২-৫০, ফুল্লরা ২৲,
সুদামা ১-২৫, অপ্সরা ০-৩৭

অমল সরকার প্রণীত

সন্দেহ মোক্ষম ২৲

তারক মুখোপাধ্যায় প্রণীত

রামপ্রসাদ ১-৫০

যামিনীমোহন কর প্রণীত

টাটমাট ০-৭৫ প্রহেলিকা ০-৭৫

নিশিকান্ত বসুরায় প্রণীত

বঙ্গবর্গী ২-৫০, পথের শেষে ও
গর্বিতা (একত্রে)—৫-৫০
দেবলাদেবী ২-৫০,

মনোমোহন রায় প্রণীত

রিজিয়া ১-৫০

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র প্রণীত

মানময়ী গার্লস্ স্কুল ১-৫০

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত

নর-নারায়ণ ৩৲,
প্রতাপ-আদিত্য ২-৭৫,
আলমগীর ৩-৫০,
রত্নেশ্বরের মন্দিরে ০-৭৫,
ভীষ্ম ২-৭৫, বাসন্তী ০-২৫

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত

দুর্গাদাস ২-৫০, বিরহ ২৲
সাজাহান ২-৫০, মেবারপতন ২-৫০
পরপারে ২-৫০, বঙ্গনারী ২৲,
চন্দ্রগুপ্ত ৪৲ পুনর্জ্জন্ম ১-০০
সীতা ২৲, সিংহল-বিজয় ২-৫০
ভীষ্ম ২-৫০, নুরজাহান ২-৫০

নিরুপমা দেবীর কাহিনী অবলম্বনে
দেবনারায়ণ গুপ্ত প্রদত্ত নাট্যরূপ

শ্যামলী ১-৫০

শচীন সেনগুপ্ত প্রণীত

এই স্বাধীনতা ২৲
হর-পার্ব্বতী ১-২৫
সিরাজদ্দৌলা ২৲
প্রিয়ার কীর্ত্তি ১-২৫

নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

আত্ম-গুপ্তচর ৪-৫০
রাতকাণা—বীররাজা এবং মুখের মত
একত্রে।

কানাই বসু প্রণীত

গৃহপ্রবেশ ২৲

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

অহল্যাবাঈ ১৲, ঝান্সীর রাণী ২৲

মন্মথ রায় প্রণীত

মরা হাতী লাখ টাকা ১-২৫,
অশোক ২৲ সাবিত্রী ২৲
চাঁদসদাগর ২৲ খনা ২৲
জীবনটাই নাটক ২-৫০,
কারাগার, মুক্তির ডাক ও মহুয়া
(একত্রে) ৩-৫০
মীরকাশিম, মমতাময়ী হাসপাতাল
ও রঘুডাকাত (একত্রে) ৩৲
ধর্মঘট, পথে বিপথে, চাষীর
প্রেম, আজব দেশ (একত্রে) ৪৲
একাঙ্কিকা ৫৲ নব একাঙ্ক ৩৲
কোটিপতি নিরুদ্দেশ—বিদ্যুৎ
পর্ণা—রাজনটী—রূপকথা
(একত্রে) ৩৲
সাঁওতাল বিদ্রোহ—বন্দিতা—
দেবাসুর (একত্রে) ৩৲
মহাভারতী ২-৫০

জ্যোতি বাচস্পতি প্রণীত

সমাজ ১-২৫

রেণুকারাণী ঘোষ প্রণীত

রেবার জন্মতিথি ১-২৫

তুলসীদাস লাহিড়ী প্রণীত

ছেঁড়া তার ২৲ পথিক ২-২৫

মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী প্রণীত

অন্ন-ব্যাধি ২৲

নিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

ফুলদল ২৲

আষাঢ়—১৩৭২

প্রথম খণ্ড | ত্রিপঞ্চাশত্তম বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

দ্বিজেন্দ্র সাহিত্যে স্বদেশ চেতনা

অমিতদ্যুতি কুমার

স্বদেশ চেতনা মানুষের স্বভাবগত প্রবৃত্তি। ব্যক্তি মানুষ আপন বঞ্চনার সমাধানের আলোক যেদিন দেখতে পেল সমষ্টির মাঝে, তখনই উদ্ভব সমাজ চেতনার। আরো পরে সমষ্টিবদ্ধ মানুষ ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বিশাল পৃথিবীর বিশেষ কোণে নিজেদের সীমাবদ্ধ করার প্রয়াস পেলো—সেদিনই জন্ম স্বদেশ চেতনার।

স্বদেশচেতনা স্পষ্টতঃই আপেক্ষিক। নিজের দেশকে মানুষ কতখানি আপন ভাবতে পারে, বা পরের দেশকে কতখানি নিজের নয় ভাবতে পারে—তার ওপরেই স্বদেশ-চেতনার ভিত্তি। প্রবোধচন্দ্র সেনের মতে কোনো একই নামে ডাকে সেদিনই স্বদেশচেতনার উদ্গিকাল। সেই হিসেবে মৌর্য্যযুগেই ভারতীয় স্বদেশচেতনার সৃষ্টি। ভারত যখন গ্রীকদের সংস্পর্শে এলো তখন দেশবাসীর মনে বিকাশ লাভ করলো পরদেশ-চেতনা। তখন দেশবাসীর কাছে এদেশ পরিচিত ছিল জম্বুদ্বীপ (অশোকের শিলালিপি দ্রঃ) নামে। বিদেশীরা বলতো ইণ্ডিকা।

রামায়ণ-মহাভারতের পদে পদে ধ্বনিত হয়েছে স্বদেশ-মায়ের চরণ বন্দনা। রামায়ণ-মহাভারতই আমাদের কাছে স্বদেশচিত্র তুলে ধরেছে পূর্ণমহিমায়,—সে চিত্র একাধারে সামাজিক, ভৌগোলিক, আত্মিক। রবীন্দ্রনাথের মতে

'মহাভারত' নামকরণ তাঁদেরই কৃত। সেই রূপটি একই কালে ভৌগোলিক এবং মানসিক রূপ। আরেক জায়গায় বলেছেন, 'রামায়ণ মহাভারতের সরল অনুষ্টুপ ছন্দে ভারতবর্ষের সহস্র বৎসরের হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইয়া আসিয়াছে।'[২] একইভাবে বিষ্ণুপুরাণ এবং কালিদাসকাব্যনিচয়ে ভারতমাতার রূপবর্ণনা লক্ষ্যণীয়। কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্যে 'নগাধিরাজ' হিমালয়ের রূপবর্ণন চিরকালের জন্যে ভারতীয় জনমানসে হিমালয়কে অনন্যসাধারণ মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। 'বিষ্ণুপুরাণে আছে:

> "উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্।
> বর্ষং তদ্‌...ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ॥
> গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি
> ধন্যাস্তু তে ভারতভূমিভাগে।
> স্বর্গাপবর্গাস্পদমার্গভূতে
> ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ।"

কালিদাসের পর স্বদেশচেতনা লক্ষ্য করা যায় শংকরাচার্য্যের সাহিত্যে। মুখ্যতঃ জ্ঞানী ও কর্মী হলেও শংকরাচার্য্যের কবিখ্যাতি উপেক্ষণীয় নয়। তাঁর ভারত উপলব্ধিকর্ম্মের রূপ আধুনিককালেও তাৎপর্য্যপূর্ণ। জন্ম তাঁর কেরলে, মৃত্যু সুদূর হিমালয়ের গিরিকন্দরে—কর্ম্মক্ষেত্র সমগ্র ভারতে।

স্বদেশচেতনা মূলতঃ নির্ভর করে দুটো উপলব্ধির ওপর, এক হোলো স্বদেশের ভৌগোলিক স্বরূপ উললব্ধি, আর আর এক হোলো ঐতিহাসিক স্বরূপ উপলব্ধি। স্বদেশচেতনা ও স্বদেশপ্রীতি একবস্তু নয়। স্বদেশচেতনা জাগে স্বদেশের ভৌগোলিক পরিচয়, এর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যবোধ থেকে। এর উদ্ভব পরদেশের ভূগোল ও সাংস্কৃতিক পার্থক্যচেতনা থেকে। আর স্বদেশপ্রীতির উদ্ভব স্বদেশের রাষ্ট্রস্বাতন্ত্র্যবোধ ও তার রক্ষার কামনা থেকে।

আধুনিক ভারতে স্বদেশচেতনার উপ্তি রামমোহনের কালে। স্বদেশচেতনা ও স্বদেশপ্রীতি সম্পূর্ণ ভিন্নতর হলেও স্বদেশচেতনা থেকেই জন্মলাভ করে স্বদেশপ্রীতি। স্বদেশচেতনার মূল উৎস আবার পরদেশ চেতনা। রামমোহনের ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের মূল উৎসও স্বদেশপ্রীতি—যার জন্ম তাঁর মর্মভূমির স্বদেশচেতনায়। রামমোহনের কালে বাংলাসাহিত্যে স্বদেশচেতনার জোয়ার বেগ খানিকটা স্তিমিত ছিল, তার কারণ স্বদেশপ্রীতি প্রকাশের উপলক্ষ্য তখনও চূড়ান্তভাবে প্রকট হয় নি—তখনকার ইংরাজী শাসকরা ভারতীয় সমাজজীবনে প্রত্যক্ষ আঘাত হানেননি। কিন্তু পরবর্তীকালেই (১৮২৩) বাংলা সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করামাত্র তিনি তীব্র প্রতিবাদ করে "মীরাৎ উল-আখবার" পত্রিকাটি বন্ধ করে দেন। ডিরোজিওর কাব্যে স্বদেশচেতনার সুস্পষ্টতা প্রথম ধ্বনিত হয় বোধ হয় ফকীর অব জঙ্গীরা কবিতায়।(১) কিন্তু রামমোহন, ডিরোজিও এঁদের স্বদেশ অপেক্ষা পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির ওপরই আস্থা ও শ্রদ্ধা ছিল বেশী। তাই অনুবর্তীদের রচনায় স্বদেশপ্রেমের গতি ১ অনেক স্বচ্ছন্দ ও উদ্দীপক। এঁদের অগ্রণী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা (১৮৩২) থেকেই বাংলাসাহিত্যে স্বদেশপ্রেমের বেগ সঞ্চার হয়।

১৮৩৯ সালে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী সভার ভিত্তি ও উদ্দেশ্য আরো বেশী সম্ভাবনাময় ছিল। ঐ প্রসঙ্গে অক্ষয় কুমার দত্তের একটি বক্তৃতা স্মরণীয়। দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম ও কর্মসাধনার ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ সহচর রাজনারায়ণ বসুর (১৮২৬-৯৯) কথা উল্লেখ্য। রাজনারায়ণ বসুর স্বদেশচেতনার প্রকাশ আরো জ্বালাময় ও খরতর ছিল। নবগোপাল মিত্রের হিন্দুমেলা (১৮৬৭) প্রতিষ্ঠার মূলেও রাজনারায়ণ বসুর স্বদেশ-চেতনা। শুধু সাহিত্যেই নয় কর্মের মধ্যেও (সঞ্জীবনী সভা' বা 'স্বাদেশিকের সভা উল্লেখ্য) তার প্রকাশ। দেশনায়ক বিপিনচন্দ্র পালের মতে',...রাজনারায়ণবাবুর শিক্ষাদীক্ষাই বাংলাদেশে সর্ব প্রথম স্বাদেশিকতার স্রোত আনিয়াছিল'। তাঁর সহপাঠী ভূদেব এবং মধুসূদনও স্বদেশচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই সাহিত্যরচনায় ব্রতী হন। মধুসূদনের শাশ্বত-আবেদন অবিস্মরণীয় পদ 'রেখো মা দাসেরে মনে এ মিনতি করি পদে' একালেরই রচনা। ভূদেববাবুর সমগ্র সাহিত্যজীবন গভীর ব্যাপক সত্যোপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত—অবিচল দেশপ্রেমের উজ্জ্বল জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। এঁদের পরেই নাম করতে হয় বঙ্কিমচন্দ্রের। বঙ্কিমসাহিত্যের স্বদেশচেতনার প্রকাশ অপেক্ষা স্বদেশপ্রীতির ক্রিয়াশীলতা ও প্রেরণাদানের শক্তি উল্লেখযোগ্য। ঈশ্বরগুপ্ত, কবি রঙ্গলাল

(পদ্মিনীর উপাখ্যান), হেমচন্দ্র (কবিতাবলী) নবীনচন্দ্র (পলাশীর যুদ্ধ) ইত্যাদির সাহিত্যেও স্বদেশচেতনার ধারা অনুধাবন যোগ্য। হিন্দু মেলার সুরু থেকেই স্বর্ণকুমারী, সরলাদেবী এবং ঠাকুরপরিবারের অন্যান্য সদস্যদের রচনা স্বদেশচেতনার সমুজ্জল হয়ে ওঠে।

কলকাতার সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার সময় (১৮৭২) থেকেই নাট্যাভিনয় দেশপ্রেমের অন্যতম প্রকাশরূপ হয়ে উঠলো এবং প্রচুর জনপ্রিয়তাও অর্জন করলো। এর মূলে হিন্দুমেলার প্রেরণা অনেকখানি। কিরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারতমাতা', জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরুবিক্রম' ও 'সরোজিনী,' উপেন্দ্র দাসের 'শরৎ-সরোজিনী,' 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' ইত্যাদি নাটকের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। রঙ্গালয়ের এই উন্মাদনা দমনের জন্য সরকারকে অবশেষে আইনের আশ্রয় নিতে হয়েছিল।(২) আস্তে আস্তে রঙ্গালয়ে স্বদেশপ্রেমের প্রকাশ স্তিমিত হয়ে আসে। অবশ্য পরবর্তী কালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় আবার রঙ্গমঞ্চে স্বদেশ প্রেমের ঢেউ লাগে। ক্ষীরোদপ্রসাদ, গিরিশচন্দ্র (এবং দ্বিজেন্দ্রলাল) সে সময় প্রচুর খ্যাতি লাভ করেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল (এবং তাঁর সমসাময়িক সাহিত্যসেবীদের) শিল্পসৃষ্টিতে স্বদেশচেতনার মূল্যায়ন করতে গিয়ে আমাদের একথা ভুললে চলবেনা, তাঁদের যুগে পরাধীনতার অভিশাপ জাতিকে জর্জরিত করে তুলেছে, কিন্তু তাকে প্রতিরুদ্ধ করার মতো প্রচুর ক্ষমতা অর্জিত হয়নি তখনো। স্বাধীন দেশবাসীর স্বদেশপ্রেম অনেকটা আত্মপ্রত্যয়পূর্ণ, অনেকটা বেশী বলিষ্ঠ এবং আত্মসমালোচনামূলক—কিন্তু পরাধীন দেশবাসী জাতির ত্রুটিকে গভীর স্নেহে আবৃত করে এবং আত্মগরিমাকে সহস্রগুণে প্রস্ফুটিত করে দেয়। কিন্তু স্বদেশপ্রেমকে বলিষ্ঠ এবং আত্মসমালোচনামূলক করার উপযুক্ত পটভূমি না থাকায় দ্বিজেন্দ্রযুগের রচয়িতাগণ কাব্যে, সঙ্গীতে, স্বদেশের স্বপ্নগত পরিকল্পনা হৃদয়াবেগে রূপায়িত করেছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে কবিত্বের অনুভূতি এবং সে অনুভূতিকে সাবলীলতায় প্রকাশ করার যথেষ্ট উপকরণ ছিল। পরবর্তী যুগের অধিকাংশ কবির মতো তাঁর কাব্য তাই সীমিত-আবেদন নয়। শিল্প-আবেদনের এই সার্বজনীনতা কিন্তু বাংলাসাহিত্যে অনুপস্থিত না হলেও সুলভ নয়। অনুভূতিপ্রবণ হলেও তিনি ভাবপ্রবণ ছিলেন না। কাব্যরচনার উপকরণগুলিও ছিল সম্পূর্ণ অধীত ও আয়ত্বাধীন। (৩) তাঁর ক্ষেত্রে তাই অনুভূতির তীব্রবেগে শিল্পরস ক্ষুণ্ণ হয়নি। তাঁর সাহিত্যের এই সামগ্রিক ও সার্বজনীন আবেদন হৃদয়ের একেবারে অন্তঃস্থলে আঘাত করতো সত্যি, কিন্তু সে আঘাত স্থায়ী হতোনা—ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুৎ চমকের মতো। এই তীব্র অনুভূতি থেকেই ভারতমাতার নানারূপের প্রকাশ। পরাধীন বলে যে মহাবীর্যের প্রসাদ থেকে সে যুগের ভারতবাসী বঞ্চিত ছিলেন, দ্বিজেন্দ্রসাহিত্যে তার সমস্তমহিমা দেশমাতৃকার চরণপদ্মে নিবেদিত।

নাটক রচনায় শেক্সপীয়র দ্বারা প্রভাবিত হলেও গিরিশচন্দ্রের রচনার চিন্তা, আঙ্গিক, পরিকল্পনার ভিত্তিভূমি স্বদেশের গভীরে নিহিত ছিল। (৪) পাশ্চাত্য শিল্পনীতির যথেষ্ট প্রভাব থাকা সত্ত্বেও তাঁর সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম এতটা উজ্জ্বল ছিল তার কারণ আগেই বলেছি—পরদেশ-চেতনার ওপরেই স্বদেশচেতনার ভিত্তিভূমি নিহিত। সমাজের ক্লীবতা, দৈন্যকে তিনি যে আঘাত হানলেন, তার মূলে ছিল দেশহিতৈষী অনুভূতিপ্রবণ একটি মন। দ্বিজেন্দ্রলালের অমর সঙ্গীত 'বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ' দেশমাতৃকার বন্দনায় মুখর। দেশের মহান্ প্রাচীন ঐতিহ্য স্মরণে লেখক আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছেন দেশকে ভালোবাসতে। আগেই বলেছি, দ্বিজেন্দ্রযুগের স্বদেশসঙ্গীত দেশমাতৃকার প্রতিফলনে মুখর। 'সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি' এই চিন্তারই প্রকাশ।

দ্বিজেন্দ্র সাহিত্যের ধারাটি অনুধাবন করলে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে তাঁর অনুভূতিপ্রবণ মন ব্যক্তিক চিন্তা থেকে সামাজিক চিন্তায় উদ্বেলিত হত বেশী। পরাধীন যুগের লেখক হলেও সমকালীন অন্যান্য লেখকদের থেকে তিনি অনেক বেশী বলিষ্ঠপ্রত্যয় আত্মসমালোচক ছিলেন। সেই কারণেই প্রেমরসে আপ্লুত হওয়ার থেকে স্বাদেশিকতার প্রবলতার বা সামাজিক হীনতার গ্লানিতে আলোড়িত হবার প্রবণতা তাঁর মধ্যে ছিল বেশী। কবি অজিত দত্তর মতে 'অন্তর্মুখীনতা অপেক্ষা বহির্মুখীনতা, ভাবালুতা অপেক্ষা বাস্তববোধ দ্বিজেন্দ্রসাহিত্যে অনেক

বেশী উচ্ছ্বসিত।' দ্বিজেন্দ্রকবিতার সুস্পষ্ট বক্তব্যের মূলেও এই বহির্মুখী কবিদৃষ্টি এবং সমাজ ও সম্প্রদায়ের প্রতি প্রখর সচেতনতা লক্ষ্য। এই জন্যই সমসাময়িক সমাজ জীবনের সমস্ত সমস্যা ও গ্লানি তাঁর কাব্যে বলিষ্ঠরূপে প্রকাশ পেয়েছে। ভাষার ওপর তাঁর অত্যাশ্চর্য্য দখলও তাঁর কাব্যের ঋজুধর্মিতার অন্যতম কারণ। বিশেষ করে কাব্যভাষায় তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয়। পাশ্চাত্য সমাজের সাথে প্রত্যক্ষ পরিচয় থাকার জন্যই বোধহয় জাতিধর্মনির্বিশেষে এক উদার সার্বজনীনতা দ্বিজেন্দ্রসাহিত্যে সুপরিস্ফুট।

পরাধীন ভারতকে স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখার আগে প্রয়োজন ছিল মানসিক ভাবে প্রস্তুত হওয়ার। এ মহান ব্রতে নিজেকে উৎসর্গ করার জন্য যে মানসিক শক্তি ও চেতনা প্রয়োজন, যে উদ্দীপনা প্রয়োজন —তাকে উন্মীলিত করার প্রচেষ্টা দ্বিজেন্দ্রসাহিত্যে সুপরিস্ফুট। "তাঁহার নাটকগুলিতে মহাপ্রাণের আত্মবলিদানে, চারণের শোক-সঙ্গীতে এবং স্বাধীনতাব্রতী জাতির বিরাট ত্যাগের মধ্যে মর্মান্তিক কারুণ্য প্রকাশ পাইলেও সঙ্গে সঙ্গে আত্মোৎসর্গের মহিমা, স্বার্থত্যাগের গৌরবে মন ভরিয়া উঠে; পুনরায় মহাব্রতে দীক্ষিত হইবার দুর্বার প্রেরণা অনুভব করা যায়।" —অজিতকুমার ঘোষ।

সাধারণভাবে দ্বিজেন্দ্রলালের গানগুলিতে স্বদেশ চেতনার (সঠিকভাবে স্বদেশপ্রেমই বলা উচিত) উপস্থিতি সহজেই উপলব্ধি করা যায়। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশপ্রেমের মূলগত চিন্তা এগুলিতে সঠিকভাবে বিধৃত হয়নি। অন্যান্য রচনায় বিচার,বিশ্লেষণ ও আত্মসমালোচনামূলক বিবেকবান স্বদেশচিন্তা দ্বিজেন্দ্রসাহিত্যে যে নির্ভীকচিত্তে সুপরিস্ফুট সেটাই সব থেকে অভিনন্দন যোগ্য। আরো একটা জিনিষ অনুধাবন করার মতো—যেখানে তিনি বিভিন্নভাবে, কোনো চরিত্রের মাধ্যমে বা নিজেরই জবানীতে দেশের উন্নতির চেয়ে হিন্দু তথা বাঙালীর সমাজ জীবন বিশ্লেষণ করেছেন, সেখানে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ উচ্ছ্বাস স্বাভাবিক রচনাশৈলীকে অতিক্রম করে যেতে পারেনি। দেশ সম্পর্কে এই যে সিরীয়াসনেস, এটাই তাঁর সৃষ্টির দেশপ্রেমী ধর্ম বহন করছে। 'আষাঢ়ে', 'মন্দ্র', 'আলেখ্য', 'হাসির গান' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ রচনায় গল্প আছে। এগুলির ভিত্তি সাধারণভাবে বাস্তব এবং ভাবও সমধিক আন্তরিক। আলেখ্য কাব্যগ্রন্থের 'নেতা' ও 'ভক্ত' কবিতায় কবি বক্তৃতাসর্বস্ব আত্মপরায়ণ রাজনৈতিক নেতা ও সৌখীন ভোগসর্বস্ব ভক্তকে ব্যঙ্গ করেছেন। নেতা চরিত্রের এই দিকটি

'…স্বদেশভক্তি কস্মিনকালেও সৃষ্ট
কার্পেটমোড়া ত্রিভলককে বসে থেকে
মা মা বলে নাকীসুরের কান্না
নিয়ে যাও সে ভক্তি বক্ষে চেপে রেখে
মা সে সৌখীন মাতৃভক্তি চান না…'

আজও প্রণিধানযোগ্য। অর্থাৎ একথা বলা যায়, দেশ-নেতাদের যে স্বরূপ, পেশাদারী রাজনীতিকদের যে উচ্চাকাঙ্খা আজ আমাদের পরিচিত, স্বদেশচেতনা উন্মীলনের প্রথমকালেই দ্বিজেন্দ্রলাল তা প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন।

(৫) দ্বিজেন্দ্রলালের স্যাটায়ারধর্মী রচনাগুলিই কাব্য-সাহিত্যের মধ্যে দেশাত্মবোধে সমুজ্জ্বল। উদ্দীপনাপূর্ণ দেশানুরাগ এই যুগের কবিমানস, তথা জাতীয় মানসের সুস্পষ্ট যুগলক্ষণ। লণ্ডন থেকে প্রকাশিত The Lyrics of Ind. কাব্যগ্রন্থে তাঁর তরুণ কবিমানস মাতৃবন্দনা করে বলে উঠেছিল :

O my land can I cease to adore thee
Though to gloom and to misery hurled?
O my Bharat! my beautiful maiden,
O sweet Ind! once the queen of the world.
And though wrecked is thy pride and glory
Of it nothing remains but the name
Yet a beauty and sunshine still lingers
And yet gleams through the mist of the same,

স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক নাটকগুলির প্রাণ নিহিত ছিল স্বদেশপ্রেমের সঙ্গীতে। ভাষার লালিত্যে, বক্তব্যের ঋজুতায়, বিষয়ের সার্বজনীনতায় এবং জাতীয় আবেগে উদ্বেল তাঁর 'আমার দেশ', 'আমার জন্মভূমি', 'ভারতবর্ষ', 'পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে' প্রভৃতি

দেশাত্মবোধক গান দেশপ্রেমের উন্মাদনায় বাংলার আকাশ বাতাস উদ্বেল করে তুলেছিল। অতীত গৌরবের কথা দেশবাসীকে স্মরণ করিয়ে তৎকালীন সমস্যা-কুটিল ভারতের আত্মপ্রত্যয়হীন ছবি, আর ভবিষ্যতের প্রত্যাশা-দীপ্ত ছবি দেশবাসীর সামনে তুলে ধরে তিনি আহ্বান করেছেন তাদের, তাদেরই হয়ে বলেছেন—

যদিও মা তোর দিব্য আলোকে
ঘেরে আছে আজ আঁধার ঘোর
কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা
ভাতিবে আবার ললাটে তোর
আমরা ঘুচাব মা তোর দৈন্য ;
মানুষ আমরা নহিতো মেষ
দেবি আমার! সাধনা আমার!
স্বর্গ আমার আমার দেশ।

দেশমাতৃকার রূপটী মানবীয় রসে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে :

জননি! তোমার সন্তান তরে
কতনা বেদনা, কত না হর্ষ,
জগৎপালিনি! জগত্তারিণি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ।

'তাঁর অকৃত্রিম ভাবুকতা ও কাল-সচেতনতা তাঁকে শুধু আকাশপ্রসারী স্বপ্নলোকে উধাও করে নিয়ে যায়নি, জাতীয় জীবনের অশ্রুবেদনা আশা আকাঙ্ক্ষার বিচিত্র তরঙ্গধ্বনির মধ্যে নিয়ে এসেছে। আপনকালের কণ্ঠে মন্ত্র দিতে গিয়ে তিনি সর্বদেশের সর্বকালের সারস্বতসাধনার কণ্ঠেই জয়-মাল্য দিয়েছেন। আর দেশকে দিয়েছেন নূতন শক্তি, নূতন আশ্বাস।'—রথীন্দ্রনাথ রায়।

তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে অবশ্য দেশপ্রেমিক মনটি খুব সঠিকভাবে, স্পষ্ট করে আঁকা হয়নি। সম্ভবতঃ 'আর্য্যগাথা', 'The Lyrics of Ind' ও 'আলেখ্য'এর ব্যতিক্রম। দ্বিজেন্দ্রলাল চেয়েছিলেন এক পৌরুষদীপ্ত বলিষ্ঠ-জীবনকে, তাই যেখানে তার ব্যতিক্রম দেখেছেন, সেখানেই তাঁর বিদ্রূপপ্রবণতা সচেতন হয়ে উঠেছে। তাই তাঁর বিদ্রূপাত্মক মনোভঙ্গীর আড়ালে একটি কঠিন ও অচল-প্রতিষ্ঠ আদর্শনিষ্ঠা ছিল। কবি দ্বিজেন্দ্রের কবিমনের এই আদর্শনিষ্ঠা দেশপ্রেমের শিশিরসিক্ত এক বিশ্বপ্রীতির আবেদনে উদ্দীপিত।

দেশের দরিদ্র জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে যখন থেকে তিনি ল্যাণ্ড এণ্ড এগ্রিকালচার বিভাগের সেটেলমেন্টের কাজে নিযুক্ত হন। বর্ধমানের সুজামুটা পরগণার কাজে ব্যাপৃত থাকাকালে জমিদারী স্বার্থের সঙ্গে তাঁর সংঘাত ঘটে। জমিদাররা তখন বিনা জরীপে জমির পরিমাণ ঠিক করে খাজনার পরিমাণ ধার্য্য করতেন। তাঁর জরীপে এসবের ভুল ধরা পড়ল এবং নিম্নমধ্যবিত্তদের ওপর থেকে করের বোঝা বহুলাংশে অপসারিত হলো। এই নিয়ে খোদ লেফটেনাণ্ট গভর্ণর ইলিয়টের সাথে তাঁর বিরোধ বাধলো এবং হাইকোর্ট পর্য্যন্ত গিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল জয়ী হলেন। পরবর্তীকালে দেশের লোক ডি.এল. রায়ের বদলে আবিষ্কার করলো দ্বিজেন্দ্রলালকে, আর সুজামুটার লোক খুঁজে পেলো 'দয়াল রায়'কে। এর পর থেকেই তাঁর কাব্যে এক গাম্ভীর্য্য নেমে এসেছে। 'মন্দ্র, 'আলেখ্য', 'ত্রিবেণী', ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থে দরিদ্র, শোষিত দেশবাসীর মর্মবেদনা প্রকাশ পেয়েছে। বাংলা-বিহারের অপূর্ব গ্রাম্য-সৌন্দর্য্যের রূপ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। আলেখ্য কাব্য-গ্রন্থের সমস্ত কবিতাই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিভূমির ওপর রচিত। দেশকে নিজের চোখে দেখে তাঁর দৃঢ় ধারণা জন্মেছিল—বহু সমস্যা, বহু ব্যর্থতাই আমাদের নিজেদের তৈরী। সাহিত্যে প্রচ্ছন্ন স্বদেশপ্রীতি এবং জাতীয়চেতনার পরিপূর্ণ বিকাশ থাকলেও অসামান্য জনপ্রিয়তার জন্য সরকার তাঁর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কোন ব্যবস্থা নিতে পারেন নি। কিন্তু ঘন ঘন বদলি, ছুটি মঞ্জুর না করা ইত্যাদির দ্বারা তাঁকে পরোক্ষভাবে নাকাল করার চেষ্টা করা হয়েছে। কথিত আছে, 'বঙ্গ আমার, জননী আমার' গানটি গাইতে গাইতে তিনি বিশেষ উত্তেজনা অনুভব করতেন—যার ফলে তিনি ব্লাডপ্রেসারে আক্রান্ত হন এবং শেষ পর্য্যন্ত ব্লাড-প্রেসারেই তাঁর মৃত্যু হয়। (৬)

ব্যক্তি দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনের বিভিন্ন দিক পর্য্যালোচনা না করলে তাঁর সাহিত্যিক মনটির স্বদেশচেতনার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যাবে না। বিলাত যাত্রা, সরকারী চাকুরী গ্রহণ, এবং দেশনেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তাঁর সাহিত্যে ও দৃষ্টিতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। সমাজের সঙ্কীর্ণতা প্রসঙ্গে বিলেত থেকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি বলেছিলেন, 'অনেকেই সমাজচ্যুত হইবার ভয়ে ভীত। আমি জানি না এ আশঙ্কার কারণ কি। সমাজ? কেন

হয় লইয়াই তো সমাজ। সমাজ আমাকে চ্যুত করিবে? তাহাতে ক্ষতি কি কেবল আমারই? তাহার নহে? সমাজ কি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া হীনবল হইল না? সমাজ আমাকে পরিত্যাগ করিল, আমি কি সমাজকে পরিত্যাগ করিলাম না? অবশ্য ক্ষতি আমার অধিক। কিন্তু পরিণামে সমাজেরই ক্ষতি। এইভাবে নূতন সমাজ গঠিত হইবে। নূতন ও সভ্যতর আচার অনুষ্ঠিত হইবে।' আসলে প্রহসন নক্সা 'একঘরে' এই চিন্তারই রূপ।

দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশপ্রেম সম্পর্কে এ কথা মনে রাখা সর্বাগ্রে প্রয়োজন যে, যা তিনি নিজে দেখেননি বা জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেননি, তা একবারও বলার চেষ্টা করেন নি। ঠিক এই কারণেই তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলি ইতিহাসকে কোথাও অতিক্রম করেনি। যেখানে ইতিহাস নীরব, সেখানে তাঁর কল্পনা বাস্তবানুগ পথে ইতিহাসকে অনুসরণ করেছে মাত্র,ইতিহাসানুগ হলেও তাঁর নাটকগুলির দেশপ্রেমিক চরিত্র অঙ্কনে যে মুন্সীয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়, তাই-ই তাঁর সাহিত্যে স্বদেশ প্রেমের উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করছে। 'দুর্গাদাস' নাটকে দুর্গাদাস চরিত্রটি একটু অস্বাভাবিক ও অমানবীয় বলে মনে হয়। লেখকের মতে, তার ট্রাজেডি চিরজীবনের উপাসনার নিষ্ফলতায়, আত্মসাধনার অসিদ্ধতায়, প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত চেষ্টার পরাজয়ে। ইহার ট্র্যাজিডিও এক কথায় ব্যর্থ হয়েছে,—পারলাম না এ জাতিকে টেনে তুলতে। (৭) 'সবার পতন' সাম্যমূলক মহানীতি প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত এক নাটক। নাটকের ভূমিকায় তিনি বলেছেন, 'এই নাটকে আমি মহানীতি লইয়া বসিয়াছি—সে নীতি বিশ্বপ্রেম। কল্যাণী, সত্যবতী ও মানসী, এই তিনটি চরিত্র যথাক্রমে দাম্পত্যপ্রেম, জাতীয় প্রেম ও বিশ্বপ্রেমের মূর্তিমান কল্পিত হইয়াছে। এই নাটকে ইহাই কীর্তিত হইয়াছে যে, বিশ্বপ্রেমই সর্বাপেক্ষা গরীয়সী।' আসলে তার ও প্রাজ্ঞ স্বদেশপ্রীতিই বিশ্বপ্রীতির জনক। দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যে স্বদেশচেতনা মহান উদারতায় মূর্ত। তাই তাঁর সাহিত্যে স্বদেশ চেতনার উপস্থিতি ভাস্বর হলেও তাকে অতিক্রম করে গেছে বিশ্বপ্রীতি—সকীর্ণ করে বলা যায় বিশ্বমানবপ্রীতি। যেমন বিচক্ষণতার সঙ্গে তিনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী পিপাসাদার রাজনীতিকদের পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, ঠিক তেমন করেই দেখেছিলেন কি ভাবে দরিদ্রশ্রেণী শোষিত হয়ে আসছে। তাদের আশ্বাস দিয়ে তিনি দৃঢ়স্বরে বলতে পেরেছিলেন,—

> "ওরে ও ভাই চাষী? ওরে ও ভাই তাঁতী?
> পড়িস নাক ঝুয়ে; জানিস এসব ফাঁকি
> তোদের অন্নে পুষ্ট, তোদের বস্ত্র গায়ে
> করে তোদের ওপর রক্তবর্ণ আঁখি।
> সারিবদ্ধ হয়ে একবার মাথা তুলে
> দাঁড়া দেখি তোরা সবাই সোজাভাবে—
> দেখবি এই যে স্পর্ধা—চূর্ণ হয়ে যাবে।
> উঠে দাঁড়া দেখি—মানুষ যদি তোরা,
> এদের সামনে কেন মাথা ঝুয়ে যাবি?
> সমস্বরে বল, 'এই সকলেরই মাটি
> কারো চেয়ে কারো বেশী নাইক দাবী।"

এই ধরণের কঠোর সত্য বহু কাব্যে, নাটকে চোখে পড়বে। কেননা তিনি 'বাস্তব চোখে' দেশকে দেখেছিলেন। শঠতা আর ভণ্ডামির বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান বিস্তৃতমানস দেশপ্রেমেরই পরিচয় বহন করছে। যে দৃঢ়তা, ঋজুচিত্ততা ও স্পষ্টতা নিয়ে তিনি সমাজের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে পেরেছিলেন তার কারণ,...'অন্যান্য নাট্যকারের মত রঙ্গালয়ের পরিচালকগোষ্ঠীর মুখাপেক্ষী হয়ে তাঁকে নাটক লিখতে হয়নি, তাঁর নাট্যসাধনা স্বাধীন শিল্পীমানসের দান।' উগ্র জাতিবৈরিতা অপেক্ষা মানব সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ ও মৈত্রী স্থাপনে তাঁর আদর্শান্বিত দৃষ্টি আগ্রহান্বিত ছিল। আধুনিককালে সমাজের বৈষম্য দূর করে সাম্যস্থাপনের যে চেষ্টা চলছে তার সুস্পষ্ট রূপ দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যে দেখতে পাওয়া যায়। এই সাম্যনীতির প্রেরণাতেই তিনি হিন্দুধর্মের ও সমাজের ক্ষুদ্রতা, শ্রেণী বৈষম্য ও সকীর্ণতাকে এ রকম কঠোর আঘাত করেছেন। মানবতার মহান গভীর বেদনাসমূহ তাঁর অন্তর স্পর্শ করেছিল বলেই মানবতার শাশ্বত গৌরব তিনি দেখতে পেরেছিলেন।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পূর্ববর্তীকালের বিভিন্ন সৃষ্টি তদানীন্তন সমাজ জীবনের দুষ্টক্ষত ও বেদনাকে রূপায়িত করার কাজে ব্যাপৃত ছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সম্পর্কে ভিন্নতর মত পোষণ করলেও সে সময় তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টি দেশবাসীর মনে জাতীয়তাবোধ উদ্বুদ্ধ করতে যথেষ্ট

সহায়তা করে। স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাতের সাথে সাথে দ্বিজেন্দ্রলাল নবপ্রবুদ্ধ দেশাত্মবোধ অবলম্বন করে 'প্রতাপসিংহ' রচনা করেন। মানসিংহ চরিত্রের মাধ্যমে তিনি একথাই বলতে চেয়েছেন যে সামাজিক সঙ্কীর্ণতা বিসর্জন দিতে না পারলে দেশাত্মবোধ অর্থহীন। এই নাটকটির কেন্দ্রগত কোন কাহিনী নেই। প্রতাপসিংহ চরিত্রে সামাজিক সঙ্কীর্ণতার ছবি এঁকে তার কুফল দেখিয়েছিলেন মানসিংহ চরিত্রে। 'দুর্গাদাস' নাটকের আদর্শ দেশপ্রেম ও নৈতিক চরিত্রবল সুপরিস্ফুট হয়েছে 'দুর্গাদাস' চরিত্রে। এই সময় রচিত নাটকগুলির মাধ্যমে 'নূরজাহান'-এ স্বদেশচেতনা বা স্বদেশানুরাগ প্রায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। প্রথমযুগের নাট্যকাব্যগুলিতেও দেশপ্রেম খুব প্রধান স্থান অধিকার করেনি। 'প্রতাপসিংহ' নাটকের সাথে দ্বিজেন্দ্রনাট্য সাহিত্যের যে কালান্তর তার মাঝেও 'সোহ্‌রাব রুস্তম্' এর মত নাটক চোখে পড়ে। 'সোহ্‌রাব রুস্তম্' নাট্য কাব্যধর্মী হলেও এখানে দেশাত্মবোধ সুপরিস্ফুট। আফ্রিদের পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার চেষ্টায় দ্বিজেন্দ্রলালের সমসাময়িক স্বদেশপ্রেমের ধারাটি অনুভব করা যায়, কিন্তু ইতিহাসানুগ নয় বলে আফ্রিদের চরিত্র রোম্যান্টিসিজমের আদর্শে পরিকল্পিত বলা যায়। 'মেবার পতন'এ মহাবত খাঁর স্বধর্মবিদ্বেষ জাতির ধ্বংসকে যে কতখানি ত্বরান্বিত করেছে তার প্রকাশে তিনি বলতে চেয়েছেন, জাতীয় ঐক্যের ওপরেই রাষ্ট্রীয় ভিত্তি স্থাপিত। হিন্দুদের সামাজিক আচারগত সঙ্কীর্ণতা যে জাতীয় কল্যাণের কতখানি অন্তরায়, তা তিনি বলতে চেয়েছেন বারবার। এই একই কথা তিনি বলেছেন, 'একঘর', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'প্রতাপসিংহ', 'মেবার পতন' ইত্যাদি প্রবন্ধ-প্রহসন-নাটকে। মেবারের প্রকৃত শত্রু মোগল নয়—মহাবত খাঁ, কিন্তু মহাবত খাঁকে হিন্দুধর্মের সঙ্কীর্ণতাই তো মেবারের শত্রু করে তুলেছিল। 'মেবার পতন'এ দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশচেতনা উচ্ছ্বাস অপেক্ষা বিবেকবুদ্ধিপ্রণোদিত বিচারবিশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত। সমস্ত নাটকটির দেশপ্রেমিক বক্তব্যটি চমৎকার ভাবে বিধৃত হয়েছে সুরচারণীদের গীতে—

> কিসের শোক করিস রে ভাই—
> আবার তোরা মানুষ হ'।
> গিয়েছে দেশ দুঃখ নাই—আবার তোরা মানুষ হ'।
> পরের 'পরে কেন এ রোষ
> নিজের-ই যদি শত্রু হোস?
> তোদের এ যে নিজেরই দোষ—আবার তোরা
> মানুষ হ'।

'সাজাহান' বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ, সম্ভবতঃ শীর্ষ স্থানীয় ঐতিহাসিক নাটক। সম্পূর্ণতঃ ইতিহাসানুগ, এই নাটকটিই স্বদেশী আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রভাবমুক্ত প্রথম দ্বিজেন্দ্রনাটক। তবুও পিয়ারার মুখে বঙ্গভূমির বন্দনা এবং চারণ বালকদের মুখে জন্মভূমির মহিমাকীর্তমূলক সঙ্গীত জাতীয় যুগচৈতন্যের দাবীও পূর্ণ করেছিল।

অখণ্ড ভারতকে কেন্দ্র করে যে স্বদেশ পরিকল্পনা ও প্রীতি নাট্যকারের মনে দানা বেঁধেছিল, 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে এক অখণ্ড ভারত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ভেতর তাও-রূপ-লাভ করেছে। চাণক্যের মুখে প্রকৃতির স্তব—'এই প্রধূমিতা, প্রজ্জ্বলিতা, প্রবাহিতরক্ত সরস্বতী ভারতভূমির পরিবর্তে এক রত্নালঙ্কারা পুষ্পোজ্জ্বলা সঙ্গীতমুখরা হাস্যময়ী জননী' এই দেশমাতৃকারই বন্দনা। চন্দ্রগুপ্তের মাতৃভূমি বন্দনও নাটকটির যুগলক্ষণ বলা যায়—"তুমি যাই কর, তুমি আমার কাছে চিরদিনই মা—'জননী-জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" (৩) অপমানিত মানবতার প্রতি শ্রদ্ধাও সেই যুগের অন্যতম যুগলক্ষণ (সত্যেন্দ্রনাথ রচিত 'শূদ্র', 'মেথর', 'দূর্বা' ইত্যাদি কবিতানিচয় রবীন্দ্রনাথের 'শুচি', ধুলামন্দির ইত্যাদি কবিতা উল্লেখ্য)। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে তাই অপমানিতা শূদ্রাণী মুরাকে বলতে শুনি, "শূদ্রাণী!—শূদ্র মানুষ নহে? তার কি ক্ষত্রিয়ের মত হস্তপদ নাই? এত ঘৃণা—উত্তম। দেখাবো এবার শূদ্রের শক্তি।" মুরার অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের ভিতর দিয়েই লেখক নির্যাতিত মানবতার বিজয় ঘোষণা করেছেন। এইভাবে যুগধর্ম স্বীকৃত হওয়াতে দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যের সাথে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর পরিচয় হয়েছে এবং দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যের সৃজনশীল স্বদেশচেতনা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে।

তাঁর অন্যান্য নাটকের মধ্যে 'পরপারে' ও 'বঙ্গনারী' নাটক দুটি সামাজিক। শেষ জীবনের রচনা হলেও এই নাটক দুটিতে কিন্তু স্বদেশচেতনা তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলির মতো সমুজ্জ্বল নয়।

ওপরের আলোচনা থেকে এ কথাটা খুব স্পষ্টভাবেই

প্রতীয়মান হয়, সেটা হল সমাজ ও জীবন, মনের ও মানবতার প্রতি দ্বিজেন্দ্রলালের অসামান্য দরদ তাঁর সৃষ্টিতে আন্তরিক হয়ে উঠেছে এবং এই আন্তরিকতাই স্বদেশচেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে পাঠকহৃদয় স্পর্শ করে। তাঁর সৃষ্টিতে তিনি হয়তো পাঠককে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথও বাতলে দেননি, বা বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে হাতিয়ার তুলে ধরতেও আহ্বান জানাননি। কিন্তু স্বাধীনতা লাভ করতে গেলে যে আত্মিক শক্তি, যে ঋজুতা, যে আশাবাদের প্রয়োজন, তাকে উৎসাহিত করার সর্বাত্মক একটা প্রচেষ্টা, তথা একটা অভীপ্সা তাঁর বিভিন্ন রচনায় দেখা যায়। দেশনায়ক সুরেন্দ্রনাথের মতে অসন্তোষের প্রকাশ থেকেই সংগ্রামের প্রেরণা লাভ করা যায়। সেই কথারই প্রতিধ্বনি করলেন তিনি লণ্ডন থেকে লেখা একটি চিঠিতে— "অসন্তোষই উন্নতির মূল, ইহা কার্যকে উত্তেজিত করে।··· অসন্তোষই ইটালীকে স্বাধীন করিয়াছে। অসন্তোষই আবার ভারতীয়গণকে নূতন জাতিতে পরিণত করিবে।"

তাঁর স্যাটায়ারধর্মী গানগুলির অবদানও নিঃসন্দেহে স্মরণীয়কার্য। অযত্নপালিত বাংলা স্যাটায়ার জগতে তাঁর এই অবদান আসলে 'পাদুকা নিক্ষেপের অসভ্যতা'কে শ্লেষবাণে বিদ্ধ' করার প্রবণতায় রূপ দিয়েছে। সুসভ্য জাতির লক্ষণই তাই—তীক্ষ্ণ বিচারশীলতার সাহায্যে প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করা। ব্যঙ্গ স্বাধীন সমাজের বস্তু। যেখানে স্বাধীনতা সেখানে বৈচিত্র্য, সেখানেই বিরোধ ও বিচার। ব্যঙ্গবিদ্রূপের মূলে তাই এই মতবিরোধ। স্বাধীনতার কলুষিত আবহাওয়ায় স্বাধীনচেতা দ্বিজেন্দ্রলালের এই অভিনন্দনীয় ব্যঙ্গবিদ্রূপ স্বকীয়তায় উজ্জ্বল এবং প্রেরণাদানে সার্থক। সে প্রেরণা আত্মোপলব্ধির প্রেরণা, প্রাপ্য সুযোগসুবিধার দাবীতে অসন্তোষের প্রেরণা। যদি এই অসন্তোষই তো জন্ম দেয় বিরোধের—অত্যাচারীর, অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে। তাই তাঁর এই স্যাটায়ারধর্মী গানগুলির গুহ্য স্বদেশচেতনা স্বতোৎসারিত ফল্গুগতি কিন্তু অন্তঃসলিলা। নন্দলালের মতো 'হতভাগা দেশের জন্য জীবনটা দিবার' উদ্দেশ্যে 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারে জীবনটা বিপন্ন না করার' মতো সবুদ্ধিপরায়ণ দেশনেতার দেখা আজও মেলে। এই ধরণের কবিতায় ব্যঙ্গবিদ্রূপ জনমানসকে কতখানি স্পর্শ করেছিল, তা এই সব কবিতার অসামান্য জনপ্রিয়তা থেকেই বোঝা যায়।

দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনদর্শন ছিলো অনেক গভীর। আত্মবিশ্লেষণী মনোভঙ্গী তাঁর স্বদেশচেতনাকে ভৌগোলিক ও কালগত সীমারেখার ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছে। তাঁর স্বদেশচেতনা বিশ্বমানবের মাঝে থেকেও আত্মস্বাতন্ত্র্যে আপন স্বদেশকে অনন্য হয়ে থাকতে প্রেরণা দিয়েছে। তাঁর প্রতিটি রচনায় প্রতিটি কাব্যে, গাথায়, নাটকে স্বদেশচেতনা তাঁর নিজের ধারায় প্রতিভাত হয়েছে। ভৌগোলিক সাম্প্রদায়িক, জাতিগত ও কালগত আপেক্ষিকতায় স্বদেশচেতনাকে অতিক্রম করে বিশ্বমানবের প্রতি মমতা অনুভব করার মতো যথেষ্ট উপাদান ও আত্মশক্তি তাঁর ছিল। এই প্রসঙ্গে দুয়েকটি উদ্ধৃতি দিয়ে আলোচনা শেষ করছি:—

> "কিন্তু তাঁর সঙ্গে যে দুদিনও মিশত সেই মুগ্ধ হতো দেখে যে তিনি গভীর বেদনা অনুভব করতেন দেশবাসীর মনে প্রাণে অসাড়তায়—স্বাধীন চিন্তার দৈন্যে—সর্বব্যাপী ক্লীবত্বে। তার ওপর এ বেদনা ছিল কবির বেদনা—বিদ্রূপীয় বেদনা নয়। তাই তিনি বিদ্রূপ ছেড়ে ধরেছিলেন নাটক, ও দেশাত্মবোধের গান গেয়েছিলেন, 'আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা' চেয়েছিলেন 'আবার' আমরা মানুষ হই।"
>
> —দিলীপকুমার রায় (উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল)

> "·····তাঁর নাট্যসাধনা স্বাধীন শিল্পী মানসের দান। স্বদেশভূমিতে অবস্থান করেও বিশ্বভূমিতে তাঁর মানস পরিক্রমা। স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তার ঊর্ধ্বে নিখিল মানবপ্রীতি ও বিশ্বমৈত্রীর যে বন্দনাগান দ্বিজেন্দ্রলাল গেয়েছেন, তাই-ই তাঁর নাটককে কালজয়ী করবে।"
>
> —অধ্যাপক কাননবিহারী গোস্বামী (দ্বিজেন্দ্র নাট্যশৈলীর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য)

> "······দ্বিজেন্দ্রলালের এ স্বদেশভক্তি সার্বজনীন দয়া মৈত্রী ও শুভেচ্ছায়। এ দেশভক্তির পরম পরিণতি দেশকালপাত্রনির্বিশেষে-এ-সমগ্র জগমঙ্গলেচ্ছায়।··· তাঁহার দেশভক্তি কোনো জাতি বা দেশের উপর ঘৃণার উদ্রেক করে না।'
>
> —দেবকুমার রায়চৌধুরী (দ্বিজেন্দ্রলাল)

(১) "সাহিত্যে স্বদেশচিন্তা—রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর"—দিলীপকুমার বিশ্বাস

(২) বাংলা নাটকের ইতিহাস—অজিতকুমার ঘোষ

(৩) বিশ্বভারতী পত্রিকা, জুলাই', ১৯৬৩

(৪) বাংলা নাটকের ইতিহাস—অজিতকুমার ঘোষ (২৪৫ পৃঃ)

(৫) দ্বিজেন্দ্রকাব্যের ধারা—অজিতকুমার দত্ত

(৬) দ্বিজেন্দ্র সাহিত্যে স্বদেশচেতনা—রাজ্যেশ্বর মৈত্র

(৭) 'দুর্গাদাস'—ভূমিকা

(৮) ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য (বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস)

এ ছাড়াও সাহায্য নিয়েছি নীচের লেখকদের :

* শতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি (রথীন রায় সম্পাদিত)
* রথীন্দ্রনাথ রায় : (দ্বিজেন্দ্রলাল, কবি ও নাট্যকার
* অজিত দত্ত : (দ্বিজেন্দ্র কাব্যসাহিত্যের ধারা)
* প্রবোধচন্দ্র সেন : (বাংলা সাহিত্যে স্বদেশচেতনা)
* হীরেন্দ্র রায় : নাটকের নাটকীয়তা—দ্বিজেন্দ্রলা
* দিলীপ বিশ্বাস : সাহিত্যে স্বদেশচেতনা রামমোহ থেকে বিদ্যাসাগ
* বিনয় ঘোষ : বাংলা সাময়িক পত্রে স্বদেশচিন্তা
* কাননবিহারী গোস্বামী : দ্বিজেন্দ্র নাট্যশৈলীর কয়েকটি বৈশিষ্ট
* দেবকুমার রায়চৌধুরী : দ্বিজেন্দ্রলাল
* রবীন্দ্র দাসগুপ্ত : দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

এস আষাঢ়ের কবি

শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়

আজি আষাঢ়ের প্রথম দিবসে হে কবি তোমায় স্মরি,
কুটজ কুসুমে অর্ঘ্য রচিয়া তোমারে বরণ করি।
আজো সাজিয়াছে গগণের গায় নবমেঘ থরে থরে,
পথিক বধূরা হেরিয়া ব্যাকুল প্রবাসী প্রিয়ের তরে;
বাদল মেঘের কণ্ঠে দুলিছে অজিত বলাকা-মালা,
সোনালী ধানের স্বপ্ন দেখিছে সরলা কৃষক-বালা;
ফুটে কদম্ব কন্দলী আর কুটজ কুসুমরাশি,
চারু-উপবন-বেষ্টনী ঘেরি' ফুটে কেতকীর হাসি।
আজো খেলে মেঘ পাহাড়ের গায়, চূড়ায় বিছায় তবু,
কৃষ্ণচূড়ার মত পরে শিরে মুকুট ইন্দ্রধনু;
বিন্ধ্যের পায় আজিও লুটায় তপঃশীর্ণা রেবা,
উপল-বিষম পঞ্জরে তার বন্যা আনিবে কে বা?
তোমার লেখনী পড়িল মন্ত্র, রচিল মোহন মায়া,
সারাটি দেশের বক্ষে বিছাল শ্যামল মেঘের ছায়া,
রামগিরি হতে কোথা কৈলাস, কোথায় অলকা-পুরী।
নির্ব্বাসিতের বিরহ-বেদনা সব ঠাঁই মরে ঘুরি'।
সবি আছে, শুধু নাই সে হৃদয়, নাই সে স্বপন চোখে,
উড়ে গেছে মেঘ দূরে গেছে ছায়া উগ্র সূর্য্যালোকে;
মরুভূর তাপ শুষিয়াছে তালু, শুকায়ে গিয়েছে বুক,
তৃষিত চাতকসম আজি প্রাণ তোমাপানে উন্মুখ।

আবার দুলাও রুক্ষ আকাশে নবীন মেঘের ছবি,
নবমেঘদূত মন্ত্র গাহিয়া এস আষাঢ়ের কবি।

অঘটনের পূর্বরাগ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

[পটভূমিকা : আমার "অঘটন আজো ঘটে" উপন্যাসটি পড়ে অন্ততঃ দু তিন শো পাঠক আমাকে পত্র লিখেছেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই এর সাতটি সংস্করণ হয়। শ্রীতরুণ রায় তাঁর রঙ্গমঞ্চে এর নাট্যরূপ দেন—যা লোকপ্রিয় হয়েছিল। উৎসাহ পেয়ে আমি এই শ্রেণীর সত্যভিত্তিক আর দুটি উপন্যাস লিখি : "অভাবনীয়" ও "অঘটনের ঘটা।" এই পর্যায়ের তৃতীয় উপন্যাস হোক "অঘটনের পূর্বরাগ"। ব্যাপারটা এই : অসিত ও তার কন্যাশিষ্যা তপতী কাশ্মীরের দুমেল যোগাশ্রম ছেড়ে আমেরিকা গিয়ে ধর্মার্থিনী কুমারী বার্বারাকে বলে ভগবানের অঘটনী করুণা সম্বন্ধে নানা কাহিনী, যথাক্রমে : অমল, কৃষ্ণদাস, মন্দিরা, শ্যামঠাকুর, আনন্দ গিরি, তাপস বাবাজী। তারপর ওরা ইংলণ্ডে এসে অতিথি হয় বার্বারার বিধবা দিদি সোফিয়ার মনোরম গৃহে। দুই বোন অসিতকে ধরে তার প্রাগযোগপর্বের কাহিনী বলতে—অঘটনবর্গীয়। "অঘটনের পূর্বরাগ" বলতে আমি যুগপৎ দুটি ইঙ্গিত করতে চেয়েছি : এক অসিতের দীক্ষা নেওয়ার আগে অঘটনের অবতরণ ; দুই, এ-অবতরণের মধ্যে দিয়ে পূর্বরাগ অর্থাৎ যৌবনের রোমান্সের কিছু খবর দেওয়া। এর বেশি আর কিছু না বললেও চলবে, কারণ অসিত নানা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতাকে পেশ করার সূত্রে নানাভাবেই ফুটিয়ে তুলেছে—এ-বুদ্ধিবাদী যুগের অত্যাধুনিক নরনারীর জীবনেও কি ভাবে পুরাকালের ভাবধারা রসোচ্ছল সংঘাত সৃষ্টি করতে পারে একাল ও সেকালের দোটানায়।]

(রমন্যাস)

অনুক্রমণিকা

ইংলণ্ডের বসন্তরাজ্য গ্লস্টারশায়ারে সোফিয়ার মনোরম বাগানে ব'সে সেদিন ওরা প্রাতরাশ সুরু করেছে চারজন : অসিত, তপতী, সোফিয়া ও বার্বারা। কথায় কথায় সোফিয়া হঠাৎ বলল :

"আপনার অদ্ভুত গণেশঠাকুর ও মোহন মহারাজের গল্প শুনে কী যে বলব সত্যিই ভেবে পাই নে দাদা। সময়ে সময়ে মনে হয়—বুঝি আপনাদের ধর্মকে আঁকড়ে পাওয়া গেল। কিন্তু কিছু মনে করবেন না দাদা—তার পরেই দেখি যেন ওমা, ফস্কে গেল! মনে হয়—এ অসম্ভব।"

বার্বারা বলল : "আমার কাছে কিন্তু এত কিছু অসম্ভব ঠেকে না। অসম্ভব বলতাম যদি দৈনন্দিন ঘরোয়া প্রসঙ্গে এ ধরণের অঘটন ঘটত। কিন্তু জীসাস্ তো নিজেই বিধান দিয়েছেন যে, মানুষের পক্ষে যা অসম্ভব, ভগবানের পক্ষে তা সম্ভব।"

সোফিয়া চিন্তিত মুখে বলল : "তা বটে—" ব'লেই হঠাৎ হেসে : "আচ্ছা দাদা, আর একটি প্রশ্ন করব—যদি কিছু মনে না করেন?"

তপতী বলল : "কী? যে ঠাকুরকে ডাক না দিয়েও অসম্ভবের আমদানী করা যায় কি না?"

সোফিয়া বলল হেসে : "তুমি বড় সর্বনেশে মানুষ দিদি। কী ভাবছি টুক টুক ক'রে ধরে ফেলো? বিধাতার দেওয়া আড়াল তুমি ঘুচিয়ে দিতে চাও?"

এই সময়ে পরিচারিকা আরো গরম টোষ্ট নিয়ে এসে টেবিলে রাখল।

বার্বারা বলল : "আর একটু কফি।"

কফিতে চুমুক দিয়ে অসিত বলল: বার্বারা! তুমি এই মাত্র যা বললে কাটা যায় না। কিন্তু শুধু ঠাকুরই যে অঘটন ঘটান তা নয়, অনেক সময়ে নিয়তিও পাকে ফেলে এমন সব দারুণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন যে, সত্যিই হকচকিয়ে যেতে হয়। আমাদের ঘরোয়া ভাষায় একে বলে দশচক্রে ভগবান ভূত।"

ব'লে প্রবচনটির মানে বুঝিয়ে দিয়ে বলল: "তোমাদের জীবনেও নিশ্চয় এমন অনেক কাণ্ড ঘটেছে—যা ঘটার আগে মনে হ'ত অসম্ভব?

বার্বারা বলল: "না দাদা। আমাদের জীবন সত্যিই দারুণ গন্তময়, হামড্রাম্ জীবন—বিশেষ আমেরিকায়। অঘটন বলতে আমরা বুঝি বড় জোর অ্যাকসিডেণ্ড বা কোইন্সিডেন্স।"

সোফিয়া টুকল: "না, আমার জীবন অত এক-ঘেয়ে বলতে পারি না। কিন্তু সে যাক দাদা। আপনি একটু খুলে বলতে পারেন কি—আপনারা 'নিয়তি' বলতে ঠিক কী বোঝেন? মানে, ঠাকুরের ঘটকালি বাদ দিয়ে।"

অসিত বলল: "পারি। কিন্তু সে আমার যোগ জীবনের আগেকার কাহিনী। তাকে ঠিক স্পিরিচুয়াল প্রসঙ্গ বলা যায় না।"

সোফিয়া উৎসুক কণ্ঠে বলল: "নাই যাক, আপনি বলুন। বলতে কি, জানেন দাদা, আমার কাল রাত্রে আপনার জীবনের প্রাক্-যোগ পর্বের কোনো অদ্ভুত রোমান্স জাতীয় কাহিনীই শুনতে ইচ্ছা হচ্ছিল—কেন জানি না। হয়ত এ-ও নিয়তি। যাই হোক, বলুন আপনি লক্ষ্মীটি, যখন প্রসঙ্গটা আপনা থেকেই উঠেছে।"

তপতীর সঙ্গে অসিতের দৃষ্টি বিনিময়। তপতী বলল: "না, থাক।"

সোফিয়া বলল: "না। থাকবে না। বলুন বলুন—বলতেই হবে। একটু মুখ বদলানো যাক তার পর আবার স্পিরিচুয়াল আলোচনা হবে। সব রকমই তো চাই—variety is the spice of life, মানেন নিশ্চয়ই?"

অসিত হেসে বলল: "মানি বৈ কি দিদি। আমার জীবনটা এত 'চেকার্ড', আর তাতে বৈচিত্র্য যে কতরকমের মশলা জুগিয়েছে—আচ্ছা বলি শোন একটা ঘটনা—রসিকদাস-বর্গীয়।"

* * *

অসিত আর এক পেয়ালা কফি ঢেলে সুরু করে: "আমি দ্বিতীয়বার বিলেত থেকে ফেরার পরে ঘটে এ-ঘটনা। ঘটনা না ব'লে হয়ত বিপাক বলাই ভালো। কারণ সেবার বিপাকটা এক অভাবনীয় রোমান্সের ছদ্মবেশে প্রায় আবর্তের কাছাকাছি এসে পৌচেছিল। কিন্তু তার বিবরণ দিতে হ'লে একটু ভূমিকা না করলেই নয়।"

বলে চায়ে ফের চুমুক দিয়ে অসিত গৌরচন্দ্রিকা পাড়ল: "দ্বিতীয়বার য়ুরোপ থেকে ফেরার পরে আমি নিজের রুচি—বা মতিগতির মধ্যে—একটা বড় পরিবর্তনের সূচনা লক্ষ্য করি। বৈরাগ্য তখনো প্রকট হয় নি—কিন্তু চাপা অসুখের মতন তার সিম্‌টম্ কিছু ধরা পড়েছে—এই ভাবেই নিদানটা দেওয়া চলে। ফলে দেখতে পেলাম—গান কই আর তেমন ভালো লাগে না তো! মানে ওস্তাদি গান—তোমাদের ভাষায় art-song—শুনতে যে তৃষ্ণা একেবারেই জাগে না এতটা বলব না, কিন্তু খানিকক্ষণ পরেই আবিষ্কার করি একটা জিনিষ: যে, মন যেন আর তেমন সাড়া দিতে পারছে না। মনে হয় যে, যাকে সোনা মুঠি ব'লে ধরেছিলাম সে যেন প্রায় ধুলোমুঠি হ'য়ে দাঁড়াবার জো।

"এ-সন্দেহ অবশ্য আসে নি যে, ভালো ওস্তাদি গানও আসলে তেমন ভালো নয়। সুন্দরকে অসুন্দর মনে হবে কেমন করে? কেবল মনে হয়—'কী ক'রে বোঝাব? মনে হয়…যেন সুন্দর হ'তে পারত আরো সুন্দর—শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়: 'More is possible'

"প্রথম দিকে এজন্যে দুঃখ হ'ত বৈকি। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি বা শ্রুতিভঙ্গি যখন বদলায় তখন এমন অনেক কিছু নব আবিষ্কার করা যায়—যার ফলে অনেক স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্বও না-মঞ্জুর মনে হয়। আমারও হ'ল: অর্থাৎ আমি দেখতে পেলাম যে, আমাদের এস্থেটিক থিওরির বনেদটাই পাকা নয়। অর্থাৎ, সুন্দর যদি নিজেকে শুধু সুন্দর ব'লে সাবাস দিয়েই সন্তুষ্ট থাকে তাহ'লে সে-সৌন্দর্যে মন গভীর তৃপ্তি পায় না। সুন্দর যাকে ছোঁয় কিন্তু ধরতে পারে না, তার একান্ত আবাহনেই লাবণ্য ওঠে অভিরাম হ'য়ে, মধু জোগায় সুধার স্বাদ।

"তাই ক্রমশঃ আমি খেয়াল ঠুংরি জাতীয় art-song

ছেড়ে ভাবসঙ্গীতের—মানে ভজনকীর্তন স্তবস্তোত্রবর্গীয় সঙ্গীতের দিকেই ঝুঁকতে সুরু করলাম—দেখতে পেয়ে যে, এসব গানে মন বেশি সহজে অন্তর্মুখী হ'তে পারে। অবশ্য মনে দ্বন্দ্ব আসত বারবারই—আবাল্য ওস্তাদি সঙ্গীতের আর্ট নিয়েই চর্চা ক'রে এসেছি তো, দ্বন্দ্ব না এসে পারে? তবু কেবলই মনের বিরুদ্ধতা কাটিয়ে প্রাণ উঠত উজিয়ে ভাবসঙ্গীতে, মনে হ'ত—এ-জাতীয় গানে যেন সুর তার যথাযথ স্থানটি বেশি সহজে খুঁজে পায়, যেহেতু এখানে মূল লক্ষ্যটা ঝোঁকে গভীরের দিকে।

"মনের এই দোলায়মান অবস্থায়ই আলোর দিশা মিলল—একটি আশ্চর্য মানুষের প্রসাদে। তাঁর আসল নাম বলব না। নাম দেওয়া থাক পীতবাস, কারণ তিনি বৈষ্ণব হ'লেও বৌদ্ধদের মত সোনালি ধুতি পরতেন। আর সোনালি চাদর, ব্যস। জামাটামার পাট ছিল না। কিন্তু তাঁর কথা বলতে হ'লে একটু পেছিয়ে যেতে হবে।"

এক

বিলেত থেকে দেশে ফিরে আমি নানা জায়গায় হানা দিতাম বড় গুণীর খবর পেলেই। পীতবাসের নাম শুনেছিলাম আমি দুতিনজন ভক্ত বৈষ্ণবের মুখে। তিনি নাকি আগে মস্ত ওস্তাদ ছিলেন, পরে ভজন কীর্তনের দিকে ঝোঁকেন—হঠাৎ। যেই ঝোঁকা সেই তিনি কলকাতা ছেড়ে আশ্রয় নেন বাংলাদেশের এক রাজবাড়ীতে। রাজার নাম দেওয়া যাক্—সুজন রায়, তাঁর রাজ্যের নাম কী বলব? হ্যাঁ, বাসন্তীপুর। তাঁর মন্ত্রীর নাম—ধরা যাক অতুল সিংহ—বিলেত ফেরৎ পাক্কা সাহেব। মন্ত্রীজায়ার নাম—প্রমীলা দেবী—আধা মেমসাহেব। দুই মেয়ে—ধরো, শমিতা ও মূর্ছনা। তাদের কথা পরে বলছি। আগে রাজবাড়ীর কথাটা সেরে নিই।

রাজা সাহেব ছিলেন কৃষ্ণভক্ত। পীতবাসের মুখে কৃষ্ণকীর্তন—তাঁর সুরে ও ভাবে তিনি এত মুগ্ধ হন যে, তাঁকে নিমন্ত্রণ করেন তাঁর সভাগায়ক হ'তে। শুধু তাঁকে গান শোনানো সন্ধ্যাবেলা—ব্যস। দক্ষিণা প্রচুর। পীতবাসের অর্থলোভ ছিল না, তবে দানের হাত ছিল, নানা প্রার্থীকেই অর্থ সাহায্য করতেন। তাই তিনি রাজার নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রে সোজা বাসন্তীপুরে গিয়ে রাজার একটি ছোট বাংলোয় কায়েম হন। সেইখানেই তাঁর সঙ্গে আমার শুভদৃষ্টি হয়। আমি উৎসুক হ'য়ে বাসন্তীপুর গিয়েছিলাম খবর নিতে—কেন তিনি ওস্তাদি গান ছেড়ে ভজন কীর্তন জাতীয় ভক্তি-সঙ্গীতের দিকে ঝুঁকলেন। মনে রেখো কিন্তু—আমি তখনো পুরোপুরি ভজন কীর্তন—অর্থাৎ devotional music-কে বরণ করতে পারি নি। তখনো আমার মনে হ'তো প্রায়ই যে, সুরের অবাধ নভোচারণও তো একটা মস্ত কথা—কীর্তনে তার অবকাশ কই? এ-তর্ক হয়ত তোমরা বুঝবে না। নাই বুঝলে, শুনে যাও—যেটুকু বোঝা দরকার সেটুকু হ'ল আমার conversion—পীতবাসের প্রভাবে। বাকিটুকু আমি ব'লে যাব যথাসম্ভব সংক্ষেপে, কিন্তু ব্যাখ্যা রেখে, নৈলে গল্প বুঝবে না সারা দিনেও।

পীতবাস আগে ছিলেন পেল্লায় খাঁ বা জাঁদরেল শাহ-বর্গীয় ওস্তাদই বটে, অর্থাৎ তাঁর গমকে শিশুরা মূর্ছা যেত আর অবলাদের হার্টফেল করত। বড় বড় সঙ্গীত কন্‌ফারেন্সের তিনি ছিলেন একজন আদি-প্রবর্তক। কিম্বদন্তী: তাঁর এক একটা তানে রাজবাড়ীর উঁচুঘরের ছাদ উঠত কেঁপে, হাতীশালের হাতী হ'ত উধাও।

কিন্তু শুধু মানুষই তো ভগবান্‌কে নিয়ে ঠাট্টা করে না দিদি, ভগবানও শোধ তোলেন ঠাট্টা ক'রে। আমাদের দেশে বলে: ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে। তাই ওস্তাদের ওস্তাদ হঠাৎ নিলেন তাঁকে একহাত। কী ক'রে সেটা বলবার মতন। শোন মন দিয়ে। তাঁর ভাষায়ই বলি। যদিও শুনলে হয়ত তোমাদের মনে হবে—নিছক গল্প।

* * *

"বাবুজি," বললেন পীতবাস. "আজ আমি কীর্তন গাইছি—কিন্তু একসময়ে কীর্তনকে বলতাম—নাকি কান্না—গানের নামে বাজে উচ্ছ্বাস, আবেগ ফেনা—কত কী!" একটু হেসে: ঘর ছাড়া বাঁশি যে শোনে নি, বাবুজি, অভিসারের ইতিহাস তার কাছে পাগলামি—সে সুস্থ নাম দেয় শুধু তাদের—যারা নাকে চশমা এঁটে, টাকা আনা পাইয়ের হিসেব ক'রে লোহার সিন্দুকটিতে ডবল তালা লাগায়। কিন্তু কী ক'রে আমার রূপান্তর জানো? একটি সাক্রেদ-গুরু পেয়ে।"

'সাক্রেদ-গুরু?'

"হ্যাঁ। আর তার বয়স কত জানো?—আট।"

"সে কি ওস্তাদজি?"

"একেবারে অক্ষরে অক্ষরে। হল কি, সেবারে জলন্ধর সঙ্গীত কন্‌ফারেন্সে এলেন সঙ্গীতরতন মহিরুদ্দিন। ধন্ত ধন্ত পড়ে গেল সর্বত্র। হবে না?—তিনি সবাইকে গমক শোনাতে শোনাতে যা ধমক দিতেন! গাইতে গাইতে হেঁকে বলতেন—ইয়ে দেখিয়ে অতি কোমল ঋষভ, ইয়ে দেখিয়ে অতি তীবর ধৈবত—গানা তো ইয়ে হয় সাব্—সুর্ সুর্—মহশল্লা—ব'লে নিজের প্রশংসায় নিজেই মুখর। তাঁর তারস্বরে আত্মজয়ধ্বনি ছিল একটা দেখবার—থুড়ি, শোনবার জিনিষ।

"আমারো গেল রোখ চেপে। পাল্লা দিয়ে নামলাম সুরের মল্লযুদ্ধে—তাল ঠুকে। উনি দেড় সপ্তকের তান দেন তো আমি দিই গৌনে দু'সপ্তক, উনি দশ পর্দার গমক বার করলে আমি বার করি সাড়ে তের পর্দার—এই রকম আর কি। সঙ্গে সঙ্গে তাল বাঁটের দুন চৌদুনের কামান বন্দুক বোমা পট্‌কা সবই ছিল, বলা বাহুল্য।

"কন্‌ফারেন্সে শেষটায় এই ওস্তাদি ঘোড়-দৌড়ে আমার কণ্ঠাশ্বই করল বাজিমাৎ। আমি হলাম ফার্স্ট—সঙ্গীত রতন মহিরুদ্দিন খাঁ খানান সাহেব হ'লেন সেকেণ্ড। সেদিন আমার বাসায় দিলাম ভোজ। কুরুক্ষেত্রে জিতে যুধিষ্ঠিরও তাঁর রাজসভায় এ-ধরণের জাঁকালো ভোজ দিয়েছিলেন কি না সন্দেহ।

"কিন্তু মনের কোণে বাবুজি, কোথায় কী একটা আত্মগ্লানি যেন থেকে থেকে খচখচ করে! ওঁকে হারিয়ে না হয় দিলাম। কিন্তু পেলাম কী? মনের মধ্যে হাত্‌ড়ে দেখি—যে-তিমিরে সেই তিমিরে! হঠাৎ আর পারলাম না—পাশের ঘরে গিয়ে বাবুজি, আপনাদের এই পালোয়ান ওস্তাদ পীতবাস কেঁদে ভাসিয়ে দিল—অকারণ—এ কোরবেই অকারণ। গান আমি ভালোবাসি কিন্তু গানের নামে এ করছি কী! এ কি বীণাপাণির সেবা, না অপমান? বাঁশিকে করছি ভোঁজালি, বীণাকে গদা? বাবুজি," বললেন পীতবাস মুখে হাসি টেনে, "আপনাদের ঘরোয়া বাংলায় বলে না—প্রদীপের নিচেই লয় অন্ধকার?

"এমনি সময়ে বাবুজি গুরু দিলেন দেখা: এক আট বছরের শিশুর ছদ্মবেশে। তাকে নিয়ে এসেছিল তার এক রইস মাতুল—আমার জাঁদরেল ভক্ত। বললেন তিনি: 'ওস্তাদজি, আমার ভাগনেটির বেশ মিষ্টি গলা—আপনি একে গান শেখাবেন?' আমি বললাম প্রীতকণ্ঠে: 'খেয়াল ঠুংরি জানে?' মাতুল বললেন: 'কোত্থেকে শিখবে ওস্তাদজি ওসব—ও বড় গরীব। গ্রাম থেকে সবে এসেছে আমার এখানে—টাইফয়েড হয়েছিল, কাবু হ'য়ে পড়েছে—শরীর সারতে পাঠিয়েছে ওর মা। জানে মাত্তর এক আধটা বাংলা কীর্তন।'

"আমি বললাম: 'তাই গাওয়াও না শুনি। কী বলেন মহিরুদ্দিন খাঁ সাহেব? ছেলেমানুষ গাইলই বা এক আধটা বাংলা কীর্তন?

"ছেলেটির হয়েছিল টাইফয়েড। নিদারুণ রোগ যাবার সময়েও রেখে গেল তার চিরচিহ্ন—একটি হাতগেল প'ড়ে। আহা সে লিকলিকে সরু বেতের মতন হাতটি দেখলে বুকের মধ্যে কেমন ক'রে উঠত বাবুজি! অথচ সে নিজে কী যে প্রফুল্ল! মা-হারা শিশু যেমন বোঝে না তার কী গেছে, বোধ হয় তেম্‌নি সে-ও বুঝতে পারেনি এ-দারুণ পঙ্গুতার অভিশাপ কী! আরও দুঃখ হ'ল দেখে—রূপদেহে ওর মুখখানি পদ্মের মতন টলটল করছে—কী একটা অপরূপ অন্তর্লীন আভায় যে বাবুজি! এমন শিশু কিনা হ'ল পঙ্গু!

আমার ভরসা পেয়ে সে গাইল গোবিন্দ দাসের একটি কীর্তন:

নন্দনন্দন চন্দচন্দন গন্ধ নিন্দিত অঙ্গ
শেষ দুই চরণে ছিল
কঞ্জলোচন কলুষ-মোচন শ্রবণ-রোচন ভাষ
অমল কোমল চরণ কিশলয় নিলয় গোবিন্দদাস।

"গাইল সে সাদা মাটা সুরেই, সাদামাটা তেওরা তালে। অলঙ্করণের বিন্দু বিসর্গও তো সে জানত না! কিন্তু কী গানই সে গাইল বাবুজি!"—পীতবাসের চোখ চিকচিক ক'রে উঠল, বললেন: "আহা, সে পূর্বজন্মে ছিল প্রহ্লাদ তথা গন্ধর্ব। কী কণ্ঠ সে! আজ পঞ্চাশ বছরে বাবুজি অমন কণ্ঠ দু'বার শুনি নি। সে তো কণ্ঠ নয়—যেন সুধা সমুদ্র ছানিয়ে ওঠা স্বর্ণছবির নরম আলো। তার বর্ণনা হয় না বাবুজি, শুনতে শুনতে শুধু হৃদয়ের মধ্যে জেগে ওঠে: 'রূপ লাগি' আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর'!"

এমন কি, অমন যে দুর্ধর্ষ সঙ্গীত-রতন খাঁ সাহেব—তাঁরো চোখের একটা কোণ যেন চিকচিক ক'রে উঠল ঝাড়-লণ্ঠনের আলোয়।

'সেই দিন থেকে বাবুজি, ওস্তাদি গানের গোঁড়ামির হাত থেকে মুক্তি পেয়েছি। অবশ্য ধ্রুপদ আলাপ গাই এখনো—কিন্তু সেও ধ্রুপদী ঝাঁকের ভঙ্গিতে নয়—অন্য ভাবের ভাবুক হয়ে: মানে, অন্তর মথিত ক'রে ওঠে যে-শুদ্ধ সুরশ্রী—রাগশ্রী, তাকেই নিবেদন করি অন্তর দেবতাকে। কিন্তু ওস্তাদী বলতে তো এ আত্মনিবেদন বোঝায় না—অন্ততঃ এ-হুহুঙ্কারী কনফারেন্স প্রতি-যোগিতার যুগে!"

পীতবাস থেমে চোখের জল মুছলেন: "মরুক গে। যা বলছিলাম: সেই দিন বুঝলাম বাবুজি, গানে কী পেতে পারি আমরা, অথচ কী নিয়ে থাকি! আর শুধু কি গানেই? সব তাতেই কি এই কথা সত্য নয়? টাকা জমাই আমরা প্রাণপণে। ভাবি, চরম সুখ মেলে বুঝি শুধু লোহার সিন্দুক ভরাট ক'রে। কিন্তু লালাবাবু যেদিন বিলিয়ে দিলেন তাঁর সব মোহর, কেবল সেদিনই তিনি জেনেছিলেন যে এই সব-অনর্থের-মূল অর্থেই পরমার্থ মিলতে পারে—শুধু হাত বদল করে। আমি খুঁজছিলাম—গানে কী পাওয়া যায়। কিন্তু বাবুজি, মদমত্ত মাতঙ্গ কবে বেণু-বনে আসে বাঁশি শুনতে? তাই তো গানের পরম বাণীটি কোথায় লুকিয়ে থাকে আমরা দেখেও দেখি না—তাই তো সুরকে তাঁর অর্ঘ্য না করে করি আত্মপূজার উপচার। মন অবশ্য তখনো পেত অতিতীব্র অতিকোমল পর্দার নিখুঁৎ জাহিরিপনায় এক ধরণের কৃতিত্ব তৃষ্ণার চরিতার্থতা (আর এর মধ্যেও একটা সূক্ষ্ম আনন্দ নিশ্চয়ই আছে, না থাকলে মানুষ এত সাধনা ও গলাবাজি করবেই বা কেন?) কিন্তু পেত না সেই মণি যে নয়নে জ্বলে আলো হ'য়ে—পেত না সেই ধ্বনি যা রক্তে কাঁপে ঢেউ হ'য়ে—পেত না সেই সুধা যা অন্তরে নামে আনন্দ হ'য়ে—যার নাম ভক্তি প্রেম শরণাগতি—যার ছোঁয়াচে

'মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ॥"*

* মধুময় হয় নদনদী, মধু ঝরায় সমীর,
মধুধারে স্নিগ্ধ হোক দিনরাত্রি ধূলি ধরণীর। (ঋগ্বেদ)

এ আমার কথার কথা নয় বাবুজি, এমন আলোর পরশমণি সত্যিই আছে যার ছোঁওয়ায় পার্থিব রজঃ হ'য়ে ওঠে মধুর মধু, কেবল সে মাণিক তো মিলবে না অতিতীব্র অতি কোমলের ভেদ দেখানোর বাহাদুরিপনায়! বাবুজি! সুর যখন প্রণাম না হ'য়ে হ'য়ে ওঠে জাহিরিপনা, তুবড়ি বাজি, তখন বাজিকর তাকে চাইতে পারে, কিন্তু সুরদাস কি তাকে চায়? তার প্রণামের অভিমানও কি বলে না—ব'লেই পীতবাস উঠলেন গেয়ে:

"তেরে চরণমে আয়কে ফির আশ কিসকী কীজিয়ে?
বৈঠ গঙ্গাকিনারে ক্যোঁ কূপকা জল পীজিয়ে?

তাঁর চরণে এসে বাবুজি, আর কী চাইব? গঙ্গাতটে এসে কুয়োর জল? আর শুধু গানেই তো নয়, জীবনে তাঁকে ছাড়া কী চাইবার আছে বল দেখি—যিনি গানে আসেন প্রেম হ'য়ে, রূপে মাধুর্য হয়ে, শোভায় শান্তি হ'য়ে, নিখিলে করুণা হ'য়ে? সেই থেকে তাই গান শেখানোও আমি ছেড়ে দিয়েছি, সাক্রেদ টাক্রেদ সব দিয়েছি বিদায় ক'রে। কী হবে এসব ধুমধামে? প্রথমে অভাবে পড়েছিলাম বই কি—কিন্তু পণ নিয়েছিলাম প্রাণ যায় যাক্‌, যাতে মন ভরে না তার আর তালিম দেব না। সুর মিথ্যা বলছি না—মিথ্যা বলছি ওস্তাদিকে, অর্থাৎ সুরের ঝাঁকে নিজের অভিমানকে সাজিয়ে তোলাকে। কিন্তু একথা ওস্তাদে বুঝবে না তো।" বলতে বলতে ফের পীতবাসের অধরপ্রান্তে জেগে উঠল বিষন্ন হাসি: "আর বুঝবে কেমন ক'রেই বা বাবুজি? তাঁর বাঁশি শুনলে তবে না মানুষ বোঝে—সুর কোন্‌ নিবেদনে হ'য়ে ওঠে সত্যের সত্য, অন্তরের নৈবেদ্য। তাই তো আমিও বুঝেও বুঝিনি যতদিন না কানে বেজে উঠেছিল তাঁর বাঁশি ঐ শিশু কণ্ঠের সরল রাধা ভাকে। সুরের পারে যিনি থাকেন তিনি গাইলেন যেন ওরই মধ্যে দিয়ে—'ওরে পথহারা, আমাকে যদি চাস তবে হ'তে হবে ঐ শিশুর ম'ত, ছাড়তে হবে এসব দেখানোপনার চরকিবাজি—অহঙ্কারের ফর্‌'রায়ণ। সুরকে কর তোর প্রেমের খেয়া—তবেই জীবনের অন্ধকারে প্রাণের তুফানে ফুটবে দিশারি ধ্রুবতারা।' অথচ বাবুজি, এই যে প্রেমের মণিমুক্তা এ-ও তো রয়েছে আমাদের অন্তরের অতলে, কিন্তু ডুবুরি হ'য়ে

তাকে না তুলে আমরা বালুচরে ঝিক্‌মিকে ঝিনুক কুড়িয়েই বলি—কী মজারে!" বলেই গান ধ'রে দিলেন:

করে ঝিকমিক শূন্য ঝিনুক—তারেই কুড়িয়ে মরিস হায়!

মুক্তা যে ডাকে অন্তরতলে ডুব দিয়ে কবে তুলিবি তায়?

একটি গানে আছে:

হর প্রেমযমুনা বহ রহী তেরে হৃদয়কে আসপাস
ফির ভী সদা তু তৃষিত ক্যোঁ—যহ তো বতা দে
প্রেমদাস!

আর যে প্রাণের বৃন্দাবনে এ-যমুনার সন্ধান পেয়েছে তার কি আর কোনো অভাব থাকে বাবুজি? ঠাকুরের করুণাই তখন তার ভরণ পোষণের ভার নেয় যে! দেখ না আমাকেই। সাক্রেদ ছেড়ে দিয়ে তাঁর দিকে মুখ ফেরাতে না ফেরাতে তিনি জুটিয়ে দিলেন সুজনরাজকে যিনি আমাকে বলেছেন—কাউকেই তালিম দিতে হবে না আমার যদি আমি শেখাতে না চাই—শুধ্ রোজ সন্ধ্যায় তাঁর মন্দিরে তাঁকে গান শোনাতে হবে—ব্যস্। যে শিখতে চায় শুনে শুনে শিখবে, আমি আমার কীর্তন ভজন নিবেদন করব শুধ্ আমার ঠাকুরকে, গাইব শুধু তাঁর জন্যে।'

আমি বললাম: "কথাটা শুনতে চমৎকার মানি ওস্তাদজি, কিন্তু যারা কীর্তনকে নিবেদন করবার মতন ভালোবাসেনি পদাবলীকে, তারা করবে কী?"

"কী করবে? শ্রদ্ধা করবে ভালোবাসতে চেয়ে—" বলতে বলতে তাঁর চোখ উঠল জ্ব'লে—"যাকে হাজার হাজার মহাজন প্রণাম করেছে তাকে প্রণাম করতে শেখাবে। বুঝতে চেষ্টা করবে যে মনে আঁধারের দুর্গকে পুষে জানলা বন্ধ করে রাখলে আকাশের আলো ঢুকবার পথ পায় না।

"এ আমার রাগের কথা নয় বাবুজি" বললেন পীতবাস সুর নামিয়ে, 'আপশোষেরই কথা। বড় জিনিষকে বুঝি না এ সওয়া যায়—কিন্তু যাকে বুঝি না তার জন্যে লজ্জিত না হ'য়ে এ-অজ্ঞানের গৌরব করলে বাজেই। আর এই অপকর্মেই বাবুজি, সেরা হচ্ছেন তোমাদের হালফ্যাশনের বাঙালিবাবুরা। তাঁরা বোঝেন না কীর্তন—কারণ ভাবের গভীরতা কী বস্তু তার খবর রাখা দরকারও মনে করেন না। সে-রসের রসিক হওয়া সহজ নয়, মানি; কিন্তু এটা যে কঠিন এ-ও তো আগে জানা চাই। কীর্তন ভালো লাগছে না কেন নম্র হ'য়ে সেটাও একটু বুঝতে চেষ্টা করা উচিত ছিল না কি? মনে পড়ে" বলতে বলতে পীতবাস আপন মনেই হাসলেন: "পরমহংসদেবের সেই গল্প যে হীরে নিয়ে বেগুনওয়ালার কাছে যেতে বেগুন-ওয়ালা বললে এর বদলে দিতে পারি মাত্র দশটা বেগুন। তারপর লোকটা গেল কাপড়ওয়ালার কাছে। ও দর বাড়াল কিন্তু দশখান কাপড়ের বেশি না। তারপর জহুরীর কাছে যেতেই সে দর হাঁকাল দশলাখ।"

বলতে বলতে উদ্দীপ্ত পীতবাসের মুখ যেন ফের নিভে গেল: "বাবুজি, যদি কঠিন কথা বলে থাকি তবে ক্ষমা কোরো আমি সেকেলে লোক ব'লে। কিন্তু একটা কথা একটু ঠাউরে দেখো—যে, বড় জিনিষকে বঝতে হ'লে কিছু সাধনা দরকার করে কি না।"

"কিসের সাধনা?"

"শ্রদ্ধার, বিনতির।"

"কিন্তু আগে থাকতেই মাথা নোয়াব কেন ওস্তাদজি?"

পীতবাস মৃদু হাসলেন: "একটা কথা বলি তাহ'লে বাবুজি!

ছেলেবেলায় কি উচ্চাঙ্গের গান লাগত ভালো তোমার? এই সেদিনই তো বলছিলে তুমি যে বাজে রেকর্ডে থিয়েটারি গান শুনেই কাটাতে অষ্টপ্রহর। ভালো সাহিত্যের বেলায়ও ঐ কথা। বহুচর্চার ফলে তবে না রুচির বিকাশ হয়—বহু নিষ্ঠার ফলে তবে না হৃদয় সাড়া দেয় সহজ অনুরাগে সরল প্রেমে। প্রেম বাবুজি শুনতেই সরল, আসলে ওর মতন জটিল ফ্যাসাদে বস্তু কি দু'টি আছে?

চমকে উঠলাম সত্যিই, কিন্তু তখন রোখ চেপে গেছে, বললাম: "কিন্তু চর্চা করে মানুষ কখন ওস্তাদজি? যখন ভালোই লাগেনি—হ্যাঁ অনুরাগ বলতে মনে পড়ল, ছেলেবেলায় আমার এক মাসতুত ভাইয়ের সঙ্গে কী তর্কই না করতাম যখন তিনি কীর্তন বলতে উজিয়ে উঠতেন! বলতেন তিনি যে আমার ঠাকুর্দা, যিনি ছিলেন বাংলার একজন সেরা খেয়াল গাইয়ে, তিনি নাকি শেষজীবনে

শান্তিপুরের এক কিন্নরকীর্তনীর গান শুনে আক্ষেপ করে বলেছিলেন: গোঁসাইজি, বৃথাই ধ্রুপদ খেয়াল শিখে সময় নষ্ট করলাম—যদি কীর্তন শিখতাম—'

খুশিতে পীতবাসের আশ্চর্য চোখ দুটি ফের ঝিকমিকিয়ে উঠল, কথাটা আমার শেষ করতেও দিলেন না', বললেন: "তা হ'লেই দেখ বাবুজি যে গানে তোমার বাপ পিতামহ সমজদার হ'য়েও মজতেন তাতে তুমি মজা দূরে থাক্ ভাসতে পর্যন্ত যে শিখলে না এর কারণ কি এই যে কীর্তন-সিন্ধু অগভীর—না, তুমি নিজে স্বভাব ডুবুরি নও? না বাবুজি, তর্ক না 'নৈষা তর্কেণ মতিরপনেয়া'—তর্কে বস্তু মেলে কবে? মনকে একটু নাড়া দিয়ে ভেবে দেখ বরং। তুমি তো ওস্তাদ খুঁজতে সারা হিন্দুস্থান চ'ষে বেড়িয়েছ' কিন্তু, শান্তিপুরের কথা উঠতে মনে পড়ল, বলো দেখি নবদ্বীপ কলকতা থেকে কত দূরে?"

এ-অসংলগ্ন প্রশ্নে একটু থতমত খেয়ে বললাম: "সত্তর আশি মাইল হবে।"

"এক বারও কি মনে হয়েছে তোমার—যাইই না ওখানে একবার, শুনে আসি ভালো কীর্তন—কলকাতায় যার দেখা মেলে না?"

দুই

মনে আছে সেদিন প্রথমটায় খুবই বিরক্ত হয়েছিলাম। কিন্তু তার পরে কয়েকদিন উপরো উপরি পীতবাসের কীর্তন শুনে লজ্জায় যেন মাটিতে মিশিয়ে গেলাম। কারণ তখন প্রথম টের পেলাম—কীর্তন বলতে কী বোঝায় না জেনেই তর্ক ক'রে এসেছি এতদিন। পণ নিলাম যে, পীতবাসের কাছে বেশ কিছুদিন কীর্তনে তালিম নিতেই হবে।

কিন্তু তালিম কথাটা বলা ভুল হ'ল। বলা উচিত ছিল দীক্ষা নিতে হবে। কারণ কীর্তন একটু শিখতে শিখতেই একটা জিনিষ অন্ততঃ বুঝতে পেরেছিলাম: যে, কীর্তন শেখা যায় না—শুনে শুনে নিজের অনুভবের নিজস্ব বিকাশের আলোয় ফলিয়ে তুলতে হয় নিজের মতন ক'রে। ওস্তাদি গানের রাগরাগিণীর ছক কাটা আছে, বাঁধা শড়ক, চলো অমুক অমুক পথে, কণ্ঠসাধনায় প্রত্যক্ষ উন্নতির ফল পাবে হাতে হাতে। কিন্তু যখন বুঝলাম কীর্তন জোরে আয়ত্ত করবার বস্তু নয়, তখন এও বুঝতে পারলাম—কেন পীতবাস যাকে শেখানো বলে তার ধারও ধারতেন না। তিনি ছড়িয়ে যেতেন সুরের রংমশালে প্রেমের ফুলকি—যে প্রার্থীর অন্তরে আঁধার মাটিতে ফসল ফলাতো আনন্দের বীজে। মনে আছে তিনি প্রায়ই বলতেন—"ভজন-কীর্তন এম্‌নি ক'রেই চিরদিন নিজেকে ছড়িয়ে এসেছে বাবুজি, নাড়া বেঁধে সাক্রেদ করার অহংকারে দেওয়া যেতে পারে বড়জোর শিক্ষা, দীক্ষা হয় শুধু পুজোয়।"

আর সত্যিই সে গান নয় দিদি, সে পুজোই বটে। পীতবাস যখন বীণা বাজিয়ে তাঁর কীর্তন গাইতেন, তাঁর চোখে বইত ধারা। যখন ভজন গাইতেন—"রঘুপতি রাঘব রাজারাম" তখন গান হ'য়ে উঠত মন্ত্র তাঁর ভক্তির আরতিতে। মজতে হ'ল বৈকি—র'য়ে গেলাম বাসন্তীপুরেই।

* * * *

একটা বাংলো নিলাম ভাড়া—মহারাণীরই সুন্দর বাগানওয়ালা। পীতবাস সেখানেই প্রথম পায়ের ধুলো দিতেন। কিন্তু পরে তাঁর সুবিধের জন্যে আমিই যেতাম তাঁর ওখানে—কেননা তাতে একটু বেশি সময় পেতাম তাঁর গান শুনবার।

আমাকে তিনি কেমন যেন ভালোবেসে ফেললেন। বললেন: এতদিনে পেয়েছেন তাকে যাকে দিয়ে যেতে পারবেন তাঁর বড় আদরের কীর্তন ভজনাবলী। থেকে থেকে বলতেন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে যে, এ যুগে ওস্তাদি গানের চাহিদা যথেষ্ট, কিন্তু কোনো সাক্রেদই ভজন-কীর্তন শিখতে আসে না—মানে সাক্রেদের মতন সাক্রেদ। তবে তার পরেই হয়ত ফের বলতেন। "তবে বাবুজি, এধরণের খেদ করিই বা আমরা কেন? মানুষ অল্প বুদ্ধি ব'লেই না! কারণ যে গানে তাঁর পূজাই লক্ষ্য সে-গান কি মরতে পারে কখনো? মন্দির যিনি গড়েছেন বাতি কি তিনি নিভতে দিতে পারেন?' ব'লেই কখনো বা হয়ত এম্‌নিই হঠাৎ গেয়ে উঠতেন মীরার বিরহ-বেদনার গান:

প্রভুজী দরশন দীজ্যো আয়ে।
তুম বিন রহ্যো ন জায়ে।
খেত মেঘ বিন, চন্দ বিন রাতী
ফুল বাস বিন, ঘর বিন বাতী
সূনে জৈসে হায়ে,
মেরা প্রভু বিন মন কুম্‌হলায়ে।

মনে হ'ত আরমীরার অশরীরী বিরহ বেদনা যেন তাঁর কণ্ঠলোকে শরীরী হ'য়ে উঠত। কখনো তুলসীদাসের ভক্তির সুরধুনী ব'য়ে চলত তাঁর আবাহনের শত তরঙ্গে। কখনো বা কবীরের পরম একেশ্বর তাঁর মূর্ছনাপ্রদীপে ঝলক জাগাতো বৈরাগ্য-শিখা হ'য়ে। আর যেই এ-বিদ্যুৎ জাগত—যুগের অন্ধকার লুপ্ত হ'ত একনিমেষে, পাষাণ চিরে ছুটত সুরের ঝর্ণা। কখনো বীণার মিড় গমকে এ-ভাবসজ্জা আরো রঙিয়ে উঠত সুরের দোললীলায়, কখনো বা তার মৃদু রণনটি মাত্র শোনা যেত নীরাভরণ প্রেমের সরল ঝঙ্কারে, কখনো কণ্ঠে বীণায় চলত প্রতিযোগিতা: এ বলে—আমায় দেখ, ও বলে—আমায়। এ বলে: এই দেখ, চলেছি আমি বালুচরে ঢেউ তুলে; ও বলে: এই দেখ, চলেছি আমি আকাশে পাখা মেলে। এ বলে: এই দেখ, পায়ে আমার সোনার মল; ও বলে: দেখ্ দেখি, হাতে আমার হীরার বালা। এ বলে: দেখ্ আমি হয়েছি মুরলীধরের হাতের বাঁশি. ও বলে: দূও—আমি যে তাঁর মুখের হাসি! ঠিক যেন দুটি আলোর শিশু গায়ে গা ঠেকিয়ে ব'সে: এ কটাক্ষ করে, ও ঠোঁট ফোলায়—কিন্তু কী প্রেমের আনন্দে! মাটি ওদের অঙ্গরাগ, আকাশ—চোখের মণি। পায়ে ওদের ধুলোর নূপুর, মাথায় মেঘের মুকুট, সে কী গান—বোঝাব কেমন ক'রে এই নিদারুণ রেডিও-টকির যুগে?"

[ক্রমশঃ

ফরগেট মি নট

শক্তি মুখোপাধ্যায়

ধূসর কুয়াশা চারিদিকে।
সবুজ পাহাড় শ্রেণী এখনো ঘুমিয়ে আছে, পাইনের বনে·
শির্ শির্ শব্দ শুনি; বিবাগী বাতাস
স্তব্ধ আকাশ ঘিরে আজকে উচ্চকিত নয়।
সুনিপুণ শিল্পীর হাতে আঁকা ছবির মত
অদূরে পাহাড়ের গায়ে নিস্তব্ধ বাড়ির দুয়ারে
কুয়াশা তরল হয়। পূর্ব আকাশে
রক্তিম আলোর সমারোহ।
আঁকাবাঁকা পার্বত্য পথের দুপাশে
গভীর সবুজ বন জেগে উঠছে, বিশপ প্রপাত
উন্মত্ত হয়ে
শব্দ করে ঝরে পড়ছে অতলান্ত গভীর গহ্বরে।
সূর্যের রঙ পেয়ে কুয়াশা হারিয়ে যায়, পথে
ক্রমাগত ভিড় বাড়ে শিশু, বৃদ্ধ, যুবক-যুবতীর।
কিন্তু মেয়েটি
নরম ফুলের মত হাসিখুশি মুখ নিয়ে ছোট্ট মেয়েটি···
আর তো আসে না ফুল নিতে!
বলেছিল, ফুল নেবো তোমার বাগান হতে
নীল ফুল দুটো···
কি নাম জানো কি তুমি ওর!
'আমায় ভুলো না'—নাম বলেছি তাকে।
তারপর কতদিন কত রাত্রি পার হয়ে গেছে;
মেয়েটি আসে না আর ফুল নিতে। আমার বাগানে
ফুল ফোটে, ঝরে যায়, বয়স্ক হৃদয়ে
অন্ধকার ছায়া পড়ে—সন্তানের নীড়ে
পুনরায় ফোটে ফুল···ফোটে···।
ফুলেরা এখন
পরস্পর বলাবলি করছে নীরবে
আবার আসবে তাখো, মেয়েটি আসবে এই বাগানের পথে;
ভুলতে পারে না কেউ, ভোলেনি কখনো!

দ্বিজেন্দ্রকাব্যে হাস্যরস

শ্রীরঘুনাথ ভট্টাচার্য এম-এ, বি-টি, এম-এ (এডিন)

বাংলা সাহিত্যের সব্যসাচী কবি দ্বিজেন্দ্রলাল। দ্বিজেন্দ্র-কাব্য প্রতিভায় যুগপৎ লিরিক ও স্যাটায়ারের সমাবেশ ঘটিয়াছে। কবির কাব্যজীবনের প্রথম হইতে লিরিকের আত্মগত ভাবতন্ময়তা ও নক্তঃ বিচরণশীল ব্যষ্টিমনের সাথে সাথেই তাঁহার দেশপ্রেমিক মানবদরদী সামাজিক মনের প্রকাশ হইয়াছে ব্যঙ্গকৌতুকের মাধ্যমে। কবি নদীয়া অঞ্চলের রঙ্গপ্রিয়তার সাথে সাথে সমাজের নিকট হইতে যে রূঢ় আঘাত পাইয়াছিলেন, তাহাই কবি দ্বিজেন্দ্রলালের রসরঙ্গ ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মাধ্যমে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। কবি তাঁহার রসরঙ্গের কবিতায় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সঙ্গীত-প্রীতিকে প্রকাশ করিয়াছেন। কবির হাস্যরসের কবিতায় সঙ্গীতেরও হাস্যরসের হরগৌরী মিলন হইয়াছে। দেশ-প্রেমিক মানবদরদী কবি কখনও কখনও দেশবাসীর বিমূঢ়তা, কুসংস্কার, অজ্ঞতা, বিবিধ প্রকারের "মি"র প্রতি ধিক্কার হানিলেও—হাস্যের ও ব্যঙ্গের অন্তরালে ক্রন্দন করিয়াছেন। মানবতার প্রতি গভীর নিষ্ঠা, মানুষের সুখ দুঃখের প্রতি গভীর সমবেদনা কবির মনকে গভীর ভাবে নাড়া দিয়াছে। তাই কবি যে গান গাহিয়াছেন, তাহা বাহ্যদৃষ্টিতে বিদ্রূপের মত শোনাইলেও অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন রসিক পাঠকের নিকট প্রেমিক দরদী মানবের সমবেদনায় ক্রন্দনরত দ্বিজেন্দ্রলালের চিত্রটিই ফুটিয়া উঠে। তাই দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানে স্থূল হইতে সূক্ষ্ম বিষয়বস্তু, তিক্ত তীক্ষ্ণ আঘাত হইতে গভীর দরদ, সমসাময়িক বাঙ্গালী জীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতি হইতে সার্বজনীন মানব প্রকৃতি, অট্টহাস্য হইতে চাপা হাসির সমব্যথী বন্ধুর ক্রন্দন সুর, গদ্যকে পদ্যের বাহনরূপে স্বীকৃতি, রসকৌতুকের সাথে মানবের ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য মমত্ববোধ মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাই কবি শুধু আমাদের বাহিরের ইন্দ্রিয়ের নিকট তাঁহার স্বীকৃতিলাভ করেন নাই—অন্তরের অন্তঃপুরেও তাঁহার হাসির গান আলোড়ন তুলিয়াছে—এ জন্য কবি হাসাইবার সাথে সাথে দেশবাসীকে ভাবাইয়া তুলিয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের দেশপ্রেম অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তাঁহার হাসির গানের মূলেও রহিয়াছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভিতর দিয়া তাঁহার যে দেশ-প্রেম প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহা জাতির চিরন্তন সম্পদ। দ্বিজেন্দ্রলালের সত্যনিষ্ঠা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত অসূয়াবর্জিত প্রতিবাদ তাঁহার হাস্যরসের কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দ্বিজেন্দ্রলাল অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভিতর দিয়া তাঁহার দেশপ্রীতি ব্যক্ত করিয়াছেন। এদিক হইতে আর্যগাথার দেশপ্রীতি দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানে গানের মাধ্যমে যেন আরও প্রাণবন্ত ও জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল দেখাইলেন, সুর ও হাসির সাথে যুক্ত হইলেও দেশপ্রীতির মত ভাবগম্ভীর বিষয়-বস্তুও যেন আরও প্রাণময় হইয়া উঠে। দেশপ্রীতি দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলির প্রাণ, তাহা দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্য-রসের কবিতাতেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের চিত্রধর্মী ও সংলাপধর্মী বাচনভঙ্গী, মানবপ্রীতি ও সমাজ চেতনার প্রকাশ তাঁহার "আষাঢ়ে"। এই 'আষাঢ়ে'তে দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যসত্ত্বা যেন আলোর রশ্মির মত হঠাৎ ঝিলিক মারিয়াছে।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা সাহিত্যে হাসির গানের জন্ম-দাতা। সুর ও হাস্যরসের মিলনরাখী সৃষ্টিতে কবি ও শিল্পী দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা সাহিত্যে পথ প্রদর্শক ও একক। হাসির গানের কবিতায় সুরকার দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাতী সুরের সার্থক প্রয়োগ করেন। হাস্যরসের কবিতাগুলি দার্শনিককবি, সঙ্গীতজ্ঞ ও নাট্যরসিক দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার দীপ্তিতে মহিমান্বিত। মানুষ হাসিয়া পশু-

পাখীকে হারাইয়া দিয়াছে। আর দ্বিজেন্দ্রলাল হাসিয়া ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সাথে রসকৌতুক, কবির হৃদয়ের সরসতার সাথে বুদ্ধিবৃত্তির একত্র সমাবেশ করিয়া হাসিকে সুরের পাখায় ভাসাইয়া এক অপরূপ জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, এ বিষয়ে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও একক।

দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরসের কবিতাগুলিকে মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: (১) যেখানে কৌতুক-রসের স্বতঃউৎসারিত সমাবেশ, নিরবচ্ছিন্ন প্রসন্নতা, উতরোল হাস্যপ্রবাহ, যেখানে তত্ত্বের শুষ্ক অবতারণা নাই —আছে ভাবের রসময়, প্রাণময়ী, বর্ণময়ী মদির অভিব্যক্তি। (২) দেশপ্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলাল, সমাজসেবী দ্বিজেন্দ্রলাল, মানবতাবাদী দ্বিজেন্দ্রলাল যেখানে, ব্যষ্টি জীবনে, সমাজ-জীবনে, রাষ্ট্রজীবনে, সাংস্কৃতিক জীবনে অসঙ্গতি দেখিয়াছেন, যেখানে মানুষকে "মি"র আড়ালে অকাল মৃত্যু পথ-যাত্রীরূপে দেখিয়াছেন, সেখানেই তিনি তীব্র শ্লেষ ও বিদ্রূপ হানিয়াছেন, ক্লেদ দূর করিয়া সমাজ ও ব্যষ্টি জীবনকে সুস্থ করিবার জন্য সম্মার্জনী দৃঢ় ও বলিষ্ঠ হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। (৩) আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণ: প্যারডি—

আষাঢ়ে কাব্যে কবি বিবিধ প্রকার কৌতুক কাহিনী শিথিল ছন্দে প্রকাশ করিয়াছেন। এই কাব্যের মারফতে কবির সামাজিক মতামতের অভিব্যক্তি হইয়াছে। এই কাব্যের কাহিনীকে আশ্রয় করিয়া হাস্যরসের অভিব্যক্তি হইয়াছে। এই কাহিনীগুলিতে সরসতা ও গল্পের দৃঢ় বাঁধুনী লক্ষ্যণীয়।

নাটকীয় সংলাপ রীতিও এই কাব্যে আমদানী করা হইয়াছে। এই কাব্যে গদ্যকে পদ্যের বাহনরূপে ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। অধ্যাপক প্রমথ বিশীর ভাষায়: "আষাঢ়ে কাব্যে দ্বিজেন্দ্রপ্রতিভার স্বকীয়তা প্রথমবার নিঃসংশয়রূপে দেখা দিয়াছে। ইহার চালচলন ভাবভাষা সমস্তই নূতন ও দ্বিজেন্দ্রীয়, ইহার গতিবিধিতে পাকীর তাল। নিরেট জোয়ান বেহারাগুলি নিছক গদ্য; কিন্তু তাহারা যখন তালে তালে পা মিলাইয়া সুর তুলিয়া চলিতে সুরু করে, তখন একপ্রকার অনির্বচনীয়তা ধ্বনিত হয়—সেইটুকুই পদ্য, সেইটুকুতেই কবিত্ব, সেইটুকুতেই কবির শিল্পের যাদু। ফলতঃ ইতঃপূর্বে আর কোন কবি গদ্যকে দিয়া এমন স্বচ্ছন্দভাবে পদ্যের পাকী বহন করাইতে পারেন নাই।" 'অদল-বদল' 'ভট্টপল্লীতে সভা,' 'হরিনাথের শ্বশুরবাড়ী যাত্রা' প্রভৃতি রসোত্তীর্ণ কবিতা। 'রাজা নবকৃষ্ণরায়ের' সমস্যায় সংবাদপত্রসেবী ধর্মব্যাখ্যাতা প্রভৃতি বিভিন্ন সমাজ জীবনের টাইপ চরিত্র, ভট্টপল্লীর সভায় প্রাচীন পণ্ডিতদের হাস্যকর অসঙ্গতি, 'শ্রীহরিগোস্বামী'তে প্রাচীন-পন্থীদিগের উদ্ভট বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রতি কটাক্ষপাত করা হইয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানে হাসি ও গানের গঙ্গা-যমুনায় মিলন হইয়াছে। কবি কোন কোন ক্ষেত্রে হাসির কবিতাকে সমাজসেবার কাজে লাগাইয়াছেন। এজন্য কবিতায় সূক্ষ্মবুদ্ধির প্রকাশ অপেক্ষা সাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাষা ও বিষয়ের সংযোজন করা হইয়াছে। কবি জীবনে যেমন স্থূল ও সূক্ষ্ম ভাব, ভারী ও চটুল ভাব পাশা-পাশি দেখিয়াছেন, তাহাকে তেমনি গ্রহণ করিয়া হৃদয় আবেগের জারকরসে সঞ্জীবিত করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্র-লালের হাসির গান তাঁহার বিভিন্ন বয়সের কতকগুলি গানের সমষ্টি। ইহা তাঁহার বিভিন্ন বয়সের মানস-পরিবর্তনের সাক্ষ্য দান করিতেছে, দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান, তাঁহার কাব্য ও নাট্যজীবন, কাব্য ও প্রহসনের সেতুবন্ধস্বরূপ। হাসির গানে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল কাব্যের কুঞ্জবন অতিক্রম করিয়া সুরের অমরপুরীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁহার অপক্ষপাত দৃষ্টিভঙ্গি। দ্বিজেন্দ্রলাল সমাজে ও জীবনে যেখানেই কোন অসঙ্গতি দেখিয়াছেন, সেখানেই তাহাকে তুলিয়া ধরিয়াছেন, কিন্তু এই অসঙ্গতিগুলি কোন বিশেষ ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে হেয় করিবার জন্য ব্যবহার করেন নাই। তাঁহার চিত্তের অসীম ঔদার্য্যে তিনি সকলকেই আপনার করিয়া লইয়াছেন। এজন্যই তাঁহার পক্ষে সকলের অসঙ্গতি লক্ষ্য করিয়া হাসির হোলির পিচকারী মারা সম্ভব হইয়াছিল। হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা থাকিলেও উৎকট হিন্দুধর্ম বাতিকগ্রস্তদের তিনি কৌতুক করিয়া লিখিয়াছেন:

> "From the above দেখতে পাচ্ছ বেশ,
> যে আমরা neither fish nor flesh,

"আমরা এ curious commodity, a human
oddity, denominated Baboos ,
আমরা বক্তৃতায় বুঝি ও কবিতায় কাঁদি,
কিন্তু কাজের বেলায় সব ঢু-s
আমরা beautiful muddle, a aneer qwal-
gam of শশধর, Hurcley, and goose."

আবার গোঁড়া সনাতন হিন্দুধর্মের ধ্বজাধারী প্রতিক্রিয়াশীলদের লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন :

"যদি চোরই হও, কি ডাকাত হও—
তা গঙ্গায় দেও গে ডুব ,
আর গয়া কাশী, পুরী যাওগে—পুণ্যি হবে খুব ;
আর মদ্য, মাংস খাও—বা যদি হয়ে পড় শৈব ,
আর না খাও যদি বৈষ্ণব হও ;—এর গুণ কত কৈব।
(কোরাস) ছেড়ো নাক এমন ধর্ম ছেড়ো নাক ভাই ;
এমন ধর্ম নাই আর দাদা, এমন ধর্ম নাই !
[বাদ্য] ভড়ালাক্ ভড়ালাক্ ভড়ালাক ভুম্ !"

কপটধ্বজাধারী হিন্দুদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কবি লিখিলেন :

"এবার হয়েছি হিন্দু, করুণাসিন্ধু গোবিন্দজীকে ভজি হে।
এখন কর দিবারাতি দুপুরে ডাকাতি
(শ্যাম) প্রেম-সুধারসে মজি হে।
আর মুরগী খাই না কেন না পাইনা !
(তবে) হয় যদি বিনা খরচেই,
আহা ! জান ত আমার স্বভাব উদার
(তাতে) গোপনে নাইক অরুচি।"

কবি নব্যব্রাহ্মদিগের প্রতি রহস্য করিয়া লিখলেন :

"চেয়ে দেখলাম—নব্য ব্রহ্ম সম্প্রদায়ে স্পষ্ট,
চক্ষু বোঁজা ভিন্ন নাইক অন্য কোনই কষ্ট,—
কাচিৎ ভগ্নী সহ দীক্ষিত হব উক্ত ধর্মে,—
এমন সময় বিয়ে হ'য়ে গেল হিন্দু ফর্ম-এ।
—ছেড়ে দিলাম পথটা, বদলে গেল মতটা,
(কোরাস্) এমন অবস্থাতে পড়লে সবারই মত
বদলায়।"

কোন এক অস্থিরমতি যুবকের খৃষ্টধর্মের প্রতি অনুরাগের কারণ লক্ষ্য করিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল কৌতুক করিয়া লিখিলেন :

প্রথম যখন ছিলাম কোন ধর্মে অনাসক্ত,
খৃষ্টীয় এক নারীর প্রতি হলাম অনুরক্ত,—
বিশ্বাস হ'ল খৃষ্টধর্মে—ভজতে যাচ্ছি খৃষ্টে,—
এমন সময় দিলেন পিতা পদাঘাত এক পৃষ্ঠে !
ছেড়ে দিলাম পথটা—বদলে গেল মতটা,—
(কোরাস) এমন অবস্থাতে পড়লে সবারই মত বদলায়।

কবি তথাকথিত শিক্ষিত আধুনিক পাশ্চাত্যানুরাগী বিলাতফেরতাদের লইয়া হাসি ঠাট্টা করিতে ছাড়েন নাই। পাশ্চাত্য জাতির বিজ্ঞানে উৎকর্ষতা তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ইংরাজী সাহিত্যে কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইলেও বিজ্ঞানে জ্ঞানলাভ করিবার জন্য তিনি বিলাত গিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি 'আমাদের বিলাত' বলিতে মূৰ্চ্ছিত হইতেন না। তাই তিনি তথাকথিত কাল্পনিক বিলাত ও বাস্তব বিলাতের পার্থক্য বর্ণনা করিয়া লিখিলেন :

'বিলেত দেশটা মাটির, সেটা সোনার রূপোর নয়,
তার আকাশেতে সূর্য্য উঠে, মেঘে বৃষ্টি হয় ;
* * *
সেথা বসন ভূষণ কমতি হ'লে স্বামীকে স্ত্রী বকে ;
আর নূতনেই প্রেম মিঠে থাকে, বাসি হ'লেই টকে ;

আবার বিলাতফেরতাদের চালচলনে অসঙ্গতি, তাহাদের 'চম্পট পরিপাটিত্বে'র সহিত বীরত্বের বড়াইয়ের অসঙ্গতি, তাহাদের পরানুকরণের প্রতি কৌতুক করিয়া লিখিলেন :

'আমরা বিলিতি ধরণে হাসি,
আমরা ফরাসি ধরণে কাশি,
আমরা পা ফাঁক ক'রে সিগারেট খেতে
বড্ডই ভালবাসি।'
* * *
'আমরা সাহেবি রকমে হাঁটি
স্পীচ দেই ইংরিজি খাঁটি ;
কিন্তু বিপদেতে দেই বাঙালিরই মত
চম্পট পরিপাটি।'

নিজ জীবনে নূতনকে বরণ করিলেও দ্বিজেন্দ্রলাল তথাকথিত হুজুগপ্রিয় প্রগতিশীল নতুনের অনুরাগীদের প্রতি হাস্য করিয়া 'নূতন কিছু করো'তে কৌতুক করিয়া লিখিলেন :

'আর কিছু না পারো, স্ত্রীদের ধ'রে মারো ;
কিম্বা তাদের মাথায় তুলে নাচো—ভালো আরো !
*　　*　　*
হয়েছি অধীর মত বঙ্গবীর,
এখন তবে কাটো সবাই নিজের নিজের শির ;
পাহাড় থেকে পড়ো, সমুদ্রে দাও ডুব,
মরবে না হয় মরবে—একটা নতুন হবে খুব।
নতুন রকম বাঁচো, কিম্বা নতুন রকম মরো ;—
—নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।'

'নবকুলকামিনী'তে তথাকথিত আধুনিকাদিগের প্রতি শ্লেষ ও কৌতুক করিবার সুযোগ কবি ছাড়েন নাই। শিক্ষিতাদিগের কর্মবিমুখতা ও চপল রঙ্গপ্রিয়তা ও হাল ফ্যাসানের প্রতি গভীর আনুগত্য তাঁহার শ্লেষের খোরাক জোগাইয়াছে :

'কটি নবকুলকামিনী
*　　*　　*
পারতপক্ষে উপর হইতে নীচের তলায় নামিনে।
গৃহের কার্য করুক সকলে—খুড়ি, জ্যেঠি, পিসি মাসিতে,
আমরা সবাই নব্য প্রথায় শিখেছি হাসিতে কাশিতে ;
করিতে নাটক নভেল শ্রাদ্ধ ;
করিতে নৃত্য, গীত, বাদ্য ;
বসিতে, উঠিতে, চলিতে, ফিরিতে,
ঘুরিতে, দিবস যামিনী।'

জীবনে পরিবর্তন স্বাভাবিক, কিন্তু যে পরিবর্তন জীবনে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারেনা, যাহাতে পূর্ববর্তী আদর্শ ও জীবনের সহিত পরবর্তী জীবনের ও আদর্শের গভীরতর অসামঞ্জস্য সৃষ্টি করে কখনও কখনও তাহা হাসির উপাদানরূপে কাজ করে। দ্বিজেন্দ্রলাল 'হ'ল কি' কবিতায় এইরূপ হাসির খোরাক জোগাইয়াছেন। যেমন দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় :

'পক্ষীর মাংস লক্ষ্মীর মত ছেলেবেলায় খাননি কে ?
ভবনদীর পারে গিয়ে বিড়াল বসছেন আহ্নিকে।'

'রাধাকৃষ্ণ রঙ্গমঞ্চে নাচছেন গিয়ে আনন্দে,' 'স্ত্রীরা সব ভবার্ণবে বেশী মাত্রায় কর্ণধার' প্রভৃতি উক্তির মাধ্যমে দ্বিজেন্দ্রলাল ব্রজধামের সহিত রঙ্গমঞ্চের অসামঞ্জস্য ও পুরুষদিগের অধ্যাত্ম-অনুরাগের সহিত নারী আকর্ষণ ও কর্তৃত্বের অসামঞ্জস্য উল্লেখ করিয়া কৌতুক করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল ভাবালুতা ও ভাববিলাসীদিগের প্রতি যেমন শ্লেষ ও কৌতুক করিয়াছেন, তেমনি আবার বাস্তববাদীদিগের অতিবাস্তবতার প্রাণহীনতাকে শ্লেষ ও কৌতুক করিবার লোভ সম্বরণ করেন নাই। কবির ভাষায় :

ঐ যায় যায় যায়,—
'প'ড়ে এ কলির ফেরে, সবাই যে রে—ভেঙ্গে চুরে,
ভেসে যায় !
*　　*　　*
ঐ যায়—গোপীর মেলা, ব্রজের খেলা, সঙ্গে শ্যামের বাঁশরীটি,
রৈল শুধু—আপিস, থানা, হোটেলখানা, রেল ও মিউনিসিপ্যালিটি,
ঐ যায়—পুরাণ, তন্ত্র, বেদ, মন্ত্র, শাস্ত্র-ফাস্ত্র পুড়ে ;
ঐ যায়—গীতাধর্ম, ক্রিয়াকর্ম, হিন্দুধর্ম উড়ে ;
রৈল শুধু—গেটে, শিলার, ডারুইন, মিল, আর—
ছেলের খরচ, মেয়ের বিয়া ;
রৈল শুধু—ভার্যার দ্বন্দ্ব, ড্রেনের গন্ধ, জোলো দুধ
আর ম্যালেরিয়া।'

সাহিত্য প্রেমের মাধুর্য ও প্রশস্তিতে মুখর। দ্বিজেন্দ্রলালও প্রেমের মালঞ্চের মালাকর। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল প্রেমের মাধুর্য ও বিশালতার সহিত চটুলতা ও চপলতা লক্ষ্য করিয়াছেন—লক্ষ্য করিয়াছেন প্রেমের অসঙ্গতি। প্রেমের এই অসঙ্গতি লইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল হাসিতে ও হাসাইতে ছাড়েন নাই। প্রেম বস্তুটি কি ? প্রেমের তত্ত্ব বিষয়ে মহাভারত সৃষ্টি হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল প্রেমের মত গুরু বিষয়ে হাল্‌কাচালে লিখিলেন :

'তারেই বলে প্রেম—
যখন থাকেনা futureএর চিন্তা, থাকে না'ক shame
তারেই বলে প্রেম।

যখন বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ,
যখন past all surgery আর যখন past all hope,
তারে ভিন্ন জীবন ঠেকে যখন ভারি tame—
তারেই বলে প্রেম।'

দ্বিজেন্দ্রলাল কৌতুক করিয়া 'স্ত্রীর উমেদার'এ লিখিলেন :

'বসন কম ছেঁড়ে ও বাসন কম ভাঙে,
গয়না সে কদাচিৎ দুই একখান চায়,
খরচ-পত্র একটু গুছিয়ে করে
অল্পই ঘুমায় ও অল্পই খায়।
যদি—তার উপর হয় একটু চলনসই গড়ন,
আর যদি হয় একটু বোকাটে ধরণ,
তার ওপর ডাকে—আমায় সোহাগে—
"পোড়ার-মুখো, আপদ্ ও হতভাগা!"
তাহ'লে হাঃ হাঃ—সে ত সোনায় সোহাগা!

"প্রণয়ের ইতিহাস"এ কবি প্রেমের রোম্যান্টিক দিক ও রোম্যান্টিক প্রেমের মোহজাল ছেদ করিয়া প্রেমের বাস্তব-রূপের চিত্র আঁকিয়াছেন। উচ্চকণ্ঠ কবি রোম্যান্টিক প্রেমের মোহিনীমায়ায়, সুরের দোলায় ভাসিয়া অপরূপ জগৎ সৃষ্টি করিলেন :

"ভাবতাম গোলাপ ফুলের মতন ফুটে আছে
প্রিয়ার মুখ,
দূরে থেকে দেখবো শুধু শুঁকবো শুধু গন্ধটুক,
রাখবো জমা প্রেমের খাতায়, খরচ মোটে
করবো না তায়,
রাখবো তারে মাথায় মাথায়, বুজবোনাক আঁখির
পাতায়—
হারাই পাছে তাহারে!
—ভাবলাম বাহা বাহা রে!'

কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল এবং প্রেমিকের যতই প্রিয়ার সাথে গভীর পরিচয় হইতে লাগিল, ততই প্রেমিককে নানাবিধ রূঢ় জীবনসত্যের সম্মুখীন হইতে হইল। কবি মোহভঙ্গ প্রেমিকের দৃষ্টিতে প্রেমের বাস্তব-রূপের চিত্র আঁকিয়া রোমান্টিক প্রেম ও বাস্তব প্রেমের অসঙ্গতি তুলিয়া ধরিলেন। সুরের আবরণ ভেদ করিয়া নিখিল মানবের প্রেমের ট্র্যাজেডি যেন করুণঘন রূপ লাভ করিল :

'দেখলাম পরে প্রিয়ার সঙ্গে হ'লে আরো পরিচয়,
উর্বশীর ন্যায় মোটেই প্রিয়ার উড়ে যাবার গতিক নয়!
বরং শেষে মাথার রতন নেপ্টে রইলেন আঠার মতন,
বিফল চেষ্টা বিফল যতন, স্বর্গ হ'তে হ'ল পতন—
রচেছিলাম যাহারে
—ভাবলাম বাহা বাহা রে।'

প্রেমে আছে মধু-মিলন ও বিরহ। যুগ যুগ ধরিয়া প্রেমিক কবিগণ বিরহের করুণ আর্ত্তি, বিরহের করুণ রসঘন চিত্র আঁকিয়াছেন। বাংলার বৈষ্ণবসাহিত্যে ভক্ত বিরহের আবরণে ভাবলোকে প্রেমিক প্রেমিকার মিলন সুখ আস্বাদন করিয়াছেন। বৈষ্ণব কবিতায় বিরহের করুণ আর্ত্তি ফুটিয়াছে। বিরহের এই নিবিড় রসঘন ঐতিহ্যের পাশেই কবি বিরহ যাপনের এক অভিনব কলাকৌশল আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রেমিক বলিতেছেন, "বিরহেতে দিন দিন ওজনেতে বেশী হই,"—কারণ "এখন রোচেনাক মুখে কিছু পাঁঠার ঝোল আর লুচি বৈ।" বিরহী কভু "দুখান সরপুরি," "সন্ধ্যায় একটু হুইস্কি" জলযোগ করেন।

শুধু যে মানুষের প্রেম লইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল রঙ্গরস করিয়াছেন, তাহাই নহে; কবি 'কৃষ্ণরাধিকার সংবাদে' কৃষ্ণভাবময়ী রাধিকার অহৈতুকী প্রেমের মধ্যে নর-নারীর সাধারণ প্রেম ও প্রেমাস্পদের মুখ হইতে প্রেমের স্তুতি শুনিবার যে আকাঙ্ক্ষা তাহার চিত্র আঁকিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার নিকট "প্রাণের কথা কইবার" সময় মোহন বেণু, পীতবস্ত্র, তাঁহার ত্রিভুবনবিমোহনরূপ, শ্রীকৃষ্ণের গোপী সম্মোহন শক্তির কথা পাড়িয়া রাধিকার মন পান নাই। শ্রীকৃষ্ণ সেইমাত্র নিজের গৌরব কীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরাধার 'রূপের ছটা,' 'চারু কেশ,' 'দেহ স্বর্ণলতার' স্তুতি করিলেন, অমনি শ্রীরাধিকার চিত্ত জয় করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহার রূপের প্রশংসা করিয়া বলিলেন :

'কৃষ্ণ বলে "আমার গুণে মুগ্ধ ব্রজবালা"
আর—রাধা বলে "ঘুম হচ্ছে না! এত ভারি জ্বালা—
তাতে আমারই কী!"

আবার শ্রীকৃষ্ণ সুর বদলাইয়া যেইমাত্র শ্রীরাধিকার গুণকীর্ত্তন করিলেন, অমনি তিনি শ্রীরাধিকার চিত্ত জয় করিলেন :

'কৃষ্ণ বলে "এমন বর্ণ দেখিনি ত কভু"
আর—রাধা বলে "হাঁ আজ সাবান মাখিনি ত তবু—
নইলে আরও সাদা!
কৃষ্ণ বলে "তোমার কাছে রতি কোথায় লাগে"

আর—রাধা বলে "এসব কথা বললেই হ'ত আগে—
গোল ত মিটেই যেত"

শ্রীরাধিকার প্রাকৃতজনোচিত মনোভাবের সহিত আমাদের চিরাচরিত মহাভাবস্বরূপিনী অহৈতুকীপ্রেমরূপা শ্রীরাধিকার ভাগবতী ভাবের মধ্যে অসামঞ্জস্যের জন্য দ্বন্দ্ব হয়; ইহা আমাদের চিত্তকে মৃদু দুঃখের আঘাত করিয়া কৌতুক সৃষ্টি করে। এখানে আমাদের চিত্র কিঞ্চিৎ দুঃখের আঘাতে জাগরিত হইয়া বেশী পরিমাণ সুখলাভ করে। এইরূপ কৌতুকে সুখের মধ্যে দুঃখের খাদ মিশিয়াছে।

কবি কোন কোন ক্ষেত্রে পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে স্থান ও কালের ব্যবধান লুপ্ত করিয়া মিলন ঘটাইয়াছেন, এই সকল কবিতায় স্থান ও কালের অসঙ্গতি পরিস্ফুট। তানসেন, বিক্রমাদিত্য সংবাদে অবলীলাক্রমে কবি হুগলী ব্রিজ, ওয়াটারপ্রুফ, রেলপুল প্রভৃতির সমাবেশ করিয়াছেন। যেমন:

'যাহোক, এলেন তানসেন রাজার কাছে দেখাতে
ওস্তাদি।
আর, নিয়ে এলেন নানা বাদ্য—'পিয়ানো ইত্যাদি।
অ—অর্থাৎ আনতেন নিশ্চয়, কিন্তু হ'ল হঠাৎ দৃষ্টি
যে, হয়নিক তানসেনের সময় 'পিয়ানো'র সৃষ্টি
তা ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি,
মেও এঁও এঁও।'

'রাম বনবাসের গানে' অধুনিক জীবনধারায় অভ্যস্ত রামের মধ্যে পিতৃসত্যব্রত শ্রীরামের কোন চিহ্ন মাত্র নেই। লঘুরসের সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মচারী সত্যনিষ্ঠ রঘুকুল-তিলক রামের চরিত্র অতি ফিকে ও তরল করিয়া আঁকা হইয়াছে:

'একি হেরি সর্বনাশ!
রাম, তুই হ'বি বনবাস—এ কি হেরি সর্বনাশ!
* * *
ওরে, আমি যদি তুই হইতাম, পোর্টম্যাণ্টর ভিতরে নিতাম,
বঙ্কিমের ঐ খান কতক (ওরে) ভালো উপন্যাস,
একি হেরি সর্বনাশ।
ও রাম, দেখিস্ তোর ঐ বাপ মাকে চিঠি লিখিস্
প্রতি ডাকে,
আর মাঝে মাঝে রাত্রিকালে, (ওরে) পোটেটো
চপ্ খাস।'

দ্বিজেন্দ্রলাল শুধু চপ খাইবার প্রস্তাব করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। কবি খাদ্য বস্তু লইয়া সাহিত্যিক ভূরি ভোজের আয়োজন করিয়াছেন। "সন্দেশ" কবিতায় রসিক কবি অপরিতৃপ্ত বাসনা লইয়া লিখিয়াছেন:

'ওহো, না রাখিত বাঁধি সন্দেশ আদি, সংসারে এই
সমুদয়,
ওহো, হ'য়ে মুনিঋষি, ছুটে কোন্ দিশি, যেতাম হয়ত
মহাশয়।
পেলাম না শুধু—হরি হে!
—খাইতে হৃদয় ভরিয়ে,—
ওহো, মনের বাসনা মনে র'য়ে যায়, চখে বহে' যায়
দরিয়া।'

কবি ঋতুর কবিতা লইয়া হাস্য-কৌতুক করিবার সুযোগ ছাড়েন নাই। বাংলা কবির মনে বর্ষা নিবিড় সাড়া জাগাইয়াছে। কিন্তু কবি দ্বিজেন্দ্রলাল বর্ষায় কোন রোম্যান্টিক শিহরণ অনুভব করেন নাই—অনুভব করেন নাই কোন পরাণ সখার অভিসারের কথা। কবি বর্ষার বাস্তব চিত্র আঁকিয়াছেন। রাস্তা কর্দমাক্ত, ছেলেরা গৃহবন্দী, গিন্নী বৌমাকে বড়ি তুলিবার নির্দেশ দেন। এমন কি বসন্তও বনরাণী সাজে আসে না। বসন্তকালে 'ভন্‌ভনে মাছি দিনের বেলায়, শন্‌শনে মশা রাত্রে।' প্রিয়তমারা বিরহে কাতর, তাহারা অভিনব পদ্ধতিতে পতির বিরহ যাপন করিতেছেন। কাঁচা আমের অম্বল ও 'গোলেব-কাওলি' গ্রন্থ তাহাদের চিত্তকে চুরি করিয়াছে। তবে একেবারে যে পতির কথা মনে পড়িতেছে না তাহা নয়। আর পড়িবে নাইবা কেন "আজ যে মাসের ২৭শে।"

দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের কতকগুলি কবিতায় শ্লেষের অন্তরালে যে দার্শনিকতা ও দরদী মনের ছাপ রহিয়াছে, তাহা বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপে "আমি যদি পিঠে তোর ঐ" কবিতাটি লওয়া যাক্। নিপীড়িত জাতির মর্মবেদনাকে হৃদয়ের জারকরসে হজম করিয়া তাহাকে যে শিল্পাবিতরূপ দান করিয়াছেন, তাহা অনবদ্য!

'আমার সেটা অনুগ্রহ—যদি লাথি মেরেই থাকি,

লাথি যদি না মারতাম ত'—না মারতেও পারতাম
নাকি
লাথি খেয়ে ওরে চাষা! বরং রে তোর উচিৎ হাসা
যে তোর কথাও মাঝে মাঝে, তবু আমার মনে জাগে।
বরং উচিত—আগে আমার পায়ে হাত তোর বুলিয়ে
দেওয়া;
পরে ধীরে ধীরে নিজের পিঠের দাগটা মুছে নেওয়া!
—পরে বলা ভক্তি ভরে—"প্রভু! অনুগ্রহ করে,
পৃষ্ঠে ত মেরেছো লাথি—মারো দেখি পুরোভাগে!
—দেখি সেটা কেমন লাগে।"

একি শুধু দেশবাসীর ত্রুটিতে বিদ্রূপ, হাস্য পরিহাস, ব্যঙ্গ তামাসা? এর পিছনে কি নিপীড়িতের দরদী বন্ধু দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যথিত মথিত ক্লিষ্ট চিত্তের গ্লানি ও বেদনা, অপমান ও আত্মধিক্কার, জাতির দুঃখকে সমভাবে অংশ গ্রহণ করিবার জাগ্রতবোধ পরিলক্ষিত নয়?

"বদলে গেল মতটা" কবিতায় শুধু কি কোন অস্থির-বুদ্ধি যুবকের খৃষ্টধর্ম, ব্রাহ্মধর্ম, নাস্তিক সঙ্ঘে, থিয়োসফিষ্ট সঙ্ঘে মত পরিবর্ত্তনের কাহিনী? জীবনের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া মত ও পথ পরিবর্ত্তনের যে করুণ কাহিনী এবং পরিশেষে জীবনের যে করুণ পরিণতি ঘটে, ইহা কি সেই করুণ ঘটনার ইঙ্গিত করে নাই? "বদলে গেল মতটায়" "মিশিয়ে এনেছি প্রায় বেসান্ট ও বেদান্ত, এমন সময় হ'য়ে গেল ভবলীলা সাঙ্গ" পাঠ করিতে করিতে বিদ্যুৎ ঝলকের মত মানবের সত্যসন্ধানের শাশ্বত এষণার ব্যর্থ পরিণতির কথা কি মনে জাগে না? মনে কি পড়ে না পরামূল্য, শাশ্বত সত্য খুঁজিবার ব্যর্থ প্রয়াস!

"পান আনতে. লবণ ফুরায়," "যেমনটি চাই তেমন য় না," প্রাণ রাখিতে সদাই যে প্রাণান্ত," "আসল প্রেমের চেয়ে ভাল কাবো প্রেমের চিত্র" প্রভৃতি বাস্তব সত্য। 'চাষার বিরহ" কবিতায় অবহেলিত কৃষাণের করুণ কাহিনী, কৃষাণের করুণ জীবন আলেখ্য কৃষানের জীবনের সমাট কান্নাই যেন ইহাতে ঘনীভূত বাণীরূপ পাইয়াছে। এ কবিতায় কৃষাণের দুঃখের জ্বালা ও দৃপ্তি, হৃদয়ের নিবিড় আলোড়ন মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

নন্দলাল কবিতায় নির্বীর্য্য দাম্ভিক ভণ্ডদেশপ্রেমিকের খোলই কি শুধু খোলা হইয়াছে? কবি কি শুধু নন্দলালের প্রতি শ্লেষ ও বিদ্রূপ করিয়াছেন? নন্দলালকে অবলম্বন করিয়া আমরা কি আমাদের দুর্বল চিত্তকে আবিষ্কার করি না? আমরা কি আমাদের পৌরুষের অন্তরালে যে ভণ্ডামি ও ন্যাকামির প্রবণতা রহিয়াছে, তাহা উপলব্ধি করি না? আর মানবচরিত্রের এই দুর্বল দিকটা অনুধাবন করিয়া আমাদের কি নন্দলাল জাতীয় মানুষের দুর্বলতায় সহানুভূতি জাগেনা?

দ্বিজেন্দ্রলাল প্রহসন ও নাটকগুলিতেও হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছেন। হাসির গানগুলি দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসনগুলিতে প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল প্রহসনগুলিতে তৎকালীন সমাজের অসঙ্গতিগুলিকে তুলিয়া ধরিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে কাত্যায়ন, পিয়ারা, দিলদার প্রভৃতি চরিত্র দর্শকের হাসির খোরাক জোগাইয়াছে। যন্ত্রলক্ষণাক্রান্ত প্রাণলীলার সামঞ্জস্যহীন কাত্যায়ন দর্শকের সস্তা হাসির খোরাক জোগাইয়াছে। হৃদয়ে দ্বন্দ্বের জ্বালাবহ্নি লইয়া নিয়তির রূঢ় বিধানের সম্মুখীন হইয়াও পিয়ারা দরদ লইয়া স্বামীকে প্রশান্ত সরস হাস্যরস পরিবেশন করিয়াছেন। দিলদার চরিত্রটি দ্বিজেন্দ্র-নাট্য সাহিত্যে অপূর্ব সৃষ্টি। দিলদার চরিত্রে আঘাতের সহিত কারুণ্য, গভীর অন্তর্দৃষ্টির সাথে প্রশান্ত হাস্যরসের সমন্বয় ঘটিয়াছে। দিলদার চরিত্রে আছে বাস্তব জীবনের রূঢ় বেদনাসিন্ধুমন্থন করিয়া মানুষের প্রতি প্রীতি ও সহানুভূতিরূপ অমৃত বিতরণের চেষ্টা। দিলদার বাস্তব জীবনে বিষামৃত পান করিয়া, দার্শনিক জারকরসে সত্যকে গ্রহণ করিয়া প্রশান্ত হাস্য বিতরণ করিয়াছে। দিলদার হাসাইবার সহিত ভাবিবার, ভাবিবার সহিত হাসাইবার, কাঁদিবার সহিত হাসিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছে। দিলদার কথিত বাণী অপেক্ষা তাহার ব্যঞ্জনার রেশই চিত্তকে ভাবাইয়া তুলিয়াছে। দার্শনিক হাস্যরসিক দিলদার দার্শনিক হাস্যরসিক পরিণত বয়স্ক জীবন রসরসিক দ্বিজেন্দ্র-লালের নব রূপায়ণ। বস্তুতঃ হাস্যরসিক দিলদার বাংলা সাহিত্যে অনবদ্য।

কবিতা ও গানে হাস্যরসের আনন্দোৎসবে দ্বিজেন্দ্রলাল শব্দের জাতবিচার না করিয়া ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত, তৎসম, চলতি শব্দের একত্র ব্যবহার করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের ন্যায় শিল্পীর হাতে ইংরাজী ও বাংলা শব্দের, বাংলা ও

সংস্কৃত শব্দের একত্র প্রয়োগে কৌতুকের সৃষ্টি হইয়াছে। কবির মিলনক্রমের চমৎকারিত্ব ও মৌলিকত্ব অদ্ভুত শব্দ-সৃষ্টির নৈপুণ্য, প্রচলিত শব্দের অর্থবিপর্যয় করিয়া ব্যবহারের দক্ষতা কাব্যের চমৎকারিত্ব বৃদ্ধি করিয়াছে। কবি ক্লাইম্যাক্স ও এ্যান্টিক্লাইম্যাক্সের প্রয়োগে পাঠক-চিত্তকে সচকিত করিয়া তুলিয়াছেন। অনুপ্রাশের সার্থক ব্যবহারে কবিতা উপভোগ্য হইয়াছে। কবির ইঙ্গিতে গুরুগম্ভীর উদাত্ত অনুষ্টুপ ছন্দও 'কলি'রঞ্জের' মত তুচ্ছ বিষয়ের বাহন হইয়া হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছে। বস্তুতঃ কবি ভাষা ও সুরের দ্বারা এক অনাবিল প্রাণখোলা হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছেন। এ হাস্য অধর প্রান্তে বিদ্যুৎ ঝলকের মত আসিয়া ইন্দ্রিয়ের সীমারেখা হইতে অন্তর্হিত হয় না। ইহা বুদ্ধিকে স্পর্শ করিয়া প্রাণ ও মনকে মাতাইয়া তুলে। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রাণভরা হাসি দেহ ও মনে হিল্লোল তোলে। এ হাসি বিদেহী নহে—এ হাসি সর্বজনগ্রাহ্য ও উপভোগ্য।

দ্বিজেন্দ্রলালকে বুঝিতে হইলে, দ্বিজেন্দ্র কাব্যকে বুঝিতে হইলে, তাঁহার হাস্যরসের কবিতাগুলি বুঝিতে হইবে। দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরসের কবিতাগুলি উপলব্ধি করিতে হইলে দ্বিজেন্দ্রচিত্তের উপরের বুদ্‌বুদ্‌গুলি ডিঙাইয়া অন্তরের অন্তরে প্রবেশ করিতে হইবে। দ্বিজেন্দ্রচিত্তের গভীর গহনে অবগাহন করিতে হইবে। একথা সত্য কখনও কখনও জীবনের রূঢ় আঘাতে আমাদের প্রথম জাগরণ হয়, রুদ্রের গভীর আহ্বানে আমরা জড়তা দূর করিয়া অনাস্বাদিতকে আস্বাদন করিবার, অদৃশ্যকে দর্শন করিবার, অস্পৃশ্যকে স্পর্শ করিবার সাধনায় মাতিয়া উঠি। দ্বিজেন্দ্রলাল জীবনের প্রথম ভাগেই সমাজ কর্তৃক একঘরে ও ধিকৃত হইয়া "একঘরে" নক্সাটির গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন। এ হচ্ছে প্রথম আঘাত, কিন্তু এই আঘাত তাঁহার চিত্তে যে তরঙ্গ জাগাইয়া তুলিল, যে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হইল, তাহার মধ্যে কূল-প্লাবিনী সৃজনী শক্তির প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিজেন্দ্র কাব্যে তাঁহার ব্যঙ্গ বিদ্রূপের কবিতায় আমরা মানবের সেই শাশ্বত সত্তাকেই দেখিতে পাই, যে পরাজিত হইয়াও অপরাজিত হইবার স্বপ্ন দেখে। অসৌন্দর্যের নরককে বসিয়া স্বর্গের অপরূপ শোভা এই ধরণীর বুকে দেখিতে আশা করে, মনুষ্যত্বের পদস্খলনেও মহামানবতাবাদে বিশ্বাসী। দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরসের কবিতায় আছে রুদ্রের রূঢ় হাসি ও পিছনে সহানুভূতিশীল বন্ধুর শুভেচ্ছা ও মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্বের জয়ে চির বিশ্বাস। দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরসের কবিতায় যুগপৎ দার্শনিক, আদর্শ-বাদী ও শিল্পীর প্রকাশ হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল বিদ্রূপী ছিলেন না। তিনি প্রাণহীন তত্ত্বের কচ্‌কচানীতে বিশ্বাসী ছিলেন না। দ্বিজেন্দ্রলাল স্বভাবে ছিলেন শিল্পী, কবি ও গীতিকার। এই জন্য তাঁহার হাস্যরসের কবিতা-গুলিতে দার্শনিক চিন্তা ও আদর্শবাদের সহিত হাস্যরসিক গীতি-কবির কোমল, সরস প্রাণের পরশ পাওয়া যায়। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার হাসির কবিতায় যে অসঙ্গতি আমাদের আয়ত্বের ভিতরে, যাহা আমাদের তীব্র শ্লেষ বা কৌতুকের উদ্রেক করে, তাহাই শুধু বর্ণনা করেন নাই। তাঁহার নিবিড় মানবপ্রীতি মানুষের আয়ত্বের বাহিরে যে অসঙ্গতি, যে অসঙ্গতি মানুষের অন্তর্জীবনে থাকিয়া সীমাহীন হাহাকার ও দুঃখকে মূর্ত্ত করে, চিত্তকে অশ্রুসজল করিয়া তুলে, সেই অসঙ্গতিজনিত বেদনাকেও রূপায়িত করিয়া-ছেন। তাই তাঁহার হাসির গান বাহ্যরূপ ভেদ করিয়া যেন ব্যথিত চিত্তের ক্রন্দনধ্বনি ভাসিয়া উঠিয়াছে। এজন্য সাহিত্যিক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় আমরা বলিতে পারি, "দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিতেছে, কণ্ঠ বাষ্পনিরুদ্ধ হইতেছে। প্রথম বিয়ে হওয়ার পর যে প্রণয়ী খাম্বাজের সঙ্গে বেহাগ মিশাইয়া "বাহা বাহা বাহারে" বলিয়া গাহিয়া উঠিয়াছিল, তাহার মোহভঙ্গের ইতিহাস পড়িয়া হাসিয়াছি। কিন্তু হাসিতে হাসিতে যখন শেষটায় পড়ি "বিফল চেষ্টা, বিফল যতন, স্বর্গ হইতে হল পতন, রচেছিলাম যাহারে," তখন হঠাৎ হাসি বন্ধ হইয়া যায়, চমকিয়া উঠিয়া ভাবি কি ভুলই করিয়াছি, এ যে বাইবেলের কাহিনীর মত করুণ, "প্যারাডাইস লষ্টে"র ইতিহাস, এ যে মানব হৃদয়ের নিত্য ও সনাতন ট্র্যাজেডির বৃত্তান্ত, তখন মনে হইল এগুলি হাসির গান না কান্নার গান? তখন দেখিলাম যে এই হাসির তাৎপর্য অতি গভীর করুণরস। * * * যে ধর্মতত্ত্ব সুবিধামত বদলাইতে বদলাইতে শেষটা "Theosophy"র গর্তে পড়িয়া-ছিল, তাহার প্রতি বিদ্রূপটা খুবই উপভোগ করিতাম, কিন্তু

শেষে যখন দেখি বেচারা "Anne" ও বেদাঙ্গ প্রায় মিশাইয়া আনিয়াছিল, এমন সময় "ভবলীলা সাঙ্গ" হওয়াতে তাহার সমস্ত পরিকল্পনা ভস্মসাৎ হইয়া গেল, তখন মনে হয় যে, বিদ্রূপের বাণ আমার এবং প্রতি মানবের বক্ষে আসিয়া বিদ্ধ হইতেছে। আমরা সকলেই কি ঠিক ঐ কাজই জীবন ভরিয়া করিনা? ঐ ভাবেই ইতস্ততঃ ছুটা-ছুটি করিয়া জীবনের পরিবর্ত্তনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া একটা সুখের স্বর্গ গড়ার চেষ্টা করিনা? এবং ঠিক ঐ ভাবেই শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হইয়া জীবনের সমস্ত আশা অপূর্ণ রাখিয়া জগৎ রহস্যের কোন কূলকিনারা না পাইয়া হঠাৎ একদিন বুদ্বুদের মত শূন্যে মিশিয়া যাই না?"

দিব্য দৃষ্টি

শ্রীসুধীর গুপ্ত

(১)

তীর্থেই যাবো, এই ছিলো প্রাণে পণ,
সহসা কখন্ ধূলার গৃহাঙ্গন
ভরিয়া দেবতা দিলো এসে দরশন।

(২)

সে কী হাসি-মুখ! সে কী দ্যুতি-মাখা দেহ!
সে কী প্রীতি-ভরা ঢল-ঢল্-করা স্নেহ!—
বুক জুড়ালো রে—ফুরালো রে সন্দেহ।

(৩)

কেহ যা' করেনি—করিতে পারে নি কভু
এক লহমায় তা-ই যে করিলো প্রভু;—
আনন্দ তা'র ছাড়ালে না ছাড়ে তবু।

(৪)

হাত বাড়ালো রে—জড়ালো রে দেহ-লতা;
ধূলা-প্রাঙ্গণে তীর্থের মদিরতা
আনিলো রে প্রিয়—শুনালো মর্ম্ম-কথা।

(৫)

নয়নে অন্য নয়ন করিলো দান;
কানের ভিতরে আনিলো অন্য কান;
আনিলো প্রেমিক পরাণে অন্য প্রাণ।

(৬)

সঙ্গীতে কহে, 'তীর্থ-প্রেমিকা, শোনো,—
তীর্থ ছাড়া যে হেথা ঠাঁই নাই কোনো;—
ভুবন-তীর্থে তীর্থ স্বপন বোনো।

(৭)

'তোমারই লাগিয়া—তোমারই তো অনুরাগে
তোমারই তীর্থ-প্রেমিক দেবতা জাগে;
সবই যে তীর্থ—পশ্চাতে—পুরোভাগে।'

(৮)

মৃদঙ্গ-রোলে ভরিলো গৃহাঙ্গন;
ময়ূর-নৃত্যে নাচে রে প্রেমিক মন;—
প্রেম আনিলো রে চরম শুভক্ষণ।

(৯)

লুট চলেছে রে অনাদ্যন্ত কালে;—
দেব-দরশনও রয়েছে সবারই ভালে;
প্রেমেরই লাগিয়া প্রেমই নিজে দীপ জ্বালে।

(১০)

ভাগ্যে যে যবে দিব্য দৃষ্টি পায়,
ধূলাও তাহারে দেখায় তীর্থ-কায়
এক নিমিষেই ধন্য সে হ'য়ে যায়।

ভাগ

জয়শ্রী চক্রবর্তী

সে এক বিশ্রী কাণ্ড!

এক বিপর্যস্ত দিন গেছে। নিখিলেশও ভাবতে পারেনি, শেষ পর্যন্ত পুলিশ আসবে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে। তবে, সুবিধে ছিল ওইটুকু—পুলিশের চাকরী সেও করে। পুলিশ মহলে একটা খাতির নামডাকও আছে। দেখা গেল সব চেনা জানা মুখ। অগত্যা, নিখিলেশের মুক্তির পথটা একরকম পরিষ্কার হ'য়ে গেল। কিন্তু আসল ব্যাপারটার সমাধান হ'তে—বেশ দেরী হোল।

প্রথম বৌ সুষমা এর একটা হেস্তনেস্ত করবে বলে রণমূর্তি ধারণ করেছিল। ধনীর দুলালী সে নাকি। পয়সাকে থোরাই কেয়ার করে। আর তার তেজেরও বড়াই খুব। এ হেন এক অপরাধীকে সাজা দেবার চরমতম সুযোগ পেয়ে—স্বামীর দরবারে সোজা পুলিশ রেজিমেণ্টটাকে পাঠায়। তারা এসে দেখলো ব্যাপারটা নির্জলা সত্য। একবর্ণও মিথ্যে নয়। সূর্য-ওঠা সকালে, কনে বৌটির মত খোলা দাওয়ায় বঁটি পেতে আনাজ কুটছিল সবিতা। ঠিক নববধূর মত লাজুক লাজুক মুখখানা। ঘোমটাটা সবে খ'সে পড়েছে আলগা খোঁপার পাশে। সিঁথিতে যেন নতুন সিঁন্দুরের রেখা টানা পুরু করে। দেখলে বেশ মালুম হয়, সদ্য বিয়ে হ'য়েছে। যাই হোক সদর দোরটা শুধু ভেজানো ছিল বলেই, ওরা সদলবলে বাড়ী ঢুকতে পারলো।

নতুন বৌ সবিতার টানা চোখ দুটি তখন বিস্ময়ের ধাক্কায় গোল হ'য়ে কপালে উঠেছে। তাড়াতাড়ি সে মাথার কাপড় টেনে দিয়ে—সোজা রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলো। ওরা তখন উঠোন থেকেই—নিখিলেশের নাম ধরে ডাকছে। সবিতা তখন রান্নাঘরের জানলার কপাট ঈষৎ ফাঁক করে এক চোখকে স্থির করে—কর্ণদেশকে সজাগ করে রেখেছে। ক্রমশঃই সে রুদ্ধশ্বাস হ'য়ে উঠলো—উঠোনের ওপর দাঁড়ানো সাদা পোষাক পরা মানুষগুলোর দিকে চেয়ে। তৎক্ষণে সে ভেবে পেলনা—এদের আগমন কিসের। কই, বিয়ের একমাসের মধ্যে তো এদের এমন ত্রস্ত আগমন এবং গুরু ডাক তো—দেখেনি বা শোনেনি! তবে এটাই সে অনুমান করে নিল, স্বামীর বন্ধু বান্ধব হ'বে নিশ্চয়। স্বামী তো পুলিশ ডিপার্টমেণ্টের লোক। নতুন বিয়ের খবর পেয়ে এই ছোট রেজিমেণ্টটা একটা নিমন্ত্রণ আদায় করতে এসেছে বাড়ী ব'য়ে। আর নিখিলেশ তো কাউকে জানায়নি তার বিয়ের খবর। ভারি লাজুক! তারপর—ইণ্টার কাষ্ট ম্যারেজ—মানে সামাজিক নীতিতে অবৈধ বিবাহ। হয়তো সেই কারণে জানায়নি কাউকে। কিন্তু বন্ধু বান্ধবরা কি আর ছাড়ে? বিশেষতঃ সহকর্মীরা। একটা চাপা আনন্দে সবিতা দুলে উঠলো। তার সুন্দর সাজানো মুখে আরক্তিম লজ্জার রঙ ছড়িয়ে গেল। হয়তো স্বামীকে ওরা এখুনি চেপে ধরে, হৈ-হৈ করে উঠবে—'কই ভায়া! বিয়ে করলে আমাদের স্রেফ্ ফাকি দিয়ে? আর ছাড়ছিনে কিন্তু! এবার যাবে কোথায়? আজই বৌদির হাতের রান্না খেয়ে যাব।'

কিন্তু একি? সে সব তো কিছুই নয়। সবিতার মুখে ছিটে লাগা সেই রক্তের আভাটা ক্রমশই—বিলীন হ'য়ে গেল ফিকে অন্ধকারে। ওর আকর্ণ বিস্তৃত হ'য়ে উঠলো, একটা ক্রোধ বিস্ময় দুঃখ অপমান! নিখিলেশ তখনো ওদের কি সব বোঝাচ্ছে, হাত মুখ নেড়ে—একটা অপরাধীর বিচিত্র ভঙ্গী নিয়ে। তারপর আর কিছু মনে নেই সবিতার। সম্বিৎহারা হ'য়ে সে রান্না ঘরে লুটিয়ে পড়ে।

যখন তার জ্ঞান ফিরলো সে দেখলো তার মাথাখানি সযত্নে রাখা স্বামীর কোলের মধ্যে। আর বড় স্নেহে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে—নিখিলেশ। তারও কদিন পর সে সুস্থ হ'লে নিখিলেশ সব কথাই খুলে বলবার চেষ্টা করে। এবং করজোরে 'ক্ষমা' প্রার্থনা করে। কিন্তু বিক্ষুব্ধ অভিমানে অনুযোগে ফেটে পড়লো সবিতা—কেন তুমি আগে জানাও নি—তুমি বিবাহিত, তোমার ছেলেও আছে? আমার সংগে এই নিষ্ঠুর খেলা করবার অধিকার তোমায় কে দিয়েছিল। নিশ্চয়ই তুমি ভেবেছিলে আমি গরীবের মেয়ে বলে কিছু করতে পারবনা। কিন্তু জেনে রাখো, যদি না খেয়েও মরতে হয় সিঁথির সিঁদুর মুছতে হয়, তাও ভালো। কিন্তু তোমার এখানে আর এক মুহূর্ত'ও নয়। অভিমানে আর অবিরত চোখের জলের ধারায় সবিতা নিজেকে হারিয়ে ফেললো।

নিখিলেশ তার সর্বশক্তি দিয়ে তাকে বাঁধ দেবার চেষ্টা করে বোঝাতে লাগলো—'আগে তুমি সব কথা শোন, লক্ষ্মীটি! তারপর—'

—'না, আমি শুনবনা। সবিতা ঝাঁঝিয়ে উঠলো, 'চালাকী করবার আর জায়গা পাওনি? শয়তান তুমি, ভণ্ড—মিথ্যেবাদী। বলতে বলতে সবিতা শিশুর মত ফুলে উঠলো—উদ্গত অশ্রুতে। শেষ পর্যন্ত সেই অবস্থাকেও নিখিলেশ এক রকম শান্ত ও সহজ করলো একটা মহান ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে। তাই দেখা গেল সবিতার তরফ থেকে বর্ষিত অশ্রুতপূর্ব বিশেষণগুলি, তাকে বিদ্ধ করে এমন কি ভেদ করেই গেল। শুধু ধৈর্যবান, অম্লান নিখিলেশ, নতুন বৌকে নিজের আয়ত্বে এনে আসামীর কাঠ গড়ায় দাঁড়িয়ে তার জবানী সুরু করেছে—আমি জানতাম না, সে এই কাণ্ডটি করবে। ওদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে দিয়ে গ্রেপ্তার থেকে রেহাই পেয়েছি। কিন্তু সত্যি কথা বিশ্বাস কর আমার তিন বছর বিয়ে হ'য়েছে—কিন্তু একদিনও সুখী ছিলামনা, তার উদ্ধত স্বভাবের জন্য। সে বড়লোকের মেয়ে বলে, আমার কথায় কথায় মেজাজ দেখাতো। রূপহীনা মেয়েটা যেন—অরূপের গর্বেই মরে যেতো! একদিন মেজাজ দেখিয়ে সে বাপের বাড়ী চলে গেল। সঙ্গে এক বছরের ছেলে বোটনকে নিয়ে। কিন্তু কিছু দিন পরে—মনটা বড় খারাপ হ'য়ে গেল ছেলেটার জন্যে। শেষে মাথা নীচু করেই গেলাম ওদের আনতে। কিন্তু বাড়ী ঢোকবার আগেই চাকর এসে জানালো, ওদের সংগে আমার দেখা হবেনা। গিন্নীমা মা (আমার শাশুড়ী) ভীষণ চটে আছেন। চাকরকে আগের থেকেই বলে রেখেছেন, জামাই বাড়ীতে এলে যেন ঢুকতে না দেওয়া হয়। এত বড় অপমান স'য়েও বললাম—ছেলেটাকে শুধু এনে দিতে। চাকর ঘুরে এসে জানালো, ছেলে বৌএর আশা যেন আমি ছেড়ে দিয়েই চলে আসি। তাই এলাম, দুঃসহ অপমানে আর দুঃখে। আর ঠিক সে সময় কি অদ্ভুত যোগাযোগ। বন্ধুর বাড়ী বেড়াতে গিয়ে তোমাকে দেখতে পেলাম। ভারি ভালো লাগলো তোমার শান্ত রূপটি দেখে। সত্যি তুমি গরীবের মেয়ে—আমিও তাই। আর এখানেই আমাদের একটা মস্ত মিল খুঁজে পেলাম। দেখলাম তুমিও আমার প্রতি দারুণ আকৃষ্ট। আর যদি সে সময় তোমাকে জানাতাম আমার স্ত্রী সন্তানের কথা, তাহলে কখনোই তোমাকে পেতাম না।

তারপর কি হোল বলতো?—নিখিলেশ জোর করে নতুন বৌকে সোহাগে বুকে টেনে নিয়ে বললো—তারপর আর কি? মাত্র এক মাসের প্রেমের পরিণতি—একেবারে শুভ পরিণয়ে সমাপ্তি। এখন আমরা দুজনেই দুজনের। আমাদের আর কেউ নেই। শুধু তুমি আর আমি। আর আমাদের ভালবাসা, তাই না? নিখিলেশ—দু'হাতে সবিতার মুখখানি সযত্নে টেনে নিল—নিজের মুখের কাছে। এতক্ষণে সবিতা শান্ত হয়ে লুটিয়ে পড়লো—স্বামীর বুকের মধ্যে।

সংসারের নিয়ম বিচিত্র। যে অতীতকে নিখিলেশ নির্মূল ভাবে মুছে দিতে চাইলো—সমস্ত জীবন থেকে সরিয়ে রাখতে চাইলো—কিন্তু তাকে মোছাও গেল না, সরানোও গেল না।

বর্তমানের কাছে অতীত এলো তার পুরাণো সাক্ষী-সাবুদ সমস্ত নথি-পত্র নিয়ে শেষকালে দেখা গেল প্রথম বৌ তার রণমূর্তি ত্যাগ করে, নিতান্ত শান্ত নিরীহ বধূটির মত স্বামী গৃহে এসে কেঁদে পড়লো ছেলেমানুষের মত। তার হার হ'য়েছে। করুণ সেই আত্মসমর্পণ। অনুতপ্তার একটি বিনীত 'ক্ষমা' প্রার্থনা, আর সেই দুষ্ট পিতৃভক্ত

বোটন, এতদিন মামার বাড়ীর সোহাগে থেকেও, আধো কচি কণ্ঠে ডেকে উঠলো—'বাবা' বলে! নিখিলেশ তখন যেন বিমূঢ় স্তব্ধতায় দেখলো অতীতকে, বর্তমানের সংগে মিশে যেতে। তাকে আর আলাদা করবার নয়। উপায়ও বুঝি ছিলনা।

বিবেক, আত্মদংশন, কর্তব্যবোধ সব কিছু এসে বর্তমানকে ঘিরে ধরে, একটি সুবিচারের প্রার্থনায় কেঁদে উঠলো। তারপরই আর একটি দুর্যোগের সূচনা। শেষ পর্যন্ত, সেই দুর্যোগের মুহূর্তকেও প্রতিরোধ করলো, পূর্বের স্থৈর্যের পরিচয় রেখে। এই সংগে চমৎকার একটি মীমাংসা!

আর তখন যেন সবিতা স্বামীকে বড় বেশী ভালোবেসে ফেলেছে। শত অভিমানেও আর সে স্বামী ত্যাগ করে চলে যেতে রাজী নয়। এদিকে প্রথম বৌ সুষমাও তার পুরাণো দাবী নিয়ে স্বামীকে ফিরে পেতে চায়। আর দেড় বছরের ছেলে বোটন, অবুঝ হ'লেও সেও তার ন্যায়-সম্মত অধিকার সম্বন্ধে পুরো সচেতন হয়ে, বিঘোষিত করলো—তার ন্যায্য দাবীকে। শতবার 'বাবা' ডাকে নিখিলেশের বুকের ঘুমন্ত পিতৃত্বকে বড় স্নেহে বিচলিত করে তুললো। তখন দুর্যোগের শান্ত মুহূর্ত! নিখিলেশ সব কিছু সামলে নিয়ে সকলকে প্রায় শান্ত করলো। সমস্যার সুমীমাংসা হোল অদ্ভুত উপায়ে। দুই বউএর কথাই থাকবে। দুজনেই তারা স্বামীকে পাবে। বোটনও পাবে তার বাবাকে। কারো দাবী অপূর্ণ থাকবে না। চমৎকার সিদ্ধান্ত! অভিনব ভাগ।

তাই নিখিলেশ একখানা ঘরের বাড়ী ছেড়ে দিয়ে অন্য বাড়ীতে চলে এলো। সেখানে পাশা পাশি দু'খানা ঘর। দুই বউ এর দু'খানা ঘর। দু' ঘরেই দুটো খাট। —এক রকম সব আসবাব। দু'জনকে সমান অধিকার দিয়ে নিখিলেশ এক নতুন সংসার পাতলো। অতীত আর বর্তমান যেন দুই সতীনের মত পাশাপাশি বাস করতে লাগলো। দু'য়ে মিলে অখণ্ড রূপ! অদ্বৈত ভাব। অভিন্ন সত্ত্বা!

ঠিক আজও, যেমন পাশাপাশি বাস করছে—দুই বউ। বড় বৌ সুষমা আর ছোট বৌ সবিতা। দুই সতীন। দুজনের কিন্তু সমান অধিকার, মাপ জোখ করা—আধা আধি ভাগ!

দুই বৌ নিখিলেশের। দুই রূপের সমন্বয়ে নিখিলেশের চোখে নতুন জগৎ! নতুন অনুভূতি! বিচিত্র সুখ ভোগ! অপরূপ দুঃখ ভোগ!

প্রথমার রূপ নেই। রস নেই। কিন্তু গৃহিণীপনার তুলনা নেই। খাম খেয়ালী-বে-হিসেবী নিখিলেশের অভাব অভিযোগগুলোকে সযত্নে সামলায় বড় বৌ। দ্বিতীয়ার মন রঙিন। রসময়ী—রূপময়ী, সহচরীর দুরন্ত চাপল্য নিয়ে, নিখিলেশের শ্রান্ত অবসরগুলোকে-মনোরম মধুর করে তোলে নিপুণ সখ্যতায়।

নিখিলেশের আনন্দ তখন বিচিত্র! বিচিত্র অনুভূতি! সে যেন নতুন এক আশ্চর্য খেলায় মেতে উঠেছে, কোন অভাবেই তার মন যেন অপূর্ণ থাকে না। একজনের কাছে যেটুকু অভাব থাকে, সেটা যেন অন্য জনে পূর্ণ করছে। ওরা দুজনে ভাগাভাগি, পালা করে করে—দুই রূপে আসে স্বামীর কাছে। এক জনকে ঘিরে, ওরা যেন এক হয়েছে। অভিন্ন সত্ত্বায় মিশে গেছে। ওরা আর আলাদা নয়—ভিন্ন নয়। দ্বৈত বাসনায় জনম নিয়েছে—অদ্বৈত এক রূপ। নিখিলেশ যেন সেই রূপে—অবাক দর্শক বিস্ময়ের শ্রোতা, বৈচিত্র্যের অনুভাবক!

এক রাত সে ছোট বৌ এর ঘরে থাকে। পরের রজনী বড় বৌ এর ঘরে। এমনি করে পালা করা রাত! সমান করা ভাগ। সমান অধিকার পেয়ে ওরা দুজনে খুশী! তবে মাঝে মাঝে দুই বউ এর—মান অভিমানেরও পালা চলে। সেটাও যেন ওরা সমান ভাবে করে। সংসারের কাজেও ওদের সমান ভাগাভাগি!

ইতিমধ্যে, সবিতার একটি মেয়ে হ'য়েছে। নিখিলেশ দুই বউকে আড়ালে ডেকে বলে—আমার এই বেশ! এক ছেলে এক মেয়ে।" ওরা দু'জনে বলে—'তোমার তাই, আমাদের তা নয়।" নিখিলেশ হাসে ওদের কথায় বলে—না হ'লেও, তোমাদের সব। তোমরা তো আমার টুকুই পূর্ণ করতে ব্যস্ত! আমার হ'লেই যে তোমরা খুশী!

দু'ঘরের সংসার এক। দুই বউএর ভালবাসাও এক। দু'জনার আশা আকাংখাও এক। উদ্দেশ্যও তাই! আর ওদের মিলিত দ্বৈত কামনায়—আনন্দ যেন এক অভিন্ন হ'য়ে ওঠে। ওরা তাই স্বামী নিয়ে এক। দুয়ে মিলে একাকার!

সুষমা সংসারের চাবীটা, আঁচলে বেঁধেছে। সারা সংসারের দায়ভার রান্নাখাওয়া দেখাশোনা সবই তার ওপর। সবিতা কিন্তু এ'সব পারে না। হিসেব বোঝে না সংসারের। সে যেন নতুন সংসারের খেলে বেড়ানো এক কুমারী কিশোরী। তার ক্ষণে ক্ষণে হাসি কান্নার মনটা—প্রতি মুহূর্তের দুঃখ আনন্দের সংসারে হাবুডুবু খায়। তার মধ্যেই সে সচেতন হয়ে ওঠে বাস্তবের অনুশাসনে। সে ছেলেমেয়ে দুটোকে যত্ন করে—সাজায়—কখনো ওদের খেলার সাথী হয়। নয় ওদের পড়ার দিদিমণি। এ'ছাড়া ঘর সাজানো, নিখিলেশের জামা কাপড় ঠিক করে রাখা,—অসুখ-বিসুখ হ'লে, সেবা যত্ন -তা ছাড়া খুঁটিনাটি বিষয়ে মন দেওয়া। তাতেই বড় বৌ খুশী। ছোটর ওপর রাগ করলে যেন—স্বামী তার দূরে সরে যাবার ভয় হয়।

নিখিলেশ মাসের মাইনেটা পেয়ে, প্রথম তুলে দেয় বড় বৌএর হাতে। বলে—'এই নাও তোমার সারা মাসের সংসার খরচ! হ্যাঁ, এ মাসের টাকা কিছু কম আছে। গত মাসে বোটন আর চৈতীর অসুখে যে টাকা ধার নিয়েছিলাম, শোধ দিয়েছি এ'মাসে। একটু কষ্ট করে—মাসটা চালিয়ে নাও।'

সুষমাও স্বামীকে শান্ত স্নেহে অভয় দেয়—'ভাববার কি আছে। আমি ঠিক ম্যানেজ করে নেব।' নিখিলেশের বুক যেন আশ্বাসে আনন্দে ভরে ওঠে। স্বল্প আয়ের সংসারটাকে যে কত সুন্দরভাবে চালাচ্ছে সুষমা। সে কিছুই বুঝতে দেয়না স্বামীকে। বুঝতেও চায় না নিখিলেশ। বোঝে না এ'সব সবিতা, এ বিষয়ে ওরা দু'জনেই ছেলে মানুষ।

আর নিখিলেশ যেন বড় বৌএর ওপর নির্ভর করতেই বেশী ভালবাসে, নিজের সব দায়ভার নিশ্চিন্তভাবে তুলে দিতে। সেখানে যেন তার অখণ্ড দাবী। অমোঘ প্রতাপ। এটা ওটা আবদার করে, জোরজুলুম করে বলতে ইচ্ছে করে। নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করবার একটা নিরুদ্বেগ আশ্রয় বুঝি বড় বৌ। আর এমন করে স্নেহের অনুশাসনে, অধিকারের সীমানায় বেঁধে রাখতে স্বামীকে সুষমাও ভালবাসে। এই এক জায়গায় তার পুরো কর্তৃত্ব করার আনন্দ খুব বেশী।

অফিস থেকে এসেই নিখিলেশ প্রথম ঢোকে বড় বৌ-এর ঘরে। সেখানেই প্রাথমিক বিশ্রাম নেয়। জামা কাপড় পাল্টে, মুখ হাত ধুয়ে, জলখাবার খেয়ে নেয়। সুষমা নিত্য নতুন খাবার তৈরী করে রাখে। কুচো নিম্‌কি, মালপো, বলবড়া, সিঙ্গাড়া, কচুরী, পুরি। তা ছাড়া হাতে পয়সা না থাকলে, রুটি আলুচচ্চরী, নয়তো কড়াইএর ঘণ্ট। সুষমা জানে স্বামীর খাওয়ার রুচি সমান নয়। তাই নিত্য নতুন রুচিতে স্বামীর রসিক জিভটিকে সন্তুষ্ট করে প্রায় প্রতিদিন।

এর পর নিখিলেশ যায় ছোট বৌ এর ঘরে। সবিতা তখন নিজের মেয়েটিকে চমৎকার সাজিয়ে—নিজেও সেজে থাকে চমৎকার, ঠিক ওকে ক'নে বৌটি দেখায়। নিখিলেশ সেদিকে কিছুক্ষণ বিমুগ্ধ আবেশে চেয়ে থাকে। তার পর অভ্যাস মত ওরা ঘরের দরজা ঈষৎ ভেজিয়ে দিয়ে—পাশাপাশি বসে গল্পে হাসিতে মেতে ওঠে।

রান্নাঘর থেকে তখন ভেসে আসে বড় বৌএর খুন্তি নাড়ার শব্দ। বারান্দায় চৈতী আর বোটনের হুড়োহুড়ি করে খেলার উল্লাসধ্বনি। আসলে তখন ওদের ওদিকে মন থাকে না। ওরা যেন আর এক খেলায় মেতে ওঠে। আবার কখনো কোনদিন ওরা দু'জনে বেড়াতে যায়। শুধু পথ হাঁটা! নিস্তব্ধ অনেকটা ফাঁকা পথ দিয়ে ওরা দু'জনে হেঁটে চলে। তখন যেন ওরা দু'জনেই খেলার সংসারে এই খেলামত্ত শিশু। অযথা কথা, হাসি, নীরবতা, মান অভিমান নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। এইভাবে সন্ধ্যেটা উত্‌রে যায়। উত্তুরে হাওয়ার ঝাঁক তেড়ে আসে মাথার ওপর দিয়ে।

রাত গড়িয়ে আসে। তখন চারপাশ বেশ অন্ধকার! একটা পথের বাঁকে নিখিলেশ দাঁড়িয়ে পড়ে। সবিতাকে অন্ধকারে টেনে নেয় খুব কাছে। উঁচু আকাশের দিকে আঙুল তুলে বলে ওঠে—'ওই দেখো, ওই চাঁদকে ঠিক তোমার মত সুন্দর! মেঘের শাড়ী পরে—ওকে যেন ঠিক তোমার মত দেখাচ্ছে!'

সবিতা হেসে ওঠে—'হুঁ! কিন্তু আমার মত ওর মনের সঙ্গীটি পাশে নেই। তাই কেমন বিমনা উদাস লাগছে—দয়িতের অভাবে।'

নিখিলেশ তাকায় ছোট বৌএর মুখের দিকে। চাঁদের

আলোটা ঠিক্‌রে পড়েছে ওর আধখানা মুখে। তাতে যেন এক রূপ খুলেছে চমৎকার! সবিতা মুখ তুলে জিজ্ঞেস করে—কি দেখছো অত?

নিখিলেশ বলে—তোমাকে। তুমি কিন্তু ওই চাঁদের চেয়েও সুন্দর!

—'ইস্! তাই নাকি!' সবিতা অনুরাগে ঠোঁট ওল্টায়! নিভৃত গরবে বুকের কোথায় যেন রঙ ধরে। মুখে শুধু বলে—আবেগে মিষ্টি করে—'কি হোল তোমার বলতো? কে বলবে তুমি পুলিশের চাকরী কর—যেন কবি কালিদাস! কি করে তোমার এত কাব্য জাগে বলতো?'

কি করে জাগে নিখিলেশও জানে না। তবু, এই ছায়াঘন নিস্তব্ধ রাত্রিতে পথের বাঁকের পাশে ঝরে পড়া মালতী ফুলের গন্ধ, চাঁদের আলো ঘেরা আকাশখানা, আর রাঙা মাটীর ভিজে নিঃশ্বাসটা, সারা বুকের পাশে লুকোন কাব্যের কথাগুলো, নিয়ে জেগে উঠতে চায়। আর পাশে থাকা সবিতার মত সোনা বউ—নিখিলেশের সমস্ত জীবনের অপরূপ কামনা নিয়ে—সুন্দর হয়ে উঠতে চায়।

হঠাৎ সবিতা সচেতন করে—'ইস্! রাত হয়ে যাচ্ছে! চলো বাড়ীতে। দিদি হয়তো এতক্ষণে রাগ করছে—ছেলে মেয়ে দুটো নিশ্চয় জালাচ্ছে!

নিখিলেশ একবার জবাব না দিয়ে বলে—'আর তোমায় ছাড়তে ইচ্ছে করছে না। মনে হচ্ছে—এখানেই সমস্ত রাত্রিটাকে পার করে দিই তোমাকে পাশে নিয়ে, জানতো আজকের রাত আবার ও ঘরে। যদি কাল বেড়াতে আসতাম বেশ হোত।—'

সবিতা বললো—বারে! ভুলে যাচ্ছো—কাল দিদিকে নিয়ে বের হবার কথা?

নিখিলেশ যেন চম্‌কে ওঠে। সমস্ত মনের কবিতা যেন নিমেষে শুকিয়ে যায়। পথের বাঁকটা ঘুরে গিয়ে—সামনের দিকে সে পা বাড়ায়।

তারপর বাড়ী ফিরে—সে রাত বড় বৌএর ঘরে। খেয়ে উঠে নিখিল অন্ধকার ঘরে এসে ঢুকলো। বোটন খাটের একপাশে ঘুমুচ্ছে। তা ছাড়া সারা ঘরখানাই কেমন শূন্য মনে হ'চ্ছে। এত রাতেও—বড় বৌএর কাজ সারা হোল না। তবু যখন সব সেরে সুষমা ঘরে ঢুকলো, তখনো নিখিলেশ জেগে দাঁড়িয়ে আছে খোলা জানলার সামনে। বোধহয় সে সেই চাঁদকে দেখছিল অনিমেষে, যার মধ্যে দিয়ে এই সময় একজনকে সে খুঁজে বেড়াচ্ছিল! ও' ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চাপা ক্রোধে যেন বলে উঠলো সুষমা—'বলি, এতক্ষণেও ঘুমলে না? কি দেখছো ওদিক চেয়ে? এই তো এতক্ষণ বেরিয়ে এলে 'ভাব করা' বউকে নিয়ে। এখনো কি তোমার সেই ভাব কাটেনি?'

নিখিলেশ কিছু না বলে, কতকটা আদেশ পালনের মত করে, নিঃশব্দে এসে শুয়ে পড়লো বিছানায়। ব্যস! আর কথা নেই কারো মুখে।' বোবা নিথর রাতটা—ওদের ঘন নিঃশ্বাসে কখোন যেন পেরিয়ে যায়।

তারপরের দিনই—নিখিলেশ বড় বউকে নিয়ে বের হোল। সেটা দৈবাৎই হয়। আর বেড়াতে নয়—মার্কেটিং করতে। তা ছাড়া কবির মত মন হারিয়ে সুষমার বেড়াতেও ভালো লাগেনা। আকাশ, চাঁদ, ফুল, তার নীরস জীবনের নিতান্ত যন্ত্রণা ছাড়া কিছু নয়। স্বামীকে সংসারে আর নিজের অধিকারে রাখতে পারলেই সন্তুষ্ট! আর মাসে মাসে বডিগার্ড হিসেবে নিখিলেশকে নেয়—বাজার করতে। নিজেই টাকা পয়সা দিয়ে দর কষাকষি করে জিনিসপত্তর কেনে। পছন্দ করে কিনে নেয় বোটনের টি সার্ট, হাওয়াই সার্ট—খান কয়েক ইংলিশ প্যান্ট। চৈতীর চাইনিজ ডিজাইনের কয়েক ধরণের ফ্রক—ঢিলে ইজের। নিখিলেশের পাঞ্জাবী, সার্ট-ধুতি, প্যান্ট, পোষাকী এবং আট পৌড়ে। সব শেষে ওদের দু'জনের এক রকম এক রঙের এক জোড়া সাড়ী, এক জোড়া ব্লাউজ, ঘের কুঁচির সায়া দু'খানা। সব গুলোই—এক রকম। এক ডিজাইন, এক রং!

দোকানদার কপাল কুঁচকে বলে ওঠে—একই রকম দোটো করে নেচ্ছেন দিদি? নিউ ডিজাইন নেন, পাল্টে দিই—দু' রকম করে?

তখন নিখিল হাঁ—হাঁ করে বলে ওঠে—'না মশাই দু'রকম চলবেনা। ওই এক রকমই চাই।"

তখন দোকানদার হেঃ হেঃ করে হেসে বলে—অ!

বুঝলেম, দিদির বুনের 'লগে নেচ্ছেন, তা বেশ! বেশ! ভালো!

সে রাতে কেনা কাটা সেরে নিখিলেশ বড়ই ক্লান্ত বোধ করে। কোন রকমে দুটো খেয়ে—ছোট বৌ এর ঘরে ঢোকে। এ রাত এ ঘরে পালা। অন্ধকার ঘরে খাটের ওপর চৈতী ঘুমুচ্ছে—তার কচি হাত পা মেলে। সবিতাও এতক্ষণে খাওয়ার পাট সেরে, বিছানায় শুয়ে র'য়েছে এক পাশ ঘেঁষে।

দরজা বন্ধ করে দিয়ে—ক্লান্ত নিখিলেশ বিছানায় গিয়ে আশ্রয় নিল। তার ঘুমের সাগরে যেন চোখ দুটো ডুবে যাচ্ছে। পাশ ফিরে ঘুমুতে চেষ্টা করে।

হঠাৎ কান্নার শব্দে সে চমকে ওঠে। পাশ ফিরে দেখে, সবিতা ফুলে ফুলে কাঁদছে! নিখিলেশ সবই বুঝতে পারে। আজ সে ক্লান্তিতে ছোট বউকে আদর করেনি বলে—তার অভিমান! কিন্তু তাকে দূরে সরিয়ে রাখবার নয়। বুকের কাছে টেনে এনে, নিখিলেশ বলে—'লক্ষ্মী আমার, কেঁদনা, আজ এত ঘুরেছি যে বলার নয়। পা হাত যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। জানতো, তোমার দিদির আবার জিনিস পছন্দ করা চাই—সারা মফঃস্বল শহরটা চষে নিয়ে।—

কথার মাঝেই—সবিতা অভিমানে উদ্বেল হ'য়ে বলে ওঠে—'জানি! জানি আমি সব। 'সাত পাকের বৌকে' নিয়ে ঘুরে বেড়িয়ে আর কি পায়ের ব্যথা কমে? তোমার মনেও এখন সাত-পাক চলেছে।"

এত ক্লান্তিতেও নিখিলেশ হেসে ফেলে। ছোট বউকে সোহাগে আবেগে ভোলাতে চেষ্টা করে। তারপর অভিমানের রাঙা রাতটা কখোন যেন ফুরিয়ে যায়।

ফুরিয়ে যায়—এমনি আরো অনেক মান অভিমানের রাত। সেই বিচিত্র খেলার নেশায় মেতে ওঠা—খেলায় মানুষটা যেন হঠাৎ হাঁফিয়ে যায়। দু' বউএর পাল্লা করা, খেলার সংসারে আর যেন তার লুকিয়ে থাকবার স্থান রইলো না। সমস্ত জগৎকে বুড়ি করে—এবার সে লুকিয়ে পড়লো—কোন এক অদৃশ্য চোর কুঠুরীতে। ওদের দুজনকে, দুই বউকে সমান ভাবে ফাঁকি দিয়ে নিখিলেশ পালিয়ে গেল—বড় অসময়ে।

সেদিন দুই বউ একই সংগে কেঁদে উঠলো—দু'জনে দুজনকে জড়িয়ে। ফাঁকির ভাগ তারা দুজনেই সমান করে পেয়েছে। তাই সেদিনের বড় দুঃখটা তাদের—সমান। দুজনের শোক এক।

এমনি করে এক সংগে ওরা কদিন কাঁদলো। তারপর একই দিনে দুজনে চুপ করলো।

ওরা সেজেছিল, একই রকম। ওদের দুজনের এক রকম সাদা থান—সাদা সিঁথি, ওদের শাঁখা একই সময়ে ভাঙা হয়েছিল।

তারপর, ওদের সেই কান্না থামার দিন পর্যন্ত—ওরা এক ছিল, পাশাপাশি, ঘনিষ্ঠ! শুধু সেই দিন পর্যন্ত।

তারপর ওরা দু'জনে ছাড়াছাড়ি হোল। এই প্রথম ওরা—আলাদা হ'য়ে গেল পরস্পরের কাছে। নিখিলেশ চলে গিয়ে—যেন ওদের অভিন্ন সত্তাকে ভেঙে দিয়ে গেল। যেন বললো—এবার যে যারটা বুঝে পড়ে নাও। আমি তো আর নেই কি করে আর এক হ'য়ে থাকবে?

সুষমা, ঘরের জিনিস পত্তর গুছিয়ে নিয়ে—বোটনের হাত ধরে—বাপের বাড়ী গেল এক পথ দিয়ে। অন্য পথে গেল সবিতা, তার কোলের মেয়েকে সংগে নিয়ে।

শুধু যাবার আগে এই প্রথম ওদের ঝগড়া হয়েছিল একটা জিনিস নিয়ে। নিখিলেশের ফটো একটাই ছিল। সেটা ওদের কাড়াকাড়িতে ছিঁড়ে দু' টুকরো হ'য়ে ঘরের দু'দিকে পড়ে গেল। দু পাশ থেকে কুড়িয়ে—নিল সেটা, চৈতী আর বোটন।

আর নিখিলেশ যেন নিজেকে এই ভাবে ওদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিল। নিজেকে ছিঁড়ে দু' টুকরো করে। কিম্বা নিখিলেশকেই ওরা দু'জনে ভাগ করে নিয়েছিল কিনা কে জানে!

সেটা আর সে সইতে পারেনি। তাই দু'জনকেই সমান ফাঁকির ভাগ দিয়ে—নিজেকে সে মুক্তি দিয়েছে—এই বৈচিত্র্যময় সংসার থেকে।

অল্ডাস হাক্সলীর প্রতিভার রূপরেখা

-শ্রীসত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত, এম,-এ, পি,-এইচ,-ডি. (লণ্ডন)

অল্ডাস হাক্সলী উনসত্তর বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। উনসত্তর বছর খুব কম নয়। বিশেষ করে ভারতবাসীর কাছে। কিন্তু তবু প্রত্যেকটি শিক্ষিত ভারতবাসীর কাছে হাক্সলীর মৃত্যু শোকাবহ। কারণ হাক্সলী ভারতদরদী। "জেষ্টিং পাইলেট" এ তাঁর ভারতের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতির একটি সুন্দর ছবি দেখতে পাই। তাঁর পরিণত বয়সের প্রায় প্রত্যেকটি বইয়ে ভারতীয় ধর্ম ও জীবনদর্শনের স্বচ্ছন্দ প্রকাশ। বস্তুতঃ ম্যাক্সমূলর, উডরফ ও ক্রীষ্টোফার ঈশারউড ছাড়া আর কোন ইউরোপীয়ই সম্ভবতঃ ভারতীয় ভাবধারা দ্বারা এতটা পুষ্ট হননি। হাক্সলী ভারতবর্ষে দুবার এসেছিলেন, কিন্তু ভারতের চিন্তাধারার প্রত্যেকটি অলিগলিতে তাঁর সহজ বিচরণ ছিল। জগৎ-সভায় ভারতের অতুলনীয় দানের কথা ঘোষণা করে তিনি হৃতগৌরব ভারতকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।

হাক্সলীর প্রতিভা বহুমুখী। উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, কবিতা, ভ্রমণকাহিনী, রম্যরচনা, জীবনচরিত, প্রবন্ধ, রাজনীতি, সমাজনীতি, সঙ্গীত, শিল্পকলা, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম—সকল শাখায়ই হাক্সলী অজস্র লিখেছেন। এত বৈচিত্র্য এক আমাদের রবীন্দ্রনাথ ছাড়া প্রাচ্য অথবা পাশ্চাত্যে আর কারুর ছিল কিনা সন্দেহ। তবুও হাক্সলী কোনদিনই জনপ্রিয় লেখক ছিলেন না। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী পাঠকের মধ্যেই তাঁর খ্যাতি সীমিত। জনগণের সরণিতে তিনি প্রবেশ করতে পারেননি।

তিনপুরুষ ধরে হাক্সলী-পরিবারের খ্যাতি। ঠাকুরদাদা ছিলেন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক—টমাস হেনরী হাক্সলী। ডারউইনের ক্রমবিবর্তনবাদ প্রচারের জন্য অক্লান্ত ও অনলসভাবে খেটেছিলেন। বাবা ছিলেন 'কর্ণহিল' পত্রিকার কর্ণধার লিওনার্ড হাক্সলী। মা ভিক্টোরীয় যুগের কবি ও সমালোচক ম্যাথু আর্নল্ডের নিকট আত্মীয়া। বৈজ্ঞানিক পিতৃকুল আর কবিভাবাপন্ন মাতৃকুল—এই দুই ধারা এসে মিলেছিল অল্ডাস হাক্সলীর মধ্যে। বিজ্ঞান ও কাব্য, যুক্তি ও কল্পনা, আকাশ আর মাটির সেতুবন্ধ হল হাক্সলীর রচনায়।

হাক্সলী ইটন স্কুলে সতের বছর পর্যন্ত পড়েছিলেন। কিন্তু দৃষ্টিশক্তি ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ। চিকিৎসক সন্দেহ করলেন বেশী পড়াশোনা করলে সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যাবেন। হাক্সলীর ভাই জগদ্‌বিখ্যাত জুলিয়ান বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। হাক্সলীরও ইচ্ছা ছিল বিজ্ঞান পড়ে বিরাট বৈজ্ঞানিক হওয়ার। পিতামহের রক্তের ধারা মুছে যাবে কি করে? কিন্তু অদৃষ্টের মার। তিন বছর পড়া বন্ধ রইল। বিশ্রামের ফাঁকে ফাঁকে লিখলেন একখানা উপন্যাস। অবশ্য তা কোনদিনই প্রকাশিত হয়নি। শিখলেন ব্রেইল পদ্ধতিতে পড়া। তাঁর মনে ধারণা হয়েছিল রূপরসবর্ণময়ী পৃথিবী তাঁর দৃষ্টিপ্রদীপে আর হয়ত ধরা দেবে না। কবি মিল্টনের অন্ধ হওয়ার পর যে বেদনার সুর ধ্বনিত হয়েছে তাঁর কবিতায়, সেই সুরের অনুরণন শুনতে পাই হাক্সলীর কিছু অপ্রকাশিত রচনার মধ্যে।

দৃষ্টিশক্তি একটু বাড়তেই হাক্সলী অক্‌স্‌ফোর্ডের ব্যালিয়ল কলেজে ভর্তি হলেন, ইংরেজী সাহিত্যের পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে সুরু করলেন সাংবাদিকতা। প্রথমে 'এথেনিয়াম' পত্রিকা, তারপর ওয়েষ্টমিনষ্টার গেজেট। এর মাঝে কয়েকমাস ইটন স্কুলে শিক্ষকতাও করেছিলেন।

অক্সফোর্ডে ছাত্রাবস্থায় দুখানা ক্ষীণ কলেবর কবিতার বই প্রকাশ করেছিলেন। "বার্ণিং হুইল" এবং "ডিফিট অব ইউথ",। দুখানা বইতেই রয়েছে না পাওয়ার বেদনা, ব্যর্থকাম তরুণের দীর্ঘশ্বাস। কয়েক বছরের মধ্যেই প্রকাশিত হল তৃতীয় কাব্য "লেডা"। হাক্সলীর তরুণ জীবনের প্রায় প্রত্যেকটি কবিতায় রয়েছে ফরাসী শিল্পীদের বিশেষ

রে ম্যালার্মের প্রভাব, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে ডেকাডেন্ট আন্দোলন সুরু হয়েছিল। তার প্রভাবও হাক্সলীর কাব্যে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

এর পরের পর্যায়ে শুরু হল ঔপন্যাসিকের দীর্ঘ অপ্রতিহত যাত্রা, উপন্যাসের ফাঁকে ফাঁকে ছোটগল্পের স্বর্ণ অঞ্জলি। ছোটগল্প-সঞ্চয়নের মধ্যে "লিম্বো" "মর্টাল কয়েলস" "লিট্‌ল মেক্সিকান" "টু অর থ্রি গ্রেসেস" ও "ব্রিফ ক্যাণ্ডল্‌স্‌" সাহিত্যলক্ষ্মীর কণ্ঠের কয়েকটি দ্যুতিময় রত্ন। ছোটগল্পগুলিকে ছোট উপন্যাস বললে বিশেষ অত্যুক্তি হবে না। ছোটগল্পের নায়কেরা পরবর্তী উপন্যাসের নায়কদের পূর্বাভাস। প্রত্যেক নায়কের মনে জৈব প্রেম ও নিষ্কাম প্রেমের সংঘাত।

ছোটগল্পে হাক্সলীর প্রতিভার পূর্ণ স্ফুরণ সম্ভব হয়নি। উপন্যাসে তিনি নিজেকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করলেন। প্রথম জীবনের উপন্যাসে হাক্সলী ব্যঙ্গাত্মক। শ্লেষে, বিদ্রূপে তিনি গতানুগতিক ভাবধারাকে নস্যাৎ করে দিলেন। ধর্ম, প্রেম, নীতি, মানুষের চিরন্তন মূল্যবোধ সব কিছুর উপরই তাঁর বিদ্রূপবান, বায়রণের মত তিনি ভাঙতে চাইলেন, কিন্তু শেলীর মত স্বপ্নবিলাসী আদর্শবাদী তিনি ছিলেন না, তাই তুহিনাচ্ছন্ন শীতের অবসানে পত্রে-পুষ্পে-বর্ণে-গন্ধে মধুময় বসন্তের আবাহন তিনি করেন নি। একটা বিরাট হতাশার সুর ফুটে উঠল ছন্দে, গানে, ছোটগল্প ও উপন্যাসে! হাক্সলীর দ্বিতীয় উপন্যাস "এ্যান্টিক হে" যেন এলিয়টের "ওয়েষ্ট ল্যাণ্ডের" প্রতিধ্বনি, ছন্দহীন, ছন্নছাড়া পৃথিবীর বুকে মানুষ-পুতুলের অর্থহীন হাসিকান্না। রবীন্দ্রনাথের গুপ্তধনের মৃত্যুঞ্জয় যেন শুকনো পাথরের বুকে বারে বারে মাথা ঠুকে মরচে।

হাক্সলীর প্রথম উপন্যাস—"ক্রোম ইয়েলো"র হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে ইংরেজসমাজ চমকিত হয়ে উঠেছিল। উপন্যাসটি নিঃসন্দেহে ঘটনাবহুল। একটি বৃহৎ কক্ষে অনেক আত্মকেন্দ্রিক নিমন্ত্রিত অতিথির সমাবেশ, তারা কেউ কেউ নৃত্যরত, কেউ সন্তরণপটু, কেউ প্রেমনিবেদনে ব্যস্ত। কিন্তু এ সব তুচ্ছ কাজে তারা বেশীক্ষণ ব্যস্ত থাকতে পারছে না। অনর্গল অনর্থক কথা বলার আনন্দই তাদের পাগল করে তুলেছে। প্রত্যেক চরিত্র হাক্সলীর নিজস্ব চিন্তাধারার পরিবেশক। শিক্ষাসমস্যা, যৌনসমস্যা, বিজ্ঞান, সামাজিক সমস্যা, সব কিছুর সম্বন্ধেই বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা, ফরাসী সাহিত্য-পারঙ্গম হাক্সলীর লেখায় ফরাসী বাগ্‌বৈদগ্ধ্য। প্রত্যেকটি চরিত্রের কথোপকথনে শাণিত তরবারির ঝিকিমিকি। "ক্রোম ইয়েলো" একদিক থেকে "ব্রেইভ নিউ ওয়ার্ল্ড" এর পূর্বাভাস। এইচ. জি. ওয়েলস্‌ তাঁর অসংখ্য বৈজ্ঞানিক কাহিনীতে যে অসম্ভব অবিশ্বাস্য ভবিষ্যতের চিত্র এঁকেছেন তারই কিছু ছিটে ফোঁটা "ক্রোম ইয়েলো"তেও দেখা যায়। স্কোগান নামক চরিত্র ভবিষ্যৎ সমাজ সম্বন্ধে বললেন যে, দিন আগত ঐ যখন জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে চালু যৌনমিলনের কোন প্রয়োজন থাকবে না। পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশের প্রয়োজন অনুসারে বোতলে বোতলে প্রজননের জন্য শুক্রকীট রাখা হবে। বর্তমান পরিবার, সমাজ ও গোষ্ঠীরও আর কোন প্রয়োজন থাকবে না। হাক্সলী নিষ্করুণভাবে ব্যঙ্গ করলেন বর্তমান সভ্যতাকে। তিনি বোঝাতে চাইলেন যে বর্তমান সভ্যতার সঙ্গে সরস মাটির স্পর্শ নেই। সভ্যতার আয়তন বিরাট। কিন্তু সেখানে মানবাত্মা সঙ্কুচিত, বুভুক্ষু।

"এ্যান্টিক হে" উপন্যাসে ডি. এইচ. লরেন্সের প্রভাব সুস্পষ্ট। এখানে যৌন সম্পর্কিত খোলাখুলি আলোচনা করেছেন হাক্সলী। ভিক্টোরীয় যুগের মনোভাবসম্পন্ন পাঠকেরা শিউরে উঠলেন। লরেন্সের "লেডী চ্যাটার্লিস লাভার"ও বোধ হয় সমাজে এতটা ঝড় তোলেনি। অথচ আর্টের কষ্টিপাথরে বিচার করে দেখলে এই উপন্যাসে কোন অশালীনতাই লক্ষ্যগোচর হয় না।

হাক্সলীর তৃতীয় উপন্যাস—"দোজ ব্যারেন লীভস্‌"এও যৌনসমস্যার আলোচনা রয়েছে। বর্তমান সভ্যতার পটভূমিকায় সুস্থ যৌন জীবন সম্ভব নয়। নায়ক ক্যালামির মনে জৈব প্রেম ও বৈরাগ্যসাধন দুটির প্রতিই ঐকান্তিক অনুরাগ। শেষ পর্যন্ত ক্যালামি পর্বতকন্দরে দুশ্চর তপস্যায় নিমগ্ন হলেন। অসংখ্য বন্ধন মাঝে মুক্তির স্বাদ তিনি লাভ করতে পারলেন না।

"পয়েন্ট কাউন্টার পয়েন্ট" এর বিস্তৃতি মহাকাব্যের মত। এখানেও বিভিন্ন ধরণের প্রেম উপজ্ঞালের উপজীব্য, কিন্তু মূল বিষয়বস্তু তথাকথিত সভ্যতার আবরণের নিষ্করুণ উন্মোচন।

"ব্রেইভ নিউ ওয়ার্লর্ড"এ হাক্সলী ভবিষ্যৎ জগতের ছবি এঁকেছেন। সে ছবিতে আলো নেই, রং নেই, আছে সুইষ্টের মত তিক্ততা। শেক্সপীয়রের "টেম্পেষ্ট" নাটকে নায়িকা মিরাণ্ডা তার পরমবাঞ্ছিত ফার্ডিনাণ্ডকে দেখে আনন্দোচ্ছল কণ্ঠে বলে উঠেছিল, "ব্রেইভ নিউ ওয়ার্লর্ড"। হাক্সলীর কণ্ঠে কিন্তু ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের সুর। ভবিষ্যৎ সমাজ নিয়ে রচনা অনেকেই করেছেন। প্লেটো লিখেছেন "রিপাব্লিক", বেকন লিখেছেন "নিউ এ্যাটলান্টিস", টমাস মোর লিখেছেন "ইউটোপিয়া", আর ওয়েলস লিখেছেন অনেক অসম্ভব কাহিনী। কিন্তু পূর্বসূরীদের কাছে কাঠামোটুকু ধার করে হাক্সলী যে রং ও সুরটুকু নিয়ে এলেন তাতে মানুষের অন্তরাত্মা শিউরে ওঠে। অরওয়েলের "১৯৮৪"র সঙ্গেই বোধ হয় এর তুলনা চলে। "এ্যান্টিক হে" উপন্যাসে স্কোগান বলেছিল যে ভবিষ্যৎ সমাজে বোতলের মধ্যে হবে ভ্রূণের বৃদ্ধি। প্রেম হবে অতীতের এক দুঃস্বপ্ন। স্কোগানের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হল "ব্রেইভ্ নিউ ওয়ার্লর্ড"-এ। "মা" শব্দটি নতুন জগতে অশ্লীল। মার্কস ও হেনরী ফোর্ড নতুন জগতের দেবতা। লোকেরা আর বস্তাপচা (A. D.) এ. ডি. বলবে না। বলবে এ. এফ. (A. F.) অর্থাৎ হেনরী ফোর্ডের সময় থেকে নতুন পঞ্জিকা রচিত হবে। "ব্রেইভ নিউ ওয়ার্লর্ড রিভিজিটেড" উপন্যাস-এ হাক্সলী দেখালেন যে তাঁর "ব্রেইভ নিউ ওয়ার্লর্ডের" কল্পনা আর শুধু শূন্যগর্ভ কল্পনা নয়, তা বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে।

ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ দিয়ে ভাঙা যায়, কিন্তু নতুন কিছু গড়া যায় না। তাই হাক্সলীর ব্যঙ্গাত্মক উপন্যাসগুলি প্রায় নেতিবাচক। নতুন কিছু গড়ার স্বপ্ন ফুটে উঠল "আইলেস ইন গাজা" উপন্যাসে, ব্যঙ্গের স্থান গ্রহণ করল মানুষের প্রতি অনুকম্পা আর সহানুভূতি। "পয়েন্ট কাউন্টার পয়েন্টের" চরিত্রগুলির ধারা ও বৈশিষ্ট্য "আইলেস ইন গাজা"তেও লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী দুই উপন্যাসে সম্পূর্ণ পৃথক্। হাক্সলী এই উপন্যাস লেখার সময় ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁর বিখ্যাত দর্শন সম্পর্কিত বই "এণ্ডস্ অ্যাণ্ড মীনস্" সেই সময়কার লেখা। "এণ্ড্স্ এ্যাণ্ড মীনস্"-এ হাক্সলী গীতা-বর্ণিত অনাসক্তিকে মানব জীবনের চরম অভীষ্ট বলে ঘোষণা করেছিলেন। "আইলেস ইন গাজা"তেও রয়েছে "অনাসক্তি"র আমন্ত্রণ।

"ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড"-এর অধিবাসী এলিয়ট যীশুখৃষ্টের ধর্মের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন অমৃতের সন্ধান। হাক্সলী পেলেন বেদান্ত দর্শনে। ক্যালিফোর্ণিয়ার রামকৃষ্ণমিশনে তিনি পেলেন পরশপাথর। রাজনীতি করেছিলেন অনেকদিন, অহিংসাধর্ম প্রচার করলেন দেশে বিদেশে। বৌদ্ধের করুণা ও মৈত্রীর বাণী তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। শান্তির ললিত-বাণী ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন বিশ্বের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে। কিন্তু তবুও মনের শান্তি মিলল না। "হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোনখানে"। তাই হিন্দুদের বেদান্তের মধ্যে পেলেন সেই অরূপরতন। বন্ধু ইশারউড পুরোপুরি সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত হলেন। হাক্সলী কাপড় না রাঙিয়ে মনকে রাঙালেন বৈরাগ্যের আর ত্যাগের গেরুয়ারঙে। হাক্সলীর "থীমস্ এ্যাণ্ড ভ্যারিয়েশনস্" এবং "পেরেনিয়াল ফিলজফী", তাঁর "এণ্ডস্ এ্যাণ্ড মীনস্"-এরই পুনরুক্তি। "পেরেনিয়াল ফিলজফীর" প্রথম অধ্যায়ে ভারতীয় দর্শনের "তত্ত্বমসি" এই বাণীই ধ্বনিত হয়েছে। ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের অনেক লেখক ও পণ্ডিতই বিশেষ অনুরাগী। এমার্সন, ম্যাথু আর্নল্ড, মামফোর্ড, হুইটম্যান, ষ্টপফোর্ড ব্রুক, জেরাল্ড হার্ড, এলিয়ট, সমারসেট মম্ প্রমুখ অনেকেই বুভুক্ষু আত্মার আরাম খুঁজে পেয়েছিলেন ভারতীয় দর্শনে

কিন্তু হাক্সলীর মত এত একনিষ্ঠ ভক্ত খুঁজে পাওয়া ভার। বুদ্ধির অম্লান আলোকে তিনি বুঝেছিলেন, বেদান্তের মধ্যেই রয়েছে বাঁচার গোপন রহস্য। "বেদান্ত বাক্যেষু সদা রমন্তঃ।"

মৈত্রেয়ী বলেছিলেন, "যা দিয়ে অমৃত লাভ করব না, তা দিয়ে কী করব ?" হাক্সলী তাঁর "আফটার মেনি এ সামার" উপন্যাসে দেখালেন যে দীর্ঘ জীবন লাভ করে এবং উপকরণের দুর্গ রচনা করে মানুষ সুখী হতে পারে না। "টাইম মাষ্ট্ হাভ্ এ ষ্টপ" উপন্যাসে রয়েছে ভারতীয় দর্শনের আলোচনা। জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গের আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্ব। "এইপ এ্যাণ্ড এসেন্স" তৃতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত। যে ভীষণ ধ্বংসলীলার কথা তিনি লিখেছেন, যে সতর্কবাণী উচ্চারিত করেছেন তিনি, বধির বিশ্ব তা শোনে নি। "শান্তির ললিত বাণী শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।"

বেদান্ত দর্শনে এত বিশ্বাসী হয়েও হাক্সলী মারাত্মক ভুল করেছিলেন। "ক্যাকটাস" থেকে তৈরী "মেস্‌কালীন" নামক বিষাক্ত পানীয় পান করে তিনি ভূমার দর্শন করতে চেয়েছিলেন। এতে ঈশ্বরলাভের সহায়তা হবে, জীবন মরণের মাঝখানের দুস্তর ব্যবধান সরে যাবে। "মেসকালীন" নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন "ডোরস অব পারসেপসন্‌" প্রবন্ধে। তাঁর শেষ উপন্যাস "আইল্যাণ্ড"-এও এই জাতীয় পরীক্ষার উপযোগিতার কথা উল্লেখ করেছেন।

হাক্সলী আর নেই। কিন্তু যে বাণী তিনি অজস্র রচনায় রেখে গেলেন তা বিশ্ববাসীর অক্ষয় সম্পদ। দেশ ও কালের ক্ষুদ্র গণ্ডী ভেঙে, মর্ত্ত্যের সীমা চূর্ণ করে, তিনি আজ চিরস্মরণীয়দের মধ্যে একটি অটল আসন গ্রহণ করেছেন।

দূর অযোধ্যাপুরী

বিশ্বামিত্র

দূর অযোধ্যা পুরী
কল্পনাদীপ জ্বালা'য়ে চলেছি সে তীর্থ অভিসারী।
বিশাখা তারার রুদ্রবীণায়
তপন তখন দীপক বাজায়
ঝঙ্কারে তার দিগ্‌বধূ সব মূর্চ্ছিত ধরাতলে
তেপান্তরের প্রান্তে তাদের বসনাঞ্চল জ্বলে।

সমুখে বিথারি মম
দীর্ঘ সরণি আদিম যুগের মহাভুজঙ্গ সম।
উর্দ্ধে দীপ্ত নিদাঘ গগন
ধূসরা পৃথ্বী তন্দ্রামগন
পপাসাকাতর চাতক মাগিছে করুণকণ্ঠে বারি
জনহীন পথ, যাত্রী একাকী—দূর অযোধ্যাপুরী।

এ কি এ অকস্মাৎ
কোথা হ'তে আসে শোণিত বন্যা, করুণ আর্ত্তনাদ?
চমকি চাহিনু পিছন পানে
দেখিনু রুধির পঙ্ক শয়ানে
লুটাইছে পড়ি ভারত জননী দু'বাহু ছিন্ন তার
মরণাম্বুধি উঠেছে উথলি, মুক্ত নরকদ্বার।

কার ছায়া ওই দূরে?
মায়েরে বধিয়া শ্বেত শয়তান পালায় সাগর পারে।

দুই শতাব্দী পিছনে তাহার
পলাশীর মাঠে দেখি যে আবার
বিপণি ছাড়িয়া সেই শয়তান ধরিয়াছে তরবারি
রাজার আসনে বসিছে বণিক্‌—দূর অযোধ্যাপুরী।

আরো দূরে ঐ কারা?
অর্দ্ধচন্দ্র পতাকা উড়িছে—কোথা হ'তে এল ওরা?
কে ঐ জনকে ফেলি কারাগারে
মস্‌নদে বসি বধে সহোদরে
মন্দির ভাঙ্গি মসজিদ্‌ গড়ে—বেদনামৌন দেশ
গোপনে ফেলিছে অশ্রুজল, ভাবিছে কোথা এর শেষ।

কারা ঐ গরজায়
মারাঠা শৈলে, পাঞ্জাবে আর মরু রাজপুতানায়?
লক্ষ পরাণ পড়িছে আহুতি
মরণ যজ্ঞে—হ'ল না মুকতি
দেশমাতৃকার কঠিন নিগড়—খেলিছে নিঠুর হোরি
বীরের শোণিতে বিজয়ী সেনানী—দূর অযোধ্যাপুরী।

পশ্চাতে হেরি তার
দুর্ম্মদ বেগে পার হ'য়ে আসে গিরি, মরু, কান্তার
এদেরই সুদূর প্রপিতামহ
রোধিতে তাহারে পারে না কেহ

পাণিপথে আর তরাইনে বাধা হ'য়ে গেল ধূলিসাৎ
বিজিত ভারত নীরবে আবার করিছে অশ্রুপাত।

পিছে কারা আসে যায়?
শোণিত সিক্ত রাজাসনে বসে শোণিতে বিদায় লয়?
আরো দূরে ঐ রণ উল্লাসে
ঝঞ্ঝার বেগে কারা ছুটে আসে?
ঝলসে আবার অসি পাণিপথে, পালায় আহত অরি
ঘরের শত্রু ডেকে আনে পুনঃ—দূর অযোধ্যাপুরী।

কে ঐ পিছনে তার
দুস্তর পথে বিভীষিকা সম নেমে আসে বার বার?
কালের বেলায় আরো বহুদূরে
কাহারা আসিছে আলোকে আঁধারে?
কেহ সামান্য নরপতি আর কারও সম্রাট্ বেশ—
বহুবিভক্ত কখনও ভারত, কভু অখণ্ড দেশ।

মহাতপস্বী দূরে
কম্বুকণ্ঠে ফিরিছে প্রচারি—মায়ার এ সংসারে
ব্রহ্ম সত্য, মিছে আর সব—
ফিরে বেদান্ত, বুদ্ধ নীরব;
পশ্চাতে কোন্ রাজাধিরাজ পুণ্য প্রয়াগে হেরি
সব সম্পদ্ বিতরি ভিখারী—দূর অযোধ্যাপুরী।

পিছে কোন্ নরপাল?
জ্বলে বিক্রম আদিত্য সম, গরিমাদীপ্ত ভাল।
উজলিছে সভা নয়টি রতনে—
শান্তি, ঋদ্ধি, শৌর্য্য ও জ্ঞানে
বিশাল ভারত শোভে অনন্ত জগতের বিস্ময়।
—দূরে পশ্চাতে গৌরব রবি আঁধারে মিলায়ে যায়।

তমসার বুক চিরে
কাহার মূরতি মহিমা উজল জাগিয়া উঠিছে ধীরে?
শোণিত সিন্ধু হেরি মহারণে
লইছে শরণ বুদ্ধ চরণে
ত্যজিয়া অস্ত্র জিনিছে ভুবন শান্তির পথ ধরি
আজর্ষি গাথা চিরভাস্বর—দূর অযোধ্যাপুরী।

বহুদেশ জয় ক'রে
দিগ্‌বিজয়ী কে আসি থমকি দাঁড়ায় বিপাশা তীরে?
জ্বলিয়া উঠেছে সমর অনল
পরাজিত তবু গর্ব্বে অটল
বন্দী রাজা দৃপ্তকণ্ঠে চাহিছে রাজার মান—
বীরের বেদনা বুঝে মহাবীর, মুছে দেয় অপমান।

পিছনে আঁধার কূলে
করুণাকোমল আঁখি দু'টি কার শুকতারা সম জ্বলে?
রাজার দুলাল মহাসন্ন্যাসী
বিজন কাননে বোধিমূলে বসি
ধেয়ানে লভিছে মুক্তির পথ—আজিও যে পথ ধরি
অর্দ্ধজগৎ খোঁজে নির্ব্বাণ—দূর অযোধ্যাপুরী।

আবার অন্ধকার—
সে আঁধারে দূরে সমর বহ্নি জ্বলিছে ভয়ঙ্কর।
আঠারো দিবসে জাতি বিদ্বেষ
ভস্ম করিল এ বিশাল দেশ—
মহাভারতের শ্মশানভূমিতে শোকের আগুন জ্বলে
জয়ের মুকুট ফেলিয়া বিজয়ী মহাপ্রস্থানে চলে!

কল্পনদীর তীরে
শোভিছে ও কোন্ স্বপনের পুরী—দূরে, আরো বহুদূরে?
অভিষেক দিনে পরি চীরবাস
রাজার কুমার চলে বনবাস
পিতার সত্যে চৌদ্দবরষ—বধি দুর্ম্মদ অরি
ফিরে অযোধ্যায়, চলেছি যেথায়—দূর অযোধ্যাপুরী।

কিছু নাহি দেখা যায়—
পশ্চাতে সব গিয়াছে মিশিয়া ঘনতর কুয়াশায়।
শুধু হোমশিখা উঠে তপোবনে
মাঝে মাঝে—আর ভেসে আসে কানে
মহা ওঙ্কার ধ্বনি সুগভীর—দূর দিগন্তে কারা
ছায়ার মতন কোথা হ'তে আসে ওই মানুষের ধারা?

দিগন্তরেখা পারে
বিস্মরণের যবনিকা তুলি সিন্ধু নদের তীরে

উঁকি দেয় কান্না আলোক ভুখারী
অচেনা মানুষ, অজানা নগরী—
কোথায় মিলাল পুরী-পুরবাসী ?
সহসা অন্ধকার—
কাঁপিল কি ধরা, আসিল অরাতি, প্লাবন প্রলয়ঙ্কর ?

শাখামৃগ কলরবে
চমকি দেখিনু সমুখে মম দাঁড়ায়ে রিক্তবৈভবে
ধূলিধূসরিতা শীর্ণা নগরী
বালুকা বেলায় অর্দ্ধ আবরি
কূর্ম্মপীড়িত উরস, বহিছে তটিনী মলিন বারি—
এই কি সরযূ পূত সলিলা—এই অযোধ্যাপুরী ?

যে তীর্থ অভিসারে
কল্পনাদীপ জ্বালায়ে ফিরিনু দূর হ'তে আরো দূরে
এ নহে সে নদী, নহে সে নগরী—
ছিল কি কখনও ? আসিবে কি ফিরি ?
অথবা চলেছে অলীক কাহিনী যুগ যুগান্ত ধরি—
কোথা অযোধ্যা, সরযূ কোথায় ?
—কোথা সে নদী ও পুরী ?

অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

১৯২৯ সাল। এম এ পাশ করার পর রিপন ল কলেজে আইন পড়তে সুরু করেছি। রিপন কলেজে ল' পড়ার কারণ এই যে এখানে মাইনে কম, আর ল' যে পড়ছি সেটা শুধুমাত্র লোককে বলার জন্য যে আমি বেকার নই। না হলে ওকালতি করার ইচ্ছে আমার আদৌ ছিল না এবং মনে প্রাণে জানতুম যে ওকালতি জমাবার মত মুরুব্বি আমার নেই। দশ বছর ধরে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার মত রেস্তও আমার পেছনে নেই। সন্ধ্যের সময়ে কলেজে যাই, দিনের আলোয় চাকরির চেষ্টা করি, সকালে পাড়ার লাইব্রেরীতে বসে খবরের কাগজে কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন দেখি। সে সময়ে এই ছিল আমার সারাদিনের ত্রিবিধ কার্য্য। টিউসনি জুটলে তাও ছাড়ি না।

সন্ধ্যের অন্ধকারে ছাতাটি মাথায় দিয়ে বাড়ী ফিরছি। বেশ বৃষ্টি পড়ছে। রাস্তায় লোকসংখ্যা খুবই কম, আর সে আমলে গ্যাসের আলোয় গ্যাসটাকেই জ্বলছে বলে দেখা যেত, অন্য কিছু তেমন দেখাই যেত না।

ট্রাম লাইন থেকে যেমনি আমাদের বাড়ীর দিকের রাস্তায় এসেছি, অমনি একটি আধুনিকা কোন এক অন্ধকার রোয়াক থেকে লাফিয়ে নেমে একেবারে আমার ছাতার তলায় এসে বল্লে, বাড়ী যাচ্ছেন ত' আমাকে একটু এগিয়ে দিন।

চমকে উঠলুম। সে আমলে এ রকম স্বাধীনা তরুণী রাস্তায় পথে দু'-একটা দেখা গেলেও ওদের সংখ্যা ছিল খুবই কম, এবং ময়লা-কাপড়-পরা ছাতা-মাথায় ছেলেদের সঙ্গে ওরা ঘৃণায় কথাই কইত না। সেই তাদেরই একজন এত পরিচিতের মতন গায়ের ওপোর এসে পড়বে এটা একেবারেই অভাবনীয়।

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, কোথায় যাবেন? ততক্ষণে একহাত দিয়ে সে আমার ছাতার বাঁট ধরে খোলা ছাতাটাকে বেশ খানিকটা নিজের দিকে হেলিয়ে ধরেছিল। আমার প্রশ্নে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠে সে বল্লে, ওমা, আমাকে চেনেন না? আমার বাড়ী দেখেন নি?

বাধ্য হয়ে বিজ্ঞের মত বল্লুম, ও! তারপর হাঁটতে লাগলুম।

ঘনিষ্ঠভাবে সে কথা কইতে আরম্ভ করলে। বল্লে, ওঃ, আজ কি মুস্কিল! ট্রাম থেকে নামা-মাত্রই বৃষ্টি এল, অথচ ছাতা নিয়ে বেরুই নি। একটা রিক্‌শা পর্য্যন্ত নেই, তাই ঐ মোড়ের বাড়ীর রোয়াকে উঠে চুপটি করে দাঁড়িয়েছিলুম। ভাগ্যিস্ আপনাকে পেলুম।

নিঃশব্দে হেঁটে চলেছি। ডান হাত দিয়ে ছাতা ধরেছি, কিন্তু ছাতাটা প্রায় সমস্তই সে টেনে নেওয়ায় আমার বাঁ দিকটা পুরো ভিজছে। অবস্থাটা হয় ত সর্ব্বকালের সকল তরুণেরই লোভনীয়, হয়ত আমারও অবচেতন মনে আমি খুশিই হচ্ছিলুম, কিন্তু সে আমোলে যে-শিক্ষা এবং সংস্কারের মধ্য দিয়ে মানুষ হয়ে উঠেছিলুম তাতে আমার চেতন-মন একবার সঙ্কুচিত এবং একবার ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছিল। আমার ডান কাঁধের সঙ্গে তার বাঁ কাঁধটা ঠেকছে, এতে আমার মনে হচ্ছিল যে, আমি খুবই অস্বস্তি বোধ করছি। একবার মনে হোল ছাতাটা তাকে পুরোই ছেড়ে দিয়ে পেছন পেছন ভিজতে ভিজতে যাই, কারণ ভিজতে বেশী আর কিছুই বাকী ছিল না। কিন্তু ছাড়লুম না, কারণ মনে হোল ছাতাটা ছেড়ে দেওয়া মানে পূর্ণ পরাজয়। কথা বলতে বলতে সে থামল, এবং আমার উত্তরের জন্য একটু অপেক্ষা করে বল্লে, আপনার খুব রাগ হচ্ছে ত?

বাধ্য হয়ে বল্লুম না, রাগ হবে কেন ?

হাসতে হাসতে সে বল্লে, আপনাকে ভিজিয়ে দিচ্ছি বলে !

ভদ্রতা বজায় রাখার জন্য বল্লুম, আপনিও ত ভিজছেন।

সে বল্লে তা ত হবেই, এ ভাবে হাঁটলে দুজনকেই ভিজতে হয়।

একটু থেমে সে বল্লে, এখন কোথা থেকে ফিরছেন ?

বল্লুম, কলেজ থেকে।

আমার মুখের দিকে বড়-বড় চোখ তুলে সে বল্লে, এত রাত্তিরে কলেজ ?

বল্লুম, ল' কলেজ।

সে বল্লে, আপনি ল' পড়েন বুঝি, বাঃ, বেশ। আমার মায়েরও খুব ইচ্ছে, আমার ভাইটা বি-এ পাস করলে তাকেও ল' পড়াবে।

বল্লুম, ভাই বি-এ পড়ে বুঝি ?

সে বল্লে, না-না, এই ত মোটে আই-এ পড়ছে। আমি ত এই মোটে বি-এ পাস করলুম, ভাই আমার চেয়ে তিন বছরের ছোট।

কথা কইতে কইতে আমার বাড়ীর কাছে এসে পড়লুম। সে নিশ্চয়ই আমার বাড়ী চিনত, বললে, এখন কিন্তু আপনাকে ছাড়ছি না, আমায় বাড়ী পৌঁছে দিয়ে তবে আপনার ছুটী।

ভয়ে ভয়ে একবার ওপোর দিকে চেয়ে দেখলুম, বাবা, বোন কি পিসিমা কেউ জানলা কিম্বা বারাণ্ডায় আছে কি না। দেখি, কেউ কোথাও নেই, জানলা সব বন্ধ, বারাণ্ডা শুন্‌শান।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার সঙ্গে যেতে হোল। এখনও পর্য্যন্ত মেয়েটাকে ঠিক চিনতে পারছি না, তবে অনুমান হচ্চে যে, বোধহয় আমাদের গলির শেষ প্রান্তের ইট-বার-করা বাড়ীটায় ওরা থাকে।

ঠিক তাই। বাড়ীর দরজায় এসে ও বল্লে, ভেতরে আসুন।

আমি বল্লুম, না, এবার আমি বাড়ী যাই; দেরী হয়ে যাবে।

সে বল্লে, ওঃ, এমন কি দেরী ! একবার মায়ের সঙ্গে দেখা করবেন চলুন। মা আপনাকে দেখলে খুব খুশি হবে।

বলেই সে আমার ছাতার হুকটা টিপে ছাতা বন্ধ করে প্রায় জোর করেই ভেতরে নিয়ে গেল।

সম্মোহিতের মত পেছন পেছন চলতে লাগলুম। দরজার পর সরু গলি ও অন্ধকার উঠান পার হয়ে পেছনের একটা ড্যাম্পধরা বারাণ্ডায় গিয়ে উঠলুম এবং সে আগে আগে এসে একটা বন্ধ দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে বল্লে, আসুন।

ঘরের মেঝেয় একটি হ্যারিকেন খুব কম করে জ্বালা আছে, দু'পাশে দুটি তক্তপোষ। একটি তক্তপোষ খালি, অপরটিতে সেই মৃদু আলোকে দেখলুম, কে যেন একজন শুয়ে আছে।

ভেতরে ঢুকেই মেয়েটি বল্লে, এ বেলা কেমন আছ মা ?

মৃদু আলোকে দেখলুম, এক বৃদ্ধা চোখ চেয়ে বল্লেন, এতক্ষণে এলি ? তা আমার যে ভয়ানক কষ্ট হচ্চে অলকা।

মায়ের মুখের ওপোর ঝুঁকে পড়ে সে বল্লে, ডাক্তারকে খবর দেব, না সোডা নিয়ে আসবো।

বৃদ্ধা বল্লেন, ডাক্তারকে খবর দিতে হবে না, দুটো সোডাই বরঞ্চ নিয়ে আয়। আমার দিকে দেখতে অলকা নিজেই বল্লে, আমার বন্ধু, এই পাড়াতেই ওদের বাড়ী। বৃষ্টির জন্য ওকে ছাড়লুম না, ওর ছাতাতেই এলুম কি না।

ক্ষীণকণ্ঠে বৃদ্ধা বল্লেন, বেশ বাবা, আমি খুব ভাবছিলুম যে, মেয়েটা হয়ত জলে ভিজে আবার অসুখ করে বসবে। তা বোসো বাবা, বোসো।

আমি কোনো কথা বলার আগেই অলকা আমার ছাতাটা হাতে নিয়ে বল্লে, তাহলে আমি চট করে মায়ের জন্য সোডা নিয়ে আসি ; আমি এলে তবে ছাতা-বেচারা ছুটী পাবে, কেমন ? বলে আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে দরজা দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

এরকম একটা অভাবনীয় বিপদে যে পড়তে হবে, তা আমি পনর মিনিট আগেও জানতুম না। কিন্তু উপায় নেই, অগত্যা সামনের খালি তক্তপোষটাতেই বসতে হোল।

বৃদ্ধা বল্লেন, তোমার নাম কি বাবা ?

বল্লুম, আমার নাম শ্রীঅসীমকুমার চক্রবর্ত্তী।

তিনি বল্লেন, তুমি বুঝি এই পাড়াতেই থাক ?

বল্লুম, হ্যাঁ।

কি কর বাবা ? পড় না কি ?

বল্লুম, হ্যাঁ, ল' পড়ি।

ল' পড়; বাঃ বেশ। তা তুমি হাইকোর্টের উকীল হবে ত?

মনে মনে হাসি এল। বল্লুম, উকীল ত আজকাল হয় না, উকীল বলে এখন আর কিছু নেই।

তিনি যেন বিস্মিত হয়ে বল্লেন, উকীল বলে এখন আর কিছু নেই? ওমা, তাহলে কি হবে?

হাসি পায়! যে উকীল নামটা চার পাঁচ বছর হোল হাইকোর্ট থেকে উঠে গেছে, সেই উকীল নামটা না থাকায় এই বৃদ্ধার কি এমন ক্ষতি হতে পারে বুঝতে পারলুম না।

বৃদ্ধা বল্লে, আচ্ছা, উকীলের কাজ এখন কারা করে?

বল্লুম, উকীল নামটা বদলে এখন এ্যাডভোকেট নাম হয়েছে; উকীলরা যে কাজ করতেন, সে কাজ এখন এডভোকেটে করেন।

বৃদ্ধা যেন একটু আশ্বস্ত হয়ে বল্লেন, ও, তাহলে পুলক আমাদের এ্যাডভোকেটই হবে। একটু থেমে বল্লেন, জানো বাবা, কর্ত্তার ভয়ানক ইচ্ছে ছিল, পুলককে উকীল করবার। উকীলদের বুঝি সাড়ে সাত শ টাকা জমা দিতে হয়, তাই কর্তা আমাদের অভাবের সংসারেও এক টাকা দু'টাকা করে প্রতি মাসে জমাতেন। তা তিনি ত আর রইলেন না। অলকা ম্যাট্রিক ক্লাশে আর পুলক থার্ড ক্লাসে, এমন সময় তিনি আমাদের এমনি অনাথ করে চলে গেলেন। বলতে বলতেই বৃদ্ধা যেন নিদারুণ শারীরিক যন্ত্রণায় কুঁকড়ে বেঁকে একটা কাতরানীর শব্দ করতে লাগলেন।

ব্যস্ত হয়ে তক্তপোষ ছেড়ে উঠে তার কাছে গিয়ে বল্লুম, কি, কি হোল আপনার?

কোন উত্তর নেই। প্রায় দু' মিনিট ধরে একটা অকথ্য যন্ত্রণা ভোগ করে বৃদ্ধা যেন একটু স্তব্ধ হয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্লেন। তারপর আমার দিকে চেয়ে বল্লেন, তুমি উঠলে কেন বাবা, বোসো।

বল্লুম, কি হোল আপনার?

বল্লেন, ঐ ত আমার রোগ। কাজ কর্ম্ম সবই করি, কিন্তু প্রায়ই সন্ধ্যের সময় পেটে একটা কষ্ট হতে থাকে। এক একবার মনে হয়, কে যেন পেটের ভেতর ছুরী চালাচ্ছে। কোন কোন দিন এমনিই সেরে যায়, আবার কোন কোন দিন একসঙ্গে দু' বোতল সোডার জল খেয়ে খানিক পরে সেই জলটা সব উঠে গেলে তবে শরীরটা হাল্কা হয়। এক একবার তাতেও হয় না, তখন ডাক্তার ডাকতে হয়।

জিজ্ঞাসা করলুম, এরকমটা কতদিন হচ্ছে? সারবে না?

হতাশভাবে বৃদ্ধা বল্লেন, এ কি সারবার রোগ বাবা! এ বুঝি অম্লশূল। যতদিন থাকবো, এমনি করেই কাটাতে হবে।

বল্লুম, খাওয়া-দাওয়া ধরাকাট করে—

তিনি বল্লেন, ধরাকাট করে কি করবো বাবা, ভাতে-ভাত খাই দুপুরে, আর রাত্রে কোন দিন মুড়ি, কোন দিন খই, এই খেয়ে থাকি। ডাক্তার বলে, বেশী করে দুধ খেতে, কিন্তু সব দিক ত দেখতে হবে। দুধ কোথায় পাব? তুমি যখন অলকার বন্ধু, তখন তোমার অজানা ত কিছুই নেই। ঐ মেয়েটি আর ছেলেটি এদের দু'জনের টিউশনির টাকায় ঘর ভাড়া দিয়ে তিনটি প্রাণীর সংসার চালাতে হয়, আবার কিছু সঞ্চয়ও রাখতে হয়, কারণ টিউশনি ত সব সময় থাকে না।

বলতে বলতে অলকা ঘরে ঢুকে দু' বোতল সোডার জল মেঝেয় রেখে বল্লে, ওঃ, বৃষ্টি আরও জোরে এসে গেছে।

বৃদ্ধা বল্লেন, আহা, তোদের কত কি কষ্টই না দিচ্ছি রে!

ধমক দিয়ে অলকা বল্লে, তুমি থাম ত। তারপর আমার দিকে চেয়ে বল্লে, কেমন জব্দ, মায়ের ঘরে বন্দী! বলেই দেওয়ালের তাক থেকে একটা কাচের গ্লাস ও মোটা পেন্সিল নিয়ে সোডার বোতল খুলে গেলাসে ঢেলে পরপর দু' বোতল জলই মাকে খাওয়ালে। সে আমোলে সোডার বোতল কাঁচের গুলি দিয়ে বন্ধ করা থাকতো, ছাতার বাঁট, পাথার বাঁট, পেন্সিল এই সব দিয়ে সোডার বোতল খুলতে হোত।

সোডার জল খেয়ে পরপর কয়েকটা ঢেঁকুর তুলে বৃদ্ধা বল্লেন, এইবার একটু সুস্থ হব।

আমি বল্লুম, এবার তা হলে উঠি।

বৃদ্ধা বল্লেন, এসো বাবা, এস। তোমাকেও কত কষ্ট দিলুম বল ত।

মায়ের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে অলকা বল্লে, তা আর কি হবে, মায়ের জন্য ছেলেদের ওরকম কষ্ট হয়েই থাকে; আমার দিকে চেয়ে বল্লে, কেমন, ঠিক বলি নি!

বৃদ্ধা বল্লেন, কিন্তু এত বৃষ্টিতে কি করে যাবে বাবা। না হয় আর একটু অপেক্ষা করে—

বল্লুম, না, এই ত পাশেই বাড়ী।

অলকা বল্লে, তা ছাড়া ভিজতে আর বাকী কিছুই নেই।

বৃদ্ধা বল্লেন, তবে আজ এসো বাবা। কিন্তু গরীব মাকে মনে করে যখনই সময় পাবে এক একবার এসো বাবা। একলাটি পড়ে থাকি—

মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, আসব। তারপর ছাতাটি নিয়ে বেরুতেই অলকা হ্যারিকেন হাতে পাশে পাশে এসে বল্লে, এখানটা ভয়ানক অন্ধকার, একটু পেছলও আছে, সাবধানে যেতে হবে।

সদর দরজা অবধি এসে অলকা বল্লে, আবার কবে দেখা পাব?

অলকাকে প্রথম থেকেই তেমন ভালো লাগে নি, তার কথার উত্তরে বল্লুম, দেখা পাওয়া কি খুবই দরকার?

ঢোঁক গিলে সে বল্লে, আমার দরকার না থাকলেও মায়ের ত দরকার আছে; তা ছাড়া তাঁর কাছে আসবো বলে কথা দিয়ে—

বল্লুম, দেখা যাক, সুবিধে মতন আসা যাবে।

কোথাও কেউ নেই দেখে সে বল্লে, আর একটা কথা! মায়ের কাছে, আমাকে 'তুমি' বলে কথা কইবেন, আর আমিও আপনাকে 'তুমি' বলবো, কারণ বন্ধু বলে পরিচয় দিয়েছি কি না!

কোন জবাব না দিয়ে রাস্তায় নেমে পড়লুম।

অলকার কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ী ফিরলুম। কি বেহায়া মেয়ে বাবা! লজ্জা সরম বলে এতটুকুও কিছু নেই। আবার বল্লে কি না, বন্ধু! 'তুমি' বলে কথা কইবে! কি স্পর্দ্ধা!

রাত্রের খাওয়া-দাওয়া সেরে এভিডেন্স একটু খুলে পড়তে বসলুম। ভালো লাগল না। জোর করে মন লাগিয়ে দু' চন পাতা পড়ে গেলুম, এক বর্ণও বুঝলুম না। বিরক্ত হয়ে বইটা সরিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলুম। পাশের তক্তপোষে বাবা দু'-তিনবার এপাশ ওপাশ করলেন। শব্দ শুনে বুঝলুম, পাশের ঘরে পিসিমা দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লেন। শেষে আমিও আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লুম।

বাস্তবিক, অলকা খুব ফ্রিলি মিশতে পারে। কোন রকম সংকোচ নেই। আহা, টিউশানির ওপোর সংসার কি করে চলে কে জানে? আমিও ত টিউশনি করেছি। অনেক সময় ছাত্ররা মাইনেই দেয় না। দিলেও কত আর দেয়? দশ টাকা, বারো টাকা, বড় জোর পনের টাকা। মাসে মাসে কত টাকা ঘরভাড়া দিতে হয়, কে জানে? দূর হোক্ গে। পাশ ফিরে জোর করে ঘুমুতে চেষ্টা করলুম।

অলকার বোধ হয় ছাতা নেই, কারণ, থাকলে আমাকে বসিয়ে রেখে আমার ছাতা নিয়ে সোডা কিনতে যাবে কেন? ভাইকেও ত দেখলুম না। ভাইটা কিরকম পড়াশুনা করে, কে জানে? সে কি মানুষ হতে পারবে? হয়ত দরকার মত সব বইও সে কিনতে পারে না। দূর হোক গে ছাই, দুনিয়ায় কত লোকের কত অভাব আছে, আমি তার কি করবো? এই যে প্রায় দু'বছর ধরে চেষ্টা করেও আমি একটা চাকরী জোটাতে পাচ্ছি না, কে আমার সাহায্য করছে। রাত্রি অনেক হোল, এবার ঘুমুতে হবে।

আমার তবু মাথার ওপোর বাবা আছেন। অলকার বাবা দাদা কেউ নেই। তাই বাধ্য হয়ে সকলের সঙ্গেই মিশতে হয়। মেয়েটা দায়ে পড়ে ফরোয়ার্ড হয়েছে, ওকে বেহায়া মনে করা অন্যায়।

ঢং ঢং ঢং—বাড়ীওয়ালার ক্লক ঘড়িতে তিনটে বাজল! —হ্যাঁ, তিনটে? কি সর্বনাশ, এত রাত অবধি জেগে আছি, তাহলে ঘুমাব কখন? তারপর চারটে বাজাও শুনলুম, কিন্তু পাঁচটা কখন বেজেছে জানি না, সাড়ে পাঁচটায় বাবা যখন যথারীতি ডেকে দিয়ে উঠে গেলেন তখন একরাশ অবসাদ নিয়ে বিছানার ওপোর উঠে বসেই আবার শুয়ে পড়লুম।

দু'দিন ধরে ভাবলুম, বুড়ো মানুষকে কথা দিয়ে এসেছি আসব বলে, একবার অন্ততঃ যাওয়া উচিত। কিন্তু—। ভাবলুম, এমন সময় যাবো যে-সময় ও থাকবে না। কিন্তু ও যে কখন থাকে আর কখন থাকে না, তা বুঝবো কেমন করে?

রবিবার দুপুরে পায়ে পায়ে বেরিয়ে ওদের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলুম। উঠান পার হয়ে বারাণ্ডায় উঠতেই এক মুখ হাসি নিয়ে অলকা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বল্লে, মেঘ না চাইতেই জল, কাল থেকে মা যে তোমাকে কতবার খোঁজ করেছে, তা গুণে বলা যায় না। এস, এস।

দ্বিধাগ্রস্ত মনটা প্রসন্নতায় ভরে গেল। বল্লুম, মা আছেন কেমন?

সে বল্লে, ভালো।

ভেতর থেকে মায়ের গলার আওয়াজ পেলুম, তিনি বল্লেন, কে বাবা অসীম, এসো এসো।

আজ ঘরে এসে পুলককেও দেখতে পেলুম। সেদিন যে তক্তপোষে আমি বসেছিলুম, সেই তক্তপোষে বসে পুলক একটা বই নিয়ে পড়ছিল। আমার দিকে মুখ তুলে চেয়ে আবার পড়ায় মন দিলে।

মিনিট পনেরো এদিক ওদিক গল্প করার পর অলকা একটা কাপড় জামা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল এবং মিনিট পাঁচেক পরে সাজগোজ করে ঘরে এসে ঢুকে বল্লে, তুমি তাহলে বোসো ভাই, আমাকে আবার বেরুতে হবে।

মা বল্লে, কোথায় যাবি ?

সে বল্লে, বিশুদার বাড়ীতে একবার যাব। বিশুদা তার ভাগ্নীকে পড়াবার জন্যে বলেছিলেন, দেখি সেই মেয়ের বাবার সঙ্গে কথাবার্তা করে, যদি ঠিক্‌ঠাক্ হয়ে যায়, তাহলে পরশু থেকেই সুরু করে দিই।

মা বল্লেন, আচ্ছা মা, তাই দেখ। দুর্গা দুর্গা। অলকা বেরিয়ে চলে গেল।

মা বল্লেন, কি বলবো বাবা, ঐটুকু মেয়ের ওপোর সমস্ত চাপ। আর ছেলেটাকেও দেখ না! বেচারা পড়ার সময় পায় না। দুপুরে কলেজ যায়, আর সকালে একটা এবং সন্ধ্যেয় দুটো এই তিনটে ছেলে পড়ায়।

বল্লুম, আচ্ছা, আপনাদের আত্মীয় স্বজন কেউ নেই।

নিঃশ্বাস ফেলে বৃদ্ধা বল্লেন, থাকবে না কেন বাবা, সবই আছে, কিন্তু কাজের বেলায় কেউ নেই।

আজ এ ঘরে এসে অবধি অলকার মায়ের সঙ্গেই কথা কয়েছি, কিন্তু অলকা চলে যাওয়ার পর সেই অলকার মায়ের সঙ্গে কথা কইতে আর যেন ইচ্ছেই হোল না। ইতস্ততঃ করে বল্লুম, আজ এখন চলি, আবার না হয় পরে আসবো।

তিনি বল্লেন, এসো বাবা, ভুলে যেও না যেন।

ওবাড়ী থেকে বেরিয়ে মনে হোল আমার এক সহপাঠীর কাছে শুনেছিলুম তার ভগ্নীপতির দাদা মেয়েকে পড়াবার জন্যে একজন শিক্ষয়িত্রী খুঁজছিলেন। ট্রাম ভাড়া খরচ করে সেই সহপাঠীর বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলুম, তারপর দুদিন ধরে চেষ্টা করে কুড়ি টাকা মাইনে স্থির করে বুধবার দুপুরে দুজনার ওদের বাড়ীতে আসা গেল।

অলকা তখন ভাইকে লজিকের সিলজিসম্ বোঝাচ্ছিল এবং অলকার মা নিজের তক্তপোষটিতে বসে কতকগুলো পুরানো কাপড় দিয়ে বালিশের ওয়াড় সেলাই কচ্ছিলেন।

সেদিন মা তার নিজের তক্তপোষেই আমাকে বসালেন। এদিক ওদিক কথার পর বল্লুম, অলকা, একটি মেয়েকে পড়াতে পারবে, সময় আছে ?

অলকা বল্লে হ্যাঁ। কোন ক্লাশের মেয়ে, কি কি পড়বে ?

সব শুনে সে রাজী হয়ে গেল। বেলা চারটের সময় আমরা দুজনে বেরিয়ে পড়লুম। ঠিক হোল হালসীবাগানে মেয়ের বাড়ী অলকাকে পৌছে দিয়ে আমি ল' কলেজে চলে যাব। কিন্তু মেয়ের বাড়ী এসে শুনলুম, মেয়ের বাবা রাত্রি সাড়ে সাতটা নাগাদ ফিরবেন, অতএব সেই সময় আসতে হবে।

তখন বেলা সাড়ে চারটে, সাড়ে সাতটা মানে তিন ঘণ্টা সময়। অলকা বল্লে, আপনি কলেজ যাবেন ত ?

বল্লুম, হ্যাঁ, তা যেতে হবে বই কি।

ইতস্ততঃ করে অলকা বল্লে, কলেজের ত দেরী আছে, চলুন না পরেশনাথের বাগানে একটু বসা যাক্।

প্রস্তাবটা ভালোই লাগল। পরেশনাথের বড় মন্দিরের পেছনে ছোট মন্দিরটার বাগানে একটা নিরিবিলি বেঞ্চিতে এসে দুজনে পাশাপাশি বসা গেল। পেছনের ঐ বাগানটায় সে আমোলে লোকজন তেমন যেত না বলেই অলকা যেন ঐখানেই বসবার জন্য আমাকে টেনে নিয়ে এল।

এদিক ওদিক দু চারটে কথা বলেই অলকা বল্লে, এক মিনিট বসুন, এখুনি আসছি। বলেই সে বেরিয়ে গেল এবং একটু পরেই এক ঠোঙা চীনা বাদাম ও কাগজে করে ঝালনুন নিয়ে ফিরে এল। বল্লুম, আবার কেন পয়সা খরচ করতে গেলেন।

সে বল্লে, পয়সা খরচ না করলে বাদামওয়ালা বাদাম দেবে কেন ?

বল্লুম, না-না. বাদাম কিনতে গেলেন কেন ?

বল্লে, না হলে কি শুধু মুখে গল্প জমে ?

অনেক কথাই সেদিন হোল। ওর বাবা রেল-অফিসে কাজ করতেন। মারা যাওয়ার পর প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের সামান্য টাকা এবং অলকা আর পুলককে নিয়ে মা জ্যেঠামশাইয়ের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। জ্যেঠামশাই

অবস্থাপন্ন, কিন্তু মা যাওয়ার পর জ্যেঠামশাই রাঁধুনী ছাড়িয়ে রান্নার সমস্ত ভার মায়ের ওপরে দিয়ে দেন। ছেলে-মেয়েদের পড়ার যাবতীয় খরচ প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা থেকেই খসতো। খাওয়া দাওয়া এত খারাপ যে, দুপুরে অধিকাংশ দিন মায়ের খাওয়াই হোত না। রাত্রে সকলের লুচি হোত, কিন্তু ওদের জন্য হোত ভাত আর মা নিজের পয়সায় মুড়ি কিনে খেতেন, মাকে কোনদিন একখানা রুটীও তারা দিত না। এই ভাবে তিন বছর কাটিয়ে মায়ের অম্লশূল দাঁড়িয়ে গেল। তারপর জ্যেঠামশাই বল্লেন ছেলেমেয়ের পড়াশুনা বন্ধ করে দাও, কারণ প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা আর নেই। তখন অলকা ফোর্থ ইয়ারে পড়ে, আর পুলক ফার্ষ্ট ক্লাশে। মা আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন, কারণ ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে এই আশায় মা এতদিন বুক বেঁধে ছিলেন। অলকা বল্লে, তখন আমি মাকে বলে জোর করে জ্যেঠামশাইয়ের বাড়ী থেকে বেরিয়ে এইখানে ঘর ভাড়া করে এসে উঠলুম। সেদিন আমাদের হাতে সম্বল ছিল মাত্র একুশটি টাকা আর বিশুদার বাড়ীতে বিশুদার ছোটবোনকে পড়িয়ে পেতুম মাসিক আটটি টাকা। ভেবেছিলুম, বাবার খাট, আরসী-দেওয়া আলমারী, মায়ের পনর যোল ভরির গয়না এইগুলো বিক্রি করে কিছুদিন চালাব, তারপর আমি পাশ করে কোথাও একটা চাকরী জুটিয়ে নেব। কিন্তু জ্যেঠামশাই কিছুই দিলেন না। অথচ, খুব মুখ মিষ্টি কিনা, বল্লেন ভাড়া বাড়ীতে খাট আলমারী নিয়ে কি হবে বউমা, তার চেয়ে ওসব আমারই কাছে থাক, পুলক বড় হয়ে মানুষ হয়ে বাড়ী-টাড়ী করে তারপর ওগুলো নিয়ে যাবে, আর গয়না এখন তোমার কি দরকার। শেষে চুরি-চামারী হয়ে যাবে, কি নষ্ট করে ফেলবে, তার চেয়ে ওগুলো আমাদের কাছেই জমা থাক, অলকার বিয়ের সময় কিছু নিও, আর বাকী পুলকের বউকে দেবে। কাজেই পরনের কাপড় আর বাবার আমলের দুটো পুরনো তোরঙ্গ সম্বল করে ভাড়া বাড়িতে এসে উঠলুম। ঐ যে তক্তপোষ দুটো দেখেছেন, ও দুটো বাড়ীওয়ালার জিনিষ, উঠোনের এক পাশে দাঁড় করানো ছিল, মা বাড়ীওলা-গিন্নীকে বলে চেয়ে নিয়েছেন।

দীর্ঘ ইতিহাস শুনতে শুনতে চোখের পাতা ভিজে উঠেছিল, এবং কলেজের সময়ও পার হয়ে গিয়েছিল। বাগানের আলো জ্বলে উঠলো, রাস্তার গ্যাসও। অলকা বল্লে, ভাড়া বাড়ীতেও দু'বছর কেটে গেল। অনেক দুঃখের ভেতর দিয়েই দিন কাটছে। একবার মেয়ে স্কুলে একজন শিক্ষয়িত্রীর ছুটী নেওয়ার দরুণ তিন মাস কাজ পেয়েছিলুম, তারপর আর কোন স্কুলে কাজ পাই নি, টিউশানি করেই সংসার চলে। ভাই বোনের টিউশানিতে গড়ে মাসিক ত্রিশ পঁয়ত্রিশ টাকা উপার্জ্জন হয়, ছ'টাকা ঘরভাড়া দিয়ে বাকী যা থাকে তাইতেই সংসার চালাতে হয়। ভাইটা বিদ্যাসাগর কলেজে হাফফ্রিতে পড়ে, বাড়ীওয়ালাই এই হাফফ্রির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, আর আমি প্রাইভেটে বাংলায় এম. এ. দেব বলে মনে মনে চেষ্টা করছি কিন্তু বইপত্র পাই না। কি যে করি, কিছুই বুঝে উঠতে পাচ্ছি না। তবে এবার কোন রকমে কাব্যতীর্থের মধ্য পরীক্ষাটা পাশ করেছি। বি-এ কাব্যতীর্থ হলেও স্কুলে কাজ পাওয়ার একটা ভালো রকম আশা থাকে।

হালসীবাগানের চাকরীটা সেদিন অলকার ঠিক হয়ে গেল। রাস্তায় বেরিয়ে সে খপ করে আমার হাতটা চেপে ধরে বল্লে, সত্যি বলছি অসীমবাবু, কুড়ি টাকা মাইনের টিউশনি আমি এ পর্য্যন্ত একটাও পাই নি। সে আমলে টিউশানির বাজার এমনই ছিল।

এর পর ওদের বাড়ী আরও কয়েক দিন গিয়েছি। অলকার বিরুদ্ধে আমার যে বিরূপ মনোভাব ছিল, তা এখন একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, ওকে এখন সত্যিই বন্ধু বলে নিয়েছি এবং বেশ সহজ ভাবেই এখন উভয়ে উভয়কে তুমি বলতে শুরু করেছি। মায়ের সামনে 'তুমি' এবং আড়ালে 'আপনি' এই লুকোচুরি ভাবটা এখন কেটে গেছে।

কিন্তু আলো-আঁধারী ভাব একটা আছে; ওর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি? বন্ধু? ছি ছি। মেয়েছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, ভাবতেও যেন মনটা কেমন বিষিয়ে ওঠে। সে আমলে যে-সংসারে আমি মানুষ হয়েছিলুম, সে সংসারের চিন্তাধারায় নরনারীর বন্ধুত্ব ছিল সম্পূর্ণ অভাবনীয়। বোন? কিন্তু পাতানো বোন বলতে মনটা যেন কেমন ফাঁকা ফাঁকা হয়ে যায়। প্রেম? ছিঃ, শরৎবাবু বঙ্কিমবাবুর বইগুলো সমস্তই পড়া হয়ে গিয়েছিল। বইয়ের প্রেম বেশ ভালই লাগত, কিন্তু জলজ্যান্ত এক জোড়া নরনারীর প্রেম, এ ভাবতে মনটা বিষিয়ে উঠত। এক কথায় মিলেছে

চরিত্রহীন এবং ঘৃণ্য বলে মনে হোত। ভয় হোত এই বলে যে, ও যদি কোনদিন আমার এই অযথা মনোবৃত্তির কথা টের পেয়ে যায়, তাহলে হয়ত আর আমার মুখ দেখতেও চাইবে না। এবং হয়ত বা আমার দেওয়া টিউশানিটা ছেড়ে দিতেও দ্বিধা করবে না।

মাসকাবারের পর প্রথম রবিবার। অলকা বল্লে অসীম, চল ভাই, আজ একটু বেড়িয়ে আসি।

বল্লুম, কোথায় ?

সে বল্লে অনেক দূরে, চল বোটানিক্যাল গার্ডেন-এ বেড়াতে যাই। বাস ভাড়া আমি দেব। আমি বল্লুম, কেন ? তুমি সব ভাড়া দেবে কেন ?

সে বল্লো বারে, কেন দেব না ? এ মাসে দুই ভাই বোনে বাষট্টি টাকা রোজগার করেছি। আমরা এখন বড়লোক, বলেই সে হেসে উঠলো।

ওর সঙ্গে অতদূর যেতে কেমন যেন বাধো-বাধো লাগছিল। তবুও গেলুম। এক সঙ্গে সারাদিন ঘুরবো, একথা ভাবতেও মনে মনে বেশ আরাম পাচ্ছিলুম।

বোটানিক্যাল গার্ডেনে কোন বেঞ্চিতে না বসে ঝোপের তলায় জলের ধারে গিয়ে বসলুম। অলকাই নিরিবিলি জায়গাটায় খুঁজে নিয়ে গেল।

অলকার ব্যবস্থা বেশ ভালো। ঘাসের ওপরে বসবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে সে তার জামার ভেতর থেকে একটা খবরের কাগজ বার করে পেতে বল্লে, এইটার ওপরে বোসো, নইলে কাপড়ে ধূলো লাগবে।

বল্লুম, আর কাগজ আছে, তুমি বসবে কিসে ?

সে বল্লে, ঐটেতেই হবে, একটু সরে সরে বসলেই হবে।

বল্লুম কাগজটাকে ছেঁড় না কেন ?

সে বল্লে, না, গোটা কাগজটাই আমার চাই।

বল্লুম, বাড়ীতে গিয়ে তোমাকে দুখানা কাগজ দেব।

সে বল্লে, না গো মশাই না অত দাতাকর্ণ হয়ে কাগজ দান করতে হবে না। তুমি বোসো ত! বলে এক রকম জোর করেই আমাকে বসিয়ে আমার গায়ে গা ঠেকিয়ে বসে পড়ল।

ভালোই লাগল কিন্তু কেমন যেন সংকোচ হয়। পাশে বসে সে বল্লে, আচ্ছা অসীম, এম. এ. বাংলার বইপত্র কিছু জোগাড় করতে পারবে ?

ভেবে চিন্তে বল্লুম বোধ হয় পারবো। আমার এক বন্ধু বাংলায় এম. এ. পরীক্ষা দিয়েছে, তার পাশের খবর বেরুলে হয়ত তার বইগুলো আনতে পারবো।

সে বল্লে, গুড, বইগুলো সমস্ত পেলে ভারী সুবিধে হয়। তা এক কাজ কর না কেন তুমিও বাংলায় এম. এ. দেবার জন্য তৈরী হও, ডবল এম. এ. হবে তুমি। আমরা দুজনেই একসঙ্গে বাংলায় এম. এ. দেব।

বল্লুম, দিলেও হয়। তবে ল'টা পড়ছি, তার সঙ্গে আবার এম. এ.-র পড়া।

সে বল্লে বেশীর ভাগ ছেলেই ত একসঙ্গে এম. এ. ল' পড়ে। এস, তোমার বন্ধুর বইগুলো নিয়ে একসঙ্গে দুজনেই এম. এ.-র জন্য তৈরী হই।

আরও দু'চার কথা কইতে কইতে হঠাৎ সে আমার হাতটা টেনে তার নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে রইল।

লজ্জা, সঙ্কোচ, পুলক ও অস্বস্তিতে মনটা ভরে উঠল, কিন্তু এত ভালো লাগল, যে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আবার আশে-পাশে ভয়ে ভয়ে দেখতে লাগলুম, পাছে কেউ কোথাও দেখে ফেলে। সে কিন্তু নির্বিকার।

নীরবতা ভঙ্গ করে সেই কথা কইলে, বল্লে, অসীম, তুমি আমায় ভালবাস, নয় ?

আমি নীরবে তার হাতে অল্প একটু চাপ দিলুম।

সে বল্লে, এই দেখ, তুমি আমার জন্য কষ্ট করে অমন ভালো একটা টিউশানি জোগাড় করে দিয়েছ, এম-এ-র বই জোগাড় করবে, এমন কি আমার সঙ্গে পড়তে পর্য্যন্ত রাজী হয়ে গেলে, কিন্তু—কিন্তু—

কিন্তু কি অলকা ? আমার গলাটা যেন ধরে গেছে।

কিন্তু আমার ওপোর তোমার কি একটুও দাবী নেই ?

ভয়ে ভয়ে বল্লুম দাবী ? তোমার ওপোর কি দাবী অলকা ?

যে দাবী সব ছেলেই করে, বলেই অলকা মুখ নিচু করে নিলে।

বোধ হয় যেন কিছু বুঝলুম, আবার মনে হোল, হয়ত বুঝি নি। মুখে বল্লুম, কি দাবী ?

বোকা! বলেই রাগ করে সে আমার হাত ছেড়ে দিলে। মনে হোল, তার এই রাগটা কৃত্রিম নয়, কারণ সে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল।

বল্লুম রাগ করছ কেন অলকা, আমি কি কিছু অন্যায় বলেছি ?

সে বল্লে তবে কি আমি শুধু নিয়েই যাব, ঋণ শোধ করতে পারব না ?

এর উত্তর যে কি হবে বুঝতে না পেরে নিরুত্তর রইলুম।

একটু চুপ করে থেকে সে বল্লে, আমি কিচ্ছু চাই না, আমার জন্য বই-টই কিচ্ছু জোগাড় করতে হবে না।

ভয়ে ভয়ে বল্লুম, রাগ করছ কেন অলকা, আমি কি বই জোগাড় করে দেব না বলেছি ?

সে বল্লে, তা হবে না ; তুমি খালি দিয়েই যাবে আর নেবে না কিচ্ছু, তা হবে না, তুমি যদি না নাও তাহলে আমিও আর কিছুই নেব না।

মরিয়া হয়ে বল্লুম বেশ, কি দিতে চাও, দাও, তুমি যা দেবে, আমি তাই নেব।

সে বল্লে, আমি কিছুই দেব না, তুমি নিজে জোর করে কেড়ে নাও। আমাকে নিয়ে তোমার যা খুসি তাই কর।

এর পরে সত্যি আমার বড় ভয় করতে লাগল। কোন কথা না বলে চুপ করে বসে রইলুম।

ধীরে ধীরে আমার হাতটি নিজের হাতে তুলে নিয়ে সে বল্লে, ছেলে বুড়ো যেই কাছে এসেছে, সেই এতটুকু উপকার করে কিম্বা না করেই ষোলআনা দখল নিতে চেয়েছে। প্রথম প্রথম ভয় হোত, নিজের ওপোর দারুণ ঘৃণা হোত, তারপর দেখলুম এই রীতি। তখন নিজেকে একেবারে বিলিয়ে দিলুম। কত লোকেই আমার উপকার করে, কিন্তু আমার ত দেবার কিছুই নেই, তাই লোকে যা চায় তাই দিয়েই আমি তৃপ্তি পাই। প্রথম প্রথম যার যা সম্বল আছে তারই বিনিময়ে সে তার চাহিদা কিনে নিক, ভিক্ষে নেবে কেন ?

কথাটা ক্রমে ক্রমে যত স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল, ততই আমার মনের একটা অংশ আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেও অপর অংশটা নিরেট হয়ে, গম্ভীর হয়ে, পাশের বসে থাকা মেয়েটাকে ঘৃণিত পশু মনে করে তার সঙ্গ অচিরাৎ পরিত্যাগ করার জন্য কৃতসংকল্প হয়ে উঠতে লাগল। তারপর আরও দু' একটা রূঢ় বাস্তব তার মুখ থেকে বেরুতেই সবেগে দাঁড়িয়ে উঠে বল্লুম, তাই যদি তোমার বিশ্বাস হয়ে থাকে, তাহলে সন্ধ্যের পর বিড়ি ধরিয়ে গ্যাস পোষ্টের তলায় গিয়ে দাঁড়াও গে, ভদ্রলোকের ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে এসো না।

সে অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে হতভম্বের মত বসেই রইল, আর আমি তার দিকে পেছন ফিরে জোর পায়ে হাঁটা দিলুম।

আজ এই পঞ্চাশ বছর বয়সে কেবলই মনে হয় বাইশ বছরের সেই আমি কি বোকাই ছিলুম! তারুণ্যের সংযম ও তেজ বুড়োদের চাইতে বহু বহু গুণে প্রবল ও পবিত্র। যখন তথাকথিত উপকারীর দল অলকার কাছে দাবী জানিয়েছিল তখন সে ছিল যুবতী এবং যুবতী অলকা প্রবলভাবে আপত্তি জানিয়ে আত্মহত্যা করতেও চেষ্টা করেছিল, কিন্তু দারিদ্র্য ও বিরুদ্ধ পরিবেশে অলকা যখন আমাকে বন্ধু বলেছে, তখন সে জন্মের সন তারিখ দিয়ে আমার সমবয়সী হলেও বোধ হয় যেন ত্রিকেলে বুড়ী হয়েই গিয়েছিল! আর আমি বেশী বয়সে যখন আমার তেমন কোন অভাব বা দারিদ্র্য আর ছিল না, তখনই কক্ষচ্যুত হয়েছিলুম, ইচ্ছে করে এবং স্বজ্ঞানে।

পাঁচ সাত দিন পরে সন্ধ্যার পর অলকার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে বোধ হয় আমাদের বাড়ীর পথে আমার জন্যই অপেক্ষা করে দাঁড়িয়েছিল। দেখা মাত্রই পাশ দিয়ে চলতে সুরু করে সে বল্লে, আর রেগে থাকতে হবে না, বাড়ীতে এসো।

আমি তার মুখের দিকে না দেখে এবং কোন উত্তর না দিয়েই নিজেদের বাড়ীতে এসে ঢুকেছিলুম। মনে আছে, বোধ হয় ছ'মাস কি এক বছর ধরে নিজেকে নিজে কশাঘাত করে জর্জ্জরিত করেছি। ল' পরীক্ষা দিতে পারি নি, এবং একসঙ্গে যেমনই দুটো চাকরীর নিয়োগপত্র পেয়েছিলুম, সঙ্গে সঙ্গে বিদেশে যাওয়ার চাকরীটা বাবা এবং পিসিমার তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও গ্রহণ করে কলকাতা ছেড়ে যেন পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিলুম।

তারপর দীর্ঘ আটাশ বছর পার হয়ে গেছে। চাকরীতে উন্নতি করেছি। নাম যশঃ পেয়েছি আশাতীত ভাবে। মফঃস্বলের যে শহরটিতে এখন বহাল হয়েছি, সেখানকার মেয়ে ও ছেলেদের দুটি হাই স্কুলেই প্রেসিডেন্ট হয়েছি। নিজের ছেলে-মেয়েরাও বেশ বড় হয়েছে। সেই সঙ্গে প্রথম রিপুঘটিত কিছু দুর্নামও যে চুপিসাড়ে লোকে করে না তা নয়।

শনিবার বিকাল আড়াইটায় সময় নিজের বাংলোয় বসে আছি। মেয়ে স্কুলের দারোয়ান হেড্ মিস্ট্রেসের চিঠি নিয়ে এল। হেড্ মিস্ট্রেস লিখছেন, আজ দুপুরে স্কুল পরিদর্শন হয়ে গেল; কিন্তু স্কুল পরিদর্শিকা প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে স্কুল সম্বন্ধে কিছু কথা কইতে চান। দুপুরে সেক্রেটারীর সঙ্গে কথা হয়েছে, এবং বিকেলে প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে কথা কইতে ইচ্ছুক। হেড্ মিস্ট্রেস তাঁকে আমার বাড়ীতে চায়ের নিমন্ত্রণ করে ডেকে আনবেন, কিম্বা আমি তাঁর ডাকবাংলোয় গিয়ে দেখা করবো, সেই কথাই হেডমিস্ট্রেস জানতে চেয়েছেন। চিঠি পড়ে মনে মনে ঠিক করলুম, চায়ের নিমন্ত্রণ নয়, আমার নিজেরই উচিত, ডাকবাংলোয় গিয়ে ইনসপেক্‌ট্রেসকে রাত্রের ডিনারে নিমন্ত্রণ করা এবং সেই সঙ্গে হেডমিস্ট্রেস ও সেক্রেটারীকেও নিমন্ত্রণ করা উচিত।

সাড়ে তিনটার সময় ডাকবাংলোয় এসে উপস্থিত হলুম। একাই গাড়ী নিয়ে এসেছি। আমাকে দেখেই ডাকবাংলোর চাপরাশী শশব্যস্ত হয়ে আমাকে ঘরে বসিয়ে ইনসপেক্‌ট্রেসকে খবর দিলে।

ইনসপেক্‌ট্রেস এলেন। দড়ির মত পাকানো চেহারা, মুখের হাড়গুলো উঁচু উঁচু, উজ্জ্বল দুই অস্বাভাবিক চোখ, হাতের সবুজ শিরাগুলো অত্যন্ত প্রকট। পুতুলনাচের তাড়কা রাক্ষসী দীর্ঘকাল ম্যালেরিয়ায় ভুগলে যে রকম চেহারা হতে পারে, বর্ত্তমানের ইনস্‌পেক্‌ট্রেসটি ঠিক সেই রকম। চেহারা দেখে মনে মনে ঘৃণাই হোল, ভাবলুম ডাকবাংলোয় না এসে ডেকে পাঠালেই ছিল ভালো।

দু'হাত তুলে নমস্কার করে সামনের চেয়ারে বসতে বসতে তিনি বল্লেন, আপনি আবার কষ্ট করে এলেন কেন, আমিই ত আপনার বাংলোয় যেতে পারতুম।

মনের ভাব গোপন করে বল্লুম, আপনাকে ত যেতেই হবে, আমাদের মুল্লুকে এসে কি শুধু মুখে ফিরতে পারবেন না কি, কিন্তু স্কুলের ব্যাপার কি রকম দেখলেন বলুন ত?

তিনি বল্লেন, দেখলুম ত ভালোই, তবে প্রেসিডেণ্টের নামটা শুনে তাঁর সঙ্গে দেখা করার লোভ সংবরণ করতে পারলুম না। দেখবেন, আবার যেন রাগ করে বসবেন না।

মানে? সন্দিগ্ধভাবে তার দিকে চাইতে লাগলুম।

ম্লান হাসি হেসে সে বল্লে, চিনতে পারলে না, আমি অলকা।

অবাক হয়ে মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। এমন নীরস ও এত লালিত্যহীন চেহারাও কি মানুষের হয়! বিশেষ সেই অলকার? রং ওর ফর্সা ছিল না বটে, কিন্তু লালিত্যই ছিল বিশেষত্ব।

তেমনি হাসি মুখেই সে বল্লে, বিশ্বাস হচ্ছে না?

ঘাড়্‌নেড়ে বল্লুম, ঠিক নয়, তবে বুঝতে পারছি বটে। তা কেমন আছ? মা ভাইয়ের খবর কি?

সে বল্লে, ভালই আছি। মা নেই, ভাই উকীল না হলেও ভালো চাকরীই করে, বিয়ে-থাওয়া করে সংসারীও হয়েছে, কিন্তু মা এসব কিছুই দেখে যেতে পারেন নি।

বল্লুম, তোমার খবর কি? মাথায় ত সিঁদুর দেখছি না, তা সিঁদুর কি একেবারেই পড়ে নি, না পড়ার পর—

সে বল্লে, না, সিঁদুর একেবারেই পড়ে নি। নিজেকে পাঁচজনের এঁটো বলে মনে হ'ল, তাই কোন ভদ্রলোকের পাতে এই অখাদ্যটা আর তুলে দিই নি। ঘাড় হেঁট করে বল্লে, ভদ্রলোকও ত আর একটাও কোথাও দেখলুম না।

এলোমেলোভাবে পুরানো কথা মনে পড়তে লাগল। আমাকে নীরব দেখে খুব ধীরে ধীরে সে বলতে লাগল; বল্লে, দেখ অসীম, সেই ছেলেবেলায় পাঁচটা লোভী ছেলের সংস্রবে এসে যখন আমার হিন্দুত্বের সংস্কারকে ভেঙ্গে আমি বর্ত্তমানের বাস্তবকেই সত্য বলে মেনে নিয়েছিলুম, সেই সময় তুমি তোমার উগ্রতাকে দিয়ে এমন করে আমাকে ঘা দিয়েছিলে যে, তদবধি কেবল প্রায়শ্চিত্তই করে যাচ্ছি। আজ এই দীর্ঘকাল পরে যখন সুযোগ পেলুম, তখন তোমার সঙ্গে দেখা করলুম শুধু এইটুকু বলার জন্য যে, এ জীবনটা যদি প্রায়শ্চিত্ত করেই কাটাই তাহলে পরজন্মে তোমার কমার পাত্রী হতে পারব কি?

আমার মুখের দিকে এক মিনিট চেয়ে থেকে বল্লে, চট্‌পট্ উত্তর দাও, এখনই আর একজনের আসার কথাআছে।

অবাক হয়ে গেলুম। বাইশ-বছরের-আমি যে আর নেই, সে কথা কেমন করে এই উগ্র তপস্বিনী শুষ্ক নীরস নারীকে আজ পঞ্চাশ বছরে বোঝাব? তখন বুঝলুম, আটাশ বছরের নির্ম্মম উপবাসে সেদিনের লালিত্যময়ী অলক তিলে তিলে কেমন ভাবে নিঃশেষিত হয়ে এসেছে। কিন্তু যে আদর্শ দেখে তার এই কঠোর সাধনা, সেই অসীম নিজেই আজ আদর্শচ্যুত; অথবা সে আর পূর্ব্বের আদর্শকে আজ আদর্শ বলে মনেই করে না।

আমাকে পূর্ব্ববৎ নীরব দেখে সে আর একবার অধৈর্য্য হয়ে বল্লে, চট্ করে উত্তর দাও, নইলে অন্য কেউ এখনই এসে পড়তে পারে।

তার আকৃতি ও একাগ্রতায় মনে মনে সত্যিই লজ্জিত হয়েছিলুম। কিন্তু পরিণতবয়স্কের অভিনয়নৈপুণ্য নিয়ে ধীর গম্ভীর স্বরে বল্লুম, তোমার সাধনা এই জন্মেই সার্থক হয়ে গেছে অলকা, কিন্তু যার কাছে থেকে সিদ্ধি প্রার্থনা করছ, তার হাতে সেই সিদ্ধি এখন আর নেই। কাজেই আর এক জন্ম অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য উপায় আর নেই।

আমার কথাগুলোর মানে সে কি বুঝল জানি না, কিন্তু হঠাৎ গলায় আঁচল দিয়ে হেঁট হয়ে আমার পায়ের ধূলো নিলে। দেখলাম, তার কোটরগত চোখ জলে টলটল্ করছে।

শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

—১০—

ধনুষ্কোটিতে স্নান মাত্র রামচন্দ্র দেখলেন রাবণ বধের পাপজনিত তাঁর শরীরের দ্বিতীয় ছায়াটি অন্তর্হিত।

বিস্মিত হলেন রাঘব।

তাঁর বিস্ময় উৎসাদনে আবির্ভূত হলেন বালখিল্য মুনিগণ। তাঁরা বললেন : এই পূত-বেলাভূমি মৈনাকের অংশ। পবিত্র এই স্থল খণ্ডের অঙ্গস্পর্শে এখানের জলধি মহাতীর্থ।

শ্রীরামচন্দ্র পবিত্র মৈনাককে চিহ্নিত করে রেখে গেলেন দেবাদিদেবের আরাধনা ক্ষেত্র হিসাবে; সেতু মূল ধনুষ্কোটি হতে কিছুদূরে একটি লিঙ্গমূর্তির প্রতিষ্ঠা করে।

রামচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত মহেশ্বরের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র বলে, তখন হতে, মৈনাকের নাম হলো রামেশ্বরম্। তমিল্ ভাষায় ইরামেশ্বরম্। তামিল্ লিপিতে আদ্য অক্ষর 'র'-বিশিষ্ট কোনও শব্দ লিখতে হলে 'র'-এর পূর্বে 'ই' বসে।

ধনুষ্কোটি থেকে পাম্বন্ হয়ে বিকেল চারটেয় পৌঁছলাম রামেশ্বরম্।

স্টেশন হতে দেবস্থান যাওয়ার ব্যবস্থা হিসাবে আছে ঘোড়ার গাড়ী। ছই দেওয়া গরুর গাড়ীর মত দেখতে। শুধু গরুর বদলে ঘোড়ায় টানে এই যা তফাৎ।

গাড়ীর চালকরা প্রত্যেকেই কিছু কিছু হিন্দী জানে। রামেশ্বরম্-এর অধিকাংশ তমিল্ বাসিন্দারই হিন্দী এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনেকেরই দু'চারটি বাংলা কথা জানা আছে। অবশ্যই তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে শেখা।

গণ্ডগ্রামের মত হলেও রামেশ্বরম্‌কে শহর বলাই উচিত। কারণ, বিদ্যুৎ ও জল সরবরাহের ব্যবস্থা রয়েছে।

মন্দিরের কাছেই লোকালয়। ঘোড়ার গাড়ী থেকে নামতেই একটা দমকা বাতাস গায়ে কিছু বালি ছুঁড়ে দিয়ে আমায় অভ্যর্থনা জানালো। যেন বলে গেলো— এই বালিতে শ্রীরামের পদ-রেণু আছে, আছে আচার্য শঙ্করের চরণ-স্পর্শ।

দেবস্থানের পশ্চিম দিকে, ওয়েস্ট্ স্ট্রীট্-এর এক লজিঙ্ হাউস্-এ রাত্রি যাপন স্থির হলো।

দেবালয় সেখান থেকে আন্দাজ আধ ফার্লঙ্ দূরে।

রামেশ্বরম্ দ্বীপটি ছিল রামনাড়ু বা রামনাথপুরম্ রাজগণের রাজ্যভুক্ত।

রামনাথপুরম্-এর রাজাদের উপাধি সেতুপতি। প্রবাদ আছে যে রামচন্দ্র নিষাদ গুহকের এক বংশধরকে এই সেতুর রক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। সেই রক্ষকের উত্তর-

পুরুষরাই রামনাথপুরম্-এর ক্ষেত্রস্বামী ছিলেন এবং চিরকাল সেতুপতি উপাধিটি ব্যবহার করে গেছেন।

সেতুপতিরা তমিল্ ভাষায় ম'র্ব'র্ (মরওঅর্) অর্থাৎ যোদ্ধা বলে উক্ত। মর'বর্ শব্দটির অন্য অর্থ—মরুবাসী। রাজস্থানের মারবারী (মারওয়ারী) সম্প্রদায়ের নামটির সঙ্গে তমিল্ মর২বর্ (মারতঅর্) কথাটির ধ্বনি ও অর্থগত সাদৃশ্য দেখা যায়। শেষোক্ত শব্দটির অর্থ মরুবাসী। সিংহলেও এই মর'ব'র্দের অস্তিত্ব আছে শুনেছি। রাজস্থানে বিবাহ হয়েছিল সিংহলদুহিতা পদ্মিনীর।

রামনাড়ুর মর২বর্ বংশীয়রা দেবতার পূজায় সুরা ও মাংসের উপচার নিবেদন করতেন। রাজস্থানের 'মারবারী' রাজকুলের মধ্যেও উপাস্য দেবতাকে অনুরূপ বীরাচারী প্রথায় মাংস, সুরা ইত্যাদি নিবেদনের প্রথা ছিল।

এই সাদৃশ্য হতে মনে হয় যে রামনাথপুরম্-এর সেতুপতিরা উত্তর-পশ্চিম ভারতের মরু অঞ্চল থেকেই এসেছিলেন। মতান্তরে প্রকাশ, মর২বর্রা রামচন্দ্রের সঙ্গে লঙ্কা হতে এসেছিলেন।

মথুরৈ-এর নায়করাজকুল একসময় রামেশ্বরম্ পর্যন্ত নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করেন এবং রামনাথপুরম্-এর সেতুপতিরা তাঁদের অধীন হন।

বহুকাল পরে, বীরাপ্পা নায়কের রাজত্ব কালে, একবার মুসলমান আক্রমণকারীদের প্রতিহত করার ব্যাপারে রামনাথপুরম্-এর তৎকালীন সেতুপতি, বীরাপ্পাকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। নায়করাজ কৃতজ্ঞতাবশতঃ মথুরৈ-এর পূর্ব-দক্ষিণ হতে সেতু পর্যন্ত ভূ-ভাগ উক্ত সেতুপতিকে দান করেন।

সেতুপতিরা রামেশ্বরের বর্তমান মন্দিরটির প্রভূত উন্নতি সাধন করে গেছেন।

মন্দিরের পশ্চিম গোপুরম্টির মধ্য দিয়েই মুখ্য প্রবেশ পথ। গোপুরম্টি ৭৫ ফিট্ উঁচু। রামায়ণের নানা উপাখ্যানের পাষাণ প্রতিকৃতিতে শোভিত।

বিগ্রহ ছাড়া মন্দিরের প্রধান আকর্ষণ এর দালানগুলি। দালানগুলির মধ্যে আছে একটি বহুস্তম্ভশোভিত অলিন্দ। অলিন্দ ও দালানের দৈর্ঘ্য প্রায় চার হাজার ফিট্। এত দীর্ঘ দালান ভারতের আর কোথাও নেই।

বিশেষজ্ঞদের মতে অলিন্দগুলির নির্মাণ শৈলী প্রাচীন

রামেশ্বরম্ মন্দিরের দালান—রামেশ্বরম্

মিশরের থিবিস্ নগরীর রেমেসিস্ মন্দিরের সদৃশ। সম্ভবতঃ আরব বণিকদের সঙ্গে আসা স্থপতিদের মন্দিরটির নির্মাণে নিয়োগ করা হয়েছিল।

অলিন্দের ছাদে আছে রঙীণ চিত্রণ। পণ্ডিতদের মতে ঐ ছবিগুলিতেও অতি প্রাচীন মিশরীয় চিত্রকলার সাদৃশ্য বর্তমান। বহুবার মন্দিরের সংস্কার হলেও সংরক্ষণ-ধর্মী ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের নির্দেশে ঐ সুপ্রাচীন চিত্রগুলি একই রূপে অনুকৃত হয়ে এসেছে। ফলে, চিত্রগুলি হতে মন্দিরের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে অনুমান করা সম্ভব হয়। অলিন্দের স্তম্ভগুলি গৈরিক ও পীতবর্ণের আলিম্পন শোভিত।

কয়েকটি স্তম্ভে শুঁড়ওলা সিংহের এক অদ্ভুত মূর্তি সংযোজিত। দ্রাবিড়ভূমির অনেক মন্দিরে এই মূর্তিটি দেখা যায়। জীবটি 'যালি' নামে অভিহিত।

সর্বাধিক সমর্থিত মতে জানা যায় যে, বর্তমান মূল মন্দিরটি অর্থাৎ গর্ভগৃহটি লঙ্কাধিপতি পররাজ-শেখর নির্মাণ করেন।

রামচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত রামেশ্বর লিঙ্গ কালপ্রভাবে লুপ্ত হয়েছিল। বহু শতাব্দী পরে এক আর্য মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ, সেতুতীর্থ স্নানে এসে, বন মধ্যে একটি গাভীকে এক পরিত্যক্ত লিঙ্গমূর্তির উপর দুধ নিঃসরণ করতে দেখেন। তিনি জঙ্গলটি পরিষ্কার করিয়ে লিঙ্গমূর্তিটির পূজা করতে থাকেন।

লোকমুখে রামেশ্বর লিঙ্গোদ্ধারের কথা শুনে লঙ্কা-রাজ

পররাজ শেখর তাঁর রাজধানী কাণ্ডিতে পাথরের সুবিশাল গর্ভগৃহটি নির্মাণ করিয়ে জলপথে রামেশ্বরে আনেন ও লিঙ্গোপরি স্থাপন করেন।

মন্দিরের গোপুরম্, প্রাকার, অলিন্দ, হর্ম্যাদি পরবর্তী-কালে কয়েকজন সেতুপতিও মথুরৈ-এর নায়ক রাজাদের দ্বারা সংযোজিত হয়েছে।

রামেশ্বর লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে স্কন্দ পুরাণের সেতু-মাহাত্ম্য অধ্যায়ে বিশদ বিবরণ আছে :

সেতুমূলে স্নানের ফলে শ্রীরামচন্দ্রের দেহের বিভীষিকা-ছায়ায় বিলোপ ঘটলে, ঋষিগণ তাঁকে পবিত্র মৈনাক স্থল-খণ্ডে শিব প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দিলেন। রাম হনুমানকে লিঙ্গ আহরণের জন্য পাঠালেন কৈলাসে। হনুমানের ফিরতে অত্যন্ত দেরী হতে থাকায় দেব প্রতিষ্ঠার শুভ মুহূর্ত অতিক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলো। ঋষিরা তখন বললেন, সীতা ক্রীড়াচ্ছলে বালুকাময় যে শিবলিঙ্গটি রচনা করেছেন সেই মূর্তিটিই প্রতিষ্ঠা করা হোক। তদনুসারে, জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা দশমীতে, বালুকা মূর্তিটিই রামচন্দ্র কর্তৃক রামেশ্বর শিব নামে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

রামরূপী ভগবান বিষ্ণু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, রামেশ্বর হলেন দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম।

গোপুরম্, প্রাকার ও অলিন্দ পার হয়ে পৌঁছলাম গর্ভগৃহের দ্বারে। দ্বারটি রেলিঙ্ দিয়ে ঘেরা। রেলিঙ্-এর বাইরে হতে দেবদর্শন নির্দিষ্ট। ব্রাহ্মণ ছাড়া কারও গর্ভ গৃহে প্রবেশাধিকার নেই।

উত্তর ভারতীয়দের মধ্যে একমাত্র মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণরাই ওই অধিকার পান। যেহেতু তাঁদেরই একজন গুপ্ত লিঙ্গ মূর্তিটির পুনরুদ্ধার করেছিলেন।

দর্শন হলো রামেশ্বরের।

বালুকাদেহী দেবতা নানা অনুলেপনের ফলে শিলাবৎ আকৃতি সম্পন্ন হয়ে উঠেছেন।

এক ব্রাহ্মণ চেঁচিয়ে আবৃত্তি করে উঠলেন :

সীতয়া স্থাপিতে লিঙ্গে রামচন্দ্রেণ পূজিতে
তস্য দর্শন মাত্রেণ পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥

উত্তর-প্রদেশাগত কয়েকজন দর্শনার্থী বারাণসী হতে গঙ্গা জল এনেছিলেন। ঈশ্বরের স্নানের জন্য নিবেদন করলেন জলপূর্ণ আধারগুলি।

রামেশ্বরের একটি সুবর্ণময় ভোগমূর্তি আছেন। মনুষ্যাকৃতি ঐ মূর্তিটি শোভাযাত্রাদিতে অংশ গ্রহণ করেন।

প্রতি রাতে মূর্তিটিকে রামেশ্বরের গর্ভগৃহের দক্ষিণে, পার্বতীর কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়।

মহেশ্বরকে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁর অর্ধস্বরূপিণী দর্শনে,—নিয়ে যাওয়া হয় মিলনের জন্য!

হিন্দুর ঈশ্বর বাল-গোপালরূপে বাৎসল্য রসে সিক্তিত হন,—প্রেমিক যুবা কৃষ্ণ হয়ে নন্দিত ও নিন্দিত হন। প্রণয়িনী উমার ভূমিকায় প্রেমাস্পদের জন্য তপস্যা করেন। ঈশ্বরেরও মানুষেরই অনুরূপ আহার-বিহার, মিলন-বিরহ, বিবাহ এবং সন্তান লাভ ঘটে।

ঈশ্বরকে এতই নিকট করে, একান্ত করে, হিন্দুর ধর্ম ভাবতে পারে!

ঈশ্বরকে মনুষ্যরূপে গ্রহণ করেছে বলেই তো মনুষ্যকেও ঈশ্বররূপে গ্রহণ তা'র পক্ষে সহজতর। ব্রহ্ম তা'র জীব-রূপে প্রকট। তাই জীবও তা'র 'ব্রহ্মৈব কেবলম্'।

মন্দির মধ্যে সূর্য, চন্দ্র, বিনায়ক, এবং সুব্রহ্মণ্যম্-এর মূর্তি বিদ্যমান। পূর্বদিকে শতক্রতু, অগ্নিকোণে অগ্নি, দক্ষিণে যম, নৈর্ঋতে নির্ঋতি, পশ্চিমে বরুণ, বায়ুকোণে পবন এবং উত্তরে কুবের রামেশ্বরের সেবকরূপে অবস্থান করছেন। ঈশান কোণে স্বয়ং মহাদেব বিরাজমান।

যুবলক্ষণ কাল—রামেশ্বরম্

যাত্রী রামেশ্বর দর্শন করেন। শিবরাত্রি, শিব-বিবাহ ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ পার্বণে, উৎসবে, দর্শকের সংখ্যা হয় অগণিত।

যুগ যুগান্ত ধরে বহু পরিশ্রম ও ক্লেশ সহ্য করে, নানা বিপদ আপদ তুচ্ছ করে, ঈশ্বর-প্রেমী মানুষ ছুটে এসেছে—ছুটে আসছে—এই দেবালয়ে।

আচার্য শঙ্করের আশ্রম—রামেশ্বরম্

ছুটে এসেছে কয়েকবার আর এক জাতের মানুষ,—লুণ্ঠক। নবম শতাব্দীতে রামেশ্বর মন্দিরের সঞ্চিত ধন-সম্পদ অলঙ্কারাদি নিয়ে গেছে সিংহলী এক দস্যুদল। পরবর্তীকালে মুসলমান হানাদারেরা লুণ্ঠন করেছে এই মন্দির।

১১৭৩ খৃষ্টাব্দে সিংহলরাজ পরাক্রম, রামেশ্বরম্ অধিকার করে। মন্দিরের পূর্ব গোপুরম্-এর সংশ্লিষ্ট দালানটিতে আছে অঘোর বীরভদ্র এবং অগ্নি বীরভদ্রের মূর্তি।

আর আছে যুগ-লক্ষণের দুটি প্রতিকৃতি। প্রথমটিতে, একটি স্ত্রীলোক একজন পুরুষকে কাঁধে নিয়েছে। দ্বিতীয়টিতে, স্ত্রী মূর্তিটি পুরুষটির স্কন্ধারূঢ়া।

প্রথমটিতে ব্যক্ত হয়েছে অতীত যুগগুলিতে নারী ও পুরুষের সম্পর্ক। দ্বিতীয়টিতে, কলিযুগে নারী প্রবলারূপে চিহ্নিতা। তাই পুরুষ-বাহিনী!

মন্দিরের পূর্বপ্রাকারের বাইরে আচার্য শঙ্করের আশ্রম। অদূরে সমুদ্রতীরে নির্মিত হচ্ছে আচার্যের এক রমণীয় স্মৃতি-মণ্ডপ।

সীতা বছরই প্রতিদিন ন্যূনপক্ষে শতেক বহিরাগত আগমন করেন এবং বহু বৎসর যাবৎ স্থানটি স্বীয় অধিকারে রাখেন।

মন্দির ও দেবদর্শন করে লজিং হাউস্-এ ফিরতে বেলা দশটা বেজে গিয়েছিল।

আচার্য শঙ্করের স্মৃতিমণ্ডপ—রামেশ্বরম্

বারোটা দশের ট্রেন্-এ যেতে হবে পাম্বন্। সেখান থেকে ধনুষ্কোটি মাদ্রাজ বোট্-মেল্ ধরে তিরুশিরাপল্লী। তাড়াতাড়ি সব গুছিয়ে নিয়ে রওনা হলাম ষ্টেশনের দিকে।

রামেশ্বরম্-পাম্বন্ লোক্যাল্ প্যাসেঞ্জার অপেক্ষা করছিল।

গাড়ী ছাড়বার তখনও আধঘণ্টা বাকী থাকায় মালপত্র একটা কামরায় তুলে দিয়ে প্ল্যাট্‌ফর্ম-এ পায়চারি করতে লাগলাম।

প্ল্যাট্‌ফর্ম-এর এক প্রান্তে দুজন শ্বেতাঙ্গী বিদেশিনী একজন স্থানীয় যুবাকে কি একটা বোঝাতে চেষ্টা করছিলেন। দূর থেকে হলেও বুঝতে কষ্ট হল না যে, যুবকটি বুঝতে পারছেনা।

কৌতূহল হলো। ব্যাপারটা জানবার জন্য এগিয়ে গেলাম। আমি কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই মহিলা দুটি বিনয়ের সঙ্গে জানতে চাইলেন—ষ্টেশন হতে Cain ও Abel-এর সমাধি কত দূরে।

ঐ সমাধি দেখিওনি, ওর কথা শুনিওনি। তাই আমার অজ্ঞতা জানালাম।...

রামেশ্বরম্ ষ্টেশন হতে কিছু দূরে একটি মসজিদের মত ইমারতের মধ্যে নাকি দুটি অতি দীর্ঘাকার সমাধি আছে।

সেই সমাধি দুটিই Cain ও Abel-এর বলে কৃশ্চিয়ান্‌দের অনেকের ধারণা।

কিংবদন্তী আছে যে, Abelকে হত্যা করার পর Cain দৈবাদেশে Abel-এর মৃত দেহ কাঁধে বহে সারা পৃথিবী পরিভ্রমণ করতে থাকে।

দৈববাণীতে নির্দেশ থাকে,—যখন Cain-এর পাপ মুক্তি ঘটবে তখন সে তার ইঙ্গিত পাবে।

পথশ্রান্ত, ক্ষুৎ-পিপাসাক্লিষ্ট ও ব্যাধিতে জীর্ণ দেহ, Cain রামেশ্বরম্‌-এ পৌঁছে একটা তালগাছের নীচে বিশ্রাম করছিল। এমন সময়ে তার সুমুখে দুটো কাক ঝগড়া শুরু করলো এবং শেষ পর্যন্ত একটা অপরটাকে হত্যা করলো।

Cain বুঝতে পারলো এইটিই দৈববাণীতে উক্ত ইঙ্গিত। সে তখন Abelকে সমাধিস্থ করলো কাকটির মৃত্যুস্থলে। পরে নিজেও ঐ কবরের পাশে চিরনিদ্রায় মগ্ন হলো।

[ক্রমশঃ

ভালবাসা

অমিতাভ বসু

ভালোবাসার গৌরব থেকে আমি আজ বঞ্চিত।
হ'য়তো ভালোবাসা আমার মানায় না ;
নয়তো যাকেই ভালোবাসি সে হারিয়ে যায় কেন— ?
তোমাকে হারাতে চাইনে তাই ভালো বাস্‌বোনা।

তোমাকে কেবল দেখ্‌বো তোমাকে কেবলই দেখ্‌বো
মুখোমুখি বসে কথা বলে যাবো তাই ভালো ;
ভালোবাসি বলে কাছে টেনে নিয়ে আঘাতটা—
আজ যদি পাই সে ব্যথা আমার সইবে না।

তোমার নামের টিপ পরে এসো আমার কাছে
দুচোখে কাজল টান্‌ছো যেমন টেনে দিও ;
আর কিছু আমি চাইনে আজকে তোমার কাছে-
যদি পারো তবে এইটুকু দাবী মেনে নিও।

দাবীর মধ্যে যদি কিছু থাকে সুপ্ত—
তাই ভালোবাসা, কথার জটলা মুক্ত ॥

প্রতিবেশিনী

শ্রীঅখিল নিয়োগী

[উত্তর কল্‌কাতা অঞ্চলের একটি দু'কামরাযুক্ত ফ্ল্যাট। ওপরে বাড়ীওয়ালা নিজে থাকেন। একতলার ছোট ফ্ল্যাটটি ভাড়া পাওয়া যেতে কর্ত্তা-গিন্নি আর তার ছোট্ট মেয়ে মিলি মোট-ঘাট নিয়ে এসে হাজির। কর্ত্তার নাম হরগোবিন্দ আর গিন্নির নাম নেত্যকালী।]

হরগোবিন্দ। দেখেছ গিন্নি,—একেই বলে বরাত। কেমন ছিম্‌ছাম্ ছোট্ট ফ্ল্যাটটি পেয়ে গেছি।

নেত্যকালী। তাই ত! দু'খানা ঘর হলে কি হবে? দিব্যি আলো-হাওয়া আছে। উঠোনের একদিকে আবার সুন্দর একটি রোয়াক রয়েছে!

মিলি। মা, আমি ওখানে আমার খেলাঘর সাজাবো। তুমি যেন আবার ঘুঁটের বস্তাটা ওইখানে চাপিয়ে দিও না!

নেত্যকালী। তুই ত' আমার ঘুঁটের বস্তাটাই শুধু দেখিস্! দু'বেলা গিল্‌তে হবে না সবাইকে?

হরগোবিন্দ। আহা! সকাল বেলাই আবার ওকে নিয়ে কেন? ছেলেমানুষ—আমাদের একমাত্র মেয়ে—ওর কি সাধ-আহ্লাদ থাকতে নেই? না হয় একটা খেলা-ঘর সাজাতে চেয়েছে—

নেত্যকালী। ওই ত! আদর দিয়ে দিয়ে তুমিই মেয়েটার মাথা খাচ্ছ। একদিন মেয়েকে শশুরঘর করতে হবে না?

হরগোবিন্দ। আহা! তখন না হয় খেলাঘর ভেঙে দিয়ে ঘুঁটের বস্তা সার করবে। কিন্তু তার অনেক দেরী! তুমি তোমার সংসার গুছিয়ে-গাছিয়ে নাও। আমি চট্ করে বাজারটা সেরে আসি—? অফিস কামাই দিলে ত' আর চল্‌বে না! যে জাঁদরেল বড়বাবু আমাদের—

[দ্রুত প্রস্থান

• [একটি বর্ষীয়সী মহিলার প্রবেশ। পাড়ার কৈবল্য-মাসি]

কৈবল্যমাসি। তোমরা আজ নতুন এলে বুঝি বাছা আমার নাম কৈবল্যদায়িনী। পাড়ার সবাই আমাকে কৈবল্যমাসি বলে ডাকে।

নেত্যকালী। তা' আসুন কৈবল্যমাসি,—আপনি আমারও মাসি হলেন।

কৈবল্যমাসি। সে ত' হলামই বাছা! কিন্তু তোমার নামটা?

নেত্যকালী। আমার নাম নেত্যকালী—

কৈবল্যমাসি। বেশ বেশ! এ বুঝি তোমার কর্ত্তার দেয়া নাম? তা' সকালবেলা ঠাকুর দেবতার নাম নেয়া খুব ভালো—

নেত্যকালী। না—না, এ নাম দিয়েছিলেন আমার দিদিমা, তিনি নিত্য কালীপূজা করতেন কিনা! তাই সাধ করে এই নামটি রেখেছিলেন।

কৈবল্যমাসি। বেশ! বেশ! খুব ভালো কথা এখন ওই নাম রোজ নিয়ে তোমার কর্ত্তারও পুণ্যি হচ্ছে। তুমি এই কালী নামটি ছেড়োনা বাছা—

নেত্যকালী। [লজ্জা পেয়ে] কি যে আপনি বলেন মাসিমা—

কৈবল্যমাসি। [শুধরে দিয়ে] কৈবল্যমাসি—

নেত্যকালী। হ্যাঁ—হ্যাঁ, কৈবল্যমাসি—

কৈবল্যমাসি। তা বাছা নেত্যকালী, তুমি এসেই উনুনটা নিয়ে টানাটানি সুরু করেছ কেন? এবেলা না হয় আমিই তোমাদের খাবারটা পাঠিয়ে দেবো'খন। আড়াইজনের ত সংসার তোমাদের—

নেত্যকালী। না—না! সে কি কথা কৈবল্যমাসি, আপনি কেন মিছিমিছি কষ্ট করতে যাবেন?

কৈবল্যমাসি। কষ্ট কি গো? এদিকে মাসি বলে ডাকছ! বোনঝি হয়ে একটা আবদার করতে পারো না?

নেত্যকালী। এলাম যখন আপনাদের পাড়ায় তখন এবেলা ওবেলা আবদার করতে হবে বৈ কি। আপনার

জামাই বাজারে চলে গেছে। আর আমার তোলা উনুনে রান্না করতে বেশী দেরী হয় না।

কৈবল্যমাসি। আচ্ছা, নেত্যকালী তুমি যখন বলছ, তখন—এ বেলা না হয় থাক্। কিন্তু জানিয়ে রাখ্ছি, ওবেলা আর উনুনের ধারে কাছে যাবে না। পাশের বাড়ীতে মাসি তবে থাকে কিসের জন্যে? ওবেলা তোমাদের খাবার আমি রান্না করে পাঠাবো। তোমরা এ পাড়ায় এলে, আর কৈবল্যমাসি খাবার তৈরী করে পাঠায়নি, একথা পাঁচ কান হলে আমার নিন্দে রট্বে যে!

নেত্যকালী। ওমা সে কি কথা! আপনার কেন নিন্দে রট্বে?

কৈবল্যমাসি। রটবে গো রট্বে! দেখ নেত্যকালী, তুমি বাছা বড় কথা কাটাকাটি করো! হ্যাঁ, ভালো কথা, তোমরা রাত্তিরে কি খাও? লুচি-রুটি না পরোটা?

নেত্যকালী। না—না, আপনাকে কোনো কষ্ট করতে হবে না!

কৈবল্যমাসি। [চটে গিয়ে] আবার কথা কাটা-কাটি করে! আচ্ছা আমি চলি। সিষ্টির কাজ সব পড়ে আছে! ওবেলা দেখা হবে'খন—

[প্রস্থান

[হরগোবিন্দের প্রবেশ]

হরগোবিন্দ। নেত্যকালী এই নাও গো বাজার—! বাজার ত' নয়—একেবারে গলাকাটা—গিলোটিন! যে জিনিসে হাত দাও একেবারে যেন তেড়ে মারতে আসে। শ্রেফ্ মাছের ঝোল আর ভাত করে ফেল। আমি মাথায় দু'ঘটি জল ঢেলে আসি—

নেত্যকালী। শোনো গো, শোনো, মজার কথা। তোমার মাস্ শাশুড়ী এসেছিলো। ওবেলা নিজে খাবার তৈরী করে পাঠিয়ে দেবে বলেছে!

হরগোবিন্দ। তুমি যে অবাক্ করলে গিন্নি! জীবনের এতগুলো জামাইষষ্ঠী ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেল—কোনো মাস্ শাশুড়ীর ত' সন্ধান পাইনি। ইনি আবার কোত্থেকে এসে হাজির হলেন?

নেত্যকালী। ওগো আস্তে কথা বলো। এই পাশের বাড়ীতেই থাকেন। জানো ত' দেয়ালেরও কান আছে। হয়ত হঠাৎ শুনে ফেল্তে পারেন। পরিচয় জান্তে চাইছ?—আমাদের কৈবল্যমাসি। শুধু আমাদের নয়, এই গোটা পাড়ার।

হরগোবিন্দ। ও কৈবল্যমাসির কেলেঙ্কারী শোন্বার সময় আমার নেই। অফিসের দেরী হয়ে যাচ্ছে—স্নানে চলি—! ওবেলা চা খেতে খেতে শোনা যাবে'খন।

[প্রস্থান

[এমন সময় ওপর থেকে একটি ডাক শোনা গেল]

স্বর্ণ। তোমরা বুঝি আজই এলে ভাই?

নেত্যকালী। ও! আপনি বুঝি দোতলার গিন্নি?

স্বর্ণ। শুধু দোতলার গিন্নি নই। এই গোটা বাড়ীটারই গিন্নি। আমাকে বাড়ীওয়ালীও বল্তে পারো। এই বাড়ীটা আমার নামেই কিনা। উনি ত' এই বাড়ীর লোভেই আমায় বিয়ে করেছিলেন। নাম আমার স্বর্ণ। তা ভাই নামটা মিথ্যে নয়, আমার দিদিমা আমার জন্যে অনেক সোনাদানা রেখে গিয়েছিলেন।

নেত্যকালী। আপনার দিদিমা বুঝি আপনাকে খুব ভালোবাসতেন?

স্বর্ণ। হুঁ! হুঁ! আমি যে তার একমাত্র নাত্নী। তাইত এত আদর। সব কথা তোমায় বলব'খন—সন্ধ্যেবেলা গা-ধুয়ে ছাদে বেড়াতে—বেড়াতে। তোমায় তুমি বলেই ডাকছি ভাই,—তোমার নাম ত' নেত্যকালী?

নেত্যকালী। তা আপনি কি করে জান্লেন?

স্বর্ণ। ওই যে কৈবল্যমাসি এসেছিলেন পাড়ার গেজেট···উনিই ত' তোমায় নেত্যকালী বলে ডাক্ছিলেন। তারপর বাজার থেকে ফিরে তোমার কর্তা—

নেত্যকালী। কি আশ্চর্যি! আপনি সব শুনে নিয়েছেন!

স্বর্ণ। তা ভাই, তুমি ত' আমার একবাড়ীর লোক হলে—, সুখ-দুঃখের সব কথা—বল্তে ও হবে—শুন্তেও হবে। তোমার সঙ্গে আমি ভাই 'দেখন-হাসি' পাতাবো। আমার মারও "দেখন-হাসি" সই ছিল কি না!

নেত্যকালী। বেশ ত! সে ত' আনন্দেরই কথা! আমার সঙ্গে চোখাচোখি হলেই আপনি হাস্বেন।

স্বর্ণ। তুমিও ভাই ফিক্ করে হেসে ফেল্বে—

হরগোবিন্দ। কই গো নেত্যকালী, তোমার নতুন হেঁসেলে মাছের ঝোল—ভাত নাম্‌লো ?

নেত্যকালী। ওগো আস্তে—আস্তে –

হরগোবিন্দ। কেন ? আস্তে কেন ? নিজের বিয়ে করা বৌয়ের সঙ্গে রসালাপ করবো—তাতেও সরকার ট্যাক্সো বসিয়েছে নাকি ?

নেত্যকালী। না-গো-না, তা নয়। ওপর থেকে আমার 'দেখন-হাসি' শুনতে পাবে।

হরগোবিন্দ। অ্যাঁ! তুমি যে আমায় অবাক্ করলে গিন্নি। পাশে কৈবল্যমাসি, আর মাথার ওপর দেখন-হাসি! গিন্নির সঙ্গে গোপন কথা বল্‌বার আর যায়গা রইল না।

নেত্যকালী। চুপ! চুপ! এখন আর কোনো কথা নয়। চুপচাপ খেয়ে অফিসে চলে যাও। রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে সব কথা বল্‌ব'খন—

হরগোবিন্দ। কিন্তু তখন যদি আবার দেখন-হাসি—

নেত্যকালী। ভারী দুষ্ট তুমি। নাও আমার রান্না হয়ে গেছে—

[Time lapse music]

[বিকেল বেলা ওপর থেকে স্বর্ণের হাঁক শোনা গেল]

স্বর্ণ। ওগো দেখন-হাসি, তোমার গা ধোওয়া টিপ্ পরা হল ?

নেত্যকালী। [নিচে—জল ঢালার শব্দ] এই যে ভাই, আজ সারাদিন জিনিস-পত্র গোছ-গাছ করেছি। চুল থেকে সারা শরীর একেবারে ধূলোয় মাথামাখি হয়ে গেছে। একটু সাবান মেখে কয়েক মগ জল ঢেলে নিচ্ছি!

[জল ঢালার শব্দ. সঙ্গে গুন্‌গুন্ গান "করো স্নান নবধারা জলে, এসে নীপবনে ছায়াবীথি তলে—"]

স্বর্ণ। আমার দেখন-হাসি শুধু হাস্‌তেই জানে না, আবার রবি ঠাকুরের গানও গায় দেখ্‌ছি—

[হাসি শোনা গেল]

নেত্যকালী। তাই ইস্কুলে শিখেছিলাম। গান গেয়ে আমি প্রাইজ পেতাম—

স্বর্ণ। তাই নাকি ? তবে ত' দেখ্‌ছি বিপদ! আমার দেখন-হাসিকে কেউ চুরি করে নিয়ে না যায়। ও কিসের বেল বাজ্‌ছে ভাই ?

নেত্যকালী। আমাদের ফোন। আগের বাসায় ফোন ছিল কিনা। তাই কর্ত্তা উঠে আসবার আগেই এখানে ঠিকানা বদলে নিয়ে এসেছে। দেখি আবার কে ডাক্‌ছে! হ্যালো, কে ? ওমা,…উমি! হ্যাঁ, আমরা নতুন বাসায় উঠে এসেছি। ঠিকানা জান্‌লি কি করে ? কর্ত্তার সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়েছিল ? বেশ! বেশ! সামনের রোববার এই বাসায় বেড়াতে আসিস্ কিন্তু…অনেক গল্প হবে…আচ্ছা…আচ্ছা…ছেড়ে দিচ্ছি…ভিজে কাপড়…বাথরুম থেকে এসে ধরেছি…

[হঠাৎ একটি আধুনিকার গট্‌গট করে প্রবেশ]

আধুনিকা। ও! আপনারা আজ নতুন এলেন বুঝি ? আপনাদের ফ্ল্যাটে ফোন কানেক্‌শন্ আছে দেখ্‌ছি। যাক্ ভালোই হল। যখন-তখন এসে ফোন করা যাবে। আমি আপনাদের এই পাশেই থাকি…

নেত্যকালী। কৈবল্যমাসির—

আধুনিকা। না—না, আমি ওই কৈবল্যমাসির কেউ নই। কেবল্যমাসি থাকে আপনাদের ডাইনের বাড়ীতে—আর আমি থাকি আপনাদের ঠিক বাঁয়ে। আলাপ হয়ে গেল, ভালোই হল। আমার নাম অনিতা। আমি কলেজে পড়ি। আপনি আমাকে নাম ধরেই ডাক্‌বেন—। আচ্ছা, এসে পড়েছি যখন—একটা ফোন করেই যাই। [কিছু মাত্র অনুমতি না নিয়ে ডায়াল করতে লাগল]

অনিতা। হ্যালো—কে ? বিশ্ববন্ধু ? কি বল্‌ছ ? আজ ক্লাশ হয় নি ? মেট্রোতে সন্ধ্যাবেলার শো'র দুখানি টিকিট কিনেছ ? আমার কাছেই আস্‌ছিলে ? কি আশ্চর্য্য! আমিও তোমাদের বাসায় যাচ্ছিলাম! কি বল্লে,—আমি হেদোর মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকবো ? তুমি মোটর নিয়ে আস্‌ছ ? কি কাণ্ড! তাহলে শাড়ীটা পাল্‌টে নি। কি বল্‌ছ ? ফিরতি পথে ফিরপোতে ডিনার। সত্যি বিশ্ববন্ধু—you are wonderful! আমি এক্ষুণি যাচ্ছি—। চলি নেত্যকালী দিদি—

[গট্ গট্ করে মেয়েটি তড়িৎ বেগে বেরিয়ে গেল। নেত্যকালীকে পয়সা দেবার কথা পর্য্যন্ত জিজ্ঞেস করল না।]

নেত্যকালী। কি আশ্চর্য্য। এই মেয়েটি আমার

প্রতিবেশিনী আবার কি বলে গেল? প্রায়ই এসে এই রকম কোন কয়ে যাবে। তা হলেই হয়েছে আর কি!

[ওপর থেকে ডাক শোনা গেল]

স্বর্ণ। কি গো দেখন-হাসি? তোমার সাজা-গোজা কি এখনও হল না? এতক্ষণ ধরে কি করছিলে? খিড়কির সিঁড়ি দিয়ে ওপরে চলে এসো—

নেত্যকালী। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমার হয়ে গেছে। এক্ষুণি আসছি ভাই—

স্বর্ণ। বলো, আস্‌ছি ভাই দেখন-হাসি।

নেত্যকালী। হ্যাঁ—গো—হ্যাঁ। আস্‌ছি ভাই দেখন-হাসি।

[গুণ্‌ গুণ্‌ গান করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলো।

"আজ তোমারে দেখতে এলাম
অনেক দিনের পরে
ভয় নেই সুখে থাকো—
অধিকক্ষণ থাকবো নাকো—
এসেছি দুদণ্ডেরি তরে!
দেখবো শুধু মুখখানি—
শুনবো মুখের মধুর বাণী—
আড়াল থেকে হাসি দেখে
চলে যাবো দেশান্তরে।"

স্বর্ণ। আমার দেখন-হাসির একেবারে উঠ্‌তে গান—বস্‌তে গান! গানের একেবারে ঝর্ণা ধারা! ভাই দেখনহাসি, তোমায় আগে থেকে বলে নি,—আমায় কিন্তু গান শেখাতে হবে!

নেত্যকালী। তা ভাই দেখনহাসি, তুমি গান শিখলেই পারো! তোমাদের বাড়ীতে ত' আর কোনো ঝামেলা নেই! যত খুশী গলা সাধো না।

স্বর্ণ। তুমি বল্লে, যত খুশী গলা সাধো না! কিন্তু কৃষ্ণ-প্রেমে যে অনেক বাধা!

নেত্যকালী। তার মানে? তার মানে?

স্বর্ণ। বা-রে! জটিলা-কুটিলা রয়েছে না? এক-দিকে আমার দজ্জাল শাশুড়ী, আর একদিকে আমার পেটের শত্তুর ছেলে! হারমোনিয়াম্ নিয়ে বসলেই একদিক থেকে শাশুড়ী, আর একদিক থেকে ছেলে,—ছুটে এসে বল্‌বে, মা, নাকিসুরে কাঁদ্‌ছ কেন? লোকে শুন্‌লে কি বল্‌বে? আচ্ছা শোনো কথা, আমি গান গাইছি, আর ওরা বলছে কিনা নাকিসুরে কাঁদ্‌ছি—?

নেত্যকালী। ভাই দেখনহাসি, গান শিখ্‌তে হলে আগে সা—রে—গা—মা করে গলা সাধ্‌তে হবে। আমি তোমায় শিখিয়ে দেবো'খন—

স্বর্ণ। তুমি 'কত্তে' ভালো দেখনহাসি। এই সময় কর্ত্তা আমার দজ্জাল শাশুড়ীকে নিয়ে বৃন্দাবন গেছে, আর ছেলেটাও ওদের ন্যাওটা কিনা,—সেও ওদের সাথ্‌ ধরেছে। আমি ভাই আর আপত্তি করিনি। দুটো দিন হাড়টা একটু জুড়োক।

নেত্যকালী। চলো ভাই দেখনহাসি, তোমাদের ছাদে বেড়িয়ে আসি—

স্বর্ণ। তাই চলো ভাই—তাই চলো—

নেত্যকালী। [গুণগুণ গান]

"নীল আকাশে কে ভাসালে—
সাদা মেঘের ভেলারে ভাই
লুকোচুরি খেলা।"

স্বর্ণ। [সিঁড়ি দিয়ে উঠ্‌তে উঠ্‌তে] তুমি বেশ আছ ভাই, নিরিবিলি সংসার, বোকাট্‌কি শাশুড়ী নেই, হাড় জ্বালানো ছেলে নেই! যখন খুশী কাজ করছ—যখন খুশী গান গাইছ…!

নেত্যকালী। হ্যাঁ, যাকে বলে একেবারে পুরো স্বাধীনতা!

স্বর্ণ। এই আমাদের ছোট্ট নিরিবিলি ছাদ। কয়েকটা ফুলের গাছও লাগিয়েছি। কিন্তু রাখ্‌বার যো কি আছে? শাশুড়ী পুজোর ফুল তুলে তুলে একেবারে শেষ করে দিচ্ছে।

নেত্যকালী। বাঃ! সুন্দর বাগানটি ত'! আমি কিন্তু রোজ বেড়াতে আস্‌বো।

স্বর্ণ। খুব ভালো হবে। আমরা রোজ দুজনে বেড়াবো। তুমি গান গাইবে, আর আমি শুনবো—

নেত্যকালী। [সুরে] "সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে
ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনা
সেই স্মৃতিটুকু যেন ক্ষণে ক্ষণে
যেন জাগে মনে ভুলো না।"

পাহাড়ী পথ

আকাশ পথ

ফটো : সন্তোষ দাস

সুবর্ণ। চমৎকার তোমার গলা ভাই। আমায় এই রকম গাইতে শিখিয়ে দিতে হবে কিন্তু!

নেত্যকালী। ঠিক আছে। তুমি ভাই রোজ ভোরে উঠে সা-রে-গা-মা সাধা সুরু করে দাও—

সুবর্ণ। হ্যাঁ, এখন বাড়ী একেবারে খালি। কাল ভোর থেকেই সুরু করবো। হ্যাঁ, ভালো কথা। গট্ গট্ করে ওই মেয়েটা তোমার কাছে কে এসেছিল দেখনহাসি?

নেত্যকালী। ও ত' তোমাদের পাশের বাড়ীর মেয়ে অনিতা।

সুবর্ণ। কি সর্ব্বনাশ! ওর সঙ্গে তুমি ভাব জমিয়েছ!

নেত্যকালী। আমাকে আর ভাব জমাতে হয়নি, ও নিজেই গট্‌গট্ করে এসে জানিয়ে গেল যে সে কলেজে পড়ে! নিজের থেকেই ফোন করলে, একটি পয়সা দেবার নামও করলে না। আবার আমার প্রাণে আশার বাণী শুনিয়ে গেল যে, রোজ এসে ফোন করে যাবে!

সুবর্ণ। আমি দু'হাত দিয়ে তোমায় মানা করছি।—দেখনহাসি, খাল কেটে কুমীর ডেকে এনো না! পাড়ায় ওর ভারী বদনাম। খবরদার, খবরদার, ওর সঙ্গে তুমি আদৌ মিশো না।

নেত্যকালী। আমি মেশ্‌বার কে? ও যে নিজেই গায়ে পড়ে ভাব জমাচ্ছে! ফোন করে কার সঙ্গে মেট্রোতে সিনেমা দেখ্‌তে গেল! তারপর ফিরপোতে ডিনার!

সুবর্ণ। ছি-ছি-ছি-ছি! আমি সব বুঝ্‌তে পেরেছি। না ভাই দেখনহাসি, তুমি শুধু আমার সঙ্গে ভাব করবে, আর কারো সঙ্গে নয়—

[হঠাৎ নীচে থেকে হাঁক শোনা গেল]

হরগোবিন্দ। কৈ গো নেত্যকালী, ঘরে তালা বন্ধ করে কোথায় গেলে?

নেত্যকালী। ওই যে কর্ত্তার ডাক পড়েছে। আমি চলি—

সুবর্ণ। কিন্তু আমার গান শেখার কি হবে?

নেত্যকালী। হবে—হবে। সা-রে-গা-মা সুরু করো।

[সিঁড়ি দিয়ে নাম্‌বার শব্দ]

হরগোবিন্দ। এ কি কাণ্ড! ঘরে তালা বন্ধ, গৃহিণী উধাও। মেয়েটা কোথায়?

নেত্যকালী। মেয়েটা ঘরে ঘুমুচ্ছে। আমি দেখনহাসির সঙ্গে ছাদে বেড়িয়ে এলাম। দিব্যি ফুলের বাগান!

হরগোবিন্দ। বাঃ! বাঃ! চমৎকার! আমি অফিসে খেটে-খুটে হয়রান, আর তুমি ছাদে উঠে ফুলের গন্ধ শুঁকে বেড়াচ্ছ! একেই পতিব্রতা—

নেত্যকালী। হুঁ পতিব্রতা! আর তোমরা যখন দল বেঁধে সিনেমায় যাও—আর হোটেলে খাও, তখন বৌয়ের কথা মনে পড়ে মশাই?

হরগোবিন্দ। ঘাট হয়েছে মহারাণী···আমারই ঘাট হয়েছে। এখন আমি সকাল সকাল খেয়ে শুয়ে পড়বো। কি রান্না হয়েছে নিয়ে এসো—

নেত্যকালী। ওমা! তবে খাবার সময় শুনলে কি? কৈবল্যমাসি, এবেলার খাবার পাঠিয়ে দেবেন যে! আমাকে পই পই করে বলে গেছেন!

হরগোবিন্দ। তবেই হয়েছে! তোমায় না হয় পই পই করে বলে গেছেন! কিন্তু আমি যে এখন খিদের জ্বালায় পটল তুল্‌বো—

[কৈবল্যমাসির প্রবেশ]

কৈবল্যমাসি। এই যে নেত্যকালী, আমি তোমাদের এবেলার খাবারটা দিয়েই যাচ্ছি। আমি আবার ঠাকুর-বাড়িতে কথকতা শুন্‌তে যাবো। ফিরতে কত রাত্তির হবে —তার ত' ঠিক নেই—! এই টিফিন কেরিয়ারটা ধরো—

নেত্যকালী। আপনি কেন এত কষ্ট করতে গেলেন কৈবল্যমাসি? আমাদের ত' আড়াইজনের সংসার।

কৈবল্য মাসি। সেই জন্যেই ত' বল্লাম,—এবেলা আর উনুন ধরিও না। তা হলে আমি চলি নেত্যকালী। কাল সকালে আবার জামাইকে নতুন খাবার খাওয়াবো। বল্লে বিশ্বেস করবে না নেত্য! খাওয়াতে আমার বড্ড সখ্! লোকে বলে, আমি আমার সোয়ামীকে খাওয়াতে খাওয়াতেই মেরে ফেলেছি। এখন চলি ভাই—

হরগোবিন্দ। অ্যাঁ! তোমাকে একেবারে ভাই বানিয়ে দিয়ে চলে গেল! যাক্ গে—মরুক্ সে—! আমার পেটের ভেতর ইঁদুর ডন্ ফেল্‌ছে। মাস-শাশুড়ী কি খাবার এনেছেন—তাড়াতাড়ি দাও আমায়—

নেত্যকালী। এই যে বসে পড়ো, আমি প্লেটে সাজিয়ে দিচ্ছি—

হরগোবিন্দ। ওরে মিলি,—সন্ধ্যেবেলায় ঘুমুচ্ছিস্ কেন? ওঠ্ ওঠ্। তোর দিদিমা—কি সব খাবার দিয়ে গেছে—খাবি আয়—

মিলি। [ঘুম থেকে উঠে] কি খাবার মা?

নেত্যকালী। এই দেখ্ না,—কত্তো খাবার! চোখে-মুখে জল দিয়ে বসে যা! সারাদিন যা ধকল গেছে—তাড়াতাড়ি সবাই শুয়ে পড়্‌বো।

হরগোবিন্দ। হ্যাঁ, আবার ত' সেই ভোরেই উঠ্‌তে হবে। [খেতে গিয়ে] এটা কি গো? টান্‌লে ছেঁড়ে না যে!

নেত্যকালী। ওটা পরোটা—

হরগোবিন্দ। উঁহু! ভুল করে তোমার মাসি বোধ-করি মেসোর পুরানো জুতোর সুকতলা ভেজে দিয়ে গেছে!

নেত্যকালী। কি যা-তা বক্‌ছ! গুরুজন হয় না!

মিলি। হ্যাঁ মা, এ পরোটা নয়। একেবারে চামড়া। দাঁত দিয়ে চেপে ধরে টান্‌ছি—কিন্তু…উ—হুঁ—হুঁ

নেত্যকালী। কি হোলো রে—কি হল?

মিলি। মাগো, পরোটা ছিঁড়তে গিয়ে আমার একটা দাঁত ভেঙে গেল। অ্যাঁ—অ্যাঁ—হ্যাঁ…

হরগোবিন্দ। উ—হুঁ—হুঁ! এদিকে আমি যে মারা গেলুম— [কেঁদে ফেল্‌ল

নেত্যকালী। কেন? তোমার আবার কি হল?

হরগোবিন্দ। হায়—হায়—হায়! প্রাণ যায়—বুক যায়!

নেত্যকালী। কি হল গো? অমন করছ কেন?

হরগোবিন্দ। তোমার কৈবল্যমাসির আলুর দম!!! একেবারে লাল লঙ্কার কোটিং দেয়া। জিবটা যে পুড়ে গেল! শীগ্‌গির জল দাও—চিনি দাও—ডাক্তার ডাকো—

নেত্যকালী। অ্যাঁ! কৈবল্যমাসির এই কাণ্ড!! খাবার দিয়ে একেবারে প্রাণে মেরে ফেল্‌বার মতলব? এই দুধের সর নাও—জিবে মাখিয়ে দাও—

মিলি। ও মা গো, আমার দাঁত যে ভেঙে গেল! এই দেখ না—কত রক্ত পড়ছে!

নেত্যকালী। কি সর্বনাশ! ডাইত! আয়, ডেটল্ জল দিয়ে কুলকুচো করবি—

হরগোবিন্দ। আমার জিব জ্বলে যাচ্ছে—বুক পুড়ে যাচ্ছে—তোমার কৈবল্যমাসির এই কাণ্ড?

নেত্যকালী। কিন্তু কৈবল্যমাসি যে, আমায় বল্লেন, রান্নায় ওঁর সুনাম আছে—

হরগোবিন্দ। হুঁ! সুনাম! এখন বুঝতে পারছি—মেসো এই রান্না খেয়েই সাত্ তাড়াতাড়ি পটল তুলেছে!

[দোরের পাশে চাপা-গলায় ডাক শোনা গেল]

সুবর্ণ। দেখনহাসি, একবারটি শুনে যাও না ভাই—

নেত্যকালী। দোতলার দেখনহাসি আমায় ডাক্‌ছে, শুনে আসি। [বাইরে চলে এলো]

সুবর্ণ। আচ্ছা ভাই দেখনহাসি, তুমি কি বলে ওই কৈবল্যমাসির রান্না খাবার তোমার কর্ত্তাকে খেতে দিলে? উনি যে লঙ্কার ভেতর ডুবে থাকেন। ওঁর ধারণা উনি খুব খাসা রান্না করেন। আমায় একবার জিজ্ঞেস করবে ত!

নেত্যকালী। এখন আমি কি করি বলোত? পরোটা ছিঁড়তে গিয়ে মেয়েটার দাঁত ভেঙে গেছে। আর আলুর দম খেয়ে কর্ত্তার জিব আর বুক জ্বলে যাচ্ছে!

সুবর্ণ। কিচ্ছু ভাবনা নেই তোমার। আমার রান্না ঠাণ্ডা পেঁপের তরকারী আছে। আমি সরু চালের ভাত আর পেঁপের তরকারী পাঠিয়ে দিচ্ছি। তোমার কর্ত্তাকে খাইয়ে দাও—

নেত্যকালী। তুমি আমায় বাঁচালে দেখনহাসি! এদিকে পেটের খিদে—ওদিকে জিবের জ্বালা—

সুবর্ণ। এই নাও ভাই। আমি ঢেকে-ঢুকে নিয়েই এসেছি! কর্ত্তাকে আগে খাইয়ে দাও—

নেত্যকালী। এতে কোনো অপকার হবে নাত?

সুবর্ণ। না—না, পেঁপের তরকারী খুব উপকারী—

নেত্যকালী। [ঘরে ঢুকে] এই নাও—ঠাণ্ডা পেঁপের তরকারী আর সরু চালের ভাত। আমার দেখনহাসি দিলে—তুমি খেয়ে নাও। মেয়েটাকে আজ রাত্তিরে দুধ খাইয়ে রাখ্‌বো'খন।

হরগোবিন্দ। দাও—তাড়াতাড়ি খাই। খিদের চোটে আমার নাড়িভুঁড়ি শুদ্ধু হজম হয়ে গেল! [খেতে লাগ্‌লো]

সুবর্ণ। [ওপাশ থেকে] দেখনহাসি···ভাই শোনো—

নেত্যকালী। [বেরিয়ে এসে] কি বলছ ভাই?

সুবর্ণ। [মুচ্‌কি হেসে] আমি ভাই ভেবে ভেবে ঠিক্ করে ফেলেছি—

নেত্যকালী। কি ঠিক করে ফেল্লে?

সুবর্ণ। তোমাকে আমার খুব ভালো লেগেছে। আর তোমায় ছেড়ে দেব না। আমার ছেলের সঙ্গে তোমার মিলির বিয়ে দেবো। ওরাই বাড়ীর মালিক হবে!

নেত্যকালী। অ্যাঁ! তুমি বলছ কি দেখনহাসি? এ বাড়ীতে আমাদের একদিনও কাটেনি,—এরই মধ্যে একেবারে দেখনহাসি থেকে বেয়ানের পদে পদোন্নতি? লোকে শুন্‌লে কি বল্‌বে? আর তোমার কর্ত্তাই যে কিছু জান্‌তে পারলে না!

সুবর্ণ। হুঁ! কর্ত্তা আবার আমার কথার ওপর কথা বল্‌বে নাকি? বাড়ীর মালিক ত' আমি! আমি যা বল্‌ব—তাই হবে।

নেত্যকালী। আচ্ছা, রাতটা ত' আগে ভোর হোক্, তখন তোমার বেয়ান হবো—

সুবর্ণ। ও! তুমি ভাব্‌ছ—আমার ছেলেটা কালো কুচ্ছিত—আমি জোর করে তোমার জামাই করে দোবো? মোটেই তা নয়। চোদ্দ বছর বয়েস, রাজপুত্তুরের মতো দেখ্‌তে! তোমার মিলির সঙ্গে দিব্যি মানাবে! মিলির বয়েস এখন কত?

নেত্যকালী। এই ত' সবে আটে পা দিয়েছে—

সুবর্ণ। তবে? আমি বলি নি? দিব্যি রাজযোটক হবে। এখন দু'জনেই পড়াশোনা করুক। ধুম করে পরে বিয়ে দেবো আমি—

[ঘর থেকে ডাক শোনা গেল]

হরগোবিন্দ। ও নেত্যকালী, শুনছ!

সুবর্ণ। ওই যে তোমার কর্ত্তার ডাক এসেছে। আমি এবার চল্লাম ভাই। কথা কিন্তু পাকা হয়ে রইল।

[প্রস্থান]

হরগোবিন্দ। বলি শুনছ—

নেত্যকালী। শুনছি বৈকি! কি বল্‌বে বলো—

হরগোবিন্দ। তোমার দেখনহাসির দেয়া সরু চালের ভাত—আর পেঁপের তরকারী খেয়ে এই সবে শুয়ে পড়েছি; কিন্তু পেট্‌টা খালি মোচড় দিয়ে উঠ্‌ছে কেন? তরকারীর ভেতরও যেন কিসের একটা গন্ধ পেলাম—

নেত্যকালী। তাই নাকি?. আচ্ছা আমি দেখনহাসিকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখি—

সুবর্ণ। আমি যাই নি ভাই, আমার রান্না খেয়ে তোমার কর্ত্তা কি বলে—তাই শোনবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি! আমার প্রস্তাবটা বলেছ ত?

নেত্যকালী। না ভাই, এখনও বলি নি। আচ্ছা ভাই, তোমার পেঁপের তরকারীতে কিসের যেন একটা গন্ধ বল্‌ছিল—

সুবর্ণ। ও! সে কথাটা তোমায় বলা হয় নি ভাই। আমার কর্ত্তা আবার ক্যাষ্টর অয়েল দিয়ে তরকারী রান্না খায়। ওইটেই আমাদের রেওয়াজ হয়ে গেছে। কোষ্ঠকাঠিন্য কি না—তাই! তা ভাই ওতে ভয়ের কিছু নেই! আমার প্রস্তাবটা বল্‌তে ভুলোনা যেন! আমি চলি! কাল সকালে আবার আস্‌বো।

[নেত্যকালী ঘরে এসে ঢুক্‌লো]

হরগোবিন্দ। হুঁ! আমি শুনতে পেয়েছি। ক্যাষ্টর-অয়েল দিয়ে তরকারী-রান্না করা! অ্যাঁ, তিনভুবনে কোথাও তো শুনিনি! উঁ-হুঁ-হুঁ। আবার পেটটা মোচড় দিয়ে উঠ্‌লো। বুঝ্‌তে পারছি আজ সারারাত শুধু বাথরুমেই ছুটো ছুটি করতে হবে! উঁ-হুঁ-হুঁ যাই একবার

[প্রস্থান

নেত্যকালী। তাই ত'। এ আবার কি বিপদ হল! সারারাত যদি ছুটোছুটি করতে হয়,—তবে কাল অফিস করবে কি করে? আমার হয়েছে এক মহাজ্বালা।

হরগোবিন্দ। [ফিরে এসে] দেখ নেত্যকালী, আর পারছি নে। আমি একটু ঘুমোবার চেষ্টা করি। তুমি আমায় ডেকো না—[শয়ন]

নেত্যকালী। [আপন মনে] আমি আজ আর মুখে কিছু দেবো না। দেখছি খেলেই বিপদ। দরজা বন্ধ করে আমিও শুয়ে পড়ি···

[Time lapse music]

[হঠাৎ কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেল]

অনিতা। নেত্যকালী দিদি, ঘুমোলেন না কি? একটু দরজাটা খুলুন না—

নেত্যকালী। কে ?

অনিতা। আমি অনিতা—দরজাটা একটু খুলুন না। বিশেষ দরকার। এক মিনিট—

হরগোবিন্দ। কি জ্বালাতন। এত রাত্তিরে আবার কড়া নাড়ছে কে ? সবে একটু ঘুমের আমেজ এসেছিল··· দিলে সেটা ভেঙে !

নেত্যকালী। অনিতা বলে সেই মেয়েটা! একবার ফোন করে গেছে,—আবার এসেছে!

হরগোবিন্দ। জ্বালাতন আর কি !

অনিতা। নেত্যকালী দিদি, দরজাটা একটু খুলুন না!

নেত্যকালী। না,—সত্যি আবার উঠ্‌তে হল ? [দরজা খুলে] কি চাই—এত রাত্তিরে !

অনিতা। আমার বড় বিপদ! একটা ফোন করতে হবে। [অনুমতি না নিয়েই ঘরে ঢুকে ডায়াল করতে লাগ্‌ল] হ্যালো ? কে ? বিশ্বা বসু ? আমি অনিতা বল্‌ছি। ট্যাক্সিতে আমার ভ্যানিটি ব্যাগটা ফেলে এসেছি। ওর ভেতর টাকা আছে। আমার কানের দুল আছে। হ্যাঁ! লক্ষ্মীটি—তুমি একবার থানায় যাও। আচ্ছা, তোমার ট্যাক্সির নম্বরটা মনে আছে ? মনে নেই! তা হলে কি হবে ? আমার যে কান্না পাচ্ছে···

হরগোবিন্দ। রাতদুপুরে আমাদের ঘরের ভেতর কান্নাকাটি না করে-বাড়ীতে গিয়ে করলে ভালো হত না ?

অনিতা। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি—

[গট্‌ গট্‌ করে চলে গেল]

হরগোবিন্দ। একদিনের ভেতরেই এই সব বন্ধু তোমার জুটেছে ? আশ্চর্য্য! [পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল]

নেত্যকালী। 'হুঁ! আমার বন্ধু! বল্লাম, ফোনটা নিয়ে দরকার নেই! এখন ওই ফোনের জ্বালায় রোজ বোল্‌তার কামড় সইতে হবে। তুমি ত' বাড়ী থাক্‌বে না,—যত জ্বালা বাড়বে আমার!

হরগোবিন্দ। আর কথা নয়। আমার চোখ জ্বলছে, পেট কাম্‌ড়াচ্ছে,—এখন দরজা বন্ধ করে, আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ো— [দরজা বন্ধের শব্দ]

[Time lapse music]

[ভোর হবার তখনও বাকি। ওপর থেকে বিকৃতকণ্ঠে সা-রে-গা মা সাধার শব্দ ভেসে এলো)

হরগোবিন্দ। কি বিপদ! কোল্‌কাতার শহরে শেষ-রাত্তিরে শেয়াল ডাক্‌ছে! দিনে দিনে কি হলো ? জানালাগুলো সব বন্ধ করে দাও—

নেত্যকালী। শেয়াল কোথায় গো ?

হরগোবিন্দ। তবে ?

নেত্যকালী। দোতলায় দেখনহাসি গলা সাধ্‌ছে। শুনতে পাচ্ছ না—সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি!

হরগোবিন্দ। [তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে] অ্যাঁ! বল্‌ছ কি ? এই শেষ রাত্তিরে রোজ গলা সাধা চল্‌বে নাকি ? তা'হলে ঘুমুবো কখন ?

নেত্যকালী। বাঃ! তাই বলে দেখনহাসি গান শিখ্‌বে না ?

হরগোবিন্দ। [জামা-কাপড় পরতে পরতে] হুঁ বুঝেছি! একদিকে কৈবল্যমাসি দাঁত-ভাঙা আর জিব-জ্বলা খাবার খাওয়াবে—! অন্যদিকে পাশের আধুনিকা অনিতা দুপুর রাতে এসে ঘুম ভাঙিয়ে ফোন করবে। আর দোতলার দেখনহাসি শেষ-রাত্তিরে উঠে মরা-কান্না কাঁদবে! চমৎকার প্রতিবেশিনী জুটেছে তোমার! শীগ্‌গির চলো, ওরা এসে আদিখ্যেতা দেখাবার আগে পালাই চলো—

নেত্যকালী। কোথায় ?

হরগোবিন্দ। এখনকার মতো কাকার বাসায়। তারপর দেখেশুনে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করলেই হবে—

নেত্যকালী। কিন্তু আমাদের বাসন-পত্র, ফার্নিচার ?

হরগোবিন্দ। এখন তালা দিয়ে চলে যাবো। সুবিধে বুঝে একদিন এসে নিয়ে গেলেই হবে। না-না, আর দেরী নয়। এক্ষুণি তোমার কৈবল্যমাসি সকালবেলাকার দাঁত-ভাঙা আর পেট-জ্বালা খাবার নিয়ে এসে হাজির হবে—। তার আগেই কুইক্ মার্চ্চ—! ওরে মিলি, ওঠ্‌-ওঠ্‌, পালাই চল্—! প্রাণ বাঁচ্‌লে সব পাবো—

[দ্রুত ঐক্যতান]

॥ যবনিকা ॥

বাঙালী ও জাতীয় সঙ্কট

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত বাঙলা দেশের যে ইতিহাস তা' বড়ই দুঃখ, দুর্দশা, অনটন, অনশন, অপমৃত্যু, ভ্রাতৃহত্যা ও আত্মহত্যার ইতিহাস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্‌লার আকাশে মারণাস্ত্রের মহোৎসব চলেছে একদিকে, আর সেই মারণোৎসবের উদ্‌যোগপর্বেই বাঙালীর গ্রাসের খাদ্য কেড়ে নেওয়া হয়েছে কতকগুলি নোট ছড়িয়ে। কংকালের মিছিল চলেছে পথে পথে। বাঙালীর কংকাল দু-মুঠো আহারের জন্যে ছটফট করে বাঙলার ধুলোয় মিশে গিয়েছে। ইংরেজের যুদ্ধজয়ের পথ বুঝি ওরা মসৃণ করে দিয়েছে। কিন্তু ম্রিয়মাণ বাঙালীর মুখেও সেদিন 'ইংরেজ ভারত ছাড়ো' ধ্বনি সবিক্রমে নির্ঘোষিত হয়েছে। অর্ধভুক্ত অভুক্ত বাঙালী সেদিন যুদ্ধের চাকুরীতে যোগ দেয় নি, একথা বলা যায় না। তবু তাদেরই মত অনশনক্লিষ্ট হাজার হাজার বাঙালী ইংরেজকে বিতাড়িত করতে শেষবারের মত লড়েছে। মরেছে পথচারী, মরেছে কলেজের ছাত্র, মরেছে মজুর, মার খেয়েছে, জেলে পচে মরেছে, তবু সংগ্রাম করেছে বাঙালী, বাঙালী-বীরত্বের আর স্বদেশপ্রাণতার অবিশ্বাস্য প্রতীক সুভাষচন্দ্রকে উৎসর্গ করে দিয়েছে।

কিন্তু আত্মরক্ষায় উন্মাদ ইংরাজ বাঙালীকে তার জাতীয় জীবনে চরম লাঞ্ছনার মধ্যে টেনে নামিয়েছে। ইংরেজ টাকা ছেড়েছে বাজারে, সে টাকায় কিনে নিয়েছে অনেক জেলখাটা স্বদেশীকে কণ্ট্রাক্টারের তালিকায়। একদিকে সৃষ্টি করেছে অভাব আর ক্ষুধা—অন্যদিকে খুলেছে মনুষ্যত্ব ক্রয়ের কালোহাট। সে হাটে দেশপ্রেমিক, তার দেশপ্রেম বেচেছে, সতীত্বকে পণ্য করেছে সতী। তার নর-নারীর মজ্জায় মজ্জায় সংক্রামিত করেছে দুর্নীতি, কালোবাজারী আর বঞ্চনার দুরারোগ্য বিষ। সেই বিষে যখন সারা বাঙলা জর্জরিত, তখন আর এক কঠিন বিষে বাঙালীর রক্ত কলুষিত করল ইংরেজ আর তাদের অনুচরেরা। সে হলো সাম্প্রদায়িকতার বিষ। সেই বিষের ক্রিয়ায় অন্ধ হল অনেক অর্থবান, শিক্ষিত, ক্ষমতাগৃধ্নু বাঙালী। তারা কোলকাতার বুকে নরহত্যার লীলা প্রত্যক্ষ করল। পৈশাচিক পুলকে মত্ত হল—নোয়াখালিতে, ঢাকায়, নারায়ণগঞ্জে, সারা পূর্ববাঙ্‌লায়।

সুসংহত প্রগতি আর কৃষ্টির অধিকারী একটা গোটা জাতি টুকরো টুকরো করে নিল দেশটাকে। শুধু বাঙলা নয়, পাঞ্জাবটাকেও দ্বিখণ্ডিত করে স্বাধীন হল ভারত। সাম্প্রদায়িক শোণিত পিপাসু বর্বরদের আস্ফালনের মধ্যে, আর নিরীহ দুর্বল মানুষের রক্তস্রোতে স্নান করে বিদেশীর শাসনশৃঙ্খল মুক্ত হল সারা দেশ, কিন্তু স্বাধীনভারতের পশ্চিমবঙ্গ আর স্বাধীন পাকিস্তানের পূর্ববঙ্গ অন্তহীন সমস্যার জালে দিনের পর দিন জড়িয়ে পড়তে লাগল।

স্বাধীন বাঙলার প্রথম সমস্যা হল ক্রমাগত দুর্যোগ, দুর্দশা, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচারের ফলে সামাজিক অন্তর্দ্বন্দ্ব। সেই দ্বন্দ্ব থেকেই জন্ম নিয়েছে হিংসা, হিংসা থেকে নিরীহ মানুষের নির্যাতন, বিতাড়ন, হত্যাকাণ্ড। সম্প্রদায়ের মধ্যেই যে হিংসার বীজ নিহিত আছে তা নয়, হিংসা ক্রিয়া করেছে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। ব্যবসায়ী, জমি-বাড়ীর মালিক, পুঁজিপতি, বিপথচালিত শ্রমিক, কর্মচারী, ছাত্র, শিক্ষক, সরকারী, বেসরকারী কর্মচারী,—সকলের মধ্যে প্রবেশ করেছে অসাধুতা, নির্মমতা, বিদ্বেষ আর বঞ্চনার বিষ। এদেশের মানুষ যেন কেমন করে হারিয়ে ফেলেছে নীতিবোধ, হারিয়ে ফেলেছে বিবেক বুদ্ধি। আজ এ-যুগে যে সব শিশু জন্মাচ্ছে, বড় হচ্ছে, আপনা থেকে ওদের নীতিবোধ জাগ্রত হবে একথা আশা করা যায় না। বিবেক ভগবান্ দেন বটে, কিন্তু চারিদিকের পরিবেশ আর মানুষ তা কেড়ে নেয়। এ যে ধরণের যুগ চলছে, তাতে সুষ্ঠু নীতিবোধ ও সুস্থ মানসিকতা নিয়ে যারা আসছে তারা শুধু বোকা—বুদ্ধু বলে

আখ্যাত হচ্ছে। এ অসাধু জগতে তাদের পক্ষে বেঁচে থাকা কঠিন বিড়ম্বনা মাত্র।

পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা আরও জটিল, স্বাধীনতার শুভ লগ্নে যে অর্থনৈতিক দুর্যোগের ঘনঘটা নেবে এসেছিল কোলকাতার বুকে আজ তা সারা পশ্চিমবঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে। পূর্ববাঙলার উৎখাত মানুষেরা আশ্রয় খুঁজছে পশ্চিমবাঙলায়। তাতে জন সংখ্যার যে চাপ বাড়ছে ক্ষুদ্র খণ্ডে তাতেই সে তার অর্থনৈতিকভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। এত বেকার, এত দুঃখী, এত লাঞ্ছনাকাতর মানুষ আজ আর কোথায় আছে?

চাষীদের কথা ধরা যাক, অনেকেরই তো নিজের জমি ছিল না। পরের জমি চাষ করে ওদের দিন চলতো। কিন্তু এখন আর চলে না। তাই অনেকে লাঙল ছেড়ে চলে আসছে কলকারখানায়। সেখানে সে হয়ত উদর-পূর্তির মত টাকা পাচ্ছে। তাতেই সে সুখী, প্যাণ্ট পরছে, হাওয়াই সার্ট গায়ে দিচ্ছে, বস্তীতে থাকছে। নানা রকমের অনাচার উচ্ছৃঙ্খলতা শিখছে। সারা দেশের মানুষের যে অন্ন যোগাত, এখন সে মসলার কারখানায় নকল হলুদ, নকল জিরের গুঁড়ো তৈরী করছে। আর যে গাঁয়ের জমি সে ফেলে এসেছে বাবুরা তা প্লট প্লট করে বিক্রি করে দিচ্ছেন। অগ্নিমূল্যে কিনে নিচ্ছে সে সব জমি সহস্রলক্ষ টাকার মালিকেরা। রেললাইন ধরে গেলে আগে যেসব জমিতে ধান গাছের ঢেউ দেখতে পাওয়া যেত, সে সব জমি এখন আগাছায় ভরা পিলারে আচ্ছন্ন। সে জমি চাষ করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

শুধু বাঙলাতেই যে এই দুঃখ দুর্দশার আগুন সীমাবদ্ধ থাকছে তা নয়, এ আগুন ছড়িয়ে পড়ছে ভারতের সর্বত্র। যে সব দুর্নীতি আর কদাচার আগে কোলকাতা আর বোম্বাই-এতে দেখা যেত, সে সব আজ ছড়িয়ে পড়ছে সকল রাজ্যে। বিভ্রান্ত বেকার মানুষেরা অর্থ উপার্জনের সহজ উপায় হিসাবে বাছাই করে নিচ্ছে নানা শ্রেণীর অপরাধ, অপকার্য। তাদের মধ্যে অনেকে আবার তথা-কথিত রাজনৈতিক নেতাদের অপকার্যে প্রযুক্ত হচ্ছে। প্রাদেশিকতার নামে কুকার্য সাধিত হচ্ছে প্রত্যেকটি বিশৃঙ্খলার সময়ে। কোমলমতি কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে সংক্রামিত হচ্ছে এই নীতিহীনতার দুরারোগ্য ব্যাধি। এই ব্যাধি আরও উৎকট রূপ ধারণ করছে নীতিবোধহীন শুধু কামকাঞ্চনগৃধ্নু ধনিক-বণিক রচিত ছায়াচিত্রের বহুল প্রচারে। যারা শুধু বক্স আফিসের দিকে দৃষ্টি রেখে চিত্র নির্মাণ করে, তাদের তৈরী ছবি দেখে কোন মানুষের মধ্যে নীতিবোধ জাগ্রত হবে তা আশা করা বৃথা।

নীতিবোধহীনতা আর কদাচার আজ ধর্ম-ধ্বজীদের মধ্যে আজ এমন বেড়ে গেছে যে সাধুতার আর সদাচারের নাম শুনলে অভাব অনটন লাঞ্ছিত মানুষেরা তেড়ে মারতে আসে। কারণ বর্তমান যুগের মহারাজদের কুকীর্তি মানুষের মনকে বিষিয়ে দিয়েছে। তাই ধর্মের কথা শুনলেই সাধারণ মানুষের মনে প্রতিক্রিয়া জাগে।

যাঁদের অন্তরে বিবেক বুদ্ধি আছে তাঁরাও যেন অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে মুক্তকণ্ঠে প্রতিবাদ করতে পারছেন না। তাঁদের মধ্যে দেখা দিয়েছে একটা ভীরুতা, একটা দুর্ভাগ্যজনক নির্লিপ্ততা 'কে কার কে আমার?' হাজার জপ করে যেন তাঁরা সিদ্ধি লাভ করেছেন! তাঁদের মনের ভাব—'দূরে থাক, ঝামেলার মধ্যে যাও কেন? আরও কত লোক রয়েছেন তাঁরা অন্যায়ের বিধান করুন।' এ যেন একটা সাংঘাতিক moral laryngitis, moral paralysis, শুধু বাঙলায় নয়, সারা ভারতের বিবেকবান মানুষেরা আজ এ রোগে প্রপীড়িত।

তাহলে উপায়? তবে কি এদেশ থেকে বিদেশীদের বিতাড়িত করে বেকার-সমস্যার সুরাহা করা হবে? অর্থ-গৃধ্নু পুঁজিপতিদের ঠেঙিয়ে তাদের মানবতা বোধ জাগাতে হবে? জমি জবরদখল করে ফাটকাবাজি বন্ধ করা হবে? আইন করে সকল রকমের দুরাচার দূর করতে হবে? অক্ষমতা কদাচার প্রভৃতির বিরুদ্ধে জনতার ক্রোধবহ্নি প্রজ্বালিত করতে হবে? ময়দানে পথে ঘাটে বক্তৃতা করে জনমানসকে সংস্কৃত করা হবে?

ছি! ছি! বিদেশী বিতাড়নের কথা বাঙলার লোক ভাবতে পারে না। এ দেশের কবিই না গেয়েছেন—'সবারে বাসরে ভালো।' চোরদের ধর্মের কাহিনী শুনিয়ে কোন উপকার হবে, সে আশা করা যায় না। অপরের জমি জবর দখল করার কথা যারা ভাবে, তারা কোন মহৎ কাজ করতে পারবে সে কথা ভাবা যায় না। আইন করে

অপকার্যের মাত্রা কমানো যায় না। আমাদিগকে মানুষের মতো চালাবার জন্যে কত আইন তো রয়েছে। ক্ষমতা-সম্পন্ন লোকেদের দুষ্কার্য দূর করতে গিয়ে জনতার ক্রোধ-বহ্নি প্রজ্বালিত করলে অনেক মানুষের ক্ষতি করা হবে, অনেক সম্পত্তি ধূলিসাৎ করা হবে। দেশের সম্পদ নষ্ট করার কারো অধিকার নেই। শুধু ময়দানে বা পার্কে বক্তৃতা করে এই বিরাট জাতির কঠিন রোগ দূর করা সম্ভব হবে না। কিছুতেই কিছু হবে না।

তবে কী বাঙালী জাতি—চণ্ডীদাসের রামপ্রসাদের জাতি, রামমোহনের রামকৃষ্ণের জাতি, বিবেকানন্দ অরবিন্দ সুভাষচন্দ্রের জাতি বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যাবে? ভারত-সভ্যতার ইতিহাসে তার নামই শুধু থাকবে অধুনা-অবলুপ্ত প্রাণীর নামের মত?

না! নিশ্চয়ই নয়। যে জাতির শিরায় বইছে চৈতন্য—হুসেনশাহের রক্ত; রামপ্রসাদ আর লালন ফকিরের গানে এখনও যে জাতির প্রাণে এনে দেয় সুখদুঃখনাশী ভাবের বিহ্বলতা, সে জাতি বাঁচবে না, সে জাতি জ্বালাবে না ভারতের অগ্রগতির আলোক—তা বিশ্বাস করা যায় না। এ জাতি বাঁচবেই। বিভ্রান্ত ভারতের বুকে আবার জ্বলবেই আশার আলো—যে আলোকে পথ দেখতে পাবে সারা এশিয়ার মানুষ—সারা দুনিয়ার মানুষ।

আগেই বলেছি বক্তৃতায় কাজ হবে না। বিক্ষোভে কাজ হবে না। হিংসায় কাজ হবে না। একদল মানুষ চাই যাঁরা আত্মবলিদান করতে প্রস্তুত। যাঁরা নামের মোহে পাগল নন,—'আমার কাজ, আমার ত্যাগ দশজনে দেখুক, তারিফ করুক—হাততালি দিক,' সে লালসায় যাঁরা মত্ত নন এমন কয়জন সর্বত্যাগী মানুষের আজ প্রয়োজন। তাঁরা সন্ন্যাস নিয়ে আসবেন না, তাঁরা নেতারূপে দেখা দেবেন না, তাঁরা নেমে আসবেন সাধারণ মানুষের কাছে শিক্ষকরূপে। তাঁরা যাবেন গ্রামে গ্রামে সহরে সহরে শিক্ষকরূপে—মনুষ্যত্বের মন্ত্র নিয়ে। এই মন্ত্রে তাঁরা দীক্ষিত করবেন সমস্ত ছেলে-মেয়ে, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে। তাঁরা বুঝাবেন সততার মর্যাদা, তাঁরা বুঝাবেন স্বাধীনতার মূল্য দিতে হয় কেমন করে। তাঁরা প্রতি দম্পতিকে মন্ত্র দেবেন মনুষ্যত্বের মন্ত্র—যাতে তারা জপ করতে পারে, তাদের সন্তান যেন মানুষ হয়। যেন তারা বাঙলার, ভারতের দুঃখ দূর করতে পারে—সেই দুঃখজয়ের অমোঘ-মন্ত্র থেকেই যেন তাদের জন্ম হয়—যেন তাদের শিরায় শিরায় ধ্বনিত হয় জগন্মঙ্গলের অনির্বার স্পন্দন।

বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের শক্তিতে মত্ত মানব কখন দানবে পরিণত হয়ে জগৎ সংহার করতে পারে এ ভয় জেগেছে বিশ্বের চিন্তাশীল দার্শনিকদের মনে। বাঙলার দুর্দিনে যেমন কোন কোন মননশীল মানুষের মনে জাতিটাকে রক্ষার চিন্তা জেগেছে, তেমনি বিশ্ববিনাশের ভয়ে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেলও উদ্বিগ্ন হয়েছেন। কিন্তু তিনিও শিক্ষকদের হাতেই ছেড়ে দিয়েছেন বিশ্ব-রক্ষার ভার—যুদ্ধের বিরুদ্ধে মানুষের মন তৈরী করবার ভার।

এ-দেশে এই কঠোর তপস্যার ব্রত নিয়ে যে সকল আত্মত্যাগী নর-নারী এগিয়ে যাবেন তাঁদের অবশ্যই অনেক বাধা বিপত্তির, অনেক নিন্দা উপহাসের সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু তাঁরা যে হবেন আত্মত্যাগী, তাঁরা যে হবে সর্বত্যাগী, নিন্দা প্রশংসায় তাঁদের পণ টলবে না, তাঁরা যে বাঙালী তথা ভারতবাসীদের রক্ষার ব্রত নিয়ে জীবন-দান করতে এগিয়েছেন। বাধা-বিঘ্ন উপহাসে তাঁরা কিছুতেই দমবেন না। তাঁরা যে 'সম্ভবামি যুগে যুগে' যিনি বলেন তাঁরই প্রতিনিধি। তাঁরা নেমে এসেছেন—আরও আসবেন। মৃতপ্রায় জাতিটার দেহে তাঁরা প্রাণ-সঞ্চার করুন অবিলম্বে, আমরা যেন গাইতে পারি—

—বাঙ্‌লার বলে লভুক ভারত
বিশ্ব-সভার শীর্ষস্থান।'

(গুরুপদ দত্ত)

ভাঙা পাড়ের নতুন বাঁধে

তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী
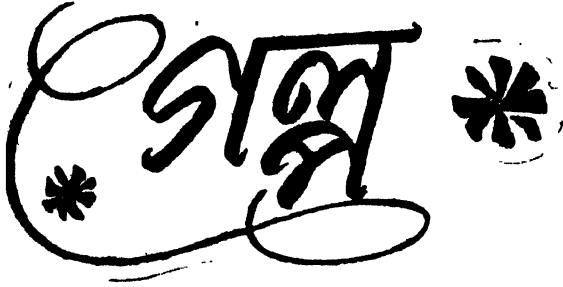
নিখোঁজ লোকটির জন্যে দুঃখ সবার।

গ্রামছাড়া হবার পর, লোকটির যেন কদর বেড়েছে আরো। দর বুঝেছে পড়শীরা—দূরের কাছের বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনেরা। সকলেই মনেপ্রাণে চেয়েছে—আবার ফিরে আসুক। জন্মভূমি কোহামগাম্-এর অন্ধিসন্ধি তোলপাড় করে দেখেছে গাঁয়ের লোকেরা। অন্ধ্রপ্রদেশের গ্রামশহরের কোনো জায়গা আর খুঁজতে বাকি নেই স্বপক্ষ-বিপক্ষদের। হদিস মেলেনি কোথাও। ফিরেও আসেনি লোকটি।

একটা বছর ঘুরল।

এই বছর ঘোরার অপেক্ষায়ই দিন গুণে চলছিল সুভদ্রা। সুভদ্রা জানে আসবে। ফিরে আসবে নাগরাজ বছরের এই প্রথমদিনে। এই রকমই কথা ছিল তার সংগে। তাই সকাল থেকেই কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে। নিজের আজ্ঞাতেই বারান্দায় এসে, দূরে সবুজ পাহাড়ের দিকে তাকাচ্ছে। পাহাড়ের কোল দিয়েই আসবে ব'লে গেছে নাগরাজ।

নাগরাজ চলে যাবার দু'দিন বাদে, নিরুদ্দেশের সংবাদ কানাকানি হ'তে হ'তে সকলেই জেনে ফেলল। প্রথম ধাক্কায় অনেকে হতভম্ব হ'য়ে গেছল। অনেক কথাই তো রটল ওকে নিয়ে—তখন গেল না, হঠাৎ।

জনায় জনায় এসে, প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তুলল সুভদ্রাকে। কেন গেল, কারণ কি? কোথায় গেছে সে জানে কিনা ইত্যাদি।

একটা প্রশ্নেরও উত্তর না দিয়েই, মৌনমুখে ঘরে চ'লে গেছে সুভদ্রার এই ব্যবহারে, আড়ালে সরে গিয়ে কটু-কাটব্য করেছে অনেকে। দেমাক দেখ না! উত্তর দিলেনা! যে অত বড় করে দিলে, তার জন্যে একটুও খেদ নেই! থাকবে কেন? উনিই যে সর্বেসর্বা হলেন এখন।

পাড়ার বুড়ীমার বক্তৃতা শুনে আবার, অনেকের বুক ভেসেছে চোখের জলে। আহা। চোখের কোণে জল টল টল করছে দেখলে না গা তোমরা! কেঁদেছে খুব। মুখখানা ফুলোফুলো। বেচারা! এসময় ওকে জ্বালাতন করা মানেই কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়া। জানলে কি আর জানাত না কিছু!

জানলেও জানাবে না কিছু সুভদ্রা। জানায়নি ও কাউকে। কারো আকুলিবিকুলি দেখে টলেনি। মনকে সংযত করেছে। মুখ বন্ধ রেখেছে।

পার্বতী নদীর তীরে এসে দাঁড়াল সুভদ্রা।

'কত্তাসামাসারম্' হচ্ছে। নববর্ষ উৎসব। সব বয়সের মেয়েছেলেরা মণ্ডপের তলায়, সমবেতকণ্ঠে গান গেয়ে গেয়ে, নতুন বছরকে আহ্বান জানাচ্ছে। 'লছমী-সরস্বতী তল্লি না দানম্ রাশি লো ওয়োচ্ছে।' লক্ষ্মী সরস্বতী এসো ধন-ধান্যে ফসলে আমার। নারকেল খেজুর গাছের তলায় তলায় জমায়েৎ বাচ্চাদের মিঠাই বিতরণ করা হচ্ছে।

ফিরে এলো সুভদ্রা। এখন আসার লগ্ন নয় নাগ-রাজের। ব্যর্থ অনুসন্ধান তার। রাতের নিঃস্বনিভৃতে সকলের চোখের আড়ালে আসবে নাগরাজ। আসবে নিশ্চয়। তাকে কথা দিয়েছে। প্রতিশ্রুতি করিয়ে নিয়েছে যাবার আগে—একথা কখনো যেন না প্রকাশ করা হয় কারো কাছে।

সকাল থেকে দুপুর, দুপুর থেকে সন্ধ্যে একরকম নাগরাজেরই ধ্যানে বিভোর হয়ে, থেকেছে সুভদ্রা। রাত এসেছে। নিশুতিরাতের সেই শুভক্ষণটির জন্যে নিজেকে

প্রস্তুত করে তুলতে সচেষ্ট হ'য়ে উঠল এবার। চত্বরের দেয়াল-ঘড়ির দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছে।...দেড়টা। উৎকর্ণ হয়ে শুনলে সুভদ্রা। কারো পায়ের শব্দ নয়। ঘুমে অচেতন পুরীর নিশ্বাস-প্রশ্বাস ধ্বনি শুধু ভেসে উঠছে বাতাসে। চত্বরের দু কোণের কাঠের পিলসুজে রাখা প্রদীপের স্তিমিত আলো উজ্জ্বল ক'রে দিলে। সলতে উসকে দিলে।

নামল আঙিনায়। আলপনাবৃত্তের রেখা ধরে সাজানো পঞ্চাশটি প্রদীপ জ্বাললে একটির পর একটি সুভদ্রা। আগে দুজনে মিলে জ্বালত। নাগরাজ আর সে। এক্ষণটিতে একা থাকতে চাইত নাগরাজ। সুভদ্রা ছাড়া অন্য কারো আসা নিষেধ ছিল। দুহাতে ভূমি স্পর্শকরে কপালে ছোঁয়ালে বার তিনেক।

চাতালে এসে বসল আবার। গালে হাত দিয়ে বসে আছে সুভদ্রা। অধীর প্রতীক্ষা। কিছুক্ষণ।

সুভদ্রা দেখছে।

মন্থরগতিতে আসছে নাগরাজ। এগিয়ে আসছে। আঙিনায় এসে থমকে দাঁড়াল। জ্বলন্ত প্রদীপ বৃত্তের দিকে লক্ষ্য রেখে, নত মস্তকে রইল খানিক। মাথা তুলে তাকাতেই, দৃষ্টি বিনিময় ঘটল দুজনের—সুভদ্রা-নাগরাজের।

বেদনায়-আনন্দে মুখে কথা সরছে না সুভদ্রার। ভাষাহীন চোখে শুধু অশ্রু ঝরছে। ঠোঁট দু'টি কেঁপে কেঁপে উঠছে। অভ্যর্থনা করতে, বসতে বলতেও ভুলে গেল সুভদ্রা। নাগরাজ দাঁড়িয়ে ধীরস্থির অচঞ্চল। একদৃষ্টে দেখছে সুভদ্রাকে প্রদীপ-আলোয়।

দশ বছর আগে, সুভদ্রার সংগে প্রথম হৃদ্যতা গড়ে ওঠে নাগরাজের। ওরা স্বামী-স্ত্রী—লখ্ রমণ সুভদ্রা আসে নাগরাজের নারকেল দড়ির কারখানায়। দড়ি তৈরী, পাকানোর কাজ করত উভয়ে। কর্মী হিসেবে সুদক্ষ কারিগরই ছিল ওরা। কিন্তু কিছুদিন বাদে, ওদের নামে অভিযোগ আসতে লাগল প্রায়ই নাগরাজের কাছে। মেয়ে কর্মী-মজুরণীদের তরফ থেকেই। লখ্ রমণটা পাঁড় মাতাল। কাজের সময় মাতলামো করে বেশীর ভাগ। নিজেরও অন্যের কাজ পণ্ড করে কেবল। আর সুভদ্রার তো রঙ্গো নেই বলেই চলে। যদিও বকাবকি করে একটু শান্ত রাখা যায় লখ্ রমণকে, কিন্তু সুভদ্রার নাচানাচি বন্ধ করে কার সাধ্যি! বেপরয়, কাউকে পরোয়া করে না। বকলে আরো বেহায়াপনা চরমে ওঠে ওর। হাসির ফোয়ারা ছোটার বহর দেখে কে! হেসে গায়ে গড়িয়ে পড়ে সকলের। কি ঘেন্না! মজুরণীরা তো যে যার পেরিমিটিকে—স্বামীকে সামলাতে পথ পায় না। স্বামীরাও তেমনি নির্লজ্জ। সুভদ্রার হাসি দেখলে যেন স্বর্গের চাঁদ পায় হাতে একেবারে। কাজকর্ম ফেলে, হেসে হেসে কেঁদে মরে সব। এরকম চলতে থাকলে, মেয়েরা একজোট হয়ে কাজ বন্ধ ক'রে দিতে বাধ্য হ'বে। স্বামীদেরও বন্ধ করাবে।

বারবার এই ছক-বাঁধা আবেদন-অভিযোগ আর কর্মবিরতির শাসানি নাগরাজের মনে রেখাপাত করেনি একটুও। সুভদ্রা সুদর্শনা। সর্বকনিষ্ঠা কর্মনিপুণা। এরকম ক্ষেত্রে গাত্রদাহ হওয়া স্বাভাবিক অন্যদের। তাড়াবার জন্যে উঠেপড়ে লাগবেই ওরা। ওদের আরজি এড়িয়ে গেলে, চুপচাপ থাকলে, আপনা হইতে চুপ হ'য়ে যাবে ওরা একদিন।

নাগরাজের ভুল ধারণা ভাঙল শীগগিরই। চুপ হ'ল না ওরা। বরং দিনে একবারের জায়গায় তিন-চারবার করে অভিযোগ পেশ হ'তে লাগল নাগরাজের কাছে। শেষে, উত্যক্ত হ'য়েই লোকমারফৎ সুভদ্রাকে শাসিয়ে দিলে নাগরাজ। কারখানায় বেহায়াপনা চলবে না মোটে সুভদ্রার। এবার কিছু শুনতে পেলে, চাকরি খতম সংগে সংগে।

শাসন করার ফলও ফলল উলটো। ক'দিন পরই শুনতে হ'ল—'সুভদ্রার জ্বালায় তিষ্ঠনো অসম্ভব হ'য়ে উঠছে। আগের চেয়ে আরো চতুর্গুণ বেড়েছে। সাবিত্রীর স্বামী নরহরির সংগে ফষ্টিনষ্টি গলাগলি দৃষ্টিকটু হ'য়ে উঠছে বড় বেশী। অভিযোগকারিণী সাবিত্রী স্বয়ং এসেছে নাগরাজের কাছে। সংগে নিয়ে এসেছে লখ্ রমণকেও সাক্ষী হিসেবে।

লখ্ রমণ সজল চোখে জানালে, প্যাল্লায়োর স্ত্রীর জ্বালায় দেশান্তরী আত্মঘাতী হ'বে সে। স্ত্রী তার আয়ত্তের বাইরে। বারণ করলে বলে, আমার কথা না শুনলেই এরকম হ'বে। ওর কথা শোনা মানে, কোথাও না

বেরিয়ে; নিজের সুখসুবিধে বন্ধুবান্ধব বিসর্জন দিয়ে ঘরের কোণে ব'সে দমবন্ধ হ'য়ে মরা!

সুভদ্রাকে পরিবর্তন করার পথও বাতলে দিলে মালিককে লখ্‌যমণ। কিছুদিনের জন্যে চাকরিতে জবাব দিলে, জব্দ হ'বে। নিজেকে শুধরে নিতে বাধ্য হ'বে।

লখ্‌যমণের কথামত কাজ ক'রেছিল নাগরাজ।

এরপর বহুদিন কেটে গেছে। সুভদ্রার সংগে দেখা-সাক্ষাৎ আর হয় নি। কারখানায় কোনো গোলমালও আর শোনা যায় নি।

অকস্মাৎ একদিন ভোরে নাগরাজের বাঙলোয় এসে উপস্থিত হ'ল সুভদ্রা। নাগরাজের দু'পায়ে মাথা রেখে, ফুঁপিয়ে, ফুঁপিয়ে, কাঁদতে লাগল। ডেরা থেকে বার ক'রে দিয়েছে লখ্‌যমণ। অপরাধ—সরাবীদের সংগে মিশতে, সরাব খেতে নিষেধ করে। ঘরে সরাব দেখলে জমিতে ঢেলে দেয়।

ছ'মাস আগে লিভারের ঘায়ে মরমর হ'য়েছিল লখ্‌যমণ। ডাক্তারদের বারণ সরাব ছোঁয়া। বিষ ওর পক্ষে। খেলে যমকে ঠেকানো যাবে না আর কোনোক্রমে। কিন্তু এসব কথা মানছে না, শুনবে না মোটে লখ্‌যমণ। বেশী বকাবকি করলে রেগে আগুন হয়ে উঠবে। মারমুখী হ'য়ে তেড়ে আসবে।

সুভদ্রার আপাদমস্তক নিরক্ষণ করলে নাগরাজ। প্রায় সর্বাংগেই কালশিটের দাগ। হিত কথা শোনানোর যথেষ্ট পুরস্কার পেয়েছে সুভদ্রা লখ্‌যমণের কাছ থেকে।

লখ্‌যমণের মর্মস্থানে আঘাত হেনেও সরাব ছাড়াবার সব চেষ্টা করেছে সুভদ্রা। ওর অপছন্দ করাটাকেই হাতিয়ার বেছে নিয়েছে। নরহরিকে বলে কয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে মেলামেশার অভিনয় চালিয়েছে। মুহূর্তের জন্যেও লখ্‌যমণের মনের কোঠায় জলুনি ধরাতে পারত সুভদ্রা রাজ, কিন্তু জলুনি ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল একেবারে সুভদ্রার চাকরি খতম হওয়ায়, দিনরাত ঘরে বসে থাকায়।

বেদনাকাতর স্বরে বলল সুভদ্রা, হুজুর। ওকে বাঁচান। আমি মরি ক্ষতি নেই।

সুভদ্রার শেষের কথা শুনে, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হ'য়ে ছিটকে গেল যেন নাগরাজ। খানিক দূরে সরে গেল। সুভদ্রার স্বরে আর একজনের স্বর, সুভদ্রার কথায় আর একজনেরই কথা শুনলে।

—বত্রিশটি বসন্ত কেটেছে সবে নাগরাজের তখন। জন্মতিথিপালন করলে দময়ন্তী ঘটা করে। দেবতার আশীর্বাদ ফুল এনে এনে মাথায় ছোঁয়ালে। দীর্ঘজীবন কামনা করলে। বেশ উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল দময়ন্তীকে। একটা অপরিসীম আনন্দে মন ভরে উঠছিল সারাদিন ধরেই নাগরাজের।

সেইরাতে। রজনীগন্ধার স্তবক হাতে নিয়ে, দময়ন্তীর ঘরে এসে হাজির হ'ল নাগরাজ। দরজা ভিতর থেকে ভেজানোই ছিল। এই রকম রোজ থাকে। আলতো ভাবে দরজা ঠেলে ঘরে প্রবেশ করেছে নাগরাজ। বিছানায় বসল। চোখ বুজে, জেগে শুয়েছিল দময়ন্তী। ধড়মড়িয়ে ওঠে বসল। নাগরাজকে দেখছে। দেখছে দেখছে দেখছে।

নাগরাজের চাউনিতে হাসিতে হঠাৎ যেন কি খুঁজে পেল দময়ন্তী, রেগে উঠল ভীষণ। নাগরাজের রাতজাগা আর তার ঘুম ভাঙানোর জন্যে ভর্ৎসনা করলে। ঘরে ফিরে যেতে বললে। একরকম জোর করেই ঘর থেকে বার করে দিলে নাগরাজকে। সজোরে দরজা বন্ধ করে দিলে।

ফিরে এলো ঘরে নাগরাজ দারুণ মর্মবেদনা নিয়ে। স্ত্রীর এই অপ্রত্যাশিত অপমান প্রতিটি স্নায়ুকেন্দ্রে ছুঁচ বিঁধিয়ে দিলে নাগরাজের। এতো ঘৃণা কেন এলো দময়ন্তীর! মরণাপন্ন অসুখে মরণপণ করে বাঁচিয়ে তুলেছিল তাকে ওই একদিন। তখন ঘৃণা করেছে সকলে। কাছে ঘেঁষে নি কেউ। ঘৃণার লেশমাত্র ছিল না একটিমাত্র লোকের—দময়ন্তীর। জীবনের ভয় পর্যন্ত ছিল না ওর। শিয়রে বসে থেকেছে রাতের পর রাত, দিনের পর দিন।

দময়ন্তীর অস্বাভাবিক আচরণে আশ্চর্য হ'য়ে গেল নাগরাজ।

টেবিলে মাথা রেখে, অসহায় শিশুর মতো কেঁদেছে একলা ঘরে। খানিক পর, পিছনে তাকিয়েছে। দময়ন্তী আসছে নিশ্চয় তাকে সান্ত্বনা দিতে। তার কান্নার নিশ্বাস এঘরের দেয়াল ফুঁড়ে ওঘরের কানে পৌঁচেছে।

কিন্তু না, আসছে না কেউ। মনের ভুল। অন্ধকার ঘর ডুকরে কেঁদে উঠেছে তার সংগে।

দময়ন্তী এলো না। ক্ষোভ-অভিমান বেড়ে উঠতে লাগল ক্রমে নাগরাজের। দময়ন্তীর নির্দয় ব্যবহারের কারণ খুঁজে বার করলে নাগরাজ। ··

বিশ্বেশ্বর। বাল্যবন্ধু বিশ্বেশ্বর। দময়ন্তী বৌদির অনুগত খুব। বৌদিও দেওরের বাধ্য। বিশ্বেশ্বর বৌদির হ'য়ে ওকালতি করে নাগরাজের কাছে প্রায়ই। বৌদি অন্যায় কথা বলতে জানে না। সব কথাই দাদার দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নেওয়া উচিত। শোনা উচিত। আর বৌদি তো উকিলের বুদ্ধিমত্তার তারিফে পঞ্চমুখ।

স্বামী-স্ত্রীর সব ব্যাপারেই বিশ্বেশ্বরের মাথা গলানো পছন্দ করেনি পড়শীরা, আত্মীয়-স্বজনেরা। মাঝে মাঝে অনেকের কাছ থেকেই তামাসা বিদ্রূপ শুনতে হয়েছে নাগরাজকে। স্বামীর চেয়ে পাতানো দেওরেরই আধিপত্য দেখা যাচ্ছে বৌএর ওপর বেশী। স্বামীর অবাধ্য হ'য়ে উঠছে দিন দিন বৌ। দেওরের সব কথাই বেদবাক্য—শিরোধার্য!

এসব কথা হেসে উড়িয়ে দিয়েছে নাগরাজ। সরল চোখে দেখেছে ওদের দু'জনকে। সরল প্রাণে বিশ্বাস করেছে। কিন্তু সে বিশ্বাস ভংগ করেছে বিশ্বেশ্বর। দময়ন্তীর মন থেকে নাগরাজকে সরিয়েছে। বিশ্বেশ্বরের ওপর কোনোদিন রোষ প্রকাশ করতে দেখেনি দময়ন্তীকে নাগরাজ। ঘর থেকে বার করে দিতেও না।

এঘরে একা জলেপুড়ে মরছে নাগরাজ। ওঘরে বিশ্বেশ্বরের সুখস্মৃতির ধ্যানে মগ্ন দময়ন্তী! ক্ষেপে উঠল নাগরাজ। মাথায় বুকে আগুন জলছে। দ্রুত পদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দুম-দুম-দুম।

দরজায় লাথি মেরে চলেছে নাগরাজ একনাগাড়ে।

দরজা খুলল দময়ন্তী।

দময়ন্তী পাথর মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। দেখছে নাগরাজ। একবার জিগ্যেস করছে না কোনো কথা, ঘরে ডাকছে না পর্যন্ত। বিকৃত গলায় চীৎকার করে উঠল নাগরাজ—বেরিয়ে যাও এখুনি! বিশ্বেশ্বরের বাড়ীতে চলে যাও! মুখ দেখতে চাইনে।

ভালো করে আরো একবার নাগরাজের মুখচোখ দেখলে দময়ন্তী। ধীর পদক্ষেপে মৌনমুখে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

এক, দুই, তিন···ছ'মাস অবধি অপেক্ষা করেছে দময়ন্তীর জন্যে নাগরাজ। ফিরে আসবে দময়ন্তী। নিজের ভুল শুধরে নেবে। বিশ্বেশ্বরকে ভুলবে। আগের মতো ভালোবাসবে তাকে আবার। কিন্তু সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা কল্পনায় বাসা বাঁধা হ'ল নাগরাজের। পূর্ণ হ'ল না।

ঝিমিয়ে পড়া রাগ আবার সতেজ হ'য়ে উঠল নাগরাজের। প্রতিশোধ নিতে হ'বে। জব্দ করতে হ'বে। বুকে শেল বিঁধিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারতে হ'বে। বিয়ে করবে নাগরাজ।

···সমস্ত ব্যবস্থা হ'য়ে গেছে বিয়ের। সহসা বজ্রপাত হ'ল যেন নাগরাজের মাথায়। পাত্রী পক্ষ সাফ জবাব দিয়েছে, বিয়ে দেবে না। পাত্র অসুখ গোপন ক'রেছে। না বুঝে একটি পরিবারের সর্বনাশ করতে চলেছে। পাত্রের প্রথমা স্ত্রী আর অন্তরংগ বন্ধুই গোপন তথ্য ফাঁস ক'রে দিয়েছে।

ধমনীতে উষ্ণ রক্তস্রোত ব'য়ে গেল নাগরাজের। চোখের সামনে দময়ন্তীর তাজা রক্ত দেখতে লাগল শুধু নাগরাজ। কেন বাড়ী থেকে বার করে দেবার সময় শেষ করে ফেলেনি। এতোখানি দুষমণি করবে ও—স্বপ্নের বাইরে! লোক দেখানো সেবা করে পতিব্রতা সাজত শুধু!

দময়ন্তীকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলবার জন্যে উন্মত্তের মতো বেরিয়ে পড়ল নাগরাজ।

শ্বশুরবাড়ী এলো।

দময়ন্তীর সংবাদ জানতে চাইলে শাশুড়ীর কাছে। অঙ্গুলী সংকেতে দেখিয়ে দিলে শাশুড়ী—ওপরে দময়ন্তী। এ বাড়ীর আনাচেকানাচে সব কিছু নখদর্পণে নাগরাজের। বহুবার এসেছে গেছে। থেকেছেও।

তরতর ক'রে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলো নাগরাজ। ঠাকুরঘরে দোরগোড়ায় এসে থমকাল। চেতনা জেগে উঠেছে নাগরাজের। বিস্ময় বিমূঢ় হ'য়ে যাচ্ছে। জেগে স্বপ্ন দেখছে যেন সে। অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখছে। কথা শুনছে।

পুজারিণী দময়ন্তী শ্রীকৃষ্ণের পূজা করছে ঠাকুরঘরে। শ্রীকৃষ্ণের পায়ের তলায় যুঁইফুলের মালা পরানো চন্দনের আলপনা আঁকা ফোটো নাগরাজের।

চোখের জলে, করুণ সুরে প্রার্থনা জানাচ্ছে দময়ন্তী। কৃষ্ণা! তনুশ্রী! না জীবতম্ ওয়াড়িকে ইচচি ব্রদি-কিংচু। কৃষ্ণ প্রভু! আমার পরমায়ু নিয়ে ওকে বাঁচিয়ে রাখো!

ডানদিকের পিঠটা চিনচিন ক'রে উঠল নাগরাজের। পুরনো অস্ত্রের জায়গাটায় বিষের জলুনি ধরল যেন। অস্থির হয়ে পড়ল নাগরাজ। দাঁড়াতে পারলে না আর এক মুহূর্ত ওখানে। দৌড়ে পালিয়ে গেল।

বাড়ী ফিরে সারাক্ষণ ভেবেছে নাগরাজ দময়ন্তীর কথা। কত হাসিখুসি-আমুদে মেয়েই না ছিল দময়ন্তী। বিয়ে হবার পর থেকে বছর তিনেক অবধি বেশ সুখ-শান্তিতে কেটেছে তাদের জীবন। সে সুখ-শান্তিতে বাদ সাধল একদিন জীবনক্ষয়ী ক্ষয়রোগ। নাগরাজের ডানদিকের ফুসফুস জুড়ে ক্ষয়রোগ জেঁকে বসেছে। ক্ষয় প্রতিরোধের আপ্রাণ চেষ্টা চলল ডাক্তারদের। ডানদিকের পাঁজর কেটে ফুসফুসকে বিশ্রাম দেওয়া হ'ল। থার্কোপ্লাষ্টি করা হ'ল। অসুস্থ অবস্থায় আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে সেবা করেছে দময়ন্তী। ঠোঁটের কোণে বিষণ্ণের হাসি টেনে অভয় দিয়েছে—ভালো হয়ে উঠবে নিশ্চয়। ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে নাগরাজ।

এক এক ক'রে তিন বছর কেটে গেছে। তবুও চোখের পাহারায় রাখে দময়ন্তী। নাওয়া-খাওয়া শোওয়া-খাটুনি—সব কিছুর সময় বাঁধা। উনিশ থেকে বিশ হবার উপায় নেই। ডাক্তাররা বলেছে, বাঁ ফুসফুসটার ওপর বেশী ধকল পড়লে মুস্কিল হতে পারে। ওটাও ক্ষয়রোগের হাত থেকে রেহাই না পেতে পারে। সর্ব বিষয়ে সংযমী হয়ে থাকতে হ'বে নাগরাজকে। সংযত রাখবার—ওর জীবনের ভার দময়ন্তীর ওপর।

নিয়ম শৃংখলার শেকল দিয়ে আষ্টেপিষ্ঠে বেঁধে রাখলে দময়ন্তী নাগরাজকে। সময় সময় নাগরাজের অবাধ্য-দুরন্ত মন বিদ্রোহী হ'য়ে উঠত। শেকল ছিঁড়ে মুক্ত হ'তে চাইত। ইচ্ছে করেই অনিয়ম করত। সুস্থ আছে, ভয়ের কারণ নেই এখন। অনিয়ম ভংগ ক'রে দিয়েছে তখুনি বিশেশ্বর। বৌদি যা করে, বলে—মংগলের জন্যে বাঁচাবার জন্যে। যদি আর একটায়—

মুখে আঙুল দিয়ে, ইশারায় চুপ করতে বলেছে বিশে-শ্বরকে দময়ন্তী। হাসিমুখে নাগরাজের কাছে এসেছে। চিবুক ধরে আদর করে বলেছে, তুমিই আমার সব। তুমি বাঁচলে আমি। চোখে জল ভরে উঠেছে দময়ন্তীর।

নাগরাজের চেয়ে, নাগরাজের জীবন রক্ষার দায়িত্বটাই সব থেকে বড় হয়ে উঠেছিল দময়ন্তীর কাছে। কাছে গেলে, হাত ধরলে, হুঁশিয়ার করে দিত—ডাক্তারদের নিষেধ। হাসতে হাসতে ছুটে পালিয়ে যেত।

সেদিন রাতে নাগরাজের চোখে কামনার তরল আগুন দেখেছিল নিশ্চয় দময়ন্তী, তাই ডাক্তারের নিষেধ বজায় রাখতে বুঝি ছদ্মকোপে ভর্ৎসনা করেছিল তাকে।

অনুশোচনায় ঠোঁট কামড়ে রক্ত বার ক'রে ফেলল নাগরাজ। হাহাকারে ভরে উঠল মন। নিষ্কলংক কপালে কলংকের টীকা পরিয়ে যাকে বার ক'রে দিয়েছে, কেমন ক'রে ফেরাবে তাকে আর?

এই চিন্তা পেয়ে বসল নাগরাজকে দিনের পর দিন। রাতের ঘুম গেল। দিনের কাজ গেল। মন অবসাদগ্রস্ত হ'য়ে পড়তে লাগল ক্রমে। শরীরও ভেঙে আসতে লাগল।

অসুস্থ হ'য়ে পড়ল আবার নাগরাজ। এবারে বাঁদিকের ফুসফুসে ক্ষয়ের দাপট সুরু হয়েছে। মুখে মুখে নাগরাজের ব্যাধির খবর পৌঁছল দময়ন্তীর কানে।

এলো দময়ন্তী!

দময়ন্তীকে দেখে, দু'চোখের জলে ভেসেছে শুধু নাগ-রাজ। ক্ষমা চাইতে ঠোঁট কেঁপেছে। ক্ষমা চাওয়ার অযোগ্য সে। মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরোয়নি।

মাথার কাছে এসে বসেছে দময়ন্তী। স্নিগ্ধ স্নেহ ওপ-চানো ধরা গলায় বলেছে, খবর দাওনি কেন? এভাবে আত্মঘাতী হ'তে দেবন! জীবন থাকতে! দেয়ালে টাঙানো শ্রীকৃষ্ণের ছবির দিকে তাকিয়ে, জোড়হাত করে, চোখ বুজে থেকেছে খানিকক্ষণ। তারপর জলভরা চোখে হেসে বলেছে, ভয় নেই, ভালো হয়ে যাবে আবার তুমি! দেবতাকে ভালো ক'রে দিতে বলেছি।

সত্যিই যেন শ্রীকৃষ্ণ কথা শুনলেন ভক্তের। ডাক্তাররা

দ্বিতীয় ফুসফুসেও থার্কোপ্লাষ্টি করল। ক্রমে সুস্থ হ'য়ে উঠল নাগরাজ।

নাগরাজ সুস্থ হ'য়ে উঠল বটে, কিন্তু দময়ন্তী অসুস্থ হ'য়ে পড়তে লাগল। নাগরাজের সেবায় মনপ্রাণ সমর্পণ ক'রে রেখেছিল দময়ন্তী। নিজেকে লক্ষ্য রাখবার অবকাশ পায়নি একটুও। নাওয়া-খাওয়া ঘুম-নিদ্রা ত্যাগ করেছিল সব।

রক্তশূন্যতা রোগে আক্রান্ত হ'ল দময়ন্তী। বাঁচিয়ে তুলতে বহু অর্থব্যয় করেছে নাগরাজ। চেষ্টার ত্রুটি রাখেনি কোনো। তবুও বাঁচানো গেল না দময়ন্তীকে। মরণের আগের মুহূর্তেও বলেছে দময়ন্তী, কৃষ্ণ! তনুন্ত্রী না জীবতম্…। কৃষ্ণ! প্রভু! আমার পরমায়ু নিয়ে ওকে বাঁচিয়ে রাখো!

দময়ন্তীর মৃত্যুর পর কেমন যেন হ'য়ে গেল নাগরাজ। অত ক্রোধী বদমেজাজী—একেবারে মাটির মানুষ। কারখানার কোনো কর্মীকে যে কারণে-অকারণে জুতোর ঠোক্কর দিয়ে কথা বলত, সে কারো শত অন্যায় দেখলেও, পিঠে হাত চাপড়ে বলে, ভুল মানুষেরই হয়, দোষ মানুষেরই হয়—ঘাবড়ে যেয়োনা, সংশোধন করতে চেষ্টা কর নিজেকে।

প্রত্যেক মজুর-মজুরণীর অসুখে বিসুখে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সেবাশুশ্রূষা করতে লাগল নাগরাজ। ওদের হাসিকান্নার অংশীদার হতে লাগল। সকলের পরিবারের একজন হয়ে উঠল—ওদের অভিভাবক—দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। দেবতা।

দেবতা দেবী দময়ন্তীকে হারাবার পরও হারাতে চায়নি। খুঁজেছে অনেক। রাস্তাঘাটে—যেখানে যত মেয়ে দেখেছে—মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছে। দময়ন্তী এদের ভিতর আছে কিনা! পায়নি।

দময়ন্তীকে খুঁজে পেল, দময়ন্তীর মৃত্যুর পনের বছর পরে নাগরাজ। তারই কারখানার মেয়ে কর্মী সুভদ্রার ভিতরে।

স্বামীকে বাঁচানোর জন্যেই এসেছে সুভদ্রা। নাগরাজের শরণাপন্ন হয়েছে।

সুভদ্রার কাছে এলো নাগরাজ। হাত ধরে তুলে বসাল। আশ্বাস দিল, নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে থাকো বেটী এখানে! লখ্ষমণকে কি ক'রে শোধরানো যায়—পথ খুঁজে বার করতে হবে।

নাগরাজের নিজের কাণেই বিদ্রূপের সুরে বেজে উঠল শেষের কথা। শোধরানোর পথ কি পেয়েছিল নাগরাজ? লখ্ষমণ আর সে কি একই অপরাধে অপরাধী নয়?

সুভদ্রাকে তাড়িয়ে দেবার পর থেকে কাজে আর আসেনি লখ্ষমণ। লোক পরম্পরায় শুনেছে সুভদ্রা—তার না থাকার সুবিধের সরাব গিলছে দিন-রাত লখ্ষমণ। পেটের যন্ত্রণায় বেহুঁশ হ'য়ে পড়েছে। হুঁশ হ'লেই আবার গিলেছে। নাগরাজের কাছে কেঁদে পড়ল আবার সুভদ্রা। অনুরোধ করলে, নায়েনা—বাবা! ওকে বাঁচাও যে কোনো উপায়ে!

বাঁচাতে গেছে লখ্ষমণের ডেরায় নাগরাজ। লখ্ষমণকে নীতি কথা বলে অনেক বুঝিয়েছে। মদ ছাড়াতে পারে নি। অনেক ডাক্তার-বৈদ্য দেখিয়েও পেটের অসহ্য যন্ত্রণা সারাতে পারে নি। বাঁচাতে পারে নি লখ্ষমণকে। নিয়তির অচ্ছেদ্য বন্ধন থেকে ছিন্ন করে আনতে পারে নি।

লখ্ষমণের মৃত্যু সংবাদে মূর্ছা গেল সুভদ্রা।

সুভদ্রার পরিস্থিতি প্রেরণা যোগাল নাগরাজকে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে। ভুল বোঝাবুঝির ফলে স্বামী-পরিত্যক্তা মেয়েদের আশ্রয়স্থল। আশ্রয়স্থলের কর্মীদের মুখ্য উদ্দেশ্যই হবে স্বামী স্ত্রীর ভুল ভাঙিয়ে মিলন ঘটানো।

নিজের জীবনে সুখের নীড় ভেঙেছে, তাই অন্যের জীবনে স্থায়ী সুখের নীড় বাঁধবার জন্যে তলায় তলায় অক্লান্ত চেষ্টা চলতে লাগল নাগরাজের…কোহামগাম্‌-এ 'আম্মাইল্লু'—মাতৃভবন গড়ে উঠল নাগরাজের অর্থে পরিশ্রমে। সুভদ্রাকে প্রধানা করা হল আম্মাইল্লুর।

প্রধানা করা নিয়ে নানা লোকে নানা কানাঘুষো করছে নাগরাজ-সুভদ্রার সম্পর্ক জড়িয়ে। কান্নায় ভেঙে পড়েছে সুভদ্রা। নাগরাজকে অনুনয় বিনয় করে জানিয়েছে ওকে দূরে সরিয়ে দিতে। ওর জন্যেই এই অপযশ। আব্বার অপযশ বরদাস্ত করা ওর পক্ষে অসম্ভব।

নির্বিকার মুখে হেসেছে নাগরাজ। বলেছে, ভালো কাজে বাজে কথায় কান দিলে চলে না বেটী!

আঁচলে চোখ মুছে ঘরে ফিরে গেছে সুভদ্রা।

বছর পাঁচেক কেটে গ.ছ। আম্মাইল্লু প্রতিষ্ঠানটির সুনামও ছড়িয়েছে অনেক জায়গায়। হঠাৎ একদিন প্রবল জ্বরের আক্রমণে অস্থির হয়ে পড়ল নাগরাজ। কাছে বসে আছে—সেবা করছে সুভদ্রা। বিকারের ঘোরে মাঝে মাঝে সুভদ্রাকেই দময়ন্তী বলে ডাকছে নাগরাজ। টস টস ক'রে চোখের জল পড়ছে সুভদ্রার দু'গাল বেয়ে। মনে পড়ল সুভদ্রার নাগরাজের মুখে শোনা কথা। তোমার আম্মা দময়ন্তী সব অসুখেই শ্রীকৃষ্ণকে ডেকে ডেকে ভালো করে তুলতো। মনে মনে বলতে লাগল সুভদ্রা, আম্মা দি কৃষ্ণা বাগোছেচে। মার কৃষ্ণ ভালো করে তোলো।

কিছুদিন জ্বর ভোগ করে সেরে উঠল বটে নাগরাজ, কিন্তু নাগরাজের মনে একটা অশুভ-আশংকার ছায়া উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল অহর্নিশি। তাকে সেবা ক'রে দময়ন্তী চ'লে গেছে দুনিয়া ছেড়ে, দময়ন্তীর প্রতিরূপ সুভদ্রাও যাবে বুঝি। সে ইংগিত পেয়েছে সে সেদিনকার জ্বরে—সুভদ্রার প্রাণঢালা সেবায়। কিন্তু সুভদ্রাকে যেতে দেবে না সে। একবার ভুল হ'য়ে গেছে। এবারে নিজে সরে থাকবে দূরে। ভুল হ'তে দেবে না আর। সুভদ্রাকে বাঁচাতে হ'বে। সুভদ্রার ভিতর দময়ন্তীকে।

সুভদ্রাকে বুঝিয়ে বলেছে নাগরাজ। আম্মাইল্লুর দায়িত্ব পরিচালনার ভার ওকে দিয়ে নিশ্চিন্ত। ওর কর্মদক্ষতা প্রমাণ হ'য়ে গেছে। অনেক মেয়েদের পুনর্মিলন ঘটেছে। প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সফল হ'য়েছে।

নাগরাজের কথা শুনে অনেক কেঁদেছে সুভদ্রা। ছাড়তে চায় নি প্রথমে, আশ্বাস দিয়ে বলেছে নাগরাজ আসবে সে। দেখা হবে সুভদ্রার সংগে। বছরের একটি দিনে। দময়ন্তীর জন্মদিনের জন্মলগ্নে।

কথা রেখেছে নাগরাজ। দময়ন্তীর জন্মক্ষণে এসেছে। পঞ্চাশতম জন্মতিথির স্মারক পঞ্চাশটি জলন্ত প্রদীপের কাছে শ্রদ্ধা জানিয়েছে।

চাতালের সিঁড়ি বেয়ে উঠল নাগরাজ। সচেতন হ'ল সুভদ্রা। উঠল। অনুসরণ করলে নাগরাজকে।

...পুজোর ঘর। সিংহাসনে বসানো দময়ন্তীর প্রতিকৃতি ফুলে ফুলে সাজানো। দু'পাশে রূপোর শেকল ঝুলছে। শেকলের মাঝে মাঝে জলন্ত গোল প্রদীপ। প্রদীপের আলো ঠিকরে পড়ছে দময়ন্তীর ছবির চোখেমুখে। ছবি যেন জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে!

বাঁ পাশের তামার থালা থেকে যুঁইফুলের মালা দু'ছড়া তুলে নিলে নাগরাজ। পরিয়ে দিলে ছবিতে। দেখলে খানিক। একটি মালা খুলে নিয়ে সুভদ্রার হাতে দিয়ে গম্ভীর মধুর কণ্ঠে বললে, বদ্ কুণ্ডু। দীর্ঘজীবী হও!

ঘর থেকে বেরিয়ে এলো নাগরাজ-সুভদ্রা। চত্বরের বাঁ কোণে ফিরে তাকালে নাগরাজ। ফুলের পাহাড়। ভোরেই ফুলে ফুলে ঢেকে দেবে দময়ন্তীর ছবি মেয়েরা। জন্মতিথির উৎসব পালন করবে। অপরিসীম আনন্দে চকচকিয়ে উঠল দু'চোখ নাগরাজের।

...আঙিনা পার হ'য়ে যাচ্ছে নাগরাজ। জলন্ত প্রদীপবৃক্ষের কাছে মালা হাতে দাঁড়িয়ে সুভদ্রা। নির্নিমেষ নয়নে দেখছে। সুভদ্রার নিশ্বাস-প্রশ্বাস বলছে, আব্বা বদ্‌কুণ্ডু। বাবা দীর্ঘজীবী হও! দীর্ঘজীবী হও!

দু'চোখে জলের ধারা নামছে সুভদ্রার। ঝাপসা হ'য়ে আসছে দৃষ্টি।

...দূরে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে চলেছে নাগরাজ। দৃষ্টির বাইরে চলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

যোগপথ

শ্রীরাসবিহারী ভট্টাচার্য্য

এ জগতে রহস্য অনেক আছে, কিন্তু সেই সকল রহস্যের মধ্যে "যোগ"কে একটি "উত্তম রহস্য" বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। যে রহস্য জানিতে পারিলে পৃথিবীর কোন রহস্যই আর অজ্ঞাত থাকে না, জীবনের কোন সাধই অপূর্ণ থাকে না, তাই মহাযোগেশ্বর হরি সেই পুরাতন যোগের কথা পরম ভক্ত ও সখা অর্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া সাধুদের পরিত্রাণের জন্য ও দুষ্কৃতদের বিনাশ সাধন জন্য এবং এই যোগধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপন জন্য "কামোপভোগপরমা"বাদীদিগের প্রতি করুণা করিয়া উপদেশ দিতে (দ্বাপরের শেষভাগে ও কলির প্রথমেই) আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইহাই গীতা শাস্ত্রের পরম গুহ্য ও প্রধান প্রতিপাদ্য কথা। যে যে শাস্ত্র বেশ মধুর, রোচক, শ্রুতিসুখকর কথায় পূর্ণ, যাহাতে কোনও কষ্টকল্পনার ধার ধারিতে হয় না, সাধনাদি কোনত কষ্টকর কাণ্ড-কারখানার মধ্যে না গিয়া দুইটা মুখের কথায় এবং কল্পনার মারফতে স্বর্গ-মর্ত্ত-অন্তরীক্ষের সমস্ত বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়া শীঘ্রই মহামনীষীরূপে তথাকথিত মনীষীদের নিকট পূজাদি পাওয়া যায়, অথচ বিশেষ বিধি-নিষেধও নাই, সেই সকল শাস্ত্রকে বড় করিয়া যাহা বাস্তবিকই বড় এবং শাস্ত্রকর্ত্তা ঋষিগণের দ্বারা লিখিত ও সমর্থিত এবং যাহা স্বয়ং "পদ্মনাভের" মুখ নিঃসৃত সেই "গীতা" শাস্ত্রখানির প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করিতেছি—ইহা অপেক্ষা অধোগতির কথা আর কি হইতে পারে? যোগ-প্রভাবে অসাধ্য সাধন, অপরোক্ষানুভূতি, দিব্যদর্শন ইত্যাদিই ছিল ভারতীয় ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য। প্রার্থনা আর কাঁদা-কাটির ধর্ম্ম ভারতের নয়, ইহা অন্য দেশাগত ও অনার্য্য বুদ্ধিপ্রসূত, কিন্তু কাল-প্রভাবে দুর্ভাগ্যক্রমে আমরাও আজ অনার্য্যবুদ্ধি পরিচালিত মূঢ়। তাই পরম শ্রেয়ঃ যোগপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছি। সমস্ত শাস্ত্রেই "যোগপথ"ই শ্রেষ্ঠ পথ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। গীতায় শ্রীভগবান বলিতেছেন—তপস্বী, জ্ঞানী ও কর্ম্মী, সকলের অপেক্ষা যোগীই বড়, সুতরাং অর্জ্জুন তুমি যোগী হও, অর্থাৎ যোগ না করিলে তত্ত্বতঃ আমাকে জানিতে পারিবে না এবং তাহা না হইলে প্রকৃত শান্তিলাভ হইবে না; নচেৎ সাধারণে যেরূপ দেখার আকাঙ্খা করেন, তাহা তো অর্জুনের হইয়াছিল; কিন্তু ইহাও মায়িক দর্শন, আবার তিনি নিজ মুখে ইহাও বলিয়াছেন—

যৎ দৃষ্টং বিশ্বরূপং মে মায়ামাত্রং তদেব হি।

যাহা হউক, এখন যোগের "রহস্য" সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক। যোগরহস্য মাত্র শ্রোতব্য ও জ্ঞাতব্য নয়, রীতিমত বিচার্য্য এবং আচর্য্য। যেহেতু বিচারে বিজ্ঞান জানা যায়, কিন্তু জ্ঞান জানা যায় না। জ্ঞান অনুভূতি সাধন সাপেক্ষ; এই সাধন আবার সদ্গুরু বা আচার্য্যগুরু সাপেক্ষ। যিনি নিজে আচার করিয়া শিষ্যকে এই কৌশল দেখাইয়া দিতে পারেন, তিনিই "আচার্য্য"-পদ-বাচ্য। এই যোগজ্ঞান আবার যাহাকে তাহাকে দিতে নাই। উদ্যমী, অধ্যবসায়ী, স্বধর্ম্মে নিষ্ঠাবান, গুরুবাক্যে একান্ত শ্রদ্ধাবান ও বিশ্বাসী ভক্তকে দেওয়া উচিত।

যোগ প্রধানত চারিভাগে বিভক্ত। যথা—মন্ত্রযোগ, হঠযোগ, লয়যোগ ও রাজযোগ। পক্ষান্তরে তিন ভাগে, যথা—কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে যোগ করিতে হইলে উপ-রোক্ত কোনওটিকে ছাড়িয়া কোনও একটির দ্বারা যোগ সাধন হয় না। "যোগ" সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত সারকথা এই যে শরীরস্থ প্রাণের গতিকে সদ্গুরুর উপদেশানুসারে সুস্থ ও যদিচ্ছা সঞ্চারী করিতে পারিলেই যোগ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায় এবং তাহা দ্বারা সর্বশক্তি লাভ হয়। ইহা বৈজ্ঞানিক ও আনুভূতিক সত্য। যিনি যতটুকু সাধন করিয়াছেন বা করিবেন, তিনি নিশ্চয়ই সেই পরিমাণে উপলব্ধি করিয়াছেন, বা করিবেন। কেহ কেহ অনুমান করেন বা বলেন যে মাত্র ভাবভক্তির দ্বারাও এই-রূপ অনুভূতি হয়। একথার উত্তরে বক্তব্য এই যে, এই ভাবভক্তির স্থিতি মনের উপর, মন অত্যন্ত চঞ্চল। সুতরাং এরূপ ভাবভক্তি ও তদ্দ্বারা সঞ্জাত অনুভূতিও ক্ষণস্থায়ী এবং মনের দ্বারা সংস্কারের উপরের জিনিষ অনুভূত হয় না; কেন না, মন সংস্কারাচ্ছ। মন অপরা শক্তি, অপরা শক্তিকে ধরিয়া সেই পরদেবতার উপাসনা হয় না, অপরা শক্তিকে "দৈবী প্রকৃতি" বলা হইয়াছে, আর পরা শক্তিকেই "দৈবী প্রকৃতি" বা প্রাণ বলা হইয়াছে "মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ। ভজন্ত্য-নন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্।" সুতরাং আবাল বৃদ্ধ বণিতা, জ্ঞানী-অজ্ঞানী, ধনী-দরিদ্র ও জাতি-ধর্ম্ম নির্বিশেষে সকলেরই যথাশক্তি প্রাণায়ামাদি যোগ করা একান্ত কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ লাভ ইহাতে সম্ভব।

বিলাপ

প্রবীরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

সুখ-সুপ্তি ভেঙ্গে গেল
পাখীর কাকলী
আর জন-কোলাহলে,
ছকে বাঁধা কর্ম্মব্যস্ত জীবনের
যাত্রা হল শুরু।
গণ্ডীবদ্ধ আবর্তন মাঝে
নিজেকে ভরিয়ে দিয়ে
কত যে বসন্ত হারালুম
হিসেব তাহার আজ
পাইনে খুঁজে,
অতীতেরে প্রশ্ন করি,—রয় নিরুত্তর।
জানি, কোনদিন মেলেনি,—মিলেনা
এই প্রশ্নের উত্তর।
সারাদিন, সারারাত, সারাটি জীবন—
একটানা একঘেঁয়ে বেয়েই চলেছি
এই জীবনের খেয়া,
শেষ এর কবে কোথা—?
দারা-পুত্র-পরিবার লাগি আহার জোটাতে
যায় বেলা।
শীত-গ্রীষ্ম-বসন্ত ফুরায় কবে
কে রাখে হিসাব?
সময় কোথায়—?
অফিসের ক্ষুদ্র-কক্ষে একখানি টুলে বসে
কেবল খাতাই লিখি।
লক্ষ লক্ষ টাকার হিসাব কষি
নির্ভুল অক্ষরে।
ও টাকা আমার নয়,
আমার ঘরের চাল ফুটো।
অনাহারে অর্দ্ধাহারে কাটে মোর বেলা,
লক্ষ লক্ষ কেরাণীর
আমি একজন।
সুখ-দুঃখ অনুভব হারিয়ে ফেলেছি
অনেক অনেকদিন আগে।
আনন্দ……
সে আমার প্রাপ্য নয়।
জীবনের রূপ রস গন্ধ স্পর্শ
কিছুই জানিনে।
যুগ যুগ ধরে আমরা কলের মত
আদেশ মেনেই চলি!
অবকাশ……!
তাও নয় আমাদের তরে।
কল বিকল হয়ে সেও পায় ছুটি
আমরা বিকল হলে ছুটির বদলে মিলে
চিরতরে অবসর।
তাই রোগে শোকে আমাদের
অবসর কই?
ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে গিলে-করা পাঞ্জাবী গায়ে
অফিসে হাজির হই;
কর্তব্যের দায়ে।
একদিন যেতে যেতে পথে,
চোখের আলোটি যায় নিভে,
নতুবা হয়ত চির পরিচিত পথটির বাঁকে
কোন এক ধনীর গাড়ীর নিচে
ঘটে জীবনান্ত।
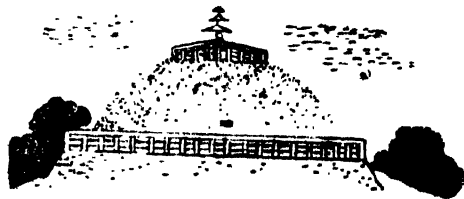
কান্ত কবির কথা

শ্রীজ্ঞান

জ্ঞানী ও গুণীর সম্বর্দ্ধনা সব দেশেই করা হয়ে থাকে। গুণীদের প্রতি শ্রদ্ধা তোমরাও জানিয়ে থাক—সম্বর্দ্ধনা উৎসব করে বা অন্য নানা রকমে। ইদানীং শতবর্ষ পূর্ত্তি উৎসব খুব জনপ্রিয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কবি, সাহিত্যিক, নেতা, ধর্ম্ম-প্রচারক প্রভৃতি গুণীজনের জন্ম শতবার্ষিকী মহাড়ম্বরে পালন করা হচ্ছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের, স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম শতবার্ষিকী উদ্যাপন হয়ে গেছে। কিছুদিন আগেই মহাকবি শেক্সপীয়রের চতুর্থ জন্ম শত-বার্ষিকীও সারা বিশ্বে প্রতিপালিত হয়েছে। এই সব শতবার্ষিকী পালনের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই সব মহান ব্যক্তিকে স্মরণ করাই শুধু নয়—তাঁদের মহৎ জীবনের আদর্শকে অনুসরণ করা, তার থেকে শিক্ষা লাভ করা। যে মহাজীবন তাঁরা যাপন করে গেছেন, যে মহাআদর্শ তাঁরা স্থাপন করে গেছেন, যে মহাকর্ম্ম তাঁরা সাধন করে গেছেন—তার থেকে প্রেরণা লাভ করে নিজেদের জীবনও সেই ভাবে গড়ে তোলবার চেষ্টা করলে তবেই এই সব স্মরণ-উৎসব সার্থক হয়ে ওঠে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তা হচ্ছে না। স্মরণ উৎসবের পর সেই মনীষীকে আমরা আবার ভুলে যাচ্ছি—তাঁর জীবনব্যাপি সাধনাকেও বিস্মৃত হচ্ছি। বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত জাতি বলে একটা অখ্যাতি আছে। এটা কিন্তু খুবই সত্যি। আমরা নিজেদেরই ভুলে যাই। আমাদের গুণীদের, আমাদের সাধকদের, আমাদের মনীষীদের খুব সহজেই আমরা ভুলে যেতে পারি—গুণীর গুণ, সাধকের সাধনা, মনীষীর মনীষা আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেও হারাই,—শুধু ছুটে চলি নতুনের সন্ধানে,· অন্ধ অনুকরণের পশ্চাতে অতীত ঐশ্বর্য্য বিস্মৃত হয়ে!

তবে, যাই হোক, এই সব শতবার্ষিকী থেকে আমরা একটি বিষয়ে লাভবান হই, সেটি হচ্ছে অন্ততঃ একবারও সেই মনীষীর কার্য্যাবলীর আলোচনা করাই শুধু নয়, তোমাদের মতন নবীনেরা, যারা হয়ত ঐ মনীষীকে বিশেষ রূপে জান না, তারাও তাঁর সম্বন্ধে কিছু শুনে, পড়ে, দেখে জ্ঞান লাভ করতে পার। আগামী শ্রাবণ মাসের ১২ই তারিখে এই রকম একজন প্রায় বিস্মৃত মনীষীর শতবার্ষিকী উদ্যাপিত হবে। এই মনীষী হচ্ছেন কবি রজনীকান্ত সেন। "কান্তকবি" নামেই কিন্তু ইনি উজ্জ্বল হয়ে আছেন বঙ্গ-ভারতীর আসরে। একদা এঁর কবিতায় ও গানে সারা বাঙ্গলা প্লাবিত হয়ে গেছে। বাল্যকাল থেকেই রজনীকান্ত কবিতা লেখায় হাত দেন এবং পরিণত বয়সে মৃত্যুর আগে পর্য্যন্ত তিনি অবিশ্রান্ত ভাবে কাব্য সাধনা করে গেছেন। তাঁর গান, বিশেষ করে তাঁর রচিত স্বদেশী গান, সেই স্বদেশী যুগে বাংলার তরুণদের উদ্দীপিত করে দেশের কাজে প্রেরণা জুগিয়েছিল।

কান্ত কবি শুধু স্বদেশী গান রচনা করেই বিখ্যাত হন

নি—ভক্তিমূলক গান, হাসির গান, বিষাদের গান, এমন কি তোমাদের মতন কিশোরদের মনের মতন গানও রচনা করে গেছেন।

কান্ত কবি রচিত কয়েকটি গান এখানে উদ্ধৃত করছি।—

হজমী গুলি

(বাণী)

আঃ, যা কর, বাবা, আস্তে ধীরে
ঘা কর কেন খুঁচিয়ে ?
পাতলা একটা যবনিকা আছে,
কাজ কি সেটাকে ঘুচিয়ে ?
ফেলো না পৈতে, কেটো না টিকিটে,
সর্ব্ব-বিভাগে প্রবেশ-টিকিট এ,
নেহাৎ পক্ষে টাকাটা সিকিটে
মেলেও তো ন্যাকা বুঝিয়ে।
কালিয়া কাবাব, চপ, কাটলেট,
টিকি ঝাড় আর খাও ভরপেট,
পৈতেটা কাণে তুলে নিয়ে ব'স,
নামাবলী খানা কুঁচিয়ে।
(কীর্ত্তন-ভাঙ্গা সুর—গড় খেমটা)

জেনে রাখ

(বাণী)

মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই যে পুরো পাঁচ হাত লম্বা,
সাধু সেই, যে পরের টাকা নিয়ে দেখায় রম্ভা !
ধার্ম্মিক বটে সেই, যে দিনরাত ফোঁটা তিলক কাটে ;
ভক্ত সেই যে আজন্মকাল চৈতন্য নাহি ছাঁটে।

*   *   *   *

সেই কপালে', বিয়ে করে যে পায় বিশ হাজার পণ,
নারীর মধ্যে সেই সুখী যার করতে হয় না রন্ধন।
সেই নিরীহ, রামের কথা শ্যামের কাছে দেয় বলে,
সেই বাবু, যে কোঁচা হাতে জামায় ফুঁদিয়ে চলে।

*   *   *   *

'সর্ট-সাইটেড' চশমা নিলেই, বুঝবে ছোকরা ভাল ;
বাপকে যে কয় 'ইডিয়ট' তার গুণে বংশ আলো !

*   *   *   *

সে কালের সব নিরেট বোকা এ সত্য কি জান্ত—
যে লেখক বল্লেই বুঝতে হবে, এই ধুরন্ধর 'কান্ত' ?

(মিশ্র বিভাস—কাওয়ালী)

দেশের উদ্দেশ্যেও তিনি রচনা করে গেছেন নানা সঙ্গীত।

জন্মভূমি

(বাণী)

জয় জয় জন্মভূমি জননি।
যাঁর, স্তন্য সুধাময় শোণিত ধমনী
কীর্ত্তি-গীতিজিত, স্তম্ভিত, অবনত,
মুগ্ধ, লুব্ধ, এই সুবিপুল ধরণী

*   *   *

(মিশ্র পরোজ—কাওয়ালী)

বঙ্গমাতা

(বাণী)

নমো নমো নমো জননি বঙ্গ।
উত্তরে ঐ অভ্রভেদী
অতুল, বিপুল, গিরি অলঙ্ঘ্য।
দক্ষিণে সুবিশাল জলধি,
চুম্বে চরণতল নিরবধি,
মধ্যে পূত-জাহ্নবী-জল
ধৌত শ্যাম ক্ষেত্র সঙ্গ।
বনে বনে ফুটে ফুল-পরিমল,
প্রতি সরোবরে লক্ষ কমল,
অমৃতবারি সিঞ্চে, কোটি
তটিনী মত্ত, খর-তরঙ্গ ;
কোটি কুঞ্জে মধুপ গুঞ্জে,
নব কিশলয় পুঞ্জে পুঞ্জে,
ফল-ভর-নত শাখি-বৃন্দে
নিত্য শোভিত অমল অঙ্গ !

(সুরট মল্লার—একতালা)

তোমরা অনেকেই হয়ত 'কান্ত' কবির "কি সুন্দর" নামের সুন্দর ছন্দবদ্ধ কবিতা (আসলে গান) পড়েছ। গানটি এখানে আবার তুলে দিলাম।

কি সুন্দর

(কল্যাণী)

ধীর সমীরে, চঞ্চল নীরে
খেলে যবে মন্দ হিল্লোল,—
বিগলিত-কাঞ্চন-সন্নিভ শশধর,
জল মাঝে খেলে মৃদু দোল ,—
যবে, কনকপ্রভাতে নবরবি সাথে,
জাগে সুষুপ্ত ধরা,—
পরিমল-পূরিত কুসুমিত কাননে,
পাখী গাহে সুমধুর বোল , —
যবে, শ্যামল শস্যে, বিস্তৃত প্রান্তর
রাজে মোহিয়া মন প্রাণ,—
সান্ধ্য-সমীরণ-চুম্বিত চঞ্চল,
শীত-শিশির করে পান ,
কোটি নয়ন দেহ, কোটি প্রাণ, প্রভু,
দেহ মোরে কোটি শ্রবণ,—
হেরিতে মোহন ছবি শুনিতে সে সঙ্গীত,
তুলিতে তোমারি যশরোল ।
(মিশ্র ভূপালী—কাওয়ালী)

এমনি অজস্র অপূর্ব্ব সঙ্গীতগুলি তাঁর অসামান্য কাব্য-প্রতিভার স্বাক্ষর হয়ে বঙ্গ-ভারতীর ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে। "বাণী", "কল্যাণী", "আনন্দময়ী", "শেষ দান" প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে তাঁর এই মধুর সঙ্গীতগুলি নিবদ্ধ হয়ে আছে। তোমরা রজনীকান্তের এই জন্ম-শতবর্ষে ঐ কাব্যগুলি পাঠ করে, কান্ত কবির কালজয়ী কাব্য প্রতিভাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে, কান্ত কবির শতবার্ষিকী পালন কর।

***

চার্লস্ ডিকেন্স
রচিত

অলিভার টুইষ্ট
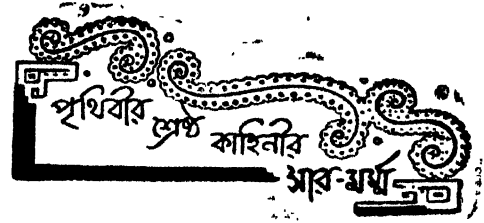
সৌম্য গুপ্ত

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গিন্নী-মায়ের অনুরোধে ডাক্তার নিজেই অলিভারকে নিয়ে গিয়েছিলেন মিঃ ব্রাউনলোর বাড়ীতে। ডাক্তারের মুখে সেয়ানা-ফন্দীবাজ বদমায়েশ ফ্যাগিন্, মঙ্কস্ আর বিল্ সাইক্সের পাল্লায় পড়ে বেচারী অলিভারের দুর্ভোগ-দুর্দ্দশার কাহিনী শুনে মিঃ ব্রাউনলোর মন অসহায় কিশোরের উপর মমতায়, সহানুভূতিতে ভরে উঠলো। মিঃ ব্রাউনলো স্পষ্টই বুঝতে পারলেন, অনাথ অলিভারের সম্বন্ধে তাঁর যে ধারণা ছিল, সেটা মিথ্যা নয়। কাজেই নিরুদ্দেশ অলিভারকে ফিরে পেয়ে, মিঃ ব্রাউনলো আগের মতোই আবার তাকে পরম আদর-যত্নে নিজের বাড়ীতে রেখে সন্তান স্নেহে মানুষ করে তুলতে লাগলেন। শুধু তাই নয়···মিঃ ব্রাউনলো মনে মনে স্থির করলেন যে অসহায় নাবালক অলিভারের মতো ছেলেপুলেরা যাতে ফ্যাগিন্, মঙ্কস্ আর বিল্ সাইক্সের মতো ফন্দীবাজ বদমায়েশদের খপ্পরে পড়ে অনর্থক দুঃখ-দুর্দ্দশা ভোগ আর অন্যায় অত্যাচার সহ্য করে অমানুষ হয়ে না ওঠে—তারও একটা ব্যবস্থা করা দরকার। তাই তিনি তাঁর আইনজ্ঞ বন্ধু মিঃ গ্রিম্‌উইগ্‌কে বাড়ীতে ডেকে এনে সব খবর জানালেন। গ্রিম্‌উইগ্ এতদিন অলিভারকে নিতান্তই মন্দ চোখেই দেখতেন···বন্ধু ব্রাউনলোর মুখে অলিভারের

দুর্ভোগের কাহিনী শুনে তাঁর সে ধারণা গেল মিলিয়ে··· আসল ব্যাপার জানতে পেরে গ্রিমউইগ্ও তাঁর বন্ধু ব্রাউনলোর সঙ্গে একজোট হয়ে বদমায়েশদের সর্দার ফ্যাগিন্, ফন্দীবাজ মঙ্ক্স্, গুণ্ডা-বাটপাড় বিল্ সাইকস্ আর তাদের সাঙ্গোপাঙ্গদের পাকড়াও করে সাজা দেবার জন্য মেতে উঠলেন।

ওদিকে কিশোরী ন্যান্সীও ইতিমধ্যে মমতাভরে অসহায় অলিভারকে ফন্দীবাজ বদমায়েশদের কবল থেকে উদ্ধার করবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করছিল। বদমায়েশদের দলে মিশে দিন কাটালেও, ন্যান্সীর মন তখনো নির্মম হয়ে ওঠেনি···তাছাড়া কিশোর অলিভারের উপরেও তার কেমন যেন একটা মায়া জন্মেছিল···অলিভারকে ভালবাসতো সে তার নিজের ছোট ভাইয়ের মতো···তাই অলিভারকে বিপদের মুখ থেকে রক্ষা করার জন্য সে এতখানি অধীর হয়ে উঠেছিল···কি উপায়ে অলিভারকে রক্ষা করা যায়—এই ছিল ন্যান্সীর একমাত্র লক্ষ্য।

অলিভারের উদ্ধারের চিন্তায় বিভোর হয়ে শহরের পথে-পথে ঘুরে বেড়ানোর সময়, ন্যান্সী হঠাৎ একদিন দেখলো—সৌখিন-ছাঁদের বিরাট এক জুড়ি-ঘোড়ার গাড়ীতে চড়ে সুদৃশ্য সাজপোষাক পরা সম্ভ্রান্ত ধনী মিঃ ব্রাউন্লোর পাশে বসে তার পুরোনো সাথী অলিভার বেরিয়েছে বেড়াতে। অলিভার তখন চলন্ত গাড়ীতে মিঃ ব্রাউনলোর পাশে বসে শহরের সাজানো দোকানপাট, বাড়ী-ঘর আর লোকজনের ভীড় দেখার উৎসাহে এমনই মশগুল যে পথের মোড়ে কিশোরী ন্যান্সীর চেহারা তার চোখেও পড়লো না। ন্যান্সী কিন্তু এতদিন পরে তার পুরোনো বন্ধু অলিভারের সঙ্গে এমন আচম্কা দেখা হয়ে যাবার এই সোনার সুযোগ সহজে ছাড়বার পাত্রী নয়··· অলিভারকে দেখেই সে আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে সটান্ ছুটতে সুরু করলো সেই জুড়ি-ঘোড়ার গাড়ীর পিছু-পিছু! কিন্তু পথে—একে শহুরে লোকজন আর গাড়ী-ঘোড়ার প্রচণ্ড ভীড়, তার উপর তেজী ঘোড়ায়-টানা জুড়ি-গাড়ী সবেগে এগিয়ে চলেছে—তার সঙ্গে তাল রেখে সমানে পিছুপিছু ছুটে চলা··· কিশোরী ন্যান্সীর সাধ্য নয়। কাজেই কিছু দূর ছুটোছুটির পর নিতান্ত হায়রাণ হয়েই বেচারী ন্যান্সীকে সেদিনের মতো এ চেষ্টা ত্যাগ করতে হলো···

কিন্তু দূরে শহরের পথে ক্রমশঃ বিলীয়মান জুড়ি গাড়ীতে অলিভারের পাশে বসে থাকা সম্ভ্রান্ত যাত্রী মিঃ ব্রাউনলোকে ন্যান্সী বেশ ভালোভাবেই চিনে রাখলো···তখনকার মতো হতাশ হয়ে পড়লেও, ন্যান্সী মনে মনে স্থির করলো যে পরে অন্য কোনো সময়ে এমনিভাবে পথেই যে উপায়েই হোক, সৌখিন জুড়ি-গাড়ীর মালিক ঐ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিটির সঙ্গে দেখা করে, তাঁর হাতে পৌঁছে দেবো আমার লেখা চিঠি—সে চিঠিতে লিখে জানাবো বেচারী অলিভারের বিপদের সব কথা···ফন্দীবাজ বদমায়েশ ফ্যাগিন্, মাঙ্ক্স্ কি মতলব এঁটেছে অলিভারকে ফাঁশানোর উদ্দেশ্যে! ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গেই দেখা করে নিজের মুখেই খুলে বলবো তাঁকে অলিভারকে রক্ষা করার কথা!

উদ্দেশ্য-সিদ্ধির আশায় কিশোরী ন্যান্সী নিত্যই ঘুরে বেড়ায় শহরের পথে পথে···অবশেষে সুযোগও মিললো একদিন সহসা তার বরাতে। এমনিভাবে ঘোরাঘুরি করতে করতে শহরের বড় রাস্তার মোড়ে ন্যান্সী হঠাৎ একদিন মিঃ ব্রাউনলোকে দেখতে পেয়ে, ছুটে গিয়ে তাঁর হাতে সঁপে দিয়ে এলো—অলিভারের বিপদের সম্বন্ধে লেখা তার ছোট্ট চিঠিখানি।

পথের মাঝে আচমকা অজানা-অচেনা ছিন্ন মলিনবসনা এক কিশোরীর হাত থেকে এই চিঠি পেয়ে মিঃ ব্রাউনলো তো অবাক!···কে এই অপরিচিতা কিশোরী···এমনভাবে ছুটে এসে চিঠি দিয়ে গেল তাঁর হাতে?

চমক ভাঙতেই মিঃ ব্রাউনলো চোখ তুলে চারিদিকে তাকিয়ে পথের আশেপাশে কোথাও সেই অপরিচিতা কিশোরীর চিহ্নমাত্রও খুঁজে পেলেন না। কাজেই কৌতূহলভরে হাতের চিঠিখানা খুলে মিঃ ব্রাউনলো পড়ে দেখেন—মেয়েলী ছাঁদের আকাবাঁকা হরফে লেখা রয়েছে—

মহাশয়,

অলিভারের বিপদের সম্ভাবনা আছে খুবই। সে সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে আলোচনা করা বিশেষ দরকার। কাজেই আগামী কাল সন্ধ্যার পর আপনি অনুগ্রহ করে লণ্ডন ব্রীজের তলায় এসে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। তখন সব কথা জানতে পারবেন। বিশেষ জরুরী কথা আছে। অবশ্যই আসবেন।

ইতি

চিঠি পড়ে মিঃ ব্রাউনলো রীতিমত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন! চিঠির তলায় কারো নাম-স্বাক্ষর নেই…কাজেই সেই অপরিচিতা কিশোরীর পরিচয় মিললো না!

* * * *

চিঠির নির্দেশমতো পরের দিন সন্ধ্যার পর লণ্ডন ব্রীজের তলায় হাজির হয়ে মিঃ ব্রাউনলো দেখেন যে পোলের সিঁড়ির পাশে আবছা অন্ধকার কোণে অধীরভাবে পায়চারী করছে ছিন্ন-মলিনবসনা এক কিশোরী…মিঃ ব্রাউনলোকে দেখবামাত্রই সে আকুলভাবে ছুটে এসে তাঁকে ডেকে নিয়ে গেলো পথ চলতি লোকজনের দৃষ্টির আড়ালে নিভৃত নির্জ্জন এক পাচিলের ধারে। কথায় কথায় মিঃ ব্রাউনলো জানতে পারলেন—কিশোরীর নাম ন্যান্সী… ফন্দীবাজ ফ্যাগিনের আড্ডায় মানুষ হলেও, সে আসলে অসহায় অলিভারের সত্যিকার হিতাকাঙ্খিণী দিদির মতোই স্নেহ করে তাকে! ন্যান্সীর কথাবার্তা শুনে মিঃ ব্রাউনলোর খুবই মমতা জাগলো মেয়েটির উপর…তার দুর্দ্দশা দেখে মনে মনে দুঃখ হলো—এমন নিষ্পাপ সুন্দর কিশোরী নিতান্তই বরাত-দোষে অসহায় অবস্থায় শহরের ফন্দীবাজ বদমায়েশদের খপ্পরে পড়ে কী মর্ম্মান্তিক দুর্ভোগেই না দিন কাটাচ্ছে!…এ সব অভাগাদের ভালোভাবে বাঁচবার…মানুষ হয়ে, বড় হয়ে ওঠবার কী এতটুকু সুযোগ, কোনো উপায়ই মিলবে না এমন বিশাল এই দুনিয়ার কোনোখানে?…কী বরাত নিয়েই যে এ সব অনাথ-অসহায় অভাগা ছেলেমেয়েরা এ পৃথিবীতে এসেছিল… মানুষের মতো মানুষ হয়ে ওঠার সুযোগের অভাবে, এরা কি শুধু মুষ্টিমেয় কয়েকটা ফন্দীবাজ চোর-বাটপাড় গুণ্ডা-বদমায়েশদের পাল্লায় পড়ে মুখ বুজে তাদের সব কিছু নির্ম্মম অত্যাচার, অন্যায় অনাচার সহে তিলে তিলে অধঃপাতের অতল অন্ধকার গহ্বরে নেমে ফুটন্ত ফুলের মতো জীবন, সাধ, আশা, আনন্দ, রূপ রস-গন্ধ বেঘোরে বিসর্জ্জন দিয়ে বসবে?…এদের বাঁচিয়ে তোলার, সুস্থ-সবল রাখার কী কোনো উপায়ই নেই?…

এ সব কথা চিন্তা করতে করতে মিঃ ব্রাউনলোর বুক পাথরের মতো ভারী হয়ে উঠলো…চোখ ভরে এলো জলে …তিনি স্তব্ধ হয়ে শুনতে লাগলেন ন্যান্সীর সব কথা। মিঃ ব্রাউনলোর সহানুভূতি পেয়ে, ন্যান্সীও অসহায় অলিভারকে বিপদমুক্ত করার উদ্দেশ্যে, অকপটে তাঁর কাছে ফন্দীবাজ ফ্যাগিন্, মঙ্কস্ আর বাটপাড় বদমায়েশ বিল্ সাইক্স্—সবাইকার চক্রান্তের কাহিনী সব আগাগোড়া খুলে বললো।

বদমায়েশদের বেয়াড়া কীর্ত্তিকলাপের পরিচয় পেয়ে ব্রাউনলো আর গ্রিম্‌উইগ্ বহু কষ্টে শয়তান মঙ্কস্‌কে খুঁজে বার করে, তাকে বেকায়দায় ফেলে এমন জব্দ করলেন যে বেচারী শেষে প্রাণের ভয়ে নিজেই খুলে বললো—অনাথ-কিশোর অলিভারকে ফাঁকি দিয়ে বাপের অগাধ-সম্পত্তি আত্মসাৎ করবার লোভে সে বদমায়েশদের সর্দ্দার ফ্যাগিনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে গুণ্ডা-বাটপাড় বিল্ সাইক্‌সের সহায়তায় কী জঘন্য ফন্দী এঁটেছিল।

মঙ্কসের স্বীকারোক্তি থেকেই প্রমাণ হলো—ফ্যাগিন্ আর বিল্ সাইক্‌সের শয়তানী ফন্দী-ফিকির আর বদমায়েশী কীর্ত্তিকলাপের কথা। ফন্দীবাজ-বদমায়েশদের কীর্ত্তিকলাপের পরিচয় পেয়ে, ব্রাউনলো, গ্রিম্‌উইগ্—এঁদের সকলের চেষ্টায় ফ্যাগিন্ বিল্ সাইক্স্ পড়লো পুলিশের হাতে ধরা…আদালতের বিচারে তাদের হলো—কড়া শাস্তির ব্যবস্থা।

আর অলিভার?…

এত দুর্ভোগ-দুর্দ্দশার পর, আইনজ্ঞ-বন্ধু গ্রিম্‌উইগের সহায়তায় মিঃ ব্রাউনলো অলিভারের পিতার দেওয়া সব সম্পত্তি উদ্ধার করলেন। অলিভারের আসল পরিচয় জানতে পেরে সবাই অবশেষে দুর্বৃত্ত-ফন্দীবাজ মঙ্কসের বদলে অলিভারকেই করলো তার বাবার বিপুল সম্পত্তির একচ্ছত্র অধিকারী।
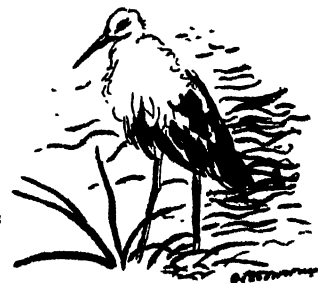
চিত্রগুপ্ত

এবারে তোমাদের আরেকটি বিচিত্র-মজার বিজ্ঞানের খেলার কথা বলছি।

ধরো, আমরা আজকাল 'ভিজিটিং-কার্ড' (visiting card) বা সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণ পত্র ছাপানোর জন্য সচরাচর যে-ধরণের ঈষৎ পুরু কার্ড বা কাগজ ব্যবহার করে থাকি, ঠিক তেমনি ধরণের এক টুকরো কাগজ তোমাদের হাতে সঁপে দিয়ে কেউ যদি বলেন যে সেই কাগজের টুকরোটির চারিদিক কায়দা মতো ভাজ করে চৌকোণা-'ট্রে'র (square-shaped tray) ছাঁদে একটি পাত্র বানিয়ে, পাত্রটিকে জলন্ত বাতি কিম্বা উনানের আঁচে রেখে খানিকটা জল ফুটিয়ে নিতে পারো? তাহলে, তোমরা সবাই হো জবাব দিয়ে বসবে—এমন কাজ কখনো সম্ভব হয় নাকি, মশাই!

কিন্তু আসলে বিজ্ঞানের বিচিত্র কলা-কৌশলে এমন কাজ করা, মোটেই অসম্ভব নয়। কি উপায়ে এমন অসম্ভব কাজ দিব্যি সহজেই হাসিল করা যায়, আপাততঃ তারই মোটামুটি পরিচয় দিই।
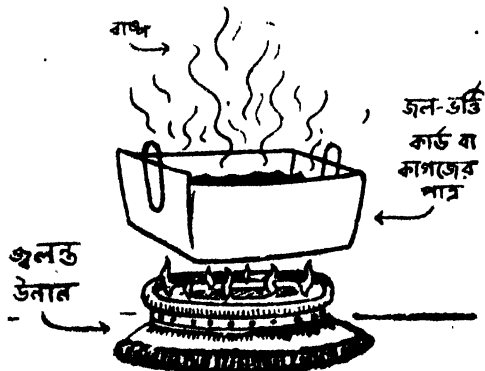
আসরে আত্মীয়-বন্ধুদের সামনে এ খেলা দেখানোর সময়, গোড়াতেই পাশের ছবিতে যেমন নমুনা দেওয়া হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে কাগজের টুকরোর চারিদিক বরাবর সমান-ছাঁদে মুড়ে ভাজ করে প্রত্যেকটি কোণে 'আলপিন' (pin) অথবা 'পেপার-ক্লিপ' (paper-clip) এঁটে জল-রাখবার উপযোগী বেশ মজবুত একটি চৌকোণা-'ট্রে' (square-shaped tray) বানিয়ে নিতে হবে। তারপর সদ্য-বানানো ঐ কাগজের 'ট্রে'র ভিতর অল্প একটু জল ভরে, সেটিকে সামান্য-ক্ষণ জলন্ত দেশলাই কাঠি, বাতি কিম্বা উনানের আঁচে বসিয়ে রাখলেই দেখবে—কাগজের 'ট্রে'র ভিতরকার জলটুকু দিব্যি ফুটতে সুরু করেছে, অথচ কাগজের কোথাও এতটুকু আগুনের ধোঁয়া বা পোড়ার দাগের চিহ্নমাত্র নেই। অর্থাৎ, জলন্ত-আগুনের সংস্পর্শে এসেও কাগজের পাত্রটি শুধু যে আগাগোড়া অদগ্ধ অক্ষত রয়েছে তাই নয়, উপরন্তু, পাত্রের ভিতরকার জলটুকুও দিব্যি ফুটন্ত হয়ে উঠেছে। তবে হুঁশিয়ার, এ কারসাজি পরখ করে দেখার সময় সর্ব্বদা নজর রাখতে হবে যে আগুনের শিখা যেন আদৌ পাত্রের জলের সীমার উর্দ্ধে কাগজের কোনো অংশ স্পর্শ করতে না পারে...তাহলেই সেখানকার কাগজটুকু আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গেই।

এমনটি কেন সম্ভব হয়, জানো? শোনো তাহলে—বলি, তার আসল রহস্য।

অর্থাৎ, বিজ্ঞানের বিচিত্র নিয়মানুসারে, জল সাধারণতঃ ফুটতে সুরু করে ২১২° ফারেনহিট বা ১০০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায়। তাপমাত্রা তার চেয়ে বেশী হলে, ফুটন্ত জল ক্রমশঃ বাষ্পে পরিণত হয়।

কাজেই কাগজের পাত্রের ভিতরে জল ভরা থাকে বলে, কাগজটি জলের শীতল-স্পর্শ পায়। তাই জলন্ত আগুনের শিখার তাপে, সেটি সহজে পুড়ে ছাই হয়ে যায় না...আগাগোড়া দিব্যি অক্ষত ও অদগ্ধ থাকে। অর্থাৎ কাগজের পাত্রটি জলের শীতল-স্পর্শ পায় বলেই, কাগজের নীচেকার জলন্ত-আগুনের শিখার তাপটুকু, জল ফোটানোর সঙ্গে সঙ্গেই ক্রমান্বয়ে শোষিত হতে থাকে, এবং তার ফলে, কাগজটি আগুনের ছোঁয়াচ লেগে সহজে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারে না। এই হলো—এবারের মজার খেলাটির আসল রহস্য।

আগামী সংখ্যায় এমনি ধরণের আরেকটি মজার খেলার হদিশ দেবার বাসনা রইলো।

মনোহর মৈত্র

১। অঙ্কের হেঁয়ালী :
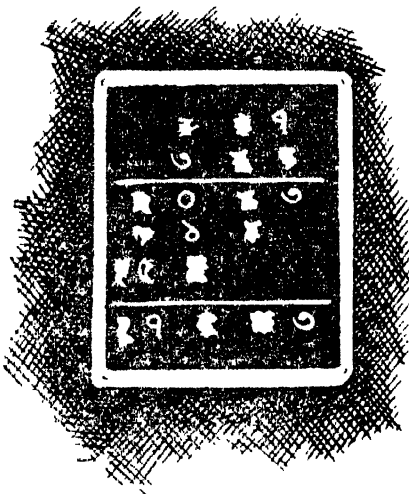
স্কুলের মাষ্টারমশাই একরাশ অঙ্ক 'হোম-টাস্ক' দিয়ে ছিলেন গ্রীষ্মের ছুটিতে—সকালবেলা বাড়ীতে বসে খোকন বাবু শ্লেটে সবেমাত্র একটি অঙ্ক কষে, কালি-কলম দিয়ে সেটিকে স্কুলের খাতায় পরিষ্কারভাবে লিখতে সুরু করেছে, এমন সময় মা এসে তাকে ফরমাশ করলেন —গলির মোড়ে রেশনের দোকানে গিয়ে সরষের তেল আর চাল, আটা, চিনি কিনে আনতে। কাজেই মার কথামতো খোকন ছুটলো রেশনের দোকানে—অঙ্ক-কষা শ্লেটখানা পড়ার ঘরের টেবিলে ফেলে রেখেই। ইতি মধ্যে দাদা ঘরে নেই দেখে সুযোগ বুঝে খোকনের ছোট বোন মিনু এসে হাজির হলো সেখানে। মিনুর ভারী সখ, সেও দাদার মতো শ্লেটের উপর হিজিবিজি হরফ লিখবে…কাজেই সে আর লোভ সামলাতে পারলো না…দাদার আঁক-কষে রাখা শ্লেটের হরফগুলোর উপর সে আপন খেয়ালমতো কত কি হিজিবিজি আঁচড় টানতে লাগলো…তার ফল যা দাঁড়ালো, সে প্রমাণ তোমরা পাশের ছবিতেই দেখতে পাচ্ছো। বলতে পারো, হিসাব করে, যে সব সংখ্যার উপর মিনু হিজি-বিজি আঁচড় টেনে দিয়েছে, সেগুলি আসলে কি লেখা ছিল ?…

২। 'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা :

তিন অক্ষরে নাম আমার। প্রথম ও তৃতীয় অক্ষর মিলে স্রোতস্বিনী বুকে নেমে আমি লোকালয় ও কৃষি-জমি গ্রাস ও ধ্বংস করি। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় অক্ষর মিলিয়ে আমি বিচিত্র সুর-লহরীতে লোকজনকে মোহিত করি। বলো তো, আমার নাম ?…

রচনা : গৌতম ঘোষ (কলিকাতা)

ইংরাজী আখরের দুইজন,
কোথা হতে এসে,
হয়ে গেল আপন জন—
পাশাপাশি বসে।

রচনা : ধীরেন্দ্রনাথ মোদক (বাঁশবেড়িয়া)

গতমাসের ধাঁধা ও হেঁয়ালীর উত্তর :

১। ৩৩টি বাড়ী থেকে তিনটি করে ছেলে, ৩৪টি বাড়ী থেকে দুটি করে ছেলে এবং বাকী ৩৩টি বাড়ী থেকে একটি করে ছেলে স্কুলে পড়তে আসে।

২। নিম।

৩। চারখণ্ডের ওজন যথাক্রমে—১ সের, ৩ সের, ৯ সের এবং ২৭ সের।

গতমাসের তিনটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ

বুজু, বিজু, কুলু (কলিকাতা), সত্যেন, সঞ্জয়, মুরারি, সুনীল ও অমিয় (ভিলাই), সমীর, শচীন ও বিরজামোহন (কলিকাতা), রনি ও রিনি মুখোপাধ্যায় (কাইরো), পুপু ও ভুটিন (কলিকাতা), হাবলু, টাবলু, সুমা ও পুতুল (হাওড়া), লীন ও মীরা (কাম্পালা উগাণ্ডা), ফণী ও পিণ্টু সাহা (কলিকাতা), কবি, অধাশ ও অমিতাভ হালদার (পানাগড়), বন্দেন্দু দাম্মি, মঞ্জুলা ও রবীন্দ্র নন্দী (মের্ডরোড)।

গত মাসের দুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ

বাপি, বুতাম ও পিণ্টু গঙ্গোপাধ্যায় (বোম্বাই), প্রশান্ত, অমিয়, অভীন্দ্র, অমৃত ও কৃষ্ণলাল (কলিকাতা), সুনীত, তিনকড়ি, বরুণ, মৃণাল ও অরুণ (গড়িয়া) মিঠু ও বুবু গুপ্ত (কলিকাতা), রণবীর ও দীপঙ্কর নিয়োগী (কলিকাতা), দ্বিজেন্দ্রমোহন সরকার (কলিকাতা), তরুণ পাঠাগারের সভ্যবৃন্দ (আসাননগর)।

গতমাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

দেবকীনন্দন ও বিশ্বনাথ সিংহ (গয়া), কালু, সনৎ, লাড্ডু, খোকা, ও. মানু (লক্ষ্ণৌ), শর্মিষ্ঠা ও সঙ্ঘমিত্রা রায় (কলিকাতা), গৌতম ও অশোক ঘোষ (কলিকাতা), জয়ন্তী, দীপঙ্কর ও তীর্থঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (মেদিনীপুর)।

॥ অভিযাত্রী ॥

শ্রীমঞ্জুষ দাশগুপ্ত

বুকে নিয়ে আশা আর ভালবাসা
চল্ ছুটে অভিযাত্রী,
তোদের মাথায় ঝরাবে আশীষ
কল্যাণী-বরদাত্রী।
আলোর তীর্থে করি' অভিযান
সবার মনের দূরি' অজ্ঞান
সমুখের পথে চল্ ছুটে চল্
ঘুচাতে কালিম রাত্রি ;-
বুকে নিয়ে আশা আর ভালবাসা
চল ছুটে অভিযাত্রী ॥
অন্যায়-পাপে পদাঘাত আঁকি
মাতারে সবার চিত্ত,—
অসীম সাহস চপলতা আর
হোক্‌রে তোদের বিত্ত।
দুঃখে না হয়ে কভু ম্রিয়মাণ
সবারে হর্ষ কর্ তোরা দান,
দূর কর্ ভয় যত সংশয়
তোরা ধরণীর বীর ত ,—
অন্যায়-পাপে পদাঘাত আঁকি
মাতারে সবার চিত্ত ॥

বেহালা বা VIOLIN তার-যন্ত্রও বহু প্রাচীন আমল থেকেই প্রতীচ্যের সঙ্গীতানুরাগীদের বিশেষ প্রিয়। শুধু প্রতীচ্য-বাসীদেরই নয়—শোনা যায়, প্রাচ্যদেশীয়দের ভিতরেও পুরাকালে এমনি ধরণের বেহালা বা VIOLIN জাতীয় তার-যন্ত্র বাজিয়ে সঙ্গীত-চর্চ্চার বিশেষ রেওয়াজ ছিল… এমন কি প্রাচীন আর্য্যদের মধ্যেও 'বাহুলীন' নামে এই ধরণের বিচিত্র এক প্রকার তার-যন্ত্র ব্যবহারের পরিচয় মেলে বিভিন্ন ঐতিহাসিক পুঁথিপত্রে। অনেকে বলেন—সেকালের এই 'বাহুলীন' যন্ত্রই একালের বেহালা বা VIOLIN-এর আদি-পুরুষ।

●

প্রতীচ্য-দেশের আরেক ধরণের বিচিত্র তার-যন্ত্র হলো, এই 'ম্যাণ্ডোলিন' (MANDOLIN)। এই বাদ্য-যন্ত্রটিও বেশ প্রাচীন আমলের। তবে এটি বেহালার মতো তারের উপর ছড় টেনে বাজানো হয় না… হাতের আঙুলের সাহায্যে সুনিপুণ কৌশলে এটিতে সুরের কলতান সৃষ্টি করাই হলো চিরাচরিত রীতি। স্পেন ও ইতালী দেশে এ বাদ্য-যন্ত্রটি বিশেষ জনপ্রিয়।

বাংলা নাটক : সেযুগ ও এযুগ

কৃষ্ণচন্দ্র দে

প্রাক্-আর্যযুগ থেকে সুরু করে বর্তমানযুগ পর্যন্ত বাংলা নাটকের ক্রমোন্নতির ধারাবাহিকতা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করছি। বাংলা নাটকের সেযুগ ও এযুগ লিখবার আগে এখানে বাংলা নাটক কাকে বলে এবং নাটক লেখার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু আভাষ দেওয়া গেল।

নাটক বলতে এরূপ একটি কাহিনী যার ঘটনাবলী—সংলাপ ও অভিনয় দ্বারা রঙ্গমঞ্চে প্রদর্শিত করা হয়; আর নাটক লেখার উদ্দেশ্য সামাজিক চিত্তে রসের উদ্রেক করা। সুপ্রসিদ্ধ নাট্যশাস্ত্র সমালোচক আচার্য ভরতের মতে, নাট্যকার দর্শকগণের চিত্তে যে রসের উদ্রেক করতে চান তা তিনি রচনাকালে উপযুক্ত বাক্যবিন্যাস দ্বারা এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীগণ অভিনয় দ্বারা দর্শকগণের চিত্তে সঞ্চারিত করবেন। সেজন্যই সংলাপ হচ্ছে নাটকের অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু এই সংলাপ তখনই সার্থক হয় যখন নাটকের পাত্রপাত্রীর চরিত্রকে প্রকাশ করতে সহায়ক হবে।

এযুগের বাংলা নাটক কতকগুলি নিয়মের মধ্যে বাঁধা। যেমন প্রত্যেক নাটককেই অর্থাৎ কাহিনীকে কতকগুলি বিভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়, যার মুখ্যবিভাগ হচ্ছে 'অঙ্ক' আর উপ-বিভাগ হচ্ছে 'দৃশ্য'। সেযুগের নাটকগুলির মধ্যে এধরণের কোন বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না। সেগুলি অভিনীত হতো দেবালয়ে। দেবালয়ই ছিল রঙ্গালয় এবং অভিনয় করতেন দেবালয়ের ভক্তবৃন্দ অর্থাৎ ভক্তরাই ছিলেন অভিনেতা। প্রাক্-আর্যযুগের ইতিহাস থেকে যতদূর জানা যায় তাতে ধারণা হয় সেযুগের এই নাটকাভিনয় থেকেই সুরু হয়েছে নাটকের ইতিহাস।

প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রকারগণ বলেছিলেন যে, পর পর তিনটি ধাপ অতিক্রম করে নাটকের পরিণতি হয়েছিল। যথা :— ১। 'নৃত্ত' অর্থাৎ তাললয়াশ্রিত অঙ্গবিক্ষেপ মাত্র; ২। 'নৃত্য' অর্থাৎ হাবভাবের সাহায্যে মূক অভিনয়সহ নর্তন; ৩। 'নাট্য' অর্থাৎ নৃত্যগীতসহ বাচিক ও সাত্ত্বিক অভিনয়। সম্ভবতঃ সবদেশেই এই ক্রমানুসারেই নাটকের সৃষ্টি হয়েছিল।

বাংলাদেশ সকলক্ষেত্রেই যেমন নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রেখেছে, নাটকের বেলাতেও বাঙালী সে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে এসেছে। শুধুমাত্র স্বাধীন মনোবৃত্তির বলেই বাঙালী প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত ধর্ম, সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা, এমনকি রাজনীতি এবং সমাজনীতি প্রভৃতি সকলক্ষেত্রেই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অতীতকে না জানলে বর্তমানকে জানা যায় না। অবশ্য সেসব এখনও বিশ্লেষণের মধ্যেই আবদ্ধ। তবে, একথা সত্য যে, উনিশ শতকের রেনেসাঁসের প্রথম স্তর সুরু হয় নাট্য আন্দোলনের মাধ্যমে। ইংরেজী নাটকের পরিবর্তে যেদিন বাংলা নাটক মঞ্চস্থ হলো সেদিনটি জাতীয় জীবনের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন।

সেযুগের বাংলা নাটকের ক্রমশঃ পরিবর্তনের ফলেই এযুগের বাংলা নাটক রূপ পেয়েছে। সেযুগের নাটকগুলি এযুগে প্রায় বিলুপ্ত হয়েছে। পুরাকালে যে সমস্ত নাটক অভিনীত হত সেগুলি অধিকাংশই লিখিত হত না। হাব-ভাব-নৃত্য-গীতই ছিল সেগুলির মধ্যে প্রধান। কেবল মাঝে মাঝে ছড়া আবৃত্তি করা হত।

এরপর মধ্যযুগের বাংলা নাটক। মধ্যযুগে পালাগানই ছিল অধিক প্রচলিত। ক্রমশঃ সেগুলিই নাটকে পরিণত হলো। পালাগান ও নাটকের বিষয়বস্তু ছিল প্রথমে দেবলীলা, তারপর পুরাণোক্ত দেবোপম মানবচরিত ও সাধারণ মানবজীবন নাটকের বিষয়ীভূত হয়। প্রাচীনকালে দেবালয়ে গানের মাধ্যমে যা অভিনীত হতো মধ্যযুগে সেগুলি পালাগানে রূপান্তরিত হয়েছিল।

দশম শতাব্দীর রামাই পণ্ডিত লিখিত "শূন্যপুরাণ" ব্যতীত প্রাচীনতর বাংলা গীতিকাব্য বা পালাগান কিছু পাওয়া যায় না। মঙ্গলগীতি ও পালাগানের মধ্যে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে নাট্যাভিনয়ের অঙ্কুর দৃষ্ট হয়েছিল। যেমন :—

"গৌরী—তোমার দেশে যামুরে সূর্যাই আমি কাপড়ের দুঃখ পামু।

সূর্যাই—নগরে নগরে আমি তাঁতিয়া বসামু।

গৌরী—তোমার দেশের যামুরে সূর্যাই আমি শঙ্খের দুঃখ পামু।

সূর্যাই—নগরে নগরে আমি শাঁখারি বসামু।

গৌরী—তোমার দেশে যামুরে সূর্যাই আমি সিন্দুরের দুঃখ পামু।

সূর্যাই—নগরে নগরে আমি বাণিয়া বসামু।"[১]

এইভাবে মধ্যযুগে সূর্যমঙ্গল থেকে পালাগানে রূপান্তরিত করে বাংলা নাটক তৈরি হত।

এরপর সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত হল পাঁচালিগান। মুসলমান কবি কর্তৃক রচিত এই পাঁচালিগানই ছিল সেযুগের নাটক। এসব রচনা ভাষার মনোহারিত্বে ও কবিত্বে ছিল সমৃদ্ধ। খুব সম্ভবতঃ এই সব পাঁচালিগানের মধ্যে পাঁচটি অঙ্গ থাকাতে ইহার 'পাঁচালি' নামকরণ হয়েছিল। অঙ্গ পাঁচটি হচ্ছে যথাক্রমে—(১) পাদ-চালনা পূর্বক ঘুরে ফিরে পদ গান; (২) ভাবকালি অর্থাৎ হাব-ভাব সুরসহ পদের ব্যাখ্যা; (৩) নাচাড়ি অর্থাৎ নৃত্য করতে করতে নাচাড়ি ছন্দে রচিত কবিতার আবৃত্তি ও গান; (৪) বৈঠকী অর্থাৎ উপবিষ্ট হয়ে উচ্চদরের রাগরাগিণীতে সঙ্গীতালাপ; (৫) দাঁড়া কবি অর্থাৎ দণ্ডায়মান হয়ে দলের সমস্ত লোকের সমবেত সঙ্গীত।

ধীরে ধীরে পাঁচালি গানও কমে এল। উৎপত্তি হলো যাত্রাগানের। তারপর গীতিনাট্য, উত্তর প্রত্যুত্তর সবই চলতো গানে। গিরিশচন্দ্রের "ব্রজবিহার" এই ধরণের নাটক।

মধ্যযুগের শেষে বাংলা নাটকের সৃষ্টি হল গদ্যপদ্যময় কথোপকথন ও নাটকীয় ক্রিয়ার সমাবেশে। ক্রমে ক্রমে সে সমস্ত নাটক বর্তমান যুগে রূপ নিল, হাস্যরসাত্মক চরিত্র ও ঘটনার সৃষ্টি—প্রহসন জাতীয় লঘু নাটকের জনপ্রিয়তা চিরন্তন ও সার্বদেশিক।

পালাগান থেকে যাত্রানাটকের পর সুরু হল 'থিয়েটারী' নাটক। এই 'থিয়েটারী' নাটক দিয়েই আরম্ভ হয় বর্তমান যুগের নাটক। ১৮৫২ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল দু'খানি বাংলা নাটক। আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে নাট্যরচনা এই প্রথম, কিন্তু তারও বিশ বছর আগে "The Persecuted" নামে একটি নাটক লিখেছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। এভাবে বাংলা নাটকের জন্ম বলা চলে ১৮৩১ সালে এবং এবৎসরই প্রসন্নকুমার ঠাকুর "হিন্দু থিয়েটার" প্রতিষ্ঠিত করেন। ইংরেজী থেকে অনূদিত 'উত্তররামচরিত' বাংলা নাটকখানি প্রথম মঞ্চস্থ হয়েছিল এই থিয়েটারে। ১৮৫৩ সালে রচিত হয়েছিল "ভদ্রার্জুন ও কীর্তিবিলাস" নাটক।

সেই প্রাচীনযুগ থেকে এযুগ পর্যন্ত রচিত বাংলা নাটকের মধ্যে সেযুগের নাটকের সংস্পর্শ আছে। কারণ 'শকুন্তলা', 'বিক্রমোর্বশী', 'রত্নাবলী', 'মালবিকাগ্নিমিত্র' প্রভৃতি সংস্কৃত থেকে অনূদিত নাটক অথবা 'শর্মিষ্ঠা', 'রুক্মিণীহরণ', প্রভৃতি নাটক কিংবা 'কাদম্বরী' ও 'বিদ্যাসুন্দর' প্রভৃতি অর্ধ-পৌরাণিক নাটকগুলিই স্মরণ করিয়ে দেয় প্রাচীন নাটকের কথা। কেননা, প্রাচীন নাটক থেকেই যুগোপযোগী সংশোধন করে এই নাটকের সৃষ্টি হয়েছে।

এখন কথা হচ্ছে নাটক লেখার পদ্ধতি সম্বন্ধে। সম্ভবতঃ এ সম্বন্ধে ফ্রেটাগের পিরামিডাকৃতি সূত্রটি সমর্থন-যোগ্য। সুসাহিত্যিক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এ বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। ফ্রেটাগের সূত্রে নাটক রচনার পদ্ধতিকে ৬টি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন এবং এই ৬টি শ্রেণী অবলম্বন করে নাটক লিখলে তা সম্পূর্ণ হয়। (১) ভূমিকা (২) জটিলতার বীজ (৩) সংঘাতের আরম্ভ (৪) চরম সঙ্কট (৫) ঘটনার অবরোহণ (৬) সমাপ্তি।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সেযুগের নাটকের প্রধান লক্ষ্য ছিল অভিনয়, কথার আগে কাজ, সংলাপের আগে নাচ, মনের ক্রিয়ার আগে দেহের ক্রিয়া অর্থাৎ অভিনয় দ্বারা কোন একটি ঘটনাকে দর্শকের সম্মুখে ব্যক্ত করাই প্রধান লক্ষ্য।

আর এযুগের বাংলা নাটকের ধারা ক্রমশঃ পরিবর্তন করে কালোপযোগী করে রচিত হচ্ছে। যেমন উনবিংশ শতকের সপ্তম দশকে দেশপ্রেমের এক প্রবল বন্যা এসে

[১] "বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ"

শিক্ষিত সমাজকে আলোড়িত করেছিল এবং তার ফলে অনেকগুলি জাতীয়ভাবাত্মক ঐতিহাসিক নাটক লিখিত ও অভিনীত হয়েছিল; কিন্তু আগস্ত কঠিন বীররস আশ্রয় করেই নাটক রচিত হতো।

বাংলা নাট্যজগতে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাবলীর প্রভাব ছিল অসাধারণ। আর গিরীশচন্দ্রের প্রথম গীতিনাট্য ছিল 'মায়াতরু' 'মোহিনী প্রতিমা' প্রভৃতি। 'আনন্দ রহো' নামক ঐতিহাসিক নাটকটি ১২৮৮ সালের ৯ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে "ন্যাশনাল থিয়েটার"-এ অভিনীত হয়।

'রাবণবধ', 'সীতার বনবাস', 'অভিমন্যু বধ', প্রভৃতি পৌরাণিক নাটকগুলি বর্তমানের উপযুক্ত করে সংশোধন করে অভিনীত হয়ে থাকে। গিরীশচন্দ্রের সময় এসব পৌরাণিক নাটক ছাড়াও আরও অনেকগুলি পৌরাণিক নাটক অভিনীত হয়েছিল। 'প্রহ্লাদ চরিত' 'নিমাই সন্ন্যাস' 'বুদ্ধদেব চরিত' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

গিরীশচন্দ্রের পর রসরাজ অমৃতলালের 'হীরকচূর্ণ' নাটক প্রকাশিত হল ১৮৭৫ সালে। তারপর ক্রমে ক্রমে রাজকৃষ্ণ রায়, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতি স্বনামধন্য লেখকগণ কর্তৃক রচিত হতো এযুগের বাংলা নাটক। এইভাবে ক্রমে ক্রমে আবির্ভূত হলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর লেখনী শক্তিতে বাংলা সাহিত্যে এল নব-জাগরণ। তিনি নবপ্রাণ সঞ্চারিত করলেন বাংলা সাহিত্যে। 'বাল্মীকি প্রতিভা', 'বিসর্জন' প্রভৃতি নাটকগুলি এযুগের নাট্য সাহিত্যকে আরও সমৃদ্ধতর করেছে।

সেযুগ থেকে এযুগ পর্যন্ত বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত এবং বহুপ্রকার ভাঙা-গড়ার মধ্য থেকে এযুগের বাংলা নাটক যে রূপ পেয়েছে এখন তারও পরিবর্তন সুরু হয়েছে। বাংলা নাটক যাতে আরও সুন্দরতর ও সর্বাঙ্গীণ সার্থক হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখাই নাট্যকারগণের কর্তব্য।

হে ঈশ্বর তোমাকে

শ্রীভাগবতদাস বরাট

হে ঈশ্বর কোথা তুমি জানি না তা আমি,
তুমি যে কেমন তা কেউ তো জানি না,
তবু তোমা নিশিদিন সতত প্রণমি,
রণাঙ্গনে করে রণ কোটি কোটি সেনা।
আমরণ করে রণ জীবন বাঁচাতে
এ ভুবন মাঝে কেউ মরিতে না চায়,
অর্থ-যশ-সুখ-খ্যাতি যা চায় বাড়াতে,
তব করুণার দান-তা সে ভুলে যায়।
হে ঈশ্বর তুমি আছ কেমনে বুঝিব,
দেহের রক্তের মত বিশ্বাস না হয়,
তবু যেন মন বলে—যতই ভাবিব,
তুমি আছ রবি শশী যেমন নিশ্চয়।
সর্বত্র আছ তুমি হে ঈশ্বর যদি,
তবে কেন হানাহানি রক্তক্ষয় কেন ?
জগতের হিংসা দ্বেষ দাও প্রভু রোধি,
আগাছার ঝোপঝাড় রোপিয়াছ কেন ?
হে ঈশ্বর তুমি সত্য নির্ব্বাণের মত,
তুমি নাই ইহা সত্য সুখে ও সম্পদে,
অটুট শান্তির পরে মানুষ সতত,
খোঁজে তোমা হে ঈশ্বর আপদে বিপদে

সাহিত্যের স্বরূপ

অধ্যাপক শ্রীনির্মলকান্তি বসু, এম্.-এ (সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)

বাংলায় 'সাহিত্য' ও 'কাব্য' সমার্থক না হইলেও, সংস্কৃতে এই শব্দ দুটি একার্থক। বাংলায় 'সাহিত্য' ব্যাপক, 'কাব্য' তাহার একটি শাখামাত্র। সংস্কৃতে যাহার নাম 'সাহিত্য', তাহারই নাম 'কাব্য'। একখানি উপন্যাসও সংস্কৃতে কাব্য নামেই পরিচিত হইবার সম্পূর্ণ অধিকারী। প্রসঙ্গতঃ মনে রাখা ভাল—'সাহিত্য' কথাটির অপেক্ষায় 'কাব্য' শব্দটির প্রচলনই সংস্কৃতে সমধিক।

অতি-প্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কাল পর্যন্ত—সাহিত্যমীমাংসকগণ সাহিত্যের স্বরূপ নির্ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সাহিত্যের স্বরূপ সম্পর্কে সকলে একমত হইতে পারেন নাই। এ বিষয়ে প্রত্যেকেই "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্"—নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। ফলে আমরা সাহিত্যের নানাবিধ লক্ষণ পাইয়াছি।

সাহিত্যের যে-লক্ষণটি আমাদের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইয়াছে, সেটিই এখানে আলোচনা করিব। এই লক্ষণটিই অধিকাংশ রসজ্ঞের কাছে সাদর স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক তৈলঙ্গব্রাহ্মণ পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ ভট্ট তাঁহার "রসগঙ্গাধর" নামে অলংকারগ্রন্থে সাহিত্যের যে-লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছেন সেটি এই—

"রমণীয়ার্থপ্রতিপাদকঃ শব্দঃ কাব্যম্।"

শব্দই কাব্য। ক্লাসে ছাত্রদের চুপ করাইবার জন্য আমি যখন টেবিলে করাঘাত করি, তখন তো একপ্রকার শব্দ উত্থিত হয়। এই শব্দটিও কি কাব্য? না—এটি কাব্য নয়—কারণ এটি ধ্বন্যাত্মক শব্দ। শব্দ দুইপ্রকার—(১) বর্ণাত্মক ও (২) ধ্বন্যাত্মক। একমাত্র বর্ণাত্মক শব্দই কাব্য। তাহা হইলে 'কখগঘঙ'—এই বর্ণাত্মক শব্দটি কি কাব্যের মর্যাদালাভের অধিকারী? না—এটিও কাব্য নয়—কারণ এটি নিরর্থক শব্দ। এই শব্দ হইতে কোনো অর্থের বোধ হয় না। যে-শব্দ কোনো নির্দিষ্ট অর্থ প্রতিপাদন করে, একমাত্র সেই শব্দই কাব্য। তাইতো 'শব্দঃ'-এর বিশেষণ 'অর্থপ্রতিপাদকঃ'। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার—'শব্দ' বলিতে 'নির্বিভক্তিক প্রাতিপদিক' নয়। এখানে 'শব্দ' 'পদ' অর্থে ব্যবহৃত। আরও উল্লেখযোগ্য, 'শব্দঃ' এই পদে যে একবচন প্রযুক্ত হইয়াছে সেটিও 'অতন্ত্র' অর্থাৎ 'তাৎপর্যপূর্ণ নয়'। অতএব 'শব্দ' মানে 'পদাবলী'। এখানে স্মরণযোগ্য, খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর বিশ্রুত আলংকারিক আচার্য দণ্ডী তাঁহার 'কাব্যাদর্শঃ' নামক অলংকারগ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে কাব্য-লক্ষণ নির্ণয় প্রসঙ্গে 'পদাবলী' কথাটিই ব্যবহার করিয়াছেন। দণ্ডি-কৃত লক্ষণটি এই—

"শরীরং তাবদিষ্টার্থব্যবচ্ছিন্না পদাবলী।"

আর 'পদাবলী' মানে তো 'বাক্য'। ন্যায়ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"পদসমূহো বাক্যমর্থসমাপ্তৌ"। একখানি কাব্য তো কতকগুলি সুবিন্যস্ত সুসংবদ্ধ বাক্যের সমষ্টি। অতএব একটি একক বাক্যও কাব্যরূপে পরিগণিত হইতে পারে।

অর্থপ্রতিপাদক শব্দমাত্রই যদি কাব্য হয়, তবে "ধনং তে দাস্যামি" (আমি তোমাকে টাকাকড়ি দিব), "পুত্রস্তে জাতঃ" (তোমার পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে)—এই বাক্য-দু'টিও তো কাব্যরূপে স্বীকৃতি লাভের যোগ্য; কেননা, এখানে শব্দ হইতে অর্থের প্রতীতি হইতেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ-দু'টি বাক্য আদৌ কাব্য নয়। কারণ এখানে শব্দ হইতে যে-অর্থের বোধ হইতেছে, সে-অর্থ রমণীয় নয়। একমাত্র রমণীয়—অর্থপ্রতিপাদক শব্দই কাব্যরূপে পরিচিত হইবার অধিকারী। তাইতো 'অর্থ'-এর বিশেষণ 'রমণীয়'। ('রমণীয়' কথাটির অন্বয় 'শব্দ' কথাটির সঙ্গে নয়—এটি

মনে রাখা আবশ্যক।) 'রমণীয়' মানে কী? 'রমণীয়' মানে 'অলৌকিক-আনন্দজনক'। জগন্নাথের ভাষায়—"রমণীয়তা চ লোকোত্তরাহ্লাদজনকজ্ঞানগোচরতা"। এখানে অধ্যাপক শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্তীর উক্তিটিও উদ্ধৃতিযোগ্য: "'লোকোত্তরাহ্লাদজনকজ্ঞানগোচরতা'-রূপ 'রমণীয়তা'ময় অর্থের (বিষয়ের) প্রতিপাদন সকল সুকুমার কলারই (art) লক্ষ্য। সংজ্ঞাটিকে কাব্যৈকলক্ষ্য করতে জগন্নাথ 'শব্দঃ' পদটিকে প্রয়োগ করেছেন।" (—অলঙ্কার-চন্দ্রিকা পৃঃ ৩২১।)

'অলৌকিক' বলার তাৎপর্য এই যে, শব্দপ্রতিপাদিত অর্থ যদি **লৌকিক** আনন্দের অনুভূতি জাগায়, তবে সে-শব্দ কাব্যের মর্যাদা লাভ করিতে পারিবে না। লৌকিক-অলৌকিক নির্বিশেষে যে-কোনো-প্রকার আনন্দের সঞ্চার করিলেই যদি শব্দ কাব্য হইত, তাহা হইলে পূর্বোক্ত উদাহরণ দু'টি ("ধনং তে দাস্যামি" এবং "পুত্রস্তে জাতঃ") উৎকৃষ্ট কাব্যের নিদর্শন হইত। অর্থপ্রাপ্তির সংবাদে কেই বা উল্লসিত না হয়? পুত্রোৎপত্তির সংবাদ কাহার হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার না করে?

এই আলোচনা হইতে স্পষ্টই বোঝা গেল যে—যে-পদসমষ্টির অর্থ সহৃদয়ের হৃদয়ে অলৌকিক আনন্দের অনুভূতি উদ্রিক্ত করে, সেই-পদসমষ্টিকেই 'সাহিত্য' বলে।

এখানে একটি কথা স্মরণ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। শব্দনির্বাচন সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। শব্দগত উৎকর্ষ যেন অর্থগত উৎকর্ষকে অতিক্রম করিয়া না যায় এবং অনুরূপভাবে অর্থগত উৎকর্ষও যেন শব্দগত উৎকর্ষকে অতিক্রম না করে। শব্দচারুত্ব ও অর্থচারুত্বের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানই সাহিত্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। শব্দ ও অর্থের সুসমঞ্জস অবস্থানই সাহিত্য। তাইতো খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত আলঙ্কারিক রাজানক কুন্তক তাঁহার 'বক্রোক্তি-জীবিতম্' নামে অলংকার-গ্রন্থের প্রথম উন্মেষে সপ্তদশ কারিকায় ইহাকেই বলিয়াছেন—'অন্যূনানতিরিক্তত্ব'। বৃত্তিতেও আছে,—"শব্দার্থয়োঃ .... পরস্পরসাম্যসুভগমবস্থানং .... সাহিত্যমুচ্যতে।"

এইবার কাব্যের একটি উদাহরণ বিচার করা যাক। উদাহরণটি প্রসিদ্ধ—"গতোঽস্তমর্কঃ"। এখানে বাক্যটির বাচ্যার্থঃ 'সূর্য অস্তমিত হইয়াছে'। এ-অর্থ রসজ্ঞের মনের মধ্যে তেমন আনন্দের উদ্রেক করে না। দেখা যাক, বাক্যটির অন্য কোনো অর্থ আছে কি-না। ধরা যাক, বাক্যটি দূতীর প্রতি কোনো অভিসারিকার উক্তি। সেক্ষেত্রে একমাত্র বাচ্যার্থটিই অভিসারিকার বক্তব্য নয়। বাচ্যার্থ-ভিত্তিক ব্যঙ্গার্থই এখানে প্রতিপাদ্য। ব্যঙ্গার্থটি কী? দিনের আলো নিভে গেল। পৃথিবীর বুকে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল। আমার দয়িত সঙ্কেতস্থানে আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। আমার অভিসারে যাবার সময় হ'ল। এইবার আমায় সাজিয়ে দে—এটিই গূঢ়ার্থ। 'অভিসার-যাত্রার সময় সমুপস্থিত'—এই ব্যঙ্গার্থটি কাহার চিত্তে অলৌকিক আনন্দের সঞ্চার না করে? অতএব উক্ত বাক্যটি শ্রেষ্ঠ কাব্যের একটি চমৎকার উদাহরণ। বলা বাহুল্য, এই-বাক্যার্থ-বোধ-জনিত আনন্দ—অর্থপ্রাপ্তি ও পুত্রোৎপত্তি-জনিত আনন্দ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

সসীম মানুষ অসীম আনন্দের আস্বাদন লাভ করে সাহিত্য-লোকে। সাহিত্যের আনন্দ মানুষকে জৈব সত্তার অনেক ঊর্ধ্বে উন্নীত করে। তাইতো সাহিত্যে আনন্দবাদ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এ-আনন্দ, আলংকারিকের ভাষায়, 'বিগলিত-বেদ্যান্তর'। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর আলংকারিক মম্মট তাঁহার "কাব্যপ্রকাশঃ" নামে অলঙ্কার-গ্রন্থের প্রথম উল্লাসে স্পষ্টই বলিয়াছেন—"সকলপ্রয়োজনমৌলিভূতং সমনন্তরমেব রসাস্বাদনসমুদ্ভূতং বিগলিতবেদ্যান্তরমানন্দং... ...কাব্যং......করোতি"।

বস্তুতঃ দণ্ডি-কৃত কাব্য-লক্ষণ এবং জগন্নাথ-কৃত কাব্য-লক্ষণের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভাবগত কোনো পার্থক্য নাই বলিলেই চলে। যে কথাটি দণ্ডী স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন, সেই কথাটিই জগন্নাথ স্পষ্টতরভাবে উচ্চারণ করিয়াছেন। তথাপি আমাদের কাছে দণ্ডীকৃত লক্ষণ অপেক্ষা জগন্নাথ-কৃত লক্ষণের আবেদনই সমধিক। জগন্নাথ-কৃত কাব্য-লক্ষণের মানদণ্ডে পৃথিবীর সর্বদেশের সর্বকালের সাহিত্যের বিচার করা যাইতে পারে। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্তীর মন্তব্যও প্রণিধানযোগ্য: "মনে হয় পণ্ডিতরাজকৃত এই সংজ্ঞাই কাব্যের চরম সংজ্ঞা এবং এর আলোকে আধুনিক কাব্যেরও বিচার চলতে পারে।" —অলঙ্কার-চন্দ্রিকা পৃ. ৩২১।

ত্রিধারা

সন্তোষকুমার দত্ত

তেতলার ওপর পাশাপাশি তিনখানা ঘর। প্রথম ঘরখানায় থাকেন লোকেন চ্যাটার্জী। রেলওয়ে অফিসের এল. ডি. ক্লার্ক; স্ত্রী অনুপমা, কলেজে-পড়া বোন আরতি আর একটা দু' বছরের বাচ্চা। একুনে এই চারজন। দ্বিতীয়টায় আছেন জ্যোতিষার্ণব শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার বসাক সমুদ্রতান্ত্রিকার্য সিদ্ধান্তবিশারদ মশাই। মৃতদার। নিঃসন্তান। আর সব শেষের ঘরখানায় থাকেন সুখেন্দুবিকাশ রায়চৌধুরী নামে পঁচিশ বছরের এক যুবক। মার্চেন্ট অফিসের কেরাণী। অবসর সময়ে কবি বা কাব্যচর্চাকারী।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই ডানদিকে লোকেনবাবু থাকেন। বাঁদিকে জ্যোতিষার্ণব মশাই এবং সুখেন্দুবিকাশ। লোকেনবাবুর বোন আরতির সঙ্গে জ্যোতিষার্ণব মশাইয়ের আলাপটা ভালই হয়। আরতি বলে, আজ থেকে আমাদের সেকেণ্ড ইয়ার টেষ্ট। বলুন তো কাকাবাবু—কেমন হবে পরীক্ষাটা—?

—আজ! থামো—, বলেই জ্যোতিষার্ণব হিসেব করেন,—বৃহস্পতিবার, মৃগশিরা নক্ষত্র, যাত্রা উত্তরদিকে শুভ। ওঃ—এর ফল খুব ভালো! খুব ভাল মা—!

সুখেন্দুবিকাশ আরতির মুখ থেকে কথাটা শুনে হাসে। বলে—, বেস্পতিবার লক্ষ্মী ঘর থেকে বের হলে তার বরাতে দুর্ভাগ্য এসে জোটে। তুমি ঠিক ফেল করবে।

—যান! আরতি রেগে যায়,—অত শুভকামনায় কাজ নেই।

মানুষ মাত্রেরই বাতিক আছে। থাকাটা স্বাভাবিক। লোকেনবাবুরও একটা বাতিক ছিল। তা হলো সেতার বাজানো। আশ্চর্য ধৈর্য ভদ্রলোকের। দিনের পর দিন সকাল সন্ধ্যের একঘণ্টা দেড়ঘণ্টা ক'রে বাজনায় বসেন। সেকারণ আরতির কলেজের পড়াটা সুখেন্দুর ঘরে বসেই করতে হয়। এ বিষয়ে সুখেন্দু তাকে সাহায্য করে কম নয়। এককালে গ্রাজুয়েট হয়েছিল ব'লে ডিগ্রী পেয়েছিল। সুতরাং সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্রীকে দু' একটা ছোটখাট বিষয় ব'লে দেওয়া তার পক্ষে এমন শক্ত নয়।

আরতির বইপত্র সব সুখেন্দুর ঘরে থাকে। এতে সে বিরক্ত হয় না। বরং খুশী হয় মনে মনে। তার কবিতার শ্রোতা এবং রসবেত্তা বাইরে অনেকেই আছে। কিন্তু তারা সবাই পুরুষ। ঘরে-বাইরে নারী বলতে একমাত্র আরতিই তার কবিতার অনুরাগিণী।

সুখেন্দু আরতির পড়া বলে দেয়। আরতি তার কবিতা শোনে।

তিনঘরে তিনরকমের মানুষ। জ্যোতিষী। কবি। সেতারী।

আরতি তিনজনকেই উৎসাহ দেয়।

তাকে বসিয়ে লোকেন চ্যাটার্জী সেতার শোনান। একটা গৎ বাজানো শেষ হলে জিজ্ঞেস করেন—, কেমন হ'লো বল দেখি—?

আরতির তন্ময়তা ভেঙে যায়। বলে—, সত্যি দাদা, তোমার হাত এত মিষ্টি—!

লোকেন চ্যাটার্জী গম্ভীর হবার ভান ক'রে বোনের প্রশস্তি মেনে নেন।

মাঝে মাঝে জ্যোতিষার্ণব তাকে ডেকে বসান।—দেখো মা, আজ একটা নতুন জিনিস পেলাম।

—কি কাকাবাবু—? আরতি আগ্রহ দেখায়।

—জন্মমাসের ওপর মানুষের স্বভাব আর সুখ-দুঃখ নির্ভর করে। বলতো মা—তোমার জন্মমাস কোন্‌টা—!

—ফাল্গুন। আরতি বলে।

জ্যোতিষার্ণব সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন—, বাঃ—চমৎকার! তুমি তো রাজরাণী হবে! ব'লেই পাশের একখানা বই খুলে নির্দিষ্ট একটা জায়গা পড়ে শোনান—, 'ফাল্গুন মাসে জন্ম হইলে নম্র, ভক্তিমতী এবং সুখী হইবার লক্ষণ পাওয়া যায়। মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা হয়।'—দেখতে পাচ্ছ তো, কথাটা ঠিক কিনা—!

রাত্তিরে সুখেন্দু'র ঘরে ব'সে পড়ার থেকে কবিতা শোনা হয় বেশী। সুখেন্দু প'ড়ে যায়—,

উতলা হয়েছে মন আমার,
চিন্তায় আজি জেগেছে সুর।
আসবে কখন আগামী কাল—
কতদূরে আর কত সে দূর!

ভাবাবেশে তার সুন্দর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

এখন নিশুতি হয়েছে রাত,
দীপের আলোটি ক্রমশ ক্ষীণ।
মনে মনে ভাবি—কবে সকাল
এনে দেবে আলো-ভরাট দিন!
নিঃশ্বাসে ছোঁওয়া পাবে যে মন,
উৎসুক প্রাণে শুধু আরাম।
আগামী দিনের আনন্দের—
বন্যা বহাবে তোমার নাম!

এক সময় কবিতা শেষ হয়। সুন্দর বাচনভঙ্গী এবং ভাবাবেগে পড়ার জন্যে আরতির মন আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সে বলে—, সুন্দর! ভা—রী সুন্দর হয়েছে কবিতাটি!

সুখেন্দু'র মুখ স্মিতহাস্যে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সে বলে—, তোমার মত অনুরাগী শ্রোতা পেলে বাংলাসাহিত্যে রোমান্টিক কবিতায় আমার স্থান প্রথম—!

আরতি হাসি দিয়ে হাসি শোধ দেবার চেষ্টা করে,—আমি কি আপনার কবিতার অনুরাগী নই!

—নিশ্চয়! দেখো না সেইজন্যেই তো এমাসে দু'খানা নামকরা কাগজে আমার দুটো লেখা বেরিয়েছে।

—দেখি—দেখি—! আরতি আগ্রহ দেখায়। সুখেন্দু'র হাত থেকে একরকম কেড়ে নিয়ে একখানা পত্রিকা খোলে।

পাতা ওলটাতে ওলটাতে একজায়গায় থেমে পড়ে,—ও—এই তো—"শেষ রাত্রির স্বপ্ন।" বাঃ—বেশ নামটা দিয়েছেন তো—!

—কেন? সুখেন্দু জিগ্যেস করে।

আরতি বলে—' শেষ রাত্রির স্বপ্ন সত্যি হয় যে! জানেন না!

তারপর সুখেন্দুর উত্তরের অপেক্ষা না রেখেই সে জোরে জোরে পড়ে যায়—,

শেষ রাত্রির স্বপ্নের মাঝে
তুমি এসেছিলে আমার জীবনে—
নিঃশব্দ পদসঞ্চারে।
আমি নিজেও জানতে পারিনি তোমার আগমন।
ডাক দিলে মনে মনে:
চেয়ে দেখি—তুমি!

কবিতা পড়া শেষ হয় না। আরতি বলে—, এর মধ্যে 'তুমি'টা কে—?

সুখেন্দু হাসে—, 'তুমি'—তুমি!

—যান! সব বিষয়ে ইয়ারকি—!

—ইয়ারকি হলো কি রকম! আমি তোমার মাষ্টার মশাই—!

—থাক্! আরতি মুখরা হয়ে ওঠে। মাষ্টার মশাইরা ছাত্রীদের নিজের কবিতা শোনায় না। পরের কবিতার ব্যাখ্যা করে।

হাসিমুখে সুখেন্দু তার কথা মেনে নেয়। বলে—, জ্যোতিষার্ণব তোমার মাথা খেয়েছেন।

—তার মানে—? আরতি বিস্মিত হয়।

—ওই যে ফাগুন মাসে জন্ম হলে মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা—

খিল্‌খিল্ ক'রে আরতি হেসে ওঠে। বলে—, তাঁর কথা তাহলে সত্যি তো—!

এমন সময় বাইরে কার গলা শোনা যায়—, ভায়া আছ নাকি—?

—কে—দাদা! সুখেন্দু ব্যস্ত হয়ে ওঠে, আসুন—আসুন—!

ঘরে ঢুকে জ্যোতিষার্ণব বলেন—, এই যে মা, তুমিও আছ দেখছি! তা ভালই হয়েছে। ব'লে পকেট থেকে হলদে রঙের একখানা লম্বা কাগজ বার করেন,—এই তোমার জন্ম পত্রিকা।

—ও থাক, পরে দেখবো'খন। সুখেন্দু কথাটা চাপা দেবার চেষ্টা করে। আপনি বসুন—!

জ্যোতিষার্ণব বাধা দেন, পরে কেন—শোনোই না—। তোমার জন্মসাল এবং জন্মতারিখ যা, তাতে কৃষ্ণপক্ষের

পঞ্চমী তিথি, মকর রাশি, মিথুন লগ্ন রয়েছে। তার ওপর দেবগণ, শূদ্রবর্ণ দেখছি। এর ফল কি জানো তো ভায়া—!

—কি কাকাবাবু! আরতি উৎসুক হয়।

—এই দেখ লেখা আছে, জ্যোতিষার্ণব কোষ্ঠী খোলেন।—তার ফল 'জাতক কামদেবের ন্যায় কান্তিযুক্ত, সৎকর্মশীল, কাব্যানুরাগী ও অতুল কীর্তিবিশিষ্ট।' একটু দম নিয়ে আবার বলেন—, তা তুমি তো কীর্তি রাখবেই। জন্মমাস রহস্যে কি বলে জানো—!

—বলুন! সুখেন্দু হাল ছেড়ে দেয়। কাব্যচর্চা আপাতত বন্ধ রাখতে হবে।

জ্যোতিষার্ণব বলেন—, জন্মমাস রহস্যে বলে—আষাঢ় মাসে জাতকেরা ডাক্তার, উকিল, কবি, সাহিত্যিক একটা না একটা হবেই। ডাক্তারী আর ওকালতিতে যখন তোমার বিদ্যে নেই, তখন কবি-সাহিত্যিক হওয়াই সম্ভব। তাছাড়া তুমি যখন দস্তুর মত কাব্যচর্চায় লেগেছ, তখন—

কথাটা শেষ না করেই তাঁর মনোভাব বোঝাবার চেষ্টা করেন।

তা ঠিক—! আরতির চোখে-মুখে স্থির বিশ্বাস।

সুখেন্দু প্রশংসায় পুলকিত হয়।

জ্যোতিষার্ণব আপন ক্ষমতায় গর্ব অনুভব করেন।

আরতিকে কেন্দ্র ক'রে তিনজন গুণীর তিনদিকে যাত্রা।

লোকেন চ্যাটার্জী সেতারে অনেক নতুন গৎ, নতুন সুর আয়ত্ব করেছেন। এক একদিন মাঝরাতে আরতির ঘুম ভেঙে যায়। একটা করুণ সুরঝঙ্কার তার কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করে। সে যে কী বেদনাময়—তা বোঝানো যায় না। প্রাণের সমস্ত তন্ত্রী ছিঁড়ে বেদনার্ত আত্মা যেন বাইরে বেরিয়ে আসতে চায়। নিজের অজান্তেই আরতির চোখে জল ভ'রে আসে।

আবার কোনদিন শেষ রাতে ঘর থেকে বেরিয়ে দেখে, সুখেন্দু বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। একটু দূরে রাইস্ মিলের আড়ালে একফালি বাঁকা চাঁদ দেখা দিয়েছে। সেদিকে তন্ময় হয় তাকিয়ে সুখেন্দু আস্তে আস্তে আবৃত্তি করছে। সমস্ত পৃথিবী এত নিস্তব্ধ যে তার আবৃত্তি স্পষ্ট কানে আসে—

"বাঁকানো চাঁদের সাদা ফালিটি
তুমি বুঝি খুব ভালবাসতে!
চাঁদের শতেক আজ নহে তো
এ যুগের চাঁদ হলো কাস্তে।"

—বাঃ—বেশ লিখেছেন তো! আরতি নিঃশব্দে ফিরে যাবে ঠিক ক'রেও পারে না। মুখ থেকে কথাটা হঠাৎ বেরিয়ে যায়।

সুখেন্দু চমকে উঠে পিছনে তাকায়। তারপর কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বলে—, ও—তুমি! কিন্তু কবিতাটা আমার লেখা নয়। কবি দিনেশ দাসের—।

—তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু এই শেষ রাত পর্যন্ত কবিতার কথা চিন্তা করছেন! আরতির স্বরে স্পষ্ট রাগের রেশ থাকে।

—ঠিক তা নয়! সুখেন্দু হাসে—, মাঝরাতে লোকেন-বাবুর সেতার বাজনায় ঘুম ভেঙে গেল। অনেকক্ষণ শুয়ে থেকেও ঘুম এল না। তাই একটু বাইরে এসেছিলাম—।

আরতি জানে, এটা তার মিথ্যে কৈফিয়ৎ। সুখেন্দু প্রায়ই রাত্তিরে জেগে থাকে। নিজের মনে কবিতা পড়ে। লেখে।

মাঝে মাঝে তার মনে হয়, কবিতার মধ্যে সুখেন্দু এমন কি পায়!

কিসের আশা! কী এমন আনন্দ! কোন শান্তির বাণী!

সুখেন্দু কবি। কবিতা ভালবাসে। কিন্তু সে কবিতা কি আরতির চেয়েও তার মনে আশা দিতে পারে? আনন্দ দিতে পারে? পূর্ণতা দিতে পারে?

তাই যদি হয় তো সে—আরতির সতীন!

নিজের মনের কাছে আরতি নিজেই ধরা দেয়।

এ পাশের ঘরে জ্যোতিষার্ণব দিনরাত গণনা-কাজে ব্যস্ত থাকেন। সময়াভাবে প্রায়ই স্নান করেন না। লম্বা লম্বা রুক্ষ চুল কপালের দু' পাশে, চোখে-মুখে এসে পড়ছে। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। মাঝে মাঝে তাঁর ঘরে অচেনা আগন্তুকের দর্শন মেলে। আরতির কানে আসে দু' একটা ভাসা ভাসা কথা:

—আপনার করকোষ্ঠী বিচার ক'রে যা পাচ্ছি, তাতে

রবির ওপর শনির পূর্ণ দৃষ্টি থাকায় নানা বিষয়ে অশুভ সূচনা করে। তার ওপর রাহু দশমে অবস্থিত থাকায়—

—এর কোন প্রতিকার নেই? অচেনা গলায় আগ্রহ প্রকাশ পায়।

—আছে। জ্যোতির্বার্ণব বলেন—, একটি কমলা কবচ ধারণ করতে হবে।

আরতির কেমন যেন আশ্চর্য লাগে। তিন ধরণের তিনজন মানুষের মেতে থাকার এই বাড়াবাড়ি যেন কেমন। কিছুটা বিরক্তি, কিছুটা ভয় আর আশঙ্কা তার মনে জাগে। চারদিকে মা দেশ থেকে চিঠি লিখেছে, সেখানে গিয়েই থাকবে সে। এতগুলো উদাসী মানুষের মাঝখানে তার যেন দম বন্ধ হয়ে আসে।

কিন্তু সুখেন্দু? সুখেন্দু কি সত্যিই উদাসীন—?

সেখানেই আরতির পরাজয়।

ভুল সে করেনি। সুখেন্দুর চোখের চাউনিতে, কথা বলার ভঙ্গীমায়, সর্বোপরি কবিতার বিষয়বস্তু নির্বাচনে এমন একটি ইঙ্গিত সে পেয়েছে, যার সম্বন্ধে সন্দেহ করা চলে না।

এই সব কথা ভেবেই মায়ের চিঠির উত্তর দিচ্ছি দিচ্ছি করেও দেওয়া হয়নি।

সেদিন রাত্তিরে সুখেন্দু নতুন একটা কবিতা পড়ছে, আরতি শোনে। সে ভাবছে—, সত্যি, কত সুন্দর এই সুখেন্দু! আর তার হাতের কবিতা! যে হাতে অমন সুন্দর কবিতা লেখে, সে হাতখানা একবার ধরতে ইচ্ছে করে, কিন্তু পারে না।

সুখেন্দু তন্ময় হয়ে পড়ে যায়—

তোমার কাজল-চোখে অনুনয়
আমার পরাণখানি টানবে।
উদাসী এ মন হবে তন্ময়,
তোমাকেই ভাল ক'রে জানবে।
কাজল-চোখের সেই অনুনয়
আমার পরাণে ছোঁওয়া আনবে।

আবেগে তার স্বর কাঁপতে থাকে।—

তোমার প্রাণের যত আবেদন
বন্ধ দুয়ার মোর খুলবে।
জাগবে কুসুম-কলি এই মন
আমার হৃদয়ে সাড়া তুলবে।
মুগ্ধ প্রাণের সেই আবেদন
বিগত দিনের ব্যথা ভুলবে।

আরতি তার মুখের দিকে তাকিয়ে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সুখেন্দু তার কত আপন! কতদিনের পরিচিত।

একসময় শেষ হয় কবিতা। সুখেন্দুর কথার রেশ তখনো যেন ঘরময় থরথর করে কাঁপতে থাকে।

—কেমন হয়েছে? সুখেন্দুর মুখ হাসিতে ভ'রে ওঠে।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আরতি বলে—, চমৎকার!—কিন্তু একটা কথা বলবো!

—বলো! সুখেন্দু উৎসুক হয়।

একটু চুপ ক'রে থেকে আরতি বলে—, আপনি কি কাউকে ভালবাসতেন! কথাটা বলেই সে লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। ভাবে, এতখানি প্রগলভ হওয়া তার উচিত হয়নি?

ভাল—? সুখেন্দু কপাল কোঁচকায়;—না! কাউকে বেসেছি বলে তো মনে হচ্ছে না। কেন বলো তো—?

—তবে এসব ভালবাসার কবিতা লেখেন কেন—? কতকটা মরীয়ার মত আরতি জিগ্যেস করে। তার এতদিনের বিশ্বাস শিথিল হয়ে আসছে।

সুখেন্দু জোরে জোরে হেসে ওঠে—, ঐ তো তোমাদের দোষ! সব জিনিসই এক ফরমুলায় দেখ।

—তাই বলে আপনি বলতে চান কবিদের জীবনে ভালবাসার স্থান নেই—? হঠাৎ বোকার মত আরতি প্রশ্ন করে। তার স্বর কতকটা আর্ত।

আরতির মুখের দিকে সুখেন্দু একমুহূর্ত তাকিয়ে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে বলে—

—আছে। অস্বীকার করি না। তাই বলে তুমি যা মনে করছ, সেটা ঠিক নয়। কবিদের কাব্যই মুখ্য। জীবনটা গৌণ। সুতরাং ভালবাসার স্থান এবং অবসর যদি কোথাও থাকে—সেটা কবির কাব্যে, জীবনে নয়।

আরতির সমস্ত ধারণা পালটে যায়। এতদিন তার নিজের মনোমত কল্পনা দিয়ে, আনন্দ দিয়ে, বিশ্বাস দিয়ে যার মূর্তি তৈরি করেছিল, আজ হঠাৎ সে দেখছে মূর্তিটা নিষ্প্রাণ। সেখানে দয়ামায়া স্নেহ, ভালবাসা একবিন্দু নেই।

সে ভেবেছিল আজকের মত এমনি এক কাব্যচর্চার মাঝখানে নিজের কথা জানাবে, ছোট্ট একটি কথা সুখেন্দুকে বলবে,—কিন্তু না!

তার সব আশাই ব্যর্থ হয়ে গেছে।

লোকেন চ্যাটার্জী সেতারে বেশ নাম করেছেন। আজকাল হু'একটা জলসা বা বিচিত্রানুষ্ঠানে তিনি সেতার বাজান। দক্ষ শিল্পীর মত সুরের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেন। মানুষ অভিভূত হয়ে যায়। একটা ককিয়ে-ওঠা কান্না অনেকের মুখ থেকে বেরিয়ে আসতে চায়।

লোকেন চ্যাটার্জীর চোখে-মুখে প্রতিভার দীপ্তি জ্বলজ্বল করে।

তিনদিকে তিনজন গুণী। মাঝখানে আরতি। তিনজনের পথযাত্রা তিনদিকে। কিন্তু আরতির কোন পথ নেই। অন্ততঃ সুখেন্দুর প্রত্যাখানের পর তার পথ হারিয়ে গেছে। নির্লজ্জের মত সুখেন্দুকে সে একদিন তার মনের কথা স্পষ্ট করে বলেছিল। ভেবেছিল, সব কথা শুনে সুখেন্দু হয়তো খুশী হবে। তাকে আশা দেবে।

কিন্তু—না।

সুখেন্দু শুধু হাসতে হাসতে বলেছিল—, কাব্যচর্চার মাঝখানে ও-সবের সময় কোথায়!

তার থেকে যদি আরতির গালে একটা চড় বসিয়ে দিতো, তো সে রাগ করতো না।

সুখেন্দুর ঔদাসীন্য তাকে পাথর ক'রে দিয়েছে। আরতি ভাবে—, দাদার সেতার আছে। বৌদির সংসার আছে। হেমন্তবাবুর জ্যোতিষ আছে। সুখেন্দুর কবিতা আছে—কিন্তু তার কি—!

তার—কি আছে!

এক কথায় বলতে গেলে বলা যায় কিছুই নেই। তার ভবিষ্যৎ অন্ততঃ—এখন দেখলে মনে হয় ফাঁকা। সেই অবস্থাতেই সে মায়ের চিঠির উত্তর দেয়।

আরতির মুখ থেকে কথাটা শুনে লোকেন চ্যাটার্জী বলেন—, দেশে যাবি বলছিস, কিন্তু আসবি কবে—?

আরতি হেসে ফেলে,—আগে যাই! তবে তো আসার কথা—!

—তাড়াতাড়ি ফিরিস। তুই থাকলে সেতার বাজাতে ভালই লাগে। জানিস তো তোর বৌদি এসব পছন্দ করে না। সে তার সংসার নিয়েই ব্যস্ত। তোর উৎসাহ না পেলে—!

—থামো দাদা। আরতি লজ্জিত হয়—, কি যা তা বলো—!

—না রে না! ঠিকই বলছি।—লোকেন চ্যাটার্জী স্নেহভরে বোনের দিকে তাকান।

জ্যোতির্বার্ণব বললেন—, আবার ফিরে এসো মা। তুমি না থাকলে তেতলা অন্ধকার।

আরতি বলে—, আপনার কথা গিয়েও ভুলতে পারবো না কাকাবাবু!

—ভুলবে কেমন ক'রে! তুমি যে মা-লক্ষ্মী। জ্যোতির্বার্ণব বলেন—, মিথুনরাশি, দেবগণ, তার ওপর জন্মমাস হ'লো ফাল্গুনে—। তুমি যে মায়াবিনী—!

সব শেষে খবর পেল সুখেন্দু। বলদে—, মায়ের কাছে যাচ্ছ, বেশ তো। কিন্তু আসছ কবে—?

দাদাকে যা বলেছিল, সেই কথারই সে পুনরাবৃত্তি করে।

—তাড়াতাড়ি ফিরো। এসে দেখবে অনেক নতুন কবিতা লিখে রেখেছি। সুখেন্দু হাসে।

কিন্তু আরতি কারো কথাই রাখতে পারেনি। তার জন্যে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। দেশে যাবার কিছুদিন পরেই বসন্তরোগে সে মারা গিয়েছে।

খবরটা যথাসময়ে তেতলায় এসে পৌচেছিল। লোকেন চ্যাটার্জী বড় আঘাত পেয়েছেন মনে। একমাত্র বোন চলে যাওয়ায় তিনি যেন কেমন বিভ্রান্ত হয়ে গেছেন। সেতার বাজাতে উৎসাহ পাননা। তাছাড়া সেতার নিয়ে বসলেই আরতির কথা মনে পড়ে। তার উৎসুক চোখের দৃষ্টি আর হাসিভরা মুখ চোখের সামনে ছবির মত ভেসে ওঠে। তার কাছে মানুষের স্তুতি আর জলসার হাততালি নগণ্য মনে হয়।

না—! সেতার বাজানো বোধহয় তাঁর দ্বারা চলবে না!

জ্যোতির্বার্ণব দুঃখ করেন—, আহা-হা! রাজরাণী মা আমার অকালেই চলে গেল! কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে

আরতির কোষ্ঠীর কথা তাঁর মনে পড়ে। তিনিই ক'রে দিয়েছিলেন সেখানা। কই তার মধ্যে তো আরতির অকালমৃত্যুর সামান্যতম ইশারা পাননি। ভাল ঘর, বর, আর আয়ুষ্মতী হবে—এই ছিল কোষ্ঠীর ফল। কিন্তু…! জ্যোতিষার্ণব ভাবতে থাকেন—তবে কি সব মিথ্যে! এতদিন ধ'রে যা কিছু করলেন সব ভূয়ো! চকিতে একটা কথা মনে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি দেরাজ থেকে বার করলেন নিজের কোষ্ঠীখানা। পুরনো। বিবর্ণ। তাঁর গুরু অর্থাৎ যিনি তাঁকে জ্যোতিষ-বিদ্যায় দীক্ষা দেন, সেই নামকরা জ্যোতিষীর হাতের কোষ্ঠী। মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলেন তার মধ্যে। দেখতে দেখতে জ্যোতিষার্ণব হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। কুচি কুচি ক'রে ছিঁড়ে ফেললেন কোষ্ঠীখানা। মিথ্যে—মিথ্যে! সব ফাঁকিবাজি! চালাকি—!

সাঁইত্রিশ বছর বয়েসে তাঁর মৃত্যুযোগ—এই ছিল কোষ্ঠীর ফল। এর বেশী তিনি বাঁচতে পারেন না। তাই আর কোন দশাদশা কোষ্ঠীতে নেই। অথচ এই পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েস হ'লো—দিব্যি সুস্থ শরীরে তিনি বেঁচে রয়েছেন। জ্যোতিষার্ণব ভয় পেলেন মনে মনে। মানুষের আয়ুকে, ভাগ্যকে কোষ্ঠীর বাঁধনে বাঁধা যায় না। কিন্তু আজ পনের বছর ধ'রে মানুষকে নিয়ে তিনি ছেলেখেলা করেছেন। তাদের ভয় দেখিয়েছেন। রাজাকে ফকির আর ফকিরকে রাজা হবার মিথ্যে স্বপ্ন দেখিয়েছেন। এই সত্যটা এতদিন ভুলে ছিলেন কেমন ক'রে! আশ্চর্য!

সুখেন্দু মনে মনে একটু বিষণ্ণ হয়েছিল মাত্র। এ বাড়িতে শুধু আরতি ছিল তার কবিতার অনুরাগী। মেয়েটিকে কবিতা শুনিয়ে আনন্দ ছিল। কবিতা সে বুঝতো।

এরপর একবছর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে কবে। এখন যদি কেউ টালিগঞ্জের সেই তেতলা বাড়িতে যান, দেখবেন—লোকেন চ্যাটার্জীর সেতার নেই।

কারণ জিগ্যেস করলে শুনতে পাবেন—, ও আর ভাল লাগে না মশাই। বাজনার ঝন্‌ঝনানি শুনে শুনে কানে একটু খাটো হয়ে গেছি। বেচে দিয়েছি সেটাকে।

জ্যোতিষার্ণব ব'লে খোঁজ করলে আজ আর কেউ বলতে পারবে না। কয়লাবাবু বললে একডাকে সকলেই চিনিয়ে দেবে। রাস্তার মোড়ে কয়লার দোকান করেছেন হেমন্তবাবু। মন্দ আয় করেন না। এখনো অনেক রাত পর্যন্ত তাঁর ঘরে আলো জ্বলে। জ্যোতিষচর্চা নয়—কয়লার হিসেবের জমাখরচ লেখেন তিনি।

কেবল সুখেন্দুর কবিখ্যাতি আরও বেড়েছে। ছোটখাট সভার এক আধটা ফুলের মালা ও সে পায়। আজও অনেক রাত পর্যন্ত সে জেগে থাকে। রাইস্ মিলের আড়ালে বাঁকা চাঁদ দেখে আজ আর দিনেশ দাসের কবিতা মনে পড়ে না। মনে পড়ে……। কি মনে পড়ে তা সে ঠিকমত বুঝতে পারেনা। ভাবে—, জীবনে সে বোধহয় একটা ভুল করেছিল!

কিন্তু সে ভুলটা কি—সুখেন্দুর কবিবুদ্ধি তার কোন হদিস পায় না।
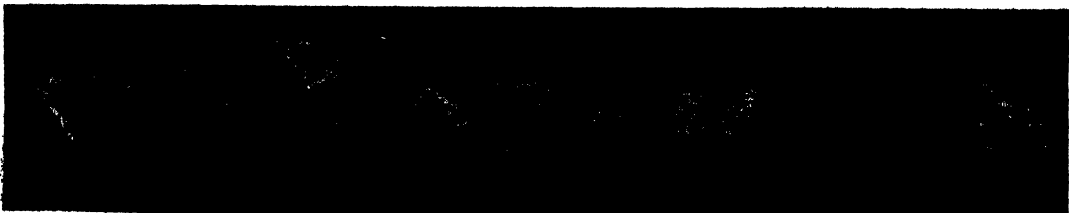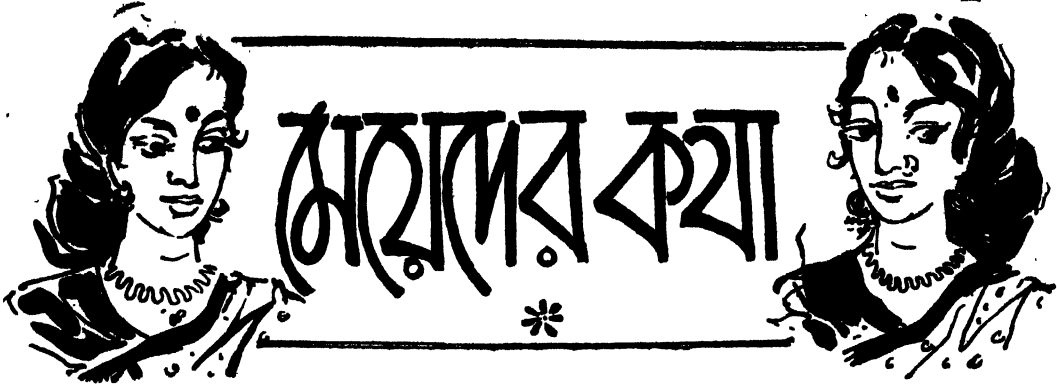
ধর্মশাস্ত্রে স্ত্রীধন

শ্রীবাণী চক্রবর্তী, এম্-এ, স্মৃতিতীর্থ

সমাজে স্ত্রীলোকের স্থান সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেক স্ত্রীই আদ্যাশক্তির অংশস্বরূপা। মহর্ষি মার্কণ্ডেয় প্রত্যেক রমণীই যে আদ্যাশক্তির অংশভূতা তাহা নির্দেশ দিয়াছেন। যথা—

"বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।"

অর্থাৎ হে দেবি! জগতে সকল বিদ্যা ও সমস্ত রমণীই তোমার মূর্ত্যন্তরমাত্র। এইজন্য শাস্ত্রে উক্ত আছে যে—

"স্ত্রিয়ো যত্র চ পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
অপূজিতাশ্চ যত্রৈতাঃ সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥"

অর্থাৎ স্ত্রীগণ যেখানে পূজিত হন, সেখানে দেবতাগণও সুখী হন। যেস্থানে নারীগণ পূজিত না হন, সেখানে সমস্ত ক্রিয়া নিষ্ফল হয়।

এইজন্য মহাভারতেও কথিত আছে—

"পূজনীয়া মহাভাগাঃ পুণ্যাশ্চ গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়ো গৃহস্যোক্তাস্তস্মাদ্ রক্ষ্যা বিশেষতঃ॥"

অর্থাৎ নারীগণ পূজনীয়া, মহাভাগা, পুণ্যা ও সংসারের দীপ্তিস্বরূপা, তাঁহারাই সংসারের শ্রী, সেইজন্য যত্নপূর্বক তাঁহারা রক্ষণীয়া।

স্ত্রীলোকের বিবাহই প্রধান সংস্কার। ইহা তাঁহার দ্বিতীয়জন্মস্বরূপ হইয়া থাকে, যথা—'পাণিগ্রহণং নাম স্ত্রীণাং জন্ম দ্বিতীয়মিচ্ছন্তি।' দ্বিজাতির পুত্রের উপনয়নের ন্যায় প্রধান সংস্কার স্ত্রীলোকের এই বিবাহ। সংসারে স্ত্রীগণ সম্রাজ্ঞী হইয়া অবস্থান করেন। এই বিষয় আমরা ঋগ্বেদে দেখিতে পাই—

"সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রাং ভব।
ননান্দরি সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু॥"

অর্থাৎ নববধূকে আশীর্বাদ করিয়া ঋষি বলিতেছেন যে শ্বশুর, শাশুড়ী, ননদ, দেবর—সকলের নিকটই তুমি সম্রাজ্ঞী হও।

সংসারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইয়া নারী অবস্থান করেন। এই সংসারকে পরিচালনা করিবার জন্য সদা সচেষ্ট থাকিতে নারীকে বলা হইয়াছে। সকলের মধ্যে দাক্ষিণ্য ও কল্যাণ বিতরণ করিতে নারীকে সর্বদা তৎপর হইতেও নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অথর্ববেদে বলা আছে—

"যথা সিন্ধু র্নদীনাং সাম্রাজ্যং সুষুবে বৃষা।
এবা ত্বং সম্রাজ্ঞ্যধিপত্যুরস্তং পরেত্য॥"

অর্থাৎ সমস্ত নদীর মধ্যে সিন্ধু নদী আপন দাক্ষিণ্য ও উদারতার গুণে সকলের প্রধান হইয়াছে, সেইরূপ তুমিও পতিগৃহে গমন করিয়া স্বকীয় মহত্ত্ব ও দাক্ষিণ্যগুণে সম্রাজ্ঞীর পদলাভ কর। এইজন্য মনু বসন, ভূষণ ও আহার্যাদির দ্বারা নারীকে পূজা করিতে বলিয়াছেন। যথা—'তস্মাদেতাঃ সদা পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ'।

এইরূপে দেখা যায় স্ত্রীলোক সর্বস্থানেই একটি বিশিষ্ট-

স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই সমাজে কি গৃহকর্মে, কি ধর্মক্ষেত্রে, কি ব্যবহারক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের দাবী অগ্রগণ্য। ধনাধিকারনিরূপণেও স্ত্রীলোকের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে। ধর্মশাস্ত্রের ধনাধিকারবিষয়ে পারিভাষিক স্ত্রীধনই এই বিশিষ্টতা দান করিয়াছে।

স্ত্রীগণকে কেন ধন দেওয়া হয় তাহার উত্তরে বলা যায় যে কন্যাগণ পুত্রের ন্যায়ই পিতামাতার শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কারণ উক্ত আছে—

"অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবতি পুত্রবদ্দুহিতা নৃণাম্।
তস্যাঃ পিতৃধনং ত্বন্যঃ কথং গৃহ্ণীত মানব॥"

অর্থাৎ পুত্র যেরূপ মানবের অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হয়, কন্যাও সেইরূপ অঙ্গ হইতেই উৎপন্ন হয়। সুতরাং কন্যা থাকিতে কিরূপে পিতৃধন অন্যে গ্রহণ করিতে পারে?

আবার কন্যা নিজপুত্রের দ্বারা মাতামহের স্বর্গলোক প্রাপ্তি করায়। যেমন মহাভারতের আদিপর্বে গান্ধারীবাক্য আছে যে—

"একা শতাধিকা কন্যা ভবিষ্যতি কনীয়সী।
ততো দৌহিত্রজাল্লোকাদবাহোঽসৌ পতির্মম॥"

অর্থাৎ গান্ধারী বলিতেছেন যে আমার কনিষ্ঠা কন্যা একাই শতপুত্র অপেক্ষা উপকারিণী। কারণ ইহার জন্যই আমার পতি ধৃতরাষ্ট্র দৌহিত্র দ্বারা প্রাপ্য স্বর্গাদি লোক হইতে আর বহিষ্কৃত হইবেন না।

কন্যা পিতৃবংশের এইপ্রকার উপকার করে বলিয়াই জন্ম হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত পিতা, মাতা, ভ্রাতা, মাতুল, মাতামহ, পতি, আত্মীয়বর্গ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ তাঁহার উপর দয়াপরবশ হইয়া কন্যাকে যাহা স্বেচ্ছায় ক্রয়, বিক্রয় ও ভোগ করিবার জন্য দিয়া থাকেন, সেই ধনই ধর্মশাস্ত্রে স্ত্রীধন বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে।

তবে স্ত্রীলোকের যে কোন ধনই স্ত্রীধনরূপে গণ্য হইবে না। স্ত্রীধনে স্ত্রীলোকের দান, বিক্রয় প্রভৃতি কার্যে সম্পূর্ণ অধিকার আছে। এই ধনে স্বামী বা অন্য কোন ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য থাকে না। যদি কেহ বলপূর্বক স্ত্রীধন ভোগ করে, তাহা হইলে সে সেই অপরাধে রাজার নিকট দণ্ডনীয় হইবে। আর যদি কেহ প্রণয়পূর্বক অনুমতি লইয়া স্ত্রীধন ভোগ করে, তবে সেই ব্যক্তি যখন সম্পত্তিপন্ন হইবে তখন রাজা সেই স্ত্রীধন তাহাকে ফেরৎ দিতে বাধ্য করিবেন। অতএব স্ত্রীধনে একমাত্র স্ত্রীরই সম্পূর্ণ অধিকার। স্ত্রীধনের লক্ষণ হইতেছে যে স্ত্রীগণ ভর্তা বা অপর কোন ব্যক্তির অনুমতি অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং যে ধন দান, বিক্রয় ও ভোগ করিতে পারে সেই ধনকে স্ত্রীধন বলা যায়।

এই স্ত্রীধন বহুপ্রকারের হইতে পারে।

পিতৃদত্ত, মাতৃদত্ত, পুত্রদত্ত, ভ্রাতৃদত্ত, অধ্যগ্নি হইতে আগত অর্থাৎ যৌতুক ধন, আধিবেদনিক অর্থাৎ অধিবেদন লব্ধ, মাতুল প্রভৃতি দ্বারা প্রদত্ত, শুল্ক ও অন্বাধেয়—ইহাদিগকে স্ত্রীধন বলে।

অধিবেদন শব্দের অর্থ অধিক বিবাহ, তদুপলক্ষে যাহা দত্ত এই ব্যুৎপত্তিতে আধিবেদনিকশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অতএব দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবার নিমিত্ত স্বামী প্রথমা স্ত্রীকে যাহা পারিতোষিক হিসাবে দিয়া থাকেন তাহার নাম আধিবেদনিক।

অন্বাধেয় ধন যথা—বিবাহের পর ভর্তৃকুল বা পিতৃ-মাতৃকুল হইতে এবং ভর্তা ও তাঁহার পিতামাতার নিকট হইতে স্ত্রীলোক যে ধন প্রাপ্ত হয় সেই ধনকে অন্বাধেয় বলে।

মনু ও কাত্যায়ন স্ত্রীধন সম্বন্ধে বলিয়াছেন। যথা—

"অধ্যগ্ন্যধ্যাবাহনিকং দত্তঞ্চ প্রীতিতঃ স্ত্রিয়ৈ।
ভ্রাতৃমাতৃপিতৃপ্রাপ্তং ষড়্‌বিধং স্ত্রীধনং স্মৃতম্॥"

অর্থাৎ অধ্যগ্নি, অধ্যাবাহনিক ও প্রণয়পূর্বক আত্মীয়েরা স্ত্রীলোককে যাহা দেন এবং ভ্রাতা, মাতা ও পিতা হইতে প্রাপ্ত—এই ছয় প্রকার স্ত্রীধন কথিত হয়।

বিবাহকালে অগ্নিসন্নিধানে স্ত্রীলোককে যাহা দান করা হয় পণ্ডিতগণ তাহাকে অধ্যগ্নি নামক স্ত্রীধন বলিয়াছেন। ইহাকে যৌতুকধনও বলে। অধ্যগ্নিধন বলিতে "দীয়তে হ্যগ্নিসন্নিধৌ" অর্থাৎ অগ্নিসন্নিধানে যাহা দত্ত হয়—এই কথা উক্ত থাকিলেও বিবাহকালে অর্থাৎ নান্দীমুখ শ্রাদ্ধের আরম্ভকাল হইতে সপ্তপদীগমনের পর পতিকে অভিবাদন পর্যন্তকাল মধ্যে কন্যাকে বা তাহার স্বত্বের উদ্দেশ্যে বরের হাতে যে ধন অর্পিত হয় তাহাও স্ত্রীধন হয়। এই ধনকে যৌতুকধন বলিয়াও অভিহিত করা হয়। যৌতুক ও যৌতক শব্দ একার্থবাচক। যৌতক অর্থাৎ বিবাহকালে লব্ধ ধন। কারণ যু ধাতুর অর্থ মিশ্রণ, তাহার উত্তর ক্ত প্রত্যয়ে 'যুত' পদ সিদ্ধ হইতেছে। এস্থলে বিবাহ হইতে স্ত্রী ও

পুরুষের মিশ্রতা অর্থাৎ একশরীরতা মন্ত্র দ্বারা সিদ্ধ হয়। এই মিশ্রণ হয় স্ত্রী ও পুরুষের অস্থির সহিত অস্থির, মাংসের সহিত মাংসের এবং ত্বকের সহিত ত্বকের—ইহা শ্রুতিতে আছে। অতএব বিবাহকাললব্ধ ধন যৌতক বা যৌতুক ধন।

আর কন্যাকে যখন পিত্রালয় হইতে পতির গৃহে লইয়া যাওয়া হয়, তখন ঐ কন্যা পিতৃকুল ও মাতৃকুল হইতে যাহা প্রাপ্ত হয় তাহাকে অধ্যাবাহনিক নামক স্ত্রীধন বলা যায়।

বিবাহসময়ে কন্যার উদ্দেশ্য অর্থাৎ এই ধন কন্যার—এই উদ্দেশ্য করিয়া বরের হস্তে যাহা কিছু দেওয়া হয় সে সমস্তই কন্যার ধন হইবে তাহা কেহ ভাগ করিয়া লইতে পারিবে না। কন্যার ইহা হউক—এইরূপ উদ্দেশ্য না থাকিলে স্ত্রীধন হইবে না। অতএব বিবাহকাল উপলক্ষমাত্র। যে কোন সময়ে যে কোন ব্যক্তির উদ্দেশ্যে দান করিলেই গ্রহীতার স্বত্ব হইবে। স্বত্বের প্রতি দাতার অভিসন্ধিই কারণ। যেহেতু প্রমাণ আছে যে কন্যার স্বামীর হস্তে যাহা দেওয়া হয় তাহা সেই কন্যাকেই দেওয়া হইবে এবং সেই স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাহাতে সেই স্ত্রীর কন্যাপুত্র প্রভৃতির অধিকার হইবে। এই বচনে বিবাহকালের কোন উল্লেখ নাই এবং পতির হস্তে সমর্পিত ধন কন্যা পাইবে বলাতে কন্যার উদ্দেশ্যেই দানবোধ হইয়া থাকে, এইজন্য উদ্দেশ্যের কথা বলা হয় নাই।

যাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন—

"পিতৃমাতৃপতিভ্রাতৃদত্তং মধ্যগ্ন্যুপাগতম্।
আধিবেদনিকঞ্চৈব স্ত্রীধনং পরিকীর্তিতম্॥"

অর্থাৎ পিতা, মাতা, পতি, ভ্রাতা যাহা নারীকে দিয়া থাকেন তাহা এবং অধ্যগ্নি ও আধিবেদনিক ধন স্ত্রীধন।

দেবল বলেন—

'বৃত্তিরাভরণং শুল্কং লাভশ্চ স্ত্রীধনং ভবেৎ'।

অর্থাৎ বৃত্তি, আভরণ, শুল্ক ও লাভপ্রাপ্ত ধন স্ত্রীধন।

বৃত্তি অর্থাৎ জীবিকা। রমণীকে তাঁহার জীবিকার জন্য অর্থাৎ স্বেচ্ছায় ব্যয়ের জন্য যে ধন তাঁহার আত্মীয়গণ প্রদান করেন তাহাকে বৃত্তিধন কহে।

আভরণ ধন যথা—নারীকে স্বেচ্ছায় ব্যবহারের জন্য অর্থাৎ যখনই তাঁহার ইচ্ছা হইবে তখনই যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিবে এইরূপ স্বাতন্ত্র্য দিয়া যে অলঙ্কার প্রভৃতি তাঁহাকে আত্মীয়গণ দান করেন, সেই আভরণই এই আভরণ-সংজ্ঞক স্ত্রীধন।

কিন্তু যেসকল আভরণ অর্থাৎ স্বর্ণালঙ্কার প্রভৃতি স্ত্রীলোককে তাহার যথেচ্ছ ব্যবহার্যরূপে দান করা হয় নাই, কেবলমাত্র গৃহস্বামীর সম্ভ্রমরক্ষার উদ্দেশ্যে উৎসবের সময় অর্থাৎ নিমন্ত্রণ প্রভৃতি ব্যাপারে এবং নারী জনসমাজে গমন করিবার সময় পরিধান করিতে পারিবে—এই উদ্দেশ্যে স্ত্রীলোকের নিকট যে আভরণ রাখা হয় সেই আভরণ স্ত্রীধন হইবে না। আবার দেখা যায় অপর কোন অধিকারীকে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে যে আভরণ প্রভৃতি স্ত্রীকে দেওয়া হয় তাহাও স্ত্রীধন বলিয়া গণ্য হইবে না।

শুল্ক অর্থাৎ গৃহাদি শিল্পকার্যে, গৃহোপযোগী যাবতীয় দ্রব্যের নির্মাণকার্যে, অশ্ব প্রভৃতি জীবজন্তু বাহনের শিক্ষাকার্যে, গরু-মহিষ প্রভৃতির দোহনকার্যে কিম্বা আভরণ রচনা কার্যে নিপুণতম ব্যক্তিকে নিজকার্যে নিয়োজিত করিতে তত্তৎকার্যের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ঐ কার্যে প্রবর্তনার জন্য উক্ত কার্যে নিপুণতম ব্যক্তির আত্মীয়া নারীকে যে উৎকোচ অর্থাৎ ঘুষ দেওয়া হয় সেই ধনকে শুল্কধন বলে।

আবার দেখা যায়—

"যদা নেতুং ভর্তৃগৃহে শুল্কং তৎ পরিকীর্তিতম্"

অর্থাৎ পতি তাঁহার স্ত্রীকে পিত্রালয় হইতে নিজের আলয়ে আনিবার কালে যাহাতে সেই স্ত্রী সন্তুষ্টচিত্তে আসে সেইজন্য যে ধন প্রদান করে তাহাকে শুল্কধন কহে।

লাভ অর্থাৎ অসম্ভাবিত উপায়ে স্ত্রীলোকে যাহা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ কুড়াইয়া পায় তাহাই লাভসংজ্ঞক স্ত্রীধন। তবে ব্যবহারময়ূখকার নামক নিবন্ধকার লাভশব্দের অর্থ 'বৃদ্ধি' বলিয়া ধরিয়াছেন। বৃদ্ধি অর্থাৎ কুসীদ অর্থাৎ সুদ। আবার বীরমিত্রোদয়কারের মতে কুমারীপূজায় বা সধবা-পূজায় স্ত্রীলোক যে ধন প্রাপ্ত হয় তাহাও লাভরূপে স্ত্রীধনরূপে কথিত হয়।

মহর্ষি দেবব্যাস বলিয়াছেন—

"দ্বিসহস্রপরো দায়ঃ স্ত্রিয়ৈ দেয়ো ধনস্য তু।
যচ্চ ভর্ত্রা ধনং দত্তং সা যথাকামমশ্নুয়াৎ।"

অর্থাৎ দুই হাজার পর্যন্ত ধন স্ত্রীকে স্বামী প্রতিবৎসর

স্বেচ্ছাব্যয়ের জন্য দিবেন, উহা স্ত্রীধন মধ্যে পরিগণিত হইবে।

গোলাপ শাস্ত্রীর "হিন্দু ল" গ্রন্থে উক্ত আছে যে বিবাহ উৎসব আরম্ভ হইতে তাহার সমাপন পর্যন্ত কালের মধ্যে অর্থাৎ গাত্রহরিদ্রা হইতে পাকস্পর্শ কাল পর্যন্ত যে ধন কন্যা লাভ করে তাহাই যৌতুক ধন। ইহা বলিয়া তিনি আরও নির্দেশ দিয়াছেন যে বিবাহের পরদিন পতিগৃহে যাইবার সময় পিতা ঐ সময়ে কন্যাকে যাহা দেন তাহা অধ্যাবাহনিক হইলেও যৌতুক ধন। আবার ঐ সময়ে পতিও যদি সন্তোষের জন্য পত্নীকে কিছু দেন তাহা শুল্ক হইলেও যৌতুক ধন। ইহা ছাড়া দ্বিরাগমন প্রভৃতিকালে পিতৃদত্তধন অধ্যাবাহনিক ও পতিদত্ত ধন শুল্ক স্ত্রীধন হয়। ইহা কেবল বঙ্গদেশে প্রচলিত, বিহার প্রভৃতি দেশে নহে; কারণ ঐ সব প্রদেশে বিবাহের পরই কন্যাকে পতিগৃহে পাঠানোর রীতি নাই।

আবার কাত্যায়নের বচন আছে—

"প্রাপ্তং শিল্পৈস্তু যদ্বিত্তং প্রীত্যা চৈব যদন্যতঃ।
ভর্তুঃ স্বাম্যং ভবেত্তত্র শেষন্তু স্ত্রীধনং স্মৃতম্॥"

অর্থাৎ স্ত্রীলোক শিল্পকর্ম করিয়া যাহা প্রাপ্ত হয় ও পিতৃমাতৃভর্তৃকুল ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হইতে যাহা পায়—এই দুই প্রকার স্ত্রীধনে ভর্তার স্বামিত্ব হয়, অর্থাৎ স্বামী ইচ্ছা করিলে আপৎকাল ব্যতিরেকেও ঐ দুই স্ত্রীধন লইতে পারেন, কিন্তু অন্যান্য স্ত্রীধন আপৎকাল ভিন্ন লইতে পারেন না। এই বচনে 'অন্যতঃ' এই পদ থাকায় পিতৃ, মাতৃ ও ভর্তৃকুল ব্যতিরিক্ত অন্য লোকের নিকট প্রাপ্ত অথবা শিল্পকর্ম দ্বারা যে ধন উপার্জিত হয় সে ধনে ভর্তার প্রভুত্ব অর্থাৎ আপৎভিন্নকালেও ভর্তা উহা গ্রহণ করিতে পারেন। এইজন্য উক্ত দুই ধন স্ত্রীর স্বত্বযুক্ত হইলেও স্বামীর পারতন্ত্র্য প্রযুক্ত সম্যক্ প্রকারে স্ত্রীধনপদবাচ্য হইতে পারে না, এই দুইটি ভিন্ন আর সমস্ত স্ত্রীধনেই স্ত্রীলোকের দান, বিক্রয় প্রভৃতি কার্যে সম্পূর্ণ অধিকার আছে। সেইরূপ কাত্যায়ন ঋষি বলিয়াছেন যে বিবাহিতা হউক আর কুমারীই হউক, পতির গৃহে হউক বা পিতার বাটীতে হউক, ভর্তার নিকটেই হউক বা পিতামাতার নিকটেই হউক—স্ত্রী যাহা প্রাপ্ত হয় তাহাকে সৌদায়িক নামক স্ত্রীধন বলা যায়। সৌদায়িক স্ত্রীধনে স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ প্রভুত্ব আছে। যেহেতু আত্মীয়েরা কৃপা করিয়া জীবিকার্থই সেই ধন তাঁহাকে দিয়াছেন বলিয়া সেই সৌদায়িক ধন স্থাবর হউক বা অস্থাবর হউক সর্বত্রই ইচ্ছানুসারে দান বিক্রয় করিতে স্ত্রীলোকের সর্বতোভাবে প্রভুত্ব আছে। সৌদায়িক শব্দের ব্যুৎপত্তি এই যে 'সুদায়' শব্দে যাহাদের সঙ্গে ধনাধিকার সম্বন্ধ ঘটে এমত আত্মীয় লোকদের নিকট হইতে স্ত্রীলোক যাহা প্রাপ্ত হয় তাহা 'সৌদায়িক' পদবাচ্য। সৌদায়িকের মধ্যে কেবল ভর্তৃদত্ত স্থাবর সম্পত্তিতে স্ত্রীর দান, বিক্রয় প্রভৃতি কার্যে অধিকার নাই। ভর্তা প্রীত হইয়া স্ত্রীকে যাহা দান করেন তাহা স্বামীর মৃত্যুর পর সেই স্ত্রী আপন ইচ্ছানুসারে ভোগ করিবে। আর স্থাবর সম্পত্তি ভিন্ন স্বামীদত্ত অন্য ধন স্ত্রী দান করিতেও পারে।

কিন্তু স্বামী যদি দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি সঙ্কটে পড়িয়া স্ত্রীধন ব্যয় না করিয়া অন্য কোন প্রকারে জীবিকা নির্বাহ করিতে সমর্থ না হন তবে স্ত্রীধন লইতে পারেন, অন্যথা পারেন না। যথা যাজ্ঞবল্ক্যের বচনে আছে—দুর্ভিক্ষ সময়ে, অবশ্য ধর্মকার্যে ও রোগগ্রস্ত হইলে এবং উত্তমর্ণ ঋণ আদায় জন্য অবরুদ্ধ হইলে পর বিপদগ্রস্ত হইয়া স্বামী যে স্ত্রীধন গ্রহণ করেন তাহা পুনর্বার স্ত্রীকে না দিলেও না দিতে পারেন। কিন্তু পূর্বোক্ত দুর্ঘটনা ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে স্ত্রীধনে স্বামী হস্তার্পণ করিতে পারেন না। যদি স্বামী আর একটি বিবাহ করিয়া ঐ প্রথমা স্ত্রীকে ভাল না বাসেন তাহা হইলে প্রথমা স্ত্রী কর্তৃক প্রীতিপূর্বক প্রদত্ত হইলেও স্ত্রীধন রাজা বলপূর্বক প্রথমা স্ত্রীকে দিতে বাধ্য করিবেন। আর উক্ত নিরুপায় স্ত্রী স্বামীর নিকট হইতে আপনার পতিযোগ্য অংশ গ্রহণ করিবেন। স্বামী স্ত্রীধন লইয়া যদি অন্য স্ত্রীর সহিত পৃথক্ বাস করেন এবং তাহাকে অবজ্ঞা করেন তাহা হইলে গৃহীত স্ত্রীধন রাজা বলপূর্বক প্রথমা স্ত্রীকে দেওয়াইবেন এবং ভর্তা যদি অন্নাচ্ছাদনাদি না দেন তবে তাহাও স্ত্রী রাজদ্বারে অভিযোগ করিয়া আদায় করিয়া লইবে।

স্ত্রীধনের বিভাগ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে মনুবচনে আছে—জননী পরলোকগত হইলে সহোদর ভ্রাতৃগণ এবং অদত্তা ভগিনীরা সকলে মিলিয়া মাতার অযৌতুক ধন সমান ভাগ করিয়া লইবে। এই বচনে দ্বন্দ্বসমাস না থাকিলেও দ্বন্দ্বের সমানার্থক চ-কার দ্বারা ভ্রাতৃভগিনী উভয়ের মিলিত রূপে

বিভাগ প্রতিপাদন করায় ভগিনীগণ ও সহোদর অর্থাৎ দত্তকাদি ভিন্ন ভ্রাতারা সকলে মিলিয়া ভাগ করিয়া লইবে—এইরূপই বচনের অর্থ করা কর্তব্য। বৃহস্পতিও চ-কার দ্বারা কন্যাপুত্রের মিলিত অধিকার হইবে বলিয়া নির্দেশ দিয়াছেন—যথা, স্ত্রীধনে তদীয় অপত্যগণের অধিকার এবং কন্যাও তাহার অংশভাগিনী হয়, অবিবাহিতা কন্যা যদি থাকে তাহা হইলে বিবাহিত কন্যার অধিকার হইবে না।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে কন্যা ও পুত্রের একের অভাবে অন্যের অধিকার হইবে। এই সব বিষয়ে ধর্মশাস্ত্র নিবন্ধকার জীমূতবাহন ও রঘুনন্দনের মতের পার্থক্য নাই। তবে সাধারণ স্ত্রীধনে রঘুনন্দন দৌহিত্রের অধিকারের পরে মৃতা ধনস্বামিনীর পিণ্ডদানরূপ উপকার করে বলিয়া প্রপৌত্রের অধিকার প্রতিপাদন করিয়াছেন। কিন্তু জীমূতবাহন ইহার উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার মতে দৌহিত্রের অভাবে বন্ধ্যা ও বিধবা কন্যার অধিকার। কিন্তু রঘুনন্দন দায়ভাগের টীকাপ্রসঙ্গে এই সম্বন্ধে কোন মত দেন নাই। তাঁহার মতে ধনাধিকারে পিণ্ডদানরূপ উপকারই হেতু। বন্ধ্যা ও বিধবাগণের সেইরূপ উপকারকতা নাই বলিয়া দৌহিত্রের পূর্বে ইহাদের অধিকার নাই। তবে এই টীকায় রঘুনন্দন দৌহিত্রের ও পর প্রপৌত্রের অধিকার সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করেন নাই। কেবল দায়তত্ত্বে ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। দায়ভাগের টীকাপ্রসঙ্গে শ্রীনাথও এই সম্বন্ধে কোন কথা উল্লেখ করেন নাই। আরও দেখা যায় রঘুনন্দন দায়তত্ত্বে লিখিয়াছেন—দৌহিত্র পর্যন্ত অধিকারীর পরই সপত্নীপুত্র এবং সপত্নীপৌত্রের অধিকার হইবে। কিন্তু দায়ভাগে দৌহিত্রের পূর্বে সপত্নীপুত্রের অধিকার নির্দেশ করা হইয়াছে। এই প্রকার অধিকারিক্রমে রঘুনন্দন সম্পূর্ণ দায়ভাগমত অনুসরণ না করিয়া কিছু কিছু স্বকীয় মতও প্রচার করিয়াছেন।

এখানে আরও উল্লেখযোগ্য যে, বঙ্গদেশে বর্তমানে কেবলমাত্র জীমূতবাহনের দায়ভাগকৃত স্বকীয় মতই যে প্রচলিত আছে তাহা নহে, বর্তমানে দায়ভাগকার জীমূতবাহনের মত, তাহার টীকাকার রঘুনন্দনের মত ও তৎকৃত দায়তত্ত্বোক্ত মত এবং টীকাকার শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের মত—এই তিন জনের মতের মিশ্রণে যে অপূর্ব অভিনব মত দায়ভাগের মত বলিয়া বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে এবং যাহার অবলম্বনে বর্তমান আইন গঠিত হইয়াছে, তাহাকে একটি নূতন মিশ্রিত মত বলা চলে।

অতএব দেখা যায় ধনাধিকারনিরূপণেও স্ত্রীগণের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে।

প্রসূতি-পরিচর্য্যা ও শিশুমঙ্গল

ডাঃ কুমারেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম,বি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

স্নানাদির ব্যবস্থা ছাড়া, প্রত্যহ নিয়মিতভাবে নবজাত শিশুর ওজন পরীক্ষা করে দেখাও প্রসূতি, ধাত্রী, চিকিৎসক ও পালিকা সকলেরই একান্ত আবশ্যকীয় কর্তব্য। এ কাজের সাধারণ-রীতি হলো নবজাত-শিশুকে গোড়াতেই পোষাক-পরিচ্ছদ পরিহিত অবস্থায় ওজন করে দেখে, পরে আরেকবার স্বতন্ত্রভাবে শুধু জামা-কাপড়গুলির ওজন নিয়ে হিসাব কষে, মোট-ওজন থেকে বাদ দিলেই, নব-জাতকের যথার্থ-ওজনের (Actual Weight) সঠিক-পরিচয় মিলবে। প্রসঙ্গক্রমে, জন্মকাল থেকে দুই বৎসর পর্যন্ত শিশুদের ওজন-মানের (Standard Weight) একটি মোটামুটি হিসাব-তালিকা নীচে প্রকাশিত হলো। তবে প্রত্যেকটি নবজাত-শিশুই যে এই হিসাবমতো প্রতি সপ্তাহে সমান ওজনে পরিপুষ্ট হয়ে উঠবে, এমন কোনো বাঁধা-ধরা নিয়ম নির্দিষ্ট নেই। কাজেই নীচে প্রকাশিত হিসাবের সঙ্গে যদি কোনো নবজাত-শিশুর ওজনের অল্প-বিস্তর তারতম্য বা গরমিল ঘটে, তাহলে প্রসূতির অহেতুক দুশ্চিন্তা বা আশঙ্কার কোনো কারণ নেই। অর্থাৎ নীচে প্রকাশিত হিসাব তালিকাটি রচিত হয়েছে পাশ্চাত্ত্য-দেশীয় শিশুদের ওজনের আদর্শ অনুসারে এবং দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে, অধুনা প্রত্যক্ষ করা গেছে যে আমাদের দেশের শিশুরা সচরাচর পাশ্চাত্ত্য শিশুদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম ওজনের হয়। সুতরাং এ বিষয়টি বিবেচনা করে দেখলেই নিম্নোল্লিখিত হিসাব অনুসারে শিশুদের বয়স ও ওজনের মোটামুটি হদিস মিলবে।

শিশুর বয়স	শিশুর ওজন — পাউণ্ড হিসাবে (কম)	(বেশী)
জন্মকালীন	৫ থেকে ৬ পাঃ	৭ থেকে ৭॥০ পাঃ পর্য্যন্ত
দ্বিতীয় সপ্তাহে	৭।০ পাঃ	৭॥০ পাঃ „
এক মাসে	৮॥০ পাঃ	৮৷৷০ পাঃ „
দুই মাসে	১০ পাঃ	১০॥০ পাঃ „
তিন মাসে	১১।০ পাঃ	১১॥০ পাঃ „
চার মাসে	১২ পাঃ	১৩ পাঃ „
পাঁচ মাসে	১৪॥০ পাঃ	১৫ পাঃ „
ছয় মাসে	১৫ পাঃ	১৬ পাঃ „ (ওজনে দ্বিগুণ)
সাত মাসে	১৬॥০ পাঃ	১৭ পাঃ „
আট মাসে	১৭॥০ পাঃ	১৮ পাঃ „
নয় মাসে	১৮ পাঃ	১৮॥০ পাঃ „
দশ মাসে	১৮৷৷০ পাঃ	১৯॥০ পাঃ „
এগারো মাসে	১৯॥০ পাঃ	২০॥০ পাঃ „
বারো মাসে বা এক বছরে	২০॥০ পাঃ	২২॥০ পাঃ „

[আঠারো মাসেতে শিশুর ওজন জন্মকালের তুলনায় প্রায় তিনগুণ পর্য্যন্ত বেশী হতে পারে]

শিশুর বয়স	(কম)	(বেশী)
দুই বছরে	২৮ পাঃ	....

প্রথম তিনমাসে প্রতি সপ্তাহে নিয়মিতভাবে শিশুর ওজন নিতে হবে। পরে অবশ্য পনেরো দিন অন্তর ওজন নিলেও চলবে। প্রথম কয়েকদিনে শিশু ওজনে প্রায় ৭ থেকে ৮ আউন্স কমে গেলেও, পরে আবার ওজনে বেশী হয়ে উঠবে। তবে মাতৃস্তন্যের পরিবর্ত্তে 'বেবী-ফুড' বা বোতলের দুধ খাওয়ানো হলে, শিশুর ওজন বৃদ্ধি পেতে আরো দু'তিন সপ্তাহ বিলম্ব ঘটে। প্রথম তিনমাসে শিশুর ওজন প্রতি সপ্তাহে ছয় থেকে আট আউন্স পর্য্যন্ত বাড়ে। তারপর ছয়মাস বয়স পর্য্যন্ত পাঁচ থেকে ছয় আউন্স; ছয়মাস থেকে নয়মাস বয়স পর্য্যন্ত চার থেকে পাঁচ আউন্স; নয়মাস থেকে এক বছর বয়স পর্য্যন্ত তিন থেকে চার আউন্স ...অর্থাৎ মাসে প্রায় এক পাউণ্ড হিসাবে ওজন বৃদ্ধি পায়।

সাধারণতঃ, প্রতি সপ্তাহে বা প্রতি পক্ষে (পনেরো দিন অন্তর) শিশু নিয়মিতভাবে বাড়ে...তবে, বিশেষ বিশেষ সময়ে—অর্থাৎ, শিশুর দাঁত-ওঠার সময়, স্তন্যপান ত্যাগ করার সময় অথবা হঠাৎ গ্রীষ্মতাপের কারণে, তার ওজন নিয়মিতভাবে বৃদ্ধি না পেতেও পারে।

সচরাচর পিতা-মাতার স্বাস্থ্য ও শিশুর খাদ্য-গ্রহণ ও স্বভাবের কারণে, নবজাতদের ওজনের তারতম্য ঘটে। এমন কি, শীত বা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের বিশেষ কোনো অঞ্চলের বা বিশেষ কোনো জাতির শিশু-সন্তানদের শারীরিক গঠন ও ওজনেরও অল্প-বিস্তর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন, আফ্রিকার অধিবাসী 'বান্টু' জাতির (বিশেষ এক ধরণের বামন-জাতীয় আদিম অধিবাসী) শিশুরা আমাদের দেশের পাঞ্জাব-অঞ্চলের অধিবাসীদের শিশু-সন্তানদের মতো দীর্ঘ-পরিপুষ্ট আকারের বা বেশী ওজনের হয় না। তাছাড়া, আরো লক্ষ্য করবার বিষয় যে —বহু শিশু জন্মকালে কম ওজনের হলেও (মাত্র পাঁচ পাউণ্ডের মতো), অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের দৈহিক ওজন যত শীঘ্র বেড়ে ওঠে, জন্মকালীন সাত-আট পাউণ্ড ওজনের শিশুরা ঠিক তত তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে না।...এবং ছয় মাস পরে উভয় শ্রেণীর শিশুর ওজন নিয়ে দেখা যায় যে, তাদের দৈহিক ওজন প্রায় সমান বা একই হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ প্রসঙ্গে আরো লক্ষ্য করা যায় যে—দ্বিতীয় বছরে শিশুর ওজন কিন্তু এমন দ্রুত-হারে বৃদ্ধি পায় না...উপরন্তু, দেখা যায়, সারা বছরে প্রায় ছয় থেকে আট পাউণ্ড পর্য্যন্ত ওজন বাড়ে এবং তৃতীয় বছরে শিশুর দৈহিক-ওজন বৃদ্ধির হার দাঁড়ায় মাত্র চার থেকে পাঁচ পাউণ্ড। শিশুরা সাধারণতঃ, এক বছর বয়সে হামা দেওয়া, হাঁটতে সুরু ও ছুটোছুটি করে বলেই, পূর্ব্বের মতো ওজনে ততখানি বাড়তে পারে না। একালের বিচক্ষণ ধাত্রী-চিকিৎসকদের মতে, শিশু খুব বেশী মোটাসোটা বা ওজনে ভারী হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ, খুব বেশী মোটাসোটা ও ওজনে ভারী হওয়া শিশুর স্বাস্থ্যের ও যথাযথ পরিপুষ্টির পক্ষেও বিশেষ ভালো নয়। অষ্ট্রেলিয়ার সুবিখ্যাত শিশু-চিকিৎসক ও ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ স্যার ট্রাবি কিং বলেন,—"সুস্থ, সবল ও সুদৃঢ়-সুঠাম গঠনের শিশুই সকলের কাম্য। মেদবহুল, পারিতোষিক-প্রাপ্ত, শূকর-শাবকের মতো স্থূল-গোলাকার সন্তান না হওয়াই মঙ্গল।" মনীষী সক্রেটিসও অভিমত প্রকাশ করেছেন,—"সকল

কাজের সূত্রপাতই প্রধান!" তাই মানব-জাতির উত্তরাধিকারী হিসাবে, শিশুদের দৈহিক স্বাস্থ্য ও যথাযথ ওজনের দিকে সযত্ন দৃষ্টি দিয়ে, তাদের ভবিষ্যৎ-মঙ্গলের কথা ভেবে উপযুক্তভাবে লালন-পালন করা উচিত।

(ক্রমশঃ)

—

সুপর্ণা দেবী

দেহের স্বাস্থ্যের সঙ্গে লাবণ্য, শ্রী ও সৌন্দর্য্যের সম্পর্ক বড় নিবিড়। তাই স্বাস্থ্যহানির সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ-লাবণ্যেরও অবনতি ঘটে। কাজেই দৈহিক স্বাস্থ্য, শ্রী-সৌন্দর্য্য-লাবণ্য আর মানসিক স্ফূর্ত্তি অটুট-অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য, পর্য্যাপ্ত আলো-বাতাস, নিয়মিত ও সুপরিমিত খাদ্য-পানীয় ছাড়াও, নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যায়াম-অনুশীলন আর সুনিয়ন্ত্রিত অঙ্গ-চালনাও একান্ত আবশ্যক। তবে অধুনা আমাদের দেশে জীবন-যাত্রার ধারা দিন-দিন এমনই নিদারুণ সমস্যাসঙ্কুল হয়ে দাঁড়িয়েছে যে সাধারণ গৃহস্থ-সংসারে—বিশেষতঃ মহিলাদের পক্ষে, এ সব ব্যাপারে সক্রিয়-অংশ গ্রহণ করা তো দূরের কথা, বহু ক্ষেত্রে সামান্য চিন্তা করারও অবকাশটুকু পর্য্যন্ত মেলে না। অথচ, সুস্থ-সুন্দর জীবনযাপনের জন্য, এগুলি যে কতখানি প্রয়োজনীয়, সে সম্বন্ধে তাঁরা সকলেই রীতিমত সচেতন। কথায় বলে,—'যে রাঁধে, সে চুলও বাঁধে!' অর্থাৎ, প্রত্যহ সংসারের শত কাজের ফাঁকে সামান্য ক্ষণের জন্যও যদি আমরা নিয়মিতভাবে নিতান্ত ঘরোয়া-ধরণের কয়েকটি ব্যায়াম-ভঙ্গী অনুশীলনের দিকে সযত্ন-দৃষ্টিদান করি তো ক্ষতি কি?...তার ফলে, দৈহিক শ্রী-সৌন্দর্য্য-লাবণ্য-স্বাস্থ্য, মনের স্ফূর্ত্তি কর্ম্মদক্ষতা—সব কিছুই উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করে...আজীবন অটুট-অক্ষুণ্ণ-অম্লান-মনোরম থাকে।

সুতরাং ঘর-সংসারের দৈনন্দিন কাজকর্ম্মের অবসরে, আমাদের দেশের সাধারণ গৃহস্থ-সমাজের মেয়েরা যাতে নিজেদের ঘরোয়া-পরিবেশে সহজ-সরল উপায়ে তাঁদের স্বাস্থ্য-শ্রী বজায় রাখার জন্য বিশেষ ধরণের কয়েকটি ব্যায়াম-ভঙ্গী অনুশীলন করতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে, ইতিপূর্বে যেমন হদিশ দিয়েছি, এবারও তেমনি-ধরণের আরো দুয়েকটি ব্যায়াম-ভঙ্গীর কথা বলছি।

(১১)

উপরের ছবিতে যে ব্যায়াম-ভঙ্গীটির নমুনা দেখানো হয়েছে, সেটি নিত্য-নিয়মিতভাবে অনুশীলনের ফলে, সারা দেহের গঠন হয়ে উঠবে মেদহীন, ঋজু ও সরল। ব্যায়ামের এই বিশেষ ভঙ্গীটি প্রত্যহ অন্ততঃপক্ষে দশ-বারোবার অভ্যাস করা প্রয়োজন। এ ব্যায়াম-ভঙ্গীটি অভ্যাসের রীতি হলো—ঘরের সমতল মেঝে বা শক্ত-মজবুত বিছানার উপর উপুড় হয়ে শুয়ে হাত দুখানিকে জোড়-বাঁধা অবস্থায় পিছনে ধরে রাখুন। তারপর ধীরে ধীরে নিশ্বাস-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মাথা ও দুই পা যতখানি-সম্ভব উর্দ্ধে তুলুন। মাথা ও দুই পা উর্দ্ধে তোলার সঙ্গে সঙ্গে ইতিপূর্ব্বে জোড়-বাঁধা অবস্থায়-রাখা হাত দুখানিকে উর্দ্ধে তুলবেন এবং দেহটিকে নৌকার মতো ভঙ্গীতে বাঁকিয়ে সামান্য ক্ষণ উর্দ্ধপানে স্থির হয়ে থেকে পুনরায় ধীরে ধীরে নিশ্বাস গ্রহণের তালে-তালে বঙ্কিম-দেহটিকে ক্রমশঃ নামিয়ে এনে সমতল-মেঝের উপর সমানভাবে (Flat) রেখে ব্যায়াম-ভঙ্গীর সূচনাবস্থায় ফিরে আসুন। এমনিভাবে সূচনাবস্থায় ফিরে আসার সামান্যক্ষণ পরে পুনরায় পূর্ব্বোক্তপদ্ধতিতে দেহটিকে নৌকার মতো ভঙ্গীতে বাঁকিয়ে উর্দ্ধে তুলবেন ও মেঝেতে নামাবেন। এই পদ্ধতিতেই কয়েকবার ব্যায়াম-ভঙ্গীটি অনুশীলন করতে হবে।

উপরোক্ত ব্যায়াম-ভঙ্গীটি অনুশীলনের পর, ১২নং চিত্রে যেমন নমুনা দেখানো হয়েছে, সেই ব্যায়াম-ভঙ্গীটিও অন্ততঃপক্ষে চৌদ্দ বা ষোলবার অভ্যাস করা আবশ্যক। ব্যায়ামের এই বিশেষ ভঙ্গীটি প্রত্যহ নিয়মিত অভ্যাসের ফলে, দেহের শ্রী-সৌষ্ঠব, পায়ের গড়ন, উদরের পেশী, পাকাশয়-যন্ত্র ও শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়ার উন্নতিসাধন হবে। এ ব্যায়াম-ভঙ্গীটি অভ্যাসের রীতি হলো—ঘরের সমতল মেঝে বা শক্ত-মজবুত বিছানার উপর দেহটিকে সুপ্রসারিত করে চিৎ হয়ে শুয়ে পা দুটিকে সটান-সমানভাবে ছড়িয়ে দিন এবং হাত দুখানিও সটান-সমানভাবে দেহের দুই পাশে লম্বালম্বিভাবে প্রসারিত করে রাখুন। তারপর ধীরে ধীরে নিশ্বাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে উপরের ১২ নং ছবির ভঙ্গীতে বাঁ-পা প্রসারিত করে, ডান-পা দুমড়ে ভাঁজ করে ক্রমশঃ সটান ও সিধা-খাড়াভাবে উর্দ্ধে তুলুন। এমনিভাবে ডান-পা-টিকে সটান-সিধা উর্দ্ধে তুলে, সামান্যক্ষণ সেই অবস্থায় স্থির হয়ে থেকে, পুনরায় ধীরে ধীরে নিশ্বাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ডান-পা নীচে নামিয়ে এনে সমতল জমির উপর সটান সমানভাবে প্রসারিত করে রাখুন। এবারে অনুরূপ ভঙ্গীতে ডান-পা সমতল জমিতে সটান-সমানভাবে ছড়িয়ে রেখে, পূর্ব্বোক্ত প্রথানুসারে বাঁ-পা দুমড়ে ভাঁজ করে ক্রমশঃ সটান-সিধাভাবে উর্দ্ধে তুলে ধরুন এবং ইতিপূর্ব্বে ডান-পায়ের ব্যায়াম-চর্চ্চার সময় যেমনটি করেছিলেন, অনন্তর ঠিক তেমনি উপায়েই ব্যায়াম-ভঙ্গীটি অভ্যাস করুন। এমনিভাবে একবার ডান-পা এবং আরেকবার বাঁ-পা উর্দ্ধে তুলে, এ ব্যায়াম-ভঙ্গীটি অভ্যাস করতে হবে।

আপাততঃ, ব্যায়ামের এই বিশেষ ভঙ্গী দুটিরই মোটামুটি হদিশ দিলুম—আগামী সংখ্যায় মেয়েদের ঘরোয়া-ব্যায়ামের আরো কয়েকটি ব্যায়াম-ভঙ্গীর কথা আলোচনা করবো।

——

কাদা-মাটির কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

ইতিপূর্ব্বে গত বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় আলোচনা প্রসঙ্গে কাদা-মাটির তাল দিয়ে সমতল-ছাঁদের 'চাক্তি' (Disc), 'পাটা' (plaque) ও 'টালির' (Tile) উপর অভিনব উপায়ে ফুল, লতা, পাতা প্রভৃতি নানা রকম নক্সার 'ছাঁচ' বা 'প্রতিলিপি' (Mould cast Images) রচনার যে সহজ-সরল পদ্ধতির মোটামুটি হদিশ দিয়েছি, এবারেও অনেকটা ঠিক তেমনি ধরণের আরেকটি কলা-কৌশলের কথা বলছি। তবে, এ পদ্ধতিতে মৃৎশিল্প সামগ্রী রচনা অবশ্য, ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত অপর দুটি পদ্ধতির চেয়ে অপেক্ষাকৃত কঠিন এবং কারু-নৈপুণ্য সাপেক্ষ কাজ। তাহলেও নিষ্ঠাভরে এবং ধৈর্য্য ধরে অল্প কয়েকদিন সযত্নে অভ্যাস করলেই, যে কোনো শিক্ষার্থীই অচিরে এ পদ্ধতির কলা-কৌশলগুলি শিখে নিয়ে অনায়াসেই বিবিধ ছাঁদের সৌখিন সুন্দর মৃৎশিল্প সামগ্রী বানাতে পারবেন।

পর পৃষ্ঠার নক্সাটিতে ডিমের মতো গোলাকার সমতল 'টালি' বা 'পাটার' (Oval shaped Tile or plapue) উপরে পাতা সমেত আঙুর গুচ্ছের যে 'আলঙ্কারিক প্রতি-লিপি' (Decorative Motif) দেখানো হয়েছে, কাদা-মাটির তাল দিয়ে ঠিক তেমনি ছাঁদের বিচিত্র সৌখিন কারু শিল্প সামগ্রী রচনা করতে হলে, গোড়াতেই ইতিপূর্ব্বে গত বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার প্রবন্ধে যেমন বলেছি, অবিকল সেই পদ্ধতিতে, ডিম্বাকৃতি সমতল ছাঁদের ঐ 'টালি' বা 'পাটাটিকে' বানিয়ে ফেলুন।

কাদা-মাটির তাল দিয়ে 'টালি' বা 'পাটাখানিকে' আগাগোড়া বেশ পরিপাটি সমান ও মসৃণ (Flat, smooth and evenly finished) ছাঁদে বানিয়ে নেবার পর, সেই

ভিজা নরম কাঁচা-মাটির তৈরী 'টালি' বা 'পাটার' উপরে নিখুঁত পরিপাটি ছাঁদে ছুঁচালো মুখওয়ালা সরু কাঠি বা পেন্সিল অথবা কার্পেট সেলাই করবার ছুঁচের সাহায্যে সূক্ষ্ম রেখার আঁচড় টেনে লতা-পাতা সমেত আঙুর গুচ্ছের পুরো নক্সাটি এঁকে বা 'ট্রেসিং' (Tracing) করে নেবেন।
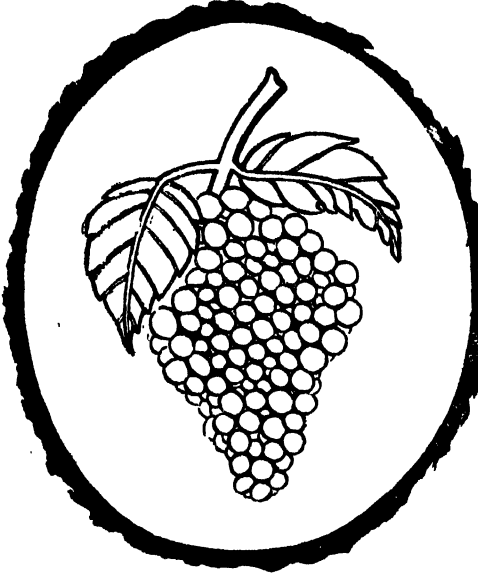
এমনিভাবে কাঁচা-মাটির 'টালি' বা 'পাটার' উপর লতা-পাতা সমেত আঙুরগুচ্ছের নক্সাটিকে আগাগোড়া সুষ্ঠুভাবে ছকে নেওয়া হলে, ইতিপূর্ব্বে গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার প্রবন্ধে যেমন হদিশ দিয়েছি, তেমনি পদ্ধতিতে আঙুর-লতার ডাঁটি ও পাতাগুলি করে, সেগুলিকে পরিপাটি ও পাকাপোক্তভাবে নক্সা-রেখা চিহ্নিত কাঁচা-মাটির 'টালি' বা 'পাটার' যথাযথস্থানে এঁটে বসিয়ে দেবেন। তাহলেই উপরের নক্সা নমুনা অনুসারে আঙুর পাতা ও আঙুর লতা রচনার কাজ শেষ হবে।

এ কাজ সারা হলে, আঙুর-গুচ্ছ রচনার কাজে হাত দেবেন। আঙুর-গুচ্ছ রচনার জন্য—কাদা-মাটির তাল থেকে ছোট ছোট টুকরো বেছে নিয়ে, দুই হাতের তালুর সাহায্যে সেগুলির প্রত্যেকটিকে পৃথকভাবে ডিমের মতো গোল ছাঁদে পাকিয়ে একরাশ 'গোলক' বা 'গুলি' বানিয়ে ফেলুন। তারপর উপরের নক্সা-নমুনা অনুসারে গুচ্ছের আঙুরগুলি যেমনভাবে সাজানো রয়েছে, হুবহু তেমনি ধরণে কাঁচা-মাটির 'টালি' বা 'পাটার' উপরে আগাগোড়া পরিপাটি নিখুঁত ও পাকাপোক্তভাবে একের পর এক সত্ত-বানানো ছোট ছোট ডিম্বাকৃতি ঐ 'গুলি' বা 'গোলক'-গুলিকে এঁটে বসিয়ে দিন। বলা বাহুল্য, কাঁচা-মাটির 'টালি' বা 'পাটার' উপরে আঙুরের লতা পাতা এঁটে বসানোর সময় যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন, এক্ষেত্রেও ঠিক তেমনিভাবেই কাজ করতে হবে। তাহলেই দিব্যি সহজ সুন্দর উপায়ে উপরের নক্সা নমুনার ছাঁদে আঙুরগুচ্ছ রচনার কাজ শেষ হবে।

এমনিভাবে ভিজা নরম কাদা-মাটির 'টালি' বা 'পাটার' উপর লতা-পাতা সমেত আঙুর-গুচ্ছ রচনার কাজ সারা হলে, সত্ত-বানানো মৃৎশিল্প সামগ্রীটিকে প্রথমে সযত্নে ছায়া-শীতল স্থানে রেখে উন্মুক্ত বাতাসে আগাগোড়া বেশ ভালো-ভাবে শুকিয়ে নেবেন এবং প্রয়োজনবোধে, পরে সেটিকে তুঁষের আগুনের নরম আঁচে রেখে যথাযথভাবে সেঁকে পুড়িয়ে আরো বেশী পাকাপোক্ত ও দীর্ঘস্থায়ী করে তোলা চলবে। তারপর রঙ তুলির পরশ বুলিয়ে কাদা-মাটির কারুশিল্প সামগ্রীটিকে আগাগোড়া বর্ণোজ্জ্বল ও অপরূপ করে তুলে, সেটির উপর হালকাভাবে একপোঁচ 'বার্নিশ' (Varnish) কিম্বা গঁদের আঠার প্রলেপ লাগিয়ে দিন। তাহলেই ঘরের দেয়ালে টাঙিয়ে রাখার মনোরম ছাঁদে গৃহ-সজ্জার উপযোগী অপরূপ সুন্দর বিচিত্র সৌখিন এই মৃৎশিল্প সামগ্রী রচনার কাজ মিটবে।

——

কুশনের সৌখিন নক্সা-নমুনা

হৈমন্তী মুখোপাধ্যায়

সকল সুগৃহিণীই আজকাল তাঁদের বাড়ীর ড্রয়িং-রুম, বৈঠকখানা আর বসবার ঘরটিকে শোভন-সুন্দর ও পরিপাটি ছাঁদে সাজিয়ে গুছিয়ে মনোরম করে রাখতে ভালবাসেন। এজন্য তাঁরা সর্ব্বদাই নানা রকম সৌখিন-সুচারু রঙীন-ঝক্ঝকে আসবাবপত্র, ছবি, পর্দ্দা, ঘট, ফুলদানী, পুতুল প্রতিমা, টবে সাজানো ফুল-পাতা-মনসা গাছ প্রভৃতি বিচিত্র অভিনব সাজ-সরঞ্জাম, শিল্প-সম্ভার সংগ্রহ করে দেশী ও বিদেশী বিবিধ ধরণের রুচি-মাফিক কেতায় গৃহ-সজ্জার সুব্যবস্থা করে থাকেন। হাল-ফ্যাশনে ও সৌখিন-পরিপাটি ছাঁদে বসবার ঘর সাজানোর সময় অতিথি অভ্যাগত এবং বাড়ীর লোকজনের সুবিধা-স্বাচ্ছন্দ্য-আরাম এবং গৃহ-সজ্জার বৈশিষ্ট্য রক্ষার উদ্দেশ্যে, অধিকাংশ সুগৃহিণীই অধুনা ছোট-বড় এবং গোল, চৌকোণা, লম্বা আকারের নানা রকম বিচিত্র নক্সাদার ও রঙীণ সুতী বা রেশমী কাপড়ের তৈরী মনোরম-সুন্দর 'কুশন' (cushion) বা 'বালিশ' (pillow) ব্যবহার করে থাকেন। এ ধরণের বিচিত্র-নক্সাদার সৌখিন 'কুশন' ও 'বালিশ' সেলাইয়ের কাজ আজকাল অনেক সুগৃহিণীরা আবার সংসারের দৈনন্দিন কর্ম্মের অবসরে বাড়ীতে বসে নিজেদের ব্যক্তিগত রুচি, শিল্প-নৈপুণ্য এবং সঙ্গতি অনুসারে হামেশাই চর্চ্চানুশীলন করেন। তাই সূচীশিল্পানুরাগিণী মহিলাদের সুবিধার্থে এবারে আমরা গৃহ-সজ্জার উপযোগী অভিনব ছাঁদের সৌখিন নক্সাদার 'কুশন' বা 'বালিশ' রচনার একটি বিচিত্র নক্সা-নমুনা উপহার দিলুম।
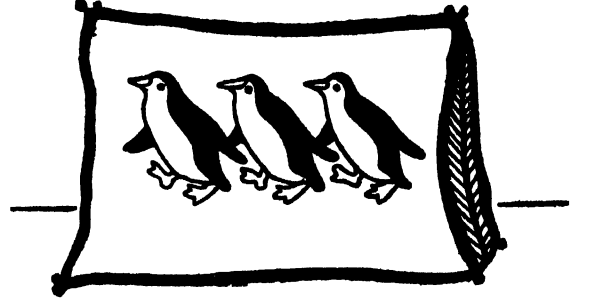
উপরে তিনটি গতি-চঞ্চল পেঙ্গুইন পাখীর যে আলঙ্কারিক-নক্সাটি (Decorative Motif) দেখানো হয়েছে, সূচীশিল্পের কাজ করে গৃহ সজ্জার উপযোগী সৌখিন 'কুশন' বা 'বালিশের' কাপড়ের উপর এ-নক্সাটিকে আগাগোড়া পরিপাটি সুন্দর ছাঁদে ফুটিয়ে তুলতে হলে, গোড়াতেই আশমানী নীল (Light Blue) ধূসর (grey) ফিকে হলুদ (pale yellow) অথবা হালকা গোলাপী (pink) রঙের কাপড় বেছে নেবেন—'কুশন' বা 'বালিশের' খোল বানানোর জন্য। কারণ, হালকা রঙীণ ধরণের কাপড়ের উপরেই উপরের পেঙ্গুইন-পাখী তিনটির নক্সাটি বেশ সুন্দর ও মানানসই দেখাবে।

'কুশনের' জন্য পছন্দমত রঙের কাপড় বেছে নেবার পর, সেই কাপড়টির উপরে পেঙ্গুইন-পাখীদের শিল্প-নক্সা নমুনাটিকে পরিপাটি ছাঁদে এঁকে কিম্বা 'ট্রেসিং' (Tracing) করে নিতে হবে। কাপড়ের বুকে নক্সাটি আগাগোড়া নিখুঁতভাবে ছকে নেবার পর, সূচীকার্য্যের পালা। পেঙ্গুইন পাখীদের চেহারাগুলিকে দুই-ধরণের পদ্ধতিতে রূপদান করা যাবে। প্রথমটির হলো—'এ্যাপ্লিক (Applique) সূচীশিল্প পদ্ধতিতে এবং দ্বিতীয়টি—রঙীণ সুতোর সাহায্যে 'এম্ব্রয়ডারী' পদ্ধতিতে। তবে আমাদের মতে, 'এম্ব্রয়ডারী' পদ্ধতির চেয়ে 'এ্যাপ্লিক' সূচীশিল্প পদ্ধতিতে কাজ করলেই, উপরের নক্সা-নমুনাটি আরো বেশী সুন্দর ও মনোরম দেখাবে।

'এ্যাপ্লিক'-পদ্ধতিতে কাজ করতে হলে—পেঙ্গুইন-পাখীদের পেটের অংশটি শাদা রঙের কাপড়ে, পিঠের অংশটি কালো রঙের কাপড়ে এবং ঠোঁট ও পায়ের অংশগুলি ফিকে-কমলালেবু রঙের কাপড়ের টুকরো বসিয়ে সেলাই দিতে হবে। পেঙ্গুইন পাখীদের চোখগুলি রচনা করতে হবে—কালো-রঙের সুতোর সাহায্যে 'এম্ব্রয়ডারী' পদ্ধতিতে সেলাইয়ের ফোঁড় তুলে।

'এম্ব্রয়ডারী' পদ্ধতিতে পেঙ্গুইন পাখীদের নক্সাটিকে রূপদান করতে হলে, উপরোক্ত প্রত্যেকটি রঙের সুতোর সাহায্যে পাখীদের দেহের বিভিন্ন অংশের সীমা-রেখাচিহ্নগুলিকে (Figure Outline) যথাযথভাবে 'ব্যাক্-ষ্টিচ্' (Back Stitch) অথবা 'বাটন্-হোল্ ষ্টিচ্' (Button-hole-stitch) প্রথায় সেলাই দেওয়া যেতে পারে।

মোটামুটিভাবে, এই দু'ধরণের সূচীশিল্প পদ্ধতিতে সুচারুভাবে কাজ করতে পারলে, অনায়াসেই উপরের নমুনা-অনুসারে গতি-চঞ্চল পেঙ্গুইন পাখীদের নক্সাটিকে মনোরম সুন্দর ছাঁদে কুশন-বালিশের বুকে ফুটিয়ে তোলা যাবে।

এবারে এই পর্য্যন্তই···বারান্তরে এমনি ধরণের আরো কয়েকটি বিচিত্র-সৌখিন সূচীশিল্পের নক্সা-নমুনা প্রকাশের বাসনা রইলো।

—

সুধীরা হালদার

এবারে বলছি—বাঙলা দেশেরই অভিনব মুখরোচক বিশেষ এক-ধরণের মিষ্টান্ন রান্নার কথা। বিচিত্র-সুস্বাদু মিষ্টান্ন-জাতীয় এই খাবারটির নাম—'কুমড়োর মালপোয়া'। বাড়ীতে কোনো ঘরোয়া উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে কিম্বা ছুটির দিনে অল্প-আয়াসে এবং স্বল্প-ব্যয়ে নতুন-ধরণের এই 'কুমড়োর মালপোয়া' বানিয়ে সাদরে প্রিয়জনদের পাতে পরিবেষণ করা যেতে পারে।

'কুমড়োর মালপোয়া' বানানোর জন্য উপকরণ দরকার—আধসের কুমড়ো, একপোয়া চিনি, এক মুঠো ময়দা বা আটা, প্রয়োজনমতো পরিমাণে খানিকটা ঘি, গোটা চার-পাঁচ ছোট এলাচ এবং অল্প একটু মৌরী।

এ সব উপকরণ জোগাড় হলে, রান্নার কাজে হাত দেবার আগে, কুমড়োটিকে ফালি করে কুটে, খোসা ছাড়িয়ে নিয়ে গরম জলে আগাগোড়া সুসিদ্ধ করে নিন। কুমড়োর ফালি-টুকরোগুলি সুসিদ্ধ হয়ে যাবার পর, সেগুলিকে গরম-জলের পাত্র থেকে তুলে, ভালোভাবে জল ঝরিয়ে নিয়ে অন্য একটি পরিচ্ছন্ন পাত্রে সযত্নে আলাদা সরিয়ে রাখুন। এবারে পুনরায় উনানের আঁচে ডেকচি চাপিয়ে, সে পাত্রে চিনির রস পাক করে ফেলুন। চিনির রস পাককরার পালা শেষ হলে রসটুকু ডেকচিতেই আলাদা সরিয়ে রেখে সযত্নে জুড়োতে দিয়ে, ইতিপূর্ব্বে-সুসিদ্ধ-করে-রাখা কুমড়োর টুকরোগুলিকে হাতের তালুর সাহায্যে ঠেশে বেশ মিহিভাবে চটকে আগাগোড়া নরম 'মণ্ডের' মতো বানিয়ে তুলুন এবং 'মণ্ডে' ময়দা বা আটা আর ছোট-এলাচের গুঁড়ো মিশিয়ে দিন।

এবারে উনানের আঁচে রন্ধনপাত্র চাপিয়ে, সে পাত্রে আন্দাজমতো পরিমাণে ঘি গরম করে, সেই তপ্ত তরল ঘিয়ে ইতিপূর্ব্বে বানিয়ে-রাখা কুমড়োর মণ্ডকে প্রয়োজনানুসারে ছোট বা বড় ধরণের মালপোয়ার ছাঁদে ভালোভাবে ভেজে নিন। এভাবে ভাজবার ফলে, কুমড়োর 'মণ্ডের' মালপোয়াগুলি বেশ বাদামী-রঙের হয়ে উঠলে, সেগুলিকে সযত্নে রন্ধন-পাত্রের তপ্ত তরল ঘি থেকে তুলে, ডেকচির চিনির রসে ডুবিয়ে রাখুন। কুমড়োর মালপোয়াগুলিকে এমনি ভাবে প্রায় আধঘণ্টাকাল চিনির রসে ডুবিয়ে রাখার ফলে, সেগুলি আগাগোড়া বেশ রস-সিক্ত ও সুমিষ্ট মুখরোচক হয়ে উঠবে।

বাড়ীতে নিজের হাতে রান্না করে অল্প-আয়াসে এবং স্বল্প-খরচে বিচিত্র-সুস্বাদু 'কুমড়োর মালপোয়া' রান্নার এই হলো মোটামুটি পদ্ধতি।

আগামী সংখ্যায় এমনি ধরণের আরেকটি অভিনব মুখরোচক ভারতীয় রান্নার কথা আলোচনা করার বাসনা রইলো।

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

পথ দেখিয়ে সেই মহিলাই প্রথমে বাড়ির মধ্যে ঢুকেছেন। তাঁকে অনুসরণ করে ভেতরে গেছে দীপেন। অবশেষে সেই মেয়েটি যার নাম শীলা, যার চেহারায় লীলা চৌধুরীর আদল বসানো।

বাড়ির ভেতর ঢুকে দীপেন অনুভব করেছিল, হৃদ্‌পিণ্ডের উত্থান-পতন অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে, আর শ্বাসরুদ্ধ এক উত্তেজনা চারদিক থেকে ধীরে ধীরে তাকে বেষ্টন করতে শুরু করেছে। মনে হয়েছিল, তবলার দ্রুত লহরার মত সমস্ত সত্তার গহনে সেই মুহূর্তে কি যেন একটা অশ্রান্তভাবে বেজে যাচ্ছে। মনে হয়েছিল ধমনীতে রক্তের স্রোত ক্রমশ অস্থির আর উদ্দাম হয়ে কলরোল বাধিয়ে দিচ্ছে।

এই বাড়িটায় ঢুকবার জন্য কি না করেছে দীপেন! এটা তো শুধু ইটকাঠ দিয়ে তৈরি মানুষের বসবাসের একটা ঠিকানামাত্র নয়, দীপেনের সারা জীবনের সিদ্ধি এটার সঙ্গে জড়িত।

যাই হোক, সপ্তাহখানেক ধরে প্রতিদিন নিয়মিত ওখানে হানা দিয়েছে দীপেন। এতদিনে তার পরিশ্রমটা মোটামুটি পুরস্কৃত হয়েছে। প্রথমতঃ, এ বাড়ির অন্তঃপুরে ঢুকতে পেরেছে সে। দ্বিতীয়ত একটু অন্ততঃ জানা গেছে লীলা চৌধুরী এখনও জীবিত।

মহিলার পিছু পিছু চলতে চলতে চারদিক একবার দেখে নিয়েছে দীপেন। বাড়িটার ভেতরে কোথাও কোন বিস্ময় নেই। একটা চৌকো ঘাসহীন উঠোনের একধারে দালান। দালানটার তিন দিকে তিনখানা ঘর। চতুর্থ দিকে দোতলার সিঁড়ি। সিঁড়িটা পাক খেয়ে খেয়ে ওপরে উঠে গেছে।

দেওয়ালগুলো থেকে কবেই পলেস্তারা খসে গিয়েছিল। নোনাধরা ইট দগদগে ক্ষতের মত বেরিয়ে পড়েছে। আর অশ্বত্থেরা ভিতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শিকড় চালিয়ে বাড়িটার ধ্বংসের কাজ অনেকখানিই এগিয়ে রেখেছে। ছাদের কাছে শতাব্দীর ঝুল জমে আছে। দেওয়ালের কোণে কোণে বংশপরম্পরায় মাকড়সাদের বাস। তাদের শান্তি যে নিরাপদ, দেখামাত্রই তা টের পাওয়া যায়।

মাকড়সাদের কাছাকাছি ঘুলঘুলির মধ্যে যারা সংসার পেতে বসেছে তারা একদল দিশি পায়রা। এই দুই ভিন্-সম্প্রদায়ের প্রাণী সহাবস্থানে বিশ্বাসী কি-না, দীপেনের জানা ছিল না। এখানে এসে তার মনে হয়েছিল, মাকড়সা আর পায়রাদের মধ্যে বোধহয় একটা চুক্তি হয়ে গেছে। তারা কেউ পররাজ্যে হানা দেবে না এবং সৎ প্রতিবেশীর মত পাশাপাশি বাস করবে।

চলতে চলতে একসময় একটা ঘরের সামনে এসে

দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন মহিলাটি। তাঁর সঙ্গে দীপেন যেন অদৃশ্য সুতোয় বাঁধা। মহিলা দাঁড়াতেই সে-ও দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

মহিলা তার দিকে ঝুঁকে চাপা গলায় এবার ফিস্‌ফিসিয়ে উঠেছেন, 'আমরা এসে গেছি।'

ঠিক বুঝতে না পেরে বিমূঢ়ের মত তার কথাগুলোর প্রতিধ্বনি করেছে দীপেন, এসে গেছি!

'হ্যাঁ।' মহিলা আঙুল দিয়ে ঘরখানা দেখিয়ে সতর্কভাবে বলেছে 'এই ঘরে আমার স্বামী আছেন।'

মহিলা যে তাঁর স্বামীর কাছে নিয়ে যাবেন, সে কথা আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। তথাপি এই ঘরখানার সামনে দাঁড়িয়ে মুহূর্তের জন্য দীপেনের ধমনীতে সমস্ত রক্তস্রোত থম্‌কে গেছে যেন।

মহিলা আগের মত চাপাগলাতেই আবার বলেছেন 'সেই নামটা মনে আছে তো?'

'আছে।' দীপেন মাথা নেড়ে বলেছে,—নীলা চৌধুরী।'

'জায়গাটার নাম?'

'আন্ধেরী।'

নাম দুটো আরেকবার ঝালানো হলে মহিলা বললেন, আসুন ভেতরে যাই।'

ডাকামাত্রই যায় নি দীপেন। মহিলার চোখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলেছে, 'একটা কথা।'

'কী?'

'আপনার স্বামী যদি জিজ্ঞেস করেন নীলা চৌধুরী কি-ভাবে মারা গেছেন, তা হলে কী বলব?'

একটু চুপ করে থেকে কি ভেবে মহিলা বললেন, বলবেন ছোরা মেরে গুণ্ডারা তাকে শেষ করেছে।'

'বেশ। কিন্তু—'

'কী?'

'যদি জিজ্ঞেস করেন আমি নীলা চৌধুরীকে কি করে চিনলাম, আর এ-বাড়ির ঠিকানাই বা পেলাম কি ভাবে?'

মহিলা কিছু একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই ঘরের ভেতর থেকে তীক্ষ্ণ শাণিত গলা ভেসে এসেছে, 'কে ওখানে?'

স্বরটা চিনতে পেরেছিল দীপেন। প্রথম প্রথম ক'দিন সদর দরজায় কড়া নাড়তেই এই স্বরটা তাকে তাড়া করে গিয়েছিল।

যাই হোক ঘরের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাড়াতাড়ি উত্তর দিয়েছিলেন মহিলা, 'আমরা গো, আমরা।' তারপর দীপেনের উদ্দেশে বলেছিলেন 'আমার স্বামী! উনি যদি নীলার সঙ্গে আপনার পরিচয়ের কথা জিজ্ঞেস করেন যা হোক একটা কিছু বলে দেবেন। এবাড়ির ঠিকানার কথা জিজ্ঞেস করলে বলবেন, নীলার কাছে পেয়েছেন।'

দীপেন বলেছে, 'আচ্ছা।'

ঘরের ভেতর থেকে সেই কর্কশ কণ্ঠ আবার ভেসে এসেছে, 'আমরা কারা?'

মহিলা উত্তর দিয়েছেন, 'আমি আর একজন ভদ্রলোক।'

'ভদ্রলোক।' ঘরের কণ্ঠস্বরটি এবার আরো কর্কশ। শুধু কর্কশই নয়, সেটার সঙ্গে পৃথিবীর সবটুকু বিরক্তি, উত্তেজনা এবং সংশয় যেন মেশানো।

মহিলা বলেছেন, 'হুঁ।'

'ভদ্রলোক কে?'

'তুমি চিনতে পারবে না। বোম্বাই থেকে আসছেন।'

'ওঁকে ভেতরে নিয়ে এস।'

দীপেনের দিকে ফিরে মহিলা এবার বললেন, 'আসুন।'

মহিলার পিছু পিছু ঘরের মধ্যে পা দিয়েই দীপেনের মনে হয়েছিল, চির-অন্ধকারের রাজ্যে এসে পড়েছে। সোনারপুরের এই পটে সূর্যের আলো যে খুব কুণ্ঠিত, তা নয়। ঘরখানার বাইরে সেই মুহূর্তে সোনালী রোদের ঢলে চারিদিক ভেসে যাচ্ছিল। কিন্তু সেই ঘরটিতে আলোর প্রবেশ বোধহয় নিষিদ্ধ। জানালার অভাব ছিলনা সেখানে; বরং সংখ্যায় তারা অনেকগুলি। কিন্তু তাদের একটাও খোলা নেই। পৃথিবীর আলো আর বাতাসের সঙ্গে সমস্ত রকম যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে ঘরখানা শতাব্দীর পর শতাব্দী অন্ধকারের আরকে নিমজ্জিত হয়ে আছে।

আলো থেকে অন্ধকারে এসেছে। প্রথমটা কিছুই দেখতে পায় নি দীপেন। অন্ধকার ঈষৎ সয়ে এলে তার দৃষ্টি ঘরের উত্তর-প্রান্তের বিশাল তক্তপোষে নিবদ্ধ হয়েছে। সেখানে অনন্তশয্যায় যিনি শুয়ে ছিলেন তিনি যে নীলা

চৌধুরীর বাবা তথা সেই মহিলাটির স্বামী, তা অনায়াসেই বুঝতে পেরেছে দীপেন। একবার দেখেই তার মনে হয়েছে, ভদ্রলোক একদা বেশ সুপুরুষই ছিলেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে ?

তাকিয়ে থাকতে থাকতে দীপেন টের পেয়েছিল, পক্ষাঘাতে ভদ্রলোকের বাঁ দিকটা অনুভূতিশূন্য, অসাড়। শরীরময় অসংখ্য ধ্বংসের চিহ্ন ছড়িয়ে আছে। চোখ দুটি কোটরে বিলীন। গাল ভেঙে চোয়ালের হাড় আর হনু বেরিয়ে পড়েছে। মুখ ভর্তি বহুকালের সঞ্চিত দাড়ি আর গোঁফ। দেহের কোথাও মেদের লেশমাত্র নেই। হাড়ের প্রকাণ্ড কাঠামোর ওপর শিথিল চামড়া জড়িয়ে আছে মাত্র। সমস্ত শরীরে একমাত্র দ্রষ্টব্য নাকখানা। দীপের মত সেটা তীক্ষ্ণভাবে মাথা তুলে আছে।

যাই হোক ভদ্রলোক প্রখর ধারালো চোখে অনেকক্ষণ দীপেনের দিকে তাকিয়ে থেকেছেন। সে দৃষ্টি এমন যা পৃথিবীর কোন কিছুকে বিশ্বাস করতে জানে না।

ভদ্রলোকের নিষ্পলক অবিশ্বাসী চোখ তার ওপর স্থির হয়ে ছিল। দীপেন নিদারুণ অস্বস্তি বোধ করেছে। ভেতরে ভেতরে কুঁকড়ে গেছে।

একসময় নীরস রুক্ষ স্বরে ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি বোম্বাই থেকে আসছেন ?'

দীপেন আগেও লক্ষ্য করেছিব, এখনও করেছে, ভদ্রলোকের আর সব ধ্বংস হলেও গলার স্বর বোধহয় অটুটই আছে। বহুকাল নিয়মিত শান পড়ে পড়ে সেটা এত তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে যে কানে তীব্রভাবে বিঁধে যায়। ভয়ে ভয়ে আড়ষ্ট গলায় দীপেন উত্তর দিয়েছে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। বোম্বাই থেকেই আসছি।'

'আপনার নাম ?'

'দীপেন লাহিড়ী।'

একটুক্ষণ চুপচাপ। কি যেন চিন্তা করে ভদ্রলোক বললেন, 'এদিকে আসুন।' দীপেন কাছে এগিয়ে এলে ইঙ্গিতে তক্তপোষের একটা প্রান্ত দেখিয়ে বললেন, 'ওখানে বসুন।'

নির্দেশমত দীপেন বসেছিল।

প্রখর চোখে ভদ্রলোক তাকিয়েই ছিলেন। একসময় আস্তে আস্তে ডাকলেন, 'আচ্ছা দীপেনবাবু—'

ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বরে এমন একটা কিছু ছিল যাতে চকিত হয়ে উঠেছে দীপেন। কিছুটা ভয়ে ভয়ে সাড়া দিয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছে সে।

ভদ্রলোক এবার জিজ্ঞেস করলেন, 'বোম্বাইতে আপনি কী করেন ?'

প্রশ্নটা ঠিকমত বুঝতে না পেরে দীপেন বিমূঢ়ের মত বলেছে, 'কী করি মানে।'

'মানে কাজকর্মের কথা বলছি।'

'আজ্ঞে চাকরি করি।'

'কী চাকরি ?'

প্রথমে যা মনে এসেছিল চোখকান বুজে তা-ই বলে ফেলেছে দীপেন, 'আজ্ঞে একটা ওষুধের কোম্পানিতে আমি সেলস্ রিপ্রেজেন্টেটিভ্।'

ভদ্রলোক বললেন, 'রিপ্রেজেন্টেটিভ্ মানে ফড়ে ? লোক ধরে ধরে খুব কোম্পানীর মাল গছান, না ?' যদিও ওষুধ কোম্পানীর সে দালাল নয় তথাপি ফড়ে শব্দটা প্রীতিকর মনে হয় নি দীপেনের। কোন উত্তর না দিয়ে চুপচাপ বসে থেকেছে সে।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। তারপর ভদ্রলোকই আবার শুরু করেছেন। স্বভাবসিদ্ধ সেই ধারাল স্বরে বললেন, 'তা, হ্যাঁ মশাই—'

দীপেন তৎক্ষণাৎ সাড়া দিয়েছে, 'আজ্ঞে—'

'আমাদের বাড়িতে কী মনে করে ?'

'আজ্ঞে, বিশেষ একটা দরকারে—'

স্বরটা এবার আরো উগ্র, আরো নীরস। ভদ্রলোক বললেন, 'দরকারের কথা পরে হবে। আগে বলুন, কি করে আপনি বাড়ির ভেতর ঢুকলেন ?'

দীপেন শঙ্কিত। খিড়কির দরজা দিয়ে চুপিসাড়ে চোরের মত যেভাবে সে এ বাড়ির অন্তঃপুরে এসেছে— সে কথা বলতে গেলে কোন তোপের মুখে পড়তে হবে বুঝে উঠতে পারে নি। বিপন্নের মত কিছু একটা বলতে চেয়েছে সে, কিন্তু কী বলবে সেটাই ভেবে পাওয়া যায়নি।

সেই মহিলা অর্থাৎ নীলা চৌধুরীর মা খানিকটা দূরে একটা নিশ্চল ছায়া মূর্তির মত দাঁড়িয়ে ছিলেন। এতক্ষণ একটি কথাও বলেননি তিনি। এবার দীপেনের অবস্থা

অনুমান করে ব্যস্তভাবে এসেছেন। বললেন, 'আমিই ওকে বাড়ীর ভেতর এনেছি।'

ভদ্রলোক স্ত্রীর মুখে দৃষ্টি রেখে সবিস্ময়ে বললেন, 'তুমি!'

'হ্যাঁ, আমি।'

'তুমি তো জানো, এ বাড়ীতে আমি কারো আসা পছন্দ করি না।'

'জানি।'

'তবে।'

'সব জেনেও একে বাড়িতে ঢুকতে দিতে হয়েছে।' মহিলা বলে গেলেন, 'ক'দিন ধরে ছেলেটা রোজ আসছে, আর সদর দরজায় কড়া নাড়লে তুমি ফিরিয়ে দিচ্ছ। আজ ওকে বাড়িতে না এনে পারিনি।'

এবার দীপেনের উদ্দেশে ভদ্রলোক বললেন, 'তা হলে আপনিই ক'দিন ধরে আসছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' দীপেন মাথা নেড়েছে।

'কেন?'

'একটা বিশেষ দরকারে—'

'দরকার!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

এবার কিছুটা কৌতূহলই যেন বোধ করলেন ভদ্রলোক। বললেন, 'আমাদের কাছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' দীপেন বলেছে।

'দরকারের কথা পরে হবে। আগে বলুন এ বাড়ির ঠিকানা কোথায় পেলেন।'

'আপনার মেয়ের কাছে।'

'আমার মেয়ে!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি নীলা চৌধুরীর কথা বলছি।'

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত পঙ্গু অসাড় শরীরটাকে এবার বিছানা থেকে অনেকখানি ওপরে টেনে তুলেছিলেন ভদ্রলোক। তাঁর গলা চিরে তীক্ষ্ণ চিৎকারের মত একটা আওয়াজ বেরিয়ে এসেছে, 'কার—কার কথা বললেন?'

দীপেন ভয় পেয়ে গেছে! স্খলিত স্বরে বললে, 'আজ্ঞে নীলা চৌধুরীর—'

'তাকে আপনি কোথায় পেলেন?'

দীপেন লক্ষ্য করেছে, অসহ্য উত্তেজনায় হাত-পা আঙুল—সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছিল ভদ্রলোকের। আর সেই কাঁপুনি—শরীরের সচল দিকটাতেই নয়, পক্ষাঘাতে নিশ্চল দিকটাতেও বুঝি সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল। ভদ্রলোকের বিচিত্র প্রতিক্রিয়া দেখতে দেখতে স্খলিত স্বরে দীপেন বলেছে, 'আজ্ঞে বোম্বাইতে। আন্ধেরী বলে একটা জায়গা আছে, সেখানে পাশাপাশি বাড়িতে আমরা থাকতাম।'

'ভদ্রলোক চেঁচিয়ে উঠেছেন, 'সে হারামজাদী কী করে সেখানে?'

দীপেন এবার হকচকিয়ে গেছে। মহিলা যা শিখিয়ে পড়িয়ে এনেছিলেন ভদ্রলোকের প্রশ্নটা তার মধ্য থেকে আসে নি। সম্পূর্ণ বিপজ্জনক আরেকটি দিক থেকে হানা দিয়েছে। কী বললে ভদ্রলোককে আয়ত্তে রাখা যাবে সেই মুহূর্তে তা বুঝে উঠতে পারে নি সে। বিভ্রান্ত অবস্থায় কিছুক্ষণ বসে থেকে অবশেষে মরিয়ার মত বলে ফেলেছে, 'আজ্ঞে, ওখানকার বড় একটা মার্চেন্ট অফিসে চাকরি করেন।'

ভদ্রলোক এবার গর্জন করে উঠেছেন; 'মিথ্যে—মিথ্যে—'

সভয়ে দীপেন বলেছে, 'আজ্ঞে—'

ভদ্রলোক হাতের উপর ভর দিয়ে উঠে বসতে চেয়েছেন, পারেন নি। অতএব শুয়ে শুয়েই চেঁচাতে হয়েছে তাঁকে, 'চাকরি করে! ব্লাফ দেবার আর জায়গা পান নি!'

ক্ষীণ স্বরে দীপেন বলেছে, 'সত্যি বলছি উনি চাকরি করেন। আপনি আমার বাবার বন্ধু। শুধু শুধু আপনাকে ব্লাফ দেবার কী কারণ থাকতে পারে?'

'অনেক কিছুই থাকতে পারে।'

'যেমন?'

'জানতে চান? বেশ নম্বর দিয়ে বলছি। প্রথমত আমার এই অথর্ব অবস্থা দেখে আপনার করুণা হয়েছে হয়তো। দ্বিতীয়ত বদমাইশ মেয়েটাকে আপনি আড়াল করতে চান। কিন্তু—'

'কী?'

'ও তো আমারই মেয়ে। আমার চাইতে ওকে আর কে বেশি করে চেনে! তাই বলছিলাম—'

'কী?'

'আমার চোখের দিকে তাকিয়ে একটা কথার ঠিক জবাব দিন তো।'

'ঠিক জবাব!'

'হ্যাঁ।' যতখানি পেরেছেন সামনের দিকে ঝুঁকে ভদ্রলোক বলেছেন, 'বলুন তো, হারামজাদী বোম্বাইতে এখন কার রক্ষিতা হয়ে আছে?'

সমস্ত অস্তিত্বের তলায় একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে গিয়েছিল যেন! কিছুক্ষণের জন্য দীপেনের চোখের সামনে থেকে সারা পৃথিবী বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সেই মহিলা, এই ভদ্রলোক, চির অন্ধকার ঘরখানা—কিছুই সে দেখতে পাচ্ছিল না, কিছুই শুনতে পাচ্ছিল না। সব নিরাকার নিরবয়ব হয়ে গিয়েছিল যেন। অনেকক্ষণ পর অনুভূতি-শূন্য বিচ্ছিন্ন স্নায়ুগুলোকে একত্র করে দীপেন কোনরকমে বললে, 'এ—এ আপনি কি বলছেন!'

'ঠিকই বলছি দীপেনবাবু।' বিচিত্র হেসে ভদ্রলোক বললেন, 'আপনি লুকোতে চাইলে কি হবে, নিজের মেয়েকে কি আমি চিনি না!'

দীপেন নির্বাক।

একটু চুপ করে থেকে ভদ্রলোক বললেন, 'এবার বলুন, কী দরকারে যেন এসেছেন?' [ক্রমশঃ

রজনীকান্ত ঃ সাধক ও স্রষ্টা

শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই;
দীন-দুঃখিনী মা যে তোদের
তার বেশী আর সাধ্য নাই।
ঐ মোটা সুতোর সঙ্গে, মায়ের
অপার স্নেহ দেখতে পাই;
আমরা, এমনি পাষাণ, তাই ফেলে ঐ
পরের দোরে ভিক্ষে চাই।
ঐ দুঃখী মায়ের ঘরে, তোদের
সবার প্রচুর অন্ন নাই,
তবু, তাই বেচে কাঁচ, সাবান, মোজা,
কিনে কল্লি ঘর বোঝাই।
আয় রে আমরা মায়ের নামে
এই প্রতিজ্ঞা করব ভাই;
পরের জিনিস কিনবো না যদি
মায়ের ঘরের জিনিস পাই।"

১৯০৫ সালে ভারতইতিহাসের এক সঙ্কট-সন্ধিক্ষণে বঙ্গ-ভঙ্গ-রোধ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে কান্তকবি রজনীকান্তের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল মাতৃসেবার এই অটল 'সংকল্প'! সেদিন বাংলার প্রতিটি দেশপ্রাণ কবি স্বদেশ-মাতৃকার বন্দনাগানে মুখর হয়ে উঠেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, মুকুন্দ দাস, কামিনীকুমার প্রভৃতি কবির কণ্ঠেও স্বদেশী সঙ্গীত ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠে জাতীয় জাগরণের সূচনা করেছিল; আর তার মাঝে কান্তকবির মধুর গম্ভীর সংকল্প-সঙ্গীত দেশবাসীর প্রাণে প্রেরণা জুগিয়েছিল, অসীম সাহসে প্রবল পরাক্রান্ত পরদেশী প্রভুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার।

সেই দেশপ্রাণ কবি রজনীকান্ত সেনের জন্মের শত বর্ষ পূর্ণ হতে চলেছে আগামী ১২ই শ্রাবণ। রজনীকান্ত সেন "কান্তকবি" নামেই বাংলা কাব্য-জগতে সমধিক প্রসিদ্ধ। ১২৭২ সালের ১২ই শ্রাবণ (২৬শে জুলাই, ১৮৬৫) পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার ভাঙ্গাবাড়ী গ্রামে ইনি জন্ম-গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ৺গুরুপ্রসাদ সেন। রজনীকান্তের কবিপ্রতিভা ও সঙ্গীত রচনার প্রকৃতিগত শক্তি বাল্যকাল থেকেই বিকশিত হয়। সঙ্গীতের প্রতি ছিল তাঁর আশৈশব আকর্ষণ। কোথাও কোনও গান একবার মাত্র শুনেই তা তিনি সুরতানলয় সহিত স্মৃতি-বদ্ধ করে রাখতে পারতেন। এর ওপর কি খেলাধুলা, কি, ব্যায়ামচর্চ্চা, কি সন্তরণ সকল বিষয়েই তাঁর পারদর্শিতা ছিল। লেখাপড়াতেও তিনি পিছিয়ে ছিলেন না। ১৮৮২ সালে রজনীকান্ত এনট্রান্স পরীক্ষায় দশ টাকা বৃত্তি সহ উত্তীর্ণ হন। পর বৎসর বাংলা ১২৯০ সালের ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ তাঁর বিবাহ হয় এবং কবি-পত্নী হিরণ্ময়ী দেবী কবির সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণী ছিলেন। তারপর সিটি কলেজ থেকে ১৮৮৫ সালে এফ-এ এবং ১৮৮৯ সালে বি-এ ও ১৮৯১ সালে বি-এল পাশ করে রাজসাহীতে ওকালতি আরম্ভ করেন। আর সেই সময় থেকে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সঙ্গীতজ্ঞ কবি ঈশ্বর উপাসনায়, দেশের সেবায় ও বঙ্গবাণীর আরাধনায় প্রাণমন নিয়োজিত রেখেছিলেন। তাঁর অসামান্য সঙ্গীত-প্রতিভা দেশবাসীকে মুগ্ধ করেছিল, নিরাশার ক্ষণে প্রেরণা দিয়েছিল, জাতীয় জাগরণে ইন্ধন জুগিয়েছিল। কান্তকবির রচনায় শুধু দেশপ্রেমই রূপ পায়নি—তিনি স্রষ্টাই শুধু ছিলেন না, তিনি ভক্ত ও সাধক ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অনেক দুঃখ, অনেক হাসিকান্নাও সঙ্গীতরূপ লাভ করেছে। প্রিয়পুত্রের বিয়োগব্যথায় যখন তিনি বিহ্বল তখনও তিনি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস

হন নি, বরং তাঁর প্রতি তিনি আরও আকৃষ্ট হলেন, আর ভক্ত সাধকের কণ্ঠে উচ্চারিত হল—

তোমারি দেওয়া প্রাণে, তোমারি দেওয়া দুঃখ,
তোমারি দেওয়া বুকে, তোমারি অনুভব।
তোমারি দু'নয়নে, তোমারি শোকবারি,
তোমারি ব্যাকুলতা, তোমারি হা হা রব।
তোমারি দেওয়া নিধি, তোমারি কেড়ে নেওয়া,
তোমারি শঙ্কিত আকুল পথ চাওয়া।
তোমারি নিরজনে ভাবনা আনমনে
তোমারি সান্ত্বনা, শীতলসৌরভ।
আমিও তোমারি গো, তোমারি সকলি ত,
জানিয়ে জানে না, এ মোহ-হত চিত
আমারি ব'লে কেন, ভ্রান্তি হ'ল হেন,
ভাঙ্গ এ অহমিকা, মিথ্যা, গৌরব।
(আলেয়া মিশ্র—তেওরা)

আবার তিনি গাইলেন।

নির্ভর

(বাণী)

তুমি নির্ম্মল কর, মঙ্গল-করে
মলিন মর্ম্ম মুছায়ে;
তব, পুণ্যকিরণ দিয়ে যাক, মোর
মোহ কালিমা ঘুচায়ে।
লক্ষ্য-শূন্য লক্ষ্য বাসনা
ছুটিছে গভীর আঁধারে,
জানি না কখন ডুবে যাবে কোন্
অকূল গরল-পাথারে!
প্রভু, বিশ্ববিপদহন্তা,
তুমি, দাঁড়াও রুধিয়া পন্থা,
তব, শ্রীচরণতলে নিয়ে এস, মোর
মত্ত বাসনা গুছায়ে।
আছ, অনল-অনিলে, চিরনভোনীলে,
ভূধরসলিলে, গহনে,
আছ, বিটপিলতায়, জলদের গায়,
শশিতারকায় তপনে,
আমি, নয়নে বসন বাঁধিয়া,
ব'সে আঁধারে মরিগো কাঁদিয়া,
আমি, দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু,
দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে।
(ভৈরবী—জলদ একতালা)

কান্ত কবি লিখে গেছেন বহু গান; কিন্তু তাঁর ভগবৎ প্রেমের গানই সবচেয়ে সুমধুর। ভগবানকে সখারূপে কল্পনা করে ভক্ত সাধক গেয়েছেন—

সখা

(বাণী)

আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে,
তুমি অভাগারে চেয়েছ;
আমি না ডাকিতে, হৃদয়-মাঝারে
নিজে এসে দেখা দিয়েছ!
চির-আদরের বিনিময়ে, সখা,
চির অবহেলা পেয়েছ;
(আমি) দূরে ছুটে যেতে, দু'হাত পসারি'
ধরে টেনে কোলে নিয়েছ!
"ওপথে যেওনা, ফিরে এস" ব'লে
কাণে কাণে কত ক'য়েছ,
(আমি) তবু চ'লে গেছি; ফিরায়ে আনিতে
পাছে পাছে ছুটে গিয়েছ।
(এই) চির-অপরাধী পাতকীর বোঝা
হাসি মুখে তুমি বয়েছ;
(আমার) নিজহাতে গড়া বিপদের মাঝে,
বুকে করে নিয়ে র'য়েছ!
(মিশ্র কানেড়া—একতালা)

কান্তকবির ভক্তি-ধারা বয়ে চলে, তিনি গেয়ে চলেন—

ভক্তি ধারা

(কল্যাণী)

আর—

কত দূরে আছ, প্রভু, প্রেম-পারাবার?
শুনিতে কি পাবে মৃদু বিলাপ আমার?

তোমারি চরণ-আশে, ধীরে ধীরে নেমে আসে,
ভকতি-প্রবাহ, দীন ক্ষীণ জলধার।
কঠিন বন্ধুর পথ, পদে পদে বাধা শত,
অচল হইয়া, প্রভু, পড়ে বারবার!
নীরস নিঠুর ধরা, শুষে লয় বারি-ধারা,
কেমনে দুস্তর মরু হয়ে যাব পার?
বড় আশা ছিল প্রাণে, ছুটিয়া তোমারি পানে,
এক বিন্দু বারি দিব চরণে তোমার।
পরিশ্রান্ত পথহারা, নিরাশ দুর্ব্বল ধারা,—
করুণা-কল্লোলে, তারে ডাক একবার!
(মিশ্র গৌরী—কাওয়ালী)

প্রার্থনা জানান ভক্ত কবি ঈশ্বর পদে—

প্রার্থনা

(বাণী)

(ওরা)—চাহিতে জানে না, দয়াময়!
চাহে ধন, জন, আয়ুঃ, আরোগ্য, বিজয়।
করুণার সিন্ধু-কূলে বসিয়া মনের ভুলে
এক বিন্দু বারি তুলে মুখে নাহি লয়;
… … …
আহা! ওরা জানে না ত, করুণানির্ঝর নাথ,
না চাহিতে নিরন্তর ঝর-ঝর বয়;
চির-তৃপ্তি আছে যাহে, তা' যদি গো নাহি চাহে,
তাই দিও দীনে, যা'তে পিয়াসা না রয়।
(বারোঁয়া—ঠুংরি)

সাধক কবির কণ্ঠ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে উচ্চারিত হয়ে চলে সাধন সঙ্গীত—

আর চাহিব না

(বাণী)

(আমি) দেখেছি জীবন ভ'রে চাহিয়া কত;
(তুমি) আমারে যা' দাও, সবই তোমারি মত।
… … …

প্রেমাঞ্জন

(বাণী)

'যে দিন তোমারে হৃদয় ভরিয়া ডাকি,
শাসন-বাক্য মাথায় করিয়া রাখি;
কে যেন সেদিন আঁখি-তারকায়,
মোহন তুলিকা বুলাইয়া যায়,
সুন্দর, তব সুন্দর সব,
যে দিকে ফিরাই আঁখি!
… … …

এস

(বাণী)

বিবেকবিমলজ্যোতিঃ
জ্বেলেছিলে তুমি হৃদয়-কুটীরে;
তোমারি আলোকে তোমারে দেখেছি,
তোমারি চরণ ধরেছি শিরে!
… … …

পাতকী

(কল্যাণী)

পাতকী বলিয়ে কি গো পায়ে ঠেলা ভাল হয়?
তবে কেন পাপী তাপী, এত আশা ক'রে রয়?
করিতে এ ধূলোখেলা অবসান হ'ল বেলা
যারা এসেছিল সাথে, ফেলে গেল অসময়।
হারাইয়ে লাভে মূলে, মরণের সিন্ধু-কূলে
পথশ্রান্ত দেহখানি টানিয়া এনেছি হায়!
জীবনে কখন আমি ডাকিনি, হৃদয়-স্বামী!
(তাই) এ অ-দিনে এ অধীনে ত্যজিবে কি দয়াময়?
(মিশ্র বেহাগ—যৎ)

ভ্রান্তি

(বাণী)

লোকে বলিত তুমি আছ,
ভেবে দেখিনি আছ কিনা,
তখন আমি বুঝিনি, প্রভু,
নাস্তি গতি তোমা বিনা।
তোমারি গৃহে বসতি করি,
খেয়েছি তোমারি অন্ন,
তোমারি বায়ু দিতেছে আয়ু,
বেঁচে আছি তোমারি জন্য;

ক্ষুধা হ'য়েছে তব ফলে,
পিপাসা গেছে তব জলে ;
সে কি ভুল, যে ভুলে ভুলে,
প্রভু, তোমারি নাম করি না !
তোমারি মেঘে শস্য আনে,
ঢালি' পিযুষ জল-ধারা,
অবিরত দিতেছে আলো,
তোমারি রবি-শশি-তারা,
শীতল তব বৃক্ষচ্ছায়া,
সেবে নিয়ত, ক্লান্ত কায়া,
(তবু) তোমারি দেওয়া মন র'য়েছে
ভুলে তোমারি গুণ-গরিমা ।
(মিশ্র বিভাস—ঝাঁপতাল)

পরিবেদনা

(বাণী)

তব, করুণা অমিয় করি' পান—
পাপ, তাপ, দুঃখ, মোহ, বিষণ্ণতা,
নিরাশ, নিরুদ্যম, পায় অবসান ।
এই, পাপ-চিত্ত, সদা তাপ-লিপ্ত রহি',
এনেছে দুরপনেয় মৃত্যুবিকার বহি',
দিতেছে দারুণ দাহ হৃদয়-দেহ দহি',
দেবতা গো, দয়া করি' কর পরিত্রাণ ।
তব, অমৃতপানে এই বিকৃত প্রাণে মম,
স্থানভেদে হয় কালকূট-সম,
হৃদয়ে বহ্নিজ্বালা, নয়নে অন্ধ-তমঃ
কোথা শান্তিনিদান, কর শান্তিবিধান ।

উষা-বিকাশ

(বাণী)

তব, শান্তি-অরুণ-শান্ত-করুণ
কনক-কিরণ-পরশে,
জাগে প্রভাত হৃদি-মন্দিরে,
চরণে নামিয়া হরষে !
... ...

"বাণী" কাব্যগ্রন্থের সূচনাতে তিনি লিখে গেছেন—

সূচনা

সেথা আমি কি গাহিব গান ?
যেথা, গভীর ওঙ্কারে, সাম ঝঙ্কারে,
কাঁপিত দূর বিমান
যেথা, সুরসপ্তকে বাঁধিয়া বীণা,
বাণী শুভ্রকমলাসীনা,
রোধি' তটিনী-জল-প্রবাহ,
তুলিত মোহন তান ।
যেথা, আলোড়ি' চন্দ্রালোক শারদ,
করি' হরিগুণগান নারদ,
মন্ত্রমুগ্ধ করিত ভুবন,
টলাইত ভগবান ।
যেথা, যোগীশ্বর—পুণ্যপরশে,
মূর্ত্ত রাগ উদিল হরষে ;
মুগ্ধ কমলাকান্ত-চরণে
জাহ্নবী জনম পান ।
যেথা, বৃন্দাবন-কেলিকুঞ্জে,
মুরলী-রবে পুঞ্জে পুঞ্জে,
পুলকে শিহরি' ফুটিত কুসুম,
যমুনা যেত উজান ।
আর কি ভারতে আছে সে যন্ত্র,
আর কি আছে সে মোহন মন্ত্র,
আর কি আছে সে মধুর কণ্ঠ,
আর কি আছে সে প্রাণ ?
(গৌরী—একতালা)

ভক্তহৃদয়ের অর্ঘ্যস্বরূপ এই সব অজস্র, অপূর্ব্ব সাধন-সঙ্গীত ছাড়াও কান্তকবি সৃষ্টি করে গেছেন আরও নানা ধরণের সঙ্গীত। তাঁর হাসির গান ও ব্যঙ্গাত্মক সঙ্গীতগুলিও খুবই জনপ্রিয় হয়। তিনি নিজে উকীল ছিলেন, তাই উকীল সম্বন্ধে গান রচনা করে গেছেন—

উকীল

(কল্যাণী)

দেখ আমরা জজের pleader,
যত, public Movement-এর leader,

আর, conscience to us is a marketable thing
(which) we sell to the highest bidder.

দেখ, annually swelling in number
আমরা, করেছি bar encumber
আর, শামলা, চাপকানে, চেন, চশমা, দাড়িতে,
We, look so grave and sombre !

আমরা বাদীকেও বলি "হ্যালো,
তোমার মামলা তো অতি ভাল !"
আবার, প্রতিবাদী এলে বলি "জিতে দেবো,
কত টাকা দেবে, ফ্যালো।"

দুটো খেয়েই কাছারী ছুটি,
আর যা পাই থলুসে পুঁটি,
ঐ, জল কাদা ভেঙ্গে, যার যার মত,
কাড়াকাড়ি ক'রে লুটি।

... ...

দুর্দ্দশার কি দিব ফর্দ্দ ?
দেখ, হয়েছি বেহায়ার হদ্দ ;
কাজ যত, তার ত্রিগুণ উকীল
মক্কেল তাহার অর্দ্ধ !
দেখ, কেউ কারো পানে চায় না,
যত কম নিতে পায় 'বায়না',
সেই কম কত, সে কথা তো দাদা,
কারো কাছে বলা যায় না !

... ...

আমরা একবারে ডুবে গেছি,
"This is dishonest advocacy,"
দিলেন হুজুর গালি সুমধুর,
পকেটে করে এনেছি !

Courtএ ধর্ম্মাবতারের তাড়া,
বাড়ীতে গিন্নীর নথ-নাড়া,
থতমত খাই, মাথা চুলকাই,
বুঝি মাঝখানে যাই মারা !

(সুর—'আমরা বিলেত ফেরতা ক'ভাই।'—D, L. Roy)

বিদ্যা জাহির করাকে ব্যঙ্গ করে লিখেছেন—

পুরাতত্ত্ববিৎ

(কল্যাণী)

রাজা অশোকের ক'টা ছিল হাতী,
টোডরমল্লের ক'টা ছিল নাতী,
কালাপাহাড়ের ক'টা ছিল ছাতি,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে ক'রেছি জাহির।

আকবর সাহা কাছা দিত কিনা,
নূরজাহানের ক'টা ছিল বীণা,
মন্থরা ছিলেন ক্ষীণা কিংবা পীনা,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে ক'রেছি জাহির।

... ...

কৃষ্ণের বাঁশীতে ছিল ক'টা ছ্যাদা,
দিলীপের বাগানে ছিল কি না গাঁদা,
কোন্ মুখো হয়ে হয় লঙ্কা বেঁধা,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে করেছি জাহির।

বাদশা হুমায়ুন কাট্‌তো কি না টেড়ি,
Alexander খেতেন কি না Sherry,
মীরাবাই, কানে প'রত কি না ঢেঁড়ি,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে ক'রেছি জাহির।

... ...

এ মাথাটা বড়ই ছিল উর্ব্বর,
বুঝিল না যত অসভ্য বর্ব্বর !
এটা আঁধার প্রত্ন-তত্ত্বের গহ্বর !
ইতিহাসামৃত-পায়ীর, আমি পানীয় ক'রেছি বাহির।

ঔদরিককে উদ্দেশ্য করে তিনি গাইলেন—

যদি, কুমড়োর মত, চালে ধরে রত,
পান্‌তোয়া শত শত ;
আর সরষের মত, হত মিহিদানা,
বুঁদিয়া বুটের মত !
(প্রতি বিঘা বিশমণ ক'রে ফ'লত গো ;
আমি তুলে রাখিতাম ; বুঁদে মিহিদানা গোলা বেঁধে
আমি তুলে রাখিতাম !)
যদি তালের মত হ'ত ছানাবড়া,
ধানের মতন চ'সি ;

আর তরমুজ যদি, রসগোল্লা হ'ত
দেখে প্রাণ হ'ত খুসি !
... ...
যদি, বিলিতি কুমড়ো হত লেডিকেনি
পটোলের মত পুলি ;
(আর) পায়েসের গঙ্গা ব'য়ে যেত, পান
ক'র্ত্তাম দুহাতে তুলি'।

(আমি ডুবে যে যেতাম ; সেই সুধা তরঙ্গে ডুবে যে যেতাম। আর বেশী কি বলব, গিন্নির কথা ভুলে, ডুবে যে যেতাম ; আর উঠতাম না হে। গিন্নি ডেকে ডেকে কেঁদে মরতো, তবু তো উঠতাম না হে। গিন্নি হাত ধরে করতো টানাটানি, তবু উঠতাম না হে)।

সকলি ত' হবে বিজ্ঞানের বলে,
নাহি অসম্ভব কর্ম্ম ;
শুধু, এই খেদ, কান্ত আগে মরে যাবে,
(আর) হবে না মানব জন্ম।

(আর খেতে পাবে না, কান্ত আর খেতে পাবে না ; মানব জন্ম আর হবে না—·········আর খেতে পাবে না।)

(মনোহরসাই—গড়-খেমটা)

তাঁর 'কল্যাণী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত "খিচুড়ী" নামক সঙ্গীতে ধর্ম্মসমন্বয়ের প্রতি কটাক্ষ করে লিখেছেন—

ভারি সুনাম ক'রেছে নিধিরাম !
শোন বলি গুণ-গ্রাম,
খবরের কাগজে করে ধর্ম্মমীমাংসা,
যত মাসিকে ও সাপ্তাহিকে পেলে প্রশংসা ;
না যায় অন্ন পেটে, শুধু শাস্ত্র ঘেঁটে,
কেবল, পুরাতত্ত্বে আছেন মত্ত হ'য়ে অবিরাম।

সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ে ছিলেন নিযুক্ত ;
কি প্রশস্ত ধর্ম্মপথ ক'রেছেন মুক্ত !
তত্ত্বসুধার সিন্ধু, ব্রাহ্ম, মুসলমান, হিন্দু,
(এবার) সবারি পিপাসা গেল সিদ্ধ মনস্কাম।

তিনি বলেন, হরি বল চৈতন্যের মত,
(কিন্তু) মতি রেখো প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পদ,
বুদ্ধের পথও মন্দ নয়, নানক যে সব কথা কয়,
তার, এক একটি কথায় যে ভাই ভারি ভারি দাম !

ব্রাহ্মমতে আকারশূন্য ব্রহ্মেতে মজ,
(কিন্তু) কালী নামের নাই তুলনা, মায়েরে ভজ ;
(ও যা) বলেন মহম্মদ, ভারি বেজায় তার কিস্মত,
'খোদাতালা আল্লা' বলে কর ভাই সেলাম।

... ...

(চল) গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, কামাখ্যা, কালীঘাট,
(চল) শ্রীক্ষেত্র, নৈহাটি, শ্রীধাম, নবদ্বীপ, শ্রীপাঠ,
যখন যাবে হরিদ্বার, সেই রাস্তা হ'য়ে পার,
মক্কা থেকে 'হজ' করে ভাই, ফিরো নিজগ্রাম।

মাঝে মাঝে চার্চ্চে যেয়ো বগলে বাইবেল ;
(একটা) সময় ক'রে কোরাণ সরিফ পড়ো খুলে দেল্,
কভু গীতাটাও দেখো, আবার শিয়রে রেখো
শাস্ত্রী মশা'র ব্রাহ্মধর্ম্ম-তত্ত্ব দু'একখান।

অহিংসা পরম ধর্ম্ম, খেয়ো নিরামিষ ;
আবার গোপনে রমজানের কাছে নিয়ো দু'এক ডিস ;
হরিনামের মালা, হাতে ফিরিয়ো দু'বেলা,
সন্ধ্যা ক'রো, নামাজ দিয়ো, কেউ হবে না বাম।

... ...

হুইস্কিতে তিল তুলসী করিয়ে অর্পণ,
'জগৎ তৃপ্ত' বলে গিলে ক'রো পিতার তর্পণ,
ক'রে কৃষ্ণে নিবেদন, ক'রবে বীফ্‌ষ্টিক ভোজন :
রেখ বদনা, কমোড, কোশাকুশী, আদি সরঞ্জাম।

খেয়ো প্রকাশ্যেতে আতপান্ন, গোপনে ফাউল ;
খোদার নামে দরবেশ সেজো, হরিনামে বাউল।
দীন কান্ত বলে ভাল, নিধির বলিহারি যাই !
এই অপূর্ব্ব খিচুড়ী খেয়ে আমি তো গেলাম !

(খাম্বাজ—কাওয়ালী)

সেকালের স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে একটি সুন্দর humour তিনি সঙ্গীতে ফুটিয়ে তুলেছেন—

বিনা মেঘে বজ্রপাত
(কল্যাণী)

স্বামী— "চাহিয়া দেখ, এনেছি আজ, জড়োয়া মতিমালা ;
আর সত্তের ভরি, সোনার এই, মকরমুখো বালা,

তারের কান পঁচিশ ভরি, হীরের দু'টি দুল গো !"
স্ত্রী— "আহাহা ! কেবা ভাগ্যবতী, আমার সমতুল গো !"
স্বামী— "এই সোনার সিঁথি, ঝালরে মতি,
কপিপাতা অনন্ত এ ;
আর হীরের চুড়ি, একশ ভরি,
হয় না কি পছন্দ এ ?
খোঁপার শোভা, সোনার ফুল এ,
সেজেছে দু'টী মীনে।"
স্ত্রী— "(আহা !) পান সেজে দি, মসলা দিয়ে,
ফেলেছ মোরে কিনে !"
স্বামী—"কেমন হ'ল পয়লা-কাঠি, কাটা-বাজু, এ চন্দ্রহার ?
(আর) হীরের সাতনহরী মালা,
ঝ'ল্‌কে নাশে অন্ধকার !
জরির বডি, পার্শী শাড়ী বড্ড বেশী দামী এ !"
স্ত্রী— "(আহা !) মুছিয়ে দেই, বদনখানি,
বড্ড গেছ ঘামিয়ে।"
স্বামী— "এ সব এনেছি, বড় ব'য়ের তরে,
তোমার তরে আনি নি !
ও কি ও ? আরে কাঁদ কেন ?
ছি ! রাগ ক'রো না মানিনি !
তোমার সব গহনা আছে, বড় ব'য়েরই নাই গো !"
স্ত্রী— "হায় কি হ'ল ! ধর গো ধর,
পড়িয়া বুঝি যাই গো !"
(মনোহরসাই—ঝাঁপতাল)

কান্তকবি রচিত এরূপ অনবদ্য হাসির গানে বাংলার ঘরে ঘরে একদা হাস্যের রোল উঠত। হাসির গান বা ব্যঙ্গাত্মক সঙ্গীত আজকাল আর বিশেষ রচিত হয় না। কিন্তু সেকালে রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি সঙ্গীতস্রষ্টার হাসির গানের বিশেষ কদর ছিল।

স্বদেশী গান ও হাসির গান রচনায় রজনীকান্তের বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকলেও ভক্ত কবির প্রধান আকর্ষণ ছিল, প্রাণের টান ছিল ভক্তিমূলক সঙ্গীতেরই প্রতি। সাধক-সঙ্গীতজ্ঞ তাঁর হৃদয় নিংড়ে ভক্তিধারা ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদন করে গেছেন আমৃত্যু। রোগশয্যায় শুয়েও তিনি সৃষ্টি করে গেছেন "আনন্দময়ী" নামে সঙ্গীতে রচিত সুমধুর এক কাব্যগ্রন্থ। এই পুস্তকের ভূমিকায় সারদাচরণ মিত্র মহাশয় লিখেছেন—"...আনন্দময়ী বঙ্গে আনন্দের উৎস; রজনীকান্তের "আনন্দময়ী" সেই আনন্দ শতগুণে পরিবর্দ্ধিত করিবে।...যে কবি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মভূতা মহাশক্তি আনন্দময়ীর মানবী ভাবে বাপের বাড়ীতে আসিবার ও শ্বশুর-বাড়ীতে যাওয়ার উপাখ্যান রচনা করিয়াছিলেন, তিনি মানব-হৃদয় ও মানব-সমাজ সূক্ষ্মভাবে দেখিয়াছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই কবিকুলের অগ্রণী ছিলেন। রজনীকান্তের "আনন্দময়ী" সেই সুন্দর মনোহর উপাখ্যানের ভিত্তিতে বিরচিত।...আধুনিক কবিতায় আমি প্রায়ই কবিত্ব দেখিতে পাই না ; অনেক সময়েই কেবল বাক্যের সমষ্টি দেখিতে পাই। "আনন্দময়ী" বাক্যের সমষ্টি নহে ; প্রত্যেক পদেই চিন্তার বিষয় আছে ; প্রত্যেক পদেই হৃদয় বিকাশের উপযোগী ভাব আছে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রজনীকান্ত মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াও হৃদয়াকাশে অনন্তবিশ্বের প্রতিমা গড়িয়া কবিতা লিখিতে সমর্থ হইয়াছেন। রোগের যাতনা, অর্থাভাবের ক্লেশ, পুত্রকলত্রকে নিরাশ্রয় ফেলিয়া ইহসংসার ত্যাগের চিন্তা—কিছুতেই তাঁহার কোমল হৃদয়কে ক্লিষ্ট করিতে পারে নাই। তাঁহার হৃদয় পাষাণময় নহে, কিন্তু কাব্যরসে এরূপ নিমজ্জিত যে, চতুর্দ্দিকে সেই রস ভিন্ন আর কিছুই নাই। রামপ্রসাদ ভাবুক ছিলেন ; স্বাভাবিক কবি ছিলেন। মহাশক্তি তাঁহাকে শক্তিমান করিয়াছিলেন। বাগ্‌দেবীও সঙ্গে সঙ্গে মহাশক্তির পার্শ্বে ছিলেন। 'আনন্দময়ী' পাঠ করিতে করিতে রামপ্রসাদকে মনে পড়ে। তবে সেকালের ভাষায় ও একালের ভাষায় পার্থক্য আছে ; কিন্তু দার্শনিক ভাবের পার্থক্য নাই, করুণরসের পার্থক্য নাই। "আনন্দময়ী" একালের লোকের সম্পূর্ণরূপে উপযোগী।"

"আনন্দময়ী" কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধে কান্তকবি নিজে লিখে গেছেন,—

"...ভারতবর্ষের ন্যায় কল্পনাকুশল প্রদেশ পৃথিবীতে আর নাই। এমন সুবিস্তীর্ণ উর্ব্বর কল্পনাক্ষেত্র অন্যত্র কুত্রাপি নয়নগোচর হয় না। সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সর্ব্ব বিষয়ে ভারতীয়েরা উজ্জ্বল আদর্শ কল্পনার সৃষ্টি করিয়া লোকশিক্ষা দিয়াছেন। পুরাণোক্ত আধ্যাত্মিকাবলীর প্রতিপাদ্য বস্তুতে বিশে

শতাব্দীর শিক্ষিত সম্প্রদায় আস্থা-স্থাপন করিতে না পারিলেও, এ কথা তাঁহারা অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, ধর্ম্মরাজ্যে ঐ সকল কল্পনার প্রয়োজন ছিল এবং ঐ সকল কল্পনার দ্বারা মানব-সমাজের বহুবিধ মঙ্গল সংসাধিত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-রূপে গোপবংশে আবির্ভূত হইয়া বৃন্দাবনে যথাবর্ণিত মধুর লীলা করিয়াছিলেন কি না, এ বিষয়ে নব্য যুবক সন্দিহান; কিন্তু কৃষ্ণলীলার কীর্ত্তন শ্রবণে এ পর্য্যন্ত কত পাষাণচিত্ত দ্রব হইয়া ভগবদুন্মুখ হইয়াছে, কত দুষ্কৃতের সৎপথে গতি হইয়াছে, কত অপ্রেমিক প্রেমের বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে, তাহার সংখ্যা কে করিবে? তাই বলিতেছিলাম, কল্পনানিপুণ ভারতবর্ষে পৌরাণিক আখ্যায়িকা-বিশেষকে কল্পনা বলিয়া স্বীকার করিলেও, জনসমাজে তাহার মহোপকারিতা অস্বীকার করা যায় না। কৈলাস হইতে জগজ্জননীর হিমালয়ে আগমন, দিন-ত্রয় পিতৃগৃহে অবস্থান এবং বিজয়ার দিবস সমস্ত হিমালয়-বাসীকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া কৈলাসে প্রত্যাবর্ত্তন, এই আখ্যায়িকা কল্পনা হইলেও মহাকবিগণের সুনিপুণ তুলিকা-রঞ্জিত হইয়া, এমন উজ্জ্বল চিত্তোন্মাদক কাব্য-সৌন্দর্য্য বিকাশ করিয়াছে যে, তাহা ভারত ব্যতীত অন্যত্র সম্ভব হয় কি না, সন্দেহ।

ভগবান্‌কে সন্তানরূপে পাইবার আকাঙ্ক্ষা ও তাঁহাকে সন্তানজ্ঞানে তাঁহার সহিত তথাবদ্ব্যবহার ভারতবাসী ব্যতীত অন্য জাতি কল্পনাচ্ছলেও নিজ মস্তিষ্কে কোনও কালে স্থান দিয়াছে কিনা, বলিতে পারি না। তবে ইহা দৃঢ়তার সহিত বলা যায় যে, মানসিক সমস্ত বৃত্তির পূর্ণ বিকাশ ও চরিতার্থতা ভগবানেই সম্ভব; কারণ তিনি সর্ব্ব বিষয়ে পূর্ণ ও নির্দ্দোষ আদর্শ। যশোদার গোপাল প্রভাস-যজ্ঞে পিতামাতার নয়নে যে গলদশ্রুধারা প্রবাহিত করিয়া ছিলেন, মেনকার উমা প্রতিবর্ষে শারদীয়া শুক্লা দশমীর প্রভাতে মাতৃনয়নে সেই উষ্ণ প্রস্রবণেরই সৃষ্টি করিয়া কৈলাসে গমন করেন।…

জগজ্জননীর পিতৃগৃহে আবির্ভাব 'আগমনী,' এবং কৈলাসাভিমুখে তিরোধান, 'বিজয়া' নামে অভিহিত। এই ক্ষুদ্র সঙ্গীত-পুস্তকের আদ্যাংশ 'আগমনী' ও শেষাংশ 'বিজয়া'। পাঠকগণ পুনঃ পুনঃ শুনিয়াছেন,—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" "যাহারা যে ভাবে আমার শরণাপন্ন হয়, আমি সেই ভাবেই তাহাদিগকে অনুগ্রহ করি।" সুতরাং সম্যক ও যথাবিধি একাগ্র-সাধনায় যে ভগবান্‌কে সন্তানরূপে পাওয়া যায় না, তাই বা কেমন করিয়া বলি? তিনি তো ভক্তের ঠাকুর, যে তাঁহাকে যে ভাবে পাইয়া তুষ্ট হয়, তিনি সেই ভাবেই তাহাকে দর্শন দেন; এ কথা সত্য না হইলে যে তাঁহার করুণাময়ত্বে, তাঁহার ভক্তবৎসলতায় কলঙ্ক হয়। ধর্ম্মজীবন ভারতবর্ষ চিরদিন এই ধারণায় কর্ম্মক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত ও অকুতোভয়।

উৎকট-রোগ-শয্যায়, দুর্ব্বল হস্তে এই সঙ্গীতগুলি লিখিয়াছি। আর কোনও আকর্ষণ না থাকিলেও, ইহাতে জগদম্বার নাম আছে মনে করিয়া, পাঠক অনাদর করিবেন না, ইহাই বিনীত প্রার্থনা।"

কান্ত কবির এই কথাগুলি থেকে তাঁর মনের ভক্তি-মাধুর্য্যেরই শুধু পরিচয় মেলে না, তাঁর তত্ত্বানুসন্ধানী মনটিকেও আমরা যেন দেখতে পাই। ভক্ত-সাধক কবি হাসপাতালের রোগ শয্যায় শায়িত থেকেও তাঁর লেখনীকে বিশ্রাম দিতে পারেন নি—স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবেই সেই লেখনী চালিত করে সৃষ্টি করে গেছেন 'আগমনী' ও 'বিজয়া'র সুমধুর সঙ্গীতগুলি। কিন্তু বাংলার সঙ্গীতপিপাসু, কাব্য-পিপাসু, ভক্তিরসপিপাসু পাঠকদের "আনন্দময়ী"-র আনন্দ দান করেই কান্তকবি তুষ্ট হন নি—মৃত্যু আসন্ন জেনে তিনি বাঙ্গালী পাঠককে দিয়ে গেলেন তাঁর শেষ দান, কান্ত কবির শেষ সঙ্গীত, তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থ "শেষ দান"। মৃত্যু পথযাত্রী এই স্বভাব কবির এই শেষ কাব্যগ্রন্থের ছত্রে ছত্রে ভক্তির সঙ্গে ফুটে উঠেছে অপরূপ দার্শনিক তত্ত্ব ও তার সাথে সাধক কবির মর্ম্মব্যথা ও আত্মনিবেদন। গ্রন্থারম্ভেই কবি গাইলেন—

দয়ার বিচার

আমায়, সকল রকমে কাঙ্গাল করেছ—
গর্ব্ব করিতে চুর,
যশঃ ও অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য,
সকলি করেছ দূর।

ওইগুলো সব মায়াময় রূপে
ফেলেছিল মোরে অহমিকা-কূপে,
তাই সব বাধা সরায়ে দয়াল
করেছে দীন আতুর ;
আমায়, সকল রকমে কাঙাল করিয়া
গর্ব্ব করিছে চুর।

যায় নি এখনো দেহাত্মিকা মতি,
এখনো কি মায়া দেহটার প্রতি,
এই, দেহটা যে আমি—সেই ধারণায়
হয়ে আছি ভরপুর ;
তাই, সকল রকমে কাঙ্গাল করিয়া
গর্ব্ব করিছে চুর।

ভাবিতাম, "আমি লিখি বুঝি বেশ,
আমার সঙ্গীত ভালবাসে দেশ,"
তাই, বুঝিয়া দয়াল ব্যাধি দিল মোরে,
বেদনা দিল প্রচুর ;
আমায়, কত না যতনে শিক্ষা দিতেছে
গর্ব্ব করিতে চুর!

আবার নিজের যা কিছু দম্ভ তা অকপটে স্বীকার করে মৃত্যুপথযাত্রী গেয়ে উঠলেন—

দম্ভ

... ...
... ...

এই অন্ধ, মত্ত উদ্যমে আমি
বাড়াতে আপন মান,
সিদ্ধিদাতারে গণ্ডী-বাহিরে
করিনু আসন দান ;
তাই বিধাতার হইল বিরাগ,—
ভেঙ্গে দিল মোর শিবহীন যাগ,
সকল দম্ভ ধুলোয় ফেলিয়া
আজ ডাকি, ভগবান!
হে দয়াল, মোর ক্ষমি অপরাধ
কর তোমাগত প্রাণ।

ক্লান্ত কবি এবার জীবনের হিসাব-নিকাশ সব শেষ করতে চান, তাই তিনি লিখলেন—

হিসাব-নিকাশ

(ওরে) ওয়াশীল কিছু দেখিনে জীবনে,
শুধু ভূরি ভূরি বাকি রে ;
সত্য সাধুতা সরলতা নাই,
যা আছে কেবলি ফাঁকি রে!

... ...

কত যে মিথ্যা, কত অসঙ্গত
স্বার্থের তরে বলেছি নিয়ত ;
(আজ) পরম পিতার দেখিয়া বিচার
অবাক হইয়া থাকি রে!

রুদ্ধ ক'রেছে আগে গল-নালী,
তীব্র বেদনা দেছে তাহে ঢালি,
করি কণ্ঠরোধ, বাক্যজ পাতক
হরেছে,—খোল্ না আঁখি রে!

এমনি মনোজ, কায়জ পাতক
ক্রমে লবে হরি' পাপ-বিঘাতক ;
নির্ম্মল করিয়া, 'আয়' ব'লে লবে
সুশীতল কোলে ডাকি রে!

ঈশ্বরকে উদ্দেশ্য করে মুমূর্ষু কবি গেয়ে চলেন—

দয়াল আমার
....

আগুন জেলে, মন পুড়িয়ে
দেয় গো পাপের খাদ উড়িয়ে,
ঝেড়ে ময়লা-মাটি, ক'রে খাঁটি,
স্থান দেয় অভয়-শ্রীচরণে।

... ...

দেখ্ কেমন তার ভালবাসা,
মিঠায় আনন্দ-পিপাসা,
আগে, না পোড়ালে খাদ র'য়ে যায়,—
সে আনন্দ পাবে কেমনে?

অন্তিমে

(মোরে) এ উৎকট ব্যাধি দিয়ে,
কি শঙ্কটে ফেলে নিয়ে,
বুঝাইয়া দিলে যবে
সকল চিকিৎসাতীত,

না হইলে নিরুপায়,
নির্লাজ ফেরে না হায় ;
তাই শরণ লইতে হ'লো
তোমার চরণে পিতঃ
... ...
দীর্ঘ দিবা রাত্রি পেয়ে
বেত্রাঘাত অনিবার,
বুঝিলাম যবে পিতঃ
এ শুধু স্নেহের মার ;—
এ টুকু সহিতে হবে,
নতুবা কি হতে পারি
অনশ্বর সে অনন্ত
আনন্দের অধিকারী ?

এবারে যেন তিনি শুনতে পাচ্ছেন ঈশ্বরের আহ্বান, তাই "চিরানন্দ" কবিতাটির শেষে গাইলেন—

... ...
... ...
লইতে আনন্দ-কোলে,
মা ডাকে, "আয় বাছা" বলে,
তাই, আনন্দে চলেছি, ভাই রে,
কিসের মরণ-ভয় ?
ওগো, মা আমার আনন্দময়ী,
পিতা চিদানন্দময় ॥

মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্বে কবির পরমবন্ধু প্রখ্যাত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের কবিতায় লিখিত একখানি পত্রের উত্তর কবি কবিতাতেই দিয়েছিলেন। এই কয়েক ছত্র কবিতায় লিখিত পত্রের মধ্যেও আমরা পাই কান্তকবির humour, বিষাদ, ভগবানে অটল বিশ্বাস ও শেষ-বিদায়ের আন্তরিকতাটুকু।—

বিদায়-লিপি

একৃসটেম্পোর পত্র পেয়ে
হয়েছি অবাক !
হাজার হলেও, দাদা,
মরা হাতী লাখ।
তোমার মঙ্গল-ইচ্ছা
হ'ল না সফল,—
জীবন ফুরায়ে গেল
ভেঙ্গে যায় কল।
আর তো হ'ল না দেখা,
কর আশীর্ব্বাদ—
এড়িবে সমস্ত দুঃখ,
বেদনা, বিষাদ।
বড় যে বাসিতে ভাল,
শিখাইতে কত,
ছাপা'ল কবিতা তাই,
সে "নব্যভারত"।
বিদায় বিদায়, ভাই,
চিরদিন তরে,
মুমূর্ষুর হিতাকাঙ্ক্ষা
রেখ মনে ক'রে।
একান্ত নির্ভর আমি
করেছি দয়ালে,
মারে সেই রাখে সেই—
যা থাকে কপালে।
প্রীতি দিও তথাকার
প্রিয় বন্ধুগণে,
ভক্তি দিও তথাকার
নমস্য সুজনে।

"বিদায় লিপি" লেখবার পরই কিন্তু কান্তকবি বিদায় নিতে পারেননি। ঈশ্বর কৃপায় আরও কয়েকটা দিন এ মর-জগতে তিনি ছিলেন এবং সেই শেষ সময়টুকুও তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতেপারেন নি—সেটুকুরও সদ্ব্যবহার করে তিনি বঙ্গ-সাহিত্যের ভাণ্ডারে তাঁর শেষ দান দিয়ে গেলেন "শেষ দান" নামের কবিতায়।

শেষ দান

দাও, ভেসে যেতে দাও তারে।
ঐ প্রেমময় পরমেশ-পাদোদক !
তাহার চরণামৃত ছুটেছে যে অশ্রুরূপে,
তারে দিও না গো বাধা।

যেতে দাও!
আমার মরাল-মন ঐ চ'লে যায় কার গান গেয়ে,
শোন। ঐ স্রোতোবেগে, মধুর তরঙ্গ তুলি',
যেতে দাও!
মুছিও না, ওটিও চলিয়া যাক্
আসিয়াছে যেথা হ'তে,—
সে চরণে ফিরে চ'লে যাক্।
দিয়ে যাক্ এ তৃষায় কাতর
পৃথিবীরে সুশীতল সুমধুর ধারা,—
অমর করিয়া যাক্ বহি।
ঐ অশ্রুটুকু এ জীবন-মরালের পাথেয় মধুর,
সেটুকু নিও না কেড়ে,
দিতে চাই তারি পদতলে—
যে দিয়েছিল অশ্রুভিক্ষা।
আমার দয়াল অই—
ব'সে আছে নিরজনে!
আমারে দিও না বাধা,—
ভেসে যাই একমনে!

এই কবিতা রচনার কয়েকদিন পরেই তাঁর লেখনী চির-বিশ্রাম লাভ করল—সাধক কবি তাঁর সঙ্গীত সাধনার ও কাব্য সৃষ্টির শেষ করে তাঁর ঈশ্বরের কাছে, তাঁর দয়ালের কাছে, তাঁর আনন্দময়ীর কোলে চিরতরে আশ্রয় নিলেন।

কান্তকবির কলম গেছে থেমে—কান্তকবির কণ্ঠ হয়েছে নীরব, কিন্তু তাঁর সৃষ্ট সঙ্গীত-সমারোহে সমৃদ্ধ হয়ে আছে বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার। কিন্তু সে সঙ্গীত কি আজ আর শোনা যায় না? সে সুর কি শেষ হয়ে গেছে? তার ঝঙ্কার কি হারিয়ে গেছে কালের কলরবে?—এ জিজ্ঞাসা রইল একালের গায়কদের কাছে, শ্রোতাদের কাছে, কবিদের কাছে, সাহিত্যিকদের কাছে, সুধীজনের কাছে!

সুর-শিল্পী, সঙ্গীত-স্রষ্টা, ভক্তসাধক কান্তকবি রজনী-কান্তের জন্ম-শতবর্ষ উদ্‌যাপিত হতে চলেছে। যাতে তা যথাযোগ্য ভাবে পালিত হয় এবং এযুগের প্রণাম ঐ প্রতিভাধর অনন্যসাধারণ সাধক ও স্রষ্টাকে আমরা যাতে যথোচিত ভাবে নিবেদন করতে পারি, তার ব্যবস্থা বঙ্গের সুধীজন-সমাজ করবেন বলেই আশা করি।
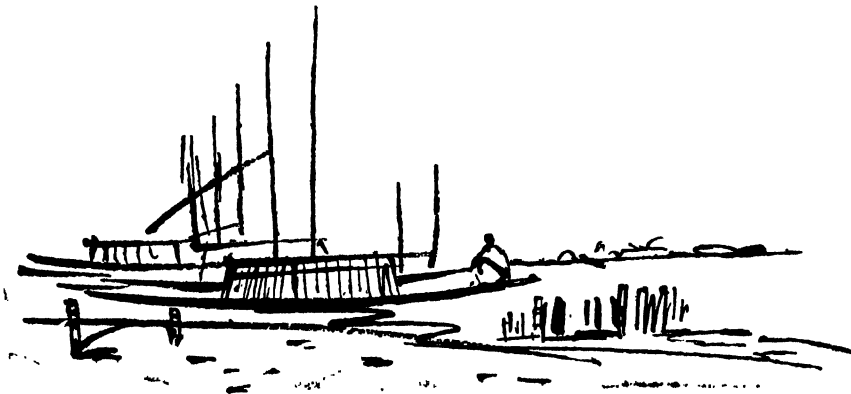
জল মাটির গন্ধ

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

১

রেলওয়ে ষ্টেশনটি খুবই ছোট। তিন কামরার একটি একতলা বাড়ি। তার মধ্যে ষ্টেশন মাষ্টার ছাড়া বোধ হয় দু তিন জনের বেশি লোক নেই বলে শুভ্রার মনে হল। এ ষ্টেশনে লোকজন নামলও কম। উঠল বোধ হয় জন কয়েক। তারপর পলক ফেলতে না ফেলতে ইলেকট্রিক ট্রেনখানা অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটি মনোরম দৃশ্য শুভ্রার চোখের সামনে ফুটে উঠল। অবারিত দিগন্ত ছোঁয়া সবুজ মাঠ। রেল লাইনের পাশে কয়েকটি খেজুর গাছ। আরও দুটি গাছ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। তাদের পাতার রঙও গাঢ় সবুজ। শুভ্রা তাদের নাম জানে না। কিন্তু এই শীতের দিনেও তাদের সতেজ দৃপ্ত ভঙ্গি চেয়ে দেখবার মত।

শুভ্রা তার পাশের বন্ধুটিকে বলল 'ভারি চমৎকার, নারে কেতকী?'

কেতকী হেসে বলল, 'তুই তো সেই ট্রেনে উঠেই চমৎকার চমৎকার করছিস। বাংলা দেশের গ্রাম শুধু ওপর থেকে চেয়ে দেখতেই ভালো। কিন্তু ভিতরে গিয়ে যদি অবস্থাটা একবার—। যাকগে আগে থেকেই তোর স্বপ্নভঙ্গ করতে চাইনে। তুই কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু প্রকৃতির শোভা দেখবি, না কি ইন্টারভিউ দিতে সত্যিই যাবি—তাই আগে ঠিক করে ফেল।

শুভ্রা বলল, 'বাঃ রে, নিশ্চয়ই যাব। নাই যদি যাব তো এলাম কেন।'

কেতকী বলল, 'তাহলে চল।'

প্লাটফর্ম থেকে বেরোতেই কয়েকটি রিক্সাওয়ালা এগিয়ে এল, 'আসুন দিদি-মণি···আমার গাড়িতে আসুন।'

কেতকী ও:দের ভিতর থেকে একটি শক্ত-সমর্থ যুবক ছেলেকে বেছে নিল।

'কুমারপুর যাব। এখান থেকে কত দূর?'

'মাইল দেড়েক হবে দিদি-মণি।'

'কত নেবে?'

'দশ আনা। বাঁধা রেট আমাদের।'

কেতকী ধমক দিয়ে বলল, 'ঈস্, বাঁধা রেট না আরো কিছু। ছ' আনার বেশি দিতে পারব না। যাবে তো চলো। নইলে আর একজনকে ডাকি।'

শেষ পর্যন্ত আট আনায় রফা হল। শুভ্রা ভিতরে ভিতরে লজ্জিত হচ্ছিল। একটু বা বিরক্ত। এত দর কষাকষিও করতে পারে কেতকী। ও যতটা না প্র্যাকটিক্যাল তার চেয়েও বেশি বিচক্ষণ বলে নিজেকে প্রমাণ করতে চায়।

কেতকীর সঙ্গে রিক্সায় উঠে বসল। শুভ্রা চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। নিচু সরু রাস্তা। বাঁ দিকে মাঠ। ডান দিকে গ্রাম। ঝোঁপ-ঝাড়ের মধ্যে ছোট ছোট মাটির বাড়ি। পাকা বাড়ি কদাচিৎ চোখে পড়ে।

রিক্সাওয়ালা বলল, 'আপনারা কি কুমারপুর স্কুলে যাচ্ছেন?'

কেতকী বলল, 'হ্যাঁ।'

'ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছেন বোধহয়।'

'হ্যাঁ। কেন বলতো। হাসছ যে তুমি?'

'যান। নিজেরাই গিয়ে দেখবেন।'

'কেন স্কুলের অবস্থা তেমন ভালো নয় বুঝি?'

'অবস্থা যে তেমন খারাপ তা নয়।'

'তবে?'

'টিচাররা এসে টিকতে পারেন না। দু-মাস চার মাস বাদে বাদেই এসে চলে যান।'

কেতকী বলল, 'কেন হেডমিস্ট্রেস কি খুব কড়া?'

'তিনি কত উদার তা জানিনে। তবে সেক্রেটারী—'

কেতকী বলল, 'তবে সেক্রেটারী কি?'

রিক্সাওয়ালা বলল, 'তিনি বড় বেশি দয়ালু আর উদার।'

কেতকী শুভ্রার দিকে তাকাল। তারপর হেসে বলল, 'শুনলি তো? এর পরেও যেতে চাস?'

শুভ্রা বলল, 'নিশ্চয়ই। আমি কি তোর মত ভীরু নাকি? কে কি বলল না বলল তাই শুনেই পালাব?'

কেতকী একটু হাসল, 'আমার মত কালো কুচ্ছিৎ মেয়ের ভয়ের কিছু নেই। ভয় তোদের মত সুন্দরীদের। সুন্দর মুখের জয় যেমন সর্বত্র, বিপদও তেমনি সর্বত্র।'

শুভ্রা বলল, 'থাক, তোকে আর বচন আওড়াতে হবে না। আচ্ছা একখানা ঠানদি হয়েছিস তুই।'

কেতকী বলল, 'এক কাজ করলে হয়না? তোর সার্টিফিকেট-টার্টিফিকেটগুলি আমাকে দে। আমিই শুভ্রা দত্ত চৌধুরী সাজি। আর তুই আমার বন্ধু কেতকী ভটচায হয়ে থাক। দুজনেই তো বাংলার এম-এ। জিজ্ঞাসাবাদ কিছু করলে একেবারে মৌনী বাবা হয়ে বসে থাকব না। তবে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে খোদ সেক্রেটারী মশাই-ই বোধ হয় মৌনী হয়ে যাবেন। আর পত্রপাঠ একেবারে দোর দেখিয়ে দেবেন। তাই না?'

শুভ্রা বলল, 'ঈস্, একেবারে বিনয়ের অবতার। কালো বলে তুই কি অতই খারাপ নাকি দেখতে? তা ছাড়া তুই তো আর আমার মত বেকার নোস। তুই এক বছর আগে পাশ করে বেরিয়েছিস, এক বছর আগে চাকরিতে ঢুকেছিস। তুই এখন সব দিক থেকেই আমার চেয়ে সিনিয়র।'

কেতকী হেসে বলল, 'শুধু একটা ব্যাপারে ছাড়া।'

শুভ্রা বলল, 'আহাহা।'

কেতকী বলল, 'আচ্ছা এস তো। দেখি গিয়ে সেক্রেটারী সাহেবের চেহারা-টেহারা কেমন। ধন-দৌলতের জোর কতখানি। তাই বুঝে তোর সঙ্গে ভাগ্য বদলাবার চেষ্টা করা যাবে।'

রিক্সা এসে একেবারে স্কুলবাড়ির সামনে থামল।

গাঁয়ের সরু ছোট্ট রাস্তাটি দক্ষিণ থেকে উত্তরে চলে গেছে। তারই ধারে একটি একতলা নতুন বাড়ি। সারি সারি আট দশখানা ঘর। দেখলেই স্কুল বলে চেনা যায়। তবে বাড়ির কাজ এখনো শেষ হয়নি। বাইরের দেয়ালগুলিতে এখনো পলেস্তারা পড়েনি। সম্পূর্ণ সাজানো গোছানো একটি বাড়ির চেয়ে এই অসম্পূর্ণ অগোছালো বাড়িটিই যেন বেশি ভালো লাগল শুভ্রার। বাঁদিকে বাঁখারির বেড়া ঘেরা অনেকখানি জায়গা। দু-ধারে মরশুমী ফুলের গাছ। মাঝখানে দুটি দোলনা আছে। বেশ বোঝা যায়—স্কুলের খেলার মাঠ কি পার্ক করা হয়েছে এটিকে।

রিক্সাওয়ালার ভাড়া চুকিয়ে দিল কেতকী। ব্যাগ থেকে পয়সা বের করে শুভ্রাই অবশ্য দিল বন্ধুর হাতে।

রিক্সাওয়ালা ছেলেটি বলল, 'আপনাদের কি খুব বেশি দেরি হবে? না ওয়েট করব আপনাদের জন্যে?'

হাফ-প্যান্ট হাফসার্ট পরা ছেলেটি। শুভ্রার মনে হল তাদের মত বাইশ তেইশ বছরই হবে বয়স। ভাব ভঙ্গিতে মনে হয় বেশ চালাক চতুর চৌখোস। এত বুদ্ধি নিয়েও সামান্য রিক্সা টানছে কেন কে জানে! ইচ্ছা করলেও তো আরো অনেক ভালো কাজ করতে পারত।

খবর পেয়ে এক ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন।

'এই যে আসুন আসুন। আপনারা কলকাতা থেকে এসেছেন?'

কেতকী বলল, 'হ্যাঁ। আমরা সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

ভদ্রলোক বিনীত ভাবে হেসে বললেন 'আজ্ঞে আমার নামই রাম গোপাল বসাক।' আমিই সেক্রেটারী—কথাটা আর ভদ্রলোক উচ্চারণ করলেন না।

কেতকী আর শুভ্রা দুজনেই নমস্কার জানাল।

বেশ সুদর্শন ভদ্রলোক। গায়ের রঙ স্বর্ণাভ। পরণে ধুতি। ভদ্রলোক বেশ লম্বা। গায়ে গেরুয়া রঙের খদ্দরের কোট। বয়স পঞ্চাশ পার হয়েছে। মাথার চুল বেশ কালো। শুধু কপালের সামনে একগুচ্ছ চুল হঠাৎ পেকে

উঠেছে। কিন্তু এই অসঙ্গতিটুকু তেমন খারাপ লাগল না শুভ্রার চোখে।

রামগোপালবাবু কেতকীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনিই কি শ্রীমতী শুভ্রা দত্ত চৌধুরী ?'

কেতকী একটু হেসে বলল, 'আপনার কি সত্যিই তাই মনে হয়েছে ?'

তারপর শুভ্রার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, 'আমি ওর বন্ধু। সঙ্গে এসেছি।'

রামগোপাল কেতকীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না। আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।'

কিন্তু শুভ্রার মনে হল ভদ্রলোক সত্যিই অত বোকা নন। নিশ্চয়ই কেতকীর সঙ্গে এই সুযোগে একটু কৌতুক করে নিলেন।

সেক্রেটারীর পিছনে পিছনে কোণের দিকের একটি ঘরে গিয়ে ঢুকল। আসবাবপত্র এখনো তেমন কেনা হয়নি মনে হল। নিতান্তই সাধারণ ধরণের একটি টেবিল। খান কয়েক চেয়ার। একটি পুরোন আলমারি দিয়ে স্কুলের অফিস ঘর সাজানো হয়েছে।

শুভ্রা ভেবেছিল সেক্রেটারী একাই বুঝি তার ইণ্টারভিউ নেবেন। কিন্তু তা নয়, ভিতর থেকে আরো দুটি মেয়ে এসে বসল। একজন কুমারী আর একজন বিবাহিতা। দুজনেরই বয়স পঁচিশ থেকে ত্রিশের মধ্যে হবে।

সেক্রেটারী তাদের সঙ্গে শুভ্রাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। 'মিস্ চিত্রা তালুকদার, মিসেস্ ইন্দিরা সেন। এঁরা কলকাতা থেকে ইণ্টারভিউ দিতে এসেছেন। আমরা আরো তিনজনকে ডেকে ছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই অজ পাড়া গাঁয়ে কেউ বোধ হয় আসতে ভরসা পান নি। শুধু আপনারাই—'

শুভ্রার দিকে চেয়ে রাম গোপাল একটু হাসলেন। তারপর শিক্ষিকা দুজনার দিকে চেয়ে বললেন, 'হেডমিষ্ট্রেস তো ছুটিতে আছেন। আপনারাই যা জিজ্ঞেস করবার করুন।'

চিত্রা আর ইন্দিরা লজ্জিত হয়ে বলল, 'সে কি! আপনি থাকতে আমরা আবার কি জিজ্ঞেস করব।'

রাম গোপালবাবু একটু হেসে বললেন' আমি জিজ্ঞেস করব ? আমি তো লোহা লকড়ের কারবার চালাই। আপনাদের শিল্প সাহিত্যের, শিক্ষা সংস্কৃতির কীই বা আমি বুঝি ? কতটুকু খোঁজই বা আমরা রাখতে পারি ?

শুভ্রার দিকে তাকিয়ে রামবাবু আরও একবার বিনীত মধুর ভঙ্গিতে হাসলেন, 'তাছাড়া জিজ্ঞেস করবার বিশেষ আছেই বা কি। আপনার অ্যাপলিকেশনেই তো আমরা সব জানতে পেরেছি। ডেকে ছিলাম আলাপ পরিচয় করবার জন্যে। তাছাড়া জায়গাটা আপনিও দেখুন। সুবিধে অসুবিধেটা বুঝে নিন। তারপর জয়েন করতে পারবেন কিনা বরং মন স্থির করে জানাবেন। সপ্তাহ-খানেকের মধ্যে আমাকে জানালেই হবে। এমন কিছু তাড়া নেই।'

শুভ্রা জিজ্ঞাসা করল 'আচ্ছা, আপনাদের ষ্টেশন থেকে এই স্কুল বোধহয় দেড় মাইল পথ ?'

রাম গোপালবাবু স্মিত মুখে প্রতিবাদ করে বললেন, 'কে বললে আপনাকে ? ওই রিক্সাওয়ালারা বুঝি ? ওরা বেশি ভাড়া আদায় করবার জন্যে অমন বলে থাকে। এক মাইলেরও কম রাস্তা, আমরা তো হেঁটেই যাতায়াত করি। আপনার পক্ষে তা হয়তো সম্ভব হবেনা। তবে আরও একজন টিচার কলকাতা থেকে আসেন। আপনি তাকে সঙ্গী হিসাবে পাবেন। রিক্সার সঙ্গেও মাসিক বন্দোবস্ত করে দেব। কোন অসুবিধে হবেনা। অবশ্য পাড়াগাঁয়ের অসুবিধেগুলি মেনে নিতেই হবে।'

কেতকী বলল, 'মাইনে ?'

রাম গোপালবাবু বললেন, 'মাইনে ?' আমাদের নতুন স্কুল। সবে এফিলিয়েশন পেয়েছে। তবে বোর্ডের যা নিয়ম কানুন আছে তা তো মানতেই হবে। সে দিক থেকে কোন অসুবিধে হবেনা।'

শুভ্রা বলল, 'আচ্ছা আমরা তাহলে—।

অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার কি—?

রাম গোপালবাবু হেসে বললেন, 'যেদিন এসে জয়েন করবেন সে দিনই পাবেন। কি চান তো আগেও পাঠিয়ে দিতে পারি। তার জন্যে ভাববেন না। আগে তো ওসব চিঠি পত্রের কোন বালাইই ছিল না আমাদের। এখন অবশ্য বাধ্য হয়ে একটু কেতাদুরস্ত হতে হয়েছে।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন রাম গোপালবাবু। চিত্রা আর ইন্দিরার দিকে চেয়ে বললেন, 'আচ্ছা, আমি তাহলে এগোই। আপনারা ওঁদের দুজনকে নিয়ে আসুন।

কেতকী বলল, 'সে কি, আমাদের আবার কোথায় যেতে হবে?'

রামগোপালবাবু বললেন, 'একটু কষ্ট করতে হবে। কাছেই বাড়ি। সেখানেই সামান্য চা-টার ব্যবস্থা করেছি।'

কেতকী শুভ্রার দিকে তাকাল। তার প্রশ্ন—এত আপ্যায়ন কিসের? এই অতিসৌজন্য কিসের লক্ষণ?

শুভ্রা সবিনয়ে স্মিতমুখে বলল, 'আপনার অত কষ্ট করবার দরকার ছিল না। কিন্তু যদি বলেন, তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের যেতে হবে।'

রামগোপালবাবু বললেন, এলে খুসি হব। অতদূর থেকে এসেছেন। ফিরতে ফিরতেও নিশ্চয়ই আপনাদের সন্ধ্যা হয়ে যাবে। অবশ্য এখন পর্যন্ত স্কুলের সঙ্গে আপনাদের কোন সম্পর্ক হয়নি। তবু আমাদের গাঁয়ের অতিথি হিসেবে এক কাপ করে চা খেয়ে যেতে নিশ্চয়ই তেমন কোন আপত্তি হবে না।'

এমন সৌজন্যে কে মুগ্ধ না হয়ে পারে? শুভ্রা স্মিতমুখে চুপ করে রইল।

ইন্টারভিউ দেবার অভিজ্ঞতা কলকাতায় আর তার আশেপাশের কয়েকটি স্কুলে এর আগে হয়েছে শুভ্রার। কিন্তু এমন সমাদর আর কোথাও পায়নি। এমন সৌজন্য আর কোথাও দেখেনি। চতুর রিক্সাওয়ালা ছেলেটির মন্তব্য মনে পড়ল শুভ্রার। এই শিষ্টাচার—এই মিষ্টি ব্যবহারের মূলে কি—'

হঠাৎ কেতকী অন্য দুটি টিচারের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা এ স্কুলের নাম নিরুপমা গার্লস হাইস্কুল কেন? নিরুপমা কার নাম?'

ইন্দিরা বলল, 'রামগোপালবাবুর স্ত্রীর।'

'তিনি কি আছেন?'

'না বছর পাঁচেক হল মারা গেছেন।'

কেতকী আবার শুভ্রার দিকে তাকাল।

ইন্দিরা বলল, 'দুটি মেয়ে আছে ছোট ছোট।'

'ঠাকুরমার কাছে থাকে। আমাদের স্কুলেরই ছাত্রী চলুন আমরা এগোই এবার।'

শুভ্রা বলল, 'চলুন।'

চেয়ার ছেড়ে সবাই উঠে পড়ল। [ক্রমশঃ

বর্ষা আরম্ভ—

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ প্রায় দুইমাসকাল পশ্চিমবঙ্গে বৃষ্টি হয় নাই। ফলে সর্ব্বত্র দারুণ জলাভাব এবং আউসধান ও পাটের ক্ষতি হইতেছিল। আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহে বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে এবং কয়েকদিন সদাসর্ব্বদা বৃষ্টির ফলে মানুষ বৃষ্টির অভাবে যেমন উত্যক্ত হইয়াছিল বৃষ্টিতেও তেমনি নানাভাবে বিপর্যস্ত হইয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পর পশ্চিমবঙ্গে ঘটা করিয়া প্রতি বৎসর বৃক্ষরোপণ উৎসব হইতেছে বটে কিন্তু যেভাবে নানা কারণে পুরাতন গাছ-গুলি ধ্বংস করা হইয়াছে উৎসাহ ও প্রেরণার অভাবে সেভাবে নূতন বৃক্ষ জন্মায় নাই। দেশবাসী কৃষি সম্বন্ধে যেমন প্রায় উদাসীন, নূতন ফলেরবাগান প্রভৃতি রচনায়ও তদপেক্ষা অধিক উৎসাহহীন। সারা পৃথিবীব্যাপী যান্ত্রিক সভ্যতা শিল্প নগরী সৃষ্টিতে সর্ব্বদাই আগ্রহশীল। খাদ্য উৎপাদনে অন্ততপক্ষে ভারতবর্ষে সেরূপ চেষ্টা এখনও আরম্ভ হয় নাই। আমরা কাগজে কলমে এ বিষয়ে যতই আন্দোলন করি না কেন সরকার পক্ষ হইতে নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সহিত এ বিষয়ে কাজ করা না হইলে দেশের খাদ্যাভাব কোনদিনই দূরীভূত হইবে না।

কেন্দ্রীয় সীমান্ত বাহিনী—

ভারতবর্ষের ১৩৫০ মাইল দীর্ঘ পাকিস্থানী সীমান্ত উপযুক্তভাবে রক্ষার জন্য এতদিন বিভিন্ন প্রদেশ কর্তৃপক্ষের উপর যে ভার প্রদত্ত ছিল তাহা নানা কারণে উপযুক্তভাবে পালন করা হয় নাই। এতদিনে কেন্দ্রীয় সরকারের এ বিষয়ে মনোযোগ গিয়াছে এবং কেন্দ্রের অধীনে দুইজন উচ্চস্তরের কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার বাহিনী গঠিত হইতেছে। গত ১৮ বৎসর ধরিয়া আমরা যে স্বাধীনতা ভোগ করিতেছি তাহার মূল্য নির্দ্ধারণের সময় সীমান্তবাসীদের দুঃখ-দুর্দ্দশা সর্ব্বদাই আমাদের ব্যথিত করে। ১৯৪৭ সালে ভারতকে দুইভাগে ভাগ করিয়া পাকিস্থান ও ভারতরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। আজও পর্য্যন্ত উভয় খণ্ডের সীমানা নির্দ্ধারিত বা চিহ্নিত হয় নাই। ফলে পাকিস্তানের উচ্ছৃঙ্খল শাসক সম্প্রদায় ও অধিবাসীরা সর্ব্বদাই শান্তিকামী ভারতরাষ্ট্রের উপর হামলা করিয়া ভারতরাষ্ট্রের অধিবাসীদিগকে বিপন্ন করিয়া থাকে। কাশ্মীর সমস্যার কথা এত অধিক আলোচিত হইয়া থাকে যে সে সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভাল। ১৮ বছরে কাশ্মীর সমস্যার মীমাংসা হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গ ও আসামকে ঘিরিয়া যে পূর্ব্ব পাকিস্থান রাজ্য আছে তাহার সীমানা সর্ব্বদাই অরক্ষিত। এত দীর্ঘ সীমান্ত সহজে রক্ষিত হইবার নহে। ফলে পশ্চিমবঙ্গ ও আসামকে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকিতে হয় ও পাকিস্থানী অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইতে হয়। অতি সত্বর সীমান্তবাহিনী গঠিত হইলে ভারতের লোক পাকিস্থানী অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিয়া শান্তিতে বসবাস করিতে পারিবে। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকার অতি-সত্বর সীমান্ত বাহিনী গঠন করিতে উদ্যত হওয়ায় আমরা আশান্বিত হইয়াছি এবং আমরা বিশ্বাস করি এ কার্য্যে যত অধিক অর্থব্যয়ই হউক না কেন তাহাতে কেহ আপত্তি করিবে না।

খাদ্য মূল্য বৃদ্ধি—

পশ্চিমবঙ্গে সরকারী চেষ্টা খাদ্য মূল্য বৃদ্ধি রোধ করিতে আদৌ সফল হয় নাই। সম্প্রতি রেশনের চাউলের দাম ও গমের দাম বর্দ্ধিত হইয়াছে। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার বারবার ঘোষণা করিতেছেন তাহাদের গুদামে ভারত-বাসীকে খাওয়াইবার জন্য প্রচুর চাউল ও গম মজুত আছে। সরিষার তেল লইয়া কয়েকমাস ধরিয়া ফটকা-বাজ ব্যবসায়ীরা খেলা করিয়াছে এবং তাহার ফলে সরিষার তৈল ব্যবহারকারী দরিদ্র জনসাধারণ নানাভাবে অনর্থক কষ্টভোগ করিয়াছে। ডাল লইয়াও ফটকাবাজী কম হয় নাই। সব ডালের দাম বাড়িয়াছে এবং ছোলা ও ছোলার

ডাল গত ৫।৬ মাস যাবৎ বাজার হইতে উধাও হইয়াছে। এখনও ছোলা বা ছোলার ডাল দুষ্প্রাপ্যই থাকিয়া গিয়াছে। মাছ লইয়া কারবারীদেব খেলার শেষ নাই। সরকার যে দাম স্থির করিয়া দেন সে দামে কোনদিনই বাজারে মাছ পাওয়া যায় না। অথচ সংবাদপত্রে নানা প্রকার বড় বড় বিবৃতি ছাপিয়া পশ্চিমবাংলার মৎস্য দপ্তর জনসাধারণকে সস্তায় মাছ খাওয়াইবার আশ্বাস দিয়া থাকেন। দুধ তো দুষ্প্রাপ্য, দাম দেড় টাকায় একসের। তাহাও ইচ্ছামত পাওয়া যায় না। দুধ সরবরাহের জন্য বহুসংখ্যক মোটা বেতনের কর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু কোন ফল হইতেছে না। সম্প্রতি ছানা সরবরাহ কমাইবার জন্য ও সেইভাবে দুধ সরবরাহ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সরকার সন্দেশের দোকান বন্ধ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। কি উপায়ে দুধের সরবরাহ বৃদ্ধি করা যায় সে বিষয়ে কাহারও চেষ্টা বা উৎসাহ নাই। বিভিন্ন প্রকারে ডালের চাষ বাড়াইবার জন্যও কোনরূপ সরকারী চেষ্টা দেখা যায় না। সরকারের এই নিষ্ক্রিয়তা দেশবাসী প্রত্যেক মানুষকে সরকারের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইতে বাধ্য করিতেছে। এই সমস্ত সমস্যার কথা আমরা বহুবার আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু তাহার কোন সুফল না দেখিয়া আমাদিগকে ক্রমে হতাশ হইতে হইতেছে।

পশ্চিমবঙ্গে অবাঙ্গালী—

সাধারণ নিয়মে পশ্চিমবঙ্গে লোক নিয়োগের সময় বাঙ্গালীদেরই অগ্রাধিকার দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ১৯৬৪ সালে পশ্চিমবঙ্গে সকল কারখানা, অফিস প্রভৃতিতে নূতন লোক নিয়োগের সময় অধিক সংখ্যায় অবাঙ্গলীকেই কাজ দেওয়া হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে অবাঙ্গালী কারখানা মালিকের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে এবং সে সকল কারখানায় বাঙ্গালী কেরাণী বা শ্রমিক অতি অল্পই চাকুরী পাইয়া থাকে। সত্য কথা যে, বাঙ্গালী অপেক্ষা অবাঙ্গালী কর্মীরা অধিক পরিশ্রম করে এবং কম ফাঁকি দেয়, কিন্তু তথাপি পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে বিভিন্ন রাজ্যে কর্মী নিয়োগের সময় যেমন নিজ নিজ রাজ্যের লোকদিগকে অধিক সুবিধা দেওয়া হয় পশ্চিমবঙ্গে কেন তাহা করা হইবে না তাহা বুঝা কঠিন। এ সমস্যা প্রত্যেক বাঙ্গালীকে চিন্তিত করিয়াছে। দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরীতেও বাঙ্গালী এখন আর সুবিধা পায় না। অবশ্য আইন করিয়া এ সমস্যার সমাধান করা হইবে না, তাহাতে প্রাদেশিকতা বাড়িয়া যাইবে। কাজেই পশ্চিমবঙ্গে যে সমস্ত অবাঙ্গালী কারখানা করিবে প্রথম হইতেই তাহাদের সহিত চুক্তি করিয়া অধিক সংখ্যায় বাঙ্গালী নিয়োগ না করিলে বাঙ্গালী জাতি কর্মের অভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। আমরা এ বিষয়ে আইনজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে চিন্তা করিতে ও এই সমস্যা সমাধানের উপায় স্থির করিতে আবেদন জানাই।

নূতন জে-পি—

২৪ পরগণা বারাকপুর মণিরামপুরের অধিবাসী ও কলিকাতা-১৪, ৩৮ মলঙ্গা সেনবাসী প্রসিদ্ধ সমাজসেবী

শ্রীতারাচরণ মুখোপাধ্যায়

শ্রীতারাচরণ মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক 'জষ্টিস অফ দি পিস' (জে-পি) মনোনীত হইয়াছেন। তিনি মধ্য কলিকাতার বহু শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য চর্চা ও সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত। ১৯৬৩ সালে ২৪ পরগণা জেলা কংগ্রেস বার্ষিক উৎসবে তাঁহাকে সম্মানিত

করিয়াছিলেন। আমরা শ্রীমান তারাচরণের দীর্ঘজীবন ও সাফল্য কামনা করি।

কলিকাতা কর্পোরেশন—

প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারে নূতন কলিকাতা কর্পোরেশন কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। কাউন্সিলরের সংখ্যা ৮০ হইতে ১০০ হইয়াছে এবং সমগ্র কর্পোরেশন এলাকা ১০০টি ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত হইয়া এক একজন কাউন্সিলর এক একটি ভাগে কার্য্যভার দেখিবার সুযোগ পাইয়াছেন। সহরে নানা কারণে পর্য্যাপ্ত জল সরবরাহের ব্যবস্থা নাই। প্রাথমিক শিক্ষা এখনও অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হয় নাই। সহরের যানবাহন সমস্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কষ্টদায়ক হইয়াছে। হাওড়ার পুলের কাছে নূতন পুল নির্ম্মাণ, সহরকে ঘিরিয়া সার্কুলার রেলপথ, বড় বড় জনবহুল রাস্তায় মাটির ভিতর দিয়া মানুষ চলাচলের সুড়ঙ্গপথ প্রভৃতির কথা শুনিয়া আমাদের দুঃখ কমে না। সকালে ও বিকালে নিজ নিজ কার্য্যে যোগদান করিতে প্রতিটি দরিদ্র মানুষকে অসহ্য দুঃখকষ্ট বরণ করিতে হয়। তাহা ছাড়া পথচারীদের কষ্টের সীমা নাই। পথ দিয়া চলিবার সময় এত অধিক স্থানে গর্ত্ত দেখা যায় যে কলিকাতা যে পৃথিবীর একটি বড় সহর একথা কিছুতেই মনে করা যায় না। কর্পোরেশনের নূতন কমিশনার নির্ব্বাচিত হইলে লোক মনে করিয়াছিল এর সুরাহা হইবে, কিন্তু তাঁহার পক্ষে কোন কাজই সম্পাদন করা সম্ভব হইতেছে না। এই সকল তো বড় সমস্যার কথা। সহরবাসীর ক্ষুদ্র সমস্যাগুলিও কম নহে। করের হার দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। কর্পোরেশনের কর্ম্মচারীর সংখ্যা অসংখ্যরূপ বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু সহরের অধিবাসীরা কোনই সুখ সুবিধা ভোগ করে না। বৃষ্টি হইলে পর পথ এমন ভাবে জলে ডুবিয়া যায় যে, পথচারীর দুঃখ দ্বিগুণ বাড়িতে থাকে। আমরা সামান্য কয়েকটি মাত্র অভাবের কথা এখানে উল্লেখ করিলাম। নবগঠিত কলিকাতা কর্পোরেশন অধিকতর উৎসাহের সহিত শহরবাসীর অভাব অভিযোগ দূর করিতে আগাইয়া আসিলে তবেই প্রাপ্তবয়স্কদের ভোট দাননীতি সার্থক রূপদান করিবে।

আজকের দিনে
ভানুমতীর খেলা

শিল্পী—পৃথ্বী দেবশর্ম্মা
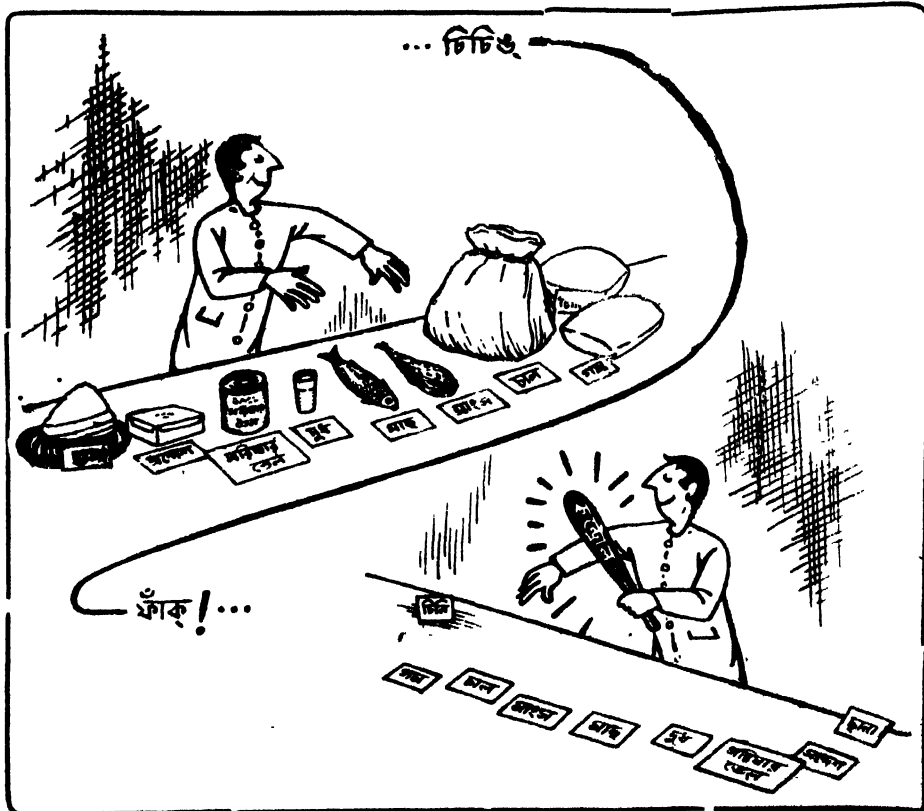
সম্পাদনা ঃ শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ ঃ

৬৫ সালের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগের খেলায় গত দু বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান ক্লাব লীগ তালিকার শীর্ষস্থান এখনও অধিকার ক'রে আছে —১৬টা খেলায় তাদের ৩১ পয়েণ্ট উঠেছে। তারা জজ্জ টেলিগ্রাফ দলের সঙ্গে গোলশূন্য অবস্থায় খেলা ড্র ক'রে একটা পয়েণ্ট যা নষ্ট করেছে। দ্বিতীয় স্থানে আছে ইস্টার্ণ রেলওয়ে—১৫টা খেলায় ২৩ পয়েণ্ট। এবং তৃতীয় স্থান মহামেডান স্পোর্টিং ১৪টা খেলায় ২১ পয়েণ্ট। বি এন রেলওয়ের খেলা আরম্ভ ভালই হয়েছিল। এক সময়ে (১২ই জুন) ৯টা খেলায় তাদের ১৬ পয়েণ্ট ছিল। কিন্তু আজ (৫ই জুলাই) বি এন রেল দলের ১৫টা খেলায় ২০ পয়েণ্ট—তারা ১০ পয়েণ্ট নষ্ট করেছে। ইস্টবেঙ্গল দল ১০টা খেলায় ১৬ পয়েণ্ট সংগ্রহ করেছে। গত ৪ঠা জুন রাজস্থান ইষ্টবেঙ্গল দলের খেলাটি খেলা ভাঙ্গার নির্দ্দিষ্ট সময়ের ১৪ মিনিট আগে সাধারণ দর্শকদের গ্যালারী এবং ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের সভ্যদের আসন থেকে মাঠের মধ্যে ইটপাটকেল পড়ার দরুণ বন্ধ হয়ে যায়। এই সময় রাজস্থান ক্লাব ১—০ গোলে অগ্রগামী ছিল। রেফারী কর্ত্তৃক ইষ্টবেঙ্গল দলের একটি গোল নাকচ করার ফলেই মাঠের মধ্যে এই হাঙ্গামা বেঁধেছিল। আই, এফ, এ-র লীগ সাবকমিটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাজস্থান ক্লাবকে ঐ দিনের অসমাপ্ত খেলার দু পয়েণ্ট বিতরণ করেন। প্রথম বিভাগের লীগ তালিকায় সর্ব্ব নিম্ন স্থানে রয়েছে নবাগত গ্রীয়ার স্পোর্টিং ক্লাব—১৫টা খেলায় মাত্র ৪ পয়েণ্ট। তারা এখনও কোন খেলায় জয় লাভ করতে পারেনি।

ইংল্যাণ্ড বনাম নিউজিল্যাণ্ড ঃ

বার্মিংহামের প্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ইংল্যাণ্ড ৯ উইকেটে নিউজিল্যাণ্ডকে পরাজিত ক'রে ১৯৬৫ সালের এই দুই দেশের টেস্ট সিরিজে ১—০ খেলায় অগ্রগামী হয়। পঞ্চম দিনে অর্থাৎ খেলার শেষ দিনে খেলা ভাঙ্গার নির্দ্দিষ্ট সময়ের চার ঘণ্টা আগে জয় পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

ইংল্যাণ্ড : ৪৩৫ রান (কেন ব্যারিংটন ১৩৭, কলিন কাউড্রে ৮৫ এবং টেড ডেক্সটার ৫৭ রান। ডিক মজ ১০৮ রানে ৫ এবং কলিঙ্গ ৬৩ রানে ৩ উইকেট)।

ও ৯৬ রান (১ উইকেটে। বারবার ৫১ এবং বয়কট নটআউট ৪৪ রান)

নিউজিল্যাণ্ড : ১১৬ রান (ডাউলিং ৩২ রান। টিটমাস ১৮ রানে ৪, কাটরাইট ১৪ রানে ২ এবং বারবার ৭ রানে ২ উইকেট)।

ও ৪১৩ রান (ভিক পোলার্ড নট আউট ৮১ এবং বার্ট সাটক্লিফ ৫৩ রান। বারবার ১৩২ রানে ৪, ট্রুম্যান ৭৯ রানে ৩ এবং টিটমাস ৮৫ রানে ২ উইকেট)।

এরপর লর্ডস মাঠের দ্বিতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ইংল্যাণ্ড ৭ উইকেটে নিউজিল্যাণ্ডকে পরাজিত করলে ইংল্যাণ্ড ১৯৬৫ সালের টেস্ট সিরিজে 'রাবার' জয় করে। এই সিরিজের তৃতীয় অর্থাৎ শেষ টেস্ট খেলায় ইংল্যাণ্ড পরাজিত হলেও ইংল্যাণ্ডের হাতেই 'রাবার' থেকে যাবে। এই নিয়ে ইংল্যাণ্ড এবং নিউজিল্যাণ্ডের মধ্যে ১২টি টেস্ট সিরিজ খেলা হল। টেস্ট সিরিজের ফলাফল দেখা যাচ্ছে ইংল্যাণ্ডের 'রাবার' জয় হয়েছে ৯ বার এবং টেস্ট সিরিজ অমীমাংসিত থেকেছে ৩ বার।

নিউজিল্যাণ্ড : ১৭৫ রান (ভিক পোলার্ড ৫৫ এবং ব্রুস টেলর ৫১ রান। রামসে ২৫ রানে ৪, টিটমাস ২৫ রানে ২, জন স্নো ২৭ রানে ২ এবং ট্রুম্যান ৪০ রানে ২ উইকেট)

ও ৩৪৭ রান (সিনক্লেয়ার ৭২, ডাউলিং ৬৬ এবং পোলার্ড ৫৫ রান। বারবার ৫৭ রানে ৩, স্নো ৫৩ রানে ২ এবং টিটমাস ৭১ রানে ২ উইকেট)

ইংল্যাণ্ড: ৩০৭ রান (কলিন কাউড্রে ১১৯, টেড ডেকস্টার ৬২ এবং মাইক স্মিথ ৪৪ রান। কলিন্স ৮৫ রানে ৪, মজ ৬২ রানে ২ এবং টেলর ৬৬ রানে ২ উইকেট)

ও ২১৮ রান (৩ উইকেটে। ডেকসটার নট আউট ৮০ এবং বয়কট ৭৬ রান। মজ ৪৫ রানে ৩ উইকেট।

ফাইনাল ফলাফল

পুরুষদের সিঙ্গলস: ১নং বাছাই রয় এমার্সন (অস্ট্রেলিয়া) ৬—২, ৬—৪ ও ৬—৪ গেমে ২নং বাছাই ফ্রেড স্টোলেকে (অষ্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস: ২নং বাছাই কুমারী মার্গারেট স্মিথ (অষ্ট্রেলিয়া) ৬—৪ ও ৭—৫ গেমে নং বাছাই কুমারী মেরিয়া বুনোকে (ব্রেজিল) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস: ২নং বাছাই টনি রোচ এবং জন নিউকম্ব (অষ্ট্রেলিয়া) ৭—৫, ৬—৩ ও ৬—৪ গেমে ৪নং বাছাই কেন ফেচার এবং বব্ হিউইটকে (অষ্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস: ২নং বাছাই মেরিয়া বুনো (ব্রেজিল) এবং বিলি জিন মোফিট (আমেরিকা) ৬—২ ও ৭—৫ গেমে অবাছাই জুটি এফ দুর এবং জে লিফরিগকে (ফ্রান্স) পরাজিত করেন!

মিক্সড ডাবলস: ২নং বাছাই কেন ফ্লেচার এবং কুমারী মার্গারেট স্মিথ (অষ্ট্রেলিয়া) ১২—১০ ও ৬—৩ গেমে অবাছাই টনি রোচ এবং কুমারী জে এম টেগার্টকে (অষ্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

উইম্বলডন্ লন্ টেনিস প্রতিযোগিতা:

১৯৬৫ সালের ৭৯তম উইম্বলডন লন্ টেনিস প্রতিযোগিতায় পাঁচটি খেতাবের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া চারটি খেতাব জয় ক'রে আন্তর্জাতিক টেনিস মহলে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছে। গত বছরও অষ্ট্রেলিয়া চারটি খেলায় জয়ী হয়েছিল। ১৯৬৪ সালের প্রতিযোগিতায় অষ্ট্রেলিয় মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব জয় করতে পারেনি; আলোচ্য বছরে অষ্ট্রেলিয়া মহিলাদের ডাবলস খেতাব হাতছাড়া করেছে। ১৯৬৫ সালের প্রতিযোগিতায় অষ্ট্রেলিয় পেয়েছে পুরুষদের সিঙ্গলস ও ডাবলস, মহিলাদের সিঙ্গলস এবং মিক্সড ডাবলস খেতাব। একই বছরে পুরুষ ও মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ের গৌরব অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে এ প্রথম। রয় এমার্সনের সিঙ্গলস খেতাব জয় লাভের ফ. প্রতিযোগিতার ইতিহাসে এ পর্যন্ত পাঁচজন খেলোয়াড় উপর্যুপরি দু'বছর পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব পী হলেন। আগের চারজন হলেন ইংল্যাণ্ডের ফ্রেড পেরী (১৯৩৪-৩৬—উপর্যুপরি তিনবার রেকর্ড), আমেরিকার ডোনাণ্ড বাজ (১৯৩৭-৩৮), অষ্ট্রেলিয়ার লুই হাড (১৯৫৬-৫৭) এবং রড লেভার (১৯৬১-৬২)।

১৯৬৫ সালের প্রতিযোগিতার ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার প্রাধান্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য—মোট পাঁচটি অনুষ্ঠানের মধ্যে চারটি অনুষ্ঠানের ফাইনালে খেলেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা এবং এই চারটির মধ্যে তিনটি অনুষ্ঠানের ফাইনালে কেবল অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন (পুরুষদের সিঙ্গলস, ও ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলসে)। মহিলাদের সিঙ্গলসের ফাইনালে অষ্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়ের বিপক্ষে ছিলেন ব্রেজিলের খেলোয়াড়। একমাত্র মহিলাদের ডাবলসের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কোন খেলোয়াড় পৌঁছতে পারেন নি।

১৯৬৫ সালের ফাইনালে ২নং বাছাই খেলোয়াড়রাই প্রাধান্য বিস্তার করেন। মোট পাঁচটি খেতাবের মধ্যে একমাত্র পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন একনম্বর বাছাই খেলোয়াড়। বাকি চারটি খেতাব পেয়েছেন ২নং বাছাই খেলোয়াড়রা।

সম্পাদকদ্বয়—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট), কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে ১০।৭।৬৫ তারিখে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বিকশিত চিত্র—রামকিঙ্কর

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ও

শ্রাবণ—১৩৭২

প্রথম খণ্ড | ত্রিপঞ্চাশত্তম বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

ঋগ্বেদে লিঙ্গদেবতার উপাসনা

শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্ত্তী এম-এ

লিঙ্গ বা চিহ্নদ্বারা দেবদেবীর উপাসনা ভারতে বহুকাল যাবতই চলিয়া আসিতেছে। সাল-তারিখের নিরিখে তাহা ধরা না গেলেও, এই প্রথা যে সুপ্রাচীন ঋগ্বেদীয় যুগ হইতেই চলিয়া আসিতেছে, ইহা প্রমাণ করিবার মত যথেষ্ট তথ্য ঋগ্বেদেই আছে। ঋগ্বেদ পৃথিবীর তাবৎ আর্য্যজাতির প্রাচীনতম গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত। সুতরাং এই ঋগ্বেদেই যদি লিঙ্গ বা চিহ্ন দ্বারা নানা দেবদেবীর উপাসনার উল্লেখ পাওয়া যায়, তবে লিঙ্গোপাসনা প্রথাটি যে অতি প্রাচীন আর্য্যপ্রথা, একথা অনস্বীকার্য্য হইয়া পড়ে। ভারতের জনসাধারণ লিঙ্গপূজা বলিতে লিঙ্গ বা চিহ্নরূপী শিব-শক্তির উপাসনাকে বুঝিলেও, ইহা বাস্তবিক পক্ষে অতি ব্যাপক। উপাস্য দেবতার প্রতিমা থাকুক, আর না-ই থাকুক, ঘট স্থাপন করিবার সময় ঘটে পুরুষ বা স্ত্রী-দেবতার একটি চিত্র সিন্দুর দিয়া আঁকিয়া দেওয়া হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে স্বস্তিক চিহ্ন বা ওঁ চিহ্নটিও প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তান্ত্রিক মতে উপাসনা বা যাগযজ্ঞের সময় তান্ত্রিক ত্রিকোণ-চিহ্ন বা অন্য কোন চিহ্ন বালির উপর অঙ্কিত করা হয়। এ সকলই যে লিঙ্গ বা প্রতীকোপাসনা, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

ভারতের হিন্দু-সাধারণ এই প্রথার উৎপত্তি কিভাবে

হইল, তাহা লইয়া বিশেষ মাথা না ঘামাইলেও, ভারতে চিহ্ন বা প্রতীকোপাসনার নানারূপ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ একদল বিদেশী গবেষক শিবলিঙ্গ উপাসনার প্রকৃত উৎস আবিষ্কারের চেষ্টায় বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই বেশ উৎসাহ দেখাইতে আরম্ভ করেন। ষ্টিভেনসন ও ল্যাসেন প্রমুখ কয়েকজন গবেষক প্রচার করিলেন যে লিঙ্গপূজা ঋগ্বেদে নিন্দিত হইয়াছে, এবং ইহা কোন আর্য্যপ্রথা হইতে পারে না। এই সঙ্গে ইহাও প্রচার করা হইল যে, শিব মূলতঃ অনার্য্য দেবতা; কারণ বিভিন্ন বৈদিক দেবতার মধ্যে একমাত্র শিব ও শিবানীই আর্য্য ও অনার্য্য, এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সমভাবে সমাদৃত। ঋগ্বেদে লিঙ্গপূজার নিন্দা আছে, ইহা প্রমাণ করা গেলে, শিব ও শিবানীকে অতি সহজেই অনার্য্য দেবতা বলিয়া সাব্যস্ত করা যায়। এই মহৎ প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি স্বরূপ ঋগ্বেদ হইতে সর্বশেষে দুইটি মন্ত্র বিশেষভাবে বাছিয়া লওয়া হইল, যেখানে "শিশ্নদেবাঃ" নামক একটি পদ বর্ত্তমান। ঋক্ দুইটিতে শিশ্নদেবগণের নিন্দাসূচক উক্তি আছে। এখন এই শিশ্নদেবাঃ পদের সহজতম অর্থ যদি করা যায়:—শিশ্নো দেবো যেষাং তে শিশ্নদেবাঃ, অর্থাৎ শিশ্ন বা জননেন্দ্রিয়ই যাহাদের দেবতা, তাহারা শিশ্নদেব, তবে কাজটি সহজেই সমাধা হইতে পারে। অন্য কোন বৈদিক গ্রন্থে অবশ্য এ জাতীয় কোন পদ বা উক্তি পাওয়া গেল না। তথাপি শিশ্নদেব নামক এই একটিমাত্র পদকে সম্বল করিয়াই প্রচারাভিযান চলিতে লাগিল। এই অভিযানের পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে এ্যাগেলিং, অফ্রেক্ট, মুর, বেবার, হপ্‌কিন্‌স্‌, কীথ প্রভৃতি মহারথিগণ যোগদান করেন, এবং এদেশে সম্ভবতঃ প্রখ্যাত গবেষক ডঃ রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরই সর্ব্বপ্রথম এই অভিমতটিকে সমর্থন করেন (তদ্রচিত Vaisnavism, Saivism and Minor Religious Systems নামক গ্রন্থের ১৬৩-৬৪ পৃষ্ঠা)। একটি মজার ব্যাপার এই যে, কোন বৈদেশিকপণ্ডিত হিন্দুধর্ম্ম বা হিন্দুজাতির ধর্ম্মগ্রন্থ বা অন্য কোন গ্রন্থ সম্পর্কে কোন অভিমত প্রদান করিলে, তাহা সাগ্রহে গ্রহণ করিবার লোকের অভাব এদেশে হয় না। পাশ্চাত্যের অতি-অনুরাগী একদল পণ্ডিত যেন বিলাতী টোপ গিলিবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিয়াই থাকেন। এক্ষেত্রে একটি মতবাদ প্রায় শতবৎসর ধরিয়া ক্রমাম্বয়ে জোর গলায় প্রচারের ফলে, ব্যাপার এই দাঁড়াইয়াছে যে, মূলতঃ যাহা ভ্রান্ত ও অসত্য, তাহাই এদেশে সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। পক্ষান্তরে যে পদটি লইয়া এই তুলকালাম কাণ্ড, প্রাচীনকালের বিভিন্ন প্রখ্যাত বেদাচার্য্য কর্তৃক বহু আলোচিত এই পদটির প্রকৃত অর্থ কি, তাহা নির্ণয় করিয়া, এই অপপ্রচারের প্রতিবাদ করিবার জন্য এদেশস্থ পণ্ডিতবর্গের মধ্যে অন্ততঃ একজনকেও পাওয়া গেলনা। পাওয়া গেলে দেখা যাইত যে, ব্যাপারটির মূলেই ভুল, এবং ইহার ষোলআনাই ভেজাল।

ঋগ্বেদ হইতে সূক্ত ও মন্ত্রবিশেষের উদ্ধৃতি সমগ্র বৈদিক সাহিত্যেই কমবেশী দেখা যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অন্য কোন বৈদিক গ্রন্থে এই শিশ্নদেব পদের উদ্ধৃতি বা অবস্থিতি নাই, বা তথাকথিত লিঙ্গ বা জননেন্দ্রিয় উপাসকগণের নিন্দাসূচক কোন উক্তিও নাই। আরও বিশেষভাবে লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, যে আচার্য্য বৌধায়ন তদীয় ধর্ম্মসূত্রে একমাত্র কুরু-পাঞ্চাল দেশ ব্যতীত ভারতের অপর প্রায় সকল প্রদেশের ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়গণের সামান্যতম ক্রটি-বিচ্যুতিও ক্ষমা করিতে পারেন নাই, সেই গোঁড়া ও অতিশয় উন্নাসিক বেদাচার্য্য বৌধায়নও শিশ্নদেবগণের সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব। সুতরাং এই একটিমাত্র যুক্তিতেই স্পষ্ট ধরিয়া লওয়া যায় যে, এ বিষয়ে পাশ্চাত্য মতের কোন ভিত্তিই নাই। ইহা মন-গড়া একটি মতবাদ মাত্র, এবং এই শিশ্নদেব পদের প্রকৃত অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন।

এই 'শিশ্নদেবাঃ' পদটি আচার্য্য যাস্কের (খৃঃ পূঃ ৭ম শতাব্দী) নিরুক্ত গ্রন্থের ৪।১৯ অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এবং ইহার অর্থ করা হইয়াছে "অব্রহ্মচর্য্যাঃ" বা ব্রহ্মচর্য্যবিহীন কামুক ও লম্পট শ্রেণীর লোক। এস্থলে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয়টি এই যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে কোন বৈদিকপদের অর্থ সম্পর্কে বেদাচার্য্য-মণ্ডলে মতভেদ থাকিলে, আচার্য্য যাস্ক তাহা যথাসম্ভব উদ্ধৃত করিয়াছেন। সে জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা একই বৈদিক পদের বিভিন্ন প্রকার অর্থ, এমন কি, ৬।৭টি পর্য্যন্ত অর্থও, নিরুক্তে দেখিতে পাই। এ ক্ষেত্রে কিন্তু একটিমাত্র ব্যাখ্যাই প্রদত্ত হওয়ায় এই সিদ্ধান্তটি অপরি-

হার্য্য হইয়া উঠে যে, অতীতকালে এই শিশ্নদেব পদটির এই একটিমাত্র অর্থই প্রচলিত ছিল। নিরুক্তের প্রাচীনতম ভাষ্যকার বলিয়া কথিত আচার্য্য স্কন্দস্বামীও শিশ্নদেবাঃ পদের ব্যাখ্যায় যাস্ক-কৃত অর্থটিকেই বহাল রাখিয়াছেন, এবং তৎপরবর্ত্তী ভাষ্যকার দুর্গাচার্য্যও এই পদে লিঙ্গ-সেবী কামুক বা বেশ্যাসক্ত লম্পটগণকেই বুঝিয়াছেন। শিশ্ন বা লিঙ্গশব্দের একটি অর্থ যে জননেন্দ্রিয়, এই সহজ কথাটি সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ প্রায় প্রত্যেক ভারতীয় হিন্দুই জানেন। অথচ বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষায় অতি কৃতবিদ্য নিরুক্তের ভাষ্যকারগণ, এমন কি, প্রখ্যাত বেদ-ভাষ্যকার আচার্য্য বেঙ্কটমাধব বা সায়ণাচার্য্য কেহই শিশ্নদেব পদের এই অতি সহজ অর্থটি ধরিতে পারিলেন না, ইহা কেমন কেমন মনে হয় না কি? আসলে, যে পদের যে অর্থ নয়, বা হইতে পারে না, সেই ব্যাখ্যা আসিবে কোথা হইতে?

এবার বহু ঢক্কা-নিনাদিত এই ঋগ্বেদীয় মন্ত্র দুইটির প্রকৃত অর্থ কি, তাহা আলোচনা করা যাইতে পারে। মন্ত্র দুইটি এরূপ :—

১। ন যাতব ইন্দ্র জুজুবুর্ণো ন বন্দনা শবিষ্ঠ বেদ্যাভিঃ।
ন শর্ধদর্যো বিষুণস্য জন্তোর্মা শিশ্নদেবা অপি
গুর্ঋতং নঃ॥ ঋগ্বেদ—৭।২১।৫

ভারতীয় ভাষ্যকারগণের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এই মন্ত্রটির বঙ্গানুবাদ হয় :—হে ইন্দ্র, তুমি সর্বাপেক্ষা বলশালী, রাক্ষসগণ যেন আমাদিগকে হিংসা না করে, অথবা প্রজাগণ হইতে আমাদিগকে পৃথকও না করে। ইন্দ্র বিষম জন্তুর বধে উৎসাহিত হউন, আর লিঙ্গসেবাপরায়ণ লম্পট-গণ যেন আমাদের যজ্ঞে বিঘ্ন উৎপাদন না করে।

২। স বাজং যাতাপদুষ্পদা যন্ত্‌ সর্বাতা পরি ষদৎ সনিষ্যন্।
অনর্বা যচ্ছতদুরস্য বেদো ঘ্নঞ্ছিশ্নদেবান্ অভি
বর্পসা ভূৎ॥ ১০।৯৯।৩

ইন্দ্র সুচারুগতিতে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন। তিনি সর্ব-বস্তুর দাতা, এবং যেন দান করিতে উদ্যত হইয়াই যুদ্ধে অবস্থান করেন। ইন্দ্র অবিচলিতভাবে শতদ্বার-বিশিষ্ট শত্রুপুরী হইতে ধন আহরণ করেন, এবং ইন্দ্রিয়-পরায়ণ দুরাত্মাদিগকে নিজতেজে পরাভব করেন।

পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন যে এই মন্ত্র দুইটিতে ইন্দ্রিয়-পরায়ণ রাক্ষস এবং শত্রুভাবাপন্ন লম্পট ও দুর্বৃত্তগণকেই উদ্দেশ করা হইয়াছে, লিঙ্গ বা চিহ্ন-উপাসকগণের কোন কথা এখানে নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, লিঙ্গ-পূজা ঋগ্বেদে নিন্দিত হয় নাই, বা ঐই নিন্দার কোন উল্লেখ পর্যান্ত ঋগ্বেদের কোথাও নাই। অন্য কোন সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্, শ্রৌত, গৃহ্য বা ধর্মসূত্র ইত্যাদি কোন গ্রন্থেই এই তথাকথিত জননেন্দ্রিয়-উপাসনার কোন কথা নাই। মতবাদটি একান্তভাবেই মনগড়া এবং বিশেষ কোন উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। একথা যদি বলা হইত যে, ঋগ্বেদের এই শিশ্নদেবাঃ পদটির যে অভিনব ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহার সঙ্গে ভারতীয় বেদাচার্য্যগণের ব্যাখ্যার কোন মিল নাই, এবং ইহা একান্তভাবেই একটি নূতন ব্যাখ্যা মাত্র, তবে অবশ্য ব্যাপারটি স্বতন্ত্র হইত। কিন্তু যে ভাবে আসল অর্থটিকে আড়ালে রাখিয়া, একটি সম্পূর্ণ নূতন এবং অপব্যাখ্যাকেই সত্য বলিয়া বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া চালাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহাতে বিস্ময়ে হতবাক্ হইতে হয়। সুতরাং জগৎকারণ ভগবান রুদ্র শিব ও তৎপত্নী জগন্মাতা রুদ্রাণী ভবানী, উভয়েই অনার্য্য দেবতা, এই ভ্রান্ত মতবাদের সমর্থন-সূচক কোন বেদ-মন্ত্রের উদ্ধারের অপচেষ্টার ফলেই যে ঋগ্বেদ হইতে এই মন্ত্র দুইটিকে বাছিয়া লওয়া হইয়াছিল, সে বিষয়ে আর সন্দেহের কোন অবকাশ থাকেনা। ইহারই নাম কি বৈদিক গবেষণা? আর ইহাই কি সত্য নিরূপণের উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার নমুনা! শুধুমাত্র ব্যাকরণ ও অভিধানের সাহায্যে দুরূহ বেদ-মন্ত্রের ঐতিহ্যপূর্ণ ব্যাখ্যা সম্ভবপর হইলে বিগত ৩০০০ বৎসরের মধ্যে ভারতে অন্ততঃপক্ষে ৩০০০ বেদ-ভাষ্যকারের অভ্যুদয় ঘটিতে পারিত, মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মাত্র নয়!

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, সম্ভবতঃ একজন মাত্র ভারতীয় গবেষক ব্যতীত অপর কাহাকেও এই ভ্রান্ত মতবাদের প্রকৃত উৎস অনুসরণের চেষ্টা করিতে এযাবৎ দেখা যায় নাই। বেদ-গবেষক বলিয়া যাঁহারা এদেশে সুপরিচিত, তাঁহাদের দৃষ্টি এদিকে বহু পূর্ব্বেই নিবদ্ধ হওয়া অতীব প্রয়োজনীয় ছিল, এবং তাহা হইলেও এই মিথ্যা ও অপপ্রচারে যথেষ্ট বিঘ্ন সৃষ্টি হইত; আর এই ভাবে

এই ভ্রান্ত মতবাদটি সুপ্রণালীতে, নানা পাঠ্য-পুস্তকে ও গবেষণা-মূলক গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়া, সার্বজনীন প্রচারলাভে সক্ষম হইত না। মূল সংহিতা-গ্রন্থ পাঠ না করিয়া, বা কেবল মাত্র বৈদেশিক অনুবাদ ও বৈদিক শব্দসূচী (vedic Index) জাতীয় গ্রন্থের উপর বেশী নির্ভরশীল হইয়া, যাঁহারা গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তাঁহারাই নিজেদের অজ্ঞাতসারে এদেশে এই একান্ত ভ্রান্ত ও অনিষ্টকর মতবাদের শ্রেষ্ঠ প্রচারযন্ত্রে পরিণত হইয়াছেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আর মূল গ্রন্থ পাঠ করিয়া যাঁহারা গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তাঁহারা জনকতক বিদেশী পণ্ডিতের ভয়ে এযাবৎ প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনে বিরত আছেন, ইহাও সত্যসত্যই অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। আমরা এই আশাই করিব যে, গবেষকগণ প্রকৃত সত্যনির্দ্ধারণে যত্নবান হউন, আর নির্ভীকভাবে সত্যপ্রকাশেও দৃঢ়ব্রত হউন।

ভারতীয় লিঙ্গোপাসনা মোটেই জননেন্দ্রিয়ের উপাসনা নয়। ইহা বিশেষ বিশেষ চিহ্ন-দ্বারা বিভিন্ন দেবতার উপাসনার নামান্তর মাত্র। ঋগ্বেদে এরূপ চিহ্ন বা প্রতীকের সাহায্যে নানা দেবদেবীর উপাসনার ভূরিভূরি দৃষ্টান্ত আছে। অথচ কোন বৈদেশিক বা ভারতীয় পণ্ডিতের রচিত বেদ সম্পর্কিত কোন গ্রন্থেই এই অতি মূল্যবান তথ্যটির উল্লেখ পর্য্যন্ত দেখা যায়না। ইংরেজ গবেষকগণের মধ্যে একমাত্র অধ্যাপক Macdonell-ই এ সম্পর্কে সামান্য ২।৪ লাইনে ইঙ্গিত মাত্র দিয়াছেন (Vedic Mythology, p. 155)। এবার আমরা ঋগ্বেদের কোন্ কোন্ সূক্ত ও মন্ত্র সম্পর্কে লিঙ্গদেবতার বা লিঙ্গরূপী দেবতার উপাসনার কথা বিভিন্ন বেদাচার্য্য কর্ত্তৃক নির্দ্দেশিত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

লিঙ্গ শব্দের তাৎপর্য্য

ব্যাকরণ শাস্ত্রে লিঙ্গ শব্দটি জাতি বা চিহ্নের দ্যোতক অর্থাৎ কোন প্রাণী বা বস্তু পুং-জাতীয় কি স্ত্রী-জাতীয়, অথবা ক্লীব-জাতীয়, লিঙ্গ শব্দে সাধারণতঃ তাহাই বুঝাইয়া থাকে। বৈদিক সাহিত্যে কিন্তু কোন দেবতার লিঙ্গ বুঝাইতে, সেই দেবতা পুরুষ কি স্ত্রী জাতীয়, তাহা বুঝায় না; অথবা সেই দেবতার জননেন্দ্রিয়কেও বুঝায় না; পক্ষান্তরে সেই দেবতার পরিচয়-জ্ঞাপক কোন বর্ণনা বা চিহ্ন বা প্রতীককেই মাত্র বুঝায়। আচার্য্য যাস্কের নিরুক্তে (১।১৭ প্রভৃতি অধ্যায়) এবং শৌনকীয় বৃহদ্দেবতায় (১।৮৬-৯০] আমরা কতকগুলি ঋগ্বেদীয় সূক্ত ও মন্ত্র সম্পর্কে ইন্দ্রলিঙ্গ, বায়ুলিঙ্গ, অগ্নিলিঙ্গ, সূর্য্যলিঙ্গ, অশ্বিনলিঙ্গ, সরস্বতীলিঙ্গ, বিশ্বলিঙ্গ, প্রভৃতি পদের সাক্ষাৎ পাই। এখানে লিঙ্গ শব্দটি সেই সেই দেবতা বা দেবতাগণের বিশেষ বিশেষ পরিচয়জ্ঞাপক বর্ণনা বা চিহ্ন বা প্রতীক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই সেই দেবতা পুরুষ অথবা স্ত্রী জাতীয়, সেই অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, বা তাঁহাদের জননেন্দ্রিয় সম্পর্কেও ব্যবহৃত হয় নাই। ঋগ্বেদীয় লিঙ্গদৈবত সূক্ত এবং মন্ত্রসমূহকেও ঠিক এই ভাবেই দেখিতে হইবে, সন্দেহ নাই। এই সকল সূক্ত ও মন্ত্রের বিশ্লেষণ কালে আমরা দেখিতে পাইব যে, ঋগ্বেদে সম্ভবতঃ এমন কোন প্রধান দেবতা নাই (পুরুষ ও স্ত্রী, উভয় জাতীয় দেবতা), বিশেষ চিহ্ন বা প্রতীকের সাহায্যে যাঁহার উপাসনা বৈদিক যুগে না হইত।

ঋগ্বেদের সূক্ত ও দেবতা

ঋগ্বেদে এক দেবতা, দুই দেবতা, কয়েকজন দেবতা, এবং বহু দেবতার স্তুতিমূলক অনেকানেক সূক্তই দেখা যায়। সাধারণভাবে বলিতে গেলে, বহু দেবতার স্তুতি-মূলক সূক্ত বা সূক্তাংশকেই বিশ্বদৈবত সূক্ত বা সূক্তাংশ বলা যায়। মুদ্রিত সকল সংস্করণেই প্রতিটি সূক্তের উপরের দিকে সূক্তের ঋষি, দেবতা বা দেবতাগণ, এবং মন্ত্রসমূহের বিশেষ বিশেষ ছন্দ ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া থাকে। এই পরিচয়-জ্ঞাপক সূত্রসমূহ হইতেই আমরা দেখিতে পাই যে, বিশেষ কতকগুলি সূক্ত ও সূক্তাংশকে লিঙ্গদৈবত আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, এবং এখানে কোন দেবতার নামের স্পষ্ট উল্লেখ নাই। অনুমান করিতে কষ্ট হয়না যে, বিভিন্ন ঋষি কর্ত্তৃক সূক্তসমূহ দৃষ্ট হইবার সময় হইতেই তাহাদের সঙ্গে দ্রষ্টাগণের নাম, উদ্দিষ্ট বিভিন্ন দেবতার নাম, এবং মন্ত্রসমূহে ব্যবহৃত ছন্দাদির নামও যুক্ত হইয়া আসিতেছে, এবং ক্রমে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বেদাচার্য্য-পরম্পরায় বাহিত ও লিপিবদ্ধ হইয়া আমাদের হাতে আসিয়াছে। বর্ত্তমান যুগে শৌনকীয় আর্ষানুক্রমণী, বৃহদ্দেবতা, ঋষ্যনুক্রমণী, ছন্দ-অনুক্রমণী ও আচার্য্য কাত্যায়ন-

ত সর্বানুক্রমণী প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে আমরা এই সকল তথ্য লিপিবদ্ধ দেখিতে পাই।

ঋগ্বেদের লিঙ্গদেবতা বা লিঙ্গোক্ত সূক্ত ও সূক্তাংশ

শৌনকীয় বৃহদ্দেবতা পাঠে জানা যায় যে, ঋগ্বেদের কোন্ কোন্ সূক্ত ও সূক্তাংশ লিঙ্গদৈবত বা লিঙ্গদেবতাগণের উদ্দেশে উদ্গীত, সে সম্পর্কে আচার্য্য যাস্ক (খৃঃ পূঃ ম শতাব্দী) ও শৌনক (খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী) ভিন্ন মত পোষণ করিতেন ; আর শৌনক এবং তৎপরবর্ত্তী আচার্য্য কাত্যায়নের (ঐ শতকের শেষ পাদ বা পরবর্ত্তী শতকের প্রথম পাদ) মধ্যেও কিছুটা মতভেদ ছিল, দেখা যায়। মোটামুটিভাবে আমরা দেখিতে পাই যে, ৪টি পূর্ণসূক্তে এবং অন্ততঃপক্ষে ১৬টি বিভিন্ন সূক্তাংশে এই লিঙ্গদেবতাগণের স্তবস্তুতি ও প্রশংসা করা হইয়াছে। বিষয়টি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বিধায় আমরা এখানে সংক্ষেপে এই সকল সূক্ত ও সূক্তাংশের বিবরণ প্রদান করিলাম :—

পূর্ণ-সূক্ত :—ঋগ্বেদ ৪।১৩ ও ৪।১৪ সূক্তদ্বয়। সূক্তদ্বয়ের ঋষি গৌতম বামদেব ; মুখ্য দেবতা অগ্নি বলিয়া মনে হলেও, উমা, অশ্বিদ্বয়, সূর্য্য, বরুণ, মিত্র, স্কন্ত, দ্যৌ ও পৃথিবী প্রভৃতি দেবতার নাম সূক্তদ্বয়ে উল্লিখিত আছে।

১০।১৬১—সূক্তের ঋষি যক্ষ্মনাশন প্রাজাপত্য (প্রজাপতি-পুত্র) ; দেবতাগণের মধ্যে ইন্দ্র ও অগ্নি, নিঋতি, এবং সবিতা ও বৃহস্পতি প্রভৃতির নাম আছে।

১০।১৮৪—ঋষি গর্ভকর্ত্তা ত্বষ্টা (বিশ্বকর্ম্মা), বিকল্পে বিষ্ণু-প্রাজাপত্য ; বিষ্ণু, ত্বষ্টা, প্রজাপতি, ধাতা, সিনীবালি, সরস্বতী, অশ্বিদ্বয় প্রভৃতি দেবতা।

সূক্তাংশ :—১।৩৫।১—সূক্তের ঋষি হিরণ্যস্তূপ আঙ্গিরস ; দেবতা অগ্নি, মিত্র, বরুণ, রাত্রি ও সবিতা।

১।৯৪।৮-১০ ও ১৬—ঋষি কুৎস আঙ্গিরস ; দেবতা—দেবগণ, অগ্নি, মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও দ্যৌ।

১।১১২।২৪-২৫—ঋষি পূর্ব্বোক্ত কুৎস আঙ্গিরস ; দেবতা—অশ্বিদ্বয়, মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও দ্যৌ।

১।১৩৬।৬-৭—ঋষি পরুচ্ছেপ দৈবদাসি (দিবদাস-পুত্র) ; দেবতা—রোদসী, (দ্যাবা-পৃথিবী), মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি, ভগ, সোম ও মরুদ্গণ।

২।৩২।৮ ঋষি গৃৎসমদ শৌনক ; দেবতা-গুংগু, সিনীবালি, রাকা, সরস্বতী, ইন্দ্রাণী ও বরুণানী। ইহারা সকলেই স্ত্রী দেবতা।

৫।২৬।৯ ঋষি আত্রেয়গণ (অত্রিবংশীয় কয়েকজন ঋষি), দেবতা মরুদ্গণ, অশ্বিদ্বয়, মিত্র, বরুণ ও সর্বদেবগণ।

৬।৪৭।২০ ঋষি গর্গ ; দেবতা—পৃথিবী, বৃহস্পতি, ইন্দ্র প্রভৃতি।

৬।৪৮।১৩-১৫ ঋষি শংযু বার্হস্পত্য (বৃহস্পতি বংশীয়), দেবতা—ইন্দ্র, বরুণ, অর্যমা, বিষ্ণু, মরুদ্গণ, পূষা প্রভৃতি। মন্ত্রে ঋষি ভরদ্বাজ ও ধেনুর উল্লেখ আছে।

৬।৭৫।১০, ১৭-১৯—ঋষি ভরদ্বাজ-বংশীয় পায়ু ; দেবতা—ব্রাহ্মণগণ, পিতৃগণ, সোম, পূষা, ব্রহ্মণস্পতি, অদিতি, বরুণ প্রভৃতি।

৭।৪১।১ ঋষি বসিষ্ঠ ; দেবতা অগ্নি, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অশ্বিদ্বয়, ভগ, পূষা, ব্রহ্মণস্পতি, সোম ও রুদ্র।

৭।৪৪।১ ঋষি পূর্ব্বোক্ত বসিষ্ঠ ; দেবতা—দধিক্রা, অশ্বিদ্বয়, উমা, অগ্নি, ভগ, ইন্দ্র, বিষ্ণু, পূষা, ব্রহ্মণস্পতি, আদিত্যগণ, দ্যৌ, পৃথিবী, অপঃ (জল) ও স্বঃ (স্বর্গলোক) ইত্যাদি।

১০।১৪।৬-৯ ঋষি মৃত্যু-দেবতা বৈবস্বত যম ; মন্ত্রদ্বয়ে অঙ্গিরাগণ, পিতৃগণ, অথর্বাগণ, ভৃগুগণ ও কয়েকজন পুণ্যবান রাজার এবং বরুণ দেবতার প্রশংসা করা হইয়াছে।

১০।১৭।৭-৯—ঋষি যম পুত্র দেবশ্রবস ; মন্ত্রে সরস্বতী ও পিতৃগণের প্রশংসা করা হইয়াছে।

১০।৫৯।৭ ঋষি গৌপায়ন ভ্রাতৃত্রয় (ঋষি অগস্ত্যের ভাগিনেয়), দেবতা অসু (প্রাণ), পৃথিবী, দ্যৌ, অন্তরীক্ষ, সোম (চন্দ্র), পূষা ও পথ্যাস্বস্তি বা পথ্যা ও স্বস্তি প্রভৃতি।

১০।৯৩।১ ঋষি নামের্ধ ; মন্ত্রের দেবতা দ্যৌ, বন্ধুগণ, পৃথিবী অশ্বিদ্বয় প্রভৃতি।

১০।১৬৭।৩ ঋষিদ্বয় বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি (জামদগ্ন্য পরশুরামের পিতা) ; দেবতা সোম (চন্দ্র), বরুণ বৃহস্পতি, অনুমতি, ইন্দ্র, ধাতা প্রভৃতি।

লিঙ্গদৈবত সূক্ত ও সূক্তাংশের বিশেষত্ব ও তাৎপর্য্য

এই লিঙ্গদৈবত সূক্ত ও সূক্তাংশ সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণী হইতে আপাতোঃদৃষ্টিতে এই কথাই সর্বপ্রথম মনে হইবে যে, ইহাদের মধ্যে এমন কোন বিশেষত্ব আছে, যেজন্য ইহাদিগকে লিঙ্গদৈবত সূক্ত ও লিঙ্গদৈবত মন্ত্র বলিয়া আখ্যাত করা হইয়াছে? যে সব দেবদেবী ঋগ্বেদের সর্বত্র সাধারণভাবে স্তুত হইয়াছেন, এক্ষেত্রেও তাঁহাদের অনেকেই বর্তমান; সুতরাং এই বিশেষভাবে চিহ্নিত-করণের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? একমাত্র নামের বিশেষত্ব ছাড়া আর কোন বিশেষত্বই হয়ত এখানে নাই; বরং এগুলিকে বিশ্বদেবসূক্ত বা সূক্তাংশ বলিয়াই প্রতীয়মান হইবে; কেন না কয়েকটি মাত্র ক্ষেত্র ছাড়া আর সব ক্ষেত্রেই একসঙ্গে বা পর্য্যায়ক্রমে বহু দেবদেবীর নাম পাওয়া যাইতেছে। আর সূক্তের আকৃতি-প্রকৃতি বা গঠন-প্রণালী এবং ছন্দের দিক হইতেও ইহাদের কোন বিশেষত্ব নাই। দুইটি ক্ষেত্রে (১০।১৪ ও ১০।১৭) অবশ্য পিতৃগণ ও স্বর্গত ঋষিগণের উল্লেখ আছে। কিন্তু স্বর্গত ঋষিগণ ও পিতৃগণের প্রশংসা-সূচক মন্ত্র ঋগ্বেদের অন্যত্রও দেখা যায়। সুতরাং এইদিক হইতে বিচার-বিবেচনা করিলেও তাহাদের বিশেষত্বের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। একথা অনস্বীকার্য্য যে, এই "লিঙ্গদৈবত" নামটি বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ; ততোধিক তাৎপর্য্যপূর্ণ হইল "লিঙ্গ" শব্দটি, যাহা লইয়া ইতিপূর্ব্বে বহু তাত্ত্বিক গবেষণা হইয়া গিয়াছে। অতএব নামের তাৎপর্য্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও, "লিঙ্গ" কথাটি যে ঋগ্বেদে নিন্দাসূচক কথা নয়, বরং সমুদয় প্রধান দেবদেবীর সম্পর্কেই প্রযুক্ত হইয়াছে, অন্ততঃপক্ষে এই বিশেষ তথ্যটি আমরা আপাততঃ পাইতেছি।

ইতিপূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছি যে, আচার্য্য যাস্ক ও শৌনক দেবতা সম্পর্কে প্রযুক্ত লিঙ্গ শব্দটির ব্যাখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু আচার্য্য যাস্ক এতৎপ্রসঙ্গে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে লিঙ্গদৈবত সূক্তের কোন উল্লেখ নাই। তথাপি তিনি লিঙ্গ শব্দের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহার মূল্য অপরিসীম। পরবর্ত্তী বেদাচার্য্য শৌনক অবশ্য বৃহদ্দেবতা গ্রন্থের বহু স্থলে লিঙ্গদৈবত সূক্ত ও সূক্তাংশের উল্লেখ করিলেও, লিঙ্গদৈবত শব্দটির প্রকৃত তাৎপর্য্য বা বিশেষত্ব কোথাও পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু অন্ততঃপক্ষে একটি স্থলে, যেমন ঋগ্বেদের ১।৯৪ সূক্তের উল্লেখকালে, তিনি সূক্তের ৮ম—১০ম ও ১৬শ মন্ত্রের অর্দ্ধাংশ, এই ৩½টি মন্ত্রে "দেবদেবাঃ" বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। ইহার অর্থ হইল এই যে, যে-যে দেবতার নাম এ সকল মন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই মন্ত্রসমূহের প্রকৃত দেবতা (বৃহদ্দেবতা—৩।১২৬)। আচার্য্য কাত্যায়নও তদ্‌রচিত সর্ব্বানুক্রমণী নামক গ্রন্থে এই ১।৯৪ সূক্তের উল্লেখকালে বলিয়াছেন, "লিঙ্গোক্ত-দেবতো যদ্দেবত্যং বা সূক্তম্," অর্থাৎ, যে সূক্তে উল্লিখিত সমুদয় দেবতাই সূক্তের প্রকৃত দেবতা, ইহা তাহাই। আচার্য্যদ্বয়ের মন্তব্য হইতে একটি বিষয় পরিষ্কার হইল যে, লিঙ্গোক্ত সূক্ত বা মন্ত্রে উল্লিখিত সকল দেবতাই প্রধান বা প্রকৃত দেবতা, কেহই অপ্রধান নহেন। ইহাতে সাধারণ শ্রেণীর মন্ত্র হইতে লিঙ্গোক্ত মন্ত্রের প্রভেদ সূচিত হয়। সাধারণ মন্ত্রে কোন কোন স্থলে একাধিক দেবতার উল্লেখ থাকিলেও, তাঁহাদের মধ্যে মাত্র ১টি কিংবা ২টিই প্রধান দেবতা, অন্য সব অপ্রধান। আচার্য্য শৌনকের ভাষায় ইহাদিগকে বলা হইয়াছে, "নিপাতেন যাঃ স্তুতাঃ," বা সাধারণভাবে মাত্র যাঁহাদের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, বা যাঁহারা স্তুত হইয়াছেন। যাস্কের নিরুক্ত হইতে এ প্রসঙ্গে দুইটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে [নিরুক্ত ১।১৭]:—যেমন (ক) ঋগ্বেদের "ইন্দ্রং ন ত্বা শবসা দেবতা বায়ুং পৃণন্তি রাধসা নৃতমাঃ"—৬।৪।৭, এই মন্ত্রাংশে ইন্দ্র ও বায়ু দেবতার নামের উল্লেখ থাকিলেও, মন্ত্রের প্রকৃত দেবতা হইলেন অগ্নি, ইন্দ্র বা বায়ু কেহই নহেন; আর (খ) ঋগ্বেদের "অগ্নিরিব মন্যো ত্বিষিতঃ সহস্ব সেনানীর্নঃ সহুরে হূত এধি"—১০।৮৪।২, এই মন্ত্রাংশের প্রকৃত দেবতা হইলেন মন্যু, অগ্নি নহেন। এখানে (ক) মন্ত্রাংশে ইন্দ্র ও বায়ু অপ্রধান, এবং (খ) মন্ত্রাংশে অগ্নি অপ্রধান বা প্রসঙ্গক্রমে উক্ত হইয়াছেন মাত্র (mentioned incidentally only—বৃহদ্দেবতার অনুবাদে prof. Macdonell]। কিন্তু লিঙ্গদৈবত সূক্ত ও মন্ত্রে উল্লিখিত সকল দেবদেবীই প্রধান বা প্রকৃত দেবতা। কিন্তু এই বিশেষত্ব বিশ্বদেব-সূক্ত সমূহেও দেখা যায়, এবং সেখানেও উল্লিখিত সমুদয় দেবতাই মুখ্য বা প্রধান; তাঁহাদের মধ্যে কেহই অপ্রধান

নহেন। সুতরাং এগুলিকে বিশ্বদেব সূক্ত বা সূক্তাংশ না বলিয়া লিঙ্গদৈবত বলা হইল কেন? একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় যে, লিঙ্গদৈবত মন্ত্রসমূহে প্রায়শঃ এই মন্ত্রে একসঙ্গে বহু দেবতার উল্লেখ বিদ্যমান; কিন্তু বিশ্বদেব সূক্তের মন্ত্রসমূহে এই বিশেষত্ব কয়েকটি মাত্র ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ (১ম মণ্ডলের কুৎস ঋষির দৃষ্ট বিশ্বদেব সূক্তসমূহ ইত্যাদি)। আরও একটি বিশেষত্ব লিঙ্গদৈবত সূক্তসমূহে লক্ষ্য করা যায়। প্রায়শঃ দেখা যায়, সূক্তের অন্যান্য মন্ত্রে যে যে দেবতার প্রশংসাসূচক বা প্রার্থনামূলক উক্তি আছে, ঠিক তাঁহারই সেই সূক্তের লিঙ্গদৈবত মন্ত্রসমূহে একই সঙ্গে বা পর্য্যায়ক্রমে পুনরাবির্ভূত হন। বিশ্বদেব সূক্তসমূহে এই বিশেষত্ব হয়ত অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাইবেনা।

অধ্যাপক Macdonell তৎপ্রকাশিত বৃহদ্দেবতা গ্রন্থে লিঙ্গদেবতা শব্দের অনুবাদ করিয়াছেন, "divinities mentioned by their characteristic names, or divinities expressed by name"। অধ্যাপক লক্ষ্মণ-স্বরূপ লিঙ্গ শব্দের অনুবাদ করিয়াছেন, characteristic mark" (তৎপ্রকাশিত নিরুক্তগ্রন্থের সূচী)। অধ্যাপক স্বরূপের অনুবাদই সঠিক বলিয়া মনে হয়। আমরা দেখিয়াছি যে, যাস্ক ও শৌনক দেবতার লিঙ্গ বুঝাইতে পরিচয়-জ্ঞাপক চিহ্ন বা প্রতীক বা বর্ণনা বা কোন বিশেষত্ব মনে করিতেন। সুতরাং লিঙ্গদৈবত সূক্ত বা মন্ত্রসমূহ কোন যজ্ঞকার্য্যে ব্যবহৃত বা উচ্চারিত হইবার সময় সম্ভবতঃ মন্ত্রসমূহে উল্লিখিত দেবতাগণের পরিচয়-জ্ঞাপক কোন কোন চিহ্ন বা প্রতীক ব্যবহার করা হইত। প্রতীকসমূহ ঠিক কি ধরণের ছিল, তাহার উল্লেখ না থাকিলেও, সঙ্গত কারণে ধরিয়া লওয়া যায় যে, এগুলি সম্ভবতঃ চিহ্নযুক্ত বা মার্কাযুক্ত হইত; এমন কি ক্ষেত্রবিশেষে দ্রব্য-নির্ম্মিত প্রতীক ও দেবতার পরিচায়ক চিহ্ন হিসাবে সম্ভবতঃ ব্যবহৃত হইত (Macdonell Vedic Mythology, page 155)। ঋগ্বেদেরই অন্ততঃপক্ষে ৭টি বিভিন্ন মন্ত্রে আমরা বিভিন্ন দেবতার ক্ষেত্রে "প্রতীকম্" বা প্রতীক শব্দটির প্রয়োগ লক্ষ্য করিয়া থাকি (ঋগ্বেদ ৬।৫০।৮, ৬।৭৫।১; ৭।৩।৬; ৭।৮।১; ৭।৩৬।১; ১০।৮৮।১৯ ও ১০।১১৮।৩।), এবং অন্ততঃপক্ষে একটি ক্ষেত্রে প্রতিমা বা প্রতিমূর্ত্তিরও ইঙ্গিত পাইয়া থাকি (ঋগ্বেদে ৪।২৪।১০)। আচার্য্য যাস্ক নিরুক্তের ৭।৩১ অধ্যায়ে ১০।৮৮।১৯ সংখ্যক মন্ত্রটির ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে প্রতীকস্ শব্দের অর্থ করিয়াছেন "রূপম্।" স্কন্দস্বামী ইহার ভাষ্য করিয়া লিখিয়াছেন "সাদৃশম্"। আচার্য্য সায়নও তদীয় ঋক্-ভাষ্যে এই অর্থই অনুসরণ করিয়াছেন দেখা যায়। সুতরাং ঋগ্বেদের যুগে যে দেবতার চিহ্ন-স্বরূপ প্রতীকের ব্যবহার হইত, ইহা অনস্বীকার্য্য। দেখা যায় যে, বর্ত্তমান যুগেও চিহ্ন বা প্রতীকের সাহায্যে অনেক দেবদেবীর পূজা হইয়া থাকে। মূর্ত্তি না থাকিলে শুধুমাত্র চিহ্ন বা প্রতীকেও পূজা হয়; আবার মূর্ত্তি থাকিলেও, ঘটের মধ্যে প্রতীক-চিহ্ন আঁকিয়া দেওয়া হয়। এই সকল প্রতীক-চিহ্ন নানা প্রকারের হয়। বলা বাহুল্য, এই ঐতিহ্য প্রাচীন বৈদিক রীতিরই ধারাবাহী মাত্র।

আচার্য্য সায়ন ঋগ্বেদের ভাষ্যকালে লিঙ্গদৈবত সূক্ত ও মন্ত্র সমূহের তাৎপর্য্য বা বিশেষত্ব ব্যাখ্যা না করিলেও, কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের ভাষ্যকালে ভরদ্বাজ নামক কোন এক বেদাচার্য্যের অভিমত উদ্ধৃত করিয়াছেন (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ-ভাষ্য, ২।৪।১, উপহোম নামক যজ্ঞের মুখবন্ধ)। আচার্য্য ভরদ্বাজ বলেন, "দেবতার লিঙ্গ বিবেচনায় উপযুক্ত মন্ত্রের প্রয়োগ করিতে হইবে। শ্রুতি ও স্মৃতির বিধান অনুযায়ী দেবতার লিঙ্গ বিচারপূর্ব্বক জ্ঞানিগণ (যাজ্ঞিকগণ) তাঁহাদের উদ্দেশে যথোপযুক্ত মন্ত্র প্রয়োগ করিয়া থাকেন। যে যে ক্ষেত্রে সেরূপ কোন বিধান বা বিনিয়োগ-বিধি না পাওয়া যাইবে, তথায় দেবতার লিঙ্গানুসারেই যথোপযুক্ত মন্ত্র প্রযোজ্য হইবে।" দেবতার লিঙ্গ বলিতে এখানেও পরিচয়-জ্ঞাপক চিহ্ন বা প্রতীকই বুঝাইতেছে, সন্দেহ নাই। নিঃসন্দেহে এখানে আচার্য্য যাস্ক ও শৌনকের অভিমতেরই সমর্থন পাওয়া যায়। এই আচার্য্য ভরদ্বাজ (ভরদ্বাজ গোত্রীয় অনামী কোন এক আচার্য্য) যাস্ক ও শৌনকের পূর্ব্ববর্ত্তী অথবা পরবর্ত্তী, তাহা সঠিক জানা না গেলেও, প্রখ্যাত বেদাচার্য্য হিসাবে তাঁহার অভিমত অবশ্যই প্রামাণ্য এবং গ্রহণযোগ্য।

ঋগ্বেদের যুগে লিঙ্গদেবতার উপাসনা

এই লিঙ্গদৈবত সূক্ত ও মন্ত্র সমূহের প্রকৃত তাৎপর্য্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও, এক্ষেত্রে ২টি বিষয় সুস্পষ্ট হইয়া

উঠে যে, (১) ঋগ্বেদীয় যুগের প্রথমাবধিই ভারতীয় আর্য্যসমাজে বিভিন্ন লিঙ্গদেবতার উপাসনা বলবৎ ছিল, (২) ঋগ্বেদে স্তুত প্রায় সমুদয় দেবদেবীরই পরিচয়-জ্ঞাপক লিঙ্গ বা প্রতীক-চিহ্ন আদিকাল হইতে বিদ্যমান ছিল। অনেক দেবতার এই পরিচয়-জ্ঞাপক প্রতীক নানা-ভাবে ও নানা-রূপে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, গৌতম বামদেব অঙ্গিরা-বংশীয় হিরণ্যস্তূপ ও কুৎস, গৃৎসমদ ও অত্রি-পুত্রগণ হইতে আরম্ভ করিয়া, গর্গ, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি প্রভৃতি অতি-প্রখ্যাত প্রাচীন ঋষিগণ সকলেই বিভিন্ন সূক্তে লিঙ্গদেবতাগণের স্তবস্তুতি করিয়াছেন। অধিকন্তু ঋগ্বেদের প্রখ্যাত দেবতাগণের মধ্যে অন্ততঃপক্ষে কয়েকজনকেও (যেমন প্রজাপতি পুত্র, ত্বষ্টা, বিষ্ণু প্রাজাপত্য, মৃত্যু-দেবতা যম ও তৎপুত্র দেবশ্রবা প্রভৃতি) আমরা লিঙ্গদেবতাগণের প্রশংসায় রত দেখিতে পাই। ইহাতে কি এই সিদ্ধান্তই অপরিহার্য্য হইয়া উঠে না যে, প্রথমাবধিই লিঙ্গদেবতার বা লিঙ্গরূপী দেবতার উপাসনা ও প্রশংসা দেবসমাজ ও আর্য্যসমাজে সমভাবে প্রচলিত ছিল? লিঙ্গরূপী দেবতার উপাসনা পুরাপুরিই একটি আর্য্যপ্রথা? সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই এই প্রশ্নটি মনে আসে, "ঋগ্বেদে লিঙ্গপূজা ধিকৃত হইয়া থাকিলে, ঋগ্বেদেরই অভ্যন্তরে লিঙ্গদেবতার স্তুতিমূলক এত এত মন্ত্র স্থান পাইল কি করিয়া"? প্রক্ষিপ্তবাদের কোন প্রশ্নই এখানে উঠিতে পারে না; কারণ মন্ত্রগুলি সংখ্যায় পর্য্যাপ্ত এবং ঋগ্বেদের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। আর আচার্য্য যাস্ক, শৌনক, কাত্যায়ন, ভরদ্বাজ প্রভৃতি ইহাদের সম্পর্কে কিছু কিছু আলোকপাতও করিয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ সাহিত্যের যত্রতত্র বিভিন্ন যজ্ঞকার্য্যে এই সমস্ত লিঙ্গদৈবত মন্ত্র প্রয়োগের নির্দেশ দেখা যায়।

ঋগ্বেদীয় লিঙ্গমন্ত্রে লিঙ্গদেবতা

ঋগ্বেদের খিলসূক্তসমূহেও লিঙ্গোক্ত দেবতাগণের উল্লেখ আছে। এই খিলসূক্তসমূহকে কেহ কেহ ঋগ্বেদের পরিশিষ্ট (Supplement or Appendix) বলিয়া মনে করিলেও, আসলে কিন্তু খিল মন্ত্রসমূহ পরিশিষ্ট মন্ত্র নয়, মূল ঋগ্বেদের অভ্যন্তরেই ইহাদের স্থান নির্দ্দিষ্ট। অনেকানেক খিল সূক্ত মূল সূক্তগুলিরই মত প্রাচীন বলিয়া বিশেষজ্ঞ-গণের বিশ্বাস। আর মর্য্যাদার দিক হইতেও ইহারা ন্যূন নহে; কারণ যাস্ক শৌণকাদি আচার্য্যগণ ইহাদিগকে ঋক্-মন্ত্র বলিয়াই আখ্যাত করিয়াছেন, কোন এক বিশেষ শ্রেণীভুক্ত বা অর্বাচীন মন্ত্র বলিয়া কোন ইঙ্গিত করেন নাই। খিলসমূহ ৫টি অধ্যায়ে বিভক্ত। খিলানুক্রমণীর মতে নিম্নোক্ত খিলসমূহে লিঙ্গদেবতার স্তুতি আছে :—

১ম অধ্যায়। ২য় সূক্ত। ৯ম মন্ত্র; ঋষি তার্ক্ষ্য সুপর্ণ।

ঐ । ৪র্থ „ । ৬ষ্ঠ মন্ত্রের অর্দ্ধাংশ, ঋষি ভারদ্বাজ (ভারদ্বাজ বংশীয়)।

ঐ । ৫ম „ । ১-৬; ঋষির স্পষ্ট উল্লেখ নাই; সম্ভবতঃ তিনি পূর্ব্বোক্ত ভরদ্বাজ

৩য় ঐ । ৮ম „ । ৫ম মন্ত্র; ঋষি পৃষধ্র বা প্রস্কণ্ব কাণ্ব।

৫ম „ । ৫ম „ । ১-১১; সমগ্র সূক্ত, দেবতা অগ্নি। ইহা নিবিদ্ মন্ত্র।

ঐ „ । ৭ (২)—সমগ্র মন্ত্র; ইহা প্রৈষ মন্ত্র।

উপসংহার

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, অনেকানেক পণ্ডিত ব্যক্তি ঋগ্বেদের দেবতা ও ধর্ম্ম সম্পর্কে নানা গবেষণামূলক মূল্যবান্ গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেও এই লিঙ্গোক্ত দেবতাগণের ব্যাপারে সকলেই এক অবিশ্বাস্য নীরবতা অবলম্বন করিয়াছেন, দেখিতে পাই। যাঁহারা বেদালোচনায় সারা-জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, তাঁহাদের দৃষ্টিতে যে এই লিঙ্গোক্ত দেবতা বা লিঙ্গদেবতাগণের অবস্থিতি ধরা পড়ে নাই, এমন কথা কিছুতেই বলা যায় না। তবে তাঁহারা এই ব্যাপারে নীরব রহিলেন কেন? সম্ভবতঃ তাঁহারা ব্যাপারটিকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচনা করেন নাই। কিন্তু ইহাও দেখা যায় যে, ঋগ্বেদের আনাচে-কানাচে কোথাও কোন সামান্য বিষয়ের উল্লেখ থাকিলে, তাহার আলোচনা সবিস্তারে করা হইয়াছে; অথচ ঋগ্বেদেরই অভ্যন্তরে ন্যূনপক্ষে ২৬টি বিভিন্ন সূক্তে যে সকল লিঙ্গরূপী দেবতার স্তবস্তুতি ও প্রশংসা করা হইয়াছে, তাঁহাদের কোন উল্লেখ পর্য্যন্ত নাই। তাই এই অনুল্লেখটিকে ঠিক যেন সহজভাবে গ্রহণ করা যায় না। এমনও হইতে পারে যে, যাঁহাদের নজরে বিষয়টি ধরা পড়িয়াছে, এবং যাঁহারা বিষয়টির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্যও অনুধাবন করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা এ সম্পর্কে নীরব থাকাটাই

হয়ত বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করিয়াছেন ; নতুবা হয়ত অনেকেরই অসন্তুষ্টির কারণ ঘটিতে পারিত। লিঙ্গ-পূজা ঋগ্বেদসম্মত প্রথা নয়, আর লিঙ্গ-রূপী শিবও আদিতে অনার্য্য-পূজিত দেবতাই ছিলেন,—পরবর্ত্তীকালে আচার্য্য-গণের স্বীকৃতি লাভ করতঃ আর্য্যসমাজে স্থান পাইয়াছিলেন, —এই ভ্রান্ত মতবাদের যাঁহারা ধারক ও পরিপোষক, তাঁহারা ঋগ্বেদে এই লিঙ্গরূপী দেবতাগণের অবস্থিতির বিষয়টিকে সম্ভবতঃ খুসী মনে গ্রহণ করিতেন না ; সুতরাং গবেষকগণের পক্ষে এই ব্যাপারে নীরবথাকাটাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ও নিরাপদ পন্থা বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। কিন্তু বেদে শিব নামের উল্লেখ নাই বলিয়া যাঁহারা প্রচার করিয়া থাকেন, তাঁহারা সম্ভবতঃ জানেন না যে, অন্যান্য বেদের কথা ছাড়িয়া দিলেও, একমাত্র ঋগ্বেদেরই অন্ততঃ-পক্ষে ৯টি বিভিন্ন মন্ত্রে "শিব" নামের স্পষ্ট উল্লেখ আছে ; আর আছে নানা মন্ত্রে শিবের রুদ্র, ঈশ, ঈশান, ভব, উগ্র, বামদেব, নীললোহিত, দেবদেব, মহাদেব প্রভৃতি অতি প্রসিদ্ধ নামের ভূরিভূরি প্রয়োগ। লিঙ্গরূপী দেবতার উপাসনা একমাত্র শিব-শিবানীর ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, বাস্তবে ইহা অতি ব্যাপক ; সমুদয় দেবদেবীর ক্ষেত্রেই প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া আজও পর্য্যন্ত চিহ্ন বা প্রতীকের সাহায্যে পূজা-উপাসনার পদ্ধতি বলবৎ আছে। লিঙ্গরূপী দেবতার উপাসনাকে জননেন্দ্রিয়ের উপাসনা কিছুতেই বলা যায়না। ভ্রান্ত বৈদেশিক ব্যাখ্যা গ্রহণের ফলে, এদেশে পণ্ডিতসমাজেও এই মতবাদ চালু হইয়াছে যে, লিঙ্গদেবতার উপাসনা প্রকৃত প্রস্তাবে জননেন্দ্রিয়েরই উপাসনা মাত্র। যদি তাহাই সত্য হইত, তবে সমগ্র বৈদিক ভারত ঋগ্বেদীয় বিভিন্ন পুরুষ ও স্ত্রী দেবতার জননেন্দ্রিয়ের মূর্ত্তিতে আকীর্ণ হইয়া যাইত, এবং তাহার জের আজও পর্য্যন্ত বজায় থাকিত। জগৎকারণ শিব-শিবানী সম্পর্কে যে বিশেষ প্রতীক চিহ্নটি সুপ্রাচীনকাল হইতে ভারতে চলিয়া আসিতেছে, তাহারও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা চতুর্বেদে এবং সমগ্র বৈদিক ও পৌরাণিক সাহিত্যে বহু-ক্ষেত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ইহা আলোচ্য বিষয় নহে।

ঋগ্বেদের এই উপেক্ষিত লিঙ্গদৈবত সূক্ত ও মন্ত্রসমূহের প্রতি আমরা এতদ্দেশীয় পণ্ডিতবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। হিন্দুধর্ম্মের দিক হইতে বিষয়টি নিঃসন্দেহে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ, এবং ইহার যথোচিত আলোচনাও সবিশেষ বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করি। বিষয়টির সঙ্গে হিন্দু-সমাজে প্রচলিত লিঙ্গোপাসনার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। আমরা ইহাও বিশ্বাস করি যে, বিষয়টির উপযুক্ত প্রচার এবং প্রসার হইলে ভারতে লিঙ্গরূপী দেবতার আদি ইতি-হাসের অন্ধকার দূরীভূত হইবে, এবং একটি বহু বিতর্কিত ব্যাপারের ও তৎসম্পর্কিত একটি অতি ভ্রান্ত ও অনিষ্টকর ধারণার উপরও যবনিকাপাত হইবে।

অতীতে সংস্কৃতভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত সমাজে হিন্দুধর্ম্মের নানা দিক লইয়া যত আলোচনা ও গবেষণা হইয়াছে, এত ব্যাপক আলোচনা সম্ভবতঃ পৃথিবীর অন্য কোনও জাতির ধর্ম্ম লইয়া হয় নাই। গবেষণা কার্য্য সঠিক পথে পরিচালিত হইলে অবশ্য ব্যাপারটি অত্যন্ত গৌরবেরই হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই আলোচনা ও ইঙ্গিত ভুল-পথের নিশানা দিয়াছে। ধর্ম্মীয় ব্যাপারে ধার-কর্জের প্রশ্ন আসে না বা আসিতেও পারে না, বিশেষতঃ বিপরীত-মুখী ধর্ম্মের ব্যাপারে। মুসলমান আমলে অনেকেই প্রয়োজন-বোধে মুসলমানী পোষাক-আসাক পরিধান করিতেন, যেমন এ যুগের অনেকেই ইউরোপীয় পোষাক ও খানা-পিনার প্রতি অনুরাগশীল। কিন্তু ইস্‌লামী পোষাকধারী কয়জন হিন্দু সে যুগে প্রার্থনা জানাইবার জন্য মস্‌জিদে যাইতেন, বা এ যুগেরই কয়জন ইউরোপীয় পোষাকধারী হিন্দু গীর্জায় যাইয়া থাকেন, তাহার কোন হিসাব বা প্রমাণ কেহ দিতে পারেন কি ? কোন একটি ধর্মীয় প্রথা কোন এক সমাজে প্রচলিত থাকিলে, তাহার প্রভাব যে পার্শ্ববর্ত্তী সমাজের উপর পড়িবেই, তাহারও কোন প্রমাণ বা নজীর আছে কি ? ধর্ম্মান্তরগ্রহণ সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। কিন্তু ভারতীয় সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমান সমাজ যে কোন ভাবেই হউক, হিন্দুর পূজা পদ্ধতির কোন কিছু গ্রহণ করিয়াছেন কি ? সেইরূপ সংখ্যালঘিষ্ঠ ভারতীয় খৃষ্টানগণও হিন্দু সমাজ হইতে ধর্ম্মীয় ব্যাপারে বিগত ১৫০০ বৎসরের অধিককালের মধ্যে কোন কিছু গ্রহণ করিয়াছেন কি ? পাশ্চাত্যের বহু-বহু পণ্ডিতব্যক্তি সুপ্রাচীন বৈদিক আর্য্য-ধর্ম্ম সম্পর্কে এ শ্রেণীর বহু ভুল ও অনৈতিহাসিক মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এবং এতদ্দেশীয় পণ্ডিত সমাজের কেহ

কেহ তাহা প্রায় বিনাবিচারে সত্য বলিয়া গ্রহণও করিয়াছেন দেখিতে পাই। বাস্তব ইতিহাস বা সত্যের সঙ্গে ইহার কতটুকু সম্পর্ক আছে?

দুষ্প্রাপ্য বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্যের মুদ্রণ, প্রকাশন ও প্রচারের ব্যাপারে পাশ্চত্যদেশীয় পণ্ডিতবর্গের অবদান অনস্বীকার্য্য। কিন্তু এই প্রশংসনীয় কার্য্যের সবটুকুই যে পরহিতব্রতে বা নিঃস্বার্থভাবে নিয়োজিত হইয়াছে, ইহাও স্বীকার করা যায় না। নেহাৎ বিদ্যাচর্চ্চার উদ্দেশ্যে যে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল, পরবর্ত্তীকালে সেখানে রাজনীতির প্রবেশ ঘটে, এবং এই রাজনীতিই সত্য ও নিরপেক্ষ মত প্রকাশের উপর অন্যায় প্রভাব বিস্তার করে। এ কারণেই, পাশ্চাত্যদেশীয় পণ্ডিতবর্গ অতুলনীয় প্রতিভার অধিকারী হইলেও, হিন্দু-ধর্ম্মমত সম্পর্কে তাঁহাদের মত বহু ক্ষেত্রেই পক্ষপাত মুক্ত নয়, এবং সিদ্ধান্তসমূহও নির্ভুল এবং ইতিহাসসম্মত নয়। পরনির্ভরতা ছাড়িয়া এতদ্দেশীয় পণ্ডিত সমাজকেই ধর্ম্মও সাহিত্যসম্পর্কিত প্রকৃত সত্যের সন্ধান করিতে হইবে; নতুবা আমাদিগকে অন্ধকারেই পথ হাতড়াইয়া বেড়াইতে হইবে। ভাবাবেগে তাড়িত হইয়া কেহ কেহ অবশ্য বলিয়া থাকেন যে, পাশ্চাত্য-সমাজ দৃষ্টি না দিলে বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্য এদেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইত। ইহা নিছক অতিশয়োক্তি বা চাটুকারিতা মাত্র, সন্দেহ নাই। যে সকল দেশ পাশ্চাত্য সমাজের নেকনজরে পড়িবার সৌভাগ্য অর্জন করিতে পারে নাই, সে সব দেশের প্রাচীন সাহিত্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে বলিয়া শুনি নাই। যে যুগে বিধর্ম্মীয় পুঁথিপত্র পুড়াইয়া নিশ্চিহ্ন করাকে অতি পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া ফতোয়া জারি করা হইত, ভগবানের অলঙ্ঘনীয় বিধানে সেই যুগেই দক্ষিণ ভারতে বৈদিক সাহিত্যের চর্চ্চা দ্বিগুণ উৎসাহে আরম্ভ হইয়াছিল, এবং সেই যুগেই অধিকাংশ বৈদিক গ্রন্থের ভাষ্যসমূহও রচিত হইয়াছিল।

সিন্ধু ও বিন্দু

যূথিকা দাস

সুবিশাল সিন্ধু বক্ষে
আমি বিন্দু ভাসি—
না জানি জীবন অর্থ
কেন যাই আসি।
বুদ্ বুদ্ সম আমি
ভাসি অনুক্ষণ
অসংখ্য যে সঙ্গী মোর
জীবন মরণ।
সকলের এক গতি
এক পরিণতি
আত্ম দম্ভে তবু ভাবি
কে করে মোর ক্ষতি।
কত যে বড়াই মোর
কত অহঙ্কার

সম্মুখে যদিও দেখি
মৃত্যু অনিবার।
একটি তরঙ্গে করে
অজস্রের নাশ—
তবু বক্ষে ধরি কত
স্বপনের ফাঁস।
কত সে বঞ্চনা তবু
মরীচিকা পানে
নিয়ত ধায় মন
কথা নাহি শুনে
অপলক নেত্রে শুধু
পলক ফেলিতে
কখন যে মিশে যাই
মহা-সিন্ধু সাথে।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তিন

(অসিত আর একটু কফি ঢেলে নিয়ে ব'লে চলল) গল্প সুরু করার আগে পটভূমিকার একটু খবর দেওয়া দরকার। পয়লা নম্বর: আমি বাসন্তীপুরে যে-সময়ে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম সে-সময়ে মহারাজ সুজনদেব প্রবাসে—তাঁকে রাজাসাহেব বলত সবাই, আমিও বলব। তিনি গিয়েছিলেন বিলেত। বিখ্যাত সেণ্টবর্গীয় থেরেসা নয়মানের প্রতি সপ্তাহে সমাধিতে খৃষ্ট দর্শন হয়, হাত পা ফেটে রক্ত পড়তে থাকে—তোমরা যাকে বলো ক্রসের Stigmata—তাকে দর্শন ক'রে ইতালি ও স্পেনে কয়েকটি ক্যাথলিক মঠ দেখে তাঁর ফিরবার কথা মাস তিনেক পরে। কাজেই আমার সুবিধা হ'য়ে গেল—আমি সকাল সন্ধ্যা পীতবাসের ওখানে হানা দিতাম গান শিখতে। রাজাসাহেব থাকলে তো সন্ধ্যায় শেখা হ'ত না—তিনি যে সন্ধ্যায় তাঁর সভাগায়কের গান শুনতেন। মন্ত্রী সাহেবকে তখনো আমি চোখে দেখিনি। বাংলোটি ভাড়া নিয়ে পীতবাসের প্রতিবেশী হ'য়ে বসেছি।

একদিন সকালবেলা পীতবাসের বৈঠকখানায় গিয়ে বসতেই পাশের বারান্দা থেকে দুটি বামাকণ্ঠের স্বর ভেসে এল। কল্পনা তো ছিল, তাই দুই আর দুয়ে চার জুড়ে সিদ্ধান্ত করতে বিলম্ব হয়নি যে, তাঁরা মন্ত্রী সাহেবেরই আত্মজা। কারণ পীতবাসের কাছে শুনেছিলাম যে মন্ত্রী-কন্যা দুটি তাঁর কাছে মাঝে মাঝে গান শেখে। আমি যখন পীতবাসের কাছে শেখা প্রথম সুরু করি সে-সময়ে তাঁরা মার সঙ্গে ছিলেন কাশ্মীরে। দুচার দিন আগে শুনেছিলাম সুষমাদেবী কাশ্মীর থেকে সোজা যাবেন ইংলণ্ডে কি একটা নারী সম্মেলনে—বাসন্তীপুরে মেয়ে দুটিকে পাঠিয়ে। এর পরে ওঁদের সনাক্ত করতে বেগ পাবার কথা নয়।

আমি এদিক ওদিক তাকাচ্ছি এমন সময়ে হঠাৎ চোখে পড়ল—পীতবাসের টেবিলে একটি আলবাম। পীতবাস আলবাম রাখেন না জানতাম—তাই একটু আশ্চর্য লাগল। আলবামটি খুলতে প্রথম পাতায়ই দেখি—ঝিলম নদীতে শিকারায় ব'সে একটি সুশ্রী প্রবীণা মহিলার দু পাশে দুটি তরুণী। বুঝলাম মন্ত্রীজায়া ও তাঁর দুই মেয়ে।

ঠিক এমনি সময়ে পীতবাস ঢুকলেন ওঘর থেকে। আমাকে দেখেই ডাক দিলেন: এসো এসো মা, যার কথা বলছিলাম এইমাত্র সে একেবারে সশরীরে! দেখ সে!

ডাক শুনে ওরা দুজন ঢুকল।

বার্বারা: ওদের রূপবর্ণনাটা বাদ দেবেন না দাদা।

অসিত (হেসে): তোমাদের ঐ এক বিষম কৌতূহল।

সোফিয়া: plead guilty, দাদা! কিন্তু একটু আগে রোমান্সের hint দিয়েছেন যে। আর রোমান্স জমতে হ'লে—

অসিত (হেসে): হয়েছে হয়েছে, এবার আমিই হার মানছি। ওঁদের মধ্যে বড়টি—যার নাম দিয়েছি

শমিতা—শ্যামলী, শ্রীমস্তিনী। আর ছোটটি—মূর্ছনা গৌরী তথা সুন্দরী। ব্যস আর নয়। কারণ সুন্দরীর রূপবর্ণনা কথায় হয় না—ও শ্রেফ বিড়ম্বনা।

ওরা ঘরে ঢুকেই নমস্কার। তার পর মূর্ছনাই প্রথম কথা কইল, বেশ সপ্রতিভ ভাবেই বলল: "আপনার এত নাম শুনেছি সাধুজির কাছে—"

"এরি মধ্যে 'এত' শুনলেন কেমন ক'রে?"

"এরি মধ্যে কি? সাধুজি বুঝি চিঠি লেখেন না?"

আমি সাধুজির দিকে চাইলাম। তিনি আমার অনুক্ত প্রশ্নের জবাব দিলেন তৎক্ষণাৎ: "ভালো কথাই লিখেছি বাবুজি! তোমার গানে সহজ ভক্তিভাবের কথা।"

মূর্ছনা বলল: "হঁ্যা—এবার শোনান তাহ'লে।"

আমি হেসে বললাম: "কিন্তু আপনারা আধুনিকী মহিলা—কাজেই আপনাদের ক্ষেত্রে ladies first মানতেই হবে।"

মূর্ছনা হেসে চুপি চুপি শমিতাকে কি বলল। সে বলল: "তা কী হয়েছে? গা না।"

মূর্ছনা চাপা স্বরে কী বলল বোঝা গেল না, তবে মৃদু আপত্তি জাতীয় কিছু এটুকু বুঝতে বেগ পেতে হ'ল না, কারণ পীতবাস ব'লে উঠলেন: "তা গাও না মা, গান তো তুমি খারাপ গাও না—"

"তাই ব'লে ওঁর কাছে?"

"তা কী করা যাবে? যে যেমন পারে। জনার্দন স্বভাবে ভাবগ্রাহী—কীর্তিগ্রাহী নন।"

তখন মূর্ছনা গাইল একটি কবীরপন্থী গান, তার অন্তরাটি আমার বড় ভালো লেগেছিল:

আশা দাসীকে জো জায়ে—সোজন জনকে দাসা
আশা দাসী করেজো নায়ক—নায়ক অনুভব জ্যাসা

এর আমি ভাবানুবাদ করেছিলাম এই ব'লে:

"আশা কুহকিনী বাসনা-নটিনী, মাতায়ে রাখে
সে কতই ছলে!
তারে জিনে যেই হয় শুধু সেই মরণ বিজয়ী ধরণীতলে।
আশার অধীন যে রজনীদিন চিরপরাধীন সে যে
ভুবনে:
আশা দাসী যার সেই বসুধার প্রভু বরেণ্য
রহে জীবনে।"

সোফিয়া: কিন্তু গাইল কেমন বললেন না তো?

অসিত: খুব ভালো এমন কথা বলব না—তবে সত্যিই ভালো লাগল। কিন্তু সেটা ঠিক ওর গাওয়ার জন্যে নয়—মনে হ'ল রূপসী বালাকে ঘা খেতে হয়েছে এরি মধ্যে। নৈলে আশা কুহকিনী এ-ধরণের বৈরাগ্যপন্থী বাণীতে ওর হৃদয়ের সাড়া ফুটে উঠতে পারত না। অন্তত আমার তাই মনে হয়েছিল সেদিন। তাই ওর ঠোঁটে গালে রুজ দেখে যে একটা বিরক্তিভাব এসেছিল তার সবটা না হোক খানিকটা উবে গেল।

বার্বারা: তারপর?—আপনাকেও গাইতে হ'ল তো?

অসিত: বলাই বাহুল্য।

সোফিয়া: কী গাইলেন মনে আছে?

অসিত: আছে, কারণ গানটি আমি বাসন্তীপুরেই বেঁধেছিলাম পীতবাসের প্রিয় একটি সুফী উর্দু গানের সুরে ও ভাবে। মূল গানটি এই:

হর নফস জো আতা জাতা হৈ—য়ে আমির কৌন হৈ?
নিত নয়ে জলবে দিখাতা হৈ—য়ে আমির কৌন হৈ?

আমি অনেকক্ষণ ধরে গেয়েছিলাম আমার এই তর্জমাটি:

নানা রূপেই যে আসে যায়—কে সে, কেমন, কে জানে?
নিত্যই নব রঙে যে তোয়—কে সে কেমন কে জানে?
কেমন সে অচিন—যার কেউ পায় নি আজো পরিচয়?
তবু বাজে গহন হিয়ায়—কে সে কেমন কে জানে?
কে সে নিঠুর দরদী—যে আজ ফিরিয়ে দেয় আমায়,
কাল গাইতে "আয় আয় আয়"—কে সে, কেমন,
কে জানে?

দুদণ্ডও থাকতে যে না দেয় আমাকে শান্তিতে,
ঘুরিয়ে মারে চারদিকে হায়—কে সে কেমন, কে জানে?
নিশ্বাসে যার বিশ্বভুবন নেয় নিশ্বাস নিরন্তর,
ভেঙে আবার গড়ে যে তায়—কে সে, কেমন, কে জানে?
দুঃখ-ব্যথার সিন্ধুজলে ডুবিয়ে তরী তার পরেই
ডোবার মুখে তুলে বাঁচায়—কে সে, কেমন, কে জানে?
ছাই থেকে যে গ'ড়ে আমার অমল কান্তি, সব শেষে
ছাইয়েই আবার তাকে মেশায়—কে সে, কেমন
কে জানে?

গাইতে গাইতে একেবারে ভুলেগেলাম—কোথায় গাইছি

—কার কাছে-এরা বুঝবে কি না এ গানের ব্যথা, স-ব। কারণ আমি বহুবার দেখেছি যে, আমার গান সুরু করার ভার আমিই নিই বটে, কিন্তু তার পরে সে-গানের সুর ও ভাবের রসদ জোগান আর একজন। তাই আমার মনে নেই কতক্ষণ গেয়েছিলাম। শুধু এইটুকু মনে আছে যে, গাইতে গাইতে আমার হৃদয়ের কোথায় কি একটা উৎস খুলে গিয়েছিল—যার ফলে আমার মনে সুরের ঝর্ণা ঝরল আনন্দে, অথচ সে আনন্দের সঙ্গে মিশে এক নাম-না-জানা ব্যথা!" বলে বার্বারার দিকে চেয়ে: "এও এক কম আশ্চর্য নয় দিদি, যে, জীবনে যে দুঃখে অতিষ্ঠ ক'রে তোলে গানে সে-ই আনে প্রশান্তি—এমন কি, যন্ত্রণার মধ্যেও যেন প্রলেপ দেয় এক অনামী সান্ত্বনার। কিন্তু সে অন্য কথা।

"গান শেষ হ'লে দেখলাম মূর্ছনা মুখ নিচু ক'রে—দুটি চূর্ণালক ওর কপালে বাতাসে খেলে বেড়াচ্ছে। শমিতার চোখে জল চিক চিক করছে। আর সাধুজি এ-জগতেই নেই—চোখ বুজে পাথরের মতন স্থির—তাঁর হাতের খোল গেছে থেমে। ব'লতে ভুলেছি—তিনি আমার বাংলা গানের সঙ্গে খোলই বাজাতেন বরাবর। সব সঙ্গতেই তাঁর নৈপুণ্য ছিল অনন্যসাধারণ।

* *

*

তারপর থেকে ক্রমশ আমাদের গান শেখা সুরু হ'ল এক সঙ্গেই। তাকে ঠিক শেখা বললে হয়ত একটু ভুল হবে, কারণ বলেছি—সাধুজি গান ঠিক শেখাতেন না। তিনি গাইতেন বারবার—তাঁর নিতুই নব ভঙ্গিতে আর আমরা তা থেকে মূল সুরটা আয়ত্ত ক'রে নিয়ে তারপরে সেই শোনা সুরের মেঠো পথে সাধনার আনন্দে চলাফেরা করতে করতে তাকে ক'রে তুলতাম রাজপথ। তিনি আমাদের ভঙ্গির উপর বড় একটা হাত দিতেন না। কেবল কখনো কদাচিৎ দেখিয়ে দিতেন এক আধটা সুরের মোড় বা কণ্ঠের বিশেষ দুলুনি। ব্যস, এর বেশি না।

"কিন্তু গান শিখতে শিখতে একটা জিনিষ লক্ষ্য করলাম: যে, শমিতা গুন্ গুন্ ক'রে গাইলেও গলা ছেড়ে গায় না কক্ষণো। অথচ পীতবাস আমাকে বলেছিলেন—কণ্ঠলাবণ্য ওর আশ্চর্য।

সোফিয়া: তবে গাইত না কেন গলা ছেড়ে।

অসিত: ওর মধ্যে ছিল এক অদ্ভুত লজ্জা। কোনো কিছুতেই ও লোকচক্ষুর সামনে আসতে চাইবে না। গান গাইতে হ'লে এ চলে না—কারণ আব্রু যাকে বলে তাকে আর যেখানেই বজায় রাখা যাক না কেন—গানে রাখা যায় না কিছুতেই। সেখানে গুণীকে তো আরো উজ্জ্বল করেই প্রকাশ করতে হবে নিজের নিভৃত স্বপ্নতৃষ্ণা দুরাশাকে। কিন্তু শমিতা কিছুতেই আত্মপ্রকাশ করতে চাইত না। তাই ও গান গাইত - বলত মূর্ছনা, কিন্তু একা ও নিরালায়—ওর নিজের একটি ছোট্ট বাগানে একটি ফোয়ারার সাম্‌নে—আর কোথাও না।

বার্বারা: আশ্চর্য তো!

অসিত বলল: আশ্চর্য নয় মোটেই। আমরা প্রায়ই একটা মস্ত ভুল করি যখন ভাবি যে, সব মেয়েরাই সবাইয়ের সাম্‌নে বেরোয় আব্রু ঘুচিয়ে। কিন্তু কথাটা সত্য নয়। প্রতি সমাজেই মেয়েদের মোটামুটি দু'টো থাকে ভাগ করা যায়: এক, যারা স্বাধীনা—মোহিনী—Siren, আর এক—যারা স্বল্পবাক্, নিভৃতসঞ্চারিণী—shy by nature: বিলেত থেকে যখন প্রথমবার ফিরি তখন কিন্তু এ-কথাটা আমি আদৌ বুঝতাম না, আর না বোঝার দরুণই একটা মস্ত রকম গোড়ায় গলদ ক'রে বসেছিলাম। কথাটা একটু খুলে বলি—বলবার মত।

"উচ্ছল যৌবনে আমরা প্রকাশকে খুব বড় ক'রে দেখি, উদ্বেলতা দেখলে অধীর হই, গতিবেগ দেখলে উজিয়ে উঠি, বলি—এই-ই তো জীবন। খুব যে ভুল করি তাও নয়। কারণ অব্যক্তকে সুব্যক্ত করা, অগোচরকে গোচর করা, ঝাপ্‌সাকে স্বচ্ছ করা হ'ল আলোর একটা প্রধান ক্রিয়া। সৃষ্টির একটা আদিম তাগিদ হ'ল অজানাকে জানানো, বীজকে ফোটানো—এক কথায় অচিনের সঙ্গে যাকে জানিশুনি তার মালা বদল করানো। কিন্তু তবু বলতেই হবে যে, আনন্দলীলায় সবপ্রকাশের ছন্দই এক নয়, হ'তে পারে না। তাই একথা বললে ভুল হবে যে যে-ছন্দ গতির মাঝে, বচনের মাঝে, সংঘাতের মাঝে নিজেকে জানান দেয় সেই ছন্দই হ'ল প্রকাশশীল, আর যে-ছন্দ এই প্রকাশের পিছনে সংযমের গাঢ়বন্ধে নিজেকে বেঁধে রেখে তবে অগোচরকে গোচর করে সে বেবাক

জুয়ো। অন্ততঃ, শমিতাকে দেখে একথা আমার বারবারই মনে হ'ত।

সোফিয়া : কিন্তু মূর্ছনার বেলায় কী বল্‌বেন তাহ'লে ?

অসিত : বললাম না—সব প্রকাশের ছন্দ এক নয় ? মূর্ছনার ভিৎ-ই ছিল আলাদা যে—তার রূপসিদ্ধি আলাদা হবে না ? সে ছিল স্বভাবে বহির্মুখরা, চিরচঞ্চলা, নৃত্য-রঙ্গিণী। এ-শ্রেণীর মেয়ে সমাজে নিজের ঠাঁই ক'রে নেয় ঠিক তেমনি সহজে—যেমন সহজে পাখী নেয় আকাশে, গন্ধ—বাতাসে। তাই মূর্ছনাকে বর্ণনা করা যেতে পারে স্বভাব-সুদক্ষিণা ব'লে : কি না ওর কাছে যে-ই আসবে কিছু-না-কিছু পাবেই পাবে। কারণ ও যে শুধু নৃত্য-গীত-বাদ্যে অসামান্যা ছিল তা-ই নয়—সঙ্গিনী হিসেবেও ওর জুড়ি মেলা ভার। ওকে যে পরিবেশেই ফেলো না কেন, দেখবে ও গেঁথেছে প্রাণের শিকড়, মেলেছে আনন্দের ডালপালা, ফুটিয়ে তুলেছে সহজ আনন্দের নানা-রঙা ফুল। ও সুখী হবেও—করবেও। দুঃখও পাবে বৈকি—কেন না প্রাণ-লীলায় সুখ-দুঃখ তেম্‌নি অচ্ছেদ্য যেমন জীবলীলায় মেয়ে-পুরুষ। আমার বলবার উদ্দেশ্য—ওকে স্বীকার না ক'রে থাকবার জো নেই—কেননা ও তো শুধু দুঃখ পেয়েই ব'সে থাকবে না—দুঃখ দিতেও যে ও সমান রাজি—বিদ্যুৎ-চঞ্চলা তো কেবল দীপ্তির চমকই আনেন না, আনেন জ্বালা, দাহ, শ্মশান, অপঘাত—যার সাক্ষ্য ইতিহাসের পাতায়।

ওর কথা যখন ভাবি, ভাবতে ভালো লাগে যে, এ-শ্রেণীর মেয়ে সংসারে আসে···কী বলব ?···স্বদেশী হ'য়ে। শমিতার কথাটা ভাবলে এ-ব্যথার নিহিতার্থ আরো বুঝতে পারি স্পষ্ট ক'রে—কারণ সংসারে ওরা থাকে বিদেশিনী : এক পা মাটিতে না ফেলে অন্য পা বাড়াতে ভরসা পায় না, দশটা কথা শুনবে তো একটার জবাব দেবে, যাকে চিনবে তাকেও বেশি কাছে টানবে না—যাকে চিনবে না তার তো কথাই নেই। নির্ভরসা এদের রক্তে—না, আরো বেশি—অস্থি-মজ্জায়। নিজেদের এরা মনে করে পালিতা কন্যা—ঘর-কন্নায় যার ঠাঁই ঠিক ততটুকু যতটুকু অনাহূতের।

অথচ এরাই সমাজকে ধারণ করে। মূর্ছনারা যদি হয় আরাম-নিকেতনের চঞ্চল পতাকা, শমিতারা হ'ল জয়স্তম্ভ—না, মূলাধারই বল। কেন-না এরা গৃহের ভিৎ হওয়া সত্ত্বেও গৃহের বাইরের কেউ এদের খবর পায় না। কিম্বা বলা যেতে পারে—এরা যেন জাহাজের জলমগ্ন অংশ। অবশ্য জাহাজের যে-অংশ জলের উপর খাড়া হ'য়ে দাঁড়িয়ে সেখানেই যাত্রীদের প্রাণলীলায় সমারোহ—নাচগান, খাওয়া-দাওয়া, আমোদ-আহ্লাদ—কী নয় ? কিন্তু এ অংশকে ধারণ ক'রে রয়েছে কে ? না, ঐ জলমগ্ন অংশ যাকে কেউ দেখতে পায় না। সে চিরগোপন, চির-আঁধার—আনন্দ বলতে যা বোঝায় তার সঙ্গেও হয়ত তার কোনোই সম্বন্ধ নেই—অথচ তবু সে আশ্রয় দিচ্ছে ব'লেই আনন্দের ভিৎ বজায় থাকে।

সোফিয়া : ভাবটা সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন দাদা, ধন্যবাদ।

অসিত (প্রসন্ন কণ্ঠে) : যদি পেরে থাকি তবে তার কারণ শুধু এই যে, শমিতা ও মূর্ছনাকে দিনের পর দিন পাশাপাশি দেখে আমার চোখে এ সত্যটি খানিকটা আমার অন্তরঙ্গ উপলব্ধি হ'য়েই ফুটে উঠেছিল। তাই আমি সময় থাকতে একটু সাবধান হ'তে পেরেছিলাম দেখতে পেয়ে যে—মূর্ছনা আমার বেশি মন টানলেও আমি নির্ভর করতাম বেশি শমিতারই 'পরে। অবিশ্যি একথা আমার অজানা ছিল না যে, আমি উভয়েরই সুনজরে। কিন্তু একটু মিলিয়ে দেখতে গেলেই আমার চোখে পড়ত যে, মূর্ছনার ছোঁয়াচে আমি একটু ক্ষণিক উত্তেজনা—সেখানে শমিতা আমাকে, প্রত্যক্ষভাবে কিছু দিতে না পারলেও ঝড়-ঝাপটায় তারই সমর্থনে আমি বারবার পায়ের নিচে মাটি পেয়েছি।

বাবারা (উৎসুক কণ্ঠে) : দুবোনের মনের ছবি বেশ ফুটেছে দাদা, কিন্তু ওদের বাইরের ছবিরও দুএকটা আঁচড় কাটলেনই বা। যা অবান্তর নয় তাকে এড়িয়ে গেলে চলবে কেন ?

অসিত (হেসে) : এড়িয়ে যাব না দিদি। তবে আগে ব'লে নিই সাধুজির কথা। কারণ তিনি এসেছিলেন খানিকটা ওদের ব্যাকগ্রাউণ্ড হ'য়েই বলব।

সোফিয়া (খুশী হ'য়ে) : এ বেশ কথা। Faultless !

বলুন খুলে। এ-মানুষটির কথা আমরাও শুনতে চাই বৈকি।"

অসিত: খুলে বলতে তো ইচ্ছে করে খুবই দিদি, কিন্তু তাঁর কথা কি একটা? বলতে গেলে চতুর্মুখ হ'তে হয়। তাঁর ভাব বদল হ'ত ক্ষণে ক্ষণে। কখনো মূর্ছনার রূপের এক প্রসাদার্থীর সম্বন্ধে বলতেন ফার্সী থেকে উদ্ধৃত ক'রে: ইস্ক পর জোর নহী হয় বো আতিশ গালিব, কে লগায়ে ন লগে ঔর বুঝায়ে ন বুঝে'—অর্থাৎ

প্রেমের মতি মানে না মানা হায়,
আপন পথে চলে সে এ-জগতে:
জলিলে আর নিভিতে সে না চায়,
নিভিলে আর জলে না কোনোমতে।

কখনো বা শমিতার শ্রীর জয়ধ্বনি ক'রে উদ্ধৃত করতেন কৃষ্ণকর্ণামৃতের সংস্কৃত বর্ণনা—'মাধুর্যমেব মনোনয়নামৃতং নু' —কিনা শমিতার শ্রী হ'ল মনোনয়নের অমৃত। এইটুকু ব'লে এবার সুরু করি বাসন্তীপুরের ছবি আঁকতে। [ক্রমশঃ

শ্রাবণ

শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ

আষাঢ় চলিয়া গেল আঁখিনীরে ভাসি—
করুণ পূরবী সুরে দিগন্ত উদাসী।
তার সেই ব্যাথাচ্ছন্ন যাত্রাপথ তলে
এলে তুমি হে শ্রাবণ ঘন কলরোল।
অম্বরে ডম্বরু বাজে মেঘের সম্ভার,
কেতকী কদম্ব কুঞ্জে পুষ্প ভারে ভার।
ক্ষণে ক্ষণে চমকিছে বিদ্যুতের লতা
দাদুরী ডাকিছে বনে সিক্ত লতাপাতা।
মেঘ ঘিরি এল আজ গম্ভীর শ্রাবণ—
মুহুর্মুহু শিহরিছে তমালের বন।
উন্মাদ তরঙ্গ তুলি ব্যাকুল উচ্ছ্বাসে
পূর্ণা তরঙ্গিনী ধায় সমুদ্র সকাশে।
সুগভীর আলোড়নে বিশ্ব চরাচর
পরিপূর্ণ বেদনায় কাঁপে থরথর।

হে নবীনা

অনুরাধা মুখোপাধ্যায়

আধুনিকা সমাজের ওগো পথিকৃৎ,
নব্যযুগের যারা গড়ে তোল ভিত্।
সুসভ্য আচরণ আলট্রামডার্ণ—
অসভ্য লজ্জার নেই কোন স্থান!
বাড়তির জঞ্জালে প্রগতির পথ
রুদ্ধ না হয় যেন এই যে শপথ।
ছাঁটকাটে শর্ট করা তাই ফিটফাট
নব্য-তরুণী ওগো আচরণে স্মার্ট—
কালের নবীন হাওয়া ওড়ায় আঁচল
কৃষ্টির মহিমাকে রাখে অবিচল।
প্রতিদিন নাটকের নব পটভূমি
গড়ে তোল, হে নবীনা, প্রণম্য তুমি।
ওষ্ঠের সিঁদুর হোক চির-অক্ষয়,
হে নবীনা গাহি তব যাত্রার জয়!

রবীন্দ্ররচনায় পদাবলীর প্রভাব

ডক্টর দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, পি-এইচ-ডি

রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলীর রসমাধুর্যে আকৃষ্ট হয়েছিলেন কিশোর বয়স থেকেই। এর প্রমাণ পাওয়া যায় কবি-কৃত 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' রচনা ও 'পদরত্নাবলী' নামে পদসংকলন গ্রন্থ সম্পাদনে। এ-ছাড়া কবিগুরুর নানা কাব্যগ্রন্থ, আখ্যান কাব্য ইত্যাদি রচনাতেও বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব স্থানে স্থানে দেখা যায়। ইতিপূর্বে এ-বিষয়ে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। (দ্রষ্টব্য ভারতবর্ষ, কার্ত্তিক ১৩৭০) বর্তমান প্রবন্ধে আরও খানিকটা আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে কবিগুরুর দুইটি কাব্যগ্রন্থ অবলম্বনে।

১২৯৩ সালে রচিত রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল'-এর অন্তর্গত 'মথুরায়' শীর্ষক কবিতাটি মূলতঃ বৈষ্ণবভাবেই প্রভাবিত। অত্যাচারী রাজা কংসকে হত্যা করে কৃষ্ণ মথুরায় সুশৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছেন। মথুরার সিংহাসনে তিনি বসিয়েছেন কংসের পিতা উগ্রসেনকে। মথুরায় সর্বত্র যখন আবার আনন্দের সাড়া পড়েছে, তখন কৃষ্ণও অসি ছেড়ে হাতে নিলেন বাঁশী; কিন্তু বাঁশী আর পূর্বের মতো বেজে ওঠে না। যে-বংশীরবে বৃন্দাবন আকুল হয়ে উঠত, যমুনা উজান বইত, তরুলতা ও কীটপতঙ্গ পর্যন্ত উল্লসিত হয়ে উঠত, সেই প্রাণ মাতানো ধ্বনি বাঁশী থেকে আর নিঃসৃত হলনা। বাঁশীর যেন সে শক্তি আর নেই; কারণ বাঁশীর সম্বন্ধ বৃন্দাবনের সঙ্গে, আবার বৃন্দাবনের সঙ্গে রাধিকার নিত্য সম্বন্ধ। সুতরাং যেখানে রাধাও নেই, বৃন্দাবনও নেই সেখানে কৃষ্ণের বাঁশী বাজবে কেন? রবীন্দ্রনাথের 'মথুরায়' শীর্ষক কবিতায় কৃষ্ণ আক্ষেপ করে বলছেন,—

> বাঁশরি বাজাতে চাহি বাঁশরি বাজিল কই?
> বিহরিছে সমীরণ, কুহরিছে পিকগণ,
> মথুরার উপবনে কুসুমে সাজিল ওই।
> বাঁশরি বাজাতে চাহি বাঁশরি বাজিল কই?

মথুরার বনে বনে ফুল ফুটেছে; বকুলের গন্ধে চারদিক আমোদিত, দিকে দিকে কোকিল পঞ্চমে তান ধরেছে; প্রাণমাতানো বসন্তসুরভিত কুসুমকুঞ্জে অলিকুলের সদা-গুঞ্জন। এই পরিবেশেই তো বাঁশী বেজে ওঠে। কৃষ্ণ ভাবেন, এই বুঝি বৃন্দাবন! তাই বাঁশী বাজাতে যাচ্ছেন; কিন্তু বাঁশী তো বাজল না! তখনই কৃষ্ণের মনে হল—এতো বৃন্দাবন নয়; এখানে সেই চন্দ্রাননা শ্রীমতী তো অভিসারে আসবে না, আর তার নূপুরধ্বনিও শোনা যাবে না। রাধিকার কথা মনে পড়ায় কৃষ্ণের আর বাঁশী বাজানো হল না। যেখানে রাধিকা নেই, সেখানে বাঁশী নীরব; তার দেহই আছে, প্রাণ নেই। 'মথুরায়' কবিতায় উক্ত ভাব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে,—

> বিকচ বকুল ফুল দেখে যে হতেছে ভুল,
> কোথাকার অলিকুল গুঞ্জরে কোথায়।
> এ নহে কি বৃন্দাবন? কোথা সেই চন্দ্রানন,
> ওই কি নূপুরধ্বনি বনপথে শুনা যায়?
> একা আছি বনে বসি, পীত ধড়া পড়ে খসি,
> সোঙরি সে মুখশশী পরাণ মজিল সই।
> বাঁশরি বাজাতে চাহি বাঁশরি বাজিই কই?

বৃন্দাবনের কথা কৃষ্ণের মনে পড়ছে। মধুযামিনীতে মথুরার কুঞ্জে বসে তিনি রাধিকার কথা ভাবছেন, আর অমনই বাঁশী ধরলেন মুখে; কিন্তু রাধানামের সাধা বাঁশী আর বাজল না। কৃষ্ণ রাধিকার কথা ভেবে বড়ই আকুল হয়ে উঠলেন। এদিকে বসন্ত নিশিও অবসান প্রায়। তাই বৈষ্ণব কবির কণ্ঠ মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠেও বেজে উঠল,—

> একবার রাধে রাধে ডাক বাঁশি মনোসাধে,
> আজি এ মধুর চাঁদে মধুর যামিনী ভায়।
> কোথা সে বিধুরা বালা, মলিন মালতী মালা,
> হৃদয়ে বিরহ জ্বালা, এ নিশি পোহায় হায়

কবি যে হল আকুল, একি রে বিধির ভুল।
মথুরায় কেন ফুল ফুটেছে আজি লো সই।
বাঁশরি বাজাতে গিয়ে বাঁশরি বাজিল কই ?

বৈষ্ণব কবিদের মতো মাথুর বিরহের ভঙ্গীতে লেখা রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটিতে রাধিকার বিরহোক্তি নেই, আছে কৃষ্ণের। কৃষ্ণ মথুরায় চলে গেলে রাধা ও অন্যান্য গোপীদের অশ্রুধারায় বৃন্দাবন ভেসে গিয়েছিল। শত শত পদকর্তা রাধিকার আর্তকণ্ঠের এই ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছেন সহস্র সহস্র পদে; কিন্তু কৃষ্ণের বিরহার্তিসূচক পদ কখনও লেখেন নি। বৈষ্ণব পদকর্তা শুধু রাধিকার মনকেই জেনেছিলেন, কৃষ্ণের কথা একবারও ভাববার অবকাশ পান নি; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিমানসে কৃষ্ণের বিরহার্তিও দোলা দিয়েছে। মথুরার রাজাধিরাজ হয়েও কৃষ্ণের মন হাহাকার করে উঠেছে রাধিকার জন্য। সুদূর মথুরায় বসে রবীন্দ্রনাথের কৃষ্ণ রাধিকার নূপুরধ্বনি শোনার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন,—

এ নহে কি বৃন্দাবন ? কোথা সেই চন্দ্রানন।
ওই কি নূপুরধ্বনি বন পথে শোনা যায় ?

মনে হয় গীতগোবিন্দের প্রভাব পড়েছে রবীন্দ্রনাথের এই কবিতায়। জয়দেব রাধা-কৃষ্ণ উভয়েরই বিরহার্তিসূচক পদ রচনা করে গেছেন। গীতগোবিন্দে রাধাগতপ্রাণ কৃষ্ণ বলছেন,—

কিং করিষ্যতি কিং বদিষ্যতি সা চিরং বিরহেণ।
কিং ধনেন জনেন কিং মম জীবিতেন গৃহেণ ॥
দৃশ্যসে পুরতো গতাগতমেব মে বিদধাসি।
কিং পুরেব সসম্ভ্রমং পরিরম্ভনং ন দদাসি ॥

গীতগোবিন্দম্, ৩।৪, ৮

(আমার দীর্ঘ বিরহে রাধিকা এখন কি করছেন, কিই বা বলছেন ? তাঁর বিরহে আমার ধন, জন, জীবন ও গৃহের কি প্রয়োজন ? আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, তুমি আমার সম্মুখ দিয়ে যাতায়াত করছ, তবে কেন পূর্বের ন্যায় সসম্ভ্রমে আমাকে আলিঙ্গনদান করছ না ?)

'কড়ি ও কোমল'-এর 'বনের ছায়া' শীর্ষক কবিতাতেও পদাবলীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কৃষ্ণসহ ব্রজবালকগণ ধেনু বৎস বনে ছেড়ে দিয়ে সারাদিন খেলাধুলা করত, যমুনা তটে খেলায় পরিশ্রান্ত হয়ে কেউ শ্যামল ছায়ায় নিদ্রা যেত। বৈষ্ণব কবি মাধব দাসের একটি পদ্যাংশে এর পরিচয় পাই,—

নবীন রাখাল সব আবা আবা কলরব
শিরে চূড়া নটবর বেশ।
আসিয়া যমুনা তীরে নানা রঙ্গে খেলা করে
কভু হয় নিদ্রার আবেশ ॥

গোষ্ঠের এই চিত্র আংশিকভাবে ফুটে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের 'বনের ছায়া' কবিতায়,—

হাসি, বাঁশি, পরিহাস বিমল মুখের শ্বাস
মেলামেশা বারো মাস নদীর শ্যামল তীরে;
কেহো খেলে, কেহো দোলে, ঘুমায় ছায়ার কোলে
বেলা শুধু যায় চলে কুলু কুলু নদী নীরে।

'বাঁশি' কবিতায় রাধিকার ব্যাকুলতার আভাসও দুর্লক্ষ্য নয়। বৃন্দাবনে রাসরসে কৃষ্ণ বংশীধ্বনি করলে তরুলতা, কীট-পতঙ্গ থেকে আরম্ভ করে সমস্ত জীবকুল সম্মোহিত হয়ে পড়ে। বেণুরবে তরুলতা পুলকাতিশয্যে মঞ্জুরিত হল; গোধন খোয়াড় ভেঙ্গে ধ্বনি অনুসারে ছুটে চলল; কর্ণহীন সর্পজাতি পথে পড়ে 'আঁখিএ দেখি শুনে।' ময়ূর-ময়ূরী নৃত্য আরম্ভ করল; আর গোপাঙ্গনা চিত্রপুত্তলিকা-বৎ নিশ্চল হয়ে রইল। রাধিকার অবস্থা আরও গুরুতর। তিনি পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষিণীর ন্যায় ছটফট করে বিলাপ করতে লাগলেন। কৃষ্ণের রাসলীলার এই চিত্রটি রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল'-এর অন্তর্গত 'বাঁশি' কবিতায় আভাস পাওয়া যায় রাধিকার বিলাপোক্তির মধ্য দিয়ে,—

ওগো শোনো কে বাজায়।
বনফুলের মালার গন্ধ বাঁশির তানে মিশে যায় ॥
অধর ছুঁয়ে বাঁশিখানি চুরি করে হাসিখানি,
বঁধুর হাসি মধুর গানে প্রাণের পানে ভেসে যায়।
ওগো শোনো কে বাজায় ॥
কুঞ্জবনের ভ্রমর বুঝি বাঁশির মাঝে গুঞ্জরে,
বকুলগুলি আকুল হয়ে বাঁশির গানে মুঞ্জরে;
যমুনারি কলতান কানে আসে, কাঁদে প্রাণ,
আকাশে ঐ মধুর বিধু কাহার পানে হেসে চায়।
ওগো শোনো কে বাজায় ॥

'কড়ি ও কোমল'-এর 'বিরহ' কবিতায় বাসকসজ্জা ও উৎকণ্ঠিতা নায়িকার ভাব প্রায় বিদ্যমান। কৃষ্ণের আগমন

প্রতীক্ষায় রাধিকা কুঞ্জে শয্যা রচনা করে আছেন। প্রহরের পর প্রহর অতীত হয়ে গেল ; কিন্তু কৃষ্ণের দেখা নেই। এইভাবে কত নিশি অতিবাহিত হল। 'বিরহ' কবিতায় যেন রাধিকার আক্ষেপ পরিস্ফুট,—

আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ন
আকুল নয়ন রে।
কত নিতি নিতি বনে করিব যতনে
কুসুম চয়ন রে॥

বৈষ্ণব কবি জ্ঞানদাসের একটি পদ্যাংশে এই আক্ষেপোক্তি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে,—

শেজ বিছাইয়া রহিলুঁ বসিয়া
পথপানে নিরখিয়া

রবীন্দ্রনাথের উক্ত অনুভাবনা বৈষ্ণব পদাবলীজাত, সন্দেহ নাই।

রাধিকার জীবন-যৌবন সবই ব্যর্থ ; বৃথাই তাঁর মালা গাঁথা, বৃথায় প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা। রাধিকার একবার মনে হয়, কৃষ্ণ যদি নিশাবসানে আসেন, তবে তাঁকে একবার শুধু চোখে দেখে যমুনার জলে প্রাণ বিসর্জন করে চিরতরে বিরহজ্বালা প্রশমিত করবেন। রবীন্দ্রনাথের 'বিরহ' কবিতায় রাধিকার এই ব্যাকুলতাই প্রকাশ পেয়েছে,—

এই যৌবন কত রাখিব বাঁধিয়া
মাধব কাঁদিয়া রে।
সেই চরণ পাইলে মরণ মাগিব
সাধিয়া সাধিয়া রে।...
তাই মালাখানি গাঁথিয়া পরেছি মাথায়
নীল বসনে তনু ঢাকিয়া,
তাই বিজন আলয়ে প্রদীপ জ্বালায়ে
একেলা রয়েছি জাগিয়া।...
ওগো যদি নিশিশেষে আসে হেসে হেসে,
মোর হাসি আর রবে কি !
এই জাগরণে ক্ষীণ বদন মলিন
আমারে হেরিয়া কবে কি ?
আর সারা রজনীর গাঁথা ফুলমালা
প্রভাতে চরণে ঝরিব,
ওগো আছে সুশীতল যমুনার জল
দেখে তারে আমি মরিব॥

'কড়ি ও কোমল'-এর অন্তর্গত 'বিলাপ' কবিতাটিতে মাথুরবিরহের সুরই যেন স্পষ্ট শোনা যায়। কৃষ্ণ মথুরায় চলে গেছেন বহুদিন। কবে যে তিনি ফিরে আসবেন তাই ভেবে রাধিকা আকুল। রাধিকা ভাবতেই পারে না যে রাধাগত-প্রাণ কৃষ্ণ কিভাবে এতদিন ভুলে আছেন,—

ওগো এত প্রেম-আশা প্রাণের তিয়াষা
কেমনে আছে সে পাসরি।

রাধিকা এক একবার ভাবেন, কৃষ্ণ যদি আমাকে ভুলেই যাবেন, তবে আমাকে কেন এখানে ভুলিয়ে গেলেন তাঁর মদনমোহন রূপে আমি তাঁকে আত্ম-সমর্পণ করেছি— মান-সম্ভ্রম, লোকলজ্জা, গৃহপরিজন সব ভুলে। আমাকে কেনই বা তিনি বাঁশিতে রাধা রাধা বলে পাগল করে তুলেছিলেন ?

যদি আমারে আজি সে ভুলিবে সজনী
আমারে ভুলাল কেন সে ?
ওগো এ চির জীবন করিব রোদন
এই ছিল তার মানসে।

পরে রাধিকা বড়ই আক্ষেপ করে বলেছেন, কৃষ্ণের সুখের কণ্টক হতে তিনি চান না। মথুরায় যদি তিনি সুখে থাকেন, তবে সেইখানেই তিনি থাকুন, শুধু একবার চোখের জলের উপহার তাঁর কাছে তিনি পাঠাতে চান,—

যদি মনে নাহি রাখে, সুখে যদি থাকে
তোরা একবার দেখে আয়,
এই নয়নের তৃষা পরাণের আশা
চরণের তলে রেখে আয়।

'বিলাপ' কবিতা লেখার সময় রবীন্দ্রনাথ যে রাধাভাবময় হয়েছিলেন তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রমাণ কবিতায় রাধা কথার উল্লেখেই। বিরহতাপ সহ্য করতে না পেরে রাধা তার শেষ দশা কৃষ্ণকে জানাবার জন্য সখীকে মথুরায় পাঠাচ্ছেন এই বলে,—

আর নিয়ে যা রাধার বিরহের ভার
কত আর ঢেকে রাখি বল।
আর পারিস যদি তো আনিস হরিয়ে
এক ফোঁটা তার আঁখিজল।

আবার পরক্ষণেই রাধিকা দারুণ দুঃখ ও অভিমানে বলে উঠলেন,—

না না এত প্রেম সখী ভুলিতে যে পারে
তারে আর কেহো সেধো না।
আমি কথা নাহি কব, দুঃখ লয়ে রব
মনে মনে সব বেদনা।

সুখ একবার চলে গেলে আর তাকে ফিরে পাওয়া যায় না। কৃষ্ণের মথুরাগমনে রাধিকা এ-কথা স্পষ্ট অনুভব করেছেন; আর এও বুঝতে পেরেছেন, প্রেম-ভালবাসা সবই মিথ্যা। তাই রাধিকা বড় দুঃখে সখীকে বলছেন,—

ওগো মিছে, মিছে সখী, মিছে এই প্রেম,
মিছে পরাণের বাসনা।
ওগো সুখ-দিন হায় যবে চলে যায়
আর ফিরে আর আসে না॥

'কড়ি ও কোমল'-এর 'গান' কবিতাটিও বৈষ্ণব পদাবলী-প্রভাবজাত। কৃষ্ণ বৃন্দাবনে রাধা রাধা বলে বাঁশী বাজাচ্ছেন। পরাধীনা রাধিকা তাঁর মনের বেদনা জানাতে না পেরে তাঁর প্রাণ কেঁদে কেঁদে ফিরছে। তিনি যে ফুল তুলেছিলেন কৃষ্ণের গলায় মালা পরিয়ে দেবার জন্য তা ধূলিতেই গেল শুকিয়ে। সারা রাত্রি এই ভাবে বৃথাই কেটে গেল। যৌবনডালা সাজানোই রইল—কৃষ্ণকে তা দিয়ে পুজো করা হল না। রাধিকা ভাবছেন, এ বৃথা দেহের কি প্রয়োজন; কৃষ্ণ তো আগেই তাঁর প্রাণ হরণ করে নিয়েছেন বাঁশীর রবে, এখন এই পঞ্চভূতাত্মক দেহের সব কাজ ফুরিয়ে গেছে। বিরহাতুর রাধিকার এই ব্যাকুলতা অপূর্বভাবে প্রকাশ পেয়েছে 'কড়ি ও কোমল' এর 'গান' কবিতায়,—

তার আকুল পরাণ বিরহের গান
বাঁশি বুঝি গেল জানায়ে।
আমি আমার কথা ভাবে জানাব কী করে,
প্রাণ কাদে মোর তাই যে॥
কুসুমের মালা গাঁথা হল না,
ধূলিতে পড়ে শুকায় রে,
নিশি হয় ভোর, রজনীর চাঁদ
মলিন মুখ লুকায় রে।
সারা বিভাবরী কার পূজা করি
যৌবন ডালা সাজায়ে
ওই বাঁশি-স্বরে হায় প্রাণ নিয়ে যায়
আমি কেন, থাকি হায় রে॥

রাধিকার দিবাভিসারের ইঙ্গিত রয়েছে 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'একাল ও সেকাল' কবিতায়। 'কড়ি ও কোমল'-এর পরেই অর্থাৎ ১২৯৫ সালে 'মানসী'র রচনাকাল।

আকাশ ঘিরে যখন ঘন কালো মেঘে বারি বর্ষণ করতে থাকে, মধ্যাহ্নের সূর্যও যখন একেবারে ঢাকা পড়ে যায় মেঘের পর মেঘ এসে, তখন দিন কি রাত্রি বোঝা যায় না। সেই সময় কৃষ্ণের কথা মনে পড়ায় রাধিকা কৃষ্ণাভিসারের জন্য প্রস্তুত হন। এ বিষয়ে নানা পদ রচিত হয়েছে। এমনি একটি দিনের চিত্রও রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত করেছেন 'একাল ও সেকাল' কবিতায়। একদিন বর্ষায় দুপুরবেলা মেঘ নেমেছে আকাশে; কোথা থেকে সব মেঘ এসে আকাশ একেবারে ছেয়ে ফেলল; ধরণীর উপর সুগভীর কালো ছায়া পড়েছে; শ্যাম বনানী শ্যামলতর হয়ে উঠেছে। এই সময় রাধিকার কথা চিন্তা করে কবিগুরু লিখলেন,—

আজিকে এমন দিনে শুধু পড়ে মনে
সেই দিবা-অভিসার
পাগলিনী রাধিকার
না জানি সে কবেকার দূর বৃন্দাবনে।
সেদিনও এমনি বায়ু রহিয়া রহিয়া।
এমনি অশ্রান্ত বৃষ্টি,
তড়িৎ চকিত-দৃষ্টি,
এমনি কাতর হায় রমণীর হিয়া।

সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথ গোবিন্দদাসের নিম্নোক্ত পদাংশটি অনুসরণ করে থাকবেন,—

গগনহি নিমগন দিনমণি কাঁতি
লখই না পাঠিয়ে ফিরে দিন রাতি॥
ঐছন জলদ কায়ল আন্ধিয়ার।
নিয়ড়হি কোই লখই নাহি পার॥
চলু গজ-গামিনী হরি-অভিসার।
গমন নিরঙ্কুশ আরতি বিথার॥

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, রাধিকার সেই বিরহাভিসার

নিত্যকাল ধরে চলছে। আজিও শারদ পূর্ণিমায় ধারা-বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে সেই চিরন্তন বিরহ গানই ভেসে ওঠে। 'একাল ও সেকাল' কবিতায় কবিগুরু রাধিকার কথা স্মরণ করে আবার বলছেন,—

সেই কদম্বের মূল, যমুনার তীর,
সেই সে শিখীর নৃত্য
এখনো হরিছে চিত্ত
ফেলিছে বিরহছায়া শ্রাবণ তিমির।
আজও আছে বৃন্দাবন মানবের মনে,
শরতের পূর্ণিমায়
শ্রাবণের বরিষায়
উঠে বিরহের গাথা বনে উপবনে
এখনো সে বাঁশি বাজে যমুনার তীরে।
এখনো প্রেমের খেলা
সারাদিন সারা বেলা
এখনো কাঁদিছে রাধা হৃদয় কুটিরে।

চৈতন্যভাগবত-কার বৃন্দাবনদাসও রাধিকার চিরন্তন অভিসারের অনুরূপ চৈতন্যের নিত্যলীলা দর্শন করে বলেছিলেন,—

অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌর রায়।
কোনো কোনো ভাগ্যবান দেখিবারে পায়॥

রবীন্দ্রনাথের লিখিত 'একাল ও সেকাল' কবিতায় চৈতন্যভাগবতের প্রভাব-পড়া অসম্ভব নয়।

'মানসী'র 'পত্র' কবিতায় বর্ষাভিসারের অপর এক চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। বাদলার মধ্যে দারুণ দুর্যোগময়ী রজনীতে রাধিকা চলেছেন সংকেতকুঞ্জে। তাঁর মন আকুল হয়ে উঠছে এই ভেবে যে কৃষ্ণ তাঁরই জন্য ঝঞ্ঝাবাত্যা-ক্ষুব্ধ রজনীতে কুঞ্জে অপেক্ষা করছেন যমুনাতটে নির্জন নীপমূলে। চারদিকে ঘন অন্ধকার। অকিঞ্চন রাধার জন্য কৃষ্ণের এই দারুণ ক্লেশের কথা স্মরণ করে রাধিকা বড়ই উতলা ও শঙ্কিতা। 'পত্র' কবিতা লিখতে লিখতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

পড়ে মনে বরিষার বৃন্দাবন অভিসার
একাকিনী রাধিকার চকিতচরণ—
শ্যামল তমাল বন, নীল যমুনার জল,
আর দুটি ছল ছল মলিন নয়ন।
এ ভরা বাদর দিনে কে বাঁচিবে শ্যাম বিনে,
কাননের পথ চিনে মন যেতে চায়।
বিজন যমুনাকূলে বিকশিত নীপমূলে
কাঁদিয়া পরাণ বুলে বিরহব্যথায়।

মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ এ-বিষয়ে বিদ্যাপতির নিম্নোক্ত পদাংশ অনুসরণ করেছিলেন :—

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভর বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥

উপরি উক্ত আলোচনায় দেখা যায়, বৈষ্ণব পদাবলী তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল 'কড়ি ও কোমল' এবং 'মানসী'র যুগে। শুধু তরুণবয়সেই নয়, কৈশোর ও তারুণ্যের সন্ধিক্ষণেও তিনি পদাবলীর রসমাধুর্যে বিমুগ্ধ হয়েছিলেন। ইতিপূর্বে এ-বিষয়ে কিছু আলোচনা করা হয়েছে।

দ্রষ্টব্য মৎ-লিখিত প্রবন্ধ—'রবীন্দ্রনাথ : বৈষ্ণব কবি-গোষ্ঠীর উত্তর সাধক—ভারতবর্ষ, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৭০।

নব বাংলায় উষার কাকলি

ডঃ প্রফুল্লকুমার সরকার এম-এ, পি-এচ-ডি, ডিপ-এড (এডিনবরা ও ডাবলিন)

কলেজ-পত্রিকা, সাহিত্যসভা, ছাত্র ইউনিয়ন প্রভৃতির প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সে যুগ প্রভাতের সূচনা প্রেসিডেন্সি কলেজকে কেন্দ্র করে কলেজে কলেজে একদা দেখা দিয়েছিল—জেগেছিল উষার কাকলি।

যে পরিস্থিতিতে ছাত্রজীবনে হৈহল্লা ব্যতিরেকে গঠনমূলক কর্ম্ম-ধারায় আমার সমসাময়িক কলেজবন্ধুগণের মধ্যে যে নবভাব জাগরণ ও প্রেরণা এসেছিল প্রথমে সে কথাই একটু বলি। তাদের কর্ম্মসূচির মধ্যে কলেজ ম্যাগাজিন প্রতিষ্ঠা ব্যাপারকে সামনে করে বাংলা সাহিত্য-সভার স্থাপন। পরীক্ষার্থী সাহায্য তহবিলগঠন. বাংলায় এম, এ পঠনের প্রস্তাব, ডঃ বসুর অভ্যর্থনা, নবীন সেনের চিত্রপট উন্মোচন প্রভৃতির ব্যবস্থা স্বতঃই জাগে। অধ্যয়নের সঙ্গে এরূপ সুসংবদ্ধলক্ষ্য কর্ম্মসাধনে জ্ঞান ও কর্ম্ম সমন্বয়ে যাঁরা ছাত্রজীবন বিকশিত করতে খানিকটা পেরেছিলেন তাঁদের দু একজনের কথা আভাসে ইঙ্গিতে কিছু বলে নিয়েই কলেজ ম্যাগজিনের কথা আরম্ভ করব। প্রেসিডেন্সি কলেজের কথাকেই মূল ধরে আমি সে নব ভাব বিভাবন শুভ মুহূর্ত্তের কথা বলব।

আমি যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে ফোর্থ ইয়ারে পড়ি, অধ্যক্ষ জেম্‌স বললেন—কলেজের 'ওলড বয়দের নিয়ে প্রতিষ্ঠা দিবস প্রথম প্রবর্ত্তিত হবে—নিমন্ত্রণ করালেন আমাদের দিয়ে তিনি নাগপুর ইউনিভার্সিটির ভাইস্-চ্যান্সেলর স্যর বিপিন বিহারী বসু, স্যর সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ (ব্রিটিশ পার্লামেন্টের লর্ডসভার সভ্য) মাইকেল মধুসূদনের কিছু পরবর্ত্তী কালীমোহন মিত্র মহাশয়। স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, স্যার আশুতোষ চৌধুরী, 'জে চৌধুরী সাহেব (স্বদেশী-যুগের নেতা) সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক (ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের ভাইস্ প্রেসিডেন্ট পরে হন্) মহোদয়। ভূপেন্দ্রনাথ বসু, ডঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতিকে। কলেজের এই অনুষ্ঠানের উদ্যোগপর্বে চেয়ার বেঞ্চি টানাটানির কাজে আমি হাত দিয়ে সাহায্য করলাম পলিটিক্যাল থিওরীর লেখক অধ্যাপক গিলক্রীষ্ট সাহেবকে —অভিজাত বংশের ছেলেরা হাত গুটিয়ে তা দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। সেই থেকে আমি কলেজের ছাত্রসম্পর্কীয় অনেক কাজেরই ভার পেতে লাগলাম। বোধহয় গিলক্রীষ্ট সাহেব অধ্যক্ষ মহোদয়কে আমার সহযোগিতার কথা বলেছিলেন। প্যাণ্ডেলে রক্ষিত একটা ছোট টেবিলের উপর ওলড্ বয়েজ 'রেজিষ্টারে' একে একে আগত ওলড্ বয়েজদের মধ্যে প্রথমেই সই নিলাম স্যর আশুতোষের। তিনি আমার মত একটা ছোট মানুষের সামনে হেঁট হয়ে সই দিচ্ছেন, পরণে তাঁর ধুতি, গায়ে কালো কোট, আর কাশ্মীরি শাল ; দেখলাম তাঁর মাথার পরিধিটা কতখানি বিস্তৃত ও গোলাকার—নির্নিমেষ নেত্রে তাই দেখছিলাম। তাঁর পরে এলেন স্যর আশুতোষ চৌধুরী, তাঁর ভাই জে, চৌধুরী সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে ; পর পর বড় বড় ওলড্ বয়েরা এসে সই দিয়ে আসন গ্রহণ করছিলেন। এদিকে ডায়াসের উপর সমাসীন বাংলার লাট লর্ড কারমাইকেল ও তাঁর একসিকিউটিভ কাউন্সিলর জাঁদরেল স্যর পি, সি, লায়ন—যিনি বাংলার শাসন যন্ত্রের প্রকৃত পরিচালক ছিলেন। শব্দ শোনা গেল দূর কলেজ ষ্ট্রীটের দিক হতে 'হরি-ই বোল।'—'হরি-ই-বোল ?' সভার কাজ চলছে। স্যর দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী তখনই উঠে চলে গেলেন গেট পানে ; কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি ফিরে এলেন সঙ্গে করে প্রেসিডেন্সি কলেজের গোলড মেডালিষ্ট সুপ্রসিদ্ধ স্কলার প্রখ্যাত অনিমন্ত্রিত সাধু অতুল চম্পটীকে নিয়ে এবং মাননীয়দের সবারই সঙ্গে তাঁকে সমান আসনে বসিয়ে দিলেন। এখানেই ওলড বয়েজ ইউনিয়নের সার্থকতা। ছেলেদের মধ্যে অনেকের মনেই সন্দেহ

জেগেছিল ওল্ড বয় বল্‌তে কি শুধু বড় লোকই বুঝায়? কিন্তু চম্পটী ঠাকুরকে মর্য্যাদাদানের ব্যাপারে আমাদের সে সন্দেহ কেটে গেল। মাননীয় স্যর এস্‌, পি, সিংহ মহোদয় আমার ন্যায় ক্ষুদ্র এক ছাত্র সম্পাদককে চিঠি লিখে জানাতে দ্বিধা করলেন না যে অনিবার্য্য কারণে আমাদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য তাঁর হল না। তিনি তো অধ্যক্ষ জেম্‌স মহোদয়কে এচিঠি লিখতে পারতেন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজের সকল কাজেই আমাদের উৎসাহ দিতেন। আমি তাঁর শিষ্য নীলরতনদা, জ্ঞানদা, মেঘনাদদা, জীবন রতনদা, ছোট জ্ঞান (মুখার্জি) দা প্রভৃতির সহিত চার পাঁচ বছর এক সঙ্গেই ছিলাম। আমরা সবাই প্রতিদিন বিকালে মাঠে গিয়ে রবার্টস ষ্ট্যাচুর কাছে তাঁর সঙ্গে মিলতাম। ফিরবার সময় আমরা তাঁর গাড়ীতে চেপেই ফিরতাম-কেউ ভিতরে কেউ কেউ বা ছাদে আর কোচ বাক্সে বসে আসতাম; স্বাবলম্বী মেঘনাদদা ও আমি মাঝে মাঝে হেঁটে ফিরতাম। তিনি প্রতি রবিবার ভোরে নিজের কাপড়চোপড় নিজেই কাচতেন। তিনি আমায় ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে উৎসাহ দিতেন। সেই শুভ ইচ্ছাতেই হয়তো আমি পাহাড়পুরের প্রাথমিক খনন কার্যে "বাংলার ঐতিহাসিক-গণের পিতামহ" অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সি, আই, ই, মহোদয়ের পদপ্রান্তে বসতে পেয়েছিলাম। স্যার সুরেন্দ্র-নাথের স্বদেশী আমলের সহকর্মী সত্যানন্দ বসু মহাশয়ও তাঁর শকটারোহী ছিলেন। তিনি বার্ধক্যে ডঃ রায়ের সঙ্গী হতে পেরে খাদিজা বেগমের ন্যায় আপন সৌভাগ্যে গর্বান্বিত বোধ করতেন।

আমি তখন থার্ড ইয়ারে; সুভাষ কটক থেকে এসে ভর্ত্তি হল ফার্ষ্ট ইয়ারে; ম্যাট্রিকে তার প্লেস হয়েছিল সেকেণ্ড; আমার ভাই হেমন্তর সঙ্গে তার বিশেষ বন্ধুত্ব ঘটায় সে আমায় দাদার মত দেখত; তাতেই একবার আমায় লেখে, "আমি তোমার সঙ্গে ভক্তি ও ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ।" হেমন্ত তখন কৃষ্ণনগর কলেজে পড়ে, আর আমি তো প্রেসিডেন্সির ছাত্র ছিলাম সে সময়ে।

অবসর সময়ে বা ক্লাশ থেকে ক্লাশান্তরে যেতে সুভাষ স্মিত হাস্যে আমায় অভিনন্দন জানাত বা দু একটি কথাও বলত। ৩ নম্বর মির্জাপুর ষ্ট্রীটে কলেজ স্কয়ার ট্যাঙ্কের ঠিক দক্ষিণ ধারে তেতলায় থাকতেন মেডিক্যাল কলেজের খ্যাতনামা ছাত্র ডঃ বিধানচন্দ্র-শিষ্য সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় (পরে পশ্চিম বাংলার মন্ত্রী), তিনি বিকালে কথামৃত, স্বামিজীর রচনা প্রভৃতি পাঠান্তে আলোচনা করতেন। আমার সঙ্গে সুভাষ প্রায় যেত সেখানে। পাঠশোনা ও আলোচনার পর সন্ধ্যার আগেই আমরা বেরিয়ে আসতাম—সুভাষ হেঁটেই চলত তার এলগিন রোডের বাড়ী পানে, আর আমি তার সঙ্গে ছানাপটি পর্য্যন্ত এসে ১১০ নম্বর কলেজ ষ্ট্রীটের বাড়ীতে উঠতাম। বাড়ীখানির উপরতলায় ছিল আমাদের সুবিখ্যাত 'ডঃ রায়ের মেস' বলে পরিচিত ছাত্রাবাস, যেখানকার আবাসিকেরা 'পাইওনিয়র অব্‌ সায়ান্স' বলে সত্যই নিজেদের মনে করতেন। আত্মভোলা মৌলিক গবেষণা যজ্ঞের যাজ্ঞিক তাঁদের সাধনায় সে ভাব সদাই নন্দিত। স্যর প্রফুল্লচন্দ্র ও স্যর জগদীশচন্দ্রের উত্তরসাধক হতে পেরেছিলেন তাঁরা এই ভাবে।

সুভাষ কটক থেকে এসে যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে; অপূর্ব তার চেহারা ও ভাব সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। এক রবিবারে সুভাষ, সুরেশদা, যুগলদা, অমূল্য (উকীল) দা, যোগেন, বিমু, নীলমণি ও আমি বেলুড়মঠে যাই; সেখানে রাখাল মহারাজের সাদর আতিথ্য গ্রহণের পর এদিক ওদিক খানিক ঘুরে আমরা একখানা নৌকায় করে দক্ষিণেশ্বর যাওয়া স্থির করলাম, মঠের ঘাটে স্বামিজীর সমাধি মর্মর মূর্তির নীচে আমরা নৌকায় উঠলাম; সুভাষ বসল নৌকার আগার দিকে আসন করে, আর আমি তার পাশেই একটু পিছনে। অস্তোন্মুখ সূর্যের কনককিরণে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরচূড়া ঝলমল করছিল; সুভাষ গান ধরল সে অভাবনীয় মুহূর্তে ভাবগম্ভীর উদাত্তস্বরে!

নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি—নাহি শশাঙ্কসুন্দর
শোভে ব্যোমে ছায়া সম—ছবি বিশ্ব চরাচর
নির্মল মন আকাশে—জগৎসংসার ভাসে
উঠে নামে ডোবে পুনঃ—অহং স্রোতে নিরন্তর
অবাঙ্‌মনসো গোচরং—বুঝে প্রাণ বুঝে যার!

আমি তো প্রায় সপ্তাহান্তেই সুভাষকে নিয়ে আমাদের কৃষ্ণনগরের বাড়ীতে আসতাম, হেমন্তর সঙ্গে মিলতে। হেমন্ত বাড়ী থাকত, আর আমি তাকে এখানে ওখানে

বেড়াতে নিয়ে যেতাম। একবার আমরা দলে পুরু হয়ে নবদ্বীপ দর্শনে পায়ে হেটে যাই; পথে বল্লাল সেনের রাজবাড়ীর অবশেষ দেখে হুলোর ঘাটে পার হই; আমাদের দলে ছিলেন ডঃ মেঘনাদ সা, ডঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, নিরঞ্জন চক্রবর্তী (পরে ইনি ডাইরেক্টর জেনারল অব্ আর্কিওলজি হন) প্রভৃতি। নবদ্বীপের পারে উঠে আমরা মহাপ্রভুর বাড়ী গেলাম, মহাপ্রভু দর্শনের সময় সুভাষ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল বিগ্রহের পানে; তার পরিষ্কার নির্নিমেষ চোখ দিয়ে জলধারা ঝরছিল অবিরত ধারে—আমি মাঝে মাঝে তাই দেখছিলাম পাশে দাঁড়িয়ে; তার ওদিকে ছিলেন মেঘনাদদা, জ্ঞানদা প্রভৃতি; গৌরাঙ্গ দর্শনে তার কি ভাব হয় আমার জানবার ইচ্ছা হচ্ছিল; কারণ আমি ভাবতাম তার হাবভাব দেখে তার মধ্যে নিত্যানন্দের মত কোন শক্তির আবির্ভাব হবে। যাই হোক, ঘটনাচক্রের আবর্তনে পরে বিশ্বপ্রেমের মুখ ঘুরে গিয়েছিল স্বদেশপ্রেমের দিকে।

একদিন ডঃ রায় (স্যর পি, সি,) এর কাছে তাকে নিয়ে গেলে তিনি তার গাল টিপে ধরে বলে উঠলেন, "আরে, এযে জানকীর ছেলে—এযে গাল টিপলে দুধ বেরোয়রে।"—বলেই দিলেন এক কিল পিঠের উপর। পবিত্রতার সেই সুকুমার মূর্তি গোলমালের সময় আমায় বলে চলে গেল রাজনীতির আবর্তে ঝাঁপ দিতে—"তুমি থাকো—আমি চললাম!" সে কথা আমার প্রাণে এখনও বাজে মাঝে মাঝে—"তুমি থাকো—আমি চললাম।"

হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠাদিবসের প্রায় শতবার্ষিকী মুখেই ১৯১৪ সালে প্রথম কলেজ ম্যাগাজিনের প্রস্তাব করি। থার্ড ইয়ারে ভর্ত্তি হয়ে যখন কলেজ লাইব্রেরী টেবিলে বসে গ্রিফিথ সাহেবের 'এডুকেশন জারনাল' পড়তাম, তখনই আমার মনে জাগত কলেজের একটা এইরকম ম্যাগাজিন বা পত্রিকা থাকার দরকার। তাতে প্রকাশিত হিন্দু-হষ্টেলের His holiness the cook প্রভৃতির ছবি আমাদের কাছে খুব ভাল লাগত। দুধের তৃষ্ণা প্রথমে ঘোলে মিটানোর চেষ্টা হল; কলেজ গেটের একসমিলিটারী দীর্ঘকায় চাঁপদাড়ি-ওয়ালা দারবানের লম্বা স্থালিউটের, 'পায়জ্ পায়ে পাঞ্জাবী গায়ে চুলগুলি বৈবিক' করে বাংলার নবীন সাহিত্যিকের ও আরও অন্যান্ত সমসাময়িক বিষয়ের ছবি দিয়ে হিন্দু হষ্টেলে হাতে-লেখা ম্যাগাজিন বাহির করা হল; তাতে অংশ গ্রহণ করেন কৃষ্ণ হালদার, প্রফুল্ল হালদার, হেমেন্দ্র ভট্টাচার্য, ক্ষিতীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (পরে Cosmopolitan Review এক সম্পাদক হন), চারু গাঙ্গুলী প্রভৃতি। ছবিগুলির অনেক ক'খানি আমারই আঁকা ছিল।

এক রবিবারে কৃষ্ণনগরের বাড়ীতে হেমন্ত, সুভাষ ও আমি শুয়েছিলাম। আমার তখন ফোর্থ ইয়ার ও সুভাষ হেমন্তর সেকেণ্ড ইয়ার। আমি ও সুভাষ প্রেসিডেন্সিতে পড়তাম আর হেমন্ত পড়ত কৃষ্ণনগর কলেজে। আমি স্বপ্ন দেখলাম, আমি যেন আমাদের প্রিয় অধ্যাপক গিলক্রীষ্টের সামনে হাই ডেস্কে বসে কলেজ পত্রিকার প্রস্তাব করছি। ভোরে উঠে হেমন্তকে স্বপ্নের কথা বললে সে বলল, 'সুভাষকে' কলেজ ম্যাগাজিন হলে, তোর অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট করে নিস্; সে ইউরোপীয় স্কুলে মানুষ; লোকজনের সঙ্গে একেবারেই মিশতে পায় নি, তার চোখ ফোটার দরকার।'

অধ্যাপক গিলক্রীষ্টের ক্লাশের শেষে কলেজ-ম্যাগাজিনের প্রস্তাব করলাম তাঁর অনুমতি নিয়ে। তিনি তো খুব উৎসাহ দেখালেন। আমার প্রস্তাব নিয়ে তিনি অধ্যক্ষ জেম্‌সের কাছে যাওয়া মাত্র তিনি বললেন, 'একাজে সিনিয়র ষ্টুডেণ্ট চাই।' তখন আমার আশাপী ষষ্ঠ বার্ষিকের শ্রীপ্রমথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তদ্বন্ধু যোগীশ চক্রবর্তী হিন্দু হষ্টেলের তেতলায় আবাসিত তথাকথিত 'হাইল্যাণ্ডারদ্বয়কে বললাম; বলামাত্র তাঁরা সে প্রস্তাব সাগ্রহে নিলেন। ম্যাগাজিন বাহির হবে ঠিক হল; তবে চাঁদা বাধ্যতামূলক না হলে চলবে না—একথা আমরা জানালাম। অধ্যক্ষ মহোদয় বললেন 'তাহলে এ বিষয়ে সংবাদপত্রের সমর্থন চাই।' আমি 'হিতবাদী' ও 'বেঙ্গলী' সম্পাদক মহোদয়গণের সঙ্গে দেখা করি; হিতবাদীতে একটা লেখাও এ বিষয়ে দেই, স্যার সুরেন্দ্রনাথেরও সমর্থন আমরা পেয়েছিলাম, আমার পরলোকগত-বন্ধু ও তাঁর নাতী ব্রহ্মানন্দের বন্ধু হিসাবে। ক্লাশে ক্লাশে সভা করে বাধ্যতামূলক চাঁদার জন্য প্রস্তাব পাশ করা হল। ফিফ্‌থ ও সিক্‌স্‌থ ইয়ারের ভার নিয়েছিলেন প্রমথদা ও যোগীশদা; থার্ড ও ফোর্থ ইয়ারের ভার ছিল আমার

উপর, আর ফার্ষ্ট ও সেকেণ্ড ইয়ারের কাজের ভার দেওয়া হয় সুভাষের উপর। চাঁদা বাধ্যতামূলক করার পথে আর বাধা রইল না; জেম্‌স সাহেবের চেষ্টায় গভর্ণমেণ্ট বার্ষিক ২৫০০৲ টাকা গ্র্যাণ্ট দিতে রাজি হলেন। অনেক চেষ্টার পর কলেজম্যাগাজিন বাহির হল ১৯১৪ এর সেপ্টেম্বরে মনে হয়। প্রবীণের সঙ্গে তরুণ জীবনের সুর বেজে উঠল অধ্যক্ষ জেমসের আশীষপূত সেই 'অর্গ্যানে'। ম্যাগাজিন ডিষ্ট্রিবিউশনের ভার দিয়েছিলাম সুভাষের উপর; ষ্টেয়ার-কেসের পাশে কমনরুমের সামনে সে দাঁড়িয়ে—একমনে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে চলেছে; আমি ও মোহিত ক্লাশ্‌ থেকে এসে তার কাছে দাঁড়িয়ে আছি; আমার কাছেই এসে দাঁড়ালেন 'রমাপ্রসাদ, রবীন্দ্রচন্দ্র, জ্যোতির্ময়, সুকুমাররঞ্জন, বিজয় সিংহ রায়, প্রমথ দা, যোগীশদা প্রভৃতি, এমন সময়ে বেরিয়ে এলেন তাঁর ল্যাবরেটরী থেকে আচার্য স্যর পি, সি, রায়—অধ্যক্ষ জেম্‌স সাহেবের সঙ্গে উপরে দেখা করতে যাওয়ার পথে। তিনি থামলেন আমার ন্যায় ক্ষুদ্র এক ছাত্রের সামনে, আর কাঁধে হাত রেখে নাড়া দিয়ে বললেন, 'নেমসেক, ম্যাগাজিন তো দেখছি কলেজে ছেলেদের মধ্যে নতুন জীবনের সাড়া এনে দিয়েছে; সুভাষ আমার পাশে দাঁড়িয়ে পত্রিকা বিলিয়েই চলেছে; আচার্য তা দেখছেন, আর বলছেন, 'মাইকেলের সময়ে যে নবযুগের সাড়া পড়ে ছিল একশ বছর পরে তা আবার তোদের সামনে ঐ বুঝি এসে পড়ল। 'তিনি অঙ্গুলি নির্দেশে বলে উঠলেন যেন 'ফুটেছে উষার আলো—শোন ঐ চকিত পাখীর কাকলি।' প্রেসিডেন্সি কলেজে নতুন হাওয়া বইতে লাগল; তারপর কলেজে কলেজে পত্রিকা বাহির হতে লাগল, কেবল ছিল তা বঙ্গবাসী ও স্কটিশ চার্চ্চ কলেজে—মনে হয়। ডিরোজিও রিচার্ডসনের শিক্ষায় অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে মিলে বাংলায় নতুন ভাবের প্লাবন এনেছিল। অবশ্য সে প্লাবনে আবিলতাও ছিল যথেষ্ট; এবারেও শতবার্ষিকী সামনে করে তার নব কলেবরে নব আবির্ভাবের কতকটা আভাস পাওয়া যাচ্ছিল; তবে যাদের চোখ আছে তারাই তা দেখেছে —উষার আগমনে গাছের ডালের পাতায় পাতায় আঁধার পাকিয়ে থাকে কিনা।

তারপর বিধির বিধানে কোন এক ভুল বুঝাবুঝির ঘটনার পর আমাদের কলেজজীবনে ছেদ পড়ল। তবে আমি ম্যাগাজিনের কাজ চালিয়ে যেতাম অফিসের এক কোণে বসে; ওয়ার্ডসোয়ার্থ সাহেব তা দেখে একটু মুচকে হেসে চলে যেতেন।

দীর্ঘ পাঁচমাস বন্ধের পর কলেজ খুলল। ফিজিক্স থিয়েটারে সেদিন এক মহতী সভার অধিবেশন, ছাত্রগণ ও অধ্যাপক মণ্ডলী নিয়ে। সভাপতি অধ্যক্ষ ওয়ার্ড-সোয়ার্থ সাহেব স্বয়ং, আমার উপর ভার পড়েছিল ইউরোপীয় অধ্যাপকবৃন্দ ও ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে মনোমালিন্য অপসারণের আবেদন জানিয়ে নতুন করে গঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়ে কলেজজীবনের পুনর্গঠনের সহায়তা করতে সকলকে আহ্বান জানান। সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে ভাইস্‌-চ্যান্সেলর স্যর দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী অধ্যক্ষ ওয়ার্ডসোয়ার্থ মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমাদের মতামতের কথা। ইংরাজীতে বক্তৃতা করতে অনভ্যস্ত আমার ভাষণ দিতে প্রায় ২৫ মিনিট লেগেছিল। আমার সতীর্থ ও বন্ধুরা নীরবেই তা শুনেছিলেন। সকলেই জানতেন আন্তরিকতা ছাড়া আমার কোন অসাধারণত্ব বা বৈশিষ্ট্য ছিল না; আমি অভিজাত সম্প্রদায়ের ছেলেদের মধ্যে মফঃস্বলের একটি হীনবিত্ত ছাত্র মাত্র ছিলাম। আমাদের প্রতিষ্ঠিত বাংলা সাহিত্যসভা, পরীক্ষার্থী সাহায্য তহবিল প্রভৃতি বিভিন্ন ছাত্রপ্রতিষ্ঠান ছাড়াও গোলমালে লুপ্ত কলেজ পার্লামেণ্টের কাজের কতকটাও আমার উপর এসে বর্তাল। সকলেই আমাদের কাজে খুব উৎসাহ দিতেন। রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্রের প্রেরণায় ও স্যর প্রফুল্লচন্দ্রের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বাংলা সাহিত্য সভায় আমি বাংলায় এম, এ পাঠ্যের প্রস্তাব করি; সেজন্য বন্ধু পাঁচকড়ি সরকার উদ্যোক্তাদের নন্দিত করে বেনামী পত্র লিখেছিলেন। রমাপ্রসাদ ও অধ্যাপক মিত্র মহাশয়ের মুখে সকল কথা শুনে স্যর আশুতোষ বাংলায় এম, এ পাঠ প্রবর্তন করেন।

ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের সমর্থক ডেভিড হেয়ার, নবদ্বীপাধিপতি মহারাজা বাহাদুর সতীশচন্দ্র রায়, বর্দ্ধমানাধিপতি তেজচন্দ্র বাহাদুর, রাজা রামমোহন রায়, গোপীমোহন

ঠাকুর, গোপীনাথ দেব, লেঃ কর্ণেল আরভিন, স্যার এডওয়ার্ড ঈষ্ট প্রভৃতির অক্লান্ত প্রচেষ্টায় নব যুগের নব তপোবন হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়; সেই তপঃক্ষেত্র হতে আরম্ভ করে জ্ঞানের বিভিন্ন কেন্দ্র পর পর কখনও বা সমকালে বিকশিত-উন্মেষিত হতে লাগল। পুরাতন ঋষিদের তপোবনের মতই উদ্ভূত সেই সব জ্ঞানতীর্থ হতে দিঙ্‌মণ্ডল আলোকরা নতুন নতুন চিন্তাস্ফুলিঙ্গ উত্থিত হল। মাইকেল মধুসূদন, স্যর আশুতোষ, স্যর সত্যেন্দ্র-প্রসন্ন, স্বামী বিবেকানন্দ, নবীন সেন, রবীন্দ্রনাথ, আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ, আচার্য্য সত্যেন্দ্রনাথ, আচার্য্য মেঘনাদ, আচার্য্য নীলরতন, আচার্য্য জ্ঞানচন্দ্র, মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ, মহামহোপাধ্যায় আশুতোষ শাস্ত্রী, বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, হেমচন্দ্র, আচার্য্য সুনীতিকুমার, আচার্য্য ভাণ্ডারকর ও তারাপুরওয়ালা, আচার্য বিধুশেখর, শ্রীঅরবিন্দ ও প্রভু জগবন্ধু, অশ্বিনীকুমার ও শিশিরকুমার, আচার্য্য কালিস ও আচার্য্য শ্যামাপ্রসাদ, সম্পাদক অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথ, হেমন্তকুমার, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও সুরেন্দ্রনাথ, অধ্যক্ষ জেম্‌স, জ্যাকারিয়া ও স্যর জেহাঙ্গীরজী কয়েজী, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ও স্যার জগদীশচন্দ্র প্রভৃতির প্রতিভার ফলিত বা প্রতিফলিত আলোয় হিন্দু কলেজ কেন্দ্রিক সে তীর্থমালা দীপান্বিতার শোভা ধারণ করল! সে পবিত্র তীর্থক্ষেত্রের বর্ত্তমানের কর্ম্মী ও ভবিষ্যতের আশাস্থল নব বাংলার প্রবীণ সাধক ও তরুণ অন্তেবাসীর দলের নিকট আমার ন্যায় একজন সামান্য ভক্তের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা জানাই যে যুগোদয়ের নবজীবন শ্যামলিকার মাঝে তাঁদের জীবনপুষ্প বিচিত্র বর্ণে প্রস্ফুটিত, রঞ্জিত হয়ে দিক আমোদিত করুক, পূতশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যোত্থিত সঙ্কল্পময় ও আদর্শোজ্জ্বল প্রাণ জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয় সাধনে নবভাবে বিকশিত হয়ে পূর্ব সাধক-গণের সাধনার সিদ্ধির পূর্ণতা বিধান করতে। তাঁদের পুরোগামী সুভাষচন্দ্র আদর্শনিষ্ঠ ও কর্ম্মেঅচলসংকল্প থেকেই নেতাজী হতে পেরেছিলেন, মেঘনাদদা, সত্যেনদা, জ্ঞানদা প্রভৃতি সেই সাধনার মধ্যে দিয়েই উঠেছিলেন। স্বামিজীরও উদয় এইভাবে হয়। বিজ্ঞান ও কলাবিভাগে মৌলিকচিন্তা ও কর্ম্মধারায় প্রদীপ্ত জ্ঞানযোগীর দল এই-ভাবেই গড়ে উঠে নবীন জাতির পত্তন করেন।

রোমাঁ রোলাঁ

শ্রীসুধীর গুপ্ত

যে সত্তা মহান তা'র সবি যে মহান।
জন্ম-লগ্ন হ'তে তা'র মৃত্যু-মুহূর্ত্তের
বিদায় অবধি সবি ভাবের কর্ম্মের
বিচ্ছুরিত বিস্ময়ে যে দীপ্ত অনির্বাণ।
উচ্চাবচ-পথবাহী প্রবাহের গান
বার্ত্তা যথা উভ তটে দেয় সমুদ্রের,
আলোক-বর্ত্তিকা যত জলন্ত সূর্য্যের
জাজ্জ্বল্যমানতা যথা করে সপ্রমাণ,
অনন্তের-অভিব্যক্তি তেমনি প্রোজ্জ্বল
মহতেরও মর্ত্ত্য-কর্ম্মে। আনন্দ আত্মার
তাই স্মৃতিচারণায়। দীর্ণ চিত্ততল
স্মৃতির দীপ্তিতে লভে উল্লাস চলার।
কে না জানে, মহাঝঞ্ঝা মাঝেও মঙ্গল
আমৃত্যু-সাধনা ছিল অদম্য রোলাঁর।

[রোমাঁ রোলাঁর জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে।]

পথের ধারে

অরুণ দে

থমকে দাঁড়াল যোগীন।

রাগে তার দু'চোখ জ্বলছিল। ছুটে গিয়ে চুমকির চুলের মুঠি ধরে হিড় হিড় করে টেনে আনার ইচ্ছা হল। কিন্তু এগোতে গিয়েই খেয়াল হল যে তার একটা পা হাঁটু পর্যন্ত ভাঙ্গা। কাঠের বহু পুরাণ ক্রাচারটা সে শক্ত করে বগলে চেপে ধরে ডাকল, "চু-ম কি।"

হঠাৎ অমন রাগেভরা ভারী গলার ডাক শুনে পথ-চারীরা ফিরে তাকাল। ভাবল, ভিখারীটা হয়ত আজ আবার ক্ষেপে গেছে। কে একজন কি যেন বলল। কিন্তু যোগীন সেদিকে খেয়াল না করে আবার ডাকল, "চুমকি, চলে আয় বলছি। উঠে আয়।"

দূর থেকে চুমকি একবার ফিরে তাকাল, কিন্তু কোন উত্তর দিল না। যেমন গান শুনছিল তেমনই শুনতে লাগল।

অন্ধ ভিখারী পরাণ তখন প্রাণপণে চীৎকার করে গান গাইছে। একটা মাটির হাঁড়িতে আঙ্গুলের সাহায্যে তবলার মত আওয়াজ তুলে গানের সঙ্গে তাল রাখছে। তার চারপাশে অনেক লোক জমা হয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকে সামনে ছড়ান কাপড়টার উপর পয়সা ছুঁড়ে দিচ্ছে।

চুমকি লোলুপদৃষ্টিতে সেই পয়সার দিকে দেখছিল আর গান শুনছিল। চুমকিও ভিখারিণী। কিন্তু এত পয়সা এত অল্প সময়ে রোজগার করতে সে বড় একটা দেখে নি। কাশীমিত্র ঘাটের সব ভিখারীর পয়সা যেন অন্ধ লোকটা একাই টেনে নিচ্ছে।

গঙ্গার তীরে কাশীমিত্র ঘাটের এই ভিখারীদের আড্ডায় চুমকি এসে ডেরা বেঁধেছে অনেকদিন। সেই কবে খোঁড়া যোগীনের সঙ্গে সে এখানে পালিয়ে এসেছিল তা আজ আর তার মনে নেই। গঙ্গার তীরে কাশীমিত্রের শ্মশান। তার পাশে স্নানের ঘাট। ঘাটে যে বুড়ো বটগাছটা রয়েছে তারই তলায় বসে যোগীন রোজ ভিক্ষা করে। চুমকি শ্মশানের সামনের রাস্তাটায় ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বসে। রাস্তাটার ওপারে শিবের মন্দির। সেই মন্দিরের সামনে বসে আজ অন্ধ ভিখারীটা গান গাইছিল। চুমকি নিজের নির্দিষ্ট স্থান ছেড়ে উঠে এসেছিল সেখানে। গান শুনে সে নিজেই যেন মজে গেছে। মুগ্ধদৃষ্টিতে অন্ধের মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

ওদিকে যোগীন ক্রমাগত চীৎকার করে চলেছে, "চলে আয় চুমকি। চু-ম-কি…।"

উঠে এল চুমকি। যোগীনের কাছে এসে বলল, "হেই, তখন থেকে অমন ষাঁড়ের মত গলা ফাটাচ্ছিস কেনে?"

যোগীন বলল, "তোকে বলেছি না ঐ অন্ধ কুত্তাটার কাছে যাবি না—মনে নেই? ফের গেলে মাথা ফাটিয়ে ফেলব। খবরদার।"

চুমকি বলল, "কেনে নাগর—তোর চুমকিকে কি অন্ধটা কেড়ে নিবে? কেমন দু-হাতে পয়সা লুটছে দেখে আয়।"

"শালাকে এখান থেকে তাড়াতে হবে।" বলে যোগীন চুমকির হাত ধরে শ্মশান ঘাটে নিয়ে চলল। তার বজ্র-মুষ্টিতে ব্যথা পেয়ে চুমকি বলল, "ছাড়। হাত নয় তো ভাল্লুকের থাবা। ছাড় বলছি।"

যোগীন হাত ছাড়ল না। মুখখানা গম্ভীর করে সে বটতলায় এসে বসল।

পাখানা বাদ দিয়ে যোগীনের দেহের অন্য অংশের দিকে তাকালে তাকে শক্তিমান পুরুষ বলে মনে হয়। পেশীবহুল হাত ও বিস্তৃত বুকের ছাতি এখনও তার যৌবনের পরিচয়

দিচ্ছে। কিন্তু পা খানা শক্তিহীন—সরু লিকলিকে। এককালে এই ভাঙ্গা পা দেখিয়ে যোগীন কম রোজগার করে নি। ঘাটের স্নানার্থীরা তার অসহায়তায় দয়া দেখিয়েছে। কিন্তু অনেককাল এক জায়গায় থাকায় পুরাণ স্নানার্থীরা আর পয়সা দিতে চায় না। তবু পা-টা সামনে প্রসারিত করে যোগীন বলে চলে, "বাবু, আমি অক্ষম। একটা পয়সা রাজাবাবু।" রোজগার না হলে যোগীন অনায়াসে না খেয়ে কাটাতে পারে, সহ্য করতে পারে সব দুঃখ; কিন্তু চুমকি যদি অন্য কোন ভিখারীর দিকে নজর দেয় তবেই যেন তার মাথায় আগুন জলে ওঠে।···

চুমকি যোগীনের পাশে নীরবে বসেছিল। হঠাৎ বলে উঠল—"ওই—ওই যাচ্ছে।"

যোগীন বলল, "কে?"

"সেই বুড়ীটা," বলেই ছুটল চুমকি।

গঙ্গায় স্নান করে ফিরছিলেন এক বৃদ্ধা মহিলা। তার হাতে এক ঘটি পবিত্র গঙ্গাজল। চুমকি তার পথ আগলে দাড়াল।

"ছুঁসনে—ছুঁসনে," বলে দুপা পিছিয়ে গেলেন বৃদ্ধা। চুমকি খিল খিল করে হেসে বলল, "চারটা পয়সার কমে আজ পথ ছাড়ব না মা। ঠিক ছুঁয়ে দেব।" হাত বাড়াল চুমকি।

বৃদ্ধাকে এই একই ভাবে নিয়মিত বিরক্ত করে চুমকি। তিনি ধমক দিয়ে বললেন, "খেটে খেতে পারিস না? ভিক্ষে করিস কেন? গতরটা তো কম নয়।"

বৃদ্ধা পয়সা চুমকির হাতে দিল না। রাস্তায় ছুড়ে ফেলল। চুমকি পথ ছেড়ে পয়সা কুড়িয়ে নিতে গেল।

"হেই বাবু কি দেখছিস?" পয়সাটা তুলেই এক স্নানার্থীকে প্রশ্ন করল চুমকি। ভদ্রলোক মুখ ফিরিয়ে নিল। যেন শুনতে পায় নি। পয়সা কুড়োবার সময় চুমকির খালি গায়ের উপর ছেঁড়া কাপড়টার কিছু অংশ সরে গিয়েছিল। চুমকির দেহের সেই অনাবৃত অংশের দিকে তাকিয়েছিল লোকটি। সে উত্তর না দিলেও চুমকি ছাড়বার পাত্রী নয়। ভদ্রবেশী মানুষদের দুর্বলতার কথা সে জানে। সে আবার বলল, "হেই বাবু, পালাচ্ছিস কেনে?" লোকটির সামনে এসে সে হাত পেতে দাঁড়াল, "হেই বাবু—দুটো পয়সা।"

কোন কথা না বলে পয়সা দিয়ে লোকটি তাড়াতাড়ি চলে গেল। হি হি করে হেসে উঠল চুমকি।

কাশীমিত্র ঘাটের শ্মশানের সামনের রাস্তায় তার নির্দিষ্ট স্থানে এসে বসল চুমকি। সে দেখেছে অন্য জায়গা থেকে আজকাল এই শ্মশানের ধারেই ভাল রোজগার হয়। আগে সে শিবমন্দিরের পাশে বসত। কিন্তু মন্দিরে যারা পূজা দিতে আসে তারা আর আগের মত ভিখারীদের পয়সা দেয় না। বরং যারা শ্মশানে মড়া পোড়াতে আসে সে লোকগুলো অনেক উদার। শ্মশানের গেটে মড়ার খাট নামলেই চুমকি ছুটে যায়, "হেই বাবু, এ সগ্‌গে যাবে বাবু—একটা পয়সা দে।"

এক জায়গায় বেশীক্ষণ স্থির হয়ে বসতে পারে না চুমকি। সে বটগাছ তলায় যোগীনের কাছে ফিরে এল। যোগীনের দিকে তাকিয়ে সে চমকে উঠল। "হেই-ও কি করছিস?" চুমকি বলল যোগীনকে। যোগীনের হাতে এক জায়গায় কিছুদিন আগে ঘা হয়েছিল। যোগীন একটা ছুরি দিয়ে খুঁচিয়ে সেই ঘা-টা বড় করছিল। তার চেষ্টায় ছোট ঘা বেশ বড় দগদগে ঘা-এর রূপ নিয়েছে। চুমকি চীৎকার করে উঠল, "তুর কি মাথা খারাপ হয়েছে? ঘা বড় করছিস কেনে?" যোগীন বলল, "বাবুরা কি এমনি পয়সা দেবে? হাতে বড় ঘা দেখলে লোকের দয়া হবে, অনেক পয়সা কামাব।" চুমকি যোগীনের কাছ থেকে ছুরিটা কেড়ে নিয়ে গঙ্গায় ফেলে দিল। তারপর একটা ন্যাকড়া দিয়ে রক্তাক্ত ঘা-টা জড়িয়ে দিতে লাগল। তার সেবায় খুশী হয়ে যোগীন বলল, "হ্যারে, সকালে যে শক্ত করে তোর হাত ধরেছিলাম খুব লেগেছে না? হঠাৎ কি রকম যে চটে গেলাম। যন্ত্রণা আছে?"

চুমকি ঘা বাঁধতে বাঁধতে মুখ তুলে তাকাল। যোগীন আবার বলল, "শালা অন্ধটা নতুন এসেছে—কোথা থেকে এল রে?"

চুমকি বলল, "গান গেয়ে অন্ধ একলাই আমাদের সব পয়সা কামিয়ে নিচ্ছে।"

যোগীন বলল, "শালা আমাদের রোজগার মেরে দিল।"

চুমকি বলল, "উটাকে ইখান থিকে তাড়াতে হবে।"

যোগীন বলল, "অন্ধটা সেদিন তোকে একা পেয়ে কি বলছিল রে? শালা কি বলছিল তোকে?"

ফিক করে হেসে ফেলল চুমকি—"বুলছিল আমাকে নিকা করবে। ...আচ্ছা, তুর মনে এত হিংসা কেনে? যত বুড়ো হচ্ছিস তত হিংসা বাড়ছে।"

"হাত ছাড়, গঙ্গায় ডুব মেরে আসি," বলে যোগীন উঠে দাঁড়াল।

রাত্রি হয়ে এসেছে। যোগীন এই সময় নিয়মিত গঙ্গায় স্নান করে আসে। তারপর চুমকি আর তার ভিক্ষার পয়সা একত্র করে বাজারে যায় কিছু কেনার জন্য। চাল প্রায়ই কিনতে হয় না। কারণ গঙ্গায় স্নানার্থীদের মুষ্টিভিক্ষা হিসাবে অনেকের চাল দেবার অভ্যাস আছে। যোগীন বাজারে গেলে চুমকি রোজ বটতলায় রাঁধতে বসে। শ্মশান থেকে আধপোড়া কাঠ নিয়ে এসে উনুন ধরায়।

আজও উনুন ধরিয়ে চুমকি তার কানাভাঙ্গা মাটির হাড়িটা সবে মাত্র উনুনে চাপিয়েছে এমন সময় শুনতে পেল তার নাম ধরে কে যেন ডাকছে।

"চু-ম-কি"—সেই অন্ধটা তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

"হেই উস্তাদ! বোস নাগর বোস।" বলল চুমকি।

"তুই কোথায়? আমার হাত না ধরলে কিছু দেখতে পাই না" বলল অন্ধ।

হাত ধরে চুমকি তাকে বটতলায় বসিয়ে বলল, "আজ রোজগার কেমন হল?"

"দশ টাকা" বলল অন্ধ।

"দ-শ টা-কা!" বিস্ফারিত নেত্রে তাকাল চুমকি।

"আজ শিবপুজা ছিল তাই রোজগার মন্দ হল না।" বলল অন্ধ। তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে যোগ করল, "শুধু নিজের জন্য রোজগার করে সুখ নাই।"

"অ। তা ইথানে আইছ কেনে?"

"মন চায়। তোর জন্য মনটা নিসপিস করে।"

"হেই মা গো। কি বুলছ, আমার যে আঁদমী আছে।"

"যোগীন? ঐ খোঁড়াটা? ভয় নাই। আমি ওর মত দশটাকে—

বলতে বলতে অন্ধ চুমকির হাত চেপে ধরল।

চুমকি বলল, "যদি বাজার থেকে এসে ও তুমায় দেখে তো কেটে ফেলবে। হাত ছাড়।"

"আমি কাউকে ডরাই না। শুধু তুই যদি—"

"পালাও। আমার অনেক কাম আছে।"

উনুন থেকে হাঁড়িটা নামাল চুমকি। অন্ধ বলল, "বুঝলি চুমকি, অন্ধ হলেও আমি জোয়ান মনিষ্যি। কামাইও ভাল। এখন তুই যদি—"

"পালাও। না হয় গরম ফ্যান গায়ে ঢেলে দিব।

...ধীরে ধীরে চলে গেল অন্ধ। যেতে যেতে গান ধরল—

পরাণবন্ধু কই গো আমার কোথায় গেলে পাই

চাতক যেমন বারি যাচে আমি তারে চাই।...

বাজার থেকে ফিরে যোগীন খাওয়া দাওয়ার পর চুমকির কাছে সব কথা শুনল। চুমকি হাসতে হাসতে অন্ধ ভিখারীর গল্প করল। যা ঘটেছিল তার সঙ্গে আরও মিথ্যা-কাহিনী যোগ করল। সব শুনে যোগীন গুম হয়ে বসে রইল। মনে মনে হাসল চুমকি। মুখে বলল, "রাত অনেক হল। শুবে নাই? রাগ করে আর কি হবে।"

মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল চুমকির। তারই নাম ধরে কে যেন ডাকছে। উঠে দেখল পাশে যোগীন নেই। মনে হল দূরে গঙ্গার ধারে দুটো লোক ধস্তাধস্তি করছে। সেদিকে ছুটে গেল চুমকি। যা ভেবেছে ঠিক তাই। যোগীন আর অন্ধ ভিখারী মারামারি করছে। অন্ধ ভিখারীর কপাল ফেটে রক্ত পড়ছে। চুমকির উনুনের পোড়া কাঠটা সামনে পড়ে আছে। ওটা দিয়ে নিশ্চয়ই যোগীন অন্ধটার কপাল ফাটিয়েছে। ফাটা কপাল নিয়েও লড়ছে অন্ধটা। দেখতে দেখতে সে যোগীনের বুকের উপর বসে তার গলা চেপে ধরল।

"হেই-মরে যাবে যে।"—ছুটে এল চুমকি।

"অন্ধকারে শালা আমায় মারতে এসেছিল। আজ শালার জান নিয়ে নেব," বলে অন্ধটা যোগীনকে আরও চেপে ধরল। যোগীনের ক্র্যাচারটা দূরে পড়েছিল। যন্ত্রণায় তার চোখমুখ লাল হয়ে উঠেছিল। অসহায় ভাবে সরু ভাঙ্গা পা ছোড়বার চেষ্টা করছিল।

চুমকি ছুটে গিয়ে অন্ধের হাত ধরল, "ছেড়ে দে। ছেড়ে দে ওস্তাদ—মরে যাবে।"

ক্ষণকাল কি ভাবল অন্ধ। তারপর যোগীনকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। চুমকি অন্ধের পেশীবহুল দেহের দিকে তাকাল। তারপর ক্যাচারটা কুড়িয়ে এনে যোগীনকে নিয়ে নিজেদের বটতলায় ফিরে এল।

পরদিন যোগীন আর চুমকি দুজনে মিলে ঠিক করল—যেমন করে হোক অন্ধ ভিখারীকে কাশীমিত্র ঘাট থেকে তাড়াবে। যোগীন প্রথমটা অন্ধকে হত্যার প্রস্তাব করেছিল।

কিন্তু সে প্রস্তাবে রাজী হল না চুমকি।

সে মনে মনে ঠিক করল অন্ধকে প্রাণে না মেরে ওর রোজগারের পথ বন্ধ করতে হবে। অন্ধের পা এমনভাবে ভাঙ্গতে হবে যে সে যেন কোনকালে বিছানা ছেড়ে উঠতে না পারে।

যোগীনকে নিজের মতলবের কথা জানাল না চুমকি। সে স্থির করল যে সে একাই রাত্রির অন্ধকারে অন্ধের কাছে গিয়ে কাটারির এক আঘাত দেবে অন্ধের পায়ে। তারপর অন্ধকারেই পালিয়ে আসবে।

পরদিন।

রাত্রি তখন গভীর। চুমকি বিছানা ছেড়ে উঠল। পাশে তাকাল একবার—মনে হল যোগীন অঘোরে ঘুমাচ্ছে। চুমকির চোখে কিন্তু ঘুম নেই। তার বুকে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছিল।

ধারাল কাটারিটা কাপড়ের তলায় লুকিয়ে নিয়ে এগিয়ে চলল চুমকি।

গঙ্গার ধারে যেখানে অন্ধটা শুয়ে থাকে সেখানে গিয়ে আজই প্রতিশোধ নিতে হবে।

চারিদিকে তরল অন্ধকার। পথ নির্জন। গঙ্গার ধারে নির্দিষ্ট জায়গায় এসে চমকে উঠল চুমকি। অন্ধটা পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে। নিজের হাতের কাটারির দিকে একবার দেখল চুমকি, তারপর অন্ধের পায়ের দিকে তাকাল।

সরীসৃপের মত নিঃশব্দে এগোতে যাচ্ছিল চুমকি। পেছন থেকে কে যেন তার কাপড় টেনে ধরল। সভয়ে চুমকি ফিরে দেখল যোগীন দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখে আগুন জ্বলছে। সে বলল, "ছিনালী, আমার চোখে ধুলো দিয়ে কোথায় যাচ্ছিস? ভেবেছিলি, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি তাই না? রোজ রাতে লুকিয়ে পিরীত করতে চলে আসিস—আজ ধরা পড়ে গেইল—কি বল?"

"কাপড় ছাড়। বেশ করি পিরীত করি—তোর কি? বুড়ার ভীমরতি ধইরেছে। ছাড়।"

—এক ঝটকায় কাপড়টা টেনে নিল চুমকি।

দ্বিগুণ ক্রোধে যোগীন এবার চুমকির গলা চেপে ধরে বলল, "আমি বুড়া তাই জোয়ানের সঙ্গে মজা লুটতে প্রাণ চায় তাই না, আয় তোরে পিরীতের রসটা টের পাওয়াই।"

চুমকি কি একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু বলা হল না। যোগীন প্রাণপণ শক্তিতে চুমকির টুঁটি চেপে ধরল। একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে নীরব হয়ে গেল চুমকি। তার নিষ্প্রাণ দেহটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

হঠাৎ শব্দ শুনে ঘুম ভেঙ্গে গেল অন্ধের। "কে? কে!" বলে সে তাড়াতাড়ি উঠে বসল।

অন্ধের গলার আওয়াজে চমকিত হল যোগীন। কোন উত্তর দিল না। নিঃশব্দে পালিয়ে গেল চিরদিনের জন্য কাশীমিত্রের ঘাট ছেড়ে অনেক দূরদেশে।

দক্ষিণ অ্যাং

শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

—১১—

পাম্বন্ থেকে মাদ্রাজগামী মেল্ ধরে মানামাথুরৈ জংশনে পৌছলাম বিকেল পাঁচটায়।

গাড়ী ওখানে বিশ মিনিট রইলো।

গাড়ী ছাড়তেই নজরে পড়লো স্টেশনের লাগাও, রেল লাইনের ধারের বাড়ীগুলির প্রবেশ পথে আজ বিশেষ আলিম্পনের সমারোহ। অবশ্য বাড়ীর প্রবেশ দ্বারের সুমুখে আলপনা দেওয়া এদেশে নিত্য কৃত্য।

কতকগুলি পিক্নিক্ প্রত্যাগত ছোট ছোট দল চলেছে। ছেলে বুড়ো সবাই খুব সেজেছে।

আজ পোঙগল্-এর প্রথম দিন,—ভোগি পোঙ্গল্।

পোঙ্গল্ তমিলর্ নাড়ুর প্রধান গ্রামীণ উৎসব। ঠিক বাঙ্গলা দেশের পৌষ-পার্বণের মত তিন দিনের অনুষ্ঠান।

পৌষ সংক্রান্তির আগের দিন থেকে হয় উৎসবের সূত্রপাত। প্রথম দিনটি বন-ভোজন, বেড়ানো ও দেখা সাক্ষাতের জন্য নির্দিষ্ট। দ্বিতীয় দিনে সূর্যের উদ্দেশে নতুন চালের পরমান্ন নিবেদন করা হয়। ঐ দিনটির নাম সূর্য পোঙ্গল্। তৃতীয় দিনটি মাড়ু পোঙ্গল্ গো-পরিচর্যার দিন। প্রাণীগুলিকে সেদিন স্নান করিয়ে, শিং ঘষে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়। অনেকে ওদের শিং রঙ করে দেন। ফুলের মালা পরানো হয়; নতুন গলঘণ্টি, কড়ির মালা ইত্যাদি বাঁধা হয়। তারপর, দেবোদ্দেশে উৎসর্গ করা অন্ন পশুগুলিকে খেতে দেওয়া হয়।

দীপালী তমিলর্ নাড়ুর জাতীয় উৎসব হলেও পোঙ্গল এর মর্যাদা যেন বেশী।

কৃষিপ্রধান দেশে কৃষকের পার্বণের পক্ষে তাই স্বাভাবিক।

রাত সাড়ে ন'টায় গাড়ী পৌছলো তিরুশিরাপপল্‌লী। ইংরেজরা যাকে ত্রিচিনাপল্লী বা সংক্ষেপে ত্রিচি বলতেন, তারই দেশীয় নাম তিরুশিরাপ্পল্‌লী (তিরুশিরাপল্লী)। স্বাধীনতার পর এই নামটি প্রচলিত হয়েছে।

ইংরেজী ও তমিলর্ ভাষায় লেখা হয়—তিরুচিরা-প্পল্‌লী। কিন্তু 'চিরা' অংশটুকু 'শিরা' হিসাবে উচ্চারিত হয়। তমিলর্ ভাষায় 'শ' নামে কোনও পৃথক অক্ষর নেই। প্রয়োজন বোধে 'চ' অক্ষরটিই 'শ' হিসাবে ব্যবহৃত ও উচ্চারিত হয়।

পুণ্য-সলিলা কাবেরী কূলে সুন্দরী নগরী তিরুশিরা-প্পল্‌লী। নামটির উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, রাবণের বংশধর ত্রি-শির রাক্ষস এই স্থানে বাস ও মহা-দেবের তপস্যায় কালাতিপাত করতো। তপস্যায় শিবকে

কাবেরী কূলে তিরুশিরাপ্‌পল্লী

তুষ্ট করে ত্রি-শির বহু বর লাভ করেছিল। তারই নাম হতে স্থানটির নাম ত্রিশিরাপল্লী এবং শেষ পর্যন্ত তিরুশিরাপ্‌পল্‌লী হয়েছে।

অনেকে বলেন,, এর সঠিক নাম তিরু-শিলা-পল্লী।

তিরু অর্থে পবিত্র। তিরু-শিলা-পল্লীর অর্থ পবিত্র শিলাযুক্ত বসতি।

জনপদটি মহাদেবের মন্দির যুক্ত একটি ছোট পাহাড়ের সানুদেশে অবস্থিত হওয়ায় এই নামটির অর্থ সুস্পষ্ট।

মতান্তরে, কথাটি তিরু-চিন্‌ন-পল্লী।

তমিল্‌ ভাষায় চিন্‌ন শব্দের অর্থ ছোট। তিরু চিন্‌ন পল্লীর অর্থ দাঁড়ায় ক্ষুদ্র পবিত্র বসতি।

তিরু চিন্‌ন পল্লী থেকেই ইংরেজরা ত্রিচিনাপল্লী করেছিলেন—এ যুক্তিও অগ্রাহ্য করা যায় না।

সন্নিহিত অরি-উর্‌ ছিল চোলর্‌ রাজগণের রাজধানী। আর তাঁদেরই অধীন ছিল তিরুশিরাপ্‌পল্‌লী।

১৩১০ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দিন খিল্‌জীর সেনাপতি মালিক কাফুর দক্ষিণাপথ অভিযান করেন এবং অরি-উর্‌ সমেত চোলর্‌ রাজ্য ধ্বংস করেন। তখন হতে তিরুশিরাপ্‌পল্‌লীতে কিছুকাল মুসলিম আধিপত্য চলে।

ঐ শতাব্দীতেই বিজয়নগররাজ অচ্যুত রায়লু তিরুশিরাপ্‌পল্‌লীকে নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

বিজয়নগররাজ্যের পতনের পর এখানে মথুরৈর নায়ক কুলের প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিরুশিরাপ্‌পল্‌লী নায়ককুলের অধীন থাকে। তারপর এখানে আবার প্রতিষ্ঠিত হয়, মুসলিম অধিকার।

ঐ বছরে কর্ণাটের চাঁদ সাহেব তিরুশিরাপ্‌পল্‌লী দখল করেন।

কিছুকাল পরে স্থানটির জন্য চাঁদ সাহেব ও আর্‌কাট্‌-এর মহম্মদ আলির মধ্যে সঙ্ঘর্ষ হয়। এই সময়ে পট-ভূমিতে উপস্থিত হন ইংরেজ ও ফরাসীরা। ডুপ্লের নেতৃত্বে ফরাসীরা এবং ক্লাইভের পরিচালনায় ইংরেজরা যথাক্রমে চাঁদ সাহেব ও মহম্মদ আলির পক্ষ গ্রহণ করেন।

ক্লাইভ বেশ কিছুকাল তিরুশিরাপ্‌পল্‌লীতে কাটিয়েছিলেন।

তিনি যে বাড়ীটিতে বাস করতেন সেই বাড়ীটি বর্তমানে সেন্ট্‌ জোসেফ্‌ কলেজের সঙ্গে সংযুক্ত। বাড়ীটির নামকরণ হয়েছে ক্লাইভ হোস্টেল।

১৮০১ খৃষ্টাব্দে তিরুশিরাপ্‌পল্‌লী সম্পূর্ণরূপে ইংরেজ করতল গত হয়।

তিরুশিরাপ্‌পল্‌লী জংশন স্টেশন থেকে যখন শহরের রক্‌ফোর্ট অঞ্চলে পৌছলাম তখন রাত দশটা বেজে গেছে।

ফোর্ট্‌ গেট্‌-এর কাছেই সর্বাধিক সংখ্যক হোটেল

রক্‌ ফোর্ট্‌—তিরুশিরাপ্‌পল্লী

ও লজিং হাউস্‌-এর ভিড়। ওরই মধ্যে একটায় ঠাঁই

নিলাম। জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি হলেও তখন বেশ গরম।

স্নান সেরে ঘরের খোলা জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই চোখে পড়লো রক্ ফোর্ট-এর পাহাড়টির মাথায় জ্বলছে তীব্র নীল আলো। সারা রাতই জ্বলবে ঐ আলো, এই শহরের প্রধানতম দ্রষ্টব্যটিকে সূচিত করতে।

সকাল হতেই প্রাতঃকৃত্য সেরে এগোলাম রক্ ফোর্ট-এর দিকে।

রক্ ফোর্ট নামটি প্রচলিত থাকলেও ফোর্ট-এর অস্তিত্ব নেই। তবে, পাহাড়ের চূড়ায়, রাতের নীল আলোর নিশানার নীচেই রয়েছে একটি মন্দির।

সমতল হতে ২৭৩ ফিট্ উঁচুতে মন্দিরটি। পল্লব২ রাজগণ কর্তৃক একাদশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত এই দেবালয়ের নাম তায়ুমানব২র্ বা মাতৃভূতেশ্বর কোয়িল্। দেবতার নাম তায়ুমান্। নামটির অর্থ ধাত্রী। এই ধাত্রী দেবতা সম্বন্ধে একটি সুন্দর কাহিনী প্রচলিত:

রত্নাবতী নামে শিব-উপাসিকা একটি স্থানীয় যুবতীর প্রসব বেদনা উপস্থিত হলে তার স্বামী ধনগুপ্ত অত্যন্ত অসহায় হয়ে পড়ে। কারণ, তাদের আত্মীয় স্বজন বলতে কাছাকাছি কেউই ছিলেন না। কাবে২রীর অপর পারে থাকতেন রত্নাবতীর মা। খবর দেওয়া সত্ত্বেও, নদীতে বন্যার দরুণ, তিনি আসতে পারেন নি।

স্বামীটি অত্যন্ত কাতর হয়ে গ্রাম্য দেবতা মহাদেবের প্রার্থনা করতে লাগলো।

হঠাৎ দ্বারে করাঘাত শুনে দ্বার উন্মুক্ত করে ধনগুপ্ত দেখলো রত্নাবলীর মা এসে গেছেন।

প্রসবকার্য নির্বিঘ্নে সমাধা হলো।

কিছুক্ষণ পরে আবার করাঘাত শুনে ধনগুপ্ত দ্বার খুলে দেখে রত্নাবতীর মা!

ধনগুপ্ত বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলো।

তখন প্রথম মহিলাটি ছদ্মবেশ ত্যাগ করে ধনগুপ্তকে নিজের প্রকৃত রূপে দর্শন দিলেন। দর্শন দিলেন শিবরূপে।

শিব-প্রাণা রত্নাবতীর বিপজ্জনক অবস্থা দেখে ধাত্রীরূপে ছুটে এসেছিলেন ভক্তের ভগবান।

ঐ ঘটনাকে ভিত্তি করেই দেবতার নাম হয়েছে তায়ুমানব২র্। মন্দির মধ্যে কতকগুলি চিত্রপটে বিবৃত হয়েছে ঘটনাটি।

মন্দিরে বিরাজ করছেন মাতৃভূতেশ্বর মহাদেব ও তাঁর শক্তি,—সুগন্ধি-কুন্তল-আম্মল্।

মন্দিরটি যে পাহাড়ে অবস্থিত সেই পাহাড়টির সম্বন্ধেও চমৎকার এক উপাখ্যান আছে:

পৃথিবীর শৈশবকালে, এক সময়ে মহাদেব কৈলাস-শিখরে ধ্যানস্থ ছিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, বরুণ, পবনাদি দেবগণ এবং আদিশেষ-নাগ দেবাদিদেবের দর্শনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

কথায় কথায় ব্রহ্মাদি দেবতারা পৃথিবীকে স্বীয় সপ্ত ফণার উপর ধারণ করে রাখার জন্য আদিশেষের বিশেষ প্রশংসা করলেন।

তাই শুনে পবনের ভীষণ হিংসা ও রাগ হলো। তিনি আদিশেষের সঙ্গে বাক্‌বিতণ্ডা শুরু করলেন এবং আদিশেষকে শক্তি পরীক্ষায় আহ্বান করে বসলেন।

স্থির হলো, আদিশেষ কৈলাস পর্বতকে স্বীয় শরীর দিয়ে বেষ্টন করবেন ও পবন তাঁর বেগ দিয়ে সেই বন্ধন উন্মোচন করবেন।

আদিশেষ কৈলাসকে তখনি স্বীয় অঙ্গ-বেষ্টনীতে আবদ্ধ করলেন। বায়ু প্রচণ্ড শক্তিতে সেই বন্ধন উন্মোচনের জন্য ধাবিত হলেন কিন্তু শত চেষ্টাতেও সফল হলেন না। পরাজিত হওয়ায় বায়ু আরম্ভ করলেন ভয়ঙ্কর এক ধ্বংসলীলা।

ধরিত্রীর সমূহ বিপদ দেখে শিব তখন তার রক্ষায় এগিয়ে এলেন। তিনি আদিশেষকে বন্ধন শিথিল করতে বললেন।

মহাদেবের নির্দেশ মত আদিশেষ তার বন্ধন শিথিল করে দিতেই বায়ু এত প্রচণ্ড বেগে ধাবিত হলেন যে, কৈলাসের তিনটি শিখর বিচ্ছিন্ন হয়ে দিকে দিকে ছিট্‌কে পড়লো।

তারই একটি ত্রিরুশিরাপ্‌পল্‌২লীর তায়ুমানব২র্ অধ্যুষিত পাহাড়টি।

তায়ুমানব২র্ মন্দির হতে একটু উঁচুতে বিনায়কের গুহা-মন্দির। এটি ষষ্ঠ শতাব্দীতে পল্লব২ রাজ মহেন্দ্র বর্মনের সময়ে নির্মিত।

ষোড়শ শতাব্দীতে কাছাকাছি অঞ্চলগুলিতে যখন মুসলিম আধিপত্য ও যুদ্ধ-বিগ্রহ বাড়তে থাকে তখন মথুরৈরাজ বিশ্বনাথ নায়ক তায়ুমানবর্ মন্দিরটিকে প্রাকার দিয়ে সুরক্ষিত করেন। পাহাড়ের নীচেও তিনি দু সারি রক্ষা-প্রাচীর নির্মাণ করেন এবং প্রাচীর দুটির মাঝখানে গড়খাই খনন করে জলপূর্ণ করে দেন।

পাহাড়ের নীচের বর্তমান তেপ্পকুলম্টি বিশ্বনাথ নায়কেরই সৃষ্টি।

তিরুশিরাপ্পল্লীর কাছাকাছি আরও দুটি বিখ্যাত দেবস্থান আছে।

একটি বৈষ্ণবদের পরমতীর্থ শ্রীরঙ্গম্-এর শ্রীরঙ্গনাথ এবং অপরটি জম্বুকেশ্বরম্ গ্রামের স্বয়ম্ভু অপ্-লিঙ্গ,—শৈব তীর্থ।

দক্ষিণাপথে শৈব ও বৈষ্ণবই প্রধান দুটি সম্প্রদায়। উভয় সম্প্রদায়েই বহু মহান্ আচার্য, উপাধ্যায়, সাধু, সন্ত এবং রাজা মহারাজার আবির্ভাব ঘটেছিল।

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী হতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে দক্ষিণ ভারতে ৬৩ জন বিশিষ্ট শৈব মহাপুরুষ ও ১২ জন বৈষ্ণব মহাত্মা আবির্ভূত হয়েছিলেন।

স্থানীয় রাজন্যবর্গও বিষ্ণু অথবা শিবের উপাসক হওয়ায় বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মমত দক্ষিণাপথে বিশেষ প্রসার লাভ করতে পারেনি।

এর আর একটি কারণ স্বরূপ অনেকে বলেন যে, দশম শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত নাকি দক্ষিণভারতে জাতিভেদ প্রথার তেমন প্রচলন ঘটেনি। দশম হতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যেই এ অঞ্চলে জাতিভেদ প্রথার বিশেষ প্রচলন ঘটে বলেই অনুমিত হয়।

দ্বাদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হন সমাজ সংস্কারক ও পরম বৈষ্ণব রামানুজ। শুধু দক্ষিণাপথেই নয়, তিনি সারা ভারতের দিকে দিকে বৈষ্ণব ধর্মের বিজয় পতাকা উড্ডীন করে যান।

হোয়সল রাজ বিট্টল দেবকে জৈন হতে বৈষ্ণব মতে উপনীত করেন রামানুজ। (পরবর্তীকালে এই বিট্টল দেবেরই নাম হয়েছিল বিষ্ণুবর্ধন। ইনি বেলুর্-এর সুবিখ্যাত চেন্ন-কেশব মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা।)

প্রখ্যাত শৈবগুরু বাসবন্ন ১১৫৬ হতে ১১৬৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বীর শৈব বা লিঙ্গায়েত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করে যান। তখন হতে শৈবরা আবার প্রবল হয়ে ওঠেন। অষ্টম হতে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে পাঁচজন দিক্‌পাল ধর্মগুরুর আবির্ভাব ঘটেছিল দক্ষিণাপথে। যাঁদের মধ্যে—

প্রথম, কেরল প্রদেশের মালাবারী নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ আচার্য শঙ্কর। প্রচার করেন অদ্বৈতবাদ।

দ্বিতীয়, তমিল নাড়ুর তেলুগু ব্রাহ্মণ রামানুজ। প্রচার করেন বিশিষ্ট-অদ্বৈতবাদ।

তৃতীয়, কলচুরি রাজ্যের কন্নড় ব্রাহ্মণ বাসবন্ন প্রতিষ্ঠা করেন বীর শৈব সম্প্রদায়।

চতুর্থ, তেলুগু ব্রাহ্মণ রামানন্দ। ইনি রামানুজ পন্থী। এঁরই শিষ্য প্রখ্যাতভক্ত কবীর।

পঞ্চম, মৈশূর্-এর কন্নড় ব্রাহ্মণ মাধবাচার্য। প্রচার করেন দ্বৈতবাদ।

দক্ষিণভারত সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে প্রথমেই তার কাছে আমাদের একটি অপরিশোধ্য ঋণের কথা মনে রাখা উচিত। মনে রাখা উচিত, দক্ষিণাপথ আমাদের দিয়েছিল আচার্য শঙ্কর এবং রামানুজ-এর মত জ্ঞান-লোকের দুই মূর্তিমান বিস্ময়।

বিকেলের দিকে তিরুশিরাপ্পল্লীর বিগ্-বাজার অঞ্চলে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে নজরে পড়লো এক বিস্ময়কর পণ্য। একটি মহিলা মাথার চুল কিনছিলেন। দক্ষিণাপথে কয়েকটি দেবস্থানে স্ত্রীলোকদের মুণ্ডন বিধি আছে। যেমন আছে, তিরুপতির সুবিখ্যাত বেঙ্কটেশ্বর মন্দিরে।

স্বামীর জীবিতাবস্থায়ও স্ত্রীর মুণ্ডন এ অঞ্চলে বিধি-সম্মত। তাই স্ত্রীলোকদের মধ্যে প্রচুর মুণ্ডনের ফলে যে কেশরাশি সঞ্চিত হয় তা বিক্রী হয় বাজারে। কেশ-সজ্জায় স্বল্প-কেশিনীরা ঐ কেশ ব্যবহার করেন।

উদ্দেশ্য ?—

অবশ্যই নিজ কেশ দীর্ঘতর দেখানো।

[ক্রমশঃ

কবি রজনীকান্ত

শ্রীঅম্বিকাচরণ চৌধুরী

বাঙালীর ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। বাঙালী আজ জগিয়াছে। পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত ভারতবাসী বিশ্বের দরবারে সগৌরবে দাঁড়াইয়া ভারতের লুপ্ত গরিমা পুনরুদ্ধারের উন্মাদ আগ্রহে মাতিয়া উঠিয়াছে। বাঙলার তথা ভারতের এই গান জাগরণের প্রেরণা জোগাইয়াছিলেন প্রধানতঃ এই বঙ্গভূমির কবি ও সাহিত্যিকেরা; স্বাধীনতার প্রথম সামগান এই বাঙলার আকাশেই ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল; বাঙালীই ভারতের মুক্তিপথের মুক্তিযজ্ঞের পথ প্রদর্শক।

বাঙালার বঙ্কিম মধু-হেম-নবীন দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীরা সুষুপ্ত বাঙালীর কর্ণে জাতীয় মুক্তির গুপ্ত-মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। এই সকল প্রতিভাধর শিল্পীর আবির্ভাব ঘটিয়াছিল বলিয়াই ভারতের স্বাধীনতা যজ্ঞের অনুষ্ঠান সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে।

ঊনবিংশ শতকের বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাসে পূর্বোক্ত মনীষীদের সমগোত্রীয় কয়েকজন অপেক্ষাকৃত স্বল্প-খ্যাত কবির সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁহাদের মধ্যে কান্ত কবি—রজনীকান্ত সেনের নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। নিতান্ত পরিতাপের বিষয়, এই শক্তিমান কবিকে বাঙালী ক্রমশঃ বিস্মৃত হইতে চলিয়াছে। যে কান্ত কবির অজস্র সংগীত রসধারায় বাঙলার জাতীয় জীবন একদা পরিপ্লুত হইয়াছিল, যাঁহার লেখনীর অমৃতস্পর্শে বেদনায় ম্লান ব্যর্থতায় ভগ্নোৎসাহ বাঙালী নূতন আশা ও আনন্দের সন্ধান পাইয়াছিল, যাঁহার গানের সুরে সুরে মোহান্ধ জাতি জাগরণের মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিল এবং ক্লৈব্য পরিহার করিয়া জাতীয় জীবন-গঠনের দুর্বার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল, যিনি তাঁহার কবিতার সুরমাধুর্যে সমগ্র বাঙলা দেশকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই কবির প্রতি বাঙালী জনসাধারণের এই ঔদাসীন্য সত্যই লজ্জাকর।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম্" এবং কবিগুরু রবীন্দ্র-নাথের "জনগণ মন অধিনায়ক" স্বাধীন ভারতের জাতীয় সংগীত। এই মনীষীদ্বয়ের প্রতি আমাদের জাতীয় শ্রদ্ধা স্বাভাবিক। কিন্তু সুপ্ত বঙ্গবাসী তথা ভারতবাসীর নিদ্রিত প্রাণের সঞ্জীবনীমন্ত্র রচয়িতা দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশ প্রীতি মূলক সংগীত "আবার তোরা মানুষ হ" এবং মাতৃ মন্ত্রের সাধক কবি রজনীকান্তের স্বদেশাত্মক গান "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই" ভারতবাসীর স্মরণীয়। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল এই কান্ত কবি সম্বন্ধে বলিয়াছেন "যদি দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকলের হৃদয়তন্ত্রীতে কাহারও সংগীত ক্রিয়া করিয়া থাকে, তবে তাহা কবি রজনীকান্তের।

সত্যই, মনের বীণার তন্ত্রীতে অপরূপ সুরছন্দ সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা রজনীকান্তের ছিল। তিনি ছিলেন বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর নিজস্ব কবি। তিনি শুধু ভাব লোকের রহস্যঘন তীরে দাঁড়াইয়া জাতিকে স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে চাহেন নাই, বস্তুবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া জাতিকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

বাঙালী রজনীকান্ত সমগ্র হিন্দুস্থানের কবি। হিন্দু-স্থানের গৌরব গাথা তিনি গাথিয়াছেন, ভারতমাতার বেদনায় তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছে, ভারতজননীর সেবায় তিনি আত্মোৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও অতীত ঐতিহ্যের মহিমা তিনি সগর্বে ঘোষণা করিয়াছেন, ভারতভূমিকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির জন্ম-ভূমিরূপে কীর্তিত করিয়াছেন।

কবি রূপের উপাসক। ভারতের রূপ "শুভ্র রজত-গিরি বিকীর্ণ যমুনা সরস্বতী গঙ্গা বিরাজিত, অলিকুল গুঞ্জিত, সামগান নিনাদিত, তপোবন সুশোভিত, নীর-নিধি" ভারতভূমির রূপ সে কী অপূর্ব! সেই ঋষিগণ সেবিত ভারতের পূর্বরূপে ও পূর্বগৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিত করি-বার জন্য কবির চিত্ত উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার রূপের রাজ্য হইতে।

"শ্যামল-শস্য-পুষ্প-ফল পুরিত
সকল-দেশ-জয়-মুকুট মণি!

সর্ব শৈলজিত, হিমগিরি-শৃঙ্গ
মধুর ভৃঙ্গ গীত মুখরিত—
সাহস বীর্যমণ্ডিত।
সঞ্চিত পরিণত জ্ঞানখনি।

দেশকে যিনি এই দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, তাঁহার নিকট কিছুই গোপন থাকিতে পারে না। তাই স্বদেশী আন্দোলনের সময় রজনীকান্ত দেশের অন্নবস্ত্র সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ধারণ করিয়াছিলেন, বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবন যাত্রাপথের শ্রেষ্ঠতম পাথেয়র সন্ধান দিয়াছিলেন। বাঙালী তাঁহারই সঙ্গে সুর মিলাইয়া গাহিয়াছেন :—

তাই ভালো, মোদের মায়ের ঘরের শুধু ভাত—
মায়ের ঘরের ঘি সৈন্ধব মার বাগানের কলার পাত"

বিদেশীবর্জন ও স্বদেশী গ্রহণ আন্দোলনে রজনীকান্তের সঙ্গীত মন্ত্রশক্তির ন্যায় ক্রিয়া করিয়াছিল, বাঙ্গালী নিজেকে ও নিজের দেশকে যথার্থভাবে চিনিবার সুযোগ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিল।

রজনীকান্ত ভারতবাসীর কল্যাণমন্ত্রের আদি উদ্গাতা। তিনি ভারতকে কল্যাণ ও মঙ্গল আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার সংগীতের সুর বাঙালীর মনের সুর। খাঁটি বাঙালী কবি সহজ কথায়, সহজ পথ—জাতির উন্নতির পথ, সমস্যার সমাধানের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন।

"মোটা হোক সে যে মোর মায়ের ক্ষেতের ধান;
সে যে মায়ের ক্ষেতের ধান"—ইহা যেন পথভ্রান্ত বাঙালীর প্রতি আমোঘ নির্দেশ।

সর্বং পরবশং দুঃখং" তিনি ভারতবাসীকে জানাইলেন :—

"আমরা নেহাৎ গরীব, আমরা নেহাৎ ছোট
তবু আছি সাত কোটি ভাই, জেগে ওঠ।"

কিন্তু তাঁহার এই উদ্বোধন সংগীতের মধ্যে বিদ্বেষ বা বিদ্রোহের সুর ছিল না।

তিনি গাহিয়াছেন জাগরণের গান, নূতন ভাবে গড়ার গান—ভাঙনের ভৈরব সংগীত নহে, মিলনের মহা সংগীত। শুধু হিন্দু ও মুসলমানের মিলন নহে—প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন-স্বপ্ন বিভোর কবি তাই ঘোষণা করিয়াছিলেন :—

"বিলেত, ভারত ছুটো বটে, দুয়েরি এক ভগবান।
(দুই চোখে সে দু'চোখ দেখেনা)
(তার কাছে তো সবাই সমান রে।)

পরপদসেবী, পরানুকারী দেশবাসীকে তিনি ঘরে ফিরাইয়া আনিয়া আত্মস্থ করিয়াছিলেন এবং কর্মে ব্রতী করিয়াছিলেন। কোন মনীষী লিখিয়া ছিলেন "কাহারও বাণী গদ্যে, কাহারও পদ্যে, কাহারও বা সংগীতে অভিব্যক্ত। রজনীকান্তের কান্ত পদাবলী কেবল সংগীত।" তিনি গানের কবি, গানের সুরে গাঁথা তাঁহার সকল রচনা। কিন্তু সে গান আমাদের অন্তরের অন্তর্নিহিত অপ্রকাশিত ভাবের ব্যঞ্জনা, একান্তভাবে আমাদের প্রাণের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, নিবিড়তম ভাবে জড়িত। রজনীকান্তের কাব্যসৃষ্টির বৈশিষ্ট্য এইখানেই। তাঁহার সুর বিচিত্র, ভাষার সরসতা, ভাবের প্রাঞ্জলতা, স্বাদেশিকতা, দেশাত্মবুদ্ধি, শিক্ষিত ও জনসাধারণের চিত্ত জয় করিতে পারিয়াছিল। তাঁহার সমগ্র কাব্য তাঁহার নিজেরই মর্মকথা, তাঁহার অন্তরে অনুভূত ভাবের সহজ প্রকাশ, বাঙালী-জাতির জাতীয় ভাবোন্মেষের ও জাগরণের জয়গান।

তবে, একথা ভুলিলে চলিবে না, কান্তকবি শুধু জাতীয় জাগরণের বা স্বদেশী ভাবমূলক গান রচনা করিয়া যশস্বী হন নাই। তিনি শিক্ষিত ও অশিক্ষিত উভয় শ্রেণীরই উপযোগী কাব্যও রচনা করিয়াছিলেন। ছন্দ-বৈচিত্র্য ও মাধুর্যসত্ত্বেও তাহার কবিতায় ছিল ভাবের স্পষ্টতা, তাঁহার কবিতা কোথাও ভাবের রাজ্যে হারাইয়া যায় নাই। তাঁহার কাব্যে দার্শনিকতত্ত্বের ব্যাখ্যা নাই, আছে প্রেম, ভক্তি, করুণা ও ভালবাসা; আছে তাঁহার সাধনার ভগবান, জীবন দেবতার প্রতি পরম আত্ম-নিবেদন।

রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলীর মধ্যে এবং বৈষ্ণব কবিতায় প্রেমময়ের জের, জীবন দেবতার উপর যে অনাবিল ভক্তি ও ভগবৎপ্রেমে বিমুগ্ধ মানবাত্মার আত্মোৎসর্গের সুর নিহিত রহিয়াছে, রজনীকান্তের কাব্যে তাহাই অবিকৃত ভাবে খুঁজিয়া পাই। তাঁহার সঙ্গীতে ও কবিতায় সেই নিবেদনের সুর স্বতঃস্ফূর্ত মন্দাকিনীধারার মত স্বচ্ছন্দ-গামী, অব্যাহত গতি। তাঁহার কাব্যধারা ভগবৎ প্রেম-সিন্ধুর পানে নিশিদিন ছুটিয়া চলিয়াছে।

"যারে মন দিলে মন ফিরে আসেনা—
…বাধা ভেঙে চুরে ঠেলে
কেমন করে যাচ্ছি চলে দেখনা ভাই !"

তিনি অহরহ ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, কখনও বা তাঁহার দেখা পাইয়াছেন, আবার কখনও বা বিরহের বেদনায় পুনরায় তাঁহারই উদ্দেশ্যে অশ্রুপাত করিয়াছেন। তিনি দুঃখ দেন, কিন্তু তাঁহার প্রেমের অন্ত নাই, দয়ার সীমা নাই। করুণাময়ের মঙ্গল করস্পর্শে তাঁহার জীবন ধন্য হইয়াছে।

"হৃদয় মাঝারে নিজে এসে দেখা দিয়েছে।
(আমি দূরে-ছুটে-যেতে দু হাত-পসারি
ধরে টেনে কোলে নিয়েছে"।)

জীবন দেবতার সঙ্গে এমনি লুকোচুরি খেলা এমন নিবিড় পরিচয়, এত গভীর প্রেমের—সপ্রকাশ বলিয়াই তাঁহার কবিতা সহজেই মনোহরণ করিতে পারে—তাঁহার জীবন-দেবতা—

"অন্তহীন বিরাট, নিখিল বিশ্বব্যাপী, অচ্যুত অক্ষয়, নিত্যমঙ্গল, নির্মল জ্যোতি শান্ত-সুমধুর—উজ্জ্বল, পরম-সুন্দর বিশ্বভূষণ, মধুর করুণা আর্দ্র লহরী, তৃষ্ণাতুর চির—পোষণ, পাপতিমির—চন্দ্রতপন, ভবভয় নাশন, মোহ-স্বপন, চিত্ত বিহারী প্রেমসুন্দর, নিত্য পুলকচেতন, শান্তি-চির-নিকেতন।"

তাঁহার সহিত মিলনের সে কী উৎকণ্ঠা :—

"কবে, তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব—
তোমারি রসাল নন্দনে।
কবে, তাপিত এ চিত করিব শীতল
তোমারি করুণা-চন্দনে।"
…"প্রভু বিশ্ব বিপদহন্তা……
তুমি দাঁড়াও রুধিয়া পন্থা
তব শ্রীচরণতলে নিয়ে এস মোর
মত্ত বাসনা গুছায়ে।"

ভগবানের উপর, জীবনদেবতার উপর কবির বিশ্বাস অবিচল। ইহা ভক্তের ভগবৎ বিশ্বাস। এমন বিশ্বাস একমাত্র কবির পক্ষেই সম্ভব।

"কেন বঞ্চিত হব চরণে
আমি কত আশা করে বসে আছি
পাব জীবনে না হয় মরণে।"

ইহা যেন কবি বিদ্যাপতির "তুহুঁ জগন্নাথ" কবিতারই প্রতিধ্বনি। তিনি কবিকে দুঃখ দেন, ব্যথা দেন তাহাতে তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন না। কারণ তিনি জানেন—

"তোমারি দেওয়া প্রাণে তোমারি দেওয়া দুঃখ
তোমারি দেওয়া বুকে তোমারি অনুভব
… … … …
তোমারি সান্ত্বনা শীতল সৌরভ।

তাই তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন—

"ব্যথাহারী বলে হরি—
ভালবাস কি হে ব্যথা দিতে,
চাহ ব্যথা ঘুচাইতে ?"

এই ব্যথা ও বেদনার মধ্যেই কবি জীবন দেবতাকে খুঁজিয়া পান। তাঁহাকে "ডাকিলে হৃদয়ে" আসেন। জীবন-দেবতার সঙ্গে তাঁহার মিলনের কি বিপুল আনন্দ !

"বিভল প্রাণ মন রূপ নেহারি
তাত, জননি সখে ! হে গুরো,—হে বিভো
নাথ, পরাৎপর, চিত্তবিহারী

ইহা ভগবদ্গীতার "পিতাহি বিশ্বস্থ" শ্লোকেরই অভিনব কাব্যরূপ।

ইহা ছাড়া কান্ত কবি রজনীকান্ত বিশুদ্ধ বিদ্রূপাত্মক কবিতাও রচনা করিয়াছেন। সমাজের সহিত তাঁহার সুনিবিড় পরিচয় ছিল। তাই সমাজের প্রতিটি স্তরে অত্যাচার, অবিচার, কুসংস্কার, ইত্যাদি তিনি চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন এবং সংস্কার আনয়নের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার হাসির মধ্যে তাঁহার স্বদেশ প্রীতিই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ব্যঙ্গ করিতে যাইয়া তিনি দেশের অবনতিতে অশ্রুপাত করিয়াছেন। তাঁহার হাসির গানের মধ্যে কোথাও ব্যক্তিগত আক্রমণ বা নিন্দা নাই, আবিলতা বা ভণ্ডামি নাই। মার্জিত রুচি ও সহজ ভাষার সাহায্যে তিনি তাঁহার বক্তব্য শেষ করিয়াছেন, এবং তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন। তাঁহার হাসির কবিতা বঙ্গ সাহিত্যে এক বিশিষ্ট সম্পদ।

যাঁহারা যথার্থ কাব্যরসপিপাসু, তাঁহাদের মনোমন্দিরে রজনীকান্ত চিরদিন সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবেন ইহাতে সংশয়ের অবকাশ নাই। তাহার কারণ তিনি নিজস্বভাবে ও ভাষায় কাব্য রচনা করিয়াছেন। জনসাধারণ তাই সানন্দে তাহার কাব্যরস আস্বাদন করিতে পারে। বিশ্বসৌন্দর্য, ভগবৎপ্রেম, ও গভীর বিশ্বাস, তাহার প্রতি ছন্দে অনুরণিত হইতেছে। বাঙালী তাঁহার কাব্যের মধ্যে তাহার প্রাণের প্রকৃত সুরের সন্ধান পাইয়াছে, তাঁহার কাব্য পাঠ করিতে করিতে এক শান্ত, সুন্দর পরিবেশপূর্ণ কাব্যলোকে উপস্থিত হওয়া যায়—সেখানে বিলাস নাই, আড়ম্বর নাই, আছে শুধু আনন্দ রূপামৃত।

বাঙালী কবি রজনীকান্ত বাঙালীর একটি সমগ্র জীবনের কাব্য-সংগীতের স্রষ্টা হিসাবে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। তাঁহার লোকোত্তর কাব্যপ্রতিভা কালজয়ী।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ভদ্রলোকের প্রশ্নটা যেন শুনতেই পায় নি দীপেন। তার সমস্ত সত্তা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। চিত্রার্পিতের মত সে শুধু বসেই থেকেছে।

ভদ্রলোক অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছেন, 'কি, মুখ বুজে রইলেন যে ?'

দীপেনের চেতনা এবার ফিরে এসেছে বুঝি। হকচকিয়ে সে বলেছে, 'বলছি।' বলছি বলেও অনেকক্ষণ চুপ করে থেকেছে। সম্ভবত বক্তব্যটা মনের মধ্যে গুছিয়ে নেবার জন্য।

পক্ষাঘাত পঙ্গু রুগ্ন মানুষটির ধৈর্য, সহিষ্ণুতা—এ সব অত্যন্ত কম। হঠাৎ যেন ক্ষিপ্তই হয়ে উঠেছেন তিনি। বিদ্রূপ করে বলেছেন, 'যে দরকারে এসেছেন সেটা ভুলে গেছেন, মনে হচ্ছে! না কি কোন দরকারই ছিল না? শুধু শুধু বিরক্ত করতে বাড়ির ভেতর ঢুকেছেন!'

সেই মহিলা অর্থাৎ নীলা চৌধুরীর মা কাছেই ছিলেন। স্বামীকে শান্ত করতে চেষ্টা করেছেন তিনি। বলেছেন, বিনা প্রয়োজনে কেউ কারো বাড়ি আসে না। ভদ্রলোকের ওপর অকারণে রাগারাগি করছ কেন ?'

অসুস্থ মানুষটির সুর এবার কিঞ্চিৎ নরম হয়েছে। গজগজানিটা অবশ্য ছিলই। বলেছেন 'যা বলার তাড়াতাড়ি বলে ফেললেই হয়।'

ইতিমধ্যে বক্তব্যটা সাজানো হয়ে গিয়েছিল। থেমে থেমে স্খলিত স্বরে দীপেন বলেছে, 'বোম্বাই থেকে একটা দুঃসংবাদ নিয়ে আমি এসেছি।'

'দুঃসংবাদ!' প্রৌঢ়টির গলার স্বরে তরঙ্গই যেন থেমে গেছে। স্থির নিষ্পলকে দীপেনের দিকে তাকিয়ে থেকেছেন তিনি।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, সাংঘাতিক খারাপ খবর।' আস্তে আস্তে মাথা নেড়েছে দীপেন।

উৎকণ্ঠিত সুরে প্রৌঢ় এবার বলেছেন, 'কী ব্যাপার বলুন তো ?'

মুখখানা যতখানি সম্ভব করুণ গম্ভীর করে দীপেন শুরু করেছে, 'আপনার মেয়ে মানে নীলা চৌধুরী—'

শুরুটা আর শেষ হয়নি। তার আগেই চীৎকার করে উঠেছেন প্রৌঢ়, 'থামুন—থামুন, ঐ নাম আপনি আমার সামনে করবেন না। কত জন্মের পাপে যে ঐ মেয়ের বাপ হয়েছিলাম—'

'কিন্তু—'

'কী ?'

'আপনার মেয়ের কথা যে শুনতেই হবে।' খুব শান্ত গলায় দীপেন বলেছে।

'না-না, কিছুতেই না। তার কোন কথায় আমার

প্রয়োজন নেই।' জোরে জোরে, উন্মত্তের মত প্রবল বেগে মাথা নেড়ে গেছেন প্রৌঢ়।

কী করবে বুঝতে না পেরে হতভম্বের মত এবার নীলা চৌধুরীর মায়ের দিকে তাকিয়েছে দীপেন। তিনি চোখের ইসারায় তাকে আশ্বস্ত করেছেন। তারপর স্বামীর দিকে ফিরে কোমল স্বরে বলেছেন, 'এত অস্থির হয়ে পড়লে চলে। ছেলেটি অতদূর থেকে আসছে। কী বলতে চায়, আগে শোনই না।'

প্রৌঢ়র অস্থিরতা কমে নি। মাথা নাড়তে নাড়তেই তিনি বলেছেন, 'কী হবে সেই হারামজাদীর কথা শুনে। তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। সে যে বেঁচে আছে, একথা ভাবতে গেলে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে যায়। কেউ যদি তার মরার খবর দিত তো প্রাণভরে শুনতাম।' দীপেনের দিকে তাকিয়ে বলেছেন, 'আজ আপনি চলে যান। যদি তার মৃত্যুর খবর আনতে পারেন, আসবেন। নিশ্চয়ই তা শুনব। শুধু শুনবই না, বয়সে বড় হই, দু হাত তুলে আশীর্বাদ করব।'

দীপেনের ঘাড় ভেঙে মাথাটা ঝুলে পড়েছে যেন। আস্তে আস্তে ফিসফিসিয়ে সে বলেছে, 'নীলা চৌধুরীর মৃত্যুর খবরই আমি এনেছি।'

মুহূর্তে মাথা ঝাঁকানি থেমে গেছে প্রৌঢ়ের। তীক্ষ্ণ শাণিত একটা চিৎকার তীরের মত তাঁর গলার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে, 'কী—কী বললেন!'

'নীলা চৌধুরী মারা গেছে।' বলেই দীপেন সেই মহিলাটির দিকে তাকিয়েছে। দু-চোখে আঁচল চাপা দিয়ে তিনি ডুকরে কাঁদতে শুরু করেছিলেন।

দীপেন হতভম্ব। নীলা চৌধুরী বেঁচে আছে জেনেও মহিলা কেঁদেছেন। আশ্চর্য চতুরা অভিনেত্রী বটে। পরক্ষণেই দীপেনের খেয়াল হয়েছে, স্বামীর সামনে দাঁড়িয়ে না কাঁদলে মেয়ের মৃত্যু-সংবাদটাকে ঠিক বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা হয় না। অভিনয় ঠিকই, তবে কি নিদারুণ মর্মন্তুদ অভিনয়!

এদিকে নীলা চৌধুরীর মৃত্যুর খবর আরেকভাবের প্রতিক্রিয়া করেছে সেই অসুস্থ শয্যাশায়ী লোকটির ওপর। সমস্ত সত্তার মধ্যে বিদ্যুৎ-স্পর্শের মত কি যেন খেলে গেছে তাঁর। কিসের এক অলৌকিক প্রভাবে অসাড় নিম্নাঙ্গটাকে এক হ্যাঁচকায় টেনে তুলে ফেলেছেন। তারপর পৃথিবীর সবটুকু ব্যগ্রতা গলায় ঢেলে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছেন, 'হারামজাদী মরেছে, বলছেন!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' ব্যথিত সুরে দীপেন উত্তর দিয়েছে।

'ঠিক বলছেন?'

'মিথ্যে খবর দিয়ে আমার তো কোন লাভ নেই।'

'তা বটে, তা বটে।' বলেই ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন প্রৌঢ়, 'মরার বয়েস তো তার হয় নি। তা এত তাড়াতাড়ি আপদ চুকল কিভাবে?'

প্রৌঢ় কি বলতে চেয়েছিলেন বুঝতে না পেরে দীপেন বলেছে, 'আজ্ঞে—'

'বলছি, শয়তানীটা মরলে কিসে? অসুখ-বিসুখ কিছু করেছিল?'

'আজ্ঞে না।'

'তবে?'

নীলা চৌধুরীর মা যা শিখিয়ে দিয়েছিলেন ঠিক সেই কথাগুলিই আবৃত্তি করেছে দীপেন, 'আজ্ঞে, আপনার মেয়ে খুন হয়েছে।'

গলার স্বরে অস্বাভাবিক জোর ঢেলে প্রৌঢ় বলেছেন, 'খুন।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। কারা যেন তাকে ছোরা মেরে রাস্তায় ফেলে রেখে গিয়েছিল। পুলিশ দেখতে পেয়ে রাস্তা থেকে হাসপাতালে তুলে নিয়ে যায়। কিন্তু ঐ নেওয়া পর্যন্তই। হাসপাতালে গিয়ে দেখা গেছে সে ডেড্।'

'চমৎকার—চমৎকার!' হঠাৎ জোরে জোরে হাত-তালি দিয়ে উঠেছেন প্রৌঢ়। বলেছেন, 'আমি জানতাম, এ ভাবেই হতচ্ছাড়া মেয়ে মরবে; জানতাম এ-ই ওর নিয়তি। অসুখে ভুগে মরলে খুব একটা তৃপ্তি পেতাম না। খুনের খবরে কি শান্তি যে পেয়েছি! আঃ, কতকাল পর একটা সুসংবাদ শুনলাম!'

মেয়ে অর্থাৎ নীলা চৌধুরীর প্রতি এই অসুস্থ বিকলাঙ্গ মানুষটি যে নিদারুণ বিরূপ, তা অনেক আগেই টের পেয়েছিল দীপেন। কিন্তু যত বিরূপতাই থাক, কোন বাপ সন্তানের মৃত্যু-সংবাদে এমন পরিতৃপ্ত হয়ে উঠতে পারে, এ ছিল তার পক্ষে অকল্পনীয়। প্রৌঢ়র মস্তিষ্কের সুস্থতা

সম্বন্ধেই দীপেন সন্দিহান হয়ে পড়েছে। মৃদু বিষণ্ণ স্বরে বলেছে, 'মেয়ের মৃত্যুতে আপনি খুশী হয়েছেন!'

দীপেনের বলার ভঙ্গিতে অনুচ্চারিত একটু বিদ্রূপ অথবা বিস্ময়, নাকি তীক্ষ্ণ শ্লেষই ছিল। প্রৌঢ় তা গ্রাহ্য করেন নি। আপন খেয়ালে বলে গেছেন, 'আমাকে দেখে কি মনে হয় খুব একটা দুঃখ পেয়েছি?'

দীপেন নিশ্চুপ।

প্রৌঢ় আবার বলেছেন, 'অকপটে বলছি মশাই, এমন খুশী জীবনে আর কোনদিন আমি হই নি।'

এবার অস্ফুটে দীপেন বলেছে, 'আশ্চর্য!'

স্বর যত অস্পষ্টই হোক, ঠিক শুনে ফেলেছেন প্রৌঢ়। দীপেনকে কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন তিনি, হঠাৎ দৃষ্টি গিয়ে পড়েছে স্ত্রীর ওপর। স্ত্রী অর্থাৎ সেই মহিলা চোখে কাপড় দিয়ে ফুলে ফুলে তখনও কাঁদছিলেন। কিছুক্ষণ স্থির নিষ্পলকে তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকেছেন প্রৌঢ়। এক সময় বলেছেন, 'এ কি, তুমি কাঁদছ রমা!'

মহিলা অর্থাৎ রমাদেবী উত্তর দেন নি। কান্নাও থামে নি তাঁর।

প্রৌঢ় আবার বলেছেন, 'আজকের এই দিনটার জন্য কতকাল ধরে অপেক্ষা করে আছি বল তো! এমন শুভ-দিন আমাদের জীবনে আর এসেছে!' একটু থেমে পর-ক্ষণেই শুরু করেছেন, তোমার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ, 'কেঁদে কেঁদে এই দিনটার আনন্দ নষ্ট করে দিও না।'

স্বামীর অনুরোধ রমাদেবী শুনতে পেয়েছেন কি-না সন্দেহ। তাঁর কান্না আরো উত্তাল, আরো শব্দময়, আরো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।

প্রৌঢ় বলেছেন, 'ছিঃ রমা, কাঁদে না। এসো আমার কাছে; কথা আছে।'

রমাদেবী কাছে এসেছেন কিন্তু কান্নাটা যথারীতি চলছিলই।

প্রৌঢ় বলে যাচ্ছিলেন, 'এমন একটা সুখবর এসেছে। আজকের দিনটায় একটা উৎসব টুৎসব কিছু কর। আজ সারা রাত বাড়ির সবগুলো আলো জ্বালিয়ে রাখবে। সন্ধ্যেবেলা নীলুকে কালীঘাটে পাঠিয়ে মানতের পুজোটা দেবে। আর বেশ ভাল করে বাজার করাও। আজ মাছ খাব, মাংস খাব, ডিম খাব। দেখ, কিছু দুধ জোগাড় করতে পার কি-না। পারলে একটু পায়েসও কোরো। ভাল কথা, দই-মিষ্টির বন্দোবস্ত করতে যেন ভুলো না।'

রমাদেবী নিরুত্তর। কান্না থেমে গিয়েছিল তাঁর। স্তব্ধ অনুভূতিশূন্যের মত তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন।

আর পাশে বসে দীপেনের মনে হয়েছে, প্রৌঢ়র এত উচ্ছ্বাস, উৎসবের এত পরিকল্পনা, এত মুখরতা—সবই কি নিদারুণ কান্নার ছদ্মবেশ?

স্ত্রীর উদ্দেশে প্রৌঢ় আবার বলেছেন, 'চোখ থেকে কাপড় সরাও রমা, আমার দিকে তাকাও।' বলতে বলতে অকর্কিতে কি যেন মনে পড়ে গেছে। ব্যস্তভাবে নিজের বালিশের তলা হাতড়াতে হাতড়াতে বিড় বিড় করেছেন, 'কর্তব্য-টর্তব্য, কোনদিকেই আজকাল আর খেয়াল থাকে না। কি যে ভুলো মন হয়েছে!' বিড় বিড় করতে করতে স্বরটাকে উঁচু পর্দায় তুলে হঠাৎ ডেকে উঠেছেন, 'শীলা—শীলা—'

শীলা অর্থাৎ নীলা চৌধুরীর আদল-বসানো সেই মেয়েটি। আশে-পাশে কোথাও বুঝি ছিল সে। ডাকা মাত্র ঘরে এসে ঢুকেছে।

এদিকে হাতড়াতে হাতড়াতে বালিশের তলা থেকে দুটি টাকা বার করে ফেলেছিলেন প্রৌঢ়। শীলার দিকে তা এগিয়ে দিয়ে বলেছেন, 'যা তো মা, একটাকার রাজ-ভোগ আর চার আনাওলা একটাকার সন্দেশ নিয়ে আয়। চটপট আসবি।'

টাকা নিয়ে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে নি শীলা। ঊর্ধ্ব-শ্বাসে ছুটে গেছে।

রমাদেবী এতক্ষণে মুখ থেকে কাপড় সরিয়েছেন। তাঁর রক্তাভ সজল চোখ দুটিতে অপার বিস্ময়! কান্নাজড়িত ভাঙা স্বরে বলেছেন, 'সন্দেশ-রাজভোগ দিয়ে কী হবে?'

রহস্যময় একটু হেসেছেন প্রৌঢ়। বলেছেন, 'শীলা ফিরে আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধর। ক'মিনিটের আর ব্যাপার। তারপরেই সব জানতে পারবে।'

এ প্রসঙ্গে রমাদেবী আর প্রশ্ন করেননি।

স্ত্রীর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে দৃষ্টিটা এবার দীপেনের মুখে নিবদ্ধ করেছেন প্রৌঢ়। বলেছেন, 'তারপর দীপেন-বাবু—'

উন্মুখ হয়েই ছিল দীপেন। সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিয়েছে, 'আজ্ঞে—'

'আপনি কি ঐ খবরটা দেবার জন্যেই বোম্বাই থেকে এত দূর ধাওয়া করে এসেছেন ?'

'না ; কলকাতায় আমার অন্য দরকার ছিল। আর কলকাতাতেই যখন আসা হয়েছে তখন সোনারপুর আর কত দূর! ঐ খবরটা নিজের মুখেই তাই দিতে এসেছি। অবশ্য—'

'কী ?'

'কলকাতায় না এলে চিঠি দিয়েই খবরটা আপনাদের জানাতে হত।'

কি একটু ভেবে প্রৌঢ় আবার বলেছেন, 'আচ্ছা দীপেনবাবু—'

'বলুন—' দীপেন তাকিয়েই থেকেছে।

'আপনি কি এখন কিছুদিন কলকাতায় থাকবেন ?'

প্রৌঢ়র প্রশ্নটার উদ্দেশ্য কী, বুঝতে না পেরে দীপেন স্পষ্ট করে 'হ্যাঁ' বা 'না'—কিছুই বলেনি। দুয়ের মধ্যবর্তী একটা দায়সারা উত্তর দিয়েছে, 'দেখি—'

প্রৌঢ় আরো কি বলতে যাচ্ছিলেন ; বলা হয় নি। ঠিক এই সময় খাবার কিনে ছুটতে ছুটতে ঘরে এসে ঢুকেছে শীলা।

প্রৌঢ় ব্যস্তভাবে এবার স্ত্রীকে বলেছেন, 'একটা প্লেটে খাবারগুলো সাজিয়ে ভদ্রলোককে খেতে দাও।'

ভদ্রলোক যে কে, তা বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়। দীপেন প্রায় শিউরেই উঠেছে, 'কার খাবার কথা বলছেন ? আমার ?'

'হ্যাঁ।'

ইতিহাসে অসংখ্য নির্দয়তার কাহিনী পড়েছে দীপেন, শুনেছেও অনেক। কিন্তু এর যেন তুলনা নেই!

সন্তানের মৃত্যু-সংবাদ শুনে কোন বাপ সংবাদদাতাকে যে সন্দেশ-রাজভোগে আপ্যায়িত করতে পারে—এমন নিষ্ঠুরতার কথা তার অজানা। শ্বাস যেন ক্রমশ রুদ্ধ হয়ে এসেছে দীপেনের। বার বার তার মনে হয়েছে, একটা বায়ুশূন্য অন্ধকার ঘরে কেউ তাকে জোর করে ঠেলে দিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। সেখান থেকে মুক্তির কোন উপায় নেই। ঝোঁকের বশে মহিলাকে কথা দিয়ে এ কোথায় এসে পড়েছে দীপেন! যাই হোক, ভীত দুর্বল স্বরে সে বলেছে, 'না-না, আমাকে ক্ষমা করবেন।'

প্রৌঢ় যেন অবাকই হয়েছেন এবার, 'ক্ষমা!"

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কী জন্যে ?'

'ও-সব মিষ্টি টিষ্টি আমি খেতে পারব না।'

'সে কি! কেন ?'

'কেন, সে কথা না-ই বা বললাম। তবে এটুকু বলতে পারি ঐ সব সন্দেশ-রাজভোগ খেতে গেলে কাঁটার মতন গলায় আটকে যাবে। যা বলতে এসেছিলাম, বলা হয়ে গেছে। এখন আমি চলি।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়িয়েছে দীপেন।

'কি আশ্চর্য! একটা সুখবর নিয়ে এসেছেন ; একটু মিষ্টিমুখ করিয়ে দিতে চাইছি। না-খাবার কি থাকতে পারে আমি তো মশাই বুঝতে পারছি না। বসুন—বসুন, বসার জন্য পরিত্যক্ত তক্তাপোষের কোণটা আবার দেখিয়ে দিয়েছেন প্রৌঢ়।

দীপেন বসে নি। তার মনে হচ্ছিল, মাথার ভেতর শিরার পর শিরা ছিঁড়ে ক্রমাগত রক্ত ঝরে যাচ্ছে। কপালের দু-পাশের রগদুটো পাগলা ঘোড়ার মত সমানে লাফিয়ে যাচ্ছিল। শিথিল স্বরে কোন রকমে সে বলেছে, 'আমার স্নায়ুগুলো খুব শক্ত নয়। এমনিতেই তাদের ওপর যথেষ্ট অত্যাচার হয়ে গেছে। এর পরও যদি খাবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন সেগুলো আর সহ্য করতে পারবে না। আচ্ছা নমস্কার।' বলে অপেক্ষা করে নি সে। টলতে টলতে ঘরের বাইরে পালিয়ে এসেছে।

পেছন থেকে প্রৌঢ়র চিৎকার ভেসে এসেছে 'কি হল ও মশায়! চলে যাচ্ছেন যে! আমাদের সংসারের কি হাল জানেন ? একদিন চলে তো তিন দিন অচল থাকে। তবু সেই অবস্থার মধ্যে দুটো টাকা খরচ করে খাবার আনলাম। প্রাণে কতখানি আনন্দ হলে আমাদের মত লোক দুটো টাকা খরচ করে ফেলতে পারে সে ধারণা আপনার নেই। আমার আনন্দটা মাটি করে দিয়ে যাবেন না। প্লীজ, খেয়ে যান।'

দীপেন দাঁড়ায় নি। এমন কি সেই ঘরটার দিকে

ফিরেও তাকায় নি! বাইরের বিস্তৃত বারান্দা পেরিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত উঠোনে নেমে গিয়েছিল। পক্ষাঘাত পঙ্গু ঐ লোকটির সঙ্গে অন্ধকার সেই ঘরখানায় ঘণ্টাখানেক মাত্র কাটিয়ে এসেছে। তবু মনে হয়েছিল, একটা যুগ, নাকি একটা শতাব্দীই পার করে এল। মনে হয়েছিল, জীবনীশক্তির প্রায় সবটুকুই তার ধ্বংস হয়ে গেছে।

যাই হোক দীপেনের পিছু পিছু রমাদেবীও ছুটে এসেছিলেন। উঠোনে নেমে উদ্বেগের সুরে বলেছেন, 'আপনার কি খুব কষ্ট হচ্ছে বাবা?'

'হ্যাঁ।' আস্তে আস্তে মাথা নেড়েছে দীপেন। বিকৃত-স্বরে ফিসফিসিয়ে বলেছে, 'যন্ত্রণায় আমার মাথা ছিঁড়ে পড়ছে।'

'আসুন আমার সঙ্গে।'

'কোথায়?'

'একটু খোলা হাওয়ায় বসবেন।'

দীপেন আর কিছু বলে নি। কিছু বলা বা ভাবার মত মানসিক অবস্থা তখন তার নয়। সমস্ত চেতনাই একটা স্বাদগন্ধহীন নিরাকার শূন্যতার মধ্যে ভাসছিল। যাই হোক, অজ্ঞাতসারেই বোধ হয় রমাদেবীর ইচ্ছায় নিজেকে সঙ্গে দিয়েছিল সে।

আর রমাদেবী করেছিলেন কি, দীপেনকে সঙ্গে করে খিড়কির সেই বাগানে গিয়েছিলেন। তারপর চীনাঘাসের উদ্দাম জঙ্গল ঠেলে ঝাঁঝি-ভরা পুকুরটার পাড়ে ভাঙা ঘাটলায় নিয়ে তাকে বসিয়েছিলেন এবং নিজেও পাশে বসেছিলেন।

এরপর অনেকক্ষণ স্তব্ধতা। [ক্রমশঃ

হরিনাম

শ্রীদিলীপকুমার রায়

হরিনাম কর অনিবার
মরণের দুর্লগনে
জপিলে অমরতার
পাবি বর এই জীবনে
কেন তুই ভাবিস ভোলা,
হরিনাম চায় না কেউ আর?
দিয়ে যা নামের দোলা
শুধু তুই চিত্তে সবার।
নামে যার ধরায় জাগে
আলো রোজ বুকে বুকে,
প্রাণে তার ঢেউ যে লাগে
পুলকের যুগে যুগে।
শোনে বা না শোনে—যা
ছড়িয়ে নামের সুধা,
বীজ তুই যা বুনে যা,
ফলে যার মেটে ক্ষুধা।

মিছে তুই এত শত
ভাবনার গাঁথিস মালা,
পেলি যে নামের ব্রত
প্রেমে তার প্রদীপ জ্বালা।
চিরদিন যার করুণায়
প্রণয়ের বাজে বাঁশি,
তরু তৃণ তপন তারায়
তারি তো হাসিরাশি।
জয় জয় তার মধু নাম
গেয়ে যা আপন হারা,
বিলিয়ে যা অবিরাম
সুর তার বিশ্বে সারা
নামী-সে দেখা দেবেই
সাধনে নাম ভজনে,
তার আপন ক'রে নেবেই
লুটালে তার চরণে॥

বাবরের আত্মকথা

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় এম-এ

[পূর্ব্বাভাষ—খানুয়ার যুদ্ধে রাণা সঙ্গকে পরাজিত করার পর ভারত ভূমিতে বাবরের রাজত্বের ভিত্তি দৃঢ় হলো। জয়ের উল্লাসের আতিশয্যে যুদ্ধক্ষেত্রের কাছাকাছি একটি ছোট পাহাড়ের উপর বিধর্ম্মীদের ছিন্ন শির দিয়ে তৈরী একটি স্তম্ভ স্থাপন করার নির্দ্দেশ দিয়ে তিনি কয়েকটি স্থান ঘুরে আগ্রায় ফিরে আসেন।

এরপর তিনি চান্দেরির বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ আরম্ভ করার জন্য যাত্রা করেন। চান্দেরির শাসন ভার রাণা সঙ্গের অধীনস্থ মেদিনীরায়ের ওপর ছিল। চান্দেরি দুর্গ জয় করতে তাঁর বেশী সময় লাগেনি। তিনি লিখেছেন যে আল্লার দয়ায় এই প্রসিদ্ধ দুর্গটি ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই তাঁর হাতে চলে আসে। চান্দেরি জয়ের পর বাবরের ইচ্ছা ছিল যে বিধর্ম্মী অধিকৃত অন্যান্য স্থানে অভিযান করবেন। কিন্তু নানা জায়গা থেকে বিদ্রোহের সংবাদ আসায় সেই বিদ্রোহ দমন করার কাজকেই তিনি অগ্রাধিকার দেন।

অযোধ্যায় আফগানদের বিদ্রোহ দমন করে (১৫ই মার্চ ১৫২৮) সেখানকার এবং নিকটবর্ত্তী দেশের শাসন ব্যবস্থার জন্য সেখানেই কয়েকদিন অবস্থান করেন।

হিজরি ৯৩৫, ইংরাজী ১৫২৮ সালের এপ্রিল থেকে ১৭ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত আত্মচরিতে আর কোনও ঘটনার উল্লেখ নাই।

২০শে সেপ্টেম্বর তিনি গোয়ালিয়ার পরিদর্শনের জন্য রওনা হন। সেখানকার দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখে ৪ঠা অক্টোবর গোয়ালিয়ার ত্যাগ করে সন্ধ্যা নাগাদ ঢোলপুর আসেন। সেখানে একটি উদ্যান রচনার কাজ পরিদর্শন করেন। সেখানে কয়েক দিন অবস্থান করে সিক্রিতে আসেন। সিক্রিতে তিনি যে উদ্যান তৈরী করিয়েছিলেন তার প্রাচীর ইত্যাদির কাজ পছন্দ মত না হওয়ায় তিনি কাজের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীদের তিরস্কার করেন ও শাস্তি দেন। সিক্রি থেকে আগ্রায় ফিরে যান।

এই সময় দিল্লী ও আগ্রার কোষাগারে ইস্কান্দার ও ইব্রাহিম লোদির সঞ্চিত মুদ্রা নিঃশেষিত হওয়ায় এবং অবিলম্বে সৈন্যদের জন্য সাজসজ্জা, বন্দুক কামানের জন্য বারুদ এবং গোলন্দাজ সৈন্যদের বেতন দেওয়ার জরুরি প্রয়োজন হওয়ায় বাবর সফর মাসের ৮ই তারিখ সমস্ত বিভাগে এই আদেশ জারি করেন যে যারা বার্ষিক কর দিয়ে থাকে তাদের প্রত্যেককে তাদের শতকরা ত্রিশ টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব দিতে হবে।

রবিয়ল মাসের ১০ই তারিখ হুমায়ূনের নিকট থেকে শুভ সংবাদ আসে যে তাঁর একটি পুত্র সন্তান হয়েছে।

১৯শে তারিখ বুধবার বাবর তাঁর বিশ্বস্ত আমিরদের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করেন যে তিনি এই বৎসর কোনও না কোনও দিকে সৈন্য চালনা করবেন। তাঁর যাত্রার পূর্ব্বে তাঁর পুত্র আসকারি পূব দেশের (বাংলা) দিকে রওনা হবে এবং গঙ্গার ওপারের বিশ্বস্ত আমির ও সুলতানরা তার সঙ্গে যোগ দেবে। তারপর বাবর যে ভাবে অভিযান আরম্ভ করা উপযুক্ত মনে করেন সেই ভাবেই অভিযান সুরু হবে। ২১শে ডিসেম্বর সোমবার আসকারি পূব দিকে রওনা হয়ে যায়।

১৫২৯ সালের ১লা জানুয়ারি মোল্লা মহম্মদ মজহাব পূব দেশ থেকে এসে পৌঁছিয়ে বাবরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানায় যে বঙ্গদেশ সম্পূর্ণ বশে আছে এবং সেখানে শান্তি বিরাজ করছে। আমিরদের সঙ্গে পরামর্শ করে এই সিদ্ধান্ত হয় যে তিনি পশ্চিম দিকেই অভিযান করবেন। তবে অভিযান সুরু করতে কিছুদিন দেরী হবে।

ইতিমধ্যে মহম্মদ গোকুল তাদের কাছ থেকে খবর আসে যে বেলুচিরা আবার বিদ্রোহ করেছে। এই

অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তিনি চিন্ তাইমুর সুলতানকে জানিয়ে দেন যে তিনি যেন সিরহিন্দ, সামান প্রভৃতি স্থানের আমিরদের একত্রিত করে তাদের সৈন্যদলকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে নিয়ে বেলুচিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় বেরিয়ে যান।

১০ই জানুয়ারি রবিবার বাবর যমুনা পার হয়ে ঢোলপুরের উদ্যানে আসেন। সেই দিনই আগ্রা থেকে খবর আসে যে ইস্কান্দারের পুত্র মহম্মদ বেহার অধিকার করেছে। এই সংবাদ পাওয়ার পর তিনি ঐ দিকেই যাওয়ার সঙ্কল্প করেন। পরদিন সকালে আমিরদের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক হয় যে প্রথম জুমমা মাসের ১০ই তারিখ (২১শে জানুয়ারী) বৃহস্পতিবার পূর্ব দিকেই রওনা হবেন। ইতিমধ্যে খবর আসে যে হুমায়ুন চল্লিশ, পঞ্চাশ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করে সমরকন্দের দিকে অভিযানে বের হয়ে গেছে।

১০ই তারিখেই সকাল সওয়া সাতটায় বাবর পূব দেশের দিকে রওনা হন। নৌকায় যমুনা নদী পার হয়ে জলশিরের কিছু উজানে বাগ-ই-জায়েফসানে এসে নামেন। শনিবারে বঙ্গ দেশের রাজদূত ইসমালি মিতা নজরাণা নিয়ে আসে ও হিন্দুস্থানের রীতি অনুসারে সম্মান প্রদর্শন করে। সে নতজানু হয়ে হাত দিয়ে তিনবার ভূমি স্পর্শ করার পর এগিয়ে এসে নসরত খাঁর চিঠি ও উপঢৌকন দেওয়ার পর বিদায় নেয়।

১৭ই তারিখ বৃহস্পতিবার (২৮শে জানুয়ারি) সকাল সওয়া সাতটায় বাবর সসৈন্যে যাত্রা সুরু করেন। নৌকায় আগ্রা থেকে সাত ক্রোশ দূর আনওয়ার গ্রামে পৌছিয়ে তীরে অবতরণ করেন। মঙ্গলবার, ২রা ফেব্রুয়ারি সকাল নয়টায় আনোয়ার ত্যাগ করে আবাপুর এসে নামেন।]

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাকালে (৪ঠা ফেব্রুয়ারি) আবদল মালুক কেরেচিকে বিদায় দিই। পারস্যের রাজার দূত হিসাবে হাসান চালেবির সঙ্গী হয়ে তাকে যেতে হবে। চাপুককেও সেইদিন বিদায় দিই। সে উজবেক দূতদের সঙ্গে খাঁ ও সুলতানদের নিকট দৌত্যকার্য্যে যায়।

রাতের চারঘড়ি তখনও অতিবাহিত হয়নি (শেষ রাত্রি ৪½টা) সেই সময় আবাপুর থেকে যাত্রা করি। প্রত্যুষে চান্দওয়ার অতিক্রম করে নৌকোয় চড়ি। রাতের নমাজের কাছাকাছি সময়ে রাবেরির কাছে নৌকো থেকে ডাঙ্গায় নামি। ফতেপুরে যে শিবির ফেলা হয়েছিল সেইখানে শিবিরবাসীদের সঙ্গে যোগ দিই। ফতেপুরে একদিন অপেক্ষা করি। শনিবার (৬ই ফেব্রুয়ারি) ভোরের আলো ফুটে উঠতেই স্নান সেরে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠি। রাবেরির কাছাকাছি জায়গায় জনসাধারণের সঙ্গে মসজিদে নমাজ পড়ি। ইমাম ছিলেন —মৌলানা মহম্মদ ফারাবি। সূর্য্য উদয়ের সময় আমরা রাবেরির বাঁধের নীচে নৌকায় উঠি। এইদিন আল্লার সেবকদের কথায় আমার মনে কিছু শান্তির বারি সিঞ্চন করে। ঝাকনের বিপরীত দিকে তীরে আমাদের নৌকাগুলি টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। ঝাকন রাবেরির একটি প্রধান সহর। নৌকাতেই সেই রাতটা কাটাই।

নৌকাগুলি ছাড়বার আদেশ দেওয়া হয় প্রভাতের আলো ফুটবার আগেই। আমি নৌকাতেই সকালের নমাজ পড়ি। নমাজ পড়া শেষ হতেই সুলতান মহম্মদ বকসি পৌছে যান। তাঁর সঙ্গে আসে খাজা কালানের ভৃত্য সামসাদিন মহম্মদ। সে কয়েকখানি চিঠি নিয়ে এসেছিল। এই চিঠিগুলি পড়ে এবং পত্রবাহকের মুখেও সংবাদ সংগ্রহ করে কাবুলে যা কিছু ঘটেছে তার বিস্তারিত সংবাদ জানতে পারলাম। মোহাদ খাজাও নৌকাতেই আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়।

মধ্যাহ্নের নমাজের সময় নদীর অপর পারে একটি উদ্যানের কাছে নেমে যমুনায় স্নান করে নমাজ পড়ি। নমাজ শেষ করে আবার আমরা এটোয়ার দিকে আসি এবং গাছের ছায়ায় নদীর বাঁধের ওপর বসে কয়েকজনকে কুস্তির কসরৎ দেখানোর জন্য আদেশ দিই। মোহদি খাবাস যে আহার্য্য প্রস্তুত করার ব্যবস্থা করেছিল তা এখানেই পরিবেশন করা হয়। সান্ধ্য নমাজের সময় আমরা নদী পার হই। রাতের নমাজের সময় শিবিরে ফিরে আসি। সৈন্য সংগ্রহ করার জন্য এবং সামসুদ্দিনের হাতে কাবুলে চিঠি পাঠানোর জন্য চিঠি লেখার উদ্দেশ্যে এইখানে দুই তিন দিন অবস্থান করি।

প্রথম জুমেদ মাসের ৩০শে তারিখ বুধবার এটোয়া থেকে রওনা হয়ে আটক্রোশ অতিক্রম করে মুরি ও আদুশায় বিশ্রাম করি। কাবুলে পাঠানোর জন্য যে

চিঠিগুলি আগে লেখার সময় পাইনি সেগুলি এই সময় লিখে ফেলি। হুমায়ুনকে লিখি যে দেশের শান্তিভঙ্গ-কারীদের বিদ্রোহ যদি সম্পূর্ণ দমন না হয়ে থাকে তাহলে সে যেন তস্কর ও লুণ্ঠনকারীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য অবিলম্বে নিজেই যাত্রা করে। যারা লুঠতরাজের জন্য দায়ী তাদের সায়েস্তা করার জন্য তাকে অবিলম্বে ব্যবস্থা করতে হবে। চিঠিতে এই কথা যোগ করে দিই যে, কাবুল আমারই সাম্রাজ্যের অংশ হিসেবেই গ্রহণ করেছি। সেইজন্য আমার সন্তানদের মধ্যে কেউ যেন এই দেশের ওপর কোনও দাবী না রাখে। আমি হিন্দালকেও এই আদেশ দিয়ে পাঠাই যে সে যেন আমার দরবারে ফিরে আসে। কামরাণকে লিখি—সে যেন শিষ্টতার চর্চা করে এবং সম্রাটপুত্রের পদমর্য্যাদানুযায়ী সে যেন তার কর্ত্তব্য পালন করে। আমি তাকে লিখি যে মুলতান প্রদেশ তাকেই দান করেছি এবং আরো জানিয়ে দিই যে কাবুল আমার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকবে। তাকে একথাও জানাই যে আমার স্ত্রী ও পরিবারবর্গকে এখানে আনার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আমার অনেক কিছু তৎকালীন ব্যাপার ও তথ্য খাজা কালানকে যে চিঠি লিখি তাতে পাওয়া যাবে মনে করে সেই চিঠির অবিকল নকল এইখানে যোগ করে দিচ্ছি।

'খাজা কালানের স্বাস্থ্য কামনা করি। সামসাদ্দিন মহম্মদ এটোয়াতে পৌছিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করেছে। তার কাছ থেকে ঐ দিককার (কাবুল) সমস্ত সংবাদ পাই। আমার পশ্চিমের রাজ্য পরিদর্শন করার যে কি অদম্য ইচ্ছা তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। হিন্দুস্থানের ব্যাপার শেষ পর্য্যন্ত অনেকটা শৃঙ্খলার মধ্যে এসে গিয়েছে। পরম শক্তিমান আল্লার ওপর আমার অখণ্ড বিশ্বাস। তাঁর অসীম দয়ায় এমন সময় শীঘ্রই আসবে যখন এই দেশের সমস্ত ব্যাপারই সুশৃঙ্খলভাবে পরিসমাপ্ত হবে। এই রকম অবস্থায় পৌছালেই, আল্লার ইচ্ছা হলে, এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে তোমাদের দেশের দিকে রওনা হব।

কি করে আমি ঐ দেশের আনন্দদায়ক দিনগুলির কথা মন থেকে মুছে ফেলতে পারি? আমার মত লোক যে সুরাপান ত্যাগের শপথ গ্রহণ করেছে এবং জীবনে পবিত্রতা পালনের সঙ্কল্প করেছে—সে ঐ দেশের সুমিষ্ট খরমুজ ও আঙুরের কথা কি করে ভুলে যাবে? সম্প্রতি ঐ দেশের মাত্র একটি খরমুজ ওরা আমাকে এনে দেয়। সেই খরমুজটি যখন কাটি তখন আমার মনে এক অদ্ভুত একাকিত্ব বোধ এবং দেশ থেকে নির্ব্বাসন জনিত পীড়াদায়ক মনোভাব আমার অন্তরকে আচ্ছন্ন করে। সেটি খাওয়ার সময় আমি চোখের জল সংবরণ করতে পারি নি।

তুমি কাবুলের বিশৃঙ্খল অবস্থার দিকে নজর রেখো। আমার বিচারবুদ্ধিতে যতদূর সম্ভব আমি পুঙ্খনাপুঙ্খভাবে এই ব্যাপার নিয়ে বিবেচনা করেছি এবং এই স্থির সিদ্ধান্ত করেছি যে—যে দেশে সাত আটজন সর্দ্দার রয়েছে সেখানে কোনও নিয়ম মাফিক শৃঙ্খলাযুক্ত অবস্থা আশা করা যেতে পারে না। আমি সেইজন্য আমার ভগ্নী ও স্ত্রীদের হিন্দুস্থানে চলে আসার জন্য নির্দ্দেশ দিয়েছি। এও ঠিক করেছি যে কাবুল ও তৎসংলগ্ন দেশ আমার সাম্রাজ্যের অংশ বলে গণ্য হবে। হুমায়ুন ও কামরাণকে এ বিষয়ে বিশদভাবে লিখেছি। যে চিঠিগুলি এখন পাঠাচ্ছি সেগুলি যেন কোনও বুদ্ধিমান লোক দিয়ে যথাস্থানে বিলি করা হয়। তুমি হয়তো জানো আমি আগেই করণীয় বিষয় সম্বন্ধে মির্জ্জাদের লিখে জানিয়েছি। সেইজন্য এ দেশকে শৃঙ্খলার পথে আনার এবং উন্নতি সাধনের কোনও বাধাবিঘ্ন বা প্রতিবন্ধক থাকতে পারে না। যদি দুর্গের রক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় না হয়, যদি রাজ্যের প্রজাগণ দুঃস্থ অবস্থায় জীবন যাপন করে, যদি গোলায় খাদ্যশস্য মজুত না থাকে, যদি রাজকোষ অর্থশূন্য হয়, তাহলে ভবিষ্যতে সমস্ত দোষ দেশের শাসকের ওপর বর্ত্তাবে।

কতকগুলি বিষয়ে বিশেষ নজর রাখতে হবে যার তালিকা আমি নীচে যোগ করছি। কোনও কোনও বিষয়ে তোমাকে আগেই লিখেছি যাতে তুমি প্রস্তুত হতে পার। তালিকাটি এইরূপ:—দুর্গ সম্পূর্ণভাবে মেরামত করতে হবে। শস্যাগার শস্যপূর্ণ করতে হবে, পশু খাদ্যও মজুদ রাখতে হবে। দূতদের আগমনির্গম ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে হবে—যাতে তাদের কোনও অসুবিধা না হয়, বড় মসজিদ অবশ্যই মেরামত করতে হবে। ফুল ও ফলের বাগানের ওপর যে কর ধার্য্য আছে সেই আয় থেকে ব্যয়

নির্ব্বাহ করতে হবে। স্নানাগার ও দুর্গের অভ্যন্তরে যে অলিন্দ ওস্তাদ আলি ইট দিয়ে তৈরী করেছে এবং যে প্রাসাদের এখনও নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হয় নাই; সেগুলির সংস্কার এবং নির্ম্মাণের কাজ ওস্তাদ সুলতান মহম্মদের সঙ্গে পরামর্শ করে শেষ করতে হবে। যদি ওস্তাদ হাসান আলি কোনও নক্সা ইতিমধ্যে করে থাকে তাহলে সে যেন সেই অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করে দেয়। যদি সে কোনও নক্সা প্রস্তুত না করে থাকে তাহলে তোমরা দুইজনে একত্রে আলোচনা করে একটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর নক্সা প্রস্তুত করবে। নক্সা করার সময় নজর রেখো যাতে বিচার কক্ষ ও দরবার কক্ষের মেঝের সমতা থাকে। আবার বলছি যখন বাদাসগাকের কাছে ছোট কাবুলে যখন যাবে তখন ওখানকার অট্টালিকাগুলির দিকে দৃষ্টি দিয়ে যেন সংস্কার করা হয়। গজনির জলের বাঁধও সম্পূর্ণ মেরামত করার ব্যবস্থা করবে। প্রমোদ উদ্যানে জল সরবরাহের ব্যবস্থা অপ্রচুর। এমন একটি স্রোতস্বতীর সন্ধান করতে হবে যার স্রোতের বেগে একটা কল চলতে পারে এবং সেই স্রোতের জল বাগানে আনার ব্যবস্থা করতে হবে। আমি পূর্ব্বে খাজের (বাস্তের) দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে একটি উঁচু জমির পাদদেশে টুটুনদার নদীর জল এই ভাবে আনার ব্যবস্থা করেছিলাম। সেখানে আমি নানাজাতের বৃক্ষ রোপন করি। এই উদ্যানের ভবিষ্যৎ এত উজ্জ্বল মনে হয় যে—আমি এর নাম রাখি—'নজের গা' (সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর)। নানা ফলের বাগান থেকে উৎকৃষ্ট গাছ সংগ্রহ করে প্রমোদ উদ্যানে রোপণ করে বাগানের চারিধারে সুগন্ধি পুষ্পের চারা ও গুল্ম নক্সা অনুযায়ী লাগাবার ব্যবস্থা করবে।

গোলন্দাজ বাহিনীর লোকদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য সৈয়দ খাঁকে নিযুক্ত করা হয়েছে।

এ কথা স্মরণ রেখো যে অস্ত্র নির্ম্মাণ বিশারদ ওস্তাদ মহম্মদ হাসানের যেন কোনও রকম অযত্ন না হয়।

এই পত্র তোমার হাতে পৌছানোর পর কোনও রূপ কালক্ষেপ না করে আমার ভগ্নী ও পত্নীদের এখানে পাঠানোর ব্যবস্থা করে তুমি নিলাব পর্য্যন্ত তাদের সঙ্গে আসবে। কাবুল ত্যাগ করার ব্যাপারে যত বাধা বিঘ্নই আসুক না কেন,এই চিঠি পাওয়ার সাত দিন মধ্যেই তাদের কাবুল ত্যাগের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে ফেলতে হবে। হিন্দুস্থান থেকে একদল সৈন্য তাদের সঙ্গে করে আনার জন্য ইতি-মধ্যেই পাঠানো হয়েছে। তারা তাদের জন্য অপেক্ষা করে থাকবে। দেরী হলে নানা অসুবিধার সৃষ্টি হবে। যেখানে সৈন্যরা উপস্থিত হয়েছে সেখানকার অধিবাসীদের ও সৈন্য দলের উপস্থিতির জন্য অসুবিধা হবে।

আবদুল্লাকে যে চিঠি লিখেছি তাতেই উল্লেখ করেছি—অনুতপ্ত হয়ে যে সংযমের নীতি গ্রহণ করেছি তার সঙ্গে নিজের ইচ্ছাকে খাপ খাওয়াতে আমাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। কিন্তু সঙ্কল্পের দৃঢ়তা বজায় রাখার মত মনেরও জোর আমার আছে।

(তুর্কিতে) 'সুরাপান পরিত্যাগ, মনোপীড়া নিয়ে আছি।
কাজের অযোগ্য হয়ে হতাশায় ভুগছি।
অনুতাপ আমাকে সংযমী করেছে,
সংযম আমার মনে অনুতাপ এনেছে।'

বানাইয়ের একটি গল্প আমার এখনও মনে আছে। সে একদিন মির আলি সেরের পাশে বসে একটা রসাল কথা বলছিল। মির আলিসেরের গায়ে ছিল দামি বোতাম লাগানো কোর্ত্তা। মির বলেছিল-তোমার রসিকতাটা খুবই সুন্দর। আমি তোমাকে আমার গায়ের কোর্ত্তা বকসিস দিতে পারতাম কিন্তু এই বোতামগুলোর জন্যই পারছি না। বানাই উত্তরে বলে—বোতাম কেন বাধা দেবে? বোতামের ঘরই বাধা দিচ্ছে। (তুর্কিতে বোতাম ঘরের আর এক অর্থ হচ্ছে নীচতা এবং পুরুষত্বহীনতা)। এই গল্পের সত্যতা অবশ্য যে আমাকে এই গল্প শুনিয়েছে—তারই সততার ওপর নির্ভর করবে। এই নির্বোধ অবান্তর কথা লেখার জন্য তুমি আমায় ক্ষমা করো। এর জন্য আমাকে ভুল বুঝো না।

চতুষ্পদী কবিতাটি, যা আমি উপরে উল্লেখ করেছি, গত বছর লিখেছিলাম। সত্যই গত বছর সুরার পিপাসা এবং সামাজিক মেলামেশার ইচ্ছাটা মাত্রাহীনভাবে বেড়ে গিয়েছিল। এমন অবস্থায় আমি উপনীত হয়েছিলাম যে হতাশায় ও বিরক্তিতে আমি চোখের জল ফেলতাম। বর্ত্তমান বৎসরে আল্লার অসীম অনুগ্রহে এই যন্ত্রণার হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছি। এর প্রধান কারণ আমার মনে হয় এই যে কবিতার অনুবাদে নিজেকে নিযুক্ত করেছি

বলে মন একটা খোরাক পেয়েছে। তোমাকেও আমি এই উপদেশ দিই যে তুমিও যেন সংযমের জীবনই গ্রহণ করো। আমুদে বন্ধুবান্ধব ও পুরোণো প্রাণের সুহৃদদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া এবং সুরাপান অবশ্যই আনন্দদায়ক। কিন্তু এমন কোন অকৃত্রিম বন্ধু আছে যার সঙ্গে তুমি সামাজিক সুখের পেয়ালায় চুমুক দিতে পার? সুরা-পানের আনন্দ কোন বান্ধবের সঙ্গে উপভোগ করবে? যদি সের আহম্মদ ও হায়দার কুলির মত লোককে তোমার আনন্দময় মুহূর্ত্তে এবং সুরার পাত্র হাতে নেওয়ার সময় সঙ্গী হিসাবে পাও, তাহলে নিজেকে সে সুখে বঞ্চিত করতে এবং আমার উপদেশে সম্মত হতে তোমার অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে এই চিঠি শেষ করছি। শেষ জুমাদা মাসের ১লা তারিখ বৃহস্পতিবার (১১ই ফেব্রুয়ারি) লিখিত।"

চিঠিগুলি অনেক কষ্টে লিখে শেষ করে সমেসউদ্দিন মহম্মদের হাতে দিয়ে এবং তাকে মৌখিক কতকগুলি প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়ে শুক্রবার সন্ধ্যায় বিদায় দিই।

শুক্রবার আমরা আটক্রোশ অগ্রসর হয়ে জুমানদ্রাতে আসি। কিতিনকারা সুলতানের একজন কর্ম্মচারী কামানউদ্দিন কনাকের কাছে সুলতানের কতকগুলি চিঠি নিয়ে আসে। কামাল উদ্দিনও সুলতানের আর একজন কর্ম্মচারী। সে আমার দরবারে সুলতানের দূত হিসাবে আছে। সেই চিঠিগুলিতে সীমান্তের আমিরদের আচরণ সম্বন্ধে গুরুতর অভিযোগ ছিল। ঐ দিকে ডাকাতি ও নানা ধ্বংসকর কাজ ঘটছে বলে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়েছিল। কনাক ঐ লোকটিকে আমার কাছে পাঠায়। আমি কনাককে দেশে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিই এবং সীমান্ত প্রদেশের আমিরদের এই আদেশ জানাই যে তারা যেন ডাকাত ও ধ্বংসকার্য্যে লিপ্ত ব্যক্তিদের উপযুক্ত শাস্তি দেয় এবং প্রতিবেশী শাসকদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলে। কিতিনকারা সুলতান (বালখের উজবেগ সর্দ্দার) যে লোক পাঠিয়ে ছিল তার সঙ্গেই আমার আদেশ পত্র পাঠাই এবং তাকে এখান থেকেই বিদায় দিই।

হাসান চালেবি পারস্যবাসী ও উজবেকদের মধ্যে জামের নিকট যে যুদ্ধ চলছিল তার বিবরণ দিয়ে সাকুলি নামে এক জন লোককে আমার কাছে পাঠায়। আমি পারস্যের রাজার কাছে এই লোকটির মারফৎ চিঠি পাঠাই। চিঠিতে হাসেন চালাবিকে কাজের চাপে ছাড়তে না পারায় ক্ষমা প্রার্থনা করি। সাকুলি ২রা তারিখ আমার কাছ থেকে বিদায় নেয়।

শনিবারও আমরা আটক্রোশ অগ্রসর হয়ে কলেজি পরগনার অন্তর্গত গাপুর ও হেমামনিতে গিয়ে থামি।

[ক্রমশঃ]

একটি না বানানো গল্প

নির্মলেন্দু রায় চৌধুরী

এ গল্পে আমার কোন হাত নেই। এ গল্পের লেখক শ্রীবাসুদেব সান্যাল এবং নায়ক শ্রীপরেশ সরকার। গল্পটি গত কার্তিক সংখ্যার মাসিক 'মেদিনী'তে প্রকাশিত হয়েছে।

ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে বাসুদেববাবু তাঁর নায়ক শ্রীপরেশ সরকারের জীবনের স্থির সরোবরে একটি গল্পের ঢিল নিক্ষেপ করেছিলেন। ফলে সে সরোবরে কিঞ্চিৎ আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু থাক, সে হচ্ছে গিয়ে আর এক কথা। অন্য গল্প।

মূল গল্প বাসুদেববাবুর। সে গল্প তিনি শুরু করেছেন পরেশবাবুর শৈশব এবং বাল্য-জীবনের কথা দিয়ে। বলেছেন—শিশুকে মা যেমন জানে, তেমন আর কেউ না। সুতরাং পরেশবাবুর ছেলেবেলার সঠিক তথ্যের জন্য তাঁর মা'র শরণাপন্ন হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

হ্যাঁ, লেখক এই ভাবেই গল্পটি শুরু করেছেন।

মা ব'লতেন,—সাত সাতটা ছেলেকে মানুষ করতে আমার হাড়মাস ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। বাপরে বাপ! কী দস্যি! কী দস্যি! মারামারি করছে, পা ভাঙছে, হাত ভাঙছে, জিনিস-পত্র নয়-ছয় করছে। সব সময় যেন ওদের হাতে পায়ে লক্ষ্মী খেলছে। কিন্তু অদ্ভুত ছেলে আমার পরেশ। একেবারে অন্য ধাতু দিয়ে গড়া। ছোট থেকেই ও শান্ত। একদিনের জন্যেও এতটুকু হাংগামা পোয়াতে হয়নি ওকে নিয়ে। ও যখন ছোটটি, সবে হামা দিতে শিখেছে, দামাল হয়েছে, তখন ওকে মোড়ার ওপর বসিয়ে রেখে আমি রান্নাবান্না কাজ-কর্ম সারতুম। ও এতটুকু নড়ত না। যেমনটি বসিয়ে রাখতুম, তেমনটি বসে থাকত। ক্রমশঃ ও বড় হল। কিন্তু কোনদিন গুলি, লাট্টু কিংবা ঘুড়ির জন্য বায়না ধরল না। পয়সার জন্য ছেলেরা যখন বায়না ধরত তখন চুপটি ক'রে হাসত আর বলত—ম, ওরা কী বোকা! শুধু শুধু গুলি, লাট্টু কিনে পয়সাগুলো নষ্ট করছে।

একবার কালীপূজোয় কী বিপদেই না পড়লুম। ছেলেরা ভীষণ রকমের বায়না ধরল,—বললে, বাজি কিনব, পয়সা দাও।

আমি তো চোখে অন্ধকার দেখলুম। ওনার সামান্য চাকরী। সংসারের দারুণ দুরবস্থা। নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। ছয় ছেলেকে চার আনা করে দিলেও দেড় টাকা লাগে! কিন্তু কোথায় তখন দেড় টাকা!

পরেশ আমায় বাঁচালে। চুপি চুপি বললে,—মা, তুমি ভেবোনা, আমায় আট আনা পয়সা দাও, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।

সকালের দিকে আট আনা নিলে পরেশ, আর বিকেলের দিকে বারো আনা ফিরিয়ে দিলে। বাজিও দেখলুম দিলে ওর দাদা ও ভাইদের।

জিজ্ঞাসা করলুম—কী ক'রে কী করলি পরেশ?

মিটিমিটি হেসে পরেশ উত্তর দিলে, কেন, মশলা কিনে এনে ঘরে বাজি তৈরী করলাম। বোকা ছাড়া কেউ বাজার থেকে বাজি কেনে না! চোখের সামনেই তো দেখলে যে বাজি বিক্রীতে কী দারুণ লাভ! সেই ছেলেবেলা থেকেই পরেশবাবু লাভ লোকসানের তত্ত্ব বোঝেন। তখন থেকেই তিনি বিজ্ঞ। পরম প্রবীণ। শুধু শৈশব কেন, যৌবনের জল-তরংগও তাঁর জীবনের কংক্রীট বাঁধে ব্যর্থ আক্ষেপে মাথা কুটে মরেছে। তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে নি। টলাতে পারে নি এতটুকু।

পরেশবাবুর যৌবনের খবর আমি তাঁর মুখ থেকেই শুনেছি। একই আফিসে, একই সেকশনে কাজ করি। পাশাপাশি বসি। কাজের ফাঁকে ফাঁকে সুখ-দুঃখের গল্প করি।

কথায় কথায় একদিন কী জানি কেমন করে প্রেম-প্রসংগ এসে গেল।

আমি পরেশবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম,—আচ্ছা প্রেম সম্বন্ধে আপনার অভিজ্ঞতা কী?

পরেশবাবু সোজা আমার দিকে তাকিয়ে বললে,—প্রেম হচ্ছে দাদের মত। চুলকানি পেলে আর রক্ষে নেই।

—প্রেমকে আপনি দাদের সংগে তুলনা করলেন?

—হঁ্যা।

—কিন্তু আপনি তো জানেন বড় বড় সাহিত্যিকেরা নাটকে, নভেলে, কবিতায় এই প্রেমকে কত মহৎ, কত সুন্দর করে দেখিয়েছেন।

—রাখুন মশায় আপনার সাহিত্যিকদের কথা। ওঁরা হচ্ছেন সব বেলুনের ব্যাপারী। আমার কাছে ওঁদের কাণাকড়িও দাম নেই।

—বলেন কী? সাহিত্যিক মানে বেলুনের কারবারী? এই শরৎচন্দ্র, বংকিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ,—এঁরা সব···

—হঁ্যা, হঁ্যা, আমার কাছে ও সবই এক।

—আচ্ছা কিছু মনে করবেন না পরেশবাবু, শরৎ, বংকিম, রবীন্দ্রনাথ, এঁদের কোন বই-ই কী আপনি পড়েন নি?

—বললাম তো ওসবে আমার রুচি নেই।

—আজ না হয়ত রুচি নেই। কিন্তু আপনার সেই প্রথম যৌবনে, যখন জীবনে সবে রঙ্ ধরতে শুরু করেছে।

—কী বাজে বাজে বকর্ বকর্ করেন মশায়! বললাম তো,ওসব মিথ্যে কথা পড়তে আমার কোনদিন ভাল লাগে না। তবে হঁ্যা,—মিছে কথা বলবোনা—শরৎ চাটুয্যের কী যেন একটা বই,—নাম ভুলে গেছি,—হঁ্যা, সেই বইটা একবার পড়তে গিয়েছিলাম। আমার নামের একটা লোক ছিল বইটাতে। তা আমার ইচ্ছে হ'ল বইএর সেই লোকটা কী রকম, একটু পড়ে দেখি। শেষে দেখলাম লোকটা চাকর! যেই দেখা, অমনি বই ছুঁড়ে ফেলে দিলাম।

—আপনি 'দত্তা'র কথা বলছেন বুঝি?

—হঁ্যা, হঁ্যা, মনে পড়েছে। 'দত্তা'। দূর দূর,—প্রেম, প্রেম, কেবল প্রেম। ঘেন্না ধরিয়ে দিলে।

সত্যি কথা বলতে কি পরেশবাবুর'পরে আমি প্রবল একটা আকর্ষণ অনুভব করতাম।

কথায়-বার্তায় এবং চেহারায় ভদ্রলোক ছিলেন একটু উগ্র। কিছুটা অকমনীয়। হয়ত অনমনীয়ও। কিন্তু স্পষ্ট। একেবারেই স্পষ্ট এবং সোজা।

যে কোন প্রশ্নের তিনি উত্তর দিতেন এবং কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে ভব্যতার সীমা ছাড়ালেও কিছু মনে করতেন না। সেই সুযোগে তাঁকে অনেক প্রশ্ন করতাম। এমন কি তাঁর বিয়ের ব্যাপারেও।

হঁ্যা, প্রেম পরেশবাবু করেন নি, এমন কি প্রেমের গল্প পর্যন্ত পড়েন নি। কিন্তু বিয়ে একটা করেছেন।

তা বিয়ের পর বৌ-এর কাছ থেকে প্রথম চিঠি এল। নীল খাম। কাগজে ঠাসা। ভারী ভারী। খাম ছিঁড়ে ফেললেন পরেশবাবু। মিষ্টি একটা গন্ধ এসে লাগল নাকে। আতরের গন্ধ। নোতুন বৌ চিঠিতে আতরের গন্ধ লাগিয়ে দিয়েছে। নাক সিটকালেন পরেশবাবু। ছিঃ ছিঃ যত সব অপব্যয়!

তারপর চিটি পড়তে পড়তে পরেশবাবুর ভ্রূ কুঁচকে উঠল। রেগে গেলেন তিনি।

চিঠিতে লেখা ছিল:

প্রিয়তম,

তুমি যেদিন গেলে সেদিন থেকে সময় আর কাটছে না। এই তো সেদিন তুমি গেলে তবু মনে হয় যুগ যুগ ধরে যেন তোমায় দেখি নি।

ইচ্ছা হয় এখুনি পাখী হয়ে উড়ে যাই তোমার পাশে। কত কথা কত ভাব যে মনে আসে! কিন্তু চিঠিতে মনের সমস্ত কথা লিখি, সে সাধ্য আমার নেই।

আকাশ যদি কাগজ হত, সমুদ্র যদি হত কালি, তাহলে পারতাম হয়ত মনের ভাব কিছু প্রকাশ করতে। আর বাঁশ যদি হত কলম, তাহলে আমি তা পারতাম তোমার মাথায় ভাঙতে।

চিঠি পড়ে পরেশবাবু একটু ভাবলেন এবং ভীষণ রেগে গেলেন। তারপর কাগজগুলো দুমড়ে মুচড়ে জানালা গলিয়ে ফেলে দিলেন।

দু' দিন পর উত্তর দিলেন চিঠির। লিখলেন:

কল্যাণীয়াসু

তোমার পত্র পাইয়া কিছুই অবগত হইলাম না। তুমি খামে পত্র লিখিয়াছ, ভবিষ্যতে ঐ রূপ করিবে না। উহাতে পয়সার অপব্যয় হয়। আমার মত পোষ্টকার্ডে লিখিবে। আর একটি বিশেষ অনুরোধ এই যে, গল্প-লিখিয়েদের মত আজে বাজে কিছু লিখিবেনা। ঐ বস্তুটি আমি বরদাস্ত করিতে পারি না।

তোমার শরীর কেমন আছে? শ্বশুর মহাশয় এবং শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম দিবে।

তোমাদের গরুটি গাভিন দেখিয়া আসিয়াছিলাম। তাহার বাচ্চা হইয়াছে কী?

অনেকদিন পর নীলিমা একদিন দুঃখ করে পরেশ-বাবুকে বলছিল,—তুমি ও-রকম করে লিখতে গেলে কেন? তোমার চিঠি দেখবার জন্য আমার বান্ধবীরা সব অপেক্ষা করছিল। চিঠি আসামাত্র ওরা পড়ে ফেললে। তারপর সে কী হাসির পালা! লজ্জায় আমার মাথা কাটা যায়!

পরেশবাবু উত্তর দিয়েছিলেন,—তা তুমিই বা ও-রকম ইনিয়ে বিনিয়ে বাজে বাজে লিখতে গেলে কেন? পোষ্ট কার্ডে না লিখে, খামে লিখতে গেলে কেন? আচ্ছা, পয়সা কী তোমাদের কামড়ায়? কিন্তু ও সব তো বাপু আমার কাছে চলবে না। আমি অপব্যয় একেবারে সইতে পারি না।

হ্যাঁ, পরেশবাবু কোনদিন অপব্যয় সইতে পারেন নি। আজও পারেন না। এই একটি প্রশ্নে তিনি অত্যন্ত কঠোর, একেবারে আপোষহীন।

বোনের বিয়েতে যেতে হবে। নিমন্ত্রণ এসেছে বাপের বাড়ি থেকে। কিন্তু বিপদ এই যে, পরেশবাবুর স্ত্রী নীলিমার তেমন ভাল শাড়ি নেই।

নীলিমা বললে পরেশবাবুকে—ভাল একখানা শাড়ি না হ'লে যাই কী করে? হাজার হলেও বিয়ে-বাড়ি বলে কথা।

পরেশবাবু নির্বিকার। বললেন,—যা আছে ওই দিয়ে চালিয়ে নিতে হবে। সোনার গয়না চাও, তা দিতে পারি। কিন্তু শাড়ি আমি কিনব না।

নীলিমা আশ্চর্য হয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলে, কেন? পরেশবাবু মিটি মিটি হেসে একটা শ্লোক আওড়ালেন:

মাটি খাঁটি সোনা আধা
কাপড় জামা যে কেনে সে একটা গাধা।

এ গল্প শুনে আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম,—বৌদিকে আপনি এ কথা বলতে পারলেন?

পরেশবাবু উত্তর দিয়েছিলেন, কেন পারব না? আমি তো আর বৌ-এর বশ নই! তা এমনিতে পরেশ সরকার বেশ ভাল মানুষ, মাটির মানুষ, কিন্তু খরচ খরচায় সে কারুর কথা শোনে না। তার মত থেকে কেউ-ই তাকে এক চুল নাড়াতে পারে না। স্বয়ং ভগবান এলেও না। বলি অভাবে পড়লে আমাকে কেউ দেখবে? কেউ একটি পয়সা দিয়ে সাহায্য করবে? আত্মীয় বলুন, বন্ধু বলুন, তখন তো কারুর টিকিটি পর্যন্ত দেখা যাবে না!

হ্যাঁ, অভাব অভিযোগ আমাদের নিত্য সংগী। স্বল্প আয়ের সংসারে ভয়াবহ টানাটানি। আর এ টানাটানি ঠেকিয়ে যে কোনদিন একটু স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখব, সে কল্পনাও আমাদের কাছে এখন সুদূরপরাহত। কিন্তু পরেশবাবুর ব্যাপার একেবারে স্বতন্ত্র। অভাবের কথা তিনি ভুলেও উচ্চারণ করেন না। একদিন জিজ্ঞাসা করলাম,—পরেশবাবু, এই বাজারে আপনি সংসার চালান কেমন করে বলুন তো? পরেশবাবু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে বললেন, বুঝলেন বাসুদেববাবু, বসে বসে এ প্রেমের গল্প ফাঁদা নয়। সংসার চালান বড় কঠিন কাজ। বুদ্ধি এবং সাধনা লাগে। পারবেন? শুনুন তাহলে। আপনারা তো সকালে উঠেই চায়ের জন্য চিঁ চিঁ করেন। আমার বাড়িতে চা বারণ। চিরতা ভিজিয়ে জল খাই আমি সকালে। সকাল থেকেই চা, পান, বিড়ি, সিগারেট, নস্যি ইত্যাদি কত কী যে শুরু করেন আপনারা তার ইয়ত্তা নেই। অনেক ভেবেছি আমি। কেন যে টাকা পয়সা আপনারা অমন করে উড়িয়ে দেন, তা আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না। আরে আমি তো মশায় সুপুরিটুকু পর্যন্ত দাঁতে কাটি না। এ তো গেল একদিক। অন্যদিকগুলো শুনলে আপনি তো থ হয়ে যাবেন! শুনুন তাহলে। কাপড় জামা আমি নিজে কাচি। ধোপার বাড়ি দেই না। জামা আমি নিজে কাটি এবং সেলাই করি। দর্জির চৌকাঠ মাড়াই না। বেগুন কুমড়োর গাছ দিয়েছি বাড়িতে। সাধারণতঃ বাজারের পথে পা

দিই না। হোমিওপ্যাথিক বই দেখে নিজে ওষুধ দিই। ডাক্তারের বাড়ির কাছ দিয়ে হাঁটি না। পারবেন কোন দিন আমার মত হতে? পারলে দুঃখ ঘুচত।

নোতুন নয়, এ সব কথা পরেশবাবুর মুখে অনেকদিন শুনেছি। উত্তরে কিছু বলি নি। নীরবই থেকেছি।

কিন্তু সেদিন কেন জানি না আমারও কিছু বলবার ইচ্ছা হল। বললাম, চোখ কান বন্ধ করে, সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ ক'রে আপনি তো কেবল পয়সা জমিয়ে যাচ্ছেন! কিন্তু দাদা, আপনিও তো একদিন মারা যাবেন, আপনাকেও তো যেতে হবে যমের বাড়ি। তা যমের রাজত্বে তো ব্যাংক নেই দাদা! সেখানে আপনি টাকা জমাবেন কোথায়?

পরেশবাবু ভীষণ রেগে গেলেন।

শুধু বললেন, অর্বাচীন।

তারপর আর একটিও কথা না বলে, ফাইল খুলে নিজের কাজে মন দিলেন।

* * *

তা এই হচ্ছে গল্প।

প্রথমেই বলেছি যে এ-গল্পে আমার কোন হাত নেই। এ-গল্পে আমার ভূমিকা শুধুমাত্র সাক্ষীর! বলতে গেলে গল্পটিকে আমি জন্মাতে দেখেছি। দেখেছি যে বাসুদেববাবু পরেশবাবুর পাশে প্রায়ই ঘুর ঘুর করছেন। বুঝেছি যে বিড়াল দুধের গন্ধ পেয়েছে। লেখক পেয়েছে গল্পের গন্ধ। আর রক্ষা নেই। এবার বিশেষ নির্বিশেষ হয়ে উঠবে, পরেশবাবুর ব্যক্তিগত জীবন হয়ে উঠবে সার্বজনীন। কিন্তু এ কথা আমি আদৌ ভাবতে পারি নি যে পরেশবাবু স্বয়ং এ গল্প পড়বেন। জানি যে পত্রপত্রিকার ধার কাছ দিয়ে উনি হাঁটেন না—তা ছাড়া ও সব বস্তুর প্রবেশ নিষেধ ওঁর বাড়িতে। কিন্তু ওঁর পাশের বাড়ির আইবুড়ো যুবতী মেয়েটি যে গল্প গিলবার একটি, তা আমি কী করে জানব? কী করে জানব যে নিয়মিতভাবে সে পরেশবাবুর স্ত্রী নীলিমাকে গল্পের বই জোগান দেয়?

তা সেই নীলিমাই একদিন পরেশবাবুকে বললে, ওগো দেখ দেখ, কে জানি না বাপু একটা গল্প লিখেছে এই পত্রিকায়। একেবারে হুবুহু তোমার কথা। অবাক হয়ে যেতে হয়। পড়ে দেখ না গল্পটা। ভারী মজা লাগবে।

লেখাপড়া ছাড়ার পর কুড়িটা বছর কেটে গেছে। এই কুড়ি বছরের মধ্যে এক পাঁজি ছাড়া পরেশবাবু আর কিছু পড়েন নি। নিজের কথা লেখা শুনে স্ত্রীর হাত থেকে পত্রিকাটি নিয়ে পড়তে বসলেন পরেশবাবু। পড়ে ভীষণ রেগে গেলেন।

মনে পড়ল সহকর্মী বাসুদেব সান্যালের কথা।

বাসুদেব সান্যাল একদিন বলেছিলেন পরেশবাবুকে, পরেশবাবু, আর পারি না। সংসার আর চলছে না। আপনি একটা বাজেট তৈরী করে দিন। আপনার কথামত চলব।

পরেশবাবু বলেছিলেন,—তা বাজেট আমি তৈরী করে দেব। আর সে বাজেট যদি আপনি মেনে চলেন, তাহলে জীবনে আপনার কোনদিন অভাব হবে না। কিন্তু তার আগে আমার গোটাকয়েক নির্দেশ মেনে চলতে হবে।

বাসুদেব সান্যাল জিজ্ঞাসা করেছিল একান্ত ভক্তিভরে,—কী নির্দেশ বলুন?

পরেশবাবু বলেছিলেন, চা, পান, সিগারেট, এ সব কিছুই খেতে পাবেন না। যদি নেহাৎ না থাকতে পারেন, একটা হরীতকী মুখে দেবেন। মনে রাখবেন আমাদের মুনি ঋষিরা এককালে ঐ হরীতকী খেয়েই কত বড় বড় কাজ করে গেছেন। এ তো গেল এক নম্বর। তারপর শুনুন। খবরের কাগজ কিনতে পারবেন না,—নিতান্তই পড়ার ইচ্ছা হলে ট্রামে, বাসে কিংবা অফিসে অন্য লোকের খবরের কাগজে মোটা মোটা হেডলাইনে একটু চোখ বুলিয়ে নিতে পারেন, এই পর্যন্ত। লাইব্রেরীর মেম্বার থাকতে পারবেন না, পত্রপত্রিকা পড়তে পারবেন না, সিনেমা থিয়েটার দেখতে পারবেন না, ও সবে শুধু পয়সার অপব্যয়-ই হয় না,—অকারণে সুস্থ মন ব্যস্ত হয়। আর একটা কথা। মনে রাখবেন যে গোয়ালা আর মেয়ে-মানুষের আশি বছরেও বুদ্ধি হয় না। বৌ-এর বশ কখনও হবেন না। বৌ-এর বুদ্ধি কখনও নেবেন না। টাকা পয়সা কাছ-ছাড়া করবেন না। আর আপনার পক্ষে সব থেকে দামী জিনিস হচ্ছে এই যে—গল্প একেবারে লিখতে পারবেন না। যে সময়টা গল্প লেখেন কিংবা গল্পের কথা ভাবেন, সে সময় দুটো ছেলে পড়াবেন।

বাসুদেব সান্যাল গল্প লিখবে না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তা সমস্ত প্রতিশ্রুতি ভংগ করে সেই বাসুদেব সান্যালই এই গল্প ফেঁদেছে। আর ফাঁদবি তো ফাঁদ, একেবারে পরেশবাবুকে নিয়ে। তাঁরই মুখে শোনা, তাঁরই কাহিনী নিয়ে।

পড়া শেষ ক'রে পত্রিকাটি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন পরেশবাবু।

শুধু বললেন,—অর্বাচীন কোথাকার, ব্যাটা শয়তান! নীলিমা জিজ্ঞাসা করলে,—কাকে গালাগাল দিচ্ছ গো!

পরেশবাবু বললেন—যিনি এই গল্পটি লিখেছেন, তোমার সেই মহান সাহিত্যিককে।

নীলিমা বললে,—তুমি ওঁকে চেন বুঝি? তাহলে তো ভালই হল। একবার নেমন্তন্ন করনা গো ভদ্রলোককে আমাদের বাড়িতে। বেশ মজা হবে! পাশের বাড়ির ডলিও আবার সাহিত্যিকদের বড় ভালবাসে।

বাসুদেব সান্যাল যেন নীলিমার হাত দিয়ে পরেশবাবুর গালে একটা থাপ্পড় লাগিয়ে দিলে।

অন্ততঃ পরেশবাবুর তাই মনে হল এই মুহূর্তে। তিনি শুধু বললেন,—অর্বাচীন।

রবীন্দ্রদর্শনে "তুমি-আমি" তত্ত্ব

শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যের দার্শনিক ব্যাখ্যা পছন্দ করতেন না। কিন্তু স্থানে অস্থানে এমন সমস্ত উক্তিপ্রত্যুক্তি করেছেন যে স্বতই দার্শনিক ব্যাখ্যা এসে পড়ে। এসে পড়লেই কোন কিছু ক্ষতি নেই। তাঁর কবিতার আস্বাদন শিল্পসামগ্রী হিসাবেই উপভোগ করবো,—দর্শনের সামগ্রী হিসাবে নয়।

কবি গান করেন—

"আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিলে দেখতে আমি পাইনি।
তোমায় দেখতে আমি পাইনি।
বাহির পানে চোখ মেলেছি, আমার হৃদয়পানে চাইনি॥"

(৫০নং। পৃঃ ২৬, গীতবিতান, ১৩৬৭ সংস্করণ)

অথবা, "আমারে তুমি অশেষ করেছ, এমনি লীলা তব—
ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেছ জীবন নব নব।"

(ঐ ৫৪ নং)

ভগবান বৈদান্তিকের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রদর্শনে আবির্ভূত নন্। বৈদান্তিকের 'এক' রবীন্দ্রদৃষ্টিতে রসময়বিগ্রহ। অনন্ত ছন্দে তিনি কবির সম্মুখে আবির্ভূত হন। রামানুজের বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকলেও মূলে ঔপনিষদিক দীক্ষা আছে। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে দ্বৈতবাদীর ভান; কি আশ্চর্য্য সমন্বয়! 'তুমি-আমি' তত্ত্বটি মূলতঃ সেই একের উপরেই স্থাপিত। এইখানেই রবীন্দ্রনাথের অনন্যতা। কবি তাঁর 'Religion of man' গ্রন্থে বলেন—"I felt sure that some being who comprehended me and my world was seeking his best expression in all my experiences writing then into an ever-widening individuality which is a spiritual work of art.

পুনশ্চ,"To this being I was responsible; for the creation in me is his as well as mine.—এই 'পরম-তুমির সম্পর্কে তাঁর personality ভাষণে একস্থানে বলেছেন—"He gives as from his own fullness and we also give him from our own abundance. And in this, there is true joy not only for us, but for god also.

এই দেওয়া এবং নেওয়া চলে চিরন্তন ও চির প্রসার্য-মান 'তুমি এবং আমি'র মধ্যে। এর শেষ নেই।

"হায়, আরো যদি চাও, মোরে কিছু দাও,
ফিরে আমি দিব তাই।"

সেই প্রিয়তমের তো চাওয়ার শেষ নেই এবং তাঁর কাছে আমাদের দেওয়ারও শেষ নেই। শ্রেষ্ঠ দানস্বরূপ তাঁকে কিছু দেওয়া যে আর ফুরায় না। (লক্ষণীয় 'দান' কবিতা—'বলাকাকাব্য) তাঁর সেরা সৃষ্টির সেরা সৃষ্টসামগ্রী এই মানুষ। মানুষের 'আমি আছি' এই অস্তিত্বমূলক মনোভাবের মধ্য দিয়েই তো তাঁর অস্তিত্ব সম্ভব। এই আমার সামনে সব দৃশ্য সংসার, রমণীয় সামগ্রী, সব কিছু আছে, যেহেতু 'আমি আছি'। কবি 'Religion of man' গ্রন্থে বলেছেন—"It may be one of the numerous manifestations of god. The one in which is comprehended Man and his universe. But we can never know or imagine him as revealed in any other inconceivable universe so long as we remain human beings." (Religion of man. ch. XII) কবির মতে—"এই আমার দ্বন্দ্বনিকেতন আমিকে আমার ভগবান নিজের মধ্যে লোপ করে ফেলতে চান না। একে নিজের মধ্যে গ্রহণ করতে চান। "এই 'আমি' তাঁর প্রেমের সামগ্রী ; একে তিনি অসীম বিচ্ছেদের দ্বারা চিরকাল আপন করে নিচ্ছেন।" 'কল্পনার' একটি গানে এর সুরটি স্পষ্ট—

"জানি হে তুমি যুগে যুগে তোমার বাহু ঘেরিয়া
রেখেছ মোরে তব অসীম ভুবনে—" ইত্যাদি

রবীন্দ্রনাথ খানিকটা বিবর্তনবাদীর দৃষ্টিতে এই 'আমি'র জয়যাত্রা দেখেছেন। কিন্তু যে কোন 'বাদ' অথবা 'ইজম্' হোক্ না কেন, রবীন্দ্রস্বাতন্ত্র্য তার অনন্যসাধারণ প্রতিভা দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যই সম্ভবপর হয়েছে। দ্বৈতবাদীর কাছে এই 'আমি'র স্বাতন্ত্র থাকলেও, এই 'আমি'র সঙ্গে সেই 'তুমি'র এত মাখামাখি ও অনন্ত অভিসার ইত্যাদি প্রত্যক্ষ অনুভূতিসিদ্ধ কবিকল্পনা দেখা যায়নি। রবীন্দ্রনাথ চিরকালই বেদান্তের মায়াবাদের বিরোধী ছিলেন। আমার ব্যক্তিত্ব বা স্বাতন্ত্র সেই পরমপ্রিয়তমের অথবা অনন্তপুরুষের লীলার সঙ্গে অপরিহার্যভাবে জড়িত—এই ছিল রবীন্দ্র দৃষ্টিভঙ্গী। নানান্ বিবর্তনের মধ্য দিয়া এই অনন্ত সীমাহীন 'আমি'র জয়যাত্রার কথা 'কল্পনা' কাব্যে "অনবচ্ছিন্ন আমি" নামক কবিতাটিতে আছে।

উদাহরণ স্বরূপ—

"জলে স্থলে শূন্যে আমি যতদূরে চাই
আপনাকে হারাবার নাই কোন ঠাঁই।
জলস্থল দূর করি ব্রহ্ম অন্তর্যামী,
হেরিলাম তাঁর মাঝে স্পন্দমান আমি।"

অথবা—

"আপনাকে এই জানা আমার
ফুরাবে না।
এই জানারই সঙ্গে সঙ্গে
তোমায় চেনা।"
(গীতবিতান)

'শ্যামলী'র 'আমি' কবিতাটিও এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য—

"আমারই চেতনার রঙে পান্না হ'ল সবুজ,
চুনি উঠ্‌ল রাঙা হয়ে।"

কবির মনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রশ্ন জেগেছে এর তাত্ত্বিক উপলব্ধির সম্পর্কে। হিবার্ট বক্তৃতামালায় তিনি যে বলেছিলেন "I can't prove this ; but this is my conception; এখানেও তাই কাব্যাকারে বললেন—

"তুমি বল্‌বে, এ যে তত্ত্বকথা,
এ কবির বাণী নয়।
আমি বলব, এ সত্য,
তাই এ কাব্য।
এ আমার অহঙ্কার,
অহঙ্কার সমস্ত মানুষের হয়ে।"

এই ধরণের 'অহমে'র বিলোপ বৈদান্তিকের ন্যায় রবীন্দ্রনাথ চাননি। রবীন্দ্রদর্শনের এই একটা কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা।

"অরূপ তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদয়পুর"—(৬৫ নং গীতবিতান।) সেই মায়াময়, মায়াধীশকে তিনি চান্ হৃদয়গহনবনে, বাইরে নয়। তারই সন্ধানে তাঁর অনন্তযাত্রা। যাত্রার শেষ নেই এ কথা ঠিক। কারণ থামা মানেই মৃত্যু। তবে পরমপদপ্রাপ্তির পর নিশ্চিত নিঃসীম 'সামরস্যসুখ (আনন্দ) অনুভূত হবে। 'হিয়ার মাঝেই'

যে তিনি লুকিয়ে থাকেন। দেখা তো সব সময় ঘটেনা। কারণ অহং-আবরণ যতক্ষণ না ক্ষয় হচ্ছে, ততক্ষণ তো আমার এই দেহ ভূমানন্দময় হয়না। লীলাবাদীর দৃষ্টিতে কবি তাঁকে দেখেছেন। জীবনকে সেই পরমের লীলারূপেই কবি প্রকারান্তরে দেখ্তে চান। তাঁকেই পাবার জন্য 'ঘরের চাবি' ভেঙ্গে কবির যাত্রার আগ্রহ। এই যাত্রা মূলতঃ ভিতর পানেই যাত্রা।

'বলাকা' কাব্যে চলার অনন্তসুরের কথাই স্পষ্টতঃ ধ্বনিত। কিন্তু প্রাপ্তির ইতিকথা, অন্তরের অন্তরানুভূতির মাধ্যমে তাঁকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করবার ইঙ্গিত 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য', 'গীতালি', 'গীতবিতানে' আছে। 'বলাকায়' নিঃসংশয় আকৃতি এবং তজ্জনিত বেদনাময় পথপরিক্রমা আছে। 'গীতাঞ্জলি' পর্বে আছে পাওয়ার হদিস, বিশ্বাসের ঐকান্তিকী নিষ্ঠা। এর সুর 'নৈবেদ্য' থেকেই আরম্ভ হয়। 'খেয়ার' মধ্য দিয়ে 'গীতাঞ্জলি' পর্বে তা এক অসীম ভাব-সাগরে মিলিত হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা কোন একটি সুস্থির ভাবাদর্শে কোন বিশেষ ভাবের লালন-পালন করতে সন্তুষ্ট নয়। কখনও এই 'তুমি' লীলাসঙ্গিনী-রূপে কবির কল্পনারাজ্যের দোসর, ক্রীড়াসহচর, নিরুদ্দেশ-যাত্রার সঙ্গিনী। 'সোনার তরী'র 'নেয়ে'রূপে তিনি কবি-দৃষ্টিতে দেখা দেন; অথবা পৌষ নিশীথে রহস্যময় অব-গুণ্ঠনের অন্তরালে তিনিই চেনামুখ নিয়ে দেখা দেন। 'চিত্রায়' তিনিই জীবনদেবতা, অন্তর্যামীরূপে, কৌতুকময়ী-রূপে, কবির কাব্যসৃষ্টির প্রেরণার প্রেরয়িত্রীরূপে আবির্ভূতা হন। তিনি কিন্তু এক। কবিদৃষ্টি রূপোপাসক। বিবিধ-বর্ণতুলিকায়, নানারূপবৈভবের পৈঠায় তিনি তাঁর অন্তর-তমকে স্থাপনপূর্বক অপূর্বরসাস্বাদন করাতে চান। 'চিত্রা' পর্বে এই 'তুমি' কবির কাব্যসৃষ্টিকালে অবচেতন লোকান্তরবাসিনী। তিনি আবার 'কল্পনা'কাব্যপর্বে কখনও 'মোহিনী' 'নিষ্ঠুরা', 'কঠোরস্বামিনী'। তিনি কবিকে বজ্রশঙ্খে আরাম, বিলাস হতে পৃথিবীর কর্মচাঞ্চল্যে যোগ দেবার জন্য আহ্বান করেন।

আসলে তিনি আছেন কোথায় এই প্রশ্ন যদি তোলা হয়, তো সন্ধান করলে পাওয়া যাবে যে, তিনি আছেন কবিচিত্তেই। কবি নিজেই এর সমাধান করেছেন, 'মানুষের ধর্ম' নামক গ্রন্থে, বৃহদারণ্যক উপনিষদ থেকে একটি শ্লোকের উদ্ধৃতি করে,—"অথ যো বৈ অন্যাং দেবতাম্ উপাস্তে"—ইত্যাদি আলোচনার মাধ্যমে। আলোচনার সারাংশ—"যে মানুষ মনে করে যে দেবতা বাহিরে, আমার ভিতরে নয়—আমা হইতে পৃথক—সে মানুষ দেবতাকে পায় না—"ইত্যাদি। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, কবিচিত্তেই এই পরমপদের অধিষ্ঠান। তাঁরই সন্ধানে আমার 'আমির' যাত্রা।

কবি গেয়ে চলেন—"হে মোর দেবতা,

ভরিয়া এ দেহ প্রাণ

কি অমৃত চাহ করিবারে পান?"

আশ্চর্য্য এই দেবতা! দেবতাকে একেবারে কাছের মানুষরূপে, অন্তরের একান্ত নির্জন প্রদেশে আদরের ধনরূপে দেখা, সাধনসামগ্রী হিসাবে পুরাতন হলেও নূতন। এই দেখার ভঙ্গীটা নতন। বোধহয় এরূপ আর পূর্বে কোন কবি দেখেননি। দেবতা যেন আমার মাধ্যমে নিজেকে পুনরায় আস্বাদ করছেন। বৈষ্ণবের ভগবান তাঁর হ্লাদ-সত্তাকে বাইরে প্রকাশিত করে, পুনরায় তার প্রেমের গভীরতার নবীনতম আস্বাদ পেতে চান। আসলে বৈষ্ণবের রাধাকৃষ্ণ একই,—দুই নয়। দুই-এর একটা প্রাতিভাসিক সত্তা আছে। জীব রাধাভাবের বা কৃষ্ণভাবের সাধনা অপেক্ষা গোপী প্রেমেরই সাধনা করতে অভ্যস্ত। গৌবিন্দদাস এই প্রকৃতির সাধক ছিলেন। কিন্তু জীবের স্থান নির্ণয়ে বৈষ্ণব জীবকে চরমমূল্য দেননি। তাঁদের কাছে চরমমূল্য ভগবানেরই আছে। বৈষ্ণব সহজিয়া আরোপের সাধনা করেছে। পুরুষকে কৃষ্ণজ্ঞান এবং নারীকে রাধাজ্ঞান করে সাধনা করতে হবে। রবীন্দ্রসাধনা আরোপের সাধনা নয়।

এ সাক্ষাৎ উপলব্ধির সাধনা,—এ যেন আপন ঘরের লোকের কাছে অবাধ মেলামেশাজনিত অসীম আত্ম-প্রত্যয়। "ন বা অরে পুত্রকাম্যায় পুত্রঃ প্রেয়ো ভবতি। আত্মনস্তু কামায় পুত্রঃ প্রেয়ো ভবতি"—উপনিষদের এই বাণীর সহিত রবীন্দ্রনাথের যেন কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। আশ্চর্য এই যে, একই পরমপুরুষ কবিদৃষ্টিতে 'রুদ্র, আনন্দময় এবং দুঃখরাতের রাজা'। যখন 'তিনি' যে ভাবে কবির সম্মুখে আবির্ভূত হন, কবিকল্পনা তাঁকে সেই ভাবেই দেখে। তন্ত্রে শক্তিতত্ত্ব মূলতঃ অদ্বয়াত্মিকা,—

চিন্ময়ীশক্তি। কিন্তু সাধক তাঁকে দশরূপে দেখছেন। রবি-প্রতিভার আলোকে তিনি যে এক, তা বার বার ধরা পড়লেও, কবি তাঁকে বিভিন্ন রূপাবয়বে দেখেছেন, চিনেছেন এবং পেয়েছেন। এখানে কবি একক। কারও প্রভাবের প্রশ্ন যেমন অবান্তর, তেমনি হাস্যকর।

এই রসময় ভগবান,—জীবনে সুখদুঃখের অনন্ত তীর্থ-পরিক্রমায় করুণাময় পুরুষ। তিনিই কিন্তু রুদ্র। এই রুদ্রকেই 'জীবন যখন শুখায়ে যায় করুণাধারায় এসো' —বলে আহ্বান জানাতে কবি ইতস্তত বোধ করেন না। এই রুদ্র লীলামৃতস্বরূপ। তিনি কবিকে দুঃখ দেন; কবি "দিন শেষে বিদায়ের ক্ষণে"—ঐ দুঃখকে আনন্দে রূপান্তরিত করেন। তাই 'আমার' কাছে (বলা বাহুল্য এই 'আমি' ভোগসর্বস্ব, অহংগর্বিত 'আমি' নয়) দুঃখ গর্বের জিনিষ। কারণ এই দুঃখ তাঁরই দান। তাই কবির ভাষায় বলতে ইচ্ছা করে—

"তুমি যাহা দাও সে যে দুঃখের দান
শ্রাবণ ধারায় বেদনার রসে সার্থক করে প্রাণ।"

কিন্তু এই জীবনে চল্‌তে চল্‌তে যদি বা মোহাঞ্জন চোখে লেগেই যায়, তার জন্য কবির সতর্কবাণী—

"যদি কোন দিন তোমার আহ্বানে, সুপ্তি আমার
চেতনা না মানে

বজ্রবেদনে জাগায়ো আমারে, ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু।"

তাই বলছিলাম, এই 'তুমি—আমি'র লীলার শেষ নেই।

আসল কথা কি, রবীন্দ্রনাথ অনন্ত সময়কে বিচ্ছিন্ন করে, রূপবিবিক্ত, জগৎজীবপৃথককৃত আরাধনা করতে চাননি। এই সান্তের মধ্যেই অনন্তের আরাধনা করতে চেয়েছেন। তাই কবি বলেন—

"আমার মাঝে তোমার মায়া জাগালে তুমি কবি।
আপন মনে আমারি পটে আঁকো মানস ছবি॥"
(ঐ গীতবিতান।৭১নং)

অল্পের মধ্যেই ভূমার আত্মাত্মমান গতিপ্রকৃতিকে নব নব বৈচিত্র্যে মাধুর্য্য দান ও গ্রহণ করতে চেয়েছেন। এর ইঙ্গিত উপনিষদে আছে সত্য কথা, কিন্তু রবীন্দ্র হস্তে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে।

"যস্মিন্ সর্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥"৭॥
ঈশোপনিষৎ।

অর্থাৎ "যে সময় সর্বভূতই আত্মার সঙ্গে এক ও অভিন্ন হইয়া যায়, তখন সেই একত্বদর্শী জ্ঞানীর শোকই বা কি, আর মোহই বা কি?" রবীন্দ্রমানসের অন্তস্থলবর্ত্তিনী চিন্তাধারার মধ্যে হয়তো এ ধরণের একটা প্রভাব থাকা অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু তাতেই সব বলা হল না। কবি প্রজাপতিতুল্য নিরঙ্কুশ। তিনি যত্রতত্র তাঁর কল্পনার তির্যকরশ্মি প্রেরণ করতে পারেন। কিন্তু চরম মূল্যায়ন নিরূপণ করতে গেলে, সেই কবিতার অথবা কবিভাবনার মূল উৎস থেকে পূর্ণায়ন পর্য্যন্ত লক্ষ্য করে তবে রায় দিতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ উপনিষদকে স্বীকার করেছেন এবং অতিক্রমও করেছেন। এইখানেই তাঁর জয়লাভ। কবি নিজে 'মানুষের ধর্ম' নামক পুস্তকে বলেছেন—"মানুষও আপন অন্তরের গভীরতর চেষ্টার প্রতি লক্ষ্য করে অনুভব করেছে যে, সে শুধু ব্যক্তিগত মানুষ নয়, সে বিশ্বগত মানুষের একাত্ম। সেই বিরাট মানব "অবিভক্তং ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।" সেই বিশ্বমানবের প্রেরণায় ব্যক্তিগত মানুষ এমন সকল কাজে প্রবৃত্ত হয়, যা তার ভৌতিক সীমা অতিক্রমণের মুখে।"

কবি মুক্তি চেয়েছেন। কিন্তু অদ্ভুত এবং আশ্চর্য্য তাঁর সাধনা। একদিকে বলছেন—"আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে," অপরদিকে বলেন, "আমার মুক্তি সর্বজনের মনের মাঝে"। এইখানেই তাঁর স্বকীয় প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য। তিনি নির্বিশেষের আরাধনা করেননি।

"বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারও॥"

—এই ছিল রবীন্দ্রসাধনার মূলসুর। উপনিষদে এর ভাবনা আছে। কিন্তু প্রকৃতি একটু ভিন্নতর!

"এষ সর্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ" ॥৩।১২
কঠোপনিষৎ।

অর্থাৎ "ইনি সর্বভূতের অভ্যন্তরে গূঢ়ভাবে নিহিত থাকায় প্রকাশ পান না, অথবা সকলের নিকটে প্রকাশ পান না।

পরম সূক্ষ্মদর্শী পুরুষ একাগ্রতাযুক্ত ও সূক্ষ্মবুদ্ধি দ্বারা দেখিতে পান, অপর ইন্দ্রিয়দ্বারা নহে।" রবীন্দ্রনাথ সেই চিরন্তন 'তুমি'কে সর্বমানবের সর্বজনীন কর্মে, চিন্তায়, ভাবে এবং ভাবনায় নামিয়ে এনেছেন। তাঁকে নির্বিকল্প অবস্থায় সমাধিমগ্ন রাখেন নি। উপনিষদের 'এক'কেই তিনি পরিশোধিত করে নবতররূপে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন।

সর্বত্রই এই 'তুমি' আমার সঙ্গে আছে। উপনিষদের অদ্বয়তত্ত্বের উপর রবীন্দ্রনাথের এই 'তুমি-আমি' তত্ত্ব এক অপূর্ব মহিমায় প্রোজ্জ্বল। এই 'আমি'র অনাদি উৎস থেকে শেষহীন যাত্রা। 'পরিশেষ' কাব্যের 'বিস্ময়' কবিতাটি লক্ষণীয়—

"আবার জাগিনু আমি।
রাত্রি হল ক্ষয়।
পাপড়ি মেলিল বিশ্ব।
এই তো বিস্ময়
অন্তহীন।"

'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থ 'বলাকা' কাব্যের পরবর্তী। 'বলাকা' পর্বের 'যুগে যুগে এসেছি চলিয়া' ইত্যাদি অংশের সহিত ছিন্নপত্রের কয়েকটি পত্রও উল্লেখ্য হতে পারে। এ অংশে আর আমার উদ্ধৃতিতে প্রয়োজন নেই। যে জিনিষটা বোঝাবার চেষ্টা করছি, আশা করি তা সিদ্ধ হয়েছে। 'অহল্যার প্রতি', 'বসুন্ধরা', 'সমুদ্রের প্রতি' ইত্যাদি কবিতার মধ্যে এই চিরন্তন 'আমি'র জয়যাত্রার কথাও মনে আসে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এই কবিতাগুলি ১২৯৮ সাল নাগাদ্ রচিত হয়েছিল। একে অভিব্যক্তিবাদ বা পুনর্জন্মবাদের তত্ত্বরসে ফেলে বিচার চলে না। অথচ, ঐ উভয়ের সাদৃশ্য আছে! রবীন্দ্রনাথ এই 'আমির' জয়যাত্রাকে খানিকটা বিবর্তনবাদীর দৃষ্টিতে দেখ্‌লেও তাঁর অধ্যাত্ম-বিশ্বাস সর্বদাই প্রবল ছিল।

এ ধরণের মননসাধনা পুরাতন হয়েও নূতন। কবি নিশ্চিতভাবে জানেন যে তাঁর অন্তরদেবতা অন্তরেই আছেন।

"আছ অন্তরে চিরদিন, তবু কেন কাঁদি?
তবু কেন হেরিনা তোমার জ্যোতি?"

—গীতবিতান। পৃঃ ১৭২।

কবি সেই রসামৃতপূর্ণ স্বরূপকে হৃদয়াকাশে আত্মসাক্ষাৎকারপূর্বক বহির্লোকে পার্থিবজগতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে চান। সেই চিরন্তন 'তুমি'কে একদিকে যেমন স্বকীয়-চিত্তে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, অপরদিকে তেমনি বিভিন্ন রূপচয়ের মধ্যেও, অর্থাৎ সান্তের মধ্যেও দেখ্‌তে চেয়েছিলেন। একদিকে নির্বিকল্প-সাধনা, অপরদিকে সবিকল্প-সাধনা। দুটো ঠিক এক সঙ্গেই। কি অপূর্ব সমন্বয়।

"সবার মাঝারে তোমারে স্বীকার করিব হে।
সবার মাঝারে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে॥"

—গীতবিতান। পৃঃ ১৫২

'ঘরে ফেরার দিন' নামক কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গপত্রে কবিগুরুর স্নেহভাজন ও একালের লব্ধপ্রতিষ্ঠ অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ডাঃ অমিয় চক্রবর্তীর কয়েকটি লাইন মনে পড়ছে—

"সেই পুরাতন জ্যোত—
কবি তাঁর জানান্ প্রণতি॥
চেতনা—উদয়—অস্তহীন
—যস্তবেদ স বেদ—
হৃদয়ে ধরেন সমাসীন।" (১৩৬৮)

কবির দ্বারা কবিবরের মূল্যায়ন কত কম কথায় আশ্চর্য্যভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে!
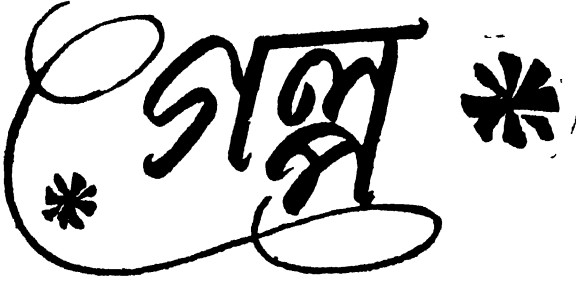
দুটি মনের ছবি

মানসী মুখোপাধ্যায়

"শয়নের শেষ চিন্তা
প্রভাতের প্রথম ভাবনা—"

কর্ণেল অনিলেশ একা হলেই তাকে সেই এক চিন্তা পেয়ে বসে। চোখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে সাপের মত বুকে হেঁটে সে চিন্তা তার ব্রেণ-চেম্বার অকুপাই করে বসে। তারপর সারা দিনের কাজের শেষে ক্লান্ত অনিলেশ যখন ইজি-চেয়ারের কোলে শুয়ে সুগন্ধ চুরুটে সুখটান দেয় তখনো তার রেহাই নেই। পাকান পাকান ধোঁয়ার সঙ্গে তার চিন্তাও তাকে পাক দিতে থাকে—যে তারঘরে এলো, সে কি কোনোদিন তার অন্তরের অন্তরঙ্গ হয়ে উঠবে না!

সুচিরা নিজের থেকে অনিলেশের ঘরে আসেনি। আমাদের দেশের সে প্রথা নয়। যারা নিজের থেকে আসে তাদের সংখ্যা অতি নগণ্য। সুচিরাদের বাড়ী বয়ে আনতে হয়। অনিলেশকেও যেতে হয়েছিল। অবশ্য সুচিরাকে আনতে নয়। বিশেষ বন্ধুর অনুরোধে নিজের উপস্থিতির দ্বারা গরীব কন্যাপক্ষকে সাহায্য করতে। এর বেশী সত্যি তখন তার কোনো উদ্দেশ্য ছিলনা।

সুচিরাকে তখনো সে দেখেনি। তার বিষয় কিছু শোনেও নি। মার্গারেটের অন্তর্ধানের পর থেকে মেয়েদের সম্বন্ধে তার আগ্রহ শেষ হয়ে গেছে। নয় তো অনিলেশের বিয়ের বয়েস এখনো যায় নি। আমাদের দেশে চল্লিশ বছরের ছেলেও পাত্র হিসেবে নাবালক।

বন্ধু অরুণাভ তাকে কন্যাপক্ষের বিপদের কথা বলেছিল। অনিলেশ প্রথমে মন দিয়ে শুনেছিল। পরে রঙ্গ করে বলেছিল, এমন যখন ব্যাপার, আর তুমি ব্যাচিলার হয়ে যখন এত আগ্রহ দেখাচ্ছ—তখন সমাধানও নিজেই করে দিতে পার।

ম্লান হেসে অরুণাভ জবাব দিয়েছিল, সুচিরা গরীবের ঘরে দুর্লভ মেয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাকে আমার কঠিন রোগটার কথা ভুললে ত চলবে না, দু বার স্ট্রোক্ হয়ে গেছে। যাক সে কথা, সুচিরার যার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে তাতে সে সুখী হবে। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে জ্ঞাতি গোষ্ঠিদের নিয়ে, বিশেষ করে ঐ সোমনাথ কাকা। উনি মৎলবে ছিলেন এই পাত্রের সঙ্গে তার নিজের মেয়ের বিয়ে দেবেন। এখনো তাঁর সে মৎলব পালটায় নি। কাজেই তোমার মত একজন হোমরা চোমরা লোকের উপস্থিতি বুঝলে কিনা—

আর বোঝাতে হয় নি। অনিলেশ রাজি হয়ে গেছল। আসার সময় তার আরো কয়েকজন হোমরা-চোমরা বন্ধুদের কন্যাপক্ষের হয়ে নিমন্ত্রণ করে সঙ্গে এনেছিল।

কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। সুচিরার মিথ্যে দোষের খবরে বর নিয়ে বরপক্ষ চলে গেল। সোমনাথ কাকা এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। মোটা রকম রুপেয়া দিয়ে তিনি বরপক্ষকে ফিরিয়ে আনলেন। তারপর তাঁর তথাকথিত সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে ধূমধাম করে বিয়ে দিয়ে দিলেন। অলকা যখন বরের হাত ধরে বাসরে ঢুকল, সুচিরা তখন লাল চেলি পরে কনের সামনে মূর্চ্ছিতা।

এখন উপায়! বনেদী ঘরের নাম যায়, কনের জীবন বরবাদ। সুচিরার বাবার সঙ্গে অরুণাভ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। পরোপকারের মন নিয়ে প্রতিবেশী এক গরীব কন্যাপক্ষের উপকার করতে গেছল। এই ছেলের সন্ধান সে-ই এনে দিয়েছিল। যাতে লোক জানাজানি না হয়, সুচিরার আত্মীয়রা তার কোনো ক্ষতি না করতে পারে, বিয়েতে ভাংচি দিতে না পারে তাই কথাবার্তা দেখা শোনা সব কিছু নিজের বাড়ীতে করিয়ে ছিল। গুপ্তচরের মত নিঃশব্দ পদ্ধতিতে কাজ এগিয়ে

ফটো : দীপ

দি লিনিং ট্রী

*

অবলোকন

*

ফটো : রবীন চক্রবর্তী

যাচ্ছিল দেখে নিশ্চিন্ত ছিল। ভাবতে পারেনি তার চেয়েও নিঃশব্দে সোমনাথ-কাকা সব খবর জেনে নিয়ে তার ওপর টেক্কা দেবে! যাক সে কথা, এখন বর পাবে কোথায়! কি ভাবে এ সর্বনাশকে কাটিয়ে ওঠা যায়। আলোয় ভরা বিয়ে বাড়ীতে বসে অরুণাভ চোখের সামনে যেন পর্বত প্রমাণ অন্ধকার দেখল।

একটু পরে অরুণাভ দেখল, তার চোখের সামনে জমাট অন্ধকার রূপোলি তুষারে ঢেকে গেল। তারপর তাতে দেখা দিল প্রভাত বেলার স্বর্ণালোকের ঝিলিক। সে উঠে পড়ল। সোজা অনিলেশকে পাকড়াও করে এনে বরের আসনে বসিয়ে দিল।

অনিলেশ আপত্তি করল। বলল, তার আদর্শের কথা। কিন্তু অরুণাভের করুণ-চক্ষু এক ধমকে যেন তাকে অবশ করে দিল। মানুষের জীবনের চেয়ে কী আদর্শ বড়!

নাঃ, মান সম্ভ্রম বাঁচলেই জীবন বাঁচেনা। ভীরু যেমন বেঁচে থেকেও বহুবার মরে, তেমনি সুচিরা মরে গেল। তার অরুণ-দা ভুল বলেছে, আদর্শ জীবনের চেয়ে অনেক বড়। ছায়াঘেরা সন্ধ্যাকে কি সূর্যোদয়ের সঙ্গে তুলনা করা যায়!

কীটদষ্ট ফুল যেমন পুরুষের পক্ষে তেমনি নারীর পক্ষেও কাম্য নয়। যে তার স্বামী হতে যাচ্ছিল তাকে চোখে না দেখেও তার ছবি তাকে সুচিরার অনেক কাছে এনে দিয়েছিল। সুচিরার কল্পনার রঙে রেঙে যে মানুষ বিয়ের লগ্নের অনেক আগেই তার কাছে পৌঁছে গিয়েছিল, বন্ধু হয়ে উঠেছিল।

তার বন্ধু, সুচিরার প্রায় সমবয়সী সুশান্ত যেমন তার মন বুঝতে পারত, তার ডাকে সাড়া দিতে পারত—তেমন কি মাঝদুপুরের সূর্য অনিলেশ পারবে। পারছেও না, পারবেও না। ঘড়ির কাঁটার ইঙ্গিতে কেমন পা পা করে সময় কাটায়, মুখ বুজে কাজ করে যায়, মনে হয় যেন একটা উল্লাসহীন জীব। কখন যে রাতে শুতে আসে, আর কখন যে সকালে উঠে যায়—সুচিরা জানতেও পারে না।

সুচিরা ছবি আঁকে, কবিতা লেখে, গুন গুন করে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে কাপড়ের ওপর ফুল-পাতার অবয়ব ফুটিয়ে তোলে। আর যখন কিছু করার থাকে না, তখন জানলায় মুখ রেখে সুনীল আকাশ-পটে মেঘের আলপনায় একটি মুখ আবিষ্কারের চেষ্টা করে।

বিয়েটা আর যাইহোক, করুণা নয়; মানে করুণা করে কাউকে এনে তারপর তার কাছ থেকে ভালবাসা চাওয়া যায় না। ভাবে অনিলেশ। বিবাহান্ত-প্রেমে তার কোনো দিনই বিশ্বাস ছিল না। এদেশে তার মতে বিয়ে করার খোলা রাস্তা নেই বলে কার্তিক হয়েই সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিল। উদ্দেশ্য, সরস্বতীকে গুড্‌বাই বলা হলে, পরে ভারতীয় ভাষায় খড়মপরা লক্ষ্মী ধরে আনা।

ধরাধরি অবশ্য তাকে বিশেষ করতে হয় নি। মার্গারেট নিজেই প্রায় তার কাছে ধরা দিয়েছিল। আত্মীয়-স্বজন এ বিয়ে সমর্থন করবে না জেনে অনিলেশ ও দেশেই বিয়ে সেরে ফেলেছিল। এরপর ঘর বাঁধার স্বপ্নে সে যখন মসগুল, মার্গারেট হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। পরে একদিন জানিয়েছিল, বিয়েটা ভালবাসার প্রতিশ্রুতি নয় বরং উপসংহার।

অনিলেশের অনিচ্ছায় ঘটনা-স্রোত এগিয়ে চলল। 'বসন্ত হয়ে মাধুরী বিছায়ে' যে তার জীবনে এসেছিল, রুদ্র দিনের হাহাকার ঢেলে দিয়ে এক সময় উধাও হয়ে গেল। চূর্ণ, হাজার টুকরো হৃদয় নিয়ে অনিলেশ ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলো। কিন্তু বিয়ে আর নয়। তার একটা আদর্শ আছে। যে গণ্ডীর বাইরে তার বিশ্বাস নেই।

বিশ্বাস নেই বলে সুচিরাকে ছেড়ে দিতে তার প্রথম কষ্ট হয় নি। বরং সে যে তার নানা 'হবি' নিয়ে আস্তে আস্তে দূরে সরে যাচ্ছে দেখে অনিলেশ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে। সহজ হয়ে নিজের কাজে ডুব দিয়েছে।

কিন্তু না, সুচিরা তাকে ভাল না বাসতে পারে ক্ষতি নেই, ঘৃণা অসহ্য। যে মানুষটার সঙ্গে দিনে অন্তত দশ-বার মুখোমুখি হতে হয়, যাকে বাইরে 'আমার মিসেস্' বলে পরিচয় করাতে হয়, যার সঙ্গে রাত্তিরে পাশাপাশি শুয়ে থাকতে হয়, সে ঘৃণা করে—এ ভাবনা অসহ্য। অথচ ব্যাপারটা সত্যি। এ সত্যি বলে বা লিখে বোঝাতে হয় না, মানুষ তার স্বাভাবিক অনুভূতি দিয়ে বুঝতে পারে।

প্রথমে রাগ হয়েছিল অনিলেশের। পরে ক্ষুব্ধ হল। শেষে বুদ্ধি এবং বিচার দিয়ে বিশ্লেষণ করে নিজেকে বোঝাতে লাগল। সুচিরার মন জেনে এবং নিজের মন

জানিয়ে এ বিয়ে হয় নি। সুচিরার তাকে ভাল লাগবে কিনা এবং তাকে ভালবাসবে কিনা সুযোগের অভাবে তারও ফয়শালা করা হয় নি। সুচিরা এক শুনেছে, এক স্বপ্ন দেখেছে, আর অন্য জনের সঙ্গে তার বিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওর মন এখন যে রঙে রঙীণ অনিলেশের জীবনে সে রঙ অনেকদিন আগেই চটে গেছে। অনেক মনস্থন তার জীবনের ওপর দিয়ে চলে গেছে। সে এখন সীজন্ড্। তার তুলনায় সুচিরা শিশু, না একটি বালিকা মাত্র। অনিলেশের পায়ে পা ফেলে এক সঙ্গে চলা সুচিরার পক্ষে এখন সম্ভব নয়। সে অনেক পিছিয়ে আছে। তাকে সঙ্গে নেবার জন্যে অনিলেশকে অপেক্ষা করতে হবে। একক অপেক্ষা। তা সে যত বেদনাদায়ক হোক এই এখন তার নিয়তি।

অনিলেশের আদর্শ যাই হোক, মত তার পালটেছে। সুচিরাকে সে ভালবেসে ফেলেছে। তার স্ট্যাচুর মত সুঠাম সুন্দর দেহের দিকে চেয়ে অনিলেশ নিজের দুর্বল মনকে দেখতে পায়। মনে মনে ভাবে, যে মানবী বধূ হয়ে ঘরে এলো, প্রেয়সী হয়ে সে কবে হৃদয়ে ধরা দেবে!

যুদ্ধ লেগেছে বর্ডারে, যুদ্ধ এগিয়ে এসেছে দুয়ারে। চুরুটের ধোঁয়া রিং করে ছাড়তে ছাড়তে অনিলেশ ভাবে যুদ্ধ সুরু হয়ে গেছে তার মনে, তার শরীরে।

আজো সে সুচিরার পাশে পাথরের মত পড়ে থাকে, কিন্তু এক জ্বালা তার হৃদয়কে কুরে কুরে খায়। ক্লান্ত অনিলেশ চোখ বুজে ভাবে, এর চেয়ে কোথাও পালিয়ে যাওয়া যাক।

যুদ্ধ সুযোগ এনে দেয়। অনিলেশ যেন মুক্তির আস্বাদ পায়। হৈ চৈ করে সে যাবার যোগাড় করে ফেলে।

সুচিরাও এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। কল্পনা রাজ্যে ঘুরে ঘুরে যেন সে বড় ক্লান্ত। এবার একটু মাটির জগতে ঘোরা যাক। তেজপুর যাবার জন্যে সেও তৈরী হল। ও পর্যন্ত সে নিশ্চয় যেতে পারে।

মিলিটারী ক্যান্টিনের ইনচার্জ সুশান্ত। নাম পড়ে সুচিরা চমকে ওঠে। এ কোন সুশান্ত! খোঁজ করতে গিয়ে অলকারও নাম পাওয়া যায়।

বোনের বাড়ী সুচিরা একবার যাবে। অনিলেশের কাছে সুচিরার এই প্রথম সামান্য এক প্রার্থনা।

না, সামান্য নয়, অসামান্য। অনিলেশের বুক জ্বলে ওঠে। সে ভাব গোপন করে জানায়, তার একটা অফিসীয়াল স্টাটাস্ আছে। একজন সাধারণ—

কিন্তু ওরা সুচিরার আত্মীয় এ কথা অনিলেশ ভুলে যায় কি করে, একটু শক্ত হয়ে জানায় সে।

এরপর কথা বলতে গেলে অপ্রিয় কথা বলতে হয়। অনিলেশ তাই নিঃশব্দে রিট্রিট করে।

সারা রাস্তা এক অদ্ভুত উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে সুচিরার কেটেছে। নিজের বুকের মধ্যে থেকে ইঞ্জিনের মত ধক্ ধক্ শব্দ শুনে সে চমকে উঠেছে। স্টুডিবেকার থেকে নাবার পর পা দুটো ভারি লেগেছে। সহজ হতে গিয়ে নার্ভাস ফিল্ করেছে।

আশা করেছিল খোলা দরজার মুখে সুশান্তকে দেখবে। কিন্তু তার জায়গায় যে দাঁড়িয়ে আছে সুচিরা তাকে অবাক হয়ে দেখল। সেও দেখল এবং চিনল। সম্ভ্রমের সঙ্গে ভেতরে আসার আহ্বান জানাল। সুচিরার দ্বিধা দেখে নিজের পরিচয় দিল, আমি অলকা। অবশ্য উনিও বাড়ীতে আছেন…।

কিন্তু না, সুচিরার আর আলাদা করে অলকার "উনি"কে দেখার সথ নেই। অলকার মধ্যে দিয়েই সুচিরার মনে হয় সুশান্ত, না অশান্ত, না না দুর্দান্ত নামে একটি জীবকে সে দেখে নিয়েছে। নির্দয়, অসংযম স্বার্থপর লোকটা অলকার সর্বাঙ্গে যে কালিমা ঢেলে দিয়েছে—এরপর তাকে দেখার সব প্রয়োজন সুচিরার ফুরিয়ে গেছে। সুচিরা এখন পালাতে চায়।

এক রকম ছুটেই সে চলে যায়।

সুচিরার নির্দেশে গাড়ী জোর স্পীড্ নেয়। সীটের ওপর পড়ে একটা তাড়া খাওয়া জানোয়ারের মত সুচিরা হাঁপাতে থাকে। জানলার সব কাঁচ নাবিয়ে দেয়। ঠাণ্ডা হাওয়া মাথায় মুখে লাগার পর একটু রিলিফ্ বোধ করে। সহজ হয়ে উঠে বসে। তারপর হঠাৎ তার মনে পড়ে যায়, আচ্ছা, অনেক দেরী হয়ে যায়নি ত!

সেকালের আমোদ-প্রমোদ

পৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বাস্তবিকই, খৃষ্টীয় সপ্তদশ-শতকের শেষভাগে ইংরাজ বণিক-সম্প্রদায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে-গড়া বাণিজ্য-কেন্দ্র—সার্ব্বজনীন-মহামিলনের অভিনব পীঠস্থান কলিকাতা শহরের উদ্ভব-কাহিনীও যেমন অদ্ভুত-চিত্তাকর্ষক, তেমনি বিচিত্র-কৌতূহলোদ্দীপক ছিল। এখানকার তৎকালীন দেশী-বিলাতী সমাজের ছোট-বড় ধনী-দরিদ্র অধিবাসীদের হালচাল, কাজ-কারবার, আচার-আচরণ, চিন্তাধারা, শিক্ষা-সভ্যতা-সংস্কৃতি, সৌখিন বিলাস-আড়ম্বর-নবাবীয়ানা, খামখেয়ালী হৈ-হুল্লোড়-বেলেল্লাপণা আর বিবিধ ধরণের আমোদ-প্রমোদ, উৎসব-অনুষ্ঠানের আজব-অপরিসীম হুজুক-প্রীতি। সেকালের প্রাচীন পুঁথি-পত্রের পাতায় এ সব কীর্ত্তিকলাপের নিদর্শনও মেলে প্রচুর। তাই একালের অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকাদের কৌতূহল নিবারণের উদ্দেশ্যে, বিগত আমলের সেই সব বিচিত্র কীর্ত্তিকলাপের কয়েকটি চিত্তাকর্ষক বিবরণ নীচে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

(৺কালীপ্রসন্ন সিংহ রচিত 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত)

…অ্যাং যায়, ব্যাং যায়, খলসে বলে আমিও যাই—বামুন কায়েতরা ক্রমে সভ্য হয়ে উঠলো দেখে সহরের নবশাক, হাড়িশাক, মুচিশাক মহাশয়রাও হামা দিতে আরম্ভ করলেন * * * সন্ধ্যার পর দুগাছী আটা ও একটু স্যাব্‌ড়ানের বদলে—ফাউলকারী ও রোল্ রুটি ইন্‌ট্রডিউস হলো। শ্বশুরবাড়ি আহার করা, মেয়েদের বাঁ নাক বেঁধান চলিত হলো, দেখে বোতলের দোকান, কড়িগণা, মাকুঠেলা ও ভালুকের লোম ব্যাচা কল্‌কেতায় থাকতে লজ্জিত হতে লাগলো। থরকামান চৈতন্য ফক্কার জায়গায় আলবার্ট ফ্যাশান ভর্ত্তি হলেন। চাবির থলো কাঁদে করে টেনা ধুতি পরে দোকানে যাওয়া আর ভাল দেখায় না, সুতরাং অবস্থাগত জুড়ি, বগি ও ব্রাউহাম্ বরাদ্দ হলো। এই সঙ্গে সঙ্গে বেকার ও উমেদারী হালোতের দু এক জন ভদ্রলোক মোসাহেব, তকমা আরদালী ও হরকরা দেখা যেতে লাগলো। ক্রমে কলে, কৌশলে, বেণেতী বেসাতে, টাকা খাটিয়ে অতি অল্পদিন মধ্যে কলিকাতা সহরে কতকগুলি ছোট লোক বড় মানুষ হন। রামলীলে, স্নানযাত্রা, চড়ক, বেলুন-ওড়া, বাজি ও ঘোড়ার নাচ এঁরাই রেখেচেন—প্রায় অনেকেরই এক একটি পোষা পাশ বালিশ আছে—"যে আজ্ঞে" ও "হুজুর আপনি যা বলচেন, তাই ঠিক" বলবার জন্যে দুই এক গণ্ডমূর্খ বরাখুরে ভদ্রসন্তান মাইনে করা নিযুক্ত রয়েছে। শুভ কর্ম্মে দানের দফায় নবডঙ্কা! কিন্তু প্রতি বৎসরের গার্ডেন ফিস্‌টের খরচে চার পাঁচটা ইউনিভারসিটি ফাউণ্ড হয়।

কলকেতা সহরের আমোদ শিগগির ফুরায় না, বারোইয়ারি পুজোর প্রতিমা পুজো শেষ হলেও বারো দি

ক্ষ্যালা হয় না। চড়কও বাসী, পচা, গলা ও ধসা হয়ে থাকে—সে সব বলতে গেলে পুঁথি বেড়ে যায় ও ক্রমে তেতো হয়ে পড়ে, * * *

......পাঠক! নবাবী আমল শীতকালের সূর্য্যের মত অস্ত গ্যালো। মেঘান্তের রৌদ্রের মত ইংরাজদের প্রতাপ বেড়ে উঠলো। বড় বড় বাঁশ ঝাড় সমূলে উচ্ছন্ন হলো। কঞ্চিতে বংশলোচন জন্মাতে লাগলো। নবো মুন্সি, ছিরে বেণে ও পুঁটে তেলি রাজা হলো। সেপাই পাহারা, আসা-সোটা ও রাজা খেতাব, ইণ্ডিয়া রবরের জুতো ও শান্তিপুরের ডুরে উড়ুনির মত, রাস্তায় পাঁদাড়ে ও ভাগাড়ে গড়াগড়ি যেতে লাগলো। কৃষ্ণচন্দ্র, রাজবল্লভ, মানসিংহ, নন্দকুমার, জগৎশেঠ প্রভৃতি বড় বড় ঘর উৎসন্ন যেতে লাগলো, তাই দেখে হিন্দুধর্ম্ম, কবির মান, বিদ্যার উৎসাহ, পরোপকার ও নাটকের অভিনয় দেশ থেকে ছুটে পালালো। হাফ-আথড়াই, ফুল-আথড়াই, পাঁচালি ও যাত্রার দলেরা জন্মগ্রহণ কল্লে। সহরের যুবকদল গোখুরী, ঝকমারী ও পক্ষীর দলে বিভক্ত হলেন। টাকা বংশগৌরব ছাপিয়ে উঠলেন। রামা মুদ্দফরাস, কেষ্টা বাগ্‌দী, পেঁচো মল্লিক ও ছুঁচো শীল কলকেতার কায়েত বামুনের মুরুব্বী ও সহরের প্রধান হয়ে উঠলো। এই সময়ে হাফ-আথড়াই ও ফুল-আথড়াই সৃষ্টি হয় ও সেই অবধি সহরের বড় মানুষরা হাফ-আথড়াইয়ে আমোদ কত্তে লাগলেন। শামবাজার, রাম-বাজার, চক ও সাঁকোর বড় বড় নিষ্কর্ম্মা বাবুরা এক এক হাফ-আথড়াই দলের মুরুব্বী হলেন। মোসাহেব, উমেদার, পাড়া ও দলস্থ গেরস্তগোছ হাড়হাবাতেরা সৌখীন দোহরের দলে মিশলেন। অনেকের হাফ আথড়াইয়ের পুন্যে চাকরি জুটে গ্যালো। অনেকে পূজুরী দাদাঠাকুরের অবস্থা হতে একেবারে আমীর হয়ে পড়লেন—কিছু দিনের মধ্যে তক্‌মা, বাগান, জুড়ি ও বালাখানা বনে গ্যালো!

* * *

অর্থাৎ, খৃষ্টায় সপ্তদশ, অষ্টাদশ শতাব্দীকালে নবাবী আর ইংরাজী শাসন-সভ্যতা-সংস্কৃতির বিচিত্র আবহাওয়ার সংস্পর্শে এসে শহর কলিকাতার দেশী-বিদেশী সমাজের লোকজন ক্রমশঃ এমনই অদ্ভুত আমোদপ্রিয়, জাঁক-জমক-অনুরাগী ও বিলাসী-সৌখিন আর উচ্ছৃঙ্খল-মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিলেন যে দৈনন্দিন কাজ-কারবারের অবসরটুকু তাঁরা সর্ব্বাই বিবিধ ধরণের হুজুগ-হিড়িকে মেতে অবাধ স্ফূর্ত্তিতে পরমানন্দে অতিবাহিত করতে চাইতেন। তাই সেকালের কলিকাতা শহর নিত্যই ছোট-বড় নানান্ উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজনে সরগরম হয়ে থাকতো অষ্টপ্রহর। সেকালের কলিকাতা-শহরবাসীদের এই আজব-উৎকট হুজুগ-প্রিয়তা সন্দর্শনে ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় তাঁর সুপ্রসিদ্ধ "হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা" গ্রন্থে যে অপরূপ ছড়াটি লিপিবদ্ধ করে গেছেন, প্রসঙ্গক্রমে সেটি এখানে উল্লেখ করা বোধহয় অসঙ্গত হবে না।

(বাউলের সুর)

আজব সহর কল্‌কেতা।
রাঁড়ি বাড়ি জুড়ি গাড়ি মিছে কথার কি কেতা।
হেতা ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে বলিহারি ঐক্যতা;
যত বক বিড়ালে ব্রহ্মজ্ঞানী, বদমাইসির ফাঁদ পাতা।
পুঁটে তেলির আশা ছড়ি, শুঁড়ী সোনারবেণের কড়ি,
খ্যাম্‌টা খান্‌কির খাসা বাড়ি, ভদ্রভাগ্যে গোলপাতা।
হদ্দ হেরি হিন্দুয়ানি, ভিতর ভাঙ্গা ভড়ংখানি,
পথে হেগে চোখরাঙ্গানি, লুকোচুরির ফের গাঁতা।
গিল্‌টি কাজে পালিশ করা, রাঙ্গা টাকায় তামা ভরা,
হুতোম দাসে স্বরূপ ভাষে, তফাৎ থাকাই সার কথা।

* * *

বাস্তবিকই, কলিকাতা শহর সম্বন্ধে সমাজসেবী দার্শনিক "হুতোম প্যাঁচার" এই ছড়ার যৌক্তিকতা যে সহজে উপেক্ষা করা যায় না, সে কথা বলাই বাহুল্য। তাছাড়া প্রাচীন কলিকাতা শহরের অধিবাসীদের উৎকট হুজুগপ্রিয়তার সম্বন্ধে স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় তাঁর সুবিখ্যাত "হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা" গ্রন্থে যে মন্তব্য করেছেন, সেটি শুধু সেকালের ক্ষেত্রেই নয়, একালের কলিকাতা শহরবাসীদের সম্পর্কেও বিশেষভাবে প্রযোজ্য বলে ধারণা হয়। কাজেই, আধুনিক-আমলের পাঠকপাঠিকাদের কৌতূহল-নিবারণের উদ্দেশ্যে, সে মন্তব্যটির সবটুকু অংশ নীচে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

(৺কালীপ্রসন্ন সিংহ রচিত "হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা" গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত)

হুজুক

সাধারণে কথায় বলেন, "হুনরেচীন" ও "হুজ্জুতে বাঙ্গাল", কিন্তু হুতোম বলেন "হুজুকে কল্‌কেতা"। হেতা নিত্য নতুন নতুন হুজুক, সকলগুলিই সৃষ্টিছাড়া ও আজগুব! কোন কাজকর্ম্ম না থাকলে "জ্যাঠাকে গঙ্গাযাত্রা" দিতে হয়, সুতরাং দিবারাত্র হুঁকো হাতে করে থেকে গল্প করে তাস ও বড়ে টিপে বাতকর্ম্ম কত্তে কত্তে নিষ্কর্ম্মা লোকেরা যে আজগুব হুজুক তুলবে, তা বড় বিচিত্র নয়! পাঠক! যত দিন বাঙ্গালির বেটর অকুপেশন না হচ্চে, যত দিন সামাজিক নিয়ম ও বাঙ্গালির বর্ত্তমান গার্হস্থ্য প্রণালীর রিফর্ম্মেশন না হচ্চে, তত দিন এই মহান্ দোষের মুলোচ্ছেদের উপায় নাই। ধর্ম্মনীতিতে যাঁরা শিক্ষা পান নাই, তাঁরা মিথ্যার যথার্থ অর্থ জানেন না, সুতরাং অক্লেশে আটপৌরে ধুতির মত ব্যবহার কত্তে লজ্জিত বা সঙ্কুচিত হন না।

*　　　　*　　　　*

নিরন্তর একই জায়গায় একত্রে বসবাস, নিবিড় মেলামেশা, ব্যবসা-বাণিজ্য, কাজ-কারবার, খানাপিনা, আমোদ-আহ্লাদ আর হৈ-হুল্লোড় করে দিন কাটানোর ফলে, বিদেশী সাহেব-সুবোদের দেখাদেখি সেকালের দেশী-বাবুদের মধ্যেও ক্রমশঃ সখের ও বিলাসিতার নানা রকম উৎকট হুজুকের নেশা, উদ্দাম আমোদ-প্রমোদ, উচ্ছৃঙ্খল, স্ফূর্ত্তি-বেলেল্লাপণা আর কদর্য্য অনাচার-স্পৃহা যে কতখানি ব্যাপক-প্রসারতা লাভ করেছিল, প্রাচীন পুঁথি-পত্রে সে সব প্রমাণও যথেষ্ট মেলে। প্রসঙ্গক্রমে, তারও কয়েকটি কৌতূহলোদ্দীপক নিদর্শন নীচে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো… এগুলি থেকে একালের অনুসন্ধিৎসু পাঠক পাঠিকারা অনায়াসেই তৎকালীন সমাজের রীতি-নীতি আচার-আচরণের সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নিখুঁত একটী পরিচয় সংগ্রহ করতে পারবেন।

সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়

(২১শে ফাল্গুন, ১২৪২। ৩রা মার্চ্চ, ১৮৩৬)

পঞ্চপদী

গিয়াছিনু কলিকাতা, যা দেখিনু গিয়া তথা,
কি লিখিব তার কথা,
হা বিধাতা, এই হলো শেষে। ভদ্রলোকের ছেলে যত,
কদাচারে সদা রত, সুরাপান অবিরত,
কত মত কুচ্ছ দেশে ২।
কাঙ্গালি বাঙ্গালি ছেলে, ভুলেও না বাঙ্গলা বলে, ম্লেচ্ছ কহে
অনর্গলে, তেরিয়া হয়ে পথে চলে, কাছ দিয়ে গেলে, বলে
গো টো হেল। পেনটুলুন জাকিট পরে, ধুতি-চাদর তুচ্ছ করে,
সদাই চাবুককরে মুখে বোল ইয়েস বেরিওয়েল। এবে
করি নিবেদন, গিয়াছিনু যেইক্ষণ, করিলাম নিরীক্ষণ, কোন
ধামে নব্যভব্য বাবু কত জন॥ ইংরাজ ফিরিঙ্গি সনে, বসি
সবে একাসনে, টিপিন করে হৃষ্টমনে, জনে ২ কথোপকথন॥
একজন বলে হিয়ের, ডোন লেফ্ ও মাই ডিয়ের,
হুইচ আই সে
হিয়ের ২ ফিয়ের গাড় ২। বেড সোয়ের নো ওয়েল, দেট ইজ
রোড টো গো হেল, অল ওবে বাইবেল, দেন উইল গো
নিয়ের লাভ ২। পরে বলে একদুষ্ট, অশিষ্ট ও অবিমৃষ্ট,
লেটকরকালী কৃষ্ণ, না ভজিও দুষ্ট ইষ্ট,
তুষ্ট হবেন প্রভু যিশুখ্রীষ্ট।
আমি যাহা কহি নিষ্ঠ, ভজ খ্রীষ্ট হবে বেষ্ট, শেষেতে জানিবা
স্পষ্ট, যদি হন খ্রীষ্ট রুষ্ট, যত হিন্দু ব্যাড্ কেষ্ট, পাইয়া
যথেষ্ট কষ্ট, হবে নষ্ট সহিত শ্রীকৃষ্ণ। পুনঃ কয়ে এক ষণ্ড,
কেবল পাষণ্ড ভণ্ড, হিয়ের মাই কাইণ্ড ফ্রেণ্ড,
ইংলণ্ডে যাইব চল,
সবে। ব্রহ্মাণ্ডের গ্রামখণ্ড, সেই হয় উক্ত খণ্ড,
ইহভিন্ন নেদরলেণ্ড,
আইলণ্ড ও এর্লণ্ড, হোলেণ্ড পোলেণ্ড গিয়া খণ্ড বুদ্ধি
খণ্ডাইব তবে॥
প্রথমে লণ্ডনে যাব, রিফারমর কহাইব, টেবিলেতে খানা খাব,
সিটী, চৌন
আদি বেড়াইব। মনার্ক নিকটে রব, আদর-টঙ্কে কথা কব,
বাঙ্গালার নাম
পাব, বিধবার বিয়া দেওয়াইব॥ এইরূপ কহে কথা,
হেনকালে আইল তথা,
সঙ্গে দারবান ছাতা, পদদ্বয়ে বুটযুতা,
ভদ্রলোকের পুত্র একজন। একখানি
গ্রন্থ করে, অতিপুলকিতান্তরে, উপনীত সেই ঘরে,
দেখি সবে সমাদরে,

আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া তখন ॥ গুডমারনিং শব্দান্তরেঃ
সকলে শোকহেন
করে, সমাদর পুরঃসরে, যত্ন করে বসিবারে,
চৌকি আনি দিন।
বাবুগণ যত্ন দেখি. বসিলেন হয়ে সুখি,
কিছুমাত্র নহেন দুঃখি, সকলের
মুখামুখি, পরে নানা প্রসঙ্গ হইল।
কত বা লিখিত তার উক্ত ব্যক্তি
সভাকর, পরে শুন চমৎকার, যে ব্যাপার কৈল সকলেতে।
আর বা লিখিব কত, মদ্য, মাংস আদি যত,
আহরিয়া কত মত, সবে হয়ে
সুখান্বিত, নানামত, নানামত লাগিল খাইতে॥
ইংরাজ ফিরিঙ্গীসনে, বসি সবে
একাসনে, টেবিলেতে হৃষ্টমনে, খাইল দেখি জনে ২,
ইথে মম হয় মনে,
ঘোর কলির আগমনে; কলিকাতা এত দিনে গেলো ৩।
তল্লক্ষণ দেখা যায়, সকলে
কুকর্ম্মে ধায়, ধর্ম্ম পানে নাহি চায়, দিব্য বুট দিয়া পায়,
ইংরাজ সহিত খায়—এ কথা
কহিব কায়, হায় ২ একাকার হলো ৩।
কস্যচিৎ সহর হুগলির প্রতাপপুরনিবাসি অত্যাচারদর্শিনঃ॥
(ক্রমশঃ)

যখন পড়বেনা মোর পায়ের চিহ্ন

শ্রীনিরপেক্ষ

'যে দিন নারায়ণ ডেকে নেবেন, আমার স্কুলে একটি খবর পাঠিয়ে দিস্ বাবা! তাঁদের বলিস্—স্কুলের বাগানে, আমি যেখানে বসতাম, ঠিক সেই থানটায় একটা কদম, না হয় বকুল, আর যদি তাও না পাওয়া যায় ওঁরা যেন একটা বটগাছ পুঁতে দেন। যতদিন সেই গাছটি থাকবে, লোকে আমার কথা মনে রাখবে। ছবি টাঙ্গানোর দরকার নাই—গাছের শীতল ছায়ায় আমার ছবি আঁকা থাকবে।' মহাপ্রয়াণের ঠিক একপক্ষকাল আগে রোগ শয্যায় শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করে গিয়েছিলেন, সেকালের একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক মাণিক ভট্টাচার্য্য। অনুমান চারমাস-কাল রোগ ভোগ করার পর গত ১৩ই চৈত্র ১৩৭১ (ইংরাজি ২৭শে মার্চ ১৯৬৫), শনিবার সকাল ৬টায় এই এককালের অতি-পরিচিত সাহিত্যিক এক সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। যাদের মাঝে শেষ কটা দিন ছিলেন, তারা চিনলো না, জানলো না তাঁকে। মাণিকবাবুর সাহিত্য প্রতিভার কথা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত তাদের কাছে রয়ে গেলেও স্নেহপূর্ণ হৃদয়ের পরিচয় অনেকেই পেয়েছিলেন। জন্মের সঠিক তারিখ জানা না থাকলেও ১২৯৪ সালের ফাল্গুন শুক্লপক্ষের বৃহস্পতিবার তাঁর জন্ম হয়েছিল রাণাঘাটে (নদীয়া)।

পণ্ডিতের বংশে তাঁর জন্ম হয়। পিতামহ, প্রপিতামহ এবং উর্দ্ধতন আরও তিন পুরুষের বিষয় তিনি জানতেন। তাঁরা সকলেই ছিলেন পণ্ডিত—নদীয়ার অলঙ্কার বলা যেতে পারে তাঁদের। তবে মাণিকবাবুর পিতাঠাকুর শৈশবে মাতৃপিতৃহীন হয়ে পড়ার ফলে পড়াশোনা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। তাঁকে মাত্র ৬।৭ বৎসর বয়সেই অর্থোপার্জ্জন আরম্ভ করতে হয়। তাঁরই সহৃদয়া কোন আত্মীয়া নতুন গামছা কিনে তাঁর কাঁধে চাপিয়ে দিতেন আর সেই শিশুটিকে সারাদিন ঘুরে ঘুরে সেগুলি বিক্রী করতে হত! ব্রাহ্মণের সন্তানকে বৈশ্যের বৃত্তি নিতে হয় এত অল্প বয়সে। লেখাপড়ার কি আকাঙ্ক্ষা! হল না। তার জন্য গভীর ক্ষোভ মনে নিয়ে ছোট ভগ্নীটির কথা মনে রেখে মন দিয়ে ব্যবসা করতে থাকেন ৺রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

জন্ম—ফাল্গুন ১২৯৪　　মাণিক ভট্টাচার্য　　মৃত্যু—চৈত্র ১৩৭১

এই সাধু শিশু তার সরল ব্যবহারে এবং সাধুতার জন্য অল্পদিনেই 'ফেরী' বন্ধ করে দোকান খুলে বসলেন—কাপড়ের দোকান। রাণাঘাট এবং কাছে পিঠের গাঁ গুলির মধ্যে সেরা দোকান হয়ে দাঁড়ালো তাঁরটা। এই কঠিন পরিশ্রমী ব্যবসায়ী রাণাঘাটে দুটো বড় বড় কাপড়ের দোকানের মালিক হলেন—একটি বড়বাজারে, আর একটি ছোটবাজারে।

বিবাহ করে সংসারী হলেন। দুই ছেলে আর চারটি মেয়ে তাঁর। মাণিকবাবু পিতার কনিষ্ঠ পুত্র। নিজে লেখাপড়া শিখতে না পাবার ক্ষোভ মেটানোর জন্য পাঠেচ্ছু অনেক গরীব ছেলেদের থাকা আর খাওয়ার ভার তিনি যেচে নিয়েছিলেন। এমন ছাত্রের সংখ্যা ছিল অনুমান ৬০।৬৫টি।

ছেলেবেলা থেকেই পড়াশোনার বিশেষ আগ্রহ ছিল মাণিকবাবুর—একটু ভাবুকপ্রকৃতির ছিলেন তিনি। একদিন পিতা রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, জ্যেষ্ঠ পুত্রের শিক্ষা বিষয়ে অমনোযোগিতা দেখে অনুযোগ করে বল্লেন—'মাণিক—তুই বাবা লেখা পড়া ছাড়িসনি যেন! আমার সাধ তুই পণ্ডিত হোস্, তবু নিজে মুখ্যু থাকার ক্ষোভ একটু কমবে আমার!' মাণিকবাবু তাই বলতেন, তিনি পিতার এই অনুরোধের কথা এক মুহূর্ত্তের জন্য বিস্মরণ হন নি। দোকানে তাই ডেকে বসালেন জ্যেষ্ঠপুত্রকে। কয়েকটি ভায়ের মৃত্যুর পর জন্ম হয়েছিল মাণিকবাবুর বড় ভায়ের, তাই আদর পেয়েছিলেন একটু বেশী। শোনা যায় যমরাজার দৃষ্টি এড়ানোর জন্য তাঁকে ৫টি কড়ি দিয়ে নাকি কেনা হয়েছিল ধাই মার কাছ থেকে, সেই কারণে নাম হল তাঁর 'পাঁচকড়ি'।

৺রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কথা আজও রাণা-

ঘাটের লোকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। দারিদ্র্যের কঠিন জ্বালা শৈশব থেকেই অনুভব করে এসেছিলেন তিনি। তাই যখন এই দৈন্যের হাত থেকে মুক্তি পেলেন তখন অন্যের দুঃখকষ্টের বিষয়ে তিনি অতিমাত্রায় সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। মেয়ের বিয়ে বা বাপমায়ের শ্রাদ্ধের সময় সাহায্য চাইতে এসে একজনও হতাশ হয়ে ফেরেনি! দুহাতে দান করেছেন তিনি—জন্ম হয়েছিল যে 'অবসতি' চট্টোপাধ্যায় বংশে! পূর্বপুরুষেরা শোনা যায় ১২ বৎসর অন্তর বসত বাড়ী পর্যন্ত দান করতেন—তাই তো এঁদের 'অবসতি চট্টোপাধ্যায়' বলা হয়।

মাত্র তিন বৎসর বয়সে মাণিকবাবু মাতৃহীন হন, আর চৌদ্দ বৎসর বয়সে বাবাকে হারান! মৃত্যুর পূর্বে একদিন মনের ক্ষোভে মাণিকবাবুকে ডেকে বলেছিলেন—'আচ্ছা মাণিক তোমায় যদি দোকানের কাজে বসিয়ে দেই লেখাপড়া ছাড়িয়ে, তুমি কি খুব কষ্ট পাবে বাবা?' সঙ্গে সঙ্গে মাণিকবাবু উত্তর দিয়েছিলেন—'তুমি যা বলবে আমি তাই করবো—কোন কষ্ট হবে না।' এত ভালোবাসতেন তিনি বাবাকে! শেষে তাঁর পিতা বলেন—'না থাক্—তুই পণ্ডিত হ'বি—, বংশের ধারা বজায় থাকবে। তোর দাদাকে বুঝিয়ে বলবো—।'

পিতার মৃত্যুর পর বৃহৎ সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার পড়লো একটি ১৭।১৮ বৎসর বয়সের কিশোরের হাতে। কু-পরামর্শ দেওয়ার লোকের তো অভাব ছিল না—কিশোর তাই সহজেই ফাঁদে পড়েন। লোভীর দল একে একে গ্রাস করতে লাগলো সব। তবু বড় ভায়ের প্রতি অগাধ ভক্তি তাঁর! জ্যেষ্ঠের বিরুদ্ধে কোন কটু সমালোচনা তিনি সহ্য করতে পারতেন না—মুহূর্তে সরে যেতেন সেখান থেকে। দুই ভায়ের মধ্যে এমন মধুর সম্পর্ক বিরল!

লেখার আগ্রহ তাঁর ৯।১০ বৎসর বয়স থেকেই। একবারের ঘটনা, তিনি সম্ভবত তখন ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। পণ্ডিতমশাই ব্যাকরণ পড়িয়ে কিছু লিখতে দিয়েছিলেন। বালক মাণিকবাবু উত্তর লিখে খাতাটি অন্যান্য খাতার সঙ্গে টেবিলে রেখে দেন। পণ্ডিতমশাই খাতা দেখে যাচ্ছেন, এবার মাণিকবাবুর পালা। বাতাসে উত্তরের পৃষ্ঠা উড়ে অন্য একটি পৃষ্ঠা সামনে এসে গেছে। পণ্ডিতমশাই মোটা চশমাটা আরও খানিকটা নাকের উপর এগিয়ে দিয়ে পড়লেন—'ভারত উদ্ধার'—শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য! বালকের অবস্থা তখন কল্পনা করার মত! ভয়ে তখন কাঁপছেন—কান দুটো লাল হয়ে উঠেছে! আর কিছু ভেবে ঠিক করতে না পেরে বই-খাতা ক্লাসে ফেলে রেখে পণ্ডিত মশায়ের কাছে অনুমতি না চেয়েই ছুটে বেরিয়ে গেলেন বাইরে—একেবারে চূর্ণা নদীর ধারে বুড়ো বটগাছের তলায়! কতক্ষণ সেখানে বসেছিলেন স্মরণ নাই। মনে পড়লো ক্লাশ পালানোর কথা!…সেদিন আর ক্লাসে যাওয়া হল না—পাল চৌধুরীর স্কুল। খালি হাতে বাড়ী ফিরলেন।

পরের দিনের কথা। ক্লাশে চুপ করে শেষের বেঞ্চিতে বসে আছেন। পণ্ডিতমশাই এলেন। ডাক পড়লো। অত্যন্ত ভীত হয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন—দু চোখে জল ভরা!

'ভারত উদ্ধার করলে কি—না বলে ক্লাশ পালাতে হয়? নিজে লিখে থাকলে ভালো হয়েছে—অভ্যেস রেখো।' অবাক হয়ে গেল শিশু, পণ্ডিতমশায়ের কথায়। বেত পড়লো না তো পিঠে! এ যে আশীর্বাদ করছেন! তাই শেষ দিন পর্য্যন্ত মাণিকবাবু বারবার এই পণ্ডিতমশায়ের কথা উল্লেখ করে বলতেন—'পণ্ডিতমশাই তিরস্কার করলে হয়তো সারা জীবনের মত লেখার অভ্যাস ছেড়ে দিতে হত।'

অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলেন তাঁরা চার জন—সর্বশ্রী ক্ষীরোদ চন্দ্র পালচৌধুরী, নিতাইচন্দ্র দালাল আর সুধাময় (পদবী স্মরণ নাই)। শৈশবের বন্ধু এঁরা। সুধাময়বাবুর মৃত্যু পূর্বেই হয়েছিল। ক্ষীরোদবাবুর জন্ম হয়েছে বাংলার গৌরব বিখ্যাত পালচৌধুরী বংশে—মাণিকবাবুর মৃত্যুতে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছেন তিনি। নিতাইবাবু রোগ শয্যায় পড়ে আছেন। মাণিকবাবুর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে রোগ শয্যা থেকেই শিশুর মত কেঁদে কেঁদে ডেকেছেন—'ও মাণিক একা যেও না…!' যেদিন রাত্রে হঠাৎ উঠতে গিয়ে মাণিকবাবুর 'কলার বোন্' ভেঙ্গে যায়, সেই সংবাদ পেয়েই প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে তাঁকে দেখতে গেছেন নিতাই বাবু! এমন স্বর্গীয় দৃশ্য সঞ্চিতপুণ্য থাকলে দেখতে পাওয়া যায়।

কয়েকবার সরকারী চাকরী পেলেও তিনি তা ছেড়ে দেন—আর গ্রহণ করেন শিক্ষকতা। যে স্কুলের তিনি

ছাত্র ছিলেন সেই স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক এবং অল্পদিনেই প্রধান শিক্ষক হন। সেকালে পশ্চিমের আকর্ষণ ছিল অসীম। তাই বিহারের গয়া জেলার অন্তর্গত আরাঙ্গাবাদ শহর থেকে প্রধান শিক্ষকের চাকুরী পাওয়া মাত্র সেটা গ্রহণ করলেন। অবশ্য রাণাঘাট ছেড়ে চলে যাওয়ার মধ্যে ছিল আদর্শের দ্বন্দ্ব!

একই স্কুলে (Gait High English school) তিনি প্রায় ৩০ বৎসর কাল প্রধান শিক্ষকের কাজ করে ১৯৪৭ সালে অবসর গ্রহণ করেন। নিজের হাতে গড়া স্কুল তাঁর। কত ঝড় বয়ে গেছে সেকালে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে। এই আদর্শ শিক্ষক তাঁর কর্তব্যে থাকতেন অটল আর নির্ভীক! হিন্দু মুসলমান সকলেই তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতো। স্বাধীনতার পূর্বে ২৬শে জানুয়ারী পতাকা উত্তোলনের দিনে কত জায়গায় কত গোলমাল হত, কিন্তু এমন অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল এই আদর্শ শিক্ষকের—ইনি এসে দাঁড়ালেই সব গোলমাল শান্ত হয়ে যেত।

বিহারে ১৯৩৭ সালে প্রথম কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। সাথে সাথে প্রাদেশিকতার বিষ ছড়িয়ে পড়ে অদ্ভুত ভাবে। তবে মাণিকবাবুকে সকলে শিক্ষক বলেই জেনেছিল, ইনি ছিলেন সকল নীচতার বহু ঊর্দ্ধে। একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ না করলে আমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে। তখন বিহারের বর্ত্তমান মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসত্যেন্দ্র নারায়ণ সিংহের পিতা, বর্ত্তমান বিহারের একজন অন্যতম নির্ম্মাতা ৺অনুগ্রহ নারায়ণ সিংহ ছিলেন অর্থমন্ত্রী। তাঁর দুই ছেলেই মাণিকবাবুর ছাত্র। তখন প্রাদেশিকতার তাণ্ডব চলছে। শিক্ষা বিভাগের একজন 'বরিষ্ঠ' পদস্থ কর্ম্মচারী হঠাৎ আসেন স্কুল পরিদর্শনে কোন সংবাদ না দিয়ে। এত বড় স্কুলে একজন বাঙ্গালী প্রধান শিক্ষক! অসহ্য। সইতে পারলেন না। 'এই প্রধান শিক্ষককে সরাতে না পারলে-স্কুলটি তুলে দিয়ে অন্য স্কুল গড়তে হবে'; তিনি প্রচার করে দিলেন! ফলে নতুন স্কুলের গোড়া পত্তন হল। ছাত্র-সংখ্যা মাণিকবাবুর স্কুলে একটু কমলো—আর্থিক সঙ্কটও দেখা দিল। কয়েকজন শিক্ষককে না সরালে চলবে না! মাণিকবাবু কিন্তু কর্ত্তব্যে অবিচল—ছাঁটাই হবে না। জানিয়ে দিলেন সকলের স্বসম বেতন কমবে।' হাসিমুখে কষ্ট সহ্য করলেন এবং তাঁরই আদর্শে আর সকলেই সেটা সানন্দে গ্রহণ করলেন। এই সংবাদ কি রকমে সে সময়ের অর্থমন্ত্রী স্বর্গত প্রভু নারায়ণ সিংহের কানে পৌঁছে গেল। মাণিকবাবু জানাননি। সঙ্গে সঙ্গে তিনি চিঠি দিয়ে ডেকে পাঠালেন মাণিকবাবুকে পাটনায় তার সঙ্গে দেখা করতে। মাণিকবাবু পাটনায় গেলেন। মন্ত্রী মশায়ের সাথে সাক্ষাৎ করতে চলে গেলেন কত দুর্ভাবনা নিয়ে। মন্ত্রী মশাই তাঁর আগমন সংবাদ পাওয়া মাত্র নিজের ঘরে ডেকে পাঠালেন। মাণিকবাবুকে বসতে বলে টেলিফোন তুললেন—'কে?··· বাবু? শুনুন—আরাঙ্গাবাদ গেট হাই স্কুলের হেড মাষ্টার মশাইকে চেনেন?

উত্তর আসে—'হ্যাঁ চিনি···একজন বাঙ্গালী।'

'না, তবে তাকে চেনেন না। মাণিকবাবু বাঙ্গালী বা নন-বিহারীও নন—এ সবের অনেক ঊর্দ্ধে, তাঁর একমাত্র পরিচয় তিনি আদর্শ গুরু। আর যার সাথে যাই করুন, এঁকে জ্বালাতন করবেন না।' অবাক হয়ে গেলেন মাণিকবাবু—এঁকে কে বলেছে এ সব কথা!

'আমায় বলেননি কেন মাণিকবাবু? এতটা দুর্ভোগ হত না। যাক কোন কষ্ট হলে জানাবেন।'

সত্যই এই আদর্শবাদী সাহিত্যিক শিক্ষক এই সব সঙ্কীর্ণতার বহু ঊর্দ্ধে ছিলেন। তাই অবসর গ্রহণ কালে স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ যখন তাঁকে সামান্য কিছু টাকা (১০০১) দিতে চেয়েছিলেন, তখন তিনি তাঁদের অনুরোধ করেন—এই উপহারের পরিবর্ত্তে তাঁরা যেন স্কুলে বাংলা পড়ানোর জন্য একজন বাঙ্গালী শিক্ষক নিয়োগ করেন, তিনি বাংলাও পড়াবেন সাথে সাথে অন্যান্য বিষয়ও পড়াতে পারবেন। বাঙ্গালী ছেলেরা তাহলে মাতৃভাষা শিক্ষার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে না। স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ সানন্দে স্বীকার করলেন এবং বাক্য দান করেন যে তাঁর স্কুলে একজন বাঙ্গালী ছাত্র থাকলেও বাংলা ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। আজও সেই ব্যবস্থা তাঁর স্কুলে চলছে।

ভাব-প্রবণ সাহিত্যিক মাণিকবাবু ছিলেন ৺প্রভাত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সমসাময়িক। 'মানসী ও মর্ম্ম-বাণীর' যুগে তিনি প্রভাতবাবু এবং নাটোরের মহারাজার সাথে একত্রে নানা রকম সাহিত্য-সেবার পরিকল্পনা

করতেন। মাণিকবাবুর রচনা অধিকাংশই রচিত হয় তাঁর বিহার বাস কালেই, যদিও তার সূচনা হয় রাণাঘাট থাকা কালে। সেই সময় তাঁর থেকে বয়সে অনেক ছোট, সাহিত্যসেবী শ্রীসুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর পাশে অনুজের মতই এসে দাঁড়িয়েছিলেন। স্কুল থেকে ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসতেন মাণিকবাবু, তারপর একটু বিশ্রাম করতেন। ঘুমিয়েও পড়তেন ক্লান্তিতে। লেখার জন্য প্রস্তুত হতেন আবার প্রায় রাত্রি দশটায়। লিখতেন এবং পড়তেন। মাণিকবাবুর লেখা পাঠোদ্ধার করা সহজ ছিল না—তখনকার দিনে একমাত্র সুবোধবাবুই সেগুলি পাঠোদ্ধার করে তুলে নিতেন। তারপর রচনাগুলি যেত প্রকাশার্থে। আর পাঠোদ্ধার করতেন মানসী ও মর্ম্মবাণীতে প্রকাশের জন্য বাংলা সাহিত্যের 'মোপাসাঁ' প্রভাত মুখোপাধ্যায় মশাই—যাঁর কাছে গল্প লিখে সেই ভাবেই পাঠিয়ে দিতেন মাণিকবাবু। সে সময়ে ভারতবর্ষের সম্পাদক ৺জলধর সেন মহাশয় আর প্রবাসীর সম্পাদক ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মাণিকবাবুর গল্পের জন্য অত্যন্ত আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করতেন। ছোট গল্পের জন্য মাণিকবাবুর খ্যাতি ছিল যথেষ্ট। প্রায় মাসেই তাঁর গল্প বা উপন্যাস যে সব মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ লাভ করতো, সেগুলির মধ্যে প্রধান ছিল 'ভারতবর্ষ', 'মানসী ও মর্ম্মবাণী', 'বসুমতী', 'প্রবাসী,' 'উদয়ন', 'পুষ্পপাত্র', 'উত্তরা' ইত্যাদি।

নিজের বৃহৎ পরিবারের সাথে ভার নিতেন স্কুলের দরিদ্র ছেলেদের, তাদের অসুখে-বিসুখে এই আদর্শ শিক্ষক সস্ত্রীক চিকিৎসা আর সেবার ভার নিজেরাই তুলে নিতেন। স্কুলের কোষ থেকে চিকিৎসার ব্যয় করার অসুবিধা দেখা দিলে তিনি নিজেই সেই ভার বহন করতেন। তাঁর স্ত্রী৺মায়াদেবী মাতৃসুলভ স্বভাবে রোগীর সেবার ভার তুলে নিতেন। তাইতো আজও তিনি আরাঙ্গাবাদে সকলের 'মায়জী।'

যুক্ত বিহার-উড়িষ্যার প্রথম ভারতীয় চীফ্ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীসনৎকুমার রায় ছিলেন মাণিকবাবুর বিশেষ বন্ধু এবং ভক্ত। আরাঙ্গাবাদের দিকে পরিদর্শনে এলেই তিনি মাণিকবাবুর কাছে আসতেন, গয়া জেলার মধ্যে 'কালুডাক্ জঙ্গল' শিকারের জন্য বিখ্যাত। সনৎবাবু শিকারীর দল নিয়েও মাঝে মাঝে আসতেন। সাথে সাথে মাণিকবাবুর ডাক পড়তো। নিরীহ সাহিত্যিকদের শিকারে কোন আগ্রহ ছিল না, তাই তিনি ডাক্-বাংলোতেই থাকতেন, যখন আর সকলে সারারাত গহন বনে ঘুরে বেড়াতেন শিকারের খোঁজে! সকালে তাঁরা ফেরার আগেই মাণিকবাবুর গল্প তৈরী থাকতো। ক্লান্ত শিকারীদের চায়ের সাথে সুমধুর কাহিনী পরিবেশন করতেন মাণিকবাবু। এই অবকাশে লিখিত ছোট গল্পগুলির মধ্যে তাঁর একটি গল্প যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করে ('প্রেমের মূল্য' গল্প গ্রন্থে পাওয়া যাবে)।

উপন্যাস অপেক্ষা ছোট গল্প লিখতে বেশী ভালো বাসতেন। তবে তাঁর অধিকাংশ ছোট গল্পে উপন্যাসের সব রকম উপাদান থাকতো। তাই নাটোর মহারাজ অনুযোগ করতেন—'মাণিকবাবু আমাদের উপন্যাস থেকে বঞ্চিত করছেন কেন? এগুলো একটু বাড়িয়ে লিখে ফেলুন। শিক্ষক সাহিত্যিকের আদর্শবাদ আকার পেয়েছিল তাঁর শিক্ষা বিষয়ক উপন্যাস 'প্রশান্ত' বইখানিতে। এই ধরণের উপন্যাস সেকালে ছিল না বলা যেতে পারে। শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধ তিনি বহু লিখেছেন—আর সেই সব প্রবন্ধে তিনি শিক্ষা ব্যবস্থার নানা বিষয়ে আলোচনা করে গেছেন, তার সমাধানের সংকেত দিয়েছেন।

মাণিকবাবুর উপন্যাসগুলির মধ্যে 'কালো বৌ', অদৃষ্টের খেলা' 'স্মৃতির মূল্য' 'অপূর্ণ' 'অমর প্রেম, 'শঙ্কর' 'চির অপরাধী, 'অশ্রুনির্ঝর' 'মালতী ও বিভূতি' ইত্যাদি হচ্ছে প্রধান। ছোট গল্প সংগ্রহের মধ্যে বিশেষ খ্যাতি লাভ করে 'বন্ধু' 'প্রেমের মূল্য' 'পাথরের দাম' 'মিলন' 'অনুপম' 'প্রভাতের স্বপ্ন' ইত্যাদি। 'মিলন' বইখানি একটি নাট্য সংগ্রহ। এই ধরণের ছোট ছোট নাটিকা বাংলা সাহিত্যে মাণিকবাবুর সৃষ্টি একথা বলা যায়। পরবর্ত্তীকালের লেখকের রচনায় এই রচনা পদ্ধতির প্রভাব দেখতে পাওয়া গেছে। 'মিলন' বইখানির বৈশিষ্ট্য আজও অস্বীকার করার উপায় নাই। মাণিকবাবুর অসংখ্য ছোট গল্পের মধ্যে এমন অনেক গুলি আছে যে গুলি সাহিত্যিককে অমর করে রাখতে পারে, আর কিছু রচনা না করলেও। 'অনুপম, 'পাঁথারী' 'পাথাকুলি' 'তোরের বাতাস' তাদের মধ্যে অন্যতম।

সভা-সমিতির গোলমাল থেকে নিজেকে দূরে রাখতেন

তিনি। সাহিত্য সম্মেলনে বহুবার তাঁর ডাক পড়তো, তিনি সে সব এড়িয়ে যেতেন। তাঁকে নিয়ে কেউ হৈচৈ করবে, তা তিনি ভালোবাসতেন না! মানিকবাবু বলতেন—'আমি আনন্দ পাই তাই লিখি। লোকে তা নিয়ে সভাসমিতি ডেকে স্তুতিবাদ করে আমার সেটা ভালো লাগে না।' ঠিক এই কারণেই বর্ত্তমান যুগের পাঠকপাঠিকারা তাঁকে বিশেষ চেনেন না।

অভাবের সাথে অহর্নিশ যুঝতে হয়েছে এই সাহিত্যিককে, হয়তো এই কারণেই অকালেই মানিকবাবু লেখা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। অবশ্য মাঝে মাঝে তাঁর গল্প পাওয়া যেত। ইদানীং তিনি প্রবন্ধ আর কবিতা লিখতেন বেশী। 'তদবধি' তাঁর প্রকাশিত কাব্য গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম।

বাংলা সরকার তাঁর সাহিত্যসেবার স্বীকৃতি হিসাবে তাঁকে মাসে ৭৫৲ টাকার পেন্সান দিতেন। এই ধরণের বৃত্তির সুযোগ দেন স্বর্গত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বাংলার মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন।

মধুরভাষী স্নেহপ্রবণ সাহিত্যিকের ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হয়ে যেতেন। অভাব অভিযোগের হাত থেকে তাকে নিষ্কৃতি দিতে পারলে হয়তো আজও বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার আরও একটু সমৃদ্ধ হতে পারতো। তাই শেষ করছি তারই কথা দিয়ে—

"পুষ্প ফুটি তরু শাখে কোথায় মিলায়,
গন্ধ কাঁদি বলে আমি জানিয়াছি হায়।"

হে সৈনিক

শ্রীবংশী মণ্ডল

এইবার শেষ কথা বলে দাও
সকরুণ সাগরের তীরে
মহাজাগতিক শূন্যে সুবিপুল
অন্য এক সূর্য্যের শরীরে
কারা আজো হেঁটে যায়
পৃথিবীর বুনো হাঁস—হৃদয়ের ত্রাণ
প্রজাপতি মরে গিয়ে অন্ধকারে
আকাশের পায় কি সন্ধান ?
মরে গেছে কবে—
উত্তেজিত লাল মেঘে সে বিরাট
দিগন্ত প্রতিমা
জীবনের ঘাটে আনে যত ঋণ
উৎসারিত বেদান্তের সীমা
সে কেমন অন্ধকার—
পড়ন্ত রৌদ্রের দেহে
এযে তার নব সম্মোহন
প্রজ্ঞার আকাশে অগ্নি জেলে দেয় অবিকল
অতলান্ত সাগরের কোণ।
অনেক স্বীকৃতি নিয়ে—আরো যে বিস্মৃতি ঘুম
চৈতন্যের নীল—
জীবনকে গাঢ় করে
গড়ে তোলে তিল তিল অবিশ্রান্ত গতির মিছিল
জড়তার অন্ধকারে প্রগাঢ় ব্যাপ্তির তলে
নীল সূর্য্য পিচ্ছিল বাতাসে
দুর্ব্বোধ আত্মার পাখী একটি হৃদয় ঘিরে
আকাশ কে ছুঁয়ে ছুঁয়ে আসে।
সেথায় অনেক কথা।
নিজস্ব দৈন্যের শেষে শত ছিদ্র নিঃস্ব সমারোহ
বিবর্ণ বকুল বনে উদ্ধত চাঁদের ত্রাণ
সৃষ্টি করে সমুজ্জ্বল সুরের আবহ
জীবন মৃত্যুর পর।
পৃথুল শরীরে তার অগণিত দিগন্তের টানে
সহস্র আকাশ হেঁটে একই পথে বারে বারে
বেদনাকে গাঢ় করে আনে।
মানুষেরা ঘুমিয়েছে লোণা জলে
ফসলেরা ঘুমাবে কি মাঠে
আসন্ন অপার মৃত্যু বিবর্ণ করবে কেন
অশরীরী সেথা পথ হাঁটে।
যেমন সময় চলে—সূর্য্য-হিম-উল্কা জব
এ জীবন তবু বার বার
হয়েছে বিষণ্ন নীল অবচেতনায়
আর এক হৃদয়কে হারিয়ে পাবার।

মার্গ সংগীত ও যুগ-প্রভাব

সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

যুগের দাবীতে মার্গ সংগীত আজ সামন্ততন্ত্রের দরবারী পরিবেশ থেকে বাইরের সাধারণ আসরে ঠাঁই নিয়েছে। রাজসভা আর জমিদারের বাগানবাড়ির প্রাচীর অতিক্রম ক'রে উচ্চাংগ সংগীত আজ মুক্ত প্রাঙ্গণে সামিয়ানার নীচে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সম্বর্ধনায়, সুউচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। আকবরের বাদশাহী আমল থেকে দেশীয় রাজা মহারাজার কাল পর্যন্ত যে সভাগায়কদের কণ্ঠ শুধু ভোগবিলাসের ব্যক্তি সীমানার মধ্যে গীত সৃষ্টি ক'রেছে, যুগের প্রভাবে তারই আজ স্বাগত আবির্ভাব সম্ভব হ'য়েছে জনসমষ্টির ব্যাপক পরিসরে। অবশ্য একথা স্বীকার করতেই হবে যে, সেকালের ধনী রাজন্যবর্গ গুণগ্রাহী ছিলেন এবং গুণী-দের পৃষ্ঠপোষকতা করতে তাঁরা বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করতেন না। তাঁদের সহানুভূতি ও সাহায্যেই গুণী শিল্পীরা পেতেন সাধনমার্গে সিদ্ধিলাভ করার সুযোগ। তবে সে ফলশ্রুতি সীমাবদ্ধ থাকত আশ্রয়দাতা রাজপুরুষদের ব্যক্তি-গত মনোরঞ্জনে; তার প্রসাদ সাধারণের লভ্য ছিল না। গণতান্ত্রিক যুগের প্রভাবে আজ কিন্তু তা' সম্ভব হ'য়েছে।

রাজসভার গায়ক আজ জনসভার গায়ক হ'লেও ঘরণার অবগুণ্ঠন কিন্তু সম্পূর্ণ উন্মোচিত হয়নি, কিছুটা শিথিল হ'য়েছে মাত্র। সংগীতধারা ও গায়কীর বিশুদ্ধি ও ঐতিহ্য রক্ষার জন্যে যে ঘরাণার সৃষ্টি হ'য়েছিল, তাই আবার এক-কালে চরম গোঁড়ামিতে শুধুমাত্র উত্তরাধিকার সৃষ্টির সীমা-বদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে বন্দীশালার রূপ নিয়েছিল। ফল কিন্তু হ'য়েছিল বিষময়। বিভিন্ন ঘরাণার ওস্তাদগণ তাঁদের যুক্তিহীন রক্ষণশীলতার জন্যে বহু প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন শিল্পীকে তালিম পর্যন্ত দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। তাঁদের অমূল্য রত্ন ভাণ্ডার উজাড় ক'রে দিতে পারেন নি সাধারণ গুণী শিল্পীদের মধ্যে শুধু ঐ রক্ষণশীল মনোভাবের জন্যেই। তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়েছে দেশের সংগীত শিল্পই। সাহিত্য, চারু-কলা, ভাস্কর্য-শিল্পের বিভিন্ন শাখার মধ্যে কিন্তু এই অহেতুক রক্ষণশীলতা নেই; তবে সংগীতকলার মধ্যেই বা থাকবে কেন? অন্যান্য শিল্পের মধ্যে ঘরাণার ঘোমটা না টেনেও যদি উন্নতি সম্ভব হয়, তা হ'লে সংগীতের মধ্যেই বা থাকবে কেন ঘরাণার ঘেরাটোপ? এই অগণতান্ত্রিক মনোভাবের ফলে অনাগত যুগের প্রতি পরোক্ষ অশ্রদ্ধাই প্রকাশ পাচ্ছে না কি? অনাগতকালের প্রতিশ্রুতিবান শিল্পীরা কেন পাবেন সংগীতকলাবিদ্‌দের ক্ষমাহীন উপেক্ষা? সনিষ্ঠ সম্ভাবনাময় শিল্পীকে শিক্ষা দিলে গীতি-ধারার বিশুদ্ধি নষ্ট হওয়ার কথা নয়।

বৈদিক যুগের সামগানের উপাদান নিয়েই গঠিত হয় প্রথমে গান্ধর্ব সংগীত ও পরে মার্গসংগীত। ভারতীয় সমাজে মার্গসংগীতের বেশ চর্চা ছিল খ্রীষ্টীয় প্রথম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত। গান্ধর্ব সংগীতের তিনটি অঙ্গ ছিল —স্বর, পদ ও তাল। পরবর্তী যুগে সেগুলি গীত, নৃত্য ও বাদ্য নামে পরিচিতি লাভ ক'রেছে এবং এই ত্রয়ীর মিলনেই সৃষ্টি হয়েছে সংগীত। এদিক থেকে বিচার করলে বর্তমান সংগীত সম্মেলনে বাদ্য ও নৃত্যের যে পশরা উপস্থিত করা হয় তা যুক্তিসম্মত নিশ্চয়ই। বিশুদ্ধ রাগরাগিণীর যে রহস্যময়তা আজকের গীতিধারার মধ্যে বিরাজমান, তাই একদিন ছিল বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণের চর্যাগীতির মধ্যেও। যুগ প্রভাবে এই রহস্যময়তার আবেদন আজ ভিন্ন, এই মাত্র।

নাট্যশাস্ত্রকার শিল্পী ভরত থেকে মুসলমান আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত ভারতীয় মার্গসংগীতের ছিল বিশেষ গৌরবময় যুগ। তারপরই মুসলমান আমলে এর practical side এর উৎকর্ষতা এলেও theoretical sideএর উন্নতি সম্ভব হয়নি এবং তার ফলেই এই দু'য়ের মধ্যে যোগাযোগের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিও স্থাপিত হয়নি। পরিণামে সংগীত-রাজ্যে দেখা দিয়েছিল চরম বিশৃঙ্খলা। "রাগমালা,"

"রাগমঞ্জরী", "সংগীত পারিজাত" প্রভৃতি পুস্তক পরবর্তীকালে প্রকাশিত হ'য়ে theory-র দিকটার কিছুটা অভাব পূরণ করলেও, অতীত ও বর্তমানের মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত যোগসেতু রচিত হয়নি। পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডেই প্রথম সার্থক সংগীত ব্যাকরণ রচনা ক'রে সংগীত বিজ্ঞানে শৃঙ্খলা আনেন। তাঁর জন্যেই পেয়েছি আমরা আজকের মার্গ সংগীতের পথনির্দেশ।

পূর্বে উচ্চাংগ সংগীত সাধারণ শিক্ষিত সমাজে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলনা। ধনীদের খেয়ালে যে 'খেয়াল' ধ্বনিত হত, তাই আবার ভিন্ন ঢঙে প্রতিধ্বনি তুলত রঙ্-মহলের মদির পরিবেশে বাঈজীর কণ্ঠে—নূপুর নিক্কণে। তা ছিল নিতান্ত সম্ভোগের এবং সঙ্কীর্ণ বিলাসগণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। সে জন্যেই তা ছিল সাধারণের চোখে অশ্রদ্ধেয়। সে সব সংগীতের মধ্যে শিল্পকলার অসাধারণ নৈপুণ্য মাঝে মাঝে দেখা গেলেও, পরিবেশের জন্যেই ছিল তা বাইরের কাছে অপাঙ্‌ক্তেয়। সংগীতের সেই বিকৃত ধারাকে পরিমার্জিত ক'রে ভারতের সাধারণ শিক্ষিত সমাজের প্রথম সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর পালুসকর। তাঁরই অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ভারতীয় মার্গসংগীত আজ মর্যাদার উচ্চাসনে সমাসীন।

বাঙলার শিক্ষিত সমাজে সংগীতকে প্রথম সম্মানীয় ক'রে তোলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্ব ও মনীষায় সংগীত আজ সমাদরে ধন্য। তাঁর আশ্চর্য সাঙ্গীতিক প্রতিভায় ভারতীয় মার্গসংগীতও কম সমৃদ্ধ নয়। তিনি ধ্রুপদাঙ্গের বাংলা গান যেমন রচনা ক'রেছেন, আবার বিভিন্ন রাগের বিজ্ঞানসম্মত সংমিশ্রণে বৈচিত্র্যপূর্ণ উচ্চাংগ বাংলা সংগীতও সৃষ্টি ক'রেছেন। হিন্দুস্থানী সংগীতে বাণী অকিঞ্চিৎকর, সুরই প্রধান! সুরের এতটা প্রাধান্য তথা সর্বময়তা রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক মন স্বীকার ক'রে নিতে পারেনি। সেই জন্যে বাণী ও সুরের সুসমঞ্জস মিলনে সৃষ্টি করলেন তিনি নতুন রাগ সংগীত—সেখানে কেউই যেমন প্রধান নয়, আবার অপ্রধানও বলা যায় না। এই মিলনেই তাঁর সৃষ্টি হয়েছে সার্থক। আর্টে সংযম হচ্ছে বড় কথা। সেখানে আর্ট exhibition নয়, revelation. মালকোষের ব্যাপক প্রদর্শনী আর্ট নয়, বিশেষ রূপের সীমাতে মালকোষ আর্ট হ'য়ে উঠতে পারে। হিন্দুস্থানী সংগীতের তান ও কর্তব্যের আতিশয্য রবীন্দ্রনাথ সুনজরে দেখেন নি। তিনি সংগীতকে শ্রুতিমধুর ও আবেদনধর্মী করবার পক্ষপাতী ব্যাকরণের শৃঙ্খলা মেনেই, কিন্তু নীরস ব্যাকরণের হুবহু অনুসরণ করতে প্রস্তুত নন।

দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটকী সংগীতকে বাদ দিলে মার্গসংগীত বল্লে বোঝায় উত্তর ভারতের হিন্দুস্থানী সংগীতকেই —যার কথা হল উর্দু আর হিন্দী। পূর্বে উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ ক'রে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যেক বছর দেওয়ালীর সময় সংগীত সম্মেলন হ'ত। সে সব অনুষ্ঠানে তৎকালীন ভারতবিখ্যাত গুণী শিল্পীরা সমবেত হতেন। কলকাতায় সংগীতের উন্নতি কল্পে সংগীত প্রতিযোগিতা এবং সম্মেলনের জন্যে প্রথম ঐতিহাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয় ২৮শে অক্টোবর, ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে নাটোরের মহারাজার বাড়িতে। এই সভার উদ্যোক্তা ছিলেন দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ভুপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ। কিন্তু কলকাতা মহানগরীতে উচ্চাংগ সংগীত সম্মেলনের পথিকৃৎ হচ্ছেন ভুপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ। তাঁর প্রচেষ্টাতেই ২৭শে ডিসেম্বর ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম নিখিল বঙ্গ সংগীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কলকাতার সিনেট হলে। এই চাঞ্চল্যসৃষ্টিকারী ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রবীন্দ্রনাথ। তারপর থেকে কলকাতায় প্রতিবৎসর সংগীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে থাকে ও অদ্ভুত আলোড়ন সৃষ্টি ক'রে। ক্রমে ক্রমে এসব অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করবার জন্যে ভারতের নানা অঞ্চল থেকে যে সব প্রখ্যাত জ্ঞানী, গুণী, শিল্পী এলেন তাঁদের মধ্যে ফৈয়াজ খাঁ, আলাউদ্দিন খাঁ, ওঙ্কারনাথ ঠাকুর, এনায়েৎ খাঁ, আবদুল করিম খাঁ, বিসমিল্লা খাঁ, বড়ে গোলাম খাঁ, বিলায়েত হোসেন, বিনায়ক রাও পটবর্ধন, কণ্ঠে মহারাজ, মজঃফর খাঁ, আহমদজান থেরাকুয়া, বান্দা হোসেন খাঁ, কেশর বাঈ কেরকার, সুশীলা টেম্বে, গঙ্গুবাই হাঙ্গল, হীরাবাঈ বরোদেকর, নারায়ণ রাও ব্যাস, ওস্তাদ আল্লাদিয়া খাঁ আবদুল ওয়াহেদ খাঁ, মুস্তাক হোসেন, ডি, ডি, পালুকর আখতারী বাঈ, রসুলন বাঈ, সোয়াই গন্ধর্ব, কুমার গন্ধর্ব, শান্তা প্রসাদ, হাফেজ আলি, আনোবীলাল; এ, টি, কানন, কেরামতউল্লা খাঁ; আলি আকবর; রবিশঙ্কর প্রভৃতি কণ্ঠ ও যন্ত্র সংগীত শিল্পী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভারত বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী শ্রীনম্বুদ্রী ও বালা সরস্বতীও অংশ নেন কয়েকবার। কিছুকালের মধ্যেই কলকাতার সংগীত সম্মেলন ঐতিহ্যমণ্ডিত হ'য়ে উঠল। আজও সে ঐতিহ্যের ধারা অক্ষুণ্ণ তো বটেই—ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তায় সে ধারা আজ শত-ধারায় উচ্ছ্বসিত।

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, হীরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, লালচাঁদ বড়াল, কৃষ্ণচন্দ্র দে হলেন ভারতবিখ্যাত বাঙালী-প্রতিভা। পরবর্তীকালে তারাপদ চক্রবর্তী, রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র, জয়কৃষ্ণ সান্যাল, চিন্ময় লাহিড়ী, তিমির বরণ, বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, রাধিকা মোহন মৈত্র, পান্নালাল ঘোষ, রাইচাঁদ বড়াল, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যাম গঙ্গোপাধ্যায়, মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপালী নাগ, উমা দে, মালবিকা কানন, সত্যেন ঘোষাল, সুখেন্দু গোস্বামী, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বাঙালী শিল্পী বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রেছেন। তাঁদের সকলের কৃতিত্বে বাঙলার জয় যেমন সূচিত হচ্ছে উচ্চাংগ সংগীতলোকে আবার তাঁদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের প্রভাবও পড়েছে তাতে।

মীড় গমকের কারুকলায় পূর্ণ, আলাপ, তান, শ্রুতি ও মূর্ছনায় ঐশ্বর্যমণ্ডিত, তাল, লয় ও সুর সপ্তকের সৌন্দর্যে বৈচিত্র্যময় উচ্চাংগ সংগীতকলা আজ দেশের অসংখ্য গুণী কলারসিকদেরই শুধু মুগ্ধ ক'রে রেখেছে তাই নয়, অগণিত সাধারণ মানুষকেও ক'রেছে আকৃষ্ট।

প্রাচীন কালের ধ্রুপদ আর ধামার যুগের প্রভাবেই আজ খেয়াল আর ঠুংরিতে রূপান্তরিত। ধ্রুপদের সে গাম্ভীর্য আর গভীরতা খেয়ালে না থাকলেও এটি যে একটি পরিশীলিত রূপ, বহু গবেষণা আর অনুশীলনের ফলে যে এর সৃষ্টি, এ সম্বন্ধে দ্বিমত হবার আশংকা নেই ব'লেই মনে হয়। অধুনা ধ্রুপদের প্রচার খুবই কম। খেয়াল থাকুক, কিন্তু ধ্রুপদও প্রচলিত থাক তার স্বমহিমায়। আজকের দিনে ধ্রুপদের প্রচলন আরও বেশী ক'রে দরকার, না হ'লে এ গায়কী ধারা একদিন লুপ্ত হ'য়ে যাবে—যা মোটেই সংগীত জগতের ক্ষেত্রে শুভ হবে না।

অর্থনৈতিক যুগসংকটের প্রভাবে কিছু কিছু উচ্চাংগ সংগীত শিল্পীর মধ্যে একটু কমার্শিয়াল ভাব এসে গেছে, পূর্বের মহান শিল্পীদের মত সংগীত সৃষ্টির ক্ষমতাও বর্তমানে খুব বেশী লক্ষ্যে পড়েনা। অবশ্য এখনই সেজন্যে হতাশ হওয়া উচিত নয়, তবে শিল্পীর পক্ষে সতর্ক হবার প্রয়োজনীয়তা আছে। অর্থকে কখনই শিল্প নিষ্ঠার ওপরে ঠাঁই দেওয়া সঙ্গত নয় শিল্পীর পক্ষে। তাতে আর যাই হোক্, শিল্পীর শিল্পীত্ব বজায় থাকে না। সংগীতে রস আবেদন-সঞ্চারের অক্ষমতা নিশ্চয়ই শিল্পীকে তুলে ধরে না।

শাস্ত্রবিদ্‌দের মতে চৌষট্টি কলাবিদ্যার মধ্যে সংগীত হচ্ছে শ্রেষ্ঠ কলা-বিদ্যা। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'প্রাণের যে ধর্ম, সংগীতেরও হবে সেই ধর্ম।' সংগীত মানুষকে নিয়ে যায় প্রাণের সেই চরম লক্ষ্যের দিকে—সার্থকতার পথে। সংগীত তার অমোঘ প্রভাবে মানব মনকে আনন্দরসে ডুবিয়ে উন্নত করে সৌন্দর্যলোকে। সংগীত সেইজন্যেই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। ভারতীয় সংগীত আবার পৃথিবীর সুপ্রাচীন সংগীত হিসেবে বিশ্বসভায় স্বীকৃত। ভারতীয় রাগ সংগীত পৃথিবীতেও অতুলনীয়। পাশ্চাত্ত্য সংগীতে দেখি সিম্ফনির বৈচিত্র্য ও ঐক্য শৃঙ্খলা। কিন্তু ভারতীয় সংগীতে পাই মেলোডির মাধুর্য বা আন্তর আবেদনে গভীর। পাশ্চাত্ত্য সংগীতে ধ্বনি হচ্ছে প্রধান। এ দেশের গানেও ধ্বনির গমককে স্বীকার করা হয়েছে—কিন্তু সেখানে কৃত্রিমতা নেই, আছে বিজ্ঞান সম্মত অন্তর্মুখীন দৃষ্টিভঙ্গী। এই সূক্ষ্ম দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে ভেতরের জগৎ, সমস্ত ধ্বনিরই উৎস যেখানে। শার্ঙ্গদেব নাদ সম্বন্ধে মূলতঃ একথাই বলেছেন।

সুমহান এই ভারতীয় মার্গ সংগীতকলার চর্চা ক'রেছেন যুগে যুগে কত ভাবে কত গুণী সাধক শিল্পী। সাধন মার্গে এসেছে বাধা, বিঘ্ন, কিন্তু ঐকান্তিক নিষ্ঠায় ও বিস্ময়কর মনোবলে সে সব বিপত্তিকে অতিক্রম ক'রে তাঁরা সমৃদ্ধ ক'রেছেন কালে কালে উচ্চাংগ সংগীত শিল্পকে। তাঁদের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার প্রভাব প'ড়েছে নানা ভাবে ভারতীয় সংগীত ধারায়। ঐতিহ্যবাহী সে ধারায় আজ আমরা স্নাত ও ধন্য।

অনুরাধা

শৈলেন রায়

শেষ পর্য্যন্ত অনুরাধা যে এমন একটা কীর্ত্তি করে বসবে কে আগে ভেবেছিলো, বলা নেই কওয়া নেই হুস করে একেবারে বিয়ে করে বসা! আর তাও কিনা ভাস্করের মত সাধারণ একটি ছেলেকে? কি আছে ভাস্করের ঐ চেহারাটা ছাড়া? একটা মাকাল ফলকে নিয়ে আজীবন কাটবে নাকি অনুরাধার মত মেয়ের? অন্ত কেউ হ'লে কথাটা হয়তো এভাবে সবাই বলাবলি করতো না। কিন্তু অনুরাধার কাছে যেন ভাস্কর একেবারেই তুচ্ছ, নগণ্য।

বি-এ পাশকরা সাধারণ একটি ছেলে, কাগজের অফিসে চাকুরী করে। সংবাদ সরবরাহ করাই তার কাজ। তবে একটু সাজিয়ে গুছিয়ে লোকের সামনে পরিবেশন করতে হয়। এ আর এমন কি একটা কাজ। তা ছাড়া নাকি মাঝে মাঝে গল্প উপন্যাসও লেখে দুচারটা। তাও এমন কিছু নয়। চেষ্টা করলে সবাই হয়তো পারে এ রকম লিখতে। অন্ততঃ অলক রায়—অর্থাৎ অনুরাধার দাদার তাই মত। তার মতে পৃথিবীর সবচেয়ে সোজা কাজ হচ্ছে বানিয়ে বানিয়ে গল্প লেখা। যা নয় তাই করা। কোন যুক্তি নেই, তর্ক নেই, আইনের বিচার নেই—মনে যা আসে তাই একটু গুছিয়ে লেখার নামই তো গল্প বা উপন্যাস! হ'তো যদি তার মত ব্যারিষ্টার তবে না হয় বোঝা যেত হিম্মৎ। অলক রায় বেশ নামজাদা ব্যারিষ্টার। এ কথা বলা হয়তো তার সাজে!

সংসারে বাপ মা অনেকদিন গত হয়েছেন। দাদাই এখন কর্ত্তা। বুদ্ধিমান ভারিক্কি মানুষ। অনুরাধাকে নিয়ে তার কতই না আশা ছিল। আশা ছিল কোন উঠ্‌তি ব্যারিষ্টারের হাতেই অনুরাধাকে দেবে। সুখে থাকবে রাধা—আর তাছাড়া সামাজিক কৌলিন্যকেও তো আর উড়িয়ে দেওয়া যায় না!

বৌদি মীনাক্ষী সাতে পাঁচে নেই—নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। আজ এ পার্টি, কাল ক্লাবের ফাংসন, এ নিয়েই যেন তার জীবন। তবে এ বিয়েটা তারও মনঃপূত হয়নি। মনঃপূত হয়নিই বা বলবো কেন—দস্তুরমত অসুখী হয়েছে সে। পাঁচজনে পাঁচ কথা বলে—এত বড় মানীঘরের মেয়ে, তার কি এই উপযুক্ত কাজ হ'লো! শেষ পর্য্যন্ত সাধারণ একটা চাকুরে—দিন এনে দিন খাবে অনুরাধা!

অনুরাধা কিন্তু গায়ে মাখে না এসব,—'টাকাই কি সব? মানুষটা কি কিছুই নয়?'

মুখ বাঁকিয়ে বৌদি বলে—'কি জানি ভাই, টাকা না থাকলে প্রেমট্রেম ক'দিন থাকে দেখো!'

বোনদের বিয়ে হ'য়ে গেছে। ভালই বিয়ে হয়েছে, বড়দি থাকে এলাহাবাদে। স্বামী সিভিল সার্জ্জেন। মেজর স্বামী ব্যবসা করে—দুহাতে নাকি টাকা লুটছে।

অনুরাধা মাঝে মাঝে মেজ জামাইবাবুকে ঠাট্টা করে বলে—'আচ্ছা,সব গাণি ব্যাগ নাকি বাইরে রপ্তানি হচ্ছে?'

মেজ জামাইবাবু একটু মোটা ধরণের মানুষ, বলে—'কেন, তাতে কি হ'লো?'

চোখ বড় বড় করে অনুরাধা বলে—সব বস্তা রপ্তানি হ'লে টাকাগুলি রাখবেন কিসে?'

অট্টহাসিতে ভেঙ্গে পড়ে মেজ জামাইবাবু। কথাটায় তার যেন কোথায় একটু সুড়সুড়িও লাগে হয়তো।

বিয়ের ব্যাপারে কিন্তু সবাই একমত, অনুরাধার এ

বিয়ের কোন মানেই হয় না। তার মত মেয়ের কপালে কিনা শেষ পর্য্যন্ত একটা হা-ঘরের ছেলে!

বড় জামাইবাবু তো সোজা অনুরাধার সাম্‌নেই বলে বসলো—'হেরিডিটি তো আছে একটা! কি আছে ওর?'

ফোঁড়ন কাটে বড় গিন্নী—'নধরকান্তি চেহারাটা ছাড়া?'

বৌদি টিপ্পনি কাটে—'যার সাথে যার মজে মন—' একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে—'অনিমেষ বেচারী! কি কষ্টই না পাবে বিলেত থেকে ফিরে এসে—'

দাদা চুপচাপ। তার ব্যথা অনুরাধা যেন বোঝে। কত সাধ করেই না মনের মত গড়ে তুলেছিলো দাদা তাকে। দাদার সাধ ছিলো বড় ঘরে উপযুক্ত বরে অনুরাধার বিয়ে দেবে, কিন্তু একটা কথা অনুরাধা কিছুতেই বুঝতে পারে না। টাকা পয়সার ওপর এত আসক্তি এ সংসারের সবাইর এলো কেন? সবই কি তারা ভুলে গেছে? একদিন তো তারাও বড়লোক ছিল না। একদিন সাধারণভাবেই তো তাদের দিন কাটতো। বেশ কষ্ট করেই তো বাবা দাদাকে বিলেত পাঠিয়েছিলেন ব্যারিষ্টারি পড়তে। সেদিনকার কথা আর কারুর না হোক—দাদার কি একেবারেই মনে পড়ে না, না, মনে পড়ে বলেই তা আর হতে দিতে চায় না অলক রায়! যে কষ্ট সে পেয়েছে, সে কষ্ট যেন না পায় অনুরাধা।

বাবা মারা যাবার পর ধীরে ধীরে দাদা কিভাবে সংসারে নিজের জায়গা করে নিলো, কি ভাবে তাকে নিজের খেয়ালখুসী মত চলতে সাহায্য করলো—তা আর কেউ না জানুক অনুরাধা জানেভালো করেই। তাই দাদার কাছ থেকেই আঘাতটা যেন বাজলো বেশী। চোখ ছল ছল করে তাই তো দাদাকেই শুধু সে বলেছিলো—'তুমি এতে বাধা দিও না দাদা, লক্ষ্মীটি! সবার কথা উড়িয়ে দিতে পারি,—কিন্তু—' একটু দম নিয়েই আবার বলেছিলো—'টাকা পয়সার প্রাচুর্য্য হয়তো তার নেই—আর সবার তা থাকেও না, কিন্তু রাস্তার ভিখিরীই বা ভাবলে কেন তাকে?'

মাথা নাড়তে নাড়তে ধরা গলায় অলক বলেছিলো—'তা নয় অনু, ভিখিরি আমি বলছি না তাকে। তবে তোকে কি ভাবে মানুষ করেছি, আমি তো জানি। বিলেত থেকে যখন ফিরলাম—তখন তুই কত বড়ই বা।' পেছনের দিকে ফিরে যেন দেখছে অলক—'তখনও ফ্রক পরিস। মা মারা গেলেন, বাবাও গত হলেন। তোর গায়ে আঁচড়টি পর্য্যন্ত লাগতে দিই নি, তারপর ধীরে ধীরে আমার পসার জমতে শুরু হ'লো, কোন দিন কোন অভাবই তো পেতে দিই নি তোকে—'দাদার গলা যেন বুজে আসে। এখানেই অনুরাধা যেন বড় দুর্ব্বল হয়ে যায়। আর যে যাই বলুক, দাদার এই ভেঙ্গে পড়া ভাবটা সহ্য করতে পারে না অনুরাধা, এক এক সময় মনে হয়, না-ই বা হোল তাদের বিয়ে—দাদা সুখী হোক, কিন্তু অলকই আপত্তি করে,—'না তা হয় না, সব যখন ঠিক হয়ে গেছে, বিয়ে হোক।'

তাই শেষ পর্য্যন্ত এ বিয়ে হোল। ঢাক ঢোল পিটিয়ে সানাই বাজিয়ে জাক জমক করেই হোল। হ্যাঁ অলক রায়ের বোনের বিয়েতে কোন কার্পণ্যই করেনি অলক রায়।

নববধূ অনুরাধা প্রথম দিন থেকেই সংসারের হাল ধরলো। অবশ্যি কি-ই বা সংসার। দু'টি লোকের ভারী তো সংসার! কয়েকদিন পরই কাজের লোকটিকে তুলে দেবার ব্যবস্থা হোল। তোলা ঝি এলো, এই মাগ্‌গিগণ্ডার বাজারে নাকি অহেতুক বাজে খরচা করবার কোন মানেই হয় না, ভাস্কর অবশ্যি আপত্তি করেছিলো—বেশ জোড়ালো আপত্তিই করেছিলো সে, কিন্তু ধোপে টেকে নি, অনুরাধার নাকি ঐটুকু কাজ গায়েই লাগে না।

প্রথম দিনের রান্না খেয়ে ভাস্কর হাসবে কি কাঁদবে ভেবেই পায় না। লাউয়ের তরকারি রান্না হয়েছে। প্রত্যেকটি টুকরো যেন ভাস্করের দিকে তাকিয়ে মিষ্টী মিষ্টি হাসছে, আগ্রহভরা কণ্ঠে অনুরাধা জিজ্ঞাসা করে—'ভালো হয় নি বুঝি?'

ঢোক গিলে তাড়াতাড়ি ভাস্কর বলে ওঠে—'না না, বেশ হয়েছে।'

—'তা হলে আর একটু দিই, একটু থেমে বিপদমাখা সুরে অনুরাধা আবার বলে—'কেই বা যত্ন করে রাঁধতো আগে! দেখি হাতটা সরাও তো—বলেই দুহাতা তরকারি তার পাতে ফেলে দিয়ে বলে—'তুমি তো লাউয়ের ঘণ্ট খুব ভালোবাসো—'

ভাস্কর কি রকম করুণ চোখে অনুরাধার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো—তার মনের কথা যেন বুঝে ফেলেছে অনুরাধা। সান্ত্বনার সুরে বলে—'আজ তো রবিবার—ছুটির দিন। একটু বেশী খেলেও ক্ষতি নেই। দুপুরে লম্বা ঘুম দিয়ে উঠলে দেখবে সব হজম।' এক বাটি আধ সিদ্ধ লাউয়ের ঘণ্ট ভাস্করকে সেদিন গলাধঃকরণ করতে হয়েছিলো—নেহাৎ দায়ে পড়েই—সত্যি কথাটা না বলতে পারার জরিমানা হিসেবে।

মাস কয়েক স্বপ্নের ঘোরে কেটে গেলো। সেদিন সকালের ডাকে দেশ থেকে চিঠি এসেছে ভাস্করের নামে। মা'র চিঠি। অনেকদিন ভাস্করকে দেখেন না তিনি—আর তা ছাড়া এক ঘেঁয়ে ভাবে ভালোও লাগছে না আর দেশে থাকতে, তাই সামনের শনিবার ছোট ছেলে দীপুকে নিয়ে তিনি কলকাতায় আসছেন।

ভাস্কর যেন চুপ্সে যায় একটু। মা আসছেন, দীপু আসছে, এতো আনন্দের কথা, কিন্তু অনুরাধার কি ভালো লাগবে এসব? কিন্তু সব সন্দেহ তার দূর হয়ে গেলো যখন অনুরাধা বল্লো—'বেশ ভালোই তো। এ ভালোই হলো।'

একটু থেমে যেন আপন মনেই বলে—'তা ছাড়া মেয়ে মানুষ শ্বশুর শাশুড়ী নিয়ে ঘর না করলে—'জীবনে এত খুশী হয়তো এর আগে ভাস্কর কোন দিনই হয়নি।

মা বেশ কয়েকদিন ছিলেন, তারপর দেশে চলে গেলেন দীপুকে নিয়ে। কর্তার আমলের জমিজমা এখনও যা অবশিষ্ট আছে, একটু দেখাশুনো না করলে চলবে কেন? যাবার সময় অনুরাধার মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন—'লক্ষ্মী মেয়ে! সুখী হও মা—'

...বড্ড ফাঁকা ফাঁকা লাগে আজকাল অনুরাধার। ভাস্করেরও ফিরতে আজকাল যেন বড্ড রাত হয়। বলে—'কি করবো বলো, যা কাজের চাপ।'

ঠোঁট ফুলিয়ে অনুরাধা অনুযোগ করে—'আর আগে তো অফিস কামাই করে কতদিন ঘুরে বেড়িয়েছো আমার সঙ্গে। তখন কাজ ছিল না বুঝি?'

কথার জবাব না দিয়ে স্নানের ঘরে চলে যায় ভাস্কর, সত্যি আজকাল তার বড্ড যেন দেরী হয়ে যায় আসতে। এত চেষ্টা করে, কিন্তু তবু কিছুতেই যেন আসা হ'য়ে ওঠে না। আর তা ছাড়া মিষ্টার চ্যাটার্জ্জি যেন বড় বেশী পীড়াপীড়ি করেন তাকে। জোর করে বাড়ী নিয়ে যাওয়া, খাওয়ানো দাওয়ানো। অবিশ্যি খুব যে খারাপ লাগে তার তা নয়। আমোদ-ফূর্ত্তিতে সময়টাও কাটে ভালো। বাড়ী এলে তো সেই একঘেয়ে ঘরকন্না, এ নেই সে নেই—এটা নিয়ে এসো, ওটা নিয়ে এসো, লোকটাকে উঠিয়ে দেবার যে কি দরকার ছিল অনুরাধার? বড্ড একগুঁয়ে যেন সে। কী কষ্টেই না গেছে অনুরাধার বিয়ের পর। ঘর ছেড়ে বেরুবেনা এক পা। কিছু বললেই হেসে বলে—'সব মাপা থাকে গো। আগে টো টো করেছি, এখন ঘরে থাকার পালা। তারপর মিষ্টি হেসে বলে—'আমার এই ভালো।'

অনুরাধার এই ভালো। কিন্তু ভাস্করের যেন হাঁফ ধরে ওঠে মাঝে মাঝে। এই এক ঘেঁয়েমি থেকে যেন মাঝে মাঝে মুক্তি পেতে চায় সে। তাই অফিসের পর মিষ্টার চ্যাটার্জ্জি যখন বিরাট ডজখানা নিয়ে হাজির হ'ন, তখন মনে-প্রাণে হয়তো বেশী জোড়াজুড়ি করতে পারে না সে। মিষ্টার চ্যাটার্জ্জিকে যে তার খুব ভালো লাগে তা নয়—কি রকম যেন ফন্দিবাজ লোক। ব্যবসা করেন—বিরাট ব্যবসা। কাগজের লোককে হয়তো হাতে রাখা প্রয়োজন, বুঝেও যেন না বোঝার ভাণ করে ভাস্কর।

সে দিন যেন অন্য দিনের চেয়েও রাত করে বাড়ী ফিরেছে ভাস্কর। অনুরাধার সহ্যেরও যেন সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, কাছে আসতেই কী রকম ঝাঁজালো একটা গন্ধ এসে লাগে তার নাকে। দাঁতে দাঁত চেপে চীৎকার ক'রে ওঠে অনুরাধা—'তুমি মদ খেয়েছো?'

ভাস্কর কি রকম থতমত খেয়ে যায়—'কি করবো, অনু, ওরা ছাড়লে না। আর তা ছাড়া ড্রিংক করা তো এমন কিছু নয় আজকাল।'

অনুরাধা অবাক হয়ে ভাস্করের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ, তারপর বোবা গলায় বল্লো—'তাই বলে তুমি মদ খাবে? আর আমি—'

বলতে বলতে দু চোখে তার জল টল টল করে উঠলো। সেদিন সমস্ত রাত ধরে সাধ্যসাধন করে, অনুরাধার গায়ে হাত দিয়ে ভাস্করের প্রতিজ্ঞা করতে হয়েছিলো—এ জিনিষ

সে আর ছোঁবে না কোনদিন। তবে অনুরাধার রাগ ভেঙ্গেছিলো সেদিন।

বেশ কয়েক মাস কেটে গেলো নির্ব্বিবাদে, কথা রেখেছে ভাস্কর, অনুরাধার গা ছুঁয়ে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলো তার নড়চড় হয়নি।

সেদিন ওদের বিয়ের তারিখ, গত বছর এই দিনটিতে ওদের বিয়ে হয়েছিলো। ভোর না হ'তেই স্নান সেরে নিয়েছে অনুরাধা, একটু দেরী করে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যেস ভাস্করের—তাও আবার বহু সাধ্য-সাধনার পর। ঘুম থেকে উঠেই সে অবাক।

—'এতসাতসকালে সাজের এত ঘটা কেন গো রাধে?'

হাসিমুখে অনুরাধা জবাব দেয়—'ওঠো আগে—পরে বলছি।'

ভাস্কর বিছানার ওপর উঠে বসতেই একটা যূঁয়ের মালা তার গলায় পরিয়ে কৃত্রিম রাগত চোখে তার দিকে তাকিয়ে অনুরাধা বলে—'আজকের দিনটিও মনে নেই?' একটু থেমে কি রকম স্নিগ্ধস্বরে বলে—'আজই তো তোমার হাতে নিজেকে তুলে দিয়েছিলাম আমি। ঠিক এক বছর আগে—এম্‌নি একটি দিনে—কথা শেষ হবার আগেই দু-হাত বাড়িয়ে ভাস্কর অনুরাধাকে ধরতে যায়। দুপা পিছিয়ে গিয়ে হাসি মুখে অনুরাধা বলে—'থাক, অত সোহাগে আর কাজ নেই। তার চেয়ে বরং চট করে বাজারটা ঘুরে এসো তো লক্ষীসোণা! ভালো করে শোনো কি কি আনতে হবে—'

মুখ গোম্‌ড়া করে একের পর এক সব ক'টা জিনিষের নাম শুনে যায় ভাস্কর। বাজারের নাম শুনলেই তার গায়ে জ্বর আসে। কেন যে লোকটাকে তাড়াতে গেলো অনুরাধা!

আজ যেন অনুরাধার হাত খুলে গেছে। বার বার মনে করিয়ে দিচ্ছে ভাস্করকে—'দেখো, কিছু যেন ভুল না হয়, বলতো লিখে দিতে পারি। যা ভুলো মন তোমার! বড় বড় কই মাছ আনবে—তেল-কৈ রাঁধবো। চিতল মাছের পেটি এনো একটা—গায়ে গায়ে ঝোল হবে। তুমি তো খুব ভালোবাসো এ দুটোই। আর আনবে দৈ, মিষ্টি —'কথা শেষ হবার আগেই বাজারের থলি হাতে নিয়ে চলতে শুরু করেছে ভাস্কর।

বাজার থেকে ফিরে আসতেই হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়লো অনুরাধা।

—'ওমা, এতটুকু কৈ মাছ দিয়ে কি তেল-কৈ হয় নাকি আবার? তরকারি কোথায়? ফুলকপির কথা এত পৈ পৈ করে বলে দিলাম—'

বেশ বিরক্ত হয়েই জবাব দেয় ভাস্কর—'এখন কি কপির সময় যে তোমার ফরমাস মতো কপি পাবো? আর তা ছাড়া, অত ঘুরে ঘুরে পেটুকদের মত বাজার করতে ভালোও লাগে না আমার।'

—কিন্তু খেতে বাবুর বেশ লাগে, তাই না? বলে আলতো ভাবে ভাস্করের গায়ে একটা চিম্‌টি কাটে অনুরাধা।

স্নান সেরে এসে ধড়মড় করে খেতে বসে ভাস্কর। তাড়াতাড়ি জলের হাত শাড়ীর আঁচলে মুছতে মুছতে অনুযোগ করে অনুরাধা—'এর মধ্যে হ'য়ে গেলো তোমার? আজ না হয় একটু দেরী করেই গেলে—'

ভারিক্কি চালে ভাস্কর বলে—'তা কি হয়? খবরের কাগজের অফিসের লোকদের কি আর অত যুৎ করে খাওয়া চলে সকালে? ভালো করে রেঁধে রাখো, রাত্রে বেশ মৌতাত করে খাওয়া যাবে। তারপর ন'টার শোতে সিনেমা—'

বাধা দিয়ে অনুরাধা বলে—'ঐ তো তোমার দোষ। বাইরে গিয়ে হট্টগোল না করতে পারলে যেন তোমার আনন্দই হয় না।' তারপর একটু থেমে সোজা ভাস্করের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে—'আমার মধ্যে আনন্দ পাওনা তুমি, তাই না?'

জলের গ্লাসটা মুখে তুলতে তুলতে ভাস্কর জবাব দেয়—'তোমার মধ্যে আনন্দ পাই কিনা জানি না। কিন্তু তোমার রান্নার মধ্যে আজীবন ডুবে থাকতে রাজী আছি রাধে।' সব মেয়েরাই এখানে দুর্ব্বল, অনুরাধাও তাই।

—'থাক্, আর ঢাক-ঢোল পিটিয়ে নিজের বউয়ের গুণপনা জাহির করতে হবে না। হাঁ করো—' 'হাঁ করতেই মুখে পান গুঁজে দিয়ে চীৎকার ক'রে ওঠে—'ওরে বাবা, আঙ্গুলটাও খেয়ে ফেলবে নাকি লোকটা?'

হাসতে হাসতে অফিসে বেরিয়ে যায় ভাস্কর।

বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যে হয় হয়। ভাস্কর এখনও আসে

নি। অনুরাধা খুব সুন্দর করে সেজেছে আজ। বিয়ের পর এমন করে সাজেনি কোনদিন সে। নীলাম্বরী পরেছে একখানা, মাথায় সুন্দর খোপা বেঁধেছে—তার মধ্যে ফুলের মালা জড়ানো। আয়নায় নিজেকে দেখে নিজেই মুগ্ধ। এমন করে নিজেকে বহুদিন দেখেনি অনুরাধা।

রাত তখন অনেক, ভাস্কর এখনও ফেরেনি। দুঃখে ক্ষোভে অনুরাধার চোখ ফেটে জল আসছে। কি হোল মানুষটার? কোন দুর্ঘটনা? ষাট্, বালাই। আজকের দিনটা কি ভুলে গেছে ভাস্কর—সে কি জানেনা কী গভীর আগ্রহ নিয়ে এ দিনটির দিকে তাকিয়েছিলো অনুরাধা?

বাইরের দরজায় শব্দ হ'তেই ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দেয় অনুরাধা। খোলা দরজার মধ্য দিয়ে হুমড়ি খেয়ে ঘরে ঢোকে ভাস্কর।

সমস্ত ঘরটা ভরে গেছে একটা ঝাঁঝালো গন্ধে—যে গন্ধ পেয়েছিলো অনুরাধা কয়েকমাস আগে। প্রচণ্ড একটা বিস্ময়—প্রকাণ্ড একটা জিজ্ঞাসা নিয়ে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে অনুরাধা।

আর দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বিড়্‌বিড়্ করে বলে চলেছে ভাস্কর—'চ্যাটার্জ্জি কিছুতেই ছাড়লোনা। জোর করে আমার বিয়ের তারিখ সেলিব্রেট করলো। এত করে বল্‌লাম, কিন্তু কিছুতেই ছাড়লো না। তুমি রাগ ক'রো না অনু—' 'টল্‌তে টল্‌তে অনুরাধার দিকে এগিয়ে যায় ভাস্কর। দু হাতে তাকে ঠেলে দিয়ে হিংস্র বাঘিনীর মত দাঁতে দাঁত চেপে গর্জ্জে ওঠে অনুরাধা—'খবর্দ্দার, আমাকে ছুঁয়োনা। ইতর, জানোয়ার কোথাকার—'

ঠেলা সামলাতে না পেরে দেওয়ালের ওপর ছিটকে পড়ে ভাস্কর। মাথাটা হয়তো ফেটে গেছে তার। কিন্তু কোনদিকে জ্রক্ষেপ নেই অনুরাধার। টান দিয়ে গলার মালা ছিঁড়ে ফেলেছে সে। অত সাধের খোঁপা ভেঙ্গে চুল এলিয়ে পড়েছে সমস্ত পিঠে! রাগে সমস্ত শরীর তার দুলে দুলে উঠছে,—'অসভ্য, নোংরা চরিত্রের লোক একটা! আর এর জন্যেই আমি কিনা—কথা শেষ না করেই অনুরাধা দরজার দিকে এগিয়ে যায়। বাধা দেয় ভাস্কর—'কোথায় যাচ্ছ?'

তার কথার জবাব না দিয়েই ঠেলে তাকে সরিয়ে নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলতে থাকে অনুরাধা—'বিয়ে আমার হয়নি—এ বিয়ে আমি মানি না। আমি চল্‌লাম—' 'বলেই ঘর ছেড়ে সোজা রাস্তায় নেমে চলন্ত একটা ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে উঠে বসলো অনুরাধা। বালীগঞ্জ প্লেস—অলক রায়ের বাড়ীর দিকে ছুটে চলেছে ট্যাক্সি।

আর কি রকম ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখছে ভাস্কর জানালার মধ্য দিয়ে। দেখছে ট্যাক্সি ষ্টার্ট দিয়েছে, তারপর মৃদু থেকে দ্রুতগতিতে চলতে শুরু করলো—তারপর কোথায় চলে গেলো গাড়ীটা, সব শক্তিই তখন লোপ পেয়ে যাচ্ছে যেন ভাস্করের।

নেশার ঘোর কেটে গিয়ে কি রকম ফাঁকা ফাঁকা লাগছে ভাস্করের। কপালের যেখানটা কেটে গিয়েছিলো সেখানটা ফুলে রক্তের চাপ বেঁধে রয়েছে। একটা বিষাদময় রিক্ততা, একটা ক্লেদাক্ত গ্লানি যেন গলা টিপে মারতে আসছে তাকে। এ কী করলো সে এক মুহূর্ত্তের অসাবধানতায়! শুধু কি অসাবধানতাই, না আরও কিছু। মনের কোণে হয়তো একটু লোভ উঁকি-ঝুঁকি মারছিলো। সুযোগ বুঝে চ্যাটার্জ্জির মাধ্যমে তাকে গ্রাস করে ফেলেছে। হয়তো ভেবেছিলো, অনুরাধাকে ভুলিয়েভালিয়ে আবার ঠিক করা যাবে। মেয়েদের মন—বিশেষ করে অনুরাধার মন জানতে তো আর বাকি ছিল না ভাস্করের। একটু অনুনয় বিনয় করলেই মন গলে যাবে অনুরাধার। কিন্তু এ কী হোল! এতটা যে ভাবতেই পারেনি ভাস্কর। শেষে কিনা লোক হাসিয়ে নিজের মুখে চুণকালি মাখিয়ে চট করে চলে গেলো অনুরাধা। দোষ সে করেছে, একশোবার করেছে, হাজারবার করেছে। কিন্তু তার কি ক্ষমা নেই? আর তা ছাড়া অনুরাধা কি বুঝতে পারে না, শুধু ঘর নিয়েই পুরুষ মানুষের—অন্ততঃ ভাস্করের যেন আর চলছিলো না। কি রকম যেন একঘেঁয়েমী এসে যাচ্ছিল তার জীবনে। চ্যাটার্জ্জিকে সে কোনদিনই শ্রদ্ধা বা প্রীতির চোখে দেখেনা, তবু কি রকম যেন তার অনুরোধ এড়াতে পারেনি ভাস্কর সেদিন। আর তা ছাড়া জোর করে কেউ তাকে ধরে বসলে এড়াতে পারে না ভাস্কর। অনুরাধা তো আর আজকে দেখছে না তাকে। একটা যদি দুর্ব্বলতা তার সাময়িক এসেই থাকে তা যদি ক্ষমা করতেই না পারলো অনুরাধা, তবে কিসের ভালবাসা?

ভাস্কর ভেবেছিলো পরদিনই অপিসে ফোন করবে অনুরাধা। গভীর আগ্রহ নিয়ে টেলিফোনের আশায় বসে রইল সমস্ত দিন। কাজে মন বসে না—কেমন যেন সব এলোমেলো হয়ে গেছে। সাজানো ঘর যেন কোন্ দুরন্ত শিশুর হাতে তছনছ হয়ে গেলো।

দুদিন পর ভাস্করই ফোন করে বসলো অলক রায়ের বাড়ী। বেছে বেছে দুপুর বেলা—যখন অলক রায়ের বাড়ী থাকার কোন সম্ভাবনাই নেই। ফোন ধরেছিলো অনুরাধাই। কিন্তু কোন সুযোগই তাকে দিল না রাধা। শুধু দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিলো—'সেমলেস্।' তারপরই দম্ করে ফোনটা রেখে দিয়েছিলো। রাগে ক্ষোভে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কাম্ড়ে রক্তই বার করে দিয়েছিলো ভাস্কর। এত তেজ এত অহঙ্কার অনুরাধার!

দিন কেটে যায়। অনুরাধা আবার যেন তার আগের জীবনে ফিরে এসেছে। ইউনিভারসিটিতে এম-এ পড়তে ভর্ত্তি হয়েছে সে। জীবনের উচ্ছলতায় পূর্ণ, প্রাণের আবেগে ধাবমান একটি গ্রহ! সবাই অবাক। ধন্য মেয়ে অনুরাধা। দিদিরা, জামাইবাবুরা, বৌদি তো মহা খুসী। শেষ পর্য্যন্ত মেয়েটার সুবুদ্ধি হয়েছে যা হোক। নিজেদের মধ্যেই গুঞ্জন ওঠে, ডিভোর্স করিয়ে আবার বিয়ে দেওয়া হোক। আইনের যথেষ্ট জোরালো যুক্তি আছে—মানসিক পীড়ন! অলক কেমন যেন উদাস সুরে বলে—'হ্যাঁ তা অবিশ্যি আছে। 'তবে—'

অনুরাধাই বাধা দেয়—'তবেটবে নেই দাদা। এ বিয়ে আমি মানি না, আমি ডিভোর্স চাই।'

চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে অলক বলে—'বেশ, তাই হবে।' কিন্তু হচ্ছে হবে করেও বেশ কয়েকটা দিন কেটে যায়।

সেবার সোসাল ফাংসন, হলে লোক গিস্ গিস্ করছে। অনুরাধা চিরদিনই ভালো গান গায়—তবে আজকাল যেন প্রচারের ঝোঁকটা বেশী।

গাইতে উঠেছে অনুরাধা, হঠাৎ সামনের সারিতে চোখ পড়তেই চমকে ওঠে সে, চেয়ারে বেশ আরাম করে বসে আছে ভাস্কর। আর তার পাশেই সুবেশা একটি তরুণী, মাঝে মাঝে কথা বলতে বলতে মেয়েটি হেসে গড়িয়ে পড়ছে ভাস্করের গায়ে, গান গেয়ে চলেছে অনুরাধা—ভালই গাইছে সে, কিন্তু মাঝে মাঝে অনিচ্ছাসত্বেও চোখ গিয়ে পড়ছে ওদের দিকে। কী অসভ্য মেয়ে মানুষরে বাবা! হল ভর্ত্তি লোকদের সামনে এত হাসাহাসি! আর বলি-হারি ঐ নোংরা লোকটাকে! লজ্জা না থাক—এবং তা না থাকাই স্বাভাবিক এই সব ইতর শ্রেণীর লোকদের, তবু একটু চোখের পর্দ্দাও কি থাকতে নেই?

...সেটা ডিসেম্বরের শেষ দিক। বন্ধুবান্ধব নিয়ে ষ্টিমার পার্টিতে যাচ্ছে অনুরাধা, লোক ও হয়েছে প্রচুর, সন্ধ্যা হয়ে এসেছে. এবার ফেরার পালা। নিরিবিলি দেখে ওদিককার কোণটায় বসতে যাচ্ছে অনুরাধা, হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় সে, ঘেঁসাঘেঁসি করে রেলিংএ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দুজন, ভাস্কর ও সেই মেয়েটি—যে মেয়েটিকে প্রথমে দেখেছিলো অনুরাধা গানের আসরে। দাঁতে দাঁত চেপে নিজের মনেই বলে ওঠে অনুরাধা,—'যেমন হাঁড়ি তেমন সরা! দুই সমান বেহায়া'—ওদিকে যাওয়া আর তার হয় না।

তারপর অনেকদিনই অনুরাধার চোখে পড়েছে ওদের দু জনকে। ছায়া আর কায়া—জোড় না বেঁধে এক পা চলার উপায় নেই যেন তাদের! অবিশ্যি অনুরাধার কি-ই বা এসে যায় তাতে? কবে কোন্ একটা ইতর লোকের সঙ্গে তার ভাব হয়েছিলো, আর ভাবই বা বলা যায় কেন? আলাপ হয়েছিলো—দু দিন এক সঙ্গে ছিলো। ব্যস্, তার পর তো সব চুকে বুকে গেলো। সেই লোকটাকে নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই অনুরাধার।

কিন্তু মাথা ঘামাবো না বললেই তো আর মানা শুনছে না সে—আপন মনেই ঘেমে যাচ্ছে যেন, আর চোখ দু'টোও হয়েছে অনুরাধার। কই এত সব তো আগে চোখে পড়তো না তার। আর ওরা দু জনই যেন সর্ব্বত্র ছড়িয়ে যাচ্ছে হাটে মাঠে, সিনেমায় যেখানে যাও দেখবে দুজন হাসতে হাসতে গল্প করছে। এত কথাই বা কি, আর এত হাসি আসেই বা কোত্থেকে? হাসতে অনুরাধাও জানে। হঠাৎ সঙ্গের মেয়েটিকে কি বলে অনুরাধা হেসে লুটিয়ে পড়ছে যেন, হাসতে হাসতেই কোন রকমে গাড়ীতে উঠে বসলো সে, একবার দেখেও নিলো, যেন কথা থামিয়ে ভাস্কর কেমন অবাক হয়ে দেখছে তাকে। সিনেমার শো ভেঙেছে, ভীড়ে ভাস্করকে আর দেখা গেলো না,

মেয়েটিকে সব কথা বলেছে ভাস্কর—না সব চেপে চুপে আবার নতুন করে শুরু করেছে!

সেদিন আকাশে খুব ঘনঘটা। কেমন একটা থমথমে ভাব, অনুরাধার কি মনে হোল, সেজে গুজে বেরিয়ে পড়লো, অলক বললো—'এখন আবার বেরুচ্ছিস কোথায়?'

—'যাই একটু ঘুরে আসি।'

—'গাড়ীটা নিয়ে যেও।'

—'না দাদা। এম্‌নি একটু ঘুরে আসি। বেশী দেরী করবো না।' টুকিটাকি দু একটা জিনিষ কিনে কি ভেবে টালিগঞ্জের ট্রামে উঠে বসলো অনুরাধা।

কয়েকদিন ধরেই চিন্তাটা মাথায় এসেছে তার। এ ভাবে মাঝ পথে ঝুলে থাকার কোন মানেই হয় না, একটা হেস্ত নেস্ত হওয়া দরকার। দাদা রাজী হয়েছে, এবার নোংরা লোকটাকে একটু শাসিয়ে আসা দরকার, যেন ডিভোর্স স্যুটে কনটেষ্ট না করে। যদি চায় কিছু টাকাও না হয় দিয়ে দেবে অনুরাধা অলককে বলে, গোলমাল বাধাবার চেষ্টা না করে যেন সে।

বহুচেনা বাড়ীটার সামনে আসতেই পা যেন ভারী হয়ে আসে তার।

ততক্ষণে টিপ্‌ টিপ্‌ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু হয়েছে। এক পা দু পা করে দরজার সামনে এসে ধীরে ধীরে কড়া নাড়লো অনুরাধা।

টুক্‌ করে দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে ভাস্কর। একবার ইতস্তত করে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে অনুরাধা বল্‌লো—'একটা কথা ছিলো—'

হাত দিয়ে চেয়ারটা দেখিয়ে দিয়ে ভাস্কর বল্‌লো—' 'ব'সো।'

রুক্ষ কণ্ঠে বলে ওঠে অনুরাধা—'ব'সো নয়, বসুন। হ্যাঁ যে কথা বলছিলাম—'

কথায় বাধা দিয়ে ভাস্কর বল্‌লো—'সে পরে শোনা যাবে। চা করতে বলি?'

—'থাক, অত ভদ্রতায় আর কাজনেই, আর তা ছাড়া এক্ষুণি যাব আমি।'

উদাস সুরে বলে ভাস্কর—'বাইরের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলে যাবার আশা ছাড়তে হবে আজ। তুমুল বৃষ্টি নেমে গেছে ততক্ষণে, সেই সঙ্গে প্রচণ্ড ঝড়!

হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে অনুরাধা—'এখন উপায়, যাবে কি করে সে?' চমক ভাঙ্গলো ভাস্করের কথায়—'যে কথা বলতে এসেছিলেন?'

একটু চুপ থেকে ধীরে ধীরে অনুরাধা বলে—'আমি ডিভোর্স-চাই, এতে যেন বাধা না আসে।'

এতটার জন্য যে প্রস্তুত ছিল না ভাস্কর! অনেকক্ষণ চুপ চাপ তাকিয়ে রইলো অনুরাধার মুখের দিকে। সেই অনুরাধা—সে-ই রাধা, যে দুদিন আগেও কত আদর করত তাকে—ছোট ছেলের মত সব সময় আগলে আগলে রাখতো—

—'আমি কথার জবাব চাই।' অনুরাধাই বল্‌লো আবার।

একটু ভেবে মরা গলায় উত্তর দেয় ভাস্কর—'বেশ তাই হবে।'

দুজন চুপচাপ বসে আছে, কারুর মুখেই কথা নেই। বাইরে অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়ছে, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আকাশে, এমন একটা দুর্যোগের রাত যেন আসে নি আগে—রসাতলে যাচ্ছে যেন সমস্ত পৃথিবীটা!

টেবিলের ওপর খোলা খাতা একটা। পাশেই মুখ খোলা পেনটা পড়ে আছে। কি যেন লিখছিলো ভাস্কর গল্প না উপন্যাস? এত দূর থেকে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

চাকর এসে চা দিয়ে গেলো, অনুরাধা চিরদিনই চা ভালবাসে। আর এমন একটা দিনে এ লোভ সামলাতে সে পারলো না। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে গভীর তৃপ্তিতে ভরা মন ভরে ওঠে—'বাঃ, বেশ চা তো—' কথাটা বলেই সে অপ্রস্তুত হয়ে যায় নিজের কাছেই। না, কোনরকম ঘনিষ্ঠতাই করা চলবে না এ রকম লোকের সঙ্গে, এক্ষুণি আস্কারা পেয়ে যাবে হয়তো লোকটা।

কিন্তু আস্কারা পেলো না লোকটা। আগের কথার জের টেনেই আবার ভাস্কর জিজ্ঞাসা করলো—'ডিভোর্স কবে হবে?'

উদাস স্বরে জবাব দেয় অনুরাধা—'কবে হবে জানি না, তবে কাল দাদা এ্যাপ্লিকেশন ফাইল করবে, দিনটাও ভাল কাল—হয়তো তাড়াতাড়িই হয়ে যাবে।'

ছোট একটা 'ও' বলে ভাস্কর আবার চুপচাপ। বাইরে

সেই একঘেঁয়ে ভাবেই বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে। চাকর এসে জানিয়ে গেলো, খাবার দেওয়া হয়েছে। ভাস্কর বল্‌লো—'তুই খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়। আমার খেতে দেরী হবে।' তারপর অনুরাধার দিকে তাকিয়ে বল্‌লো—'আজ যাওয়া আর হবে না—রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে গেছে। গাড়ীও চলবে না এই জলে। তারচেয়ে বরং আমি একটা ফোন করে জানিয়ে—'

কথার মাঝখানেই অনুরাধা প্রতিবাদ করে—'থাক্, আর দয়া না করলেও চলবে। রাত দুপুরে ফোন করে বলা হবে আমি এখানে এসে—' কেমন যেন কথাটা শেষ করতে পারে না সে।

দুজনে বসে আছে মুখোমুখি। কিন্তু কোন কথাই যেন নেই আর তাদের। সব কথাই যেন ফুরিয়ে গেছে আজ। রাত তখন গভীর, বাইরে মুষলধারায় বৃষ্টি, মাঝে মাঝে সমস্ত দিক আলো করে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ভাস্করই এক-সময় বল্‌লো—'আপনি না হয় ভেতরের ঘরের খাটে শুয়ে পড়ুন। আমি এখানে থাকি। খিদে পেলে খেতেও পারেন।'

অনুরাধা উপায় না দেখে ধীরে ধীরে ভেতরের ঘরে চলে গেলো। তাদের শোবার ঘর। দু দিন আগেও এ ঘরটা ছিল তার একান্ত নিজস্ব—আজ যেন কোথায় হারিয়ে গেছে সেটা। এখন এটা একটা ভয়ানক খারাপ লোকের আশ্রয়—যে লোকটার সঙ্গে কথা বলতেও যেন ঘৃণা হয়। সেই একভাবে বিছানা পাতা, পাশাপাশি দুটো বালিশ। বেশ ছিম্‌ছাম। অথচ এম্‌নিতে তো কী আগোছালো ভাস্কর। মনে হয় যেন খুব যত্ন করে বিছানা পেতে রেখেছে কেউ—যেমন করে রাখতো সে নিজে। সেই বালিশ—সেই এক কোণে ছোট করে তার নামের আদ্যাক্ষর লেখা—সেই তার তেলের গন্ধ। কিছুই যেন পাল্টায় নি। সবই যেন নতুন করে গুছিয়ে রাখা হয়েছে। ঘরের প্রত্যেকটি জিনিষ যেন গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করছে—কবে আসবে সে—যে কিছুদিন আগেও ছিল এখানে। ঘরের আলনাতে তারই ছাড়া কাপড় দু'টো। তেমনি ভাঁজ করা রয়েছে, ড্রেসিং টেবিলের ওপর তারই ব্যবহার করা স্নো পাউডার ঠিক তেমনি ভাবেই গোছানো রয়েছে। কোনও কিছু বদলায়নি—কোথাও ধূলো বালি পড়ে নি একবিন্দু!

অজানিতেই কখন চোখে জল এসে গেছে অনুরাধার। কেন তা সে নিজেও জানে না। খাটের ওপর ব'সে স্বপ্ন দেখছে যেন অনুরাধা। কত কি-ই যেন ছিল, কত কি-ই যেন হারিয়ে গেছে। এ বাড়ী ছেড়েছে প্রায় চারমাস হ'লো। কিন্তু এমন করে তো নিজেকে সে দেখেনি কোন-দিন, লাভ ক্ষতির অঙ্ক কষে তো এতদিন মনে হয়নি যে তার লোকসান হয়েছে—একেবারে শূন্য হ'য়ে গেছে সে!

হঠাৎ কড় কড় কড়াৎ করে সমস্ত দিক আলো করে কাছেই কোথায় বাজ পড়লো। কি হ'লো অনুরাধার কে জানে, এমনিতেই বাজ পড়লে তার ভীষণ ভয়। আজ যেন সব জ্ঞান লোপ পেয়ে গেলো তার। ছুটে এসে সামনের ঘরে যে সোফাটায় কাত হয়ে শুয়ে ভাস্কর ওপরের দিকে তাকিয়েছিল, হুমড়ি খেয়ে এসে পড়লো তার ওপর। দু-হাতে ভাস্করকে জড়িয়ে চীৎকার করে উঠলো—'বাঁচাও আমাকে ভাস্কর।'

ভাস্কর চমকে উঠে বসতে যাচ্ছিল। কিন্তু পারলো না। সবলে আঁকড়ে ধরে আছে তাকে অনুরাধা। সমস্ত শরীর তার ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে।

—'কি হয়েছে, কি হয়েছে রাধা?'

অনুরাধা কিছুই বলতে পারলো না, শুধু নিবিড় করে ভাস্করকে জড়িয়ে ধরে তার বুকে মুখ গুঁজে হাঁউ মাঁউ করে কেঁদে উঠলো। ভাস্কর তাকে আরও ঘনিষ্ঠ করে নিলো সবল দু টি বাহুর টানে।

কিন্তু তা শুধু মুহূর্তের জন্য। নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে করতে অশ্রুবিকৃত স্বরে গর্জ্জে উঠলো অনুরাধা—'ছাড়ো, ছেড়ে দাও আমাকে। অসভ্য, বর্বর তুমি. ইতর তুমি, ভীষণ—ভীষণ নোংরা তুমি—' বলতে বলতেই ভাস্করের চুল টেনে, কিল চড় মেরে মুক্ত করে নেয় নিজেকে। দু'হাত সরে ভাস্করের মুখোমুখি দাঁড়ায় সে, গাল বেয়ে টস্ টস্ করে জল পড়ছে—চুলগুলি সামনে এসে পড়েছে। সমস্ত শরীর তার দুলে দুলে উঠছে। খসে-পড়া আঁচল ঠিক করতে করতে বল্‌লো—

—'আমি থাকবো না, এক্ষুণি যাব। আমি মরলে কার কি এসে যায়। সবাই তো আনন্দে নাচবে তা হ'লে। রোজ রোজ নতুন নতুন মেয়ে নিয়ে ঘোরা যায়—কত স্ফূর্তি হয়, কত মজা হয়। আমি তো এক ঘেঁয়ে

—'কথা শেষ না করেই সে বাইরে যাবার জন্য পা বাড়ায়।

আর চুপ করে থাকবে না ভাস্কর। অনেক ক্ষতি তার হয়েছে—আর ক্ষতি তার হতে দেবে না সে—কোন মতেই না।

দরজায় পিঠ দিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ধীর গম্ভীর গলায় বল্‌লো,—

—আজ আমি মদ খাইনি, বিশ্বেস করো আর নাই করো, সেদিন থেকে কোন দিন খাইওনি আর। যেতে তোমাকে আর দেবো না—' বলেই দু'হাতে তাকে তুলে নিয়ে শোবার ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। কোন বাধাই দিতে পারে না অনুরাধা—সব শক্তিই যেন আজ লোপ পেয়ে গেছে তার।

খাটের ওপর অনুরাধাকে বসিয়ে হাত দিয়ে সযত্নে তার চুল ঠিক করে দিতে দিতে ভাস্কর ফিস ফিস ক'রে বলে—'কোথায়' যাবে রাধা আমাকে ফেলে। আমি যে আর পারছি না—' বলতে বলতে অনুরাধার কোলে মুখ গুঁজে দেয় ভাস্কর।

সব যেন কি রকম ওলোট পালোট হ'য়ে গেলো অনুরাধার। কি যে সে করে যাচ্ছে তা যেন নিজেও জানে না সে। গভীর আবেশে ভাস্করের চুলে হাত বুলোতে বুলোতে স্নিগ্ধ কণ্ঠে চুপি চুপি বলে—'ছিঃ, তুমি না পুরুষ মানুষ।'

এভাবে দুর্য্যোগের রাত কেটে যায় এক সময়, ভোর হতে না হতেই বৃষ্টি থেমে গেছে। একটু রোদও উঠেছে বুঝি। কে বলবে সমস্ত রাত ধরে বাইরের এ গাছগুলি কি-ই না মাতামাতি করেছে! অনুরাধা স্নান কোরে এসেছে। ভাস্করও হাত মুখ ধুয়ে চা খেতে বসেছে। এমন সময় বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ।

অনুরাধা দরজা খুলে দিতেই এক ঝলক খুসী হাওয়ার মত ঘরে ঢুকে পড়ে একটি মেয়ে, সেই মেয়ে—যাকে দেখে ভুল হবে না কোনদিন অনুরাধার।

—'কি চাই!' চাপা আগুন যেন আর চাপা থাকছে না।'

—'ভাস্কর বাবুকে চাই।' মিষ্টি হেসে উত্তর এলো।

কথার মাঝেই ভাস্কর বেরিয়ে এসেছে।—'আরে তুই যে এই সাত সকালে?' তির্য্যক দৃষ্টিতে ভাস্করের দিকে তাকিয়ে মেয়েটি জবাব দেয়—'বাঃ, সবই ভুলে ব'সে আছ দেখছি। আজ যে বালীগঞ্জ প্লেসের বাড়ীটার সামনে দিয়ে দুবার হাঁটাহাঁটি করবার কথা ছিল।' তারপর অনুরাধার দিকে তাকিয়ে—'তার আর নিশ্চয়ই দরকার নেই। এসো বৌদি প্রণামটা সেরে নিই।'

অনুরাধা হকচকিয়ে দু হাত পেছিয়ে যায়, কেমন অস্ফুট স্বরে বলে,—'প্রণাম কেন?'

খিল খিল করে মেয়েটি হেসে ওঠে—'প্রণাম করতে হয়। তুমি যে আমার বৌদি গো—'

অনুরাধার মুখের অবস্থা দেখে মায়া হয় ভাস্করের। এগিয়ে এসে বলে—'এসো আলাপ করিয়ে দিই। আমার বোন সুমিতা অর্থাৎ সুমি, এর নাম তুমি নিশ্চয়ই বহুবার শুনে থাকবে। বিয়ে হবার পর থেকেই ওরা বাংলা দেশের বাইরে—এই কিছুদিন হল বদ্‌লি হয়ে এসেছে। তার পরের ইতিহাস তো তুমি মোটামুটি জানই।'

অনুরাধা হাসবে কি কাঁদবে কিছুই বুঝতে না পেরে হঠাৎ খপ করে সুমিতার হাত ধরে বলে উঠলো—বৌদির সঙ্গে দুষ্টুমি, দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা!

মুখ কাঁচুমাচু করে সুমিতা দাদার দিকে তাকিয়ে বলে—'তুমি বাঁচাও দাদা, তোমার জন্যে এত করলাম—'

উদাস সুরে জবাব দেয় ভাস্কর—'হ্যাঁ, কত কি করলে আমার জন্যে? ঘাড়ে চেপে সমস্ত সহর ঘুরলে, সিনেমা দেখলে, কাঁড়ি কাঁড়ি গিল্‌লে—'

—'দেখেছো বৌদি, পুরুষমানুষ কি রকম নেমক-হারাম! দু দিন আগেও কী নাকেকান্না রে বাবা। তোকে এ দেবো, সে দেবো, শুধু আমার সঙ্গে তোর বৌদির চোখের সাম্‌নে একটু ঘুরে বেড়াবি। তাতেই নাকি কাজ হাসিল হবে। মেয়েরা নাকি এমন হিংসুটে—একটু থেমে আয়ত চোখ দু'টি অনুরাধার মুখের ওপর রেখে মিষ্টি হেসেবলে—'সত্যি, বৌদি, তুমি মেয়েদের কলঙ্ক! চেহারা দেখেও একবার সন্দেহ হ'লোনা, ছোট বেলা থেকেই সবাই আমাদের বলতো যমজ ভাই-বোন।

অনুরাধা ততক্ষণে সুমিতাকে জড়িয়ে ধরেছে।—'তুমি একটু ব'সো ভাই আমি চা, মিষ্টি নিয়ে আসি।'

—'এখন নয় বৌদি, বিকেলে ওকে নিয়ে আসবো,

বেচারী একা একা অনেকদিন কাটিয়েছে। আমার তো প্রায় ছুটিরদিনই ডিউটি থাকতো কিনা—বিনে পয়সার ডিউটি—'

কথার মাঝেই বাধা দেয় ভাস্কর—'একেবারে বিনে পয়সার নয় রে। একটা সাড়ী বরং দেওয়া যাবে তোকে।

ঠোঁট উল্টে জবাব দেয় স্নমিতা—'চাইনে তোমার শাড়ী—অকৃতজ্ঞ কোথাকার। আমি চল্লাম।' বলে হাসতে হাসতে স্নমিতা বেরিয়ে যায়।

সে বেরিয়ে যেতেই ভাস্করের কাছে সরে এসে অনুরাধা বলে,—'বাবা, কী দুষ্টু তুমি, এতও মাথায় খেলে'। একটু থেমে ভাস্করের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে বলে—'অসভ্য, ইতর, জানোয়ার কোথাকার।'

ফোঁড়ন কাটে ভাস্কর—'চরিত্রহীন বল্লে না, ওটাই বা বাদ যায় কেন? চল চা খাওয়া যাক্—'

দু জনে চায়ের টেবিলে এসে বসে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে ভাস্কর বলে—'আঃ, বহুদিন পর মিষ্টি ছাড়া চা কী মিষ্টিই না লাগছে।'

—'একেবারে ভুলে গেছি। স্নমিতার সঙ্গে কথা বলতে বলতে—'

তাকে বাধা দিয়ে ভাস্কর বলে—'থাক, আর দিতে হবে না, চিনির চেয়েও যা মিষ্টি তাই বরং দিও একটা।'

হাভ ছাড়াতে ছাড়াতে অনুরাধা বলে,—'ছাড়ো ইতর অভদ্র লোক কোথাকার!'

দু জনের হাসির রোলে বহুদিন পর টালিগঞ্জের বাড়ীটা যেন আবার ঝলমলিয়ে উঠলো।

অন্বিষ্টা

রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আরব মরুতে খুঁজেছি যে ভাই বেদুইন সাথে মিশি,
নিউজিল্যাণ্ডের হৃদ্‌পিণ্ডেতে তথা ভূমধ্য নীরে;
রাশিয়ার পাতা উল্টে দেখেছি ভেদি' বিজ্ঞান-কৃষি,
অ্যাটম বোমের কারুকার্যেতে উপগ্রহের ভিড়ে।

কক্ষপথের গ্রহ চিরে চিরে, ধূমকেতু মাঝে মাঝে—
সপ্তর্ষির মিছিল ভাঙিয়া; কালপুরুষের হাড়ে,
ধ্রুবতারা আর শুকতারাটার রশ্মির ভাঁজে ভাঁজে—
মেঘের আলিসে বজ্র যেথায় ঘন ঘন ডাক ছাড়ে।

খুঁজিয়া ফিরেছি আফ্রিকা মাঝে ঘন বন ছায়ে ছায়ে,
যেথানে হিংস্র শ্বাপদের ডাকে নিশীথ ককিয়ে কাঁদে;
হিমগিরির তুষার খচিত পাথরের গায়ে গায়ে—
তোমারে বন্ধু খুঁজিয়া খুঁজিয়া পাইলাম অবসাদে।

অবশেষে এসে পড়ো-বাড়ীটার কার্নিসে কার্নিসে,
খোঁজ করিলাম কতশতবার মিলিল না তবু দেখা;
শুধু হেরিলাম প্রতি খাঁজে খাঁজে যত্ন রয়েছে মিশে,
আন্তরিকতার প্রতি চত্বরে আদরেতে আছে লেখা।
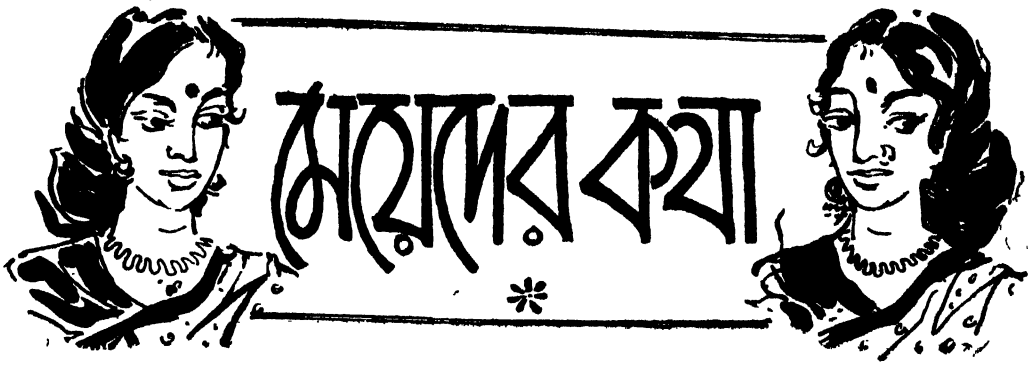
স্বাধীনতার সীমানা

সরস্বতী সোম

যদি কোন রমণীর অন্তর জেনেছ বা বুঝেছ বলে তোমার বিশ্বাস হয়ে থাকে, আমি বলছি সে বিশ্বাস তোমার ভুল, সে ভুল তুমি সংশোধন কর। আমি জানি, তুমি আমার কথা কিছুতেই মেনে নেবে না। কারণ তাতে তোমার নিজস্ব বিচারের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হতে পারে। কিন্তু জানো, আমার এ অভিজ্ঞতা হয়েছে তোমাকে দেখে—তোমাকে পঁচিশ বছর ধরে দেখে।

তুমি আমার ধনবতী মাসীমার একমাত্র কন্যা। আমার মা মারা যাবার পর তোমার মা অর্থাৎ আমার মাসীর কোলেই আমি মানুষ হয়েছি। আমার মা যখন মারা গেলেন তোমার বয়স পাঁচ, আমার সাত। আমাকে খেলার সাথী পেয়ে তুমি খুশি হয়েছিলে। আমিও মাসীমার আদরে আর তোমার সাথে খেলায় মাতৃশোক ভুলেই ছিলাম। মাসীমাকেই মা বলে ডাকতে আমি শিখলুম। তুমি বুঝতে পারতে না আমি তোমার মায়ের পেটের বোন কি না। তবুও মায়ের কোলে, সারা সংসারে, চাকর-বাকরের মধ্যে তোমার প্রভুত্ব বজায় রইল। আমি তোমার দিদি হয়েও তোমার আজ্ঞাবহ হয়ে রইলুম। তুমি যখন খেলতে চাইবে, তখন আমাকে খেলতে হবে, যদিও খেলায় আমার তখন মন না উঠে। তুমি যখন বেড়াতে যাবে তখন আমাকে বেড়াতে হবে। যদি না যাই, তুমি এমন চীৎকার করতে যে মা বাধ্য হয়ে ছুটে এসে আমার বলতেন, 'যা-না-রে, ওকে নিয়ে এই গলি দিয়ে একটু ঘুরে আয়।' মার কথার অবাধ্য আমি কখনও হতে পারতুম না,—যদিও চোখের সামনে দেখতুম তুমি সব কথায়ই মার অবাধ্য। মাকে, সংসারের সবাইকে তোমার কথায়, তোমার কান্নায় বাধ্য হয়ে চলতে হত।

মা আমাদের পড়াবার জন্য একজন মাষ্টার ঠিক করলেন। আমি তোমার চেয়ে দুই বছরের বড়। তোমার চেয়ে উপরের ক্লাসের বই পড়া উচিত। কিন্তু তোমার খেয়াল হল আমি যে বই পড়ব তোমাকেও সেই বই পড়াতে হবে। মা ও মাষ্টার মশাই বাধ্য হয়ে তোমাকে ও আমাকে একই শ্রেণীর বই পড়াতে সুরু করলেন। পড়াশোনায় দুজনেই আমরা ভাল ছিলুম। কিন্তু প্রতিযোগিতায় তুমি আমার সঙ্গে পেরে উঠলে না। অন্য দিকে তুমি আমায় পেছনে ফেলতে চেষ্টা করলে। খেলা-ধূলায়, নাচে-গানে, সব-কিছুতে তুমি আমায় পরাজিত করলে। আর সকলের চেয়ে যে বেশী আমায় পরাস্ত করল, সে তোমার রূপ। তোমার স্বাস্থ্য আর যৌবনের পাঁপড়ি মেলে তোমার রূপ যেন সুগন্ধ ফুলের মত ফুটে উঠল; আমি আমার স্কুলের সমস্ত ভাল ফল নিয়েও তোমার পাশে নিষ্প্রভ হয়ে পড়লুম।

তোমার রূপের আগুনে আকৃষ্ট হয়ে কত পতঙ্গ এসে উড়ে পড়তে লাগল, পুড়তে লাগল, তোমার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। তুমি মনের আনন্দে তাদের নাচাতে লাগলে। আমি তা লক্ষ্য করে কৌতুক অনুভব করেছি—দুঃখও অনুভব করেছি। আমার সেই দুঃখ আর সেই জ্বালা

অসহ্য হল—তুমি যখন মার নির্বাচিত বান্ধবী পুত্র অপূর্বকে প্রত্যাখ্যান করলে। অপূর্ব তার মায়ের একমাত্র সন্তান। গরীব বিধবার পুত্র। মার কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে তার মা তাকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। তার মার সঙ্গে আমাদের মা এই স্থির করে রেখেছিলেন—অপূর্ব যদি একেবারে তোমার অযোগ্য না হয় তবে তার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবেন। তাই মা ইচ্ছা করেই অপূর্ব এম-এ পাশ করার পর তোমার সঙ্গে তার ভাব জমিয়ে দিলেন। তুমি নূতন একটি শিকার পেয়ে তাকে নিয়ে এখানে সেখানে ঘুরলে, তাকে বল-নাচ শেখাতেও নিয়ে গেলে। কিন্তু কিছুই তার ভাল লাগল না। তুমি তাকে অযোগ্য অপদার্থ বলে ধরণা করলে। তাই মা যখন অপূর্বর মার সঙ্গে যুক্তি করে তোমাদের বিয়ের প্রস্তাব করলেন, তুমি বেঁকে বসলে। অপূর্বর মত গোবেচারা ছেলে তুমি কখনও বিয়ে করতে পারবে না, তা জানিয়ে দিলে। মা ভয়ঙ্কর ক্ষুণ্ণ হলেন। কিন্তু তার মত স্নেহময়ী মায়ের প্রাণেও কেমন একটা প্রতিহিংসা জাগলো। তিনি স্থির করলেন অপূর্বর সঙ্গে আমায় বিয়ে দেবেন। আমাদের দুজনকে সব সম্পত্তি উইল করে দিয়ে কাশীবাসী হবেন। মার মন টলানো কারো সাধ্যে কুলাল না। অপূর্বর সঙ্গে আমার বিয়ে হল। অপূর্ব আমাদের বাড়ীতে এসে ঘর জামাই হয়ে বসল। কিন্তু আমি তাকে উৎসাহ দিয়ে চাকরী করতে প্রস্তুত করলুম। চাকুরী পেল সে। আমি একদিন মার মনটা কেমন আছে বুঝে তার পায়ে গিয়ে লুটিয়ে পড়লুম উইলখানা নিয়ে। কেঁদে বললুম, মা উইলখানা ছিঁড়ে ফেল, পুড়িয়ে ফেল, যমুনার এত বড় সর্বনাশ আমি চোখের সামনে দেখতে পারব না। অপূর্ব এখন চাকুরী করছে, আমাদের কোন রকমে চলে যাবে।' মা রাগ করে বললেন, 'যা, তোর যদি ইচ্ছে না হয় নিতে তুই ছিঁড়ে ফেল।' মার অনুমতি পেয়ে তাঁর দেওয়া দত্ত-সম্পত্তির দলিল, টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললুম। কিছুটা শান্তি এল মনে।

কিন্তু তোমার মনে কি এলো জানি না, কত ছেলেকে নিয়ে খেলিয়ে বেড়াচ্ছ। তবু আবার অপূর্বকে নিয়ে নূতন খেলা খেলবার তোমার সখ হল। তোমার শোবার ঘরের পাশেই আমার শোবার ঘর। আমি নীচের তলায় রান্নাঘরে ব্যস্ত। অপূর্ব আমার শোবার ঘরে একলা বিছানায় শুয়ে ছিল। তুমি হঠাৎ ঝড়ের বেগে এসে টেনে নিয়ে গেলে তোমার ঘরে। তোমার মধ্যে তখন তোমার শ্যালিকার চাতুরিকা রূপ ফুটে উঠল। তুমি তাকে পথভ্রষ্ট করতে চেষ্টা করলে। কিন্তু আমার কপাল ভাল। তোমার চাতুরীতে সে মজল না। কারণ দুদিন আগে তোমার প্রত্যাখ্যানে সে আহত হয়েছিল। তারপর তুমি মান-অভিমান করেছিলে, নূতন ছলাকলার জাল বিস্তার করেছিলে—অপূর্ব আমায় সব বলেছে। আমি সব জেনেও তোমায় কিছু বলি নি : মাকে কিছু বলি নি।

তুমি প্রতিহিংসায় মত্ত হয়ে উঠলে। এ প্রতিহিংসা শুধু আমি কিংবা অপূর্বর বিরুদ্ধে নয়। সমস্ত সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেন তোমার হিংসা জ্বলে উঠল। তুমি আমার মত কোন পুরুষের ঘরে বাঁধা দাসী হয়ে জীবন নষ্ট করতে পারবে না। তুমি যাপন করবে স্বাধীন স্বতন্ত্র নারীর জীবন—যে জীবন কোন বন্ধনে আবদ্ধ নয়, কোন বাধায় সীমিত নয়। তোমার মনে জাগল অপার মুক্তি আস্বাদনের দুরন্ত আগ্রহ।

তোমার চারিদিকের অলিকুল দিন দিন বেড়ে চলল। মার চোখে তা ভাল লাগল না। অপূর্বও তার নিন্দে করল। কিন্তু মানুষ কোন বন্ধন মানুক আর নাই মানুক, তার কাজ তাকে বেধে ফেলে। শত রকমের বৈজ্ঞানিক সতর্কতা সত্ত্বেও জীবিতেশের সঙ্গে তোমার নিবিড় অথচ বন্ধনহীন ভালোবাসার আচরণ তোমায় বেঁধে ফেলল। তুমি অন্তঃসত্ত্বা হলে। জীবিতেশকে নিয়ে নানা জায়গায় তুমি ঘুরলে, তোমার কার্যের কুফল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে। সবাই পরামর্শ দিল—প্রথমেই এ পথে কেন? জীবিতেশকে বিয়ে করলেই তো সব ঝঞ্ঝাট মিটে যায়। জীবিতেশের নিজেরও এই মত। কিন্তু তাতে রাগ বেড়ে যায় তোমার।—আমায় ফাঁদে ফেলে বশীভূত করা। মুক্ত-প্রেমের অভিনয় করে ফাঁদে ফেলে বিয়ে করার মতলব! জীবিতেশের উপর তুমি অপ্রসন্ন হলে। সুমিত্র সেন চিরকুমার। বয়স তাঁর পয়তাল্লিশ কি পঞ্চাশ। তিনি তোমায় তাঁর ডাক্তার-বন্ধুর সাহায্যে মুক্ত করলেন। তাঁর সাহায্যে উপকৃত অনুভব করলে তুমি। বাঁধা পড়লে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায়। তিনি নির্বিষ জেনে তুমি উল্লসিত

হলে। কিন্তু তাঁকে নিয়ে খেলা তোমার বেশীদিন ভাল লাগল না। কারণ যে সাপের বিষ নেই তাকে নিয়ে খেলা কোন খেলাই নয়। তুমি তাঁর কাছ থেকে দূরে সরতে চাইলে। কিন্তু তিনি তা হতে দেবেন কেন? অক্টোপাসের মত তাঁর রজ্জুজালের বন্ধন তিনি শক্ত করতে লাগলেন।—তুমি ততই অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে। তোমার বিরূপতা তাঁকে হিংস্র করে তুলল—তিনি প্রথমে তোমার নিন্দা প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন,—তাতেও যখন কাজ হল না, তিনি গুণ্ডা লাগিয়ে হত্যা করবেন বলে শাসালেন। তুমি সেই শাসানিতে সত্যি সত্যি ভয় পেলে। তুমি দেখলে তোমার কাজ তোমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেধে রেখেছে—নিত্য আরো বেশী করে বাধছে। তুমি উপলব্ধি করলে মুক্তি তোমার নেই—আরও বেশী পরাধীন তুমি।

শেষ পর্যন্ত তোমার কোলকাতা ছাড়তে হলো ভয়ে। সুমিত্র সেন তোমায় বিয়ে করে তোমার সম্পত্তির মালিক হয়ে সুখে রাজত্ব করার স্বপ্ন দেখছিলেন। সে স্বপ্ন দিলে তুমি ভেঙ্গে। তিনি তোমার প্রত্যেকটি প্রত্যাখ্যাত বন্ধুকে উত্তেজিত করতে লাগলেন। গুণ্ডা তোমায় মেরে ফেলবে এ ভয় না করলেও দুর্জনের কথার ঘায়ে তুমি ক্ষত-বিক্ষত হয়ে কোলকাতা ছেড়ে লখনৌ চলে গেলে স্কুলের চাকুরী পেয়ে। সেখানে পুরুষের শাসন তোমাকে মেনে নিতেই হল। শৃঙ্খলার মধ্যে আসতে হলো। কিন্তু সব তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সময়ের চক্রান্তে। যমুনা, সময় বড় চক্রান্তকারী। যে সময় একদিন তোমাকে রূপ দিয়েছিল, যৌবন দিয়েছিল—যার বলে তুমি এতগুলি শিক্ষিত রূপবান তরুণকে পুতুলের মত নাচিয়েছিলে, সে সময়ই তা কেড়ে নিলো—তোমার উচ্ছৃঙ্খলতার, স্বৈরাচারের দুষ্পরিণামে একটু বেশী তাড়াতাড়ি কেড়ে নিল। যে মন্ত্রে তুমি সবাইকে মুগ্ধ করে, বশীভূত করে বেধে ফেলতে, তাদের উপর প্রভুত্ব করতে—সে মন্ত্র তার শক্তি হারিয়ে ফেলল। তোমার স্বাধীনতার স্বৈরাচারের অহঙ্কার তোমায় পুড়িয়ে মারছিল। লখনৌ স্কুল সেক্রেটারীর শাসনে সে স্বাধীনতা হারিয়ে যেন তুমি শান্তি পেলে। নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা দায়িত্বহীন স্বাধীনতা যে স্বাধীনতা নয় তা তুমি বুঝলে—কিন্তু বড় দেরীতে বুঝলে, যমুনা!

——

প্রসূতি-পরিচর্য্যা ও শিশুমঙ্গল

ডাঃ কুমারেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম,বি

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বিলাতে শিশুকে স্তন্যদান করা, এক সময়ে প্রত্যেক মাতারই প্রধান কর্ত্তব্য ছিল, কিন্তু পরে যুগ-পরিবর্ত্তনের ফলে, ক্রমশঃ এমন একটা সময় এলো—যখন প্রতি ঘরে ঘরে শিশুদের মাতৃস্তন্যদানের বদলে কৃত্রিম উপায়ে 'ফিডিং' বোতলে দুধ খাওয়ান রেওয়াজ হয়ে উঠল। তবে সুখের বিষয় প্রথম মহাযুদ্ধের পর হতে সে হাওয়া বদলাতে আরম্ভ করেছে···বিলাতের অধিকাংশ মাতাই আজকাল শিশুদের স্তন্যদান করাই পছন্দ করেন। প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ জুইসবেরীর মতে সকল মায়েরই কর্ত্তব্য নিজের শিশুকে স্তন্যদান করা। কারণ, শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে স্তন্যদুগ্ধ বা মায়ের দুধের সঙ্গে কোনও কৃত্রিম খাদ্যেরই তুলনা হয় না। অধুনা দেশী ও বিলাতী সকল সমাজের বিজ্ঞ চিকিৎসকদের ধারণা—মায়ের দুধ ছাড়া শিশুদের জন্যে সমপর্য্যায়ের আর কোনো খাদ্য নেই। একালের প্রখ্যাত ধাত্রী ও শিশু চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ সার ট্রবি কিং, নার্শ ম্যাবেল লিডিয়াড, লেডী ব্যারেট, ডাঃ জুইসবেরী, ডাঃ হলাণ্ড, ডাঃ উইলিয়ামস্, ডাঃ লেডী পিট্রি প্রভৃতি সকলেই একবাক্যে এই অভিমত প্রকাশ করেছেন। আমাদের দেশের সুবিখ্যাত চিকিৎসক সার কেদারনাথ দাস, ডাঃ নরেন্দ্রনাথ বসু, কর্ণেল গাউয়ের নামও এ প্রসঙ্গে বিশেষ-ভাবে উল্লেখ করা যায়। যারা প্রসূতি পরিচর্য্যা সম্বন্ধে প্রধান স্থান অধিকার করেন, তাদের মধ্যে, শিশুপালন সম্বন্ধে যেমন সবিশেষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার দরকার···শুধু মা হলেই সর্ব্বজ্ঞ হওয়া যায় না, স্তনে দুধ বাড়ানোর জন্যে তেমনি উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রস্তুতির প্রয়োজন। সচরাচর যক্ষ্মা প্রভৃতি কোনো সংক্রামক রোগ না হলে শিশু সন্তানকে স্তনদান করা সকল মায়েরই অবশ্য কর্ত্তব্য হওয়া উচিত। আধুনিক ধাত্রী ও শিশু চিকিৎসকদের মতে, যদি প্রসূতিরা নিজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকেন, এবং খাদ্যাখাদ্য বিচার

করে সদা মন প্রফুল্ল রেখে সংসারের কাজকর্ম্ম করেন, তাহলে শিশুকে স্তন্যদানের বিশেষ কোনও অসুবিধা হবে না। তাছাড়া প্রয়োজনবোধে ডাক্তারের উপদেশ নেবেন, এ ব্যাপারে অহেতুক সঙ্কোচ বা লজ্জার কোনও প্রয়োজন নেই।

বিশিষ্ট চিকিৎসক সার ট্রবি কিং বলেন, ঈশ্বর প্রসূতির সন্তান সম্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর জন্য যে খাদ্যের ব্যবস্থা করেন, সেটাই হলো শিশুর সবচেয়ে উপযুক্ত খাদ্য। স্বাস্থ্যরক্ষা, পুষ্টি ও দৈহিক উন্নতির পক্ষে যে জগদ্‌বিধাতা মাতৃগর্ভে অভিনব বিধানে শিশুর আগমন সম্ভব করলেন, তার উপযোগী খাদ্য ব্যবস্থা করলেন—সেটা উপযুক্ত ও যথেষ্ট পরিমাণ হবে না—এমন যুক্তি নিতান্তই অবান্তর বোধ হয় নাকি? আমাদের দেশে স্যার ট্রবি কিং-এর মতে, গরুর দুধ তার বাছুরের জন্যেই উপযুক্ত, এবং এই প্রাকৃতিক-বিধির যতই পরিবর্ত্তন সাধন হোক না কেন, সে দুধ মানবশিশুর পক্ষে ঠিক ততখানি উপযুক্ত খাদ্য হতেই পারে না।

তাছাড়া কৃত্রিম দুধে বা খাদ্যগ্রহণে যে সব শিশু মানুষ হয়ে ওঠে, পরিসংখ্যা হিসাবে দেখা যায় তাদের মৃত্যুর হার সাধারণতঃ স্তন্যদুগ্ধে-পালিত শিশুদের চেয়ে অনেক বেশী।

স্যার ট্রবি কিং আরো অভিমত প্রকাশ করেন যে সচরাচর স্তন্যপায়ী শিশুরা কম রোগপ্রবণ হয়। কারণ মায়ের দুধের মাধ্যমে রোগনিবারক-শক্তি, তাদের দেহে সন্নিবেশিত হয় এবং রোগ নিরোধ করে। কাজেই এসব স্তন্যপায়ী শিশুরা কোনো কারণে রোগে পড়লেও, সহজেই সেরে ওঠে। •

গর্ভাবস্থায় ভ্রূণ যখন মায়ের রক্ত থেকে পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে, তখন তার পাকাশয়, মূত্রাশয় প্রভৃতির বিশেষ কোনও সক্রিয়তা থাকে না, কিন্তু জন্মের পর মুখে খাদ্যগ্রহণ করায়, পাকাশয় ও অন্ত্রেতন্ত্রে পরিপাক হলে, তবেই খাদ্যের পুষ্টিকর উপাদানসমূহ শিশুর শরীরে ও রক্তে যায়। করুণাময়ের এমনই কৃপা যে প্রসবের পর প্রথম সাত আট দিন মায়ের দুধ এমতাবস্থায় থাকে যে তাতে শুধু শিশুর শরীর গঠনোপযোগী মাতার রক্তের আমিষ জাতীয় বা প্রোটিন উপাদান (Colostrum) মেলে, যার ফলে, নবজাত শিশুর পাকাশয়ের অথবা হজম শক্তির উপর কোন রকম চাপ পড়ে না। তারপর ধীরে ধীরে সময়াতিবাহের সঙ্গে সঙ্গে মায়ের দুধ গাঢ় হয় এবং সেই সঙ্গে তার উপাদানেরও পরিবর্ত্তন ঘটতে থাকে। উপরন্তু, শিশুর হজম শক্তিও এই খাদ্য গ্রহণে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

গরুর দুধ ঘন ও তার মধ্যে আমিষ, স্নেহ প্রভৃতি উপাদান থাকে বলেই প্রসূতি প্রভৃতির স্তনদুগ্ধের চেয়ে সেটি বেশী ঘন হয়। তাছাড়া পাকাশয়ে সেই দুধ গাঢ় দইতে পরিণত হয় বলে, মানব শিশুর পক্ষে সে দুধ সহজে হজম করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। কাজেই দেখা যায় যে অনেক ক্ষেত্রে বহু জননী শিশুদের গরুর দুধ পান করিয়ে অল্প বয়সেই তাঁদের সন্তানদের পরিপাক যন্ত্রের পীড়া ও গোলযোগ ঘটিয়ে তোলেন। মাতৃ-স্তন্য পানের সময়. শিশুরা সচরাচর খুব আনন্দে খেলা করে, হাত-পা ছোঁড়ে। তার ফলে, শিশুদের চোয়ালের গড়ন মজবুত তো হয়ই, উপরন্তু সারা দেহ সবল ও পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে।

যে সব জননী প্রসবের পর শিশুকে স্তন্যদান করেন, তাঁদের শরীর যেমন তাড়াতাড়ি সারে, অন্যদের বেলায় ঠিক তেমনি ঘটতে দেখা যায় না। কারণ, স্তন্যদানের সময় জরায়ু, অন্ত্রতন্ত্র প্রভৃতি সমস্ত শরীর থেকে প্রচুর রক্ত সঞ্চারিত হয়ে জননীর স্তনে দুধ যোগায়। তার ফলে, জরায়ু ও সরাকৃতি-ভাণ্ডের মধ্যে অবস্থিত শরীরের যাবতীয় যন্ত্রাদি সঙ্কুচিত হয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবার সুযোগ পায়।

মাতৃদুগ্ধ সর্ব্বদাই পরিষ্কার, টাট্‌কা ও সব রকম জীবাণু-মুক্ত থাকে এবং কৃত্রিম দুধের মতো সে দুধের উত্তাপ নিয়ন্ত্রণেরও কোনো প্রয়োজন হয় না।

গরুর দুধে 'সিস্‌টিন' (Cystine) ও 'লেসিথিন' (Lecithin) জাতীয় আমিষ উপাদান থাকে না, যেটি মায়ের দুধে পাওয়া যায়। এ উপাদানগুলি শিশুর মস্তিষ্কের গঠনের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। তাছাড়া জননীর স্তন্যদুগ্ধে সচরাচর খাদ্যপ্রাণের (Vitamines) অভাবও বিশেষ ঘটে না। তাই Rickets বা অস্থিবিকৃতি প্রভৃতি রোগ সচরাচর কৃত্রিমখাদ্যে বর্দ্ধিত শিশুদের মধ্যেই বেশী দেখা যায়।

মাতৃস্তন্যের দুগ্ধপান প্রসঙ্গে সবচেয়ে বড় কথা—মা ও সন্তানের মধ্যে যে মধুর সম্পর্ক এই সময়ে গড়ে উঠে, সেটির সুযোগ সহজে নষ্ট করা উচিত নয়। যত ভাল পরিবর্ত্ত-খাদ্যই শিশুদের দেওয়া হোক না কেন, মূল্যমানের দিক থেকে বিচার করে দেখলে, স্তন্যদুগ্ধের সঙ্গে বাকী কোনটিরই তুলনা হবে না। যেসব শিশু অসময়ে জন্মায় বা যাদের স্বাস্থ্য ভাল নয়, তাদের সুস্থ, সবল ও যথাযথভাবে মানুষ করতে হলে জননীকে কিঞ্চিৎ ত্যাগ স্বীকার তো করতেই হবে।

স্যার কিং বলেন—"স্তন্যদুগ্ধে বর্দ্ধিত হওয়া—দুনিয়ার সকল শিশুরই জন্মগত অধিকার। ভগবানের এই আশীর্ব্বাদ থেকে তাকে বঞ্চিত করা উচিত নয়।

বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ মাদার ক্রাফট্ ও নার্শারী 'ওয়ার্ল্ড' পত্রিকার মতে,—শুধু তখনই মাতৃস্তন্য দেওয়া বন্ধ করা হবে, (১) যখন মা যক্ষ্মা রোগী, অথবা (২) এমন কঠিন কোনও অসুখে শয্যাগত, যখন দিন দিন তিনি কৃশ হয়ে যাচ্ছেন, বা তার ওজন কমে যাচ্ছে, (৩) না হলে তিনি বিকারগ্রস্ত রোগী, বা (৪) মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত, আর (৫) যদি তিনি আবার সন্তানবতী হন তাহলেও, ধীরে ধীরে তিন সপ্তাহে শিশুকে স্তন্যদানের অভ্যাস ছাড়ানো উচিত। তবে স্বাভাবিক নিয়মানুসারে, স্তন্যদুগ্ধ ছাড়বার সময় এলে অর্থাৎ শিশু নয় মাসে পদার্পণ করলে অবশ্য ভিন্ন কথা।

(ক্রমশঃ)

সুপর্ণা দেবী

মহিলাদের দৈহিক-স্বাস্থ্য আর শ্রী-সৌন্দর্য্য-লাবণ্য অক্ষুণ্ণ-অটুট রাখার জন্য নিয়মিত ব্যায়াম-চর্চ্চার সুবিধার্থে, ইতিপূর্ব্বে যেমন হদিশ দিয়েছি, এবারেও তেমনি ধরণের আরো কয়েকটি ঘরোয়া-ধরণের ব্যায়াম-ভঙ্গীর কথা বলছি। এ ব্যায়াম-ভঙ্গীগুলি নিত্য-নিয়মিত অভ্যাসের ফলে, মহিলাদের উদরদেশ, বস্তী, কোমর, বুক, স্কন্ধ, গ্রীবা, হাত এবং পায়ের গঠন, সুস্থতা ও সাবলীলতাই যে শুধু উন্নতিলাভ করবে তাই নয়, সারা দেহের সুঠাম-লাবণ্যশ্রী এবং স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্যও বজায় থাকবে সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত...এমন কি, অকালে জরাজীর্ণ হয়ে পড়বার আশঙ্কাও বিদূরিত হবে সবিশেষ।
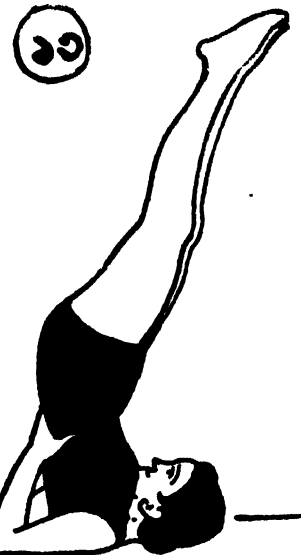
উপরের ছবিতে যে ব্যায়াম-ভঙ্গীটির নমুনা দেখানো

হয়েছে, সেটি নিত্য-নিয়মিতভাবে সযত্নে অনুশীলনের ফলে, সারা দেহের গঠন হয়ে উঠবে মেদবিহীন, ঋজু ও সরল… পাকাশয়ের গোলযোগ, কোষ্ঠকাঠিন্য, ফুসফুসের বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি বিবিধ দৈহিক-বৈকল্যের দুর্ভোগ থেকেও রেহাই মিলবে বিশেষভাবে। এ ব্যায়াম-ভঙ্গীটি অভ্যাসের রীতি হলো—ঘরের সমতল মেঝে অথবা মজবুত তক্তপোষ বা চওড়া-বেঞ্চের উপর সারা দেহটিকে সুপ্রসারিত করে চিৎ হয়ে শুয়ে দুই পা একত্রে জোড়া রেখে সটান ছড়িয়ে দিন। তারপর ধীরে ধীরে নিশ্বাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে উপরের ছবিতে দেখানো নমুনামতো ভঙ্গীতে মাথা ও কাঁধের উপর দেহের ভার রেখে, হাত দু'খানি কোমরের দুই পাশে ন্যস্ত করে, দুই পা ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে তুলুন। এভাবে ঊর্দ্ধে পা তোলবার সময়, দুই পা যেন বরাবর জোড়া এবং নিবিড়ভাবে পাশাপাশি ছুঁয়ে থাকে। এ ব্যায়ামটি অভ্যাসকালে, গোড়ার দিকে অনেকের পক্ষে হয়তো পা দুটি বরাবর সটান-সিধা ঊর্দ্ধে তোলা সহজসাধ্য হবে না…কিন্তু তার জন্য হতোৎসাহ হয়ে পড়বার কোনো কারণ নেই! বরং প্রথম-প্রথম ব্যায়ামাভ্যাসকালে যতটা পারেন, ততটুকু ঊর্দ্ধেই পা দুটিকে সটান-সিধা ধরণে তুলে রাখার চেষ্টা করলেই চলবে। কারণ, দু'চারদিন সযত্নে নিয়মিত-অভ্যাসের ফলে, এ ব্যায়াম-ভঙ্গীটি ক্রমেই রপ্ত হবে। যাই হোক, এইভাবে পা দুটি সম্পূর্ণভাবে উর্দ্ধে তোলার পর, সেই ভঙ্গীতে দু'এক মিনিটকাল স্থির-নিশ্চলভাবে থেকে, পুনরায় ধীরে ধীরে প্রশ্বাস-ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে পা দুটিকে ক্রমশঃ উর্দ্ধে থেকে সটান-সিধা এবং নিবিড়ভাবে পাশাপাশি একত্রে জোড়া রেখে নীচে নামিয়ে আনবেন ও অবশেষে ব্যায়ামটি গোড়াতে সুরু করবার সময় যেমনভাবে সারা দেহটিকে সুপ্রসারিত করে সমতল মেঝে, তক্তপোষ বা চওড়া-বেঞ্চের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে ছিলেন, অবিকল তেমনি ভঙ্গীতে ফিরে এসে সামান্যক্ষণ স্থির-নিশ্চলভাবে অবস্থান করবেন। এমনিভাবে প্রত্যহ অন্ততঃপক্ষে দশ-বারোবার ব্যায়ামের এই বিশেষ-ভঙ্গীটি সযত্নে অভ্যাস করলেই, উদ্দেশ্য সফল হবে।

পার্শ্বে ১৪নং ছবির ব্যায়ামানুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি বিশেষ-ধরণের ব্যায়াম-ভঙ্গীও নিত্য-নিয়মিত অভ্যাস করা প্রয়োজন। উপরের ছবিতে যেমন নমুনা দেখানো হয়েছে, ঠিক তেমনি ভঙ্গীতে ঘরের সমতল মেঝে কিম্বা মজবুত

তক্তপোষ বা চওড়া-বেঞ্চের উপরে দেহটিকে খাড়াখাড়িভাবে রেখে বসে, দুই পা সামনের দিকে সটান-সোজা সুপ্রসারিত করে দিন এবং দুই হাত মাথার দুই পাশে সটান-সিধা ঊর্দ্ধে তুলে রাখুন। তারপর ধীরে ধীরে নিশ্বাস-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে উপরের ছবির নমুনামতো ভঙ্গীতে ঊর্দ্ধে-উত্থিত হাত ও মাথা থেকে কোমর পর্য্যন্ত দেহের ঊর্দ্ধাংশ বাকিয়ে দুই হাত পাশাপাশি সম্প্রসারিত করে ক্রমশঃ দুই পায়ের আঙুল স্পর্শ করুন এবং এমনিভাবে সামান্য দু'এক মিনিটকাল স্থির-নিশ্চল অবস্থায় থাকবার পর, পুনরায় ধীরে ধীরে নিশ্বাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে দুই পায়ের আঙুল থেকে হাত দুটিকে সরিয়ে নিয়ে দেহের ঊর্দ্ধাংশ ক্রমশঃ সোজা করে, দুই হাত মাথার দুইপাশে খাড়াখাড়িভাবে ঊর্দ্ধে তুলে সটান-সিধা ভঙ্গীতে বসুন। এভাবে দু'এক মিনিটকাল স্থির-নিশ্চল বসে থাকার পর, পুনরায় দেহের ঊর্দ্ধাংশ বাঁকিয়ে পূর্ব্বোক্ত পদ্ধতিতে দুই হাত দিয়ে দুই পায়ের আঙুল স্পর্শ করুন ও আবার হাত দুখানি পায়ের আঙুলের উপর থেকে মাথার দুই পাশে উঁচু করে তুলে আগের বারের মতোই দেহটি সিধা-খাড়া-সটানভাবে রেখে স্থির হয়ে বসুন। এইভাবে দেহ বাঁকানো ও সিধা করা ব্যায়াম-ভঙ্গীটি নিত্য-নিয়মিতভাবে সযত্নে অভ্যাস করতে হবে—অন্ততঃপক্ষে, বারো থেকে ষোলো বার।

আপাততঃ, এই পর্য্যন্তই…আগামী সংখ্যায় রূপচর্চ্চার আরো কয়েকটি অত্যাবশ্যকীয়-প্রসঙ্গ আলোচনা করবার ইচ্ছা রইলো।

——

হাতের কাজ

কাগজের ছায়া-প্রতিলিপি রচনা

রুচিরা দেবী

বাড়ীতে সুদৃশ্য ফ্রেমে বাঁধিয়ে প্রিয়জনের প্রতিলিপি সাজিয়ে রাখতে সকলেই ভালবাসেন। এ সব প্রতিলিপি সচরাচর 'ফটোগ্রাফ' (Photograph) বা 'তৈল-চিত্র' (Oil Painting), জল-রঙে আঁকা ছবি (Water-colour Sketch), রঙীণ 'প্যাস্টেল্' (Coloured Pastel Portraits), পেন্সিল কিম্বা কালি-কলমের নক্সা (Pencil or Pen & Ink Sketches) প্রভৃতি বিভিন্ন পদ্ধতিতে রচিত হয়ে থাকে। এছাড়াও কিন্তু আরেকটি সহজ-সরল-অনায়াসসাধ্য অভিনব-পদ্ধতিতে এবং নিতান্ত ঘরোয়া ধরণের অল্প কয়েকটি সাজ-সরঞ্জামের সহায়তায় শিল্পকলানুরাগিণী যে কোনো মহিলাই সামান্য চেষ্টাতে সংসারের দৈনন্দিন কাজকর্মের অবসরে নিজের হাতে কাজ করে বিচিত্র-অপরূপ সৌখিন-ছাঁদে আত্মীয় বন্ধু-প্রিয়জনদের বিবিধ প্রকার প্রতিলিপি বানাতে পারেন। আপাততঃ প্রতিলিপি-রচনার সেই বিচিত্র-অভিনব বিশেষ-ধরণের পদ্ধতিটির মোটামুটি পরিচয় দিচ্ছি। ইংরাজীতে বিশেষ-ধরণের এই প্রতিলিপি-রচনা-পদ্ধতিটির নাম দেওয়া হয়েছে—'Paper-made Silhonette Portrait's বা 'কাগজের ছায়া-প্রতিলিপি রচনা'।

এ পদ্ধতিতে প্রতিলিপি-রচনার সাধারণ-রীতি হলো,—উপরের 'ক'-চিহ্নিত ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনি ধরণের একটি 'Profile Photograph of a human head' বা 'মানুষের মুখের পার্শ্বদৃশ্য'—অর্থাৎ, পাশ থেকে দেখলে মানুষের মুখের চেহারা যেমন দেখায়, অবিকল সেই

ভঙ্গীতে তোলা যে কোনো প্রিয়জনের ফটোগ্রাফ সংগ্রহ করে, নীচের ২নং ছবির নমুনা অনুসারে সেটিকে ঘরের সমতল মেঝে (Level Floor of the room), কাঠের
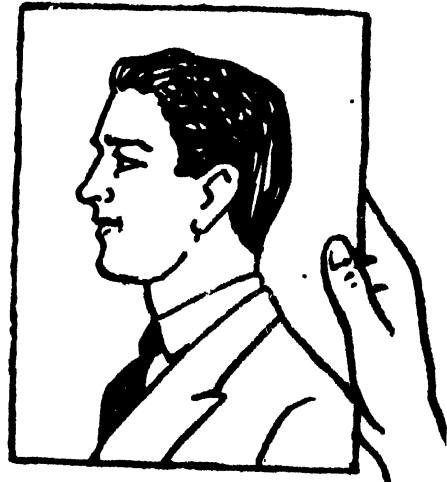
পাটা (Wooden Board) অথবা টেবিলের উপর সমানভাবে (Flat) বিছিয়ে রেখে ভালো পেন্সিল বা

২

কালি-কলমের রেখা টেনে পাতলা-স্বচ্ছ একখানি 'ট্রেসিং-

পেপারের' (a sheet of thin and transparent Tracing-Paper) বুকে আগাগোড়া নিখুঁত-পরিপাটি ছাঁদে কেবলমাত্র ঐ ফটোগ্রাফে-মুদ্রিত মানুষের মুখের বাইরের চারিদিকের (Outline Sketch of the human head and shoulder etc.) অংশটুকু এঁকে নিন। তারপর 'মানুষের মুখের বাইরের অংশের' ছাঁদ-আঁকা সেই 'ট্রেসিং-পেপারটিকে' ঈষৎ পুরু আরেকখানি শাদা কাগজের উপর সমানভাবে (Flat) বিছিয়ে রেখে, উভয়-কাগজের মধ্যে সযত্নে পরিষ্কার একখানি 'কার্ব্বন-কাগজ' (Carbon-Paper) পেতে, পরিপাটি-নিখুঁতভাবে পেন্সিলের রেখা টেনে, পূর্ব্বোক্ত ফটোগ্রাফ থেকে 'ট্রেসিং' করে রাখা মানুষের মুখের চেহারার খসড়া-চিত্রের (Outline Tracing-Sketch of the human head) প্রতিলিপিটিকে আগাগোড়া সুস্পষ্টরূপে এঁকে নিতে হবে। তাহলেই বেশ সহজ-উপায়ে শাদা-কাগজখানির উপর পূর্ব্বোক্ত ফটোগ্রাফটির হুবহু প্রতিলিপি (Exact Representation) আগাগোড়া নিখুঁত-পরিপাটি ছাঁদে নকল করে (Copy) নেওয়া যাবে।

চিত্রাঙ্কনে যাঁদের দক্ষতা অল্প, তাঁদের পক্ষে অবশ্য উপরোক্ত-পদ্ধতিতে 'মানুষের মুখের পার্শ্বচিত্র' বা 'Profile Sketch of the human head' রচনা করাই বিশেষ সুবিধাজনক এবং অনায়াসসাধ্য হবে। তবে চিত্রাঙ্কন-শিল্পে যাঁরা নিপুণ, পূর্ব্বোক্ত-পদ্ধতি অনুসরণ করার পরিবর্ত্তে আরেক-ধরণের অভিনব-প্রথায় তাঁরা অনায়াসেই প্রয়োজন-মতো ছোট-বড় আকারে এমনিভাবে 'মানুষের মুখের চেহারার' খসড়া-চিত্র রচনা করতে পারেন। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে প্রিয়জনের 'ছায়া-প্রতিলিপি' (Silhonette Partraits) রচনার সহজ-সরল রীতি হলো—নীচের ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, অবিকল তেমনিভাবে ঘরের দেয়াল কিম্বা দরজার সমতল কাঠের পাটার গায়ে প্রয়োজন-মত সাইজের একখানা ঈষৎ-পুরু শাদা কাগজ এটে রেখে, সেই কাগজখানির কিছু দূরে আত্মীয়, বন্ধু বা প্রিয়জন—অর্থাৎ, যাঁর 'ছায়া-প্রতিলিপি' রচনা করতে হবে, তাঁকে স্থিরভাবে টুল, মোড়া বা চেয়ারে বসিয়ে তাঁর মুখের পাশেই সামান্য তফাতে উপরের ছবির নমুনামতো ভঙ্গীতে বেশ জোরালো-আভার একটি আলো জালিয়ে দিলেই, দেয়াল অথবা দরজার গায়ে-আঁটা শাদা-কাগজের উপর দিব্যি সুস্পষ্টভাবে মানুষের মুখের পার্শ্ব-চেহারার ছায়া নজরে পড়বে। সে ছায়াটির রূপ ফুটে উঠবে—উপরের 'খ'-চিহ্নিত ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, অনেকটা ঠিক তেমনি ধরণের। এবারে, ইতিপূর্ব্বে ফটোগ্রাফ থেকে মানুষের মুখের পার্শ্বচিত্রের (Profile Portrait) 'খসড়া-প্রতিলিপি' রচনার সময় পেন্সিল বা কালি-কলমের রেখা টেনে যে-পদ্ধতিতে কাজ করেছিলেন, অবিকল সেই প্রথানুসারে প্রিয়জনের মুখের ছায়া-প্রতিকৃতিটিকে আগাগোড়া নিখুঁত-পরিপাটি ছাঁদে এঁকে নেবেন। তাহলেই, অভিনব-প্রথায় প্রিয়জনের 'ছায়া-প্রতিকৃতি' রচনার প্রাথমিক-পর্ব্বের কাজ শেষ হবে।
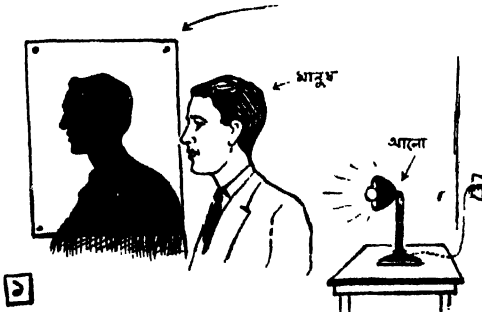
এ কাজের পর, মানুষের মুখের চেহারার 'ছায়া-প্রতিকৃতি' রচনার বাকী কাজগুলি করবার পালা। কিন্তু স্থানাভাবের কারণে, এবারে সে কাজগুলির বিশদ-পরিচয় দেওয়া সম্ভব হলো না। তাই আগামী সংখ্যায় সবিস্তারে সে সব কলা-কৌশলের হদিশ দেবার বাসনা রইলো।

(ক্রমশঃ)
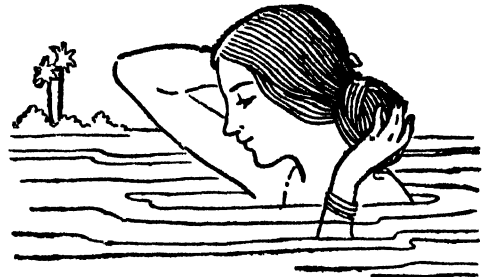
এমব্রয়ডারী-করা সৌখিন ক্যালেণ্ডার

সুলতা মুখোপাধ্যায়

শুধু নিত্য-প্রয়োজনীয় সামগ্রীই নয়, উপরন্তু গৃহ-সজ্জার অন্যতম সৌখিন-উপকরণ হিসাবেও, অনেকেই আজকাল নানা রকম বিচিত্র-সুন্দর অভিনব-কারুকলা-শ্রীমণ্ডিত 'ক্যালেণ্ডার' বা 'দিনপঞ্জী' ব্যবহার করার পক্ষপাতী। তাঁদের সৌখিন-চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে, বাজারে অধুনা কাগজের, কার্ডবোর্ডের, কাঠের, মাদুরের এবং সূতী, রেশমী আর পশমী কাপড়ের তৈরী বিবিধ ধরণের সুন্দর-সুন্দর 'ক্যালেণ্ডার' মেলে প্রচুর। এ সব সৌখিন-সুন্দর 'ক্যালেণ্ডার' সকলেই বেশ পছন্দ করেন এবং অল্প-ব্যয়ে প্রিয়জনদের অভিনব-সামগ্রী উপহার দিয়ে পরিতুষ্ট করবার পক্ষেও এগুলি বিশেষ উপযোগী। ঘর-সংসারের দৈনন্দিন কাজকর্মের অবসরে সচরাচর যে সব মহিলা সূচীশিল্প-চর্চা করেন, তাঁদের সুবিধার জন্য এবারে আমরা সূতী, রেশমী বা পশমী কাপড়ের উপর এমব্রয়ডারী-সেলাইয়ের কাজ করে এমনি ধরণের সৌখিন-সুন্দর 'ক্যালেণ্ডার' রচনার বিচিত্র একটি 'নক্সা-নমুনা' ও কলা-কৌশল সম্বন্ধে মোটামুটি হদিশ দিলুম।

পাশের ছবিতে 'আলঙ্কারিক-কলারীতি' অনুসারে রচিত বিচিত্র-ছাঁদের যে পাখীর 'নক্সা-নমুনাটি' দেখানো হয়েছে, সূতী, রেশমী বা পশমী কাপড়ের বুকে নিখুঁত-পরিপাটি ধরণে এমব্রয়ডারী সূচীশিল্পের কাজ করে, সেটিকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলে সৌখিন-সুন্দর 'ক্যালেণ্ডার' বানাতে হলে, গোড়াতেই প্রয়োজনমতো আকারের বেশ পুরু-মজবুত একখণ্ড কার্ডবোর্ড জোগাড় করা চাই। তারপর 'ক্যালেণ্ডারটির' আকারানুযায়ী-মাপে···অর্থাৎ, সেটি যতখানি লম্বা এবং যতখানি চওড়া সাইজের হবে, তার চেয়ে অন্ততঃপক্ষে তিন-চার ইঞ্চি (চওড়া এবং লম্বা—উভয় দিকেই কার্ডবোর্ডের চারিপাশে মোড়াই করবার উপযোগী কাপড় রেখে) বেশী বা বাড়তি মাপের রঙীন সূতী, রেশমী কিম্বা পশমী কাপড় বেছে নিয়ে, কাপড়টিকে আগাগোড়া পরিপাটি-ছাঁদে ছাঁটাই করে ফেলতে হবে। কার্ডবোর্ডের উপর মোড়বার উপযোগী কাপড়টি যেন বেশ মোটা-ধরণের হয়, সেদিকে বিশেষ নজর রাখা দরকার। এ কাজের জন্য—মোটামুটিভাবে, 'খদ্দর', 'দোসূতী', 'লিনেন', 'ম্যাটে' প্রভৃতি সূতী-বস্ত্র, 'মুগা', 'গরদ', 'এণ্ডি' প্রভৃতি রেশমী-কাপড় এবং 'ফ্ল্যানেল', 'টুইড্' জাতীয় পশমী-কাপড় বিশেষ সুবিধাজনক হবে।

উপকরণাদি সংগ্রহের পালা চুকলে, পছন্দানুযায়ী বিভিন্ন বর্ণের সুতোর 'হালির' সাহায্যে সূতী, রেশমী বা পশমী কাপড়ের উপর আগাগোড়া নিখুঁত-পরিপাটি ছাঁদে পাখীর প্রতিলিপিটিকে প্রয়োজনমতো আকারে এঁকে বা 'ট্রেসিং' করে নিয়ে, এমব্রয়ডারী-সূচীশিল্পের কাজ সুরু করতে হবে।

দৃষ্টান্ত হিসাবে, ধরে নেওয়া যাক্ যে উপরের নক্সা-

নমুনাটি এমব্রয়ডারীর জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে—বিস্কুটে মতো হলুদে-রঙের কাপড়। এ কাপড়ের সঙ্গে চাই— সিকি-ইঞ্চি চওড়া এবং তিন-ইঞ্চি লম্বা খানিকটা লাল-রঙে

ফিতা এবং ঝরঝরে-হরফে ছাপা বা রঙীন কালি দিয়ে সুস্পষ্টাক্ষরে লেখা আনকোরা-নতুন একটি ছোট্ট 'ক্যালেণ্ডার' বা 'দিনপঞ্জীটিকেও' যথাস্থানে বসিয়ে সেলাই করে গেঁথে দিতে হবে।

পাখীর প্রতিলিপিটি এমব্রয়ডারীর জন্য ব্যবহার করবেন—ফিকে-নীল রঙের হালকা-বেগুনী রঙের, 'পেটুনিয়া' ফুলের (Petunia flower) মতো আর 'জেড্'-পাথরের (Jade-stone) মতো রঙের এক-এক 'হালি' বা 'লচ্ছি' পাকা-রঙীন সুতো। এছাড়া আরো চাই—'ক্রীম্' (Cream colour) বা মাখনের মতো রঙের একহালি সুতো।

এমব্রয়ডারী-সূচীশিল্পের কাজটুকু করবেন—আগাগোড়া 'ষ্টেম-ষ্টিচ্' (Stem-stitch) পদ্ধতিতে। পাখীর গা, লেজ এবং ডানার অংশ রচনা করতে হবে ফিকে-নীল রঙের সুতোয়। পাখীর গলার কাছে ও ডানার নক্সাদার অংশগুলি রচনার জন্য ব্যবহার করবেন—'পেটুনিয়া'-রঙের ও 'জেড্'-রঙের সুতো। পাখীর চোখ বানাবেন—ফিকে-নীল আর 'ক্রীম্' বা মাখনের মতো রঙের সুতোয়। পাখীর ঠোঁটের জন্য ব্যবহার করবেন—হাল্কা-বেগুনী রঙের সুতো। পাখীর দেহের নীচেকার দু'পাশের ফুল দুটি এমব্রয়ডারী করতে হবে 'পেটুনিয়া'-রঙের সুতোর সাহায্যে এবং পাতাগুলি রচনার জন্য ব্যবহার করবেন—'জেড্'-রঙের সুতো। পাখীর দেহের আশেপাশে যে সব 'বিন্দু-চিহ্ন' (Dots) রয়েছে, সেগুলি এমব্রয়ডারী করতে হবে—'ক্রীম' বা মাখনের মতো রঙের সুতোয়।

তাহলেই এমব্রয়ডারী-সূচীশিল্পের কাজ করে দিব্যি সহজ উপায়ে পরিপাটি-সুন্দর ছাঁদে পাখীর প্রতিলিপি সমেত কাপড়ের তৈরী সুদৃশ্য ক্যালেণ্ডারটি বানিয়ে তুলতে পারবেন।

—

সুধীরা হালদার

এবারে যে বিচিত্র-মুখরোচক নিরামিষ-জাতীয় খাবার রান্নার কথা বলছি, সেটি ভারতের বিহার-অঞ্চলের অধিবাসীদের বিশেষ প্রিয়। এ খাবারটির নাম—'ছাতুর কচুরি'। বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের এবং আত্মীয়-বন্ধু, অতিথি-অভ্যাগতদের অল্প-খরচে এবং সহজ উপায়ে সুস্বাদু অভিনব এই ধরণের জলখাবার পরিবেষণ করে অনায়াসেই তাঁদের প্রচুর তৃপ্তি দিতে পারবেন।

আপাততঃ, পাঁচ-ছয়জন লোকের আহারের উপযোগী 'ছাতুর কচুরি' রান্নার জন্য যে সব উপকরণ প্রয়োজন, গোড়াতেই তার হদিশ দিই। অর্থাৎ, এ খাবার রান্নার জন্য চাই—আধ সের ময়দা, ছয় ছটাক ছোলা বা যবের ছাতু, এক পোয়া ঘি, আন্দাজমতো পরিমাণে খানিকটা চিনি, নুন এবং অল্প একটু জিরা ও লঙ্কার গুঁড়ো।

উপকরণগুলি সংগ্রহ হবার পর, রান্নার কাজে হাত দেবার আগে, সচরাচর যেমনভাবে লুচির ময়দা মাখা হয়, ঠিক তেমনি পদ্ধতিতে অল্প একটু ঘি ও নুন মিশিয়ে দিয়ে ময়দাটুকু আগাগোড়া বেশ সুষ্ঠুভাবে মেখে নিন এবং উনানের আঁচে রন্ধনপাত্র চাপিয়ে শুকনোভাবে জিরা ও লঙ্কার গুঁড়ো ভেজে রাখুন। এ কাজ সারা হলে, ছাতুর সঙ্গেও আন্দাজমতো পরিমাণে অল্প একটু ঘি, নুন, চিনি, জিরা ও লঙ্কা ভাজার গুঁড়োর সঙ্গে সামান্য একটু জল মিশিয়ে, 'মিশ্রণটিকে' বেশ শক্ত তালের (pulp) মতো করে মেখে ফেলুন।

এবারে সাধারণতঃ লুচি বানানোর সময় যেমন পদ্ধতিতে কাজ করেন, অবিকল তেমনিভাবেই ইতিপূর্বে মেখে-রাখা ময়দার তাল থেকে ছোট-ছোট আকারের লেচি কেটে, সেগুলির ভিতরে সদ্য-মিশ্রিত ছাতুর পুর পুরে সামান্য একটু গুঁড়ো-ময়দা মিশিয়ে, চাকি-বেলনীর সাহায্যে প্রত্যেকটি লেচিকে লুচি বা কচুরির মতো গোল বা ত্রিকোণ ছাঁদে পরিপাটিভাবে বেলে নিন। তারপর উনানের আঁচে রন্ধনপাত্র চাপিয়ে, আন্দাজমতো পরিমাণে ঘি গরম করে নিয়ে, সেই তপ্ত-তরল ঘিয়েতে সদ্য-বেলে-রাখা লুচির মতো গোল বা ত্রিকোণাকার ছাঁদের কচুরিগুলিকে একের পর এক সযত্নে ভেজে নিয়ে, সেগুলিকে পরিষ্কার একটি পাত্রে তুলে রাখুন। তাহলেই দিব্যি সহজ-সরল উপায়ে সুস্বাদু-মুখরোচক 'ছাতুর কচুরি' রান্না করা যাবে।

আগামী সংখ্যায় এমনি ধরণের অভিনব-উপাদেয় আরেকটি ভারতীয় খাবার রান্নার কথা জানাবার চেষ্টা করবো।

—

ম্লান মন্দার

নারায়ণ চক্রবর্তী

মিত্রা,

জেল হাজতের অন্ধকার কোণে বসে আজ আমি তোমাকে হয়তো এই শেষ চিঠি লিখছি,—আমার মনের ভাবনাগুলো শেষবারের মতো তোমার মনের দুয়ারে পৌছে দিচ্ছি। আট মাস আগে কোনো একদিন চিঠির শৃঙ্খল রচনার যে সূচনা হয়েছিল, হয়তো এই চিঠিটা তারই শেষ কড়ি।

চোখ ধাঁধানো রূপ তোমার,—আমার দু'চোখ ঝলসে গিয়েছিল, তাই এতদিন জীবন আর পৃথিবীর পরিষ্কার আর সত্যিকারের স্বরূপ আমার চোখে ধরা পড়ে নি। আমার দু' চোখ ভরে, সারা মন জুড়ে ছিল স্থির বিদ্যুৎশিখার মতো তোমার যৌবনপুষ্পিত দেহলতা।

কিন্তু এই ক'দিনের নিঃসঙ্গ কারাবাসের কঠিন নির্জনতায় আমি আমার আগের দৃষ্টি, আগের মন ফিরে পেয়েছি, এখন অনেক কিছুই স্পষ্ট আর পরিষ্কার হয়ে গেছে আমার কাছে।

তুমি তোমার মা-বাবার নিরাপদ আশ্রয়ে দামি চেয়ারের পুরু গদীতে শরীরের প্রায় আধখানা ডুবিয়ে বসে আমার এই চিঠিখানা যখন পড়বে, তখন হয়তো জেল হাজতের এই বিষণ্ণ ঘরখানার কোণে কোণে যে অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে তার চেয়েও গভীর এক নিরাশার অন্ধকার আস্তে আস্তে আমার সারা মন ছেয়ে ফেলবে।

তুমি ইচ্ছে করলেই চিঠি থেকে চোখ তুলে আকাশের ঘন নীলে তোমার দৃষ্টিকে অবগাহন করাতে পারো, পারো পথ-চলতি রিক্সা-অলার বাঁকা পিঠের নিস্তেজ বক্রতা লক্ষ্য করতে, ইচ্ছে করলেই তোমাদের দামি রেডিওর চাবি টিপে সুরের প্রবাহে মন ভাসিয়ে দিতে পারো, অথবা জানালায় দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনতে পারো রাজপথের অবিরাম শব্দ মিছিল। তুমি স্বাধীন, তুমি মুক্ত।

তোমার কাছে চিঠি লিখতে বসে আমার অবাধ্য মন বারে বারেই আট মাস আগে তোমার আমার প্রথম পরিচয়ের দিনটিতে ফিরে যেতে চায়,—তাকে ফেরাই কি করে বলোতো?

জেলখানার বাইরে আজকের আকাশ মেঘের ভ্রূকুটিতে কালো হয়ে আছে না উজ্জ্বল রদ্দুরের প্রাণময়তায় চনমন করছে তা এখানে বসে ঠিক বুঝতে পারছি না। কিন্তু সে দিন দুপুর দেড়টার সময়ে ইয়ুনিভার্সিটির সামনে কলেজ স্ট্রীটে দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম হাল্কা মেঘে ঢাকা আকাশ যেন অবগুণ্ঠনবতী রূপসীর মতো চাপা হাসি হাসছে। আমি ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিলাম।

ঘটাং ঘটাং শব্দ করতে করতে একটা ট্রাম আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। আমি উঠবার জন্য এগিয়ে গেলাম, ঠিক তখনি ভেতরের ভীড় ঠেলে বাইরে এসে নামবার চেষ্টা করছিলে তুমি। ভীড়ের মধ্যে কোনো ইতর হয়তো অশোভন ভাবে তোমার অঙ্গ স্পর্শ করেছিল, তুমি সেই অপমানের নিরুদ্ধ উত্তেজনায় রাঙা টকটকে মুখে নীচে নামতে গিয়ে হঠাৎ শাড়িতে পা জড়িয়ে ফুটবোর্ড থেকে পড়ে যাচ্ছিলে। আমি তোমাকে ধরে ফেললাম। তোমার ডান পা বেশ একটু মচকে গিয়েছিল, তাই তুমি আমার কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়ালে। তোমার প্রথম স্পর্শের সেই মিষ্টি অনুভূতিটুকু এখনো আমার মনে অটুট হয়ে আছে।

যেমন হয়, একটা হৈ চৈ উঠলো চার ধারে, লোক জন গোল হয়ে ভীড় করে দাঁড়ালো, তার পর আস্তে আস্তে সে ভীড় পাৎলা হয়ে গেল।

আমার বাড়ি ফেরা আর হল না। একটা রিক্সা ডাকলাম, রিক্সা করে তোমাকে মেডিক্যাল কলেজ

হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। তোমার মুখ দেখে বুঝতে পারছিলাম যে খুব যন্ত্রণা হচ্ছে তোমার।

ডাক্তার এসে দেখে শুনে বললেন,—"ও বেশী কিছু নয়, সামান্য স্প্রেইন—"

সূর্য যখন উদাসী বাউলের মতো একতারা বাজিয়ে পৃথিবীর কাছ থেকে বিদায় নেব নেব করছে তখন তোমাদের বাড়ির গেটের সামনে ট্যাক্সি থেকে নামলাম আমরা। তখন তুমি কৃতজ্ঞতাভরা বড়ো বড়ো চোখ দুটি আমার মুখে তুলে ধরলে, পায়ের যন্ত্রণা ভুলে, অল্প হেসে, মিষ্টি সুরে বললে,—"আবার আমাদের দেখা হবে তো?"

সে দিন অতক্ষণ ধরে অত জায়গায় তোমাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরেছিলাম, কিন্তু তুমি সুন্দরী কি কুশ্রী, যৌবনবতী কি অপগতযৌবনা অতশত খুঁটিয়ে ভাববার অবকাশই পাইনি। সমুদ্রের ঢেউ এর মতো একটার পর একটা ঘটনা এসে পড়ছিল। কিন্তু তোমাদের বাড়ির বাগানের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে সদ্য-ফোটা গোলাপের মতো তোমার মুখ যেন সেই প্রথম আমার মনকে মুগ্ধ করল। ঝাউ গাছের মৃদু মর্মর আর অস্ত সূর্যের বাঁকা রাঙা রশ্মি একটা অপরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। আমার প্রাণ মন হঠাৎ যেন গান গেয়ে উঠেছিল:

"প্রহর খানেক আলোয় রাঙা
সে দিন চৈত্র মাস
তোমার চোখে দেখেছিলাম
আমার সর্বনাশ।"

তোমার বাবা বা দাদা তখনো আপিস থেকে ফেরেন নি, বাড়িতে ছিলেন শুধু তোমার মা, তবু তুমি তোমার এই কৌলীন্যবর্জিত সঙ্গীকে সে দিন বাড়ির ভেতরে নিয়ে যেতে পারোনি। বিখ্যাত ব্যারিষ্টার এন, কে, মিত্রের সুরুচি শোভন ড্রইং রুমে আমাকে যে একেবারেই মানাতো না তা বুঝতে একটুও দেরী হয় নি তোমার,—আমার সামাজিক স্তর আমার দু'বার মুচিরঘর ঘুরে-আসা তালিমারা জুতো জোড়ায়, মিলের মোটা ধুতিতে, সস্তা পপলিনের সার্টে স্পষ্ট অক্ষরেই লেখা ছিল। তবু আমাকে একেবারে অস্বীকার করতেও পারো নি তুমি। সহপাঠী মহলে আমার দেহসৌষ্ঠব আর সৌন্দর্যের খ্যাতি ছিল, হয়তো তা-ই তোমার মনে মোহের সঞ্চার করেছিল।

আজ ভাবি সে দিন তোমার জন্য নির্দিষ্টকরা বেবি অষ্টিনটার কলকব্জা না বিগড়ালে তোমার সঙ্গে এভাবে পরিচয়ের কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। কখনো মনে হয় যে দেখা না হলেই বুঝি ভালো হোতো, তা হলে তো তোমাকে ভালোবাসবার এই বিপুল বেদনা আর তোমাকে পাবার সেই তীব্র, সুনিবিড় আনন্দ,—যা বেদনার মতোই ভারী,—তার কোনো আস্বাদই পেতে হত না, জানতেও হত না।

কিন্তু না, কথায় কথায় অনেক দূরে চলে এলাম, সান্নিধ্যের বিদ্যুতাহিত সেই প্রথম মুহূর্তে আবার ফিরে যাই।

কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র, কিন্তু তার মধ্যে যেন যুগ যুগান্ত লুকিয়ে ছিল।

আমি বিদায় চাইলাম। সত্যি বলতে কি-তোমাদের বাগানের ভেতরে সুন্দর ছবির মতো অতি আধুনিক তোমাদের বাড়িটা দেখে বার বার আমাদের বারো বাই সাত বাই এক বি হিদারাম খান্ লেনের অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে থাকা এক রত্তি বাসাটার কথা মনে পড়ছিল। একটা বট গাছ যেমন হাজার হাজার পাখিকে আশ্রয় দেয়, এই বাড়িটাও তেমনি জীবন যুদ্ধে পিছিয়ে পড়া, প্রায় হেরে যাওয়া বহু পরিবারকে আশ্রয় দিয়েছে। এ বাড়ির মেঝের সিমেন্ট ওঠা একটি মাত্র ঘরে মাথা গুঁজে থাকি আমরা মা-বাবা-ভাই-বোনে মিলে সাত জন। অনেক দিন পরে প্রথম যেদিন ভীরু লাজুক পায়ে তোমাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম, সেদিন সব চেয়ে অবাক হয়েছিলাম আলো বাতাসে ভরপুর অগুনতি খালি ঘর দেখে, এ রকম এক একটা ঘরে আমাদের মতো বাস্তুহারা গোটা পরিবার স্বচ্ছন্দে আশ্রয় নিতে পারতো। সম্পদের এই অপচয়ে আমি ব্যথা পেয়েছিলাম মনে।

আর সে দিনই আরও স্পষ্টভাবে বুঝেছিলাম যে তোমাদের জীবনতরী স্বচ্ছলতার নিস্তরঙ্গ নদী বেয়ে মন্দাক্রান্তা তালে বয়ে যায়, আর আমাদের জীবনতরী অভাবের খরস্রোত কুটিল আবর্তে ক্রমাগত পাক খায়,—নিরাপদ বন্দরে উত্তরণের আশা তার নেই।

অবশ্য এ কথাগুলো নিয়ে আজ যেমন ভাবছি, আজ যেমন বুঝছি, সে দিন তেমন ভাবিনি, বুঝিও নি। সব কিছুই ভাসা ভাসা ভাবে, হাল্কা সাদা মেঘের মতো মনের আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, হয়তো তুমি তখন আমার পাশে ছিলে বলে, তোমার মুখ মাথা নেড়ে কথা বলবার সঙ্গে তোমার বব্‌ছাট্‌ চুলের নাচ দেখে মুগ্ধ হচ্ছিলাম বলে, আমার মন নিজের গভীরে তেমন ভাবে তলিয়ে যেতে পারে নি।

রাস্তায় আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায়! বিদায়-বাণী উচ্চারণে তোমার গলাটা যেন একটু কেঁপে উঠেছিল, বলেছিলে,—"সত্যি, আপনি না থাকলে কী যে হ'ত আজ—"

একটু হেসে আমি বলেছিলাম,—"কী আবার হ'ত? আমার বদলে অন্য কেউ থাকতো, নাগরিকের এই সাধারণ কর্তব্যটুকু করতে কেউ ভুলতো না—"

ঝাউ পাতার ফাঁক দিয়ে এক ঝলক রাঙা রোদ আমার বাইশ বছরের উদ্দীপ্ত মুখে এসে পড়েছিল, চোখ তুলে নিঃসঙ্কোচে তুমি তাই দেখছিলে, তোমার চোখে একটা মুগ্ধ ছায়া খেলা করছিল, তুমি বলেছিলে,—'না না, নিছক কর্তব্যের কথা তুলে উপকারকে ছোট করা ঠিক নয়, আপনি বোধহয় কলেজে যাচ্ছিলেন? সত্যি, আমার জন্য আপনার পড়ার খুব ক্ষতি হ'ল—"

বাধা দিয়ে আমি বলেছিলাম,—"না না, মোটেও না, আমার ক্লাশ আজকের মতো শেষ হয়ে গিয়েছিল,—"

"আপনি কি প্রেসিডেন্সীতে—"

"না, ইয়ুনিভার্সিটিতে, এম-এ ফাইন্যাল দিচ্ছি এবার,—বাংলায়—"

খুশীর আলো ছড়িয়ে পড়েছিল তোমার মুখে, নেচে উঠেছিল চঞ্চল চোখের তারা দুটি, উজ্জ্বল মুখে তুমি বলেছিলে,—"আমি পড়ি প্রেসিডেন্সীতে,—ফার্ষ্ট ইয়ার ডিগ্রী কোর্স—"

কেন যেন তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে কৌতূহলী হ'য়ে উঠেছিলাম আমি, বলেছিলাম,—"ও, কলেজে যাচ্ছিলেন বুঝি?"

যদিও ঝাউ গাছ দুটো যথেষ্ট আড়াল রচনা করেছিল, তবু তোমার সাবধানী চোখ দুটো তোমাদের বাড়ির জানালা, ব্যালকনী ছুঁয়ে এলো, বললে,—"না, কলেজে আজ যাই নি, বেরিয়েছিলাম বই কিনতে—"

আমার পড়ুয়া মন বলে উঠলো,—"আরে এ কথা আগে বললেন না কেন? ফেরার পথে কিনে আনা যেত—"

তুমি অবহেলার সঙ্গে বললে—থাক গে, কাউকে দিয়ে আনিয়ে নিলেই হবে—"

এর পরেই আমাদের সব কথা যেন ফুরিয়ে গেল। নিরালা রাস্তায় কোনো সাড়া শব্দ ছিল না, স্তব্ধ সন্ধ্যার বুক থেকে ভেসে আসছিল কয়েকটা নীড়ে-ফেরা পাখির কাকলি। তোমার কাছে থেকে সরে আসতে গিয়ে আমার মনের ভেতরে কেমন একটা যন্ত্রণা অনুভব করছিলাম, তার সত্যিকারের স্বরূপ যে কি—তা ঠিক তক্ষুনি বুঝতে পারি নি। কিন্তু সেই নির্জনতার পরিবেশ থেকে যখন কোলাহল মুখর মহাত্মা গান্ধী রোডে পৌঁছুলাম তখন বুঝলাম যে আমার মনের স্বাধীনতাকে চির-কালের জন্য বিসর্জন দিয়ে এসেছি।

রাতের অন্ধকারে সেই বেদনাকে আমি লালন করেছি, দিনের আলোতে তাকে আমি পালন করেছি, ব্যথার ভারে, হৃদয় ছিঁড়ে পড়তে চাইলেও অমূল্য রত্নের মতো তাকে আমি ধরে রেখেছি।

•

দিনের পর দিন কেটে গেল: আমাদের দুই বিপরীত মেরুর দু'টি নর নারী আপন আপন বৃত্তে ঘুরপাক খেতে লাগলো।

কিন্তু কৌতুক প্রিয় জীবনদেবতা আবার আমাদের দেখা করিয়ে দিলেন। তারপর আবার, আবার—আবার—

যে প্রেমের কথা এতদিন শুধু কাব্যে আর সাহিত্যেই পড়েছি, তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একদিন বিহ্বল, হতচকিত হয়ে গেলাম আমরা দু' জন। আমার কাঁধে মাথা রেখে তুমি বললে,—"তোমাকে ছাড়া বেঁচে থাকার কোনো অর্থ হয় না সুনীল!"

সে দিন আমার সস্তা টুইলের জামা আর তোমার দামি চোলী স্বচ্ছন্দে গায়ে গা লাগিয়েছিল, আমার মিলের মোটা কাপড় ছুঁয়ে থাকতে আপত্তি জানায়নি তোমার কাশ্মীরী সিল্ক এর সাড়ী। লিপষ্টিক মাখা তোমার রাঙা

নরম ঠোঁটের ছোঁয়া সহজে এসে লেগেছিল আমার ঠোঁটে। দুটি শরীর যেন কী এক বিপুল আকর্ষণে পরস্পর সংলগ্ন হয়ে পড়েছিল। আমি ভুলে গিয়েছিলাম নিজেকে, তুমিও তাই। নতুন বর্ণ শ্রমের ব্রাহ্মণ আর অন্ত্যজ এক হতে পেরেছিল কয়েকটি মুহূর্তের জন্য।

তোমার বুকের ঝড় থামলে তুমি বললে,—"এ ভাবে লুকিয়ে চুরিয়ে দু' এক ঘণ্টার দেখায়, আমার মন ভরে না সুনীল—"

তোমার কথায় আমি বাস্তব জগতে ফিরে এলাম, বললাম,—"কিন্তু এ ছাড়া আর উপায় কি মিত্রা?

আমাদের বাড়িতে তোমাকে নিয়ে যেতে পারি, কিন্তু সেখানে নিরালার নিতান্ত অভাব, নিরালার অভাব নেই তোমাদের বাড়িতে, কিন্তু···"

আমার সার্টের বুকের কাছে তোমার মুখ ঘসতে ঘসতে তুমি বললে,—"উপায় একটা বার করেছি সুনীল—"

তোমার ববছাঁট চুলে আঙুল চালাতে চালাতে আমি বললাম,—"কী উপায় মিত্রা?"

তুমি মুখ তুলে বললে,—"বাবাকে বলেছি যে আমি বাংলায় কাঁচা, তাই একজন প্রাইভেট টিউটার দরকার। বাবা তাই শুনে তক্ষুণি অধ্যাপক দাশগুপ্তকে ফোন করতে যাচ্ছিলেন, আমি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললাম,—'না না, ওঁকে বিরক্ত কোরো না বাবা, উনি এখন একটা গবেষণায় ডুবে আছেন, ভীষণ ব্যস্ত। তখন বাবা দাদাকে ডেকে ব্যবস্থা করতে বললেন—"

আমি তোমার বুদ্ধি চাতুর্যে মুগ্ধ হয়ে বললাম,—"তারপর—"

তুমি বললে,—"কিন্তু গোল বেধেছে দাদাকে নিয়ে, উনি কিছুতেই কলেজের অধ্যাপক ছাড়া কাউকে বহাল করবেন না। তাই তোমাকে একটু অভিনয় করতে হবে সুনীল—"

আমি চমকে উঠলাম, বললাম,—"অভিনয়? সে কি!"

তুমি একটু হেসে বললে,—"হ্যাঁ, কাল বিকেলে তোমাকেই দাদার কাছে যেতে হবে অধ্যাপক সেজে, বলতে হবে যে তুমি কোনো এক বেসরকারী কলেজে পড়াও, ব্যস,তা হলেই তিনতলায় আমার নিরিবিলি পড়বার ঘরে শুধু তুমি আর আমি,—কী মজা হবে বলোতো?"

বলতে বলতে তুমি হেসে গড়িয়ে পড়লে।

আমি অবশ্য তোমার কথা শুনে বিশেষ 'মজা' পেলাম না। অবশ্য রোজ দু'ঘণ্টার জন্য তোমার নিবিড় সঙ্গ পাবার সম্ভাবনাটা আমাকে খুবই প্রলুব্ধ করছিল, কিন্তু বড়োলোকের খামখেয়াল মেটাবার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিতে আমার রুচিতে বাধল।

আমাকে নিরুত্তর দেখে তোমার মুখে অভিমানের মেঘ ঘনালো, মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সরে বসলে তুমি, রাতের ময়দানে দূরে দূরে দাঁড়ানো জমাট বাঁধা অন্ধকারের ডেলার মতো রূপসী গাছগুলোর দিকে তাকালে। বেদনার তীব্র কশাঘাতে আমার বুকের ভেতরটা ফালা ফালা হয়ে গেল।

আমাকে রাজী হতে হ'ল।

খুশীর আনন্দে উজ্জ্বল মুখে তুমি আমার মুখের দিকে তাকালে, আরও ঘন হয়ে, আরও নিবিড় হয়ে বসলে,—বললে,—"ভয় নেই তোমার, ইণ্টারভিউ দিতে যাবে একা তুমিই, আর আমিও দাদার পাশেই বসে থাকবো।"

ছোকরা বয়সী অধ্যাপককে দেখে তোমার বিলেত ফেরৎ ডাকসাইটে ইঞ্জিনিয়ার দাদা ভুরু কোঁচকালেন। একমাত্র তোমার সুপারিশের জোরেই শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করলেন যে সত্যিসত্যিই আমি সদ্য পাশ করে বেরিয়ে সুরেন্দ্রনাথ কলেজের নৈশ-বিভাগে বাংলা পড়াই।

তোমাকে পড়াবার ভার পেলাম।

সেদিন তোমার বয়েস ছিল সতেরো, কি আঠারো, আর আমার বাইশ। পরিণাম চিন্তাহীন যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতায় আমরা দু'জন যেন ভেসে গেলা'ম। আমার বাস্তব বুদ্ধির যেটুকু তখনো অবশিষ্ট ছিল ত-ও তোমার আবেগের স্রোতে ভেসে গেল।

বাড়িতে সবার ছোটো বলে যখনি যা চেয়েছ তাই পেয়ে এসেছিলে এতদিন। আবার তোমার ইচ্ছা হ'ল শুধু দু'ঘণ্টার জন্য নয়, আরও বেশী সময়ের জন্য, আরও একান্ত করে, আরও নিবিড় করে আমাকে পেতে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাটাও বুঝেছিলে যে মুখের কথা খসাবামাত্র তোমার এ সাধ মিটবার নয়, বরং উল্টো ফল হওয়াটাই হবে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক,—যা এখন পাচ্ছ তা-ও হারাবে।

আমাদের দু'জনের মাঝখানে যে একটা দুস্তর ব্যবধান

অটল পাষাণপ্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে আছে তা যেন আবার নতুন করে তোমার চোখে পড়ল।

কিন্তু চিরজীবন ধরে যারা শুধু পেয়েই এসেছে তারা এত সহজে হাল ছেড়ে দেয় না, চাওয়ার জিনিষ পাবার চেয়েও বড়ো হয়ে ওঠে চাওয়া ও পাবারমাঝখানকার বাধাটাকে গুঁড়িয়ে ভেঙ্গে ফেলবার দুর্দমনীয় জেদ।

তোমার বেলায়ও তাই হ'ল।

আমি শুধু উপলক্ষ্য ছিলাম। আসলে তোমার এই জেদই তোমাকে বিদ্রোহিনী করল।

মিত্রা, সেদিন তোমার প্রস্তাব শুনে আমি ভয়ে কেঁপে উঠেছিলাম, এর পরিণামের কথা তোমাকে বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করেছিলাম। আমার তোমার ভবিষ্যৎ বিপদের কথাও খুলে বলেছিলাম।

কিন্তু তুমি আমাকে ভুল বুঝলে, আমাকে কাপুরুষ বললে, তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের ধারালো ছুরি দিয়ে আমার মনকে বার বার বিদ্ধ করলে, বললে,—"ম্যারেজ রেজিষ্ট্রি আপিসে গিয়ে দু'জনে সই করবার পর আবার কী ভয় থাকতে পারে সুনীল? কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকলেই মা বাবা দাদা সবার রাগ পড়ে যাবে, তখন ফিরে এলেই হ'ল। এমন তো আজকাল আকছার হচ্ছে। মিছেই তোমার ভয়—'

কিন্তু তুমি ভয়ানক ভুল করেছিলে মিত্রা। নীলরক্তের রাগ অত সহজে পড়ে না, তার প্রতিহিংসা যে কতো তীব্র, কতো ভয়ানক হতে পারে সে বিষয়ে তোমার কোনো ধারণাই ছিল না। তুমি ভুলে গিয়েছিলে যে তোমার বাবা কলকাতার ব্যারিষ্টার সমাজের শিরোমণি।

মিত্রা, তোমার জন্য আবার আমি আগুনে ঝাঁপ দিলাম। তোমাকে বাধা দেব এমন শক্তি আমার কোথায়? তাই আমি ভুলে গেলাম যে আমি বাড়ির বড়ো ছেলে, এম, এ, পাশ করে চাকরীতে ঢুকলে তবেই ছোটো আইবুড়ো বোন দু'টোর বিয়ে হতে পারবে। আমার ওপর নির্ভর করে আছে একটি সহায় সম্বলহীন বাস্তুহারা পরিবার।

মোটা ব্যবস্থাগুলো সবই তুমি করেছিলে। নোটিশ দেওয়া হ'ল। দু'জনে আলাদা আলাদা ভাবে এসে জুটলাম ম্যারেজ রেজিষ্ট্রি আপিসে। তোমার সঙ্গে ছিল সীতেশ।

আইন সঙ্গত বিয়ে হয়ে গেল আমাদের। আমার হাল্কা পাঁচ আনি সোনার আংটিটা তোমার আঙুলে পরিয়ে দিলাম, তুমি মুক্তা বসানো এক ভরির আংটিটা আমার আঙুলে পরিয়ে দিলে।

তার কয়েকদিন পরেই এক মেঘমন্দ্রিত রাতের অন্ধকারে তুমি চলে এলে আমার কাছে। আমরা দু'জন যুগল প্রেমের ছোট্ট তরীতে উঠে জীবন-স্রোতে ভেসে পড়লাম, অনিশ্চিত অজ্ঞাত সুদূর হাতছানি দিল আমাদের।

সেই বিহ্বল মুহূর্তেও বাস্তব প্রয়োজনের কথা ভোলো নি তুমি, আসবার আগে ব্যাঙ্কের পাশ বই থেকে তোমার নামে রাখা কয়েক হাজার টাকা তুলে নিয়ে এলে।

সূর্য তখন ডুবুডুবু। আসন্ন রাত্রির ছায়ার আড়ালে অনন্ত যৌবনা পৃথিবী তার বয়েস লুকিয়ে রেখেছে, আমরা এলাহাবাদ ষ্টেশনে এসে নামলাম। মুঠিগঞ্জে ছোট্ট ছিমছাম একতলা বাড়িতে আমার জীবনের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর ও তীব্র বেদনার কয়েকটি দিন কাটালাম। তীব্র সুখের ভেতরেও যে তীক্ষ্ণ বেদনা লুকিয়ে থাকে তার রহস্য এতদিন অজানাই ছিল আমার কাছে, একান্ত করে কাছে পেয়েও যে কেন মন ভরে ওঠে না, কেন যে একটা গোপন অপরাধবোধের দীর্ঘ ছায়া আমাদের মধুরতম মুহূর্তগুলি বিষাদ করে দিত তার রহস্য ধরতে পারিনি তখন।

তবু সেই দু'মাসের তীব্র আনন্দ-বেদনার স্মৃতি আমার মনে অক্ষয় হয়ে থাকবে। পুরীর সমুদ্রের উচ্ছল উদ্বেলতার মধ্যে তোমারই প্রতিচ্ছবি দেখলাম। তুষারমৌলী হিমালয়ের ধ্যান গম্ভীর বিশালতার মাঝে তোমারই প্রেমকে নতুন করে উপলব্ধি করলাম। অসংখ্য জনপদে তোমার নিত্য-নিয়ত পরিবর্তনশীল মনের চেহারা আমার মনে বর্ণাঢ্য রঙে আঁকা হয়ে গেল।

নিজেকে তুমি নিঃশেষে বিলিয়ে দিলে আমার কাছে। আমিও পরিপূর্ণ ভাবে নিজেকে সমর্পণ করে দিলাম তোমার কাছে।

তারপর একদিন কানপুরের সেই হোটেলের বারান্দা পুলিশের পদধ্বনিতে কেঁপে উঠল।

পড়লাম।

পুলিশের মুখে শুনলাম যে যে-বিয়েকে আমরা আইন-সঙ্গত বলে জেনেছিলাম তা নাকি নিতান্তই বে-আইনী। যৌবনের উচ্ছলতাভরা তোমার শরীর বিপরীত সাক্ষ্য দিলেও তোমার বয়েস নাকি নাবালিকাত্বের গণ্ডী পার হয়নি। তাই বিয়ের দলিলে তোমার সানুরাগ স্বাক্ষরের দাম এক কানাকড়িও নয়।

পুলিশের অতিথি হয়ে আমরা ফিরে এলাম সেই পুরানো কলকাতায়। হাওড়া ষ্টেশনে তোমার বাবা এসেছিলেন। চোখ পাকিয়ে একবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে যেন আমাকে ভস্ম করে দিতে চাইলেন, তারপর তোমার দিকে ফিরে স্নেহ-কোমল চোখে তোমার মুখে তাকিয়ে বললেন,—"মিত্রা, মা আমার—"

আর সঙ্গে সঙ্গে তুমি—তুমি আমার দিকে একবারও না তাকিয়ে, আমার কথা একবারও না ভেবে, ঝাঁপিয়ে পড়লে তাঁর বুকে।

পরদিন কোর্টে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে গড়গড় করে বলে গেলে কি ভাবে তোমার অপরিণত সরল মনের সুযোগ নিয়ে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস আমি তোমাকে প্ররোচিত করেছি, প্রলুব্ধ করেছি।

তুমি তোমার বাবার নিরাপদ আশ্রয়ে যাবার অনুমতি চাইলে।

কোণে বসে আছি, আকাশ পাতাল ভাবছি, তোমার রহস্যময় চরিত্রের দুর্জ্ঞেয় রহস্য উদ্ঘাটন করবার চেষ্টা করছি।

মিত্রা, আজ আমার মনে হচ্ছে যে আমি তোমার কাছে একটা নতুন খেলনার চেয়ে বেশী কিছু ছিলাম না। আমাকে নিয়ে তোমার খেলার নেশা আজ ছুটে গেছে, তাই তুমি এত সহজে আমাকে অন্ধকার ভবিষ্যতের হাতে ছেড়ে দিয়ে তোমার চিরাভ্যস্ত সুখী জীবনে ফিরে যেতে পারলে।

কিন্তু সে দু'মাসের গন্ধ আমার মনে এখনো লেগে আছে, যে দু'মাস তুমি সত্যিই একান্ত করে আমার ছিলে, সেই তুমি আর আজকের তুমি-তে এত তফাৎ কেন মিত্রা? তবে কি সেটাও ছিল তোমার ছলনা?

মিত্রা, আমি আমার অন্ধকার ভবিষ্যৎকে খুশী মনে বরণ করে নেব, তুমি শুধু একবার এসে বলে যাও যে তুমি আমার সঙ্গে ভালোবাসার ভান করো নি, আমাকে নিয়ে নিষ্ঠুর খেলা খেল নি,—একদিন তুমি সত্যিই আমাকে ভালোবেসেছিলে।

তোমার মুখের এই কথাটাই আমার কারাবাসকে স্বর্গবাস করে তুলবে।

মিত্রা তুমি বলো—একটিবার এসে শুধু বলো।

ইতি। সুনীল।

মিথ্যার মোহ

শ্রীজ্ঞান

প্রবন্ধের শিরোনামা দেখে তোমরা বোধ হয় আশ্চর্য্য হচ্ছ! ভাবছ মিথ্যার আবার মোহ কি? কিন্তু সত্যই মিথ্যার একটা মোহ আছে আর সে মোহও খুবই প্রবল এবং অল্প-বিস্তর প্রায় সর্ব্বস্তরের ও সর্ব্ববয়সের লোকই এই মিথ্যার মোহের জালে জড়িয়ে আছে! এই মিথ্যার মোহ আর কিছুই নয়,—এটি হচ্ছে মিথ্যা কথা বলবার ইচ্ছা বা অভ্যাস। আর এ কথা বললে নিশ্চয়ই অত্যুক্তি করা হবে না যে এই মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস অল্প বিস্তর প্রায় শতকরা নিরানব্বই জন লোকেরই আছে! আজকালই দেখা যায় এই মিথ্যা কথা বলার রেওয়াজ এতটা বেড়ে গেছে। আগেকার কালের লোকের কিন্তু এ বদভ্যাস এতটা ছিল না। তখন মানুষের মধ্যে নীতিবোধ ও ধর্ম্মবিশ্বাস বেশী থাকায় লোকে মিথ্যা বলতে সঙ্কুচিত হত, মিথ্যা বলার থেকে যথাসাধ্য বিরত থাকত। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগের এই আধুনিক কালে, এই আণবিক যুগে মানুষের নীতিবোধ ও ধর্ম্মবিশ্বাস অনেক শিথিল হয়ে পড়ায় লোকে আর মিথ্যা কথা বলতে ইতস্ততঃ করে না—অবলীলাক্রমে বলে যায়!

মানুষের এই যে সত্যকে বিকৃত করে বা সম্পূর্ণ অসত্যকে সত্য বলে চালাবার চেষ্টা ও অভ্যাস যে কেন হয়, তার সঠিক কারণ মনোবিজ্ঞানিরাই বলতে পারেন। তবে সাধারণতঃ দেখা যায় মানুষ মিথ্যা বলে প্রধানতঃ দু'টি কারণে। প্রথমটি হচ্ছে কোনও বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে মিথ্যার আশ্রয় নেয় এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে নিজেকে বড় করবার জন্যে অর্থাৎ নিজের প্রকৃত অবস্থা, ক্ষমতা ইত্যাদি ঢেকে রেখে নিজেকে সর্ব্ববিষয়ে বা বিশেষ কোনও বিষয়ে বড় করে দেখিয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করে বাহাদুরী নেওয়া বা কার্য্যোদ্ধার করা। এ ছাড়াও একশ্রেণীর লোক আছে যাদের অভ্যাস-মিথ্যাবাদী বলা চলে। অর্থাৎ তারা কোনও কারণ ছাড়াই মিথ্যাকথা বলে—মিথ্যা কথা বলাটা তাদের এমন একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে যে তারা সত্য কথাটা ঠিক মত বলতে পারে না, মিথ্যা বলে ফেলবেই!

তোমরা যদি একটু লক্ষ্য করে দেখ তাহলে দেখতে পাবে তোমাদের আশে পাশে পরিচিত-অপরিচিত, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন অনেকের মধ্যেই এই অভ্যাস রয়েছে। তবে কারুর বেশী, কারুর কম। তোমাদের মধ্যেও কি এ বদভ্যাস নেই? আছে বই কি! পড়া ঠিক মত না করতে পারার জন্য, পরীক্ষার ফল খারাপ হওয়ার জন্য, কোনও কুকীর্ত্তি ঢাকবার জন্য, প্রায়ই তোমরা মিথ্যা অজুহাত দিয়ে থাক,—তাই নয় কি? তাছাড়া যারা একটু বয়স্ক হয়েছ তারা তো অনেক সময়েই নিজেকে বড় করে সহপাঠী মহলে জাহির করবার জন্য মিথ্যা করে বা বানিয়ে অনেক কিছুই বলে থাক,—বল না কি? ভাল

র ভেবে দেখ তো! এই অভ্যাসই যদি ক্রমশঃ বাড়তে ্কে তাহলে একটা বিশ্রী বদভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। সের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিও যেমন বাড়ে, মিথ্যা বলে নিজেকে ্ করবার আগ্রহ ও মোহও তেমনি বাড়তে থাকে। খন আরও কায়দা করে, আরও নিখুঁত করে এই মিথ্যা া চলতে থাকে। এতে অবশ্য কিছু লাভ যে হয় না নয়। অনেকে হয়ত এই মিথ্যা ধরতে পারে না এবং ই মিথ্যা-কথককে সত্যই একটা কেউকেটা বলে মনে রে।

এই মিথ্যা ভড়ং-এ অনেক কাজ যে হাসিল হয় একথা বশ্য সত্য। তবে সাধারণতঃ দেখা যায় এরূপ মিথ্যা াল অল্প সময়ের জন্য বা স্বল্প-পরিচিত লোকেদের কাছেই বেশী সফল হয়। দীর্ঘদিন ধরে বা অতি পরিচিত লোকেদের কাছে এই চাল বেশী দিন টেঁকে না। আর য়েকবার এই মিথ্যা ধরা পড়ে গেলে তখন 'গুলবাজ' াখ্যাও লাভ করতে হয়। তখন আর কেউ এরূপ ালবাজদের কথা বিশ্বাস করতে চায় না এবং বন্ধু মহলে ও আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে ঠাট্টা বিদ্রূপ প্রভৃতি সহ্য করতে হয়। কিন্তু এই মিথ্যা চালমারার অভ্যাস একবার মজ্জাগত হয়ে গেলে শত ঠাট্টা বিদ্রূপেও এর মোহ থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। তখন একটা মিথ্যা ঢাকতে আর একটা মিথ্যা, তার ওপর আরও মিথ্যা এরকম মিথ্যার পাহাড় জমে গেলেও এবং শত বিদ্রূপবাণেও চৈতন্যোদয় হয় না। তোমাদের নিশ্চয়ই কথামালার সেই রাখালের গল্প মনে আছে। রাখাল প্রায়ই মজা করবার জন্যে মিথ্যা করে তার গরুরপালে বাঘ পড়েছে বলে চিৎকার করে লোক ডাকত; কিন্তু লোকজন সাহায্যের জন্যে ছুটে এসে দেখত রাখাল দাঁত বার করে হাসছে! শেষকালে একদিন যখন সত্য সত্যই রাখালের গরুর পালে বাঘ পড়ল, তখন মিথ্যে মনে করে তার ডাকে আর কেউ সাড়া দিল না, আর রাখালের গরুদের মৃত্যু ঘটল বাঘের কামড়ে,—মিথ্যা বলার উচিত শাস্তি পেল রাখাল! ভারত তথা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য "মহাভারত" যদি তোমরা পড়ে থাক (আগেকার কালে ছেলেমেয়েরা সবাই প্রায় রামায়ণ, মহাভারত পড়ত; এখন কিন্তু সে পাঠ উঠে যাচ্ছে—এটা খুবই দুর্ভাগ্যের!) তাহলে দেখবে তাতে আছে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির, যিনি জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলেন নি, তাঁকেও শুধু একটিমাত্র সত্য কথাকে স্পষ্টভাবে না বলার জন্য একদিন নরক দর্শন করতে হয়েছিল! তাহলে যারা প্রতিদিন শতশত মিথ্যা কথা বলছে কারণে অকারণে, তাদের কাজ কতটা গর্হিত হচ্ছে তা কি বুঝতে পারছ?

মিথ্যা বলা পাপ, মিথ্যা বলা অন্যায় এই বোধ যদি নিজেদের মনে জাগ্রত করতে পার, তাহলে দেখবে মিথ্যা-কথনের প্রবৃত্তি ও প্রবণতা ক্রমশঃই কমে আসছে, আর সত্য-কথনের প্রতি, সত্য বাক্যের প্রতি আকর্ষণ জাগছে, সত্যনিষ্ঠ হওয়ার আগ্রহও অনুভূত হচ্ছে। সত্যের আদর সব সময়েই আছে এবং সত্যবাদীরও বিশেষ সমাদর আছে সমাজে—এ কথাটা মনে রেখে মিথ্যার মোহ থেকে মুক্ত হতে চেষ্টা কর, চেষ্টা কর সব সময়ে সত্য-কথনের সহস্র অসুবিধা সত্ত্বেও এবং তাতে দেখবে তোমাদের মনের মালিন্য ঘুচে গিয়ে তোমাদের মন সত্যের আলোকে ঝলমল করে উঠছে আর অনাবিল আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

***

***
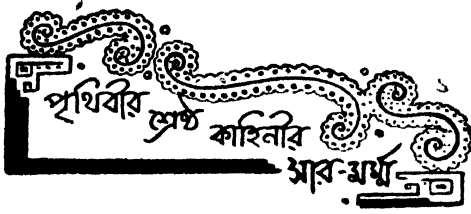
জর্জ্জ এলিয়ট্
রচিত

সাইলাস্ মার্নার্

সৌম্য গুপ্ত

[ইংরাজী সাহিত্যে যে সব মহিলা লেখিকার গল্প-কাহিনী-উপন্যাস বিশ্বের সকল দেশে সকল কালে সমানভাবে সমাদর লাভ করেছে, জর্জ্জ এলিয়ট্ তাঁদের অন্যতম। নামে পুরুষ হলেও, ইনি আসলে কিন্তু পুরুষ নন্···রমণী! এঁর আসল নাম—মেরী অ্যান্ ইভান্স্···জন্ম ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে। 'জর্জ্জ এলিয়ট্' ছদ্মনামে ইনি অনেকগুলি উৎকৃষ্ট উপন্যাস রচনা করে গেছেন। এঁর রচিত—'রোমোলা', 'আডাম্ বীড্', 'দি মিল্ অন্ দি ফ্লস্', 'দি স্প্যানীশ্ জীপসী' এবং 'সাইলাস্ মার্নার্' প্রভৃতি অনবদ্য উপন্যাসগুলি পৃথিবীর কথা-সাহিত্যে অমর হয়ে আছে। মোটামুটিভাবে পাশ্চাত্য দেশের মধ্যবিত্ত এবং অতি সাধারণ দরিদ্র জনগণের জীবনের সুখ-দুঃখ,আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন নিয়েই ইনি উপন্যাস রচনা করেছেন। ১৮৬১ সালে এঁর সুপ্রসিদ্ধ 'সাইলাস্ মার্নার্' উপন্যাস প্রকাশিত হয় এবং অচিরেই বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জ্জন করে। আপাততঃ, তাঁর 'সাইলাস মার্নার্' উপন্যাসের অপরূপ কাহিনীটি সংক্ষেপে তোমাদের বলছি।]

শ্যামল বনের প্রান্তে ছবির মতো সুন্দর—রাভেলো গ্রাম··সেই গ্রামের কোণে ছোট একটি পাহাড়ী-টিলার কোলে নিরালা এক পাথরের কুটিরে বাস করে সাইলাস্ মার্নার্। সাইলাসের পেশা—তাঁতে কাপড় বোনা···ঘরে তাঁত আছে—তাইতে সে কত রকমের কাপড় বোনে। সংসারে তার কেউ নেই···না কোনো আপন-জন, না বন্ধু ··একা থাকে সে ছোট্ট কুটিরটিতে···শুধু ঐ তাঁত ছাড়া পৃথিবীতে তার আর কিছু নেই। দিন-রাত তাঁত চালায় সে···গ্রামের কারো সঙ্গে মেলামেশা করে না। তবে, যদি শোনে—কারো অসুখ করেছে, নিজে যেচে গিয়ে তাকে ওষুধ দেয়, পথ্য দেয়, সেবা-যত্ন করে···গ্রামের লোকে বলে,—আশ্চর্য্য মানুষ!

এ গ্রামে সে আছে আজ প্রায় পনেরো বছর। তাঁতে-বোনা কাপড় বেচে অনেক টাকা রোজগার করে···একলা মানুষ···খাওয়া-পরায় কী বা খরচ···কাজেই, এই পনেরো বছরে সাইলাস্ গিনি-মোহর, অর্থ জমিয়েছে প্রচুর। টাকা জমানো তার যেন নেশা! এ সব সঞ্চিত গিনি-মোহর-টাকা সে সযত্নে লুকিয়ে রাখে—ঘরে যে তাঁত আছে, সেই তাঁতের নীচে···মেঝের ইট-সরিয়ে বানানো এক গর্ত্তে—বড় বড় দুটি চামড়ার তৈরী থলিতে ভরে। রাত্রে শুতে যাবার আগে, মেঝের গর্ত্তের ভিতর থেকে থলি বার করে গিনি মোহরগুলি রোজ সে গোণে···গুণে, আবার থলিতে ভরে গর্ত্তেই লুকিয়ে রাখে—পাছে কেউ জানতে পারে! এই গিনি-মোহর···এই সোনা-দানা তার প্রাণ···এ সব নেড়ে-চেড়ে সে যে সুখ পায়, যে আনন্দ পায়, তেমন আর কিছুতে নয়। মানুষের সঙ্গ···সাইলাসের বিষ মনে হয়, তাই কারো সঙ্গে মেশে না। ভগবানকে একদা সে খুবই মানতো···কিন্তু কি কারণে, জানি না—এখন আর মানে না!

সাইলাস্, কেন যে এমন—তার একটু ইতিহাস আছে। ···পনেরো বছর আগে, সে থাকতো 'ল্যান্টার্ন-ইয়ার্ড' নামে অন্য এক গ্রামে···বয়সে তখন সে জোয়ান···ধর্ম্মে-কর্ম্মেও মতি ছিল বেশ···গ্রামের গির্জ্জাতেও ছিল যাতায়াত··· মানুষ-জনের উপরেও ছিল স্নেহ ভালবাসা দরদ। তার তখন এক বন্ধু ছিল···নাম—'উইলিয়াম্ ডেন'···সাইলাসের ছিল বন্ধু-অন্ত প্রাণ! সাইলাস্ তখন 'সারা' নামে একটি মেয়েকে বিয়ে করবে বলে পাকা কথা দিয়েছিল···এমন সময় ঘটলো এক ঘটনা!

গির্জ্জার পাদ্রীর হলো শক্ত অসুখ···গ্রামের আর পাঁচজনের মতোই সাইলাস্ আর তার বন্ধু ডেন দিন-রাত

রুগ্ন পাদ্রীর কাছে থেকে সেবা করতো। একদিন অনেক রাত অবধি সাইলাস্ মুমূর্ষু পাদ্রীর রোগশয্যার শিয়রে বসে—বন্ধু ডেনের আসবার প্রতীক্ষায়···বাকী রাতটুকু বন্ধুরই সেবা করার পালা, অথচ ডেনের দেখা নেই! সারা রাত সাইলাসের জেগে কাটলো···ভোরের বেলা সাইলাস্ দেখে—সর্বনাশ!···শেষ রাতেই পাদ্রী কখন যে নিঃশব্দে ইহলোক ছেড়ে মৃত্যুলোকে মহাপ্রয়াণ করেছেন, তার এতটুকু হদিশ পর্য্যন্ত মেলেনি! আচম্কা এমন ঘটনা ঘটতে দেখে, ভয়ে ভাবনায় আকুল হয়ে সাইলাস্ তাড়াতাড়ি ছুটে গেল গ্রামের লোকজনকে এ খবর জানাতে। লোকজন এসে দেখে—পাদ্রী তো মারা গেছেনই, সেই সঙ্গে পাদ্রীর বিছানার পাশে সিন্দুকের ভিতরে গির্জ্জার যত টাকাকড়ি থাকতো থলিতে ভরা, সে থলিও নেই··· উপরন্তু, ঘরের মেঝেতে পড়ে রয়েছে সাইলাসের ছুরিখানা!

ব্যাপার দেখে গ্রামের লোকজনের সন্দেহ হলো·· সবাই বললে,—এ নিশ্চয় সাইলাসের কারসাজি···মুমূর্ষু অসহায় পাদ্রীকে খুন করে সে গির্জ্জার টাকাকড়ি চুরি করেছে!·· সাইলাস্ ভগবানের নামে শপথ করে জানালো,—সে নির্দোষ···এ ছুরি ডেন চেয়ে নিয়েছিল তার কাছ থেকে।

কিন্তু কে শোনে, সে কথা! সাইলাস্ বেচারীকে দোষী সাব্যস্ত করে গ্রামের লোকজনেরা তাকে গির্জ্জা থেকে তাড়িয়ে দিলে। সারার সঙ্গে সাইলাসের বিয়ে গেল ভেঙ্গে···চোরকে বিয়ে করতে সারা রাজী নয়···সে বিয়ে করলো সাইলাসের বন্ধু ডেনকে।

এই ঘটনার ফলে, ভগবানের উপর সাইলাসের বিশ্বাস রইলো না বিন্দুমাত্র। তার ধারণা হলো—ভগবান মিথ্যা! ···মানুষের উপরেও সাইলাসের ঘৃণা জন্মালো অপরিসীম! 'ল্যাণ্টার্ণ-ইয়ার্ড্' গ্রামের পুরোনো আশ্রয় ছেড়ে সাইলাস্ এসে তখন নতুন বাসা বাঁধলো এই রাভেলো গ্রামে···সেই থেকে এখানেই সে রয়েছে আজ সুদীর্ঘ পনেরো বছর।

রাভেলো গ্রামের জমীদার ক্যাস্··রীতিমত কড়া রাশভারী মানুষ। জমীদার ক্যাস্ বিপত্নীক···সংসারে তাঁর দুটি ছেলে ছাড়া আর কেউ নেই। বড়ছেলের নাম—গড্‌ফ্রে···ছেলেটি খুবই ভদ্র-শান্ত, বাধ্য, বিনয়ী। কিন্তু ছোটছেলে ডান্‌সি—ঠিক তার বিপরীত··যেমন বেয়াড়া বদমায়েশ, তেমনি মাতাল, জুয়াড়ী, ফন্দীবাজ!···দুই ছেলেই বড় হয়েছে। জমীদারের ইচ্ছা—গড্‌ফ্রের বিয়ে দেবেন গ্রামেরই এক বোনেদী ঘরের সুন্দরী কন্যা ন্যান্সী লামেটারের সঙ্গে। কিন্তু মুস্কিলে পড়েছে বেচারী গড্‌ফ্রে। জমীদারের অজান্তে লুকিয়ে সে বিয়ে করে বসেছে গাঁয়ের এক ছোট-ঘরের মেয়ে মলি ফারেন্‌কে···তাদের একটি ফুটফুটে সুন্দর ছোট্ট মেয়েও হয়েছে ইতিমধ্যে। এ খবর গ্রামের কেউ জানে না···জানে শুধু ডান্‌সি। ফন্দীবাজ শয়তান ডান্‌সি কিন্তু এ খবরটুকু জেনে, নিজের বেশ সুবিধা করে নিয়েছে ··অর্থাৎ, নিত্য জুয়াখেলা আর মদের নেশার জন্য ডান্‌সির চাই মুঠো-মুঠো টাকা, অথচ জমীদারবাবার কাছে ঘেঁশবার সাহস নেই···তাই সে বড়ভাই গড্‌ফ্রেকে এই গোপন বিবাহের কথা ফাঁশ করে দেবার ভয় দেখিয়ে প্রায়ই মোটা মোটা টাকা আদায় করে।

একদিন জমীদারের প্রজা ফাউলার্ এসে বড়ছেলে গড্‌ফ্রের হাতে খাজনার টাকা দিয়ে গেছে—সে টাকা গড্‌ফ্রে বাপের হাতে জমা দেবে, এমন সময় ডান্‌সি এসে ধরলো,—টাকা চাই, এখুনি···নইলে বিয়ের কথা ফাঁশ করে দেবো!

গড্‌ফ্রে বেচারী পড়লো বিপদে!···ডানসি কিন্তু নাছোড়বান্দা···সে মতলব দিলে—গড্‌ফ্রের সখের ঘোড়া উইণ্ড্-ফায়ারকে পাশের গ্রামের ঘোড়াওয়ালা ব্রাইসের আস্তাবলে বেচে দিয়ে জমীদারের পাওনা খাজনার টাকার ব্যবস্থা করার জন্য। নিরুপায় হয়ে গড্‌ফ্রে বেচারী ফন্দীবাজ ছোটভাইয়ের জিম্মায় নিজের সাধের ঘোড়াটিকে সঁপে দিলে। জুলুম চালিয়ে ঘোড়া আদায় করে, সেই ঘোড়ায় চড়ে মনের আনন্দে ডান্‌সি বেরুলো স্ফূর্ত্তি করতে। কিন্তু বাড়ী ছেড়ে পথে বেরিয়েই ডান্‌সি এমন বেপরোয়াভাবে ছোটালো যে শেষে বেটক্করে পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়ে সে ঘোড়া পথেই প্রাণ হারালো।

কাজেই ঘোড়া আর পৌঁছানো হলো না ব্রাইসের আস্তাবলে···ঘোড়া হারিয়ে মনের দুঃখে নেশায় বুঁদ হয়ে ডান্‌সি টলতে টলতে হেঁটে চললো বাড়ীর দিকে।

সবে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে তখন···হঠাৎ কালো মেঘে

আকাশ ছেয়ে মুষলধারে নামলো বৃষ্টি! সে বৃষ্টিতে ভিজে ভান্সি যখন বাড়ীর পথে এগিয়ে চলেছে, এমন সময় নজরে পড়লো দূরে সাইলাসের কুটির ··কুটিরের ভিতরে আলো জ্বলছে···সদর দরজাটাও খোলা। ভান্সি সটান্ এগিয়ে এসে ঢুকলো সেই ঘরে। দেখে—সাইলাস্ ঘরে নেই! ভান্সির হঠাৎ মনে পড়লো—সাইলাসের সঞ্চিত গিনি-মোহরের কথা···সন্ধান করতেই মিললো তাঁতের নীচের সেই গর্ত···আর দুটি থলি-ভর্তি গিনি-মোহর! নিঃশব্দে গর্ত থেকে মোহরের থলি দুটি সরিয়ে রাতের সেই দুর্য্যোগ অন্ধকারেই ভান্সি বেরুলো পথে···তারপর চকিতে কোথায় যে অদৃশ্য হলো, কে জানে!

ভান্সি অদৃশ্য হবার সঙ্গে সঙ্গেই হাতে লণ্ঠন নিয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ঘরে ফিরলো সাইলাস্। ঘরে ঢুকেই দেখে সব ছড়ানো···লণ্ডভণ্ড ব্যাপার! হঠাৎ নজরে পড়লো—তাঁতের নীচেকার গর্ত খালি···মোহরের থলি দুটিও নেই! [ক্রমশঃ

—

চিত্রগুপ্ত

এবারে শোনো—বিজ্ঞানের বিচিত্র কলা-কৌশলের সাহায্যে আজব মজার আরেকটি কারসাজি দেখানোর কথা বলছি।

ধরো, বাড়ীতে হঠাৎ কোনো জরুরী চিঠিপত্র বা প্যাকেট ওজন করে চটপট ডাকঘরে পাঠানো দরকার হলো···অথচ হাতের কাছে তখন ছোটখাট জিনিষ যথাযথভাবে ওজন করে দেখবার মতো সাজ-সরঞ্জাম নেই ·· তাছাড়া পোষ্ট-অফিসেও আজকাল হামেশাই লোকজনের যে দারুণ ভীড় জমে, সে ভীড়ে দীর্ঘকাল 'লাইন' দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকাও রীতিমত কষ্টকর এবং এভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা 'লাইনে' দাঁড়িয়ে থাকার পর, সময়াভাবে বা সুযোগ ফশ্‌কে যাবার ফলে, জরুরী চিঠিপত্র কিম্বা প্যাকেটটি যদি সেদিন আর ডাকে পাঠানো সম্ভব না হয়ে ওঠে শেষ পর্য্যন্ত, তাহলে শুধু মনস্তাপ আর দুর্ভোগই নয়, লোকসানও ঘটে রীতিমত। কাজেই এ হাঙ্গামা থেকে রেহাই পেতে হলে, বিজ্ঞানের সহজ-সরল বিচিত্র কলা-কৌশলের সহায়তায় এবং নিতান্ত ঘরোয়া-ধরণের সামান্য কয়েকটি সাজ-সরঞ্জামের দৌলতে, ওজন-দাঁড়ির অভাবেও তোমরা অনায়াসেই বাড়ীতে বসে নিজেদের হাতে-গড়া অভিনব-ছাঁদের ওজন-কলের সাহায্যে ডাকে-পাঠানোর যাবতীয় জরুরী চিঠিপত্র বা প্যাকেট চটপট ওজন করে নিতে পারো—আপাততঃ, তারই হদিশ দিচ্ছি।

সুষ্ঠুভাবে এ কাজ হাসিল করতে হলে, বিজ্ঞানের বিচিত্র কলা-কৌশলগুলি আরম্ভ করার আগে, অভিনব-ছাঁদের 'ওজন-দাঁড়ি' (Weighing Scale) বানানোর সাজ-সরঞ্জাম সব জোগাড় করে নেওয়া দরকার। গোড়াতেই বলেছি—এ সব সাজ-সরঞ্জামের প্রত্যেকটি হলো নিতান্তই ঘরোয়া-সামগ্রী···কাজেই সামান্য চেষ্টা করলেই, তোমাদের সকলের বাড়ীতেই এ সব সামগ্রী সহজেই মিলবে। অর্থাৎ, বিজ্ঞানের এই আজব কারসাজির জন্য চাই—চওড়া-মুখওয়ালা বড় বা মাঝারি সাইজের একটি কাঁচের বোতল, সাধারণ পর্দ্দা-খাটানোর দণ্ড বা 'ফুট-রুলের' (Foot Ruler) মতো ছাঁদের লম্বা ও গোলাকৃতি একটি কাঠের ডাণ্ডা, এক টুকরো সীসা (a piece of Lead), এক গামলা জল এবং বোতলের মুখের উপরে ঢাকা-দেবার উপযোগী গোলাকার একটি কার্ডবোর্ডের চাকতি।

ফর্দ্দমতো উপকরণগুলি সংগ্রহ হবার পর, ২৩০নং পৃষ্ঠার ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, অবিকল তেমনি ধরণে লম্বা ও গোলাকৃতি কাঠের ডাণ্ডার উপর-প্রান্তে কাঁটা-পেরেক কিম্বা আলপিন দিয়ে কার্ডবোর্ডের গোল-চাকতিটিকে পাকাপাকিভাবে এঁটে বসিয়ে দিতে হবে এবং সেই সঙ্গে ঐ কাঠের ডাণ্ডাটির নীচের প্রান্তেও সুতোর সাহায্যে সীসার টুকরোটিকে বেশ মজবুত-উপায়ে
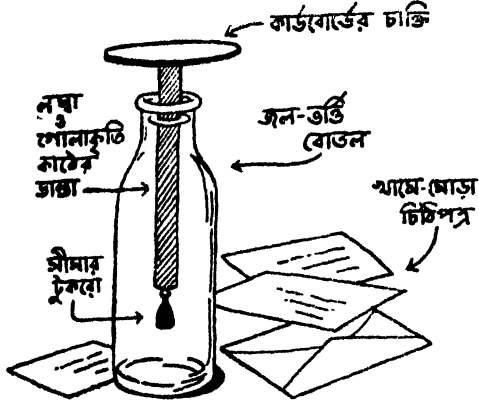
...রে ঝুলিয়ে, ডাণ্ডা-সমেত সুতো-বাঁধা সীসার টুকরোটিকে কাঁচের বোতলের মধ্যে রেখে, বোতলটিতে জল ভর্ত্তি করতে হবে। বোতলটি আগাগোড়া এমনিভাবে জল-ভর্ত্তি করে নেবার পর, এ্যালোপ্যাথিক ওষুধের দোকান-দাররা মিক্সচারের শিশির গায়ে সরু কাগজের ফালি ছাঁটাই করে বিচিত্র কায়দায় যেভাবে প্রতি বারের ঔষধ-সেবনের যে মাত্রার দাগ রচনা করে থাকেন, অবিকল ঠিক তেমনি পদ্ধতিতে তোমাদের চিঠিপত্র বা প্যাকেট ওজন করবার হিসাব অনুসারে আউন্স, গ্রাম অথবা তোলার অঙ্কগুলি সঠিক-ধরণের সুচিহ্নিত করে পরিপাটি এক-ফালি কাগজের লেবেল এঁটে দাও। তাহলেই দিব্যি সহজ-সরল উপায়ে তোমরা অভিনব-ছাঁদের এই ঘরোয়া 'ওজন-দাঁড়িটি' বানিয়ে নিতে পারবে এবং সেটির সাহায্যে অনায়াসেই এবং সঠিকভাবে যে কোনো চিঠিপত্র পার্শেলের প্যাকেট, এমন কি, ছোটখাট জিনিষপত্রও ওজন পরীক্ষা করে দেখা চলবে।

মোটামুটিভাবে, বিজ্ঞানের বিচিত্র কলা-কৌশলের সাহায্যে এবং নিতান্ত ঘরোয়া সামান্য কয়েকটি টুকিটাকি সামগ্রী ব্যবহার করে এমনি সহজ-সরল উপায়ে দিব্যি চমৎকার 'ওজন-দাঁড়ি' বানানো যাবে।

আগামী সংখ্যায় আরেকটি মজার খেলার কথা জানাবার বাসনা রইলো।

— •

মনোহর মৈত্র

১। দেশলাই-কাঠি সাজানোর আজব হেঁয়ালী :
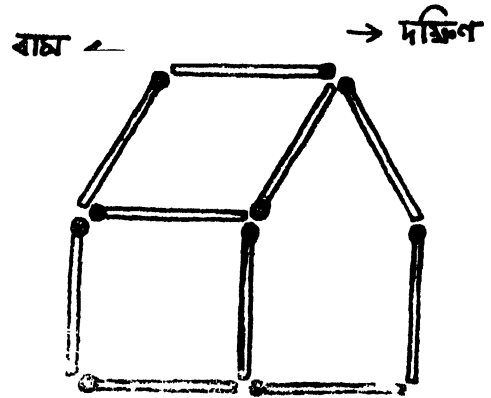
উপরের ছবিতে বিচিত্র কায়দায় দশটি দেশলাই-কাঠি সাজিয়ে যে কুটিরটি রচনা করা হয়েছে, সেটির সুমুখ-ভাগটি রয়েছে দক্ষিণ-দিকে। ধরো, যদি কেউ তোমাকে বলে যে, ঐ দেশলাই-কাঠি যেমনভাবে সাজানো রয়েছে, মোটামুটি তেমনি ধরণটি যথাযথ বজায় রেখে, কেবল মাত্র দুটি কাঠিকে সরিয়ে-নড়িয়ে সামান্য একটু স্থান-পরিবর্তন করে নিজের মগজের বুদ্ধি খাটিয়ে এমন কোনো নতুন-কায়দায় সাজাতে পারো কি—যাতে কুটিরের সুমুখ-ভাগটি সহজেই দক্ষিণের বদলে বাম-দিকে দেখানো যায়?...তাহলে তুমি কি জবাব দেবে...অর্থাৎ, কোন দুটি দেশলাই-কাঠিকে স্থান-পরিবর্তন করে কিভাবে সাজিয়ে

বসাবে—তার সঠিক হদিশ যদি চটপট একটুকরো কাগজে ছকে ফেলে, সেই কাগজখানি আমাদের দপ্তরে পাঠিয়ে দিতে পারো তো বুঝবো যে বুদ্ধি তোমার বেশ প্রখর হয়ে উঠেছে দিনে-দিনে। এ হেঁয়ালির সঠিক মীমাংসা করতে পারলে, পুরস্কার হিসাবে আগামী সংখ্যায় তোমার নামটি আমরা ছাপার হরফে প্রকাশ করে সবাইকে জানিয়ে দেবো সঙ্গে সঙ্গেই।

২। 'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা :

তিন অক্ষরের একটি শব্দ। প্রথম দুই অক্ষরে বিশেষ এক ধরণের তৃণ বুঝায়, আর বুঝায় রামায়ণে উল্লিখিত বিশেষ একটি চরিত্রের নাম। প্রথম ও তৃতীয় অক্ষর মিলে বুঝায়—বিশেষ এক ধরণের ফল। বলো তো—শব্দটি কি ?

রচনা : গৌতম ঘোষ (কলিকাতা)

৩।

আমাতে আছি আমি,
নিজেতে নাই।
কাননে আছি আমি,
বনেতে নাই।
তারকায় আছি আমি,
চাঁদেতে নাই,
শশধর মাঝে আছি,
তপনেতে নাই।
সদাই রয়েছি আমি
মাথার উপর,
বুদ্ধি করে বলো দেখি,
কিবা নাম মোর।

রচনা : পরেশচন্দ্র মজুমদার (ওকরাবাড়ী)

গতমাসের ধাঁধা ও হেঁয়ালীর উত্তর :

১।
```
   ১১৭
   ৩৯৯
  ----
  ১০৫৩
  ১১৭
 ৩৫১
 -----
 ৩৭৩২৩
```

২। বাগান

৩। পিসি (pc) বা জেটি (jt)

গতমাসের তিনটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

কুলু মিত্র (কলিকাতা), সৌরাংশু ও বিজয়া আচার্য্য (কলিকাতা), পুতুল, সুমা, হাবলু ও টাবলু (হাওড়া), রিনি ও রনি মুখোপাধ্যায় (কাইরো), রানা ও বুনা (কলিকাতা), বাপি, বুতাম ও পিন্টু গঙ্গোপাধ্যায় (বোম্বাই), পুপু ও ভুটন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), কবি, লাড্ডু ও অমিতাভ হালদার (পানাগড়), মিঠু ও বুবু গুপ্ত (কলিকাতা), পৃথ্বীশ ও মনতোষ মজুমদার (বর্দ্ধমান), আশুতোষ সান্যাল (চাকদহ), অমিয়, প্রশান্ত, অমৃত, মৃণাল, কৃষ্ণলাল, অসীম, সুনীত, রাণা ও হরিদাস (গড়িয়া), কালীচরণ, মায়া, গৌর, লিপি, দুর্গা, রেণু ও আশালতা (দিল্লী), সুধা, অবনী, দ্বিজেন, রথীন ও দেবী (পাটনা), মুক্তি, বিন্নু, রামু, মেনী, সুধীর, গিলু ও সমীর (হাজারীবাগ), রিতা, রাহুল ও সিদ্ধার্থ চক্রবর্ত্তী (কলিকাতা)।

গত মাসের দুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

বিশ্বনাথ ও দেবকীনন্দন সিংহ (গয়া), দেববর, মীরা, লীনা ও প্রভাদেব বন্দ্যোপাধ্যায় (বাঙ্গালোর), রতন, খোকন, শ্যামলী ও তোতন (মুর্শিদাবাদ), কুচো ও ঘণ্টু (নবদ্বীপ), অজয় মিত্র (চন্দননগর), দ্বিজেন্দ্রমোহন সরকার (কলিকাতা), গোপালচন্দ্র নাথ (মাণিকপুর), জীবন সরকার (কৃষ্ণনগর), সন্তু, মন্টি, গাব্বু, বুটু সিংহ, দেবী, শিউলী ও পিয়ালী (মদনপুর), কাশীনাথ দে (সারগাছি),

গতমাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

মিহির, সুধাংশু, রজত, কল্যাণ, ইন্দ্রদত্ত, শচীন ও বিমল (কলিকাতা), চন্দ্রশেখর, অরুন্ধতী, মালতী, আরতি, রেখা, বীরেন, রাণী, দাদু ও মমতা (ইন্দোর), গৌতম ও অশোক ঘোষ (কলিকাতা) সোমনাথ পালিত (মজঃফরপুর)।

মানব-সভ্যতার আদি-যুগে প্রাচীন মিশরের সঙ্গীত-কলা সাধক-সাধিকাদের মধ্যে যে সব অভিনব বাদ্যযন্ত্র-সহযোগে বিচিত্র সুর-লহরী সৃষ্টির রেওয়াজ ছিল, তার অন্যতম হলো—অপরূপ-ছাঁদের এই বাঁশী। সেকালের সৌখিন সমাজে এ ধরণের বাঁশীর ছিল রীতিমত কদর।

আর মধ্য-যুগের প্রতীচ্য-সমাজে সুপ্রচলিত ছিল—কতকটা ঠিক 'ম্যাণ্ডোলিনের ছাঁদের তার-যন্ত্র—এই বিচিত্র 'ল্যুট্' (LUTE) বাজনা।

ঢাকের মতো বড়-বড় বিচিত্র-ছাঁদের এই বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার সেই-প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত চলে আসছে আফ্রিকা রাজ্যের আদিম নিগ্রো-সমাজের অধিবাসীদের মধ্যে।

জলমাটির গন্ধ

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

একতলাতেও বসবার ব্যবস্থা আছে। তবু শুভ্রাদের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা দোতলাতেই করেছেন রামগোপাল বাবু। দক্ষিণ খোলা ঘর। ঘরের বাইরে চারদিকে ঘুরানো খোলা বারান্দা। চারিদিকে নিঃশব্দ প্রশস্তি।

ভারি ভালো লাগল শুভ্রার।

তারা ওপরে এসে পৌছবার সঙ্গে সঙ্গে দুটি কিশোরী মেয়ে ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। একটির পরণে নীল রঙের ফ্রক, আর একটির সবুজ। ওদের নিজেদের গায়ের রঙও সুন্দর। মাজা গৌরবর্ণ। কালো চোখে কাজল। কৌতুহলও কম নয়। দীর্ঘ বেণী দুলছে পিঠের ওপর। এই বয়সেই বেশ চুল হয়েছে তো মাথায়! কত আর হবে বয়স। বড়টির বছর বারো ছোটটির দশ বছরের বেশি হবেনা। কিন্তু এরই মধ্যে মাথায় বেশ লম্বা হয়েছে।

রামবাবু নিজের মেয়েদের সঙ্গে শুভ্রা আর কেতকীর পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'একটির নাম হাসি আর একটির নাম খুসি। দেখে অবশ্য তা মনে হবেনা। কী গুরু গম্ভীর দেখেছেন। একটি আমার মা আর একটি মাসীমা। তোমাদের টিচার, প্রণাম করো।'

মেয়ে দুটি এগিয়ে এল। শুভ্রা বাধা দিয়ে বলল, 'না না প্রণাম করতে হবেনা। ও কি, করছ কি তোমরা!

কিন্তু মেয়ে দুটি তাদের করণীয় শেষ করল। শুধু এক জনকে নয় চার জনকেই প্রণাম করতে হল।

কেতকী একটু হেসে বলল 'ওদের জন্যে এ কি শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন?'

রামগোপালবাবু হেসে বললেন, 'শাস্তি কিসের। গুরুজনকে শ্রদ্ধা ভক্তি করতে শিখবেনা? শ্রদ্ধার যা নমুনা দেখছি আজকাল! হাত জোড় করে শুধু নমস্কার জানানো।'

বলে দুখানি যুক্ত হাত নাক পর্যন্ত তুলবার ভঙ্গি করে হাসলেন রামগোপালবাবু।

সোফা কোচে সাজানো ড্রয়িংরুমে বসে কথা হচ্ছিল। রামগোপালবাবু যতই বিনয় করুন, তিনি গ্রাম্য মহাজন

কি ব্যবসায়ী নন। সহরের আসবাব পত্রেই ঘর সাজিয়েছেন। নাগরিক আদব কায়দাও বেশ জানেন।

একটু বাদে পাশের ঘর থেকে একজন বৃদ্ধা মহিলা এসে দাঁড়ালেন। থাটো থান পরণে। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা।

তিনি বললেন, 'রাম, এবার ওঁদের এ ঘরে নিয়ে এসো। না কি এ ঘরেই সব এনে দেবে কুমু?

রামবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন 'না না এ ঘরে কেন। আমরা ও ঘরেই যাচ্ছি, চলুন।'

শুভ্রার দিকে তাকালেন রামবাবু। তারপর বৃদ্ধার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন 'আমার মা।'

একটু আগেই শ্রদ্ধা জানাবার রীতি নিয়ে কথা হয়েছে। শুভ্রা আর দ্বিধা করল না। উঠে গিয়ে রামবাবুর মাকে প্রণাম করল।

রামবাবু বললেন, 'মা, ইনি আমাদের স্কুলে কাজ করবেন। এখনো পাকা কথা অবশ্য হয়নি। তবে কথাবার্তা চলছে।'

বৃদ্ধা বললেন, 'পাকা কথা দিয়ে ফেল।' তারপর শুভ্রার দিকে চেয়ে বললেন, 'ভারি মিষ্টি ভারি সুন্দর চেহারা তো। কী নাম তোমার?'

শুভ্রা লজ্জিত হয়ে নিজের নাম বলল।

তারপর এল কেতকী। সেও প্রণাম করে বলল 'আমি কিন্তু আমার বন্ধুর মত মিষ্টিও নই সুন্দরও নই। আমাকে কী বলবেন?'

বৃদ্ধা হেসে বললেন 'তোমাকেও সুন্দরীই বলব মা। যার স্বভাব সুন্দর সেই সুন্দর। বাইরের রূপ আর মানুষের কদিন থাকে! তোমার নাম কি মা?' কেতকী নিজের নাম আর পদবী দুইই বলল। শুভ্রার মত শুধু নিজের নাম টুকু বলে ক্ষান্ত রইল না। বৃদ্ধা জিভ কেটে বললেন, 'ওমা, তুমি বামুন! ছি ছি ছি। তবে কেন পায়ে— ভারি অন্যায় হয়ে গেল।'

বৃদ্ধা তাঁর দুখানি পা নিয়ে যেন বিব্রত হয়ে উঠলেন।

কেতকী একটু হেসে বলল 'তাতে কিছুই দোষের হয়নি। আমরা সবাই তো আপনার মেয়ের মত।'

বৃদ্ধার মুখে একবার হাসি ফুটল। তিনি প্রসন্ন সুরে বললেন 'তা অবশ্য ঠিক। মেয়ে কেন? তোমরা আমার নাতনীও হতে পারতে। আমার বড় মেয়ের মেয়ের বয়সী তোমরা, ঠিক তোমাদের মতই নাতনী আছে আমার। তাদের বিয়ে থা হয়েছে ছেলে মেয়েও হয়ে গেছে। নাতির ঘরে দেখলাম। কে জানে গুরু আরো কত দেখাবেন। এই দুনিয়ায় কি কম দিন ধরে আছি?

রামবাবু একটু অসহিষ্ণু হয়ে বললেন 'চল মা। ওঁদের আবার দেরি হয়ে যাচ্ছে। কলকাতায় ফিরে যেতে হবে তো ওঁদের?' বৃদ্ধা বললেন, 'চল বাবা চল। এসো তোমরা।'

পাশের ছোট একটি ঘরে খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেয়াল ঘেঁষে ডাইনিং টেবিল আছে। আবার মেঝেতে সারি সারি সুন্দর আসনও পাতা রয়েছে।

রামবাবুর মা বললেন 'কোথায় বসবে তোমরা।'

কেতকী বলল 'আমরা শুধু চা খাব।'

রামবাবুর মা বললেন 'যাই খাও বসেতো খাবে।'

তারপর ছেলের দিকে চেয়ে বললেন, 'রাম, তুই এখন যা। বাইরের ঘরে গিয়ে বোস, তোর কোন ভাবনা নেই। তোর স্কুলের মেয়েদের অযত্ন হবেনা। আমি আছি কুমু আছে।' রামবাবু কোন প্রতিবাদ করলেনা। একটু লজ্জিত হয়েই যেন ভদ্রলোক উঠে পাশের ঘরে চলে গেলেন।

শুভ্রা রামবাবুর মার মনোভাব বুঝতে পেরে মেঝেয় পাতা আসনেই বসল। কেতকী আর অন্য দুজন টিচারও বসল তার পাশাপাশি।

একটি মাঝবয়সী বিধবা স্ত্রীলোক তাদের পরিবেশন করতে লাগল।

রাববাবুর মা বললেন 'বউ তো নেই। এই কুমুদিনীই আমার সব করেকম্মে দেয়। ভারি ভালো মেয়ে।'

লুচি তরকারি ছানার পায়েস একেবারে ভুরী ভোজের ব্যবস্থা।

কেতকী খেতে খেতে বলল 'এ সব করেছেন কী। চা খাওয়াবার নাম করে—ভারি অন্যায়।'

রামবাবুর মা বললেন, 'আহা খাও খাও। ছেলেমানুষ তোমরা। এই তো খাওয়া-পরার বয়স।'

কেতকী বলল, 'রামবাবু বুঝি খেতে খুব ভালো-বাসেন?'

বৃদ্ধা একটু হাসলেন, 'নিজে যে তেমন খেতে পারে তা নয়। লোকজনকে খাওয়াতে খুব ভালোবাসে আমার ছেলে। সেই ছেলেবেলা থেকেই ওর এই অভ্যাস।'

কেতকী বেশ আলাপী ধরণের মেয়ে। খুঁটে খুঁটে অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করল। বৃদ্ধার কাছ থেকে অনেক কথা জেনেও নিল। রামবাবুর বাবা ছিলেন সেণ্ট্রাল পি, ডবলিউ-ডির ইঞ্জিনিয়ার। চাকরি উপলক্ষে অনেক জায়গায় ঘুরেছেন—অনেক ঘাটের জল খেয়েছেন। অনেক দেশ দেখেছেন। বড় বড় সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে মিশেছেন। রামবাবুও বি-এ পাশ করেছেন। কিন্তু তাঁর বাবার মত সরকারী বেসরকারী কোন চাকরিতেই ঢোকেন নি। স্বাধীন ব্যবসা বাণিজ্যের দিকেই ঝুঁকেছেন। 'কর্তারও সেই ইচ্ছাই ছিল।' বৃদ্ধা একটু হাসলেন। চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর তিনিই সেই ব্যবসায়ের পত্তন করেছেন। বাড়ি-ঘর জমিজমা করে দিয়ে গেছেন। ছেলে অযোগ্য নয়। সে বাপের বিষয় আশয় বাড়িয়েছে। বরং বাপের চেয়ে ছেলেকেই এ অঞ্চলের লোকে বেশি চেনে। কিন্তু চিনলে কি হবে মনে সুখ নেই রামের। ঘরে যদি বউ না থাকে তাহলে কি আর শান্তি থাকে পুরুষের। সুখ তো আর দুধ ঘিয়ের মধ্যেও নেই, বিষয়-আশয় ঘরভরা জিনিস-পত্রের মধ্যেও নেই। যে সুখ ছেলের চিরতরে চলে গেছে সেই সুখ আর তাকে কী করে এনে দেবেন রামবাবুর মা। তাঁর ছেলে তো এখন আর ছেলেমানুষ নয়। তবু বউ মারা যাবার বছরখানেক পর থেকে তিনি কতবার ছেলেকে অনুরোধ করেছেন, 'বিয়ে কর বাবা, দেখে-শুনে আর একটি বিয়ে কর। ভগবান দুটি মেয়ে দিয়েছেন। তাঁর দয়া। কিন্তু একটি পুত্র-সন্তানও তো দরকার! তা নইলে তোর এসব দেখবে কে? মেয়েরা তো বিয়ে হলে পরের ঘরে চলে যাবে।'

কিন্তু ছেলে কিছুতেই মার কথায় কান দেয়নি। আর কবে দেবে। বিয়ের বয়স কি আর আছে। এখন সেও তো বুড়ো হতে চলল। ছেলে বাইরে বাইরেই থাকে। ব্যবসা বাণিজ্য আছে। অবসর সময়ে স্কুল কলেজ লাইব্রেরী হাসপাতাল নেই কী। নিতান্তই মেয়ে দুটো আছে তাই একবার করে বাড়িতে আসে। নইলে বোধহয় তাও আসত না। দান ধ্যান করেই ফতুর হয়ে যেত।

কেতকীর যেন প্রশ্ন আর ফুরোতে চায় না। জানবার ইচ্ছার যেন আর শেষ নেই তার।

শুভ্রা এক ফাঁকে মৃদুস্বরে বলল, 'কী রে, আজ কি এখানে থাকবি নাকি। ফিরতে হবে না কলকাতায়?'

কেতকী বলল, 'আমি ঠিকই ফিরব। তুই থেকে গেলেও পারিস।'

কথাটা রামবাবুর মার কানে গেল। তিনি হেসে বললেন। 'থাকতে তোমরা দুজনেই পার। জলে তো আর পড়নি।'

কেতকী বলল, 'শুভ্রাই তাড়া লাগাচ্ছে। শুভ্রা তো রোজই আসবে, রোজই পেট ভরে খাবে আর আপনার কাছে বসে বসে গল্প শুনবে। আমার ভাগ্যে তো আর তা হবে না।'

রামবাবুর মা বললেন 'ওমা হবে না কেন। তুমিও তোমার বন্ধুর সঙ্গে মাঝে মাঝে আসবে। দেখে যাবে আমাকে। সবচেয়ে ভালো হয় তুমিও যদি রামের স্কুলে একটা মাষ্টারিটাষ্টারি নাও। তাহলে দুজনে মিলে এক-সঙ্গে এলে বেশ হবে। যদি বল রামকে বলে দেখি।'

শুভ্রা বলল, 'আপনি তো জানেন না। ও কলকাতায় ভালো একটা স্কুলে কাজ করে। ও কেন আসবে এখানে।'

রামবাবুর মা হেসে বললেন, 'তাই বল। এতক্ষণ সে কথা লুকিয়ে রাখা হচ্ছিল। মেয়ে তো আমার ভারি দুষ্টু।'

বৃদ্ধার কথা বলবার ভঙ্গি বেশ মিষ্টি। গলার স্বরের মধ্যেও অন্তরঙ্গতার মাধুর্য আছে। রামবাবু বোধহয় তার মায়ের কাছ থেকেই মিষ্ট ভাষা আর মিষ্ট স্বভাবটুকু পেয়েছেন।

রামবাবুর মা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আরও কয়েকখানা ঘর দেখালেন শুভ্রাদের। শুভ্রা যেন স্কুলের কাজের জন্য ইণ্টারভিউ দিতে আসেনি, অন্তরঙ্গ আত্মীয়া হয়ে এসেছে। যেন কিছুক্ষণ মাত্র আগে রামবাবু আর মার সঙ্গে আলাপ হয়নি, যেন অনেকদিন ধরেই আলাপ পরিচয়।

রামবাবুর বসবার ঘর, পড়বার ঘর দেখল শুভ্রা। কাঁচের আলমারিভরা বই পরিপাটি করে সাজানো। ছেলের শোবার ঘরেও নিয়ে গেলেন তিনি। দেয়াল ঘেঁষে ডবল বেডের একখানি খাট এখনো পাতা রয়েছে। আলমারি

ড্রেসিং টেবিলে পরিপাটি করে সাজানো। উত্তর দিকের দেয়ালে একটি সুশ্রী মহিলার অয়েল পেইন্টিং টাঙ্গানো রয়েছে। ঘরে ঢুকতেই চোখে পড়ে।

শুভ্রা মৃদুস্বরে বলল, 'উনিই বুঝি ?'

রামবাবুর মা বললেন, 'হ্যাঁ মা। ওই আমার সেই নিরুপমা।'

কয়েক সেকেণ্ড সবাই চুপ করে রইল।

তারপর পিছন ফিরে আস্তে আস্তে বাইরের দিকে পা বাড়াল।

বাইরের ঘরে রামবাবু চুপচাপ বসেছিলেন। শান্তশিষ্ট যেন মাতৃভক্ত বালক।

শুভ্রাদের দেখে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর তার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'মা বোধহয় কিছুই আর আপনাদের দেখাতে বাকি রাখেন নি।'

শুভ্রা কোন জবাব দিল না। লজ্জিতভাবে মুখ নামিয়ে নিল।

বন্ধুর হয়ে জবাব দিল কেতকী, 'বাকি যা আছে আপনার কাছ থেকে আমরা সব দেখে শুনে নেব।'

রামবাবু বললেন, 'বেশ তো। দেখবার মত আমাদের এখানে কিন্তু অনেক কিছু আছে। ঘাট বাঁধানো দীঘি আছে। মজা নদী আছে একটি। যেটুকু বেঁচে আছে জল সারাবছরই থাকে। ধার দিয়ে বেড়াবার মত জায়গাও আছে। ওপারে আছে পিকনিক করবার মত বিরাট এক আমবাগান। দেখবেন ?'

কেতকী বলল, 'আজ আর সময় নেই। শুভ্রা তো আসবেই। ওকে দেখাবেন।'

দু'টি সাইকেল রিক্সা সামনেই দাঁড়ানো আছে। রামবাবু আগে থেকেই সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

শুভ্রাদের সঙ্গে রামবাবু সেদিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'শুধু শুকনো দীঘি আর মজা নদীই নয়। আপনাদের আরো কিছু দেখাতে পারতাম। এখানে একটি পাবলিক লাইব্রেরী করেছি আমরা। ছেলেদের ক্লাব আছে, মেয়েদের গানের স্কুল। একজন ভদ্রমহিলা কলকাতা থেকে সপ্তাহে একদিন করে আসেন মেয়েদের গান শেখাতে। গত বছরের আগের বছর আমাদের নতুন হলটির দ্বারোদ্‌ঘাটন হল। শিক্ষামন্ত্রীকে এনেছিলাম আমরা।'

কেতকী বলল, 'তাহলে তো অনেক কাজ হচ্ছে এখানে।'

পুরোণ দুটি টিচার আগেই বিদায় নিয়েছিল।

শুভ্রা আর কেতকী একটি রিক্সায় উঠল। রামবাবু দ্বিতীয় রিক্সাখানিতে উঠে বসলেন। তারপর মৃদু হেসে বললেন, 'চলুন, আপনাদের একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।'

সেক্রেটারীর অলক্ষ্যে কেতকী শুভ্রার দিকে তাকিয়ে একটু দুষ্টুমির ভঙ্গিতে হাসল।

[ক্রমশঃ

ক্ষুধার সময়

অনিলকুমার ঘোষ

যখন দেহের ক্ষুধা মিটে যায় আমাদের মন
বস্তুতঃ তখন-ই ক্ষুধার্ত আর তখনি উদ্দাম,
চাওয়া ও পাওয়ার দ্বন্দ্বে মুখরিত অভীপ্সার দেহে
তখনি ঘনিষ্ঠ তাপে উচ্ছ্বসিত সংগ্রামের ঘাম।

মনে হয়, তখন মনের সত্তা ক্ষিপ্ত এক নদী
আষাঢ়ের অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতে দেহ ভরে নিয়ে
তবুও তখনো তার অতিরিক্ত ব্যস্ততাই স্থায়ী নিরবধি,
তখন-ও প্রজব কামনা বক্ষে কোথায় সে
চলেছে এগিয়ে।

জল তার ঘোলা হয় পাথরে ও পথের প্রাকারে ;
বাধা পায় কতো, তবু তীরে, কিনারে-কিনারে
অজস্র রঙের খেলা, অজস্র সবুজ গাছ, পাখী—
সে তারি সান্ত্বনা বক্ষে নিরিবিলি রাখিয়াছে ঢাকি।
এ মন-ও যুদ্ধ করে, ক্লান্ত হয় ; ক্লান্ত ব্যথাহত—
অভীপ্সা তবুও ফোটে ফুল হ'য়ে নদীদের মতো।

বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন—

গত ১১ই জুলাই রবিবার নদীয়া জেলার শান্তিপুরে স্থানীয় পাবলিক লাইব্রেরীর উদ্যোগে নব নির্মিত বিরাট লাইব্রেরী ভবনে বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের এক মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে সম্মেলনের ৫০ জন সদস্য ও স্থানীয় প্রায় ৫০০ জন ভদ্রলোক সম্মেলনে সমবেত হইয়াছিলেন। সঙ্গীতাদির পর শান্তিপুরের প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীবনবিহারী গোস্বামী অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রূপে এক মুদ্রিত অভিভাষণে শান্তিপুরের ইতিহাস বিবৃত করিয়া সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন।

বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের পক্ষে ডাঃ শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত সম্মেলনের উদ্দেশ্য ও ইতিহাস বলিবার পর শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্মেলনের পক্ষ হইতে শান্তিপুরবাসী নিম্নলিখিত চার জন সাহিত্যকর্মীকে মাল্যাদির দ্বারা অভিনন্দিত করেন। (১) শান্তিপুর পুরাণ পরিষদের সম্পাদক শ্রীঅজিত স্মৃতিরত্ন। (২) খ্যাতনামা কথা সাহিত্যিক শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়। (৩) কবি শ্রীদেবেন্দ্র নাথ বিশ্বাস। (৪) শান্তিপুর সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক ও ফুলিয়ায় কীর্ত্তিবাস উৎসবের পরিচালক শ্রীপ্রভাসচন্দ্র রায়।

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য এবং ভাষণ দেন অধ্যাপক শ্রীঅজিত ঘোষ, শ্রীকুমারেশ ঘোষ ও অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সভায় কবি-কঙ্কণ শ্রীহেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅতুল্য চরণ দে, পুরাণরত্ন, রাণাঘাটের শ্রীবিনয়কৃষ্ণ তরফদার প্রভৃতির কবিতা পঠিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গের দুগ্ধ সমস্যা—

পশ্চিমবঙ্গে যে দুগ্ধ উৎপন্ন হয় তাহার দ্বারা পশ্চিম বঙ্গের চাহিদা মেটান যায় না। সেজন্য বিদেশ হইতে প্রচুর গুঁড়া দুধ আমদানি করিতে হয়। কিন্তু গুঁড়া দুধ আমদানির জন্য যে বিদেশী মুদ্রার প্রয়োজন তাহা না পাওয়ার ফলে গত প্রায় ৩ মাস কলিকাতার দুগ্ধ সমস্যা সঙ্গীণ হইয়াছিল। গত ২২শে জুলাই কেন্দ্রীয় সরকার ৩ মাস গুঁড়া দুধ আমদানির বিদেশীয় মুদ্রা মঞ্জুর করিয়াছেন। তাহার ফলে ১লা আগষ্ট হইতে গুঁড়া দুধ আমদানি বৃদ্ধি পাইবে ও পশ্চিমবাংলার দুগ্ধ সমস্যা কিছু পরিমাণে কমিবে।

এই ব্যবস্থা সাময়িক। যত দিন না বাংলার লোক অধিক পরিমাণে দুগ্ধ উৎপাদনে মনোযোগী হয় ততদিন বাঙ্গালীকে দুধের কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। আমরা ইতিপূর্ব্বে বহুবার সমবায় প্রথায় দুগ্ধ উৎপাদনে সরকারী উৎসাহের অভাবের কথা বলিয়াছি। সরকার যেমন সমবায় প্রথায় মুদির দোকান স্থাপনে কার্য্য করিতেছেন, তেমনি যদি সমবায় প্রথায় দুগ্ধ উৎপাদনে সাহায্য করেন তাহা হইলে হয়ত এই সমস্যার কিছু সমাধান হইতে পারে।

চালের অভাব—

জুলাই মাসেই আবার সারা ভারতে চালের অভাব দেখা দিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের রেশন এলাকা ছাড়া কোন কোন স্থানে পঞ্চাশ টাকা চাউলের মণ হইয়াছে। বিহারের বহু স্থানে চাল পাওয়া যায় না। ফলে গ্রামাঞ্চলে লুট তরাজ আরম্ভ হইয়াছে। কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী বা পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী যাহাই বলুন না কেন সর্ব্বত্র মানুষকে চালের অভাবে কষ্ট পাইতে হইতেছে। ইহা সমাধানের জন্য ছোট ছোট চাষীদের নিকট হইতে তাহাদের সঞ্চিত ধান চাল সংগ্রহ করিবার চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। কি উপায়ে এই সমস্যার সমাধান করা যায় তাহা কেহই স্থির করিতে পারিতেছেন না। যতদিন না দেশের শিক্ষিত ধনী ব্যক্তিরা এ বিষয়ে অগ্রসর হন এবং কৃষিকার্য্যে ধনীরা মূলধন নিয়োগ না করেন ততদিন এ সমস্যার সমাধান হইবে না।

আজকের দিনে আসল কথা

আধুনিক তরুণ :—দ্যাখো আসল কথাটাই তোমাকে (নবপরিণীতা বধূকে) এতকাল বলা হয়নি !…এখন বিয়ে চুকেছে—এবারে বলি।

নব-পরিণীতা বধূ :—কি কথা ?

আধুনিক তরুণ :—অর্থাৎ, বাবা আমাকে ত্যাজ্যপুত্তুর করেছেন !…আমি বেকার…তাই তোমায় অবলম্বন করেছি—তোমার চাকরী আছে বলে !

নব-পরিণীতা বধূ :—বটে !…তাহলে আমিও তোমায়…

শিল্পী—পৃথ্বী দেবশর্ম্মা

সম্পাদনা ঃ শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

রাশিয়া বনাম আমেরিকা :

১৯৬৫ সালে রাশিয়া বনাম আমেরিকার সপ্তম বার্ষিক এ্যাথলেটিক্স স্পোর্টস প্রতিযোগিতায় রাশিয়া পুরুষ এবং মহিলা—এই দুই বিভাগেই জয়ী হয়েছে। একই দেশের পক্ষে একই বছরের অনুষ্ঠানের উভয় বিভাগে জয়লাভ প্রতিযোগিতার ইতিহাসে এই প্রথম। ১৯৬৫ সালের প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে রাশিয়া ১৮৮—১১২ পয়েন্টে এবং মহিলা বিভাগে ৬৩½—৪৩½ পয়েন্টে আমেরিকাকে পরাজিত করে। ১৯৬০ সালে এই দুই দেশের ক্রীড়ানুষ্ঠান স্থগিত ছিল।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, প্রতিযোগিতার সূচনা ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৬৪ সাল পর্য্যন্ত পুরুষ বিভাগে কেবল জয়ী হয়েছিল আমেরিকা এবং মহিলা বিভাগে কেবল রাশিয়া। ১৯৬৫ সালেই তার ব্যতিক্রম হল। রাশিয়া বনাম আমেরিকার এই বাৎসরিক এ্যাথলেটিক্স স্পোর্টস প্রতিযোগিতার আকর্ষণ কেবল এই দুই দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, আন্তর্জাতিক ক্রীড়া-জগতে এই প্রতিযোগিতার গুরুত্ব যথেষ্ট।

রাশিয়া বনাম আমেরিকার গত ৭ বছরের এ্যাথলেটিক্স স্পোর্টস প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত ফলাফল নীচে দেওয়া হল :

পয়েন্টের খতিয়ান

পুরুষ বিভাগ

সাল	রাশিয়ার পয়েন্ট	আমেরিকার পয়েন্ট
১৯৫৮	১২৬	১০৯
১৯৫৯	১২৭	১০৮
১৯৬০	—	—
১৯৬১	১২৪	১১১
১৯৬২	১২৮	১০৭
১৯৬৩	১১৯	১১৪
১৯৬৪	১৩৯	৯৭
১৯৬৫	১১২	১৮৮

মহিলা বিভাগ

সাল	রাশিয়ার পয়েন্ট	আমেরিকার পয়েন্ট
১৯৫৮	৬৩	৪৪
১৯৫৯	৬৭	৪০
১৯৬০	—	—
১৯৬১	৬৮	৩৯
১৯৬২	৬৬	৪১
১৯৬৩	৭৫	২৮
১৯৬৪	৫৯	৪৮
১৯৬৫	৬৩½	৪৩½

ইংল্যাণ্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা :

দক্ষিণ আফ্রিকা ঃ ২৮০ রান (রবার্ট পোলক ৫৬ রান। রামসে ৮৪ রানে ৩, ডেভিড ব্রাউন ৪৪ রানে ৩, টিটমাস ৫৯ রানে ২ এবং বারবার ৩০ রানে ২ উইকেট পান)।

ও ২৪৮ রান (কলিন ব্ল্যাণ্ড ৭০ এবং এডি বার্লো ৫২ রান। রামসে ৪৯ রানে ৩ এবং ব্রাউন ৩০ রানে ৩ উইকেট পান)।

ইংল্যাণ্ড ঃ ৩৩৮ রান (কেন ব্যারিংটন ৯১, ফ্রেড টিটমাস ৫৯ এবং রবার্ট বারবার ৫৬ রান। ডামব্রিল ৩১ রানে ৩ উইকেট পান)।

ও ১৪৫ রান (৭ উইকেটে। কলিন কাউড্রে ৩৭ রান। ডামব্রিল ৩০ রানে ৪ উইকেট পান)।

ইংল্যাণ্ডের লর্ডস মাঠে অনুষ্ঠিত ইংল্যাণ্ড বনাম দক্ষিণ

আফ্রিকার প্রথম বে-সরকারী টেষ্ট ক্রিকেট খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়নি, খেলা ড্র হয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকা টসে জয়ী হয়ে প্রথম ব্যাট করার দান নেয়। প্রথম দিনের খেলায় তারা আটটা উইকেট খুইয়ে মাত্র ২২১ রান সংগ্রহ করে। লাঞ্চের সময় তাদের রান ছিল ৭৫ (৩ উইকেটে)। রবার্ট পোলক এবং কেনেথ কলিন ব্ল্যাণ্ড চতুর্থ উইকেটের জুটিতে দলের ৮০ রান তুলে দলের মুখরক্ষা করেন। প্রথম দিনের খেলার প্রথম দিকে ইংল্যাণ্ড দুটো শক্ত ক্যাচ নিয়ে খেলার গতি নিজেদের কোলে টেনে নেয়।

বৃষ্টির দরুণ ২ ঘণ্টা ৫০ মিনিট দেরী ক'রে দ্বিতীয় দিনের খেলা আরম্ভ হয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম ইনিংস ২৮০ রানের মাথায় শেষ হলে ইংল্যাণ্ড কোন উইকেট না হারিয়ে বাকি সময়ের খেলায় ২৬ রান তুলেছিল।

তৃতীয় দিনের খেলায় ইংল্যাণ্ডের ২৮৭ রান দাঁড়ায় ৬টা উইকেট পড়ে। ফলে তারা দক্ষিণ আফ্রিকার থেকে ৭ রানে এগিয়ে যায়। লাঞ্চের ঠিক আগের শেষ ১৫ মিনিটের খেলায় ইংল্যাণ্ডের তিনটে উইকেট পড়ে যায়—৮২ রানের মাথায় ১ম উইকেট এবং ৮৮ রানের মাথায় ২য় এবং ৩য় উইকেট। ইংল্যাণ্ডের এই ভাঙ্গনের মুখে নির্ভীকভাবে খেলেছিলেন কেন ব্যারিংটন। মাত্র ৯ রানের জন্যে তিনি সঞ্চুরী করার গৌরব থেকে বঞ্চিত হন।

চতুর্থ দিনে ৩৩৮ রানের মাথায় ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হয়। কলিন ব্ল্যাণ্ড ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের খেলায় দু'জনকে রান-আউট করেন এবং দ্বিতীয় ইনিংসে দলের সর্ব্বোচ্চ ব্যক্তিগত ৭০ রান করেন। এই-দিন দক্ষিণ আফ্রিকার পাঁচটা উইকেট পড়ে ১৮৬ রান উঠেছিল।

পঞ্চম দিনে দক্ষিণ আফ্রিকা তাদের বাকি পাঁচটা উইকেটে মাত্র ৬২ রান তুলেছিল। লাঞ্চের চল্লিশ মিনিট আগে ২৪৮ রানের মাথায় দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শেষ হলে খেলায় ইংল্যাণ্ডের জয়লাভের জন্যে ১৯১ রানের প্রয়োজন হয়। হাতে চার ঘণ্টা সময় থাকলেও ইংল্যাণ্ড ৭ উইকেট খুইয়ে ১৪৫ রানের বেশী সংগ্রহ করতে পারেনি।

ডেভিস কাপ ঃ

১৯৬৫ সালের ডেভিস কাপ লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার ইউরোপীয়ান জোন-ফাইনালে স্পেন ৪-১ খেলায় দক্ষিণ আফ্রিকা দলকে পরাজিত করেছে।

আমেরিকান জোন-ফাইনালে আমেরিকা ৪-১ খেলায় মেক্সিকো দলকে পরাজিত করে ইন্টার-জোন ফাইনালে স্পেনের সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে।

এশিয়ান জোন-ফাইনালে উঠেছে ভারতবর্ষ এবং জাপান। এই খেলা সুরু হবে জাপানের টোকিও সহরে আগামী অক্টোবর মাসের ১লা তারিখে।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ ঃ

১৯৬৫ সালের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছে গত তিন বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান ক্লাব। গত ৫ই আগষ্ট তারিখে প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ নির্দ্ধারিত হয়। এই দিন মোহনবাগান ২-০ গোলে বি-এন রেলওয়ে দলকে পরাজিত করে এবং ৮ই জুলাই তারিখে মোহনবাগানের বিপক্ষে লীগের ফিরতি খেলায় রাজস্থান ক্লাবের অনুপস্থিত হওয়ার কারণে আই-এফএ-র লীগ সাব কমিটি মোহনবাগান ক্লাবকেই দু' পয়েন্ট দেওয়ার সিদ্ধান্ত এই দিনেই ঘোষণা করেন। ফলে মোহনবাগান ২৭টা খেলায় ৫১ পয়েন্ট সংগ্রহ করার কৃতিত্বে ১৯৬৫ সালের লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়। মোহন-বাগানের আর মাত্র একটা খেলা বাকি, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সঙ্গে (২৮শে আগষ্ট)। বর্ত্তমানে লীগের তালিকায় যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে অপর কোন ক্লাবের পক্ষে মোহনবাগানের পয়েন্টের নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়। এদিকে রাজস্থান ক্লাব লীগ সাব কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আই এফ এ-র গভর্নিং বডির কাছে আবেদন করেছেন।

এই নিয়ে মোহনবাগান ক্লাব তের বার প্রথম বিভাগের লীগ চ্যাম্পিয়ান হল। প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগের ইতিহাসে মোহনবাগানই সর্ব্বাধিকবার লীগ চ্যাম্পিয়ান-হওয়ায় রেকর্ড করেছে। তাদের পরই মহমেডান স্পোর্টিং দলের ৯ বার, ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের ৮ বার এবং ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ৭ বার লীগ চ্যাম্পিয়ান হওয়ার ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

সম্পাদকদ্বয়—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,) কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে ১২।৮।৬৫ তারিখে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বাসা

চিত্র : মধুসূদন মুখোপাধ্যা
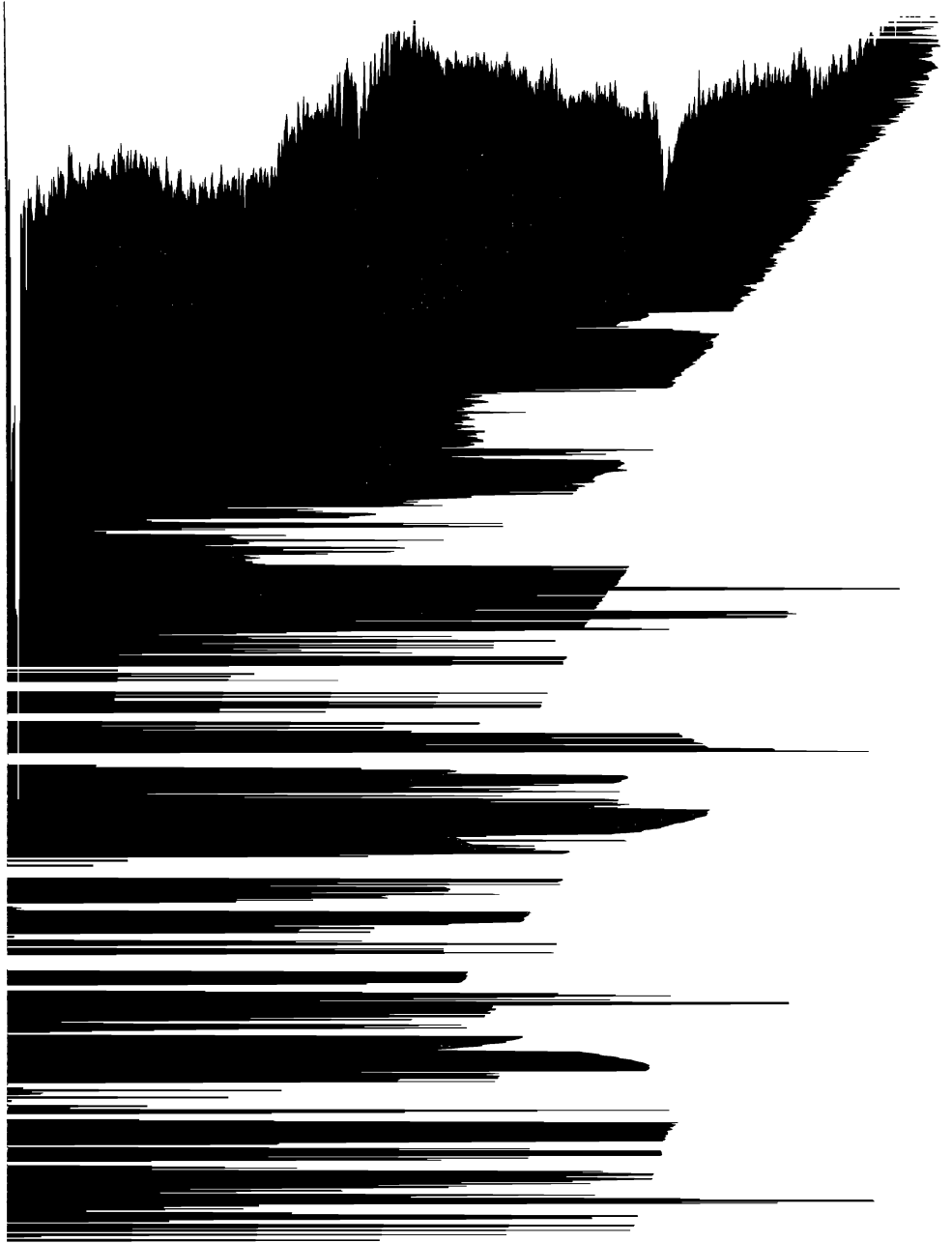
ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়া:

প্রকাশিত হ'ল

প্রফুল্ল রায়ের

নতুন বিরাট উপন্যাস

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে হুগলী জেলার দূরঅভ্যন্তর থেকে একটি যুবক জীবিকার সন্ধানে কলকাতায় এসেছিল। তার জীবনের একটিমাত্রই মন্ত্র ছিল, 'বাঁচতে চাই, বাঁচতে চাই, বাঁচতে চাই।'

সারা বাঙলাদেশ, বিশেষ করে কলকাতা জুড়ে তখন অন্ধকারের সাধনা চলেছে। একদিকে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, কালোবাজারি—এদের ফলশ্রুতি হিসেবে ভিক্ষুক আর গণিকা। অন্যদিকে মুদ্রাস্ফীতির কল্যাণে উদ্দাম ভোগবাদের প্রমত্ত উৎসব। তৃতীয় আরেকটি দিক ছিল যেখানে আঘাতের পর আঘাতে সমস্ত পুরানো মূল্যবোধ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল। এরই মধ্যে একটা শ্বাপদের মত হামাগুড়ি দিয়ে দাঙ্গা এসে গেল—কলকাতার 'গ্রেট কিলিং'। তারও পর খণ্ডিত দেশের রক্তাক্ত দেহের ওপর দিয়ে স্বাধীনতার রথ এল ঘর্ঘরিয়ে।

যুদ্ধ থেকে স্বাধীনতা পর্যন্ত বাঙলাদেশের এই বিশৃঙ্খল অধ্যায়টি ঘিরে শুধু অন্ধকার, অন্ধকার আর অন্ধকার। আর সেই সর্বব্যাপী অন্ধকারে যুবকটি একটু একটু করে ডুবে যাচ্ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডোবা তার হ'ল না।

এত যে অন্ধকার আর নৈরাজ্য তবু এরই অন্তর্স্রোতে কোথায় যেন আলোর ক্ষীণ একটি ধারা ধীরে ধীরে বইছিল। যুবকটি হঠাৎ তা আবিষ্কার করে বসল। দেখল উনিশ শতকের রামমোহন, বিদ্যাসাগর থেকে আজ অবধি অসংখ্য মানুষ সেই ধারাটিকে বয়ে নিয়ে চলেছেন এবং আশ্চর্য তাঁদের উত্তরাধিকার তার ওপরে এসে পড়েছে।

জীবিকার খোঁজে যে যুবক এসেছিল, কলকাতা তাকে জীবনের মহত্তর সন্ধান দিয়েছে।

এই বিশাল রূপদী উপন্যাস সাম্প্রতিক কালের একটি অনন্য সংযোজন।

দাম—দশ টাকা

এই লেখকের আরেকটি উপন্যাস : **নোনা জল মিঠে মাটি** (দ্বিতীয় সংস্করণ) দাম : ৮'৫০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ... কলিকাতা-৬

ভাদ্র—১৩৭২

প্রথম খণ্ড | ত্রিপঞ্চাশত্তম বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

জীবের লক্ষ্য

মহামহাচার্য পণ্ডিত শ্রীশিবশঙ্কর শাস্ত্রী, বাচস্পতি

(ক)

ত্রিতাপদগ্ধ এই সংসারে মানুষ দিশেহারা হইয়া ইতস্তত: ভ্রমণ করিতেছে। অনন্তকাল ধরিয়া ত্রিতাপের এই তাড়না মানুষ সহ্য করিয়া আসিতেছে। 'ক্ব প্রাপ্নোমি ক্ব যামীত্যনিশমনুদিনং চিন্তয়া জীর্ণদেহঃ'। এই ভাব সমগ্র জীবন ধরিয়া তাহাকে অধিকার করিয়া থাকে। কিন্তু ইহা হইতে নিষ্কৃতি-লাভের কোন উপায়ই সে দেখিতে পায় না। মানুষ স্মরণাতীত কাল হইতে এই প্রকার নিঃসহায় অবস্থায় জীবনযাপন করিয়া আসিতেছে। তাই তাপদগ্ধ জগতের প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির হৃদয়ে স্বতঃই এই প্রশ্ন উদিত হয়,—'কেবা আমি কেন মোরে জারে তাপত্রয়'। মহর্ষি কপিলের মনেও এই প্রশ্নই জাগিয়াছিল। এজন্য তিনি বলিলেন—'দুঃখত্রয়াভিঘাতা-জ্জিজ্ঞাসা'। তবে এই জিজ্ঞাসার কারণীভূত ত্রিতাপের হাত হইতে মুক্তিলাভের উপায় নির্ধারণের বিবিধ প্রচেষ্টা সৃষ্টির প্রথম হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। উপায় নির্ধারণ করিয়াছেন পরম কারুণিক ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ। তাঁহাদের প্রণীত বিভিন্ন দর্শনশাস্ত্র মানব জাতির পূর্বোক্ত শাশ্বত প্রশ্নের সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছে। বেদকল্প ঐ সকল মহর্ষি কোন্ কার্য

দ্বারা আত্মার প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয় তাহার নির্দেশ করিয়াছেন। কি উপায়ে মানব-হৃদয়ের দুর্বলতা বিনষ্ট হইবে তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন।

অবিদ্যা বা অজ্ঞান মানবের দুঃখের একমাত্র কারণ। এই অজ্ঞান বা মোহ অর্জুনের মত জ্ঞানীর হৃদয়কেও একসময় আচ্ছন্ন করিয়াছিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রারম্ভে মোহ যখন অর্জুনের হৃদয়ে দুর্বলতার সৃষ্টি করিল শ্রীভগবান্ তখন অর্জুনের নিন্দা করিলেন, তাঁহাকে দুর্বল হৃদয় বলিলেন, এমন কি, তাঁহাকে স্বধর্মত্যাগী বলিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। মহাভারতের অর্জুন-চরিত্র সত্যই বিস্ময়জনক। অর্জুনের বাহুবল ও তাঁহার অলৌকিক বীরত্ব, কাহার হৃদয়ে বিস্ময়রসের সঞ্চার না করে। তাঁহার মধ্যে শাস্ত্রমর্যাদা, গুরুমর্যাদা এবং লোক-মর্যাদা একত্র অক্ষুণ্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়। এতগুলি গুণ অর্জুন চরিত্রে বর্তমান থাকিতেও মোহ যখন তাঁহার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিল তখন সাধারণ সাংসারিক মনুষ্য যে অজ্ঞানের গুরুভারে নিষ্পেষিত হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য হইবার কি আছে? অর্জুনকে শোকমোহাচ্ছন্ন দেখিয়া শ্রীভগবান্ সখাকে তাঁহার বিপদ শান্তির জন্য ব্রাহ্মীস্থিতির উপদেশ দিলেন। এই ব্রাহ্মীস্থিতি কি পদার্থ সে বিষয়ে ভগবান্ শঙ্কর বলিয়াছেন: 'ব্রহ্মণি ভবেয়ং স্থিতিঃ সর্বকর্ম সন্ন্যস্য ব্রহ্মরূপেণৈবাবস্থান মিত্যেতৎ'—সর্বকর্মের সন্ন্যাস করিয়া ব্রহ্মরূপে যে অবস্থান তাহাকে বলে ব্রাহ্মীস্থিতি। সহজ কথায় যাহা ব্রাহ্মীস্থিতি তাহারই নাম ব্রহ্মনির্বাণ আর তাহাকেই বলে আত্মজ্ঞান। অতএব ব্রাহ্মীস্থিতি ভিন্ন শোকের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায় না। লৌকিক উপায়ে শোক দুঃখের ক্ষণিক নিবৃত্তি হইতে পারে কিন্তু আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির জন্য আত্মজ্ঞানের প্রয়োজন। এ বিষয়ে সকল দর্শনেরই একমত। এই আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি যেমন সাংখ্যশাস্ত্রের লক্ষ্য, যোগশাস্ত্রেরও লক্ষ্য ঠিক ঐ প্রকার। যোগশাস্ত্রের মতে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থিতি দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির উপায়। আর ইহারই জন্য বেদান্তে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার কথা বলা হইয়াছে। ব্রাহ্মীস্থিতির স্বরূপ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে—দুঃখবাদ হইতেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ফলে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির উপায় নির্ধারণের জন্য সকল দর্শনশাস্ত্রের সৃষ্টি।

(খ)

'দর্শন' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'দৃশ্যতে যথার্থতত্ত্ব-মনেন'—যাহার দ্বারা তত্ত্ব বিষয়ক যথার্থ জ্ঞান হয় বা জানা যায় তাহাকেই বলে দর্শন। দর্শনশাস্ত্র তত্ত্বজ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়। দুঃখবাদকে লক্ষ্য করিয়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দর্শনের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রত্যেক দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্যে কোন ভেদ নাই। পরতত্ত্বের অনুসন্ধানে সমস্ত দর্শনই ব্যাপৃত। অতএব দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে প্রকৃত তত্ত্বের একটা ধারণা মনের মধ্যে জন্মিতে পারে। আস্তিক-দর্শনগুলি উপনিষদকেই প্রমাণ রূপে গ্রহণ করিয়াছে। আর দর্শনগুলির রচয়িতা অধ্যাত্মতত্ত্ববিদ্ সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ। এই ঋষিগণ তাঁহাদের বহুদর্শিতার ফলে পরতত্ত্ব বিষয়ক যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন সেগুলিকে দর্শনশাস্ত্র বলে। প্রধান দর্শনশাস্ত্রের সংখ্যা ছয়টি :

(ক) কপিলপ্রণীত সাংখ্যদর্শন। (খ) পতঞ্জলি প্রণীত যোগশাস্ত্র (গ) গৌতম প্রণীত ন্যায়শাস্ত্র (ঘ) কণাদ প্রণীত বৈশেষিকদর্শন (ঙ) জৈমিনি প্রণীত পূর্ব-মীমাংসা (চ) ব্যাসপ্রণীত উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত।

ইহা ছাড়া সর্বদর্শন সংগ্রহাদিতে বৌদ্ধাদি অপর শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত দৃষ্ট হইলেও বেদান্তাদিশাস্ত্রে ঐগুলি খণ্ডিত হইয়াছে। এ কারণে ঐগুলিকে আর্যদর্শনের মধ্যে ধরা হয় না।

দর্শনশাস্ত্রে পরম কারুণিক ঋষিগণ কেবল যে পরতত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়াছেন তাহা নহে পরতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁহারা জীবতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, কর্মানুসারে জীবগণের প্রাকৃতিক দেব-মনুষ্য-কীট-পতঙ্গাদি দেহধারণের বিষয় এবং উহার কারণ বিবৃত করিয়াছেন। ঐ সকল বিষয়ের সম্যক জ্ঞান লাভ ছাড়া জীবের কর্মপাশ হইতে মুক্তিলাভ সম্ভবপর নহে এবং কর্মপাশ হইতে মুক্ত না হইলে জীবের লক্ষ্য যে সালোক্যাদি মুক্তিলাভ তাহারও সম্ভাবনা থাকে না।

[গ]

কোন স্মরণাতীত কালে সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের হৃদয়ে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি জাগিয়াছিল—ইচ্ছার বিরুদ্ধে মানবের দেহ

ধারণের কারণ কি? দেহাশ্রয়ে বিবিধ দুঃখই বা মানব ভোগ করে কেন? আর কি করিলেই বা এই দুঃখের করাল কবল হইতে মুক্তিলাভ করা যায়? আর্যদৃষ্টি অভ্রান্ত। তাই ঋষিগণ নিজেদের তপোলব্ধ অলোকিক শক্তিপ্রভাবে উহাদের যথাযথ উত্তর প্রদানে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহারা ছিলেন ত্রিকালজ্ঞ। এজন্য তাঁহারা সাধনাবলে জানিতে পারিয়াছিলেন জীবের বিদ্যা, অবিদ্যা; গতি ও অগতির স্বরূপ। সাধারণতঃ মানব অজ্ঞানে আচ্ছন্ন। তাই আপন ইষ্টানিষ্টজ্ঞান তাহার থাকে না। দুঃখের ঘাত-প্রতিঘাতের কারণও সে উপলব্ধি করিতে পারে না। বিষয় সুখে এমনই মুগ্ধ থাকে যে, দুঃখের অনলে দহ্যমান হৃদয়ে সে শান্তি না পাইলেও পুনঃ পুনঃ বিষয়ভোগের আকাঙ্ক্ষা তাহার হৃদয় হইতে বিদূরিত হয় না। দুঃখের মধ্যেও ক্ষণিক সুখের সন্ধানে সে ব্যাপৃত থাকে। উদ্দাম ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া কালযাপন করিলেও প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবিনী পরিণামজনিত প্রতিক্রিয়ার সময়ে সেও ক্ষণিক প্রকৃতিস্থ হয় এবং সংসারের নশ্বরতা সে কিছুক্ষণের জন্যও উপলব্ধি করিতে পারে। প্রাক্তন সুকৃতির ফলে আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে যদি তাহার ধারণা থাকে তবে পরলোকের প্রতি বিশ্বাসও তাহার স্বাভাবিক। আর যিনি জ্ঞানী, তাঁহার হৃদয়াকাশ জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত থাকে বলিয়া তিনি আত্মার উন্নতি সাধনে যত্নবান্ হন। বিষয় বাসনা মন হইতে দুর করিতে চেষ্টা করেন। মানবের পুরুষার্থ কি তাহা তাঁহার অজ্ঞাত না থাকায় তিনি উহা লাভ করিতে সাধনা করেন। তিনি পুণ্যের জন্য কঠোর তপস্যা করেন, কৃচ্ছ্র ব্রত পালন করেন, ইন্দ্রিয়সংযম করেন, অধ্যাত্মশাস্ত্র পাঠ করিয়া পরতত্ত্ববিষয়ক জ্ঞান অর্জন করিতে চেষ্টা করেন। তিনি আপন সাধনায় অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি লাভ করিতে যত্নবান্ হন। ক্রমে সদ্গুরুর কৃপায় তাঁহার জ্ঞাননেত্র ফুটিয়া ওঠে। তিনি তখন পরমাত্মার সত্তা সর্বত্র উপলব্ধি করেন।

এতদূর আলোচনা করিয়া আমরা জানিতে পারিলাম সংসারের দুঃখের জ্বালা শাশ্বত এবং সেই শাশ্বত দুঃখজ্বালার হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভের চিন্তাও অনন্তকাল ধরিয়া মানবের হৃদয়কে অধিকার করিয়া আসিতেছে। ঋষিগণের হৃদয়ে এই নিষ্কৃতির প্রশ্ন জাগিয়াছিল এবং তাঁহারা আর্যদৃষ্টিতে উহার সমাধানে জগতের মঙ্গল সাধন করিয়া গিয়াছেন। জীবের চরমলক্ষ্যের কথা তাঁহারা বলিয়াছেন। মানুষ চায় আনন্দ। সেই আনন্দের সন্ধানে মানব সর্বদা ব্যাপৃত। কিন্তু জগতে যে আনন্দ সে আনন্দ দুঃখসংভিন্ন। সে আনন্দ ক্ষণিক। অতএব সেই ক্ষণিক আনন্দ অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীবের কাম্য হইলেও উহা জ্ঞানীর পক্ষে কখনও বাঞ্ছনীয় নহে। এজন্য যে ব্যক্তির প্রাক্তন কর্মের ফলে হৃদয়ে বিবেক জ্ঞানের উদয় হইয়াছে তাঁহার আর ক্ষণিক সাংসারিক আনন্দ ভাল লাগে না। তিনি পরমানন্দের সন্ধান করেন। এই পরমানন্দ সদ্গুরুর কৃপা এবং ভগবদনুগ্রহ ছাড়া লাভ করা যায় না। ভগবৎকৃপা ব্যতীত তত্ত্বস্ফূর্তি হয় না। অনুমানাদি লৌকিকপ্রমাণের সাহায্যে ঈশ্বর সাধিত হইতে পারেন কিন্তু ভগবত্তত্ত্বের স্ফূর্তি তাঁহার অনুগ্রহ সাপেক্ষ। তাই ব্রহ্মার মুখে শুনিতে পাই—

"তথাপি তে দেব পাদাম্বুজদ্বয়প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।" যাহাকে তুমি চরণকমলের কৃপা কর সেই ব্যক্তিই তোমার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে। শ্রুতিও এই কথাই বলিয়াছেন:

'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।'

অতএব শ্রীভগবদনুগৃহীত ব্যক্তিই মানবের পরমপুরুষার্থ যে ভগবৎসাক্ষাৎকার তাহা লাভ করিতে পারেন।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

চার

বাসন্তীপুরকে তোমাদের ভাষায়—sleepy hollow বলা চলে। অর্থাৎ প্রাণশক্তির কোনো চিহ্নও পাওয়া যায় না সে ঘুমের দেশে। এ হেন পরিবেশে সাধুজির মতন প্রাণোচ্ছল মানুষ কেমন ক'রে টিঁকে রইলেন একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি শুধু মিষ্টি হেসে এড়িয়ে গিয়েছিলেন। বুঝেছিলাম কোনো কারণে তিনি বলতে চান না তাঁর জীবনের ব্যথার ইতিহাস। পীতবসন বৈরাগ্য, ভজন, কীর্তন এসবেরই উদ্ভব সেই বেদনা থেকে। পরে একদিন বলেছিলেন কিন্তু সেকথা আর একদিন বলব। এখন খেই ধরি হারানো সুতোর।

নির্জীব দেশ ব'লেই গানকে আরো আঁকড়ে ধরেছিলাম —শুধু আমিই নই, সাধুজি, শমিতা ও মূর্ছনাও। কাজেই আমাদের নিত্যকর্ম হ'য়ে উঠল গান শেখা ও গানের আলোচনা—চারজনে মিলে।

এ-সূত্রে অনেক কিছুই শিখেছিলাম, সেসব যথাপর্যায়ে বলা যাবে। উপস্থিত কেবল একটা কথা একটু জোর দিয়েই ব'লে রাখতে চাই যে, সঙ্গীতের চর্চা করতে করতে আমার একটি আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হয়েছিল এই যে, শিল্প কলাকারু জাতীয় কোনো সৌন্দর্য সাধনায় যারা সতীর্থ হ'য়ে কাছাকাছি আসে তাদের মধ্যে যেন একটা অভিনব পবিত্র সম্বন্ধ গ'ড়ে উঠতে চায়। সব সময়ে হয়ত স্বভাবের পিছু টানে এ-পবিত্রতা আমরা বজায় রাখতে পারি না, কিন্তু তবু বলব যে, একসঙ্গে গান-শেখা আমার কাছে মনে হ'ত যেন একটা তীর্থযাত্রার সাধনা, যে তীর্থের লক্ষ্য সুদূর হ'লেও সতীর্থদের মধ্যে অন্তরঙ্গতার যে-পবিত্র আবহটি ঘন হ'য়ে গড়ে ওঠে তার মূলেও ঐ লক্ষ্যের আকর্ষণ সক্রিয় হ'য়ে ওঠে পদে পদেই। অর্থাৎ এ-টানের ইসারা আসে অলক্ষ্য সুদূর থেকে। আমাদের দেহমনের কোনো অতি-প্রত্যক্ষ স্থূল তাগিদ থেকে নয়। সে-ইসারা যেন—কী বলব—সতীর্থদের মধ্যে এক নব ভাবরাজ্যের টান গ'ড়ে তুলে তাদের গতিবেগ দেয়, যেমন সূর্যের টান গ্রহ উপ-গ্রহের মধ্যে জন্ম নিয়ে তাদের পরিক্রমা করায়।'

সোফিয়া (খুশী হ'য়ে): কথাটা শোনাচ্ছে চমৎকার দাদা, মানতেই হবে—যদিও খতিয়ে টিঁকবে কি না জানি না। কিন্তু সে যাই হোক, আপনাদের ঘুমের দেশেও তাহ'লে শুধু ঘুমেরই জয়জয়কার নয় দেখা যাচ্ছে—কেননা এ হেন ভাবরসও তো গ'ড়ে ওঠে সেখানে—অন্ততঃ কারুর কারুর মনোলোকে।

অসিত: বটে, কেবল মনে পড়ে একদা এ-উপমাটা মূর্ছনাকে বলতেই সে পিঠ পিঠ জবাব দিয়েছিল স্বরচিত একটি কবিতা আবৃত্তি ক'রে এ-আদর্শবাদকে "মাটিছাড়া" নাম দিয়ে:

How shall I deal with thee, my soul ?
In the womb of earth thou gropest blind ;
But when I send thee a rocket of sky,
Thou leavest the mortal life behind.

সোফিয়া: বলেন কি দাদা? মূর্ছনা ইংরাজীতে কবিতা লিখতে পারত?

অসিত: ওরা দুই বোন যে শৈশবে শিক্ষা পেয়েছিল লণ্ডনে। দেশে ফিরেও সাহেব সুবোর সঙ্গেই মিশত বেশি—যদিও শমিতা সাধুজি আসার পরে ক্রমশঃ নিজেকে একটু গুটিয়ে নিয়েছিল—কী ভাবে, পরে বলছি। মূর্ছনা তাদের সঙ্গে বল-ডান্সেও যোগ দিত। কিন্তু এবার বলি শোনো ওদের কাহিনী, তাহ'লেই বুঝবে।

পাঁচ

বলেছি প্রথমেই যে, বাসন্তীপুরে আমরা তিনজনে সাধুজির কাছে একসঙ্গেই গান শিখতাম—প্রায় যেন এক ক্লাসের পড়া। সেই সূত্রেই ক্রমশ: এ-দুইবোনের স্বভাব ও মতিগতির পরিচয় পেয়েছিলাম। তাই চোখে পড়ল বই কি যে, শমিতা ছোঁয়া দিলেও ধরা দেয় না—খানিকটা আলগোছেই মেশে, গান শেখে, হাসি গল্প করে—কিন্তু ব্যবধান বজায় রেখে। তারপরে আরো দেখতে পেলাম যে,সংসারটা ও-ই চালায়—ওর মা— মন্ত্রীজায়া মেমসাহেবা, ঘোরেন ফেরেন তাঁর নিজের তালে—ফ্যাশনের সমাজে। মূর্ছনা মা-র এই ইঙ্গবঙ্গ চালটিই আয়ত্ত করেছিল। তাই সংসারে থাকলেও সে সংসারকে—মানে লোকমতকে—উপেক্ষা ক'রেই চলত। শমিতা এজন্যে ওকে কিছু বলা দূরে থাক, যেন প্রশ্রয়ই দিত উড়ুক্কু হ'য়ে চলতে—খুশ-খেয়ালে। বলত: "কুটনো-কোটা বাটনা-বাটার জন্যে তো মৃন্ময়ী আমরা আছিই ভাই, তুই আকাশের পাখী, আকাশেই চ'রে বেড়া না।" আমার সত্যিই অবাক লাগত দেখে যে, শমিতা সংসারের সব গুরুভার বহন করত হাসিমুখে—যেন শুধু বোনটিকে আরো মুক্তি দিতে চেয়ে। তাই মূর্ছনাকে ও কখনো গানের ক্লাস কামাই করতে দিত না। কাজের চাপ বেশি পড়লে নিজে আরো এগিয়ে এসে সব ভার নিয়ে ওকে দিত সামনের দিকে ঠেলে: যা।

ফলে হ'ল এই যে, মাঝে মাঝেই শমিতার অনুপস্থিতিতে মূর্ছনা একটু একটু ক'রে আমার কাছে এসে পড়ল। কখনো কখনো পীতবাসও হয়ত থাকতেন না, কি ধ্যানে বসতেন। একবার ধ্যানে বসলে তিনি তো সহজে উঠতেন না, কাজেই তাঁর বাংলোর বারান্দায় ব'সে বা মাঠে বেড়াতে বেড়াতে মূর্ছনার সঙ্গে নানা কথাই হ'ত।

একদিন এমনি এক নিরালা সন্ধ্যায় আমাদের কথা-লাপ মোড় নিল একটু গভীরের দিকে। কথায় কথায় শমিতার প্রসঙ্গই উঠল ফের। হঠাৎ কী যে হ'ল—আমি শমিতার চাল চলনের একটু প্রশংসা করতেই ওর কণ্ঠস্বরে এসে গেল—ঠিক তাপ নয়, তবে ঝাঁঝ বললে হয়ত ভুল হবে না। যা বলল তার চুম্বকটুকু বলি সংক্ষেপে—যতটা পারি ওরই ভাষায়। যদিও এ-কথালাপটা উদ্ধৃত করা উচিত ছিল পরে—যথাপর্যায়ে। কিন্তু প্রসঙ্গটা যখন এসে গেছে আগেই ব'লে ফেলি, কে জানে পরে যদি বলতে ভুলে যাই?

ছয়

মূর্ছনা বলল: "আমি যখন সরলা ছিলাম অসিত, ভাবতাম যে, মাতালের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করলে বুঝি মনটা গড়ায় নেশারই ঢালুপথে। অনেক সময়েই এটা হয় অবশ্য। কিন্তু জীবনের মজা এই যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার ঠিক উল্টোটাই ঘটে।

"আমার আর দিদির দৃষ্টান্ত পাশাপাশি নিলেই চোখে পড়বে এই উল্টোপাল্টামি—অর্থাৎ একই প্রভাবের বিপরীত পরিণাম: যে-সাহেবীয়ানার ধাক্কা আমাকে রওনা ক'রে দিল বিলিতি গায়ে ফুঁ দিয়ে চলার দিকে, ঠিক সেই ধাক্কাই দিদিকে ক'রে তুলল তিরিক্ষি—ও বেঁকে ব'সে রওনা হ'ল একেবারে উলটো মুখে।" বলতে বলতে ওর মুখে ফুটে উঠল দ্ব্যর্থক হাসি, "ওকে দেখলে কে বলবে বলো দেখি যে ওর জন্মদাতা হলেন সাহেবিয়ানার মাষ্টার-স্পীস আর গর্ভধারিণী একেলিয়ানার প্রাইমা দন্না?"

আমি বললাম: "কিন্তু ওর এ চালচলনে তোমাদের বাবা মা আপত্তি করতেন না?"

"করলে হবে কি অসিত? সংসারে এককণা নীরব দৃঢ়তার কাছে যে একরাশ ফিঁকে কলকলানি কত সহজে হার মানে এ আমরা চাক্ষুষ করলাম দিদিরই দৃষ্টান্তে। অথচ ওর লড়াইয়ের পদ্ধতি ছিল আশ্চর্য। বিদ্রোহ তো দূরের কথা—ও তর্কাতর্কি বচসা বাগ্বিতণ্ডারো ধার দিয়ে গেল না—মুখ বুঁজে স্রেফ নিজেকে নিজে গুটিয়ে—কতকটা কচ্ছপের ঢঙেই বলব দেখা গেল

তখন এক অপরূপ দৃশ্য: আমরা যতই সিগারেট খাই, টয়লেট করি, টেনিস খেলি, নেচেগেয়ে বেড়াই, ও ততই চুড়ি খোলে, নিরামিষ ধরে, বই মুখে ক'রে ব'সে থাকে—আর সে কী বিদ্যানুরাগ—যেন সরস্বতী জন্ম নিলেন ওর মগজে!"

আমি টুকলাম: "সাক্ষাৎ দিদিকে এভাবে খোঁচা দিতে আছে?"

ও বলল: "খোঁচা দিই কি সাধে অসিত? দিই বড় দুঃখেই। দেখ, ভালো মেয়ে হওয়া খুবই ভালো—কিন্তু সংসারটা এমনই এক বিচিত্র ডেরা যে এখানে ভালো যদি দুর্দান্ত ভাবে ভালোই হ'তে থাকে তবে দেখবে কখন তার সোজা ডিঙি গেছে স্রেফ উল্টে। তবু দিদি যদি bookworm হ'ত তাহ'লেও আমাদের এত আপত্তি হ'ত না—কিন্তু ব্যাপারটা যে ক্রমশ: হ'য়ে দাঁড়ালো রোখালো কুণোমি—যার ফলে ও এ-জগৎটার সঙ্গে ব্যবহার করত যেন সে একটা বানের জলে ভেসে আসা, ঘুনশিপরা, উল্কিকাটা হাঘরে ছেলে যাকে ছুঁয়েছ কি তোমার গায়ে মাছি বসেছে। ওর সে শুচিবাই চোখে তো দেখনি—দেখলে বুঝতে। ও ঘরকন্নার মাঝখানে ধীরে ধীরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগল যেন এক মূর্তিমতী নন্-কো অপারেটিং বৈরাগিণী হ'য়ে। সাপেরও তার পুরোনো খোলস ছাড়তে মায়া হয় কিন্তু ওর এতটুকু মায়া হ'ল না আমাদের সঙ্গ বর্জন করতে! গুণ ওর অজস্র—কিন্তু বলো তো গুণেরও কি বাড়াবাড়ি নেই? অবিশ্যি ছেলেবেলায় আমরা 'এইটে কালো ঐটে সাদা, এইটে ময়ূর ঐটে গাধা' ব'লে চলতি ফ্যাশনে সায় দিয়ে একে ওকে তাকে লেবেল মারি—মানি। কিন্তু একটা সময় আসেই আসে যখন দেখা যায় যে, সংসারে যেমন নিরবচ্ছিন্ন মন্দও নেই, তেমনি নিরবচ্ছিন্ন ভালোও থাকতে পারে না। ভালো বলব তাকেই যে পাঁচটার সঙ্গে সই পাতিয়েও অধোমুখী মতিগতিগুলিকে উপর দিকে টেনে তুলতে পারে খানিকটা। মন্দকে বর্জন করা ভালো নয়, একথা অবিশ্যি বলছি না, কিন্তু সে বর্জনেরও একটা সীমা আছেই' আছে—যেটা পেরিয়ে গেলে ভালো মেয়েমি হ'য়ে ওঠে শুচি বেয়েমি।—বেশি ক'রেই।"

"বেশি ক'রে কেন?"

"কারণ মেয়েরাই হ'ল সংসার-যন্ত্রের সব চেয়ে মসৃণ কব্জা lever। পুরুষরা খানিকটা এলো ভোলা কাটা-ছেঁড়া হ'য়েই থাকে। আমাদের মেয়েদের পরেই যেন বিধাতা পুরুষ ভার দিয়েছেন তাদের আলগামিকে শক্ত ক'রে হাজারো দায়িত্ব চাপিয়ে সংসারটাকে টেঁকসই করে তোলবার। তাই ওর ভালো মেয়েমিতে ঠিক আমার আপত্তি নয়, আমরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম যখন ও গুরুদেবের দেখাদেখি আরো আরো আরো ভালো হ'তে হ'তে শেষটায় ওর শোবার ঘরটাকে পর্যন্ত করে তুলল পুজোর ঘর।"

"পুজোর ঘর?"

"তাছাড়া কী বলবে বলো?—যখন সে-ঘরও সাজালো স্রেফ সাধু সন্তদের ছবি দিয়ে, শেলফে রাখল রাজ্যির ধর্মগ্রন্থ হয়ত একটা বিগ্রহও বসাত যদি না সেখানে বাবা বেঁকে ব'সে বলতেন: no idolatry in my household, if you please!—মরুক গে, এসবের ফলে হ'ল কি—ওকে আমরা যেন আর ঠিক বুঝতে পারি না। ভালোবাসি বৈ কি—কিন্তু ওর সঙ্গে মিশতে গিয়ে দেখি কেমন যেন রস কি সুখ পাই না—এমন কি, ওকে যেন আমরা একটু—কি বলব—হ্যাঁ ভয়ই করি—অন্তত বাবা আর আমি।"

"আর মা?"

"একমাত্র তিনিই হয়ত ওকে একটু বোঝেন বা। কেন না—জানি না ঠিক ওর হ'য়ে লড়েন তো দেখি একা তিনিই—আর এ-ও এক কম আশ্চর্য নয় অসিত! কারণ বাইরের দিকে মা-র মিল আমার সঙ্গেই বেশি—অথচ কেন যেন আমার সঙ্গে তাঁর কোনো অন্তরের মিলন খুঁজে পাই না, যেমন পাই—ধরো, বাবার সঙ্গে। মানে, তাঁকে আমিই বুঝতে পারি—চিনি, যেমন তিনিও আমাকে বোঝেন, চেনেন।"

"চেনেন তো?" বললাম হেসে।

ও-ও হাসল: "অতটা কাঁচা আমাকে না-ই ভাবলে। আমি বলতে চেয়েছি—মানুষের মানুষকে যতটা চেনা সম্ভব—বিশেষ রক্তের সম্বন্ধের বাধা থাকলে।"

"বাধা বলছ কেন?"

বেপরোয়া মেয়ে ওর ডাগর তীক্ষ্ণ চোখ দুটি আমার

চোখের 'পরে রেখে জবাব দিল অকুতোভয়েই : "সংসারে কারা আমাদের সবচেয়ে পর অসিত ? আমাদের নিকট আত্মীয়েরাই নয় কি ? অথচ তাই ব'লে তারা ভালোবাসে না বললে নিশ্চয়ই অত্যুক্তি হবে। ভালোবাসে বৈকি—কিন্তু চেনে কবে ? আত্মীয়তার অতি পরিচয়ের অভিমানই যে হয় আস্তানা—নয় কি ? যেখানে বজ্র আঁটুনি সেখানেই না ফস্কা গেরোর লীলাখেলা !

"কিন্তু বাবার সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা ঠিক আত্মীয়ের সম্বন্ধ নয়। তিনি আমার বন্ধু—হ্যাঁ, বন্ধু বলতেই ইচ্ছে করে, তবে হয়ত," ওর প্রফুল্ল মুখখানির উপরে হঠাৎ কেমন যেন একটা উদাস ছায়া পড়ে, "তবে হয়ত সেটা এইজন্যেই যে, বন্ধু বলতে আমার কেউ নেই। যাক, যা বলছিলাম। সত্যি অসিত, আমার খুব অবাক লাগে ভাবতে—কেমন ক'রে দিদি মার এত কাছে আসতে পারল আর আমিই গেলাম দূরে স'রে !"

আমি চুপ ক'রে রইলাম। কী বলব এর পরে ? ও ই ব'লে চলল : "আমিও প্রথমে দিদির'পরে বিরক্ত হ'য়েছিলাম, হয়তো মা সদাসর্বদা ওকে আগলাতেন দেখেই। বাবা তো রেগে আগুন ! কিন্তু কী করবেন বলো ? একদিকে মা, অন্যদিকে দিদি কি মুখ খুলে ভুলেও প্রতিবাদ করবে যে, ওকে শায়েস্তা করবার প্রশ্ন উঠবে ? কাজেই যতই দিন যায়, ঐ যে বললাম—শামুকের মতনই ও নিজেকে গুটিয়ে নিতে থাকে—নিজের মন-বাগানের কোন এক নিরালা শাখায় পরিপাটি ক'রে গুটি বাঁধতে। ক্রমে এই গুটি হ'য়ে উঠল গুহা গোছের, দুর্গ বললেও হয়ত বেশি বলা হবে না। তখন আর ওকে সেখান থেকে টেনে বার করে কার সাধ্যি ? আমরা তো ওর আশা একরকম ছেড়েই দিয়েছিলাম। এখন ফের একটু যা আশা হচ্ছে সে শুধু এই জন্যে যে, ও গান শিখতে একটু আধটু বেরোচ্ছে বাড়ী থেকে। বলতে কি, মা যে এবছর ফের বিলেত গেলেন তারও মূলে ছিল ওঁর এই অভিমান যে ও কিছুতে তাঁর মতে চলে না।"

"কিন্তু অভিমান কেন ?"

"তুমি কি জানো না অসিত যে, সংসারে যেখানে মানুষকে পাঁচজনের সঙ্গে মিলে মিশে থাকতেই হয় সেখানে যদি একজন হঠাৎ নিজেকে এভাবে বিচ্ছিন্ন ক'রে নেয় তা হ'লে সে দূরত্বটা বাকি সবাইকে কতখানি বাজে ? একটা জড় ইমারত খাড়া রাখা শক্ত হয় যদি একটা কড়ি বরগাও আলগা হ'য়ে আসে আর একটা জলজ্যান্ত ঘরকন্নার আদরিণী দুলালী চিপ দিলে সংসারটা টলমল ক'রে উঠবে না ?"

আমি অপ্রতিভ হ'য়ে বললাম : "তা বটে, কিন্তু তোমার বাবা জোর করলেন না কেন ?"

"করতেন প্রথম দিকে। কিন্তু সেখানে আবার গোল বাধল যে ঐ মাকে নিয়েই। সংসারে বিশৃঙ্খলা আসে তো আমাদের মধ্যে এই ধরণের হ-য-ব-র-লর দরুণই। তাই মজা দেখ—যে-মা ক্রমাগতই চাইতেন যে মেয়ে গেরুয়া ছেড়ে বঁধুয়াকেই বরণ করুক, সে-ই মা-ই বাধা দিলেন যখন বাবা দিদির নির্মম বৈরাগ্যের মোক্ষম চিকিৎসা করতে উঠে প'ড়ে লাগলেন। তবে বাধা দেবার একটা কারণ ছিল এই যে, এ-ধরণের আদিখ্যেতা মার দু'চক্ষের বিষ হ'লেও তিনি দিদিকে কোথায় একটুখানি সত্যি ভালোবাসতেন। এখানে কিন্তু আমি গড়পড়তা মাতৃস্নেহের কথা বলছি না—বলছি সেই ভালোবাসার কথা যার তলায় আছে দরদ আর শ্রদ্ধা। নইলে কি আর মা-ও দিদিকে অমনধারা সমীহ ক'রে চলতে পারতেন ? না, ওকে পুরোপুরি বুঝতে না পারা সত্ত্বেও (কিম্বা হয়ত বুঝতে না পারার দরুণই) ওকে পদে পদে আগলে চলতেন ? এতে বাবা প্রথম প্রথম আপত্তি করতেন, কিন্তু মা উঠতেন রুখে, বলতেন : তোমার কর্তামি খাটাতে চাও তো আর এক মেয়ে তো রয়েইছেন যিনি তোমার আদরিণী, মাথার মণি এ মেয়েটি আমার এর মাথাটিও না-ই বা খেলে ? কাজে কাজেই দেখছ, দশচক্রে প'ড়ে দিদি পেয়ে গেল নিষ্কৃতি, আর তার ফল কী হ'ল তা-ও বুঝতেই পারছ : প্রথমটায় মা-ই ওকে আশ্রয় দিলেন বটে, কিন্তু শেষটায় ওর চরিত্রের দৃঢ়তাই জাগালো শ্রদ্ধা—এমন শ্রদ্ধা যে, বাবা-যে-বাবা—রাগলে যাঁর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না বললেই হয়—তাঁর রাগের আগুনও দিদির মৌন দৃঢ়তার সামনে ধুঁকতে ধুঁকতে গেল নিভে। তাই একদিন আমি দিদিকে ঠাট্টা ক'রে ছড়া বানিয়েছিলাম :

How can our passions' flickers last,
Unfanned by life's fool, furious blast ?

সত্যি অসিত—" বলতে বলতে ওর ঠোঁটে ঝিলিক দিয়ে

উঠল ফের সেই শাণিত হাসি—"দিদি দেখতে ভালোমানুষ বটে, কিন্তু আসলে শেয়ানা গিন্নির ঠানদি : তাই ও বুঝেছিল যে ক্রুদ্ধ ঝড়ের জবাব তর্কের ঝাপটা নয়—বোবা নৈপুণ্য। আর যেহেতু nothing succeed like success সেহেতু দিদির প্রতিপত্তির দর বাড়তে না বাড়তে ওর চাল চলনেরও কদর হ'ল। না হ'য়ে পারে? ও মা! ক্রমশ দেখি—ওর পাড়হীন শাড়ী, খালি পায়ে চলা, চুপচাপ থাকা—এসবই কেমন যেন আমাকে ধমকাতে থাকে বোবা ভাষায়! তবু স'য়ে ছিলাম, কিন্তু শেষে গা জ্বালা ক'রে উঠল দেখে যে, মা-যে-মা তিনিও গাউন ছেড়ে শাড়ী ধরলেন। শান্তিরও তো ছোঁয়াচ আছে। সবচেয়ে আশ্চর্য হলাম আমি নিজেই যেদিন ওর দেখাদেখি পিয়ানো ছেড়ে বাংলা গানের গোয়ালে মাথা মুড়োলাম।"

"তখন ও নিশ্চয় নরম হ'ল?"

"দিদি সেই মেয়ে কি না! ও টলাবে অপরকে, কিন্তু ওকে কেউ একচুল নড়াক তো দেখি! ঈ—শ্! আমাকে ও বাংলা গান ধরালো, কিন্তু আমি হাজার পীড়াপীড়ি করাতেও ও নিজে পিয়ানোর ছায়া পর্যন্ত মাড়ালো না। এমন কি আগে আগে আমার সঙ্গে যে একটু আধটু ডুয়েট গাইত তা-ও দিল ছেড়ে। সোজা একগুঁয়ে মেয়ে ও! ভাগ্যে যাও নি ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে—গেলে কী যে হ'ত তোমার অদৃষ্টে!"

এ সব কথা শুনতে এতক্ষণ সত্যিই ভালো লাগছিল। কারণ আমার মধ্যেও আছে একটা 'র'য়ে-স'য়ে'-র মনোভাব। তাই এত বেশি স্বদেশিয়ানা আমারও ভালো লাগছিল না—আরও এই জন্যে যে, ভালো-মেয়েমিরও বেশি দেখানেপনা আমি পছন্দ করি না, সহজিয়া মনোভাবই বেশি ভালোবাসি। ডিগনিটির stiffness—আমার চক্ষুশূল।

এ হেন সময়ে মূর্ছনা ঐ শক্তিশেল হানতেই আমার সমস্ত মনটা শক্ত হ'য়ে উঠল। আমি কণ্ঠের পরুষতাকে শুধু একটু পালিশ দিয়ে বললাম : "আমার অদৃষ্ট নিয়ে অত মাথা না ঘামালেও এ-যাত্রা এক রকম ক'রে হয়ত ত'রে যাব মূর্ছনা।"

ওর মুখের আলো নিভে গেল মুহূর্তে, বলল : "কী? —রাগ করলে?"

আমি সামলে নিয়ে ধরলাম ঈষৎ শ্লেষের সুর, বললাম : "না না—রাগ করতে যাব কেন? আমার কথাটা এই যে আমার অদৃষ্টের ফুলশয্যার জন্যে মৃন্ময়ীই ভালো, চিন্ময়ীদের জন্যে যখন স্বয়ং মহাদেবই রয়েছেন স্বয়ম্বর হ'য়ে।"

"অমন ক'রে ঠেকা দিয়ে কথা কয় না, ছি!" বলল ও, "ও যে সত্যি তোমাকে অপছন্দ করে তা নয়—"

"যেতে দাও ও কথা মূর্ছনা। কে কাকে পছন্দ করে না করে সে আলোচনায় ফলই বা কী বলো? তার চেয়ে বরং আলোচনা করা যাক তোমার গান শেখা নিয়ে।"

"কী আলোচনা?"

"ধরো যদি জিজ্ঞাসা করি—তুমি গানই যখন শিখতে আসরে নেমেছ তখন একটু ভালো করেই শেখো না কেন?—মানে, মন দিয়ে?"

"আমার নিষ্ঠা নেই যে, দেখতে পাও না? আমি হচ্ছি—বলে না jack of all trades—তাই। হয়েছে কি, আমি সবই বেজায় ভালোবেসে ফেলি, তাই না পারি এর জন্যে ওকে ছাড়তে, না ওর জন্যে একে। আমার পিয়ানোও বাজানো চাই, বেহালায় হাত পাকানো না হ'লেও নয়, বিলিতি গানও আমি ছাড়তে পারিনে, আবার দিশি সুরও আমার কাছে মৃতসঞ্জীবনী—বৈঠকি আসরও চাই, আবার ক্লাবে সভায় আনাগোনা না করলেও উঠি হাঁপিয়ে। এক কথায় আমি হলাম the spoilt child of the family, আবদেরে মেয়ে—par excellence."

সোফিয়া : আবদেরে হোক বা না হোক, চটকদার মেয়ে মানতেই হবে।

অসিত : যা বলেছ দিদি, চটক চটক, ঐ কথাটিই আমি খুঁজছিলাম। আর ঐ সঙ্গে জুড়ে দাও সর্বগুণাধার, তা হলেই মূর্ছনার কাঠামোর খানকটা হদিশ পাবে, কারণ ওর স্বভাব ছিল এই সব কিছুতেই থাকা। তাই ও যেখানেই যাবে ধূমধাম উঠবে জেগে ওকে কেন্দ্র ক'রে। কারণ ও জানত সেই দুরূহ আর্টটি যা খুব কম মেয়েই জানে, কি না নিজেকে দু হাতে বিলোতে।

বার্বারা : কিন্তু একটা কথা, দাদা! নিজেকে দুহাতে বিলোতে মেয়ে চাইলেও বাপ-মা তো সব সময়ে চান না। তাঁরা বাধা দিতেন না?

অসিত : বাধা দেবেন কী দুঃখে ? ওদের সংসারে যারা আসা-যাওয়া করত তাদের সঙ্গে মূর্ছনার যোগসূত্রের বন্ধন ছিল যে তেম্নি সহজ যেমন পাখীর থাকে নীড়ের সঙ্গে, মেঘের তুষার-শিখরের সঙ্গে। মন্ত্রী সাহেবের মেহমান বন্ধু অভ্যাগত পতাকাবাহীর সংখ্যা যে কম ছিল না এটা অনুমেয়। তাদের হোস্টেস ছিল তো ও-ই। শ্রীমতীর নিত্যমুখর রংমহলে আতিথেয়তার রংমশাল আর কেউ এমন সহজে জ্বালাতেই বা পারবে কেন ?

অথচ আশ্চর্য এই যে এ-আলোর খোরাক জোগাত যে সেই রইল পর্দানসীনা। অতিথিদের পরিবেষণ করবার ভার নিল অবশ্য মূর্ছনা, কিন্তু বহনের ভার নিয়েছিল শমিতাই। কাজেই ওদের আনন্দের পতাকায় হাওয়া তুলত যে-মানুষটি সে অতি প্রত্যক্ষ হ'লেও সে-পতাকা দাঁড়াত যে-খুঁটির জোরে তাকে দেখতে পেত না কেউই।

[ক্রমশঃ

পঞ্চাশোর্দ্ধের প্রতি

শ্রীবিভূতিভূষণ চক্রবর্ত্তী

সে কি কথা ! পথ ছাড়ো, মোরে তুমি যেতে দাও !
এখনও আমারে তুমি তব কাছে পেতে চাও ?
হ'লই বা স্বামী স্ত্রী ? প্রিয়া আমি নহি আর !
বয়স কি হয়নি ? ভুলে গেছ সে কথার ?
কিবা চাও মোর কাছে ? ভালবেসে কাছে বসা ?
মরমে যে মরে যাই ! এ যে তব দুরাশা !
চাও তুমি অতীতের সেই মৃদু গুঞ্জন !
সেই কত রাত জাগা, গান গাওয়া গুন্‌গুন্ !
পুলকের চাপা হাসি, পাশাপাশি বসে থাকা !
চ'খে চ'খে চাওয়া আর, হাতখানি ধ'রে রাখা !
এখনও কি ঐ সব মোর কাছে পেতে চাও ?
ছি ! ছি ? লাজ নেই ! সে কথা সব ভুলে যাও !
কি কহিলে মোরে তুমি ? আমি বড় নিঠুর ?
প্রেম প্রীতি ভালবাসা সরে গেছে বহুদূর ?
সুকোমল বৃত্তি আজ কিছুই নাহিক মোর ?
আছে শুধু ঝংকার, শাসন-দুর্বার ?
জান যদি তবে কেন কর এত খোসামোদ ?
কেন শুধু জোড়হাত, অনুরোধ, উপরোধ ?
ভিখিরির মত মাগো, ছি ! ছি ! কি ঘেন্না !
বড় বড় ছেলে মেয়ে, দেখিতে কি পাও না ?
পায়ে ব্যথা, মাথা ধরা, কাশি আর সর্দি !
আমি তো করি না ত্রুটি, ডেকে আনি বদ্দি।
কি বলিলে ? ও সময়ে মোরে তুমি কাছে চাও !
কি করিতে পারি আমি ? মোরে তুমি সমঝাও।

তব দুঃখেতে আমি নহি আর উতরোল ?
মোর কথা বুঝিবে না ! শুধু তুমি কর গোল।
মোর কথা সদা হয় তীক্ষ্ণ ও তিক্ত ?
হৃদয়েতে হানে যেন ছুরিকা বিষাক্ত ?
তুমি চাও তব পাশে সদা আমি বসে থাকি !
রান্না না হ'লে পরে, বৃথা হবে হাঁকাহাঁকি।
এত করে মোরে যদি কেহ কভু দুষিত,
ফিরে নাহি চাহিতাম, পায়ে ধরে সাধিত।
নিত্য তোমারে বলি নিলাজের নাহি লাজ !
মোরা হলে ম'রে যাই, সে কথায় কিবা কাজ !
গৃহিণী এখন আমি ! মোরে চাও কি আগে ?
যৌবনের দিনগুলি, আর কভু ফিরে আসে ?
বলিহারি যাই আমি ! ছাড় মোরে, হ'ল বেলা,
তব সনে বকে' বকে' শুখায়ে গিয়াছে গলা॥
জানি আমি স্ত্রীলোকের স্বামী সেবা ধর্ম্ম !
করি নাকি তব সেবা ? কে বা বোঝে মর্ম্ম !
যত খুসি রাগ কর, মোরে আর বোলো না।
ক্ষমা কর মোরে তুমি, আমি আর পারি না॥
বুঝিতে চাওনা তুমি, সেই মোর বড় দুখ্।
হায় তব এ কি মোহ ! আজও তুমি চাও সুখ !
শেষ কথা শুন মোর, হও তুমি প্রবীণ।
একে একে শেষ হয়, জীবনের গোনা দিন॥
মোর কথা যদি মান, যদি নিজ হিত চাও।
অতীতেরে ভুলে গিয়ে, বিভু পদে মন দাও॥

আমার প্রথম শ্রীঅরবিন্দ দর্শন

ঋষভচাঁদ

"সে আজিকে হ'ল কত কাল তবু যেন মনে হয় সেদিন সকাল।"

১৯৩১ সালের কথা। প্রায় চৌত্রিশ বছরের প্রশস্ত *ব্যবধান সঙ্কুচিত হয়ে যেন একটা কম্পিত কাল-বিন্দুতে পরিণত হয়েছে। অতীত যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে* বর্তমানের মধ্যে, আজ অবশিষ্ট আছে তার একটা ক্ষীণ আবছায়া মাত্র। *তবে কেমন করে বর্ণনা করি সেই সুদূর অতীতের অনুভূতি? কেমন করে ব্যক্ত করি সেই অভূতপূর্ব আনন্দ? সেই বিস্ময়-বিহ্বল আবেশ, সেই পুলক-শিহরিত আত্মোন্মেষ, যা হয়ত অনুভব করেছিলাম* আমার চিরকাম্য, চির উপাস্য শ্রীঅরবিন্দের প্রথম দর্শনে? যে হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলাম, যে মন দিয়ে বোধ করেছিলাম, তাদের যে আজ খুঁজে পাই না; তাদের স্বরূপ ও প্রতিক্রিয়া যেন আমার চেতনার অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে গেছে! বর্তমান মন ও হৃদয় দিয়ে অতীতের সেই তলায়িত অনুভবের পরীক্ষণ সম্ভব নয়। সাহিত্যিক এ ক্ষেত্রে কল্পনার সাহায্য নিয়ে থাকেন, কিন্তু তাতে যে শুধু সত্যের অপলাপ হয় তা নয়, তিনি যা সৃষ্টি করেন তা হয় কল্পনা-রঞ্জিত রম্য সাহিত্য, জীবনস্মৃতি নয়।

তবে আমার একমাত্র সম্বল ও উপায় আমার মনের স্মৃতি। কিন্তু চেতনা যেখানে বদলে গেছে সেখানে মানসিক স্মৃতি উদ্ধার করতে পারে অতীত ঘটনার একটা অস্পষ্ট রূপকথা, একটা কাঠামো বা কঙ্কাল মাত্র। হৃদয়-বীণায় একদিন যে সুর সহসা স্বতঃস্ফূর্ত ঝঙ্কারে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছিল স্মৃতির দরদালানে তার অনুরণন আজ আর শোনা যায় না।

অতএব কল্পনার ইন্দ্রজাল থেকে স্মৃতিকে যতদূর সম্ভব মুক্ত রেখে, সেই চৌত্রিশ বছর আগেকার অনুভব ও অভিজ্ঞতার একটা সংক্ষিপ্ত রূপচিত্র আঁকবার প্রয়াস ক'রব এখানে।

দু'মাস শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে থাকার অনুমতি পে কলকাতা থেকে রওনা হ'লাম। জানুয়ারী ও ফেব্রুয়া এই দুই মাস আশ্রমে থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারীর দর্শনে পর মার্চের গোড়ায় ফিরে আসবো, বাইরের দিক থে এই ছিল ব্যবস্থা। কিন্তু আমার অন্তরে ছিল অন্য সঙ্ক সেখানে আমি দেখেছিলাম অন্য স্বপ্ন। আর ফিরব না ফিরব না সেই তপঃপূত সাধনক্ষেত্র থেকে বাসনাক্লিষ্ট প্রাকৃ *জীবনের মসীলিপ্ত পরিবেশে—এই ছিল আমার নিভৃততম অন্তরের অটল সঙ্কল্প। কেউ জানত না, কারণ কাউকে বলি নি। কাপড়-চোপড়, বই, টাকাকড়ি প্রভৃতি যা' সঙ্গে নিলাম তা' থেকে কেউ সন্দেহ করতে পারে নি* যে এই আমার অগস্ত্য-যাত্রা। ষ্টেশনে এল অনেকে আমায় বিদায় দিতে, হাসি-মুখে বিদায় নিলাম। লক্ষ্য করলাম কেবল বাবার চোখের কোণে পতনোন্মুখ এক ক্ষুদ্র অশ্রুবিন্দু। অন্তরের অব্যক্ত ভাব প্রেমের কাছে আত্মগোপন করতে পারে না! যা হোক্ ঈষৎ ব্যস্ত ও বিচলিত হ'য়ে প্রণাম নিবেদন ও বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে আমি গাড়ীতে উঠে বসলাম। গাড়ী ছেড়ে দিল। কত মাঠ, কত বন, কত সরিৎ-সরসী পার হয়ে হুহু ক'রে চলল আমার গাড়ী আমায় নিয়ে কোন অজানা লোকের অচিন দেবতার চরণতলে! এমনি করে তৃতীয় দিন সকালে পৌছলাম মাদ্রাজ ষ্টেশনে। মালপত্র নিয়ে নেমে পড়লাম। কুলীকে বললাম কাছে কোন ভাল হোটেলে নিয়ে যেতে। হোটেলে থাকতে বা খেতে আমার রুচি হয় না, কিন্তু এ ক্ষেত্রে অন্য উপায় ছিল না, এত দীর্ঘ যাত্রার পর স্নানাহার না করলে চলে না।

হোটেলের দিকে যাচ্ছি এমন সময় কোট-প্যান্ট পরা এক মাদ্রাজী ভদ্রলোক কাছে এসে ব'লল: "স্বামী, চলুন মাদ্রাজ সহরটি দেখিয়ে নিয়ে আসি।" পণ্ডিচেরী যাব শুনে বলল, পণ্ডিচেরীর গাড়ীর ঢের দেরী আছে, সহর

দেখার পর যথেষ্ট সময় থাকবে। "স্বামী" সম্ভাষণে (বাংলা দেশে বা ভারতের অন্য কোনো প্রদেশে এ সম্ভাষণের চল নাই) অবাক হয়ে আমি তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। জানতাম যে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে কয়েক বছর ব্রহ্মচারী অবস্থায় থাকার পর, ত্যাগ তপস্যায় যোগ্যতা লাভ হ'লে সন্ন্যাসের দীক্ষা দেওয়া হয় এবং দীক্ষার পর নতুন নামকরণের সঙ্গে নামের আগে "স্বামী" শব্দ জুড়ে দেওয়া হয়। আমার এক বিশিষ্ট বন্ধু কয়েক বৎসর সেখানে ব্রহ্মচারী অভয়চৈতন্য নামে থাকার পর স্বামী পদে উন্নীত হয়, এবং তার নাম হয় স্বামী বিজয়ানন্দ। অথচ এই অপরিচিত মাদ্রাজী ভদ্রলোক অবলীলাক্রমে আমাকে ত্যাগ-তপস্যার হাত থেকে রেহাই দিয়ে সাধনার উপক্রমপর্ব্বেই আমার মাথায় সিদ্ধির স্বামিত্ব-মুকুট পরিয়ে দিল! পারিবারিক স্বামিত্ব বর্জ্জন করতে না করতেই সাধক জীবনের স্বামিত্বে উঠতে পারা কম সৌভাগ্যের কথা নয়, স্বীকার করতেই হ'বে।

যা হোক্ ত্যাগ-তপস্যার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাই না পাই, মাদ্রাজী ভদ্রলোকটির হাত থেকে কোনো রকমে নিষ্কৃতি পেয়ে হোটেলে গিয়ে উঠলাম। প্রাণে আমার তখন তর সয় না। অধীর আগ্রহে পণ্ডিচেরীর ট্রেনে গিয়ে বসে' থাকব মনস্থ করে' তার জন্য নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্মে চলে গেলাম। বহুক্ষণ অপেক্ষার পর—বহুক্ষণের বহুত্ব বোধহয় মোটেই অনুভব করিনি সেদিন—গাড়ী এল এবং আমি মালপত্র সহ চেপে বসলাম। এইবার পণ্ডিচেরী পৌছতে আর দেরী নাই! "Even the longest night has the close", দীর্ঘতম রজনীরও অবসান হয়!

সন্ধ্যার বর্দ্ধিষ্ণু আঁধারে পণ্ডিচেরীতে নামলাম। আমার এক বন্ধু, যে আমার প্রায় বছরখানেক আগে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে এসে' সাধকরূপে থেকে গিয়েছিল, ষ্টেশনে এসেছিল আমায় নিয়ে যেতে। দু'জনে rickshaw-তে ক'রে সমুদ্রের ধার দিয়ে আশ্রমের দিকে চললাম। পথে দেখলাম এক উঁচু আলোকস্তম্ভ (light house) অভ্রান্ত তালে ঘুরে ঘুরে চতুর্দ্দিকে আলোক বিকীর্ণ করছে! দেখেই মনে হ'ল, এ যে শ্রীঅরবিন্দের জীবনব্রতেরই প্রতীক! শ্রীঅরবিন্দও ত এমনি করে তাঁর করুণা সিঞ্চিত জ্ঞানালোক বিকীর্ণ করছেন তমোগ্রস্ত, শোকগ্রস্ত, জগতের চতুর্দ্দিকে!

আশ্রমে পৌছলাম। আমার পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেবের যোগশক্তিবিধৃত আশ্রমে, তাঁর দিব্যজীবন নির্ম্মাণের কেন্দ্র-শালায়।

পণ্ডিচেরী আসার কয়েক বছর আগে থেকেই শ্রীঅরবিন্দ সাহিত্যের সঙ্গে আমার এক প্রকার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। তাঁর Essays on the Gita পড়ে আমি যে শুধু মুগ্ধ ও উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম তা নয়, আমার সমস্ত সত্তা তাঁকে আমার জীবন-নিয়ন্তা গুরুদেব ব'লে বরণ ক'রে নিয়েছিল। আশ্রমের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে পত্রব্যবহার করতাম। শ্রীমায়ের প্রেম ও প্রসাদের প্রথম নিদর্শন স্বরূপ তাঁর "Conversations with the Mother" বইখানা পেয়েছিলাম। শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষা আমার চেতনার পরতে পরতে ওতপ্রোত হ'য়ে গিয়েছিল। তাঁদের উপদেশ ও নির্দ্দেশ অনুযায়ী সাধ্যমত সাধনা করারও চেষ্টা করছিলাম। এমনি ক'রে অন্তরের গভীরতম স্বপ্ন দিয়ে গড়ে তুলেছিলাম আশ্রম ও আশ্রম-জীবনের একটা মনোময় রূপ। পণ্ডিচেরীতে এসে যখন আশ্রম ভাল ক'রে দেখলাম ও আশ্রম-জীবনের যথার্থ স্বরূপের আভাস পেলাম, আমার স্বপ্নরচিত সুরম্য সৌধ চোখের নিমেষে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। এ যে আমার কল্পনার অতীত এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি! এখানে হয় যোগ সাধনা, লক্ষ্য যার মন থেকে মানব গতিকে বিজ্ঞানলোকের সত্যং ঋতং বৃহতে, প্রজ্ঞানঘন অতিমানস চেতনায় তোলা, মানবের মধ্যে ভগবানের আত্মরূপায়ণ ও আত্মপ্রকাশ। অথচ নাই এখানে নিয়মের কোনো বন্ধন, কোনো বাধ্য-বাধকতা, সংঘগত বা সামাজিক কোনো প্রকার গতানুগতিকতা। নাই কোনো দীক্ষা, কোনো নির্দ্দিষ্ট বিধিবদ্ধ সাধনপদ্ধতি। স্বাধীন, স্বতন্ত্র, স্বচ্ছন্দ গতিতে ব'য়ে চলেছে প্রত্যেক সাধক-সাধিকার জীবনধারা কোন্ অন্তহীন, দিব্য সামঞ্জস্যের, কোন্ নবযুগসৃষ্টিক্ষম, বিদ্যুদ্‌গর্ভ পরাসংবিতের, কোন্ অনুপলব্ধ অতিমুক্তির পরমোৎকর্ষের পানে। প্রতিদিন সামূহিক ধ্যান করাতেন শ্রীমা স্বয়ং নিয়মিতভাবে, কিন্তু তাতে যোগ দেওয়া না দেওয়া প্রত্যেকেরই স্বেচ্ছা-সাপেক্ষ ছিল। যার ইচ্ছা, অভিরুচি বা সময় নাই, সে আসত না।

দৈনন্দিন কর্ম্মের মধ্য দিয়ে বাসনা-ত্যাগ ও আত্ম-নিবেদন, সাধনার একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ বলে' গণ্য হ'ত। প্রত্যেকের কর্ম্ম শ্রীমা নিজে ঠিক ক'রে দিতেন। কর্ম্মের মধ্যে উঁচু, নীচু, শ্লাঘ্য-হেয় ব'লে কিছু ছিল না। বাড়ি ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজা, সেলাই করা থেকে আরম্ভ করে' পঠন পাঠন, গান-বাজনা, ছবি আঁকা প্রভৃতি সব রকমের কাজ ভগবানের সেবারূপে করার দিকে প্রায় সকলেরই একান্ত চেষ্টা ছিল। কর্ম্ম বাদ দিয়ে ধ্যান-ধারণা, স্বাধ্যায় প্রভৃতি নিয়ে থাক্‌লে শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণ-যোগের লক্ষ্য যে মানুষের স্থূল প্রকৃতির দিব্য রূপান্তর তা কখনই সম্ভব হ'বে না, এ তথ্য কারুর অবিদিত ছিল না। কিন্তু এ বিষয়েও কোনো নিয়ম, কোনো বাহ্যবিধানের অনড় বাধ্যবাধকতা বা কঠোর শাসন ছিল না। সবাই স্বেচ্ছায় শ্রীমায়ের কাছে কাজ চেয়ে নিত ও আপ্রাণ চেষ্টায় তাঁর সেবা রূপে, "যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম" এই ভাব নিয়ে নিখুঁত ভাবে সম্পাদন করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে ক'রত।

লক্ষ্য ছিল পরম্পরাগত ধ্যান ধারণা সমাধিতে আসক্ত না থেকে গীতোক্ত ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিতে ব্যুৎপত্তিলাভ করা, কারণ জীবনের সমস্ত কর্ম্ম নিষ্কাম ও অনাসক্তভাবে ভগবদুদ্দেশ্যে করতে না পারলে কর্ম্মের মধ্যে মুক্তি ও ভগবানের সঙ্গে তাদাত্ম্য ও সাধর্ম্ম্যলাভ সম্ভব নয়।

এই নিয়ম-শৃঙ্খলহীন, সাবলীল জীবনপ্রবাহের পেছনে দেখতে পেলাম এক অমোঘ ঐশী নিয়ন্ত্রণ, মাতৃশক্তির প্রেমাপ্লুত, হর্ষোজ্জ্বল, অদৃশ্য পরিচালন, যা মানুষের অগোচরে, কিন্তু মানবাত্মার উল্লসিত সহযোগে এই বহু-ভঙ্গিম সংঘজীবনকে সুষম ও সুবিন্যস্ত ক'রে পুরুষোত্তমের পূর্ণতার দিকে নিয়ে চলেছে।

দেখতে দেখতে দু'মাস কেটে গেল। প্রত্যহ সকালে শ্রীমাকে প্রণাম করতে ও সামূহিক ধ্যানে যোগ দিতে যেতাম। দেখতাম শ্রীমায়ের স্মিতাননের প্রেমজ্যোতিঃ অজস্র ধারায় বর্ষিত হচ্ছে সাধক-সাধিকা, অতিথি-অভ্যাগতের উপর। কিন্তু সে কথার অবতারণা এখানে ক'রব না। "রহে যাহা মর্ম্মমাঝে রক্তময়, বাহিরে তা' কেমনে দেখাব?" অতীতের অস্পষ্ট চিত্রপটে চিরভাস্বর নক্ষত্রের মত যে দু'তিনটা অনুভূতি অম্লান দীপ্তিতে জ্বলজ্বল করছে, শ্রীমায়ের প্রথম দর্শন ও সংস্পর্শ তার মধ্যে ধ্রুব-তারার স্থান অধিকার করে আছে। কিন্তু থাক্‌ সে কথা আজ।

২১শে ফেব্রুয়ারী এল।—তখন বছরে তিনদিন দর্শন ছিল এবং এটা তার মধ্যে প্রথম—শ্রীমায়ের জন্মতিথির পরমোৎসব। উৎসব মানে আমোদ-প্রমোদ, ভূরি-ভোজন নয়, চেতনার উন্নয়ন। সকলের জানা ছিল যে প্রতি দর্শনের দিন শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দ কোন ঊর্দ্ধতর আধ্যাত্মিক শক্তিকে নামিয়ে আনতেন। তখন সকালেই দর্শন আরম্ভ হ'ত ও বিকেল পর্য্যন্ত চ'লত। আহার ও বিশ্রামের জন্য দু'তিন ঘণ্টা বন্ধ থাকত। একটা তালিকা টাঙ্গানো হ'ত যাতে দর্শনার্থীদের নাম লেখা থাকত, এবং প্রত্যেকে নিজ-নিজ সময় ও সংখ্যা হিসাবে সারি সারি একের পর একে শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দকে দর্শন করতে যেত। এখনকার মত এত ভিড় হ'ত না তখন। সাধক-সাধিকার সংখ্যা কম ছিল, এবং যাত্রীর সংখ্যাও খুব বেশী হ'ত না। সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলায় একটি নাতিদীর্ঘ সুসজ্জিত কক্ষের মধ্য দিয়ে দর্শন-মন্দিরের দিকে এগিয়ে যেতে হ'ত।

সোপানশ্রেণী পার হ'য়ে প্রথম কক্ষে প্রবেশের একটু পরেই আমার অগ্রগামী দর্শনার্থীদের ফাঁকে ফাঁকে দেখতে পেলাম সামনের একটা অতিক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে—এটাই ছিল তখন দর্শন-মন্দির—সুশোভিত এক সোফায় বসে আছেন শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দ। আশা, আনন্দ, সম্ভ্রম, সঙ্কোচ, আত্মদানের দুর্ব্বার প্রেরণা ও উচ্ছল আবেগ, ভয়, ভক্তি—এই রকম কত বিচিত্র ভাবের সংমিশ্রণে আন্দোলিত চেতনা নিয়ে বোধহয় এগিয়ে চলেছিলাম আমার চিরকাম্য জীবন-বল্লভের দিকে। হঠাৎ দেখি আমার অগ্রবর্ত্তী দর্শনার্থী প্রণাম ক'রে সরে গেলেন, আর আমি দাঁড়ালাম দর্শন-মন্দিরের দ্বারপ্রান্তে শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দের সম্মুখে। কালের ত্রিবেণী যেন মুহূর্ত্তের তরে স্তব্ধ, স্তিমিত হয়ে দাঁড়াল! আমার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত যেন বিলুপ্ত হয়ে গেল! এক মুহূর্ত্ত মাত্র, কিন্তু কে জানত তারই প্রচ্ছন্ন গর্ভে নিহিত রয়েছে সনাতনত্ব, মহাকালের শাশ্বত হাতছানি?

মুহূর্ত্তের আত্মবিস্মৃতির ঘোর কাটতেই শ্রীঅরবিন্দকে চকিতের তরে স্থির নেত্রে দেখলাম। দেখেই মনে হ'ল, মানুষ কি এত সুন্দর হ'তে পারে? আমার স্তম্ভিত চোখের

সামনে পর্ব্বত-প্রতিম স্থির-গম্ভীর কে সমাসীন? এই কি শ্রীঅরবিন্দ? তাঁর ছবিগুলো যা দেখেছি তাদের সঙ্গে ত এ দিব্য-কান্তি বিশালকায় পুরুষপ্রবরের কোনো সাদৃশ্য খুঁজে পাই না! এ লোকোত্তর রূপ যে বর্ণনার অতীত! তবে শ্রীঅরবিন্দ যে অতিমানস রূপান্তরের কথা বলেন এটা কি তারই ফল? মানব দেহের একি অভূতপূর্ব্ব রূপান্তর!

অনন্তরূপের এই দীপ্তিময় নররূপকে মনে মনে অজস্র প্রণাম জানালাম। আমার স্তম্ভিত চেতনায় সেই অপরূপ রূপ-গরিমার যে ছায়াপাত হয়েছিল সেদিন, তার আলেখ্য আজও আমার চিত্তপটে অম্লান রয়েছে। তারপর কত বার তাঁকে দেখেছি, কত বার নতজানু হ'য়ে প্রণাম করে তাঁর করকমলের অমৃতস্পর্শ পেয়েছি, কিন্তু সেই প্রথম দিনের স্মৃতি জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত আমার অন্তরে প্রোজ্জ্বল হ'য়ে থাকবে। "অজীজনো অমৃতমর্ত্ত্যেষাং ঋতস্য ধর্ম্মন্নমৃতস্য চারুণঃ"—হে অমৃত দেব, মর্ত্ত্যের মধ্যে ঋত, অমৃতত্ব ও সৌন্দর্য্যের ধর্ম্মে (বিধানে) তোমার জন্ম।

দুরুদুরু বুকে আমি আমার সমস্ত সত্তার আকূতি নিয়ে দর্শন-মন্দিরে প্রবেশ করলাম। দুধে আলতায় যে রক্তিম-শুভ্র রং এর সৃষ্টি হয়, শ্রীঅরবিন্দের গায়ের রং সেই প্রকার, এবং তাকে আভামণ্ডিত ক'রে রেখেছে এক শিশির-স্নিগ্ধ দ্যুতি, এক দেবদুর্লভ লাবণ্য ও কান্তি। অচল-প্রতিষ্ঠ হিমালয়ের মত বিরাট ও বিপুল তিনি, তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। আয়ত নয়ন পলকহীন। নয়নের গভীরতার সীমা নাই, যেন অকূল পারাবার—চিরপ্রশান্ত, আত্মসমাহিত অথচ বিশ্বতশ্চক্ষু, নিখিলদ্রষ্টা। তাঁর দৃষ্টি যেন আমার সত্তার গহনতম প্রদেশে প্রবেশ করে আমার অজ্ঞাত কোন গুহাহিত সত্যের রহস্যোদ্‌ঘাটন করছে। আমি আর তাকিয়ে থাকতে পারলাম না। নতজানু হয়ে আগে শ্রীমাকে প্রণাম করলাম। শ্রীমা আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্ব্বাদ করলেন। তারপর শ্রীঅরবিন্দকে প্রণাম করলাম। শ্রীঅরবিন্দও সেইভাবে আশীর্ব্বাদ করলেন। শ্রীঅরবিন্দের শ্রীচরণে যখন হাত রেখে প্রণাম করি, মনে হ'ল শ্রীমায়ের শ্রীচরণে যেন ভুলক্রমে আবার প্রণাম করছি—পুরুষের পা যে এত নরম, এত কোমল হয়, আমি কখনো ভাবতে পারি নি। ঠিক যেন মাখনের মত—সুপুষ্ট মেদুর চরণ দুখানি। প্রণাম করে উঠে দেখলাম শ্রীঅরবিন্দ তেমনি তাকিয়ে আছেন—প্রশান্ত-দৃষ্টি, করুণাসিন্ধু, দিব্য-জীবন-স্রষ্টা, উতামৃতত্বস্যেশানো, অমৃতত্বের ঈশান বা অধীশ্বর। নিমিষের তরে আর একবার শ্রীমায়ের দিকে তাকালাম। অমৃত-নিস্যন্দী হাস্যচ্ছটায় উদ্ভাসিত আনন তাঁর—তিনি যে মা, জগজ্জননী! করজোড়ে উভয়ের উদ্দেশে আর একবার প্রণতি নিবেদন করে' ফিরে এলাম আমার বাসস্থানে।

জীবন-কাহিনী

কিংশুক

ভুলে যাও বেঁচে থাকার ইতিকথা
ভুলে যাও চণ্ডী ও গীতা
এ দীন-দুনিয়ার দেনার মহলে
সব খোয়া গেছে যা ছিল বাঁধা—সোনার-শিকলে।
বেঁচে থাকার মর্মরের কট্‌ক্তি-কথা
তোমায় দোহাবে অকারণ অযথা
নর-দানবের শক্তির শক্তি-শেলে,
হিসাবের খাতা খুলে দেখো কি পেলে—কি খোয়ালে

বেঁচে থাকা সেটা তো কৃপণতা,
কেউ কারো নয়,—ভাই-বোন, পিতা-মাতা।
সব চলে যাবে শতাব্দীর রাবণ-যজ্ঞে—
তবে মনে হ'বে বেঁচে থাকা—থাক্‌গে।
ঐ-ত জলছে চন্দ্র-সূর্য তারা আর চিতা—
ঐ-ত জলছে মনের কবরে বেঁচে থাকার হঠকারিতা
ব্যর্থ ভুবনের সিংহাসনে
গোপনে প্রান্তরে বিজনে।

প্রচার

শ্রীঅনিল মজুমদার

আপনি কে, জানেন ?

ঠিক জানেন না বোধহয়। কিন্তু আপনাকে জানতে হবে, জানাতেও হবে। তা নাহলেই গেলেন, সারা জীবন শুধু হরিমটর। যুগই এই কথা বলছে।

আমিও জানতাম না, পরে জেনেছি,তবে কম নাকানি-চোবানি খেয়ে নয়।

অনেক দিনের কথা। গেছলাম গীতাপাঠ শুনতে। পাঠ করেছিলেন একজন মহামহোপাধ্যায়। অসামান্য পণ্ডিত। শোনা যায় গোটা হিন্দুশাস্ত্রটাকে তিনি নাকি গুলে খেয়েছিলেন।

বড়লোকের বাড়ী। যা হয়। যেমনি লোক সমাগম, তেমনি আদর আপ্যায়ন। ঢুকতেই বেলফুলের মালা—বসতেই চা সরবৎ। অতিথিরা সবাই বেশ গণ্যমান্য।

সেকালের রায়বাহাদুর, রায়সাহেবের দলত ছিলেনই, আর ছিলেন অনেক উকিল, ব্যারিষ্টার আর এটর্নির দল। লম্বা কোঁচা আর পাকানো কাছা। গায়ে সাদা উড়ুনি আর মাথায় সাদা চুল। সকলেই প্রায় বয়স্থ। চ্যাংড়া বলতে বোধহয় একমাত্র আমিই ছিলাম।

মহিলা মহলেও সেই একই অবস্থা। তবে তাঁদের মধ্যে দুচার জন 'চিংড়ি'র দর্শন পাওয়া গেছল। মনে হয় ঠাকুমা কিম্বা দিদি শাশুড়ির চাপে পড়েই তাঁরা সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। যেমন আমি। এক বৃদ্ধা নিকট-আত্মীয়াকেই সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হয়েছিল সেখানে। বিনিময়ে কিছু 'প্রাপ্তি'র আশা ছিল বলে।

চুপ করে বসে থাকার লোক বাঙ্গালী কোন কালেই নয়। পাঠ তখনও শুরু হয়নি।

মহামহোপাধ্যায় মহাশয় সবে তখন যুঁই ফুলের মালা গলায় দিয়ে একটুখানি ধ্যানস্থ হয়েছেন, অমনি সভায় শুরু হয়ে গেল, গুজ গুজ, ফুসফুস আর ফিসফাস। চাপা গলায় কথা বলাবলি।

বিষয় বস্তুর মধ্যে বোধহয় একমাত্র গীতাটুকু বাদ দিয়ে সব কিছুই ছিল। যথা ছেলের চাকরি, মেয়ের বিয়ে, বিষয় সম্পত্তি, শেয়ার মার্কেট, এমন কি রেসের ঘোড়াটি পর্য্যন্ত।

ক্রমে সেই গুঞ্জন যখন হাটে পরিণত হল তখনই মহা-মহোপাধ্যায় মহোদয়ের ধ্যানভঙ্গ হল।

চোখ মুখ পাকিয়ে তিনি সভাস্থ সকলকে ধমক দিয়ে বললেন 'শোনো'।

ব্যস্। একেবারে চুপ। কারও মুখে আর কোন কথা নেই। সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে রইলেন মহামহো-পাধ্যায়ের দিকে।

প্রসন্ন হলেন তিনি। পরক্ষণেই অত্যন্ত সহজ সরল কণ্ঠেই বললেন, সবাই একবার নিজেকে প্রশ্ন কর দিকি, আমি কে ?

সর্বনাশ ! শুনেই ত আমার খাবি খাবার অবস্থা। এ আবার কি উদ্ভট প্রশ্ন রে বাবা, 'আমি কে ?'

ভেবে পাই না কিছু। শুধু ভ্যাবা-চ্যাকার মত এধার ওধার তাকাই।

অবস্থা দেখি প্রায় সবারই সমান। শুধু মুখ চাওয়া-চায়ি আর মাথা নাড়ানাড়ি। কেউ যে কিছু ভাবছেন বলেও মনে হোল না।

শেষ পর্য্যন্ত আমার পাশের দুই বৃদ্ধ ভদ্রলোক, এতক্ষণ যাঁরা ছেলের বউয়ের আর জামাইয়ের শ্রাদ্ধে রত ছিলেন, হঠাৎ তাঁরা দুজনে দুজনার দিকে তাকিয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন। বললেন 'আহা, কি কথা, আমি কে'।

তাজ্জব ব্যাপার।

সভারও রঙ বদলে গেল তখনই। শুধু ফ্যাঁস ফ্যাঁস আর ফোঁস ফোঁস। কান্নাটা যে এত ছোঁয়াচে তা আগে আমার জানা ছিল না।

এর পরই শুরু হ'ল মহামহোপাধ্যায় মহোদয়ের সেই 'আমি কে'র ব্যাখ্যা। শ্লোকের পর শ্লোক আউড়িয়ে আর উদাহরণের পর উদাহরণ দিয়ে তিনি তাকে যত বোঝাতে চেষ্টা করলেন আর আমি তত গোলাতে লাগলাম।

শেষ পর্যন্ত ছাড়ান দিলাম। দেখলাম বৃথা চেষ্টা। ও জিনিষ আমার মাথায় ঢুকবেওনা আর কেউ ঢোকাতেও পারবে না।

আর পাঁচজনেও যে কে কি বুঝলো জানি না তবে তাদের কান্নার বহর দেখে মনে হল সবাই যেন সে জিনিষটা বেশ ভাল করেই বুঝে ফেলেছেন।

সত্যিই তাই। পরবর্ত্তীজীবনে তারই একটা জলন্ত দৃষ্টান্ত খুঁজে পেলাম।

ইংরেজ রাজত্বে বঙ্গীয় কাউনসিলের ইলেকসন হচ্ছে। কংগ্রেসের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছেন সেদিনকার এক প্রখ্যাত জমিদার। পারিবারিক সূত্রে ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের বহুদিনের জানাশোনা। আর সেই কারণেই আমাদেরও তাঁর পক্ষে কিছু কিছু কাজকর্ম করতে হয়েছিল।

আমাদের গ্রামে এর জন্যে এক মিটিং ডাকা হল। মিষ্টান্নের বিনিময়ে কিছু লোকজনও যোগাড় হল এবং তাঁর প্রধান বক্তা হলেন আমাদের সেই জমিদার মহোদয়।

ভদ্রলোক বসেছিলেন এক উচ্চাসনে। পরণে কোঁচানো ধুতি, গায়ে গিলেকরা আদ্দির পাঞ্জাবি, পায়ে সাদা পামসু। এক হাতে একটি সিগারেটের টিন, অন্য হাতে একটি রূপো বাঁধানো লাঠি।

গরম কাল। পাছে তাঁর কোনরূপ অসুবিধা হয় সেই জন্যে একজন লোক সারাক্ষণ তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে হাত-পাখার বাতাস করছিল।

সভা আরম্ভ হল। প্রথমেই উদ্বোধন সঙ্গীত। একজন হারমনিয়াম বাজিয়ে ভাঙ্গা গলায় গান ধরলেন 'তোমায় পেয়ে ধন্য হলাম, ওগো অতিথি।'

এর পরই মাল্যদান। একটি ছোট ছেলে এসে তাঁর গলায় একটি গাঁদাফুলের মালা পরিয়ে দিলে।

তারপরই তাঁর ভাষণ। ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। বার কয়েক জল খেয়ে আর গোটা কয়েক গলা খাঁকারি দিয়েই তবে তিনি তাঁর সারগর্ভ ভাষণ আরম্ভ করতে পারলেন।

"বন্ধুগণ,

আজ আপনাদের সৌজন্যে আমি সত্যিই বড় প্রীত হয়েছি। আশা করি এ সৌজন্য আমার চিরদিনই অক্ষুণ্ণ থাকবে।

আমি জানি আপনারা সকলেই আমার প্রজা আর আমি আপনাদের জমিদার। তাহোক, সে সম্বন্ধ নিয়ে আজ আর আমি কোন কথা তুলতে চাই না।

আমি যে একজন 'রায়বাহাদুর' এ বোধহয় আপনারা সকলেই জানেন এবং সরকার যে আমার গুণমুগ্ধ হয়েই সে খেতাব আমায় দিয়েছেন এও বোধহয় আজ আর আপনাদের বুঝিয়ে বলতে হবেনা। আমার জামাই যে একজন সিভিলিয়ান, আমার বেয়াই যে একজন খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার, আমার শ্বশুর যে একজন বিখ্যাত জমিদার, এও বোধহয় আপনারা সকলেই জানেন বা শুনেছেন, তাই সেগুলোকে আজ আর আমি আপনাদের কাছে নতুন করে শোনাতে আসিনি।

শুধু একটা কথাই আপনারা শোনেননি বোধহয় যে এই সরকারই, একবার নয়, বহুবার, এই কাউনসিলেরই জন্যে আমাকে মনোনীত সভ্য নির্বাচন করতে চেয়েছিলেন কিন্তু আপনারা হয়ত শুনে আশ্চর্য হবেন যে সে সম্মান আমি শুধু আপনাদেরই মুখ চেয়ে বারবার প্রত্যাখান করেছি।"

সভায় রব উঠল 'সাধু' 'সাধু'।

ভোট যুদ্ধে যদিও ভদ্রলোকের জামানত জব্দ হয় কিন্তু আমার তিনি একটা মস্ত উপকার করেছিলেন।

চোখ খুলে দিয়েছিলেন তিনি।

অন্ততঃ পক্ষে 'আমি কে' এটা যে, কি ভাবে জাহির করতে হয় সেটা আমি তখন থেকেই বেশ ভাল করে শিখে ফেলেছিলাম।

এর কিছুদিন বাদেই আমাকে এক চাকরির দরখাস্ত করতে হোল।

দরখাস্তে আমিও ফলাহ করে 'আমি কে' সেইটেই বেশ সবিস্তারে লিখে দিলাম। কোন বংশে আমার জন্ম,

আমার বাপ-ঠাকুর্দা কবে কি করেছেন, কবে কোন সাহেব এসে আমাদের বাড়ীতে মাছের ঝোল ভাত খেয়ে গেছেন, কিছুই বাদ দিলাম না।

ফল পেলাম হাতে হাতে। দুদিন বাদেই ইনটারভিউ-এর চিঠি। সেখানেও সেই 'আমি কে'।

একটা ছালা পরে, গলায় পলতের টাই ঝুলিয়ে, মাথায় সোলার হ্যাট চাপিয়ে, রীতিমত একটি বাঁদর সেজে যে যত হুপহাপ করতে পারলে তারই তত নম্বর।

উতরে গেলাম। চাকরি হয়ে গেল। আমি তরে গেলাম কিন্তু আমার বন্ধু রঘুনাথ আটকে পড়ল।

'আমি কে' জানাই হোল তার কাল।

বড় বংশের ছেলে রঘুনাথ। বংশ পরম্পরায় শুধু জমিদারিই করে এসেছে। বাপও ছিলেন একজন খ্যাতনামা জমিদার। ঘরে টাকাকড়ি ধন দৌলতেরও কোন অভাব ছিল না।

থেমে থেমে কোন রকমে ম্যাট্রিকটা পাশ করলে রঘুনাথ।

বাপ বললেন 'থাক, বাবা, আর নয়, ওতেই আমার জমিদারি রক্ষা হবে। এখন একটু স্বাস্থ্যটার দিকে নজর দাও।

ছেলেবেলায় একটু রোগা রোগা ছিল রঘুনাথ। বাপের কথায় তখন সে শরীরের দিকেই নজর দিলে।

দুজন পালওয়ান রাখা হোল। সকালে মাটি মেখে কুস্তি আর তার সঙ্গে পেস্তা-বাদামের সরবৎ, আর রাত্রে গব্যঘৃতের দিস্তা কয়েক লুচি খেয়ে, বলতে নেই, কমাসের মধ্যে স্বাস্থ্যটা ফিরিয়ে ফেললে রঘুনাথ। শরীরে পেশীর সঙ্গে মেদও জমল একটু কিন্তু মেধাটুকু চিরকালের জন্যে অন্তর্হিত হোল।

এদিকে দক্ষিণের হাওয়া তখন উত্তরে বইতে আরম্ভ করেছে।

বাপ সেটা লক্ষ্য করেছিলেন। তাই রঘুনাথকে ডেকে একদিন তিনি বললেন 'বৎস, যে রকম দিনকাল আসছে তাতে জমিদারি যে বেশীদিন টিকবে তা মনে হচ্ছে না। অতএব এখন থেকেই একটু ভবিষ্যতের চিন্তা কর।

রঘুনাথ এল আমার কাছে। চাকরি করতে চায় সে। ব্যবস্থাও একটা করলাম। তার হয়ে একখানা মস্ত দরখাস্তও লিখলাম। সইটুকুই শুধু বাকি। আর সেই সই করতেই রঘুনাথের হাত আটকে রইল।

দরখাস্তের শেষে 'I have the honour to be, Sir your most obedient servant.'

জমিদারের ছেলে রঘুনাথ আর 'Servant' হতে পারে না কোন কালে।

জেনেও যেমন বিপত্তি না জানলেও কম নয়।

সাব ডিভিসানাল কোর্টের মোক্তার রমেশ অধিকারী প্রচুর রোজগার করেন আর তাঁর পাশের বাড়ীতেই থাকেন জনার্দ্দন রায় এম-এ, বি-এল দুবেলা উপোস করেন। আইন তিনিও জানেন কিন্তু মুখ নেই সেইটেই হয়েছে তাঁর উন্নতির সবার চেয়ে বড় অন্তরায়।

ওদিকে রমেশ অধিকারীর মুখে খই ফুটছে। পেনাল কোডের সব ধারাগুলোই তার মুখস্থ। বাইরের ঘরের আলমারিতে থরে থরে সাজানো রামায়ণ মহাভারত আর পুরোণো মাসিক পত্রিকার মলাট ওল্টানো সব আইনের বই। কোর্টে দাঁড়িয়ে তিনি সেই পেনাল কোডের ধারাগুলো একের পর এক করে বলে যান, যেটি কাজে লাগে, আর সবার শেষে হাকিমের দিকে দুহাত তুলে আবেদন নিবেদন 'সুবিচার হোক, অবিচার হোক, বিচার চাই, বিচার চাই।

মামলার ফলাফল যাই হোক না কেন মক্কেল এসে তাঁরই কাছে জোটে। কারণ তারা এইটুকু বেশ জানে মামলা জেতবার জন্যে তাঁর কোন ত্রুটি নেই আর সেই কোর্টে বসেই হয়ত জনার্দ্দন রায় মাথা চাপড়ান আর ভাগ্যের দোষারোপ করেন।

অথচ একবার নিজেকে জানাতে পারলেই সাতখুন মাপ।

সৌখিন দলের অভিনেতা জ্ঞান রায়। জ্ঞান-দা বলেই যিনি সবার কাছে পরিচিত। যেমন ভাল অভিনয় করেন, তেমনি সুদর্শন চেহারা, গলার স্বরও অত্যন্ত মিষ্টি।

লোকে পয়সা খরচা করেও তাঁর অভিনয় দেখে।

সেবাব্রত সমিতির উদ্যোগে থিয়েটার হচ্ছে। বই হচ্ছে 'দেবলা দেবী'। জ্ঞানদা 'খিজির খাঁ'। চ্যারিটি শো। প্রচুর টিকিট বিক্রি হয়েছে। হলে তিল ধারণের স্থান নেই।

অপূর্ব অভিনয় করছেন জ্ঞানদা। ঘন ঘন দর্শকদের করতালি।

তারপরই হল বিপদ। শত গুণ থাকতেও জ্ঞানদার ছিল একটি বড় দোষ, সেটি পানদোষ। ওটি নাহ'লে তাঁর মুখও খুলত না, গলাও বেরুতোনা। বাধ্য হয়েই তাই অভিনয়ের ফাঁকে ফাঁকে গলাটা তিনি একটু একটু করে ভিজিয়ে নিতেন।

সেদিনও তাই করছিলেন কিন্তু বোধহয় মাত্রাটা একটু বেশী হয়ে গেছল।

প্লের শেষের দিকে খিজির খাঁর এক শক্ত সিন্। ওদিকে জ্ঞানদার সঙ্গীন অবস্থা। নড়বার চড়বারই প্রায় ক্ষমতা নেই।

তবু তাঁকে ঠেলেঠুলে এক রকম জোর করেই ষ্টেজে ঢুকিয়ে দেওয়া গেল। তিনি টলতে টলতে ভেতরে ঢুকলেন, দু-একবার কথা বলবারও চেষ্টা করলেন কিন্তু পারলেন না। শেষ পর্য্যন্ত শুধু হাত-পা আর মাথা নেড়ে গোটা কতক অঙ্গভঙ্গি করেই ফিরে এলেন।

সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের কি করতালি।

পরে লোক মুখে শুনলাম 'আজ একটা নতুন জিনিষ দেখিয়ে গেলেন জ্ঞানদা।

সাবাস! বাহবা! এ ছাড়া আর কি বলা যায় বলুন।

এবার মানুষ ছেড়ে আসুন বস্তুতে।

সেখানেও সেই।

সকালে কাগজ খুলতেই যেটি আপনার প্রথমে নজর পড়বে সেটি হচ্ছে তারই প্রচার, রাস্তা চলতেও তাই।

রাত্রের অন্ধকারেও তারা আলো জেলে জানাচ্ছে 'আমি কে, আমি কে।' আমি অমুক সাবান, আমি অমুক তেল, আমি অমুক সিগারেট।

ব্যবহার করে যে সব সময় তৃপ্তি পাবেন তা নয়।

তরল আলতা কিনে হয়ত আপনাকে হামানদিস্তায় ভেঙ্গে নিতে হবে, অষুধ খেয়ে হয়ত আপনাকে হাসপাতালে ছুটতে হবে। পাউডারের নামে হয়ত খানিকটা ময়দাই মাখবেন মুখে।

কিন্তু উপায় নেই। ঠেকে আর ঠকেই সব কিছু শিখতে হবে আপনাকে।

যুগদেবতা এই নির্দ্দেশই দিচ্ছেন সবাইকে।

আমারই এক বন্ধু পঞ্চাশ বছর বয়েসে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহণ করে মহাফাঁপড়ে পড়লেন। গোঁফ পাকতে লাগল, মাথার চুল পড়তে শুরু হোল। গোঁফ কামিয়ে তবু গোঁফ সামলালেন কিন্তু মাথার চুল ঠেকানো দায় হয়ে উঠল।

বাধ্য হয়ে বিজ্ঞাপন দেখে তিনি ছুটলেন এক টাকচিকিৎসকের কাছে।

সেখানে গিয়ে ত তাঁর চক্ষুস্থির। দেখেন ডাক্তারের মাথাতেও একগাছা চুল নেই।

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি।

ডাক্তার বুঝতে পেরেছিলেন ব্যাপারখানা কি। তাই হেসে বললেন ঘাবড়ে যাবেন না। এ হচ্ছে পারিবারিক টাক।

এই বলে দেয়ালে টাঙ্গানো বাপ-ঠাকুর্দার ফটোগুলোর দিকে তিনি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

বন্ধুবর সেইদিকেই তাকিয়ে থাকেন আর ভাবেন সত্যিই কি এঁদের মাথাতেও কোনদিন চুল ছিল না।

পরে ডাক্তার বলেন 'এবার বোধহয় বুঝতে পেরেছেন পারিবারিক টাকের কোন চিকিৎসা নেই। তবে অসুখের আছে। আমি সেই চিকিৎসাই করি।

তাই শুরু হোল। সকাল বিকেল অষুধ দিয়ে মাথা ঘসা।

প্রথমে দুহাত দিয়ে, পরে হাত অবশ হয়ে গেলে হাতে মাথা ঘসা।

ফল হোল—কিন্তু উল্টো। পাঁচ টাক মিলিয়ে হোল এক। শেষ পর্য্যন্ত বন্ধুবর শরণাপন্ন হলেন এক নরসুন্দরের।

মাথায় 'নীলাচলে মহাপ্রভুর' ছাঁট দিয়ে ঘোরতর বৈষ্ণব সেজেই তবে তিনি তখন টাকের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলেন।

সাধু, সাবধান!
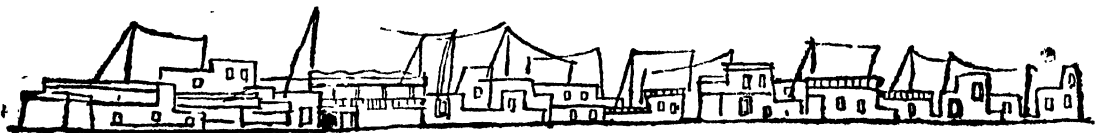
চিকিৎসকের চিন্তা

ডাঃ শ্রীকনকচন্দ্র সর্বাধিকারী
(প্রিন্সিপাল, কলিকাতা মেডিকেল কলেজ)

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা মেডিকেল কলেজের বয়স ১২৯ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। সামান্য আরম্ভ থেকে এই প্রতিষ্ঠানটি ক্রমশ বর্দ্ধিত হইয়া এখন প্রাচ্য দেশে এক শ্রেষ্ঠ গৌরবের অধিকারী। এই কলেজের মূল বিভাগ ২০টি, এবং তাহার সহিত বহু সহ-বিভাগ আছে। কলেজের মোট ছাত্র সংখ্যা স্নাতক শ্রেণীতে ৬৪৪ এবং তাহার মধ্যে ছাত্রী ১৬২ জন। ইহা ছাড়া ৪৮টি স্নাতকোত্তর ছাত্র আছে। কলেজে শিক্ষক মণ্ডলীর সংখ্যা অনেক। হাসপাতালে আছে ১৪০০ শত আবাসিক রোগীর স্থান। ১৮টি বহির্বিভাগে কলিকাতা ও বাংলার বিভিন্ন স্থানের ৭০ লক্ষ লোককে চিকিৎসাবিষয়ে সাহায্য দান করা হয়।

সম্প্রতি কলেজের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল ধাত্রীবিদ্যা-বিশারদ ডাঃ সুধীরকুমার বসুর স্ত্রী শ্রীমতী তিলোত্তমা দেবী ৪০ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ দান করিয়া একটি ট্রাষ্ট ও ফাণ্ড গঠন করিয়াছেন। ঐ টাকার সুদ হইতে ধাত্রী-বিদ্যা-বিষয়ে একজন গবেষককে এক শত টাকা মাসিক বৃত্তি দেওয়া হইবে।

১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে ছাত্রদের মধ্যে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হওয়ায় জাতীয় ছাত্র সামরিক বাহিনী গঠিত হইয়াছে। কলেজে সারাবৎসর ডি, জি, ও, ডি, ও, এম, এস, টি ডিডি, শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল। বহু ছাত্র ঐ সকল বিষয়ে উপাধি লাভ করিয়াছেন। তাহা ছাড়াও কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকগণের মধ্যে অনেকে নানা বিষয়ে উচ্চতর উপাধি লাভ করিয়াছেন। কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ও অবৈতনিক অধিকর্তা ডাঃ যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৬৪ সালে প্রজাতন্ত্র দিবসে পদ্মভূষণ উপাধিলাভ করিয়াছেন। ইহাতে সকল চিকিৎসকের সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছে।

চিত্রাঙ্কন, সাহিত্য সাধনা এবং সঙ্গীত সৃষ্টির মতই চিকিৎসা বৃত্তি মহত্তর জীবনপথের অন্যতম। প্রত্যেক মানুষেরই একটি সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট মানসিকতা থাকে, সেইটেই তাহার ধ্যানধারণাকে প্রভাবিত করিয়া থাকে এবং তাকে সুনির্দিষ্ট পথে চালনা করে। কেবল কান দিয়ে না শুনে বা চোখ দিয়ে না দেখে চিকিৎসকরা তাদের নিজস্ব দৃষ্টি দিয়ে জীবনের অতি সাধারণ ঘটনাও বিশ্লেষণ করেন। এর একটা আশ্চর্য্য আকর্ষণ আছে, সে আকর্ষণের আনন্দ উপলব্ধি করেন তাঁরা, যাঁরা এবিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। মনুষ্য দেহের গ্রন্থিরসের ক্রিয়া এবং মন বিকলনের দ্রুত বিবর্ত্তন এই আকর্ষণকে আরও মধুর করিয়া তুলিয়াছে। তার ফলে চিকিৎসকরা আজ মনুষ্য জীবনের গূঢ় রহস্যের মূল সূত্রের অনুসন্ধানে ও বিচার-বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

জীবনের যে কোন কর্ম্মের মধ্য দিয়া মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার সঙ্গে বা তাহাদের সমস্যাবলীর সঙ্গে পরিচিত হইবার যে সুযোগ আসে তাহারই মধ্যে মানব-প্রেমীরা পান এক অপরূপ আকর্ষণীয় চিন্তা ও আনন্দের খোরাক, এইটাই হইল অন্যতম কারণ যাহার জন্য কোন চিকিৎসকের জীবনই একঘেয়ে হইয়া উঠেনা। রোগী যখন তাঁহার রোগের যথার্থ বা কাল্পনিক লক্ষণ সমূহ বলিয়া যাইতে থাকেন তখন চিকিৎসকের চোখে রোগীর বক্তব্যের মধ্যে তাহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য ধরা পড়ে। তাহাছাড়া রোগী চিকিৎসকের কাছে সেই সব কথাও বলে যাহা সে অন্য কাহাকেও বিশ্বাস করিয়া বলিতে পারেনা। এর দ্বারা চিকিৎসক রোগ নির্ণয় ও রোগীর মনকে জানিতে পারেন।

(কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ১৩০ প্রতিষ্ঠা দিবস ও পুরস্কার বিতরণী সভায় প্রদত্ত ভাষণ।)

২৪পরগণা জেলা সাহিত্য সম্মেলন

শ্রীদিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ২৯শে ও ৩০শে মে শনিবার ও রবিবার সন্ধ্যায় বেলঘরিয়া রেল স্টেশনের নিকটস্থ ছাত্রমঙ্গল সমিতির গৃহে বিশেষভাবে নির্ম্মিত মণ্ডপে ২৪ পরগণা জেলা সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত তৃতীয় বার্ষিক ২৪ পরগণা জেলা সাহিত্য সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। উভয়দিনই নানা-স্থান হইতে বহু সাহিত্যিকের সমাগম হইয়াছিল এবং শনিবার সারারাত্রি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত এবং রবিবার রাত্রিতে কুমারী বন্দনা সেনের পরিচালনায় লোকনৃত্য, শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় চারণ সঙ্গীত এবং ছাত্রমঙ্গল সমিতির পরিচালনায় রবীন্দ্র-গীতি আলেখ্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

প্রথম দিনে শ্রীঅরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের পর শ্রীঅতুল্যচরণ দে, পুরাণরত্ন সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের পক্ষ হইতে প্রাথমিক ভাষণ দান করেন। পণ্ডিত শ্রীকুমারশঙ্কর শাস্ত্রী কর্তৃক মঙ্গলা-চরণের পর পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহ এক সুদীর্ঘ ভাষণে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। তিনি দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় সংস্কৃতি প্রচারের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করিয়া ২৪পরগণা জেলার অধিবাসীদিগকে তাঁহাদের এই বিরাট প্রচেষ্টার জন্য অভিনন্দিত করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রূপে শ্রীসরস্বতী প্রেসের পরিচালক শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায় এক মুদ্রিত ভাষণ পাঠ করিয়া স্থানীয় ইতিহাসের কথা এবং বঙ্গসাহিত্যের গতি ও প্রকৃতির কথা সুবিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন। তাঁহার ভাষণের সহিত শ্রীঅরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত বেলঘরিয়ার ইতিহাস সম্বন্ধে একটি মুদ্রিত পুস্তিকাও সম্মেলনে উপস্থিত সকলকে প্রদান করা হয়।

তারপর সম্মেলনের বিশেষ অতিথি আনন্দবাজারের শ্রীযোগেন্দ্রমোহন সেন তাঁহার মুদ্রিত ভাষণ পাঠ করেন। প্রবীণকবি শ্রীনরেন্দ্র দেব, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে জন্ম ও মৃত্যু সম্বন্ধে লিখিত বহু কবিতা উদ্ধৃত করিয়া রবীন্দ্র-কাব্যের একটি বিশেষ দিক সকলের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। ৭৮ বৎসর বয়স্ক সুপণ্ডিত কবির মুখে রবীন্দ্রনাথের ভাষ্য শুনিয়া সকলে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। তৎপরে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় এক নাতিদীর্ঘ ভাষণে ভারতের বর্ত্তমান ভাষা সমস্যার কথা আলোচনা করেন। তৎপরে খ্যাতিমান সাংবাদিক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু হিরণ্ময়-বাবুর বক্তব্যের সূত্র ধরিয়া তাঁহার মতে কিভাবে ভাষা-সমস্যার সমাধান সম্ভব তাহা বিবৃত করেন। পরিষদের সাধারণ সম্পাদক শ্রীসঞ্জীবকুমার বসু অতি অল্প কথায় পরিষদের উদ্দেশ্য ও সম্মেলনের পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনের বিবরণ দান করিলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণে ২৪পরগণা জেলার মন্দির, লোকসাহিত্য প্রভৃতির কথা তাঁহার সুমধুর ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তাহার পর নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায় অল্প কয়েকটি কথায় বাংলা সাহিত্যের বর্ত্তমান ধারা বুঝাইয়া দেন। সর্ব্বশেষে অনুষ্ঠানের সভাপতি প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় তাঁহার সুদীর্ঘ ভাষণ একঘণ্টা ধরিয়া পাঠ করেন। তাহাতে তিনি ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের সার্থক উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনীর ১৯৬৫ সালে শতবার্ষিকী হইতেছে বলিয়া দুর্গেশনন্দিনী সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন। তাঁহার ভাষণ সকলে মন্ত্রমুগ্ধের মত আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিয়াছিল। বিস্তৃত ভাষণ শেষ করিয়া তিনি আরও আধঘণ্টাকাল ভারতের ভাষা সমস্যা সম্বন্ধে মৌখিক বক্তৃতা করেন। তিনি দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করেন আজ ভাষা সমস্যা যেরূপই ধারণ

করিয়া থাকুক না কেন অদূর ভবিষ্যতে একদিন ভারতের ভাষা জননী সংস্কৃতভাষাই সর্ব্বভারতীয় ভাষা রূপে ভারতের সকল প্রান্তের অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইবে।

তাঁহার মত সুপণ্ডিত, চিন্তাশীল, ৭৫ বৎসর বয়স্ক দেশ-প্রেমিকের মুখে এই ঘোষণা শুনিয়া শ্রোতা মাত্রই আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠেন। তাঁহার বক্তৃতার পর 'ভারতবর্ষ' সম্পাদক শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সকলকে ধন্যবাদ প্রদত্ত হইলে রাত্রি ৯টার পর প্রথম দিনের সম্মেলন শেষ হয় এবং রাত্রি ১০টা হইতে পরদিন সকাল ৬টা পর্য্যন্ত এ, টি, কানন,মালবিকা কানন প্রভৃতি সর্ব্বভারতীয় খ্যাতি-সম্পন্ন বহু সঙ্গীতজ্ঞ ও বাদক তাঁহাদের সঙ্গীত ও বাদনের দ্বারা উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রশংসা অর্জ্জন করেন।

পরদিন রবিবার সন্ধ্যায় দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। উদ্বোধন সঙ্গীত ও মঙ্গলাচরণের পর শ্রীগোপী মোহন ভট্টাচার্য্যের প্রস্তাবে 'ষষ্টিমধু' সম্পাদক শ্রীকুমারেশ ঘোষ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। 'ভারতবর্ষ' সম্পাদক শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার উদ্বোধনী ভাষণে কাব্য সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনার পর সমাগত কবিদিগকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। শ্রীঅতুল্যচরণ দে, পুরাণরত্ন স্বাগত জানান। তাহার পর শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য্য, শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক, শ্রীসুবোধ রায়, শ্রীরাজেন্দ্রলাল বন্দ্যো-পাধ্যায়, অধ্যাপক শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীদিলীপ-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক জীবনবল্লভ চৌধুরী, শ্রীশান্তশীল দাশ প্রভৃতি বহু কবি তাঁহাদের স্বরচিত কবিতা পাঠ করিয়া সকলকে আনন্দদান করেন।

সভাপতি শ্রীঘোষ একটি ছোট অভিভাষণে কবি সম্মেলনের তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দেন ও স্বরচিত একটি কবিতা পাঠ করেন তাহার পর প্রায় ৩ ঘণ্টা ব্যাপী নৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশিত হইলে ১০টায় সম্মেলনের কাজ শেষ হয়। সর্ব্বশেষে ছাত্রমঙ্গল সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীবিশ্বরঞ্জন ঘোষাল সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ও সমিতির কার্য্যে সকলকে সাহায্য করিবার জন্য আবেদন জ্ঞাপন করেন।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় শ্রদ্ধাস্মরণে

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

শতবর্ষ আগে এক সুমঙ্গল শাঁক
মঙ্গল সূতিকা গৃহে বাজি দিল ডাক
বাণীর মন্দিরে। ধীরে আসি বীণাপাণি
রাখিলেন আশীবাদ ভরা হাতখানি
নব জাতকের শিরে। কহিলেন কানে
কোন্ কথা কি ভাষায়
কেহ নাহি জানে।
কতদিনে বুঝি তাহা পড়েছিল মনে
পৌরুষে বিরাট যবে হইলে যৌবনে।

সে ভাষা নৈবেদ্য দিলে রচিবারে ভার
বিদ্যা মহাপীঠে। মহা নৈবেদ্য সম্ভার—
সাথে আসে নানা হস্তে শ্রীবরণ ডালা,
পুষ্পপাত্র, মালা, ধূপ, জ্বলে দীপ মালা।
সেই মহাব্রতী প্রাণে করিয়া স্মরণ
জন্ম শতবর্ষ দেশ করে উদ্‌যাপন!

*　　*　　*

হে বিরাট তার পাশে আমি আনিলাম,
বিস্ময় শ্রদ্ধায় নত আমারো প্রণাম!

বড়ালকবির 'কনকাঞ্জলি' ও কবিমানস

ডক্টর জয়ন্ত গোস্বামী

প্রতিমা বিসর্জনের পূর্বে প্রতিমাকে স্বর্ণাদি যে অর্ঘ্য নিবেদন করা হয়ে থাকে, তাকেই কনকাঞ্জলি বলা হয়। বড়াল-কবি ছাড়াও মানকুমারী বসু প্রমুখ কয়েকজন কবিও তাঁদের কাব্যগ্রন্থের নামকরণে এই বিশেষ নাম ব্যবহার করেছেন। তবে সার্থক নামকরণ বলে অভিমত পোষণ করা যায় বড়াল-কবির কাব্যক্ষেত্রেই। কবি তাঁর কনকাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের প্রথমেই 'উপহার' কবিতায় বলেছেন,—

"ধর সখি, কনক-অঞ্জলি!
নহে ইহা ফুলমালা আসি নাই দিতে জ্বালা
এসেছি বিদায় নিতে কেঁদে যাব চলি!"

কবি তাঁর নায়িকার কাছে নিরাশ হৃদয়ের আর্তি প্রকাশ করেছেন। পৃথিবীর কামনা বাসনা এবং বস্তুর ক্লেদলিপ্ত কবি তাঁর নায়িকার সঙ্গে মিলনকে দুরাশা মনে করেন। যৌবনের আবেগে তিনি যে দুরাশা অন্তরে পোষণ করে নায়িকাকে মালা দিতে চেয়েছিলেন, আজ কবির মনে হচ্ছে,—সে মালা নায়িকাকে দেবে শুধু কণ্টক-জ্বালা। কারণ কবির এই দীনতাকে কবি অতিক্রম করতে পারছেন না। কিন্তু কবি তাঁর নায়িকাকে বিসর্জনকালেও শ্রদ্ধাঞ্জলি না জানিয়ে পারেন নি।

নিরুপমা নায়িকার কাছে চপলতা যদি কিছু ঘটে থাকে, তার জন্যে কবি তাঁর কাছে ক্ষমার আবেদন জানিয়েছেন। তাঁর বিশ্বাস, তাঁর নায়িকা নিষ্করুণ নন; অন্ততঃ তিনি কবিকে অযোগ্য মনে করলেও ক্ষমা থেকে বঞ্চিত করবেন না। 'সরল হৃদয় কবি' কবিতায় তিনি বলেছেন,—

"রমণি! তোমারে চেয়ে ভেবো না, কি গেছে গেয়ে
কি বকেছে ভুল—
সরল হৃদয় কবি যেখানে মাধুরী ছবি
সেখানে আকুল।"

কবি তাঁর সহজপথে চলতে গিয়ে আর উপলব্ধি করেছেন যে তাঁর সরলতা বাইরে অত্যন্ত অস্বাভাবিকতার জন্ম দিয়েছে।

যাকে তিনি এতোদিন প্রেম বলে ভেবে এসেছেন, বাস্তব সংস্পর্শে তার রূপ হয়েছে কামগন্ধী, স্বার্থযুক্ত। তাই তিনি তাঁর প্রেমকে ধিক্কার দিয়েছেন। কিন্তু এই প্রেম-উপহারের পরিবর্তে কবি নায়িকার কাছ থেকেও নির্লিপ্ততা আশা করেন না।—

"এ হৃদয় নহে, দেবি, প্রেম-উপহার!
ভালবাসা-ভালবাসা এত উচ্চ নাই আশা,
এত উচ্চ পানে আঁখি ফিরালে আমার,
ঘুরে যেন পড়ে মাথা না পাইয়া পার।"

তবু নায়িকা কবির প্রেম গ্রহণ করেছেন। কবির মতো এটা তাঁরও ভুল।—

"তুলিতে তুলিতে ফুলে কি তুমি তুলেছ ভুলে!
না জেনে পরেছ গলে প্রেম-ফুল-হার!
এ শুধু, হারান কুড়ান দুটি দুজনার!"

এ ভুল কবি ফিরিয়ে দিতে বারণ করেছেন নায়িকাকে।

কবি জানেন বাস্তবেই কল্পনার মৃত্যু। কতো কল্পনার বাস্তবে অপমৃত্যু কবি চোখের সামনে চেয়ে চেয়ে দেখেন। বিভার কাহিনী তারই রূপক। পা দুটো ঝর্ণার জলে ডুবিয়ে বিভা বকুলতলায় বসে আছে। তাকে ঘিরে আছে প্রেমময় কল্পনা।—

"বুকে প্রেমটুকু, সৌরভের মত
বেড়ায় ঘুরিয়া ভেসে!
ছুঁইতে যাইলে কিছুই থাকে না,
না ছুঁলে বেড়ায় হেসে।"

কিন্তু কবির মধ্যে কল্পনাজগৎ সহনশীল। কারণ অসীম মনোজগতেই তার অধিষ্ঠান ঘটে। কিন্তু কবির সত্তা 'তটস্থ'। বস্তুর জড়তায় তার আচ্ছন্নতা থাকলেও তার

চৈতসিকতা অনন্তের প্রতি। তাই কল্পনাজগৎ সঙ্কুচিত হলেও তার সম্পূর্ণ অমর্যাদা ঘটে না। "উড়িতেছিল গো মেঘেতে কল্পনা, বুকে কি ফিরিয়া এল!" কবির মধ্যে কল্পনাময়ী পেলেন রূপ। কিন্তু কবির মধ্যে বাস্তব কল্পনার দ্বন্দ্ব শেষ হয় না। প্রকৃতির অসীম ব্যাপ্তি কবির মনে নিজের সঙ্কীর্ণ পরিধির কথা জাগিয়ে তোলে।—

"হায় মা প্রকৃতি! ছেড়ে তোর কোল
সুখের স্বপ্নের দেশ,
সংসারের দ্বারে কেন আসি ছুটে,
যেখানে মেলে না বেশ?"

কবির সঙ্গে কল্পনার পরিচয়ে তাই কবি তৃপ্ত হয়েও অতৃপ্ত। কারণ উভয়ের মিলনের মধ্যেও পরিবেশগত বাধা উভয়সত্তাকে কোথায় যেন একটি কণ্টকের বেদনা দিয়ে যায়।—

"চারিটি নয়ন, করে ছল ছল;
বুকে সুখ ভরা ব্যথা।"

কবি তার সম্মুখে বাস্তব পেষণে কল্পনার মৃত্যু অবলোকন করেন। প্রেমের মৃত্যু তিনি লক্ষ্য করেছেন তাই পরিণয়ে। পথিকের সংস্পর্শ তাই বিভাকে কাতর করে তুলেছে। বাস্তবের বাহ্য ঐশ্বর্য মানসিক ঐশ্বর্যের শূন্যতা পূর্ণ করতে পারে না। সাতটি রত্নপূর্ণ তরীর অধিকারী পথিকের দেওয়া হীরকভূষণ বিভা কেঁদে কেঁদে অঙ্গে ধারণ করে। রত্ন-দুকূল কোলেতেই পড়ে থাকে।—

"সবাই সেজেছে, বিভাও সেজেছে!
এ কেমন হায় সাজ, গো!
ফুলের বুকেতে মরণের কীট,
অশনি মেঘের মাঝ, গো!
হোক বজ্রাঘাত, হোক উল্কাপাত,
জগতের একি কাজ, গো!"

কল্পনাময়ীর এই মৃত্যুতে কবির মধ্যে নেতিবাদ জাগে। তার সমস্ত সৃষ্টিপ্রেরণার দ্বার রুদ্ধ করে দেয়।—

"উছসি উছসি উঠিছে হৃদয়,
বাঁশরী বাজাতে চায়।
নয়নের জলে দীরঘ নিশ্বাসে
বাজান নাহিক যায়!"

কবি এবং নায়িকা—উভয়ের পারস্পরিক আকর্ষণ অস্বীকার করতে কবির মন চায় না। তাই নায়িকার ইচ্ছাকেও স্বপ্নরাণীর ইচ্ছার মধ্যে দিয়ে কবি ব্যক্ত করেছেন।—

"আসি সখা দেখিতে তোমায়!
একটি চুমিতে সাধ যায়!
যাই যাই পারি না গো, ভয় হয় পাছে জাগো
কেঁপে কেঁপে ওঠে ঠোঁট সরমে তরাসে;
এলাইয়া পড়ে দেহ, যেন ঘুম আসে!
একবার হয় ভয়, আর-বার মনে হয়,
জেগে উঠে কর আলিঙ্গন।
তোমার বুকেতে শুয়ে, একটি না কথা কয়ে
মরে যাই জন্মের মতন!"

নায়িকাকে ভালবেসে কবির যন্ত্রণা কম নয়।—

"ভালবাসা এ জগতে বড় ভাবনার।
ভালবাসা দেওয়া হেথা বড় যন্ত্রণার।···
ভালবাসা বিনা দোষ, কিছু নাই যার,
এক দোষে মাঝে বুঝি উঠে পারাবার।"

কবি যন্ত্রণা পান কল্পনাময়ীর মধ্যে বেদনার প্রতিচ্ছবি দেখে। বাস্তবের সংস্পর্শেই তা ঘটেছে। কবি তাই অভিমানভরে বলেন,—

"হৃদয়ে বেঁধেছি সখী বল।
মুছে ফেল নয়নের জল।
দাও, দাও, ছেড়ে দাও, যেথা ইচ্ছা, দূরে যাও;
প্রেম যদি কলঙ্ক কেবল!
এ প্রেমে কি ফল?···
যদি এ সাধের মায়া শুধু এ আলেয়া ছায়া,
জীবন শ্মশান করি,—বিভীষিকা স্থল,
এ প্রেমে কি ফল!"

কবি জানেন—নায়িকারও বেদনা আছে। দোষ তাই নায়িকার নয়, এ যেন সৃষ্টিতত্ত্বের মূলে বিধাতার একটা চিরন্তন অভিশাপ। নায়িকার বেদনানুভূতির ছবি দিয়েছেন কবি।—

"কি ব্যথা বুঝাতে চায়— কথা নাহি খুঁজে পায়!
চায় মুখ-পানে।
আপনি বুঝেনি যাহা, বুঝাতে ব্যাকুল তাহা
আকুল নয়ানে!"

কৃষ্ণ হয়ে কবি রাধিকা-রূপিণী নায়িকাকে সম্বোধন করে তাই বলেন,—

"বালিকা রে! যেন ভুলে দেছ প্রেম হাতে তুলে!
কাঁদাতে কাঁদিতে!
শুধু অশ্রু, শুধু শ্বাস, শুধু ব্যথা, শুধু ত্রাস,
নীরবে বুঝিতে!"

কবি তাঁর প্রেমকে অস্থায়ীভাবে চান না। তাই তিনি নায়িকাকে বেদনার সত্য উপলব্ধি করাতে চান।—

"কাঁদিতে পার গো যদি চিরকাল, নিতি নিতি,
এস তবে এস, সখা, দুজনে করি পিরীতি।
মিলনে নাহিক সাধ, সে কেবল অপবাদ;
রব মোরা দূরে দূরে, রবে শুধু সুখ স্মৃতি।
মিলন মিলন ছার, সে ধরার গোলযোগ;
পিরীতি নীরব দাহ, পিরীতি অশ্রুর ভোগ!"

কিন্তু কল্পনাময়ী নায়িকাকে বেদনাক্ত প্রেমে বাঁধা কবির কাছে অলীক স্বপ্ন। কবি এই প্রেমে নিজের জীবনকে মরুদাহে জ্বালিয়েছেন। কল্পনাময়ীর প্রেম যদি সত্য হতো, তাহলে কি কবির যন্ত্রণা আসতো?—

"যৌবনে মুমূর্ষুপ্রায় কুহকিনী কার তরে?
যেথা ছিল কল্পতরু, সেথায় মধ্যাহ্ন মরু
তৃষ্ণায় ফাটিছে প্রাণ, নিরাশ্বাস হুহু করে।
কার তরে ছুটেছিনু, যেথা না মানব চরে?"

সর্ব-শান্তির আধার তৃতীয়সত্তাকে কবি এখানে কল্পনা করেছেন। তিনিই জগদ্ধাত্রী—বিশ্বমাতৃকা।

"আয়রে সংসার আয়, কোলে তুলে নেরে মোরে
মা, তোর অবোধ ছেলে কি কাজ করেছে ফেলে।
বুলায়ে দে বুকে হাত চেয়ে থাকি প্রাণ ভরে।
মরি যেন—শেষ সাধ—তোরি স্নেহ-কোলে পড়ে।"

কল্পনাময়ীর প্রতি অভিমানই কবির বিদায়ের কনকাঞ্জলি। তিনি নায়িকার কাছ থেকে বিদায় নিতে গিয়ে অনুভব করেছেন,—

"কি খুঁজিতে গিয়াছিনু কবির উদ্দাম আশে!
আমি ত যাইব চলি, শোকে তাপে দুঃখে জ্বলি,
কলঙ্ক উপমা কিন্তু রব হায় দীপ্ত ভাসে,
জীবনের চিরকাব্যে, যৌবনের ইতিহাসে।"

যাঁর ওপরে বিশ্বাস, তাঁর ওপরেই অভিমান সম্ভবপর। তাই বাস্তবের কলঙ্কিত প্রতিবেশ কবিসত্তাকে যে আহ্বান-সূচক যন্ত্রণা দেয়, তাও কবির বিশ্বাসকে আঘাত করতে পারে নি। বৈতরণীর তীরে কবি তাঁর অস্থির শয্যায় তাই আশা নিয়ে বসে আছেন। কল্পনাময়ী নায়িকা এবং আধ্যাত্মিক তৃতীয়সত্তা—উভয়সত্তার প্রতিই কবির বিশ্বাস অসীম—যদিও তৃতীয়সত্তাই কবির সর্বময় সান্ত্বনার স্থল।

"...তপ্ত চোখে চোখ দিয়ে, তরঙ্গিত বুক চিরে
কে দেখিবে—কি সহি যন্ত্রণা?
তরুতল ছায়া হতে কে তোরা উঠিস্ হেসে?
তোরা কি বুঝিবি, ওরে পিশাচী ললনা।"

এই বিশ্বস্ততার মধ্যেও কল্পনাময়ীর প্রতি অভিমানই কনকাঞ্জলির মূল কথা। কবির হৃদয়-কানন ভেঙে কল্পনাময়ী চলে গেছেন...তাঁর "সাধের অস্ফুট ফুলবন" তছনছ করে চলে গেছেন।—

"কে জানে নারীর খেলা, কে জানে তার গাঁথা মালা!
কে জানে কেমন নারী মন!
একটি না কথা বলে, কত সাধ যায় চলে,
কত শ্রম, বাসনা, যতন!
কে ভাঙিল হৃদয় কানন?"

এই রহস্যময়ী নায়িকা পার্থিব যা কিছু সুন্দর মধুর—সবেরই মূল। কবি লক্ষ্য করেন, তাঁরই আশ্রিত এক একটি সৌন্দর্য-মাধুর্যের অণু পার্থিব পরিবেশ থেকে একে একে বিদায় নিচ্ছে। এখানেও নায়িকার প্রতি অভিমান প্রকট। "মাতৃহারা কন্যার মৃত্যুকালে" কবি চিন্তা করেছেন,—

"বৃন্তচ্যুত হয়ে ফুল, উত্তপ্ত পাষাণে পড়ি,
রবি আর ক-দিন বাঁচিয়া?
.. মিষ্ট হাসিটির যার প্রতিবিম্ব হয়েছিলে,
যা তার অধরে ঘুমা গিয়া!
যেথানে ভরসা আশা, পাঠায়ে দিয়েছি সব
হৃদয় বাঁধিয়া;

কবির স্ত্রীর মধ্যেই সেই কল্পনাময়ী নায়িকা সাকারে ধরা দিয়েছিলেন। কবি অনুভব করেছেন, স্ত্রীর মধ্যেই তাঁর নায়িকা একাকার হয়ে গিয়েছিলেন। কল্পনাময়ীর স্বাভাবিক আকর্ষণে তাই তাঁর স্ত্রীর সত্তাটিকে এতো কাছে রেখেও কবি দূরের মানুষরূপে তাঁকে অবলোকন করেছেন।

কল্পনাময়ী নায়িকাসত্তার আশ্রিত যত কিছু বাস্তবের সুন্দর অণুপরমাণু। এই সব আশ্রিতের মধ্যেই স্বয়ং কল্পনাময়ী নায়িকা ধরা দিয়ে থাকেন। বিশেষতঃ পার্থিব নারীর মধ্যে কবি সেই নায়িকাকেই দেখেছেন কবির মতো যন্ত্রণা-কাতর। কবি উপলব্ধি করেছেন, দীনতার মধ্যেও নারীর প্রেম কবির প্রেমেরই অনুরূপ। এখানে নারী যেন তার স্বাভাবিক জগতের অতনুকে ধরার জন্যে ব্যাকুল। নারীর এই যন্ত্রণা কবির মনে সহানুভূতি জাগিয়ে তুলেছে, কখনো বা কবিকে করে তুলেছে কাতর। এই কাতরতা বাস্তবের প্রতি বিতৃষ্ণা এবং কল্পনার প্রতি অভিমান সূচিত করেছে। কল্পনাময়ীর কাছে নিজের দীনতাকে নারীর দীনতার মধ্যে আরোপ করে নিজের অন্তরের নারীসত্তাকে (প্রেম নারীসত্তার মধ্যেই প্রকৃত রূপ পায়) অতনু পুরুষের আকর্ষণে বেঁধেছেন। এখানেও সেই কল্পনার প্রতি চাপা অভিমান।—

"কোথা তুমি সখা? ঘোরা ঘোরা ছায়া!
ধর ধর—তার হাতটি, আহা!
নয়ন চুমিয়া দাও—বলে দাও
এখনো, আপনি বালিকা বুঝে নি যাহা।"

স্বপ্নে নায়কের স্পর্শ পেয়ে নিদ্রাভঙ্গে মাধুরী ভাবাতুর হয়ে পড়ে।—

"মাধুরী, আকাশ পানে অন্য মনে চাহি,
না জেনে বলিল ফেলে, কি একটা—"কবি!"

হয়তো পার্থিব প্রেমিকা নারীর এই দীনতা কবির কৃত্রিম চরিতার্থতা। বৈষ্ণব কবির রাধা বলেছিলেন, "কানু যব হোয়ব রাধা, তব জানাব এ বিরহক ব্যথা।" কবি নিজেকে অতনু কল্পনা করে এবং তাঁর নায়িকাকে বাস্তব প্রতিবেশে ফেলে নায়িকার বাস্তব প্রতিবেশক্লিষ্ট প্রেমকে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেছেন।

কনকাঞ্জলিতে তাই একদিকে বস্তুর আঘাত অন্যদিকে কল্পনার স্মৃতিমাধুর্য—উভয়ের দ্বন্দ্ব কবিচিত্তকে আচ্ছন্ন করেছে। প্রৌঢ়ের দুঃখময় অভিজ্ঞতারই এখানে প্রকাশ —যৌবনের মত্ততা নেই। স্মৃতিচারণই কবির পাথেয়।

"স্বপন চলিয়া যায়, তন্দ্রা করে হায় হায়!
ভালবাসা চলে গেছে, পড়ে আছে সুখস্মৃতি
দুঃখ অশ্রুজলে ঢাকা, কল্পনা কবিতাকৃতি।"

'কনকাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের প্রথম মুদ্রিত সংস্করণের ওপর ভিত্তি করে বড়ালকবির কবিমানসের গতি প্রকৃতির পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। 'কনকাঞ্জলি'র প্রথম প্রকাশ কাল আশ্বিন, ১২৯২ সাল। ১৩০৪ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত কনকাঞ্জলির "দ্বিতীয় সংস্করণের অর্ধাধিক কবিতা নতন এবং গ্রন্থি সম্বন্ধ।" বড়ালকবির জীবিত কালের মধ্যে শেষ সংস্করণ—কনকাঞ্জলির তৃতীয় সংস্করণ—প্রকাশ কাল ১৩২৪ সাল। সাধারণভাবে 'কনকাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থ বলতে এই তৃতীয় সংস্করণের কাব্যগ্রন্থকেই বুঝে থাকি। তবে কবিপ্রকৃতির গতি-তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হলে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট প্রথম সংস্করণের উপর ভিত্তিগ্রহণ বিজ্ঞান সম্মত।
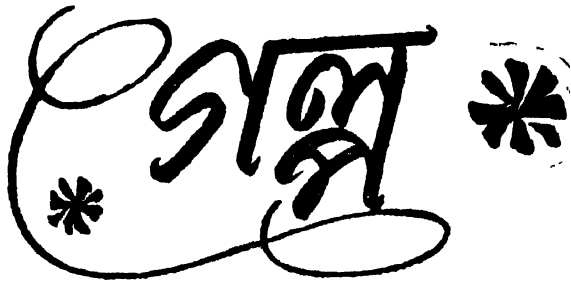
বান্ধবী

রেণুকা চক্রবর্ত্তী

মাধবী যেদিন প্রথম টাইপিষ্ট হয়ে অফিসে আসে সেদিন নন্দন ওর চ্যাপ্‌টা নাকটি নিয়ে অলক্ষ্যে খুব রঙ্গ ব্যঙ্গ করেছিল, আর মজাও লাগছিল এই ভেবে যে মেয়েটি তার আণ্ডারে কাজ করবে অর্থাৎ সে মনিব। ঠিক তার মেজাজ মত না চললে সে উপরে রিপোর্ট করলেই মাধবীর চাকুরীর দশা গয়া।

মাধবী সসঙ্কোচে তাকে সব জিজ্ঞেস করছিল। নন্দন গম্ভীর মুখে সব বলে যাচ্ছিল। ক'দিন পরেই মজা ফুরিয়ে যায়। মেয়েটি খুব নিষ্ঠার সহিত নীরবে কাজ করে যায়। নন্দন ভেবে রে'খেছিল মাধবীর কাজে ভুল হলেই বলবে মেয়েরা যে কেন কাজ করতে আসে? তাদের কাজ হল বাসন মাজা, রান্না করা। কথায় বলে "যার কাজ তারই সাজে আনাড়ীর শুধু লাঠি বাজে।" সে সব কিছুই হ'ল না।

মাধবীর নাকটি চ্যাপ্‌টা হলেও চোখ দুটি ভাল, হাসিটি আরও সুন্দর। হাসলে গালে টোল পড়ে, চোখ দুটি হাসতে থাকে। তখন মনে হয় ঠিক এমন নাক না হলে বুঝি মুখখানা এত সুন্দর হত না। তাই ওকে রাগানোর চেয়ে হাসাতেই ইচ্ছে হয়। মেয়েও এমন সেয়ানা হাসি বড় একটা ওরমুখে দেখা যায় না। হাসি পেলে চাপতে চেষ্টা করে, চোখটা শুধু চিকমিকিয়ে ওঠে। রাগ হলেও প্রকাশ করেনা, শুধু নাকটা একটু ফুলে ওঠে—ঠোঁটটা জোরে কামড়ে ধরে।

যাকগে ও-নিয়ে কে মাথা ঘামায়? ওই সাধারণ মেয়ের কথা নিয়ে কে সময় কাটায়? তাই অনেক দিন নন্দন আর ওদিকে নজর দেয়নি। এবার নন্দন নিজের ভাষায় বলতে থাকে আজ কিছুদিন ধরে ও-যেন আমাদের শান্তি ব্যাহত করছে। ব্যাহত করছে কিছু করে নয়, কিছু না করে। আমরা মাঝে মাঝে দল বেঁধে, সিনেমায় যাই, সার্কাস দেখতে যাই কিন্তু এ মেয়ে সব সময়ই অনুপস্থিত। ও অনুপস্থিত থাকলে আমাদের কিছু এসে যায় না, কিন্তু মেজাজ খারাপ হয়। আমাদের এত অবহেলা কিসের? কেন? আমরা কি এতই ফেল্‌না? অনেক বলেকয়ে দু একদিন সঙ্গে গেছে বটে সে যেন এক প্রাণহীন পুতুল। আমাদের হৈ চৈ-তে এতটুকু যোগ দেয়নি, গল্প করেনি, নিজের ভিতর নিজে সমাহিত। এ যাওয়ায় মেজাজ আরও চড়ে ওঠে। শুধু অনুরোধ রক্ষা করা, দয়া!

আমরা কয়েক জনে মিলে জয়েণ্ট টিফিন করি। মাধবী তাতে যোগ দেয়না। বাড়ীথেকে টিফিন নিয়ে আসে। আমরা অফার করি—ও খায় না।

একদিন বলেই ফেলি,—আপনি কি ভাবেন?

'ও' চমকে মুখের দিকে তাকায়, তারপর বলে কিসের?

কিসের আবার? আমাদের সম্বন্ধে?

আপনাদের সম্বন্ধে কি ভাবব?

মেজাজ ঠিক রাখা কঠিন। যেন ভিজে বেড়াল, যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না। ঠোঁট কামড়ে ধরি, পাছে বেফাঁস কথা বেরিয়ে যায়। সংযত হয়ে বলি এক সঙ্গে কাজ করি, একসঙ্গে থাকি, বসি, তবু আপনি যেন সব সময় আলাদা। আমাদের যেন মানুষ বলেই মনে করেন না, কেন বলুন তো? আমরা কি এতই অভদ্র যে আমাদের সঙ্গে মেশা যায় না?

ছিঃ, ছিঃ কিযে বলেন! আলাদা কোথায়? আমি তো আপনাদের সঙ্গেই রয়েছি—

কি জবাব দেব ? জেগে যে ঘুমায় তাকে জাগানো যায় না।

ক'দিন ওকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চলি। তাতেও 'ও'র দিকে কোন তারতম্য লক্ষ্য করিনা। এমন বিপদেও মানুষ পড়ে ? মাধবী যদি সাধারণ ভাবে আমাদের সঙ্গে মিশত, আলাপ আলোচনা করত তো আমাদের বলার কিছু ছিলনা কিন্তু ওর এই গণ্ডিটেনে চলা আমরা বরদাস্ত করে উঠতে পারছিনে। ফলে ওর কথা ওর ভাবনা। সর্ব্বক্ষণ ওর কথাই ভাবি। কেমন জানি একটা জিদ চেপে যায় ওর এই মৃন্ময়ী মূর্ত্তিতে। অথচ ও সত্যি মৃন্ময়ী নয় তা বোঝা যায় কখনো-সখনো বিদ্যুৎ কটাক্ষে।

বাড়ী গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে জলযোগ সেরে যেই গল্পের বইটি হাতে নিয়েছি বাবা ডাকেন, খোকা শুনে যাও।

বই খানা রেখে বাবার ঘরে গিয়ে দাঁড়াই।

তিনি বলেন, আমি সম্বন্ধ দেখছি তুমি বিয়ের জন্য প্রস্তুত হও।

দিদির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি তিনি হাসছেন আর চোখ মটকে বলছেন কেমন জব্দ। মা'র মুখের দিকে তাকাই তিনি উল বুনতে ব্যস্ত। আমি বলি, এখন আমি বিয়ে করব না।

বাবা হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন, এখন বিয়ে করবে না কখন করবে শুনি ? বয়স কত হল খেয়াল আছে ? আজ-কালের ছেলেদের এই এক রোগ। 'এখন বিয়ে করব না! তারপর বুড়ো বয়সে একটা বেজাত অজাত ধরে আনবে। এখন বিয়ে করতে তোমার বাধা'টা কি শুনি ? এ মাসেই তোমার বিয়ে দেব অযথা আপত্তি ক'রো না।

এখন আমি বিয়ে করব না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে আসি।

রাত্রিতে খাবার ডাক পড়লে পরে খাব বলে পাশ কাটাই। বাবার খাওয়া হয়ে গেলে, খেতে বসে ফেটে পড়ি। মাকে বলি, তোমরা আমার বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছ কেন ?

কেন মানে ? আমি একা আর সংসারের সব দেখে উঠতে পারছিনে।

না পার লোক রাখ।

মা রুখে ওঠেন মূর্খের মত কথা বলিস না, বৌ-এ'র কাজ লোকে করবে নারে আহাম্মুক ?

বৌ এ'র কাজটা কি শুনি ? তোমার বৌ এসে খুন্তি বেড়ী ধরবে না, বাসন কোসন মাজার মত তুচ্ছ কাজ করার প্রশ্নই ওঠে না। তোমার ঠাকুর দেবতার ভোগ আজ আর নেই, নেই অতিথি সজ্জন দেখা, বাড়ী রক্ষার প্রশ্ন ওঠেনা কারণ থাকবে আমার সঙ্গে কোয়ার্টারে নয়ত ভাড়া বাড়ীতে। বৌ করবে কি শুনি ?

থাম, বেয়াড়া ছেলে, মা ধমকে ওঠেন।

দিদি বলে, তোর লজ্জা করেনা মাকে এ সব বলতে ?

আমি হেসে উঠি হো-হো করে, চমৎকার কথা। মাকে আমার বিয়ের কথা বলতে লজ্জা হবে ? যার কাছে মনের কথা বলব না ? মার দিকে চেয়ে বলি আরও আছে বৌ-রূপী হাতীর খরচ যোগাতে যে আমার ঘাড়টি যাবে তা ভেবে দেখেছ ? তার উপর যখন ঘর আলো করা তোমার ২১৮টি নাতি-নাতনী জুটবে তাদের খাওয়াবে কি ? আজ কাল বেবি ফুডের ক্রাইসিস জান ?

এবার মা হেসে ফেলেন, বলেন ডেপো ছেলে, অনেক হয়েছে, এবার খা।

খাচ্ছি, তুমি বাবাকে বুঝিয়ে বলো।

দিদি ভেংচে ওঠেন আচ্ছারে বাক্যবাগীশ দেখব বিয়ে তুই করিস কি-না। করবি ঠিকই বাবা যা বলেছেন বুড়ো বয়সে।

সে দেখা যাবে। বলে উঠে পড়ি।

অফিস ছুটি হতে বেরিয়ে দেখি, মাধবী আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আজ যেন মাধবীর মুখের কাঠিন্য মিলিয়ে সেখানে আকুতি ফুটে উঠেছে, কি যেন বলতে চাইছে।

মাধবীর চোখ চিকমিকিয়ে ওঠে, গালে টোল পড়ে, মুখেও একটু সলজ্জ হাসি দেখা দেয়। আমতা আমতা করে, বলে, আমাকে একটু সর্ষের তেল যোগাড় করে দিতে পারেন ? এমন মুস্কিল হয়েছে আজ কদিন একদম পাচ্ছিনে।

বিব্রত মুখে আমি বলি আচ্ছা আমি দেখব।

মাধবী বলে তা হলে আমার খুবই উপকার হয়।

আচ্ছা তেল কোথায় পৌঁছে দেব বলুন তো? আজ ও নিঃসঙ্কোচে বাড়ীর ঠিকানা দিলে।

দিন তিনেক পরে একদিন বিজয়গর্বে মাধবীদের বাড়ী গিয়ে বলি নিন আপনার জিনিষ।

আনন্দে মাধবীর চোখ নেচে ওঠে, গালে টোল পরে, বলে সত্যি, আশ্চর্য! আমি তো কিছুতেই সংগ্রহ করতে পারলুম না। এক'দিন অফিসে যাননি কেন?

শরীরটা ভাল ছিলনা জবাব দেই, এ ছাড়া কি-ই বা বলতে পারি। এ কথাতো আর বলা যায়না যে সর্ষের তেলের জন্য লাইন দিতুম, সমস্ত দিন লাইনে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যা বেলা শুনতুম তেল ফুরিয়ে গেছে। তিন দিন এমনি অস্নাত অভুক্ত থেকেও যোগাড় করতে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে যখন ফিরে আসছিলুম তখন রাস্তায় একজন চুপি চুপি বললে এক কেজি বন্ধ টিনে সর্ষের তেল নেবেন?

হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পাওয়ার উপমাটা এতদিনে মনে প্রাণে উপলব্ধি করলুম। ইচ্ছে হল লোকটাকে কোলে তুলে নাচি। সে তাড়াতাড়ি বললে পনের টাকা দিলেই তেল দেবে। সঙ্গে সঙ্গে টাকা দিয়ে নিয়ে এসেছি। এ সব তো আর বলা যায় না।

খুব জোর সংবর্ধনা পেলুম। মাধবীর মা এসেও বললেন বাঁচিয়েছ বাবা, তেল ছাড়া যে কি বিপদে পড়েছিলুম, আমার তো যোগাড় করে দেবারও কেউ নেই, মাধবীর সময়ই হয়না।

মাধবীও এরই মধ্যে চা মিষ্টি নিয়ে এল। পরিতৃপ্ত মনে ধুমায়িত পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বলি, আবার এ সব কেন?

মাধবী চোখ চিকমিকিয়ে বলে আজ খেয়ে নিন। এ'র পর তো ছানার জিনিষ নিষিদ্ধ হচ্ছে।

মা বললেন,—সত্যি বাবা দেশের একি অবস্থা হল বলত? চাল নেই, তেল নেই, ডাল নেই, চিনি নেই, মাছ নেই, নেই, নেই শুনতে শুনতে কান যে ঝালা পালা হয়ে গেল!

আমরা যে সভ্য হচ্ছি মাসীমা বলে অনিচ্ছা সত্বেও উঠে পড়ি। কথায় বলে কারো সর্বনাশ কারো পৌষ মাস। এই সর্ষের তেলই শেষ পর্যন্ত আমাকে বাঁচালে। জীবনপণ রেখে সর্ষের তেল যোগাড় করতে লেগে যাই। তৈলসিঞ্চনে অচল মেসিন যেমন চালু হয় তেমনি মাধবীও সচল হয়ে ওঠে। আজকাল মুখে হাসি লেগেই আছে। প্রায়ই তাদের বাড়ী চায়ের নিমন্ত্রণ থাকে। ওর বাবা নেই। ওরা দুটি ভাই বোন। ভাই মধ্যপ্রদেশে প্রফেসারী করে। সেখানে পরিবার নিয়ে থাকে। মা মেয়েকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মেয়ের কাছেই থাকেন। বিয়ে দেবার মত সঙ্গতি নেই বলেই হয়ত আজও মাধবী অনূঢ়া। ভাবি হায় জ্ঞানদার যুগ কি আজও শেষ হয়নি? এই বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেও কি একটি সব রকমে কর্মক্ষম স্মার্ট সুলক্ষণা মেয়ের টাকার অভাবে বিয়ে হবে না? বাড়ী থেকে আমাকে বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছে। আমি দেখিয়ে দেব এদেশে এখনো উদার ছেলে আছে। শুধু হাতে বিয়ে করতে তারা পিছপা' নয়।

আজ মাধুরীর ওখানে যাবার কথা নয়। তবু মনে হল একবার ঘুরে আসি।

আমায় দেখে মাধবী পরমোৎসাহে চেঁচিয়ে ওঠে ওঃ খুব আয়ু আছে দেখছি; এতক্ষণ তোমার কথাই ভাবছিলাম।

এ অধমের এত সৌভাগ্য কেন বলত?

খুব যে অহঙ্কার দেখছি। কি হয়েছে জান? হঠাৎ খবর পেলাম আমার দিদিমা খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। খবর পেয়েই মা চলে গিয়েছেন। এখন ভাবছি বাড়াবাড়ি মা ফিরতে পারবেন না, খালি বাড়ী রেখে আমিও যেতে পারব না। রাত্রিতে একা একটা বাড়ীতে থাকি কি করে বল? এ সময় কিন্তু আমরা অবলাই, বলে হো, হো, করে মাধবী হেসে ওঠে।

আমার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দেয়, বলি আমাকে ভয় হচ্ছে না?

মাধবীর চোখ চিকমিকিয়ে ওঠে, গালে টোল পড়ে হাঁ তোমাকে ভয় না হাতী? বলে ষ্টোভ ধরিয়ে চা বসায়।

আমি বলি ওসব থাক। এস গল্প করি।

মাধবী হেসে বলে জান আমাদের একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে, যে রাঁধে, সে কি চুল বাঁধে না? আমি একটু চা করে গল্প করতে পারব না?

চা আর বিস্কুট নিয়ে এসে মাধবী বসে। একটা ডিসেই বিস্কুট থাকে।

আমার ভেতরে তখন প্রলয় সুরু হয়েছে। মাধু বলে মাধবীর একখানা হাত টেনে নিই।

মাধবীর মুখে কালো ছায়া পড়ে, হাতখানা ঠাণ্ডা পাথর। আস্তে করে সরিয়ে নেয়; বলে, নন্দন! তোমাকে কিছুদিন যাবৎই একটা কথা বলব বলব করেও বলা হয়নি। আজ বুঝছি বলা আমার আগেই উচিত ছিল। অসিত রায়ের সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, সে বছরখানেকের জন্য আমেরিকা যায়,কথা ছিল সেখান থেকে এলে আমাদের বিয়ে হবে। বছরখানেক সে নিয়মিত চিঠি-পত্র লিখত, তারপর আর লেখেনি। এক বছরের জায়গায় চার বছর হতে চলল। আমি তার প্রতীক্ষায় আছি। সময় সময় নানা শঙ্কা জাগে তবু তা আমল দিই না, সে আসবেই এ প্রত্যয় নিয়েই আমি বেঁচে আছি। সে জন্যই আমি তোমাদের সঙ্গে মিশতাম না। নিজেকে নিয়েই নিজে থাকতাম, অবসর সময়ে কবিতা লিখতাম। সে কবিতা কখনো ছাপাবার জন্য পাঠাই নি, কাউকে দেখাই নি। ওটা আমার অবসর বিনোদনের ছবি। তুমি নিজেই এগিয়ে এলে, আমি যে গণ্ডি-টেনে চলতাম তেলের প্রয়োজনে তা মুছে ফেলি। তোমার সঙ্গে মিশে বুঝি এ আমার প্রয়োজন ছিল, একা একা আমি হাঁপিয়ে উঠে-ছিলাম। জীবন আমার বিস্বাদ হয়ে উঠেছিল। তোমার মত অকৃত্রিম বন্ধু পেয়ে আমি বেঁচে গেছি।

এতক্ষণ যেন আমার মৃত্যুর পরোয়ানা শুনছিলাম। বিবর্ণ মুখে মাথা নীচু করে বলি, আজ চলি।

মাধবী সবিস্ময়ে বলে সে কি? এখন যাবে মানে? মা, না এলে আমাকে একা রেখে যাবে নন্দন? বলে আমার পিঠে হাত রাখে।

পাথর হয়ে যাই, ঘেমে উঠি, না, যাওয়া আমার চলবে না। শীতের রাত্রি সন্ধ্যা হতেই নিস্তব্ধ হয়ে আসে। জানলা বন্ধ। এ বাড়ীটাতে আমি আর মাধু—মাধুকে আমি পছন্দ করি, তবু, তবু তার বিশ্বাসের মর্যাদা আমাকে দিতেই হবে। হায়রে শিক্ষিত, সমাজবদ্ধ ভদ্র মানুষ! বিশ্বামিত্র, পরাশর, মহা মহা তপস্বীরা যা পারেনি আজ তা আমাকে পারতেই হবে। এ মুহূর্তে মনে পরে রাবণ রাজার কথা, রাক্ষস হয়েও কত বড় সংযমী, ভদ্র ছিলেন। মাধুকে আমি আসছি বলে বাথরুমে ঢুকে মাথায় মুখে জল দিই, কান দিয়ে যেন আগুন বেরুচ্ছে, নিঃশ্বাস ঘন হয়ে উঠেছে সমস্ত শরীর গরম। আজ আমার চরম পরীক্ষা। মাধুর মা যদি না ফিরেন সমস্ত রাত্রি থাকতে হবে, চলে যাবার উপায় নেই।

মাধবী বলে, ওকি! এই ঠাণ্ডার ভেতর এত জল ঢালছ কেন?

আমি একটা তোয়ালে টেনে নিয়ে মাথা মুখ মুছতে বলি, হাত মুখ ধুয়ে যুৎ করে বসব। আর এক কাপ চা খাওয়াও দেখি।

মাধবী হেসে বলে, বুঝেছি পেটে আগুন জ্বলছে, আমি চা দিয়ে রান্না চাপিয়ে দিচ্ছি, খেয়ে নাও।

মনে মনে বলি আগুন জ্বলছে ঠিকই, তবে পেটে নয়, মুখে বলি তা মন্দ নয়, শীতের রাত্রি খিচুরী কর। ইলিশ মাছ ভাজা তো আর খাওয়াতে পারবে না, মধু অভাবে গুড়। নিদেন বেগুন ভাজ,—নাকি বলবে ডাল নেই?

ওঃ খুব সংসার শিখেছ দেখছি বলে মাধু হাসতে হাসতে রান্না ঘরে চলে যায়।

যথা সময়ে মাধুর সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে খিচুরী খাই। রেঁধেছে ভাল। খাওয়া দাওয়ার পর মাধু বলে বিছানা পেতে দিই শুয়ে পড়।

আমি বলি কি দরকার? তার চেয়ে গল্প করেই রাত্রিটা কাটিয়ে দিই।

মাধু আপত্তি করে, না, না, শরীর খারাপ হবে।

এমন সময় কড়া নাড়ে। ওর মা মামার সঙ্গে এসে যান। দিদিমা একটু ভাল।

আমাকে দেখে খুশী হন কি বিরক্ত হন ঠিক বুঝলাম না। মুখে বললেন, তুমি এসেছ! মাধুর চিন্তায়ই আমাকে ফিরতে হল।

আমি কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞেস করে উঠে দাঁড়াই।

মাধু বলে, হ্যাঁ তোমার আর রাত্রি করে কাজ নেই।

মাধু রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বললে অনেক কষ্ট করলে।

আমি জবাব দিই অত বেশী খাওয়ালে কষ্ট একটু হয়ই। দুজনেই হেসে উঠি।

রাস্তায় আসতে আসতে ভাবি, আজকাল ধর্ম নেই তাই সহধর্মিণী না হলেও চলে কিন্তু সহমর্মিণী অপরিহার্য। আজ থেকে মাধু আমার বান্ধবী।

গান

তুমি শুকতারা সম
ডাক দিয়ে গেলে মোরে
প্রথম কুসুম তুলিব কি আজ-ভোরে !

এখনো উষার জাগেনি লালিমা
গগনে পবনে নাই যে গো সীমা
মঙ্গল ঘট রাখিনি তো গৃহ-দোরে।

এখনো কুলায় রয়েছে ভোরের পাখী
আলো আঁধারের কুয়াশায় থাকি
উঠিতেছে ডাকি ডাকি—

এখনো নয়নে আছে ঘুমঘোর
কবরীতে বাঁধা আছে ফুলডোর
দুয়ার খুলিয়া অঙ্গনে যেতে
সরমে যে যাই মরে !

কথা—অখিল নিয়োগী সুর—ক্ষিতীশ দাশগুপ্ত স্বরলিপি—রাধা সেনগুপ্তা

গা-মা	II	পা	-র্সা	-গমা	।	পা	-র্সা	-ধা	I	পা	-া	-া	।	-া	-া	-া	I
তুমি		শু	ক্	তা		রা	-০	-স		ম	-০	-০		-০	-০	-০	
		ধা	-ধা	-পা	।	মা	-মা	-পা	I	মা	-গা	-া	।	-া	-া	-া	I
		ডা	ক্	দি		য়ে	গে	-লে		মো	-রে	-০		-০	-০	-০	
		সা	-গা	-মা	।	পা	-দা	-দা	I	পা	-দা	-ণা	।	দা	-গমা	-গা	I
		প্র	থ	ম		কু	সু	ম		তু	লি	ব		কি	আ	-জ	
		ঋা	-সা	-সা	।	-া-	(গা	-মা)	II								
		ভো	রে	-০		০	তু	-মি									

II মা -দা -দা | না -র্সা -র্সা I না -র্সা -না | দা -না -না I
এ খ নো উ ষা র জা গে নি -০ লা -লী
র্সা -র্সা -র্সা | -র্া -া -া I না -র্সা -জ্ঞা | ঋা -র্সা -র্সা I
মা -০ -০ ০ -০ -০ গ গ নে প ব -নে
না -র্সা -না | দনা -দা -পা I সা -মা -গা | পা -মা -মা I
না ই যে গো সী মা ম ঙ্ গ ল ঘ ট্
গা -মা -পা | দা -পা -পা I দা -পা -পা | -া -া -া I
রা খি নি তো গৃ হ দো -রে -০ -০ -০ -০

ডাক দিয়ে গেলে ইত্যাদি······

সা -মা -মা | গা -মা -মা I গা -মা -দা | মা -গমা -গা I
এ খ নো কু লা য় র -য়ে -ছে ভো -রে -র্
ঋা -সা -সা | -া -া -া I সা -দা -দা | পা -দা -দা I
পা খী -০ ০ -০ -০ আ লো আঁ ধা -রে -র্
পা -দা -ণদা | ণদা -পা -মা I মা -পা -দা | র্সা -দা -মা I
কু য়া শা য় থা -কি উ ঠি তে -ছে ডা কি
ঋা -সা -সা | -া -া -া I
ডা কি -০ ০ -০ ০
মা -দা -দা | না -র্সা র্সা I না -র্সা -দা | না -র্সা -র্সা I
এ খ -নো ন য় নে আ -ছে -ঘু ম ঘো র্
না -র্সা -জ্ঞা | ঋা -র্সা -র্সা I না -র্সা -না | দনা -দা -পা I
ক ব রী তে বাঁ -ধা আ -ছে ফু ল ডো র্
সা -মা -গা | পা -মা -মা I মা -দা -দা | পণদা -পা -মা I
দু য়া র খু লি য়া অ ঙ্ গ -নে -যে -তে
মা -পা -দা | ণর্সা -দণা -দা I পা -মা -মা | -া -া -া III
স র -মে -যে যা ই ম -রে -০ ০ -০ -০

ডাক দিয়ে গেলে ইত্যাদি·

একটি ঔপন্যাসিক চরিত্র : বিপ্রদাস

বিনয় বিশ্বাস

ঔপন্যাসিক উপন্যাস সৃষ্টি করেন আপন মনের মাধুরি মিশিয়ে। পাঠক সে উপন্যাস পাঠ করেন আপন মনের ভক্তি আর শ্রদ্ধা নিয়ে। কেননা, মানুষ যা খোঁজে অথচ পায় না, যা হ'তে চায় অথচ হ'তে পারে না, যা হওয়া উচিত অথচ হয় না; সেই সব না-হওয়া আর না—পাওয়া-ধনের সন্ধান দেন সাহিত্যিক তাঁর সাহিত্যের মাধ্যমে। মানুষ খোঁজে এমন একটি উদার মহৎ এবং বলিষ্ঠ চরিত্র, যার কাছে মাথা আপনি নত হয়ে আসবে; সে সন্ধান করে এমন একটি আদর্শ, যার মধ্যে নিজেকে মিলিয়ে দেওয়া যাবে অনায়াসে। মানুষ খোঁজে, কিন্তু তেমনটি ঠিক পায় না। সেই তেমনটির সন্ধান পাওয়া যায় সাহিত্যে, তাইত আমরা সাহিত্য পড়ি। পড়তে পড়তে এমন মানুষের সন্ধান পাই যাকে মনে হয়, এতদিন যেন একেই খুঁজছিলাম; তখন একবারও মনে হয় না এলোকটি বইএর লোক, এ চরিত্রটি 'বানানো'। এমনি একটি চরিত্রের কথাই এখানে বলবো। এ চরিত্র 'যোগাযোগে'র বিপ্রদাস; কুমুর দাদা। এখানে একটি কথা বলা দরকার, আমি সমালোচক নই, কবিগুরুর অগণিত পাঠকের একজন মাত্র; সুতরাং একজন পাঠক-হিসাবে চরিত্রটি কেমন লেগেছে তাই বলবো।

বিপ্রদাসের কথা ভাবতে গিয়ে সর্বাগ্রে মনে পড়ে 'তাঁর দেবতার মত রূপ, বীরের মত তেজস্বী মূর্তি, তাপসের মত শান্ত মুখশ্রী, তার সঙ্গে একটি বিষাদের নম্রতা। তাঁর মুখে সেই বিষাদ তাঁর অন্তরের মহত্ত্বের ছায়া, ধৈর্যের আশ্চর্য গভীরতা। তখনকার কালে শিক্ষিত সমাজে প্রচলিত পজিটিভিজম্ তাঁর ধর্ম ছিল, দেবতাকে বাইরে থেকে প্রণাম করা তাঁর অভ্যাস ছিল না, অথচ দেবতা আপনিই তাঁর জীবন পূর্ণ করে আবির্ভূত ছিলেন।' এই কটি কথাতেই ফুটে উঠেছে বিপ্রদাসের সম্পূর্ণ ছবি। তিনি সাহিত্য ভালবাসেন; তিনি শিল্পী। তিনি বন্দুক ছোড়েন, এস্রাজ বাজান, কুস্তি করেন আর 'সংস্কৃত সাহিত্যে বিপ্রদাসের বড় অনুরাগ।' সর্বোপরি বিপ্রদাস 'ঔদার্যে মহৎ, পৌরুষে দৃঢ়।' এ চরিত্র রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

'বাবার মৃত্যুর পর বিপ্রদাস দেখলে, যে গাছে তাদের আশ্রয় তার শিকড় খেয়ে দিয়েছে পোকায়। বিষয়-সম্পত্তি ঋণের চোরাবালির উপর দাঁড়িয়ে—অল্প অল্প করে ডুবছে।' এমনি যখন সংসারের অবস্থা, তখন তাকে রক্ষা করবার ভার পড়লো বিপ্রদাসের উপর। এ এক কঠোর দায়িত্ব। ছোট ভাই সুবোধ সংসারের অবস্থা ফেরাবার জন্য 'ব্যারিষ্টার' হতে বিলেতে গেল, কিন্তু সেখানে গিয়ে বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে সংসারকে আরও বিপদগ্রস্ত করে তুললো। বিপ্রদাস সমস্ত জেনেও এতদিন অনেক কষ্টে তার খরচ জুগিয়েছেন। কিন্তু এবার তার দাবী মেটানো বিপ্রদাসের পক্ষে অসম্ভব। তাই অনেক ভেবে চিন্তে বিপ্রদাস লিখলেন: 'টাকা পাঠাতে হলে কুমুর পণের সম্বলে হাত দিতে হয়, সে অসম্ভব।' সুবোধ ভুল বুঝলো। সে তার সম্পত্তির অর্ধেক অংশ বিক্রী করে টাকা পাঠাতে লিখলো। যে ভাইকে বিপ্রদাস সমস্ত অন্তর দিয়ে অকপটে ভালবেসেছেন তার কাছ থেকে 'এ চিঠি বিপ্রদাসের বুকে বাণের মত বিঁধলো।' কিন্তু এতে তিনি একটুও বিচলিত হলেন না। যেন কিছুই হয় নি এমনি ভাবে নিজের সম্পত্তি 'পত্তনি' দিয়ে পরমস্নেহে সুবোধকে টাকা পাঠালেন; বাকিটা ভবিষ্যতের জন্য তুলে রাখলেন। কুমু এতে আপত্তি করলে বিপ্রদাস বললেন: 'ওর নিজের সম্পত্তি আর আমার সম্পত্তিতে ও যখন আজ ভেদ করে দেখতে পেরেছে, তখন আমার তালুক আমি কি আর আলাদা করে রাখতে পারি?

আজ ওর বাপ নেই, বিপদের সময় আমি ওকে দেব না ত কে দেবে ?' কি মহৎ আর উদার হৃদয় ! আজকের আত্মকেন্দ্রিক আর স্বার্থপর জগতে এমন চরিত্রের মূল্য অনেক।

'বিপ্রদাস বনেদী ঘরের অভিজাত ভদ্রলোক, তাঁর কাছে হীনতা কপটতার লেশমাত্র ছিল না।' অপর দিকে মধুসূদন অহংকারী, উদ্ধত এবং আত্মকেন্দ্রিক। তার মনের সবটুকু স্থানই দখল করে আছে টাকার দম্ভ। সঙ্গীতে সাহিত্যে তার কোন রুচি নেই। এই মধুসূদন টাকার গর্বে বিয়ে করলো চাটুজ্জে বাড়ীর সেই কুমুকে, যার সঙ্গীতে, সাহিত্যে এবং অন্যান্য বিচিত্র বিষয়ে অনুরাগ অসীম। মধুসূদন দলবল নিয়ে নুরনগরে এলো বিয়ে করতে। কন্যাপক্ষকে একটা খবর দেওয়ার কথাও তার মনে আসেনি। তার ধারণা, 'ভদ্রতা সাধারণ লোকের, অভদ্রতা রাজসিক।' বিপ্রদাস কিন্তু কাউকে না জানিয়ে বরপক্ষকে অভ্যর্থনা করবার জন্য ষ্টেশনে হাজির হলেন। একজন ভদ্রলোকের কর্তব্য হিসেবে বিপ্রদাস সেই অভ্যর্থনার জন্য এগিয়েছিলেন। কিন্তু মধুসূদন বিপ্রদাসকে দেখে ছোট একটা নমস্কার করলো। বড্ডো হৃদয়হীন সে নমস্কার। এই শুরু, এরপর মহাসমারোহে 'মধুপুরী' নির্মাণ করে, ঐশ্বর্যের রাজসিক আড়ম্বরে চাটুজ্জেদের উপর টেক্কা দিতে চেয়েছেন ঘোষালপুত্র। নিজের ঐশ্বর্য আর আড়ম্বর দিয়ে ছোট করতে চেয়েছেন বিপ্রদাসকে। এতে বিপ্রদাসের বাড়ীর অন্যান্যদের মতে বংশের অমর্যাদা এবং পূর্বপুরুষদের মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বিপ্রদাসকে এসব কিছুই স্পর্শ করেনি। 'কিন্তু ওরা ওসব কী করছেন ? এতে কি তোমাদের মান থাকবে ?' কুমুর এ প্রশ্নের উত্তরে বিপ্রদাস যা বলেছেন, তা একজন ভদ্র এবং উদারচেতা লোকের পক্ষেই সম্ভব। তিনি বলেছেন, 'ওদের দিকটাও ভেবে দেখিস্। পূর্ব-পুরুষদের জন্মস্থানে আসছে ধুমধাম করবে না ?' কত কঠিন সমস্যার কত সহজ সমাধান! মধুসূদন যাকে ঘায়েল করবার জন্য এত ব্যস্ত, তিনি কিন্তু এ সম্বন্ধে একেবারে নিস্পৃহ, উদাসীন, মনে হয় মধুসূদনের বাছা বাছা তীরগুলো এক কঠিন পাথরে পড়ে বারে বারে ব্যর্থ হয়েছে। তাছাড়া বিপ্রদাসের অন্তরের কথা হল : 'আড়ম্বরে পাল্লা দেবার চেষ্টা—ওটা ইতরের কাজ।' এক-জন সত্যিকার—সভ্যমানুষের উপযুক্ত কথা।

এরপর বিয়েটা সম্পন্ন হয়েছে এক নিরানন্দ পরিবেশের মধ্যে। 'বরপক্ষ-কন্যাপক্ষের প্রথম সংস্পর্শ মাত্রই এমন একটা বেসুর ঝনঝনিয়ে উঠল যে, তারমধ্যে উৎসবের সংগীত কোথায় গেল তলিয়ে।' বিপ্রদাস এসবের কিছুই জানলেন না, তিনি তখন একশ পাঁচ ডিগ্রী জ্বরে শয্যাশায়ী। তাঁকে সমস্ত ভুল বোঝান হ'ল। তিনি বিশ্বাস করলেন, ওরা কলকাতার লোক কি না, তাই ভদ্র ব্যবহার জানা আছে। 'ওরা বোঝে যে, যে বাড়ী থেকে মেয়ে নেবে তাদের অপমান নিজেদেরই অপমান।' অন্যদিকে মধু ভেবে গেলো, সমস্ত অনিষ্টের মূলে রয়েছেন বিপ্রদাস। একই ঘটনা-মুকুরে উভয়ের মনের প্রতিফলন অতি পরিষ্কার ভাবে ধরা পড়েছে।

এরপর মধুসূদনের সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়েছে কুমুর উপর। মধুসূদন তার অর্থ আর অহংকার দিয়ে কুমুর মন পেতে চেয়েছে। কিন্তু কুমু গড়া অন্য ধাতুতে। তাই মধুসূদনের চেষ্টা সেখানে ব্যর্থ হয়েছে। মধুসূদন দেখেছে কুমুর দাদা বিপ্রদাসের মধ্যে ঔদ্ধত্য একটুও নেই, আছে একটা দূরত্ব। মধুসূদন মনে জানে যে, বিপ্রদাস তার চেয়ে বড়ো, সে বিপ্রদাসের কাছে পরাজিত। সেই কারণে কুমুর কাছেও সে পরাজিত। সংসারে যার উপর তার সবচেয়ে অধিকার সেখানে তার কোন অধিকার নেই। মধুসূদন জানে, কুমুর রক্তের অণুতে অণুতে তার দাদার প্রভাব বর্তমান। এজন্য বিপ্রদাসের উপর মধু-সূদনের রাগ আরও বেড়েছে। বিপ্রদাস যে কুমুর দাদা একথা মধুসূদন ভোলেনি। কুমুর উপর বিপ্রদাসের প্রভাব সত্যই সুদূর প্রসারী। একটা কথা মনে রাখা দরকার, মধুসূদন অন্তরের দিক থেকে জন্মদরিদ্র, বিপ্রদাস জন্মধনী। তাই মধুসূদন আপন সম্পদের অহংকার দিয়ে যতই বিপ্রদাসের মহত্ত্বকে অস্বীকার করতে চেয়েছে, ততই সে মহত্ত্ব বেড়েই গিয়েছে। হৃদয়ের ধনের কাছে পার্থিব ধন চিরদিনই পরাজিত।

এতক্ষণ দেখা গেল বিপ্রদাস 'ঔদার্যে মহৎ' এবার দেখব তিনি 'পৌরুষে দৃঢ়'ও। বিপ্রদাস সরল বিপ্রদাস উদার, বিপ্রদাস শান্ত, সবই সত্য, কিন্তু এর

চেয়েও বড় সত্য, তিনি একজন তেজস্বী পুরুষ। অন্তরের সংগে যাকে তিনি অন্যায় বলে জানেন তার সংগে তিনি আপোসহীন। যে কোন প্রকার অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে তিনি খড়্গহস্ত। তাই 'অমন ধৈর্যগম্ভীর আত্ম-সমাহিত' বিপ্রদাস যখন শ্যামা আর মধুর অবৈধ সম্বন্ধের কথা শুনেছেন, তখন তিনি ক্রোধে জলে উঠেছেন। তাঁর চোখের সামনে কুমুকে ঘিরে ভেসে উঠেছে নিপীড়িত আর অপমান-লাঞ্ছিত হাজার হাজার অসহায় স্ত্রীর আর্ত মুখ। সমাজের এই অন্যায় অত্যাচার তাঁর বুকে কঠিন হয়ে বেজেছে। একজন বিবাহিত স্ত্রীকে তার ন্যায্য অধিকার ভোগ করবার কোন ব্যবস্থা সমাজ করেনি। কিন্তু তাকে অপমান করবার ষোল আনা ব্যবস্থা সেখানে সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান। একথা আজ বিপ্রদাসের কাছে স্পষ্ট যে, 'স্ত্রীকে নিরুপায়ভাবে স্বামীর বাধ্য করতে সমাজে হাজার রকম মন্ত্র ও যন্ত্রণার সৃষ্টি করা হয়েছে, অথচ সেই শক্তিহীন স্ত্রীকে স্বামীর উপদ্রব থেকে বাঁচাবার জন্যে কোনো আবশ্যিক পন্থা রাখা হয়নি। এই নিদারুণ দুঃখ ও অসম্মান ঘরে ঘরে যুগে যুগে কি রকম ব্যাপ্ত হয়ে আছে এক মুহূর্তে বিপ্রদাস তা যেন দেখতে পেলেন সতীত্ব গরিমার ঘন প্রলেপ দিয়ে এই ব্যথা সারাবার চেষ্টা, কিন্তু বেদনাকে অসম্ভব করবার একটুও চেষ্টা নেই! স্ত্রীলোক এত সস্তা এত অকিঞ্চিৎকর।১ বিপ্রদাস লক্ষ্য করেছেন, 'জবরদস্তের হাতেই সমাজ চাবুক জুগিয়েছে; আর যারা ধর্মহীন তাদের পিঠের দিকে কোনো বিধি-বিধান নজর করে না।' কিন্তু বিপ্রদাসের মন 'একেলে মন'। তিনি সমাজের জীর্ণ সংস্কার আর মলিন অনাচারকে মানতে একটুও রাজি নন আর তাকে তিনি গ্রাহ্যও করেন না। একথা তিনি খুব ভালভাবেই জানেন, সমাজের কোনো বিরুদ্ধাচরণ করলে, সমাজ তাকে অনেক দুঃখ দেবে। কিন্তু বিপদের ভয়ে অন্যায়কে ত মেনে নেওয়া যায় না; আর সমাজের ভয়ে অত্যাচারের সংগে আপোস—যে অসম্ভব। তাই ত তাঁকে বলতে শুনি, 'কুমু, অপমান সহ্য করে যাওয়া শক্ত নয়, কিন্তু সহ্য করা অন্যায়। সমস্ত স্ত্রীলোকের হয়ে তোমাকে তোমার নিজের সম্মান দাবী করতে হবে, এতে সমাজ তোমাকে যত দুঃখ দিতে পারে দিক।' অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে এই মনোভাব একান্ত প্রয়োজন। বিপ্রদাস দেখলেন, সমাজে মেয়েদের কোনো মর্যাদা নেই, তাদের কোন সম্মান নেই; স্বামীর হাতে মার খাওয়ার জন্যই যেন তাদের জন্ম—স্বামীর স্ত্রী ছাড়া তাদের অন্য পরিচয় নেই। তারাও যে মানুষ, তাদেরও যে—হাসি-কান্না দুঃখ আছে, একথা সমাজের বিধানে অস্বীকৃত। আমাদের একটা ধারণা আছে—স্ত্রীর কোন পৃথক সত্তা নেই—সে স্বামীর ছায়া মাত্র। স্বামী সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে—সে পাপী হোক, অত্যাচারী হোক, লম্পট হোক, সেই স্ত্রীর একমাত্র গতি। কিন্তু তাঁর ধারণা অন্য। তাঁর চিন্তা, তাঁর ধারণা সহজ সরল রাস্তা ধরে চলে—তাঁর মতামত তথাকথিত শাস্ত্রীয় বিধানের সংগে মেলে না। তিনি বিশ্বাস করেন, 'ভালো মন্দর সাধারণ নিয়ম অত্যন্ত পাকা করে বেঁধে দিলে অনেক সময় সেটা নিয়মই হয়, ধর্ম হয় না।' নিয়ম মানার জন্যই নিয়মের সৃষ্টি নয়—সকলের মঙ্গলের জন্যই নিয়ম। তাই নিয়ম যেখানে অমঙ্গল হয়ে দেখা দিয়েছে সেখানে নতুন করে ভাবতে হবে বৈকি। সুতরাং যখন তিনি সমাজের এই অবস্থা দেখলেন তখন সখেদে বললেন, 'আমি দেখতে পাচ্ছি, মেয়েদের যে অপমান সে আছে সমস্ত সমাজের ভিতরে, সে কোন একজন মেয়ের নয়।...আজ বুঝতে পারছি এর সংগে লড়াই করতে হবে সকলের হয়ে।' সে লড়াই হবে সেই সমাজের সংগে, যে সমাজ নারীকে তার প্রাপ্য মূল্য দিতে বড়ো বেশী ফাঁকি দিয়েছে। আর-'এই লড়াইয়ের' প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে কুমুকে তিনি আর তার শ্বশুরবাড়ী পাঠাবেন না। যে স্বামীর ঘর তার স্ত্রীর অধিকার দেয় না, নারীর মূল্য দেয় না, সম্মান দেয় না—সেই ঘরে, হোক না সে স্বামীর ঘর, কোন আত্মসম্মান-সম্পন্না নারীর থাকা সম্ভব নয়। আমরা মুখ বুজে সহ্য করি বলেই, মার আরও এসে পড়ে। শান্ত বিপ্রদাস বলেছেন, 'বলবার দিন এসেছে, সহ্য করব না। কুমু, এখানেই তোর ঘর মনে করে থাকতে পারবি? ও-বাড়িতে তোর যাওয়া চলবে না।' মোতির মা বলেছে,—'একদিন ওখানে যেতে তো হবেই; আর তো রাস্তা নেই।'

'যেতে হবেই একথা ক্রীতদাস ছাড়া কোন মানুষের পক্ষে খাটে না।' আর স্ত্রী যে স্বামীর

ক্রীতদাস নয় একথা বলাই বাহুল্য! বিবাহের অর্থ কোন দিক দিয়েই দাসত্ব নয়। স্বামী-স্ত্রীর সেখানে সমান অধিকার। কারও অধিকার সেখানে ক্ষুণ্ণ হবে না—স্বামী স্ত্রী কেউ কোন অন্যায় অতিক্রম করবে না। এ সম্বন্ধে তিনি বলছেন, 'স্ত্রী যদি সেই অন্যায় মেনে নেয় তবে সকল স্ত্রীলোকের প্রতিই তাতে করে অন্যায় করা হবে। এমনি করে প্রত্যেকের দ্বারাই সকলের দুঃখ জমে উঠেছে। অত্যাচারের পথ পাকা হয়েছে।'

বিপ্রদাস জানেন তাঁর এই সংকল্পের পথে বাধা প্রচুর। তিনি জানেন, 'ওরা উৎপাত করবে। সমাজের জোরে, আইনের জোরে, উৎপাত করবার ক্ষমতা ওদের আছে। সেইজন্যই সেটাকে অগ্রাহ্য করা চাই।......ঘরে বাইরে চারদিকে নিন্দের তুফান উঠবে, তার মাঝখানে মাথা তুলে ঠিক থাকা চাই।' কুমু ভয় করেছে এতে তার দাদার 'অশান্তি' হবে, 'অনিষ্ট' হবে। মানুষ শান্তি চায় এবং তা কাম্যও কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, মানুষ অন্যায়ের সংগে শান্তি করবে—সর্বোপরি এমন সম্মান কখনই কাম্য নয় যেখানে আত্মসম্মান বিসর্জিত। তাই ত বিপ্রদাস বলেছেন, 'অনিষ্ট অশান্তি কাকে বলিস কুমু? তুই যদি অসম্মানের মধ্যে ডুবে থাকিস তার চেয়ে অনিষ্ট আমার আর কী হতে পারে? যদি জানি যে, যে ঘরে তুই আছিস সে তোর ঘর হয়ে উঠল না, তোর ওপর যার একান্ত অধিকার সে তোর একান্ত পর, তবে আমার পক্ষে তার চেয়ে অশান্তি ভাবতে পারি নে।' অতএব সমস্ত কিছুকে অগ্রাহ্য করে কুমুকে নিজের কাছে রেখেছেন। এতে তাদের পুরানো কর্মচারী কালু ভীত হয়ে বলেছে, 'এ যে সর্বনেশে কথা।' বিপ্রদাস একজন সত্যকার আত্মসম্মানী লোকের মত উত্তর দিয়েছেন, 'সর্বনাশকে আমরা কোন কালে ভয় করিনে, ভয় করি আত্মসম্মানকে। একজন সত্যকার মানুষ কোনদিনই বিপদকে ভয় করেন না—ভয় করেন অবমাননাকে। বিপদ আসবে, সর্বনাশ হবে, আবার সব কেটে যাবে—অন্ধকার দূর হলেই আবার সূর্য উঠবে—কিন্তু আত্মমর্যাদা গেলে সেকি আর ফিরবে! বিপ্রদাসের সংযত ব্যবহার ও দৃঢ় মনোভাবের কথা ভাবতে গিয়ে একটা দৃশ্য বারবার মনে পড়েছে। মধুসূদন কুমুকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছে। কুমু তার সংগে যেতে অস্বীকার করেছে—এবং এই বাড়ীতেই থাকবার কথা স্পষ্ট করে বলেছে। এতে অহংকারী এবং উদ্ধত মধুসূদনের অহংকারে ঘা লেগেছে—আর সংগে সংগে ক্রোধে ফেটে পড়েছে। তখন কুমুকে কাপুরুষের মত অভদ্র ভাষায় গালাগালি শুরু করেছে। বিপ্রদাস পাশের ঘর থেকে সমস্ত শুনেছেন—আর এক সময় উঠে গিয়ে কুমুকে ডেকে নিয়ে নিজের পাশে বসিয়ে এক অসহায় নারীকে অপমান থেকে রক্ষা করেছেন। কোন কটু কথা নয়, কোন চেঁচামেচি নয়—কোন ঝগড়া নয়—শুধু ছোট ছোট কয়েকটি পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে কুমুকে ডেকে এনেছেন। অথচ মধুসূদনের কথা তখন সহজেই অনুমেয়—তার সারা দেহে তখন ভদ্রতার মিঠে আঘাতের অপমানের কঠিন জ্বালা সে হয়ত ঘরে বসে একলাই কিছুকাল রাগে ফুলেছে, তারপর একসময় উঠে গিয়েছে।

কিন্তু এরপর আমরা বিপ্রদাসকে দেখেছি অন্যরূপে। যে বিপ্রদাসকে সমাজের ভয়, নিন্দের ভয়, সর্বনাশের ভয়, কোন কিছুর ভয়ই তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে টলাতে পারে নি, সেই অনমনীয় বিপ্রদাসকে নরম করেছে কুমুর ভাবী বংশধর। বিপ্রদাস যেদিন কুমুর গর্ভের কথা সঠিক করে জেনেছেন, সেদিন বলেছেন, 'এখন তোর বন্ধন কাটাবে কে?' কুমুর জিজ্ঞাসা, 'তবে কি যেতে হবে দাদা?" বিপ্রদাসের সরল উত্তর, 'তোকে নিষেধ করতে পারি এমন অধিকার আর আমার নেই। তোর সন্তানকে নিজের ঘর-ছাড়া করব কোন স্পর্ধায়?' কর্তব্য সম্বন্ধে বিপ্রদাস অনেক সচেতন, অনের উদার। সমস্ত রকম ভয় আর বিপদ সম্বন্ধে যিনি একেবারে বেপরোয়া, সেই বিপ্রদাসকে বিচলিত করেছে কর্তব্যের কঠিন আদেশ। কুমুকে এবার বিপ্রদাস স্বেচ্ছায় মধুসূদনের বাড়ী পাঠিয়েছেন। এর পরের ঘটনা সম্বন্ধে লেখক একেবারে চুপ। তবে আমরা কল্পনা করতে পারি, এত ঘটনার পর কুমু ঘোষালবাড়ী সাদর অভ্যর্থনা পায় নি; শুধু তাই নয়, কুমুকে বিদায় দিয়ে বিপ্রদাস নিতান্ত একাকী নিঃস্ব অসহায় হয়ে গিয়েছেন। তবুও তিনি তাঁর কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হন্ নি। কর্তব্যের কাছে ভাবপ্রবণতা আর ব্যক্তিগত সুখ-

দুঃখ ইচ্ছা অনিচ্ছার ত কোন মূল্য নেই ; কর্তব্য বড় কঠিন, কঠোর।

এবার ধর্ম সম্বন্ধে বিপ্রদাসের ব্যক্তিগত সাধনার কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করব। ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর ধারণা সম্পূর্ণ নিজস্ব। তথাকথিত ধর্মের তিনি পূজারী নন। ফোঁটা-তিলক, নামাবলী-মন্দির আর বিগ্রহ তার কাছে ধর্ম নয়। দেবালয়ের রুদ্ধদ্বারে বসে ভগবানকে ডেকে ডেকে তিনি শক্তির অপচয় করেন না—ব্রাহ্মণভোজন করিয়ে পুণ্যসঞ্চয়ের ইচ্ছাও তাঁর কখনও হয় না। অন্ধ শ্রদ্ধা দিয়ে তিনি কখনও আপন মনুষ্যত্বকে অশ্রদ্ধা করেন না। তাঁর ধর্মের সংজ্ঞা সাধারণের সংগে মেলে না ; তাঁর ধর্ম 'মনুষ্যত্বের ও ন্যায় নিষ্ঠার, আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি একজন আদর্শ খাঁটি মানুষ। শান্ত সমাহিত অথচ দৃঢ় প্রকৃতির এই চরিত্রটি রবীন্দ্রমানসের এক সুন্দর প্রকাশ।

বিশুদ্ধ বাতাস

অধ্যাপক গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

মানবের অন্তর্নিহিত সৃজনীশক্তি যে কত বিস্ময়কর তাহার পরিচয় পাওয়া যায় তাহার নিত্য নূতন সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে। এই সৃজনী এষণাই মানুষকে উদ্বেলিত করিয়াছিল প্রকৃতি-দেবীর রহস্য উদ্‌ঘাটন করিবার অনুপ্রেরণা। কাল যাহা দার্শনিকের চক্ষে স্বপ্ন ও কল্পনা আজ তাহা সত্য ও বাস্তব। বিজ্ঞান ইতিহাসে মানবের বুদ্ধিপ্রখরতা ও কর্ম্মকুশলতার অবদান সত্যই অতুলনীয়। প্রস্তরযুগ হইতে অধুনা অণুপরমাণুর যুগের একটি রেখাচিত্র অঙ্কন করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, মানুষের কিরূপ দ্রুত বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধনা। অসাধ্য সাধনার মূলমন্ত্র একাগ্রতা ও অধ্যবসায়। এর সারতত্ত্ব প্রথম অনুধাবন করিতে সক্ষম হইয়াছিল বৈদেশিক দেশগুলি। যে সমস্ত মনীষীরা তাঁহাদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন বিজ্ঞান সাধনায় তাঁহারাই আমাদের নিকট চিরস্মরণীয় ও বরেণ্য। হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে মানুষ তাহার দৈনন্দিন প্রয়োজন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞান ছিল। সময়ের পরিবর্ত্তনে মানুষ তার চিন্তাধারাকে সাফল্য-সোপনের উচ্চ হইতে উচ্চতম শিখরে উপনীত করিবার শক্তি অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতে আরও কত অজানাতীত রহস্যভেদ করিবে সে শক্তি এখনও মানুষের বুদ্ধির অগোচর! সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মানুষ কত অজানার অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায় বিজ্ঞানের বিশ্বকোষে। যে মানুষ একদিন অরণ্যবাসী ছিল সে কি কোনদিন মনের অন্তরতরস্থানে ভেবেছিল, যে আজ সে প্রকৃতির কত জটিলতম রহস্যদ্বার উন্মুক্ত করিতে পারিবে। সত্যই প্রতিভা এমনই একটি পদার্থ সে যাহাকে স্পর্শ করে তাহাকেই স্বর্ণময় করিয়া তোলে।

প্রস্তর যুগের মানুষ গাছের বল্কল পরিধান করিয়া বৃক্ষ কোটরে বাস করিয়া শীত গ্রীষ্ম অতিবাহিত করিত। কিন্তু সময়ের পরিবর্ত্তনে মানুষ নিজকে অন্য প্রাণী থেকে পৃথক করিয়া ভাবিতে আরম্ভ করিল। প্রথমতঃ রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে নিজকে বাঁচিবার জন্য গৃহাদি নির্ম্মাণ করিল এবং সভ্যতার অগ্রগতির প্রতিপদক্ষেপে নিত্য নূতন আবিষ্কার করিয়া সকল প্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিতে থাকে। বিজ্ঞানের পুরানো ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকরা কত প্রকার শ্রম ও ত্যাগ দ্বারা মানুষের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন। ইহাদের অবদান মানব ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকিবে। বৈজ্ঞানিকদের সাফল্য সকল প্রকার কারিগরী বিদ্যার উপর অনেকখানি নির্ভর করে। বৈজ্ঞানিক ও ইন্‌জিনীয়ার-

দের সমন্বয় না হইলে কোন বৃহৎ কাজ সম্পাদন করা সম্ভব হয় না। যন্ত্র ও কারখানার প্রচুর উন্নয়নের পর হইতে বৈজ্ঞানিকরা অত্যাশ্চর্য্য ফল প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইতেছেন। যন্ত্রসকল যতই স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবে, বৈজ্ঞানিকরা গবেষণাগারে ততোধিক সূক্ষ্ম কাজ করিতে সমর্থ হইবেন। ইলেকট্রনিক কন্ট্রোলই (Electronic control) এখন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের একমাত্র বাহক। আজকাল বৈজ্ঞানিকরা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছেন যে এই সব স্বয়ং সম্পূর্ণ যন্ত্র, মেসিন ও বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যতীত গবেষণাগারে গবেষণা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায় এবং ফলাফল ভ্রান্তিজনক হয়। পৃথিবীতে যত কিছু আবিষ্কার হইয়েছে তাহার মূলসূত্র মানবের নিত্য নূতন প্রকার প্রয়োজনীয়তা। ইংরাজীতে একটী কথা আছে "Necssity is the mother of invention" বৈজ্ঞানিকরা যতই মানুষের সুখ সুবিধার সুরম্য পথ আবিষ্কার করিতেছেন ততই বৈজ্ঞানিকরা নূতন গবেষণার জন্য প্রণোদিত হইতেছেন। ইঁহাদের কার্য্যকলাপ ও আবিষ্কারের কাহিনী পড়িলে মানুষের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। যে সকল দেশ বিজ্ঞানশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিতে পারে নাই, সে সব দেশের এই পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহাদের সাথে সমতা রক্ষা করিবার চেষ্টাই একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত।

আজ হইতে প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে গ্রীস, রোম, প্রভৃতি দেশগুলিতে প্রথম সভ্যতার উন্মেষ হইয়াছিল। বিজ্ঞান, দর্শন, কলা, ললিতকলা প্রভৃতি সকল শাস্ত্রের আলোচনার স্থল ছিল। স্থাপত্য, কারিগরী বিদ্যার প্রধান ও বিশেষ কেন্দ্র ছিল। রোমে স্থাপত্যবিদ্যার নৈপুণ্য আজও অপকটভাবে পরিচয় দেয়। পাশ্চাত্য প্রদেশগুলি সাধারণতঃ শীতপ্রধান। শীতের প্রকোপে মানুষ বিশেষ কোন প্রয়োজন ব্যতিরেকে বাহিরে ও গৃহমধ্যে কাজ করিতে পরাঙ্মুখ হইত। বৈজ্ঞানিকরা গবেষণাগারে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন যে কিরূপ পন্থা অবলম্বন করিলে মানুষ গৃহমধ্যে এই শীতপ্রধান দেশগুলিতে অবলীলাক্রমে কাজ করিতে সক্ষম হইবে। তাঁহারা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে একটি কেন্দ্রীয় গৃহে অগ্নিসংযোগ করিয়া এবং বিভিন্ন প্রকার নলের সাহায্যে গৃহাদির চারিধারে, দেওয়ালের গাত্রে, ছাদে, মেঝেতে, গরম বাতাস দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ঈজিপ্তের বৈজ্ঞানিকরা গরম আবহাওয়াকে ঠাণ্ডা করিবার পন্থা আবিষ্কার করেন।

একটী গবেষণাগারে পরীক্ষামূলক ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে মানুষ সুখ সুবিধা পাইলে কাজ বেশী করিবার ক্ষমতা পায়। এই নীতি প্রমাণ করিবার জন্য বিভিন্ন কারখানা, আফিস প্রভৃতিতে লোকসংখ্যা গণনা করা হয় এবং তাঁহাদের কাজের একটী হিসাব লওয়া হয়। প্রমাণ স্বরূপ দেখা গিয়াছে যে যখন এই আফিস, কারখানাগুলিতে সকল প্রকার কাজ করিবার সুখ ও সুবিধা দেওয়া হইয়াছে তখন দেখা গিয়াছে যে কাজ তাঁহারা বেশী করিতে পারিয়াছেন এবং লোকসংখ্যা উপস্থিতি সর্ব্বাধিক। গ্রীষ্মকালে আবহাওয়া খুব গরম ও আর্দ্রতা খুব বেশী থাকায়, শরীরে খুবই অস্বস্তি বোধ হয়, এই কারণে লোকের কাজ করিবার স্পৃহা জাগে না। শীতকালে, শীতের প্রকোপে মানুষ কাজ করিবার উৎসাহ পায় না, কিন্তু দেখা যায় যে, যদি কারখানা, আফিস প্রভৃতি স্থানগুলিতে এমন একটী পন্থা অবলম্বন করা যায় যাহার দ্বারা ঘরের মধ্যের হাওয়াকে নিয়ন্ত্রিত করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে ঘরের মধ্যের লোকগুলির কাজ করিবার শক্তির স্ফুরণ আপনা হইতে হয়। এইরূপ নিয়ন্ত্রিত হাওয়াকে সাধারণতঃ বলা হয় এয়ার কনডিশনিং (Air-Conditioning).

বাতাসের তাপ, আর্দ্রতা, গতি, প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ এবং ধোঁয়া, গন্ধ প্রভৃতি প্রতিরোধ করিলে মানবের কাজ করিবার শক্তি বৃদ্ধি পায়। এটাই মানবের সুখের মাপকাঠি। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে যদি ঘরের মধ্যের বাতাসকে পুরোপুরিভাবে বিশুদ্ধ না করা হয় তাহা হইলে মানবের স্বাস্থ্যের হানি হইবার সম্ভবনা থাকে তার কারণ প্রত্যেক জীব নিজ দেহের ভিতর হইতে একরূপ একটী গ্যাস নির্গত করে—যাহার নাম কার্ব্বনডাইঅক্সাইড (Carbondioxide—Co_2)—সেটী মানবের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক। বাহিরের বাতাসকে একটী পাখার (Blower) দ্বারা একটি কামরার (Air washer) মধ্যে লইয়া যাওয়া হয় এবং সেখানে ঠাণ্ডা জল দ্বারা বাতাসকে নানা প্রকার ধোঁয়া, ধুলা, প্রভৃতি হইতে পরিষ্কার করিয়া

ও পরে পুনরায় ফিল্‌টারের (Filter) মধ্যে দিয়া ঘরের মধ্যে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। বাতাসকে এইরূপ প্রণালীতে ঠাণ্ডা ও পরিষ্কার করিলে বাতাস বৈজ্ঞানিকভাবে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হইল। অবশ্য প্রত্যেক লোক অনুসারে বাতাসের তাপ, আর্দ্রতা প্রভৃতি বিভিন্ন কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ইহার কোন বৈজ্ঞানিক-সূচীপত্র পাওয়া যাই নাই। পরীক্ষার দ্বারা মোটামুটিভাবে ইহা ধরিয়া লওয়া হয়।

একটী পাটের কারখানায় প্রথম ইহার পরীক্ষা করা হয় এবং তার ফলাফল দেখা হয়। বাতাসের মধ্যে আর্দ্রতা কম থাকিলে পাটের অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়। পাট ক্ষণভঙ্গুরে পরিণত হয়। গ্রীষ্মকালে দেখা যায় পাটের ওজন কমিয়া যায়, সুতরাং ইহার প্রতিরোধ করিবার জন্য নিয়ন্ত্রিতবাতাসের আর্দ্রতা বৃদ্ধি করান হয়। নিয়ন্ত্রিত বাতাসে আর্দ্রতা হইল প্রধান সহায়ক। বাতাসকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য বহু বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই, কিন্তু ১৯০১ সালে আমেরিকায় মিঃ উইলিস, এইচ কোরিয়ার (Mr willis H. Carrier) এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক ও ইনজিনিয়ারদের সাহায্যে এমন একটী যন্ত্র উদ্ভাবন করেন যাহার দ্বারা তিনি বাতাসকে ঠাণ্ডা করিবার পন্থা আবিষ্কার করেন। আজ পর্য্যন্ত বাতাসকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য যে সমস্ত যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, প্রায় সবই তাঁহারই কার্য্য পদ্ধতির অনুকরণে।

কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত লোকদের ধারণা ছিল যে এয়ার কনডিশনিং একটী বিলাসিতার সামগ্রী, কিন্তু সভ্যতার ক্রমোন্নতির সাথে সাথে বৈজ্ঞানিকেরা ইহাই প্রমাণিত করিয়াছেন যে ইহা একটী অত্যাবশ্যক সামগ্রী। স্বাধীন দেশে বিশেষতঃ পাশ্চাত্য দেশগুলিতে এয়ার কনডিশনিং গৃহ নাই এরূপ সচরাচর দৃষ্টি গোচর হয় না। হাঁসপাতাল, অপারেশন থিয়েটার, সিনেমা, নাচঘর রেস্তোরা, আফিস, কারখানা প্রভৃতি সর্ব্বত্রই এয়ারকণ্ডিশনিং। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে মানবের হিতার্থে ইহা দৈনন্দিন প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিকেরা বিভিন্ন প্রণালীতে এয়ার কন্‌ডিশনিং করিবার গবেষণা করিতেছেন যেমন রেডিএ্যান্ট হিটিং ও কুলিং (Radiant, heatnig and Cooling) কিন্তু ইহার দ্বারা বিশেষ সুবিধা পাওয়া যাইতেছে না তাহার কারণ বাতাসের মধ্যে আর্দ্রতা প্রতিরোধক।

আজ স্বাধীন ভারতবর্ষে এয়ার কণ্ডিশনিং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উন্নয়নের জন্য ভারত সরকার বহু অর্থব্যয় করিতেছেন, ইহার দ্রুত প্রসার লাভ করিলে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাগুলির উন্নতি হইবে।

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

ব'সে ছিলাম, হাতে পেলাম
একটি চিঠি
শুভ খবর : সুরমা নাকি
পেয়েছে বি-টি!
অনেকদিন সে দূরে গেছে
চাকরি নিয়ে
একা-একাই দিন গড়াই
কাফে কাটিয়ে!
মনে পড়ছে জ্যোছনা রাত,
আঁখি নিবিড়,
নিখুঁত মুখ, ক'রে ফিরছে
স্মৃতিরা ভিড়!

কি-হপ্তায় জানি ঠিকই
পিওন আসে,
তবুও মন উড়তে চায়
দূর প্রবাসে!
বিকেলবেলা—বিরস মন
ঘরে ছিলাম,
কড়া নাড়ার শব্দ হ'ল—
দুড় দড়াম।
দোর খুলতে পেয়ে গেলাম
চিঠি হাতেই :
দু'দিন জ্বরে বেহুঁশ ভুগে
সুরমা নেই!

দক্ষিণ অ্যাং
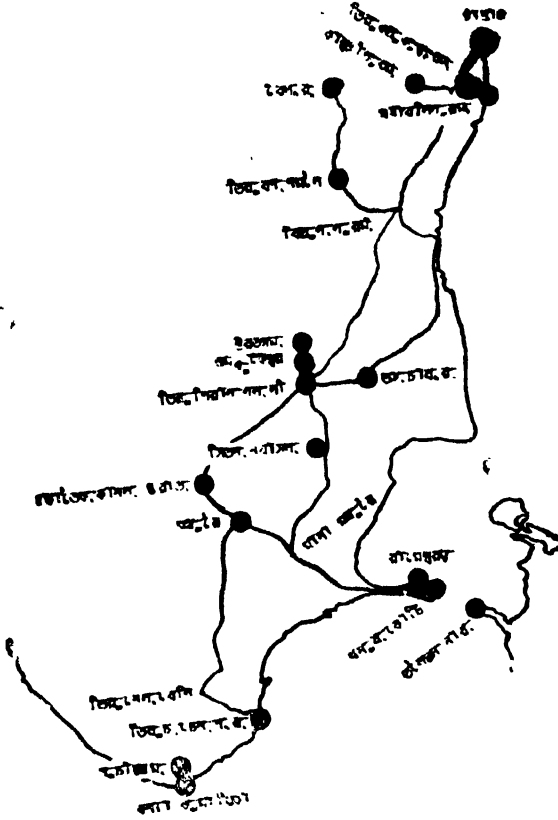
শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

॥ ১২ ॥

তিরুশিরাপ্পল্লীর রক্ ফোর্ট্ হতে তিন মাইল রে, কাবেরী ও তার শাখা নদী * কোল্লিটম্-এর ব-দ্বীপে শ্রীরঙ্গম্। তিরুশিরাপল্লী থেকে সিটি-বাস্-এই যাওয়া যায়।

শ্রীরঙ্গনাথ স্বামীর অধিষ্ঠান ক্ষেত্র হিসাবে স্থানটির নাম হয়েছে শ্রীরঙ্গম্। দক্ষিণাপথের বৈষ্ণবদের তীর্থশিরোমণি এই শ্রীরঙ্গনাথ ক্ষেত্র।

বেলা তিনটেয় শ্রীরঙ্গম্ বাস স্ট্যাণ্ড-এ নামলাম।

স্ট্যাণ্ড-এর কাছেই দেবস্থান।

আগে দেবালয়টির কথা শোনা ছিলো। রামানুজের নাম এই দেবস্থানের সঙ্গে জড়িত থাকায় উত্তর ভারতেও মন্দিরটির নাম অন্ততঃ রামানুজী বৈষ্ণব মহলে সুবিদিত।

মন্দিরটি বেশ বড় এইটুকুই শুধু শুনেছিলাম। চাক্ষুষ হওয়ার পর তার বিশালতা বিষয়ে সঠিক ধারণা হলো। একে শুধু মন্দির না বলে মন্দির শব্দটির সঙ্গে দুর্গ কথাটি যোগ করলে বোধহয় ভালো হতো।

কর্ণাট যুদ্ধের সময় চাঁদ সাহেব ও তাঁর পক্ষাবলম্বী ফরাসীরা এই মন্দিরে তাঁদের ঘাঁটি করেছিলেন।

মন্দিরটি সাতটি প্রাকার বেষ্টিত। প্রতি প্রাকারে অন্যূন চারটি গোপুরম্।

রঙ্গনাথ মন্দিরের গর্ভগৃহের প্রবেশ পথ—শ্রীরঙ্গম্

প্রাকার সমেত মন্দিরটির আয়তন দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে, উভয় দিকেই, আধ মাইলের মত। প্রথম প্রাকারটি দৈর্ঘ্যে ৩০০০ ফিট-এর চেয়ে কিছু বেশী এবং প্রস্থে ২৪০০ ফিট।

* ইংরেজী মাধ্যমে নদটি কোলেরুন্ নামে পরিচিত।

চতুর্থ প্রাকার পর্যন্ত ঘর বাড়ী ও দোকান বাজার। তার পরে প্রকৃত মন্দিরের সীমানা আরম্ভ। চতুর্থ প্রাকার পার হলেই সহস্র-স্তম্ভ মণ্ডপ। সহস্র-স্তম্ভ মণ্ডপে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে, বৈকুণ্ঠ একাদশীর দিনে, এক মহোৎসব হয়। ওই উৎসবে সারা ভারত হতে লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থীর সমাবেশ ঘটে শ্রীরঙ্গম্-এ।

মন্দিরের বিমানটি স্বর্ণ মণ্ডিত।

গর্ভগৃহে অনন্ত-নাগ শয্যায় শয়ান শ্রীরঙ্গনাথ (বিষ্ণু) বিরাজমান। সঙ্গে আছেন তাঁর শক্তিস্বরূপা রঙ্গ-নায়কী।

মন্দির সংলগ্ন তেপ্পকুলম্টির নাম—চন্দ্রপুষ্করিণী।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে শ্রীরঙ্গম্ ধামের বিষয় বর্ণিত হয়েছে :

রঙ্গনাথ মন্দিরে একটি মণ্ডপের অঙ্গ-সজ্জা—শ্রীরঙ্গম্

সৃষ্টির আদিকালে ব্রহ্মা তপস্যা দ্বারা ক্ষীরোদ সাগরে গুপ্ত বিষ্ণুকে তুষ্ট করেন এবং নারায়ণকে কূর্মরূপ ত্যাগ করে সত্য স্বরূপে দেখা দিতে প্রার্থনা জানান।

নারায়ণ ব্রহ্মাকে অষ্টাক্ষর মন্ত্র জপ করতে বলেন। ব্রহ্মা সহস্র বর্ষ অষ্টাক্ষর মন্ত্র জপ করার পর ক্ষীরোদ-সাগরে শ্রীরঙ্গধাম উত্থিত হয়। ওই ধামে ব্রহ্মা অনন্ত-নাগ শয্যায় শয়ান বিষ্ণুর দর্শন লাভ করেন।

বহুকাল পরে, সত্যযুগে, অযোধ্যারাজ ইক্ষ্বাকু কুলগুরু বশিষ্ঠের পরামর্শে শ্রীরঙ্গ বিষ্ণুর তপস্যা করতে থাকেন। ইক্ষ্বাকুর তপস্যায় শঙ্কিত হয়ে ব্রহ্মা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণু তাঁকে অভয় দিয়ে বলেন,—আমি অযোধ্যায় ইক্ষ্বাকু বংশে অবতীর্ণ হবো। সেখানে দশযুগ মনুষ্যরূপে থাকার পর চোল রাজের অধীন কাবেরী সন্নিহিত চন্দ্রপুষ্করিণীর তটে, সপ্ত মন্বন্তর কাল শয়ান থাকবো। তারপর, তোমার দিবসক্ষয়ে তোমার কাছে আসবো।

বিষ্ণুরই নির্দেশানুযায়ী ব্রহ্মা অযোধ্যায় গিয়ে মহারাজ ইক্ষ্বাকুকে শ্রীরঙ্গনাথ বিগ্রহ দিয়ে আসেন। বিগ্রহটি অযোধ্যার আধ ক্রোশ দূরে প্রতিষ্ঠিত হন।

ত্রেতা যুগে রাজা দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞে চোল রাজ ধর্মবর্মা অযোধ্যায় নিমন্ত্রিত হন এবং শ্রীরঙ্গনাথ দর্শন করেন।

ধর্মবর্মা বিগ্রহটি লাভের আকাঙ্ক্ষায় চন্দ্রপুষ্করিণী তটে ঘোর তপস্যায় রত হন।

তাঁর রাজ্যবাসী কয়েকজন মুনি তাঁকে বলেন যে, তপস্যার প্রয়োজন নেই। ভগবান বিষ্ণু শীঘ্রই শ্রীরাম রূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হবেন এবং বিভীষণের দ্বারা এই চন্দ্রপুষ্করিণীতটে শ্রীরঙ্গনাথ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করবেন।

অনতিকাল মধ্যেই শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব ঘটে।

রাবণ নিধনের পর, তিনি যখন অযোধ্যায় ফিরে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন তখন, সেই যজ্ঞে বিভীষণ আমন্ত্রিত হয়েছিলেন।

যজ্ঞান্তে রামচন্দ্র বিভীষণকে শ্রীরঙ্গনাথ বিগ্রহটি দেন।

বিভীষণ শ্রীরঙ্গনাথকে মাথায় নিয়ে লঙ্কা অভিমুখে যাত্রা করেন। পথে বিশ্রামের জন্য কাবেরী নদীর তটে বিগ্রহটি মাটিতে নামান।

রাজা ধর্মবর্মা সংবাদ পেয়ে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন এবং শ্রীরঙ্গনাথের অর্চনা ও স্তব করতে থাকেন। ধর্মবর্মার অনুরোধে বিভীষণ ঐ স্থানে এক পক্ষকাল অতিবাহিত করেন।

যাত্রাকালে শ্রীরঙ্গ বিগ্রহকে মাথায় তুলতে গিয়ে বিভীষণ দেখলেন যে, দেবতা অনড় অচল হয়েছেন!

আকুল হয়ে পড়লেন বিভীষণ। শ্রীরঙ্গনাথ বিভীষণকে আদেশ করলেন লঙ্কায় ফিরে যেতে। কারণ, ব্রহ্মাকে দেওয়া পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তখন হতে সপ্ত মন্বন্তর কাল তাঁকে বিরাজ করতে হবে কাবেরী নদীতটে।

ফিরে গেলেন বিভীষণ।

শ্রীরঙ্গনাথ অধিষ্ঠিত হলেন দ্বিধা-বিভক্ত কাবেরীর মধ্যবর্তী স্থলখণ্ডে।

দুই নদীর মধ্যবর্তী ব-দ্বীপ শ্রীরঙ্গম্‌কে সুরক্ষিত করার জন্য খৃষ্টীয় একাদশ শতকে চোল্‌ রাজগণ এক চমৎকার ব্যবস্থা করে গেলেন।

শ্রীরঙ্গম্‌ হতে ৬০ ফিট্‌ চওড়া ও ১০৮০ ফিট্‌ লম্বা যে, বাঁধটি দিয়ে কাবেরীর জলধারার একাংশ তঞ্চাবুর্‌-এর দিকে প্রবাহিত হচ্ছে তা চোল্‌ রাজগণেরই সৃষ্টি। ঐ বাঁধ দেওয়ার ফলে কাবেরীর দুই ধারা অর্থাৎ মূল কাবেরী ও তার শাখা নদী কোল্‌রুলিরুটম্‌-এর জলোচ্ছ্বাস কিংবা ভাঙ্গন দ্বারা মিলন এবং তার দ্বারা শ্রীরঙ্গম্‌-এর ক্ষতির সম্ভাবনা চিরতরে দূরীভূত হয়েছে।

রঙ্গনাথ দর্শন করে ফেরবার পথে প্রচণ্ড ঝড় উঠলো। তার সঙ্গে বর্ষণ।

পথের জন সমুদ্র মুহূর্তের মধ্যে উধাও হলো,—উঠে এলো বাড়ীর বারান্দায়, দোকানের ছাউনির নীচে।

ঢুকে পড়লাম একটা কফির দোকানে।

বেশ কিছুক্ষণ বর্ষণ চললো।

কফিতে চুমুক দিতে দিতে পথের দিকে চেয়ে মনে পড়ে গেলো কলকাতার এমনি বর্ষণ মুখর বিকেলের কথা। ভাগ্যবানদের গাড়ী বারান্দার নীচে মানুষ ও গরুর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকার দৃশ্য।

মনের পর্দায় ভেসে উঠলো হাঁটু-ডোবা জলে হাঁটার স্মৃতি; ট্রাম্‌, বাস্‌ বন্ধ হওয়া এবং মানুষের দৈনন্দিন রুটিন্‌-এর ওলট পালট হয়ে যাওয়ার ছবি।

আর যেন শুনতে পেলাম, বর্ষণ-রুষ্টা পথচারিণীর কণ্ঠের 'ভাল্‌ লাগেনা, ভাল্‌ লাগেনা' ধ্বনি।

আমার কিন্তু ভাল লাগে।

ভাল লাগে, প্রাণ-হানি ও দৈহিক ক্ষতি সাধন ছাড়া অন্যভাবে প্রকৃতি মানুষকে জব্দ করছে দেখলে।

মা মারলে ভাল লাগেনা কি?

তিরুশিরাপ্‌পল্লী থেকে দু'মাইল দূরে তিরু বনৈ। শ্রীরঙ্গম্‌-এর পথে অধিকাংশ বাসই তিরু বনৈ হয়ে যায়। তিরু বনৈ অর্থে শ্রীবন। তিরু শব্দটি 'শ্রী' শব্দের অনুরূপ। এর অপর প্রয়োগ, বিশিষ্ট অর্থে। তমিল্‌ বনম্‌ শব্দের অন্য অর্থ জল। সুতরাং তিরু বনৈ-এর অপর অর্থ করা যেতে পারে বিশিষ্ট জল।

তিরু বনৈ-এর মুখ্য দ্রষ্টব্য অপ্‌ লিঙ্গের স্থান।

লিঙ্গ মূর্তিটি সদা সর্বদা ভুগর্ভ হতে উৎসারিত জলে অধিষ্ঠিত। তাই তিরু বনৈ-এর দ্বিতীয় অর্থটির তাৎপর্য সুস্পষ্ট। দেবতার সুপ্রচলিত নাম—জম্বুকেশ্বর।

জম্বুকেশ্বর মন্দির—তিরুবনৈ

জম্বু বৃক্ষ অর্থাৎ জামগাছের নীচে মন্দিরের ভিতর অবস্থান করছেন লিঙ্গ মূর্তি। সেইজন্যই নাম হয়েছে—জম্বুকেশ্বর।

জম্বুকেশ্বরের শক্তি মূর্তিটির নাম—অখিলাণ্ডেশ্বরী। দেবালয়টি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন চোল্‌ রাজ শুভদেব এবং রাণী কমলাবতী।

ভূ-গর্ভ হতে স্বয়ং উৎসারিত জলকে বা জলময় দেবতাকে এখানে অপ্‌ লিঙ্গ আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

অপ্‌ কে অর্থাৎ জলকে ঈশ্বর রূপে উপাসনা দ্বারা জলকে পূজা বোঝায় না।

আমরা যে দৃশ্যমান জল ব্যবহার করি তা একাধিক ভূত (elements)-এর স্থূল সমষ্টি এবং পরমাণু দ্বারা গঠিত। দর্শনোক্ত অপ্‌ দৃষ্টির অতীত,—মহাভূত রূপে আখ্যাত। অপ্‌ মহাভূতের অর্থ পদার্থের রসাত্মক গুণটি।

ওই গুণ পরমাণু দ্বারা গঠিত নয় অথবা পরমাণু সমন্বয়ে উৎপন্নও নয়। পক্ষান্তরে ঐ রসাত্মক গুণ সম্পন্ন হয়েই পরমাণু স্থূল ভৌতিক জলের উৎপাদনকারী হয়েছে। সূক্ষ্ম ওই রসাত্মক গুণ, অর্থাৎ অপ্,—স্বয়ম্ভু এবং দৃশ্যমান জগতের প্রতি পদার্থেই বর্তমান। তাই অপ্ বা জলকে বলা হয়েছে সর্বব্যাপ্ত,—ঈশ্বর স্বরূপ।

[অপ্ = আপ্ (ব্যাপ্ত্যর্থে) + কিপ্,—অর্থাৎ যিনি সর্বব্যাপী।] অপ্ লিঙ্গের পূজা সেই সর্বব্যাপীরই পূজা। দৃশ্যমান স্থূল জলের পূজা নয়।

জম্বুকেশ্বর বা তিরুবইনৈ শৈবতীর্থ,—শ্রীরঙ্গম্ বৈষ্ণব-তীর্থ। দুটি খুবই কাছাকাছি।

পূর্বে, বছরে একদিন শ্রীরঙ্গম্ হতে শ্রীরঙ্গনাথকে জম্বুকেশ্বরের মন্দিরে আনা হতো। বিষ্ণু বেড়াতে আসতেন শিবালয়ে।

দুজনের অনুগামীদের, অর্থাৎ শৈব ও বৈষ্ণবদের, কলহের ফলে, বিষ্ণু এখন আর শিবের বাড়ী আসেন না!

[ক্রমশঃ

ঠগ্

অনুরাধা মুখোপাধ্যায়

উলঙ্গ ঐ সাতবছরের ছেলে
আমায় ডেকে বলে,
বুকভরা তার দীর্ঘ দুখের কথা
বাজল বুকে ব্যথা—
দেওয়ার মত দু'চার পয়সা সে কি
রইল কিনা দেখি।
অন্যমনে পয়সা দিলাম তারে,
ভাসছে বারে বারে—
তারই মুখের করুণ ছবিখানি
বলল সবে—'জানি,
মিথ্যা ওসব, ফন্দীবাজি যত—
বোকা তোমার মত
আছেও এমন! সন্দেহ হয় না কী,
এসব ভুয়ো ফাঁকী?
ঠকলে শুধু, পয়সা গেল জলে
এমন হলে চলে?
জগৎটাকে চিনতে তোমার বাকী,
এইটা বলে রাখি।'
দীর্ঘ তাদের তিরস্কারের ভাষা
জাগাল জিজ্ঞাসা—
সত্যই কী ঠকে গেলাম আমি?
পেলাম না কী দামী—
ঠকা আছে সদাই লাভের সনে
এই কথাটা মনে।
ঠকার ভয়ে চক্ষু যদি ঢাকি
সত্য পড়ে ফাঁকী,
চিনেও তারে অন্ধ হওয়ার ভানে
চিনব না তো প্রাণে।
সত্য যারে হৃদয় মেলে দেখি
যদিই তাতে ঠকি,
পূর্ণচোখে তবুও জগৎটারে
সত্য বলেই দেখব বারে বারে।

প্লট

শ্রীমদন চক্রবর্তী

এ কথা কাউকে বলা যায় না। কারণ কথাটা তার একান্তই নিজস্ব কথা। তাই মনে মনে গুমরে গুমরে চিন্তা করা ছাড়া মানসী করেই বা কি ?

মাত্র একটু, সামান্য একটু সুস্থ পরিবেশ পেলেই আজ সে এই মানসিক দ্বন্দ্বের হাত থেকে অব্যাহতি পেত অবশ্যই।

স্বামীর ওপরও তার একটু অভিমান জমা হয়ে ওঠে এই অবসরে। তবে সে অভিমান চরম কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তনের আশা নিয়ে জেগে ওঠা অভিমান নয়। নিতান্তই নিজের মন্দকপালের ক্ষোভের সঙ্গে স্বামীর নিদারুণ নিষ্ক্রিয়তা মনের ওপর একটু অভিমানের রেখা বুলিয়ে দিয়ে যায়।

দোষ নেই অরিন্দমের। নিজের আর্থিক অক্ষমতার মধ্যেও যতদূর সম্ভব ক্ষমতা প্রসারিত করে মানসীর জন্যে চতুর্দিক খোলা, জানলা দিয়ে আকাশ-ধরা ঘরখানাকে সে ভাড়া নিয়েছে। বন্দী ঘর থেকে অন্ততঃ মনটাকে মানসী ছুড়ে দিতে পারবে বিভিন্ন অবস্থার আকাশের গায়ে সেই উদ্দেশ্যে। কিন্তু আকাশে চোখ বুলালে কিংবা আকাশের পায়ে মাথা খুঁড়লেও আজকাল প্লট পাওয়া যায় না। প্লট পাওয়া যায় আকাশের নীচের চলমান জগৎ থেকে। আর সে জগৎ কোলকাতার ডাকঘরের শীল-মোহরের কৃপায় স্বর্গাভিষিক্ত সহরে নেই। আছে খাস সহরের বনেদীয়ানায়। সে সহরটা যেন মানসীর পরিবেশের অনেক দূরে পড়ে আছে, তার জানাচেনার বাইরে।

একজন নাম করা লেখক মানসীকে বলেছিলেন, লেখার খোরাক পড়ে থাকে রান্নাঘরের আশে পাশে। তাকে তুলে নিয়ে ঠিকমত কাজে লাগাতে পারলে ভাল সাহিত্য গড়ে উঠতে পারে।

মানসী মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠল তাঁর ওপর। তাই যদি হবে, তাহলে লেখা নিয়ে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে গেলে, কোন নতুন বিষয়ের ওপর না লিখলে লেখা চলবে না, একথা শুনতে হয় কেন ?

কিছুদিন আগে এক বান্ধবী এসে উপদেশ দিয়ে গেল, লিখে যদি নাম করতে চাস্ তাহলে এখনও একটা সহজ পথ খোলা আছে। কোলকাতা সহরের অন্ততঃ নাম করা রাস্তাগুলোর ইতিহাস যদি সংগ্রহ করে কোন রকমে গল্পের ছলে একটা বই খাড়া করে দিতে পারিস্, তাহলে আর দেখতে হবে না।

উপদেশটা মানসীর মনে ধরার মত। কিন্তু তার পক্ষে এ কাজ সম্ভব নয়। যদিও কোন রকমে সম্ভব করে তোলার চেষ্টা করতে সে পারত, কিন্তু স্বামী নামের অভি-ভাবকটির জন্যে আদৌ তা সম্ভব নয়।

আর একদিন কাগজের ঠোঙ্গায় হাতের লেখা একটা চিঠিতে মানসী দেখেছিল কে যেন কাকে লিখেছে, আজ-কাল ওসব লেখা কেউ ছাপাবে না। সাহিত্যের পথ অন্য-দিকে মুখ ঘুরিয়েছে। এখন চিন্তা চলেছে স্পুটনিকে করে অন্য গ্রহে গিয়ে আকাশে নায়ক-নায়িকাকে নিয়ে গল্প তৈরী করার।

কথাটাকে অবান্তর বলে উড়িয়ে দিল মানসী। এই তো ভারী আকাশ! তার ওপর আবার নায়ক-নায়িকাকে নিয়ে গল্প তৈরী ? সে যুগ পার হয়ে গেছে অনেক হাজার বছর আগে।

তাহলে মানসী করে কি ? যে পল্লীতে তার বাস, সেই কৌটোর মত জায়গাটায় ঢুকতে গেলে প্রথমে যে তিনটে রাস্তার মোড়কে মাড়িয়ে আসতে হয়, সেখানে দাঁড়ালেই বোঝা যায় যে এ অঞ্চলটাকে আসল কোলকাতা তার ছোটভাই বলতেও লজ্জা পায়। কোন পরিবেশেরই বালাই নেই এখানে। বাসিন্দারাও পুরোন আমলের দাপটে পেটে বোমা হজম করে শিক্ষা সংস্কার সব উদ্গার করে ফেলেছে অনেক দিন আগে। তাই রাস্তার নামে

রাজা-রাণীর প্রাধান্য থাকলেও রকের ওপর এ্যাটমের যুদ্ধই চলে অবিরত।

অরিন্দমের শিল্পজ্ঞানের চারদিক খোলা বন্ধ মনের ঘরটার ভেতরে জানলার রেলিংকে অবলম্বন করে মানসীর দৃষ্টি আকাশের ওপর বার কয়েক আঁচড় কেটে ক্লান্ত মনটাকে আরো ব্যাধিগ্রস্ত করে তুলল। আজ যদি সে চৌরঙ্গী পাড়ার কোন ঘর থেকে বা রাসবিহারী এ্যভিন্যু-এর দোতলা থেকে কিংবা লেকভিউ রোডের কোন বাড়ীর লন থেকে পথের ওপর একবার দৃষ্টি ফেলতে পারত তাহলে সঙ্গে সঙ্গে লেখার মত দু'চারটে প্লট তার চোখের সামনে ভেসে উঠত। তারপর হাতের কায়দায় আর কলমের নিবের খোঁচায় তাকে এমন নতুন করে তুলত মানসী, যে পাঠক মহলে ধন্য ধন্য পড়ে যেত। কিন্তু এমনই পোড়া বরাত যে এ জীবনে তা সম্ভব হয়ে উঠবে কিনা সন্দেহ।

একবার স্বপ্নের মধ্যে সোনালী নামে একটা মেয়ে এসে ধরা দিয়েছিল মানসীর কাছে। সে বলেছিল গত পঞ্চাশের মন্বন্তরে আমার জন্ম। ক্ষুধার তাড়নায় আমার বাবা-মা আমাকে পথে ফেলে রেখে চোখ বুঁজেছিল চিরদিনের জন্যে। চৌরঙ্গীর এক দেশী মেম সাহেব আমাকে তুলে নিয়ে গিয়ে মানুষ করেছে। আমার চুলের রঙ সোনালী ধরণের ছিল বলে তারা আমার নাম রাখে সোনালী। দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা নিয়ে আমার জন্ম, তাই দুনিয়ার ক্ষুধার প্রতীক হয়ে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি পথে-ঘাটে, সিনেমায়-রেঁস্তোরায়। আমাকে নিয়ে একটা গল্প লেখো।

মানসীর মনটা আরো বেশী করে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। এরা কেউই বোঝে না আজকের দিনের গল্পের প্লট বলতে কি বোঝায়? দুর্ভিক্ষের মত পুরোণ দিনের ঘটনা নিয়ে কোন কাহিনী তৈরী করলে, দু'পাতা পড়েই পাঠক সমাজ নাক সিট্‌কে বলে উঠবে, অলিগলির পচা আবর্জনা নিয়ে ঘাঁটা-ঘাঁটি করার মত সময় আমাদের হাতে নেই।

চার দেওয়ালে ঘেরা দগ্ধ জীবনের প্লট বিহীন বিদগ্ধ-মনটা তাড়া খাওয়া ইঁদুরের যে কোন একটা ফাটলের অভ্যন্তর অবলম্বনের মত দ্রুতবেগে এদিক ওদিক ছুটে বেড়াতে লাগল ভাল প্লটের মধ্যে ঢুকে নিজের মনের অস্তিত্বকে বাঁচাতে।

এ অবস্থাটা কাউকে বোঝান যায় না। বলাও যায় না। এটা মানসীর একান্তই নিজস্ব মর্মকথা না মর্ম-বেদনা।

স্বামী অরিন্দমের আগমন ঘটল সন্ধ্যের একটু পরে। সে এসেই মানসীর মানসিক অবস্থা বিপর্যয়ের আভাস পেয়ে বলে উঠল, আজ সারাটা দিন লেখালিখি করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছ বুঝি?

স্বামীর কথাটা আজ হঠাৎ যেন আন্তরিকতার সুরে নতুন হয়ে বেজে উঠল মানসীর মনে। অনেকদিন লেখা লিখির কোন কথা স্বামীর কাছ থেকে না শুনে মানসীর মনটা যেন মরুভূমির মত শুকিয়ে ছিল। আজ শুষ্ক মরুভূমিতে জলের রেখার মত আর্দ্র স্নিগ্ধ একটা স্পর্শ মানসীর মনে নতুন প্রেরণা এনে দিল। সে চেষ্টা করল তার মনের ব্যাকুলতাকে স্বামীর কাছে তুলে ধরার।

তাই সে বলল, আজ অনেকদিন হল কোন লেখায় হাত দিতে পারিনি। নতুন ধরণের লেখায় নাম করার নেশা নিয়ে আমি ছট্‌ফট্‌ করছি। সাবজেক্টও ঠিক করে ফেলেছি, কিন্তু মাল মশলা জোগাড় করার ব্যাপারে তুমি একটু সাহায্য না করলে তো চলে না!

অরিন্দম জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল মানসীর মুখের দিকে।

মানসী আবার বলে, কোলকাতার নাম করা রাস্তা-গুলোর ইতিহাস তোমাকেই জোগাড় করে দিতে হবে। আমি হয়ত ঘুরে ঘুরে তা জোগাড় করতে পারতুম কিন্তু তুমি তাতে আপত্তি তুলবে বলে, তোমার ঘাড়েই এ দায়িত্ব চাপিয়ে দিচ্ছি। তুমি তো ব্যবসার জন্যে নানা অলি-গলিতে ঘুরে বেড়াও, আমার জন্যে না হয় একটু কষ্ট করলে।

সব শুনে অরিন্দম বলল, কেন, এই বিরাট খোলা মেলা পৃথিবীতে তুমি গল্পের খোরাক খুঁজে পেলে না? কোলকাতার রাস্তার ইতিহাস দিয়ে কি বাঙলা দেশে নাম করা যায়?

এবার মানসীর ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল। সে বলে উঠল, ওসব তুমি বুঝবে না। ক্ষমতা থাকে তো বল না, নাম করার মত দু'চারটে গল্পের প্লট?

এবার হাসি ফুটে উঠল অরিন্দমের মুখে। সে বলল, আমি দোকানে দোকানে শাঁখা সিঁদুর, আলতা, পাউডার এই সব জোগান দিয়ে কোম্পানীর কাছ থেকে কমিশন পেয়ে সংসার চালাই। গল্পের কোন স্থানই নেই আমার জীবন যাত্রায়। সারা দিনই বৈষয়িক কথাবার্তা আর হিসেবের খাতায় আঁক জোক কষা আমার কাজ। এত দিনের মধ্যে কেবল মাত্র একজন দোকানদার হেসে বলেছিল, মশাই আমার এক মহিলা খরিদ্দার আপনার কোম্পানীর শাঁখা সিঁদুর কিনে নিয়ে যাবার পরই চির জীবনের মত হাতের শাঁখা আর সিঁথির সিঁদুর খুইয়েছে। সুতরাং আপনার কোম্পানীর জিনিষ আমার দোকানে আর চলবে না।

ব'লে, অরিন্দম আবার বলল, এ নিয়ে তো আর গল্পের প্লট হয় না। সুতরাং সেই দোকানদারের মত আমার কোম্পানীর জায়গায় তোমার প্লট লেনদেনের ব্যাপারে আমাকেই তুমি বয়কট কর।

এর পর আর কোন কথা চলে না। মানসী আশা করেছিল স্বামী অন্ততঃ তাকে রাস্তার ইতিহাস সংগ্রহের স্বাধীনতাটা দেবে। দোষও ছিল না তাতে। কিন্তু স্বামীর এই উদাসীনতা আবার নতুন করে ঝড় তুলল তার মনে।

অরিন্দম দু'হাতে জানালার রেলিং ধরে বাইরের জ্যোৎস্নাভরা আকাশের গায়ে দৃষ্টিকে মেলে ধরল। বড় ভাল লাগল তার। এই উদার আকাশ নির্ভর করার মত একটা জায়গা বটে। মনের সব খেদ সে যেন উদারতার মধ্যে টেনে নিয়ে ক্ষুদ্র মনের গুমোটকে আস্তে আস্তে ছিঁড়ে ছিঁড়ে টেনে মিশিয়ে নেয় নিজের অবারিতের মধ্যে।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল অরিন্দম। রাস্তার ওপারের দোকানগুলোতে ছিটের সায়া, ব্লাউজ, ফ্রক তৈরীর হিড়িক চলেছে পুরোদমে। পুজো এসে গেছে। পাড়ার মেয়েদের মধ্যে অনেকেই এই সব জামার বোতাম বসিয়ে বা বোতামের ঘর তৈরী করে পুজোর হাত খরচা চালায়। কেউ কেউ সংসারও চালায়। তাদের অনেকের ভীড় জমেছে দোকানের সামনে। সমাপ্তির ফিরিস্তি হাতে নিয়ে আর নতুন কাজের উমেদারীর আবেদন চোখের ভাষায় তুলে ধরে। মানসী খাওয়ার জন্যে ডাক দিতে অরিন্দম মুখ ঘুরিয়ে ফিরতে গিয়ে একটা দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে একটু দাঁড়াল। সামনের বাড়ীর খোলা জানলার আলোর উজ্জ্বলতার মধ্যে একটা কোমল হাত শুধু সেলাই করে চলেছে।

এরপর থেকে মানসী প্রতিদিনই রাস্তার ইতিহাসের বায়না তোলে অরিন্দমের কাছে। সে বিরক্ত হয়ে ছেড়ে দেবে মানসীকে ইতিহাস সংগ্রহের ব্যাপারে এই আশায়।

অরিন্দম প্রতিদিন মনটাকে হাল্কা করতে গিয়ে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে আকাশের গায়ে দৃষ্টি মেলে ধরে আর শুধু মাত্র একটা সেলাই করা কোমল হাত ভেসে উঠে ভাবিয়ে তোলে তার মনটাকে।

কে ঐ মেয়েটি? কার হাত ওটা? ওকে কি কোন দিন এই দোকানগুলোর সামনে সূচীকার্যের বাণিজ্যিক দেওয়া নেওয়ার দলে সে দেখেছে?

এই চিন্তা করতে করতে সেলাই করা হাতের অন্তরালে যে মূর্তিটা আছে তার মনের মনস্তাত্ত্বিক দিকের একটা ছবি ভেসে উঠল অরিন্দমের মনে।

কমিশন এজেন্সীর জাবদা খাতা লেখা কলমটা নিজের অলক্ষ্যেই অরিন্দম টেনে নিয়ে একখণ্ড কাগজের ওপর লিখতে সুরু করল ঝকঝক করে ওঠা কোমল হাতের উত্থান পতনের অন্তরালে পড়ে থাকা একটা মনের করুণ ইতিহাস।

ঘুমন্ত মানসীর পাশে বসে লেখা ইতিহাসটা অরিন্দমের নামে একদিন সকলের অজান্তেই প্রকাশিত হল একটা নাম করা সাময়িক পত্রিকায়। লেখাটা গোপনে পাঠিয়ে দেবার পর সে নিজেই ভাবতে পারেনি যে লেখাটা প্রকাশিত হবে এবং এত তাড়াতাড়ি।

সাময়িক পত্রিকাটি ডাকযোগে প্রথম এসে পড়ে মানসীর হাতে। কিছু বুঝতে না পেরে সেটি খুলে চোখ বুলোতে বুলোতে অবাক হয়ে যায় মানসী। তারপর স্বামী ফিরতে অভিমানে ফেটে পড়ে সে বলে উঠল, তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে লিখে নাম করতে চাও, তাই আমার ব্যাপারে এত উদাসীন! তুমি যাই বল, আমি কোন কথা শুনব না। আমি রাস্তার ইতিহাস নিয়ে বই লিখবই।

মানসীর হাতে ধরা পত্রিকাটা দেখে অরিন্দম ব্যাপারটার কিছুটা আন্দাজ করে নিল। তারপর স্ত্রীকে নিজের খামখেয়ালীর কথা বোঝাতে গিয়ে যুক্তি তর্কে স্ত্রীর ক্ষুরধার জিহ্বার কাছে পরাজয় স্বীকার করে শেষ পর্যন্ত তাকে ইতিহাস সংগ্রহের অনুমতি দিয়ে ফেলল।

ইতিমধ্যে অরিন্দমের 'আড়ালের মন' সহরে বেশ আলোড়ন তুলেছে। সব চাইতে অভাবনীয় ঘটনাও ঘটে গেল। যাঁকে উদ্দেশ্য করে 'আড়ালের মন' লেখা সেই বিবাহিতা ভদ্রমহিলা বাড়ীতে এসে অরিন্দমের সঙ্গে দেখা করে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন যে, সম্পূর্ণ অপরিচিতার মনের কথা এমন নিখুঁত করে বলতে বা লিখতে বা বলতে পারেন একমাত্র অন্তর্যামী। তাই আপনি আমার দেবতা।

বলে, ভদ্রমহিলা অরিন্দমকে প্রণাম করে চলে গেলেন।

দৃশ্য দেখে মানসী উঠে পড়ে চেষ্টা চালাল রাস্তার ইতিহাস সংগ্রহের।

অরিন্দমও যেন কিসের প্রেরণায় সামনের দোকান-গুলোর দিকে তাকিয়ে নারী মনের গবেষণায় নিয়োজিত হয়ে এক একটি চরিত্র সৃষ্টি করে অল্প সময়ের মধ্যেই শ্রদ্ধা কুড়োতে থাকল নারী সমাজের। আস্তে আস্তে মেয়ের দল এসে অভিনন্দন জানাতে লাগল অরিন্দমকে।

মানসী একদিন স্বপ্ন দেখল, সেই সোনালী যেন দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা নিয়ে গ্রাস করতে আসছে তাকে আর বলছে, স্বামীর সঙ্গে তোমার শাঁখা-সিঁদুরের সম্পর্ক এবার ঘুচবে।

ঘুম থেকে উঠে মানসী দেখল, অরিন্দম লেখা নিয়ে ব্যস্ত। সে আস্তে আস্তে স্বামীর পাশে এসে বলল, আমার আর প্লটের দরকার নেই। রাস্তার ইতিহাস নিয়ে আর আমি মাথা ঘামাব না। এসো, আমরা দু'জনে মিলে এবার মন দিয়ে সংসার গ'ড়ে তুলি।

অরিন্দম অবাক বিস্ময়ে মানসীর মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবল, জীবনে বেঁচে থাকার স্বাদ একবার যখন সে পেয়েছে আর তার পিছন দিকে ফিরে তাকাবার অবকাশ ঘটে উঠবে না।

মানসী প্রিয়া

শ্রীশশাঙ্কশেখর হাইত

ঘুচলো সে দিন তোমায় ওগো সামনে থেকে দেখার—
আজ তো তুমি কল্পনারই, আজ তো তুমি দূরের;
আজ তো তুমি স্বপ্ন দেখার, আজ তো ছবি আঁকার;
আজ তো তুমি নওক কথার, আজ তো তুমি সুরের;
আজ তুমি আর নও মানবী, আজ তো হৃদয়রাণী,
আমার বিজন মনের ঘরে তোমার রাজধানী।

আমার মনের রঙ দিয়ে যে তোমায় আমি রাঙাই,
আমার ব্যথার কাজল আঁকি তোমার কালো চোখে;
আমার হাসির পরশ দিয়ে তোমার হাসি জাগাই—
আমার মিলন তোমার সাথে আকুল স্বপ্নলোকে।
আজ তুমি আর নও নিঠুরা, আজ তো মরমিয়া,
আজ তুমি তো নও মানুষী, আজ মানসী প্রিয়া।

বাবরের আত্মকথা

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় এম-এ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৪ঠা তারিখ, রবিবার আমরা নয় ক্রোশ অগ্রসর হয়ে কালপির আর একটি পরগণা দারেপুরে উপস্থিত হই। এখানে আমার মাথার চুল কামাই। প্রায় দুইমাস আমার মাথার চুল কামানো হয়নি। সেদিন শঙ্কুর নদীতে স্নান করি।

সোমবার (১৫ই ফেব্রুয়ারী) চোদ্দ ক্রোশ অগ্রসর হয়ে কালপির আর একটি পরগণা চিরগিরে পৌছাই। পরদিন মঙ্গলবার সকালে কারচের একজন হিন্দুস্থানি ভৃত্য মাহিম বেগমের (বাবরের প্রিয়তমা স্ত্রী, হুমায়ুনের জননী) ফরমান কারচের কাছে নিয়ে আসে। এই ফরমানে (রাজকীয় হুকুমনামা) আদেশ ছিল যে বেরে ও লাদোরের লোকেরা যেন গন্তব্যপথে তার নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা করে। আমি যে রীতিতে নিজের হাতে হুকুমনামা লিখে থাকি এটাও সেই ভাবে লিখিত। কাবুলে প্রথম জুমাদা মাসের ৭ই তারিখ (১৮ই জানুয়ারি) এই হুকুমনামা লেখা হয়েছিল।

বুধবার (১৭ই ফেব্রুয়ারী) আমরা সাত ক্রোশ অগ্রসর হয়ে আদমপুর পরগণায় শিবির ফেলি। সেই দিন প্রত্যুষে কোনও সঙ্গী না নিয়ে অশ্বারোহণে বেরিয়ে পড়ি। মধ্যাহ্নের কিছু পরে যমুনার তীরে উপস্থিত হই। নদীর ভাটিতে তীরের কাছাকাছি দিয়ে চলতে থাকি ও আদিমপুরের অপর দিকে পৌছাই। নদীর একটা চড়ার ওপর সামিয়ানা খাটানোর ব্যবস্থা করে সেখানে মোদক খাই। এইখানে সাদিককে কালানের সঙ্গে কুস্তি লড়ার আদেশ দিই। কালান কুস্তি প্রতিযোগিতার জন্যই এসেছিল। আগ্রায় সে এই অজুহাত দেখিয়ে কুস্তি লড়তে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিল যে অনেক দূর থেকে আসায় সে পথশ্রমে ক্লান্ত, সুতরাং তাকে একুশ দিনের জন্য কুস্তি লড়া থেকে রেহাই দেওয়া হয়। তারপর চল্লিশ পঞ্চাশ দিন পার হয়ে গিয়েছে। সুতরাং তার আর কোনও অজুহাত দেওয়ার উপায় ছিল না। সাদিক খুব সুন্দর কুস্তি লড়ে। সে কালানকে অতি সহজেই পরাস্ত করে। সাদিককে দশ হাজার মুদ্রা, একটি সজিন অশ্ব ও বোতামযুক্ত কুর্ত্তা উপহার দিই। কালান পরাস্ত হলেও যাতে সে বেশী মনঃক্ষুণ্ণ না হয় সেজন্য তাকেও তিন হাজার মুদ্রা ও একপ্রস্থ পোষাক দেওয়ার জন্য আদেশ করি।

নৌকার উপরই বন্দুক ও কামানে গোলা ভর্ত্তি করার জন্য আদেশ দিই। এই সময়ের মধ্যে একটি রাস্তা তৈরি করে তার মাটি সমতল করারও নির্দ্দেশ দিই যাতে কামান-বন্দুক নিয়ে যেতে কোনও অসুবিধা না হয়। এই জায়গায় তিন চার দিন অপেক্ষা করি।

শেষ জুমাদা মাসের ১২ই তারিখ (২২শে ফেব্রুয়ারি) সোমবার বারো ক্রোশ এগিয়ে গিয়ে কোরাতে থামি।

কোরা থেকে পুনরায় বারো ক্রোশ এগিয়ে কোরার একটি পরগণা কুরিয়েতে বিশ্রাম করি (কোরা উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদ জেলায় একটি প্রসিদ্ধ সহর। মাণিকপুরের বিপরীত দিকে গঙ্গার দক্ষিণ-তীরে এই সহর অবস্থিত)। কুরিয়ে থেকে আট ক্রোশ অগ্রসর হয়ে ফতেপুর আসওয়াতে পৌছাই ও ফতেপুর থেকে আট ক্রোশ এগিয়ে গিয়ে সেরাইমিদাতে শিবির স্থাপন করি। এখানে বিশ্রাম করার সময় রাতের নামাজের কাছাকাছি সময় সুলতান জালালুদ্দিন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি ও অভিবাদন জানায়। সে তার সঙ্গে দুটি ছেলেকেও নিয়ে এসেছিল।

পরদিন সকালে শনিবার (২৭শে ফেব্রুয়ারি) আট ক্রোশ অগ্রসর হয়ে গঙ্গার তীরে কোরার আর একটি পরগণা ডাকডাকিতে পৌছাই।

রবিবার (২৮শে ফেব্রুয়ারি) মহম্মদ সুলতান মির্জ্জা, কাসিম হোসেন সুলতান, বেয়াকুব সুলতান ও তার্দিক এই জায়গায় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। সোমবার আসকারিও এইখানে এসে আমাকে অভিবাদন জানায়। এরা

সকলেই গঙ্গার পূর্বদিক থেকে আসে। গঙ্গার অপর পারে যেখানে কতক সৈন্য এসে পৌছিয়েছে তাদের নিয়ে আসকারিকে অগ্রসর হতে হবে এবং যেখানেই সৈন্যরা বিশ্রাম করবে আসকারিকে তার বিপরীত তীরে শিবির ফেলতে হবে।

আমি এই জায়গার কাছাকাছি থাকার সময় অনবরত আমার কাছে এই সংবাদ আসতে থাকে যে সুলতান মামুদ এক লক্ষ আফগান সংগ্রহ করেছে, সে বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে সেথ বেজিদ ও বিবনকে সারওয়ারের (গোরথপুর) নিকটে পর্যুদস্ত করে তাদের পৃথক করে ফেলেছে। সে এবং ফতে খাঁ সেরওয়ানি গঙ্গার দুই তীর আয়ত্বে এনে চুণারের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, সের খাঁ সুর, যাকে আমি পূর্ব্বে অনুগ্রহ দেখিয়ে কতকগুলি পরগণার অধিকার দিয়ে ঐ দিককার শাসনভার অর্পণ করেছিলাম, সেও আফগানদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। আরও কয়েকজন আমিরের সঙ্গে সে নদী পার হয়েছে। সুলতান জালালুদ্দিনের লোকজন বেণারস রক্ষা করতে অক্ষম হয়ে সে জায়গা ত্যাগ করে পালিয়ে এসেছে। তারা অবশ্য এই অজুহাত দেখায় যে তারা বারাণসীর দুর্গ রক্ষার জন্য যথেষ্ট সৈন্য রেখে এসেছে এবং তারা গঙ্গার তীরে শত্রুর মুখোমুখি হবার জন্য অগ্রসর হয়ে এসেছে।

'ডাকডাকি' থেকে রওনা হয়ে ছয় ক্রোশ এগিয়ে এসে কারার দুই তিন ক্রোশের মধ্যে কুশারে শিবির স্থাপন করি। আমি এখানে জলপথে আসি। জালালুদ্দিন সুলতান আমাকে অভ্যর্থনার বিপুল আয়োজন করায় এখানে আমাদের দুই তিন দিন অবস্থান করতে হয়। কারার দুর্গ অভ্যন্তরে জালালউদ্দিনের প্রাসাদে আমার অভ্যর্থনা করার ব্যবস্থা হওয়ায় আমি তার অতিথি হিসাবে সেইখানে যাই। সে নিজেই আমার সামনে কয়েকটি থালায় আহার্য্য পরিবেশন করে। আমি তাকে আর তার ছেলেদের প্রত্যেককে একটি সোনার জরি খচিত ইয়াকৃতা, জামা ও নিম্‌চে উপহার দিই। (ইয়াকৃতা—আস্তরণ বিহীন কোর্ত্তা, জামা—লম্বা গাউন, নিম্‌চে—কোমর পর্য্যন্ত ঝুলের কোট বিশেষ)। তার জ্যেষ্ঠপুত্রকে সুলতান মামুদ এই পদবী প্রদান করি।

কারা ত্যাগ করে আমি ক্রোশখানেক অশ্বারোহণে যাই এবং গঙ্গার তীরে বিশ্রাম গ্রহণ করি। গঙ্গার তীরে পৌছানোর পর মাহামের চিঠি নিয়ে সাবরেক আমার সঙ্গে দেখা করে। চিঠির উত্তর দিয়ে তাকে ফেরৎ পাঠাই। খাজা ইয়াহিয়ার নাতি আমার আত্মকথার যতটা লিখেছি তার নকল চেয়ে পাঠায়। এক প্রস্থ নকল আগেই করা ছিল। সেইটিই সাবরেকের হাত দিয়ে পাঠাই।

পরদিন (৬ই মার্চ) রওনা হয়ে চার ক্রোশ এগিয়ে যাওয়ার পর যাত্রা স্থগিত রাখি। আমার নিয়মানুসারে নৌকায় চড়ি। শিবিরের জায়গা বেশী দূরে ছিল না জন্য তাড়াতাড়ি সেখানে পৌছে যাই। কিছুক্ষণ পর নৌকাতেই আমি মোদক খাই। খাজা আবদুল সহিদ নর বেগের বাড়ীতে ছিল। তাকে ডেকে পাঠাই। মোল্লা আলি খাঁয়ের বাড়ী থেকেও আল্লা মামুদকে ডাকিয়ে আনি। কিছুক্ষণ নৌকায় বসে থাকার পর আমরা অপর পারে যাই। সেখানে কুস্তি করার জন্য কয়েকজন কুস্তিগিরকে আদেশ দিই। দোস্ত ইয়াসিন খয়েরকে এই নির্দেশ দিই যে সে প্রথমে যেন শ্রেষ্ঠ মল্লবীর সাদিকের সঙ্গে না লড়ে তার মল্ল নৈপুণ্য যেন অন্যান্য কুস্তিগিরের সঙ্গে লড়ে দেখায়। কিন্তু আমাদের এই নির্দেশ চলতি নিয়মের বিপরীত—কারণ রীতি এই যে সর্ব্ব প্রথমে শ্রেষ্ঠ কুস্তিগিরের সঙ্গেই লড়তে হয়। যাহোক, সে আটজন বিভিন্ন কুস্তিগিরের সঙ্গে অতি সুন্দরভাবে কুস্তি লড়ে।

বৈকালিক নমাজের সময় সুলতান মহম্মদ বক্সি নদীর অপর পার থেকে নৌকায় এপারে এসে পৌছায়। সে সুলতান ইসকান্দারের পুত্র মামুদ খাঁর—যাকে বিদ্রোহীরা সুলতান মামুদ এই গৌরবজনক পদবী দিয়ে সম্মানিত করেছিল—ধ্বংসের বিবরণ নিয়ে এসেছিল। আমার সৈন্যদলের মধ্যে যে গুপ্তসংবাদ সংগ্রহের কাজ নিয়ে ঐদিকে গিয়েছিল সে মধ্যাহ্ন নমাজের সময় ফিরে এসে বিদ্রোহীদের ছত্রভঙ্গের সংবাদ দেয়। মধ্যাহ্ন ও বৈকালিক নমাজের সময়ের মধ্যে তাজ খাঁ সারংখানির যে একখানি চিঠি আসে তাতেও গুপ্তচরের সংগ্রহ করা সংবাদের সমর্থন পাওয়া যায়। জানা গেল যে বিদ্রোহীরা চুণার এসে দুর্গ অবরোধ করে, এমন কি লঘুভাবে আক্রমণও করে। কিন্তু আমার এদিকে আগমনের নিশ্চিত সংবাদ

পেয়ে তারা আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে বিশৃঙ্খলভাবে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং দুর্গ অবরোধও তুলে নেয়। যে সব আফগান বারাণসী গিয়েছিল তারাও সেখান থেকে বিশৃঙ্খলভাবে সরে পড়ে। তাদের দুইখানি নৌকা নিমজ্জিত হয় ও তাদের কতক সৈন্য নদীতে ডুবে মারা যায়।

পরের দিনও আমি নৌকায় চড়ি। আধা-আধি ভাটিতে যাওয়ার পর আইসান তাইমুর সুলতান ও তুখ্তে বাঘা সুলতানকে দেখতে পাই। তারা ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে আমাকে কুর্ণিশ করার জন্য মাটিতে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি তাদের নৌকায় ডাকিয়ে আনি। তুখ্তে বাঘা সুলতান তার কয়েকটি ঐন্দ্রজালিক খেলা দেখালো। জোর হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি আরম্ভ হলো। বাতাসের বেগ বেড়ে যেতে আমি মোদক খেতে বাধ্য হলাম। আগের দিন একবার মোদক খেলেও এই দিনেও শিবিরে পৌঁছিয়ে আবার খেলাম।

পরদিনও এই শিবিরেই বিশ্রাম নিই।

মঙ্গলবার আবার যাত্রা সুরু হয়। দূরে একটি সবুজ তৃণাচ্ছাদিত দ্বীপ দেখতে পাই। নৌকাযোগে সেই দ্বীপে পৌঁছে ঘোড়ার পিঠে চারদিকে ঘুরে দেখে বেলা প্রহর-খানেকের সময় আবার নৌকায় উঠি। নদীর তীর দিয়ে ঘোড়ার পিঠে যেতে যেতে আমি অজ্ঞাতসারে এমন একটা জায়গায় এসে পড়েছিলাম যার ভেতরটা নদীর স্রোতের টানে ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। যে মুহূর্তে আমি সেখানে গিয়েছি অমনি ওপরের মাটি ভেঙ্গে পড়ে ভেতরে সেঁধিয়ে গেল। আমি তৎক্ষণাৎ ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফ দিয়ে শক্ত মাটির ওপর পড়লাম। কিন্তু আমার ঘোড়াটা আছাড় খেয়ে পড়লো। যদি আমি ঘোড়ার পিঠেই থাকতাম তাহলে ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও পড়তে হতো। এই দিনই আমি আনন্দ করার জন্য গঙ্গায় সাঁতার কাটি। সাঁতার দেওয়ার সময় আমি যতবার হস্ত-চালনা করি তার সংখ্যা গণনা করি। দেখলাম যে তেত্রিশবার হস্তচালনা করে গঙ্গা পার হয়ে এসেছি। এ পারে এসে বিশ্রাম না করেই শুধু নিশ্বাস ফেলার সময় নিয়েই আমি অন্য তীরে ফিরে আসি। সাঁতার কেটে প্রত্যেক নদীই পার হয়েছি—কেবল গঙ্গা নদী বাকি ছিল। যেখানে গঙ্গা ও যমুনা মিলেছে সেইখান থেকে নৌকা চালিয়ে প্রয়াগের দিকে যাই ও রাত দশটা নাগাদ শিবিরে পৌঁছাই।

বুধবার (১০ই মার্চ) সৈন্যদল যমুনা পার হতে আরম্ভ করে। আমাদের সঙ্গে ছিল চারশ' কুড়িটি নৌকা।

রাজেব মাসের পয়লা তারিখ (১২ই মার্চ) আমি নদী পার হয়ে আসি।

৪ঠা তারিখ সোমবার যমুনার তীর থেকে সসৈন্যে বেহারের দিকে এগোতে থাকি। পাঁচ ক্রোশ এসে লাওয়ানে এসে থামি। অভ্যাস মত নৌকায় চড়ি। সৈন্যরা অবশ্য সারাদিনই পথ চলতে থাকে। আমি এই সময় নির্দেশ দিই যে কামান ও কামানের গাড়ী যেগুলি আদমপুরে নামানো হয়েছে সেগুলো আবার প্রয়াগ থেকে নৌকায় চাপিয়ে জল পথেই পাঠাতে হবে। মাটিতে নেমে আমরা কুস্তিগিরদের নৌকার মাঝি লাহোরি পালওয়ানের (লাহোরের কুস্তিগির) কুস্তি লড়তে লাগিয়ে দিই। দোস্ত তাকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয় বটে কিন্তু সেটা অনেক চেষ্টার পর এবং অতি কষ্টে। তাদের দুইজনকেই এক প্রস্থ করে পোষাক দিই। কিছু দূরেই ঘোলা জলের তুষ নদী। আমরা এই জায়গায় দুই দিন অবস্থান করি। উদ্দেশ্য ছিল নদী পার হওয়ার জন্য এমন একটা জায়গা ঠিক করা যেখানে জল কম এবং একটি রাস্তা তৈরি করা। রাত্রের দিকে একটা নদীপথ আবিষ্কার করা গেল যেখানে ঘোড়া ও উট পার করানো যেতে পারে কিন্তু বোঝাই গাড়ী পার করানো সম্ভব নয়, কারণ জলের তলা টুকরো পাথরে ভর্ত্তি। যাহোক, আদেশ দেওয়া হলো যে মাল বোঝাই শকটগুলি যে কোনও উপায়ে নৌকায় পার করতে হবে।

বৃহস্পতিবার (১৮ই মার্চ) সেখান থেকে রওনা হই। নৌকায় চড়ে যেখানে তুষ নদী প্রধান নদী গঙ্গায় এসে মিশেছে সেইখানে এসে পৌঁছাই। এই দিন সৈন্যরা ছয় ক্রোশ অগ্রসর হয়।

পরদিন সকালে এই জায়গায় বিশ্রাম নিই।

শনিবার আমরা বারো ক্রোশ এগিয়ে নিলাবে গঙ্গার তীরে পৌঁছাই। সেখান থেকে পরদিন সকালে রওনা হয়ে ছয় ক্রোশ পথ চলার পর একটি গ্রামে পৌঁছিয়ে বিশ্রাম করি। সেখান থেকে চার ক্রোশ চলার পর নাহুপুরে

✻ শ্বেত-সৌধ ✻

আনমনা

*

ফটো :

অমিতেশ বন্দোপাধ্যায়
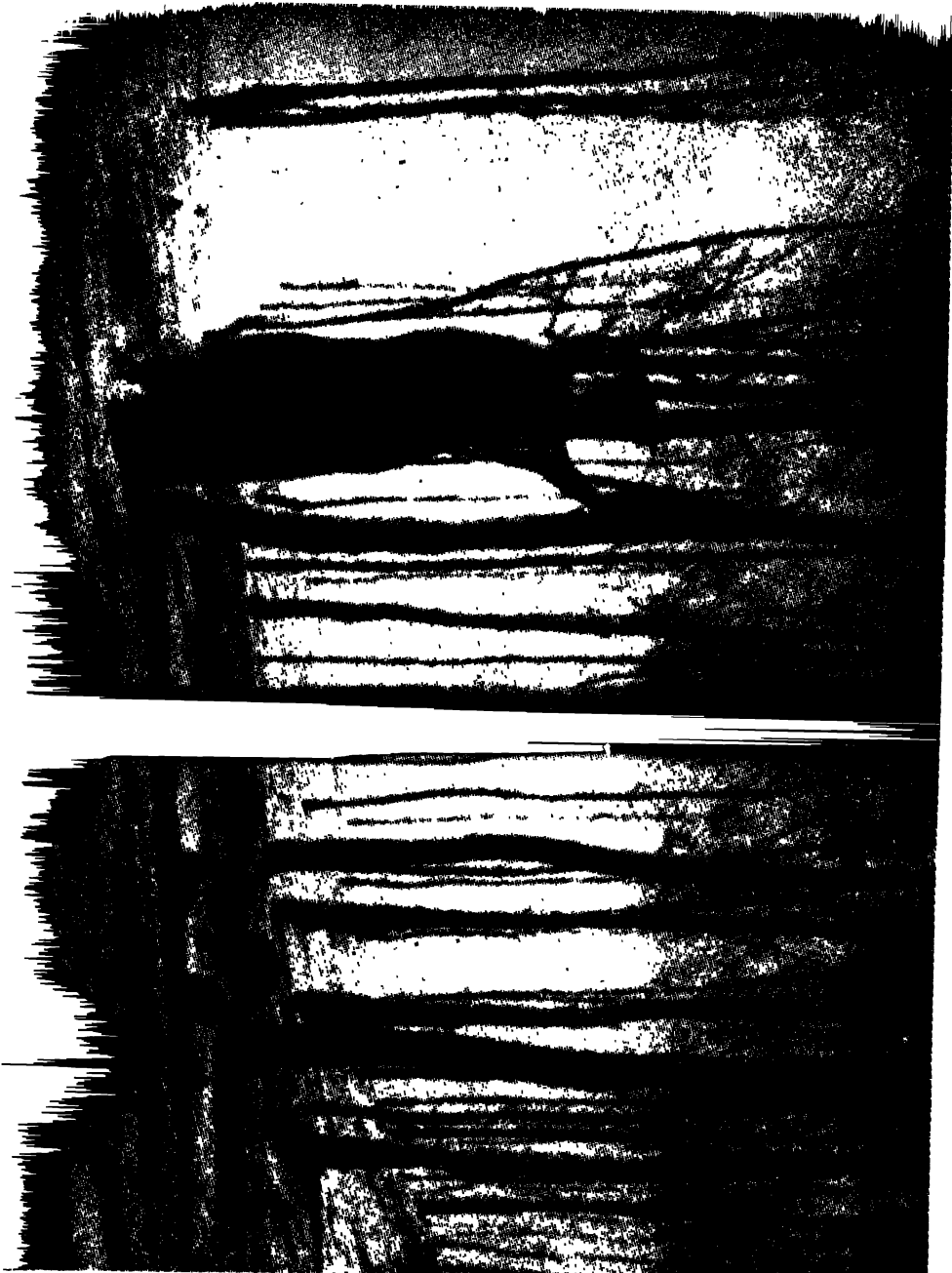
পৌছাই। এই জায়গায় বাকি খাঁ তার পুত্রদের সঙ্গে নিয়ে চুণার থেকে এসে আমাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

এই সময় মামুদ বক্সির চিঠি থেকে এই সংবাদ পাই যে আমার পত্নীগণ পরিবারবর্গসহ কাবুল থেকে যাত্রা করেছে।

বুধবার (২৪শে মার্চ) এখান থেকে চুণার দুর্গ দেখতে যাই। চুণার থেকে এক ক্রোশ অগ্রসর হয়ে শিবিরে বিশ্রাম করি। প্রয়াগ থেকে যাত্রা করার পর আমার শরীরে কতকগুলি যন্ত্রণাদায়ক স্ফোটক দেখা দেয়। এখানকার একজন চিকিৎসক আমার চিকিৎসা করে। এই চিকিৎসা পদ্ধতি সম্প্রতি এইখানে আবিষ্কৃত হয়। পদ্ধতিটি এইরূপ। একটি মাটির পাত্রে গোলমরিচের গুঁড়া সিদ্ধ করা হয়। ফুটন্ত জলে যে গরম বাষ্প উঠতে থাকে সেই ধোঁয়া ঘাগুলিতে লাগাতে হয়। যখন বাষ্প কমে আসে তখন সেই গরম জলে ঘা ধুয়ে ফেলতে হয়। দুই ঘণ্টা ধরে এই ভাবে চিকিৎসা চলে।

একটা লোক এসে সংবাদ দেয় যে আমাদের শিবিরের জায়গার কাছাকাছি সে একটা সিংহ ও গণ্ডার দেখেছে। পরদিন সকালে আমরা সেই জায়গাটা ঘিরে ফেলি। হাতী নিয়ে এসে শিকারের জন্য প্রস্তুত হই। কিন্তু কোনও সিংহ বা গণ্ডারের পাত্তা পাওয়া গেল না। শিকারের জন্য যে জায়গাটা ঘেরাও করা হয় তারই এক ধারে একটা বুনো মহিষ দেখা যায়। এই দিন ঝোড়ো বাতাস উঠেছিল। ধুলোয় ও ঝড়ে আমাদের খুব বিরক্তির কারণ হয়েছিল। যাহোক, জলপথে উজানে বারাণসী থেকে দুই ক্রোশ দূরে শিবিরে ফিরে আসি।

চুণারের চারদিকে জঙ্গলে অনেক হাতী আছে। হাতী শিকারের জন্য যখন সবেমাত্র এই জায়গা থেকে বের হবো সেই সময় বাকি খাঁ এই খবর নিয়ে আসে যে মামুদ খাঁ শোণ নদীর তীরে এসে পৌচেছে। আমি তৎক্ষণাৎ আমিরদের আহ্বান করে আলোচনা করি যে আচম্বিতে আমাদের শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করা উচিত কিনা। আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত হয় যে আমরা অতি-দ্রুত এবং ক্ষণমাত্র সময় ক্ষেপণ না করে দীর্ঘ পদক্ষেপে অগ্রসর হয়ে যাব।

সেইখান থেকে রওনা হয়ে নয় ক্রোশ অতিক্রম করে বাহুয়ায় (বারাণসী জেলার একটি শহর) এসে পৌছাই। এখান থেকে সোমবার সন্ধ্যায় (২৮শে মার্চ) তাহেরকে আগ্রায় পাঠাই। কাবুল থেকে যে সব অভ্যাগতরা এসে-ছিল—তাদের কোষাগার থেকে টাকা দেওয়ার জন্য নির্দেশনামাগুলি সে সঙ্গে নিয়ে যায়।

এই দিনও আমি নৌকায় চড়ি। ভোরের আগেই নৌকায় উঠে জৌনপুরের গোমতী নদী যে জায়গায় গঙ্গা নদীর সঙ্গে মিলেছে সেই সঙ্গমস্থলে পৌছিয়ে সেখান থেকে নৌকাতেই আরও কিছুদূর উজানে গিয়ে আবার ফিরে আসি। গোমতী সঙ্কীর্ণ ছোট নদী হলেও জলের মধ্যে হেঁটে পার হওয়ার মত কোনও জায়গা পাওয়া গেল না। সেই জন্য সৈন্যরা বাধ্য হয়ে কখনও নৌকায় ও ভেলায়, কখনও বা সাঁতার দিয়ে, কখনও ঘোড়ার পিঠে চড়ে ঘোড়াকে জলে সাঁতরিয়ে নদী পার হতে হয়। গত বছর যেখানে ছাউনি ফেলে আমার সৈন্যরা জৌনপুরে এগিয়ে গিয়েছিল সেই শিবির আমি আশ্বারোহণে দেখে আসি।

অনুকূল বাতাস বইছে জন্য বাংলা দেশের একটা নৌকায় পাল খাটিয়ে দেওয়া হয় এবং সেই নৌকার সঙ্গে একটি বড় নৌকা বেঁধে খুব দ্রুত চালিয়ে নেওয়া হয়। সৈন্যরা বারাণসী ত্যাগ করে উজানের দিকে এক ক্রোশ দূরে শিবির ফেলে। তখন দিনের মাত্র দুই ঘড়ি অবশিষ্ট ছিল। আমরা শিবিরে পৌছে যাই কারণ রাস্তায় কোনও প্রতিবন্ধক ছিল না। যে নৌকাগুলো আমাদের পেছনে আসছিল সেগুলোও খুব তাড়াতাড়ি রাতের নমাজের সময় এসে পৌছায়। চুণারে আমি এই আদেশ দিই যে যখনই আমি ডাঙ্গাপথে আসবো, মোগল বেগকে সেই রাস্তাটা মাপের ফিতে দিয়ে মেপে ফেলতে হবে। আর প্রায়ই যখন আমি নদী পথে নৌকায় যাই, তখন লুৎফি বেগকে নদীর তীর বরাবর মেপে যেতে হবে। রাস্তার মাপ হলো এগারো ক্রোশ আর নদী তীরের মাপ হলো আঠারো ক্রোশ।

পরদিন (৩০শে মার্চ) এই জায়গাতেই থেকে যাই।

বুধবার (৩১শে মার্চ) নদী পথে যাত্রা করে গাজিপুরের এক ক্রোশ ভাটিতে যেয়ে থামি।

বৃহস্পতিবার (১লা এপ্রিল) যখন শেষ উল্লিখিত স্থানে ছিলাম সেই সময় মহম্মদ খাঁ লাহোরি এসে আমাকে শ্রদ্ধা

নিবেদন করে। এই দিন লাহোর থেকে শেষ জুমেদা মাসের ২০শে তারিখে (২রা মার্চ) লেখা আবদুল আজিজ আখুরের চিঠি পাই। যেদিন এই চিঠি লেখা হয় সেই দিন করাচের হিন্দুস্থানি ভৃত্য, যাকে আমি কালপির নিকটবর্ত্তী স্থান থেকে পাঠিয়েছিলাম, সে সেখানে পৌঁছেছিল। আবদুল আজিজের চিঠিতে জানতে পারি যে সে এবং অন্যান্য সকলে আমার আদেশ অনুসারে যাত্রা সুরু করেছে এবং শেষ জুমাদা মাসের ৯ই তারিখ (১৯শে ফেব্রুয়ারি) আমার পরিবারবর্গের মহলে নিলাবে এসে মিলিত হয়েছে। আবদুল আজিজ আমার পরিবারবর্গের তত্ত্বাবধান করার জন্য চেনাব পর্য্যন্ত এসেছিল। তারপর তাদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে আগেই লাহোরে এসে পৌঁছেছে এবং সেখান থেকে এই চিঠি লিখেছে যেটা এখানে পেলাম।

শুক্রবার (২রা এপ্রিল) সৈন্যরা পুনরায় যাত্রা সুরু করে আর আমি আমার রীতি অনুযায়ী জলপথে অগ্রসর হয়ে চুসের বিপরীত দিকে যেখানে আমাদের আগের বছর শিবির ছিল ও যেখানে যাবার সময় সূর্য্যগ্রহণ হয়েছিল এবং আমরা উপবাস পালন করেছিলাম, সেইখানে এসে নৌকা থেকে মাটিতে নামি। আমি অশ্বারোহণে জায়গাটা পর্য্যবেক্ষণ করে আবার নৌকায় উঠি। মহম্মদ জেমান মির্জ্জা নৌকাতেই আমার সঙ্গে আসে। তার পীড়াপীড়িতে আমি একদফা মোদক খাই। সৈন্যরা কর্ম্মনাশার তীরে ছাউনি ফেলে। হিন্দুরা এই নদীর সংস্রব কঠোরভাবে বর্জ্জন করে। তারা নৌকায় গঙ্গা নদী দিয়ে পার হয়। তাদের বিশ্বাস যদি কেউ কর্ম্মনাশার জল স্পর্শ করে তাহলে তার ধর্ম্ম নষ্ট হবে। তাদের মতবাদের সমর্থনে বলে যে কর্ম্মনাশা নামটির উৎপত্তির কারণই এই।

আমি নৌকায় উঠে পাল তুলে দিয়ে উজানে কিছুদূর যাই এবং ফিরে এসে গঙ্গানদী পার হয়ে উত্তর তীরে আসি। অন্য নৌকাগুলিকে এই তীরের কাছাকাছি আনা হয়। কিছু কিছু সৈন্য নানারকম ক্রীড়ায় মত্ত হয়। কেউ কেউ বা কুস্তি লড়তে থাকে। সাকি মহসিন চার পাঁচ জনকে কুস্তি লড়তে আহ্বান জানায়। একজনকে সে ধরে ফেলে এবং তৎক্ষণাৎ তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। সাদে ওয়ান ছিল দ্বিতীয়। সে আবার মহসিনকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে। এই পরাজয়ে মহসিন অত্যন্ত লজ্জিত ও অপদস্থ হয়। কয়েকজন ওস্তাদ কুস্তিগিরও আসরে নামে এবং কুস্তি করে।

[ক্রমশঃ

আর্কাইভ

অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়

আর্কাইভ, আর্কাইভ নয়, অতীতের উপছায়া
জীবন যমুনা হ্রদে স্মৃতির উপল মায়া
কখনো মিলিয়ে যায়
কখনো পালিয়ে যায়,
ধরে রাখা সে ছায়ারে কঠিন,
তাপসী হিয়া
উড়ে যায়, উড়ে দূরে চলে যায়
একটি সবুজ টিয়া।

সে টিয়া প্রহরী ছিল
খাইবার পাসে
অতন্দ্র প্রহরী ছিল
পুরো বারো মাসে :
সে টিয়া পালিয়ে গেছে আর্কাইভ
ঠোঁটে করে,
আর্কাইভ, চার-ফাইভ, চার-ফাইভ
গাছে ধরে।

ফরাক্কা বাঁধ—
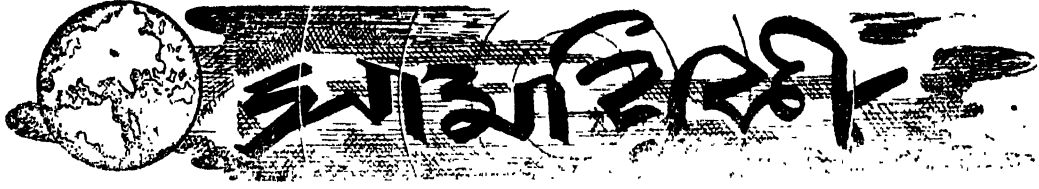
পশ্চিমবাংলার ফরাক্কা নামক স্থান বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তর প্রান্তে অবস্থিত। সেখানে গঙ্গা নদী আসিয়া ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে। ফরাক্কার নিকট নদীতে বিরাট চর থাকায় জল ভাগীরথীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, সেজন্য ফরাক্কায় বাঁধ বাঁধিয়া গঙ্গার জল ভাগীরথীর পথে কলিকাতা হইয়া বঙ্গোপসাগরে লইয়া যাওয়া হইবে। এক সময়ে ভাগীরথীর পথে কলিকাতা হইতে লালগোলা হইয়া নৌকা যোগে বিগারে যাওয়া যাইত। এখন সমস্ত নদী বুজিয়া যাওয়ায় সে পথে নৌকা চলাচল করেনা। ফরাক্কার বাঁধ নির্মিত হইলে ভাগীরথী আবার বহতা হইবে এবং তাহার ফলে সমগ্র নিম্ন পশ্চিম বঙ্গের বহুবিধ উন্নতি সাধন সম্ভব হইবে। ফরাক্কার কাজ মন্দ গতিতে চলিতেছে বলিয়া সোভিয়েট রাশিয়া সেই কার্য্যে সাহায্য দান করিতে অগ্রসর হইয়াছে। বহু রুশ ইঞ্জিনীয়ার আসিয়া ফরাক্কা পরিকল্পনাকে সত্বর কার্য্যকরী করিতে নানাভাবে সাহায্য করিতেছেন।

সত্বর এই কাজ শেষ হইলে বাঙলাদেশ উপকৃত হইবে।

সুন্দরবনের উন্নয়ন—

পশ্চিমবাংলার লোকসংখ্যা এত বাড়িয়াছে যে অধিকাংশ স্থানে মানুষের বাসোপযোগী ব্যবস্থা করা সম্ভব হইতেছে না। তাছাড়া পশুপালন, কৃষি প্রভৃতির উপযুক্ত স্থানের অভাব। অথচ ২৪পরগণা জেলার দক্ষিণে একটি বিরাট অঞ্চল এখনও অনুন্নত। তথায় অধিক লোক বাস করে না। সেই অঞ্চলের নাম সুন্দরবন হইলেও সেখানে আর অধিক বনজঙ্গল নাই। ঐ অঞ্চল নিম্নভূমি বলিয়া বন্যার ভয় ছিল। এখন বাঁধ বাঁধিয়া অধিকাংশ জমি বন্যার আক্রমণ হইতে রক্ষা করার ব্যবস্থা হইয়াছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার সুন্দরবন অঞ্চলকে উন্নত করার জন্য একটি অনুসন্ধান দল গঠন করিয়াছেন। খ্যাতনামা অধ্যাপক এম, এস, থ্যাকার ঐ দলের নেতা নিযুক্ত হইয়াছেন।

ঐ অঞ্চলে কৃষি, মৎস্যচাষ, বনরক্ষা, হাঁস-মুরগী পালন প্রভৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া ঐ দল উপযুক্ত ব্যবস্থার প্রস্তাব করিবেন। ব্রহ্মচারী ভোলানাথ নামক একজন নিঃস্বার্থ কর্ম্মী বহু বৎসর ধরিয়া সুন্দরবন অঞ্চলের উন্নয়ন কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তিনি একসময় স্বর্গত জহরলাল নেহেরুর সহিত দেখা করিয়া তাঁহার প্রস্তাবগুলি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে জানাইয়া আসিয়াছিলেন। আমাদের বিশ্বাস অধ্যাপক থ্যাকার তাঁহার কার্য্যকালে ব্রহ্মচারী ভোলানাথের সহিত পরামর্শ করিবেন।

বাঁকুড়ায় সর্ব্বত্র রেশনিং—

পশ্চিমবাংলায় সকল জেলাগুলির মধ্যে বাঁকুড়ায় সর্ব্বপ্রথম গত জুনমাসের শেষভাগ হইতে শহর, গ্রাম, পল্লী সর্ব্বত্র রেশনিং ব্যবস্থা চালু হইয়াছে। অন্য জিলায় দেখা গিয়াছে কোন কোন স্থানে রেশনিং ব্যবস্থা চালু করিয়া বাকী স্থানগুলিতে তাহা না করার ফলে মানুষের অসুবিধাও বাড়িয়া যায় এবং একদল দুষ্ট লোকের পক্ষে অনাচার করাও সম্ভব হয়। সেজন্য বাঁকুড়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট একই সঙ্গে সর্ব্বত্র রেশনিং চালু করার ব্যবস্থা করেন। এই ব্যবস্থা সকল জেলায় অনুসৃত হইলে সব দিক দিয়া লোক উপকৃত হইবে। বাঁকুড়া একসময়ে অনগ্রসর জেলা বলিয়া মনে করা হইত। এখন দেখা যাইতেছে যে, বাঁকুড়া পশ্চিমবঙ্গের একটি শ্রেষ্ঠ জেলায় পরিণত হইল।

বাঙ্গালোরে কংগ্রেস সভা—

গত ২৪শে ও ২৫শে জুলাই বাঙ্গালোরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় প্রস্তাব ছিল বিভিন্ন রাজ্যের শাসন ব্যবস্থার পার্থক্য দূরীকরণ। ইহার ফলে ঐক্য স্থাপিত

হইল। বর্ত্তমানে কংগ্রেস সমগ্র ভারতের শাসনকর্ত্তা। সেজন্য হায়দ্রাবাদে কংগ্রেস সভায় সকল রাজ্যের প্রধান-মন্ত্রীরা ও কেন্দ্রীয় রাজ্যের মন্ত্রীরা উপস্থিত ছিল। পশ্চিম-বঙ্গের পক্ষে আনন্দের কথা মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন আলোচনায় যোগদান করিয়া বিশেষ অংশগ্রহণ করেন। তাহা ছাড়া ঐ সভায় কংগ্রেস সভাপতি কামরাজ নাদারকে আরও একবৎসর সভাপতির কাজ করিবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীও বাঙ্গালোরে ভারতের বর্তমান প্রধান সমস্যা, গোয়া, কচ্ছ, পাকিস্তান ও চীন সমস্যা প্রভৃতি বিষয়ে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

বাংলার সমস্যা—

ইংরাজ শাসনের সময় উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা সরকারী কার্য্যের অবসরে দেশের সমস্যা সম্বন্ধে নানা মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিতেন। সিভিলিয়ান রমেশচন্দ্র দত্ত এ বিষয়ে অগ্রণী বলা যায়। তিনি ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধে বাংলায় রচনা করিলেও তাঁহার অর্থনীতি বিষয়ে ইংরাজীতে লিখা গ্রন্থে সে সময়ে দেশের সমস্যা সাধারণের নিকট উপস্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহার জামাতা সিভিলিয়ান জে. এন. গুপ্তও শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে ইংরাজী গ্রন্থ লিখিয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

সম্প্রতি শ্রীবি. আর, বিশ্বাস নামক একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী বাংলার সম্পদ ও উন্নতি বিষয়ে এক মূল্যবান ইংরাজী গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। উহার মূল্য পাঁচ টাকা, তাহা কলিকাতা-৯,১২১বি, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটস্থ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব্ এডুকেশন হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক তাহাতে বাংলার জমি ও মানুষ, নূতন শিল্পাঞ্চল এবং অর্থনৈতিক জীবনের কথা আলোচনা করিয়াছেন। বৃহত্তর কলিকাতা, কলিকাতার বন্দর রক্ষা ও দামোদর উপত্যকার সেচ খাল হইতে আরম্ভ করিয়া লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, কয়লা খনি শিল্প, মাইকা, তামা প্রভৃতির উন্নতি ও সমস্যার কথা আলোচনা করিয়া তিনি বাংলার, Bank আইন, সমবায়-ব্যবস্থা প্রভৃতির বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

একজন পরিণত বয়স্ক কৃতী সরকারী কর্ম্মচারী যেভাবে সমগ্র সমস্যা জনগণের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন তাহা শুধু অসাধারণ নহে অভিনব প্রচেষ্টা বলা যায়। আমরা শ্রীযুত বিশ্বাসের উদ্যম অভিনন্দিত করি।

ভারতের ভাষা সমস্যা—

ভারতের রাষ্ট্র ভাষা লইয়া আলোচনা এখনও শেষ হয় নাই। উত্তর ভারতের একজন জননেতা হিন্দিকে রাষ্ট্র-ভাষা করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। অথচ সকলেই স্বীকার করেন যে, হিন্দি-ভাষা রাষ্ট্রভাষা হইবার যোগ্য নহে। একদল উৎকট হিন্দি-প্রেমিক ইংরাজী ভাষার ব্যবহার বন্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, এ সময়ে দেশের একজন চিন্তাশীল মনীষী কলিকাতা সিটি কলেজের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল, অশীতিবর্ষ বয়স্ক শ্রীযুত নিরঞ্জন নিয়োগী ভাষা সমস্যা সম্বন্ধে একখানি নাতি বৃহৎ পুস্তক প্রকাশ করিয়া এ বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। পুস্তকখানি ইংরাজীতে লিখিত এবং তাহার মূল্য মাত্র এক টাকা। কলিকাতা-১৭, ২৫৯ দরগা রোড হইতে উহা প্রকাশিত হইয়াছে।

লেখক যুক্তি-তর্কের দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, ইংরাজী ভাষাই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণের উপযুক্ত এবং ইংরাজীকে রাষ্ট্রভাষা করা হইলে ভারতবাসীর লাভ ছাড়া ক্ষতি হইবে না। ইংরাজ চলিয়া যাওয়ার পরও ভারতের প্রায় সকল লোক ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়া নিজ নিজ জ্ঞানের ক্ষেত্র বিস্তারিত করিয়া থাকেন। হিন্দি-ভাষা লইয়া যেরূপ মতভেদ হইতে মারামারি পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে তাহাতে সারা ভারতের চিন্তাশীল মানুষের একত্র হইয়া ধীরভাবে নিয়োগী মহাশয়ের প্রস্তাব বিবেচনা করা উচিত।

তিনি সারাজীবন কলেজ সমূহে অধ্যাপনা করিয়াছেন। কাজেই আমাদের বিশ্বাস তাঁহার প্রস্তাব আলোচনার ব্যবস্থা করিবার জন্য তাঁহার ছাত্রদের উৎসাহের অভাব হইবে না। আমরাও মনে করি যতদিন না সংস্কৃত ভাষা যোগ্যতা লাভ করিয়া সারা ভারতের সম্মতিক্রমে রাষ্ট্রভাষা করা যায় ততদিন ইংরাজীকেই ভারতের রাষ্ট্রভাষা করিয়া রাখা কর্তব্য।

আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসক সম্মেলন—

গত ২৬, ২৭ ও ২৮শে আষাঢ় কলিকাতা মহাজাতি সদনে বঙ্গীয় আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসক মহাপরিষদের উদ্যোগে

এই সম্মেলনের ত্রয়োদশ অধিবেশন হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র, প্রধান অতিথি বিচারপতি শ্রীকমলেশ সেন, উদ্বোধক প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন তাঁহাদের ভাষণে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যাহাতে আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি সাধিত হয় সে জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থার দাবী করেন।

রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু তাঁহার শুভেচ্ছা বাণীতে আয়ুর্ব্বেদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজন বিবৃত করেন। মূল সভাপতি কবিরাজ শ্রীরামকৃষ্ণ শাস্ত্রী, কাব্যব্যাকরণ-ষড়দর্শন তীর্থ, একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রয়োজনীয় লিখিত ভাষণ পাঠ করেন। বিভিন্ন শাখার উদ্বোধন করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীপূরবী মুখোপাধ্যায়, প্রচার মন্ত্রী শ্রীবিজয়সিং নাহার, কলিকাতার মেয়র শ্রীপ্রীতিকুমার রায়চৌধুরী, ভারতবর্ষ সম্পাদক শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং বিভিন্ন শাখায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন অধ্যক্ষ শ্রীবিজয়কালী ভট্টাচার্য্য, অধ্যক্ষ শ্রীপরিমল সেনগুপ্ত, কবিরাজ শ্রীমন্মথনাথ রায়, অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী, পাটনার শ্রীদুর্গাপ্রসাদ শর্ম্মা, এবং শাখা সভাপতির আসন গ্রহণ করেন শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন, শ্রীহেরম্বনাথ শাস্ত্রী, শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র নাগ, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র সেন, শ্রীমনোরঞ্জন সাংখ্যতীর্থ ও শ্রীকেশবদেব শাস্ত্রী।

এবারে আয়ুর্ব্বেদ সম্মেলনে আয়ুর্ব্বেদ সম্পর্কে বহুল আলোচনা হইয়াছিল এবং সে সকল বিষয়ে প্রস্তাব গৃহীত হইয়া প্রস্তাবগুলি যথাস্থানে প্রেরিত হইয়াছে। কবিরাজ শ্রীললিতমোহন মিশ্র ও কবিরাজ শ্রীসুনীতিভূষণ সেন অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক রূপে সকলপ্রকার প্রচেষ্টার দ্বারা সম্মেলনকে সাফল্য মণ্ডিত করিয়াছেন।

বঙ্গীয় বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মেলন—

গত ১৬ই জুলাই হইতে তিনদিন সন্ধ্যায় দক্ষিণ কলিকাতার ৭০বি রাসবিহারী এ্যাভিনিয়ুস্থ শ্রীচৈতন্য রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর উদ্যোগে বঙ্গীয় বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মেলনের পঞ্চ বিংশতি বার্ষিক অধিবেশন তথা রজত জয়ন্তী উৎসব হইয়া গিয়াছে। সম্মেলনে বাংলার ও কলিকাতার বহু বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক, পণ্ডিত ও ভক্ত এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বহু প্রতিনিধি যোগদান করিয়া সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত করেন।

সম্মেলনের মূল সভাপতি শ্রীচৈতন্য মঠের ত্রিদণ্ডী স্বামী ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ, উদ্বোধক ডঃ শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ, প্রধান অতিথি অধ্যক্ষ শ্রীজনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী, সম্মেলনে উপযুক্ত ভাষণ দান করেন। মঙ্গলাচরণ করেন ভক্তিবৈষ্ণব গোবিন্দ মহারাজ, কবিরাজ শ্রীবিমলানন্দ তর্কতীর্থ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে এক মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন। রজত-জয়ন্তী উৎসবের সভাপতি রূপে ডঃ শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা করেন।

দ্বিতীয় দিনে সাহিত্য শাখার সভাপতিরূপে প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, উদ্বোধক ডাঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য, প্রধান অতিথি প্রভুপাদ শ্রীপ্রাণকিশোর গোস্বামী, কাব্যশাখার সভাপতি ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, উদ্বোধক শ্রীনরেন্দ্র দেব, প্রধান অতিথি কবি শ্রীবীরেন মল্লিক, বিশেষ অতিথি শিল্পাচার্য্য শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

তৃতীয় দিবসে দর্শন শাখার সভাপতি ব্যারিষ্টার ডঃ শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস, উদ্বোধক ডঃ রমা চৌধুরী, প্রধান অতিথি অধ্যাপক শ্রীনারায়ণচন্দ্র গোস্বামী প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅসীমানন্দ সরস্বতী, শ্রীদিলীপ কুমার রায়, শ্রীহরিহর শেঠ, শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, প্রভৃতি কর্ত্তৃক প্রেরিত বাণী সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর সম্পাদক শ্রীরাধারমণ দাস কর্ত্তৃক পঠিত হয়। সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর সভার কার্য্য শেষ হয়।

আর্য্যশাস্ত্র প্রকাশ—

বাংলাদেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রবীণ পণ্ডিত ভাটপাড়া নিবাসী শ্রীনারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, সম্প্রতি একখানি পত্রে শ্রীশ্রীসীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ প্রকাশিত আর্য্য শাস্ত্র নামক শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্রের প্রকাশে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন ও ওঙ্কারনাথজীকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আর্য্যশাস্ত্র প্রকাশে শ্রীশ্রীসীতারামকে বার্ষিক অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করায় স্মৃতিতীর্থ মহাশয় সরকারকেও ধন্যবাদ জানাইয়াছেন। আর্য্যশাস্ত্রে সংহিতাগুলির মূল ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে এবং বাল্মিকী রামায়ণ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পর বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্‌ভাগবত, মহাভারত প্রভৃতি প্রকাশিত হইবে। পূর্ব্ব প্রকাশিত সকল পত্রিকা এখনও পাওয়া যায়। বার্ষিক মূল্য মাত্র ১৫৲ টাকা। ৩৮সি, বিধান সরণী কলিকাতা—৬ ঠিকানায় আর্য্যশাস্ত্র কার্য্যালয় অবস্থিত।

বাংলা-সাহিত্যে সর্বতোমুখী প্রতিভা

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

ইংরেজি Versatile genius কথাটির বাংলা করা হয়ঃ সর্বতোমুখী প্রতিভা। বাংলা সাহিত্যে এই সর্বতোমুখী প্রতিভা খুব কম সাহিত্য-শিল্পীর দেখা গেছে। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে যদি গান বা সুর-সংযোজনার উপযুক্ত কবিতাকেও ধরা হয়, তা হলে উপন্যাস, গল্প, নাটক, কবিতা, প্রবন্ধ ও গান রচনার উপযোগী প্রথম শ্রেণীর প্রতিভা এ-পর্যন্ত সব দেশের সাহিত্যেই খুব কম দেখা গিয়েছে। বাংলা সাহিত্যে মাত্র দু জন এমন সর্বতোমুখী প্রতিভাধরের সন্ধান পাওয়া যায়ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর দিলীপকুমার রায়। শুধু গান ক'রে গাইবার উপযুক্ত কবিতা রচনা করা নয়, স্বয়ং সেই কবিতায় সুর সংযোজনা করা এবং সুশ্রাব্য ক'রে গাইতে-পারা—সে-ক্ষমতাও রবীন্দ্রনাথ ও দিলীপকুমারের মধ্যেই দেখা যায়।

গানের কথা একেবারে বাদ দিলে আরও দুজন বাঙালী সাহিত্যশিল্পীর সন্ধান পাওয়া যায় যাঁরা উপন্যাস, গল্প, নাটক, কবিতা ও প্রবন্ধ রচনায় পটুতা দেখিয়েছেনঃ প্রমথনাথ বিশী ও বুদ্ধদেব বসু। কিন্তু প্রতিভার সর্বতো-মুখিতায় এরা পূর্বোক্ত দু জনের সমকক্ষ নন, সে বিষয়ে যে তর্কের কোন অবকাশ নেই তা সঙ্গীতজ্ঞ গীতরসিক ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করবেন।

রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কোন বিতর্ক রচনা করা বাতুলের প্রলাপ ব'লে গণ্য হবে। এ-প্রবন্ধে তেমন কোন অভিপ্রায় নেই। কিন্তু অন্তত সঙ্গীতে অর্থাৎ সুরসৃষ্টিতে ও গান গাওয়ায় দিলীপকুমারের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সংশয়ের অবসান স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ক'রে গেছেনঃ—

"সকলেই বলে আমার চেয়ে তোমার কণ্ঠস্বর ভালো। তা নিয়ে বৃথা অশ্রুপাত না ক'রে আমি ব'লে থাকি, মণ্টুর চেয়ে আমার হাতের অক্ষর অনেক ভালো। তোমার শক্তি এবং শিক্ষা নিয়ে তুমি যে বাংলা সঙ্গীতসৃষ্টির কাজে হাত দিয়েছ, এ একটি বড়ো কথা। অনেক দিন বাংলা গীতভারতী যথোচিত পূজা পান নি। তুমি তাঁর আনন্দ লোকে সুযোগ্য অধিনেতা। তোমার সুকণ্ঠে হিন্দী গৌড়ীয় এবং কীর্তন বাউলধারার ত্রিবেণীসঙ্গম হয়েছে। এর প্রভাবের কথা চিন্তা ক'রে আমার মন আনন্দিত! বাংলা গানের রূপসৃষ্টিতে তুমি নেমেছ এতে আমি আনন্দিত। এই ক্ষেত্রে তোমার দান অজস্র। তোমার গীতশ্রী পূর্বেই দেখেছি। সঙ্গীত সম্বন্ধে এ রকম বিস্তারিত আলোচনা বাংলা ভাষায় আর দেখি নি। তোমার যোগ্যতা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ নেই। ভারতীয় সঙ্গীতের সকল অঙ্গেই তোমার অধিকার আছে। সঙ্গীতশাস্ত্র-মহার্ণব যে এমন দুস্তর তরঙ্গসঙ্কুল তা জানতুম না। কিন্তু তুমি তোমার পালের জাহাজ ছুটিয়ে চলেছ অনায়াসে। দূরের থেকে বাহাদুরি দিই। কিন্তু চ'ড়ে বসব যে; তার পারানি দেবার সামর্থ্য নেই। এর থেকে একটা জিনিস আবিষ্কার করা গেল—আমার প্রভূত অজ্ঞতা। গৌড়ী স্বরকেতন উপাধি তোমাকে দেওয়া উচিত।" (দিলীপ-কুমারকে লেখা চিঠি থেকে।)

গানের সুর ও গাওয়া ছাড়া গানের কথার গুরুত্বও খুব বেশি। গানের কথা মানেই কবিতা। কবিতা মাত্রই গান না হলেও কথা-সংযুক্ত গান মাত্রই কবিতা। এই কবিতাংশে রবীন্দ্রনাথ দিলীপকুমারের চেয়ে বেশি কৃতী, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই! নিজে কবিতা লিখে তাতে সুর দিয়ে গেয়ে নাম করেছেন এমন একাধারে কবি-সুরকার গায়ক গুণী কৃতী কোন দেশেই বেশি পাওয়া যায় না। যেমন তেমন কবি-সুরকার-গায়ক একাধারে হলেই তো চলবে না, প্রত্যেকটিতে নিপুণ শিল্পী হওয়া চাই। তিনটিতেই উৎকৃষ্ট কৃতিত্বের অধিকারী এমন প্রথম

শ্রেণীর একাধারে কবি-সুরকার গায়ক শিল্পী বাংলা দেশে আধুনিক যুগে অর্থাৎ উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতে মাত্র ছ জন পাওয়া যায় :—

(১) রবীন্দ্রনাথ (২) দ্বিজেন্দ্রলাল (৩) রজনীকান্ত (৪) অতুলপ্রসাদ (৫) দিলীপকুমার ও (৬) নজরুল।

এঁদের মধ্যে শুধু গায়ক হিসেবে কেউ দিলীপকুমারের ধারে কাছে ঘেঁষবার যোগ্য ছিলেন না। বর্তমান প্রবন্ধ লেখকের রজনীকান্ত ছাড়া অন্য সকলের গান স্বকর্ণে শোনার সুযোগ হয়েছে। গায়করূপে দিলীপকুমারের শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর শত্রুমহলেও অবিসংবাদিতরূপে স্বীকৃত। সুরকাররূপে তিনি শ্রেষ্ঠ কিনা, এ নিয়ে মনীষীরা কেউ কেউ মতভেদ পোষণ করলেও তিনি যে একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুরশিল্পী এ-কথা সবাই মানেন। প্রবন্ধলেখকের ব্যক্তিগত গানের কবি হিসেবে ঐ ছজনের তুলনামূলক আলোচনা করলে রবীন্দ্রনাথকে প্রথম আর অতুল-প্রসাদকে ষষ্ঠ বললে আশা করি কেউ আপত্তি করবেন না। সুরকার হিসেবে অতুলপ্রসাদের স্থান খুব উঁচুতে হলেও কবি হিসেবে তাঁর ও নজরুলের গানের কাব্যে অমার্জনীয় ছন্দশৈথিল্য ও ভাষার আকস্মিক ভাবচ্যুতি যে রকম ঘন ঘন দেখা যায়, তাতে সাহিত্য-বিচারে অনায়াসে বলা যায় কাব্যগুণানুসারে এই ছ জন গীত রচয়িতার স্থানপর্যায় এইরকম :—

(১) রবীন্দ্রনাথ (২) দ্বিজেন্দ্রলাল (৩) দিলীপকুমার (৪) রজনীকান্ত (৫) নজরুল ও (৬) অতুলপ্রসাদ। গীতিকাররূপে রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের ঠিক পরেই দিলীপকুমারের স্থান।

সুরকারদের গুণানুক্রমিক তালিকা এই জন্যে দেওয়ার চেষ্টা করা হল না যে, আমাদের সুরকারপর্যায়গণনার বিশেষজ্ঞতার কোন নজির নেই। তবে এই ছ জনের বাংলা সুরজগতে নিঃসংশয় শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে মত ভেদের অবকাশ নেই। হিমাংশুকুমার, ভীষ্মদেব, তিমিরবরণ, রাইচাঁদ, পঙ্কজকুমার মল্লিক, শচীন্দ্র দেববর্মণ প্রভৃতির স্থান এঁদের পরে।

বাংলা সাহিত্যের ছ জন প্রথম শ্রেণীর সর্বতোমুখী প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পীদের মধ্যে গান বা গানের কথা রচনায় রবীন্দ্রনাথের পরে দিলীপকুমারের যে আসন তা অনেক পিছিয়ে-পড়া দ্বিতীয় স্থানাধিকারীর অগৌরবের আসন নয়। রবীন্দ্রনাথের গীতবিতানের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির পাশে দিলীপকুমারের শ্রেষ্ঠ গানগুলির ভাষাকে সসম্মানে স্থান দেওয়া যায়। ছন্দোমাধুর্যে ও ছন্দোবৈচিত্র্যে, ভাষার সৌন্দর্যপ্রিয়তায়, ভাবের মর্মস্পর্শী গভীরতায় আর সর্বোপরি রসের অনির্বচনীয় প্রগাঢ়তায় দিলীপকুমার রবীন্দ্রপরবর্তী যুগের শ্রেষ্ঠ গীতিকার।

গান বাদ দিয়ে কবিরূপে দিলীপকুমারের মূল্য অবধারণ করতে গেলে দেখা যায় যে, রামনিধি গুপ্ত ও বিহারিলাল চক্রবর্তীর সময় থেকে আজ পর্যন্ত যত বাঙালী কবি আবির্ভূত হয়েছেন তাঁদের মধ্যেও দিলীপকুমার বিশেষ উল্লেখযোগ্য কবি। আমরা রবীন্দ্রনাথ মধুসূদন দ্বিজেন্দ্রলাল, সত্যেন্দ্রনাথ করুণানিধান মোহিতলালের প্রয়াণের পর দিলীপকুমারের স্থান অসঙ্কোচে নির্দেশ করতে পারি। বর্তমান বাংলা কাব্যজগতে নিশিকান্ত, নীরদবরণ, রবি গুপ্ত প্রভৃতি অনেক কবিই তাঁর ধারার অনুবর্তী। জীবিত কবিদের মধ্যে কুমুদরঞ্জন, কালিদাস রায় আর দিলীপকুমার রায় শ্রেষ্ঠ তিন জন কবি কাব্যের সর্বাঙ্গীণ বিচারে। মৌলিক প্রতিভা ও তার নিটোল রসরূপের দিক দিয়ে দেখ্‌লে এখন দিলীপকুমারকে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠকবি বলা যায়। তাঁর অনুগামী কবিগোষ্ঠীও আছে।

প্রবন্ধকাররূপে দিলীপকুমারের উৎকর্ষ কম নয়। তীর্থঙ্কর, ভূস্বর্গচঞ্চল, ভ্রাম্যমাণ, আবার ভ্রাম্যমাণ, এদেশে-ওদেশে, দেশে দেশে চলি উড়ে প্রভৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পঞ্চভূত, বিচিত্র প্রবন্ধ, জাপান-যাত্রী, পারস্যে, চারিত্রপূজা প্রভৃতির তুলনা করলে দোষের হবে না নিশ্চয়ই।

ছোট গল্পে রবীন্দ্রনাথ দিলীপকুমারের অনেক ঊর্ধ্বে। দিলীপকুমার গল্প লিখেছেন খুব কম; তিনি যে চমৎকার গল্প লিখতে পারেন "বিবাগীর বিড়ম্বনা" তার একটি নিদর্শন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিরাট ও উৎকৃষ্ট গল্প-সাহিত্যের পাশে দিলীপকুমারের লেখা গল্পের পরিমাণ অকিঞ্চিৎকর। তার জন্যে এ ব্যাপারে দিলীপকুমারের অমনোযোগিতাই দায়ী।

নাটক অনেক লিখলেও রবীন্দ্রনাথ দৃশ্যকাব্য রচনায় বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নি। তাঁর রাজা ও রাণী, বিসর্জন, তপতী ও চিররকুমার সভা ছাড়া অন্য নাটকগুলির

রস পাঠে উপভোগ্য কিন্তু মঞ্চে অভিনয়ে ক্লান্তিকর। গীতিকাব্যের আধিক্যময় সংলাপ ও গানের অতিপ্রয়োগ তাঁর রক্তকরবী, মুক্তধারা, অরূপরতন, ডাকঘর প্রভৃতি নাটককে মঞ্চাভিনয়ের উপযোগী রাখে নি। দিলীপ-কুমারের আপদ, শাদা-কালো, ভিখারিণী রাজকন্যা, শ্রীচৈতন্য—এই চারটি নাটক আর জলাতঙ্ক প্রহসনটির বিশ্লেষণে মনে হয় যে, নাটক রচনায় তিনিও কতকটা রবীন্দ্রনাথের দোষে আক্রান্ত। ভিখারিণী রাজকন্যা ও শাদা-কালো মঞ্চাভিনয়ে বা চলচ্চিত্রে ভালো জম্‌লেও অন্যগুলি, পড়তে বেশ লাগলেও, মঞ্চাভিনয়ে সফল হবার সম্ভাবনা কম। আপদ নাটকে আবেগপ্রবণ মুহূর্ত ও আকস্মিক সংঘাত আছে; আধুনিক বুদ্ধিবাদী মন এর সংলাপবাহুল্যে ততটা ক্লান্তও বোধ করবে না। তবু এ-ধরণের নাটকে ক্রিয়ার স্থান অল্প, যা মঞ্চাভিনয়ের তত উপযুক্ত নয়। জলাতঙ্ক প্রহসনের বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ অত্যন্ত কৌতুকসরস, কিন্তু ঘটনাবৈচিত্র্যের অভাবে তার অভিনয় জমবার কথা নয়।

উপন্যাসের ক্ষেত্রে দেখে যায় দিলীপকুমারের লেখা উপন্যাসের সংখ্যা এ পর্যন্ত ১৮ টি। রবীন্দ্রনাথ লিখে গেছেন ১৪টি। কালানুক্রমিক ভাবে দেখলে বাংলা সাহিত্যের সপ্তম উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিক দিলীপকুমার। বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার, শরৎচন্দ্র ও বিভূতিভূষণের পর দিলীপকুমারের আবির্ভাব। বর্তমানে তিনিই শ্রেষ্ঠ বাঙালী ঔপন্যাসিক। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে, সংস্কৃতি-বিচারে দিলীপকুমারের উপন্যাস বাংলাসাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

মোট কথা, রচনার পরিমাণ ও উৎকর্ষ দু দিক দিয়ে বিচার করলে সর্বতোমুখী প্রতিভা হিসেবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একমাত্র দিলীপকুমারের তুলনা চলে। রবীন্দ্রপরবর্তী যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যপ্রতিভা যে দিলীপকুমারের, সে-বিষয়ে অনুসন্ধিৎসুর মনে কোন সন্দেহ থাকা অনুচিত। প্রশ্ন এই যে, আমরা দিলীপকুমারকে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা দিয়েছি কি না। প্রায় বাইশবছর আগে শারদীয়া সংখ্যা বাতায়ন পত্রিকায় বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয় দিলীপকুমারকে রবীন্দ্রোত্তর যুগের স্রষ্টারূপে অভিনন্দিত করেছিলেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় দিলীপকুমারের জয়ন্তী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে সে সৌভাগ্য বাঙালী সাহিত্যিকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও দিলীপকুমার মাত্র এই দু জন পেয়েছেন। তবুও বলতে হবে যে, বাঙালী জাতির দুর্ভাগ্যবশত দিলীপকুমার তাঁর প্রাপ্য সম্মানের পূর্ণ স্বীকৃতি এখনও পান নি। বাংলা সাহিত্যের প্রথম পাঁচ সাত জন কবি-গীতিকার ঔপন্যাসিক প্রবন্ধকারদের মধ্যে যিনি এককভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে মর্যাদার আসন অধিকার করতে পারেন, গায়ক সুরকার সঙ্গীতজ্ঞরূপে যাঁর আসন সর্বোচ্চে, নাট্যকার ও গল্পরচয়িতারূপেও যিনি উঁচুদরের শিল্পী, তাঁকে যুগনায়কের গৌরব অর্পণে বাঙালী সমালোচকেরা এখনও এত কুণ্ঠিত কেন? বর্তমান যুগে সাহিত্যে দলাদলি ও গোষ্ঠীবদ্ধতা এত বেশি যে, দিলীপকুমারের নিঃসংশয় শ্রেষ্ঠত্ব বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মতো বিঘোষিত হয় নি। কিন্তু ধূম্রজাল বিদূরিত ক'রে ইতিহাসের সূর্যকরোজ্জ্বল নির্মল মূর্তি যখন প্রকাশিত হবে, তখন দেখা যাবে যে, ১৮৬৫—৯৪ সাল যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ, ১৮৯৪—১৯৪১ সাল যেমন রবীন্দ্রনাথের যুগ, তেমনি ১৯৪১ সাল থেকে পরবর্তী কাল দিলীপকুমারের যুগ ব'লে পরিগণিত হওয়া উচিত ছিল। এ-যুগে সঙ্কীর্ণ দলীয় বুদ্ধিবশত আমরা যে মহত্ত্বকে তার প্রাপ্য আসন দিতে দেরি করছি, তার জন্যে ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না, ভাবী কাল আমাদের ধিক্কার দেবে। দিলীপকুমারের আন্তর্জাতিক খ্যাতিও আমাদের পশ্চাদ্বর্তিতা প্রমাণ করে। প্রায় পঞ্চাশখানি বাংলা বই ছাড়া ইংরেজিতেও তাঁর উৎকৃষ্ট মৌলিক রচনা অনেক আছে।

দিলীপকুমারের সর্বতোমুখী প্রতিভার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা একটি বিরাট্‌ গ্রন্থের বিষয়বস্তু। দিলীপকুমারের মনীষা, পাণ্ডিত্য ও সাংস্কৃতিক যোগ্যতা তুলনারহিত।

অম্লমধুর

বুদ্ধদেব গুহ

দৃশ্যটা দেখে আশেপাশের লোকজন সবাই চমকে উঠেছিল। দুই বন্ধু, যাদের সবাই হরিহর আত্মা বলে এতদিন জেনে এসেছে তারা কিনা এমনভাবে প্রকাশ্য রাস্তার উপরে মারমুখ। অদূরে রকের উপর পাড়ার বাচ্চাদের দল বসেছিল। বসে বসে গল্পগুজব করছিল। এদিকে দৃষ্টি পড়তে তারা কথা বন্ধ করে গুটি গুটি এগিয়ে এল, তাদের প্রণবদা আর অমলদার ঝগড়া মারপিট দেখতে।

তখন ঝগড়াটার শেষ পর্যায়। প্রণব সদর্পে উঁচু গলায় চেঁচাতে চেঁচাতে চলে যাচ্ছিল, আচ্ছা ঠিক আছে। তোমার শেল্ফের রবিনসনের একখানা বইও কি করে থাকে একবার দেখে নেবো।

অমলও আস্তিন গুটিয়ে হাতটা উঁচুতে তুলে তীক্ষ্ণ চীৎকার করে পাল্টা জবাব দিল, নিও দেখে। লাস্কির বই আটকে রাখো কতবড় হিম্মৎ তোমার আমিও দেখে নেবো।

খবরটা চারিদিক রাষ্ট্র হয়ে যেতে বেশী সময় লাগল না। প্রণব আর অমল রাস্তায় হাতাহাতি করেছে, তার সঙ্গে আরও রঙ চড়ল—অমলের মাথা ফেটে গেছে, প্রণবের কপাল ইত্যাদি ইত্যাদি। দুচারজন দু'বন্ধুর ঝগড়া মিটমাট করিয়ে দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু ফল হল না। দু'জন একত্র হলেই একে অন্যকে তুমুল গাল পাড়ে। অমল বলে তুমি আমার বই দিয়ে দাও। প্রণব বলে, আগে আমার বই ফেরৎ দাও তারপর।

সামনে অনার্স পরীক্ষা। দুজনেই পরীক্ষার্থী। শেষ পর্যন্ত কেউ কাউকে বই ফেরৎ দেয় না। কেউ কাউরো মুখ দেখে না, কথা বলে না পর্যন্ত।

প্রণব বন্ধুদের মারফৎ অমলকে ভয় দেখায়, সার্চ ওয়ারেণ্ট পাঠাচ্ছি। দেখি কেমন করে বই আটকে রাখে।

অমল বাজার থেকে কালি তুলবার কেমিক্যাল কিনে এনে নিঃসঙ্কোচে প্রণবের নাম মুছে ফেলে একে একে সবকটা বই থেকে।

পরীক্ষা হয়ে যায়। পরীক্ষার ফলও বেরোয়। দেখা যায় দু'জনেই কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করেছে। কিন্তু তবু দুই বন্ধুর মধ্যে মনোমালিন্য ঘোচে না।

দুজনেই বুক ফুলিয়ে রাস্তায় হাঁটাচলা করে। অমলকে শুনিয়ে কখন কখন প্রণব বন্ধুদের বলে, বই আটকে কী হল? পরীক্ষায় পাশ আটকাতে পারল?

সুযোগ পেলে অমরজন প্রণবের মনে ঈর্ষা জাগাতে ইন্ধন জোগায়: পাশ করার পরের দিনই একটা চাকরীর অফার পেলাম রে নাড়ু। সুরুতেই পাঁচশো টাকা প্লাস...।

বন্ধুদের মধ্যস্থতায় একদিন বই ফেরৎ-পর্ব শেষ হয়। প্রণব অমলের বইগুলো বন্ধুদের হাতে তুলে দেয়। অমলও প্রণবের বইগুলো বন্ধুদের জিম্মায় রাখে। বন্ধুরা বই খুলে অবাক হয়ে দেখে দু'বন্ধুরই বইয়ের প্রথম পাতা সাদা। কাউরো কোথাও কোনো নাম ঠিকানা নেই।

আবার একদিন বছর দুই পরে সবার চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল। সবাই দেখল দুই বন্ধু পাশাপাশি পথ দিয়ে প্রচণ্ড হাসতে হাসতে গল্প করতে করতে চলেছে। দুজনের অন্তরঙ্গতার বহর দেখে কে বলবে এই দুদিন আগেও এরা একে অন্যের মুখ দেখাদেখি করত না।

ভাব হয়ে যাওয়ার ঘটনাটাও রাষ্ট্র হয়ে যেতে সময় লাগল না। জানা গেল দুদিন আগে কলেজষ্ট্রীটের একটা বইয়ের দোকানেই দুজনের ঝগড়া মিটমাট হয়ে গেল পাক্কা। গত দুবছরের মধ্যে প্রণব এম-এ পাশ করেছে, এমন কি একটা অধ্যাপনাও জুটিয়েছে। অমল আর পড়াশুনা করে নি। সদাগরী অফিসের একটা মোটামুটি চাকরী

পেয়ে যাওয়ায় সেটাই গ্রহণ করেছে উচ্চশিক্ষার উচ্চাশা ছেড়ে দিয়ে।

অমলের কী একটা বই কেনার দরকার ছিল। কলেজ ষ্ট্রীটের দোকানে পয়সা বের করতে গিয়ে দেখা গেল সামান্য কিছু কম পড়ে যাচ্ছে। প্রণব একটু দূরেই বই ঘাটাঘাঁটি করছিল আর সঙ্গোপনে বন্ধুর দিকে কৌতুহলী দৃষ্টি বোলাচ্ছিল ঘনঘন।

বই কেনায় অধ্যাপকেরা নানান সুবিধা পেয়ে থাকে—কমিশন, দুষ্প্রাপ্য বইয়ের ব্যাপারেও। অমল মুখ কালো করে বেরিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে পিছন হতে কার যেন ডাক শুনল: নিয়ে যা বইটা।

অমল চমকে পিছন দিকে তাকাল, দেখল প্রণব ডাকছে। দু একবার ইতস্তত করে উঠে এল দোকানের ভিতরে, তারপর জিজ্ঞাসা করল, তার মানে?

—মানে আমি কমিশন পাই তো। নিয়ে যা।

—ওঃ! একগাল হেসে ফেলল অমল। তারপর যদিও সে খবরটা আগেই জানত, তবু বলল, তুই তো চারু কলেজেই আছিস না?

প্রণব মাথা নাড়ল।

এরপরই যেদিন দুই বন্ধুর রাস্তায় মোলাকাৎ হল কেউই কাউকে পাশ কাটিয়ে, মুখ ঘুরিয়ে যেতে পারল না। কথা বলতে হল। প্রথমে 'কি রে কেমন আছিস' দিয়ে সুরু তারপর ক্রমে ক্রমে সেই আগেকার মত গভীর অন্তরঙ্গতা। পাড়ার পাঁচজন ব্যাপারটা প্রথমে দেখে প্রচণ্ড বিস্মিত, পরে পরস্পর মুখ টেপাটেপি করে হাসল, এই মাত্র।

জুন মাস এগিয়ে এলে প্রণব সহাস্যে একদিন প্রস্তাব করল, চল অমল ক'দিন পুরীতে ঘুরে আসি। আফিসে বলে কয়ে দু-চারদিন ছুটি নিয়ে নে, আমার তো গ্রীষ্মের লম্বা ছুটি।

চক্রতীর্থ ছাড়িয়ে যেখানটা ভীড়ের চাপ একেবারে হাল্কা হয়ে গেছে, যেখানে একমাত্র চরম নির্জনতা প্রেমিক ছাড়া কাউকে আশা করা যায় না—সে জায়গাটায় ঝাউবনের পদপ্রান্তে, সমুদ্রকে সামনে রেখে দুই বন্ধু অনেকদিন পর পরস্পরের কাছে মনকে একেবারে আলগা করে দিল।

দুজনেই নিপ্রেম জীবনের ক্লান্তি আর বিড়ম্বনার অভি-যোগ তুলল। অমল এক সময় প্রেম করত। প্রণব তাই ক্ষীণ প্রতিবাদের ধুঁয়ো তুলে বলল, তুই তো তবু প্রেমের আস্বাদ লাভ করেছিস, আর আমি? আঠাশটা বসন্ত পার হয়ে গেল, মদনদেবের অক্ষয়তূণের একটি শরও আমার পিছনে খরচা হল না।

অমল দুষ্টু হাসল। বলল, কেন রে তোদের কলেজে কোন তরুণী অধ্যাপিকা-টিকা নেই?

প্রণব বলল, আছে। ম্যাথমেটিক্‌সের। যখনই সময় পান হয় রাশী রাশী খাতা দেখেন নতুবা ট্রিগোনোমেট্রির দুরূহ দুরূহ প্রবলেম্ সল্‌ভ্ করতে দম ধরে বসে থাকেন তা দেওয়া হাঁসীর মত।

প্রণব আর অমল এক সঙ্গে হেসে উঠল। অদূরে একটা বিস্ফোরিত ঢেউয়ের ফেনা চঞ্চল হয়ে লুটিয়ে পড়ে দুই বন্ধুর পায়ের নীচে।

এক সময় অন্ধকার ঘন হ'য়ে নেমে এলে দুই বন্ধু উঠে পড়ে। নরম ভেজা বালিতে হাঁটতে হাঁটতে অমল একটা কবিতা আবৃত্তি করতে সুরু করে

অন্ধকারের অন্তর হতে আনন্দরোল ইতস্তত
ক্রমে ফুলে ওঠে, ফুলে ফেটে যায় ঢেউয়ের মুখের
ফেনার মত···

সমুদ্র সৈকতে অবসর যাপনের পরমায়ু ফুরিয়ে গেলেই কলকাতার কর্ম-ব্যস্ততায় নিমগ্ন হয়ে যেতে হয় যথারীতি জীবন ধারণের স্বাভাবিক প্রয়োজনে। প্রণব নোট লেখায় ডুবে যায় আর অমল চাকরীর ঘানি ঘোরাতে ছোটে দশটা পাঁচটা। দু বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ বড় কম। পথেই এক-আধ দিন দেখা হয় আর তখন 'কেমন আছিস' 'ভালো আছি' এরকম প্রশ্নোত্তরের বেশী বাক্যব্যয় করার সময় থাকে না হাতে। তবে দু বন্ধুই মনে মনে পারস্পরিক অন্তরঙ্গতা গভীর ভাবে অনুভব করে সন্দেহ নেই।

মাস দুয়েক কেটে গেছে। হঠাৎ সেদিন ভোরবেলা প্রণব অমলের বাড়িতে হাজির।

কীরে, কী ব্যাপার? কৌতুহলী প্রশ্ন করল অমল।

আছে, আছে, ব্যাপার আছে। জামাটা গায়ে চড়িয়ে বেরো, বলছি।

পথে বেরিয়ে অনতিবিলম্বে কথাটা ভাঙল প্রণব। তার

চোখে-মুখে লজ্জার ছোঁয়া, অথবা ভোরের সূর্যের রক্তিম স্পর্শ!

বিয়ে করছি। আগামী একত্রিশে দিন ঠিক হয়েছে।

মুহূর্ত কয়েক কি বলবে অমল স্থির করতে পারল না। আকস্মিক খবরটায় এতদূর বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল সে। বিস্ময়ের ঘোরটা কাটলে দীপ্ত আনন্দে প্রবলভাবে প্রণবের হাতটা ঝাঁকিয়ে বলল, কংগ্র্যাচুলেশনস্!

যাচ্ছিস তো। একত্রিশে, পয়লা দুদিনই যাবি। বন্ধুদের চিঠিপত্র দিচ্ছি না কাউকে। প্রণব সংবাদ জ্ঞাপন শেষ করল।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আছে। বন্ধুদের আবার চিঠিপত্রের কি প্রয়োজন। একটু থেমে বলল, তবে কি জানিস একত্রিশে আমি যেতে পারছিনা, বহরমপুর যাচ্ছি ইন্স্পেকশনে। পয়লা ফিরছি। পয়লা নিশ্চয় যাবো।

প্রণব একটু মনঃক্ষুণ্ণ হল। তবু উপায় কি, চাকরীর প্রয়োজনে যখন, তখন তো যেতেই হবে।

বউভাতে অস্বাভাবিক ভিড় হয়েছিল। পাড়ার প্রায় সবাইকেই নিমন্ত্রণ করতে হয়েছিল, কারণ পাড়ার সবার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র প্রণব। তার উপর অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন।

অমল বিয়ে বাড়িতে পা দিতেই মনে হল তার কানের পর্দা বুঝি ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। কী ভয়ংকর হৈ চৈ, গণ্ডগোল! তার উপর একটা মাইক অবিরাম বেজে চলেছে মেরাপ ঘেরা ছাদের এক কোণে। সব হৈ চৈ ছাপিয়ে তার আওয়াজ অমলকে মাঝেমাঝে চমকে দিচ্ছিল।

সেই হৈ চৈএর মধ্যে যাকেই ডাকে অমল কেউ শুনতে পায় না। প্রণবকে একবার দোতালার বারান্দায় অস্পষ্ট দেখা গেল, কিন্তু হাতছানি দিয়ে ডাকবার আগেই সেই অস্পষ্ট মূর্তি অদৃশ্য হ'ল। তারপর একজনকে অনেক বলে কয়ে প্রণবকে ডাকতে পাঠাল।

প্রণব এসে উচ্ছ্বাসভরে দুঃখ প্রকাশ করল। বলল, ছি, ছি, তুই কতক্ষণ এসেছিস্, অথচ আমি দোতালা থেকে নামতেই পারছিলাম না। কিছু মনে করিস নি তো? কাজ করবার লোকজন একেবারে নেই। এদিকে আবার দোতালায় কয়েকটা লাইটের এক্সট্রা পয়েণ্ট লাগাতে হবে। তদারক করছিলাম।

অমলকে হাত ধরে হিড়হিড় করে ভিতরদিককার একটা বসবার ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে সবাই প্রণবের সহকর্মী অধ্যাপকের দল। কয়েকজনের সংগে আলাপ করিয়ে দিল। তারপর পিঠ চাপড়ে কানে কানে বলল, তুই এঁদের সাথে গল্প কর, আমি একটু কাজটা দেখে আসি।

কার সাথে কি কথা বলবে? কথা শোনাই যায় না গোলমালের চোটে।

প্রণব বেরুবার উদ্যোগ করতেই অমলের মনে পড়ে গেল জরুরী প্রয়োজনটার কথা। চিঠি দিয়ে নিমন্ত্রণ করেনি প্রণব বন্ধুদের। তাই নববধূর নাম জানতে পারেনি অমল। প্রণবকে কানে কানে জিজ্ঞেস করল কিঞ্চিৎ কৌতুকের সংগে, তোর বৌএর নাম কী রে?

প্রণব ফিসফিসিয়ে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। দোতালার উদ্দেশে।

অমল উপহার স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের গোরা আর সঞ্চয়িতা এনেছিল। পকেট থেকে কলম বের করে—সুন্দর করে নববধূর নাম লিখল সে বইয়ের প্রথম পাতায়—বন্ধুপত্নী রুমাদেবীকে প্রীতি উপহার।

খেতে যাওয়ার আগে প্রীতি উপহার নববধূর হাতে তুলে দেবার জন্য পা বাড়াল নির্দিষ্ট ঘরের দিকে। প্রণব সকৌতূহলে বই দুটো একবার হাতে তুলে নিল, পাতা উলটে নাড়াচাড়া করল। তারপর হেসে জিজ্ঞেস করল আমার কোনটা? কবিতা না উপন্যাস?

অমল বলল, উপন্যাস। কবিতা তো খাটের উপরে রক্ত মাংসের শরীর ধারণ করে বসে আছে।

প্রণব ঠাট্টা করল, আচ্ছা?—মনে ধরেছে নাকি রে?

ধ্যেৎ, কি যা তা বলছিস।

কিন্তু ঘরে ঢুকবার আগেই দোরগোড়ায় হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল প্রণব।

এ কী করেছিস? আমার বউএর কী নাম লিখেছিস? প্রণব সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল।

—কেন?

—রুমা নয়—উমা, উমা।

—এ্যাঁ। আঁতকে উঠল অমল। উমা নাকি আমি তো শুনলাম রুমা। এঃ হে। কি করি এখন?

—প্রণবও মাথা চুলকালো।

মেয়েদের মধ্যে কে যেন শুনতে পেয়েছিল কথাটা। নববধূর পিছনে সমবেত মেয়েদের ভিড়ে তারই স্পষ্ট প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেল। সবাই তখন মুখ টেপাটেপি করে হাসছে।

প্রণবের ছোট বোন করুণা বিয়ের উপহারের হিসেব রাখছিল। সে আস্তে আস্তে উঠে এল। ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে হঠাৎ বলল, দাঁড়াও কোন ভয় নেই।

মনে হল যেন ও একটা উপায় উদ্ভাবন করতে পেরেছে।

প্রণব আর অমল ঘরের বাইরে একটু নির্জন জায়গায় সরে দাঁড়িয়েছিল ততক্ষণে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছিল, ভাবছিল করুণা আবার কি উপায় আবিষ্কার করবে?

কিছুক্ষণ পরেই করুণা এলো। দুজনে একসঙ্গে ঝুঁকে পড়ল করুণার উপর।

কি রে? কি করবি তুই? উদ্‌গ্রীব কণ্ঠে প্রশ্ন করল প্রণব।

এই নাও। বলে হাত বাড়িয়ে দিল করুণা। তার হাতের মুঠোর মধ্যে ছোট্ট একটা রাবারের ছিপি আঁটা শিশি।

এটা দিয়ে মুছে ফেল নামটা। খুব চাপা গলায় অভয় জানাল করুণা।

এক নিমেষে প্রণবের মুখটা বেগুনে—কালো—হয়ে গেল, কান দুটো ষ্টোভের বার্ণারের মত গনগনে লাল।

এই কেমিক্যাল দিয়েই অমলের নামগুলো ওর অনার্সের বইগুলো থেকে একে একে তুলে ফেলেছিল একদিন, নির্ভুল স্পষ্টভাবে মনে পড়ল প্রণবের। মনে পড়ল বই নিয়ে তুমুল মনোমালিন্যের দিনগুলো একের পর এক।

অমল চোখ বড় বড় করে সম্বিৎ হারিয়ে তাকিয়ে ছিল শিশিটার দিকে। আপাতত এটাই তাকে এক ভয়াবহ লজ্জার হাত থেকে বাঁচাবে।

পত্র

রমা দেবী, কাব্যতীর্থ

বহুদিন হ'য়ে গেছে গত
পেয়েছি সে মমতা ও প্রীতি রসে মাখা
তোমার সোনার লিপি, মেলিয়াছে পাখা
মন মোর হ'য়েছে উধাও, ভাবিয়াছি যত—
ভাষা মোর পায় নাই পথ।
সে লিপির রঙে আজ রাঙিল আকাশ
সে লিপির রঙে হোলো সজল বাতাস
লজ্মিতে চাহিল সে অরণ্য পর্ব্বত।
মন মাঝে জজ্বর বন্ধনে—
হেমন্ত প্রভাতে যেন শিশিরের কণা
ব্যাকুল হইয়া চাহে উদাসী বিমনা
কম্পিত আকুল তৃণে।

নভ মাঝে হেরি—
পুঞ্জ পুঞ্জ শুভ্র মেঘ রাশি,
বাঁকায়ে ধবল গ্রীবা উঠিছে উচ্ছ্বাসি,
তব গোপন বাণীটি স্মরি।
সন্ধ্যা রশ্মি রেখা—
অরুণ আকাশে আর বকুলে মুকুলে
কুয়াসার ঘন জালে নীল গুচ্ছ ফুলে
ঝিকিমিকি জোনাকীর লেখা—
পূর্ণ করে দিগন্ত অঙ্গন
বুঝি তুমি সাথে আছ সাথে আছে আর,
স্নেহ মাথা বাণী তব মমতা উদার
অপূর্ব্ব পুলকে ভরে মন।

ওয়ার্ডস্বার্থের কাব্যসিদ্ধান্ত ও রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা

আশিসপ্রসূন মাইতি

ওয়ার্ডস্বার্থের কাব্যবিচারে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "কাব্যের বিষয় ভাবা ও রূপ সম্বন্ধে ওয়ার্ডস্বার্থের বাঁধামত ছিল, কিন্তু সেই বাঁধামতের মানুষটি কবি নন ; যেখানে সেই সমস্ত মতকে বেমালুম পেরিয়ে গেছেন, সেইখানেই তিনি কবি। মানবজীবনের সহজ সুখদুঃখে প্রকৃতির সহজ সৌন্দর্যে আনন্দই সাধারণত ওয়ার্ডস্বার্থের কাব্যের অবলম্বন বলা যেতে পারে।" (সাহিত্যের পথে)।

সাহিত্য ক্ষেত্রে যখন কোনো কবিগোষ্ঠী আগের কালের কাব্যকলার প্রতিক্রিয়ায় আবির্ভূত হন, তখন তাঁদের কাব্যের বিষয়বস্তু দৃষ্টিভঙ্গী এবং রীতি-এ তিনদিকেই বিশেষ মনোযোগ দিতে হয়। কাব্যের রীতি অনেকখানিই নির্ভর করে ভাব প্রকাশের ভাষার ওপর, কেননা ভাষাই হচ্ছে কবির উপজীব্য ভাবের আধার। আঠারোর শতকের প্রথমার্ধে ইংরেজী সাহিত্যে পোপ ড্রাই ডেনের ভাষা ছিল ঝকমকে পালিশ করা—অর্থাৎ ভঙ্গীসবস্ব, ছন্দও ছিল 'কাটাকোটা ছাঁটাছোঁটা জোড়া দেওয়া দ্বিপদীর গাথনি'। বুদ্ধিবাদী কৃত্রিম নাগরিক ধর্মের স্বভাবই এমনযে কাঠামোর অতিসচেতন সৌষ্ঠব যেখানে সুপ্রকট হৃদয়ের উষ্ণ উত্তাপ সেখানে অনুপস্থিত। নিপুণ পরিশীলিত ভাষা এবং তীক্ষ্ণ-বুদ্ধির হীরকদ্যুতি দুইই ছিল সে-কাব্যে, কিন্তু কাব্যের অন্তর্নিহিত যে শক্তি হৃদয়কে 'অকূল শান্তি' আর 'বিপুল বিরতি' দান করে, সেই অমৃতময় রস-প্রবাহের ছিল একান্ত অভাব। ক্লাসিকেল কাব্যধারার এই ভাষার পারিপাট্য, শব্দচাতুর্য এবং হৃদয়োত্তাপহীন প্রকাশরীতি রোমান্টিক ভাব-আন্দোলনের দুই পুরোধা ওয়ার্ডস্বার্থ এবং কোলরিজের মনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যের ভাষারীতির আমূল সংস্কার করতে চাইলেন তাঁরা মুখ্যত মানবমুখী অথচ হৃদয়বৃত্তিপ্রধান কাব্যাদর্শের দিকে চোখ রেখে। তাঁদের এই যুগ্মপ্রচেষ্টার ফল ১৭৯৮ সালে প্রকাশিত "Lyrical ballads"। এই গ্রন্থের পরিকল্পনায় স্থির হয়, তাঁরা এমন বস্তু ও ভাষায় কাব্য রচনা করবেন যা হাটেবাটেমাঠে সর্বত্র দেখতে ও শুনতে পাওয়া যায় ; কিন্তু তাতে থাকবে কল্পনার ইন্দ্রধনুচ্ছটা, যাতে করে অপরিচিতের স্বাদে চিত্ত অভিভূত হয়।

কবিতাকে গোষ্ঠী প্রভাবমুক্ত করে বৃহত্তর জনসাধারণের সরল অকৃত্রিম মানস-গঠনের উপযোগী করে তোলা ছিল ওয়ার্ডস্বার্থের উদ্দেশ্য। তাই বলে কবিকল্পনার স্বেচ্ছা-বিহারকে তিনি কখনোই বন্দী করতে চাননি। এজন্যে কাব্যের ভাষারীতি সম্পর্কে তাঁর আদর্শ কিছুটা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছিল বলে মনে হয় ; "lyrical ballads"-এর ভূমিকায় তা স্পষ্ট। উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় তিনি বলছেন, তাঁর কবিতার ভাষা হবে "a selection of the language really used by men." যা হবে প্রধানত "in humble and rustic life" এবং at the same time to throw over a certain colouring of imagination"। এই শেষোক্ত প্রকাশ-গত দৃষ্টিভঙ্গীটি মূলত তাঁর নিজস্ব নিসর্গচেতনা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। গ্রাম্য পরিবেশ ও প্রকৃতির সঙ্গে প্রাত্যহিক যোগাযোগের মধ্যে থেকে কৃষকদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা এবং সহজ মনের স্বতোৎসারিত অমার্জিত অথচ অকৃত্রিম ভাষার সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। অপরপক্ষে, তাঁর মৌলিক লোকোত্তর কল্পনাশক্তি, যা সাধারণ মানুষসম্পর্কিত তুচ্ছ অভিজ্ঞতাকে ও অলৌকিক রহস্যমহিমা দান করতো, তার দার্শনিক মনন শক্তি যা চোখে দেখার নগণ্য জগৎকে গূঢ় তত্ত্বগত মহিমা দান করতো, তাঁকে ক্রমশ উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল কৃষক সাধারণের ব্যবহৃত প্রাত্যহিক গদ্যভাষাকে পরিশোধিত করে তাকে অসীমের ভাবব্যঞ্জনার প্রলেপ দান করতে।

কাব্যভাষা প্রসঙ্গে ওয়ার্ড স্বার্থের দ্বিতীয় বক্তব্য, "there neither is nor can be any essential differenee between the language of prose and verse"। এ মতটি বিশেষভাবে বিগত যুগে প্রচলিত artificial diction"-এর প্রতিবাদ সৃষ্টি করেছে, এক্ষেত্রে তাঁর অতীন্দ্রিয় ভাবচেতনা বিশেষ সক্রিয় নয়। কাব্যের ভাষার ছন্দের উপযোগিতা সম্পর্কেও তিনি বলেছেন "Metre is adventitious" ছন্দটা কাব্যের বহিরঙ্গেরই শোভা বর্ধন করে, অন্তঃপ্রকৃতির পক্ষে সেটা গৌণ অর্থাৎ না হলেও চলে। আর অলঙ্কার, বিশেষ করে ছদ্মক্লাসিক কাব্যে বহুল ব্যবহৃত ব্যক্তিত্বআরোপ (Personification) এবং বিপরীতকথন (inversion) তাঁর বিচারে অচল। তাঁর মতে, বাইরের আকৃতির সাড়ম্বর শোভা অন্তরের দীনতাকেই প্রমাণিত করে , ভঙ্গীর চমৎকৃতি ছাড়াও শ্রেষ্ঠ কাব্যের অস্তিত্ব সম্ভব। ম্যাথু আর্ণল্ডের মতো তাঁরও মত হচ্ছে, "great poetry may be written in a manner of noble planeness, with the bare sheer penetrating power of nature herself, yet be perfectly distinct from prose." (Herford)।

ওয়ার্ডস্বার্থের নিজস্ব কাব্যসৃষ্টির দিকে তাকালে দেখা যায়, ভাষাপ্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি প্রায়শই তাঁর সিদ্ধান্ত-গুলিকে মেনে চলতে পারেন নি। তার কারণ, এই সব যুগান্তকারী মত প্রকাশে সব সময় তাঁর মৌলিক রোম্যান্টিক কবি ধর্মের অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল না। তাঁর স্বকীয় জীবনদৃষ্টি ও মানস রুচিবিরোধী এক কৃত্রিম কাব্যধারার প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে এবং এক বিরাট কাব্য আন্দোলনের প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়েই তিনি কিছুটা সাময়িক ভাবা-বেগের বশবর্তী হয়েছিলেন, যুক্তি ও চিন্তার সাহায্যে নিজের উচ্চারিত মতগুলিকে পুনর্বিচার করে দেখেন নি। রচনাক্ষেত্রে তাই উক্ত মতগুলিকে মেনে চলতে গিয়ে কবিসত্তা প্রায়ই দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, ফলে স্রষ্টার স্বতোৎসারিত কামনা অনুপম সৃষ্টির ফুলে ফুলে সার্থক হয়ে ওঠেনি। ওয়ার্ডস্বার্থের কাব্যজীবনের অনেকটা অংশই এই স্রষ্টা ও সংস্কারকের দ্বন্দ্বে আকীর্ণ। কবিপ্রতিভার এই আংশিক ব্যর্থতার কারণ হল, প্রথমত, গ্রাম্য-জীবনের ভাষাকে কাব্যে প্রয়োগ করবার পক্ষ সমর্থন করলেও সে-ভাষা যে-সব ক্ষেত্রে কাব্যগুণের উপযুক্ত, সেগুলির দিকে তিনি তেমন মনোযোগ দেন নি। গ্রাম্য লোক-গাথা, ছড়া এবং নানাবিধ লৌকিক প্রবাদ ও বাগ্‌বিধি তিনি আয়ত্ত করেন নি যার ফলে 'অখ্যাত জনের' 'নির্বাক মনে'র অন্তরনিঃসৃত ভাষাকে তিনি অমর কাব্যরূপের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে পারেন নি। কবি এলিয়টের (Ebenezer Elliot) মতো করুণরসের (pathos) চিত্র তিনি এঁকেছেন, কিন্তু তার মধ্যে সাধারণ গ্রাম্য মানুষের অন্তরের আকাঙ্ক্ষার জোর ফোটাতে পারেন নি। বস্তুত, লোকজীবনের ভাষাকে তিনি কেবলমাত্র আগের কালের কবিদের কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত, শুধু সরল অকপট মনের অভিব্যক্তি একটা "negative ideal of speech" রূপেই দেখে-ছিলেন। সেজন্য তাঁর কাব্যে যেখানে তিনি গ্রাম্য ভাষাকে ভাবপ্রকাশের বাহন করেছেন, সেখানে তাঁর বর্ণনা নীরস এবং জড়তাযুক্ত হয়ে পড়েছে। দ্বিতীয়ত, যদিও তিনি সচেতন চিন্তার জগতে ছন্দ ও অলঙ্করণ প্রচেষ্টা বর্জন করতে চেয়েছিলেন, তথাপি তাঁর কাব্যের যত্রতত্র এই জাতীয় কারুকৃতি উচ্চমার্গের কাব্যসাধনার পরিচয় বহন করে। "A homeless sound of joy was in the sky," "a nun breathless with adoration" প্রভৃতি অনেক বর্ণনা তাঁর সেই বহু আয়াস লব্ধ রসসিদ্ধ দুর্লভ কবিত্বের সাক্ষ্য দেয়।

ওয়ার্ডস্বার্থের সমগ্র কাব্যরচনায় তিনটি সুস্পষ্ট স্তর লক্ষ্য করা যায়। প্রাথমিক স্তরে তাঁর কবিতার ভাব অগভীর এবং ভাষা জড়তাযুক্ত (যেমন The Idiot Boy কবিতা)। মধ্যপর্যায়ে তাঁর কবিতা তাঁর মনগড়া সিদ্ধান্তের কবল থেকে মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ হতে পেরেছে, ভাষাও কল্পনার আলিম্পন (Colouring of imagination) লাভ করে গভীর ভাবদ্যোতনার উপযোগী হয়েছে। তাঁর সর্বোচ্চস্তরের কাব্যরচনায়, তিনি আর কোন একটি বাঁধাধরা মতের অনুসারী নন, যথার্থ রূপস্রষ্টা শিল্পী। এই স্তরের কবিতায় তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত ভাব স্বচ্ছ, অনাড়ম্বর অথচ ব্যঞ্জনাধর্মী ভাষায় সঙ্গে সাযুজ্য লাভ করে দুরবগাহ কল্পনার জগতে অনবদ্য রসমূর্তি লাভ করেছে। এখানে

কবিতা তাঁর সিদ্ধান্তের বেড়ি পায়ে পরতে নারাজ, মুক্তরূপা সৃজনী কল্পনার রাজ্যে তার সঞ্চরণ সহজ হয়ে উঠেছে। এখানে তাঁর পরিকল্পিত সিদ্ধান্তের সূত্রগুলিই যেন কাব্যকে অনুসরণ করে গড়ে উঠেছে। তাঁর অমর শিশুকাব্য "Lucy" অথবা "The prelude"-এর নিরাভরণ অথচ সরস সহজ ভাষা তাঁর ধ্যানলোকবিহারের এবং ইন্দ্রিয়লব্ধ জগতের পটপ্রেক্ষায় অতীন্দ্রিয় রসোপলব্ধির আধাররূপে যথার্থ "ধ্বনি"-কাব্য সৃষ্টি করেছে। নির্জন এক সন্ধ্যারবর্ণনা—

> "It is a beauteous evening calm and free
> The holy time is quiet as a nun
> Breathless with adoration, the broad sun
> Is sinking down in its tranquility"
>
> ("The prelude")

অথবা, ঝড়ের রাতে নিঃসঙ্গ বালিকা Lucy-র হারিয়ে যাওয়ার দৃশ্য যা আমাদের অনুভূতির রাজ্যে এক গভীর মর্মস্পর্শী চিত্রকে অক্ষয় করে রাখে—

> "The storm came on before its time
> She wandered up and down,
> And many a hill did Lucy climb,
> But never reached the town."

আবার নির্জন উপত্যকার পাদমূলে নিঃসঙ্গ এক কৃষক-কন্যার শস্যচয়নের দৃশ্য সেও যেমনি সংকেতধর্মী, তেমনি ভাবগম্ভীর, (The solitary Reaper)। কিশোরীর উদাসকরা সঙ্গীতের মূর্ছনার মধ্যে কবি যথার্থ রোম্যান্টিক মনের অতীতচারণার প্রেরণা-উৎস খুঁজে পেয়েছেন,—

> "Perhaps the plaintive numbers flow
> For old, unhappy, far-off things,
> And battles long ago "

নিরলংকারধ্বনির সংকেতধর্মিতা যে সাড়ম্বর অলংকরণের চেয়েও সার্থক হতে পারে, তার প্রমাণ তিনি দিয়েছেন এই কবিতায়—

> "A voice so thrilling ne'er was heard
> In spring-time from the cuckoo-bird,
> Breakig the silence of the seas
> Among the farthest Hebrides."

ওয়ার্ডস্বার্থের কাব্যসিদ্ধান্তের আলোকে রবীন্দ্রনাথের গদ্য কাব্যের বিচার করতে গেলে দু'জনের মধ্যেকার উদ্দেশ্যগত মৌলিক প্রভেদটুকু মনে রাখতে হবে। রবীন্দ্র-নাথ চেয়েছেন "গদ্যকে কাব্যের প্রবর্তনায় শিল্পিত" করে তুলতে, আর ওয়ার্ডস্বার্থ চেয়েছিলেন পদ্যকে গদ্যের প্রাত্যহিক ব্যবহারের সীমাভুক্ত করতে। একজন চেয়েছেন গদ্যের অন্তর্নিহিত গতি ও ছন্দকে কাব্যরসের ক্ষেত্রে অবাধ মুক্তি দিতে, অপরজন চেয়েছিলেন কাব্যের অঙ্গীভূত ব্যঞ্জনাশক্তিকে গদ্যের সহজ প্রত্যক্ষ ভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে। ছন্দ এবং প্রকাশভঙ্গির ক্ষেত্রে উভয়ে প্রায় একমত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গদ্য কাব্যের ভাষায় ও প্রকাশরীতিতে 'সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠন-প্রথা' মেনে চলতে রাজী নন। আমাদের মৌখিক গদ্যভাষার চলন নটীর সুরে-তালে-বাঁধা নাচের মতো না হলেও তার গতি স্বচ্ছন্দ ও অনায়াসলব্ধ, সে-ভাষা সুষম যতি (pause) সমন্বিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং বাহুল্যবর্জিত। এক-কথায় প্রসাদগুণমণ্ডিত হলে যে কাব্যগুণের উপযুক্ত হতে পারে, এই ছিল তাঁর মত। তাই তাঁর শেষ বয়সের রচনা—গদ্য কাব্যগুলিতে তিনি ভাষাসজ্জা ও অলঙ্করণের আড়ম্বর যথাসম্ভব বর্জন করবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাঁর বাক্যগঠনের মধ্যে একটা অনতিলক্ষ্য ধ্বনি-স্পন্দন অনুভব করা যায়। আর ওয়ার্ডস্বার্থের কাব্যেও তাই; সেখানে পদ্য-ছন্দ ও ভাষারীতির ছলাকলা নেই বললেই চলে, আছে তাঁর নির্জনতার স্মৃতিসঞ্চয় ('recollection in tranquility') সহজ উপমা ও প্রসঙ্গযুক্ত গভীর ভাবোদ্দীপক বর্ণনা, আর কবিতার অন্তঃমিলটুকু তিনি মেনে চলেছেন। কাব্যের ভাষামার্গে লক্ষ্য করি, উভয় কবিই একেবারে গ্রাম্য মানুষের মুখের ভাষা না হলেও সাধারণ মানুষের ব্যবহারিক জীবনের উপযোগী চলতি ভাষাকে অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হয়েছেন, তবে সে ভাষা সব সময় সাধারণ মনের ভাব ও ভাবনার সীমাকে মেনে চলেনি। যেখানে সে-ভাষা দূরপ্রসারী কল্পনার অপরূপ বর্ণপ্রলেপের ('a certain colouring of imagination') সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অথবা কবির দার্শনিক চিন্তা বা মননের বাহন হয়েছে, সেখানেই তা সাধারণের বোধ ও বুদ্ধির রাজ্য উত্তীর্ণ হয়ে এক সুউচ্চ ভাবপরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছে।

বলা যায়, উভয় কবিরই এই সুগম কাব্যরচনার প্রচেষ্টা সীমিত হয়েছে তাঁদের গীতিকবিসুলভ স্বভাবসিদ্ধ মন্ময়তার (subjectivity) জন্য। রোম্যান্টিক গীতিকবি হিসেবে দু'জনেই কল্প-প্রবণতার অবাধ অসাধারণ বিকাশকে ("extraordinary developmeut of imaginative sensibility"—Hetford) কবিসত্তার আত্মিকবৈশিষ্ট্য বলে স্বীকার করেছেন। পরন্তু তাদের এই কাব্য সাধনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল যুগোচিত ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ (individualism)। ফলে, তাঁদের কাব্যের ভাষায়, বাগ্‌ভঙ্গিতে, ভাবে-ভাবনায়, কল্পনায় মননে এমন একটা স্বকীয়ত্ব বা ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্য সপ্রকাশ হয়ে উঠেছিল যে সত্যকার গণসাহিত্যের স্বাদু মর্তজীবনোপলব্ধিকে তাঁরা অকৃত্রিম অনাড়ম্বর রসরূপ দিতে পারেননি, যা স্বরূপে বর্তমান থেকে জনমনের রসতৃষ্ণা মেটাতে সক্ষম হয়। তাঁদের কাব্য-জগতে যে-সব যুক্তি ও উপমা, যে চিত্র ও সঙ্গীত ধরা দিয়েছে তা তাঁদের গাঢ় ধ্যানতন্ময় ভাবদৃষ্টিজাত বলে গণমানসের রুক্ষ বিচরণক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে। তাঁদের কাব্যের রূপ ও রীতি—উভয় ক্ষেত্রেই তা স্পষ্ট।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গদ্যকাব্যের পরিকল্পনায় ওয়ার্ডস্বার্থের মতোই লোকজীবনাশ্রয়ী কাব্যধারার কথা চিন্তা করেছিলেন ঠিকই। নতুন আঙ্গিকের সমর্থনে তিনি সেই সময় ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে একপত্রে লিখেছিলেন, "নাচের আসরের বাইরে আছে এই উঁচু নীচু বিচিত্র জগৎ রূঢ় অথচ মনোহর, সেখানে জোর চলাটাই মানায় ভালো—কখনো ঘাসের উপর কখনো কাঁকরের উপর দিয়ে।" ওয়ার্ডস্বার্থের মতো তিনিও স্বীকার করেছেন কাব্যরসের প্রকাশের জন্য পদ্যছন্দটা একেবারেই অনিবার্য নয়। কেননা, সুললিত অলঙ্কৃত ছন্দই কাব্যের মূল শক্তি নয়; কাব্যের আসল দেহবস্তু রস, সে রস গদ্যভাষার উচ্চাবচ পদক্ষেপের মধ্যেও সঞ্চারিত হওয়া সম্ভব, বরং অসঙ্কুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেকদূর বাড়িয়ে দেওয়া যায়, এই ছিল কবির বিশ্বাস। এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে কবি 'পুনশ্চে'র একটি কবিতায় বলেছেন,

"কোপাই আজ কবির ছন্দকে আপন সাথি
করে নিলে···
তার ভাঙা তালে হেঁটে চলে যাবে ধনুক হাতে
সাঁওতাল ছেলে
পার হয়ে যাবে গরুর গাড়ি
আঁটি আঁটি খড় বোঝাই করে;"

কাব্যের ভাষায়-ছন্দে ব্যবহারিক জীবনের সারল্যকে কবি ফোটাতে পেরেছেন, কিন্তু তাঁর মনোভঙ্গি ও রসচেতনা বৃহত্তর জনমানসের ক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে থেকে গেছে। তাই তিনি তাঁর গদ্য-কবিতায় দরিদ্র দুঃখ মেহনতী মানুষের কামনা বাসনাকে সজীবরূপে প্রকাশ করতে পারেন নি। তাঁর বিখ্যাত 'ওরা কাজ করে' কবিতায় কবি মেহনতী মানুষের সবকালীন কর্মধারাকে বহমান ইতিহাসের পতন অভ্যুদয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছেন; কিন্তু সেখানেও তিনি সভ্যতার পিলসুজ সেই সব সাধারণ মানুষের জীবনকে একটি বিরাট জনতার মিছিল রূপে দেখেছেন, তার গভীরে প্রবেশ করে তাদের পুঞ্জীভূত অভাব-অভিযোগ ব্যথা-বেদনার পরিচয় গ্রহণ করেন নি—তাঁর শূন্য মানসপটে যেন ভেসে উঠেছে চিত্রে-আঁকা অজস্র কলরবের একটি মৌন মিছিল—

"বিপুল জনতা চলে
নানা পথে নানা দলে দলে
যুগযুগান্তর হতে মানুষের নিত্য-প্রয়োজনে
জীবনে-মরণে।"

গরীবঘরের অতি সাধারণ দুষ্টু 'ছেলেটা'র চিত্র এঁকেছেন কবি; 'পরের ঘরে মানুষ' আগাছার মত অবহেলিত ছেলেটির একটি প্রিয় কুকুর ছিল, তার বর্ণনা দিয়েছেন এ বর্ণনায় সহানুভূতির চেয়ে কবির স্বভাবসিদ্ধ মননশীল কৌতুকপ্রিয়তার বৈশিষ্ট্যটিই অধিকতর পরিস্ফুট—

"একটা কুকুর ছিল ওর পোষা,
কুলীনজাতের নয়,
একেবারে বঙ্গজ।
চেহারা প্রায় মনিবেরই মতো,
ব্যবহারটাও।"

বস্তুত, ওয়ার্ডস্বার্থের মতো রবীন্দ্রনাথেরও পরিণত বয়সের কাব্যগুলিতে একটা সুগভীর প্রজ্ঞা দৃষ্টি, একটা দার্শনিক প্রত্যয় ও মননের পরিচয় সবকিছুর উর্ধ্বে উঠে কবির ভাবভাবনাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। তাঁর জীবন উৎসবের

াশিটি যেন দিনান্তবেলার ম্লান মূলতানে ভরে উঠেছে, যারা জীবনব্যাপী একটা অপ্রাপ্তিজনিত বেদনাবোধ তাঁর অজস্র দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে উচ্ছ্বসিত হয়েছে। মর্তের ধূলি-মাটি মাখা নগণ্য জীবনকে নতুন করে আঁকড়ে ধরার চেয়ে তাকে এতদিন অবহেলা করবার জন্য তাঁর নিজের মনে একটা অপরাধজনিত সংকোচ ও অনুতাপ দেখা দিয়েছে—

"কোনোদিন ব্যাঙের খাঁটি কথাটি কি পেরেছি
লিখতে—
আর সেই নেড়ী কুকুরের ট্রাজেডি!"

আরতির সান্ধ্যক্ষণে বিচিত্রের নর্মবাশিটিকে একের চরণে পৌঁছে দেবার জন্য কবির মনে যখন আকৃতি জেগেছে, তাঁর প্রজ্ঞাশীতল মন তখন আর জনসাধারণের কান্নাহাসির জীবনবিচিত্রাকে নতুন করে অন্তরঙ্গভাবে উপলব্ধি করতে পারে নি। কাব্যের আঙ্গিকের ক্ষেত্রে একটা নতুনত্বের পরিকল্পনা তাঁর সচেতন মনে জেগে উঠেছে বটে, কিন্তু অবচেতনার গভীরে তাঁর বোধদৃষ্টি একে সমর্থন জানায় নি। তাই তো দেখি, 'তেঁতুল', 'শালিখ', 'ছেলেটা', 'সাধারণ মেয়ে', "কিনুগোয়ালার গলি" ইত্যাদি তাঁর গদ্য-কাব্যের বিষয় হলেও দৃষ্টিভঙ্গি ও বর্ণনারীতির ক্ষেত্রে তিনি সাধারণ মানুষের রুচি ও কল্পনার জগতে নেমে আসতে পারেন নি। অপর দিকে 'পৃথিবী', 'আফ্রিকা' ইত্যাদি ইতিহাসদর্শন প্রসূত কবিতায়, 'পত্রপুটে'র 'ব্রাত্য' ইত্যাদি গভীর মানবিকতা-উদ্বুদ্ধ কবিতায়, 'পুনশ্চে'র 'চিররূপের বাণী, 'শিশুতীর্থ' এবং 'আরোগ্য'-'আকাশপ্রদীপে'র কবিতাগুলিতে যে গভীর ও ব্যাপক দার্শনিক জীবনবোধ প্রকাশিত, তা তাঁর গদ্য-কাব্যের বিশিষ্ট মননধর্মী ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির উপযুক্ত সার্থকতর বাহন হয়ে উঠেছে।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের শীর্ষস্থানীয় এই দুই রোম্যান্টিক গীতিকবির কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব খণ্ডন করা আমার এই আলোচনার উদ্দেশ্য নয়, কাব্যের একটি বিশেষ আঙ্গিক ও শিল্পরীতি প্রবর্তনের ক্ষেত্রে তাঁরা কতদূর সফল হয়েছিলেন, সেজন্য তাঁদের নিজ নিজ মৌলিক কবিধর্মের স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ (spontaneous overflow) কতকটা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল কি না এবং তাঁদের নবঅর্জিত যুগসৃষ্টির কৃতিত্ব কোন কোন ক্ষেত্রে সফলতার চরম স্বাক্ষর প্রদর্শন করেছে তা নিরূপণ করাই আমার অভিষ্ট। ওয়ার্ডস্বার্থের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবিধর্মগত মিল আরও অনেক ক্ষেত্রেই দেখানো যেতে পারে; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শুধু গদ্যকাব্যগুলিতে ওয়ার্ডস্বার্থের কাব্যচিন্তার কতটুকু সমর্থন পাওয়া যায়, তার নিজের কাব্যইবা তাঁর সিদ্ধান্তের অনুসরণে কতটা সার্থক হতে পেরেছে তার পরিমাণের বিচারই আমার আলোচনার বিষয়ীভূত হয়েছে।

অথচ বিশ্বাস কর

মিহির রায়চৌধুরী

এই একটু আগেই, এপারে প্রবল বৃষ্টি হয়ে গেলো
ঘরে বসে থাকি, সারাবেলা বৃষ্টিতে বিষণ্ণ হয়ে এলো
এখন অতীত কল্পনায় অবিমিশ্র নিমগ্ন হলাম
অথবা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে একথাই বলা যেতে পারে
এ বৃষ্টিতে সারাদিন কিছু ভাববার অবকাশ পেলাম
সে সব ভাবনা, যারা বহুদিন সুপ্ত ছিল অন্যপারে।
ওই তীরে, কেঁপে ওঠে ঝাউবন বাতাসে গাছের পাতা
একা এক নারকোল গাছ মনে হয় দারুণ উদাসী
যেতে চাই সেখানে প্রায়ই, মধ্যে নদী নাকি খরস্রোতা
অথচ বিশ্বাস করো, আজও তোমায় ভালবাসি।

সেকালের আমোদ-প্রমোদ

পৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সেকালে শহর কলিকাতায় বিদেশী ইংরাজদের বাণিজ্য-তথা ঔপনিবেশিক কেন্দ্র সুপ্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই এখানকার দেশী ও বিলাতী সমাজের বিলাসী-সৌখিন অধিবাসীরা দৈনন্দিন কাজ-কারবারের অবসরে নিজেদের চিত্ত-বিনোদনের উদ্দেশ্যে আরো যে সব বিচিত্র-আজব উৎসব-অনুষ্ঠান আর আমোদ-প্রমোদের হুজুক-আড়ম্বরে মেতে আনন্দে-স্ফূর্ত্তিতে সময় কাটাতেন, প্রাচীন পুঁথি-পত্রে তারও নানান কৌতূহলোদ্দীপক নজীর মেলে···একালের অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকাদের অবগতির জন্য অতীত-আমলের সে সব কীর্ত্তিকলাপের কয়েকটি বিবরণ নীচে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

* * * *

(সমাচার দর্পণ, ২৬শে জানুয়ারী, ১৮২২)

নূতন যাত্রা।—এই ক্ষণে শ্রুত হইল যে কলিকাতাতে নূতন এক যাত্রা প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে অনেক২ প্রকার ছদ্ম-বেশধারী আরোপিত বিবিধ গুণগণ বর্ণনাকারী মনোহর ব্যবহারী অর্থাৎ সং হইয়া থাকে তাহার বিবরণ প্রথমতো বৈষ্ণব বেশধারী ২ সং আইসে দ্বিতীয়তঃ ১ সং কর্ণিরাজা তৃতীয়তঃ ১সং রাজার পাত্র চতুর্থ ১সং দেশান্তরীয় বেশধারী বিবিধ উপদেশকারী পঞ্চম ২সং চট্টগ্রাম হইতে আগত পরিষ্কৃত বেশান্বিত এক সাহেব আর এক বিবী ষষ্ঠ ২সং ঐ সাহেবের দাস দাসী এ সকল সং ক্রমে আগত একত্র মিলিত হইয়া বিবিধ বেশবিন্যাস বিলাস হাস্য রহস্য সম্বলিত অঙ্গ ভঙ্গি পুরঃসর নর্ত্তন কোকিলাদি স্বর ন্যক্কৃত মধুর স্বরে গান নানাবিধ বাদ্য যন্ত্র বাদন আশ্চর্য্য২ প্রশ্নোত্তর ক্রমে পরস্পর মৃদু মধুর বাক্যালাপ কৌশলাদির দ্বারা নানা-দিগ্দেশীয় বিজ্ঞাবিজ্ঞ সাধারণ সর্ব্বজন মনোমোহন প্রভৃতি করেন এই অপর্ব্ব যাত্রা প্রকাশে অনেক২ বিজ্ঞ লোক উৎসুক এবং সহকারী আছেন অতএব বুঝি ক্রমে২ ঐ যাত্রার অনেক প্রকার পরিপাটী হইতে পারে।

* * *

(সমাচার দর্পণ, ৪ঠা মে, ১৮২২)

নূতন যাত্রা।—মহাভারত প্রসিদ্ধ নলদময়ন্তীর উপাখ্যান যে আছে সে অতিসুশ্রাব্য ও মনোরম এবং নব রসসম্পূর্ণ প্রসঙ্গ অতএব শ্রীহর্ষ প্রভৃতি কবিরা স্বীয়২ শক্ত্যনুসারে তাহা বর্ণনা করিয়া নৈষধাদি গ্রন্থ রচনা করাতে মহাকবিত্বে খ্যাত ও মান্য হইয়াছেন। সংপ্রতি কলিকাতার অন্তঃপাতি ভবানীপুরের ভাগ্যবান লোকেরা একত্র হইয়া সেই প্রসঙ্গের এক যাত্রা সৃষ্টি করিতেছেন তাঁহারা আপনার-দিগের মধ্য হইতে বিভবানুসারে কেহ পঁচিশ কেহ পঞ্চাশ কেহ শত টাকা ইত্যাদি ক্রমে যে ধন সঞ্চয় করিয়াছেন

তাহাতে ঐ যাত্রা বহুকাল চলিতে পারে এমত সংস্থান হইয়াছে এবং সেই ধন দ্বারা যাত্রার ইতিকর্ত্তব্যতা বেশ-ভূষা বস্ত্র বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে।

*　　*　　*

সমাচার দর্পণ, ৪ঠা ১৩ই জুলাই, ১৮২২)

নূতন যাত্রা॥—কলিকাতার দক্ষিণ ভবানীপুর গ্রামের অনেক ভাগ্যবান বিচক্ষণ লোক একত্র হইয়া নলদময়ন্তী যাত্রার সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার বিশেষ লিখিলে বাহুল্য হয় এ প্রযুক্ত সংক্ষেপে সর্ব্বত্র জ্ঞাত করিতেছি ঐ যাত্রাতে নল রাজার সং ও দময়ন্তীর সং ও হংসদূতের সং ইত্যাদি নানাবিধ সং আইসে এবং নানা প্রকার রাগ রাগিণী সংযুক্ত গান হয় ও বাদ্য নৃত্য এবং গ্রন্থ মত পরস্পর কথোপ-কথন এ অতিচমৎকার ব্যাপার সৃষ্টি হওয়াতে বিস্তর টাকা চাঁদা করিয়া ঐ সুরসিক ব্যক্তিরা ব্যয় করিয়াছেন ঐ যাত্রা প্রথমে ঐ ভবানীপুরে গঙ্গারাম মুখোপাধ্যায়ের দং বাটীতে গত ২৩ আষাঢ় শনিবার রাত্রিতে প্রকাশ হইয়াছে।

(সমাচার দর্পণ, ৫ই মে, ১৮২৭)

রাজা বিক্রমাদিত্যের যাত্রা।—গত ২ বৈশাখ শনিবার রাত্রিতে শ্রীযুতবাবু জগন্মোহন মল্লিকের কালুঘোষের দরুণ বাগানবাটীতে রাজা বিক্রমাদিত্যের যাত্রা হইয়াছিল এ যাত্রার সম্প্রদায় সংপ্রতি প্রস্তুত হইয়াছে শুনা গিয়াছে যে জোড়াসাঁকো নিবাসি কতকগুলিন রসিক গুণী এবং ভদ্রলোকের সন্তান একত্র হইয়া সোয়াক করিয়া এই ব্যাপার করিয়াছেন চারি পাঁচ স্থানে ইহার আমোদ প্রমোদ হইয়াছিল কিন্তু তাহাতে শ্রবণ জন্য সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণ না হওয়াতে প্রচাররূপে রাষ্ট্র হয় নাই তৎপ্রযুক্ত তাহার বিশেষ কিঞ্চিল্লিখনাবশ্যক হইল।

রাজা বিক্রমাদিত্যের অষ্টসিদ্ধির প্রকরণ যাহার সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভাষায় পুস্তক প্রকাশ আছে সেই পদ্ধতিমত রাজা অমাত্য লইয়া সভায় আছেন এমত কালে একটা রাক্ষস তিনটা শবের মস্তক হস্তে করিয়া রাজসভায় উপনীত হওত জিজ্ঞাসা করে ইহার মধ্যে উত্তম মধ্যমাধম কহিয়া দেও রাজা পণ্ডিতবর্গকে তাহার উত্তর করিতে অনুমতি দেন ইত্যাদি ইহাতে নানাপ্রকার সং অতি সুসজ্জিত হইয়া আইসে এবং ব্যক্তি বিশেষের সং আসিয়া প্রথমতো নানা রাগরাগিণীযুক্ত সুস্বরে গান করে এই সকল দর্শন শ্রবণ করিয়া তাবৎ লোক হায় হায় ধ্বনি করিয়াছিলেন।

*　　*　　*

[৺দুর্গাচরণ রায় রচিত 'দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন' গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত]

…ক্রমে বাজারে লোকে লোকারণ্য। বারইয়ারি-তলায় যাত্রা বসিয়াছে। খুলীরা "ধা ধিচা" "ধা ধিচা" শব্দে খোল বাজাইতেছে।…সকলে আসরে গিয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহারা গিয়া বসিবার অব্যবহিত পরেই সাজানো কৃষ্ণ আসিয়া দেখা দিলেন। তাঁহার ম্যালেরিয়া জ্বরে পেটে প্লীহা ও যকৃৎ হওয়ায় পেটটা

মোটা হইয়াছিল। গাত্রের বর্ণ প্রকৃতই কৃষ্ণ। পরিধানে ছেঁড়া নেকড়ার পীতধরা। বক্ষে খড়ি-মাটির ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন। মস্তকে শোলার চূড়া। হস্তে বাঁশীর স্থলে একগাছি লাল ছড়ি। ছোঁড়াটা আসিয়া দেবগণের সম্মুখে ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইল। তাহার ভঙ্গী দেখিয়া দেবগণ হাস্য করিতে লাগিলেন : নারায়ণ কিছু লজ্জিত হইলেন! এই সময় বাদীরা আবার বাদ্য আরম্ভ করিল—"তাক্ তাক্ তাক্তা ধিনা"—ধিতা° বিনা তাক্তা ধিনা"—অমনি কৃষ্ণ মুখে হাত দিয়া "আব্ আবু আবু ধ্বনি! মা ননী দে! শব্দ করিয়া তালে তালে পা ফেলিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল।···

··· ··· ···

এই সময়ে আটচালার বাহিরে একপাল ছেলে গান ধরিল। ক্রমে দলটি গান করিতে করিতে আসরে আসিয়া দেখা দিল। তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ গোঁপ-কামান স্থূলকায় কৃষ্ণবর্ণ দূতীও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে আসরে আসিয়া এই ভাবে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, যেন রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতেছেন। সাজান কৃষ্ণ উঠিয়া এক প্রান্ত হইতে কহিল, "বিন্দে ও বিন্দে! বলি কথা কও'—"দূতি, দূতি! বলি কথা কও ; দুটো কথা কওয়ায় দোষ কি? বিন্দে ও বিন্দে—"

বিন্দে অমনি চক্ষু দুটি ঘুরাইয়া, ডাইনে বাঁয়ে সেই সমস্ত ললিতা বিশাখা প্রভৃতিকে লইয়া লণ্ঠনের দিকে চাহিয়া দুই হস্ত বিস্তার করত দেবগণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অতি মৃদুস্বরে গান ধরিল—

কৈব কি কথা, নহে কবার কথা ;
কইলে কথা লোকে বলে কত কথা।

(পুনশ্চ ঘাড় হেঁট করিয়া হস্ত নাড়িয়া অতি সজোরে)—

কৈব কি কথা, নহে কবার কথা ;
কইলে কথা লোকে বলে কত কথা।
ক'র্লে তোমার নাম, হয় হে দুর্নাম,
সে বদনামে শ্যাম, তোলা যায় না মাথা॥
কইলে কথা যদি কেহ দেখতে পায়,
কিম্বা লোকমুখে যদি শুনতে পায়,
যে প্রকারে হউক যদি প্রকাশ পায়,
হব নিরুপায়, সে বড় লজ্জার কথা॥

শ্রোতৃবর্গ এই সময় চতুর্দ্দিক হইতে "হরি হরি বল ভাই" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

··· ··· ···

প্রাতে···তাঁহারা বারোয়ারি তলার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখেন—লোকে লোকারণ্য, সকলেই একবাক্যে কহিতেছে—গান বড্ডো জমেছে। তাঁহারা শুনিলেন —আটচালার মধ্যে বালকগণ নাচিতে নাচিতে এই গানটী ধরিয়াছে—

আর আমি যাবনা সখি! যমুনার জলে।
নিতান্ত লম্পট কৃষ্ণ কলসী দেয় ফেলে ;
দূতি কাঁকের কলসী দেয় ফেলে॥

··· ··· ···

* * *

(সমাচার দর্পণ, ৫ই জানুয়ারী, ১৮৩৯)

যেমন শীতকালাগমনে ইউরোপিয়দিগের মধ্যে সুখ ও আমোদ জন্মিয়াছে তেমনি আমারদিগের বন্ধু উড়িয়া-দিগের অপকার করিতেছে। বহুক্ষণে কলিকাতানগরে দেখা যাইতেছে যে কতকগুলিন নৃত্যকর উড়িয্যা মুলুক-হইতে উপস্থিত হইয়া রামলীলা নামে এক কাব্য রচনা করিয়াছেন ইহা যথার্থ এক নূতন বিষয় বটে এবং কোন সন্দেহ নাই যে তাহারদের দেশস্থ লোকের ও এমত সকল লোক সাহেব [যাহারা] বুঝিতে পারেন আনন্দ প্রাপ্ত হইবেন।

* * *

(সমাচার দর্পণ, ২১শে এপ্রিল, ১৮৩২)

জজসাহেবেরদের প্রতি বিদ্রূপ।—এতন্নগরে কিছুকাল পূর্ব্বে অনেক স্থানে অর্থাৎ পাড়ায়২ সখের যাত্রার দল

হইয়াছিল তৎপরে সেই সথে এখানকার লোকের ওয়াক উঠিবাতে পল্লিগ্রামে গেল শেষ অনেক ইতর লোক তাহা অভ্যাস করিয়া জীবনোপায় করিতেছে সংপ্রতি এই নগরের ধনাঢ্য লোকের সন্তানেরা ইঙ্গরেজী মতের যাত্রার সংপ্রদায় করিয়াছেন এ সম্বাদ বড় রাষ্ট্র হওয়াতে কোন সুরসিক বিবেচক এক নাটকগ্রন্থের পাণ্ডুলেখ্য আমারদিগের নিকট পাঠাইয়াছেন তাঁহার অভিপ্রায় ঐ বাবুরা যদি উক্ত নাটক মত যাত্রা করেন তবে লোকের আশু আনন্দ জন্মিতে পারে।...

*　　　*　　　*

যাত্রার পালাভিনয় ছাড়াও, সেকালের বিলাসী-সৌখিন আনন্দাভিলাষী জনগণের বিশেষ আগ্রহ-অনুরাগ ছিল—সাড়ম্বরে বিপুল ব্যয়ে বিচিত্র সাজে ও সজ্জায় জীবন্ত-মানুষ আর মাটির পুতুলদের নানান্ ছাঁদে 'সং' সাজিয়ে ভাঁড়ামি আর রঙ্গ-তামাসার আজব আসর জমিয়ে তোলা...পুরোনো কেতাবে সংবাদপত্রে তারও বহু নিদর্শন মেলে। সেকালের এই সব রঙ্গ তামাসার আসরে, আবালবৃদ্ধবনিতাকে বিচিত্র আনন্দ-পরিবেষণের উদ্দেশ্যে, সচরাচর কি ধরণের উদ্যোগ-আয়োজনাদি করা হতো—আপাততঃ তারই কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিই।

*　　　*　　　*

(৺কালীপ্রসন্ন সিংহ রচিত "হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা')
গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত

* পূর্ব্বে চুঁচড়োর মত বারোইয়ারি পূজো আর কোথাও হতো না, "আচাভো" "বোম্বাচাক" প্রভৃতি সং প্রস্তুত হতো ; সহরের ও নানা স্থানের বাবুরা বোট, বজ্‌রা পিনেস ও ভাউলে ভাড়া করে সং দেখতে যেতেন ; লোকের এত জনতা হতো যে, কলাপাত এক টাকায় একখানি বিক্রি হয়েছিলো, চোরেরা আণ্ডীল হয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু গরীব দুঃখী গেরস্তোর হাঁড়ি চড়ে নি।

*　　　*　　　*

* আজ এ সময় বীরকৃষ্ণ দাঁর গদিতে বড় ধুম—অধ্যক্ষেরা একত্র হয়ে কোন্ কোন্ রকম সং হবে, কুমোরকে তারই নমুনো দেখাবেন ; কুমোর নমুনো মত সং তৈয়ের কর্‌বে ; * *

* * এদিকে বারোইয়ারিতলায় সং গড়া শেষ হয়েচে। * * * কথা শোনবার ও সং দ্যাখ্‌বার জন্যে লোকের অসম্ভব ভিড় হয়েচে—কুমোর, ডাকওয়ালা ও অধ্যক্ষেরা থেলো হুঁকোয় তামাক খেয়ে দূরে বেড়াচ্চেন ও মিছেমিছি চেঁচিয়ে গলা ভাংচেন! বাজে লোকের মধ্যে দু এক জন আপনার আপনার কর্তৃত্ব দ্যাখাবার জন্যে "তফাৎ তফাৎ" কচ্চে, অনেকে গোছালো গোছের মেয়েমানুষ দেখে সঙের তরজমা করে বোঝাচ্চেন! সংগুলি বর্দ্ধমানের রাজার বাংলা মহাভারতের মত, বুঝিয়ে না দিলে মর্ম্ম গ্রহণ করা ভার!

কোথাও ভীষ্ম শরশয্যায় পড়েচেন—অর্জ্জুন পাতালে বাণ মেরে ভোগবতীর জল তুলে খাওয়াচ্চেন। জ্ঞাতির পরাক্রম দেখে দুর্য্যোধন ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রয়েচেন। সঙের মুখের ছাঁচ ও পোষাক সকলেরই একরকম, কেবল ভীষ্ম দুদের মত সাদা, অর্জ্জুন ডেমাটিনের মত কালো ও দুর্য্যোধন গ্রীন!

কোথাও নবরত্নের সভা—বিক্রমাদিত্য বত্রিশ পুতুলের সিংহাসনের উপর আফিসের দালালের মত পোষাক পরে বসে আছেন। কালিদাস, ঘটকর্পর, বরাহমিহির প্রভৃতি নবরত্নেরা চার দিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েচেন—রত্নদের সকলেরই এক রকম ধুতি, চাদর ও টিকি ; হঠাৎ দেখ্‌লে বোধ হয় যেন এক দল অগ্রদানী ক্রিয়াবাড়ি ঢোক্‌বার জন্য দরওয়ানের উপাসনা কচ্চে!

কোথাও শ্রীমন্ত দক্ষিণ রায়ের মশানে চৌত্রিশ অক্ষরে ভগবতীর স্তব কচ্চেন, কোটালরা ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েচে—শ্রীমন্তের মাথায় শালের শামলা হাফ ইংরিজি গোছের চাপকান ও পায়জামা পরা, ঠিক যেন এক জন হাইকোর্টের প্লিডার প্লিড কচ্চেন!

এক জায়গায় রাজসূয় যজ্ঞ হচ্চে—দেশ দেশান্তরের রাজারা চার দিকে ঘিরে বসেচেন—মধ্যে ট্যানা পরা

হোতা পোতা বামুনরা অগ্নিকুণ্ডের চার দিকে বসে হোম কচ্চেন, রাজাদের পোশাক ও চেহারা দেখ্‌লে হঠাৎ বোধ হয় যেন, এক দল দরওয়ান স্যাকরার দোকানে পাহারা দিচ্চে!

কোনখানে রাম রাজা হয়েচেন—বিভীষণ, জাম্বুবান্, হনুমান্ ও সুগ্রীব বানরেরা সহুরে মুচ্ছুদ্দী বাবুদের মত পোশাক পরে চার দিকে দাঁড়িয়ে আছেন। লক্ষ্মণ ছাতা ধরেচেন—শত্রুঘ্ন ও ভরত চামর কচ্চেন—রামের বাঁ দিকে সীতে দেবী; সীতের ট্যাড়চা সাড়ী, ঝাঁপটা ও ফিরিঙ্গি খোঁপার বেহদ্দ বাহার বেরিয়েচে!

"বাইরে কোঁচার পত্তন ভিতরে ছুঁচোর কেত্তন" সং বড় চমৎকার!—বাবুর ট্যাস্‌ল্ দেওয়া টুপি, পাইনাপেলের চাপকান, পেটি ও সিল্কের রুমাল, গলায় চুলের গার্ডচেন অথচ থাকবার ঘর নাই, মাসীর বাড়ি অন্ন লুসেন, ঠাকুরবাড়ি শোন, আর সেনেদের বাড়ি বস্‌বার আড্ডা। পেট ভরে জল খাবার পয়সা নাই, অথচ দেশের রিফর্ম্মেশনের জন্যে রাত্তিরে ঘুম হয় না। (মশারির অভাবও ঘুম না হবার একটি কারণ)। পুলিস, বড় আদালত, টালার নিলেম, ছোট আদালতে দিনের ব্যালা ঘুরে বেড়ান, সন্ধ্যা ব্যালা ব্রহ্মসভায় মিটিং ও ক্লবে হাঁফ ছাড়েন—গোয়েন্দাগিরি, দালালি, খোসামুদি ও ঠিকে রাইটরি করে যা পান, ট্যাস্‌লওয়ালা টুপি ও পাইনাপেলের চাপকান রিপু কত্তে ও জুতো বুরুসেই সব ফুরিয়ে যায়! সুতরাং মিনি মাইনের স্কুলমাষ্টারি কখন কখন স্বীকার কত্তে হয়!

কোথাও "অসৈরণ সৈতে নারি শিকেয় বসে ঝুলে মরি সং—অসৈরণ সইতে-নারি মহাশয়, ইয়ং বাঙ্গালদের টেবিলে খাওয়া, পেন্‌টুলন ও (ভয়ানক গরমিতেও) বনাতের বিলাতী কট্ চাপকান পরা! (বিলক্ষণ দেখতে পান) অথচ নাকে চসমা! রাত্তিরে খানায় পড়ে ছুঁচো ধরে খান! দিনের ব্যালা রিফর্ম্মেশনের স্পিচ্ করেন দেখে—শিকেয় ঝুল্‌চেন!

এ সওয়ায় বারোইয়ারিতলায় "ভাল কত্তে পারবো না মন্দ করবো কি দিবি তা দে" "বুক কেটে দরোজা" 'ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে' 'খ্যাঁদা পুতের নাম পদ্মলোচন' 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' 'হাড় হাবাতে মিছরির ছুরি' প্রভৃতি নানাবিধ সং হয়েচে; সে সব আর এখানে উত্থাপন করার আবশ্যক নাই। কিন্তু প্রতিমের দু পাশে 'বকা ধার্ম্মিক ও ক্ষুদ্র নবাবে'র সং বড় চমৎকার হয়েচে। বকা ধার্ম্মিকের শরীরটি মুচির কুকুরের মত নুদুর ন্যদুর—ভুঁড়িটি বিলাতী কুমড়োর মত—মাথায় কামান চৈতনফক্কা ঝুঁটি করে বাঁধা—গলায় মালা ও ছোট ঢাকের মত গুটিকতক সোনার মাদুলি—হাতে ইষ্টিকবচ—চুলে ও গোঁপে কলপ দেওয়া—কালপেড়ে ধুতি, রামজামা ও জরির বাঁকা তাজ—গত বৎসর আশী পেরিয়েচেন—অঙ্গ ত্রিভঙ্গ! কিন্তু প্রাণ হামাগুড়ি দিচ্চে! গেরস্তগোচের ভদ্রলোকের মেয়েছেলের পানে আড়চক্ষে চাচ্চেন—হরিনামের ঝুলিটি ঘুরুচ্চেন। ঝুলির ভিতর থেকে গুটিকতক টাকা বেমালুম আওয়াজে লোভ দেখাচ্চে।

ক্ষুদ্র নবাব—ক্ষুদ্র নবাব দিব্যি দেখতে—দুদে আলতার মত রং—আলবর্ট ফ্যাশানে চুল ফেরানো—চীনের শুয়ারের মত—শরীরটি ঘাড়ে গদ্দানে—হাতে লাল রুমাল ও পিচের ইষ্টিক—সিম্‌লের ফিনফিনে ধুতি মালকোঁচা করে পরা, হঠাৎ দেখলে বোধ হয় রাজারাজড়ার পৌত্তুর, কিন্তু পরিচয় বেরোবে—'হিদে জোলার নাতি'!

* * *

…সহরের অনেক বাবু গাড়ি চড়ে সং দেখ্‌তে এসেচেন—সং ফেলে অনেকে তাঁদের দেখ্‌চে। ক্রমে মজলিশ দু এক ঝাড় জ্বেলে দেওয়া হলো—সঙেদের মাথার উপর বেল ল্যান্‌ঠন বাহার দিতে লাগলো।…

বারোইয়ারিতলা লোকারণ্য হয়ে উঠলো—এক দিকে কাঠগড়া ঘেরা মাটির সং—অন্য দিকে নানা রকম পোশাক পরা কাঠগড়ার ধারে ও মধ্যে জ্যান্ত সং।…

* * *

(সমাচার দর্পণ, ১৪ এপ্রিল, ১৮২৯)

চুঁচুড়ার সং।—গত সপ্তাহে মোকাম চুঁচুড়াতে অনেক২ আশ্চর্য্য সং করিয়াছিল। তাহার মধ্যে শ্রীশ্রীরামজীকে রাজা করিয়াছিল ও শ্রীমতী রাধাকে রাজা করিয়াছিল এবং

সুন্দর নৌকাতে নৌকাখণ্ড যাত্রা হইয়াছিল এবং শরৎ-কালীন দশভুজা মূর্ত্তি এবং শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধ এই২ রূপ অনেক প্রকার সং হইয়াছিল ইহার অধ্যক্ষ চুঁচুড়া শহরবাসী সকল ও কলিকাতাস্থ অনেক কিন্তু দুই ভাগে দুই কর্ম্মকর্ত্তা একজনের নাম খোঁড়া নবু দ্বিতীয় চোরা নবু। এ বৎসর এ সংগে খোঁড়া নবুর জয় হইয়াছে। গত বৎসর সং হইয়াছিল না এ বৎসর উত্তম রূপ হইয়াছে ইহাতে অনুমান হয় প্রতিবৎসর হইতে পারে।

*　　*　　*

(সমাচার দর্পণ, ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৮২৫)

সং করার ফল॥—শুনা গেল যে ধোপাপাড়া-নিবাসি রূপনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীকাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীশ্রীসরস্বতী প্রতিমার বিসর্জ্জনের দিবসে প্রতিমা সমভিব্যাহারে এক সং বাহির করিয়াছিলেন তাহার ভাব এই একটা সাধারণে কথা আছে যে পথে হাগে আর চক্ষু রাঙ্গায়। এই ভাবে একটা মনুষ্যাকার পুত্তলিকা নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাকে বিবস্ত্র করিয়া সম্মুখে একটা জলপাত্র রাখিয়াছিলেন ইত্যাদি তাহার ভাবশুদ্ধ করিয়া-ছিলেন ইহাতে সংসুদ্ধ চট্টোপাধ্যায় পুলিশে ধৃত হইয়াছিলেন পরে বিচারকর্ত্তা সাহেব তাঁহাকে কহিলেন যে তুমি তোমারদিগের দেবতার সম্মুখে এপ্রকার কদর্য্যাকার সং করিয়াছ এ অতি মন্দ কর্ম্ম ইত্যাদি কথায় অনেক তম্বি করিয়া শেষ ৫০ পঞ্চাশ টাকা দণ্ড করিয়াছেন।

*　　*　　*

(সমাচার দর্পণ, ৫ই এপ্রিল, ১৮২৮)

ইশ্‌তেহার।—চুঁচুড়া মোকামে পূর্ব্বাপর যেরূপ সং হইতেছিল তাহা এক্ষণে বন্ধ হইয়াছে অতএব সেইরূপ সং কপোলেশ্বর গ্রামে শ্রীযুত অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত পার্ব্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কোম্পানির দ্বারা হইতেছে এবং ৩০ চৈত্র বৃহস্পতিবার বাহির হইবেক। ইস্তক শ্রীযুত শিবচন্দ্র রায় চৌধুরীর বাটীর সম্মুখ হইতে চাণকের লাইন পর্য্যন্ত এ সঙ্গের গমনাগমন হইবেক অতএব সকলের জ্ঞাপনার্থে ইহা প্রকাশ করা যাইতেছে।

*　　*　　*

(সমাচার দর্পণ, ২৪শে জানুয়ারী, ১৮২৯)

হাজি সাহেবের সং।—গত শনিবার রাত্রিতে শ্রীযুত বাবু গুরুচরণ মল্লিকের বাটীতে আখড়া গানের দুই দলে যুদ্ধ হইয়াছিল তৎশ্রবণাবলোকনে ঐ ভবনে এতন্নগরস্থ বহুতর বাবুগণ ও অন্যান্য অনেক জনের আগমন হওয়াতে চমৎকার সভা হইয়াছিল সে সভায় এক ব্যক্তি হাজি সাহেবের সং সাজিয়া আইল তাহার বেশ ও আকার প্রকার ব্যবহার দৃষ্টিমাত্র সকলেই য়িহুদী জাতি জ্ঞান করিয়া হুকা উঠাইতে আজ্ঞা দিলেন কিন্তু তাহাকে বড় লোক জ্ঞান হওয়াতে সভামধ্যে আসিতে বারণ করিতে কাহার মন হইল না পরে সে সভায় প্রবেশানন্তর সভ্যতা প্রকাশ করিল অর্থাৎ সেলাম করত সকলকেই সম্বোধন করিয়া উববেশনান্তর এক কেতাব দেখিতে লাগিল তৎপরে অনেকে সং জ্ঞান করিলেন কিন্তু এ ব্যক্তি কে তাহা নিশ্চয় হইল না শেষে পরিচয় দেওয়াতে জানা গেল নন্দকুমার সেট যিনি হিন্দু থিয়েটর করিতে প্রাবর্ত্তক হইয়াছেন যাহা হউক ইহা হইতে ঐ কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারে এমত বোধ হইতেছে কেননা যদ্যপি ইনি ইহার পূর্ব্বে অনেক প্রকার যাত্রার সং করিয়াছেন তাহা সকলের দৃষ্টিগোচর নহে কিন্তু হাজি সাহেবের সং দেখিয়া অনেকের বিশ্বাস হইয়াছে।

*　　*　　*

[ক্রমশঃ

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

এক সময় সেই মহিলা অর্থাৎ রমাদেবীই স্তব্ধতা ভেঙেছেন। বলেছেন, 'আমাদের জন্যে আপনাকে খুব কষ্ট পেতে হল।'

দীপেন উত্তর দেয় নি। একটু আগের সেই চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা বিচিত্র যন্ত্রণাবোধে তার সমস্ত সত্তাকে জর্জরিত করে রেখেছে যেন। কপালের দু-পাশে দুটো শিরা রক্তে অস্বাভাবিক স্ফীত হয়ে সমানে লাফিয়ে যাচ্ছিল। মাথাটা এত টন টন করছিল যাতে মনে হয়, যে কোন সময় সেটা ছিঁড়ে পড়বে। সেই মুহূর্তে তার চেতনা এমন আচ্ছন্ন এমন ঝাপসা যে কিছুই বুঝতে পারছিল না দীপেন, কিছুই অনুভব করতে পারছিল না।

রমাদেবী আবার বলেছেন, 'উনি যে হঠাৎ ও-রকম করে খাওয়াবার জন্যে জেদ ধরে বসবেন, বুঝতে পারিনি।'

দীপেন এবারও নিশ্চুপ।

রমাদেবী বলে গেছেন, 'সত্যি, আপনার ওপর খুবই অত্যাচার হল। কি বলে ক্ষমা চাইব, ভেবে পাচ্ছি না।' বলতে বলতেই হঠাৎ খেয়াল হয়েছে দীপেন তাঁর কথা শুনছে না। ঘাড় ভেঙে আচ্ছন্ন অভিভূতের মত বসে আছে।

একদৃষ্টে, প্রায় নিষ্পলকে, দীপেনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে রমাদেবী এবার কিছুটা শঙ্কিতই হয়ে উঠেছেন বুঝি। আস্তে আস্তে ফিসফিসিয়ে ডেকেছেন, 'দীপেনবাবু—'

এবার দীপেন সাড়া দিয়েছে।

রমাদেবী বলেছেন, 'আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন।'

'হ্যাঁ—' আস্তে আস্তে মাথা নেড়েছে দীপেন, 'মাথাটা খুব ঘুরছে আর—'

'কী ?'

'বুকের ভেতর ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে।'

এবার উদ্বিগ্ন স্বরে রমাদেবী বলেছেন, 'তা হলে এক কাজ করুন।'

দীপেন প্রশ্ন করেছে, 'কী ?'

'একটু কষ্ট করে আমাদের বাড়ি চলুন। আপনাকে ধরে ধরে আমি নিয়ে যাচ্ছি।'

কিছুটা অবাক হয়েছে দীপেন, আপনাদের বাড়ি গিয়ে কী হবে!'

'খানিকটা শুয়ে থাকলে মাথা ঘোরাটা কমে যেতে পারে।'

'না-না, তার দরকার নেই। আমি এখানেই বেশ আছি।' বলতে বলতে একটু থেমেছে দীপেন। তারপর কি ভেবে পরক্ষণেই শুরু করেছে, 'আশ্চর্য!'

দীপেনের স্বরে এমন একটা তরঙ্গ ছিল যাতে চকিত হয়ে উঠেছেন রমাদেবী। বলেছেন, কিসের আশ্চর্য বাবা!'

'সন্তানের মৃত্যু-সংবাদে খুশী হয়—এমন কোন বাপ পৃথিবীতে আছে কিনা আমার জানা নেই। মেনে নিলাম আছে। যদি থাকেও'—এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ থেমে গেছে দীপেন।

রমাদেবী কিছু বলেননি। শুধু উৎকণ্ঠিতের মত তাকিয়ে থেকেছেন।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে অস্থিরভাবে দীপেন আবার বলে উঠেছে, 'তেমন বাপ থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু সন্তানের মরার খবর শুনে কেউ সন্দেশ রসগোল্লা খাওয়াতে পারে—জগতে এমন নিষ্ঠুর হৃদয়হীন মানুষ বোধহয় একটাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

তৎক্ষণাৎ কিছু বলেননি রমাদেবী। ধীরে ধীরে তাঁর মুখখানা দুঃসহ যন্ত্রণায় প্রথমটা কুঁকড়ে গেছে। তারপর গাঢ় গভীর সীমাহীন এক বিষাদ চারদিক থেকে তাঁকে বেষ্টন করে ফেলেছে যেন। একসময় ক্লান্ত ঝাপসা স্বরে তিনি বলে উঠেছেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন দীপেনবাবু। কিন্তু—'

'কী ?'

'একটা ব্যাপার আপনি লক্ষ্য করেছেন ?'

'কী ব্যাপার ?'

'আমার স্বামীর কথাবার্তা আচার-আচরণ, কোনটাই স্বাভাবিক মানুষের মত কী ?'

দীপেন নিশ্চুপ। মহিলা কী ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন, বুঝতে না পেরে সে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল।

রমাদেবী আবার বলেছেন, 'মানুষ কত বড় আঘাত পেলে সন্তানের মৃত্যু-সংবাদে অমন উন্মাদের মত খুশী হয়ে উঠতে পারে তা বোধহয় আপনি কল্পনাও করতে পারেন না দীপেনবাবু। যদি আমাদের সব ইতিহাস জানতেন—'

'কী ইতিহাস ?' সজ্ঞানে নয়, বুঝিবা আত্মবিস্মৃত এক ঘোরের মধ্য থেকে ফিস ফিস করে উঠেছিল দীপেন।

সেই মুহূর্তে রমাদেবীর সমস্ত সত্তার ওপর কি যেন একটা ভর করে বসেছিল। দীপেনের চোখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কাঁপা তরঙ্গিত স্বরে বলেছিলেন, 'শুনতে চান ?'

'বললে নিশ্চয়ই শুনব।'

'তা হলে শুনুন'—বলেও অনেকক্ষণ চুপ করে ছিলেন রমাদেবী। দূরমনস্কের মত কি যেন ভাবতে শুরু করেছিলেন। খুব সম্ভব বক্তব্যটাকে মনের ভেতর সাজিয়ে নিচ্ছিলেন। অবশেষে একসময় আরম্ভ করেছিলেন, 'আগেই বলে রাখছি আমাদের কথা আপনার খুব ভাল লাগবে না।'

দীপেন বলেছিল, 'তা আমি জানি। জগতে সব কথাই কি ভাল লাগবার জন্যে ? আপনি বলুন—'

'বেশ—' রমাদেবী বলেছিলেন, 'আমাদের দেশ ঢাকা জেলায়—'

'ঢাকা জেলায়, মানে পাকিস্তানে ?'

'হ্যাঁ। মুন্সীগঞ্জের কাছাকাছি একটা গ্রামে ছিল আমাদের বাড়ি। বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম। নাম বজ্রযোগিনী।'

'বজ্রযোগিনী তো বিখ্যাত গ্রাম! অতীশ দীপঙ্করের জন্মস্থান।'

'হ্যাঁ।' রমাদেবী মাথা নেড়েছিলেন, 'সারা বাঙলাদেশে অত বড় গ্রাম আছে কিনা সন্দেহ। যাই হোক একটু আগে যে কঙ্কালসার মানুষটিকে মানে আমার স্বামীকে দেখে এলেন তিনি ছিলেন ঐ গ্রামেরই হাইস্কুলের শিক্ষক। আজকের এই অথর্ব পঙ্গু লোকটিকে দেখে সেদিনকার সেই মানুষটার কথা কল্পনাও করতে পারবেন না দীপেনবাবু।' বলতে বলতে একটু থেমে দীপেনের চোখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আচ্ছন্নের মত অনেক দূরে তাকিয়েছিলেন। মনে হচ্ছিল, তাঁর সামনে যেন এই ভাঙা ঘাটলা, ঝাঁঝিতে-ভরা মজা পুকুর, চীনা ঘাসের উদ্দাম জঙ্গল এমন কি বহুদূরের ঐ নীলাকাশও ছিল না। আরো দূরে স্মৃতিচারণের আলোছায়ায় তাঁর সমস্ত চেতনা বুঝি বিলীন হয়ে গিয়েছিল।

কিছুক্ষণ পর আবার শুরু করেছিলেন রমাদেবী। মনে হয়েছিল, পাশে দাঁড়িয়ে নয়, অনেক-অনেক দূর থেকে হাওয়ার তরঙ্গ আশ্রয় করে তাঁর স্বর ভেসে আসছে। তিনি বলছিলেন, 'আমাদের গ্রামে না ছিল কী! ফুটবল ক্লাব, অভিনয়ের জন্যে বাঁধানো ষ্টেজ, পাবলিক লাইব্রেরি, সংস্কার সমিতি, দুর্গোৎসব কমিটি। এ সব ছাড়াও আরো কত কি! আমার স্বামী ছিলেন ফুটবল ক্লাবের সভাপতি। শুধু সভাপতিই না কি, নিজে খেলতেনও। হাফ ব্যাক ছিলেন। খেলার দিন বাড়ির

সবাইকে মাঠে টেনে নিয়ে যেতেন। আমিও বাদ পড়তাম না। ড্রামাপার্টির উনি ছিলেন সম্পাদক, সংস্কার সমিতির সহ-সভাপতি, দুর্গোৎসব কমিটির কোষাধ্যক্ষ। আমাদের গ্রামে খেলাধুলা, নাচগান, উৎসব হুল্লোড় যা কিছু হত সে-সবের একেবারে মাঝখানটিতে উনি থাকতেন। আমার স্বামীকে বাদ দিয়ে সেখানে কিছুই চিন্তা করা যেত না।'

দীপেন কিছু বলে নি। প্রাণের অপরিসীম ঐশ্বর্যে ভরপুর একটি উদ্দাম জীবন্ত পুরুষের ছবি মনে মনে ভাবতে চেষ্টা করেছে শুধু।

রমাদেবী বলে গেছেন, 'বাড়িতে কতটুকু সময় আর ওঁকে পাওয়া যেত! স্কুলের সময়টুকু বাদ দিলে হয় ফুটবল, নয় অভিনয়, নয় লাইব্রেরি—কিছু না কিছু নিয়ে মেতে থাকতেন। অবশ্য সংসার সম্বন্ধে তাঁর না ভাবলেও চলত। আমাদের ছিল একান্নবর্তী পরিবার। ধানজমি ছিল চারশ বিঘে। পুকুর ছিল গোটা সাতেক। তা ছাড়া ফলের বাগান, তরিতরকারির বাগান—এসব তো ছিলই। যা প্রয়োজন তার চাইতে আমাদের অবস্থা ছিল অনেক বেশি সচ্ছল। সংসারটাকে ঘিরে সুখ যেন উথলে উথলে পড়ত।'

দীপেন এবারও নিশ্চুপ। একদৃষ্টে, স্থির নিষ্পলকে রমাদেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে সে শুনছিল।

রমাদেবী বলে যাচ্ছিলেন, 'উনি থাকতেন ক্লাব-লাইব্রেরি অভিনয় নিয়ে। ঘরের বাইরের যে জগৎ সেটাই ওঁকে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।'

আশ্চর্য। রমাদেবী যাঁর কথা বলছিলেন পূববাঙলার সেই প্রাণবন্ত উজ্জ্বল মানুষটির সঙ্গে সোনারপুরের পক্ষাঘাত পঙ্গু রোগজর্জর বৃদ্ধটির কোন মিল খুঁজতে যাওয়া বোধহয় বিড়ম্বনা। যে মানুষ একদিন দিক দিগন্তে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনিই যে সোনারপুরের একটি শয্যাকে আশ্রয় করেছেন—এ ব্যাপারটা কেমন যেন অবিশ্বাস্য। শুধু কি একটি বিছানার মধ্যেই নিজেকে নির্বাসিত করে রেখেছেন, চারপাশের দরজা-জানালা বন্ধ করে বাইরের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন করে দিয়েছেন। যে মানুষ ঘরের 'বাইরে'টাকে নিয়েই উৎসবে মত্ত হয়ে থাকতেন তিনিই সোনারপুরে এসে 'বাহির' বিমুখ হয়ে উঠেছিলেন।

রমাদেবী আবার বলেছেন, 'ওঁর জগৎ ছিল বাইরে। সে জন্যে আমার খুব একটা ক্ষোভ ছিল না। ঘরের মধ্যেই আমি আমার সুখ খুঁজে পেয়েছিলাম। আমার দুই মেয়ে এক ছেলে। তাদের নিয়েই ছিল আমার জগৎ। কিন্তু—'

এতক্ষণে মুখ খুলেছে দীপেন, 'কী?'

'এত সুখ আমাদের কপালে সইল না।'

'কেন?'

'কেন আবার! দেশের ভাগ্যবিধাতারা কোথায় বসে নিজেদের মধ্যে ক্ষমতা ভাগ বাটোয়ারা করে নিলেন আর তারই ফলে দেশটা গেল দু টুকরো হয়ে। আর—'

'কী?'

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলেন নি রমাদেবী। ভাঙা ঘাটলা ঝাঁঝিতে-ভরা মজা পুকুর, শরতের ঝকঝকে নীলাকাশ—সব পার হয়ে তাঁর চোখ অনেক অনেকদূরে পূর্ববাঙলার একটি গ্রামের স্মৃতিতে বিভোর হয়েছিল। হঠাৎ সে দুটি ফিরিয়ে এনে দীপেনের দিকে তাকিয়েছেন তিনি।

দীপেন লক্ষ্য করেছে, মহিলার দৃষ্টি সেই মুহূর্তে ধক ধক করছিল। চোয়াল হয়ে উঠেছিল কঠিন, কপাল রেখাময়, ঠোঁটদুটি শক্তবদ্ধ। সেই অবস্থাতেই কিছুক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন রমাদেবী। তারপর আস্তে আস্তে তাঁর ঠোঁট উদ্ভিন্ন হয়েছে। চাপা তীব্র গলায় তিনি বলেছেন, 'আর কী হয়েছিল, জানেন? আমাদের সংসারটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য—'

'কী?'

'দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা চলে আসিনি। আসিনি আমার স্বামীর জন্যে। তিনি বলে ছিলেন 'সাতপুরুষের ঘরবাড়ি ছেড়ে কোথায় যাব? হোক পাকিস্তান, তবুও আমাদের দেশ। এদেশের সঙ্গে আমাদের নাড়ির যোগ। এখান থেকে কোথাও যাব না।' ভাবি দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গেই যদি চলে আসতাম—'

'কী হত তাতে?'

'ঘরবাড়ি জমিজমা বিক্রি করে কিছু টাকাপয়সা নিয়ে চলে আসা যেত। কিন্তু—কিন্তু—'

'কী?'

'স্বামীর কথামত সেখানে থাকতে গিয়ে আমাদের

সর্বনাশ ঘটে গেল। শেষ দিকে আর সম্পত্তি বিক্রি করা যেত না। ওদিকে ওখানকার অবস্থাও থাকার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। নীলা মানে আমার বড় মেয়েটার বয়েস তখন সতের। আমি অস্থির হয়ে উঠলাম। দিন-রাত স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করতাম আর কাঁদতাম। আগেই বলেছি আমাদের সংসারটা ছিল একান্নবর্তী। দুই খুড়-শ্বশুর, তিন জ্যাঠশ্বশুর, তাঁদের ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনি মিলে বাড়ি একেবারে জমজমাট। আমার শ্বশুর-শাশুড়ী কেউ ছিলেন না; স্বামীও বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান।' এই পর্যন্ত বলে একটু থেমেছেন রমাদেবী। পরক্ষণেই আবার শুরু করেছেন, 'যাই হোক, দেশ ভাগের কিছুদিন পর থেকেই সংসারে ভাঙন শুরু হয়েছিল। একে একে খুড়শ্বশুররা জ্যাঠশ্বশুরা নিজেদের নিজেদের অংশ বেচে দিয়ে চলে যেতে লাগলেন। কেউ গেলেন আসাম, কেউ কুচবিহার, কেউ আগরতলা। তাঁরা যাতে না যান সে জন্যে আমার স্বামী বাধা দিতেন, ঝগড়া করতেন কিন্তু কেউ তাঁর কথা শোনেন নি। তাঁরা ঠিকই করেছিলেন, দূরদৃষ্টি ছিল তাঁদের। আমার স্বামী সেদিক থেকে এক-বারে অন্ধ। দেশ সম্বন্ধে আবেগ ছিল তাঁর এত বেশি যে কোন পরিণাম ভাবতে চাইতেন না। তাঁর গোঁয়ার্তুমির জন্যে গ্রামের সেই বাড়িতে আমরা একা পড়ে রইলাম। কিছুতেই, কোনমতেই আমার স্বামী সেখান থেকে নড়বেন না।'

দীপেন বলেছিল, 'তারপর?'

'তারপর আর কি; নীলার কথা তো আগেই বলেছি আপনাকে। তার দিকে তাকিয়ে বুক আমার কাঁপত। শেষ পর্যন্ত ঝগড়াঝাটি করে কেঁদে-কেটে মাথা খুঁড়ে স্বামীকে রাজী করালাম। একদিন দেশের মায়া কাটিয়ে ছেলেমেয়ের হাত ধরে কলকাতার দিকে রওনাও হলাম। আসার সময় একটি পয়সাও আনতে পারি নি। কিন্তু— কিন্তু—'

'কী?'

হঠাৎ যেন উদ্‌ভ্রান্তের মত হয়ে উঠেছেন রমাদেবী। দপ্‌দপে চোখ কঠিন চোয়ালে আর মুষ্টিবদ্ধ হাত-এর মধ্যেই তাঁর সমস্ত অস্থিরতার প্রতিফলন পড়েছিল বুঝি। অস্বা-ভাবিক তীক্ষ্ণ সুরে তিনি বলেছেন 'কলকাতায় তো চলে এলাম। তাতে হল কী? কিছু না কিছু না'—হঠাৎ দু-হাতে মুখ ঢেকে জোরে প্রবলবেগে প্রায় উন্মত্তের মত মাথা নাড়তে আরম্ভ করেছিলেন তিনি।

দীপেন প্রথমটা স্তম্ভিত। তারপর আস্তে আস্তে প্রশ্ন করেছে, 'এখানে এসে কী হয়েছিল আপনাদের?'

বিকৃত শিথিল সুরে রমাদেবী বলেছেন, 'মানুষের জীবন থেকে আমরা পশুর স্তরে নেমে গেছি দীপেনবাবু। এই-টুকুই শুধু হয়েছে।'

দীপেন এবার কিছু বলে নি। শুধু তাকিয়ে থেকেছে।

রমাদেবী আবার বলেছেন, 'দেশ ছেড়ে চলে আসার পর প্রথম কিছুদিন আমরা ছিলাম একটা রিফিউজি ক্যাম্পে। তখন থেকেই ঐ মানুষটা—আমার স্বামী—কেমন যেন হয়ে গিয়েছিলেন। অত সজীবতা যাঁর, অত প্রাণশক্তি যাঁর—তাঁর দিকে আর তাকানোই যেত না। দিনরাত ঘাড় গুঁজে কি যেন ভাবতেন। আস্তে আস্তে শুকিয়ে যেতে লাগলেন তিনি। এরই মধ্যে একদিন আমাদের কপাল পুড়ল। আমার স্বামীর বাঁ দিকটায় পক্ষাঘাত দেখা দিল।'

রুদ্ধশ্বাসে দীপেন বলেছে, 'তারপর?'

'তারপর'—বলেই কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন রমাদেবী। অনেকক্ষণ পর শিথিল সুরে আবার শুরু করেছেন, 'রিফিউজি ক্যাম্পে শেষ পর্যন্ত আমাদের থাকা হয় নি। ওখানকার পরিবেশ ভাল ছিল না। এতকাল যেভাবে যে সচ্ছলতা আর নৈতিক আদর্শের মধ্যে জীবন কাটিয়ে এসেছি তার কণামাত্র ছিল না ক্যাম্পে। সেখানে নানা জায়গার নানা মানুষ এসে ভিড় জমিয়েছিল। দেশ ত্যাগ করে কতটা ভাল আর কতটা মন্দ হয়েছে, বলতে পারব না। তবে—'

'কী?'

'একটা কথা বলতে পারি, নিজের চোখেও আমি তা দেখেছি।'

'কী দেখেছেন?'

'দেশ ভাগ মানুষকে পশুরও অধম করে দিয়েছে।'

[ক্রমশঃ

রম্যরচনার ইতিকথা

স্বপনকুমার বসু

রম্যরচনা কাকে বলে তা নিয়ে বিতর্কের অন্ত নেই। রম্যরচনা নামটি আপাত বিভ্রান্তিকর। নাম দেখে মনে হয় যে কোন রচনা রম্যহলেই তা বুঝি রম্যরচনা হবে, কিন্তু সত্য এরথেকে বহুদূরে। উৎকৃষ্ট রচনা মাত্রেই রম্য, কিন্তু রম্যরচনা মাত্রেই রম্যরচনা নয়। যেমন, ট্রাজেডি মাত্রেই বিয়োগান্তক, কিন্তু বিয়োগান্তক রচনা মাত্রেই ট্রাজেডি নয়।

রম্যরচনার সঠিক কোন সংজ্ঞা নিরূপিত না হলেও হালকা লঘু সুখপাঠ্য রচনাকে আমরা রম্যরচনা বলতে পারি। বিষয়ের সঙ্গে ভাষার, এ দুয়ের সঙ্গে লেখকের আর লেখকের সঙ্গে বুদ্ধিমান ও রসগ্রাহী পাঠকের সংযত ঘনিষ্ঠতাই হল রম্যরচনার মূল সূত্র। রম্যরচনার প্রধান কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হল :—

(১) লেখকের ব্যক্তিত্বের বিভায় সর্বদাই তা ঝলমল করছে।

(২) আলোচনাকে সম্পূর্ণ করবার কোন স্থির প্রয়াস লেখকের মনে থাকে না।

(৩) রম্যরচনা শরৎ আকাশের নিরুদ্দেশ মেঘের মতোই উদ্দেশ্যহীন।

(৪) যুক্তিতর্কের স্বল্পতা।

(৫) লেখকের স্বকীয়তার ছাপ এতে খুব স্পষ্ট থাকে।

(৬) রম্যরচনায় লেখকেরা পান মুক্তির আস্বাদ, আর পাঠকেরা পান লেখকের অন্তরঙ্গ পরিচয়।

(৭) পড়বার সময় পাঠকের মনেও হয় যে এ লেখা কষ্টকল্পিত।

(৮) নির্দিষ্ট লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবার কোন তাড়া লেখকের থাকে না।

(৯) রম্যরচনার বিষয়বস্তু যা খুশী তাই হতে পারে।

(১০) রম্যরচনার প্রাণ হচ্ছে সূক্ষ্ম হাস্যরস। এই শ্রেণীর রচনায় একটি বস্তু বা চিন্তা আমাদের মনকে আকৃষ্ট করেনা, বরং হালকা মনের খুশীতে আমরা জীবনের দিকে লঘুভাবে তাকাতে তাকাতে হাসতে হাসতে পথ চলি। Turil বলেছেন, 'it is the humour of essays··· rather to glance at all things with running conceit than to insist on any'.

রম্যরচনা সম্বন্ধে আলোচনার আগে রম্য রচনার উৎপত্তি সম্বন্ধে দুচার কথা বলা অবান্তর হবে না। অন্যান্য বহু জিনিসের মতোই রম্যরচনাও খাঁটি পাশ্চাত্য জিনিস। সংস্কৃত সাহিত্যে আমরা এই রকম কোন হালকা সুখপাঠ্য রচনার সাক্ষাৎ পাই না। বিশ্বসাহিত্যে মনটেইনই বোধ-হয় এই পর্যায়ের প্রথম লেখক। এই ফরাসী লেথকটিই প্রথম রচনাসাহিত্যকে জাতে তোলবার চেষ্টা করেন। এই ধরণের light essay রচনার ক্ষেত্রে রিচার্ড স্টিল ও জোসেফ অ্যাডিসনের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। তিনি 'The spectator নামে এক অদ্ভুত চিত্তাকর্ষক পত্রিকা বার করেন। এই পত্রিকার রচনাগুলি ছিল সংক্ষিপ্ত এবং সরস, পাণ্ডিত্য এবং গাম্ভীর্যবর্জিত এবং দৈনন্দিন জীবনের অন্তরঙ্গ ভাষায় রচিত। সাহিত্যের আলোচনা, ফ্যাসান সংক্রান্ত আলো-চনা, সামাজিক রুচি প্রভৃতি সম্পর্কে চুটকি লেখা ছিল এই পত্রিকার সম্পদ। অ্যাডিসন তাঁর কল্পিত 'spectator' ক্লাবের কল্পিত সভ্যদের (যেমন : Roger de coverly) চিত্তাকর্ষক চরিত্র সৃষ্টি করে তাদের জবানীতে বিচিত্র রস সরবরাহ করতেন। কিন্তু ইংরেজি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রম্য-রচনাকার হচ্ছেন চার্লস ল্যাম্ব। জীবনে তিনি যে দুঃখ পেয়েছিলেন তাকে বড় করে না দেখে তিনি এক বিচিত্র সহজ সরল দৃষ্টিতে সব জিনিসকে দেখতেন। সেই জন্যেই তিনি শূয়োরের মাংসের উপর জ্ঞানগর্ভ রচনা লিখতে পেরে ছিলেন। ল্যাম্ব তাঁর অফিসের বন্ধুদের নিয়ে, স্কুল শিক্ষকদের নিয়ে, বড়লোকের গরীব আত্মীয়দের নিয়ে, পরিহাসচ্ছলে যে হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন তার পেছনে সমালোচকের দৃষ্টি নেই, আছে বঞ্চিত মানুষের করুণ দীর্ঘশ্বাস!

ইংরেজি সাহিত্যে এই ধরণের অন্যান্য রচনার মধ্যে কার্লাইলের 'Sartor Resartus' স্কটের 'Tales of my Landlord' রাস্কিনের 'A Blade of Grass,' ডি কুয়েন্সির 'The Confeosions of on English opium Eater, রিচার্ড জেশোরিজের 'The pigeons at the British Museum, লি-হান্টের 'The cat by the Fire' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিংশ শতাব্দীর অন্যান্য রম্যরচনাকারদের মধ্যে চেষ্টারটন, বেলক, ল্যুকস, গ্যার্ডিনার, বীয়র বম, জেরোম কে জেরোম, রবার্ট লিণ্ড, প্রিসটলি ও পি, জি, উডহাউসের নাম উল্লেখযোগ্য।

রম্যরচনার পুর্বস্তর ব্যঙ্গরচনার ক্ষেত্রে প্রাচীন যুগে এরিষ্টোফেনিস ও জুভেনাল, মধ্যযুগে চসার, সারভাস্তেস, ভলটেয়র ও র‍্যাব্‌লে, আধুনিক যুগে আনাতোল ফ্রাঁস, আলফাঁস, দোদে, মলেয়র, ড্রাইডেন, পোপ, 'শ-এই নামগুলি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

বাংলা সাহিত্যে প্রথম এই ধরণের লঘু রচনা লেখেন বোধহয় ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর স্পর্শে বাংলা সাহিত্য সজীব হয়ে ওঠে। তিনি যদিও শুধু রস-সাহিত্যিকই ছিলেন না, তবুও এই ক্ষেত্রেই তাঁর কৃতিত্ব সমধিক। তিনি যে যুগে বাংলা ভাষায় লঘু জিনিস রচনা করেন, সে যুগে তিনি ছিলেন একক। 'কলিকাতা কমলালয়' ও 'নববাবুবিলাস' তাঁর দুটি হালকা সুখপাঠ্য রচনা। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে রচিত 'কলিকাতা কমলালয়' হতে তাঁর রচনার কিছু নিদর্শন দেয়া যাক্‌:

'দোকানদারের বাপেও এমত সোনার হল করিয়া কেতাব সাজাইয়া রাখিতে পারে না। আর তাহাতে এমন যত্ন করেন একশত বৎসরেও কেহ বোধ করিতে পারেন না যে এই কেতাব কাহারও হস্তস্পর্শ হইয়াছে।'

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় যদিও পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনাতেই সিদ্ধহস্ত, তবুও তিনি তাঁর প্রতিপক্ষদের নাস্তানাবুদ করবার জন্যে 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য" এই ছদ্মনামে কতকগুলি ব্যঙ্গপুস্তিকা লিখেছিলেন। এই পুস্তিকাগুলির কৌতুকাবহ ভাষা ও পরিহাস-মুখর বর্ণনা-ভঙ্গিমায় বিদ্যাসাগরের রম্যরচনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর 'ব্রজবিলাস' রচনাটির সুর লঘুপ্রবন্ধেরই সুর। এগুলি ছাড়াও বিদ্যাসাগরের রম্যরচনা জাতীয় লেখা আরও আছে।

প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলালে' তাঁর যে সরস পরিহাসরসিক মনটির পরিচয় পাওয়া যায় সেইটিই তাঁর আসল পরিচয়। ধনীর দুলাল মতিলাল কুসঙ্গে মিশে কিভাবে অধঃপতনে গিয়েছিল তাই এর মুখ্য বক্তব্য হলেও বইটিকে একটি উৎকৃষ্ট রম্যরচনা বলাই শ্রেয়!

'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র লেখক তৎকালীন ধনী আভিজাত সম্প্রদায়কে অবলম্বন করে তৎকালীন বঙ্গ-সমাজের বিশেষত কলকাতার সমাজের ঘৃণ্য বিলাসিতাপূর্ণ এবং রীতিবর্জিত সমাজের নকশা এঁকেছেন। 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র বহু দোষ থাকলেও বাংলা ভাষায় যে সাথক লঘু সুখপাঠ্য জিনিস রচনা করা যেতে পারে, কালীপ্রসন্ন সিংহই প্রথম তা দেখান। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'হুজুক' শিরোনামার অন্তর্গত 'মহাপুরুষ' এবং 'মরাফেরা' রচনাদ্বয় এবং 'বুজরুকি' শিরোনামার অন্তর্গত 'ভূত নাবানো' রচনাটি উল্লেখযোগ্য। 'রচনা-গুলির আয়তন পরিমিত, বর্ণনা জীবন্ত, এখানকার পরিহাসতরলতা এবং অপরুচি উভয়বর্জিত'...এগুলিকে রম্যরচনা বললে ভুল হবে না। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'দুর্গোৎসব' একটি লঘু রচনা।

বঙ্কিমচন্দ্রে এসে বাংলা রম্যরচনার ক্ষেত্রে একটি নতুন যুগের সূত্রপাত হলো। তাঁর লেখনীতেই পরিস্ফুট হলো ব্যক্তিগত প্রবন্ধ ও রসরচনার প্রথম অভিনব রূপ। স্টাইলের দিক থেকে বিচার করলে বলতে হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে এ জাতীয় রস পরিবেশনের রীতি প্রায় ক্রটিহীন। পূর্বেকার রম্যরচনায় যে স্থূলতা ছিল, বঙ্কিম তাতে যোগ করলেন রসঘন সূক্ষ্মতা।

'বাংলা সাহিত্যে 'কমলাকান্তের দপ্তরের' মতন সুখদুঃখ ও লঘুগুরু মেশানো এমন বিচিত্র রসোৎসারী রম্যরচনা নেই বললেই হয়।' 'কমলাকান্তের দপ্তরের' ওপর পাশ্চাত্য প্রভাব যথেষ্ট থাকলেও এর লেখার স্টাইলটি অতুলনীয়। হাস্যের অধরে অশ্রুর রেখা কমলাকান্ত চরিত্রে সার্থক রূপ পেয়েছে। ভাবতে অবাক লাগে, যে বঙ্কিমচন্দ্র 'সীতারাম', 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী'র মতো

তত্ত্বকণ্টকিত উপন্যাস লিখেছেন, তিনিই আবার 'লোক-রহস্যে'র মতো সরস রচনা লিখেছেন। আসলে বঙ্কিমের দুটি সত্তা, একটি নীতিবাগীশ আর একটি পরিহাস রসিক। তাঁর রচনার নিদর্শন হিসেবে 'কমলাকান্তের দপ্তরের' 'মনুষ্যফল' রচনাটি থেকে সামান্য উদ্ধৃতি দেওয়া যাক। এই রচনাটিতে তিনি স্ত্রীলোককে নারকেলের সঙ্গে তুলনা প্রসঙ্গে বড় চমৎকার করে বলেছেন :

'তবে ঝুনো হইলে জল একটু ঝাল হইয়া যায়। রামার মা ঝুনো হইলে পর, রামার বাপ ঝালের চোটে বাড়ী ছাড়িয়াছিল। এইজন্য নারকেলের মধ্যে ডাবের আদর।'

'বাবু' তাঁর শ্রেষ্ঠ রম্যরচনা। 'মুচিরাম গুড়ের জীবন-চরিত'ও এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতোই রম্যরচনার ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব 'কলোসাসে'র মতো। 'রবীন্দ্রনাথের লেখনীর গুণে লঘু প্রবন্ধ কখনও হয়েছে কবিত্বময় কথিকাবিশেষ, কখনও একটি তুচ্ছ এবং আপাতসামান্য বিষয়কে কেন্দ্র করে কল্পনার সঞ্চারী শোভা, কখনও বা চিন্তনীয় গুরুকথার অতি সরস বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণ।' (দ্রঃ রম্যরচনা ও রবীন্দ্রনাথ—শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়) তাঁর 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র কয়েকটি প্রবন্ধকে উৎকৃষ্ট রম্যরচনার পর্যায়ভুক্ত করা যায়। তাঁর 'পঞ্চভূতে'র প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধে বলা যায় এগুলি রম্যও বটে, রচনাও বটে, কিন্তু রম্যরচনা নয়। অবশ্য 'পঞ্চভূতের 'মন' প্রবন্ধটি এর উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। এটির কৌতুক-কল্পনা সত্যিই চিত্তাকর্ষক। এটিকে একটি উৎকৃষ্ট রম্যরচনা বলা চলে। 'মন' রচনাটিতে তিনি অতুলনীয় ভাষায় বলেছেন :

'ভাগ্যে গাছেদের মধ্যে চিন্তাশীলতা নাই। ভাগ্যে ধুতুরা গাছ কামিনীগাছকে সমালোচনা করিয়া বলে না, 'তোমার ফুলের মধ্যে কোমলতা আছে কিন্তু ওজস্বিতা নাই; এবং কুলফল কাঁঠালকে বলে না 'তুমি আপনাকে বড় মনে কর কিন্তু আমি তোমা অপেক্ষা কুষ্মাণ্ডকে ঢের উচ্চ আসন দিই।'

রবীন্দ্রনাথের উত্তরসাধক বলেন্দ্রনাথ। তাঁর 'যাত্রা', 'বোলতা', 'মধ্যাহ্ন' প্রভৃতি প্রবন্ধে তাঁর রসঘন বর্ণনা-শক্তির অপূর্ব প্রকাশ দেখা গেছে। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সরস রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কিন্তু বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে লেখার জন্যে তাঁর রচনার রম্যতাগুণ বহু জায়গায় একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

রসঘন রচনায় ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। তাঁর রচনার মধ্যে ব্যঙ্গ ও কৌতুকের চমৎকার মিশ্রণ দেখা যায়। জন্ম ও জীবনকে নিয়ে যে রসের কারবার তা গভীর অনুভূতি সাপেক্ষ—শুধু গভীর অনুভূতি সাপেক্ষও নয়—অতি সূক্ষ্মদৃষ্টি না থাকলে সে রসের সন্ধান পাওয়া যায় না। ত্রৈলোক্যনাথের এই বিরল সূক্ষ্মদৃষ্টি ছিল।

প্রমথ চৌধুরী বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রম্য-রচনাকার। তিনি পুরোপুরি মনটেইন পন্থী। তিনি হালকা চালের মধ্যে দিয়ে হাস্যরস পরিবেশন করতে চেয়েছেন। 'বীরবলের হালখাতা' 'চারইয়ারী কথা' প্রভৃতি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। প্রমথ চৌধুরীর শ্রেষ্ঠ রম্য-রচনা 'তোমরা ও আমরা' থেকে তাঁর রচনার সামান্য নিদর্শন দেওয়া যাক :

'আমরা স্থাবর, তোমরা জঙ্গম। তোমাদের আদর্শ জানোয়ার, আমাদের আদর্শ উদ্ভিদ।'

রম্যরচনাকার হিসেবে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাম উল্লেখ-যোগ্য। তাঁর বহু পত্র ও চুটকি লেখা তাঁর সরস মনটির পরিচয় বহন করে। অতুলচন্দ্র গুপ্ত শুধু পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ রচনাতেই সিদ্ধহস্ত ছিলেন না। তিনি একজন উৎকৃষ্ট রম্যরচনাকারও বটেন। 'নদী পথে' তাঁর শ্রেষ্ঠ রম্য-রচনা।

রম্যরচনাকার হিসেবে ধূর্জটিপ্রসাদের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। 'মশারি' তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রম্যরচনা।

রম্যরচনাকার হিসেবে কেদারনাথ বন্দোপাধ্যায়ের নাম সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। এই অদ্ভুত প্রতিভা-শালী লেখকটি আধুনিক লঘু রচনার পথিকৃৎ। তাঁর রচনায় ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও সরস বাক্‌ভঙ্গীর চমৎকার মিশ্রণ দেখা যায়।

এই ধরণের আর একজন মেজাজী লেখক ছিলেন চারুচন্দ্র দত্ত।

এ যুগের রম্যরচনাকারদের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে

প্রথমেই বুদ্ধদেব বসুর কথা মনে আসে। 'লঘু প্রবন্ধ রচনায় বুদ্ধদেব বসু একটি নতুন পথ খুলে দিয়েছিলেন যার মধ্যে কিশোর কালের বিস্ময় ও যৌবনের উন্মুখ মন ঐশ্বর্য-বান ভাষায় আত্মপ্রকাশ করেছিল। বুদ্ধদেব বসুর বাগ্-বৈদগ্ধ্য সত্যই প্রশংসনীয়। 'উত্তর-তিরিশ', 'সব পেয়েছির দেশে,' 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' প্রভৃতি তাঁর রম্যরচনা গ্রন্থ।

সৈয়দ মুজতবা আলী serious লেখার ধার ধারেন না। গুরু বিষয়ে ইনি চমৎকার লঘু প্রবন্ধ রচনা করতে পারেন। 'পঞ্চতন্ত্র' 'চাচা কাহিনী' প্রভৃতিতে লেখকের এই ধরণের রচনালেখার অপূর্ব মুন্সীয়ানা দেখা যায়। তাঁর রচনার নিদর্শন স্বরূপ 'পঞ্চতন্ত্র' বইয়ের 'প্যারিস' নামক রচনা থেকে সামান্য অংশ উদ্ধৃত করা গেল:

'প্রথমত, প্যারিসের মেয়েরা সুন্দরী বটে ইংরেজ মেয়েরা বড্ড ব্যাটামুখো, জর্মন মেয়েরা ভোঁতা, ইতালীয়ন মেয়েরা অনেকটা ভারতবাসীর মত (তাদের জন্য ইউরোপ আসার কি প্রয়োজন?) আর বলকান মেয়েদের প্রেমিকরা হরবকতই মারমুখো হয়ে আছে (প্রাণটা তো বাঁচিয়ে চলতে হবে)। তার উপর আরো একটা কারণ রয়েছে ফরাসী মেয়ে সত্যি জামা কাপড় পরার কায়দা জানে অল্প পয়সায়—অর্থাৎ তাদের রুচি উত্তম।'

pun রচনায় সিদ্ধহস্ত শিবরাম চক্রবর্তী একজন উৎকৃষ্ট রম্যরচনাকারও বটেন। তিনি লঘু বিষয়েই লঘু জিনিস রচনা করেন।

এ ছাড়া বনফুল, প্রমথনাথ বিশী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অন্নদাশঙ্কর রায় ও বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিভাও অমুল্লেখনীয় নয়।

অতি আধুনিক যুগে যাঁরা রম্যরচনাকে সমৃদ্ধ করতে প্রয়াসী তাঁদের মধ্যে রূপদর্শী, অজিতকৃষ্ণ বসু, নীলকণ্ঠ, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, কবি অজিত দত্ত, যাযাবর, রঞ্জন, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শিবতোষ মুখোপাধ্যায়, পরিমল গোস্বামী, কুমারেশ ঘোষ, নবেন্দু বসু, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার ঘোষ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পরিশেষে বলতে পারি রম্যরচনার যুগ এখনও চলছে। আধুনিক যুগে মানুষ বড় বেশী 'কেজো' হয়ে উঠেছে বলে সে এই ধরণের হালকা রচনায় খুবই আনন্দ পায়, যার জন্যে রম্যরচনার ভবিষ্যৎ অত্যন্ত আশাপ্রদ। রম্যরচনার জনপ্রিয়তার আর একটি কারণ আছে। আধুনিক মানুষের জীবনে কোন গুরুতর সমস্যা নেই। দেহ, মন ও পেটের ক্ষিদে মেটানোটাই তার কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। আজকের দিনের কোন তরুণের কাছে এইটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা যে সে তার অফিসের Typist মেয়েটিকে বিয়ে করবে, না পাড়ার স্কুল শিক্ষিকাটিকে বিয়ে করবে? এই রকম সমস্যাহীনতার জন্যেই মহৎ কোন কিছু লেখা এখন আর সম্ভব নয়। আর এই জন্যেই বাংলা সাহিত্যে এমন একটা যুগ আসবে যাকে 'হালকা রচনার যুগ' বলে অভি-হিত করা যাবে।

আজি হতে শত বর্ষ পরে

এক-বিংশ শতকের গবেষক :—পেয়েছি···পেয়েছি···এতক্ষণে সন্ধান পেয়েছি —মাটির নীচে থেকে খুঁড়ে-তোলা এ সব প্রাচীন-নিদর্শনের !···পুঁথি-পত্র-কেতাব ঘেঁটে ···মাইক্রোস্কোপে পরখ করে দেখে এখন ঠাওর হচ্ছে যে এগুলি আসলে—আজ থেকে একশো বছর আগেকার আমলের সামগ্রী···পশ্চিম-বাঙলার ধনী-দরিদ্র আবালবৃদ্ধবনিতার নিত্য-দিনের খাদ্য—মাছ, সরষের তেল আর সন্দেশ ! ···জানি না কোন্ বিশেষ কারণে, এখন থেকে প্রায় একশো বছর আগে বাঙালীর পরম-প্রিয় এ সব আহার্য্য-সামগ্রী একদা একান্তই দুর্লভ হয়ে উঠে চিরতরে লোপ পেয়ে গিয়েছিল ।

শিল্পী—পৃথ্বী দেবশর্ম্মা

সংসর্গ

শ্রী দত্তা

ইংরাজিতে একটি কথা আছে—"A man is known by the company he keeps"—অর্থাৎ মানুষকে চেনা যায় তার সঙ্গীদের দেখে। যে ব্যক্তির যে রকম সঙ্গী-সাথী, বন্ধু-বান্ধব দেখা যায় সেই ব্যক্তিও প্রায় সেই রকম চরিত্রের, মেজাজের, স্বভাবের হবে বলে ধরে নেওয়া হয় এবং এই ধারণা যে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ঠিক হয়, তাও প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং দেখা যায় যার সঙ্গী-সাথীরা সৎ প্রকৃতির হয় বা যে ব্যক্তি সর্বসময় সৎসঙ্গে মেশে, সেই ব্যক্তিও সাধারণতঃ সৎ প্রকৃতির হয়ে থাকে। অপর পক্ষে যার বন্ধু-বান্ধবেরা অসৎ প্রকৃতির হয়, দেখা যায় তার প্রকৃতিও অসৎই হয়ে থাকে।

বিদ্যালয়গামী ছেলে মেয়েদের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যারা মেধাবী ও পড়াশুনায় মনোযোগী তারা সাধারণতঃ পাঠানুরাগী ভাল ছেলে মেয়েদের সঙ্গেই মেশে। যারা ক্রীড়ানুরাগী তারা খেলাধুলার ভক্ত ছেলেদেরই বন্ধু বেশী পছন্দ করে। যারা সামাজিক কর্ম্ম বা গঠনমূলক কর্ম করতে ভালবাসে তারা সভা, সমিতি ও নানা উৎসব অনুষ্ঠানকারী কর্ম্মীদেরই সাথী হয়। আর যারা পাঠে অমনোযোগী হয় এবং হৈ হুল্লোড় করতেই আনন্দ পায় তারা আজ ষ্ট্রাইক, কাল শোভাযাত্রা, পরশু অন্য কোন গণ্ডগোল সৃষ্টিকারী এইরূপ ছেলেদের সঙ্গী হয়ে নিজেদের ক্ষতি করে থাকে। এছাড়া আর একদল আছে যারা কিছুই করে না শুধু আড্ডা ও আমোদে সময় কাটায় ও বিলাস ব্যসনে অপব্যয় করে। এদের সঙ্গে যারা মেশে তারাও ঐ রকম স্বভাবের ও প্রকৃতির হয়ে থাকে।

এবার তোমরা ভেবে দেখ তোমাদের সঙ্গী সাথী ও বন্ধুবান্ধবেরা কোন ধরণের। মনে রেখ যে যাদের সঙ্গে তোমরা মিশবে তাদের প্রভাব তোমাদের ওপর পড়বেই। যদি সঙ্গীরা ভাল হয় তাহলে তাদের সঙ্গে মেশার ফল ভালই হবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু অপর পক্ষে যদি বন্ধুদের কুপ্রভাব তোমাদের ওপর পড়ে তাহলে তোমাদের যথেষ্ট ক্ষতি হতে পারে। সংস্কৃতে একটা বচন আছে—"সংসর্গজাঃ দোষগুণাঃ ভবন্তি"। অর্থাৎ মানুষের দোষগুণের সৃষ্টি হয় সংসর্গ থেকে। সুতরাং তোমরা এই সংসর্গ বিষয়ে বিশেষ সজাগ থাকবে। হয়ত যাদের খুব মনের জোর তারা সঙ্গীদের কুপ্রভাবে প্রভাবিত হবে না। কিন্তু সবাইকার মন তো এক ধাতুতে তৈরী নয়। অনেক সুকুমার মতি ছেলে মেয়ে আছে যারা কুসংসর্গে পড়ে খারাপ হয়ে যেতে পারে। বিশেষ করে ছেলে বয়সেই এই সংসর্গের প্রভাবটা খুব বেশী কার্য্যকরী হয়। দেখা গেছে অনেক ভাল ছেলেও কুসংসর্গে মিশে মতি স্থির রাখতে না পেরে ভুল পথে পা দিয়েছে, এবং উত্তরকালে তাদের জীবন বিষময় হয়ে উঠেছে। তখন হয়ত তারা বুঝতে পেরেছে তাদের ভুল, কিন্তু তখন আর ফেরবার পথ

না থাকায় শুধু আফশোষই সম্বল হয়েছে। তাই বলি সঙ্গী নির্ব্বাচনে সদা সতর্ক থাকবে। অবশ্য এ বিষয়ে পিতামাতা বা অভিভাবকদেরও পূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে। তাঁদেরও উচিত সর্ব্বসময়ে দৃষ্টি রাখা তাঁদের ছেলে মেয়েদের সঙ্গী-সাথীদের প্রতি। ছেলেমেয়েরা যাতে তাদের সঙ্গী নির্ব্বাচন ঠিক মত করতে পারে, সে বিষয়েও তাঁদের সাহায্য করা উচিত।

যাই হোক, পিতামাতা ও অভিভাবদের দায়িত্ব তাঁরা পালন করবেন, কিন্তু তোমরা, সুকুমার মতি বালক-বালিকারা, এই সংসর্গ বিষয়ে সদা সতর্ক থেক। দেখবে সৎসংসর্গে মেশার ফল তোমরা পাবেই। তাতে তোমাদের জীবনও সুন্দর, সুস্থ, সচ্ছল হয়ে উঠবে।

***

বিচারক

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ সরকার

দাদা—

চমকে যায় রন্টি।

আনমনে বসে বসে 'টিটুল ডাকুর' কীর্তিকাহিনী দেখছিল রোববারের অমৃতবাজারে।

এমন সময়ে ছোট ভায়ের গলা শোনা গেল—দাদা—'

"কিরে ?" রন্টি প্রশ্ন করে।

কাঁদো-কাঁদো স্বরে মন্টি বলে, "রিনি বল্লে কি জানো—ওর নতুন ফ্রক্‌টা আমার এই জামাটার চেয়েও ভালো। মিথ্যে কথা না ?" হো হো করে হেসে ওঠে রন্টি।

"দ্যাৎ পাগলা—কে বল্লে তোরটা খারাপ ?"

"কেন, রিনি বললো যে" চোখ মুছতে মুছতে মন্টি বলে।

"না দাদা, ও মিথ্যে কথা বলছে। আমার ফ্রকটা নাকি ওর জামার চেয়ে খারাপ, উঁ উঁ," রিনি পাল্টা জব্দ করে মন্টিকে।

"তাতা,—তাতা—আমাল কলকাতা বালো না—" আধো আধো কথা বল্‌তে বল্‌তে অভিযোগ জানায় মিনি। রিনি নাকি বলেছে ওর জামা-ই সবচেয়ে সুন্দর।

সবার এ অভিযোগের বিচার করতে হবে বড়দা রন্টিকে। তারই বা বয়স কতো ?

খুব জোর দশ কি এগারো।

পাড়ার রন্টির নাম শুন্‌লে বাগানের মালীরা সবাই বাগান সামলাতে ব্যস্ত থাকে। দস্যিপনায় তার জুড়ি মেলা ভার !

তার হাতে কিনা এমন একটা কেস্ পড়েছে !

ছোট কাকা উকিল। তার কাছে কত কি শুনেছে রন্টি। কেমন করে জজ্ সাহেবরা চেয়ারে বসে বিচার করে, আসামীরা কাঠগড়ায় দাঁড়ায়, উকিল, মোক্তার, সাক্ষী আরও কত কি !

চট্ করে মাথায় এক বুদ্ধি খেলে যায় রন্টির।

তাড়াতাড়ি ছোট্ট টেবিলটাকে এগিয়ে নেয় ঘরের মাঝখানে।

বেঞ্চিগুলো একটু দূরে সরিয়ে দেয়। দুটো চেয়ার দুদিকে দেয় এবার টেবিলটায় বসে গম্ভীর হয়ে বিচার করে সে।

"এই মন্টি, এদিকের চেয়ারটায় তুই আর মিনি বোস," গম্ভীর বিচারক আদেশ দেন।

"আর এই বাঁ-পাশে রিনি বোস।" "বল, তোমাদের কি বিচার করতে হবে ?" বিচারক রন্টির জলদগম্ভীর গলা শোনা যায়।

"দাদা,

তাতা—"

এক সঙ্গে অভিযোগ জানায় মন্টি আর মিনি, রিনি ভয়ে কাঁদো কাঁদো।

"তোমরা জানোনা বিচারের জন্য ফি দিতে হয়। এই মন্টি তোর জমানো পয়সাগুলো নিয়ে আয় না।"

দাদার ধমকে পুরোনো কৌটো থেকে ফুটো পাঁচটা পয়সা এনে দেয় মন্টি।

"ব্যাস, এক মিনিট," পয়সা নিয়ে হাওয়া কাটে মন্টি। তারপর পাঁচটা চকোলেট হাতে ফিরে আসে।

এবার বিচারালয়ের বিচার সুরু। "এই চকোলেট দেখছো, দেখো এগুলোর ওপরের রঙ এক একটা—এক এক রকমের কেমন," রন্টির উদাহরণ সুরু হয়।

"আসলে এই ওপরের কাগজটা খুলে ফেললে ভেতরের সবগুলোই দেখতে এক যেমন, তেমনি তোমাদের ফ্রক বা সার্ট এক একটা দেখতে এক এক রকম হলেও, আসলে সবগুলোই জামা। তাহ'লে সবই সমান, ভালো মন্দ কিছু নেই।"

রন্টি বিচার শেষ করে।

সত্যি বুদ্ধির তারিফ করতে হয় রন্টির। তারপর প্রত্যেককে একটা করে চকোলেট দিয়ে বাকী তুটো নিজে মুখে পুরে দেয়।

আর সবাই একটু অবাক হয়ে তাকায় ওর দিকে।

সবজান্তার হাসি হাস্তে হাস্তে রন্টি বলে, "বারে! আমি একটা বেশী পাবোনা, আমি যে তোদের বিচারক।"

অনুযোগ
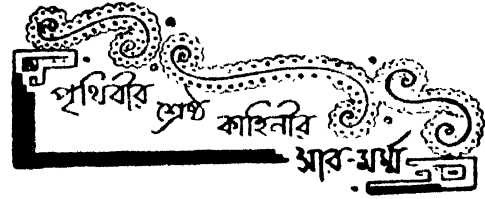
হীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

ছোট্ট খোকার তুষ্টুমীতে
কাঁপে গো চারদিক,
মিষ্টি ছেলে মোটেই সে নয়—
সৃষ্টি ছাড়া ঠিক।
মা রেগে তাই ধমকে উঠে
বললে,—'খোকন সরো,
ভাল তোমায় বাসবেনা কেউ
তুষ্টু তুমি বড়ো।'
অভিমানে চোখের কোণে
এলো যে জল ছেয়ে—
বললে খোকন ফিস্‌ফিসিয়ে
মায়ের পানে চেয়ে—
'মিছেই তুমি বকছো মাগো,
কিচ্ছুটি না জেনে;
পড়নি কি সুভাষ-চরিত—
সেই যে দিলে এনে?
তুষ্টু নাকি ছিলেন ওমা
ছোট্ট সুভাষ বোস্—
সে সব কথা বলবে নাকো,
আমারই সব দোষ!'

—

জর্জ এলিয়ট
রচিত

সাইলাস মারনার্

সৌম্য গুপ্ত

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এতদিন এত যত্নে সাবধানে তিলে তিলে সঞ্চয় করে রাখা মোহরের থলি হারিয়ে সাইলাস্ শোকে-তুঃখে পাগলের মতো হয়ে উঠলো। তার ধারণা হলো—এ নিশ্চয় রাভেলো গ্রামের ডাকসাইটে দাগী চোর জিম রড্‌নির কারসাজি। কথাটা মনে জাগতেই সাইলাস্ আর এক মুহূর্ত্তও দেরী করলো না···ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করেই সে ছুটলো 'রেন্‌বো' সরাইখানায়—নিত্য সন্ধ্যায় সেখানে আড্ডা জমিয়ে বসেন গ্রামের যত হোমড়া-চোমড়া মুরুব্বী-মাতব্বর ব্যক্তিরা··· তাঁদের সবাইকে মোহর চুরির খবর জানিয়ে হারানো ধন উদ্ধারের ব্যবস্থা করবে সাইলাস্!

এমন তুর্য্যোগের রাতে সাইলাস্‌কে আচম্‌কা 'রেনবো' সরাইখানায় পাগলের মতো ছুটে আসতে দেখে গ্রামের মাতব্বর-ব্যক্তিরা তো সবাই অবাক। সরাইখানার আসরে তখন জিম্ রড্‌নিও বসে আড্ডা জমিয়ে ছিল অন্য সকলের সঙ্গে···তাকে দেখেই সাইলাস্ তো মহা খাপ্পা···

থানার চৌকিদারকে ডেকে এনে তখনি হাজতে পাঠানোর ব্যবস্থা করে আর কি, এমন সময় আশপাশের মুরুব্বী-মাতব্বর ব্যক্তিরা শশব্যস্তে এগিয়ে এসে কোনোমতে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সে হাঙ্গামা সামলালেন। সাইলাস্ গ্রামের লোকজনদের সবাইকে খুলে বললো—তার মোহর-চুরির কাহিনী। সে কাহিনী শুনে গ্রামের মাতব্বররা সাইলাসের দুর্ভাগ্যে তাদের সহানুভূতি জানালেও, আসলে মোহর চুরি করেছে কে—তার কোনো সঠিক পরিচয় ঠাওরাতে পারলেন না। কারো কারো সন্দেহ হলো—কদিন আগে ভিন-দেশের অজানা অচেনা যে ফেরিওয়ালা রাভেলো গ্রামে টুকিটাকি সওদা বেচতে এসেছিল, এ হয়তো তারই কারসাজি। কারণ, এই মোহর চুরির ঘটনার পরের দিনই সাইলাসের কুটিরের পিছনে নিরালা পাহাড়ী-খাদের পাশে জংলী পথের ধারে চোরের পায়ের চিহ্ন খুঁজে বেড়ানোর সময় গড্‌ফ্রে হঠাৎ কুড়িয়ে পেলো—ছোট্ট একটি চকমকির বাক্স। গ্রামের লোকের ধারণা হলো যে সাইলাসের মোহর চুরির সঙ্গে পাহাড়ী খাদের পাশে হঠাৎ পথে কুড়িয়ে পাওয়া এই চকমকির বাক্সের সম্ভবতঃ বেশ খানিকটা নিবিড় সম্পর্ক আছে। কাজেই তারা সবাই এ ব্যাপারেই মাথা ঘামাতে সুরু করে দিলো···কিন্তু আসলে, ডানসি যে সেই মোহর চুরির ঘটনার রাত্রে গ্রাম ছেড়ে হঠাৎ কোথায় নিরুদ্দেশ হয়েছিল, সে খেয়াল আর কারো মাথায় এলো না দৈবাৎ্কারেও। সকলেই ধরে নিয়েছিল যে বেয়াড়া বাউণ্ডুলে হলেও, ডান্‌সি জমীদারের ছেলে—এমন অপকর্ম সে কখনো করবে না···হয় তো বাপের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করে ঝোঁকের মাথায় গ্রাম ছেড়ে সেই রাত্রে সে অন্য কোথাও চলে গিয়ে আস্তানা পেতে বসেছে। সুতরাং ডান্‌সির সম্বন্ধে রাভেলো গ্রামের বাসিন্দারা কেউই বিশেষ খোঁজ-খবর করলো না। এমন কি, ডান্‌সির দাদা গড্‌ফ্রে আর তার কাকা কিম্বল—কারো মনে এতটুকু সন্দেহও জাগলো না যে সাইলাসের মোহর চুরির আসল আসামী কে!

বেচারী সাইলাস্!···মোহর চুরির ঘটনা নিয়ে গ্রামের লোকজন সবাই দিনের পর দিন নিত্য সকাল-সন্ধ্যায় ছোট বড় রীতিমত মজলিশ জাঁকিয়ে তুলে ভালো-মন্দ নানা রকম আলাপ আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক, গাল-গল্প, গুজব মন্তব্য করেও শেষ পর্য্যন্ত চোরের কোনো হদিশ কিম্বা হারানো ধন উদ্ধারের কোনো উপায় খুঁজে পেলো না। কাজেই সাইলাসের এই ক্ষতি···এমন দুঃখে দুর্ভাগ্যে শুধু মৌখিক সমবেদনা আর সহানুভূতি জানানো ছাড়া, গ্রামের লোকেরা তার আর বিশেষ কিছু উপকার করতে পারলো না। তবে গ্রামের প্রান্তে নিরালা কুটিরে নিঃসঙ্গ-ভাবে বসবাস করলেও, রাভেলোর লোকজনেরা সবাই সাইলাসকে ভালোবাসতো···করুণা দৃষ্টিতে দেখতো। কাজেই মোহর চুরির ঘটনার ফলে, নিরীহ নির্ব্বিরোধ-অসহায় সাইলাস বেচারীর উপর তাদের দয়া-মায়া মমতা আরো নিবিড় হয়ে উঠলো।

সাইলাস কিন্তু এই মোহর চুরির ঘটনার অতর্কিত দাপটে আগের চেয়ে আরো বেশী মুশড়ে ভেঙে পড়লো! এতদিন লোক-সমাজের বাইরে নিরালা কুটীরে তার নিঃসঙ্গ জীবনে নিত্য-নিয়মিত তাঁত-বোনার অবসরে সযত্নে তিলে-তিলে জমিয়ে তুলে রাখা যে মোহরগুলি দেখাই ছিল এক-মাত্র আনন্দ, দৈব-দুর্বিপাকে সেগুলি হারানোর ফলে, সাই-লাসের মন কি তুই হঠাৎ যেন নিমেষেই শূন্য···নিরানন্দময় ···নিতান্তই অসার হয়ে গেল···বেঁচে থাকাটাই তার কাছে অসহ্য যন্ত্রণা···বিড়ম্বনা বোধ হতে লাগলো!···গ্রামের লোকজনের ধারে-কাছেও ঘেঁষে না সে সারা দিন-রাত নিজের নিরালা কুটিরে একা আপন মনে বসে বসে এক-টানা শুধু তাঁতের মাকু চালিয়ে কাপড় বোনে। স্নানাহার বিশ্রামেরও কোনো খেয়াল নেই···সর্ব্বদাই কেমন অদ্ভুত যেন একটা মৌন উদাসী উদ্‌ভ্রান্ত ভাব—দেখলে মনে হয়, সাইলাস্ বুঝি কোন অন্য জগতের মানুষ!···হাতের কাজ ফুরোলে কিম্বা কোনো কাজ না থাকলে, অবসর সময়টুকু সাইলাস্ একা নির্জ্জন তাঁত ঘরের কোণে বসেই দুঃখে-হতাশায় আপন মনেই চোখের জল ফেলে কাঁদে···উন্মাদের মতো আর্ত্তনাদ করে!···সাইলাসের এ সব কাণ্ড-কারখানা দেখে, গ্রামের লোকজনেরা প্রায়ই নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতো,—'মোহরের শোকে দেখছি, বেচারীর মাথাটাই খারাপ হবে শেষে'!

সাইলাসের দুর্ভাগ্যে, গ্রামের লোকজন···পাড়াপড়শী সকলের মনেই ক্রমে আরো বেশী মায়া-মমতা, করুণা সহানুভূতি জাগলো··ফুরসৎ পেলেই ছেলে-বুড়ো, মেয়ে-

পুরুষ অনেকেই আসতো নিঃসঙ্গ সাইলাসের খোঁজ-খবর নিতে···তার কোনো অভাব-অভিযোগ আছে কিনা জানতে···মাঝে মাঝে পাল-পার্ব্বণের দিনে আশপাশের বাড়ীর বৌ-ঝিদের মধ্যে কেউ-কেউ আবার আসতেন নিজেদের হাতের রান্না কেক্, প্যাষ্ট্রী, পুডিং কিম্বা বাগানের গাছের ফল-পাকুড়, তরী-তরকারী উপহার দিয়ে যেতে। তাঁদের মধ্যে গিন্নীরা অনেকেই আবার সাইলাসের কাছে আসবার সময় তাঁদের ফুটফুটে-চঞ্চল ছোট্ট ছেলে মেয়েদেরও সঙ্গে নিয়ে আসতেন। হয়তো তাদের ধারণা ছিল যে ছোট ছেলে মেয়েদের দেখলে বা তাদের সঙ্গে হৈ-চৈ আর খেলাধূলো করলে, সাইলাসের মনের হতাশ-ভাব ঘুচবে। সাইলাসের কিন্তু ছোট ছেলেমেয়ে দেখলেও, কোনো রকম ভাবান্তর ঘটতো না···বরং সে যেন আরো বেশী—এবং এমন গম্ভীর হয়ে যেতো যে ছেলে মেয়েরা শেষে ভয় পেয়ে তার কাছে আর ঘেঁষতে চাইতো না বিশেষ তেমন। সাইলাসের এই চিন্তাকুল-গম্ভীর ভাব দেখে গিন্নীরা কেউ কেউই সাইলাসকে সান্ত্বনা আর উপদেশও দিতেন···মনের অশান্তি ঘুচানোর জন্য প্রত্যেক রবিবারে নিয়মিতভাবে গ্রামের গির্জ্জায় গিয়ে ধর্ম্মকথা শুনতে আর ঈশ্বরের উপাসনা করতে বলতেন। সাইলাস কিন্তু চুপচাপ বসে তাঁদের কথা শোনে···কোনো জবাব দেয় না···অন্যমনস্কভাবে উদাস-দৃষ্টিতে আকাশের পানে তাকিয়ে কি যেন গভীর চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকে! তা সত্ত্বেও, গ্রামের লোকজনেরা কিন্তু সবাই সাইলাস্ বেচারীকে খুবই যত্ন করে···সমবেদনা-ভরে সকলেই বলে, —“আহা, বেচারী নিতান্তই দুঃখী অভাগা!···দুনিয়াতে এমন কেউ আপন-জন নেই ওর, যে একটুখানি দেখাশোনা বা খোঁজ-তল্লাশ করে!”

এমনি নীরস-নিরানন্দ একঘেয়েভাবেই সাইলাস বেচারীর জীবন বহে চলেছিল দিনের পর দিন। দেখতে দেখতে একের পর এক বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত ঋতু পার হয়ে ক্রমশঃ এগিয়ে এলো শীতের মরশুম···বড়দিনের উৎসব··· পুরাতন বর্ষের বিদায় আর নববর্ষের সূচনা। এ সময়-টিতে রাভেলো গ্রামে ফী বছরই জমজমাট হয়ে উঠতো —সাড়ম্বরে ধর্ম্মোপাসনা আর আনন্দোৎসব-অনুষ্ঠানের বিচিত্র মরশুম···আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবদের মেলামেশা, খানা-পিনা, নাচ-গান, খেলাধূলো সাজ-সজ্জা···এমনি আরো কত কি সব সৌখিন-বিলাস আর প্রমোদ-লীলার পালা। এই উপলক্ষ্যে সারা গ্রামের ছেলে-বুড়ো, মেয়ে-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র সকলেই হয়ে উঠতো আনন্দ-উজ্জ্বল···খ্রীষ্টমাস-উৎসব পালনের রীতিমত সাড়া পড়ে যেতো রাভেলোর গির্জ্জায়, এবং পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে, ছোট বড় প্রতি ঘরে ঘরে···সর্ব্বত্র।

অন্যান্য বছরের মতো সেবারেও রাভেলো গ্রামে সাড়ম্বরে সুরু হলো বড়দিনের উপাসনা আর আনন্দোৎ-সবের পর্ব্ব···সকালের সোনালী রোদের আভা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই গির্জ্জার সুমধুর ঘণ্টাধ্বনিতে ভরে উঠলো সারা গ্রামের আকাশ-বাতাস···আবালবৃদ্ধবণিতার মন! লোকে লোকারণ্য গ্রামের ছোট্ট-সুন্দর গির্জ্জার প্রাঙ্গণ···উপাসনা গৃহ—ছেলে-বুড়ো, মেয়ে-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র কেউই আর যোগ দিতে বাকী নেই···সৌখিন সুন্দর বসন-ভূষণে সুসজ্জিত হয়ে দলে-দলে গ্রামের লোকজন সবাই এসে জড়ো হয়েছিল গির্জ্জার আঙিনায়। রাভেলো গ্রামের এই খ্রীষ্টমাস-মহোৎসবের আসরে এসে যোগ দেয়নি শুধু একজন অভাগা···তার নাম—সাইলাস্ মার্নার! গ্রামের প্রান্তে তার নিরালা কুটীরের কোণে একা স্তব্ধভাবে বসে উদাস দৃষ্টিতে অনন্ত আকাশের পানে তাকিয়ে সে তন্ময় হয়ে ভাবছিল তার শূন্য নীরস নিরানন্দ-ময় জীবনের কথা। [ক্রমশঃ
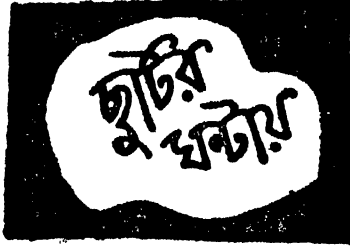
চিত্রগুপ্ত

এবারে শোন—বিচিত্র রহস্যময় বিজ্ঞানের আরেকটি অভিনব মজার খেলার কথা। এ খেলাটির নাম—'মানুষের নাড়ী পরীক্ষা করে দেখার আজব কারসাজি'।

ধরো,—হঠাৎ কেউ যদি তোমাদের বলেন যে সচরাচর ডাক্তার-বদ্যি-কবিরাজেরা রোগীর হাতের কব্জী টিপে যেমন পদ্ধতিতে মানুষের নাড়ী পরীক্ষা করে দেখেন, তেমনি উপায়ের পরিবর্তে—অর্থাৎ, তার হাতের কব্জী আদৌ স্পর্শ না করে, প্রতি মিনিটে নাড়ী-স্পন্দনের গতি-বেগ বা 'pulse-rate per minute' কত, সে সংখ্যা সঠিকভাবে গুণে-গেঁথে হিসাব কষে দেখতে···তাহলে কি জবাব দেবে তোমরা?

এমন বেয়াড়া আবদার শুনে তোমরা হয়তো রীতিমত অবাক হবে···সরাসরি জবাব দিয়ে বসবে,—অসম্ভব!··· এমন আজব কাণ্ড তো কখনো ঘটতে দেখিনি কোথাও! ···আজন্মকাল বরাবরই তো দেখে আসছি যে ডাক্তার-বদ্যি-কবিরাজ সকলেই রোগীর হাতের কব্জী টিপে দেখে তার নাড়ী-স্পন্দনের গতিবেগের সংখ্যা নির্ণয় করে থাকেন···এছাড়া আর কোন রীতি তো নজরে পড়েনি কোনো সময়ে। কাজেই কথাটা কেমন যেন অদ্ভুত ঠেকছে!···নিজের হাতের আঙুলের ডগা দিয়ে অপরের হাতের কব্জী স্পর্শ করে নাড়ী টিপে না দেখলে, স্পন্দনের গতিবেগ দ্রুত কিম্বা মন্থর, তার সংখ্যা সঠিক উপায়ে গুণে-গেঁথে হিসাব কষে আন্দাজ করবোই বা কেমনভাবে! বাস্তবিক তোমাদের এই জবাব দেওয়াটাও নিতান্ত অযৌক্তিক নয়! তবে, আসল কথাটা হলো—বিজ্ঞানের রহস্যময় ভাণ্ডারে এমন সব বিচিত্র আজব কলাকৌশল মজুত রয়েছে, যার দৌলতে অনায়াসেই তোমরা এই ধরণের অনেক কিছু অসম্ভব ব্যাপারকে অদ্ভুত উপায়ে নিমেষের মধ্যেই সম্ভব করে তুলতে পারো। তাই আজ তোমাদের তেমনি উপায়ে তারই একটি সহজ-সরল কলা-কৌশলের মোটামুটি পরিচয় দিচ্ছি।···অর্থাৎ, ডাক্তার-বদ্যি-কবিরাজদের চিরাচরিত প্রথায় মানুষের হাতের কব্জী টিপে পরীক্ষা করে না দেখেও, বিজ্ঞানের বিচিত্র আজব কলা-কৌশলে অন্য কি উপায়ে নাড়ী-স্পন্দনের অতি বেগ সঠিকভাবেই নির্দ্ধারণ ও নিজের চোখেই প্রত্যক্ষ করা যায়, তারি কথা বলি।

তবে বিজ্ঞানের এই আজব-মজার কলা-কৌশল পদ্ধতির হদিশ দেবার আগে, এ কারসাজি দেখানোর জন্য টুকিটাকি যে দুয়েকটি সাজ-সরঞ্জাম প্রয়োজন—তার একটা মোটামুটি ফর্দ দিয়ে রাখি। বলা বাহুল্য, এ সব সাজ-সরঞ্জাম নিতান্তই ঘরোয়া-ধরণের···সামান্য চেষ্টাতেই—এমন কি, বিনা খরচেই এগুলি তোমরা নিজেরাই বাড়ীতে বসে জোগাড় করে নিতে পারবে।

বিজ্ঞানের এই আজব ভেল্কি-কারসাজি দেখাতে হলে চাই—একটি চ্যাপ্টা, চওড়া ও গোল-মাথাওয়ালা

ড্রইং-পিন (a broad, round and flat-topped drawing pin), শলাকা-সমেত একবাক্স দেশলাই (a match-box with fresh match-sticks] এবং

একটি ঘড়ি (a time-piece or wrist-watch with minute-hands)।

ফর্দমতো সাজ-সরঞ্জামগুলি সংগ্রহ হলে, আসরে আত্মীয়-বন্ধুদের সামনে এ কারসাজি দেখানোর সময়, উপরের ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনিভাবে হাতের কব্জীর···অর্থাৎ ধমনী-নাড়ীর ঠিক উপরে ড্রইং-পিনটিকে মাথা নীচু রেখে খাড়াখাড়ি-ধরণে বসিয়ে, সেটির ছুঁচালো-ডগার শিয়রে জলন্ত একটি দেশলাই-কাঠি ধরো। তাহলেই দেখবে—তোমার নাড়ী-স্পন্দনের গতিবেগের তালে-তালে হাতের কব্জীর উপর খাড়াখাড়ি ভাবে বসিয়ে রাখা ড্রইঙ্ পিনটিও দিব্যি সুন্দর ভঙ্গীতে একবার সামনের দিকে ও একবার পিছনের দিকে হেলতে দুলতে সুরু করেছে···এবং সেই ছন্দে ছন্দ মিলিয়ে ড্রইঙ-পিনের শিয়রে ধরে রাখা জলন্ত দেশলাই কাঠির শিখাটিও একবার সুমুখে ও আরেকবার পিছনে হেলে দুলে কাঁপতে আরম্ভ করে দিয়েছে। এবারে ঘড়ির চলন্ত কাঁটার পানে দৃষ্টি রেখে প্রতি মিনিটে জলন্ত দেশলাই কাঠির শিখাটি কতবার সামনের দিকে এবং কতবার পিছনের দিকে হেলছে-দুলছে, তার হিসাব করলেই, খুব সহজে এবং অনায়াসে তোমার নাড়ী স্পন্দনের গতিবেগের সংখ্যা সঠিকভাবে গুণে নিতে পারবে। এটিই হলো—এবারের মজার খেলার আসল রহস্য।

মনোহর মৈত্র

১। হিসাবের হেঁয়ালী :

উপরের ছবিতে চৌখুপি-ঘর সাজানো যে নক্সাটি দেখছো, বুদ্ধি খাটিয়ে গুণে-গেথে হিসেব কষে বলো তো, মোট কতখানি চৌখুপি-ঘর সাজিয়ে এ নক্সাটিকে রচনা করা হয়েছে ?

২। 'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা :

তিন অক্ষরে নামটি তার,
সবাই তারে পুজে।
আদি-মধ্যে দুভেদা, হায়,··
আদি-অন্তে রক্ত খায় !
বুদ্ধি করে নামটি কি তার—
বলতে পারো, বুঝে ?

রচনা : ধীরেন্দ্রনাথ মোদক (বাঁশবেড়িয়া)
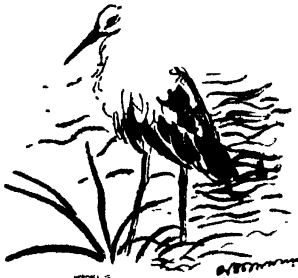
৩।

দুই অক্ষরে নাম···বনে-জঙ্গলে জন্তু জানোয়ার শিকারের জন্য বিশেষ উপযোগী হয়। প্রথম অক্ষরে পরম-পূজনীয়

মহিলা এবং শেষাক্ষরে আমাদের শরীরের ক্লান্তিনাশক ও উদ্দীপনাবর্দ্ধক বিশেষ এক-ধরণের তৃপ্তিদায়ক পানীয় বুঝায়। বলো তো, সেটি কি?

রচনা: গৌতম ঘোষ (কলিকাতা)

গতমাসের ধাঁধা ও হেঁয়ালীর উত্তর:

১। নীচের নক্সাটিতে যেমন ছাদে দেশলাই-কাঠিগুলি সাজানো হয়েছে, অবিকল তেমনিভাবে 'ক'-চিহ্নিত এবং 'খ'-চিহ্নিত কাঠি দুটিকে সরিয়ে বসালেই, সহজেই হেঁয়ালির সমাধান করা যাবে।
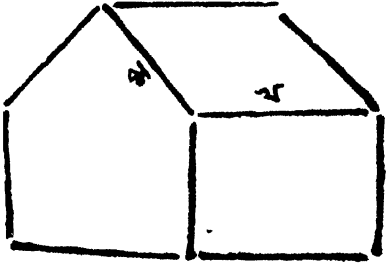
২। কুশল

৩। আকাশ

গতমাসের তিনটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে:

খুকু, পমি, রিনি ও রনি মুখোপাধ্যায় (কাইরো), কুলু মিত্র (কলিকাতা), সুজাতা, মীরা, নীন ও প্রান (কাম্পালা), পুপু ও ভুটিন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), সৌরাংশু ও বিজয়া আচার্য্য (কলিকাতা), দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় (দিল্লী), রোচনা ও ফণা সাহা (কলিকাতা), নিপু, সঞ্জীব, পুতুল, সুমা, হাবলু ও টাবলু (হাওড়া), সনৎ ও অঞ্জলি (বোম্বাই), অধীশ, কবি ও অমিতাভ হালদার (লক্ষ্ণৌ), সত্যেন, সঞ্জয়, মুরারি ও সুনীল (ভিলাই), রাণা ও বুনা মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), সুরজিৎ দত্ত (কলিকাতা), পূর্ণিমা ও দীপেন মুখোপাধ্যায় এবং সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা), সোমনাথ পালিত (মজঃফরপুর), দ্বিজেন্দ্রমোহন সরকার (কলিকাতা), শম্ভুচরণ দাস (কৃষ্ণনগর), রীতা, মিতা, বাণী ও ইন্দু (মজঃফরপুর)।

গতমাসের দুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে:

বুবু ও মিঠু গুপ্ত (কলিকাতা), বিশ্বনাথ ও দেবকীনন্দন সিংহ (গয়া), শর্ম্মিষ্ঠা ও সঙ্ঘমিত্রা রায় (কলিকাতা), ঋতু ও রনি দাশগুপ্ত (কলিকাতা), বাপি, বুতাম ও পিন্টু গঙ্গোপাধ্যায় (বোম্বাই), অমিয়, রাণা, প্রশান্ত, অমৃত, অভি, কমললাল, সুনীত, তিনকড়ি ও মৃণাল (কলিকাতা), নির্ম্মল রায়চৌধুরী ও মনতোষ মজুমদার (বর্দ্ধমান), সমা, পুলু, খুকু ও খোকন চট্টোপাধ্যায় (কৃষ্ণনগর), ক্ষেপী, মঞ্জু ও খুকু (রাণাঘাট), কল্যাণ, ইন্দ্র, শচীন, রজত, বিমল ও সুজন (কলিকাতা), রণবীর ও দীপঙ্কর নিয়োগী (কলিকাতা), দীপালী, অপর্ণা, রীতা, রানু, রুমা, সীমা ও প্রদীপ বাগচী (কোঁচ), অঞ্জন, পান্না, মুন্না ও চিঙ্কু (ছাপরা), রণবীর চক্রবর্ত্তী (কাটলীছড়া), গৌতম ঘোষ (কলিকাতা)।

গতমাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে:

হরিদাস, অজয়, বীরেন, তারাকুমার ও অবনী (চন্দননগর) সুজিতা, রঞ্জিতা, মধুমিতা ও প্রিয়দর্শিনী রায় (ব্যাঙ্গালোর), চণ্ডীচরণ দাস (শিয়াখালা), মোহিনী, মাধুরী, অপর্ণা, পূর্ণিমা, চাঁদু, খাঁদু ও নন্দলাল ঘোষ (রোরকেল্লা), নৃপেন, নলিনী, নীহারিকা ও নিরুপমা চট্টোপাধ্যায় (ভদ্রেশ্বর)।

বাদ্যযন্ত্রের কথা

দেবশর্ম্মা বিরচিত

পাতলা ধাতু-নির্ম্মিত ছোট-ছোট গোলাকার-চাকৃতি আর মিহি-মজবুত চামড়ার আস্তরণে মোড়া গোল-ছাঁদের এই বিচিত্র বাদ্যযন্ত্রটির নাম— 'ট্যাম্বোরিন্' (TAMBOURINE)। এ বাদ্যটি সচরাচর ব্যাবহৃত হয় নৃত্য ও সঙ্গীতের তালে-তালে সুর-সঙ্গত রক্ষার উদ্দেশ্যে। এ বাদ্য বাজালেই, ধাতু-নির্ম্মিত চাকৃতি থেকে ধ্বনি জাগে আমাদের দেশের 'ভজন-করতল' বা 'মন্দিরা' বাদ্যযন্ত্রের অনুরূপ, আর চামড়ার আস্তরণে 'টোকা' বা 'আঘাত' দিলে শব্দ ওঠে 'মাদল' বা 'তবলার' মতো। এ বাদ্যটির উদ্ভব সম্ভবতঃ মধ্য-প্রাচ্য দেশে... প্রচলিত হয় ভ্রাম্যমান 'জিপ্‌সী' (GYPSY) বা 'বেদে' সম্প্রদায়ভুক্ত অধিবাসীদের মাধ্যমে। তবে স্পেন, পোর্তুগাল, ইতালী, পূর্ব্ব-ইউরোপ, আরব, পারস্য, প্রভৃতি রাজ্যে এটির বহুল প্রচলনও দেখা যায়।

আর অভিনব-ধরণের ফুঁ-দিয়ে বাজানোর এই ছোট্ট বাঁশীটি তো তোমাদের অনেকের কাছেই খুবই সুপরিচিত— আজকালকার বিশেষ জনপ্রিয় বাদ্যযন্ত্র 'মাউথ্-অরগ্যান্' (MOUTH ORGAN) নামে। এ বাদ্যটি কিন্তু আসলে পাশ্চাত্য-দেশীয়।

বিচিত্র ছাঁদের এই বাঁশীটির নাম হলো— 'ট্রাম্পেট' (TRUMPET)। এটি হলো পাশ্চাত্য-দেশীয় বাদ্যযন্ত্র ... তবে অধুনা প্রাচ্য-দেশীয়দের কাছেও বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে— বিশেষতঃ, এদেশী 'জ্যাজ্' (JAZZ)-সঙ্গীতের আর কুচকাওয়াজের আসরে বাদ্য-সঙ্গতের ব্যাপারে।
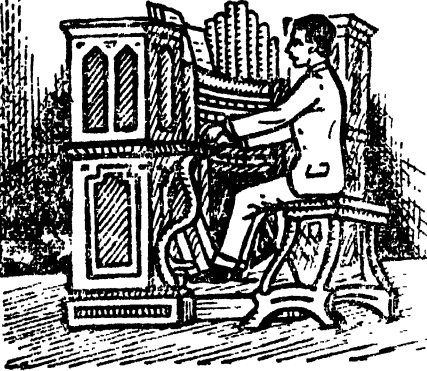
পাশ্চাত্য-দেশীয় এ বাদ্যযন্ত্রটির নাম হলো— 'পাইপ্-অরগ্যান্' (PIPE ORGAN)... অপরূপ সঙ্গীত-সুরলহরী সৃষ্টি করবার বিচিত্র উপকরণ এটি। অভিনব কৌশলে ছোট-বড় আকারের কয়েকটি ধাতু-নির্ম্মিত 'পাইপ' বা নলের সাহায্যে সুরলহরী সৃষ্টি করা যায় এই বহুমূল্য-বিরাটাকার বাদ্যযন্ত্রটি বাজিয়ে। আমাদের দেশের অধুনা-সুপ্রচলিত 'অরগ্যান্' ও 'হারমোনিয়াম্' বাদ্যযন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে এই যন্ত্রটির আদর্শে— এমন মতও অনেকে প্রকাশ করে থাকেন। তবে এ বাদ্যযন্ত্রটি খুব বহুল-ব্যবহৃত নয়।

প্রাচীন বিহার ও যক্ষ-কথা

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী

আর্য-অনার্যের সভ্যতা ও সংস্কৃতির পলিমাটির স্তরে স্তরে অনাদিকাল হতে গড়ে উঠেছে ভারতের লোকসংস্কৃতি। তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুর কাছে প্রাচীন ইতিবৃত্তের প্রতিটি ঘটনার বিচিত্রতা নিয়ে আসে সংস্কৃতি-দীপ্ত ঐশ্বর্য। প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক যুগের যক্ষপূজাধর্মকে আশ্রয় করে একটি লোকসংস্কৃতি এবং লোকবিশ্বাসের যে ধারা চলে আসছে, তারই কিছু বিবৃত করছি।

যক্ষ কথাটির উৎপত্তির একটা ইতিহাস আছে। অনেকে মনে করেন তক্ষ্‌ ধাতু (গঠন করা) হতে ত্বষ্টা, তক্ষক, দক্ষ প্রভৃতি শব্দগুলির সৃষ্টি হয়েছে। এগুলি জগতের ইতিহাসে আদিতে মনুষ্য সমাজকে যিনি পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে চেয়েছিলেন সেই মহামানব শম্বর বা তাঁর ধর্মাশ্রয়ীকে নির্দেশ করত। কিন্তু কালক্রমে দক্ষ-ই বিরোধী পক্ষে 'যক্ষ' নামে রূপান্তরিত হয়ে যায়; যেমন করে শাহ্‌নামায় 'দহাক' হয়েছিল 'জোহাক'।

মার্কেণ্ডেয় পুরাণানুসারে জানা যায় ব্রহ্মা প্রজাপতি-দক্ষের প্রপৌত্রাদি হতে কাকের মত স্বর বিশিষ্ট নগ্ন ও চীরধারী অধোমুখ ভয়ঙ্কর দ্রংষ্ট্রাকরাল দুঃসহের সৃষ্টি করেন। বোধকরি আদিম যক্ষ এই দুঃসহ। মড়া এবং মানুষের অস্থি যে গৃহে আছে সেখানেই ব্রহ্মা তার স্থান নির্দিষ্ট করে দিলেন। দুঃসহের স্ত্রীর নাম ছিল নির্মাষ্টি। এদের সন্তান-সন্ততি সারা পৃথিবী জুড়ে বসেছিল। তাদের দন্তাকৃষ্টি, শকুনি, অঙ্গধুক্‌ ইত্যাদি নামে আটটি পুত্র এবং নিয়োজিকা, বিরোধিনী, স্বয়ংহারী ইত্যাদি নামে আটটি কন্যা ছিল। সকলেই ভয়ংকর এবং ভয়াবহ ছিল। কন্যাদের মধ্যে স্মৃতিহরা ও বীজহরার নিত্য নতুন অত্যাচারের লোমহর্ষণ কাহিনী পুরাণে ছড়িয়ে আছে। স্ত্রীলোকের গর্ভ-পরিবর্তন, লোকের যশ ও প্রতিপত্তি হরণ, শস্যনাশ, গাভী বা প্রসূতির স্তন হতে দুগ্ধ হরণ ইত্যাদি অগণিত অহিত-কার্য করে এরা মানুষকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলত। দুঃসহ হতে জাত এই সব ভয়ংকর যক্ষদের হাত হতে রক্ষার জন্য লোক এদেরকে ধীরে ধীরে অর্ধদেবতা রূপে পূজা করতে সুরু করলে।

রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডে ধনাদিপতি যক্ষরাজ কুবেরের অনেক কথা লিপিবদ্ধ আছে। রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর সেনাপতি সুপ্রসিদ্ধ সংযোগকণ্টক এবং মাণিভদ্র যক্ষদ্বয়ের বীরত্বের কথা বিবৃত আছে।

প্রাক্‌-বৈদিকযুগে বিহারের অধিবাসীদের কাছে যক্ষ ছিল একটা লোকখ্যাত অপদেবতা। আর্য-অনার্যের সম্মিলনের ফলে যক্ষ আর্যদের সাশ্রয়পুষ্ট হল। তারপর ধীরে ধীরে চারশ' খ্রীষ্টপূর্বাব্দের পরে হিন্দুদের মধ্যে যক্ষপূজা জনপ্রিয়তা অর্জন করে। পূর্বে যক্ষের কোন মূর্তিপূজা হত না। অন্যূন দুইশত খ্রীষ্টপূর্বাব্দ হতে যক্ষের মূর্তিপূজা হতে থাকে। শুঙ্গ রাজত্বের সময় হতেই যক্ষমূর্তির সন্ধান পাওয়া গেছে। ভগবান্‌ বুদ্ধ এবং মহাবীরের সময় বিহারে যক্ষের মূর্তিপূজা হত না। লোক মৃত-দেহাবশেষের 'পরে তৈরী ঢিবি, চৈত্য, নাগ, সালিগ্রামশীলা পূজা করত। সে সময় একান্তে বৃক্ষের নীচে একটা ছোট বেদী মত থাকত—তাকে বলা হত যক্ষের আসন। এখানেই লোকে পূজা চড়াত। পিপুলবৃক্ষ ছিল যক্ষের প্রিয় আশ্রয়। বৌদ্ধদের যক্ষ, চৈত্য, স্তূপ পূজা এই অনার্য-প্রভাব সঞ্জাত। বৌদ্ধ ধর্ম-সংস্কৃতি প্রভাবে অন্যান্য দেবদেবীর মত যক্ষও কাল-ক্রমে মূর্তি পরিগ্রহ করল।

মহাবীর ও বুদ্ধের মাহাত্ম্যে হয়তো যক্ষের ক্ষতিকারক বৃত্তিগুলি লোকের মন হতে ধীরে ধীরে অপসারিত হতে থাকে। লোকে যক্ষকে আর নিরবচ্ছিন্ন অহিতকর মনে করল না। যক্ষেরা সমাজের উপকারও করতে লাগল। বুদ্ধ অনেক যক্ষকে সদ্‌ভাবে জীবনযাপনে ব্রতী করেন। বৌদ্ধজাতকে আছে মথুরার পুরদেবী যক্ষিনী উলঙ্গ হয়ে এসে বুদ্ধকে অকথ্য গালিগালাজ করেন। বৌদ্ধদেবী

হারিতী প্রথমে যক্ষিণী ছিলেন, তিনি রাজগীরের কাছে পাহাড় জংগলে বাস করতেন, সেখানে ছোট ছোট শিশুদের পেলেই গলাধঃকরণ করতেন। পরে বুদ্ধের প্রভাবে এসে তিনি সৎ এবং শিশুপ্রেমী বৌদ্ধদেবীতে পরিণত হন। শাহবাদের তাটিকা এবং মাতৃযক্ষ সুকেতু রামায়ণে নরমাংস-ভোজী যক্ষিণী বলে বর্ণিত হয়েছে। বৌদ্ধজাতকেও যক্ষকে সাধারণতঃ নর-খাদকরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এদের চোখে পলক বা ছায়া পড়ত না। লোকে বিশ্বাস করত যে অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে লোকের মৃত্যু হলে সে যক্ষ বা দুষ্টাত্মা হয়ে পূর্বেকার শত্রুদের উপর প্রতিশোধ নিত। ভগবান বুদ্ধ এমনতর অসংখ্য যক্ষের মুক্তিসাধন করে-ছিলেন।

বৌদ্ধদের অভ্যুত্থানের সময় উপকারী যক্ষপূজা খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠে আর এই জনপ্রিয়তার জন্যই বোধ-হয় বুদ্ধ এবং ইন্দ্র বৌদ্ধ-সাহিত্যে যক্ষ বলে অভিহিত হয়েছেন। অথর্ববেদে যক্ষকে মানবশরীরে বসবাসকারী ব্রহ্ম বলা হয়েছে।

পুরাণ ইতিহাসে বিহারের অনেক স্থানের যক্ষদের উপকারের ইতিকথা ছড়িয়ে আছে। সেই গল্পগুলি সংকলন করলে দেখা যাবে—এরা অনেক সময় বন্ধ্যা নারীকে সন্তানদান, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগ রোধ এবং নানা রকম আর্থিক সাহায্য করে সমাজকে উপকৃত করেছে। সেজন্য ইতিকথায় দেখা যায় বন্ধ্যানারীরা উমবর দত্ত আর সুরম্বর যক্ষকে পুত্রার্থে পূজা করত। সুরম্বর যক্ষের থানে অভিলাষ পূর্ণ হবার পর লোকে শত মহিষ পর্যন্ত বলি দিত বলে জানা যায়। বৈশালীর কাছা-কাছি সেলেগ নামে এক অশ্বাকৃতি যক্ষের কথা জানা যায়। সে নাকি নগরবাসীদের বিপদে আপদে নানা রকম সাহায্য করত। গ্রীস-রোমক উপাখ্যানেও অনুরূপ অশ্বিনীরূপ Ceres নাম্নী দেবীর আখ্যাংশের সন্ধান মিলে। এর সাথে অশ্বরূপী নেপচুনের মিলনের ফলে ‘এরিয়ন’-নামক অশ্ব-মানবাকৃতি-বিশিষ্ট এক মিশ্র অপদেবতার সৃষ্টি হয়।

একবার নগরে বসন্তরোগ মহামারী আকার ধারণ করে। অসংখ্য লোক রোগ-যন্ত্রণায় শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে লাগল। এমন সময় সমিল্লার মণিভদ্র যক্ষ মহামারী হতে নগরবাসীকে রক্ষা করে কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছিলেন। বৈশালীর দ্বাররক্ষক মৃত্যুর পরেও যক্ষরূপে নগর রক্ষা করবেন—এই উদ্দেশ্যে তিনি স্বীয় পুত্রকে স্বপ্নে নগরের প্রবেশ দ্বারে একটা যক্ষমন্দির তৈরী করে’ তাতে একটা ঘণ্টা ঝুলিয়ে দিতে বলেছিলেন। কোন শত্রুকে নগরে প্রবেশ করতে দেখলে যক্ষ তৎক্ষণাৎ ঘণ্টাধ্বনি করে নগরবাসীকে সতর্ক করে দিত। সেই জন্য সে ঘন্টিকা যক্ষ নামে কথিত হত। অনুরূপ আরও কাহিনী রাজগীর আর চম্পানগরকে আশ্রয় করে বেঁচে আছে। এই দু’স্থানের শুল্কাদায়কারী অফিসারের মৃত্যুর পর যক্ষ হওয়ার কথা শুনা যায়। তাঁরাও নাকি আপন পুত্রদের যক্ষস্থান তৈরীর জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। সে সব স্থানেও ঘণ্টা বাঁধা ছিল। নগরে কেহ নগর শুল্ক না দিলে ঘণ্টাধ্বনি দ্বারা তাঁরা তাদের অপরাধ প্রকাশ করে দিতেন। মহা-ভারতে শ্রীকৃষ্ণকে লয়ে যখন অর্জুন জরাসন্ধের শাসিত রাজ-গৃহে প্রবেশ করেন তখন চৈত্যগিরি তাঁদের পুরীতে প্রবেশ করবার পূর্বে গম্ভীর রবে পুরীকে সজাগ করে দিয়েছিল।

যক্ষপ্রতিমা বা যক্ষস্থান গ্রাম বা শহর হতে দূরে নির্জন নদীতীরে, গভীর জংগলে, মরুভূমিতে বা পাহাড় পর্বতে প্রতিষ্ঠা করা হত। আবার অনেক সময় নগর দ্বারেও যক্ষমন্দির প্রতিষ্ঠার কথা জানা যায়। জৈন-সাহিত্যে অধুনা ভাগলপুর জেলার চম্পার কাছে জংগলের মধ্যে যে একটা প্রখ্যাত যক্ষ মন্দির ছিল তার বিস্তৃত আলোচনা আছে। এই চম্পা-ই ছিল মহাভারতীয় দানবীর কর্ণের রাজধানী। এখানকার মন্দিরটি ছত্র, ঘণ্টা, পতাকা এবং নানা রকম সুগন্ধি পুষ্প দ্বারা সুসজ্জিত থাকত।

এখনও বিহারের সর্বত্রই অশ্বত্থ (পিপুল) বৃক্ষ খুবই নিষ্ঠার সাথে পূজিত হয়। লোকের বিশ্বাস এই পিপুল বৃক্ষে ব্রহ্ম অধিষ্ঠিত থাকেন। যক্ষস্থানই বর্তমানে ব্রহ্মস্থানে [বহ্‌ম থান] রূপান্তরিত হয়েছে। বিহারের সমস্ত ব্রহ্ম-স্থানই লোকালয় হতে দূরে, একান্তে পিপুল গাছের নীচে অবস্থিত। প্রধানতঃ মজঃফরপুরের প্রতিটি গ্রামের প্রান্তে ব্রহ্মস্থান জুড়ে অসংখ্য লোকবিশ্বাস আর যক্ষের অলৌকিক শক্তির কথা ছড়িয়ে আছে। ‘ঝগ্‌হা-কোঠী’র কাছে ‘সিমুরামনে’ অর্থাৎ গণ্ডকীর মনমনা ফেলে আসা চরে একটা সুপ্রাচীন জাগ্রত যক্ষস্থান আছে। অসংখ্য লোক সেখানে মানত করে, পাঁঠা আদি বলি দেয়। আবার অনেকে গাঁজা, ভাঙ্ প্রভৃতিও চড়ায়। যক্ষ অনার্য-অর্ধ-দেবতা। গাঁজা-ভাঙ্ চড়ানর আচরণ-বিধিই তাকে অনার্য দেবতা শিবের অনুচররূপে এখনও বাঁচিয়ে রেখেছে। এগুলি ধারাবাহিকরূপে সংগৃহীত হলে প্রাচীন বিহারের লোকাচার আর লোক সংস্কৃতির একটা নতুন অধ্যায় রচিত হতে পারে।
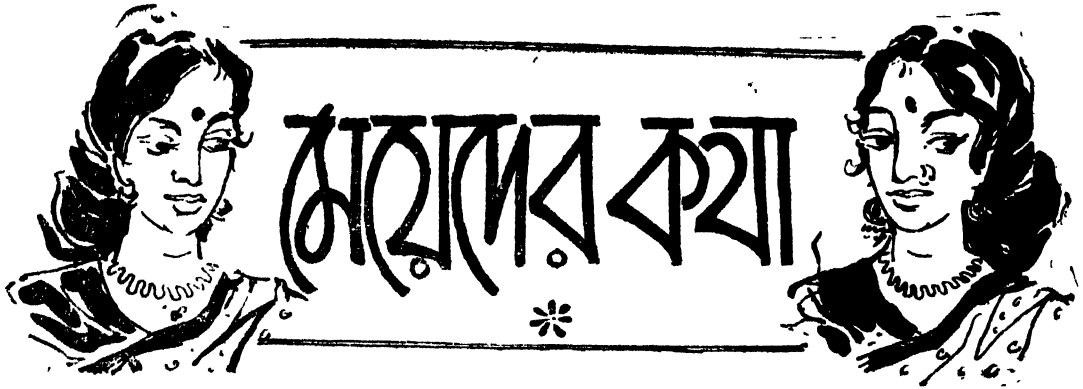
রমণীর মন

মনীষা মুখোপাধ্যায়

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা মানুষের মন নিয়ে যত গবেষণা করেছেন তার তুলনা নেই। ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিক ও দেহ বিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানী ঋষিগণের দানও এ বিষয়ে নিতান্ত নগণ্য নয়। ভারতের সমাজে নারীর অবস্থা তেমন স্বাধীন নয়, নারীকে পুরুষের উপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু সমাজে নারীদূষকের অন্ত নেই। মহর্ষি বাৎস্যায়ন, মহর্ষি মনু প্রভৃতি সকলেই তাদের লক্ষ্য করেছেন। তাদের কুচক্রে পড়ে রমণীর মন কি রকম ভাবে গলে যায়, কি রকম ভাবে তারা বিপথগামিনী হয়ে নিজের সর্বনাশ করেছেন তা বিবৃত করেছেন—উপদেশ দিয়েছেন সাবধান হবার জন্যে। বাৎস্যায়ন কামসূত্রে রমণীকে অনেক প্রকারের লোকের সংস্রব এড়িয়ে চলতে উপদেশ দিয়েছেন।

ভিক্ষুকী-শ্রমণা-ক্ষপণা-কুলটা-কুহকেক্ষণিকা
মূলকারিকাভির্ন সংসৃজ্যেত।

অর্থাৎ ভিক্ষুকী-ভিক্ষণশীলা, শ্রমণা ও ক্ষপণারত পট্টধারিণী (বৌদ্ধ ও জৈন) সন্ন্যাসিনী, কুলটা—গোপনে খণ্ডিত-চরিত্রা, কুহকা—ইন্দ্রজালকারিণী, ঈক্ষনিকা—দৈবজ্ঞা, মূলকারিণী—বশীকরণ মূলক কর্মকারিণী, এদের সঙ্গে কল্যাণকামিনী কোন নারী যেন না মেশেন। কারণ এই সব নারীর সংস্রব কলুষ-বিহীন সরলপ্রাণা নারীর মনকে কলুষিত করে থাকে।

কুল নারীর মন আরও কিসে কিসে বিচলিত হতে পারে—আরও কি কি সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় তাও স্পষ্ট করে বলেছেন :

"জ্ঞাতিকুলস্থানভিগমনমন্যত্র ব্যসনোৎসবাভ্যাম্।
তত্রাপি নায়ক পরিজনাধিষ্ঠিতায়াঃ
নাতিকালমবস্থানপরিবর্তিতপ্রবাসবেষতাচ।"

অর্থাৎ স্বামীর প্রবাসে থাকার সময় অকারণে পিতৃগৃহে বা আত্মীয়-কুটুম্বদের গৃহে যাতায়াত করিবে না। উৎসব ও ব্যসন হইলে যাইবে বটে, কিন্তু তাহাও স্বামীর আত্মীয়-স্বজন কাহাকেও সঙ্গে লইয়া যাইবে, গিয়াও অধিককাল থাকিবে না। এবং প্রবাসবেশ ত্যাগ করিবে না—অর্থাৎ যথা সম্ভব শীঘ্র ফিরিয়া আসিবে।

নারীর মন কিসে দূষিত হয় এতৎ সম্পর্কে কাকোক আরও বিশদ উপদেশ দিয়েছেন :—

স্বাতন্ত্র্যং পিতৃমন্দিরে নিবসতির্যাত্রোৎসবে সঙ্গতি-
র্গোষ্ঠীপুরুষসন্নিধাবনিয়মো বাসো বিদেশে তথা।
সংসর্গঃ সহ পুংশ্চলীভিরসকৃদ্বৃত্তের্নিজায়াঃ ক্ষতিঃ
পত্যুর্বার্দ্ধক্যমীর্ষিতং প্রবসনং নাশস্য হেতুঃ স্ত্রিয়াঃ।

অর্থাৎ—"স্বাতন্ত্র্যং—স্বেচ্ছাপ্রবৃত্তি—স্বাধীনতা, পিতৃমন্দিরে নিবসতিঃ—স্বামীগৃহ থাকা সত্ত্বেও পিতৃগৃহে নিয়ত বাস। যাত্রোৎসবে সঙ্গতিঃ—যাত্রা অর্থাৎ রথযাত্রা, দোলযাত্রা প্রভৃতি, উৎসবে—বিবাহাদি উৎসবে, সঙ্গতিঃ—যাওয়া চাইই চাই ; পুরুষ-সান্নিধ্যে গোষ্ঠী—গোষ্ঠী ক্লাব বা সভা, পুরুষ-

সন্নিধৌ—পুরুষের কাছে অথবা পুরুষদের সঙ্গে অনিয়মঃ—বিধিভঙ্গ ; বিদেশে বাসঃ—সেখানে নিজের সমাজের লোক নেই তেমন জায়গায় বাস ; পুংশ্চলীভিঃ সহ অসকৃৎসংসর্গঃ স্বেচ্ছাচারিণী রমণীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা,নিজায়াঃ বৃত্তেঃ অসকৃৎ ক্ষতিঃ—বৃত্তি—জীবিকা—নিজের জীবিকার বার বার ক্ষতি। পত্যুঃ বার্দ্ধকং ঈর্ষিতং প্রবসনম্—পতির বার্দ্ধক্য, স্ত্রীর সতীধর্মের প্রতি অকারণ সন্দেহ ;—পতির প্রবাসে বাস,এ সকল স্ত্রীলোকের নাশের কারণ।

সংহিতার ঋষি মনুও বলেছেন—

পানং দুর্জনসংসর্গং পত্যা চ বিরহোঽটনম্।
স্বপ্নোঽন্যগেহবাসশ্চ নারী সন্দূষণানি ষট্।

অর্থাৎ—মদ্যপান, অসৎ পুরুষের সঙ্গে সংসর্গ, ভর্ত্তৃবিরহ, উদ্দেশ্যহীন ইতস্ততঃ ভ্রমণ, অলস নিদ্রা, ও পরগৃহে বাস এই ছয়টি নারীকে কলুষিত করে।

সাধ্বী রমণীর সব চেয়ে বড় বিপদ হচ্চে সেই সব পুরুষেরা বাৎস্যায়ন যাঁদের 'রমণীসিদ্ধ' আখ্যা দিয়েছেন। নারীদূষণকারিব্যক্তি মাত্রেই কম বেশী রমণীসিদ্ধ। ডঃ শশিকুমার সেনগুপ্ত তাদের যে বর্ণনা দিয়েছেন নিম্নে তা উদ্ধৃত করা গেল :—

"ইহারা চেহারাতে বেশ মাজাঘসা, পোষাক পরিচ্ছদে ফিটফাট, কথাবার্তায় মোলায়েম এবং সুযোগ বুঝিয়া চটুল কলাকৌশলে পারদর্শী বা পারদর্শিতার ভাণ করে, কোন গৃহে বা পরিবারের মধ্যে প্রবেশ লাভের সুযোগ পাইলে পুরুষদের সহিত না মিশিয়া মহিলামহলে আড্ডা জমায়, পরিবারের নারীদের প্রয়োজনীয় ফরমাসমাফিক নানা ছোটখাট কাজ করিয়া বা ছোটখাট দ্রব্যাদি যোগাইয়া তাহাদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করে, যে স্থলে পরিবারের অভিভাবকেরা তাহাদের ভ্রমণাদিতে লইয়া যাইবার সময় করিতে পারে না, সে স্থলে নারীদের মন ও মরজি বুঝিয়া যাতায়াতের সঙ্গী হয়—এক কথায় উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত নারীদের বিনা মাহিনার ভৃত্যের মতই ফরমাস খাটে। গৃহকর্তা একটু সতর্ক দৃষ্টি রাখিলে ও কিছু সাধারণ বুদ্ধি খাটাইলে ইহাদের চিনিয়া লইতে কিছুমাত্র কষ্ট হয় না। আচরণ, হাবভাব, এমন কি মুখ চোখ দেখিয়াও চিনিয়া লওয়া যায়। ইহারা যে পরিবারে একবার মিশিবার সুযোগ পায় তাহাকে কলঙ্কিত না করিয়া ছাড়ে না। একবার প্রবেশের সুযোগ পাইলে ইহারা লাগিয়া থাকিবার এমন কৌশল জানে যে ইহাদিগকে বিদায় করাও অসাধ্য হইয়া উঠে। বিষধর সর্পকে লোকে যেরূপ ভয়করে এবং যে ভাবে পরিহার করে পরিবারের কল্যাণকামী ব্যক্তিরা ইহাদিগকে সেইভাবে পরিহার করিবেন। নারীদের উপর স্বাধীন বিবেচনার বা স্বাধীন আচরণের ভার ছাড়িয়া দিবেন না। কারণ ইহাদের নিকট নারীরা অবশ ও প্রতিরোধে অক্ষম। সেই জন্যেই বাৎস্যায়ন ইহাদিগকে 'রমণীসিদ্ধ' আখ্যা দিয়াছেন। আত্মীয় হউক অনাত্মীয় হউক ইহাদের সম্বন্ধে দৃঢ় ও নির্মম হইতে ইতস্ততঃ করিলে পরিবারের বিপদ ডাকিয়া আনা হইবে। অবলা আশ্রমে, শিশুসদনে, আত্মীয় পুরুষ সংসর্গে গর্ভবতী কুমারীদিগের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে এই শ্রেণীর পুরুষদিগকেই উহার মূলে দেখা যাইবে। ইহারা সমাজদেহে বিষস্বরূপ।"

'রমণীসিদ্ধ' পুরুষে আজ পৃথিবী ছেয়ে গেছে। তারা রমণীর রমণীয় মনে প্রভাব বিস্তার করে। তাকে কলুষিত করে, সংসার ভেঙ্গে দেয় সমাজে বিশৃঙ্খলা আনে। 'রমণী-সিদ্ধ' পুরুষদের প্রভাবে যাতে রমণীরা বিবশ না হয়ে যায়, তেমনিভাবে রমণীর মনকে সবল ও সচেতন করে তোলার দায়িত্ব আজ সারা পৃথিবীর সভ্য সমাজের।

—

প্রসূতি-পরিচর্য্যা ও শিশুমঙ্গল

ডাঃ কুমারেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-বি

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সন্তান প্রসবের পর ; প্রসূতিকে কিছুক্ষণ সম্পূর্ণ বিশ্রাম দিয়ে, প্রতেক ধাত্রীরই কর্ত্তব্য—নবজাত শিশুকে দু'তিন মিনিট তার মার স্তন্যপান করানো। তারপর প্রতি ছয় ঘণ্টা অন্তর প্রথম ছত্রিশ ঘণ্টা এ নিময় বজায় রেখে, পরে প্রতি চার ঘণ্টা অন্তর নবজাতককে দুধ খাওয়ানো অভ্যাস করাবেন। ছয়ঘণ্টার মধ্যে নবজাত-শিশুকে স্তন্যপান না করালে, পরে প্রসূতির স্তনে দুধ সঞ্চার হতে অসুবিধা

ঘটবে। কাজেই প্রতি চার ঘণ্টা অন্তর শিশুকে স্তন্যদান করাই সব চেয়ে ভাল। প্রয়োজন হলে, প্রথম প্রথম তিন ঘণ্টা অন্তর শিশুকে স্তন্যদান করে, এক, দুই বা তিন মাসের মধ্যে ধীরে ধীরে দশ-পনেরো মিনিট করে সময় বাড়িয়ে দিয়ে প্রতি চার ঘণ্টা অন্তর দুধ খাওয়ানো অভ্যাস করলে, মাতা ও শিশু উভয়েই যথোপযুক্ত বিশ্রাম পেতে পারে। অনেক প্রসূতির প্রথম প্রথম স্তনে দুধ থাকে না, কিন্তু তবুও শিশুকে নিয়মিত স্তন্যদান করতে হয় ও দিন তিনেক পরে স্তনে দুধ আসবে। এই দু-তিন দিন কোনও ধাত্রী প্রসূতির দুধ জল দিয়ে পাতলা করে বা মধু ও জল দিন। অনেকে ল্যাক্‌টেস মধুর বদলে দেন, অনেকে পাতলা গরু, ছাগল, বা গাধার দুধ দেন, দুতিন দিন বাদে যদি দুধ কম হয় তাহলেও শিশুকে পরে মধু ও জল কিম্বা ল্যাকটোজ দেওয়া যেতে পারে। মাতৃ-দুগ্ধ ছাড়া শিশুকে অন্য দুধ দিলে, প্রসূতির স্তনে যথোচিত দুধ হলে ক্রমশঃ অন্য দুধ বন্ধ করতে হবে। তবে এ-ব্যবস্থাকালে, মাঝে মাঝে নিয়মিতভাবে জল খাওয়নো বিশেষ প্রয়োজন। অনেকের মতে, এ সময়ে স্তন্যদানের পূর্ব্বে শিশুকে বোতলে (Baby Feeding Bottle) করে সামান্য জল খাওয়ানো ভালো। তাঁরা বলেন, এভাবে স্তন্যদানের আগে জল খাওয়ানোর ফলে; শিশু সাধারণতঃ খুব তাড়াতাড়ি ও জোরে মাতার স্তন শোষণ করে না এবং সেজন্য মাতার স্তনে প্রয়োজনানুযায়ী দুধ না থাকলে, শিশুর শোষণের কারণে কোনো রকম আঘাত লেগে মাতার স্তনমূলে ব্যথা বা ফেটে গিয়ে ঘা হবার আশঙ্কা থাকে না। প্রসূতির স্তনে যথোচিত পরিমাণে দুধ সঞ্চার হলে; পাঁচ হতে দশ মিনিট কাল স্তন্যপান করলে সচরাচর প্রায় সকল শিশুরই পেট ভরে। তবে দশ মিনিট এটা ওটা করে প্রায় কুড়িমিনিট-কাল স্তন্যদান করাই ভালো। সকাল ছটা, বেলা দশটা, বেলা দুটো, সন্ধ্যা ছটা ও রাত্রি দশটায় প্রত্যহ মোট পাঁচবার নিয়মিতভাবে শিশুকে স্তন্যদান করাই হলো সাধারণ-প্রচলিত নিয়ম। অনেকে রাত্রে সাড়ে নটায় শিশুকে শেষবারের মতো প্রাত্যহিক স্তন্যদানের উপদেশ দেন। তবে এ ব্যবস্থা, নির্ভর করে প্রসূতির ব্যক্তিগত সুবিধার উপর। এ নিয়মে স্তন দিলে প্রসূতি সংসারিক কাজ কর্ম্মের ফাঁকে অবসর ও বিশ্রামের ও রাত্রে নিশ্চিন্ত হয়ে পুরো আটঘণ্টা ঘুমানোর সুযোগ পাবেন—যেটি তাঁর ও সন্তানের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে একান্ত আবশ্যক। তাছাড়া শিশুও দৈনিক চার-ঘণ্টা অন্তর খেলে, হজম করবার যথেষ্ট সুযোগ পাবে। কারণ স্তন্যদানের মধ্যে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা সময়ের ব্যবধান থাকার ফলে, শিশুর পাকস্থলীর অম্লরসে জীবাণু সব ধ্বংস হয় ও পেটেও অজীর্ণভাব বা বায়ুর উপদ্রব ঘটে না। তাছাড়া শিশুকে দুধ খাওয়ানোর জন্যে বার বার ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলতে হয়না বলে, সে প্রচুর সময় বিশ্রাম লাভ করে। তবে প্রসূতির সর্ব্বদা মনে রাখা দরকার যে শিশুকে যেন ঠিক ঘড়ি ধরে নিয়ম মতো সময়ে স্তন্যদান করা হয়। নিরিবিলি জায়গায় বসে শিশুকে সযত্নে কোলে নিয়ে স্তন্যদান করাই উচিত। তবে আজকাল অনেকে টুলে বা চেয়ারে পিছনে ঠেস দিয়ে বসে শিশুকে স্তন্যদানের কথা বলেন। প্রসবের পর প্রসূতির পক্ষে যতদিন বসে শিশুকে স্তন্যদান করা সম্ভব না হয়, ততদিন শয্যার একপাশে কাৎ হয়ে শুয়ে স্তন্যদানকালে বিশেষ নজর রাখা দরকার যে অসাবধানতা বশে কোনো রকমেই শিশুর নাক চাপা না পড়ে বা স্বাভাবিকভাবে নিশ্বাস গ্রহণের অসুবিধা না ঘটে। এ ব্যাপারে যে সহজ রীতি সচরাচর অনুসৃত হয়ে থাকে—সেটি হলো কোলের উপর একটা বালিশ বা কুশন রেখে তার উপর শিশুকে সযত্নে শুইয়ে রেখে প্রসূতিকে স্তন্যদান করতে হবে। এ ব্যবস্থার ফলে, প্রসূতিকে সামনে ঝুঁকে স্তন্যদান করার জন্য অসুবিধা ভোগ করতে হয় না। শিশুকে খাওয়ানোর সময় প্রসূতির পক্ষে, প্রথমে একদিকের স্তন্য থেকে দুধ পান করানোর পর অপরদিকের স্তন্যদান করা উচিত। তবে নিয়ম করে, সকালে ছটায় যদি প্রসূতির ডান দিকের স্তন্যদান করা হয় তাহলে বেলা দশটায় দ্বিতীয়বার স্তন্যদানের সময় বাঁদিকের স্তন থেকে শিশুকে দুধ পান করানোই ভালো। এভাবে অদল বদল করে স্তন্যদানের ফলে, প্রসূতির উভয় স্তনেই দুধ হবে নিয়মিত ও কোনও অসুবিধাও ভোগ করতে হবে না। পরের দিন কিন্তু অন্য স্তন দিয়ে সুরু করে উপরোক্ত নিয়মেই শিশুকে দুগ্ধদান করা চাই। স্তন দেবার আগে ও পরে প্রসূতির উচিত—স্তন ও স্তনের বোঁটা বা চুষি আগাগোড়া বেশ

ভালভাবে ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে পরিষ্কার তুলো দিয়ে মুছে নেওয়া। এর ফলে প্রসূতির স্তনে কোনও ঘা ও ফাটা-ধরা দেখা দেবে না, এবং শিশুও স্তন্যপানের সময় অতর্কিতে কোন রোগের জীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত হতে পারবে না। স্তন্যদানের সময় প্রসূতিকে নিজের হাতের আঙ্গুল বেকিয়ে স্তনাগ্রভাগ এমনভাবে সযত্নে শিশুর মুখে দিয়ে ধরে রাখতে হবে যে কোনোক্রমেই যেন শিশুর নাক চাপা পড়ার ফলে, তার শ্বাসরোধ না ঘটে। সচরাচর দেখা যায় যে মুখ দিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস নিলে শিশুরা স্বচ্ছন্দে স্তন্যপান করতে চায় না এবং পারেও না। উপরন্তু পেটে অপ্রয়োজনীয় বায়ু-প্রবেশের ফলে, তারা পেট ভরে খেতেও পারে না। কাজেই স্তন্যদানের সময় মাঝে মাঝে শিশুকে প্রসূতির কাঁধ ও বুকের উপর শুইয়ে রেখে পিঠের দিকে মার্জ্জনা করলে বা আস্তে আস্তে চাপড় দিলে তার পেট থেকে অপ্রয়োজনীয় বায়ু নির্গত হয়ে যায় ও সে আবার বেশ সহজে স্বচ্ছন্দে স্তন্যপান করতে পারে। সকল প্রসূতিরই নজর রাখা উচিত— স্তন্যদানের সময় শিশুকে যেন ঘুম পাড়ানো না হয়। শিশু যদি স্তন্য-শোষণ বন্ধ করে, তাহলে স্তনাগ্রভাগ নাড়াচাড়া করে শিশুর মুখের মধ্যে এপাশ ওপাশ করলে কিম্বা শিশুর নীচের চোয়াল দিয়ে স্তনে সামান্য চাপ দিলে, ঘুমন্ত-প্রায় শিশু পুনরায় স্তন-শোষণ সুরু করে। স্তনদানকালে অবান্তর কথা বলা, গল্প করা, হাসি-ঠাট্টা, হৈ-চৈ বা শিশুকে কোনোভাবেই অন্যমনস্ক করা প্রসূতির পক্ষে উচিত নয়। প্রত্যেক মানুষেরই জীবন যাত্রা সুরু হয়, জননী জঠর থেকে জন্মগ্রহণের পর মুহূর্ত্ত থেকেই। সুতরাং, একথাটুকু মনে রেখে, এমন কোনও অভ্যাসই শিশুকে করানো উচিত নয়, যেটি সারা জীবন শৃঙ্খলের মত তাকে অসুবিধার নাগপাশে অযথা বেঁধে রাখবে। তাই শৈশব থেকেই শিশুকে সব দিকেই নিয়মিত অভ্যাসের মধ্যে সযত্নে মানুষ করে তোলা—সকল প্রসূতিরই একান্ত কর্ত্তব্য। এই কথা মনে রেখেই পুনরায় বলে রাখি যে শিশুকে চারঘণ্টা অন্তর খাওয়ানোর নিয়মই বিজ্ঞান সম্মত। শিশু কাঁদলেই যে তার ক্ষুধার উদ্রেগ হয়েছে এবং তাকে তৎক্ষণাৎ স্তন্যদান করে শান্ত করা বা ঘুম পাড়ানো প্রয়োজন—এমন ধারণা পোষণ করা কোনো প্রসূতিরই উচিত নয়। এ ধারণার ফলে, মা ও সন্তানের অপকার ঘটে নানাভাবে। স্তন দেবার আগে ও পরে, শিশু মলমূত্র ত্যাগ করেছে কিনা সেটি দেখে নেওয়া প্রসূতির আরেকটি কর্ত্তব্য। সন্তানকে স্তন্যদান করার জন্য প্রসূতিকেও তাঁর নিজের খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হতে হবে। ঠাণ্ডাই হউক আর গরমই হউক, প্রত্যেক প্রসূতিকেই যথোচিত উপায়ে সন্তানকে স্তন্যদানের উদ্দেশ্যে প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে জল—অর্থাৎ দিনে অন্তত তিন চার গ্লাস খেতে হবে এবং সেই সঙ্গে আরো খেতে হবে প্রত্যহ একসের থেকে দেড় সের দুধ, দুধ ও সাগু, দুধের পায়েস, পাতলা চা ও দুধ। প্রত্যেকবার স্তনদেবার আগে প্রসূতি যদি নিয়মিতভাবে একগ্লাস জল পান করেন, তাহলে স্তনে দুগ্ধ-সঞ্চার হবে অনেক বেশী। প্রসূতির স্তন্যদুগ্ধ বাড়ানোর জন্যে অনেকে কোনও ঔষধ খেতে উপদেশ দিয়ে থাকেন। সেটি কিন্তু বিশেষ যুক্তিযুক্ত ব্যবস্থা নয়। কারণ, সে ঔষধ ব্যবহারে, অনেক সময় শিশু ও তার জননীর উপকার তো দূরের কথা, বহুক্ষেত্রে নানা রকম অপকারই বাধিয়ে তোলে। ভয়, মানসিক চাঞ্চল্য, অনিয়ম, ও অনিচ্ছাই সচরাচর প্রসূতির স্তন্যদুগ্ধের অল্পতা বা অভাবের প্রধান কারণ হতে দেখা যায়। পাশ্চাত্যের প্রখ্যাত শিশু ও ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ ডাঃ রেজিন্যাল্ড জুইসবেরীর মতে, "এসময়ে প্রসূতির খাদ্য তালিকা নির্দ্ধারণ করাও রীতিমত জটিল সমস্যা। কারণ, একদিকে যেমন এটা খেও না, ওটা খেও না বলা উচিত নয়, অন্যদিকে তেমনি অবাধ-স্বাধীনতাও দেওয়া যায় না। তবে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে যদি খাদ্য পুষ্টিকর ও সুষম আর সে খাদ্য প্রসূতির পক্ষে রুচিকর হয়, তাহলে সে খাদ্যই তিনি গ্রহণ করতে পারেন অর্থাৎ প্রসূতিই নিজে অভিজ্ঞ চিকিৎসক বা ধাত্রীর পরামর্শানুসারে স্বয়ং স্থির করবেন, কোন খাদ্য তার সহ্য হয় না, বা খেলে অজীর্ণ অরুচি ও অসুখ ইত্যাদি করে এবং তা গ্রহণই বা করবেন কেন? কতকগুলি অপুষ্টিকর স্বাদহীন, আর বাজে ধরণের খাদ্য দিয়ে পেট ভরিয়ে লাভ কি? তাছাড়া হঠাৎ খাদ্য সম্বন্ধে একটা নূতন নিয়মে প্রসূতিকে অযথা বাধ্য করে, শুধু অনিয়মকেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে। ফলে, প্রসূতি এবং নবজাতকের স্বাস্থ্যেরও অনিষ্ট হবে রীতিমত। তবে দুধ, দই, ঘোল, ফলমূল, শাকসব্জী,

টাট্‌কা মাছ, মাছের ডিম ও ডিম, খেজুর, মনাক্কা, কিস্‌মিস্‌, আপেল, পেয়ারা; পেঁপেঁ, কড়াইস্‌টি, সোয়াবিন, প্রভৃতি সব সময়ে খাওয়া চলে ও খেলে উপকার হয় সবিশেষ।” আমাদের দেশে আম, জাম, লিচু প্রভৃতি বহুফল বেগুন এবং পটল, ঢেরস, বাঁধাকপি, ঝিঙে, উচ্ছে, লাউ, পালংশাক, নালশাক, মূলা প্রভৃতি শাকসব্জী বহুজাতের মিলে ও নানা জাতের মাছ পাওয়া যায় আর তা সাধাসিধে করে সুস্বাদু করে রান্নার পদ্ধতিও সকলেরই জানা আছে যাতে খাবার বেশ রুচিকর হয় ও সেই একটানা একঘেয়ে খাবার ব্যবস্থায় খাদ্যে বিতৃষ্ণা ও অরুচি হবে না। পাশ্চাত্যের নামধন্য চিকিৎসক ও ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ সার ট্রবি কিং দীর্ঘ-অভিজ্ঞতালাভের ফলে, শিশুর খাদ্য-তালিকা সম্বন্ধে যে মনোজ্ঞ তথ্য প্রকাশ করেছেন—প্রসঙ্গক্রমে নীচে সেটির মর্ম উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

শিশুর রোজনামচা:—সকাল ছটায় আমি উঠি—মা আমার কাপড় জামা ছাড়িয়ে আমায় স্তনদান করেন। তারপর বিছানায় শুয়ে আমি আবার ঘুমোই।

সকাল সাড়ে নটা—মা আমায় জাগিয়ে স্নান করান। স্নানের জল আগেই ঠিক করা থাকে। আমি খাই ও পায়খানা করি, পরে আবার শুয়ে পড়ি ও বেলা দুটো পর্য্যন্ত ঘুমিয়ে থাকি।

বেলা দুটো—মা আমায় খাওয়ান, কাপড় জামা বদলান আমি আবার খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে থাকি।

বেলা চারটে—মা আমার ঘুম থেকে উঠার জন্যে অপেক্ষা করেন, তারপর আমায় কমলালেবুর রস ও গরম জল খেতে দেন। মা ও আমি খানিক খেলা করি। কখন কখনও আমায় মা বেড়াতে নিয়ে যান। কোনও কোনও দিন আমি শুয়ে শুয়ে হাত পা ছুঁড়ে খেলি, আর মা আমার সঙ্গে কথা বলেন। এ সময়ে আমার গায়ে জামা কাপড় কমই থাকে। রোদ হলে মা আমায় রোদে দিতে ভালবাসেন। আমার গায়ের (চর্ম্ম) চামড়া রোদে পোড়া হয়েছে (বাদামি হয়েছে)। মা ও আমি, আমি ও মা ভারী মজা করি দুজনে।

সাড়ে পাঁচটা—মা আমার স্নানের জল ঠিক করেন। শীতকালে এখন শুধু মা মুখ, হাত ও পা ধুইয়ে দেন, কিন্তু গরম এলে আমি পুরোপুরি স্নান করি, সকলের মত।

বিকাল ছটা—আমি এখন চা খাচ্ছি—আমার ঘুম পাচ্ছে, মা আমায় শুইয়ে দিলেন।

রাত্রি সাড়ে নটা—আর একবার মা আমায় খাওয়ালেন, তবে অন্ধকার ঘরে যাতে ঘুমটা আমার পুরোপুরি না চটে যায় সেদিকে লক্ষ্য করেন।

রাত্রি দশটা—শুভরাত্রি জানাই সবাইকে, কাল সকালের আগে আর আমার কোনও কথা আপনারা শুনতে পাবেন না।

বয়স অনুসারে কতটা স্তন্য দুগ্ধ খাওয়া উচিত তার একটা মোটামুটি তালিকাও প্রসঙ্গক্রমে দেওয়া হলো।

বয়স	২৪ ঘণ্টায় কত আউন্স	কতবার খাবে	কতবারে কতটা থাবে
এক বা প্রথম সপ্তাহে	দশ আউন্স	পাঁচ	দু আউন্স প্রতিবারে
দুই বা দ্বিতীয় „	পনের „	„	তিন „
তিন বা তৃতীয় „	সাড়ে সতের „	„	সাতে তিন „
চার বা চতুর্থ „ একমাস	কুড়ি „	চার ও এক ৪ + ১	চার „
পাঁচ বা পঞ্চম „	একুশ „	করে দুভাবে	চার আউন্স দু ড্রাম চার বার চার আউন্স একবার
ছয় বা ষষ্ঠ „	সাড়ে বাইশ „	পাঁচ	সাড়ে চার করে ৪॥
সাত বা সপ্তম „	সাড়ে তেইশ „	চার বার একবার	৪৮ ৪॥ সাড়ে চার
আট বা অষ্টম দুমাসে	পঁচিশ „	পাঁচবার	৫ পাঁচ করে
তিন মাস	সাড়ে সাতাশ	পাঁচ বার	৫॥ সাড়ে পাঁচ
চার মাস	ত্রিশ	পাঁচ বার	৬ ছয় আউন্স করে
পাঁচ মাস	সাড়ে একত্রিশ	চারবার একবার	৬। সওয়া ছয় ৬॥ সাড়ে ছয় (৬॥)
ছ মাস	সাড়ে বত্রিশ	পাঁচবার	৬॥ সাড়ে ছয়
সাত মাস	পঁয়ত্রিশ	পাঁচবার	৭ সাত আউন্স করে
সাত হতে ন মাস	পঁয়ত্রিশ সাড়ে সাইত্রিশ	পাঁচবার	৭—৭॥ সাত হতে সাড়ে সাত

সুস্থ শিশুর ভিন্ন বয়সে কতটা দুধ খাওয়া উচিত—উপরের তালিকায় তারই মোটামুটি আভাস দেওয়া হলো। কোনো কোনো শিশু একটু বেশী, আবার কোনো কোনো শিশু কিছু কমও খেতে পারে। তবে কম-বেশী খাওয়া ও শিশুর বাড় যথোচিতভাবে না হলে, সুচিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে সেইমতো চলা বিশেষ দরকার। [ক্রমশঃ

সুপর্ণা দেবী

দেহের গঠন সুঠাম-সুশ্রী এবং দেহাভ্যন্তরে পেশী ও স্নায়ুগুলি সুস্থ-সক্রিয় এবং শারীরিক রক্ত চলাচল-ক্রিয়া অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে, এবারে মহিলাদের নিয়মিত-অনুশীলন উপযোগী আরো দুয়েকটি সহজ-সরল 'ঘরোয়া' ব্যায়াম-পদ্ধতির মোটামুটি হদিশ দিই। নিত্য-নিয়মিত-ভাবে এ ব্যায়াম-ভঙ্গীগুলি অভ্যাস-অনুশীলনের ফলে অচিরেই মহিলাদের দেহের জড়তা ও পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি-অবসাদ অপসারিত হবে···শরীর-মন বহু অস্বস্তিকর রোগ-যন্ত্রণা উপসর্গের দায় থেকে রেহাই পাবে···স্বাস্থ্য-শক্তি-উদ্দীপনায় জীবন অপরূপ শ্রী-সৌষ্ঠবে শান্তি-সুখে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠবে।
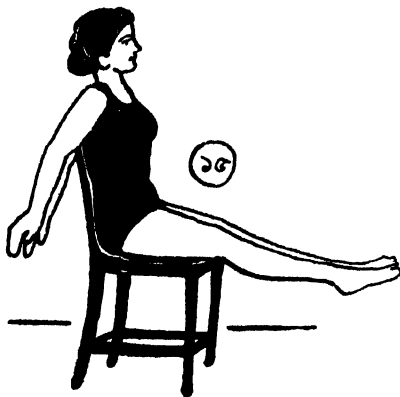
উপরের ১৫নং চিত্রে যে ব্যায়াম ভঙ্গীর নমুনা দেখানো হয়েছে, সেটি নিত্য নিয়মিত সযত্নে অভ্যাসের ফলে, মহিলাদের হাত-পা, বুক পিঠ ও কোমরের গড়ন কমনীয় থাকবে। এ ব্যায়াম ভঙ্গীটি অভ্যাসের রীতি হলো—উপরোক্ত ছবির নমুনামতো চেয়ারে বসে, চেয়ারের পিঠ-ঠেশান দেবার জায়গায় বগলের ভার ন্যস্ত করে দুই হাত পিছন দিকে ঝুলিয়ে রাখুন। এভাবে চেয়ারে ঠেশান দিয়ে বসবার পর, সামনের দিকে বুক ফুলিয়ে, দুই পা একত্রে সটানভাবে ও জোড়া-গেঁথে রেখে ক্রমশঃ যথাসম্ভব উর্দ্ধে তুলুন। পা দুটি এমনিভাবে উর্দ্ধে তোলার সময়, দুই পায়ের পাতা একত্রে জোড়া গেঁথে রেখে সামনের দিকে যথাসম্ভব হেলিয়ে দিন এবং ইতিপূর্ব্বে চেয়ারের পিছন দিকে ঝুলিয়ে-রাখা হাত দুটিকে একত্র মিলিয়ে মুষ্টিবদ্ধ করুন। তারপর ধীরে ধীরে নিশ্বাস-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে হাত দুটিকে মুষ্টিবদ্ধ-অবস্থায় রেখে অন্ততঃপক্ষে, প্রায় বিশবার পা দুটিকে একত্রে জোড়া-গাঁথা অবস্থায় একবার যথাসম্ভব উর্দ্ধে তুলুন এবং পরক্ষণেই নীচের দিকে নামান। এমনি-ভাবেই এই ব্যায়াম ভঙ্গীটি কিছুক্ষণ অভ্যাস করা দরকার।

উপরোক্ত ব্যায়াম-ভঙ্গীটির সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি বিশেষ ধরণের ব্যায়াম ভঙ্গীও নিত্য-নিয়মিত অভ্যাস করা আবশ্যক। সে ব্যায়াম ভঙ্গীটির নমুনা—নীচের ১৬নং চিত্রটি দেখলেই সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারবেন। এ ব্যায়াম ভঙ্গীটি অভ্যাসের জন্যও নরম বালিশ বা কুশন সমেত একখানি চেয়ারের প্রয়োজন হবে।
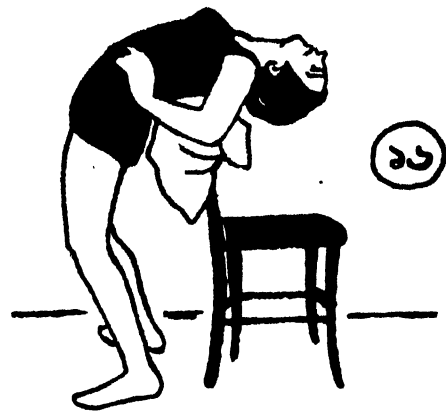
উপরের ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, ঠিক তেমনি-ভাবে ঘরের মেঝেতে চেয়ার সাজিয়ে রেখে, চেয়ারের পিঠের দিকের মাথায় বালিশ বা কুশনটিকে স্থাপন করুন।

এবারে উপরের ১৬ নং চিত্রে দেখানো ভঙ্গী-অনুসারে, চেয়ার থেকে অন্ততঃপক্ষে, এক ফুট দূরে দাঁড়িয়ে, হাত দুখানি দেহের পিছন দিকে কোমরের নীচে নিতম্বের ঠিক উপরে রাখুন এবং ধীরে ধীরে নিশ্বাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে দেহটিকে ক্রমশঃ পিঠের দিকে হেলিয়ে দিতে সুরু করুন। দেহটিকে পিছন দিকে হেলিয়ে দেবার সময় এমনভাবে নীচে নামাবেন যে পিঠের মেরুদণ্ড যেন অবশেষে চেয়ারের পিছন দিকে সাজিয়ে-রাখা বালিশ বা কুশনটি স্পর্শ করে। দেহের পিছন দিক বালিশ বা কুশন স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গেই কোমরের দুই পাশে হাত দুখানি বরাবর বজায় রেখে, পুনরায় ধীরে ধীরে নিশ্বাস গ্রহণের তালে-তালে হেলানো-দেহটিকে ক্রমশঃ নীচে থেকে ঊর্দ্ধে তুলে আনবেন। এমনিভাবে ক্রমান্বয়ে একবার নীচে এবং আরেকবার ঊর্দ্ধে দেহটিকে হেলিয়ে নামিয়ে ও সোজাসুজিভাবে উঠিয়ে এনে, অন্ততঃপক্ষে বিশবার এ ব্যায়াম-ভঙ্গীটি নিত্য নিয়মিত কিছুক্ষণ সযত্নে অভ্যাস করা দরকার। এ ব্যায়ামের ফলে, মহিলাদের নিতম্ব-দেশ, কোমর, তলপেট, বুক, পিঠ, ঘাড় ও গলার গড়ন অচিরেই সুশ্রী-সুঠাম ছাঁদের এবং দৈহিক পেশী ও স্নায়ুগুলি সুস্থ সবল হয়ে উঠবে·· শরীরের রক্তচলাচল ক্রিয়াও অব্যাহত থাকবে।

দৈহিক স্বাস্থ্য অটুট রাখার উপযোগী বিবিধ ব্যায়াম পদ্ধতির মোটামুটি পরিচয় দেওয়া হলো। কিন্তু দৈহিক ব্যায়াম অনুশীলন ছাড়াও, রূপচর্চার আরো যে সব একান্ত আবশ্যকীয় বিষয় আছে, সেগুলির মধ্যে অন্যতম হলো—অঙ্গ প্রসাধন। স্থানাভাবের কারণে, এবারে সে প্রসঙ্গ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়—তাই আগামী সংখ্যায় অঙ্গ-প্রসাধন সম্বন্ধে নানান্ তথ্যের আভাস দেবার বাসনা রইলো।
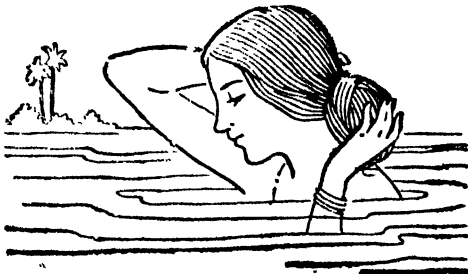
কাগজের ছায়া-প্রতিলিপি রচনা

রুচিরা দেবী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ইতিপূর্ব্বে, গতমাসের প্রবন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে ফটোগ্রাফ থেকে 'ট্রেসিং' (Tracing) করে অথবা ঘরের দেয়াল বা দরজার কপাটের গায়ে-আঁটা ঈষৎ-পুরু শাদা কাগজের উপর মানুষের পার্শ্ব-চিত্রের (profile portrait) 'খস্‌ড়া-প্রতিলিপি' (Outline sketch of the human head and shoulder) রচনার যে দুটি পদ্ধতির পরিচয় দিয়েছি সেই প্রথানুসারে পেন্সিল বা কালি-কলমের রেখা টেনে প্রিয়জনের মুখের প্রতিকৃতিটি আগাগোড়া নিখুঁত-পরিপাটি ছাঁদে এঁকে নেবার পর, নীচের ৩নং চিত্রে যেমন দেখানো হয়েছে, অবিকল তেমনিভাবে ঘন-কালো রঙের 'চাইনিজ-ইঙ্ক' (chinese ink) বা 'ওয়াটারপ্রুফ্-কালি (water-proof ink) ব্যবহার করে নিপুণভঙ্গীতে তুলি চালিয়ে 'সদ্য-আঁকা ঐ মানুষের মুখের 'খস্‌ড়া-প্রতিলিপিটিকে' পুরোপুরি ভরাট করে ফেলুন। তাহলেই দিব্যি সহজ-সুন্দর
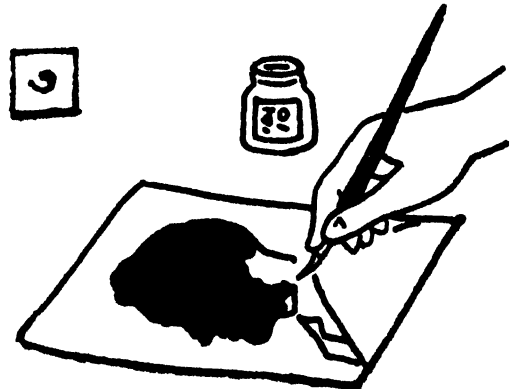
উপায়ে প্রিয়জনের মুখের চেহারার অবিকল 'ছায়া প্রতিকৃতি' (silhouette-portrait) রচিত হয়ে যাবে।

এ কাজটুকু সারা হলে, সদ্য-রঙ ফলানো 'ছায়া-প্রতিকৃতিখানিকে' কিছুক্ষণ খোলা-বাতাসে রেখে আগা-গোড়া বেশ ভালোভাবে শুকিয়ে নেবেন। তারপর নীচের ৪নং চিত্রে যেমন দেখানো হয়েছে, ঠিক তেমনি ধরণে ধারালো একটি কাঁচির সাহায্যে 'ছায়া প্রতিকৃতিটিকে' নিখুঁত-পরিপাটি ছাঁদে ছাঁটাই করে ফেলতে হবে।
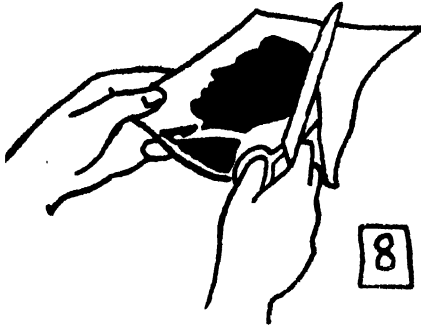
'ছায়া-প্রতিকৃতিটিকে' আগাগোড়া সুষ্ঠুভাবে ছাঁটাই করে নেবার পর, সেটিকে পুরু-ছাঁদের অন্য একটি মজবুত কাগজ (Thick and hard paper) কিম্বা কার্ডবোর্ডের উপর আঠা দিয়ে পরিপাটি ও পাকাপোক্ত ধরণে সেঁটে বসানোর পালা। 'ছায়া প্রতিকৃতিটি' আগাগোড়া কালো রঙে ভরাট করা হয়েছে বলেই, সেটিকে আঠা দিয়ে সেঁটে জোড়ার জন্য শাদা বা মানানসই কোনো হালকা রঙের কাগজ বা কার্ডবোর্ড ব্যবহার করাই ভালো। তার ফলে, ছায়া প্রতিকৃতিটি আরো বেশী শোভন সুন্দর ও মনোরম দেখাবে। কাগজ বা কার্ডবোর্ডের উপর ছাঁটাই করা 'ছায়া প্রতিকৃতিটি'কে আঠার প্রলেপ লাগিয়ে সেঁটে বসানোর সময়, চিত্রে যেমন দেখানো হয়েছে, অবিকল তেমনি উপায়ে কাজ করবেন। অর্থাৎ, 'ছায়া প্রতিকৃতির' যেদিকে কালো রঙ দেওয়া হয়েছে, সেদিকটি উল্টে-উবুড় করে রেখে তার বিপরীত-দিকটিতে (ছায়া-প্রতিকৃতির' যেদিকে কালো রঙের ছোপ ধরানো হয়নি) আগাগোড়া বেশ পরিপাটিভাবে আঠার প্রলেপ লাগিয়ে সযত্নে ঐ শাদা বা অন্য কোনো হালকা রঙের কাগজ কিম্বা কার্ডবোর্ডের উপর পাকাপোক্ত ধরণে সেঁটে বসিয়ে দিতে হবে। তাহলেই, বেশ সহজ সরল উপায়ে অভিনব বিচিত্র ছাঁদের অপরূপ সুন্দর একটি মানুষের মুখের পার্শ্ব চিত্রের 'ছায়া প্রতিকৃতি' রচিত হয়ে যাবে।

এই হলো—'কাগজের ছায়া-প্রতিলিপি' বা 'Paper-made Silhouette Portrait' রচনার মোটামুটি পদ্ধতি।

——

ছোট ছেলেমেয়েদের পোষাকের নমুনা

শিবানী সেন

পূজোর মরশুম সুরু হতে আর বেশী দিন বাকী নেই···ঘরে-ঘরে চারিদিকেই এবার সাজ-সজ্জা, উৎসব আয়োজনের সাড়া পড়ে যাবে···পাড়ায়-পাড়ায় চাঁদা আদায়ের পালা··· বিচিত্র-আড়ম্বরে বারোয়ারি-আসর সাজানোর ঘটা··· নাচ-গান-বক্তৃতা, নাটকাভিনয়ের, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক—অনুষ্ঠান···'মাইকের' উৎপাত···রঙ-বেরঙের আলোর জৌলুষ···এমনি আরো কত কি···এবং সেই সঙ্গে পথে-ঘাটে দোকানে বাজারে লোকজনের ভীড়···প্রিয়জনদের জন্য সৌখিন-সরেস ধুতি-শাড়ী···ছোট ছেলেমেয়েদের রঙীন-সুন্দর নানান্ ধরণের পোষাক-পরিচ্ছদ কেনা-কাটা—রীতিমত সমারোহের পর্ব!

তাই এ সমারোহ পর্বের সূচনাতেই আমরা এবারে ছোট ছেলেমেয়েদের সাদরে উপহার দেবার উপযোগী কয়েকটি সুদৃশ্য সৌখিন নতুন ছাঁদের পোষাক-পরিচ্ছদের নক্সা নমুনা নীচে প্রকাশ করছি। বাজারে কোনো ভালো

দর্জ্জীর দোকানে অথবা বাড়ীতে নিজের হাতে সুষ্ঠুভাবে কাট-ছাঁট-সেলাইয়ের কাজ করে রঙ-চঙে ও নক্সাদার সুতী কিম্বা রেশমী কাপড়ের সাহায্যে এ সব নক্সা-নমুনার ছাঁদে ছোট ছেলেমেয়েদের সুদৃশ্য সৌখিন পোষাক-পরিচ্ছদাদি বানানো খুব একটা দুঃসাধ্য-কঠিন বা প্রচুর ব্যয়-সাপেক্ষ ব্যাপার নয়। উপরন্তু, এ ধরণের জামা-কাপড়গুলি ছোট ছেলেমেয়েদের অঙ্গেও বেশ সুন্দর ও মানানসই দেখাবে।

উপরের ১নং চিত্রে ছোট মেয়েদের পরিধানোপযোগী যে সাধাসিধা অথচ-অভিনব ছাঁদের ফ্রকের নমুনাটি দেখানো হয়েছে, সেটী সুতী এবং রেশমী—দুই রকম কাপড়েই বানানো যাবে। এ পোষাকের ছাঁট-কাট সেলাইয়ের কাজও বিশেষ জটিল-ধরণের নয়···সীবন-শিল্পে যাঁদের অল্প-বিস্তর অভিজ্ঞতা আছে, তাঁরা এ সব কাজ সহজেই হাসিল করতে পারবেন। এই ধরণের 'ফ্রক,' 'আটপৌরে হিসাবে ব্যবহারের বদলে, পোষাকী-হিসাবেই ছোট মেয়েদের অঙ্গে আরো বেশী ছিম্‌ছাম্‌-সুন্দর ও মানানসই দেখাবে। তবে, নক্সাদার ছিটের কাপড়ের চেয়ে, লাল (Scarlet, or Crimson Red) হলদে lemon yellow), ফিরোজা বা আশমানী নীল, হালকা সবুজ (pale Green or Emareld Green) গোলাপী (pink), ফিকে বেগুনী (Mauve), বা হাল্‌কা ছাই (Silver Grey) ধরণের যে কোনো 'এক রঙা' সুতী কিম্বা রেশমী কাপড়েই আরো বেশী সুদৃশ্য মনোরম হয়ে উঠবে। 'এক রঙা' কাপড়ের সাহায্যে উপরের নমুনামতো ফ্রক বানানোর সময়, পকেটের ও গলার অংশের 'কুঁচি দেওয়া' আলঙ্কারিক কাজটুকু আগাগোড়া কিন্তু শাদা অথবা অন্য কোনো মানানসই ধরণের কাপড় বা 'লেসের' (Lace) টুকরো দিয়ে রচনা করতে হবে।

উপরের ২নং চিত্রে ছোট ছেলেদের ব্যবহারোপযোগী যে সরল সুন্দর ছাঁদের 'হাতা কাটা জামা' (short-sleeve shirt) ও 'খাটো পাৎলুনের' (short) নমুনা দেখানো হয়েছে, সেটিও সুতী কিম্বা রেশমী কাপড় দিয়ে অনায়াসেই বানিয়ে তোলা চলবে। তবে এ ধরণের পোষাকের জন্য, নক্সাদার কোনো ছিটের কাপড়ের চেয়ে, হালকা 'এক-রঙা' লাল (Scarlet or Crimson Red) ফিকে-হলদে (Lemon or Conwary yellow) ফিকে-সবুজ (pale Green) প্রভৃতি কাপড়ের শার্ট··· এবং গাঢ়-নীল (Dark Blue or Navy Blue) গাঢ়-সবুজ (Deep Green), গাঢ়-বাদামী (Dark Brown) প্রভৃতি গাঢ়-ধরণের 'এক-রঙা' কাপড়ের পাৎলুন রচনা করাই ভালো। তাহলে পরিচ্ছদটির সৌন্দর্য্য শোভা রীতিমত সুদৃশ্য-মনোরম হয়ে উঠবে। শার্টের বোতাম দুটিও কাপড়ের রঙের সঙ্গে যেন মানানসই হয়, এমন রঙীণ উপকরণ বেছে নেওয়াই ভালো।

পরপৃষ্ঠায় ৩নং চিত্রে সাধাসিধে সরল ছাঁদের যে ফ্রকের নমুনা দেখানো হয়েছে, সেটি ছোট মেয়েদের সুদৃশ্য সৌখিন 'পোষাকী'—পরিধেয় হিসাবে খুবই উপযোগী হবে। এ নমুনাটিও সহজ উপায়েই রঙ-বেরঙের নক্সাদার

ছিটের এবং হালকা-ধরণের হলদে (Lemon or Canwary yellow), আশমানী (pale Blue), গোলাপী (pink), ফিকে সবুজ (pale green), ফিকে বেগুনী (Mauve) প্রভৃতি যে কোনো 'একরঙা' সুতী বা রেশমী কাপড়ের সাহায্যে রচনা করা যাবে। ফ্রকের কিনারায় যে বোতামগুলি ব্যবহার করবেন, সেগুলি যেন জামার কাপড়ের রঙের সঙ্গে মানানসই এবং বেশ সৌখিন ছাঁদের হয়, বাজারের দোকান থেকে বেছে কিনলেই চলবে।

তবে উপরের ১নং এবং ৩নং নমুনা মতো ছাঁদে ছোট মেয়েদের ফ্রক বানানোর সময়—জামার হাতার গড়নের দিকে বিশেষভাবে নজর রেখে, পছন্দমতো সুতীর বা রেশমের কাপড়টিকে নিখুঁত পরিপাটিভাবে ছাঁট-কাট-সেলাই করবেন।

পাশের ৪নং চিত্রেও ছোট ছেলেদের পরিধানোপযোগী আরেকটি সুদৃশ্য সৌখিন পোষাকের নমুনা দেওয়া হলো। এ পোষাকটি 'নিকারবোকার' (knickerboker) ধরণের···'আটপৌরে' পরিচ্ছদ হিসাবে ব্যবহারের পরিবর্তে, 'পোষাকী' হিসাবেই এটি বিশেষ সুবিধার হবে। বলা বাহুল্য, অন্যগুলির মতোই এ পোষাকটিও, সুতী এবং রেশমী—উভয় ধরণের কাপড় দিয়েই বানানো চলবে···তবে, রঙচঙে, নক্সাদার, ছিটের কাপড়ের চেয়ে, 'হালকা ধরণের' ফিরোজা, আশমানী, হলদে, গোলাপী বা সবুজ প্রভৃতি যে কোনো 'একরঙা' কাপড় দিয়ে বানালেই, পরিচ্ছদটি আরো বেশী শোভন সুন্দর ও মনোরম দেখাবে। নীচের নমুনাটিতে পোষাকের সামনের দিকে কাঁধের দুইপাশে বুকের উপরাংশে যে নক্সাদার কাজটি দেখানো রয়েছে, সেটি 'হনিকোম্ব' এমব্রয়ডারী সূচীশিল্পের সাহায্যে রচনা করলেই চমৎকার মানানসই বোধ হবে।

আপাততঃ, এই চারটি পোষাকের নমুনা উপহার দেওয়া হলো···বারান্তরে, ছোট ছেলেমেয়েদের সুদৃশ্য সৌখিন পোষাক পরিচ্ছদ বানানোর উপযোগী আরো কয়েকটি অভিনব বিচিত্র নতুন নক্সা-নমুনার পরিচয় দেবার বাসনা রইলো।

স্বধীরা হালদার

এবারে বলছি---ভারতের পাঞ্জাব-অঞ্চলের অধিবাসীদের বিশেষ প্রিয় অভিনব সুস্বাদু মুখরোচক এক ধরণের মিষ্টান্ন রান্নার কথা। বিচিত্র মধুর এই পাঞ্জাবী মিষ্টান্নটির নাম—'বাদাম-ভোগ'। বিশেষ কোনো উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বাড়ীতে আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব ও অতিথি অভ্যাগত-দের নতুন ধরণের খাদ্য পরিবেষণ করে সাদরে পরিতৃপ্ত করার পক্ষে, পাঞ্জাবী প্রথায় পাক করা এই 'বাদাম-ভোগ' মিষ্টান্নটি পরম উপযোগী।

'বাদাম-ভোগ' মিষ্টান্ন বানানোর জন্য উপকরণ চাই—আধপোয়া বাদাম, আধপোয়া ক্ষীর, আধসের ছানা, আধ-পোয়া চিনি, একপোয়া ঘি, অল্প একটু আদার কুচি এবং আন্দাজমতো পরিমাণে কিছু কিসমিস, মৌরী আর ছোট এলাচের দানা।

এ সব উপকরণ সংগ্রহ হবার পর, রান্নার কাজে হাত দেবার আগে, বাদামগুলিকে খোলা ছাড়িয়ে পরিষ্কার জলে বেশ ভালোভাবে ধুয়ে সাফ্ করে ছুরি বা বঁটির সাহায্যে সেগুলিকে আগাগোড়া সরু-মিহি ছাঁদে কুচিয়ে নিন। তারপর ছানা ও ক্ষীর একত্রে মিশিয়ে, সেই 'মিশ্রণটিকে' আগাগোড়া বেশ ভালোভাবে মিহি-ছাঁদে বেটে নিন।

এ কাজ সারা হলে, উনানের আঁচে রন্ধন-পাত্র চাপিয়ে, সেই পাত্রে আন্দাজমতো পরিমাণে ঘি দিয়ে, তপ্ত তরল ঘিয়ে বাদামের অর্দ্ধেকটুকুর সঙ্গে কিসমিস, আদার কুচি, ও মৌরী মিশিয়ে কিছুক্ষণ ভাজুন। এ 'মিশ্রণটি' বেশ ভালোভাবে ভাজা হলে, রন্ধন পাত্রে ছানাটুকু দিয়ে, খাবারটি আরো কিছুক্ষণ পাক করুন। এভাবে পাক করার ফলে, 'মিশ্রণটি' যখন বেশ আল্‌গা ধরণের হয়ে উঠবে, তখন উনানের উপর থেকে রন্ধন পাত্রটিকে নামিয়ে, খাবারটি সযত্নে অন্য আরেকটি পরিষ্কার পাত্রে তুলে রাখুন এবং সদ্য-পাক-করা মিষ্টান্নটির উপর ছোট এলাচের দানা আর ইতিপূর্ব্বে কুচিয়ে রাখা বাদামের বাকী অর্দ্ধেক মিহি-সরু টুকরোগুলি ছড়িয়ে দিন। তাহলেই পাঞ্জাবী প্রথায় 'বাদাম-ভোগ' মিষ্টান্ন রান্নার কাজ চুকবে।

রান্নার পর, সযত্নে প্রিয়জনদের পাতে পরিবেষণের পালা। পরিবেষণের সময়, খাবারটি ঈষৎ গরম থাকতেই দেওয়া ভালো। কারণ, 'বাদাম-ভোগ' মিষ্টান্নটি ঈষৎ গরম থাকলেই, খেতে সুস্বাদু লাগে। অনেকে অবশ্য 'বাদাম-ভোগ' মিষ্টান্নের উপর 'কাঁচা-বাদামের' কুচি ছড়ানোর ব্যবস্থাটি বিশেষ পছন্দ করেন না। কাজেই তাঁদের তৃপ্তিদানের উদ্দেশ্যে, বাদামের মিহি-সরু কুচি-গুলিকে ভেজে নিয়ে, খাবারের উপর ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে।

এই হলো—পাঞ্জাবী প্রথায় 'বাদাম-ভোগ' মিষ্টান্ন পাক করার মোটামুটি নিয়ম।

আগামী সংখ্যায় আরেকটি বিচিত্র অভিনব ভারতীয় খাবার রান্নার পরিচয় দেবার বাসনা রইলো।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

২

কাঁচা মাটির রাস্তা। পাশাপাশি দুখানি রিক্সা চলতে পারে ততটুকু চওড়াও নয়। তাই একখানি রিক্সা আগে চলল আর একখানি তার পিছনে পিছনে। শুভ্রাদের রিক্সা খানাই আগে আগে চলছিল। কিন্তু রাস্তার মোড় ঘুরবার সময় কেতকী রিক্সাওয়ালাকে ইসারা করে রামবাবুদের রিক্সাকে পথ ছেড়ে দিতে বলল।

শুভ্রা বলল 'কী ব্যাপার। আমাদের রিক্সাটা পিছনে রাখতে বললি যে?

কেতকী বলল 'গল্প করতে করতে যাব। রামবাবুর রিক্সা পিছনে পিছনে থাকলে উনি শুনে ফেলতে পারেন। কান তো খাড়া করেই আছেন।'

শুভ্রা হেসে বলল 'ফাজিল কোথাকার।' কেতকী বলল 'তারপর'? কি রকম মনে হয় তোর?'

শুভ্রা বলল 'ভালোই তো লাগল। এত ভালো ব্যবহার। আমি তো কলকাতার আশেপাশে আরো ছ একটা স্কুলে ইণ্টারভিউ দিয়েছি। এক জায়গায় গিয়ে শুনলাম সেখানে শুধু ছেলেদের নেওয়া হবে। অ্যাডভার-টাইসমেণ্ট দেখতে ভুল হয়েছিল আমার। দুই বুড়ো ভদ্রলোক এসেছিলেন ইণ্টারভিউ নেওয়ার জন্যে। আমাকে দেখে তাঁদের মেজাজ আরো বিগড়ে গেল। তাঁরা বললেন তুমি কেন এসেছ? তুমি কি বিজ্ঞাপন দেখনি? আমি বললাম আমার ভুল হয়েছিল। কিন্তু আমাকে ইণ্টার-ভিউর জন্যে আসতে বলা হল কেন? একজন বললেন তাহলে বিষ্টুবাবুর ভুল হয়ে থাকবে। আর একজন বললেন খোঁজ নাও হে। হয়তো ইচ্ছে করেই দুষ্টুমি করেছে। তা হলে ষ্টেপ নিতে হবে। কড়া মেজাজী ভদ্রলোকের মেজাজ আরো কড়া হয়ে উঠল।'

কেতকী হেসে বলল 'ভারি মজার ব্যাপার তো। বলিসনি তো এর আগে। তারপর?'

'তারপর আর কি? ধমক টমক খেয়ে চলে এলাম। দুই বুড়ো বসে বসে চা খেতে লাগলেন। আশ্চর্য আমাকে এক কাপ অফারও করলেন না।

কেতকী হেসে বলল 'আহা কী আফসোস। দুটি যুবক

হলে নিশ্চয়ই তোকে শুধু চা নয় চপ কাটলেট শুদ্ধ খাইয়ে ছাড়ত। কিন্তু বুড়োরাতো আমাদের আরো বেশি আদর যত্ন করে ভাই। আমি অনেক জায়গায় দেখেছি। তোর দুই বুড়ো বোধ হয় বুড়ীদের জ্বালায় অস্থির হয়ে ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে পড়েছেন। তাই জলাতঙ্কের মত মেয়ে আতঙ্ক হয়েছে ওদের। পড়তেন আমার পাল্লায়!'

শুভ্রা হেসে বলল, 'তোর পাল্লায় পড়াই ওদের উচিত ছিল। আমি আরো কয়েক জায়গায় খারাপ ব্যবহার পেয়েছি জানিস কেতকী। তার তুলনায় রামবাবু—'

কেতকী বলল 'স্বর্গের দেবতা তাইনা? কিন্তু আমার বড্ড ভয়রে শুভ্রা।'

'কিসের ভয়?'

কেতকী বলল, 'তোকে দেবী না বানিয়ে বসেন।'

শুভ্রা ফের হেসে বলল, 'ফাজিল কোথাকার।' কিন্তু কেতকীর বোধ হয় ইচ্ছা প্রসঙ্গটা সে কলকাতা পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবে। সে হেসে বলল 'আদর যত্নের যা ঘটা দেখলাম তাতে মনে হল কোন দিন তোকে বলে বসবেন তুমি আমার মেয়েদের মায়ের আসনটিতে এসে বসো সেটি তো এখনো খালিই আছে।

শুভ্রা এবার বিরক্ত হয়ে ধমক দিয়ে বন্ধুকে বলল 'বড্ড বাড়াবাড়ি করছিস কেতকী। ইয়ার্কির একটা সীমা আছে।' ধমক খেয়ে কেতকী এবার চুপ করল।

শুভ্রা দুপাশে দেখতে দেখতে যেতে লাগল। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমেছে। চার দিকে শান্ত স্তব্ধতা। আসবার সময় যে ছোট ছোট বাড়িগুলি দেখেছিল এখন সেগুলির চেহারা বদলে গেছে। কেমন যেন ছায়া ছায়া রহস্য ঘেরা বলে মনে হচ্ছে সব। ঘরে ঘরে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বলে উঠেছে। ঝোপ ঝাড়ের ভিতর দিয়ে ক্ষীণ আলোর রেখা দেখা যায়! মাঝে মাঝে ছেলে মেয়েদের কোলাহল। 'পড়তে বোসো এখন। পড়তে বোসো সব। বোধ হয় কোন মায়ের গলা! ডান দিকে বিস্তীর্ণ শূন্য মাঠ স্তব্ধ হয়ে পড়ে আছে। অন্ধকারে নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের মত মনে হয়। নির্মেঘ আকাশে সংখ্যাহীন তারা। গ্রামের এই শান্ত পরিবেশে যেন তাদের আরো উজ্জ্বল মনে হচ্ছে। সব মিলিয়ে কিসের শান্ত বিষণ্ণতায় মন ভরে উঠেছিল শুভ্রার। বাবার কথা বার বার করে মনে পড়ছিল। প্রকৃতির দিকে তাকাবার চোখ বাবাই তাকে দিয়েছিলেন যেন! তিনি ছুটির দিনে তাদের নিয়ে বেড়াতে বেরোতেন। শুধু শহরের সীমানার মধ্যেই ঘুরতেন না। মাঝে মাঝে গ্রামের দিকেও যেতেন। লোকাল ট্রেণে উঠে অজানা অচেনা কোন ষ্টেশনে নেমে পড়তেন মাঝে মাঝে। মা রাগ করতেন 'একি বাতিক তোমার। এই বনজঙ্গলে কেন নেমে পড়লে বলতো। এখানে কী দেখবার আছে?'

বাবা বলতেন 'আছে আছে। একটু ভালো করে তাকালেই দেখতে পাবে। দেখবার মত অনেক কিছু আছে।'

মা দেখতেন না। বাবা দেখতেন। আর শুভ্রাকে দেখাতেন, সবুজ গাছপালা, ছোট ছোট পুকুর। কোন পুকুর পানায় ঢাকা। কোন পুকুরে হয়তো একটি লাল শাপলা ফুটে আছে। বললে বাবার খুব আনন্দ হত। তিনি বলতেন বেশির ভাগই শাদা শাপলা দেখা যায়। লাল শাপলা খুব রেয়ার জানিস? মা আসতে চাইতেন না বলে কোন কোন দিন শুধু শুভ্রা আর তার দুটি ভাই বোন শিপু আর তপুকে নিয়ে এমনি অজানা অচেনা গ্রাম দেখতে বেরোতেন বাবা। আকাশের তারা দেখতেন। ঝোপে ঝাড়ে হলদে জোনাকিগুলি জ্বলত আর নিবত-বাবা আঙুল দিয়ে দেখাতেন। বাবার ইচ্ছা ছিল গ্রামের দিকে কোথাও জমি টমি কিনে বাড়ি তুলবেন। সেই বাড়িতে বাস করবেন। কিন্তু মা তা কখনো হতে দেবেন না। অবশ্য স্থায়ী ভাবে গাঁয়ে বাস করবার ইচ্ছা শুভ্রাদের কারোরই ছিল না। গাঁয়ে মাঝে মাঝে বেড়াতে যেতে ভালো লাগে। কিন্তু সব সময় বাস করা যায় কি? সেখানে কি শহরের সুযোগ সুবিধা কিছু আছে? ভালো স্কুল নেই কলেজের তো কথাই ওঠে না। বাস ট্রাম নেই ভালো রাস্তা টাস্তা নেই। কাজ কর্মেরই কি কোন সুবিধা আছে? মা বলতেন 'তোমার ওই সবুজ দৃশ্য দেখে কি পেট ভরবে? গাঁয়ে বাড়ি করতে হলে তোমাকে গাড়ি করতে হবে। কিন্তু গাড়ি করলেও সব সুযোগ সুবিধে তুমি পাবে না। ভালো এসোসিয়েসন জুটবে না। ছেলে মেয়েদের মানুষ করা কঠিন হবে।'

বাবা কলকাতা থেকে একটু দূরে গাঁয়ের দিকে জমি

দেখতে গেলেই মা এইসব তর্ক তুলতেন। তারপর অবশ্য সব জল্পনা-কল্পনা হঠাৎ একদিন শেষ হয়ে গেল। বাবা করোনারী থ্রম্বসিসে মারা গেলেন। ব্লাডপ্রেসার আগে থেকেই ছিল। মা কত বলতেন। কিন্তু বাবা গ্রাহ্য করতেন না। তার ফলে যা হবার হয়েছে। সব শূন্য করে দিয়ে গেছেন বাবা। লাইফইনসিওরেনস আর প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের কিছু সঞ্চয় অবশ্য আছে। কিন্তু ভেঙে খেলে তা আর কতদিন। ছোট ভাইবোন দুটির একটি কলেজে পড়ে একটি এখনো স্কুলে। ওদের মানুষ করে তুলতে হবে। সেই দায়িত্ব কি শুভ্রা স্বীকার না করে পারে? তাই তিনচার মাসের শোকাচ্ছন্নতার পরে শুভ্রা আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই চাকরির চেষ্টা শুরু করেছে। কে জানে বাবার সেই গ্রামপ্রীতিই হয়তো তাকে এমন করে গাঁয়ের দিকে টেনে এনেছে!

অনেকক্ষণ পরে কেতকী কথা বলল 'এই যে ষ্টেশন দেখা যাচ্ছে। কী ভাবছিলিরে শুভ্রা? যেন একেবারে তন্ময় হয়ে ডুবে ছিলি?'

শুভ্রা মৃদুস্বরে বলল 'বাবার কথা মনে পড়ছিল কেতকী। তিনি গ্রাম খুব ভালোবাসতেন। কতদিন বেড়াতে নিয়ে গেছেন গাঁয়ের দিকে।'

প্রগল্‌ভা কেতকী এবার হঠাৎ যেন কোন কথা বলতে পারল না। একটু চুপ করে থেকে বলল 'জানি। তাঁকে তো আমিও কতবার দেখেছি। কত ভালো-বাসতেন। কাছে বসিয়ে রেখে গল্প করতেন। অমন মানুষ আমি আর দেখিনি। কিন্তু ভেবে আর কি করবি বল?' শুভ্রা একটু কাল চুপ করে রইল। তারপর একটি দীর্ঘশ্বাস চেপে মৃদুস্বরে বলল, 'না করবার আর কিছু নেই। তবে তাঁর কথা ভাবতে ভালো লাগে।'

ষ্টেশনে এসে পৌছল সবাই। রামবাবুই দু'খানা রিক্সারই ভাড়া দিলেন। আশ্চর্য নিজেই টিকেট কাটলেন শুভ্রাদের। কিছুতেই শুনলেন না। বললেন 'এতো সামান্য। কী আর এমন টিকেটের দাম।'

দাম কম হোক বেশি হোক, এত কম আলাপ পরিচয়ে যে কেউ কারো কাছ থেকে ভাড়া নিতে পারে না সে জ্ঞান কি রামবাবুর নেই। আশ্চর্য মানুষ! ওঁর না হয় দেওয়ার ক্ষমতা আছে। শুভ্ররা নিতে যাবে কেন? তাদের কি কোন সম্ভ্রমবোধ নেই? কিন্তু ভদ্রলোক এত সরল আর অমায়িকভাবে টিকেট দু'খানা তাদের হাতে তুলে দিলেন যে শুভ্রা তো ভালো কেতকীও কিছু বলতে পারল না। কিন্তু মনে মনে ক্ষুন্ন হল দু'জনই? অনাত্মীয় সদ্য পরিচিত কোন ভদ্রলোকের দান কেন তারা নেবে?

তারকেশ্বর থেকে শুভ্রাদের গাড়ি আসবার আগেই কলকাতার একখানা গাড়ি এসে পড়ল।

কয়েকজন ভদ্রলোক এই ষ্টেশনে নামলেন। হঠাৎ তাদের দেখে রামবাবু বলে উঠলেন 'এই যে সমীরণ? এই যে আমিনুল? তোমরা বুঝি কলকাতা থেকে ফিরছ?'

সুদর্শন দীর্ঘাঙ্গ যুবকটি বলল 'হ্যাঁ রামদা।' রামবাবু আর একটি যুবকের দিকে ফিরলেন 'হাতে অতবড় বাণ্ডিল কিসের? প্রাইজের বই বুঝি আমিনুল?'

বেঁটে খাটো ছেলেটি বলল হ্যাঁ 'রাম দা।' শুভ্রাদের দিকে একটু আড়চোখে তাকিয়ে তারা চলে আসছিল রামবাবু বললেন 'দাঁড়াও পরিচয় করিয়ে দিই। এঁরা কলকাতা থেকে আমাদের স্কুলে ইন্টারভিউ দিতে এসেছিলেন। ভাবলাম একটু এগিয়ে দিই। আসতে আসতে একেবারে ষ্টেশনেই এসে পড়লাম।'

দীর্ঘাঙ্গ যুবকটি একটু হেসে বলল 'আপনি তো কোন না কোন উপলক্ষ পেলেই ষ্টেশনে আসেন।'

রামবাবু বললেন, 'হ্যাঁ সমীরণ ঠিকই বলেছ। ষ্টেশন আমার ভাল লাগে। যত ছোট ষ্টেশনই হোক ভালো লাগে আমার। লোকজনের চলাচলে তাঁদের ওঠা নামা বেশ লাগে দেখতে। রোজই তো দেখছি তবু কেমন যেন নতুন নতুন মনে হয়। অল্প বয়সে আমার মনে হত ষ্টেশনের এই ছোট ঘরটুকু যেন অচল কোন ঘর নয়। ওরও চলার ক্ষমতা আছে! যে কোন মুহূর্তে ছুটতে শুরু করলেই হল। এখনো আমার মন থেকে ষ্টেশনের সেই রোমান্স কাটেনি।'

আমিনুল হেসে বলল, 'আপনি ভিতরে ভিতরে কবি রাম দা।'

শুভ্রার হঠাৎ মনে পড়ল তার বাবাকেও কেউ কেউ এই কথা বলত।

রামবাবু যুবক দুটির পূর্ণ পরিচয় দিলেন। সমীরণ

স্থর এখানকার ক্লাবের সেক্রেটারী আর আমিনুল হক লাইব্রেরীয়ান।

শুভ্রাদেরও নাম ধাম বলতেন কিনা কে জানে। এই সময় কলকাতায় যাওয়ার গাড়ি এসে পড়ল। ইলেকট্রিক ট্রেন।

রামবাবু ব্যস্ত ভাবে বললেন 'উঠুন উঠুন। উঠে পড়ুন।

কেতকী শুভ্রাকে আগে উঠতে দিল। তারপর নিজে উঠল।

গাড়ি ছেড়ে দেওয়ার আগে তিনিই হাসি মুখে প্রথমে ওদের নমস্কার জানালেন।

শুভ্রা আর কেতকী প্রতিনমস্কার জানাল।

গাড়িতে বেশ ভিড়। তবু বসবার জায়গা মিলল দুজনের। শুভ্রা জানলার ধার নিয়ে বসল।

কেতকী হেসে বলল, 'কী স্বার্থপর। ভালো জায়গাটি নিজেই বেছে নিলি আগে। বাঃ, মানুষের উপকার করতে নেই।'

শুভ্রা লজ্জিত হয়ে বলল, 'তুই বসবি এখানে? আয় না।'

কেতকী বলল, 'আরে না না। তুই বোস।' তারপর একটু হেসে বলল, 'আমার কথা যদি শুনিস শুভ্রা, এখানে তোর কাজ নেওয়ার দরকার নেই। ভাবী টিচারের ওপর সেক্রেটারীর যা দরদ দেখলাম তাতে লক্ষণ সুবিধের মনে হয় না।'

শুভ্রা মৃদু হেসে বলল, 'তুই বুঝি ফের ওই সব শুরু করলি? সারাটা পথ জ্বালিয়ে মারবি তুই।'

কেতকী বলল, 'তুই নিজে নিজেই জ্বলবি বিরহ তাপে।

শুভ্রা বলল, 'মাকে কিন্তু এসব বলিস নে কেতকী?'

'কোন সব?'

'এই জায়গাটা এত দূরের। যাতায়াতের এত অসুবিধে—

কেতকী বলল, 'আর সুবিধে গুলির কথা?'

শুভ্রা ভ্রূ কুঁচকে শাসনের কৃত্রিম ভঙ্গি এনে বলল 'ফের?' [ক্রমশঃ
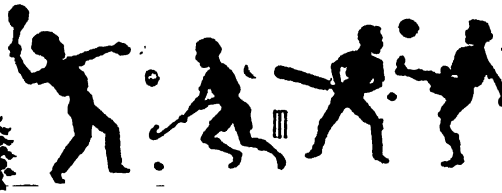
খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

ইংল্যাণ্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা :

দক্ষিণ আফ্রিকা ঃ ২৬৯ রান (রবার্ট গ্রিমি পোলক ১২৫ রান। টমাস উইলিয়ম কার্টরাইট ৯৪ রানে ৬ উইকেট)

ও ২৮৯ রান (এডি বার্লো ৭৭, এ্যারোন বাচার ৬৭ এবং রবার্ট পোলক ৫৯ রান। ডেভিড লাটার ৬৮ রানে ৫ এবং জন স্নো ৮৩ রানে ৩ উইকেট)

ইংল্যাণ্ড ঃ ২৪০ রান (কলিন কাউড্রে ১০৫ রান। পিটার ম্যাকলিন পোলক ৫৩ রানে ৫ উইকেট)

ও ২২৪ রান (পিটার পারফিট ৮৬ এবং জিম পার্কস নটআউট ৪৪ রান। পিটার পোলক ৩৪ রানে ৫ উইকেট)

নটিংহ্যামের ট্রেন্টব্রীজ মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকা বেসরকারী দ্বিতীয় টেষ্ট খেলায় ইংল্যাণ্ডকে ৯৪ রানে পরাজিত ক'রে ১৯৬৫ সালের বেসরকারী টেষ্ট সিরিজে ১—০ খেলায় অগ্রগামী হয়। লর্ড'স মাঠের প্রথম টেষ্ট ড্র হয়েছিল।

ক্রিকেট দলগত খেলা হলেও দক্ষিণ আফ্রিকার এই জয়লাভের মেরুদণ্ড ছিলেন পোলক ভ্রাতৃদ্বয়। ছোট ভাই রবার্ট গ্রিমি পোলক প্রথম ইনিংসে ১২৫ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৫৯ রান করেন, এবং বড়ভাই পিটার ম্যাকলীন পোলক ৮৭ রানে ১০টা উইকেট পান (৫৩ রানে ৫ ও ৩৪ রানে ৫)। অর্থাৎ এই দ্বিতীয় টেষ্ট খেলায় পোলক ভ্রাতৃদ্বয়ের ক্রীড়াচাতুর্য্য অপর খেলোয়াড়দের খেলা ম্লান করে দিয়েছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকা টসে জিতে প্রথম ব্যাট করতে নামে। যাত্রা শুভ হয়নি; দলের মাত্র ১৬ রানের মাথায় প্রথম ও দ্বিতীয় উইকেট পড়েছিল। দলের এই পতনের মুখে রবার্ট পোলক খেলতে নামেন। তিনি নির্ভয়ে খেললেও অন্যরা হতাশ করেছিলেন। লাঞ্চের সময় রান ছিল ৭৬ (৪ উইকেটে)। আরও খেলার অবনতি হ'ল। কিন্তু রবার্ট পোলক দর্শকদের হতাশ করলেন না। তিনি দলের ২৬৯ রানের মধ্যে একাই ১২৫ রান করলেন। বাউণ্ডারী মেরেছিলেন ২১টা। মাঠের কুড়ি হাজার দর্শক পোলকের খেলা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন; মাঠের দর্শকবৃন্দ দণ্ডায়মান হয়ে হর্ষধ্বনি দ্বারা তাঁকে অভিনন্দিত করেন। টেষ্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে পোলকের এই দিনের খেলাটি নজির হয়ে রইলো।

চা-পানের সময় দক্ষিণ আফ্রিকার রান ছিল ২২৪ (৭ উইকেটে)। তাদের প্রথম ইনিংস ২৬৯ রানের মাথায় শেষ হলে বাকি সময়ের খেলায় ইংল্যাণ্ড দুটো উইকেট হারিয়ে প্রথম ইনিংসের খেলায় মাত্র ১৬ রান তুলেছিল।

দ্বিতীয় দিনের লাঞ্চের সময় ইংল্যাণ্ডের রান ছিল ১০৫ (৪ উইকেটে)। দলের ৬৭ রানের মাথায় ৪র্থ উইকেট পড়েছিল। পঞ্চম উইকেটের জুটিতে পারফিট এবং কাউড্রে ৬৬ রান এবং ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে

অধিনায়ক মাইক স্মিথ এবং কাউড্রে ৯২ রান যোগ করেছিলেন। কাউড্রের ব্যক্তিগত ১০৫ রান দলের রান-সংখ্যা যা ভদ্রস্থ করেছিল। ২৪০ রানের মাথায় ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হলে দক্ষিণ আফ্রিকা ২৯ রানে এগিয়ে এই দিনের বাকি সময়ের খেলায় একটা উইকেট হারিয়ে ২৭ রান সংগ্রহ করেছিল।

তৃতীয় দিনের লাঞ্চের সময় দক্ষিণ আফ্রিকার রান দাঁড়ায় ১০৫ (২ উইকেটে)। উইকেটে অপরাজিত ছিলেন বাচার (৫১ রান) এবং বার্লো (৩৫ রান)। তৃতীয় উইকেটের জুটিতে বাচার এবং বার্লো দলের ৯৯ রান তুলে দিয়েছিলেন। এডি বার্লো ৩ ঘণ্টা ১০ মিনিটে ৭৬ রান তুলেছিলেন। তাঁর এই রানই ছিল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ব্যক্তিগত সর্ব্বোচ্চ রান। তৃতীয় দিনে বার্লোর খেলা প্রাধান্য লাভ করেছিল। চা-পানের পর দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় ইনিংস ২৮৯ রানের মাথায় শেষ হয়, ফলে খেলায় ইংল্যাণ্ডের জয়লাভের জন্যে ৩১৯ রানের প্রয়োজন হয়। হাতে ছিল দুদিনেরও বেশী সময়। ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনা শুভ হয়নি, ১০ রানের মাথায় ২য় উইকেট পড়ে গেলে দক্ষিণ আফ্রিকা খেলার উপর আরও প্রাধান্য লাভ করে। তৃতীয় দিনের খেলার শেষে দেখা গেল ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় মাত্র ১০ রান জমা হয়েছে দুটো উইকেট পড়ে।

চতুর্থ দিনে লাঞ্চের আগেই ৫৯ রানের মাথায় ইংল্যাণ্ডের ৬ষ্ঠ উইকেট পড়ে যায়। ফলে চতুর্থ দিনেই খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হওয়ার জোর সম্ভাবনা দেখা দেয়। সপ্তম উইকেটের জুটিতে পিটার পারফিট এবং অধিনায়ক মাইক স্মিথ ৮৫ মিনিট খেলে দলের ৫৫ রান সংগ্রহ করেছিলেন। এরপর অষ্টম উইকেটের জুটিতে পারফিট এবং পার্কস মিনিটে এক রান ক'রে দলের ৯০ রান তুলেছিলেন। চতুর্থ দিনে নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত খেলা গড়ায় নি; ১৫ মিনিট আগে ২২৪ রানের মাথায় ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হলে পুরো একদিনের খেলা হাতে জমা থাকতে দক্ষিণ আফ্রিকা ৯৪ রানে জয়লাভ করে। এই দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ব্যাটিং এবং বোলিংয়ে উভয় দলের পক্ষে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন পোলক ভ্রাতৃদ্বয়।

প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগ ঃ

১৯৬৫ সালের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় মোহনবাগান দল অপরাজিত অবস্থায় উপর্যুপরি দু'বছর লীগ চ্যাম্পিয়ান হওয়ার গৌরব লাভ করেছে। তারা আগেই লীগ বিজয়ী হয়েছিল। গত ২৮শে আগষ্ট মোহনবাগান বনাম ইষ্টবেঙ্গল দলের খেলাটি গোলশূন্য অবস্থায় ড্র গেলে মোহনবাগান অপরাজিত অবস্থায় লীগ বিজয়ের সম্মান লাভ করে। মোহনবাগান ২৮টা খেলায় ৫২ পয়েন্ট পেয়েছে। অপরদিকে রাণার্স-আপ ইষ্টবেঙ্গল ২৮টা খেলায় পেয়েছে ৪৬ পয়েন্ট। প্রথম বিভাগ থেকে দ্বিতীয় বিভাগে নেমেছে গ্রীয়ার স্পোর্টিং, ২৮টা খেলায় মাত্র ৮ পয়েন্ট পেয়ে।

লীগ তালিকায় প্রথম তিনটি দল

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পঃ
মোহনবাগান	২৮	২৪	৪	০	৫১	৩	৫২
ইষ্টবেঙ্গল	২৮	১৯	৮	১	৪৫	৮	৪৬
ইষ্টার্ণ রেল	২৮	১৮	৬	৪	৩৪	৮	৪২

সম্পাদকদ্বয়—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,)
কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে ২।৭।৬৫ তারিখে মুদ্রিত ও প্রকাশিত
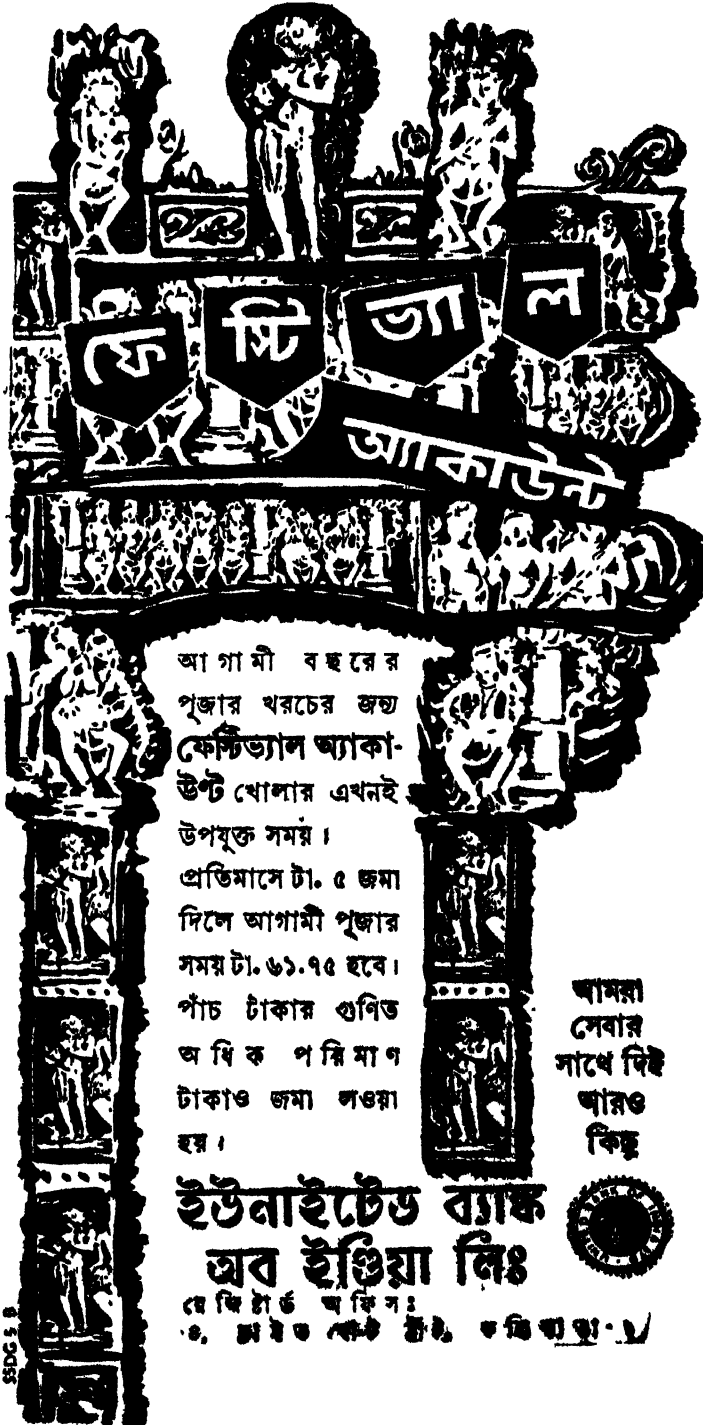
ফেস্টিভ্যাল
অ্যাকাউন্ট
আগামী বছরের
পূজার খরচের জন্য
ফেস্টিভ্যাল অ্যাকা-
উন্ট খোলার এখনই
উপযুক্ত সময়।
প্রতিমাসে টা. ৫ জমা
দিলে আগামী পূজার
সময় টা. ৬১.৭৫ হবে।
পাঁচ টাকার গুণিত
অধিক পরিমাণ
টাকাও জমা লওয়া
হয়।
আমরা
সেবার
সাথে দিই
আরও
কিছু
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক
অব ইণ্ডিয়া লিঃ
রেজিষ্টার্ড অফিস:

আশ্বিন—১৩৭২

প্রথম খণ্ড | ত্রিপঞ্চাশত্তম বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

সর্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনি।
বিশ্বস্যোপরতৌ শক্তে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
শরণাগতদীনার্তপরিত্রাণপরায়ণে।
সর্বস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

ঋগ্বেদীয় দেবীসূক্ত ও তাহার বৈশিষ্ট্য

শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্ত্তী এম-এ

যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥

বিশাল ঋগ্বেদ সংহিতার সহস্রাধিক সূক্তের মধ্যে দেবীসূক্ত নামে কথিত দশম মণ্ডলস্থ ১২৫ সূক্তটি এক বিশেষ মর্য্যাদার অধিকারী বলিয়া সর্ব্বত্র স্বীকৃত। মহাদেবী দুর্গার পূজায় এবং চণ্ডী পাঠকালে এই সূক্তপাঠের ব্যবস্থা আছে। কেবল শক্তি-উপাসকগণের নিকটই নয়, প্রাচীন যুগের কয়েকজন অতিপ্রখ্যাত বেদাচার্য্যের দৃষ্টিতেও সূক্তটির বৈশিষ্ট্য ধরা পড়িয়াছিল, দেখা যায়। প্রখ্যাত বেদাচার্য্য দেবমিত্র শাকল্য, অন্যান্য ঋক্‌সূক্তের সঙ্গে ইহারও পদপাঠ রচনা করিয়াছিলেন। অথর্ব্ববেদেও এই সূক্তটি মন্ত্রের ক্রমান্তর সহ পুরাপুরিভাবেই দেখিতে পাওয়া যায় (শৌনকীয় অথর্ব্ববেদের ৪.৩০ সূক্ত)। এতদ্ব্যতীত ঋগ্বেদীয় সাঙ্খ্যায়ন আরণ্যক (৭।২৩) ও সাঙ্খ্যায়ন শ্রৌত-সূত্র (৬।১১।১১), এবং বৃদ্ধহারীত সংহিতা, বাসিষ্ঠ ধর্ম্ম-শাস্ত্র, কৌশিকসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থে এই সূক্তের মন্ত্র ও মন্ত্রাংশের উল্লেখ আছে। আচার্য্য যাস্কের নিরুক্ত-গ্রন্থের (খৃঃ পূঃ ৭ম শতাব্দী) ৭।২-৩ অনুচ্ছেদেও এই সূক্তের বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং সূক্তটির বৈশিষ্ট্য, প্রামাণ্য ও প্রাচীনতা অনস্বীকার্য্য। বেদপাঠ যাহাদের পক্ষে একটি বিরলবিলাস মাত্র, হাল-আমলের এজাতীয় দু-একজন গবেষক বলিয়া থাকেন যে সূক্তটি ঋগ্বেদে একটি বিশেষ প্রয়োজনের তাগিদেই প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল (ডঃ কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, বেতার জগৎ শারদীয় বিশেষসংখ্যা, ১৯৬৩, ৮ম পৃষ্ঠা)। এ সম্পর্কে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। অপর এক প্রখ্যাত গবেষকের মতে এই সূক্তটির মধ্যে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে কোনও মাতৃদেবীর উল্লেখ নাই বা শক্তি-আরাধনা বা দেবী আরাধনারও কোন কথা নাই, "বিশেষ একটি দার্শনিক ব্যাখ্যাদ্বারাই সূক্তটিকে পরবর্ত্তী কালের শক্তিদেবীর সহিত যুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে" (পরলোকগত ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, ২৯-৩০ পৃষ্ঠা)। সূক্তটির আলোচনাকালে আমরা দেখিব যে, এরূপ উক্তির অণুমাত্রও ভিত্তি নাই, পক্ষান্তরে ইহার প্রতিটি মন্ত্রে "ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে" মাতৃদেবীর এবং মাতৃ আরাধনার কথা বিশেষভাবে কথিত হইয়াছে। আমরা ইহাও দেখিব যে আর্য্যসমাজে মাতৃ-আরাধনা পরবর্ত্তীকালে প্রবর্ত্তিত হয় নাই; শক্তিদেবীও পরবর্ত্তী কালে জাত হন নাই অনাদিকাল হইতেই তিনি বিরাজমানা।

ঋগ্বেদের মণ্ডল-বিভাগ

ছাত্রাবস্থায় আমরা সে যুগের অনেক প্রখ্যাত অধ্যাপকের মুখেই শুনিতাম যে, অমুক স্থানের নাম ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলে, আর অমুক-অমুক নদীর নাম সপ্তম মণ্ডলে বা দশম মণ্ডলে আছে; সুতরাং এই সব স্থান বা নদীর নাম ঋগ্বেদ-রচনার প্রথম যুগে ঋষিগণের বা আর্য্যগণের নিকট অজ্ঞাত ছিল, পরবর্ত্তী বা শেষ যুগেই এগুলি জ্ঞাত হয়। বস্তুতঃপক্ষে তাঁহারা ১, ২, ৩, ৪ প্রভৃতি গাণিতিক পর্য্যায় অনুযায়ী স্থিরীকৃত একটা ভ্রান্ত, কল্পিত এবং নিকৃষ্ট শ্রেণীর বৈদেশিক অভিমতেরই প্রতিধ্বনি করিতেন মাত্র। এজাতীয় "মৌলিক" অভিমতের অভাব যে বর্ত্তমান যুগেও ঘটিয়াছে, এমন কথা বলা যায় না। সামান্য মাত্র ঐতিহাসিক দৃষ্টি লইয়া মূল ঋগ্বেদ পাঠ করিলেই, এই ধারণা যে কতদূর ভ্রান্ত, তাহা বুঝা যায়। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের প্রথম দশটি সূক্তের ঋষি হইলেন বিশ্বামিত্র পুত্র মধুচ্ছন্দা, একাদশতম সূক্তের দ্রষ্টা মধুচ্ছন্দা-পুত্র ঋষি জেতা, অথচ মধুচ্ছন্দার পিতা বিশ্বামিত্র, পিতামহ গাথী ও প্রপিতা-মহ বা বৃদ্ধপ্রপিতামহ কুশিক দৃষ্ট সূক্তসমূহ স্থান পাইয়াছে তৃতীয় মণ্ডলে। তেমনই বসিষ্ঠ-বংশের আদি ঋষি বসিষ্ঠ-মৈত্রাবরুণির দৃষ্ট সূক্তসমূহ ৭ম মণ্ডলে, আর তদীয় এক বহু-পরবর্ত্তী বংশধর ঋষি পরাশর দৃষ্ট সূক্তসমূহ ১ম মণ্ডলে স্থানলাভ করিয়াছে। বসিষ্ঠ বিশ্বামিত্র অপেক্ষাও প্রাচীনতর ঋষি, অঙ্গিরা-পুত্র বৃহস্পতি ও মরীচি-পুত্র কশ্যপ প্রভৃতির এবং বেশ কয়েকটি দেবদেবী কর্ত্তৃক দৃষ্ট সূক্তেরও সন্ধান

পাওয়া যায় ঋগ্বেদের ৯ম ও ১০ম মণ্ডলে। সুতরাং ঋগ্বেদের মণ্ডল-বিভাগ যে সময়ের পর্য্যায়ে বা গাণিতিক পর্য্যায়ে হয় নাই, ইহা অবধারিত। প্রথম ও দশম মণ্ডলের ঋষিগণ বিভিন্ন বংশীয় বা বিভিন্ন গোত্রীয় ছিলেন, দেখা যায়। প্রথম মণ্ডলকে প্রাচীন বেদাচার্য্যগণ শতর্চী-মণ্ডল নামেও অভিহিত করিতেন (শত মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষিকেই শতর্চিন্ বা শতর্চী বলা হইত)। দ্বিতীয় মণ্ডলে শুনক ভার্গবের পুত্র ঋষি গৃৎসমদ ও তদ্বংশীয়গণের সূক্তসমূহ গ্রথিত, তৃতীয় মণ্ডলের ঋষি বিশ্বামিত্র-গোষ্ঠী (এখানে বিশ্বামিত্র-পিতা গাথী এবং পিতামহ বা প্রপিতামহ ঋষিকুশিকও আছেন), চতুর্থ মণ্ডলের ঋষি প্রধানতঃ গৌতমবংশীয় বামদেব, ৫ম মণ্ডলে অত্রিবংশের সূক্তাবলী, ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ঋষি অঙ্গিরা-বংশীয় ভরদ্বাজ ও তদ্বংশধরগণ, ৭ম মণ্ডলের ঋষি বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি ও তাঁহার বংশাবলী, এবং ৮ম মণ্ডলে প্রধানতঃ কণ্ববংশীয় ঋষিগণের সূক্তসমূহ গ্রথিত। ৯ম মণ্ডলকে সোম-মণ্ডল বলা হয়; কারণ এই মণ্ডলের সামান্য কয়েকটি সূক্ত ও মন্ত্র ব্যতীত সমুদয় মন্ত্রই সোমদেবতার উদ্দেশে নিবেদিত। প্রথম ও দশম মণ্ডলের মত এই মণ্ডলেও বহু-বংশের বহু ঋষির দৃষ্ট সূক্তসমূহ বিদ্যমান।

দেবীসূক্তের ঋষি ও তাঁহার সম্ভাব্য আবির্ভাব কাল

শৌনকীয় আর্যানুক্রমণী (রচনা-কাল খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী অথবা তাহার পূর্ব্বে) ও আচার্য্য কাত্যায়ন-কৃত সর্বানুক্রমণী গ্রন্থে (খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষপাদ অথবা পরবর্ত্তী ৫ম শতাব্দীর প্রথম পাদ) এই সূক্তের ঋষিকার নাম দেখা যায় বাগাম্ভৃণী বা অম্ভৃণ-কন্যা দেবী বাক্। আচার্য্য যাস্কের নিরুক্তেও (খৃঃ পূঃ ৭ম শতাব্দী) সূক্তের ঋষিকা হিসাবে অম্ভৃণ-কন্যা দেবী বাকের নাম উল্লিখিত হইয়াছে (৭।২-৩)। এই অম্ভৃণ সম্ভবতঃ একজন ঋষি ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতৃ-পরিচয় অথবা বংশ-পরিচয় কোথাও দেওয়া হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যতদূর বুঝা যায়, প্রাচীন বেদাচার্য্যগণ এ সম্পর্কে সঠিক কিছু অবগত ছিলেন না। কিন্তু শুক্লযজুর্ব্বেদীয় বৃহদারণ্যকোপনিষদে প্রদত্ত আচার্য্য পরম্পরা[illegible]র্ব্বশেষ তালিকায় (৬.৫) অম্ভিনী ও বাক্ নামে এই বেদের অন্যতম ধারায় দুইজন আচার্য্যার নাম পাওয়া যায়। এখানে আচার্য্যা অম্ভিনীকে এই ধারার প্রথম, ও আচার্য্যা বাক্‌কে দ্বিতীয় আচার্য্যা হিসাবে দেখান হইয়াছে। আরও বলা হইয়াছে যে, আচার্য্যা অম্ভিনী শুক্লযজুর্মন্ত্রসমূহ স্বয়ং আদিত্য হইতে লাভ করিয়াছিলেন, এবং পরবর্ত্তী কালে তাহাই ঋষি বাজসনেয় যাজ্ঞবল্ক্য (বা ব্রহ্মরাত পুত্র যাজ্ঞবল্ক্য—বিষ্ণু পুরাণ ৩।৫।২ কর্ত্তৃক শুক্লযজুর্মন্ত্র বা বাজসনেয় সংহিতা নামে প্রচারিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। ব্রহ্মরাত-সুত এই যাজ্ঞবল্ক্য প্রথমে, বেদমন্ত্র সংকলয়িতা মহর্ষি বেদব্যাসের অন্যতম প্রধান শিষ্য ঋষি বৈশম্পায়নের শিষ্য ছিলেন, এবং পরে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আদিত্য দেবতা হইতে শুক্লযজুর্মন্ত্র নামে পবিত্র ও বিশুদ্ধ বেদমন্ত্র লাভ করেন বলিয়া বিভিন্ন পুরাণে কথিত হইয়াছে। সুতরাং অন্যতম প্রশিষ্য বিধায় এই যাজ্ঞবল্ক্য ব্রাহ্মরাতি বেদব্যাস হইতে গণনায় অধস্তন ৩য় পুরুষ ছিলেন। বৃহদারণ্যক গ্রন্থে উল্লিখিত আচার্য্য-তালিকাটি এইরূপ:—[আদিত্য] অম্ভিণী, বাক্, নৈধ্রুবি কশ্যপ (বা কাশ্যপ) শিল্প কশ্যপ, হরিত কশ্যপ, অসিত বার্ষগণ, জিহ্বাবান্ বাধ্যোগ, বাজশ্রবা, কুশ্রি, উপবেশি, অরুণ (ঔপবেশি), উদ্দালক ও যাজ্ঞবল্ক্য। তালিকা দৃষ্টেই বোঝা যায়, উদ্দালক আরুণির শিষ্য এই যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মবাহের পুত্র ছিলেন, এবং তিনি তৎকালীন মিথিলা-রাজ জনকের সভার শ্রেষ্ঠতম হন। ব্রহ্মবাহ-পুত্র এই যাজ্ঞবল্ক্য ব্রাহ্মবাহি, ঋগ্বেদের পদপাঠ-কর্ত্তা সুবিদ্বান্ দেবমিত্র শাকল্যের সমসাময়িক ছিলেন (বায়ু পুরাণ, ৬০।৩২, ৬০।৫৯; ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, প্রক্রিয়াপাদ-৬৭।৩২, ৬৬।৪১, এবং বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৩.৯), এবং জনক সভায় অনুষ্ঠিত ব্রহ্মবাদ সম্পর্কিত বিচারে, তদীয় আচার্য্য উদ্দালক আরুণি-সহ, গার্গী, শাকল্য প্রভৃতি অনেক ঋষিকেই পরাজিত করিয়াছিলেন। সুতরাং এই যাজ্ঞবল্ক্য বৈশম্পায়নের পূর্ব্বতন শিষ্য ঋষি বাজসনেয় যাজ্ঞবল্ক্যের অন্যতম বংশধর, এবং অন্ততঃপক্ষে ৭ পুরুষ অধস্তন ছিলেন। বাজসনেয় যাজ্ঞবল্ক্যের নাম আচার্য্য তালিকায় উল্লিখিত হয় নাই। যাঁহার নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তিনি আদি আচার্য্যা অম্ভিণী হইতে অধস্তন ত্রয়োদশতম আচার্য্য। তাহা হইলে দেখা যায় যে, আচার্য্যা অম্ভিণী যাজ্ঞবল্ক্য ব্রাহ্মরাতি বাজসনেয়

হইতে উর্দ্ধতন ৯ম পুরুষ, এবং বেদব্যাস হইতে ৬ষ্ঠ পুরুষ। আচার্য্য-পরম্পরার অম্ভিণী ও বাক্, এই নাম দুইটি বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে এমন এক জোড়া নাম সম্ভবতঃ আর নাই। পূর্ব্বোক্ত দেবীসূক্তের ঋষিকা অম্ভৃণ-কন্যা বাক্ এবং আচার্য্যা বাক্ এক ও অভিন্না হইলে, অর্থাৎ উপনিষদোক্ত অম্ভিণী শব্দটিকে অম্ভৃণী শব্দেরই লিপিকার-প্রমাদ বলিয়া ধরা হইলে, মনে করিতে হয় যে, আচার্য্যা অম্ভিণী বা অম্ভৃণী ছিলেন ঋষি অম্ভৃণেরই অতি বিদুষী ভার্য্যা, আর ঋষিকা বাক্ তদীয়া মাতারই উপযুক্ত শিষ্যা। এই পরিচিতি সত্য হইলে, ঋষিকা বাক্ ব্রহ্মরাত-সুত যাজ্ঞবল্ক্য ব্রাহ্মরাতি বাজসনেয় হইতে অন্ততঃ পক্ষে ৮ × ৩০ বৎসর বা ২৪০ বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন বলিয়া মনে করা যায় (প্রতি আচার্য্যে গড়পড়তা অন্ততঃপক্ষে ৩০ বৎসর হিসাবে ধরা হইলে)। সুতরাং মহর্ষি বেদব্যাস কর্তৃক বেদ সংকলনের সময় এই দেবীসূক্তটি অন্যূন ১৬৫—১৮০ বৎসরের পুরাতন ছিল।

এস্থলে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, যাজ্ঞবল্ক্য একটি বংশ-নাম, ব্যক্তিগত নাম নয়। পুরাণের প্রমাণ অনুযায়ী আমরা এখানে অন্ততঃপক্ষে ৪ জন বিভিন্ন যাজ্ঞবল্ক্যের সন্ধান পাইতেছি, যথা,—ব্রহ্মরাত যাজ্ঞবল্ক্য ও তৎপুত্র যাজ্ঞবল্ক্য ব্রাহ্মরাতি……ব্রহ্মবাহ যাজ্ঞবল্ক্য ও তৎপুত্র যাজ্ঞবল্ক্য ব্রাহ্মবাহি। বৌধায়ন ও আপস্তম্বীয় শ্রৌতসূত্রের মতে (গোত্র-প্রবরাধ্যায়) অনেক যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি, কুশিক-বিশ্বামিত্র-দেবরাতের (বৈদিক শুনঃশেপের অপর নাম) ধারায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ। সুতরাং যাজ্ঞবল্ক্য উপাধি-ধারী ঋষিগণ বিশ্বামিত্র-দেবরাত-বংশীয় এই যজ্ঞবল্ক্যেরই উত্তরপুরুষ ছিলেন, সন্দেহ নাই। অনেকানেক প্রখ্যাত পণ্ডিত যাজ্ঞবল্ক্য উপাধি বা বংশ নামটিকে একটি ব্যক্তিগত নাম মনে করিয়া মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন, দেখা যায়। এই যাজ্ঞবল্ক্যের ন্যায় "জনক"ও একটি উপাধি বা পদবী বিশেষ, কোন ব্যক্তিগত নাম নয়। রামায়ণের আদিকাণ্ডে (৭১ সর্গ) রাম-সীতার বিবাহ প্রসঙ্গে এই কথা স্পষ্ট উল্লিখিত আছে। মিথিলার রাজগণ পুরুষানুক্রমে এই জনক উপাধিটি ধারণ করিতেন। রামায়ণের এই সর্গে এবং বিভিন্ন পুরাণে জনক উপাধিধারী অনেকানেক রাজার ব্যক্তিগত নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। সীতার পিতার নাম ছিল সীরধ্বজ, আর পিতৃব্যের নাম কুশধ্বজ।

দেবীসূক্ত নামটির প্রাচীনতা

দেবীসূক্ত বলিতে সাধারণতঃ এমন সূক্তকেই বুঝায়, যেখানে কোন দেবীর স্তবস্তুতি করা হইয়াছে। এই অর্থে ঋগ্বেদের বেশ কয়েকটি সূক্তকেই দেবীসূক্ত নামে আখ্যাত করা যায়। কিন্তু বর্ত্তমানে দেবীসূক্ত বলিতে আমরা ঋগ্বেদের ১০।১২৫ সংখ্যক সূক্তটিকেই মাত্র বুঝিয়া থাকি, যে সূক্তে মহাদেবী দুর্গা স্বয়ং একজন ঋষিকার মুখ দিয়া স্বকীয় মহিমারই কীর্ত্তন করিয়াছেন বলিয়া কথিত হয়। শৌনকীয় বৃহদ্দেবতা গ্রন্থে (খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী) এই সূক্তটি সম্পর্কে এ জন্যই বলা হইয়াছে, "এষৈব দুর্গা ভূত্বর্চং কৃত্বা ইত্যাদি"—বৃহদ্দেবতা (২।৭৭)। যতদূর মনে হয়, ঠিক এই অর্থে ১০।১২৫ সংখ্যক সূক্তের দেবীসূক্ত নাম অপেক্ষাকৃত হাল আমলের। এই সূক্তের ঋষি ও দেবতা উভয়ই দেবী বাক্, অর্থাৎ ইহা একটি আত্মদৈবত সূক্ত, এবং ইহার আদ্য শব্দ "অহম্" বিধায়, আর্যানুক্রমণী, বৃহদ্দেবতা ও সর্বানুক্রমণী প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে সূক্তটিকে "বাক্-সূক্তম্" অহংসূক্তম্, অহমিতি সূক্তম্ প্রভৃতি বিভিন্ন নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। আবার সূক্তের প্রারম্ভিক কয়েকটি শব্দ ধরিয়া, ইহার অহংরুদ্রেভি-র্বসুভিশ্চরামীতি নামে উল্লেখও দেখা যায় (শাঙ্খায়ন আরণ্যক, ৭।২৩)। কিন্তু এই দেবীসূক্ত নামটি খুব প্রাচীন না হইলেও, সূক্তটি যে খুব প্রাচীন এবং প্রামাণ্য, তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। আর সূক্তটি যে তাহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্যের গুণে সমুজ্জ্বল হইয়া সুপ্রাচীন কাল হইতেই বিভিন্ন প্রখ্যাত বেদাচার্য্যের সপ্রশংস দৃষ্টি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে, তাহারও কয়েকটি অতি বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ আমরা শীঘ্রই উপস্থাপিত করিব।

দেবীসূক্ত বা বাক্‌সূক্তের বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্য

আচার্য্য যাস্কের নিরুক্তে সূক্তটির কোন মন্ত্রের ব্যাখ্যা না করা হইলেও, এই প্রখ্যাত বেদাচার্য্য তদীয় গ্রন্থে এই সূক্তের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অতি মূল্যবান্ আলোচনা

করিয়াছেন। গ্রন্থের দৈবত কাণ্ডের (৭ম অধ্যায়) প্রথমাংশে, ঋগ্বেদের সহস্রাধিক (খিলসূক্ত ছাড়া মোট ১০১৭টি সূক্ত) সূক্তে বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত স্তবস্তুতির প্রকৃতি নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া তিনি বলিতেছেন :—

অথাধ্যাত্মিক্য উত্তমপুরুষযোগাঃ। অহমিতি চৈতেন সর্বনাম্না। যথৈতমিন্দ্রো বৈকুণ্ঠঃ। লবসূক্তম্। বাগাম্ভৃণীয়মিতি ॥২॥ পরোক্ষকৃতাঃ প্রত্যক্ষকৃতাশ্চ মন্ত্রা ভূয়িষ্ঠাঃ। অল্পশঃ আধ্যাত্মিকাঃ ইত্যাদি। অর্থাৎ বেদের সূক্তসমূহের মধ্যে পরোক্ষ (প্রথম পুরুষে উক্ত) এবং প্রত্যক্ষস্তুতিই (মধ্যম পুরুষে উক্ত) সর্ব্বাধিক। পক্ষান্তরে আধ্যাত্মিক স্তুতি স্বল্পসংখ্যক মাত্র। আধ্যাত্মিক স্তুতি উত্তম-পুরুষ-যুক্ত হয়, এবং এখানে "অহম্" এই সর্বনামের প্রয়োগ থাকে, যেমন, ইন্দ্র-বৈকুণ্ঠ সূক্ত, লবসূক্ত ও অম্ভৃণ-কন্যা দেবী বাক্-দৃষ্ট সূক্ত। সুতরাং এই অতি প্রখ্যাত বেদাচার্য্যের মতে, বাক্‌সূক্ত বা দেবীসূক্তটি সমগ্র ঋগ্বেদের স্বল্পসংখ্যক আধ্যাত্মিক স্তুতির অন্যতম হিসাবে পুরাকাল হইতেই গণ্য, তাহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। ইন্দ্র-বৈকুণ্ঠ সূক্ত বলিতে যাস্ক ১০.৪৮-৪৯ সূক্তদ্বয়কেই মনে করিয়াছেন, ১০।৫০ সূক্তটিকে নয়, কারণ এখানে অহং সর্বনামের প্রয়োগ নাই। আর লবসূক্ত বলিতে ১০।১১৯ সংখ্যক সূক্তটিকে বুঝায়। অবশ্য আচার্য্য যাস্ক এখানে উল্লেখ না করিলেও, ঋগ্বেদের ৪র্থ মণ্ডলস্থ ২৬ ও ২৭ সংখ্যক সূক্তদ্বয়ের প্রথমাংশেও অহং সর্বনামের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। যথাকালে আমরা এই আধ্যাত্মিক সূক্তসমূহের তুলনামূলক সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব।

ঋগ্বেদীয় শাঙ্খায়ন আরণ্যক গ্রন্থে (সম্ভবতঃ ঋগ্বেদের শাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণ গ্রন্থ রচয়িতা আচার্য্য শঙ্খ-বংশধর অপর কোন এক আচার্য্যের রচিত) এই সূক্তটি সম্পর্কে মন্তব্য করা হইয়াছে :—

সর্বা বাগ্‌ব্রহ্মেতি হ স্মাহ লৌহিক্য যে তু কেচন শব্দা বাচমেব তাং বিদ্যাত্তর্দেত্যেতদৃষিরাহাহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরামীতি সৈষা বাক্ সর্বশব্দা ভবতি। স য এবমেতাং সংহিতাং বেদ সংধীয়তে, প্রজয়া পশুভির্যশসা ব্রহ্মবর্চসেন স্বর্গেণ লোকেন সর্বমায়ুরেতি। যথা চৈতদ্ব্রহ্ম কামরূপি কামচারি ভবত্যেবং হৈব স সর্বেষু ভূতেষু কামরূপী কামচারী ভবতি। য এবং বেদ য এবং বেদ ॥ ৭ম অধ্যায়, ২৩ অনুচ্ছেদ।

অর্থাৎ এখানে ঋষি বা আচার্য্য লৌহিক্যের (মতান্তরে লৌহিত্যের) অভিমত উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, সকল বাক্যই ব্রহ্ম, এবং যত কিছু শব্দ আছে, তাহা সবই ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে হইবে। এই সত্যই এক ঋষি (দেবী বাক্) "অহংরুদ্রেভির্বসুভিশ্চরামি" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। এই বাক্‌ই সর্ব্ব-শব্দ। যিনি এই বাকের সঙ্গে সর্ব্ব-শব্দরূপী ব্রহ্মের অচ্ছেদ্য সম্পর্কের গোপন সূত্রটি জানেন, তিনি পুত্র-কন্যা, গৃহ-পালিত পশু, যশ, পবিত্রতা এবং স্বর্গরাজ্যের সঙ্গে সর্ব্বদা যুক্ত থাকেন। ইহলোকে তিনি পূর্ণ আয়ু ভোগ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মের মতই তিনি কামরূপী এবং কামচারী হন, অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মের মতই ইচ্ছানুযায়ী রূপ ধারণ করিতে পারেন ও যথা ইচ্ছা গমন করিতে পারেন, এবং ব্রহ্মের মতই তিনি সর্ব্বভূতে যথা ইচ্ছা বাস করিতে পারেন ও বিচরণ করিতে পারেন।

সুতরাং এই আরণ্যক গ্রন্থে উদ্ধৃত আচার্য্য লৌহিক্য বা লৌহিত্যের অভিমত অনুসারে, দেবীসূক্তের প্রতিটি বাক্যে বাক্-রূপী ব্রহ্মের মাহাত্মাই কীর্ত্তিত হইয়াছে, এবং যিনিই ইহার প্রকৃত মর্ম্ম অনুধাবন করিতে সক্ষম হইবেন, তিনিই ব্রহ্মতুল্য শক্তিশালী হইবেন। এই বাক্ শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গবাচক। স্ত্রীলিঙ্গবাচক এই শব্দ দ্বারা ক্লীবলিঙ্গবাচক যে-ব্রহ্মকে এখানে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহাকে ব্রহ্মের সঙ্গে অভেদ-ভাবে যুক্ত ব্রহ্মশক্তি হিসাবে ধরিয়া লইতে বাধা কোথায়? ব্রহ্ম ও তাঁহার শক্তি এক ও অভেদ, যেমন সমুদ্র ও তাহার ঢেউ এক। ব্যাঘ্র ও তাহার শক্তি এক ও অভিন্ন (মহাপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়)।

এই দেবীসূক্তটি আত্মদৈবত বা আত্মস্তুতিমূলক বিধায়, এই সূক্ত সম্বন্ধে শৌনকীয় বৃহদ্দেবতা গ্রন্থে কথিত হইয়াছে :—তস্মাদাত্মস্তবেষু স্যাদ্ য ঋষিঃ সৈব দেবতা ॥ দ্বিতীয় অধ্যায়, ৮৭ শ্লোক। অর্থাৎ এই আত্মস্তুতিমূলক সূক্তের যিনি ঋষি, তিনিই দেবতা। এতদ্ব্যতীত শৌনকীয় ঋগ্বিধান গ্রন্থেও এই সূক্তপাঠ ও জপের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হইয়াছে। ঋগ্বিধানের ২টি সংস্করণ প্রচলিত আছে, এবং এক সংস্করণের সঙ্গে অপরটির যথেষ্ট গরমিল দেখা

যায়। মনে হয়, এই দুইটি গ্রন্থে শৌনক-বংশীয় দুই পৃথক্ আচার্য্য কর্তৃক দুই বিভিন্ন যুগে রচিত হইয়াছিল। দুর্গাদাস লাহিড়ী প্রকাশিত গ্রন্থে লিখিত আছে :—

অহং রুদ্রেভির্মন্ত্রঞ্চ দিনং প্রতি জপেদ্দশ।
পতিব্রতা-ক্ষোভদোষান্মুচ্যতে সর্বথা তদা॥

৪১৮ সংখ্যক শ্লোক।

অর্থাৎ এই অহং রুদ্রেভিঃ সূক্তটি দিনে দশবার মাত্র জপ করিলে পতিব্রতা-ক্ষোভ জনিত সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্তিলাভ ঘটে।

লাহোর হইতে জগদীশ শাস্ত্রী প্রকাশিত সংস্করণে এই সূক্তটি সম্পর্কে বলা হইয়াছে :—

'অহং রুদ্রেভিরিত্যেতদ্ বাগ্মী ভবতি পূজিতঃ।৪।১৯

অর্থাৎ এই সূক্ত নিয়মিত পাঠ বা জপে পাঠক বা জাপক বাগ্মী ও লোকপূজিত হন।

এই প্রবন্ধের প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে যে এই দেবী-সূক্তটি অথর্ববেদেও মন্ত্রের ক্রমান্তর-সহ পুরোপুরিভাবেই পাওয়া যায় (৪।৩০ সূক্ত)। এ সম্পর্কে অথর্ববেদীয় বৃহৎ-সর্বানুক্রমণিকা নামক গ্রন্থে কথিত হইয়াছে :—"অহং-রুদ্রেভি" ইত্যষ্টচ মথর্বা বাগ্দেবত্যং ত্রৈষ্টুভং। স্বয়মেবাহ-মিতি বাচং সর্বরূপ-সর্বাত্মিকাং সর্বদেবময়ী মিত্যস্তৌৎ। "অহং সোমম্" ইতি জগতী॥

অর্থাৎ এই "অহং রুদ্রেভিঃ" সূক্তটি অষ্ট-ঋক্-মন্ত্র সমন্বিত", এখানে ঋষি অথর্বা, দেবতা বাক্, এবং ছন্দ ত্রিষ্টুপ্। কেবল "অহং সোমম্" বাক্য-সমন্বিত মন্ত্রটি জগতী ছন্দে গ্রথিত। সূক্তে ঋষি দেবী বাকের সঙ্গে একীভূত হইয়া, স্বয়ং দেবী বাক্-রূপে, সর্বরূপময়ী, সর্বাত্মিকা এবং সর্বদেবময়ী হইয়া নিজেই নিজের স্তবস্তুতি করিয়াছেন। এই অনুক্রমণিকায় সূক্তের প্রকৃত ঋষির নির্দেশে ভুল থাকিলেও, সূক্তের প্রকৃতি ও মূল্য নির্দ্ধারণে ভুল হয় নাই।

দেবীসূক্ত

ইংরাজীতে একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদ-বাক্য আছে যে, কবি নিজেই নিজের ভাষ্যকার, যেমন গ্রন্থ নিজেই নিজের ভাষ্য। এই প্রবাদবাক্য অনুসরণ করিয়া আমরা এবার দেখিব, যে দেবীসূক্ত বা বাক্‌সূক্তের এত বৈশিষ্ট্য ও মহিমা বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন বেদাচার্য্য কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, তাহা প্রকৃতপক্ষে এই সূক্তে ঠিক কতখানি নিহিত আছে। আমরা অবশ্যই দেখিতে পাইব যে, বেদাচার্য্যগণের মূল্যায়নে বিন্দুমাত্রও অতিশয়োক্তি নাই, এবং সূক্তটি নিজস্ব মহিমায় ভাস্বর। প্রাচীন যুগের এই প্রখ্যাত বেদাচার্য্যগণ যে সাম্প্রদায়িক শাক্ত আচার্য্য ছিলেন না, একথা বলাই বাহুল্য। সুতরাং তাঁহাদের প্রশস্তিকে, শাক্ত আচার্যগণের অভিসন্ধিমূলক এবং প্রচারমূলক প্রচেষ্টা মাত্র, বলিয়া কেহই উড়াইয়া দিতে বা হাল্কাভাবে দেখিতে পারিবেন না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সূক্তটির ঋষি এবং দেবতা উভয়ই বাক্। পাঠকবর্গ যাহাতে ইহার মর্ম্মার্থ সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন, তজ্জন্য পূর্ণ-সূক্তটি বঙ্গানুবাদ সহ উদ্ধৃত করা হইল :—

(৩) অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা॥১

অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্যহং ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগং।
অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে॥২

অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসুনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাং।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ন্তীং॥৩

ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তং।
অমন্তবো মান্ত উপ ক্ষিয়ন্তি শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি॥৪

অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।
যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাং॥৫

অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং দ্যাবাপৃথিবী আ বিবেশ॥৬

অহং সুবে পিতরমস্য মূর্দ্ধন্মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে।
ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বোতামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপ স্পৃশামি॥৭

অহমেব বাত ইব প্র বাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈতাবতী মহিনা সং
বভূব ॥৮

আমিই রুদ্রগণ (একাদশ রুদ্র), বসুগণ (অষ্টবসু), আদিত্যগণ (দ্বাদশ আদিত্য) ও বিশ্বদেবগণ (সমগ্র দেব-সমাজ) রূপে বিচরণ করি ; আমিই মিত্র ও বরুণ, ইন্দ্র ও অগ্নি, এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ধারণ করি।১। আমিই শত্রু-নাশন সোমদেব, ত্বষ্টা, পূষা এবং ভগকে ধারণ করি ; দেবগণের তৃপ্তিসাধনকারী হবিষ্মান্ যজমানের জন্য আমিই ধনের বিধান করি।২। আমিই সমগ্র জগতের অধিশ্বরী, উপাসকগণের ধনদাত্রী, ও যজ্ঞার্হগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, যুগপৎ বহুস্থানে, বহু-ভাবে এবং বহু-রূপে অবস্থিতা আমাকেই দেবগণ ভজনা করিয়া থাকেন (তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্য্যাবেশয়ন্তীং)।৩। আমারই প্রসাদে জীবকুল অন্ন ভোজন করে, দর্শন করে, শ্রবণ করে এবং শ্বাসপ্রশ্বাসাদি দ্বারা প্রাণ ধারণ করে। যে আমার ঈদৃশ মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অজ্ঞ, সে-ই সংসারে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। হে শ্রদ্ধাবান্, শ্রবণ কর।৪। আমিই স্বয়ং দেবতা ও মানবকুলের অভীষ্ট ব্রহ্মজ্ঞান দান করি ; আমার যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকেই উন্নত করি, কাহাকেও ব্রহ্মা, কাহাকেও ঋষি, আবার কাহাকেও বা প্রজ্ঞাবান্ ইত্যাদি করিয়া থাকি।৫। ব্রহ্মদ্বেষিগণের বধের নিমিত্ত আমিই রুদ্রের ধনুতে জ্যা আরোপণ করি, জনগণের রক্ষার জন্য আমিই সংগ্রাম করি, এবং ভূলোক ও দ্যুলোকে আমিই ওতঃপ্রোত আছি।৬। দৃশ্যমান সব কিছুই যাহা হইতে জাত, তাহাকেও আমিই প্রসব করি, আমার যোনি বা প্রজনন-যন্ত্র অন্তঃসমুদ্রে (জ্ঞানসমুদ্রে) অবস্থিত। এজন্যই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত হইয়া আমি অবস্থান করি এবং দ্যুলোককেও আমার সীমাহীন দেহদ্বারা স্পর্শ করিয়া আছি।৭। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে সৃষ্টি করিয়া, আমিই বায়ুর ন্যায় তাহার অন্তরে ও বাহিরে প্রবহমাণা ; অথচ আমি এই ভূলোক ও দ্যুলোক, উভয়কেই অতিক্রম করিয়া আছি, এবং ইহাই আমার মহিমা (তুলনীয়ঃ—ঋগ্বেদীয় পুরুষ-সূক্তের ১০।৯০।১ স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলং ইত্যাদি মন্ত্র)।৮।

দেবীসূক্ত ও ঋগ্বেদের অহং-বাচক কয়েকটি সূক্তের তুলনা

নিরুক্তে ধৃত আচার্য্য যাস্কের বাক্য (৭।২-৩) আলোচনা-কালে আমরা দেখিয়াছি যে, সমগ্র ঋগ্বেদ সংহিতায় এরূপ অহংবাচক সূক্ত অতি অল্প সংখ্যকই আছে, যেমন, ইন্দ্র-বৈকুণ্ঠ-দৃষ্ট ১০।৪৮ ও ৪৯ সূক্তদ্বয়, লব-রূপী ইন্দ্র-দৃষ্ট ১০।১১৯ সূক্ত, এবং বিবিধ বৈদিকগ্রন্থে কীর্ত্তিত প্রখ্যাত জাতিস্মর ঋষি বামদেব দৃষ্ট ৪।২৬ ও ২৭ সূক্তদ্বয়ের প্রথমাংশ। পরবর্ত্তী যুগে গীতায় শ্রীকৃষ্ণের বাণীতে এরূপ অহংবাদ প্রকটিত হইয়াছে। ঋষি বামদেব গৌতম মাতৃগর্ভে অবস্থানকালেই দেবগণের জন্মরহস্য অবগত হইয়াছিলেন (৪.২৭।১), আর স্বয়ং-দৃষ্ট সূক্তদ্বয়ে দেবরাজ ইন্দ্র-বৈকুণ্ঠ (বিকুণ্ঠার পুত্র বলিয়া বৈকুণ্ঠ) স্বকীয় অশেষ বলবিক্রম, বহুবিধ অলৌকিক কীর্ত্তিকলাপ, এবং প্রভূত দানশীলতার বর্ণনা করিয়াছেন। ৪।২৬ সূক্তের প্রথমাংশে ঋষি বামদেব, দেবরাজ ইন্দ্রের স্তুতিকালে, দেবরাজের সঙ্গে একাত্ম হইয়া বলিয়াছেন :—আমিই মনু এবং সূর্য্য হইয়া জন্মিয়াছিলাম, এবং আমিই মেধাবী ঋষি কক্ষীবান্, অর্জ্জুনি-পুত্র কুৎস, এবং ঋষি উশনা (শুক্রাচার্য্য) প্রভৃতি হইয়াছিলাম। হে জনগণ, আমাকে দর্শন কর। আমি আর্য্যকে ভূমিদান করিয়াছিলাম, আমিই হব্যদাতা যজমানের জন্য বৃষ্টিদান করি, শব্দায়মান জলরাশিকে এবং দেবকুলকে আমিই নিয়ন্ত্রিত করি, ইত্যাদি। ঋষি বামদেবের এই সকল উক্তি হইতে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের মনে এই ধারণাই হইবে যে, এই প্রখ্যাত জাতিস্মর স্বকীয় পূর্ব্ব-পূর্ব্ব অদ্ভুত জন্মের এবং অতীতের কয়েকটি ঘটনার সাক্ষীমাত্রই ছিলেন না, বরং চরম জ্ঞানলাভের ফলে, দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে একাত্ম হইয়া, অতীত যুগের অনেক কিছু মহৎ সৃষ্টি এবং কার্য্যের মধ্যে যেন নিজেকেই লিপ্ত বা প্রতিভাত দেখিয়াছিলেন। এরূপ চরম ব্রহ্মজ্ঞতা লাভ অতীত যুগেও বিরল ছিল। এজন্যই শুধু ঋগ্বেদে নয়, ঋগ্বেদের অন্তর্গত ঐতরেয় আরণ্যক (২।৫।১) ও ঐতরেয় উপনিষদ (দ্বিতীয় অধ্যায়), এবং শুক্লযজু-র্বেদীয় বৃহদারণ্যকোপনিষদেও (১।৪।১০) ঋষি বামদেবের অত্যদ্ভুত ব্রহ্মজ্ঞানের সবিশেষ প্রশংসা করা হইয়াছে।

লবরূপী দেবরাজ দৃষ্ট ১০.১১৯ সূক্তে যে উচ্চভাবের ব্যঞ্জনা দেখা যায়, তাহাও সত্য সত্যই সুদুর্লভ। এখানে বল-বিক্রমের স্পর্দ্ধিত বর্ণনা নাই, আছে পরমাত্মার ভূমিকায় দাঁড়াইয়া দেবরাজ কর্তৃক স্বকীয় মহিমার অবগুণ্ঠনের উন্মোচন। দেবরাজ বলিতেছেন মানুষের মধ্যে কেহই আমার দৃষ্টিকে অতিক্রম করিতে পারে না; এই বিশ্বভুবন (দ্যাবাপৃথিবী) আমার একাংশ হইতেও ক্ষুদ্রতর (তুলনীয়ঃ—ঋগ্বেদীয় ১০।৯০ বা পুরুষ সূক্তের "পাদোঽস্য বিশ্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।"); আমি স্বকীয় শক্তিতে পৃথিবীকে এক স্থান হইতে অন্যস্থানে স্থাপন করিতে সক্ষম; আমার এক পার্শ্বে আকাশ, অপর পার্শ্বে অতলস্পর্শী ব্যোম; আমি মহৎ হইতে মহত্তর, আমাকে স্তবস্তুতি কর; আমিই দেবগণের নিকট হব্য বহন করি, ইত্যাদি। অহংবাচক সূক্তসমূহের মধ্যে একমাত্র এই লবসূক্তটিই সম্ভবতঃ দেবীসূক্তের সঙ্গে ভাব ও ভাষার ব্যঞ্জনায় তুলনীয়, অপরগুলি নহে।

অনুরূপভাবেই বলা যায় যে, দেবীসূক্তে বর্ণিত উপলব্ধিও আত্মোপলব্ধির একটি চরম নিদর্শন, অথবা তাহা অপেক্ষাও কিছু বেশী। এখানে আমরা দেখিতে পাই, দেবী অম্ভৃণ-কন্যা বাক্ আত্মোপলব্ধির চরমতম মুহূর্তে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে, তিনিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রসূতি ও নিয়ন্ত্রী (রাষ্ট্রী); বিশ্বজগৎ তাঁহাতেই ধৃত ও পালিত; তিনিই বায়ুর ন্যায় জীবজগতের অন্তরে ও বাহিরে বিরাজমানা; ইচ্ছানুযায়ী তিনি যাহাকে খুসী, ব্রহ্মা, ঋষি, ইত্যাদি করিতে পারেন, এবং দৃশ্যমান জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা হিরণ্যগর্ভ বা প্রজাপতিকেও তিনিই প্রসব করিয়াছেন (অহং সুবে পিতরমস্য মূর্ধন্)। বিশ্বাসীগণের তিনি শক্তিবৃদ্ধি বা উন্নতিবিধান করেন, আর অবিশ্বাসিগণের বা তদ্দ্বেষিগণের অবনতি বা ধ্বংস। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণীতে যেন ইহারই প্রতিধ্বনি, এবং গীতার বিশ্বরূপ যেন ইহারই এক প্রত্যক্ষ প্রতিরূপ। দেবতা ও মানুষের পরমতম অভীষ্ট ব্রহ্মজ্ঞানের ভাণ্ডারিণীও স্বয়ং তিনিই। সুতরাং দেবী বাক্ কর্তৃক দৃষ্ট সূক্তে বিশ্বধাত্রী ও বিশ্বজননীর স্বরূপের বর্ণনামূলক এই উক্তিগুলি মহাদেবীর স্বকীয় স্তোত্র বা আত্মস্তুতি বিধায়, দেবীসূক্ত হিসাবে বাচ্য হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে এই সূক্ত অতুলনীয়, সন্দেহ নাই। ঋগ্বেদের এমন যে পুরুষসূক্ত বা নারায়ণীসূক্ত (১০।৯০), তাহাও প্রথমপুরুষেই উক্ত (third person), উত্তমপুরুষে (first person) নয়। ইহার প্রতিটি ঋক্ উত্তমপুরুষে এবং প্রতিটি বিশেষণ-পদ স্ত্রীলিঙ্গে উক্ত হইয়াছে। বৈদিক সাহিত্যের বহু স্থানেই ব্রহ্ম-মাহাত্ম্য ও সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে সত্য, কিন্তু আর কোথাও এমন উত্তমপুরুষে এবং স্ত্রীলিঙ্গে ব্যক্ত হয় নাই বলিয়াই বিশ্বাস; অন্যত্র প্রায় সব ক্ষেত্রেই ব্যক্ত হইয়াছে, হয় প্রথমপুরুষে, নয় মধ্যমপুরুষে। ব্রহ্ম শব্দ ক্লীবলিঙ্গ-বাচক হইলেও সৃষ্টি প্রসঙ্গে ব্রহ্ম কখনও কখনও পুংলিঙ্গে উক্ত হইয়াছেন, দেখা যায়, কিন্তু স্ত্রীলিঙ্গে আর কোথাও ব্যক্ত হন নাই। সুতরাং দেবীসূক্তটি প্রকৃতই আদিশক্তি বা ব্রহ্মশক্তি বা মহাশক্তির সূক্ত, বা মহাদেবী-কৃত মহাদেবীরই আত্মস্তুতি, সন্দেহ নাই। অতএব এই মহাদেবীর পূজায় তৎকৃত আত্মস্তুতি পাঠে অসঙ্গতি বা অনৈতিহাসিক কিছুই নাই। ইহা গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজারই নামান্তর মাত্র। পরবর্ত্তী যুগে আত্মোপলব্ধির যে উচ্চতম চূড়ায় আরোহণের ফলে, পরমাত্মার স্বকীয় বাণীই শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়া নির্গত হইয়, ভগবদ্ভক্তির মর্য্যাদায় গীতায় স্থানলাভ করিয়াছে, এবং তাহারও বহু পরবর্ত্তী একলে মক্কার হজরত মহম্মদের মুখ দিয়া নির্গত হইয়া আল্লাহ্‌র পবিত্র বাণী বলিয়া কোরাণে মর্য্যাদা-লাভ করিয়াছে, বৈদিক যুগের বাগ্‌দেবীর আত্মোপলব্ধিও সেই শ্রেণীরই। ইহা সাধারণ শ্রেণীর ব্রহ্ম-তাদাত্ম্য-লাভ নয়, অতি অসাধারণ শ্রেণীর। দেবীসূক্তের এই অন্তর্নিহিত তত্ত্বটি হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইয়াই, পরবর্ত্তী কালের কোন কোন মন্ত্র ব্যাখ্যাতা ইহাকে ব্রহ্ম-তাদাত্ম্য লাভের একটি উদাহরণ হিসাবে আখ্যাত করিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছেন। প্রাচীনতর যুগের বেদাচার্য্যগণ ইহার প্রকৃত মহিমা অবগত ছিলেন বলিয়াই ইহার এত প্রশস্তি কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইহা দেবীসূক্তের কোন দার্শনিক ব্যাখ্যা নয়, আক্ষরিক অনুবাদের অনুসরণে অনুবাদের সামান্য বিস্তার মাত্র।

শৌনক ও কাত্যায়নের বহু পরবর্ত্তী অজ্ঞাতনামা কোন বেদাচার্য্য সম্ভবতঃ এই সূক্তের দেবতা পরমাত্মা, এরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। তাই ঋগ্বেদের কয়েকটি মুদ্রিত সংস্করণে এবং সায়ণ-ভাষ্যে দেখা যায় যে, সূক্তের দেবতা পরমাত্মা। উক্তিটি সত্য, সন্দেহ নাই, কিন্তু ই

পুরাপুরি সত্য নয়। সূক্তের প্রকৃত দেবতা হইলেন পরমাত্মারই স্ত্রী-রূপ, অথবা ত্রিস্থানবর্ত্তিনী সর্বাত্মিকা দেবী বাক্ (ব্রাহ্মী বাক্, বৃহদ্দেবতা ৬।১৫২)। ব্রহ্ম-তাদাত্ম্য লাভের মুহূর্ত্তে সাধক বা সাধিকা সম্পূর্ণরূপে সম্বিৎ হারাইয়া বাহ্যজ্ঞানরহিত হন। ঋগ্বেদীয় আত্মস্তুতি সমূহে কিন্তু তাহা হয় নাই। ইহা সম্ভবতঃ এক শ্রেণীর অতি দুর্লভ অর্দ্ধ-বাহ্য-দশা যেখানে স্তুত বা আহুত দেবতার স্বকীয় বাণীই ঋষি বা ঋষিকার মুখ হইতে নির্গত হইত; অথচ সেই ঋষি বা ঋষিকাগণ পরে এই বাণীসমূহ স্মরণে রাখিতেও সক্ষম হইতেন; নতুবা এই সমস্ত বেদমন্ত্র বিলুপ্ত হইয়া যাইত। সুতরাং এজাতীয় আত্মস্তুতির একটা বিশেষ মূল্য বা মর্য্যাদা অবশ্য স্বীকার্য্য।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, ৺অধ্যাপক ডাঃ দাশগুপ্ত মূল দেবীসূক্তের ভিতরে প্রবেশ না করিয়া, সম্ভবতঃ শুধুমাত্র অনুবাদ পড়িয়াই, একটা স্থির-সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, "দেবীসূক্তের মধ্যে শক্তি আরাধনার বা দেবী আরাধনার কোন কথা নাই।" ধর্ম্ম জিনিষটি মনের বস্তু। ভুয়া বা ফাঁকা কোন কিছুর উপর ভিত্তি করিয়াই একটা ধর্ম্মমত বা সম্প্রদায় গড়িয়া উঠেনা। ইহার পিছনে চাই একটা সুদৃঢ় পটভূমি। পরবর্ত্তী কালের পুরাণের ব্যাখ্যা দ্বারা শাক্ত-মত গড়িয়া উঠে নাই, বা শাক্ত-আচার্য্যগণের মনগড়া কোন ব্যবস্থার দ্বারাও ইহা পুষ্টিলাভ করে নাই। শ্রুতিমূলক না হইলে, হিন্দু-সমাজে কোন ধর্ম্মমতই প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না, ইতিহাসই আমাদিগকে এই শিক্ষা দেয়। স্মৃতিশাস্ত্রের প্রভাব আচার-ব্যবহার এবং রীতি-নীতির উপরই পড়ে, ধর্ম্মমতের উপর নয়। অধ্যাপক মহাশয় এই মৌলিক সত্যটিই বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

এজন্যই দেখিতে পাই যে, জৈনধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারকালে বর্দ্ধমান মহাবীর অথবা গৌতম বুদ্ধ, কেহই নিজেকে আদি-প্রবর্ত্তক হিসাবে প্রচার করেন নাই, এবং প্রত্যেকেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের অনেকানেক মহাপুরুষের নাম করিয়াছেন, যাঁহারা অতীতে এই দুই ধর্ম্ম মতের পুষ্টি সাধন করিয়া গিয়াছেন। এমন কি, ইহুদীধর্ম্ম, খ্রীষ্টধর্ম্ম ও ইস্লাম ধর্ম্ম আলোচনা করিলেও দেখা যায় যে, প্রতিটি ধর্ম্মমতেরই পূর্ব্বাচার্য্য বা পয়গম্বর ছিলেন। ইহুদীগণের মতে, পয়গম্বর মুসার পূর্ব্বে এবং পরে কতিপয় পয়গম্বর আবির্ভূত হইলেও, মুসাই তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; খৃষ্টানগণের মতে, এব্রাহাম, মুসা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ পয়গম্বর হইলেও, মতামতি যীশু খৃষ্টই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; আর ইস্লামী মতে, এব্রাহাম, মুসা, ইশা (যীশু খ্রীষ্ট) প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ পয়গম্বর হিসাবে গণ্য হইলেও, হজরত মহম্মদই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বশেষ নবী। অবশ্য ইহুদীগণ যীশু খ্রীষ্টকে এবং খৃষ্টানগণ হজরত মহম্মদকে স্বীকার করেন না।

শক্তি-সাধনা বা মাতৃ-সাধনার আদি যুগ

ভারতীয় আর্য্যসমাজে মাতৃ-সাধনা বা শক্তি-আরাধনা ঠিক কোন্ সময়ে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার কোন সঠিক প্রমাণ দেওয়া দুঃসাধ্য। বর্ত্তমান যুগে ঋগ্বেদীয় দেবীসূক্ত ও রাত্রীসূক্তকে (১০।১২৭ সূক্ত) মাতৃ-সাধনার মূলমন্ত্র হিসাবে ধরা হইলেও, শক্তি-সাধনার বীজ এই সূক্তদ্বয় অপেক্ষাও প্রাচীনতর, এরূপ মনে করা অসঙ্গত নয়। এই সূক্তদ্বয়ে সম্ভবতঃ পূর্ব্ব হইতেই ঋষি সমাজে ও আর্য্য-সমাজে প্রচলিত মাতৃ আরাধনার তত্ত্ব খ্যাপিত হইয়াছে মাত্র। ঋগ্বেদের নানাবিধ অদিতি-স্তোত্র ও সরস্বতী-স্তোত্র প্রভৃতি হইতে, এবং ঋগ্বেদের খিলাংশে প্রচারিত শ্রী-সূক্ত এবং দুর্গা-সূক্ত প্রভৃতি হইতেও, এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, আর্য্যসমাজে আদিকাল হইতেই মাতৃ-সাধনা প্রচলিত ছিল। সামবেদীয় তলবকার বা কেনোপনিষদে এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণে ধৃত চণ্ডীগ্রন্থে বর্ণিত অতি প্রাচীন কালের ঘটনাসমূহও এই ধারণারই পরিপোষক। সুতরাং মাতৃ-আরাধনা ভারতে বেদ-পরবর্ত্তী কালে আরম্ভ হয় নাই, ইহা অবধারিত। তবে কালের, এবং সেই সঙ্গে পারিপার্শ্বিক অবস্থার, পরিবর্ত্তনে উপাসনার পদ্ধতিতে কিছুকিছু পরিবর্ত্তন হয়ত হইয়াছে, একথা সত্য বলিয়া মনে করা যায়। যুগযুগান্তের সেই প্রাচীন বৈদিক ধারাই পরবর্ত্তীকালে বিভিন্ন পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে, এবং প্রখ্যাত আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক যুগেযুগে নানা গ্রন্থে ব্যাখ্যাত হইয়াছে মাত্র। দেবীসূক্তেই উক্ত হইয়াছে:—"তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্য্যাবেশয়ন্তীং," এবং "অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ," অর্থাৎ বহুস্থানে, বহুরূপে এবং বহুভাবে অধিষ্ঠিতা আমাকেই

দেবগণ ভজনা করিয়া থাকেন, এবং আমিই দেবসমাজ ও মনুষ্যসমাজকে ব্রহ্মজ্ঞান দান করি। ইহারই রেশ বা পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাই আমরা কেনোপনিষদে বর্ণিত অতি প্রসিদ্ধ আখ্যায়িকাটিতে, যেখানে ব্রহ্ম যক্ষরূপে দেবগণের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এবং সহসা যক্ষের অন্তর্দ্ধানের পর তৎস্থানে দেবী উমা হৈমবতীর আবির্ভাব ঘটিয়াছিল (কেনোপনিষদ্, তৃতীয় খণ্ড)। উপনিষদে বর্ণিত আখ্যান অনুযায়ী, যক্ষের প্রকৃত পরিচয় দেবীই দেবসমাজকে দিয়াছিলেন। অগ্নি-বায়ু ইন্দ্রাদি দেবগণ যক্ষরূপী ব্রহ্মকে চিনিতে না পারিলেও, তৎস্থান-বর্ত্তিনী দেবী উমা হৈমবতীকে পূর্ব্ব হইতেই চিনিতেন, যদিও তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ হয়ত কেহই জ্ঞাত ছিলেন না, এমন কি, অগ্নি-নামে পরিচিত তদীয়া স্বামী দেবাদিদেব মহাদেবও নয়। এবার হয়ত তাঁহারা দেবীর স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হইলেন। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, যক্ষের অন্তর্দ্ধানের পর তৎস্থানে দেবসমাজের আর কোন প্রধানকেই দেখা গেলনা ; দেবমাতা অদিতি, অথবা দেবী সরস্বতী, অথবা দেবী লক্ষ্মীকেও (শ্রী) নয় ; দেখা গেল একমাত্র সেই দেবাদিদেবের নিত্যসঙ্গিনীকে, যিনি প্রত্যক্ষ ভাবে ব্রহ্মের সন্ধান রাখিতেন। দেবীসূক্তে বর্ণিত মহাদেবীর মাহাত্ম্যমূলক শ্রুতিবাক্যের সমর্থনে বিধৃত কেনোপনিষদের এই আখ্যান সেই মহাদেবীর স্বরূপের দ্যোতক নয় কি? প্রচলিত চণ্ডীগ্রন্থ পরবর্ত্তীকালে মহাদেবীর মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত হইলেও, ইহাতে উল্লিখিত দেবসমাজ কর্তৃক মহা-দেবীর মাহাত্ম্যসূচক স্তবস্তুতির বর্ণনাটিকে অবশ্যই শ্রুতিমূলক বলিয়া মনে করা যায়। চণ্ডীর ৫ম অধ্যায়ে দেখা যায় যে দেবসমাজ যখন শুম্ভ-নিশুম্ভের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া পরিত্রাণের আশায় দেবী আদ্যাশক্তির স্তুতিতে রত ছিলেন, সেই সময় তথায় দেবী উমা পার্ব্বতীর আবির্ভাব ঘটে, এবং তিনিই দেবগণকে জানাইয়া দিলেন যে, তাঁহাদের নানা স্তবস্তুতির লক্ষ্যস্থল তিনিই, অপর কেহ নয়। এই বলিয়া তিনি স্বীয় বিভূতি প্রদর্শন পূর্ব্বক দেবগণকে আশ্বস্ত করিলেন। তাঁহারই দেহ-নিঃসৃতা দেবী কৌশিকী বা অম্বিকা, বা দেবী দুর্গা সেই অসুরদ্বয়কে সসৈন্যে নিধন করেন।

সুতরাং প্রকৃত জ্ঞানদাত্রী এবং পরিত্রাত্রী হিসাবে সেই মহাদেবীর উপাসনা দেবসমাজই প্রথম প্রবর্তন করিলেন, এবং দেবসমাজ হইতে ক্রমে ঋষিসমাজে এবং জনসাধারণের মধ্যেও তাহা পরিব্যাপ্ত হইল।

এসো মা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

দশ প্রহরণ ধরি দশভূজা হয়ে—
এসো মা গো মোরা আছি শত দুখ সয়ে।
হের কত কচি কাঁচা
বাঁচানো ও শক্ত বাঁচা,
অস্বস্তির ঝঞ্ঝা ঘোর চলিয়াছে বয়ে।

২

এত ভীতি বিভীষিকা এত অশান্তির
শেষ হতে, চাই দয়া ভুবনেশ্বরীর।
মানুষ যে টুকু পারে।
করিতেছে চারি ধারে।
কে বুঝিবে এ দুর্দ্দিন কত যে গভীর ?

৩

তব কৃপা ঈক্ষণেতে অরিষ্ট পলায়—
সর্ব্বাভিষ্টপূর্ণ কর তাই লোক চায়।
সে দানের কি মাধুর্য্য
সে দানের কি প্রাচুর্য্য
নদ নদী খানা ডোবা সব ভেসে যায়।

৪

জাতি হারায়েছে তার নিষ্ঠা সদাচার
তার কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরেছে এবার।
ছিটাও মা শান্তি জল
হোক শুচি সুনির্ম্মল।
শান্ত করি তুষ্ট করি এসো মা আমার।

ব্যবধান

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

অখণ্ড অবসর। বাড়ীর লোকটা অফিসে বেরিয়ে গেলেই সুতপার আর কিছু করার থাকে না। ধুলোর ঘূর্ণী উড়িয়ে মোটরটা দৃষ্টিপথের বাইরে চলে না যাওয়া পর্যন্ত, জানলার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়ায়। ফিরে আসে নিজের গৃহস্থালীর মধ্যে।

নিখুঁত, পরিপাটিরূপে সাজানো গৃহস্থালী। পরিচারক এসে দুটি বেলা ঝেড়ে মুছে ঝকঝকে তকতকে করে দিয়ে যায়। একটু বেলা হলেই সব জানলা বন্ধ হয়ে যায়। বাইরে ধুলোর ঝড় শুরু হয়। যাতে ধুলোর একটি কণা বাড়ীর মধ্যে না ঢুকতে পারে সেই জন্যই এই সতর্কতা।

সারা দিন রাত পাখা ঘোরে। অস্বস্তিকর একটানা একটা শব্দ। মাঝে মাঝে সুতপার মনে হয় ওই শব্দটা যেন পাখাগুলো থেকে নয়, নিঃসারিত হচ্ছে সুতপার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে। গুমরে গুমরে কান্নার আওয়াজ ওই শব্দের রূপ নিয়েছে।

কোন কাজ নেই, উত্তপ্ত বিছানায় নিজের দেহভার ছেড়ে দিয়ে এপাশ ওপাশ করা ছাড়া।

সলিলের সঙ্গে এক টেবিলে মুখোমুখি বসে সুতপাও সকালের খাওয়াটা সেরে নেয়। সলিলের তাই নির্দেশ।

তারপর দুপুরের দিকে হিটারে সুতপা এককাপ কফি করে নেয়। বিছানায় বসে অনেকক্ষণ ধরে চুমুক দিয়ে দিয়ে খায়। কোন কোনদিন দু একটা বিস্কিট। এই গরমে কিছু খেতে ভাল লাগে না। কিছু পরতেও নয়।

অঙ্গের শাড়ী ব্লাউজই যেন বোঝা মনে হয়।

একেবারে খালি বাড়ী। একজন পরিচারক আছে। সে থাকে আউট হাউসে। তাকে না ডাকলে এদিকে আসে না।

কাজেই সুতপার নিরাবরণ হয়ে থাকতেও কোন বাধা নেই। কোন কলুষিত দৃষ্টি তার দেহের পবিত্রতা নষ্ট করবে না।

মাঝে মাঝে সুতপা তাও করে। একটি একটি করে সব খুলে রাখে। শাড়ী, ব্লাউজ, সায়া, অন্তর্বাস। নিরাবরণ হবার আগে জানলায় জানলায় ভারি পর্দাগুলো টেনে দেয়। এ সতর্কতার কোন প্রয়োজন নেই। চারপাশে আধ মাইলের মধ্যে কোন বসতি নেই। নিজেদের আউট-হাউস একেবারে পিছনের দিকে।

বসনের ভার মুক্ত হয়ে সুতপা চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকে। এ ঘর ও ঘর করতে পারে না। কেমন লজ্জা

করে। দর্পণে নিজের নগ্ন প্রতিবিম্বটা দ্বিতীয় সত্তা বলে যেন মনে হয়। আর একজনের অস্তিত্বের সগোত্র।

বিকাল হলে, রোদের তাপ কমে এলে পরিচারক বারান্দায় বেতের চেয়ার পেতে দেয়। পাশাপাশি দু খানা।

একখানা খালিই থাকে। সলিলের ফেরার কোন ঠিক নেই। প্রায় দিনই অফিস থেকে সোজা ক্লাবে চলে যায়। টেনিস, তারপর বিলিয়ার্ড। কোন কোন দিন কণ্ট্র্যাক্ট ব্রিজের আসর বসে।

সব শেষ করে সলিল যখন বাড়ী ফেরে তখন রাত অনেক। অপেক্ষা করে করে ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত সুতপা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। কোন কোন দিন ঘুমিয়েও পড়ে বিছানায়।

ছুটির দিনটা সলিল বাড়ী থাকে। অবশ্য এখানে ছুটির দিন বলে কিছু নেই। যে কোন সময় কারখানার গাড়ী এসে দাঁড়ায়। ব্যাকুল উদ্বিগ্ন কণ্ঠ শোনা যায়।

ইন্‌জিনিয়ার সাব! ইন্‌জিনিয়ার সাব!

যেমন অবস্থাতেই থাক, সলিলকে উত্তর দিতে হয়। বাইরে এসে দাঁড়ায়, কি ব্যাপার করিম? কি হল?

করিম হাতটা নিজের কপালে ঠেকায়, তারপর বলে, টার্বোজেনারেটারটা গোলমাল করছে স্যার। আপনি চলুন একবার।

দু মিনিট।

সলিল তৈরী হয়ে নেয়, তারপর এক রকম ছুটতে ছুটতেই গাড়ীতে গিয়ে উঠে।

চলার মুখে সুতপাকে কথাগুলো ছুঁড়ে দিয়ে যায়।

আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরছি। অবশ্য তার চেয়ে যদি দেরী হয়, তুমি খেয়ে নিও। আমার জন্য অপেক্ষা কর না।

আগে আগে সুতপা অপেক্ষা করত। এখন আর করে না।

জানে, লোকটা একবার যন্ত্রপাতি কলকব্জার আওতায় গিয়ে দাঁড়ালে পিছনের সব কিছু ভুলে যায়।

টার্বো-জেনারেটার, বয়লার, ইকনমাইজার, লেদ, স্যাফ্‌ট মানুষটাকে গ্রাস করে ফেলে। অথচ আগে এমন ছিল না। বিয়ের বন্ধনদশার আগে।

জার্মানী থেকে ফিরে সলিল মাস ছয়েক বসেছিল। নিজের দাম যাচাই করছিল। মাঝে মাঝে সুবিধামত আবেদন পত্র ছাড়ছিল এদিক ওদিক, লক্ষ্য করছিল কে কত টাকার দড়ি দিয়ে তাকে বাঁধতে পারে।

সেই সময় প্রায় প্রতিদিন আসত সুতপাদের বাড়ী। কোন বাধা ছিল না। সুতপার দাদার বন্ধু। ছাত্রাবস্থা থেকেই এ বাড়ীতে অবারিত-দ্বার। সুতপার দাদা আর সলিল একই প্লেনে রওনা হয়েছিল। একজন জার্মানী, একজন ইংল্যাণ্ড। একজন ব্যারিষ্টারীর সনদ সংগ্রহ করতে আর একজন ইন্‌জিনিয়ারীং বিদ্যায় পারঙ্গম হ'তে।

কিন্তু দুজন দুভাবে ফিরেছিল।

সুতপার দাদা ফিরেছিল বছর দুয়েক পরেই। একলা নয়, সঙ্গে সিবিলকে নিয়ে। এ বাড়ীতেও ওঠে নি। সাহেবপাড়ায় আলাদা বাড়ী নিয়েছিল।

বছর পাঁচেক পরে সলিল ফিরল একলা। জাঁদরেল ইঞ্জিনিয়ার হয়ে।

দেশে যোগাযোগ ছিল, কিন্তু বিদেশে গিয়ে সুতপার দাদার সলিল কোন খোঁজখবর রাখার অবসরই পায় নি। পড়া আর কাজের চাপে অন্য কোনদিকে মাথা তোলবার সুযোগ হয় নি।

সুতপাদের বাড়ীতে এসে বিস্মিত হ'ল তার বন্ধুর খবর শুনে। কিন্তু তার চেয়েও বিস্মিত হ'ল সুতপাকে দেখে।

যখন সলিল জার্মানী রওনা হয় তখন এই মেয়েটি ফ্রকের খোলস ছেড়ে সবে শাড়ীতে নিজের দেহ ঢাকতে শিখছে। দেহের শাখায় শাখায় যৌবন শুধু মুকুলের রূপ নিয়েছে।

সেদিনের কিশোরী আজ ভরা যুবতী। বাড়ন্ত দেহের গড়নে, সৌন্দর্যের সুষমায়, স্বভাবের কমনীয়তায় অনিন্দ্য।

শুধু রূপ নয়, কণ্ঠস্বরেও এত মধু সুতপা কোথা থেকে আহরণ করল!

মা বললেন, এই সুতপা!

এমন একটা পরিচয়ের যেন প্রয়োজন ছিল। কয়েক বছর আগে যে সুতপাকে সলিল দেখে গিয়েছিল, তার সঙ্গে এ মেয়েটির কোথাও কোন মিল নেই।

ইঞ্জিনিয়ার না হয়ে যদি কবি হত সলিল, তাহ'লে

মনে হত, শীতার্ত ক্ষীণধারা স্রোতের ছলনার সঙ্গে শ্রাবণের কূলপ্লাবিনী তরঙ্গোচ্ছলা তটিনীর কোথায় মিল!

সুতপা অসঙ্কোচে পাশে বসেছিল। আরো অসঙ্কোচেই প্রশ্ন করেছিল।

আচ্ছা সলিলদা, আপনি যে একলা ফিরলেন?

মানে?

বুঝেও সলিল না বোঝার ভাণ করল।

মানে, দাদার মতন জার্মানী থেকে একজন জীবন-সঙ্গিনী সংগ্রহ করে আনলেন না যে?

সলিল হাসল, কি করে আনব। ওখানকার সব মেয়েই যে আমার চেয়ে লম্বা। আমি যে বাড়ীতে থাকতাম সেই ল্যাণ্ডলেডির মেয়েটা ছ ফিট দু ইঞ্চি। তার সঙ্গে কথা বলতে গেলে ঘাড় ব্যথা হয়ে যেত।

মনে আছে সুতপা, এই কথায়, এমন একটা কথায়, সে অনেকক্ষণ ধরে হেসেছিল।

বেছে বেছে, ভেবে চিন্তে সলিল এই চাকরিটা নিল। মাইনের অঙ্কটা অন্য জায়গায় লোভনীয় ছিল বটে, কিন্তু সে সব জায়গায় মাথার ওপর আরো অনেকে থাকত। তাদের হুকুম মেনে চলতে হ'ত সলিলকে। নির্দেশ পালন করতে হ'ত।

এখানে সে সব বালাই নেই। ছোট কারখানা। সবে শুরু। ছোট ছোট রেলের ওপর মালগাড়ীতে করে লোহা এসে জমা হয় কারখানার প্রাঙ্গণে। নক্সা দেখে, ছক দেখে, মাপ অনুযায়ী কেটে ছেঁটে, গলিয়ে, বেঁকিয়ে সেই সব লোহার টুকরোগুলোকে নতুন রূপ দেয়া হয়। জাহাজের বিভিন্ন কলকব্জার অংশ।

এখানে সলিলই সর্বেসর্বা। নামে চীফ ইঞ্জিনিয়র, কিন্তু প্রয়োজনে সব কাজই করে। চোখে কালো চশমা এঁটে জ্বলন্ত ফারনেসের মধ্যে লোহার পাত ঢোকায়, মাঝে মাঝে মিস্ত্রীর কাছ থেকে হাতুড়ি কেড়ে নিয়ে উত্তপ্ত লোহার ওপর সজোরে ঘা দেয়। চার ধারে অগ্নির স্ফুলিঙ্গ-বৃষ্টি হয়। দেখে ছেলেমানুষের মতন সলিল আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

মজুররা আসে গ্রাম থেকে। যে দুজন কর্তা এখানে থাকেন, তাঁদের বাংলো কারখানার কাছেই।

কেবল চীফ ইঞ্জিনিয়ার সায়েবের বাংলোটাই এত দূরে। কারখানা থেকে মাইল তিনেক।

অনেক আগে সম্ভবত কোম্পানীর আমলে এখানে কোন সায়েব একটা বাংলো বানিয়ে ছিলেন। রোদে, জলে, সময়ের প্রকোপে সে বাংলো প্রায় ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল। শুধু কাঠামোটুকু অবশিষ্ট ছিল।

কারখানার মালিকরা এই জায়গাটাই প্রথমে পছন্দ করেন। নিজেরা থাকবেন বলে এই বাংলোটা নতুন করে গড়ে তোলেন দামী জিনিসপত্র দিয়ে।

তারপর রেল কোম্পানীর সঙ্গে গণ্ডগোল হ'ল। রেলের লাইন এতদূরে আনার পক্ষে কতকগুলো অসুবিধা দেখা দিল। মাঝপথে ছোট এক নদী। অন্য ঋতুতে শীর্ণকায়া, কিন্তু বর্ষায় তটপ্লাবিনী। রেল লাইন এদিকে আনতে হলে এই নদীর ওপর বাড়তি সাঁকোর সমস্যা দেখা দিল।

কাজেই কারখানার জায়গা আরো দূরে সরে গেল। কর্মকর্তাদের বাংলোও গড়ে উঠল কারখানার কাছাকাছি।

এই বাংলোটা নির্দিষ্ট হল ইঞ্জিনিয়ার সায়েবের জন্য।

সলিল কোন আপত্তি করল না। দূরত্ব এ যুগে একটা বাধাই নয়। বিশেষ করে সে ব্যবধানের সেতুবন্ধন করার জন্য যখন মরিস মাইনর রয়েছে।

প্রথম প্রথম সুতপারও ভাল লেগেছিল। কলকাতার নিরবচ্ছিন্ন কোলাহল থেকে এই নির্জন পরিবেশে এসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল। চারপাশে শুধু বাবলা, কেয়া আর ফণীমনসার জটলা। দূরে দূরে প্রায় মেঘের সঙ্গে রং মিশিয়ে তরঙ্গায়িত পাহাড়।

তখন বাড়ীর মানুষটা বাড়ীতেই থাকত। এমন কারখানা-সর্বস্ব হয়ে ওঠেনি। বসে বসে সুতপা সেতার বাজাত, চোখ বন্ধ করে সলিল শুনত।

পুরো একটা মাসও নয়।

কারখানা চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষটা বদলে গেল। কোন রকমে নাকে মুখে গুঁজে বেরিয়ে পড়ত বাড়ী থেকে। কোনদিন দুপুরে ফিরত, কোনদিন ফিরত না।

প্রথম প্রথম নিঃসঙ্গতা কাটাবার জন্য সুতপা সেতার নিয়ে বসত, কিন্তু বেশীক্ষণ ভাল লাগত না।

জানলার কাঁচে মুখ রেখে বাইরের বালির ঝড় দেখত।

নিজের অন্তরের ঝাঁঝকে প্রশমিত করার কোন উপায়ই খুঁজে পেত না।

একদিন সুতপা সোজাসুজি সলিলকে বলেই বসল।

তোমাদের ক্লাবে আমাকে নিয়ে চল!

বেতের চেয়ারে বসে সলিল একটা ইঞ্জিনিয়ারিং জার্নালের পাতা ওল্টাচ্ছিল, মাথা তুলে বলল, সেখানে তোমার ভাল লাগবে না। সব পুরুষের দল। মেয়ে তো কেউ নেই।

দুটো হাত মোচড়াতে মোচড়াতে সুতপা বলল। কণ্ঠে কান্নার রেশ। তাহ'লে আমার দিনটা কি করে কাটে বল? তুমি তো যন্ত্রপাতি নিয়ে বেশ আছ।

সলিল বিচলিত হল। সুতপার দিকে চোখ বুলিয়ে তার দুঃখের পরিমাপটা বোঝার চেষ্টা করল, তারপর খুব মৃদু গলায় বলল, সত্যি, তোমার ভারি কষ্ট। তুমি কিছুদিন কলকাতায় গিয়ে থাকবে?

না, না, না। চীৎকার করে সুতপা সলিলের সামনে থেকে ছুটে চলে গেল।

বেশী দূর নয়। পাশের ঘরে গিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল।

সলিল বুঝবে না, কোন পুরুষমানুষ বুঝবে না, বিয়ের পর এত অল্প দিনের মধ্যে, স্বামী ছেড়ে বাপের বাড়ী গিয়ে থাকা মেয়েদের কাছে ভারি লজ্জার, ভারি বেদনার।

এই সময়টা এমন সুযোগ কজন পায়। সবাই এই কথাই বলবে। বেশীর ভাগ মেয়েই শাশুড়ী-শ্বশুর-ননদ-ভাসুর-জা-কণ্টকিত সংসারে গিয়ে পড়ে। স্বামীকে নিরালায় পাবার উপায়ই থাকে না। সংগোপনে কথা বলার সুযোগই হয় না।

সব কিছু পেয়েও সুতপার বাপের বাড়ীতে দিন কাটানো লোকে অন্য চোখে দেখবে। অসূয়ার রং মিশিয়ে কদর্থ করবে।

আসল কথাটা লোকে বিশ্বাসই করতে চাইবে না।

মাঝে মাঝে এমনও হয়েছে।

ছুটির দিন। বিকালে বেতের চেয়ারে সলিল চুপচাপ বসে বসে একটা পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছে, সুতপা তার সেতার নিয়ে এল।

আড় চোখে একবার সেদিকে চেয়ে সলিল বলল, বাঃ, ভালই হয়েছে, একটু বাজনা শোনাও।

বিয়ের আগে সলিল বহুবার এ অনুরোধ করেছে। সুতপার পড়ার ঘরে, কিংবা ছাদের নির্জন অবকাশে পাশাপাশি বসেছে দুজনে। একজন হাতের ছোঁয়ায় তারে তারে ঝঙ্কার তুলেছে, আর একজন নিমীলিত নেত্রে সে সুরতরঙ্গ উপভোগ করেছে।

তারপর আরো যে সব কাণ্ড করেছে, ভাবলেও সুতপা আরক্ত হয়ে ওঠে। বাজনার শেষে সলিল সুতপার দুটো হাত জড়িয়ে ধরেছে। মুগ্ধ আবেগে বলেছে, অপূর্ব, সামান্য কাঠ আর তারের গোছা থেকে কি করে এমন সুরের লহরী ফোটাও তুমি? আশা করছি এতটা যখন পার, তখন আমার মতন নীরস মানুষকেও সঞ্জীবিত করে তুলতে পারবে।

অনেক কষ্টে হাত ছাড়িয়ে সুতপা কাঁপা কাঁপা গলায় শুধু বলেছে, আঃ ছাড়ুন, কেউ এসে পড়বে!

সুতপা সেতার নিয়ে বসল। যে সুর সলিলের প্রিয়, সেটাই বাজাল অনেকক্ষণ ধরে। আবেশে তার নিজের দুটো চোখ বুজে এল।

বাজানো শেষ করে চোখ খুলেই হতাশ হল।

সলিল তার হাতের পত্রিকায় গভীরভাবে মগ্ন। সুরের একটি কণাও যে তার কানে গেছে, এমন মনে হ'ল না।

তাও নির্লজ্জের মতন সুতপা প্রশ্ন করল, কেমন লাগল?

বিব্রত, অপ্রস্তুত সলিল বলল, ভাল, বেশ ভাল, মানে—

মানে, সুতপা কণ্ঠে দৃঢ়তা আনল, তুমি একটুও শোন নি। আমার সেতারের ছিটে ফোঁটাও তোমার কানে যায় নি।

সলিল কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে রইল, তারপর হাতের পত্রিকাটা নাড়াতে নাড়াতে বলল, নতুন ধরণের একটা ইকনমাইজারের ছবি বেরিয়েছে। একেবারে আধুনিক, অথচ দামও খুব বেশী নয় সেই অনুপাতে। মনটা সেই দিকেই ছিল। তুমি আবার বাজাও, সুতপা, এবার আমি মন দিয়ে শুনব।

কথার সঙ্গে সঙ্গে সলিল পত্রিকাটা টেবিলের ওপর সরিয়ে রাখল।

কিন্তু ততক্ষণে সুতপা উঠে গিয়েছে। ছোট একটা ঘরে যেখানে সংসারের অব্যবহৃত জিনিসগুলো স্তূপাকার করা ছিল, সেখানে সেতারটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

এ যন্ত্র কারো হৃদয় তন্ত্রীতে যদি অনুরণন তুলতে না পারে তাহ'লে এর কোন সার্থকতা নেই।

বিছানায় বালিশে মুখ গুঁজে সুতপা অনেকক্ষণ চুপচাপ শুয়েছিল। মনের মধ্যে ক্ষীণ একটা আশা ছিল, হয়তো সলিল এক সময়ে উঠে আসবে তার পিছনে এসে দাড়াবে। একটা হাত রাখবে পিঠের ওপর। সান্ত্বনার বাণী, সহানুভূতির বাণী শোনাবে। ক্ষমা চাওয়াও বিচিত্র নয়।

কিন্তু সলিল এল না।

এক সময়ে সুতপা যখন উঠে বসল, পর্দার ফাঁক দিয়ে দৃষ্টি দিল, দেখল সলিল চেয়ারে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

কিছুদিন মনভার, মুখভার করে রইল। তারপর আস্তে আস্তে সব কিছু মসৃণ হয়ে গেল।

একদিন সলিল একটু তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরতে সুতপা সাজগোজ করে নিল। দুই ভ্রূর মাঝখানে যত্ন করে টিপ আঁকল। খোঁপায় বেলকুঁড়ির মালা জড়াল। তারপর সলিলের সামনে এসে বলল, চল একটু বেড়িয়ে আসি।

সলিল সামনে একটা নীলরংয়ের নক্সা মেলে ধরে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছিল, সুতপার কথায় মুখ তুলল।

বেড়াতে? কোথায়?

কোথায় ঠিক সুতপারও জানা ছিল না। বাড়ীতে ভাল লাগছিল না, এইটুকুই বলতে পারে।

কিন্তু উত্তরের অপেক্ষায় সলিল চেয়ে রয়েছে। কিছু একটা বলতে হবে। তাই সুতপা বলল, চল জলঙ্গীর ধারে বেড়িয়ে আসি।

শীর্ণকায়া জলঙ্গীর বর্ষায় নতুন রূপ! তার ধারে বেড়াবার জায়গা হয়তো বিশেষ নেই। চারদিকে ঝোপ-ঝাড়। সাবাই ঘাসের জঙ্গল। তবু দু একবার সুতপা সলিলের সঙ্গে বেড়াতে গেছে সেখানে। হাত ধরাধরি করে বেড়িয়েছে। অবশ্য অনেক আগে। প্রথম এখানে আসার পরে।

সলিল ঢোঁক গিলল। সুতপার দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে মাটির দিকে দেখল, তারপর মৃদু কণ্ঠে বলল, আমার তো এখন যাওয়া মুস্কিল। কাল একটা নতুন মেশিন বসবে কারখানায়, সেটা দেখে রাখতে হবে।

হঠাৎ থেমে, যেন সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে, এইভাবে বলল, তুমি এক কাজ কর না। প্রসাদকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও।

সুতপার অনুমতির অপেক্ষা না করেই সলিল চেঁচাতে শুরু করল, প্রসাদ, প্রসাদ।

সুতপা সলিলকে থামিয়ে দিল।

থাক, প্রসাদকে ডাকতে হবে না। আমার একটা কাজের কথা মনে পড়ে গেছে। জলঙ্গীর ধারে আমার যাওয়াও সম্ভব হবে না।

প্রসাদ পরিচারকের নাম। সে আউটহাউস থেকে আসবার আগেই সুতপা বাড়ীর মধ্যে চলে গেল।

এতটা পরিবর্তন, এত দ্রুত, সুতপা আশা করেনি। কাজ সবাই করে, কিন্তু কাজের জন্য আর সব কিছু কেউ এভাবে বিসর্জন দেয় না। জীবিকা আর জীবন এভাবে মিশিয়ে ফেলে না কেউ।

সারাটা দিন সুতপা মুখ বুজে থাকে। কথা বলবার একটি লোকও নেই। এই নিবান্ধব পুরীর আশপাশে কোন স্ত্রীলোক নেই, যার সঙ্গে সুতপা আলাপ করতে পারে।

কারখানার মালিকেরাও কেউ পরিবার আনেন নি এখানে। সপ্তাহান্তে তাঁরা কলকাতায় যান। দু-দিন, তিন দিন কাটিয়ে আসেন। আর কুলী-ব্যারাকে কিছু মজুরণী আছে। তাদের সঙ্গে ভাব করা চলে না।

বাড়তি লোকের সুতপার কোন প্রয়োজন ছিল না। অবসর সময়ে বাড়ীর লোকটা যদি সঙ্গদান করত, আগের মতন জমিয়ে আলাপ করত, তাহ'লে সুতপার কোন ক্ষোভই থাকত না।

কিন্তু সলিল বদলে গেছে। যন্ত্র, যন্ত্র, যন্ত্র। মেশিন-গুলো অক্টোপাশের মতন অগণিত বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে তাকে। গৃহমুখী মনকে নিঃশেষে পিষ্ট করে দিয়েছে।

সব থেকেও সুতপাকে ঘিরে আছে অদ্ভুত এক রিক্ততা। এ বেদনা প্রকাশ করার নয়। অদৃশ্য শিখা নিরন্তর নিজেকেই দহন করে।

এ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার অনেক উপায় সুতপা চিন্তা

করল। একবার ভাবল, এমন যদি হয় তার পুরোণো কোন সহপাঠীর সাক্ষাৎ মেলে। তাকে সাদরে সুতপা বাড়ীতে নিয়ে আসবে। তার প্রতি এমন মনোযোগ দেবে যে সলিল ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠবে। কারখানা থেকে মাঝে মাঝে পালিয়ে এসে সুতপাকে দেখে যাবে, কিংবা শরীর-খারাপের অজুহাতে বাড়ীতে থেকে পাহারা দেবে সুতপাকে।

কিন্তু তেমন কাউকে সুতপার মনে পড়ল না। মনে পড়লেও, তাকে এমন এক জায়গায় নিয়ে আসাও তো এক সমস্যা।

সুতপা হাল ছেড়ে দিল।

সমস্যার সমাধান হ'ল অন্যভাবে।

এ ভাবে যে সব কিছু রূপ নেবে, তা কেউ কল্পনাও করে নি। না সলিল, না সুতপা।

সলিল কারখানায়, হঠাৎ দুপুর বেলা একটা মোটর থামার শব্দে সুতপা চমকে উঠে বসল।

আওয়াজেই বুঝতে পারল, সলিলের মোটর নয়। তা হ'লে এমন সময় আবার কে এল বাড়ীর দরজায়।

বাইরে বেরিয়েই সুতপা বিস্মিত হ'ল।

দরজার সামনে তার দাদা। দাদার হাত ধরে একমাথা কোঁকড়ানো চুল, ফুটফুটে চেহারার একটি মেয়ে।

সুতপাকে দেখে তার দাদা কয়েক পা এগিয়ে এল। ক্লান্ত, বিষণ্ণকণ্ঠে বলল, তুই কিছু শুনিস নি বোধহয় ?

সুতপা ঘাড় নাড়ল। না।

তোর বৌদি হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেছে। আজ মাস খানেক। আমি দিল্লী চলে যাচ্ছি। সেখানেই প্র্যাকটিশ করব। এ জায়গায় আর ভাল লাগছে না। তুই ডোরাকে রাখবি তোর কাছে ? সলিল নিশ্চয় আপত্তি করবে না। একে নিয়েই আমি মুস্কিলে পড়েছি।

দাদার কথা শেষ হবার আগেই সুতপা এগিয়ে গিয়ে ডোরাকে কোলে তুলে নিল। নীল দুটি চোখে অগাধ বিস্ময় নিয়ে ডোরা সুতপাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল তারপর নির্ভয়ে মাথাটা সুতপার কাঁধের ওপর রাখল।

সলিলের জন্য অপেক্ষা করে হতাশ হয়ে সুতপার দাদা সন্ধ্যার পর চলে গেল।

ক্লাব ফেরৎ সলিল ফিরল প্রায় রাত দশটায়।

যথারীতি সুতপা নিদ্রিত। কাজেই সলিল একলাই রাতের আহার শেষ করল। শোবার ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল।

শয্যা শূন্য। সুতপা বিছানায় নেই।

বিস্মিত সলিল এ ঘর ও ঘর খুঁজতে গিয়ে পাশের ছোট কুঠুরীতে উকি দিয়ে দেখেই ভ্রু কোঁচকাল।

রাজ্যের বাড়তি জঞ্জাল সরিয়ে মেঝেতে বিছানা পাতা হয়েছে। তার ওপর সুতপা অঘোরে নিদ্রামগ্ন। কিন্তু সে একলা নয়, তার কণ্ঠ বেষ্টন করে তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ যে শিশুটি কোল ঘেঁষে শুয়ে আছে, তাকে সলিল চিনতে পারল না।

অন্যদিন বিছানায় শরীর ছোঁয়াবার সঙ্গে সঙ্গেই পরিশ্রান্ত সলিল ঘুমিয়ে পড়ে। আজ কিন্তু অনেকক্ষণ এপাশ ওপাশ করল। ঘুম এল না।

ওই শিশুটি কে এমন একটা চিন্তা ছিলই, তাছাড়াও আর একটা ভাবনা ছিল। কারখানা বাড়ছে। সলিলের নীচে আরো দুজন ইঞ্জিনিয়ার এসেছে কলকাতা থেকে। যন্ত্রপাতির কাজ এখন থেকে তারাই দেখাশোনা করবে। খুব বড় রকমের কিছু হলে তবে সলিলের ডাক পড়বে।

আপাতদৃষ্টিতে ব্যবস্থা ভালই। সলিল কিছুটা বিশ্রাম পাবে। এতদিন তার অতিরিক্ত পরিশ্রম হচ্ছিল। কিন্তু সলিলের মন সে কথা বুঝতে চাইল না। তার মনে হ'ল তাকে যেন কর্মচ্যুতই করা হয়েছে। এতদিন প্রতিটি মুহূর্ত যে যন্ত্রপাতির চিন্তায় ভরাট ছিল, একেবার হঠাৎ তা থেকে অব্যাহতি।

এমন একটা সংবাদে সুতপা নিশ্চয় খুশী হত। দূরে-সরে যাওয়ার মানুষটা আবার কাছে ফিরে আসবে, নিকট সান্নিধ্যে, এই ভেবে সে উৎফুল্ল হয়ে উঠবে।

পরের দিন সকালেই ডোরার পরিচয় মিলল। বন্ধু-পত্নীকে দেখার সুযোগ হয়নি, তবু তার বিয়োগে সলিল দুঃখ প্রকাশ করল।

তার নিজের খবরটা দেবার আগেই সুতপা সামনে থেকে সরে গেল।

ডোরার খাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

অনেকক্ষণ পরে সুতপা যখন আবার বাইরের ঘরে এসে

দাঁড়াল, দেখল তখনও সলিল চুপচাপ বসে আছে। সামনের টেবিলে চায়ের শূন্য কাপ আর প্লেট।

কি, এখনও বসে রয়েছ ? সুতপা প্রশ্ন করল।

আমার চাকরি গেছে সুতপা।

তার মানে ? সুতপা ভ্রূ কোঁচকাল; এমন লোকের চাকরি যাবার নয়। অবশ্য স্বেচ্ছায় যদি ছাড়ে তো অন্য কথা। কিন্তু আর একটা ভাল কিছু জোটাতে না পারলে এরা একটা অবলম্বন ছাড়ে না।

সলিল হাসল, দুটি সহকারী এসেছে, তারাই দেখাশোনা করবে। খুব বড় রকমের কিছু হলে তবে আমার ডাক পড়বে। দশটার আগে আর কারখানায় যেতে হবে না।

সুতপা একটি কথাও বলল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনল।

সলিলই বলল, ভালই হ'ল, এবার বসে বসে তোমার সঙ্গে গল্প করব, তোমার সেতার শুনব, বেড়াতে যাব দুজনে।

মুহূর্তের জন্য সুতপার দুটো চোখ জলে উঠল, কিন্তু কোন কথা বলার সুযোগ সে পেল না।

পর্দার ওপার থেকে মধুকণ্ঠ ভেসে এল, মা, মা।

কাল অনেকক্ষণ ধরে ডোরাকে সুতপা এই ডাক শিখিয়েছে। পিসি নয় মা। দু একবার মামি বলতে গিয়েছিল ডোরা। সঙ্গে সঙ্গে তার দুটো চোখ জলে ভরে এসেছিল।

সুতপা থামিয়ে দিয়েছে। না, না, মামি নয়, ও নামে যেন এদেশের মেয়ের অন্তর ভরে না। মা, মা বলে ডাক।

সুতপা ছুটে চলে গেল পর্দার ওপারে।

কারখানাতেও এক অস্বস্তিকর অবস্থা।

ছ নম্বর মেশিনে একটু বুঝি গণ্ডগোল শুরু হয়েছে। সলিলকে কেউ খবর দেয় নি। মজুরদের মুখে শুনে সে ছুটে মেশিনের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু মেশিনে হাত দেবার মুখেই বাধা।

নতুন ইঞ্জিনিয়ার দুজন আপত্তি করল।

এই সামান্য ব্যাপারে আপনি কেন স্যর। এ আমরাই ঠিক করে দিচ্ছি। এ সব ছোটখাট ব্যাপারে আপনি ছুটে এলে, আমাদের ইজ্জত থাকে না।

একটি কথাও না বলে, মাথা নীচু করে সলিল নিজের ঘরে ফিরে এল। এ নিয়ে তর্ক করা চলে না। এখন কারখানা অনেক বড় হয়েছে। মেশিনের ছোট ছোট দোষ ঠিক করে দেবার অন্য লোক এসেছে।

সলিল মেশিন-অন্ত প্রাণ। এই মেশিনের জন্য নিজের সংসারের দিকে মুখ ফিরিয়ে থেকেছে, এমন একটা কথা কেউ বিশ্বাস করতেও চাইবে না। তাছাড়া, এসব কথা বললে লোকের কাছে সলিল শুধু হাস্যাস্পদই হবে।

সারা দিনে বিশেষ কাজ নেই। জার্মানীতে একটা মেশিনের অর্ডার যাবে। ক্যাটালগ দেখে জুতসই মেশিন বেছে দেবার ভার সলিলের ওপর। সলিল বেছে দিল।

এরপর মেশিনটা এলে কারখানায় কোথায় সেটা বসানো হবে, সে বিষয়ে সলিলের পরামর্শ নেওয়া হবে। ব্যস, এই পর্যন্ত। আর কিছু সলিলের করার নেই।

ছুটি হবার সঙ্গে সঙ্গেই সলিল বাড়ী ফিরে এল।

সুতপা কোথা থেকে একটা বর্ণপরিচয় জোগাড় করেছে। ডোরার অক্ষর চেনার পালা চলেছে।

সলিল আসতে সুতপা শুধু একবার মুখ তুলে দেখল। নিরাসক্ত, নিস্পৃহ দৃষ্টি। আগে আগে সলিলকে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরানোর জন্য সুতপা কম সাধ্য সাধনা করে নি।

চা, জলখাবার এল, পরিচারকের মারফৎ।

ততক্ষণে ডোরার অধ্যায়ন পর্ব শেষ। সুতপা আস্তে আস্তে কি একটা মজার গল্প বলছে, নিবিষ্টচিত্তে ডোরা শুনছে।

চায়ের কাপ সরিয়ে সলিল ডাকল, সুতপা।

বল ?

একটু সেতার শোনাবে ?

সেতার কোথায় ?

তার মানে ?

সলিল এ ঘর, ও ঘর খুঁজল। তারপর ছোট ঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়েই অবাক হয়ে গেল।

হাজার জঞ্জালের মধ্যে সেতারটা পড়ে রয়েছে। তারগুলো ছিঁড়ে গুটিয়ে গেছে। ঘাটগুলো ভাঙা।

আস্তে আস্তে সলিল সুতপার কাছে ফিরে এল।

গম্ভীর গলায় বলল, সেতারটার এ অবস্থা কে করল ?

সুতপা সলিলের দিকে না ফিরে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, কি জানি কে করল! তুমি না আমি বুঝতে পারছি না।

কিন্তু সুতপার দিকে চেয়ে সলিল বুঝতে পারল কে করেছে। যে নিজের হাতে জিনিস ভাঙে, সেই যে সব সময় দায়ী এমন মনে করার কোন হেতু নেই। অনেক সময় দোষী অন্তরালে থাকে।

পায়ে পায়ে সলিল আবার বাইরের ঘরে এসে দাঁড়াল। একটা চেয়ারের ওপর নিজের পরিশ্রান্ত দেহটা ছেড়ে দিল। অদ্ভুত একটা ক্লান্তি মজ্জায় মজ্জায়। কারখানায় উদয়াস্ত পরিশ্রম করেও নিজেকে এত ক্লান্ত মনে হয় নি।

একটু বসে থেকে সলিল আবার উঠে দাঁড়াল। সুতপার গলা আর শোনা যাচ্ছে না। বোধহয় গল্প বলা শেষ হয়েছে।

সলিল মন ঠিক করে নিল।

সুতপাকে কাছে টানার পথে কোন বাধা নেই। এতদিন যে বাধা ছিল, সেটা আজ অপসারিত। বয়লার, ইকনমাইজার, রোলিং সাফ্‌ট্‌ আর পথরোধ করে দাঁড়াবে না। লৌহদানবের আলিঙ্গন থেকে সলিল মুক্তি পেয়েছে।

পর্দা সরিয়ে সলিল শোবার ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। সুতপার শোবার ঘরের।

একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, চল, জলঙ্গীর ধারে একটু বেড়িয়ে আসি। অনেকদিন বেড়ানো হয় নি।

সুতপা শিউরে উঠল।

সলিলের কণ্ঠে যেন নিজের কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি শুনল। অনেকদিন আগে ঠিক এই ভাবেই তো সুতপা অনুনয় করেছিল। নিঃসঙ্গ জীবন থেকে সাময়িক মুক্তি কামনা করেছিল।

কিন্তু সলিল সাড়া দেয় নি। সে অনুরোধ রাখে নি।

তখন সলিলের অনেক কাজ। গোটা একটা কারখানার নির্জীব যন্ত্রপাতিগুলোর তদারক করতে হবে বলে, একটা সজীব সত্তার উপরোধ রাখা সম্ভব হয়নি।

কিন্তু সলিল বোধহয় জানে না, জলঙ্গী অনেক দূরে সরে গেছে। হেঁটে হেঁটে ঊষর প্রান্তর পার হয়ে গেলেও তারা আর পুরোনো জলঙ্গীর সন্ধান পাবে না।

কি হ'ল ?

সলিল মনে করিয়ে দিল।

নির্লিপ্ত, বিস্বাদ কণ্ঠে সুতপা বলল, পাগল, যাবার সময় কোথায় আমার। দেখছ না ডোরার শরীরটা খারাপ। ওকে নিয়ে এ অবস্থায় কখনও বাইরে যাওয়া চলে ?

আর বাইরে যাওয়া চলে না।

ডোরার জন্য নয়। কারখানার যন্ত্রপাতিগুলোর জন্যও না, সুতপার মন বদলেছে। তৃষ্ণার্ত একটা ব্যাকুলতা বার বার রুদ্ধদ্বারে মাথা খুঁড়ে অভিমানে কঠিন নিস্পৃহ হয়ে গেছে।

যে মিথ্যা শান্তির মোহে সলিল কারখানার মেশিনগুলোর অন্তরঙ্গতা কামনা করেছিল, ঠিক সেই কারণেই সুতপা দৃঢ় আলিঙ্গনে ডোরাকে আঁকড়ে ধরেছে। পতনোন্মুখ মানুষ যেভাবে আয়ত্তের মধ্যে যা পায়, তাই আঁকড়ে ধরে।

সলিল জানলার কাছে এসে দাঁড়াল। ফণিমনসা আর ক্যাকটাসের ঝোপ। এতদিন এই জানলা দিয়ে সুতপাও তো এই দৃশ্যই দেখেছিল !

বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্কলন

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

বেদকে আমি সঙ্কলন গ্রন্থ বলিয়াই মনে করি। বেদ অপৌরুষেয়। শ্রীভগবান স্বীয় নাভিকমল-সম্ভব ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পরে যাঁহারা এই বেদের অংশবিশেষকে মূর্ত্তরূপে দর্শন করিয়াছিলেন, সেই দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন দ্রষ্টাগণই ঋষিরূপে পরিচিত। ঋষি-গণের পরিদৃষ্ট বেদকে একত্রে গ্রথিত করা হইয়াছে। ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস বেদের সঙ্কলন করিয়া বেদব্যাস নামে অভিহিত হইয়াছেন। সুতরাং সঙ্কলন-প্রবণতা ভারতীয় মনের একটা বিশেষ লক্ষণ। সঙ্কলনের ঐতিহ্য স্মরণাতীত কাল হইতে একাল পর্যান্ত বহুধারায় বহিয়া আসিয়াছে। বেদের শ্লোকের পরিপূর্ণ বা খণ্ডিতাংশ মন্ত্র নামে অভিহিত। শ্লোককে সূক্ত বা পদও বলিতে পারি। বেদের শ্লোক আমি কবিতা রূপেই গ্রহণ করিয়াছি। বেদ হইতেই আধ্যাত্মিক কবিতা বা স্তোত্রাত্মক পদের উদ্ভব হইয়াছে।

বেদ অপৌরুষেয়; কিন্তু ঋষিদৃষ্টিতে তাহার প্রকাশের একটা কালানুক্রম আছে। আবার সেই পারম্পর্য্য প্রবাহে বিবর্ত্তনের একটা ধারাবাহিকতাও ধরা পড়ে। যজুর্বেদে বহুবিধ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের বিধি আছে। দেবস্তুতি এই অনুষ্ঠানেরই অঙ্গীভূত। ঋক এবং অথর্ব্ব বেদে বহু স্তুতির সংগ্রহ দেখিতে পাই। অথর্ব্ব বেদে লৌকিক ধর্ম্মেরও মূল পাওয়া যায়। সামবেদ সুর ও লয় সংযোগে গান করা হইত। সংগীতজ্ঞ কল্লিনাথ বৈদিক অশ্বমেধ যজ্ঞে বীণাবাদক ও গায়ক ব্রাহ্মণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বেদে নানা-বিধ বাদ্যযন্ত্রের নাম আছে। পরবর্ত্তীকালে সঙ্গীতের সঙ্গে যাঁহারা সঙ্গত করিত তাহাদের নাম ছিল স্বাতি। ঋক বেদের নির্বাচিত অংশের সঙ্গে চল্লিশটী নূতন গান যোগ করিয়া সামবেদ সঙ্কলিত হয়। সঙ্গীতেরও উৎপত্তি এই সামবেদ হইতেই। সঙ্গীতের শাস্ত্র ও তাহার বহু সঙ্কলন-গ্রন্থ আছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি এক একটি বৈদিক পদকে সূক্ত বলে। বেদ হইতেই দার্শনিক চিন্তার সূত্রপাত। যেমন যজুর্ব্বেদের ঈশোপনিষদ। তেমনই দেবস্তুতিও ধীরে ধীরে পরব্রহ্মের উদ্দেশেও সম্প্রসারিত হইতে লাগিল। এইরূপেই স্তোত্রের উদ্ভব ঘটে। পূজা আসিয়া যজ্ঞের স্থান অধিকার করিল ও স্তোত্র এই পূজারই পরিপূরক অঙ্গ। শতরুদ্রীয়কে আমি স্তোত্রই বলিব। এই ধারা ধরিয়াই পরে বিষ্ণুসহস্র নামাদির উদ্ভব ঘটিয়াছে। সাধনার ক্রম বিকাশে বাহ্যিক পূজা হইতে মানস পূজার ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া স্তোত্র যেন এক নব দিগন্তের সংবাদ বহন করিয়া আনিল।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের সুপ্রসিদ্ধ স্তোত্র

> বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
> আদিত্যবর্ণং তমসঃ পুরস্তাৎ

ষষ্ঠ অধ্যায়ের—

> তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্
> তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
> পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্
> বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের মধুর ভজন যেন এই ভিত্তিকে আশ্রয় করিয়াই পরিপুষ্ট হইয়াছে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য হইতে দুইটি মহার্ঘ বস্তু আহরণ করিয়া আনেন। একটি অমৃতপূর্ণ রত্ন কলস; আমি বিল্বমঙ্গলের কৃষ্ণকর্ণামৃতের কথা বলিতেছি। অপরটী সুদুর্লভ রত্ন সমুচ্চয়ে সুগঠিত ব্রহ্মসংহিতা। আমার মনে হয় শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের উক্ত স্তোত্রেরই অপরূপ ভাষ্য ব্রহ্মসংহিতা।

স্তোত্র মহাকাব্যেও স্থান প্রাপ্ত হইল। মহাভারতে ভীষ্মদেবকৃত স্তব আমার অভিমতের সমর্থন করে। যদিও বিশেষদেশে বিশেষ কালে ইহার উদ্ভব তথাপি ইহাকে সার্ব্বজনীন বলিতে বাধা নাই। মহাকবি কালিদাস

রঘুবংশেও ইহা গ্রহণ করিয়াছেন। রামায়ণ হইতে রঘুবংশ পর্য্যন্ত একই ধারা বহিয়া আসিয়াছে। পুরাণে ইহার প্রাচুর্য্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পৌরাণিক, রামায়ণ, মহাভারত ও মহাকাব্যবর্ণিত স্তোত্র-গঙ্গোত্রী হইতেই পদপ্রবাহিণীর উৎপত্তি।

দাক্ষিণাত্যে একটা কথা আছে—উভয় বেদান্ত। সংস্কৃত এবং দেশীয় ভাষায় রচিত স্তোত্র সমান মর্য্যাদায় উভয় বেদান্ত নামে পরিচিত হইয়াছে। দক্ষিণে বৈষ্ণবপদ সংগ্রহের নাম—"লাল্ আয়্যির প্রবন্ধম্"। শৈবপদসংগ্রহের নাম "দেবারম"। কোথাও কোথাও এক একজন কবিই আপন আপন রচিত পদসমুদয়কে একত্রিত করিয়াছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে পদকারের শিষ্য বা ভক্তের দ্বারাও এই সঙ্কলন সাধিত হইয়াছে। উত্তরভারতের পদকারগণের মধ্যে সুরদাস, তুলসী দাস, কবীর, পশ্চিমভারতের গুজরাটী সাধক নরসিংহ মেহতার নাম করিতে পারি। মহারাষ্ট্রে জ্ঞানেশ্বর নামদেব স্তোত্রের ধারাতেই পদরচনা করিয়া গিয়াছেন। সাধু তুকারামের পদ অভঙ্গ নামে পরিচিত। উপরি কথিত সাধকগণের পদ সঙ্কলিত হইয়াছে।

প্রাকৃতভাষায় রচিত কোন স্তোত্রের সন্ধান পাওয়া যায় না। কম বেশী প্রায় দুইহাজার বৎসর পূর্ব্বে সঙ্কলিত "হাল সপ্তশতীর" মধ্যে স্তোত্র নাই। প্রাকৃত ভাষায় রচিত নানাজনের নানা রসের নানা বিষয়ক গাথার সঙ্কলন "হাল সপ্তশতী"। আর্য্যাছন্দে গ্রথিত আর্য্য সপ্তশতী একজন কবির প্রণীত শ্লোকেরই সংগ্রহ। রচয়িতা কবিবর গোবর্দ্ধন সম্রাট লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ছিলেন। প্রাকৃত ভাষায় না থাকিলেও অপভ্রংশে রচিত স্তোত্র আছে। যেমন—"কংস বিনাশিঅ" ইত্যাদি। বৌদ্ধধর্ম্মেও সঙ্কলন গ্রন্থের অভাব নাই। শিখগণের ধর্ম্মগ্রন্থ "গ্রন্থসাহেব"ও একটি সঙ্কলন গ্রন্থ।

পূর্ব্বভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদকার কবি জয়দেব। স্বরচিত চব্বিশটী সঙ্গীতকে কয়েকটি শ্লোকের যোগসূত্রে গাঁথিয়া তিনি শ্রীগীতগোবিন্দ মহাকাব্য রচনা করেন। ছন্দ, সুর, ভাষা ও ভাবের অপূর্ব্বতায় গ্রন্থখানি কবির জীবৎকালেই সারাভারতে সুপ্রচারিত হইয়াছিল। শ্রীমন্ মহাপ্রভু মানবের সাধ্যসাধন নির্ণয়ে গ্রন্থখানিকে শ্রীমদ্ভাগবতের কবিত্বময় ভাষ্যের মর্য্যাদা দান করিয়াছিলেন। সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের অমৃত প্রস্রবণ শ্রীগীতগোবিন্দ। গীতগোবিন্দের দুইটী ধারা, একটী ধারা মিথিলার বিদ্যাপতিতে অন্যটী বীরভূম-নান্নুরের কবি চণ্ডিদাসে বিকাশ লাভ করিয়াছিল। চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি খণ্ডখণ্ড ভাবে পদ রচনা করিয়াছিলেন। এই পদমালার পুঞ্জিত প্রতিরূপ শ্রীমন্ মহাপ্রভু। মহাপ্রভু যেন একটী প্রাণোচ্ছল সুরতরঙ্গায়িত গীতিবিগ্রহ। সেই গীতি ধ্বনিত হইল বহুজনকণ্ঠে। দিকে দিকে দেখা দিলেন গায়ক কবি। অগণিত ভগবৎপ্রেমিক পিক্-পাপিয়ার মধুর কণ্ঠে বাঙ্গালার আকাশ বাতাস যেন ছন্দোময় হইয়া উঠিল। মহাপ্রভুর অশ্রুধারায় বাঙ্গালার মাটী মালিন্যমুক্ত হইল। বাঙ্গালীর জীবনে নূতন পরিবর্ত্তন দেখা দিল। পবিত্রজীবন লইয়া বাঙ্গালী একটা নূতন জাতিরূপে আত্মপ্রকাশ করিল। গৌরলীলা ও রাধাকৃষ্ণ লীলা লইয়া কত পদকার যে পদরচনা করিলেন, তাহার সংখ্যা হয় না। ইহাদের মধ্যে মুসলমান কবি ও মহিলা কবিও ছিলেন।

এই সমস্ত পদের কিছু অংশ স্থান পাইয়াছিল শ্রীখণ্ডের কবি রামগোপাল দাসের গ্রন্থে। তিনি নায়ক-নায়িকার লক্ষণ নির্ণয়ে চণ্ডিদাস বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবিগণের বাঙ্গালা মৈথিলী তথা ব্রজবুলিতে রচিত পদই উদাহরণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামগোপাল দাসের রসকল্পবল্লীকে পদের প্রথম সঙ্কলন গ্রন্থ বলা যায়।

"বাণ অঙ্গ শরব্রহ্ম নরপতি শাকে" গ্রন্থ সঙ্কলন সম্পূর্ণ হয়। বেদের ষড়ঙ্গ, আয়ুর্ব্বেদের অষ্টাঙ্গ, এবং ভক্তির নবাঙ্গ ধরিয়া শকাব্দা হয়—১৫৬৫, ১৬৮৫, ১৫৯৫ অর্থাৎ কবি খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। ইঁহার পুত্র পীতাম্বর রসমঞ্জরী ও অষ্টরস ব্যাখ্যা নামে দুই খানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করেন। এই দুইটী গ্রন্থেও অনেক পদ আছে। গোপাল দাস ও পীতাম্বরের অব্যবহিত পরে সুপ্রসিদ্ধ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী একখানি সঙ্কলন গ্রন্থ রচনা করেন—নাম "ক্ষণদা গীত চিন্তামণি"। বিশ্বনাথ সুকবি ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় রচিত মাধুর্য্য কাদম্বিনী প্রভৃতি বহু গ্রন্থ আজিও তাঁহার কবিত্বের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। তিনি হরিবল্লভ উপনামে ব্রজবুলিতেও কতকগুলি পদ রচনা করিয়াছিলেন। ক্ষণদায় সে পদগুলি আছে।

অতঃপর বিশ্বনাথের শিষ্য জগন্নাথের পুত্র নরহরি চক্রবর্ত্তীর গীতচন্দ্রোদয়ের নাম করিতে হয়। নরহরি একাধারে কবি, গায়ক, এবং সঙ্গীত শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। গীতচন্দ্রোদয় কয়েকটী খণ্ডে বিভক্ত একটী সুবৃহৎ গ্রন্থ। সম্পূর্ণ গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। গীতচন্দ্রোদয়ের পরবর্ত্তী সঙ্কলন রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃত সমুদ্র। গৌরসুন্দর দাসের কীর্ত্তনানন্দ ইহার পরবর্ত্তী গ্রন্থ। বৈষ্ণব পদাবলীর সুবৃহৎ সঙ্কলন পদকল্পতরু। মুর্শিদাবাদ জেলার টেঞা বৈদ্যপুরের গোকুলানন্দ সেন (উপনাম বৈষ্ণবদাস) বহু পরিশ্রমে নানাস্থানে ঘুরিয়া গায়কগণের নিকট হইতে প্রায় তিন-হাজার পদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের প্রথমে সঙ্কলনের সুরু, চরম পরিণতি অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে। প্রায় একশত বৎসর ধরিয়া পর পর গ্রন্থগুলি সঙ্কলিত হইয়াছিল।

সঙ্কলনের ধারা কিন্তু অবরুদ্ধ হইল না। দীনবন্ধু দাসের সঙ্কীর্ত্তনামৃতের সঙ্কলন কাল অষ্টাদশ শতকের তৃতীয় পাদে। কমলাকান্ত দাস পদরত্নাকর সঙ্কলন করেন বাঙ্গালা সন ১২১৩ সালে। নিমানন্দ দাসের পদরস সার ইহার পরে সঙ্কলিত। গৌরমোহন দাসের পদকল্পলতিকা সঙ্কলিত হয় ১২৫৬ সালে। ১২৭৮ সালে অক্ষয় চন্দ্র সরকার প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ প্রকাশ করেন। ১২৮১ সালে সারদাচরণ মিত্র বিদ্যাপতির পদাবলী প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১২৯২ সালে রবীন্দ্রনাথ সঙ্কলিত পদরত্নাবলী প্রকাশিত হয়। ১৩০৪ সালে বসুমতী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত প্রাচীন কবির গ্রন্থাবলীতে বৈষ্ণব পদাবলীর সংখ্যা খুব কম ছিল না। ১৩১০ সালে জগদ্বন্ধু ভদ্র গৌরপদতরঙ্গিণী প্রকাশ করেন। ১৩১২ সালে—বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হয় বৈষ্ণব পদ-লহরী, সম্পাদন করেন দুর্গাদাস লাহিড়ী। ১৩২১ সালে কীর্ত্তনবিশারদ রাখালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রকাশ করেন লালা গান পদ্ধতি। ময়মনসিংহ জেলার মীর্জাপুর নিবাসী কুঞ্জবিহারী দাসের একখানি বৈষ্ণব পদ সংগ্রহের নাম মনে করিতে পারিতেছি না। এক সময়ে ভদ্র সমাজে ও কীর্ত্তনীয়াগণের মধ্যে এই গ্রন্থের আদর ছিল। ১৩২৩ সালে ঢাকা বুতনী হইতে হরিলাল চট্টোপাধ্যায় যে গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন তাহার নাম পদরত্নমালা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের কন্যা অপর্ণা দেবী তাঁহার স্বামী সুধীর রায়ের সহযোগিতায় কীর্ত্তন পদাবলী প্রকাশ করেন। নবদ্বীপ বঙ্গবাসী ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত চারি খণ্ডে প্রকাশিত পদামৃত মাধুরী পদকল্পতরুর অপেক্ষাও অধিক সংখ্যক পদে পরিপূর্ণ ছিল। সর্ব্বশেষ সঙ্কলন গ্রন্থ বৈষ্ণব পদাবলীকে প্রায় চারিহাজার পদ, বিশুদ্ধ পাঠ, ও জটিল পদের ব্যাখ্যা প্রভৃতি দিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। এই গ্রন্থ প্রকাশ পূর্ব্বক সংস্বতী প্রেস একটি স্মরণীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন।

জীবাত্মার গতি

শ্রীরাধাবল্লভ দে

মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই জীবাত্মা কিরূপে স্থূল শরীর হইতে উৎক্রমণ করে, কোথায় যায়, যেখানে যায় সেই খানেই অবস্থান করে কি আবার প্রত্যাবর্তন করে, এ সব জটিল সমস্যার অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনাই এ প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। নিজ নিজ কর্মানুসারে জীবাত্মা যে চারি পথ অবলম্বন করে তাহাদের নাম দেবযান মার্গ, পিতৃযান মার্গ, ভস্মমার্গ এবং সদ্যোমুক্তি।

ছান্দোগ্য উপনিষদ বলেন যাঁহারা অরণ্যে শ্রদ্ধা ও তপস্যার অনুষ্ঠান করেন তাঁহারা যথাক্রমে অগ্নি, জ্যোতিঃ, অহঃ, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ ছয়মাস, আদিত্য, চন্দ্র ও বিদ্যুতের দেবতাগণের দ্বারা অধিষ্ঠিত পথ অবলম্বন করিয়া বিদ্যুৎ লোকে আসিলে অমানব পুরুষ ইহাদিগকে ব্রহ্মপ্রাপ্তি করান। গীতার অষ্টম অধ্যায়ের ২৪ শ্লোকেও ইহার উল্লেখ আছে।

যাগ যজ্ঞাদি কর্ম, তড়াগাদি প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ইষ্টাপূর্তকারীরা ধূম রাত্রে কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ণ ছয়মাস এই দেবতা দিগের অধিষ্ঠিত পথ দিয়া চন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকেন এবং নিজ পুণ্যার্জিত সুখভোগ করিয়া পঞ্চাগ্নির মাধ্যমে পুনরায় মর্ত্য লোকে প্রত্যাবর্তন করেন। এই পঞ্চাগ্নির প্রথম অগ্নির নাম দ্যুলোক, দ্যুলোক হইতে দ্বিতীয় অগ্নি মেঘলোককে আশ্রয় করিয়া বৃষ্টিরূপে তৃতীয় অগ্নি পৃথিবীতে বর্ষিত হয় এবং পরে শস্যরূপে উদ্ভব হয়। সেই শস্য প্রকৃতির বিধানে অবশ্যই কোন পুরুষের খাদ্য হয়। এই পুরুষ শরীরই চতুর্থ অগ্নি। তারপর পুরুষ শরীর হইতে শুক্ররূপে নারীগর্ভে প্রবিষ্ট হয়। এই নারীই পঞ্চম অগ্নি। অতঃপর শিশুরূপে জন্ম হয়। ইহার ইঙ্গিত গীতার অষ্টম অধ্যায়ের ২৫ শ্লোকে দেওয়া আছে। উপনিষদে বিশদ ভাবে উল্লেখ আছে।

যাহারা উপাসনা বা কর্মানুষ্ঠান কিছুই করেন না, যাহারা ধর্ম জ্ঞান শূন্য এবং যাহারা নিতান্ত নিকৃষ্ট জীবন যাপন করেন, তাহাদের উপরোক্ত দুইটি পথের কোনটিতেই যাইবার অধিকার নাই। তাহারা নিকৃষ্ট মনুষ্য বা মনুষ্যেতর যোনিতে জন্ম গ্রহণ দ্বারা জন্ম-জন্মান্তরে নানারূপ কষ্ট বিড়ম্বনা উপভোগ করেন। ইহারাই ভস্ম মার্গের পথিক।

কিন্তু সদ্যোমুক্তিভাব যোগিগণ জীবৎকালেই ব্রহ্মময় হন। তাঁহাদের প্রাণ ব্রহ্মলীন হয়, উৎক্রান্ত হয় না। কথিত আছে মহর্ষি রমণ যখন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, অত্যুজ্জ্বল উল্কাপাতের মত একটি জ্যোতিঃশিখা মহাব্যোমে মিশিয়া যায়। দৃষ্টিগোচর হউক আর নাই হউক জীবনান্তে তাঁহাদের প্রাণ মহাব্যোমে মিলিয়া যায়।

বাড়িটা যেন বদলে গেছে না ?

গত রাত্রের হঠাৎ আসা বৃষ্টিটা কখন থেমে গেছে। স্বচ্ছ সুনীল আকাশে কোথাও একটুকরো মেঘের চিহ্নও নেই আজ ভোর বেলায়। সূর্য ওঠা সকাল আলোর ঝরণা ছড়িয়ে দিয়ে হাসছে। প্রথম শীতের হাওয়ায় কন্‌কনে ভাবের আমেজ। তবু সেই হাওয়ায় দূরের ইউক্যালিপটাস বনের গন্ধটা যেন ভেসে আসছে। এতদিন পরে এলেও বেশ বুঝতে পারছেন শংকর দত্ত। চেনা গন্ধ।

ছড়ানো ছিটোনো শাল মহুয়া আমলকী হরিতকী গাছ-গুলোও ঠিক তেমন ভাবেই দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ির পাশের সেই খালি মাঠমতন জায়গাটায় আরো খানিকটা বুনো ঝোপ আর কাঁটা লতার জঙ্গল হয়েছে। লাল আর বেগুনে রংয়ের ছোট ছোট ফুল ফুটেছে অনেক। দূরের পাহাড়গুলো তাদের সেই অতি পরিচিত অস্পষ্ট ধূসর নীরেট চেহারা নিয়ে সদ্য-ঘুমভাঙা চোখে চেয়ে আছে ছোট্ট পাহাড়ী সহরটার দিকে। শীতের মরা নদীটা তার একটু-খানি জল নিয়ে তেমন করেই তিরতিরিয়ে বয়ে যাচ্ছে বাড়িটার পাশ দিয়ে।

এমন কি, ঐ তো বাড়ির কম্পাউণ্ডটার মধ্যে সেই মস্ত বড় বাঁধানো ইঁদারাটা, দড়ি বাঁধা বালতিটা আগের মতই পরিষ্কার টলটলে জলভরা হয়ে পড়ে আছে।

কিন্তু আসল জিনিষটাই কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে!

নিজস্ব—একান্ত নিজস্ব বাড়িটাকে এই মুহূর্তে কোন-মতেই যেন নিজের বাড়ি বলে ভাবতে পারছেন না শংকর দত্ত।

বাড়ির বাইরে, গেটের ওপাশে রাস্তায় দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বেশ ভাল করে বাড়িটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন শংকর দত্ত। রাত্রের অন্ধকারে যে সন্দেহ জেগেছিল, দৃঢ় হল ভোরের আলোয়। প্রথম দর্শনে যে বাড়িটা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন, দরদস্তুর না করেই কিনে ফেলেছিলেন, মাত্র কটা মাসের মধ্যেই বাড়িটা তার সেই পুরোণো সৌন্দর্য হারিয়ে বসে আছে। অথচ শংকর দত্ত নিজেও টের পাচ্ছেন না, কি করে এটা সম্ভব হয়?

ঝোঁকের মাথায় কিনে ফেলা বাড়িটা সব আকর্ষণ হারিয়ে বসে আছে। অথচ এই স্বাস্থ্যকর পাহাড়ী নির্জন জায়গাটার এতটুকু সৌন্দর্যহানি হয়নি। তবে কি শংকর দত্তের বিকল মনটাই এজন্যে দায়ী নাকি?

রং ওঠা দরজা জানলা। বাড়ির কম্পাউণ্ডে ফুলের গাছের বদলে যত রাজ্যের আগাছার জঙ্গল। চারিদিকের পাঁচিলে ভাঙ্গনের সুস্পষ্ট চিহ্ন।

বাড়িটার মেরামত কিছুই হয়নি!

অথচ কেনবার সময় বাড়ি সারানো হিসেবে অতগুলো টাকা তিনি বিশ্বাস করে জীবনবাবুর হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন। এছাড়া অন্য উপায়ই বা কি ছিল? নতুন জায়গায় তিনি নিজেই নতুন আগন্তুক। মিস্ত্রি, চুণ, সুরকি ইঁট, সিমেণ্ট—এখানে কোথায় কি আছে, কোথায় কি পাওয়া যায়, কোন খবরই জানতেন না। ভেবেছিলেন, বিশ্বাস করেছিলেন, এখানকার বাসিন্দা বুড়োটা অন্ততঃ তাঁর এই উপকারটুকু করবে। কিন্তু হঠাৎ মারা গিয়ে আচ্ছা ঠকান ঠকিয়ে গেল তাঁকে বুড়োটা! বাড়িটা বিক্রি করবার জন্যেই যেন বেঁচে ছিল! কলকাতা সহরের একজন অনভিজ্ঞ ভদ্রলোককে ধোঁকা দিয়ে, তাকে কিছুদিন নিজের বাড়িতে রেখে আদর আপ্যায়ন করে ভুলিয়ে ডবল দামে বাড়িটা গছিয়েও বুড়োর শান্তি হয়নি! বোঝার উপর আর এক পাহাড়ের মত ভারী বোঝাও বাড়িটার সঙ্গে রেখে গেছে। একমাত্র ঈশ্বর জানেন, কবে সেই ভারী বোঝাটা শংকর দত্তের ঘাড় থেকে নামবে।

শংকর দত্তের চারপাশে সৌন্দর্যের সমারোহ! যে অনির্বচনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য একদিন তাঁর হৃদয়মন ভুলিয়ে ছিল, তাঁকে প্ররোচিত করেছিল এখানে বসবাস করবার জন্যে। সবুজ ধুসর সোনালী-প্রকৃতির বিচিত্র বর্ণচ্ছটা। গাছপালা লতাপাতা ফুল পাহাড় নদী পাখি—শাল-মহুয়ার বন, তাঁর কর্ম-ক্লান্ত ব্যর্থ জীবনটার একান্ত কামনা বাসনার স্বপ্নের পরিপূর্ণতা নিয়ে তাঁর পথ চেয়েই যেন বসে আছে। তাঁর সব না পাওয়ার ক্ষোভ ভুলিয়ে দেবে। সমস্ত জ্বালা জুড়িয়ে দেবে বলে!

কিন্তু সব বোঝা নামিয়ে, সব কাজ সরিয়ে সহরের সব ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে এত দূরে চলে এসেও আবার একি জালে জড়িয়ে পড়লেন তিনি?

শংকর দত্তের ভাঙ্গা ফাটা কপালটা কি চিরদিনই প্রত্যেকটি জায়গায় তাঁকে এমন করে ভোগাবে? কোন কালেই দায় সারা হবেন না? হবেন না নির্ঝাট নিশ্চিন্ত?

সকালবেলার চায়ের নেশার সময় পেরিয়ে গেছে। বাড়ির ভিতরে ঢুকলে পাওয়া যাবেনা এমন নয়। তবু নিজের বাড়ির মধ্যে ঢুকবার এতটুকু ইচ্ছে পর্যন্ত হচ্ছেনা!

তবু নিরুপায় হয়ে লোহার গেটটা খুলতে হল—

দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে কম্পাউণ্ড পেরিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকতেও হল।

ঘরে ঢুকতেই দেখতে পেলেন সেই ভারী বোঝাটাকে। মূর্তিমতী অশান্তিটাকে। তাঁরই প্রতীক্ষায় ব্যস্ত হয়ে উঠেছে বলেই মনে হল।

মাথার কাপড়টা আরও একটু টেনে অপর্ণা প্রশ্ন করল, এত দেরী হল কেন ফিরতে? কতদূর গিয়েছিলেন? চা, জলখাবার কখন খাবেন?

যেখানেই, যত দূরেই যাই, আর যত দেরী করেই ফিরি, তার কৈফিয়ৎ কি তোমাকে—একটা বাইরের লোককে দিতে হবে নাকি?

না মুখে নয়। মনে মনেই কড়া করে উত্তরটা দিলেন শংকরবাবু।

মুখে বললেন, আপনি এত ব্যস্ত হবেন না! আমার খাওয়া দাওয়ার ব্যাপার কোন নিয়মের উপর চলে না। আপনি তো সবই জানেন। কলকাতায় একা থাকি। যত্ন করবার লোক কোনকালেই নেই। ওটাই ধাতস্থ হয়ে গেছে। হঠাৎ কেউ যত্ন করলেই বরং খুব অস্বস্তি লাগে। বিব্রত হয়ে পড়ি।

গতবছর যখন এখানে এসেছিলেন, তখন কিন্তু খুব ধরা বাঁধার উপর থাকতেন। অপর্ণা মুখ টিপে একটু হাসল।

মনে মনে চটে গেলেন শংকরবাবু। সেটাও আপনার পাল্লায় পড়ে। আপনার শ্বশুরমশাইয়ের পাল্লায় পড়ে। তাছাড়া সেবার খুব ভুগে ভুগে অতিষ্ঠ হয়েই এখানে শরীর সারাতে এসেছিলাম। আমার মামাতো ভাই—সেই এখানে পাঠিয়েছিল জোর করে।

এবার বুঝি তার উল্টোটা করতে এসেছেন? সারানো শরীর ভাঙ্গতে এসেছেন? আবার পুরন্ত গালে টোল পড়ল অপর্ণার। নিমকিগুলো গরম গরম খাওয়াব বলে কষ্ট করে ভেজেছিলাম, একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। নিন তাড়াতাড়ি খেয়ে নিন। চা-টাও জুড়িয়ে জল হয়ে গেছে। আমি কি জানি এত দেরী হবে? তাহলে একটু দেরী করে চায়ে জল দিতাম।

আপনি অযথা ব্যস্ত হচ্ছেন। আমার ঠাণ্ডা খাওয়া এমন কি না খাওয়াও খুব ভাল রকম অভ্যাস আছে। বিশ্বাস না হয়—

বিশ্বাস হবে না মানে? সে তো আপনার দশা দেখেই প্রথম দিন, মানে যখন এখানে এসে আমাদের বাড়ি উঠেছিলেন, তখনই বুঝতে পেরেছিলাম। তবে কিনা আপনার ঠাণ্ডা খাওয়া, না খাওয়া অভ্যাস থাকলেও আমার ঠাণ্ডা দেওয়া না খাওয়ানো অভ্যাসটা একেবারেই নেই। মুশ্‌কিলটা সেইখানে। মংলী, এই মংলী, চট্‌ করে উহুনে দু'কাপ জল বসিয়ে দেনা বাছা। কাঠ রেখে ওঠ।

মধ্যবয়স্কা দেহাতী মেয়েটা উঠোনে বসে একমনে দা দিয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঠ কাটছিল। নিঃশব্দে উঠে রান্নাঘরের মধ্যে চলে গেল।

ঠাণ্ডা চা-টা শুধু ঠাণ্ডাই নয়, তেতো লাগল। সুগন্ধি হালুয়া মচমচে নিমকিগুলোও যেন বিস্বাদ লাগল। প্রবল বিতৃষ্ণার সঙ্গে কোনমতে গলা দিয়ে সেগুলোকে নামাতে নামাতে শংকরবাবু ভাবলেন, আমি কচি খোকা নই। চুলে পাক ধরেছে। সমস্ত জীবন অনেক লোকের সংস্পর্শে এসেছি। স্বার্থপরতার এই চেহারা আমার চেনা। খুব ভাল করেই চেনা। সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতার মূল্যের বদলে অনেক দুঃখ, অনেক বঞ্চনা-প্রতারণা আমাকে সহ্য করতে হয়েছে। এই যত্ন, এই সেবায় আমি আর ভুলছি না। তোমার মতলব আমার অজানা নেই। আমি অতি ভদ্র, অতি শান্ত সরল প্রকৃতির মানুষ, কিন্তু তা বলে বেশী সুযোগ তোমাকে কোনমতেই আমি নিতে দেব না। শেষ বয়সে আমি একটু শান্তি চাই। বড় ক্লান্ত আমি।

শংকরবাবুকে ভাবনার আকাশ দিয়ে একফাঁকে অপর্ণা রান্নাঘরে চলে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই গরম চায়ের কাপটা টেবিলে এনে রাখল। 'একি, সব খেলেন না কেন? হালুয়া নিমকি, ভাল হয়নি?

না না ভালই হয়েছে। অনেক খেয়েছি। আর খাব না। শুনুন, আপনি এত কষ্ট করে সকালে এত খাবার করবেন না। মাখন পাঁউরুটি তো আছেই। এক কাপ চা হলেই যথেষ্ট। বলেছি তো, এত খাওয়াও আমার অভ্যাস নেই।

গরম চায়ের কাপটা ভালই লাগল শীতের সকালে। তবু মুখ ফুটে, একটা প্রশস্তির কথাও বলতে পারলেন না। নিঃশেষিত কাপটা রেখে আবার ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। রাস্তায় নেমে খানিকটা স্বাচ্ছন্দ্য, আর স্বস্তি বোধ করলেন। গতবছর যখন চেঞ্জে এসে এই বাড়িটায় উঠেছিলেন, তখন এটা পরের বাড়ি ছিল। আজ নিজের কেনা বাড়িতে থাকতে তাঁর যেরকম অসুবিধা অস্বস্তি, অসহজ বলে মনে হচ্ছে, সেদিন কিন্তু এখানে সুদীর্ঘ তিনমাস ধরে থাকতেও কোন কিছু অন্যরকম বোধ হয়নি। অবস্থা ও পরিবেশ বদলে গিয়ে ঘটনাচক্রে এই বাড়ির মালিক হয়ে এখন কি বেকায়দাতেই না পড়তে হয়েছে তাঁকে!

অথচ অপর্ণা? ওর এতটুকু অসুবিধা হয়েছে বলেতো মনে হচ্ছেনা!

বোঝাই যাচ্ছেনা বাড়ির আসল মালিকটা কে? তিনি না ও?

অপর্ণার ভাব গতিক দেখে উল্টো মনে হচ্ছে, এবারও যেন শংকর দত্ত তাঁর শরীর সারাতে মাস তিনেকের জন্যে এখানে চেঞ্জে এসেছেন। কিছুদিন থেকেই আবার কলকাতায় ফিরে চলে যাবেন। আর অপর্ণা, এতদিন যেমন ছিল, তেমনই এ বাড়িতে বসে থাকবে। বিক্রি করেও

স্বত্ব ছাড়বেনা। ভোগ দখল করবে দিনের পর দিন।

এ কী অভদ্রতা? এ কী অবুঝপণা? এতটুকু কাণ্ড জ্ঞানও কি নেই ওর? একেবারে ছেলেমানুষটি তো নয় মহিলাটি? সবই তো জানে। বয়স তো ওরও হয়েছে।

নাঃ, একটা ব্যবস্থা না করলে আর চলেনা। এখানকার বাসিন্দা, যাঁদের পরামর্শে বাড়িটা কিনেছিলেন, তাঁদের সঙ্গেই আবার পরামর্শ করা দরকার।

এ সব অঞ্চলে পাশাপাশি বাড়ি থাকেনা। দুটো বাড়ির মাঝখানে বেশ কিছুটা দূরত্ব থাকে। উঁচু নীচু মাঠ, জঙ্গলাকীর্ণ খানিকটা পোড়ো জমি, গাছ পালা বাগান পেরিয়ে তারপর আরেকখানা বাড়ির সীমানা।

বেশীর ভাগ পাহাড়ী স্বাস্থ্যকর জায়গাগুলোয় এমন ভাবেই বাড়ি করেন ভদ্রলোকেরা।

মল্লিক ভিলার হরেকৃষ্ণ মল্লিক বাইরের বারান্দায় তির্য্যকভাবে আসা রোদ্দুরে পা ছড়িয়ে দিয়ে বেতের চেয়ারে বসে কাগজ পড়ছিলেন, শংকর দত্তকে দেখে সোৎসাহে সোজা হয়ে বসলেন। এলেন তাহলে? বসুন, বসুন ঐ চেয়ারটায়। এবার নিজের বাড়িতে বসবাস করবেন তো?

আর বসবাস! পাশের চেয়ারে বসে পড়লেন শংকর বাবু। তাঁর কণ্ঠস্বরের হতাশা আর বিরক্তি অপ্রকাশিত রইল না হরেকৃষ্ণ বাবুর কাছে। আপনাদের পরামর্শ শুনে বাড়িটা কিনে কী মুশকিলেই পড়েছি!

মুশকিল? মুশকিল কিসের? কলকাতার এত কাছাকাছি এমন স্বাস্থ্যকর জায়গা আপনি পাচ্ছেন কোথায়? গতবছর মাত্র মাস দুতিন এখানে ছিলেন শরীর তো আপনার চমৎকার সেরে গিয়েছিল। এখানকার জলে অম্বল অজীর্ণ পালাতে পথ পায়না মশাই! নিজে ভুক্তভোগী তো! ভাল করেই জানি।

জায়গা তো ভালই। হজমও ভাল হয়···কিন্তু, কিন্তু থাকি কি করে, তাই বলুন?

হরেকৃষ্ণবাবু এবার তীক্ষ্ণ অন্বীক্ষণ দৃষ্টিতে শংকর দত্তের মুখের দিকে তাকালেন। বছর পয়তাল্লিশ কি ছেচল্লিশ সাতচল্লিশ হবে। তীক্ষ্ণ নাক। মুখশ্রী সুন্দর। বহুদিনের অজীর্ণ রোগের শিকার, বোধহয় তাই চেহারাটা কিছুটা ফ্যাকাশে। রোগাও বেশ। ভদ্রলোক একটু মোটা সোটা হলে ওঁকে সুপুরুষ বলাই চলতো। গৃহস্থ মানুষের ঘরে আদর যত্ন করার লোক থাকলে যে সুস্পষ্ট ছাপটা তার চেহারায় পড়ে, এখানে তার একান্ত অভাব।

ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন। বুঝতে পেরেছি। জীবনবাবুর পুত্রবধূ এখনও বাড়ির দখল ছাড়েন নি বুঝি?

নাঃ। দিব্যি আমার বাড়িতেই বসবাস করছেন। কি করি বলুন তো?

এই ব্যাপার? এতে ভাবনার কি আছে? বাড়িটা তো আপনারই। চলে যেতে বলুন ওঁকে। এত মিনমিনে হলে কি চলে! ভালমানুষ বলে পেয়ে বসেছে। আর আপনাকেও বলি, বাড়িটা কিনে তখনি তখনি কোথায় দখল নেবেন, তা না, সোজা কলকাতায় পালালেন।

কি করব বলুন? তখন জীবনবাবুর শরীরটা তেমন ভাল যাচ্ছিল না। আর তখন আপনারাও তো ছিলেন। উনি বললেন, বাড়িটা মেরামত করে দেবেন। তারপর পুত্রবধূকে নিয়ে চলে যাবেন বাড়ি ছেড়ে। কিছুই হলনা। বাড়ি মেরামত হলনা। নিজে মারা গেলেন ঐ বাড়িতেই। অপর্ণা দেবীও অন্য কোথাও গেলেন না। এখানে আসবার আগে আমি চিঠিতে লিখেছিলাম, আমি এখন ওখানে থাকব। এর চেয়ে খোলাখুলি আর কি লিখব বলুন? অসহায়া বিধবা স্ত্রীলোক। নিজে থেকে না গেলে তো জোর করে তাড়ানো যায়না। আপনিই বলুন না?

উঁহু। সেটাতো একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার! হরেকৃষ্ণ মল্লিক খবরের কাগজটা আড়াল না করেই মুচকে হাসলেন। আর হাসিটা একটা বিশেষ অর্থব্যঞ্জক হয়েই দেখা দিল শংকর দত্তের চোখের সম্মুখে।

সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই প্রবল বিরক্তিতে ক্ষোভে বিতৃষ্ণায় শংকর দত্তের সমস্ত মনটা সকালবেলাকার মতই বিস্বাদ তিক্ত হয়ে উঠল।

হরেকৃষ্ণবাবু ঐটুকু ইঙ্গিতেই ক্ষান্ত হলেন না। বেশ রসান দিয়ে রসাল ভাবেই বলে চললেন, যাই বলুন

ভদ্রমহিলার চেহারাটি ভারী সুশ্রী। বয়সও অল্প। তিরিশের নীচেই মনে হয়। জীবনবাবুর বড় ছেলে শিবরতনবাবুর দ্বিতীয় পক্ষের পরিবার এটি। এ পক্ষে ছেলে মেয়ে হবার আগেই ভদ্রলোক মারা গিয়েছিলেন। জীবনবাবুর মুখে শুনেছিলাম বাপের বাড়ির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় বলেই নাকি তাঁরা কোনমতে মেয়েটিকে পার করে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। আর কোন খোঁজ খবরও নেন না। তবে ও পক্ষের বড় বড় ছেলে মেয়েরা আছে। স্বচ্ছন্দে উনি সেখানে চলে যেতে পারেন। বাড়ি বিক্রির সমস্ত টাকা কড়ি তো উনিই পেয়েছেন। অসুবিধে কিসের? যেখানে থাকবেন, একটা পেট বেশ ভাল ভাবেই চলে যাবে। কাঁচা টাকাগুলো যখন ওঁর দখলেই আছে।

শুধু হরেকৃষ্ণ মল্লিকই নন—

রিটায়ার্ড জজ রুদ্রনাথ পাল, ডাক্তার বিশ্বনাথ বসু, ইঞ্জিনিয়ার সরোজ সরকার, এখানকার স্থানীয় সম্ভ্রান্ত বিশিষ্ট অধিবাসী কজন সবাই একই উপদেশ দিলেন শংকর দত্তকে।

বাড়ি কিনেছেন এতগুলো টাকা দিয়ে, নিঃসঙ্কোচে বাস করুন। অতিথির মত, চোরের মত পালিয়ে বেড়াচ্ছেন কেন মশাই? বাড়িটা কি আপনার, না ওঁর? ভাল করে বুঝিয়ে বলুন, নিশ্চয় উঠে যাবেন। আমরা নিজেরাই সবাই মিলে চড়াও হয়ে আপনার বাড়ি গিয়ে ওঁকে কিছু বললে সেটা খুব খারাপ দেখাবে, না হলে না হয় বলা যেত। এটা একান্ত ভাবে আপনারই ব্যক্তিগত ব্যাপার তো।

অত্যন্ত অসহায়, প্রায় জলে ডোবা মানুষের মত, শংকর দত্ত মিনমিন করে বললেন, হাব ভাবে তো কতবার বলেছি। বাইরের ঘরখানায় চোরের মত চুপচাপ পড়ে আছি। দেখতেই তো পাচ্ছেন। মুখের উপর আর কি করে বলব?

রিটায়ার্ড জজ ভুরু কোঁচকালেন, দলিলপত্র সব ঠিক আছে তো?

সব ঠিক আছে। আমার মামাতো ভাই উকীল। সে সমস্ত ঠিক করে, দেখে শুনে তবে টাকা দিয়েছে। জীবনবাবুকে সে ভালকরেই চিনতো। সেই তো আমাকে গতবছর অসুখের পর জোর করে এখানে পাঠায়। থাকবার, খাবার কোন ব্যবস্থা নেই, ভাল হোটেল নেই, আমি তো পেটের রোগে বারোমাস ভুগি, আমার ভাই এখানে ওঁর বাড়ীতে আমার থাকার ব্যবস্থা করে দেয়। তার সব কাজই পাকা। আচ্ছা, ওঁর তো ছেলে মেয়েরা সব আছে—

ছেলে মেয়ে! মুখ বাঁকালেন সরোজবাবু। আজকালকার দিনে নিজের পেটের ছেলে মেয়েরাই বড় বাপমাকে দেখে, তার আবার সৎ ছেলে মেয়ে! বুড়ো বয়সে আবার বিয়ে করেছিলেন বলে ছেলে মেয়েরা নাকি বিয়ের পর থেকে বাপের সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখেনি। তাদের ঠাকুর্দা মারা গেলেও তো তারা এখানে আসেনি। শ্রাদ্ধ শান্তি যা করবার, নিজেদের বাড়িতেই করেছে।

ছেলে মেয়েরা নাইবা দেখল, হাতে যখন অতগুলো কাঁচা টাকা রয়েছে, তখন ওঁকে দেখবার আত্মীয়-স্বজনের অভাব হবে না। যে বাপের বাড়ির কেউ এতকাল খোঁজ নেয়না, এখন তারা মাথায় করে রাখবে। এবার টিপ্পনী কাটলেন ডাক্তার বিশ্বনাথ বসু। কিন্তু যাই বলুন, জীবনবাবু যে এভাবে এত তাড়াতাড়ি মারা যাবেন, একথা আমিও বুঝতে পারিনি। বয়স যথেষ্ট হয়েছিল বটে, কিন্তু খুব শক্ত সমর্থ ছিলেন। শ্বশুর মারা যাওয়াতে ভদ্রমহিলা একটু অসুবিধাতেই পড়েছেন দেখছি!

কিন্তু অপর্ণার চাল চলনে বিন্দুমাত্র অসুবিধার চিহ্নটুকুও নজরে পড়ল না শংকরবাবুর।

শ্বশুরের সংসারটি যেমন গুছিয়ে করছিল, ঠিক তেমনই করতে লাগল। মংলী আর তার ছেলেটাকে দিয়ে হাট বাজার করানো, ঘরদোর বাগান পরিষ্কার করানো সবই চলতে লাগল। মাথার ঘোমটা কমতে কমতে এক সময় খোঁপায় এসে ঠেকল, ভ্রূক্ষেপও করল না। এমন সহজ আর স্বাভাবিক ভাবে অপর্ণা সংসার চালাতে লাগল, যে শংকরবাবুর ধারণা হল, সে তাঁকে দুদিনের অতিথি বলেই ধরে নিয়েছে। এই নিঃসম্পর্কীয়া যুবতী স্ত্রীলোকটিকে নিয়ে এভাবে এই বাড়িতে দিনের পর দিন কাটানো সম্ভব নয়, এই অস্বস্তিকর অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতি থেকে কি ভাবে মুক্তি পাবেন, কিছুই স্থির করতে পারলেন না শংকর দত্ত।

অথচ মুখ ফুটে, 'আমার বাড়ি থেকে আপনি চলে যান।' এই কথাটা কোন মতেই বলতে পারলেন না অপর্ণাকে।

বলা কি সহজ? কি করে ভুলবেন গত বছর ভুগে ভুগে শুধু প্রাণটুকু হাতে নিয়ে উকিল মামাতো ভাইয়ের অতি পরিচিত জীবনবাবুর বাড়িতে এসে উঠেছিলেন বলেই প্রাণটা ফিরে পেয়েছিলেন।

এত সেবা, এত যত্ন, ঘড়ির কাঁটা ধরে ওষুধ পথ্য—এতটা বয়সে কেউ এত সেবা তাঁর কখনো করেছে? না হয় বিয়েই করেননি। কিন্তু দুটি বোন তো আছে! মাসি পিসি বৌদি—এঁরাও তো আছে! ভাই ভাইয়ের বৌ, তারাও তো আছে!

দায়সারা কর্তব্য ছাড়া আন্তরিকতার স্পর্শ কোনদিনও কি তাঁর কপালে জুটেছে? দয়ামায়া ত্যাগ করে কেমন করে নিষ্ঠুরের মত তিনি দূর হয়ে যেতে বলবেন আজ অপর্ণাকে?

নিজের এই অদ্ভুত মানসিকতায় নিজেই অপ্রস্তুত হয়ে শেষ পর্যন্ত শংকরবাবু পরিচিত বন্ধুবান্ধবের সঙ্গ এড়িয়ে চলতে লাগলেন।

যতটা ভেবেছিলেন, ব্যাপারটা তার চেয়েও জটিল হয়ে উঠেছে, তাঁর প্রমাণ পেতে খুব বেশী দেরী হলনা।

সপ্তাহে এখানে দুদিন হাট বসে। টাটকা শাকশব্জী সময়ের তরিতরকারি ফলপাকড় থেকে সুরু করে সংসারের কুলো ডালা কলসী বঁটিও মেলে এ হাটে। এখানকার স্থানীয় এবং চেঞ্জার বাবুরা নিজেরাই এ দুদিন হাটে আসেন। তাঁদের সঙ্গ নেন তাঁদের স্ত্রীকন্যা ভগ্নিরাও। দেখেশুনে মনের মত জিনিষগুলি কিনে তাঁরা খুশীমনে বাড়ি ফিরে আসেন। এই সৌখিন কাজটাকে তাঁরা বেড়ানোর একটা প্রধান অঙ্গ হিসেবেই ধরে নেন।

অপর্ণা হাটে যায়না কখনো। মংলীকে দিয়েই করায়। আর তার ছোট ছেলেটা। সেটাও ওস্তাদ এই সব হাট বাজার করায়।

সেদিন কী মনে হল, শংকর দত্ত অনেকদিন বাদে হাটে গেলেন। দেখা হল অনেকের সঙ্গেই। যাঁদের সঙ্গে দেখা হল, তারা কুশল প্রশ্নের কথাটা কোনমতে সেরেই আসল কথায় এলেন। অর্পণা চলে গেছে না আছে? নিশ্চয় চলে গেছে এতদিনে। শংকরবাবু আজকাল তো বড় একটা বাড়ি থেকে বেরোন না। কি ব্যাপার? রান্নার লোকজন নেই নাকি?

অর্পণা এখনো ও বাড়িতেই আছে, এই জানা কথাটা শংকরবাবুর মুখ থেকে ভালকরে জেনে নিয়েই আর এক চোট বিস্মিত উক্তিও বর্ষণ হয় সঙ্গে সঙ্গে।

কী আশ্চর্য! এখনো আছে! শংকরবাবু বুঝি মুখ ফুটে চলে যাবার কথাটা বলতে পারলেন না? তা ভালই তো। মন্দই বা কি? এই সব জায়গায় সাঁওতাল দেহাতীদের দিয়ে বড়জোর ইঁদারা থেকে জল তোলানো বাসন মাজানো কাপড়কাচানো যায়। বাঙ্গালী বাবুদের রান্নার কাজ এরা কেউ জানে না। অপর্ণার মত অমন একটা রাঁধুনী পাওয়া কি কম ভাগ্যের কথা? বলতে নেই শংকরবাবুর তো এই কদিনেই চেহারায় জেল্লা খুলে গেছে। ভদ্রমহিলার রান্নার হাত অতি চমৎকার। জীবনবাবু বেঁচে থাকতে একবার ওঁদের সবাইকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। অপর্ণা সমস্ত রান্না একহাতে করেছিল। কত রকম পদ! শাক সুক্তো ভাজা ডাল থেকে মাছ মাংস, কোন আইটেমই বাদ পড়েনি। আর কি চমৎকার রান্না। আহা এখনো যেন সেই স্বাদ মুখে লেগে আছে! রূপে গুণে এমন একটি গুণবতী মহিলা আজকাল বড় একটা চোখেই পরেনা। কপাল বটে শংকরবাবুর।

মুখের সামনে অতি সরল ভাষায় নিরীহ ভাবে এই সব আলাপ আলোচনার মানে বুঝতে যদি বা একটু দেরী হয়, আড়াল আবডালের সরস রসিকতা টীকা টিপ্পনীগুলি কানে এলে, তার অর্থ বুঝতে এতটুকু সময়ও দেরী হয়না। আর কানে ঠিকই আসে। এখানকার মুষ্টিমেয় বাঙ্গালী পরিবারের মধ্যে একতার অভাবও যেমন নেই, তেমনই অন্যের সম্বন্ধে আলোচনার কথাটা এক সময় তার কান পর্যন্ত পৌছে দেবার মত লোকের অভাবও কখনো ঘটেনা।

ওঁদের দুজনকে নিয়ে এমনি একটি অশালীন মন্তব্যও কিছু দিন পর কানে এলো শংকরবাবুর। মাথায় আগুন জলে উঠল সঙ্গে সঙ্গে।

জলতে জলতে উত্তেজিত ভাবে বাড়ি ফিরে এলেন। এভাবে নিঃশব্দ থাকার কোন মানেই হয়না। মুখ খুলতেই হবে।

অপর্ণা তখন রান্না ঘরের বারান্দায়। তার নিজস্ব এলাকার মধ্যে। মংলীর ছেলেটা বাজার করে ঢেলে দিয়েছে। মুলো পালংশাক। আলুবেগুন। কত সস্তায় সে এনেছে, অপর্ণাকে বুঝিয়ে বলছিল হাত মুখ নেড়ে। অপর্ণাও হাসি মুখে সায় দিচ্ছিল ছেলেটাকে। বাঃ বেশ টাট্‌কা পালং শাক এনেছিস তো তুই? টাটকা জিনিষ না হলে কি রান্না ভাল হয়? তোদের বাবু পালং শাক খেতে ভারী ভালবাসে—

কথা শেষ হলনা। শংকরবাবু কাছে এসে দাঁড়ালেন। কঠিন গম্ভীর গলায় অপর্ণাকে উদ্দেশ করলেন, শুনুন, আপনাকে আমার জন্যে আর রান্না করতে হবে না।

মাথার কাপড়টা কখন খসে পড়ে গিয়েছিল। এলো হাতখোঁপাটায় আটকে রেখে হঠাৎ-আসা হাসিটা সামলাল অর্পণা। কেন? রান্নার লোক পেয়ে গেছেন বুঝি?

সে ভাবনা আপনার নয়। আমি কি আপনার ভরসায় এখানে এসেছি? আমি কি কখনো আপনাকে আমার জন্যে রান্না করতে বলেছি?

কই, নাতো। সরল ভাবে ঘাড় নাড়ল অপর্ণা। আমাকে নিজের খাবার জন্যে তো রাঁধতেই হয়, সেই সঙ্গে আপনার জন্যেও—

আমার জন্যে আপনার মাথা না ঘামালেও চলবে। বুঝতে পারলেন?

আপনার জন্যে মাথা ঘামাবার অনেক লোকই আছে। সে কথা আমি জানি। এখানে আমি অনেকদিন আছি। আপনি নতুন এসেছেন।

অপর্ণার নির্ভীক স্পষ্টভাষণে বিচলিত শংকর তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে অপর্ণার মুখের দিকে তাকালেন। লোকনিন্দার কারণ যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। ভদ্রমহিলার এতটা সুন্দরী হবার কোন প্রয়োজনই ছিল না। যৌবন এবং স্বাস্থ্য—দুটোই যেন সর্বাঙ্গে উথলে পড়ছে। মুখে চোখে অসহায়তা অথবা ম্লান বিষন্নতার কোন চিহ্নই নেই। পরাশ্রয়ের সঙ্কোচ বা গ্লানি, তাও নেই। অকুণ্ঠিত সহজ সারল্যে উদ্ভাসিত তরুণ মুখশ্রীতে প্রশান্ত সন্তোষ।

শংকর দত্তের গাম্ভীর্য, ভ্রূকুটি বা কথাবার্তা সব কিছু অগ্রাহ্য করে অপর্ণা ধীরে সুস্থে চুবড়ীর মধ্যে শাক-তরকারিগুলো তুলে ছেলেটার হাতে দিয়ে বলল, নে ধর, চট করে ধুয়ে নিয়ে আয়। বাছতে হবে কুটতে হবে। তারপর তো রান্না। আর আপনি কি এখন চা খাবেন?

না, খাব না। শংকর বাবু কি বলবেন, কি করবেন ভেবে না পেয়ে নিজের উপর বিরক্ত হয়েই যেন রেগে উঠলেন অপর্ণার উপর।

তবে থাক। বেলা হয়ে গেছে। এখন আর চা খেয়ে কাজ নেই। শুনুন, কাজ না থাকে তো আরেকবার না হয় ঐ হরেকৃষ্ণ মল্লিকের বাড়ি থেকে আড্ডা সেরে আসুন। সময়টা আপনার ভালই কাটবে। আমার অনেক কাজ। রাঁধুনী তো এখনো আনেননি দেখতে পাচ্ছি। যখন আনবেন তখন না হয় আপনার জন্যে রান্না করব না। উপস্থিত একবাড়িতে যখন আছি, চোখের সামনে পুরুষ মানুষ হয়ে নিজে রান্না করে খাবেন, সেটা তো আর হতে দিতে পারব না। সুতরাং আমি এখন রান্না করতে চললাম। উনুনের কয়লাগুলো বোধহয় এতক্ষণে ছাই হয়ে গেল।

অপর্ণা রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। আর শংকরবাবু ক্রোধে ক্ষোভে ব্যর্থ আক্রোশে বাইরের ঘরের বিছানার উপর শুয়ে পড়লেন।

একেই বলে অশান্তির কপাল!

কোনকালেই শান্তি জুটল না। ভেবেছিলেন শেষ বয়সটা সব ঝামেলা ঝঞ্ঝাট মিটিয়ে নিরুদ্বেগে নিশ্চিন্তমনে কাটিয়ে দেবেন, কিন্তু মাথার উপর সেই ভগবান আছেন, যিনি চিরটাকাল দুঃখ কষ্ট আর অশান্তির বোঝা তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে তাঁকে বাধ্য করেছেন সেটা আজীবন বয়ে নিয়ে যেতে।

বড় অসময়ে বাবা মারা গেলেন। বিধবা মা, দুটি বোন, একটি ভাই, এতবড় একটা সংসারের ভার তাঁর ঘাড়ে পড়ল। ঘাড় তখনও শক্ত হয়নি। সবে কলেজে ঢুকেছেন। বয়সটাও একেবারে কাঁচা।

কি ভাবেই না সে সব দিনগুলো কেটেছে? কি নিদারুণ দারিদ্র্যদশায়? অভাব অনটনের মধ্যে? পয়সা রোজগারের জন্যে, সংসারটাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে কী প্রাণান্তকর পরিশ্রমই না করতে হয়েছে! একটা সামান্য চাকরির জন্যে প্রতিটি অফিসে কতবার হাঁটাহাঁটি করেছেন। কতবার কতভাবে অপমানিত হয়েছেন ঘরে বাইরে, আপনপর সবার কাছে!

পড়াশোনা বন্ধ করতে হল। বড়বাজারে এক দয়ালু মাড়োয়ারী ব্যবসাদারের নজরে পড়ে তার কাছেই কাজ সুরু করলেন, নামমাত্র বেতনে। অসম্ভব খাটুনিতে।

আস্তে আস্তে তার বিশ্বাসভাজন হলেন। মাইনে বাড়ল। ভাই বোনেদের স্কুলে দিলেন। নিজের অবস্থার উন্নতি হল না। অসময়ে আধপেটা খাওয়া। দু'খানা ধুতি কেচে পালটা পালটি করে পরা!

তারপর?

সতেরো বছর বয়সে যে বোঝা ঘাড়ে পড়েছিল, এত কাল ধরে তার দায় দায়িত্ব বহন করে এসেছেন। বোন দুটি'কে পড়িয়ে ভাল ঘরে বিয়ে দিয়েছেন। একজন জলপাইগুড়িতে, অন্যজন দিল্লীতে সুখে ঘরকন্না করছে। ছোট ভাইকেও মানুষ করেছেন। ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে সে এখন রাউলকেল্লার বাসিন্দা। বিয়েও হয়েছে। ছেলেমেয়েও হয়েছে।

অবশ্য তাঁর নিজেরও উন্নতি হয়েছে। সেই দয়ালু মনিবের সাহায্যে নিজেই আলাদা ব্যবসা সুরু করেছিলেন। সে ব্যবসা এখন নিজে না দেখলেও বিশ্বাসী কর্মচারীদের তদারকে ভালই চলছে।

ভাইবোনেরা মানুষ হল। তাদের বিয়ে হল সংসার হল। সবই হল। শেষ পর্যন্ত তাঁরই কিছু হল না। যে একা সে একা। ওদের দাঁড় করাতে, পার করতে গিয়ে নিজের বয়সটাই পার হয়ে গেল একসময়। টেরও পেলেন না।

মাও ভুগলেন কম দিন নয়। প্রায় ছটি মাস—বিছানায় শুয়ে, ভুগে ভুগে তিনিও মারা গেলেন বুড়ো বয়সে।

শেষ পর্যন্ত মায়ের আফশোস রয়ে গেল। সবাই চলে গেল, শংকরের কি হবে? সমস্ত জীবন কি করে একা একা কাটাবে ও? কেন বয়সকালে জোর করে একটা বিয়ে দিলাম না ওর? অভাব অনটন সত্বেও কি লোকে বিয়ে করে না? সংসার করে না? সেই তো অবস্থা ফিরল!

একা। সত্যই এক এক সময় বড় একা বলে মনে হয়। অসুখ হলে আরো। অজীর্ণ, গ্যাসট্রিক ট্রাবল তাঁর চিরসঙ্গী। মাঝে মাঝে শয্যাশায়ী হয়ে থাকেন। কেউ আসতে পারে না। বোনেরা দূরে থাকে। সংসার ফেলে আসা সম্ভব নয় তাদের পক্ষে।

তারা অবশ্য লেখে, তাদের ওখানে গিয়ে থাকার জন্যে। কিন্তু তাও সম্ভব হয়না। শংকরবাবু দেখেছেন, সেখানেও প্রচণ্ড বাধা আছে। ওদের সংসারে তিনি যেন সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি অতিথি মাত্র। দুদিন থাকা যায়। দুমাস নয়। অস্বস্তি বোধ হয়। দু পক্ষেরই।

মামাতো ভাইটি ভালবাসে তাঁকে। সেই তাঁর নির্বান্ধব জীবনে একমাত্র সুহৃদ। গত বছর সেই জোর করে জীবনবাবুর কাছে পাঠিয়েছিল! বাড়িটা সেই জোর করে তাঁকে কিনিয়ে দিয়েছে। স্বাস্থ্যকর স্থানে সেই ঠেলে পাঠিয়েছে বার বার।

এখানে আসবার আগে ভাই বোনেদের প্রত্যেককেই আসতে লিখেছিলেন। কিন্তু কেউ আসতে পারবে না। সবাই চিঠি দিয়েছে দুঃখ প্রকাশ করে। কলকাতার ছোট্টবাড়িটাতেও একা ছিলেন, এখানেও এই বিদেশেও তিনি একা। তাঁর কর্তব্য তিনি করেছেন। ওদের কর্তব্য ওরা করুক আর নাই করুক, তাই নিয়ে মিথ্যে দুঃখ পেয়ে লাভ কি?

অবশ্য গতবছর এই অপর্ণার অক্লান্ত সেবাযত্নই তাঁকে বাঁচিয়ে তুলেছিল। একথা মিথ্যে নয়। অপর্ণা তাঁর সব খবরই জানে। বোধহয় মায়া হয়েছিল শংকরবাবুর জন্যে। তবে গতবছর যা ভাল লেগেছিল, এবার আর তা ভাল লাগছে না। অবস্থা পরিবেশ বদলে গেছে। মাঝখানে জীবনবাবু ছিলেন। তিনি আজ আর নেই। এ ভাবে অনাত্মীয়া একটি মহিলাকে নিয়ে সত্য সত্যই এক বাড়িতে বসবাস করাটা অত্যন্ত অশোভন। অন্তত যদি অপর্ণার দু একটি ছেলেমেয়ে থাকত, তবুও না হয় কতকটা সম্ভব হত কিছুদিনের জন্যে।

এখানে সম্ভ্রান্ত সামাজিক ভদ্রমহলে তাঁর পজিশন খারাপ হচ্ছে। দুর্নাম রটছে। এতকাল—পুরো বয়সকালটা সুনামের সঙ্গে কাটিয়ে শেষবয়সে মিথ্যে দুর্নামের বোঝা মাথায় নিতে তিনি পারবেন না।

শুধু কি এখানেই তাঁর কলঙ্ক রটবে? এই দুর্নাম সীমাবদ্ধ থাকবে এই ছোট্ট সহরটায়?

কোনমতেই তা সম্ভব হবে না। তাঁর ভাই, ভাইয়ের

বৌ জানতে পারবে। বোনেরা। তাদের স্বামীরাও। কলকাতার আত্মীয় স্বজন মহলেও রটবে একথা।

ছি ছি! কী লজ্জার ব্যাপারই না হবে তখন!

যে শ্রদ্ধা ভক্তির চোখে এতকাল তারা তাঁকে দেখে এসেছে, যে মান সম্মান সমস্ত পরিবারের কাছে, আত্মীয়-স্বজনের কাছে তিনি পেয়ে এসেছেন, এই কথা জানা-জানি হবার পর আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

মানুষ এক ভয়ঙ্কর জীব। সত্য মিথ্যা তারা তলিয়ে বুঝতে চায় না। এতটুকু থেকে এতটা, তিল থেকে তাল, তারা সর্বদাই করে থাকে। তাদের স্বভাবই তাই। আজ তাঁর বদলে অন্য কেউ এমন কাজ করলে, তিনিও কি তাকে প্রশ্রয় দিতেন? সমর্থন করতেন এভাবে একটি অনাত্মীয়া যুবতীকে নিয়ে একটা বাড়ীতে বাস করা? নিজেও যেখানে তিনি অকৃতদার পুরুষ।

এভাবে আর চলবে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। মিথ্যে কলঙ্কের বোঝাটা এত বয়সে বইতে তিনি পারবেন না। সে ক্ষমতা তাঁর নেই।

শংকর দত্ত মনে মনে ভাবতে লাগলেন, কি ভাবে অপর্ণাকে চলে যেতে বলা যায়। আচ্ছা মুশকিলেই পড়া গেছে যাহোক!

পরের দিন জলপাইগুড়িতে, দিল্লীতে চিঠি দিলেন আবার। ভগ্নীপোত দুটিকে অনুনয় করে লিখলেন, অন্তত দিনকতকের জন্যে বোনেদের নিয়ে যেন তারা বেড়িয়ে যায়। এখন শীতকাল। আবহাওয়া অতি চমৎকার। ইত্যাদি।

দুই বোনের মধ্যে একজন এলেও কাজ হবে।

লজ্জায় অপর্ণা পালাতে পথ পাবে না।

যতই মুখে মুখে জোর ফলাক, শংকরবাবুকে নিরীহ ভাল মানুষ পেয়ে গ্রাহ্য না করুক, তাঁর বোনেরা তাঁর মত অত শান্তশিষ্ট ভালমানুষ নয়। অপর্ণা দুদিনেই হাড়ে হাড়ে টের পাবে। পালাতে পথ পাবে না তাদের মুখের জ্বালায়।

কী আশ্চর্য, চিঠির উত্তর দুটো ঠিক একদিনে, এক-সঙ্গেই এলো!

আরো আশ্চর্য, দুটোই পোষ্টকার্ডে লেখা হয়েছে—

আর দুটো চিঠিই অপর্ণা হাতে করে তাঁর হাতে এনে দিল। গলায় সহানুভূতি ঢেলে নিজে থেকেই বলল, ওঁদের আসতে লিখেছিলেন বুঝি? কেউ আসতে পারবেন না জানিয়েছেন। অসুখ-বিসুখ, পরীক্ষা। সত্যিই তো, ছেলেপুলে নিয়ে সংসার ওঁদের, চট্ করে কি আর এখানে ওখানে আসা সম্ভব? বাচ্চাদের ঠাণ্ডালাগার ভয়ও তো আছে! শীতকাল।

শংকরবাবুর ব্রহ্মরন্ধ্র জ্বলে গেল। একি অন্যায়! তাঁর চিঠি, হলোই বা পোষ্টকার্ডে লেখা, অপর্ণা কোন হিসেবে পড়ে? একী অত্যাচার? না হয় দুবেলা রেঁধেই দিচ্ছে, কিন্তু তাঁর বাড়িতে আছে বলেই তো?

রাগের চোটে প্রায় বলতেই যাচ্ছিলেন, আপনি পরের চিঠি পড়লেন কেন?

কিন্তু তার আগেই অপর্ণা মুচকি হেসে সোজা তাকাল তাঁর রাগে লালহওয়া মুখের দিকে। আপনি ভারী বোকা কিন্তু। ওভাবে লিখলে কি আর কেউ আসে? আমি যা বলি, লিখুন, দেখবেন তিন দিনের মধ্যে আপনার ভাই, তাঁর স্ত্রী, বোনেরা, তাঁদের স্বামীরা সবাই মিলে লাঠি সোটা নিয়ে হাজির হয়েছে। লিখুন, জীবনবাবুর সেই বিধবা ছেলের বৌটিকে কোনমতেই বাড়ি থেকে তাড়াতে পারছি না। তোমরা এসে ওকে তাড়াও। না হলে—

খিল খিল করে একেবারে ছেলেমানুষের মত হেসে ফেলল অপর্ণা। আর হেসে ফেলেই অপ্রস্তুত হয়ে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ঘর ছেড়ে প্রায় এক ছুটেই পালিয়ে গেল ভিতরের দিকে।

আর শংকরবাবু!

চিঠি দুখানা পড়ে প্রায় মাথায় হাত দিয়েই বসে রইলেন স্থাণুর মত।

তিনি পারবেন না। এবার অপর্ণাই তাঁকে বাড়িছাড়া করবে।

পরের দিন থেকে যতদূর সম্ভব নিস্পৃহ উদাসীন ভাবে শংকরবাবু এড়িয়ে চলতে লাগলেন অপর্ণাকে। কথা বলার দরকার এমনিতেই বড় একটা হয়না। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যে দু একটা কথা বলতেন, সেটাও বন্ধ করে দিলেন। মংলী অথবা তার ছেলেটাকে মধ্যস্থ করেই অপর্ণাও তার বক্তব্য জানাতে সুরু করল অগত্যা নিরুপায় হয়ে।

গত বছর যখন চেঞ্জে এসেছিলেন, এখানকার স্থানীয় অথবা কিছুকালের চেঞ্জাররা তাকে খুশী মনেই গ্রহণ করেছিলেন। চেনা জানা বাড়িতে তাঁর সাদর আমন্ত্রণ ছিল। হরেকৃষ্ণ বিশ্বনাথ রুদ্রনাথ সরোজবাবু শুধু এরাও নন, এঁদের স্ত্রী কন্যা বোনেরাও বেশ সহজ ভাবে তাঁর সঙ্গে কথা বলতো। গল্প করতো। কোথাও বেড়াতে যাবার সময়, পিকনিকে যাবার সময়, তাঁর সঙ্গ অপরিহার্য ছিল ওদের কাছে।

এবারে আসার পরও কিছুদিন এ অন্তরঙ্গতা ছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে শংকরবাবু বুঝতে পারছিলেন, এঁরা যেন তাঁকে এড়িয়ে চলছেন। সে সৌহার্দ্য, সেই আন্তরিকার উত্তাপ তিনি আর আগেকার মত পাচ্ছেন না। একটা অদৃশ্য প্রাচীর তাঁর ও ওঁদের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। সমাজে বাস করতে গেলে, পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে গেলে কতকগুলো অলিখিত আইন মেনে চলতেই হয়। তিনি তা করেননি। অথবা করতে চেয়েও, পেরে ওঠেননি। অপরাধ তাঁর। একমাত্র অপর্ণার জন্যে তিনি একে একে সব কিছুই হারাতে বসেছেন। সংসার, সমাজ, সুনাম সব কিছু।

প্রত্যেক বছরের মত হঠাৎ কিছুদিন পরে সবাই দল বেঁধে পিকনিকে গেলেন। এখানকার বিখ্যাত পাহাড়ি ঝর্ণার ধারে সমস্ত দিন কাটিয়ে সন্ধ্যাবেলা ফিরে এলেন।

শংকর বাবুকে এবার কেউ ডাকলেন না সঙ্গে যাবার জন্যে।

পরের সপ্তাহেই আবার মায়াদেবীর মন্দিরে, আরেকটা পাহাড়ের চূড়ায় দল বেঁধে গেলেন সবাই। বেড়াতে।

এবারও শংকরবাবুর ডাক পড়ল না।

সব বুঝতে পারলেন শংকর বাবু।

নিঃসম্পর্কীয়া যুবতী স্ত্রীলোক নিয়ে যে অকৃতদার পুরুষ একটা বাড়িতে বাস করে, সে সমাজচ্যুত, অধঃপতিত ছাড়া আর কি?

দ্বিধা, সংশয়, দয়ামায়া, করুণা সব কিছু বিসর্জন দিয়ে মনকে প্রস্তুত করলেন শংকরবাবু সমস্ত দিন ধরে। বিকেলে অপর্ণা চা দিতে এলে সহজ ভাবেই প্রশ্ন করলেন, আপনি কবে যাচ্ছেন?

কোথায়? কার কাছে?

অপর্ণার বিস্মিত বিপন্ন কণ্ঠস্বর ওর হৃদয় স্পর্শ করল। কিন্তু অভিভূত হলেন না। চায়ের কাপটা তুলে ধরলেন মুখের কাছে। কেন আপনার আত্মীয় স্বজন? ছেলে-মেয়ে? সবাইতো আছেন।

আপনি তো এতদিন আছেন। বাবা মারা গেছেন, সেও ছমাস হতে চলল। কিন্তু দেখছেন তো, কেউ একখানা চিঠি লিখেও খোঁজ নেয়না। কার ঘাড়ে পড়তে যাব জোর করে? আর সবাইকে তো চিনিওনা ভাল করে।

আপনি তাদের কাছে চিঠি লিখুন। আপনার অবস্থার কথা খুলে লিখুন। শংকরবাবুর কণ্ঠস্বর অবিচল।

লিখেছি। কেউ জবাব দেয়নি। আর যারা জবাব দিয়েছে—যাকগে। সেকথা আপনার শুনে কাজ নেই। আচ্ছা, আপনাকে আমি আমার ঘরটা কালই ছেড়ে দেব। কাঠ ঘুঁটে থাকে যে ঘরটায়, ওটাকে পরিষ্কার করে, ওখানেই না হয় থাকব। ও ঘরের দরুণ গোটা কুড়ি টাকা আমি মাসে মাসে আপনাকে ভাড়া দেব। কি বলেন? তাহলে—

শুনুন। শংকরবাবুর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর কঠিন হল। আপনি ছেলে মানুষ নন। আপনার বোঝা উচিত, এভাবে আমার বাড়িতে আপনার থাকাটা উচিত হচ্ছে না। আপনি আমায় ভাড়া দেবেন, আপনাকে রাঁধুনী হিসেবে, আমায় রান্না করে দেন বলে মাইনে দেব, এসব ছেলেমানুষী কথা এখন রাখুন। এখানকার ভদ্রলোকেরা নানা রকম কথা বলছেন আপনার আমার বাড়িতে থাকা নিয়ে। না হলে আমার আর বলবার দরকারটা কি, বলুন?

আমি এখানে আছি বলেকি আপনার খুব বেশী রকম অসুবিধা হচ্ছে?

অপর্ণার শাণিত কণ্ঠস্বরে বিচলিত হলেন শংকরবাবু। তবু শান্ত ভাবে জবাব দিলেন, আপনি বিশ্বাস করুন, সুবিধে ছাড়া অসুবিধে আমার মোটেই হচ্ছেনা। জীবনে আমি এত সুখের, আদর যত্নের মুখ দেখিনি। আপনি আপনার খরচ পত্র, পাই পয়সা টুকু পর্যন্ত হিসেব করে দিয়ে যাচ্ছেন, তাও মুখ বুঁজে নিয়ে যাচ্ছি, পাছে

আপনার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে, সেই জন্যে। বিশ্বাস করুন, পাঁচজনের কথায়, আপনার ভালর জন্যে, মঙ্গলের জন্যেই আপনাকে চলে যেতে বলছি।

পাঁচজনের কথায় থাকেন কেন আপনি? অপর্ণা রেগে উঠল।

পাঁচজনের কথায় থাকা একে বলেনা। সব কিছুর মধ্যেই শালীনতা ভদ্রতা সভ্যতা আছে। আমি আপনার কেউ নই, বাধাটা এখানে। আপনি এখানে থাকলে শুধু এখানকার লোকেরাই নয়, আমার ভাই, বোনেরা তারাও যদি জানতে পারে, খুব দুঃখ পাবে। হয়তো কোনদিনও এখানে আসবে না।

তাই বলুন! অপর্ণার মুখের একটি রেখাও কাঁপলনা। আপনার ব্যথাটা কোথায়, এতক্ষণে বুঝেছি। এতকাল ধরতে গেলে সমস্ত জীবনটাই তো ওদের ভালর জন্যে খরচ করলেন। এখনও আপনার ওদের চিন্তা? ভাল! আচ্ছা একটা কাজ করুন না। আপনার পাঁচজন আছে। তাদের ভাবনা ভাবতে হচ্ছে। আমারতো আপনার বলে কেউ নেই। আমি আর ভয় করব কাকে? বাবা বাড়ি বিক্রির টাকা কড়ি সব আমায় দিয়ে গেছেন। বাবার নাতি নাতনিদের রাগ আমার'পরে সেজন্যে আরো বেশী। যে দামে আপনি বাড়িটা কিনেছেন, আমাকে সেই দামেই বিক্রি করে দিন না আবার? বাইরের ঘর দুটো ভাড়া নিন আপনি। পেইং গেষ্ট হিসেবে আমার বাড়িতে আপনি থাকবেন, খাবেন, বেড়াবেন। লোকে যা বলবার, আমাকেই বলবে। তখন বাড়িটাতো আপনার থাকবে না। আমার বাড়ি হবে। আমি যাকে খুশী তাকে রাখব, ভাড়া দেব, কারু কিছু বলবার থাকবে না। বিধবা মানুষ, যা দেবেন, একটা পেট কোনমতে চলে যাবে। কেমন? রাজী তো?

নিজেকে আর কোন মতেই সংযত রাখা গেল না।

রাগের চোটে সবেগে চেয়ারটা ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন শংকরবাবু। আপনি কি তামাসা করছেন? আমি কি আপনার পরিহাসের পাত্র? বাড়ি কিনেছি কি আবার আপনাকে বিক্রি করব বলে? আর বিক্রিও যদি করি, আপনার বাড়িতে আবার আমি বাস করব, একথা আপনি স্বপ্নেও ভাবেন না। যথেষ্ট আক্কেল আমার এই ক'মাসেই হয়েছে। সমস্ত জীবন কষ্ট করেছি। ভেবেছিলাম শেষ বয়সটা একটু শান্তিতে কাটাব। কিন্তু আমার কপাল তো? আর কত হবে! আপনার জন্যে অনেক অবান্তর কথা আমায় শুনতে হচ্ছে। দয়া করে আপনি আমাকে রেহাই দিন। আপনি না গেলে, আমাকেই এ বাড়ি ছেড়ে যেখানে হোক চলে যেতে হবে।

এক নিঃশ্বাসে কথা কটা কোন মতে বলে ফেলে দ্রুত-বেগে ঘর ছেড়ে একেবারে রাস্তায় নেমে এলেন শংকর বাবু। ধাক্কা লেগে চেয়ারটা যে একটা বিশ্রী কর্কশ আওয়াজ করল, কানেও শুনলেন না। আর অপর্ণার মুখের রূপান্তর বা ভাবান্তর—কোন দিকেই দৃক্‌পাত করলেন না।

হাঁটতে হাঁটতে এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে যখন পা ব্যথা হয়ে এলো, তিরতিরে জলের নদীটার কাছে এসে একখানা পাথরের উপর বসে পড়ে হঠাৎ রক্ত উঠে যাওয়া মাথাটা প্রাণপণে দুটো হাত দিয়ে চেপে ধরলেন। চার-দিকে অন্ধকার। শীতের রাত বড় তাড়াতাড়ি আসে। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসটা গায়ে যেন তীর বেঁধাচ্ছে। মাত্রা ছাড়ানো উত্তেজনায় গায়ের গরম জামাও পরা হয়নি। চাদরও আনা হয়নি। সমস্ত শরীরটা ঠাণ্ডায় যেন হিম হয়ে আসছে!

অন্তত মাথাটা যে ঠাণ্ডা হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। নিজের ব্যবহারের কথা মনে পড়তেই লজ্জায় সঙ্কোচে যেন মরমে মরে গেলেন শংকরবাবু!

ছি ছি ছিঃ একটা অসহায় স্ত্রীলোককে কী নিষ্ঠুর ভাবেই না অপমান করে এলেন তিনি! কী করে—কেমন করে পারলেন? গ্যাষ্ট্রিক ট্রাবলে গত বছর যখন মর মর হয়েছিলেন, ভাইবোন সবাইকে নিজের অবস্থা জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন, কই কেউ তো সংসার ছেড়ে, স্বার্থত্যাগ করে সেই নিদারুণ অসময়ে তাঁর কাছে ছুটে আসেনি? বরং মামাতো ভাইটা ছিল। বিয়ে করেননি বলে গালাগাল দিয়ে নিজেই জোরজার করে জীবনবাবুর কাছে এই অপর্ণার কাছেই পাঠিয়েছিল। সুদীর্ঘ তিনমাস ধরে কী সেবাটাই না করেছে অপর্ণা? তখন তো ওদের বাড়িতে থাকতে তাঁর কোন লজ্জা সঙ্কোচ বোধ হয়নি। খরচের টাকা দিতেন, সেই জন্যে? না, সে জন্যেও নয়।

জীবন বাবু বর্তমান ছিলেন সেই কারণেই। আর জীবন-বাবু? তাঁর অমায়িক অতি সহজ ব্যবহার কোনদিনই কি ভুলতে পারবেন তিনি? নিজের ছেলের মতই কি তিনি যত্ন নিতেন না শংকরবাবুর? দেখাশোনা করতেন না?

খরচের টাকাটা নিতেও কত কুণ্ঠিত হতেন তিনি!

সেই স্নেহময় পুরুষটি যদি আজ বেঁচে থাকতেন!

তাহলে এত জটিলতার সৃষ্টি হতনা। নির্বিঘ্নে নিশ্চিন্ত মনে অপর্ণা যেমন আছে, তেমনই থাকতে পারত। জীবন বাবুর কাছে তিনি তো সবই শুনেছেন। লুকিয়ে তাঁর বড় ছেলে অত্যন্ত গরীবের মেয়েটিকে বিয়ে করেছিল বলে আগের পক্ষের বড় বড় ছেলে মেয়েরা বাবার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্কই উঠিয়ে দিয়েছিল। এমন কি সে মারা যাবার পর অপর্ণা যখন তাঁর কাছে এসে দাঁড়াল আশ্রয়হীন হয়ে, তিনি আশ্রয় দেওয়াতেও ওরা ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ অসন্তুষ্ট হয়েছিল। তাদের মনোভাবের কোন পরিবর্তনই হয়নি আজ পর্যন্ত।

আর সত্যই তো! যাবার জায়গা, দাঁড়াবার জায়গা থাকলে কি অপর্ণা এ ভাবে আত্মসম্মান খুইয়ে এখানে পড়ে থাকত!

তিনি পুরুষ মানুষ। যেখানে সেখানে যেতে পারেন। থাকতে পারেন। কিন্তু অপর্ণার মত ভরা বয়সের সুন্দরী যুবতীর পক্ষে সেটা কি সম্ভব? কার কাছে যাবে ও? কোথায় দাঁড়াবে? কে ওকে খুশী হয়ে আশ্রয় দেবে?

চোরের মত ভীত সন্ত্রস্ত ভাবে বাড়ি ঢুকলেন শংকর-বাবু। দূর থেকে একবার কর্মরতা অপর্ণাকে দেখলেন। না তেমনই হাসি খুশী। মংলীর সঙ্গে গল্প করছে। নানান কাজের কথা হচ্ছে তার সঙ্গে।

বিকেল বেলায় শংকরবাবুর দেওয়া অপমান অথবা আঘাত কোন কিছুর চিহ্নই নেই তার মুখে চোখে। কথাবার্তায়।

অন্যদিনের মত সহজ ভাবেই অপর্ণা ভাত বেড়ে নিয়ে এলো। দরজার কাছে দাঁড়াল। মংলী যেমন রোজ থাকে, আজও তেমনই এলো গেলো। শংকরবাবু লজ্জায় মাথা তুলতে পারলেন না। কোন মতে খাওয়া শেষ হতেই দরজায় খিল তুলে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লেন।

ক্রমে ক্রমে সমস্ত বাড়িটা নিস্তব্ধ হল। অপর্ণা তার নিজের ঘরে ঢুকল। মংলী তার ছেলেকে নিয়ে সদর দরজা বন্ধ করল। বাসন মাজল। এটা ওটা কাজ সারল। তারপর এক সময় তাদের সাড়া শব্দও আর শোনা গেলনা।

দু চোখে ঘুম এলোনা শংকরবাবুর। একটা অস্বস্তিকর তীক্ষ্ণ অনুভূতির কাঁটা খচ খচ করতে লাগল মনের মধ্যে। উঠলেন বসলেন। জল খেলেন। বন্ধ জানলার ফাঁক দিয়ে তাকালেন বাইরের দিকে।

তারপর ঘড়িতে তিনটে বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে পড়লেন। এক ঘরেই তাঁর সমস্ত জিনিষ পত্র। সুটকেসটা সন্তর্পণে টেনে বার করে জামাকাপড় ভরলেন অপটু হাতে। আলো জ্বালতে, সাড়া শব্দ করতেও ভয় পাচ্ছিলেন।

দিনের বেলার ট্রেনটাই সব চেয়ে সুবিধা জনক। শেষ রাত্রের ট্রেনে কলকাতায় কেউ যায় না। বিশেষ করে এই শীতের প্রচণ্ড ঠাণ্ডা-পড়া শেষরাত্রের এই ট্রেনটাকে সবাই এড়িয়ে চলে। এটা অসময়ের ট্রেন।

কিন্তু দিনের বেলা পর্যন্ত থাকতে আর সাহস হচ্ছে না। এই ঘটনার পর। ওখানে গিয়েই তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করে অপর্ণাকে একখানা চিঠি দেবেন। হঠাৎ কাজ পড়ে গেছে। তিনি এখন ওখানে কোনমতেই থাকতে পারবেন না। ব্যবসার জরুরী কাজে কলকাতাতেই থাকতে হবে। যতদিন না তিনি আবার ওখানে যাচ্ছেন, অপর্ণা যেন ততদিন অনুগ্রহ করে বাড়িটা দেখাশোনা করে।

স্টেশন খুব কাছে নয়। বলা থাকলে রিক্সাওয়ালারা ঠিক হাজির থাকত। সুটকেশটা হাতে করে সর্বাঙ্গে গরম চাদর জড়িয়ে নিঃশব্দে গেট বন্ধ করে রাস্তায় নেমে পড়লেন শংকরবাবু। অনেকটা হাঁটতে হবে।

শেষবারের মত একবার অপর্ণাকে দেখতে পেলে খুব ভাল লাগত। হঠাৎ একথা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গে লজ্জিত হলেন শংকর দত্ত। দরজা জানলা বন্ধ করে ও হয়তো গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে আছে। আর জেগে থাকলেই বা কি হত? মুখদেখানোর মত অবস্থা তাঁর আছে কি অপর্ণার কাছে?

কিন্তু যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না কেন?

সেই স্নেহমমতাহীন ইটকাঠের বাড়িটায় আবার গিয়ে ঢুকতে হবে, একথা ভাবতেই যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। সেই উড়ে ঠাকুরের রান্না। ঝিয়ের ঝগড়া। সমস্ত দিন কাজের শেষে সেই নিঃসঙ্গ একক রাত্রি যাপন। একটা কথা বলবার, দু'দণ্ড গল্প করার মানুষ কোথায় সেখানে?

সুতীব্র বেদনায় মনটা আলোড়িত হয়ে উঠল। চলার গতি দ্রুত করলেন। তরল অন্ধকার গলে গলে পড়ছে এখনো। ঝিঁঝিঁর ডাক, পাখির পাখা ঝাপটানোর শব্দ। গাছগুলির নিঃশব্দ উপস্থিতি। এদিক ওদিকের বাড়ি-গুলোর সব দরজা জানালা বন্ধ। এতটুকু সাড়াশব্দ কোথাও নেই। ঠিক যেন তাঁর শূন্য হৃদয়ের নিঃশব্দ হাহাকারের মত সমস্ত প্রকৃতিটা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে।

গেট ঠেলে গোলাপী কাঁকর ছড়ানো ষ্টেশনের কম্পাউণ্ডে ঢুকলেন। টিনের সেডের নীচে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন। এককোণে কম্বল মুড়ি দেওয়া গোটা দুই কুলি আপাদমস্তক ঢাকা দিয়ে ঘুমোচ্ছে। মিটমিটে আলোটা জ্বলছে, একাকী সজাগ প্রহরীর মত। এখানেও আর কেউ জেগে নেই। ট্রেনের প্রতীক্ষায় বসে নেই এই অত্যন্ত অসময়ে।

হাতের সুটকেশটা একপাশে রাখতে কিন্তু ভয়ঙ্কর ভাবে চমকে উঠলেন।

বারান্দাটার একেবারে কোণের দিকে অন্ধকারে হেলান দিয়ে বসে আছে আর একটা অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি। আপাদমস্তক গায়ের কাপড়ে জড়ানো মূর্তিটি যে জাগ্রত, সেটাও বুঝতে পারলেন। তিনি ছাড়া এখানে অপর একটি জাগ্রত সত্তার অস্তিত্ব একান্ত অভাবনীয়, অকল্পনীয় বটে। শীতকালে এই গভীর রাত্রে অত্যন্ত অসুবিধাজনক ট্রেনে এখানকার কোন লোকই কলকাতায় যায় না।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। হঠাৎ কী মনে হল, হৃৎপিণ্ডটা ধক্ ধক্ করে উঠল। সমস্ত শরীর অজানা আতঙ্কে অবশ হয়ে এলো। এগিয়ে গিয়ে মুখো-মুখি দাঁড়িয়ে অস্পষ্ট জড়িত গলায় প্রশ্ন করলেন, কে আপনি?

ছায়ামূর্তি উত্তর দিল না। অনড় অটল হয়ে বসে রইল।

এত রাত্রে আপনি এখানে কেন? জবাব দিন।

বিদ্যুদ্‌বেগে উঠে দাঁড়াল অপর্ণা। মাথার চাদর খসে পড়ল। দুচোখের কোণে শুকিয়ে যাওয়া জলের ধারায় উপর আগুন ঝলসে উঠল। তার জবাবদিহি আপনার কাছে করতে হবে নাকি? এই ষ্টেশনটা কি আপনার কেনা বাড়ি নাকি? এখান থেকেও তাড়াতে চান নাকি আমাকে?

শেষরাত্রের মরাচাঁদের জ্যোৎস্নায় সেই আগুনভরা চোখ থেকে, আগুনরাঙা মুখের উপর থেকে কোন-মতেই নিজের অবাধ্য অসংযত চোখদুটোকে ফেরাতে পারলেন না শংকরবাবু। মরুভূমির মত পিছনে ফেলে আসা জীবনটা কেমন যেন গলে গলে মিলিয়ে যেতে লাগল। একটা অদ্ভুত অননুভূত আর্তি তাঁর সমস্ত হৃদয়কে আচ্ছন্ন করল। তিনি বুঝতে পারলেন, অদৃশ্য একটা ঝড় উঠেছে। তাঁর শরীর মন দেহ কাঁপছে। তাঁর সমস্ত জীবনটাই ওই নারীমূর্তির চোখের আগুনে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

কোনমতে প্রশ্ন করলেন, আপনিও কি কলকাতায় যাচ্ছেন?

তা দিয়ে আপনার কি দরকার? বাড়ি তো ছেড়েই দিয়েছি।

কার কাছে? সেখানে কে আছে আপনার?

যেখানে হোক। আপনার জানবার দরকার নেই।

কিন্তু কোথায় উঠবেন আপনি? কলকাতায় কে আছে আপনার?

সে ভাবনা আপনার নয়। আমার। আমার জন্যে আপনার মাথা না ঘামালেও চলবে। কিন্তু আপনি বাড়িতে কাউকে না বলে কেন চলে এসেছেন এই রাত্রে? সুটকেশ নিয়ে?

কলকাতায় চলে যাব বলে।

বেশ তাই চলে যান।

হ্যাঁ যাব। কিন্তু আপনি বাড়ি ফিরে যান।

আবার ঐ বাড়ি ফিরে যাব? মুখে তো যথেষ্ট অপমানই করেছেন, এবার বুঝি গলাধাকা দিয়ে তাড়ানোর ইচ্ছে হয়েছে?

অপর্ণার ঠোঁট কাঁপতে লাগল। গলা কাঁপতে লাগল। কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো অভিমানে। বেদনায়।

মাথা নীচু করলেন শংকরবাবু। কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধ

থেকে আস্তে আস্তে বললেন, আপনি বাড়ি ফিরে যান। কলকাতায় আমি চলে যাচ্ছি। আমি এখানে আর আসব না।

বুঝতে পেরেছি। অপর্ণার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সেইজন্যেই বুঝি আপনি চোরের মত পালিয়ে যাচ্ছিলেন? কিন্তু আমি আপনার কে? কেউ নই। আমার জন্যে এতটা স্বার্থত্যাগ আপনার না করলেও চলবে।

শংকরবাবু বিচলিত হলেন। হাতজোড় করছি। ক্ষমা চাইছি। ফিরে চলুন।

না। তা আর হয়না। বাড়ি থেকে যখন বেরিয়ে এসেছি, ফিরে আর যাব না। জেদী, একগুঁয়ে মেয়ের মত ঘাড় নাড়ল অপর্ণা। আপনি ফিরে চলে যান। এভাবে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকবেন না। কেউ দেখতে পেলে আপনার চরিত্রের দুর্নাম হবে।

বেশ, তবে আমিও আপনার সঙ্গে যাব। শংকরবাবুর গলায় কঠিন সঙ্কল্প ফুটে উঠল। এভাবে আপনাকে চলে যেতে আমি দেব না। আপনি কলকাতায় যেতে চান, সেখানেই চলুন। আমি আপনার সঙ্গে যাবই। আপনি কোনমতেই আমাকে তাড়াতে পারবেন না।

এবার অপর্ণা হতবুদ্ধি, বিস্মিত বিহ্বলের মত প্রশ্ন করল, আমি—আমিতো কোথায় যাব কিছুই ঠিক করিনি। আপনি আমার সঙ্গে কোথায় যাবেন?

ভালই হল। আপনাকে অন্য কোথাও যেতে হবে না। আমার বাড়িটা ওখানেও খালি পড়ে আছে। ওখানে উঠলেই হবে। শংকরবাবু অপর্ণার পাশে পড়েথাকা ছোট্ট ব্যাগটা হাতে তুলে নিলেন।

একী করছেন! আমার ব্যাগ দিন। আমি ফিরেই চলে যাচ্ছি। অপর্ণা ব্যাকুল হল। উদ্বেল হল। হাত বাড়িয়ে ব্যাগটা চেপে ধরল।

সেই হাতের উপর শংকরবাবু নিজের হাত রাখলেন। এক-গুঁয়ে জেদীর মত ঘাড় নাড়লেন। না তা আর হয় না। দুজনে দুজনকে লুকিয়ে বাড়ি থেকে যখন পালিয়ে এসেছি, ফিরিতো এক সঙ্গেই ফিরব। তার আগে তোমাকে কলকাতায় একবার যেতেই হবে অপর্ণা। সেখানে গিয়ে লোক পাঠাব বাড়িটা সারানোর জন্যে। মামাতো ভাইটা ভারী কাজের ছেলে। তুমি তাকে চেন। সে ভারী খুশী হবে তোমাকে দেখে। হাঙ্গামা যা কিছু তাকেই তো পোয়াতে হবে। তারপর কটা দিন কেটে গেলে দুজনে একেবারে একসঙ্গে এখানে আসব। এসো আমার সঙ্গে। এখনি ট্রেন আসবে। অসময়ের ট্রেন, তা হোক, জার্নিটা ভালই হবে আশা করি।

এবারে আর অপর্ণা হাত ছাড়াবার কোন চেষ্টাই করল না। চোখের জল মোছবারও নয়।

হ'ল কি!

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

হঠাৎ নরক হয়ে উঠ্‌লো কি দুনিয়া?—
ভালো নাহি লাগে আর দেখিয়া ও শুনিয়া!
ভেদ নেই কালো-শাদা,
ঘোড়াগুলো হ'ল গাধা,—
ধরমের বুলি ঝাড়ে গাঁটকাটা-খুনিয়া!
আহ্লাদে আটখানা যতো কালোবাজারী,
জহ্লাদ যা'রা—তা'রা পঞ্চাশ হাজারী।
যতো ছিল ন্যাড়াবুনে
হয়ে সবে কীর্তুনে
চোখের জলের ফোঁটা নিতে চায় গুণিয়া!
স্নেহমায়া, প্রেমপ্রীতি কোথা গেল চলিয়া?—
গেল কোথা সরলতা—'এই আসি' বলিয়া?
হায় সুন্দর মোর,
দরকার নেই তোর!—
কবিদল কল্পনাজাল মরে বুনিয়া।

ধরাখানা ভরা আজ দয়াহীন কসাইয়ে,
কলির সন্ধ্যা বুঝি ঘনায়েছে মশাই এ!
পিকের বদলে কাক
কান দুটো করে থাঁক্,
রসালের ঠাঁই দেখি নারিকেল ঝুনিয়া।
মাঝে মাঝে মনে হয় গেছি বুঝি ক্ষেপিয়া,
কে দিল ধরার গালে চুণকালি লেপিয়া!
দোষ ধরি বলো কার?—
খুঁত বেছে গাঁ উজাড়!
দেখে শুনে একদম হয়ে আছি কুনিয়া!
তাড়াতাড়ি নেরে মন, পাততাড়ি গুটায়ে
কি হবে এ গো-ভাগাড়ে পারিজাত ফুটায়ে!
শ্মশানে কেন গো আর
সখ বীণ্ বাজাবার?—
কিবা ফল অকারণ প্যাজা তুলো ধুনিয়া!

প্যারডি ঃ পাশ্চাত্যসাহিত্য ও বাংলাসাহিত্য

শ্রীমতী রেখা সিংহ

প্যারডি অর্থে কোন বিশিষ্ট বা বিখ্যাত রচনার অনুকরণে রচিত হাস্যোদ্রেককারী রচনাকে বোঝায়। জনসন প্যারডি কথাটির সংজ্ঞা এই ভাবে দিয়েছেন—

"Parody is a kind of writing in which the words of an author or his thoughts are taken and by a slight change adopted to some new purpose."

জনসন কর্তৃক উক্ত 'নূতন উদ্দেশ্যটি' যে 'উপহাস' তা' সহজেই অনুমিত হয়। বস্তুতঃ কোন বিষয় বা ব্যক্তিকে ব্যঙ্গ করবার জন্য প্যারডি একটি উত্তম পন্থা সন্দেহ নাই। প্যারডির আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে আমরা যদি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই, দেখতে পাবো—হাস্যরস-সমৃদ্ধ রচনার মতই এ প্রাচীন। প্যারডি অনুকরণের একটি বিভাগ; তবে অনুকরণ মাত্রই প্যারডি হয় না। সেটি অবশ্যই কৌতুকপ্রদ হওয়া প্রয়োজন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজী-সাহিত্য প্রধানতঃ অনুকৃতি-প্রবণ হয়ে উঠেছিল। তখন হোরেস, জুভেনাল আদি অগষ্টান কবিগণ ছিলেন ইংরেজী সাহিত্যিক ও কবিগণের আদর্শ। পোপের Rape of the lock হোরেসের অনুকরণে রচিত। এ যদিও কৌতুকরস সমৃদ্ধ রচনা, তথাপি এ প্যারডি নয়। আবার হোরেস টুইস (Horacetwiss) রচিত Fashion কবিতাটি যদি ধরা যায় (এটি মিল্টনের L'Allegro কবিতাটির অনুকরণে রচিত), তবে একে প্যারডি বলতে হয়। প্যারডির কয়েকটি বিশেষত্ব :—

(১) প্যারডির প্রধান লক্ষ্য 'ভেঙ্‌চানো' বলেই একে শিল্পপর্যায়ে স্থান দেওয়া চলে না। প্যারডিকার যে মূল-কবির গাম্ভীর্যপূর্ণ সুরকে লক্ষ্য করে একবার হেসে নেন না, একথা জোর করে বলা যায় না। তবে অনুকারী কবির সে হাস্য যখন ধরতে পারা যায় না, সেই স্থলেই প্যারডিকে সার্থক বলা যেতে পারে।

(২) "ফ্রেডারিক পোলক" তাঁর Leading Cases-এর ভূমিকায় বলেছেন—"Parody does not to my mind imply any want of respect for the original. Rather I would say that where the original has any real worth and distinction no parodist can succeed who has not a fairly adequet sense of its distinctive merits"—Preface to Sir Frederick Pollock's Leading Cases. বস্তুতঃ প্যারডিকারকে যথাসাধ্য নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে প্যারডিরচনায় হস্তক্ষেপ করা উচিত। প্যারডির একটি প্রধান উদ্দেশ্য হল ব্যঙ্গের দ্বারা মূলের সমালোচনা; যদি অবশ্য মূল কবির রচনা ব্যঙ্গের লক্ষ্য হয়। সে ক্ষেত্রে সে সমালোচনা নির্বেদ হয়ে করতে না পারলে প্যারডি ব্যর্থ হয়।

(৩) লালিকা রচনার জন্যও উৎকৃষ্ট কল্পনাশক্তি ও ভাষার উপর বিশেষ অধিকার থাকা প্রয়োজন।

(৪) প্যারডিকে স্যাটায়ার বা ব্যঙ্গের অন্তর্গত বলতে পারা যায়।

পাশ্চাত্যসাহিত্যে প্যারডির ইতিহাস—সাহিত্যে প্যারডির স্থান নিম্নশ্রেণী ভুক্ত হলেও বহু অতীতকাল থেকেই মানুষ প্যারডি রচনা করে আসছে। জীবন-রসে রসিক গ্রীকজাতির স্বাভাবিক কৌতুকপ্রিয়তা ও বিবিধ-গূঢ় রাজনৈতিক বিষয়ে সমালোচনার প্রবৃত্তির ফলেই প্যারডিরচনার সূত্রপাত গ্রীক সাহিত্যে ঘটেছিল। Hegemon of Thasos এর লেখা প্যারডি প্রাচীনতম প্যারডিগুলির অন্যতম হিসেবে ধরা যেতে পারে। অনেকের মতে হোমারের "Batracho-myomachia বা

ব্যাঙ ও ইঁদুরের যুদ্ধ" Hegemon-এর রচনা থেকেও বহু প্রাচীন। "ইস্কাইলাস" ও 'ইউরিপাইডস' এর অনুকরণে রচিত এ্যারিস্টোফেনাসের ব্যঙ্গানুকৃতিই গ্রীকসাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে ধরা হয়। রোমকসাহিত্যে পারসিয়াসের" রচনার মধ্যে কয়েকটি প্যারডি পাওয়া যায়। সেগুলি নীরোর লেখা কবিতার ব্যঙ্গানুকৃতি বলে ধরা হয়। Cervantes এর 'ডনকুইক্সোট, মধ্যযুগের রোমান্সপ্রিয়তাকে ব্যঙ্গ করে লেখা প্যারডি।

ইংরেজী সাহিত্যে মার্স্টন সেক্সপীয়রের 'ভেনাস ও এ্যাডোনের একটি ট্র্যাভেষ্টী * লিখেন। 'জন ফিলিপ' Splendid Shilling" নাম দিয়ে মিল্টনের 'প্যারাডাইস্ লষ্ট' এর অনুসরণে একটি বার্লেস্ক লেখেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংরেজীসাহিত্যে অনুকরণ বা অনুসরণের যুগ চলে। পূর্ববর্তী কবি—বিশেষতঃ প্রসিদ্ধ রোমককবি হোরেস, জুভেনাল, পারসিয়াস, ওভিদ্, ভার্জিল বা গ্রীক-নাট্যকারদের লেখা আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করে কবি বা লেখক-গণ রচনা করতে প্রবৃত্ত হতেন। এমনকি বিদ্যালয়ে পর্যন্ত এই কবিসমুদয়ের লেখার অনুকরণ ও অনুবাদ পাঠ্য বলে গণ্য হত। শিক্ষার্থীগণ উক্ত কবিগণের অনুকরণে ল্যাটিন কবিতা রচনা করতেন—

"Imitations of the best Latin-writers were expected at school and university, as well as translations. The works of Doune, Herbert, Vanghan, Cowley, Addison and Johnson contain evidence that this often led to a lifelong habit of writing Latin verse, and there can be little doubt that the concept of the different kinds of poetry owed a good deal to this practice···Imitation was a much more dignified activity than most people think it to-day"—Augustan Satire—Ian Jack—p-11.

এরপর থেকে ইংরেজীসাহিত্যে বহু উৎকৃষ্ট প্যারডি রচিত হয়েছে। প্যারডি রচনায় উচ্চশ্রেণীর কল্পনাশক্তির প্রয়োজন নাই। সুতরাং অপেক্ষাকৃত কমশক্তিসম্পন্ন লেখক বা কবিগণ সহজেই সাহিত্যের এই বিভাগটিতে হস্তক্ষেপ করবার জন্য আকৃষ্ট হতেন। এই কারণেই ভিক্টোরীয় যুগে ইংরেজীসাহিত্যে কয়েকটি সুন্দর প্যারডি পাওয়া যায়। এই সময় থেকে কবিতা ব্যতীত গদ্যেও প্যারডি রচিত হতে লাগল। গদ্যে প্যারডি লিখে প্রসিদ্ধ হয়েছেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে 'Bret Harte, "Max burbohm," "Stephen Leacock ইত্যাদি লেখকের নাম উল্লেখযোগ্য। ইংরেজীসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লালিকাকার-গণের মধ্যে "James Bogg," "Lewis Carroll," Thacke ray," "G. K. Chesterton" ইত্যাদির নাম প্রসিদ্ধ।

বাংলা-সাহিত্যে ইঙ্গপ্রভাব আগমনের পূর্বপর্যন্ত প্যারডির সংখ্যা অতি অকিঞ্চিৎকর ছিল। আজুগোঁসাই রামপ্রসাদের কয়েকটি গানের উপভোগ্য প্যারডি রচনা করেছিলেন। সেযুগে সেগুলি বহুজনকে বিমল কৌতুক প্রদান করেছিল।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্য প্রকাশিত হলে 'জগদ্বন্ধু ভদ্র' 'ছুছুন্দরীবধ' নাম দিয়ে এর একটি প্যারডি রচনা করেন। প্যারডিটি ক্ষুদ্রাকৃতি, মোটে ৭২ পংক্তিতে রচিত। কিন্তু এটি একটি উৎকৃষ্ট প্যারডি। স্বয়ং মধুসূদন দত্ত তাঁর রচিত এই প্যারডি পাঠে অত্যন্ত প্রীত হয়ে বলেছিলেন—"আমার মেঘনাদবধ একদিন হয়ত বাঙলা সাহিত্য হইতেও বিলুপ্ত হইতে পারে, কিন্তু 'ছুছুন্দরীবধ' কাব্য চিরদিন অমর হইয়া থাকিবে।"—শ্রী গৌরপদ তরঙ্গিণী—মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত ২য় সং—পৃঃ ৩৭৪।

'ছুছুন্দরী-বধ' থেকে নিম্নলিখিত কয়েকটি পংক্তি পাঠ করলে বোঝা যায়, কেবলমাত্র বিষয় বস্তুকেই ব্যঙ্গ নয়, মূলের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যও কবি কৃতিত্বের সঙ্গে রক্ষা করেছেন—

"যাও ধনি যাও চলি বসুধা-গরভে
ত্বরিত, নতুবা নাস করিবে বায়সে।
হায়রে গরাসে যথা আশী-বিষ ক্রূর
মণ্ডূকেরে; সৈংহিকের অথবা যেমতি

---

* Travesty—Trans Vestis change of garment মূল বিষয়কে বিকৃত বা হাস্যকররূপে উপস্থাপিত করাই হচ্ছে ট্র্যাভেষ্টির কাজ—প্যারডির সমতুল্য।

পৌর্ণমাসি অন্তে গ্রাসে অত্রাক্ষি সম্ভবে ;
কিংবা মিত্রবর্ণ যশ হরে মধু যথা।"

এখানে শেষ পংক্তিটি বিশেষ অর্থপূর্ণ। এটি বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনের জন্য মাইকেলের প্রতি কটাক্ষ। উৎকৃষ্ট কল্পনা শক্তি ও ভাষার উপর অধিকার যে উৎকৃষ্ট প্যারডি রচনার মূলে থাকে এটি তার একটি নিদর্শন।

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি-কোমলের একটি ব্যঙ্গ অনুকৃতি লেখেন—"মিঠে কড়া"। এর অন্তর্গত লালিকাগুলির প্রত্যেকটিতেই প্রায় রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রতি তীব্র আক্রমণ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "কড়িকোমলে"র অন্তর্ভুক্ত "মথুরায়" শীর্ষক কবিতাটির একস্থলে লিখেছিলেন—

"একবার রাধে রাধে ডাক বাঁশী মনোসাধে"

'মনোসাধে' কথাটি ব্যাকরণগত অশুদ্ধ বলে কাব্যবিশারদ মহাশয় এই অংশের প্যারডি করে লিখলেন—

"একবার রাধে রাধে ডাক বাঁশী মনোসাধে ;
শুনে ব্যাকরণ কাঁদে হেন সন্ধি শুনি নাই।
ব্যাকরণ হারায়েছে শুধু এক বাঁশী আছে
ভয় হয় কবি পাছে হারাইয়া ফেলে তাই।
এ শিঙা হারালে পর কি করিবে কবিবর
কি বাজাবে অতঃপর ভেবে দুঃখ হাসি পায়
দারুণ দৈবের দোষে পড়িলাম মথুরায়।"

তীব্র ব্যক্তিগত আক্রমণকে প্যারডির মুখাবরণ পরিয়ে কাব্য-বিশারদ মহাশয় এটি লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে উপ-হাসাস্পদ করবার জন্য তিনি রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত "মনো-সাধে" কথাটি প্যারডিতে স্থাপন করেছিলেন। কাব্য-বিশারদের ত্রুটি নাই ; তিনি বেচারী দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন না। "কড়ি ও কোমলের" কবি এত অধিক খ্যাতি অর্জন করেন নাই, যে, তাঁর ব্যাকরণ ভুলকে কাব্যবিশারদ আর্ষ প্রয়োগ বলে মেনে নেবেন। এই প্রকার ছোটখাট ভুল কালিদাস বা অন্যান্য বড় কবিদের রচনায় বহু পাওয়া যায়। সেগুলি তাঁরা ছন্দের সৌকর্য রক্ষার্থেই অবশ্য করেছিলেন। যেমন 'কুমার সম্ভবের' তৃতীয় সর্গে একটি শ্লোক রয়েছে—

"স দেবদারুদ্রুমবেদিকায়াং শার্দূলচর্মব্যবধানবত্যাম্
আসীনমাসন্নশরীরপাতস্ত্রিয়ম্বকং সংযমিনং দদর্শ।"

কুমার সম্ভব—তৃতীয় সর্গ ৪৪নং শ্লোক।

এখানে ত্র্যম্বকের স্থলে ত্রিয়ম্বক লেখা হয়েছে। কালিদাস বিখ্যাত কবি না হলে তাঁর এই প্রয়োগ আর্ষ প্রয়োগ বলে মুক্তি দেওয়া হত না অবশ্যই। কাব্যবিশারদের এই প্যারডিটি প্রকৃত উদ্দেশ্য মূল কবির সমালোচনা ; কিন্তু এ ক্ষেত্রে তিনি নিরপেক্ষ হয়ে সে সমালোচনা করতে পারেন নি। সুতরাং প্যারডিটি ব্যর্থ হয়েছে বলা যেতে পারে।

কবি গোবিন্দচন্দ্র রায়ের লেখা "কতকাল পরে বল ভারতরে" গানটির একটি প্যারডি রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'প্রজা-পতির নির্বন্ধ' গল্পটির জন্য লিখেছিলেন :—

"কতকাল বল ভারতরে রবে ডালভাত জল পথ্য করে
দেশে অন্ন জলের হল ঘোর অনটন ধর হুইস্কী সোডা
আর মুর্গী মটন...ইত্যাদি।

এই প্যারডিটির উদ্দেশ্য মূলের সমালোচনা নয়, এটির মধ্যে রয়েছে নির্মল কৌতুক রসের প্রকাশ।

বাংলাসাহিত্যে বহু সংখ্যায় সার্থক ও অসার্থক উভয় প্রকৃতির প্যারডি রচনা করে যাঁকে বহু পরিমাণে অখ্যাতির বোঝা বইতে হয়েছে, তিনি হলেন "দ্বিজেন্দ্রলাল।" মন্দ্র কাব্যে তাঁর প্রথম দুটি প্যারডি রবীন্দ্রনাথের "তোমরা ও আমরা" কবিতার ব্যঙ্গ অনুকৃতি পাওয়া যায়। তাঁর সে প্যারডি দুটি নির্মল কৌতুকরসই বিতরণ করেছিল। কেননা এতে কবিকে বা অন্যকে অন্যায় কটাক্ষ করা হয়নি। এই সম্বন্ধে একজন সমালোচক এই প্যারডিটির প্রশংসা করে বলেন "তিনি প্যারডি লিখতে আরম্ভ করিলেন ; রবীন্দ্রনাথের ছায়ার মত অনুগমন করিলেন ; সাধারণ লোকের ন্যায় তাঁহাকে অনুকরণ করিবার জন্য নহে। রবিবাবু তোমরা ও আমরা লিখিলেন। যে Eternal feminine রবীন্দ্রনাথের চক্ষে অত্যন্ত রহস্যময় বলিয়া বোধ হইয়া ছিল, তিনি তাহাকে আমাদের বিশেষ পরিচিত গৃহস্থের সাধারণ গৃহিণীরূপে দেখাইলেন। তাঁহার সহজ-নৈপুণ্য আমাদিগকে মুগ্ধ করিল।...সাধনায় যখন তাঁহার কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হইল, সম্পাদক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কি কবিতার এমন চমৎকার প্যারডি পাইয়া

মুগ্ধ হন নাই ?"—দুটি কথা বিপিনবিহারী গুপ্ত—মানসী শ্রাবণ, ১৩১৭।

বস্তুতঃ সোনার তরীর "তোমরা ও আমরা" শীর্ষক কবিতাটি চলচঞ্চল জলতরঙ্গের মত কবির মধুর কল্পনার রূপ। কবিত্বের মোহন স্পর্শে নারীর মোহনীয় মূর্তি অধিকতর মোহময় হয়ে উঠেছে। অপর পক্ষে ডি-এল রায়ের প্যারডি পূর্ণরূপে বস্তু জগতের চিত্র। প্যারডিকার মূল কবিতার গুণাগুণ সম্যক্ অবগত হলেই তবে সার্থক প্যারডি রচিত হতে পারে। এ প্যারডির মধ্যে কবি যেন নিক্তিতে ওজন করে মূল কবিতাটির বিপরীত ভাব ধারা এনেছেন। মূলে ঠিক যেখানে যে গুণের কথা বলা হয়েছে, লালিকাতে সে বিষয়ের হাস্যকর বিকৃতি রয়েছে। নীচে উভয় কবিতা থেকেই কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হল :—

রবীন্দ্রনাথ—তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও
কুলুকুলু কল নদীর স্রোতের মতো,
আমরা তীরেতে দাঁড়ায়ে চাহিয়া থাকি,
মরমে গুমরি মরিছে কামনা কত।
...কমল চরণ পড়িছে ধরণী মাঝে
কনক নূপুর রিনিকি ঝিনিকি বাজে..."

দ্বিজেন্দ্রলাল—আমরা খাটিয়া বহিয়া আনিয়া দেই
আর তোমরা বসিয়া খাও।
আমরা দুপুরে আপিসে ঘামিয়া মরি
আর তোমরা নিদ্রা যাও।
বিপদে আপদে আমরাই পড়ে লড়ি
তোমরা গহনা পত্র ও টাকা কড়ি
অমায়িক ভাবে গুছায়ে পাল্কী চড়ি'—
দ্রুত চম্পট দাও।

রবীন্দ্রনাথ নারীর মূর্তি কল্পনা করেছেন :—চিন্তাভারহীনা লঘু কলগামী স্রোতের মত। দ্বিজেন্দ্রলাল সেই চিন্তাশূন্যতাকে তাঁর প্যারডিতে যেন প্রতিকৃতি বিকৃতিকারী পরকলার উপর ফেলে তার বিকৃত প্রতিফলন এনে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন। ভাবনা-চিন্তাশূন্য বলেই গিন্নিরূপী নারী দিবানিদ্রায় মগ্ন। গিন্নির সেই সুখনিদ্রা যাতে প্রত্যহ নিয়মিত থাকতে পায়, কর্তারূপী পুরুষ তার জন্য দুপুরে অফিসে শ্রমরত। রবীন্দ্রনাথের নারী কমলচরণে নূপুরের শিঞ্জনধ্বনি তুলে যান ;—দ্বিজেন্দ্রলালের নারী টাকা পয়সা গুছিয়ে পাল্কী চড়ে চম্পট দেন। বহুদিন পরে সজনীকান্ত সম্ভবতঃ দ্বিজেন্দ্রলালের এই কবিতাটির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে লিখেছিলেন—

"হে ভগবান হেঁসেলের আশ্রয়ে
বাঘের মাসীর পালন কোরোনা আর
তাড়া খেয়ে খেয়ে হুলোরা হল্লা করে,
সুখে মেনীদের রেখোনা শয়ন ঘরে
দোহাই তোমার, বাহিরে ছাড়িয়া দাও,
বুঝুক তাহারা কাকে বলে সংসার।
গহনা-কাপড়ে স্বার্থ পরের দল
ডিঙিয়ে মোদের হইতেছে খেয়া পার।"

সজনীকান্তের ব্যঙ্গে কটুত্ব কিছু বেশী পরিমাণে রয়েছে—দ্বিজেন্দ্রলালে রয়েছে নির্মল হাস্যরস। প্যারডি রচনার মূল কৌশল দ্বিজেন্দ্রলাল খুব ভাল করেই জানতেন। এই সম্বন্ধে "ফ্রেডারিক পোলোকের" মন্তব্য পূর্বেই বলা হয়েছে। প্যারডিকে সফল করে তুলতে হলে মূলটির স্বরূপ পূর্ণরূপে জানা প্রয়োজন। উপরোক্ত ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল মূল কবিতাটির ভাব-ভঙ্গিমা সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন তাই প্যারডিটি তাঁর একটি সার্থক সৃষ্টি হয়ে উঠেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের কয়েকটি বিখ্যাত প্যারডি তাঁর কুখ্যাত 'আনন্দবিদায়' (১৩১৯) এই প্যারডি নাটকটির অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পাশ্চাত্য সাহিত্যে প্যারডি উপন্যাস দেখা গেলেও নাটকের প্যারডি নেই। গেটের বিখ্যাত উপন্যাস "Die leiden des jungen Werthers" (1774) বা "Sorrows of Werther"কে ব্যঙ্গ করে "থ্যাকারে" একটি অপূর্ব সরস লালিকা রচনা করেছিলেন সেটি নীচে দেওয়া হল—

"Werther had a love for Charlotte
Such as words could never utter ;
Would you know how first he met her ?
She was cutting bread and butter.
Charlotte was a married lady,
And a moral man was werther,
And for all the wealth of Indies,
Would do nothing for to hurt her.
So he sighed and pened and ogled
And his passions boiled and bubbled
Till he blew his silly brains out.

*

সীতার পাতাল প্রবেশ

*

শিল্পী : মৃণাল চক্রবর্ত্তী

And no more was by it troubled.
Charlotte, having seen his body
Borne before her on a shutter
Like a well educated person,
Went on cutting bread and butter."

অবশেষে নায়কের দশমদশা প্রাপ্তির করুণরসাত্মক কাহিনী ওয়ের্থারের প্রবল প্রেমের বিনিময়ে নায়িকার বিপুল নির্বেদ থ্যাকারে প্যারডির কৌতুক-রসে জারিয়ে অতি সহজ ভাষায় ও অতি অল্প কথায় বলেছেন। এই প্যারডিটি থেকে প্যারডির অপর একটি বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা যায়,—কোন একটি বিশিষ্ট ভাবপূর্ণ রচনাকে যখন ইচ্ছাকৃত উদাসীনতার সঙ্গে গ্রহণ করা হয় তখনই প্যারডির জন্ম হয়।

এই লালিকাটির মত নিপুণ লালিকা ইংরেজী সাহিত্যেও কম পাওয়া যায়। এই ধরণের সার্থক লালিকা বাংলা সাহিত্যে নেই বললেও চলে।

রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র বিরোধের কুখ্যাতির অন্তরালে "আনন্দ বিদায়" চিরদিনের মত আত্মগোপন করে থাকতে বাধ্য হলেও এতে সন্নিবিষ্ট প্যারডিগুলি বঙ্গসাহিত্যসেবীগণের নিকট সুপরিচিত। 'আনন্দ বিদায়ের' অন্তর্গত "এন. ডি ঘোষের মেয়ে"—রবীন্দ্রনাথের "সে আসে ধীরে যায় লাজে ফিরে" গানটির প্যারডি। রবীন্দ্রনাথ এক লাজবিনম্র অভিসারিকার চলার ছন্দ বর্ণনা করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল এক অকুণ্ঠিতা, অনম্রা, অতি আধুনিকার চলার ছন্দের বর্ণনা দিয়েছেন। যেখানে রবীন্দ্রনাথের নায়িকা "কুন্তল ফুল গন্ধে" বনতল আকুল করে চলেছে,—সেখানে এন. ডি. ঘোষের মেয়ের কেশ সমুত্থিত জবাকুসুম তেলের সুবাসে সমগ্র ড্রইংরুম ছেয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের মঞ্জু-গামিনীর কোমল পদপল্লব ধরণী চুম্বন করে রিণিকি ঝিনিকি শব্দে বনভূমি শব্দায়িত করে চলেছে; দ্বিজেন্দ্র-লালের প্রগতিশীলা—"খটমট বুট শোভিত" পদে "ধিনিক ধিনিকি" বেগে ধাবিতা হয়ে আসছে। একটি অপরটির বিপরীত অনুকৃতি।

সংস্কৃতশাস্ত্রকারগণ বলেছেন—"শৃঙ্গারানুকৃতির্যা তু স হাস্যস্তু প্রকীর্তিতঃ"এখানে সেই উক্তির সার্থকতা দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ আদ্য বা মধুর রসের অনুকৃতি দ্বারাই এখানে এই হাস্যরস উৎপন্ন হয়েছে। এ প্যারডিটি কবির কেবলমাত্র হাস্য প্রতিভাই নয়, উচ্চ কল্পনা শক্তি ও সুষম চিত্তের পরিচয় প্রদান করে। থ্যাকারের প্যারডিটির মত গূঢ় ভাবসম্পন্ন না হলেও নির্মল হাস্যরসের আধার হওয়ার জন্য কবিতাটি একটি উল্লেখযোগ্য প্যারডি।

ব্যঙ্গ অনুকার যে নিজের রচনায় নিজেই আত্মপ্রসাদের হাসি হাসেন, নীচে ইংরেজ কবি চেষ্টারটনকৃত একটি প্যারডি উদ্ধৃত করে তা দেখানো হচ্ছে—

মূল কবিতাটি হচ্ছে Wordsworthএর "To the sky lark"—কবিতাটির দুইটি পংক্তি—

"Type of the wise who soar but never roam,
True to the kindred points of heaven and home."

"চেষ্টারটন"এর প্যারডি লিখেছেন—

"Type of the wise who drill but never fight
True to the kindred points of might and right."

"ওয়ার্ডসওয়ার্থ" লিখলেন—সংসারের কর্তব্য পালন করেও যিনি ঈশ্বরকে বিস্মৃত হন নি, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী। "চেষ্টারটন্" এর ব্যঙ্গ অনুকৃতিতে লিখলেন—"যিনি যুদ্ধের পূর্বেই খুব কুচকাওয়াজ করেন, পরে আসল যুদ্ধের সময় পেছনেই বসে থাকেন—অর্থাৎ যিনি সুবিধানুসারী তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী!" এই লালিকাটি রচয়িতার রুদ্ধহাস্য গোপন করতে পারেনি—এবং তিনি যে তাঁর এই বিপরীত উক্তির প্রভাব পাঠকদের উপর কেমন পড়েছে দেখতে উদ্‌গ্রীব, সেটি বিশেষ করে শেষ পংক্তিটির মধ্যে ধরা পড়ে যায়। দ্বিজেন্দ্রলালের একটি প্যারডির মধ্যে অনেকটা এই প্রকৃতির শৈল্পিক ব্যঞ্জনা এসেছে। সেটি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের অপর একটি গান—"আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি" এই গানটির প্যারডি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় এক প্রেমিকার নিঃস্বার্থ প্রেমের পরিচয় দিচ্ছেন।—

"আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি
তুমি অবসর মত বাসিয়ো
আমি নিশিদিন হেথায় বসে আছি
তোমার যখন মনে পড়ে আসিয়ো।
আমি সারানিশি তোমা লাগিয়া রব বিরহ শয়নে জাগিয়া

তুমি নিমেষের তরে প্রভাতে এসে
মুখপানে চেয়ে হাসিয়ো।"

প্রেমিকা প্রেমের প্রতিদান চায় না। সে নিশিদিন প্রেমিকের চিন্তায় বিভোর হয়ে বসে আছে। প্রেমিক প্রতিদানে তার মুখের দিকে হাসিমুখে চাইলেই সে নিজেকে পুরস্কৃত বোধ করবে। দ্বিজেন্দ্রলাল লালিকাটি এইভাবে রচনা করলেন—

"আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি
তুমি Leisure মাফিক বাসিয়ো
আমি নিশিদিন রেঁধে বসে আছি
তোমার যখন হয় খেতে আসিয়ো।
আমি সারা নিশি তব লাগিয়া
রব চটিয়া মটিয়া রাগিয়া
তুমি নিমেষের তরে প্রভাতে এসে
দাঁত বের করে হাসিয়ো"

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রেমিকা কিছু কড়া মেজাজের স্ত্রীলোক। তিনি বলছেন প্রেমিককে তো তিনি সদাসর্বাদাই ভালবাসেন; কিন্তু তার প্রতিদানের প্রত্যাশী তিনি নন। কথাটা অবশ্য কিছু বক্রভাবেই তিনি বললেন। তারপর তাঁর মেজাজ চড়তে লাগল। তখন রুদ্ধক্রোধে তিনি বললেন—রাত্রি বেলায় রেঁধে বেড়ে তিনি প্রেমিকের প্রতীক্ষা করবেন। হয়ত সুদীর্ঘ রজনী কেটে যাবে তবু প্রেমিকের দেখা পাওয়া যাবে না। সকালবেলা তিনি এসে দাঁত বের করে হেসে তাঁকে কৃতার্থ করে দেবেন। এই লালিকাটিকে মূলের প্রতি তিনি বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন নি। এতে কেবল স্বয়ং হাসবার ও অন্যকে হাসাবার প্রয়াস রয়েছে। এই প্যারডিতে কবির প্রধান কৃতিত্ব, মূল কবিতার মধ্যে তিনি যেটুকু পরিবর্তন এনেছেন, তা নগণ্য। অথচ কবিতার রস থেকে আরম্ভ করে ভাবভঙ্গী সবকিছুরই আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। এখানেই প্যারডিকার হিসেবে কবির কৃতিত্ব। অবশ্য সব ক্ষেত্রেই তাঁর প্যারডিগুলি এমনি নির্দোষ ও নির্মল আনন্দের বাহক হয়ে ওঠেনি। যেমন রবীন্দ্রনাথের "এখনো তারে চোখে দেখিনি শুধু বাঁশী শুনেছি" এই গানটির যে লালিকা তিনি আনন্দবিদায় নাটিকার জন্য লিখেছিলেন, সেটির উল্লেখ করা যেতে পারে। লালিকাটির দুই পংক্তি নীচে দেওয়া হ'ল:—

"এখনো তারে চোখে দেখিনি শুধু কাব্য পড়েছি,
এমনি নিজেরই মাথা খেয়ে বসেছি"

এই পংক্তিগুলি সুস্পষ্ট রবীন্দ্রনাথের প্রতি আক্রমণ। আবার "কেন যামিনী না যেতে জাগালে না" এই গানটির প্যারডি—

"কেন যামিনী না যেতে জাগালে না
বেলা হল মরি লাজে
আলুথালু এই কবরী আবরি আলুথালু এই সাজে,
জেগেছে সবাই দোকানপসারী
রাস্তায় লোক আমি কুলনারী
এখন কেমনে হাটখোলা দিয়ে চলিব পথের মাঝে"

এগুলির ভাব অতি স্থূল—এবং রুচিবিরুদ্ধ। আনন্দ বিদায়ের মধ্যে কবি রবীন্দ্রনাথের রচনার অশ্লীলতা দোষ দুষ্ট প্রতিপাদন করতে গিয়ে নিজেই অনেক সময় অশ্লীল প্রকৃতির রচনা উপস্থাপিত করেছেন। এ প্রকৃতির রচনাকে সাহিত্যের প্রকোষ্ঠে স্থান দিতে পারা যায় না।

দ্বিজেন্দ্রলালের কিছু পরে উল্লেখযোগ্য প্যারডিকার হিসেবে "সতীশঘটকের" নাম করা যেতে পারে। এঁর লিখিত-'সোনার তরী' কবিতাটির প্যারডি:—'সোনার ঘড়ি' সত্যই সরস ও হৃদয়গ্রাহী। এক শ্রীফলেশ উকিলের সোনার ঘড়িটি কেমন ভাবে তাঁর চোখের সম্মুখ থেকে এক "ঝুটো" মক্কেল উঠিয়ে নিয়ে গেল তারই কাহিনী এর মধ্যে রয়েছে। কাহিনীটি করুণ অথচ হাস্যরসের মাধ্যমে প্রকাশ করায়,—এই কবিতাটি সার্থক হিউমারের নিদর্শন হয়ে উঠেছে।—এর কিয়দংশ নীচে উদ্ধৃত করা হল:—

"একখানি ছোট মেস্ আমি একেলা,
চারিদিকে বকাছেলে করে জটলা;
স্থালে ঝোলে দেশী আঁকা
কালী তারা কালি মাখা,
আমদানী নাহি টাকা প্রভাত-বেলা,
চেয়ারেতে বসে তাই ভাবি একেলা।"

এমন সময়—"পান খেয়ে সিঁড়ি বেয়ে কে আসে দ্বারে?
মক্কেল মনে হয় যেন উহারে"

তখন কবি তাকে মিনতি করে বলছেন—

"ওগো তুমি কোথা যাও বাড়ী কি দেশে?
বারেক দাঁড়াও মোর নিকটে এসে;

যেও যেথা যেতে চাও, যারে খুসি কেস্ দাও,
আগে ত তামাকু খাও ক্ষণেক বসে ;
উপদেশ কিছু মোর লইও শেষে"

সেই ব্যক্তি তামাক খেয়ে উকীল মহাশয়কে আপ্যায়িত করে এই বলে চলে গেলেন—

"কেস্ নাই কেস্ নাই ছোট চাকরি,
মামলা বলুন দেখি কেমনে করি ?
এত বলি ধীরে ধীরে গেল চলি গেল সে বাহিরে,—

তখন—

"শূন্য চেয়ারে আমি রহিনু পড়ি ,
চেয়ে দেখি নিয়ে গেছে সোনার ঘড়ি।"

প্যারিডি হলেও এর ভাবের মৌলিকতা ও সার্থক রসসৃষ্টি এটিকে একটি সার্থক রচনা করে তুলেছে। এর পর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকের উল্লেখযোগ্য প্যারডিকার হিসেবে যতীন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত, নলিনীকান্ত সরকার, সর্বোপরি সজনীকান্ত দাসের নাম করতে হয়। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রবীন্দ্রনাথের "বঙ্গে শরৎ" কবিতাটির একটি অপূর্ব লালিকা রচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গমাতার ঐশ্বর্য্যমণ্ডিতা হাস্যময়ী মূর্তি চিত্রিত করেছিলেন, যতীন্দ্রনাথ হতশ্রী, রোগক্লিষ্টা বঙ্গমাতার ছবি প্যারডিটির মধ্যে চিত্রিত করেন।

শক্তিশালী প্যারডিকার হিসেবে সজনীকান্ত দাসের স্থান বাংলাসাহিত্যে অনন্য হয়ে রয়েছে। প্যারডি সজনী কান্তের হাতে ছিল চাবুকের মত। "শনি" যখনই কোন সাহিত্যিক বা কবির রচনায় অসত্য, অন্যায়, কাপুরুষতা, ইন্দ্রিয়বিলাসিতা ইত্যাদির সন্ধান পেতো, তাকে একেবারে নাজেহাল করে ছাড়ত। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, মোহিতলাল মজুমদার, কাজী নজরুল, দিলীপ রায় ইত্যাদি থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কাকেও তিনি তাঁর বিষনাশা দৃষ্টি থেকে মুক্তি দেয়নি। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকের তাঁর লেখা কয়েকটি প্যারডি নীচে দেওয়া হ'ল।—কাজী নজরুলের নামকে ব্যঙ্গ করে তিনি 'গাজী আব্বাস বিটকেল' এই ছদ্মনামে বহু ব্যঙ্গকবিতা লিখেছিলেন। নজরুলের একটি অতি পরিচিত গানের প্যারডি নীচে দেওয়া হল—

"কে উদাসী বনগাঁবাসী বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে ;—
সুর সোহাগে ভির্মি লাগে বর ভুলে যায় বিয়ের কনে"

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে ব্যঙ্গ করে "অনুপ্রাসরঞ্জন সেন" এই ছদ্মনামে তিনি অচিন্ত্যকুমারের একটি কবিতার নিম্নলিখিত প্যারডিটি রচনা করেন—

চাটাই বিছায়ে কাটাই প্রহর
ঢাকাই পরোটা খাই—
আগুন লেগেছে 'বাগুনে'র ক্ষেতে, বুঝি
ফাগুনের গুণে,
উনায়ে উনুন নুন দিল কেবা ঘুণ ধরে গেল চুণে।
ড়মো গালে চুমো খেতে ঘুম দিল খোকা
পথক্রম পাশে
লুচি-মুখো-মুচি কাঁচা-আম-কুচি খেয়ে মুখ মুছি হাসে।

এ কবিতাটির শেষ অংশে কবি তাঁর কবিতাটির অভিনব নামকরণের কারণ দেখিয়েছেন—

"জরে জর জর বাজরায় ফিরি নজরা হানিয়া ঘাটে,
হৃদয়-দরজা প্রিয়া পদরজ না লাগি বুঝি বা ফাটে!
"ঠাঠা-পড়া" রোদে তাই—
চাটাই বিছায়ে কাটাই প্রহর, ঢাকাই পরোটা খাই।"

এ কবিতাটি আপাতদৃষ্টিতে বড়ই নির্দোষ আবোল-তাবোল জাতীয় মনে হয়। অবশ্য এটিকে আবোল-তাবোল শ্রেণী ভুক্তই বলতে হবে। কিন্তু এর মধ্যে অচিন্ত্যকুমার সেন-গুপ্তের লেখা "অমাবস্যা" কাব্য গ্রন্থের কবিতা বিশেষের প্রতি কটাক্ষ রয়েছে।

সজনীকান্তের এই ধরণের কবিতাগুলি এক সময়ে শনিবারের পাঠককুলকে প্রচুর আমোদ দিত সন্দেহ নাই। কেননা, সাময়িক আনন্দ ও উত্তেজনা দানের শক্তি প্যারডি মধ্যে প্রচুর রয়েছে। তবে সে যুগের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের যেমন আচার ব্যবহার ও অবস্থা পরিবর্তিত হয়েছে তেমনি দৃষ্টিভঙ্গীও পরিবর্তিত হয়েছে, তাই সেগুলি পড়ে আর তেমন আনন্দ পাওয়া যায় না, সেগুলি সেকেলে হয়ে গেছে বলতে হয়। এর কারণ পূর্বেই বলা হয়েছে :—শিল্প হিসেবে প্যারডিকে খুব উচ্চস্তরে স্থান দেওয়া যায় না। সত্য ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে শিল্পের কাজ। অধিকাংশ প্যারডিই রচিত হয়ে থাকে বিদ্বেষের প্রেরণায় ; কাজেই প্যারডি রচনার মাধ্যমে শাশ্বত ও সুন্দরকে গড়ে তোলা এক প্রকারের অসম্ভব ব্যাপার।

❀

পাশাপাশি বাড়ী।

একবাড়ীর কর্তা ধনঞ্জয় ধাড়া।

অপর বাড়ীর মালিক মহাদেব মুচ্ছুদ্দি।

ধনঞ্জয় ধাড়া আর মহাদেব মুচ্ছুদ্দি যখন বয়েসে তরুণ ছিলেন তখন তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়।

তারপর উভয়ে কলেজ জীবন শেষ করে চাকরী জীবনে প্রবেশ করেন। কিন্তু বন্ধুত্ব আগেকার মতেই অটুট থাকে।

ধনঞ্জয় হাইকোর্টে কি একটা ভালো চাকরী পান, আর মহাদেব কিছুদিন একটা বেসরকারী কলেজে অধ্যাপক-রূপে কাজ করে আইনের পরীক্ষাগুলো পাশ করে ফেলেন। তারপর শামলা মাথায় দিয়ে ওকালতি সুরু করে দেন। ধীরে ধীরে পশার বেশ জমে ওঠে।

উভয়ে বিয়ে করেন নিজের ইচ্ছেমত—কনে পছন্দ করে। কারো অভিভাবকের বালাই ছিলনা। তাই এক জনের বিয়েতে অন্যজন বর কর্তার দায়িত্ব পালন করেন।

তার পর বেশ কিছু টাকা পয়সা জমিয়ে দুই জনে পাশাপাশি জমি কিনে বাড়ী তৈরী করেন।

বাড়ীর সঙ্গে যে বাড়তি জমি ছিল তাতে দুই জনেই ফলের বাগান করেন। আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, বেল, নারকেল, কলা, পেঁপে সব রকম ফলের গাছই এরা পরামর্শ করে লাগিয়েছেন এবং সুফলও পেয়েছেন।

ধনঞ্জয়ের স্ত্রীর নাম কৈবল্যদায়িনী। ছিমছাম সংসার। কর্তা-গিন্নিতে মিলে সুন্দর করে বাড়ীটি সাজিয়েছেন—যেখানে যেটি মানায়।

কোনো রকম ঝামেলা ওরা সইতে পারেন না। ধনঞ্জয় অবসরে প্রচুর বই পড়েন, আর গিন্নি কৈবল্যদায়িনী কর্তার জন্যে মাফলার আর শোয়েটার বোনেন, আমের দিনে আমসত্ব তৈরী করেন; নানাবিধ আচার করতে ভারী ভালো বাসেন। কাচের বৈয়ামে করে সুন্দর ভাবে সব সাজিয়ে রাখেন।

মহাদেবের স্ত্রীর নাম মোহমুদ্গরধারিণী। তার চীৎকারে আর শাসনে বাড়ীতে কাক-চিল বসতে পারেনা। অনেকগুলি ছেলের মা হয়ে বসেছেন। তাদের আদর করতে আর সোহাগ জানাতে অনেক সময় কেটে যায়। মাঝে মাঝে বেশ শাসনও চলে।

ধনঞ্জয় মহাদেবকে ডেকে মাঝে মাঝে বলেন, দেখ ভাই মহাদেব,ভেবে চিন্তে সংসার ধর্ম করতে হয়। বাড়ীতে যে পঙ্গপালের বাহিনী সৃষ্টি করছ, শেষ কালে সামাল দিতে পারবে ত?

মহাদেব হাসতে হাসতে উত্তর দেন, ও! বুঝতে পেরেছি। ধনঞ্জয় বুঝি প্রথম থেকেই পরিবার পরিকল্পনা করছ? তাই তোমার ঘরে একটি কচি ছেলের কান্নাও

মহাদেব মুচ্ছুদ্দি

শুনতে পাওয়া যায় না? আরে দূর দূর! সারাদিন খেটে খুটে বাড়ীতে আসবো, তখন একটি কোলে উঠ্‌বে, একটি পিঠে ঘামাচি গালবে, একটি মাথার চুলে সুড়সুড়ি দেবে—তবে ত' আনন্দ! একা দশ হয়ে নতুন করে মজা করবো—তবে ত সংসারের সুখ।

মহাদেবের এই কথা শুনে ধনঞ্জয় তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে। ফোঁড়ন কেটে বলে, ও! মজা করবে?··· সংসারের আনন্দ উপভোগ করবে? কিন্তু দেশের অবস্থা দিন-কে-দিন কেমন হয়ে উঠ্‌ছে দেখতে পাচ্ছত। তখন মজা করা একেবারে বেরিয়ে যাবে!

মহাদেব তখন রসিকতা করে উত্তর দেন, ভায়া হে, বেশী ভাবতে যেও না। তা হলেই ভবসমুদ্রে হাবুডুবু খাবে। পরিবার পরিকল্পনা করছ? ছাই করছ! তাই বুঝি কৈবল্যদায়িনী দেবী ক্রমাগত আমসত্ব দিচ্ছেন, আর তোমার জন্যে মাফলার তৈরী করছেন! সময় আর কিছুতেই কাট্‌তে চায়না! ছেলেপুলেকে আদর করবে সোহাগ করবে, আবার দরকার হলে দু-ঘা বসিয়ে দেবে। তা নইলে আবার সংসারের আনন্দটা কি শুনি?

ধনঞ্জয় বলে, ও! তাই বুঝি এই পঙ্গপাল বাহিনীর আমদানী? যখন এতগুলো মুখে আহার জোটাতে পারবেনা, সংসারে আনন্দটা তখন কোথায় থাক্‌বে শুনি? অধিক সন্তান যে দারিদ্র্য আনে সে কথা কি তুমি শোনো নি?

—শুনেছি বৈ কি! নিশ্চয়ই শুনেছি!

চোখ দুটো কুত কুত করে উত্তর দেয় মহাদেব। কিন্তু তুমি কি একথা শোনো নি যে, রবিঠাকুর দেবেনঠাকুরের অষ্টম সন্তান? তোমার মতো পরিবার পরিকল্পনা করলে— আমরা রবিঠাকুরকে পেতাম কোথায়? কার কবিতা আবৃত্তি করে আমার ছেলে প্রাইজ আনতো? কার গান গেয়ে আমার মেয়ে পুরস্কার পেতো? তুমি একটা হাঁদা-গঙ্গা রাম। গাছের চারা লাগাচ্ছ হরদম! কিন্তু তোমার ঘরে মানুষের চারা দেখতে পাইনে কেন? সারা জীবন কি শুধু ভস্মেই ঘী ঢাল্‌বে?

এই নিয়ে দুই বন্ধুতে প্রায়ই তর্কাতর্কি চলে।

অন্দর মহলে ধনঞ্জয়-গৃহিণী কৈবল্যদায়িনী এবং মহাদেবের ঘরণী মোহমুদ্গরধারিণীর মধ্যেও বিশেষ সম্প্রীতি জন্মেছে বলে মনে হয়না।

কর্তা যখন চাকরী স্থলে চলে যায় পাশের বাড়ীর ছেলের দল যখন সারা দুপুর দুপদাপ্‌ করতে থাকে তখন ধনঞ্জয় গৃহিণী কৈবল্যদায়িনীর এক এক সময় মনে হয় এ বাড়ীটা কি একটু বেশী রকম নিঝুম নয়? একটু শব্দ হোক, দু একটা কাচের গ্লাস আর চায়ের কাপ ঝন্-ঝন্ করে ভাঙুক, যাতে বুঝতে পারি যে, আমরা বেঁচে আছি।

এক এক সময় সকলকে গোপন করে কৈবল্যদায়িনী পাশের বাড়ীর ছেলেদের ডেকে বৈয়ামের আচার, আর টিনের ভেতর স্যাকড়ায় জড়ানো আমসত্ব বিলিয়ে দেয়।

আস্তে আস্তে বলে, তোরা আমার সামনে বসে খা। আরো দেবো'খন।

পাশের বাড়ীর মোহমুদ্গরধারিণীর ছেলেরা এই জ্যাঠাইমাকে তাই খুব ভালোবাসে। কিন্তু মায়ের সঙ্গে জ্যাঠাইমার যে বিশেষ ভাব নেই,—সেকথা বেশ বুঝ্‌তে পারে। ওরাও তাই আচার আর আমসত্ত্ব খাওয়ার কথা বেমালুম চেপে যায়।

ইতিমধ্যে মহাদেবের ছেলের দল হাতে-পায়ে বেশ বড় সড় হয়ে ওঠে। ওদের দৌরাত্ম্যে পাড়ার লোকে অতিষ্ঠ হয়ে প্রায়ই নালিশ জানায়।

কিন্তু সেদিন একেবারে মারমুখী হয়ে উঠল পাশের বাড়ীর ধনঞ্জয়।

ছুট্‌তে ছুট্‌তে মহাদেবের কাছে এসে বল্লে, দেখ ভাই মহাদেব, বন্ধু বলে এতদিন তোমায় কিছু বলিনি! কিন্তু তোমার পঙ্গপালের কাণ্ড দেখ—

ধনঞ্জয়কে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে এগুতে দেখে মহাদেব শুধোলে, কেন, এত মারমুখী কেন? ব্যাপারটা কি শুনি?

ধনঞ্জয় বল্লে, শুনবে! তোমার পঙ্গপাল আমার পেয়ারা গাছ একেবারে সাফ্ করে দিয়েছে। এখনো ভালো করে পাকে নি পেয়ারাগুলো। কিন্তু আজ দুপুরে গাছ-কে-গাছ একেবারে সাবাড়। আমি বলে দিচ্ছি মহাদেব, তোমার পঙ্গপালকে সাম্‌লাও,—নইলে একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে—

মহাদেবও ছাড়বার পাত্র নয়। এগিয়ে এসে চোখ নাচিয়ে বল্লে, ইস্! বিষ নেই, তার কুলো পানা-চক্কর। বাড়ীতে একটা কচি ছেলে আছে যে, মজা করে পেয়ারা খাবে! সে গুড়ে ত' বালি মিশিয়ে রেখেছে। হুঁ! পরিবার পরিকল্পনা করা হয়েছে! গুষ্টির পিণ্ডি হয়েছে। ওই যে গাছ ভর্ত্তী কাশীর পেয়ারা হয়ে ঝুল্‌ছে···তা খাবে কে শুনি? বেশ করেছে—আমার ছেলেরা খেয়েছে। গাছের ফল ছেলেদের জন্যেই। নইলে সোজা বাগানে গিয়ে গাছ গুলো কেটে ফেল না। উদ্যান পরিকল্পনা পর্ব্বটা সুরু হয়ে যাক।

ধনঞ্জয় আর কথা বাড়াতে পারে না! মুখ কাঁচু মাচু করে চলে আসে।

ঘরে ফিরে দেখে, গৃহিণী কৈবল্যদায়িনীর দু'চোখ জলে ভরা।

নিজের সংসারটা খা-খা করছে বলেই কি কৈবল্যদায়িনী কাঁদছে?

মোহমুদ্গরধারিণী

ধনঞ্জয় ওকে কোনো কথা জিজ্ঞেস করবার মতো মনের বল নিজের ভেতর খুঁজে পায় না!

ওদিকে মহাদেবের পঙ্গপাল ছেলের দল দিনের পর দিন দস্যি হয়ে উঠছে। গোটা পাড়া ওদের এখন ভয় করে চলে। তার কারণ হচ্ছে, কোনো বাড়ীতে এক সঙ্গে এত ছেলে নেই। কাজেই ওদের একটু সমীহ করে চল্‌তে হবে বৈ কি!

বিশ্বকর্ম্মা পুজোর দিন পাড়ার ছাদে-ছাদে ঘুড়ি ওড়ানোর প্রতিযোগিতা চলে।

কে কার ঘুড়ি কেটে দিয়ে লটকে নিতে পারে।

প্রায় এক মাস আগে থেকে পাড়ার ছেলেরা নানাবিধ মশলা দিয়ে কাচের গুড়ো তৈরী করে। সেই গুড়োতে হয় ঘুড়ির সুতোর মাঞ্জা!

মাঞ্জা সুতোর ষড়যন্ত্র

কিন্তু মহাদেবের পঙ্গপালের কাছে কেউ এঁটে উঠ্‌তে পারে না।

দুপুর থেকে নানা রঙের ঘুড়ি উড়তে থাকে আকাশ ছেয়ে।

কৈবল্যদায়িনী

কিন্তু বিকেলের দিকে সে আকাশের চেহারা পাল্‌টে যায়।

পঙ্গপালের দল কখন যে তাদের নতুন ডিজাইনের ঘুড়ি দিয়ে সারা আকাশটা ভরে ফেলে, তা কেউ টের পাবার আগেই 'ভো-কাট্টা' সুরু হয়ে যায়।

একদল ছেলে ঘুড়ি কাটে, অপর দল ওৎ পেতে থাকে। তারা সঙ্গে সঙ্গে লটকে নেয় কাটা ঘুড়িগুলো।

পাড়ার ছেলেরা শেষকালে ঘুড়ির খেলায় জিত্‌তে না পেরে রাগ করে বলে, ওরা হচ্ছে—দুর্য্যোধনের একশ ভাইয়ের দল!

আমরা কোন্‌ দিক সামলাবো বল?

ধনঞ্জয় অবাক হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে।

এক এক সময় আপনমনে ভাবে,—আহা, আমার যদি মহাদেবের মতো কয়েকটি ছেলে থাকতো তা হলে তারাও ছাদে উঠে মজা করে ঘুড়ি ওড়াতো!

ধনঞ্জয়ের মনটা কি দুর্ব্বল হয়ে পড়ছে? নইলে মহাদেবের 'মজা' কথাটা সে মনে-মনে ব্যবহার করছে কেন?

তাড়াতাড়ি সে নীচে নেমে যায়।

ছেলেদের দাপাদাপি নেই,—তাই ছাদের কোণে কোণে শ্যাওলা জমে!

সেদিন সন্ধ্যের মুখে ধনঞ্জয় চায়ের কাপ হাতেই নাচতে নাচতে মহাদেবের বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে হাজির।

আজ সে 'মৌকা' পেয়েছে,—ছাড়বে কেন?

বল্লে, কী? কেমন মজা?

মহাদেব সকালবেলাকার পুরোণো কাগজটা উল্টেপাল্টে দেখছিল। চোখ তুলে বল্লে, ও! ধনঞ্জয়! এসো—এসো—, তা' এই ভরসন্ধ্যেয় মজাটা পেলে কোথায়? খালি বাড়ীতে বুঝি ভূতের ভয় করছে?

ধনঞ্জয় চোখ নাচিয়ে জবাব দিলে, হুঁ! মজাটা এখনো টের পাওনি বুঝি? পাড়ার গাঙ্গুলীমশায়ের মেয়ের বিয়ে সামনের হপ্তায়। সব বাড়ীতে নেমন্তন্ন করেছে, শুধু তোমার বাড়ী বাদ! তা পঙ্গপাল বাহিনীকে কে নেমন্তন্ন করবে বলো? চিরটা কাল পই-পই করে বারণ করেছি, পঙ্গপাল বাহিনী কমাও, পরিবার পরিকল্পনা করো। তা আমার কথায় ত' কান দাও নি। এখন দেখ্‌লে ত' মজা।

মহাদেব বল্লে, তা মজাটা কোথায় শুনি? নেমন্তন্ন করে বাড়ীতে নিয়ে যাবে, খাওয়াবে ত' কাজু বাদাম, আর সরবৎ। কিন্তু কনেকে ত আর কাজুবাদাম উপহার দিতে পারবে না! নেমন্তন্নের খাসারৎ দিতে হবে না? এদিকে আমরা ঘরের টাকা ঘরে খরচ করে দিব্যি ভোজ খাবো—

ধনঞ্জয় দেখ্‌লে, সে বন্ধুকে মজা দেখাতে এসে নিজেই 'গভীর গাড্ডায়' পড়ে গেছে। তাই আর সেখানে না দাঁড়িয়ে চায়ের কাপ হাতে চোঁ-চাঁ দৌড়।

মহাদেব পেছন থেকে হাততালি দিয়ে বল্লে—দুয়ো—দুয়ো—

মহাদেবের স্ত্রী মোহমুদ্গরধারিণী রসিকতা করে বল্লে, তোমাদের দুই বন্ধু কি দিন-কে-দিন খোকাটি হচ্ছ নাকি?

মহাদেব জবাব দিলে, তা নইলে আর মজা কিসের?

দেশের অবস্থা কেবলি খারাপ হচ্ছে। লোকে খেতে পায় না।

পাড়ায় ছিঁচ্‌কে চোরের আনাগোনা সুরু হয়েছে।

কোনো গেরস্ত রাতে ঘুমুতে পারছে না! খুট্‌ করে শব্দ হয়, আর সবাই চম্‌কে চম্‌কে ওঠে!

ধনঞ্জয় আর কৈবল্যদায়িনীর চোখেও সারারাত ঘুম নেই! অনেক সখের জিনিস দিয়ে বাড়ী সাজানো। কোনটি যে কে চুরি করে নিয়ে যাবে তার ঠিক কি?

পর পর পাঁচ রাত না ঘুমিয়ে কর্ত্তা-গিন্নিতে কেবলি ঢুল্‌ছে।

ওদিকে পাশের বাড়ীতে পঙ্গপালের দল পালা করে রাত জাগ্‌ছে, ছাদে টিন পেটাচ্ছে, আর যখন তখন শঙ্খ-ঘণ্টা বাজাচ্ছে।

কিন্তু ধনঞ্জয়ের বাড়ী একেবারে চুপচাপ। কর্ত্তা-গিন্নি ত' আর গাছ-কোমর বেঁধে টহল দিয়ে বাড়ী পাহারা দিতে পারে না!

একদিন সন্ধ্যের মুখে কৈবল্যদায়িনী চাপা গলায় মোহ-মুদ্গরধারিণীকে ডেকে বল্লে, দেখ, মোহ, তোর কয়েকটি ছেলেকে আমাদের বাড়ীতে রাত্তিরে থাকতে বল না—

মোহমুদ্গরধারিণী মুখ বাঁকিয়ে উত্তর দিলে, আমার পঙ্গপালেরা তোমার বাড়ীতে ঢুক্‌লে তোমার কর্ত্তা ত' গোঁসা করবেন।

কৈবল্যদায়িনী জিব কেটে উত্তর দিলে, না—না, গোঁসা করবে কেন? আমি ওদের জন্যে ঘন দুধ, আমসত্ব, খৈয়ের মোয়া সব তৈরী করে রেখেছি। মাথা খাস্— বোন, ওদের আস্‌তে দিস—

মোহমুদ্গরধারিণী ঠোঁট উল্টে বল্লে, তুমি ত' বল্‌ছ দিদি। কিন্তু আমি ভরসা পাচ্ছি নে! দেখি—আমার কর্ত্তা আবার কি বলে!

এ বাড়ীর কর্ত্তা রাত্তিরে খেতে বসে বল্লে, হুম্! এখন মজা দেখ! পরিবার পরিকল্পনা করতে বলো—ওই আকাট মুখ্যু ধনঞ্জয়কে।

তারপর হঠাৎ নিজের রসিকতায় নিজেই হো-হো করে হেসে উঠল।

মোহমুদ্গরধারিণী বুঝ্‌লে, কর্ত্তার অনুমতি পাওয়া গেছে।

পঙ্গপালেরও আনন্দের অবধি নেই! রোজ রোজ রাত্তিরে জ্যাঠাইমার কাছে নতুন নতুন খাবার চাখা যাচ্ছে। তারপর ছাদে উঠে দুপ্‌দাপ শব্দ করে চোর তাড়ানো।

সে কাজ ওরা বিলক্ষণ ভালই জানে। সুতো আর দেশলাইয়ের বাক্স দিয়ে দুই বাড়ীর মধ্যে টেলিফোনের সংযোগ করা হয়েছে।

সারারাত ধরে সেই অপরূপ টেলিফোনে কথা চলে—

—হ্যালো, পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র থেকে বলছি—

—হ্যালো, হ্যালো, পঙ্গপাল-বাহিনী-হেডকোয়ার্টার। এখন রাত দুটো-দশ। হ্যাঁ, সকলে সজাগ থাক্‌বে। একটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে একটা লোককে গলির মোড়ে গুড়ি-মেরে আস্‌তে দেখা গেছে। 'ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ড' তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে। সবাই হুঁসিয়ার।

এই ভাবে দুই বাড়ীতে চলে সংবাদের আদান-প্রদান।

ধনঞ্জয় উস্‌খুস্ করে। গিন্নিকে বলে, এত' হল আরো ভালো। সারারাত ঘুমের দফা রফা! তুমি খাল কেটে কুমীরের দল নিয়ে এলে।

কৈবল্যদায়িনী ঝঙ্কার দিয়ে উঠে জবাব দেয়, তুমি থামো দেখি! রাত্তির জেগে বাড়ী পাহারা দেবার মুরোদ নেই,—তুমি আবার কথা বল্‌তে এসো কোন্ লজ্জায়? আমি ওদের বাপু বাছা করে, কত খাওয়া দাওয়ার তোয়াজ করে এই ব্যবস্থা করেছি। আমাদের বাড়ীতে জিনিস পত্র ঠাসা! কখন চোর ঢুকে সর্ব্বস্ব নিয়ে যাবে! তখন মাথা-চাপড়ে মরতে হবে!

ধনঞ্জয় বুঝ্‌লে গিন্নি সপ্তমে চড়ে আছে—তাকে এখন ঘাটানো খুব বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তাই নীরবে পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগ্‌লো।

সেদিন ধনঞ্জয় অফিস থেকে ফিরে এলো একটু সকাল সকাল। মুখে তার হাসি খুশি আর ধরে না!

গিন্নি জিজ্ঞেস করলে, কিগো, এত পুলক কিসের? হঠাৎ লটারীর টিকিট পেলে নাকি?

ধনঞ্জয় যেন দিগ্বিজয় করে ফিরেছে—এমনি মুখের ভাব করে উত্তর দিলে, না-না, লটারী নয় গিন্নি। এবার সত্যি সুখবর আছে।

—সুখবর? কিসের সুখবর? তোমার মাইনে বেড়েছে?

—না-না, মাইনে বাড়ার কথা হচ্ছে না!

—লটারী নয়, মাইনে নয়, কোনো লাভের কথা নয়, তবে পোড়ামুখে এত হাসি আসে কোত্থেকে?

ধনঞ্জয় তাতেও দমে না।

বল্লে, হুঁ! হুঁ। এখনো ক্থাটা ভাঙি নি। চীনের সঙ্গে যুদ্ধ সুরু হয়ে গেছে!

গিন্নি তার কপালে করাঘাত করে বল্লে, আ আমার পোড়া কপাল। যুদ্ধ সুরু হয়েছে,—তাতে আমাদের কি? হু হু করে জিনিস পত্রের দাম বেড়ে যাবে,—বাজারে কিছু পাওয়া যাবে না, সেটা বুঝি সুখবর হল?

ধনঞ্জয় মাথা নেড়ে ভুঁড়ি দুলিয়ে উত্তর দিলে, হাঁ৷ গিন্নি, সুখবর। তুমি বুঝতে পারছ না! জিনিস পত্রের দর আরো চড়ে যাক,—তখন ওই পঙ্গপালের দল টের পাবে! আর সুখবর কি একটা আরো আছে গিন্নি—

—আবার কি সুখবর?

—হুঁ! হুঁ! ওই পঙ্গপালের দল। এক এক টাকে ধরবে, আর যুদ্ধে পাঠিয়ে দেবে! এই বার মহাদেব ভায়া বুঝবে মজা! এইবার মহাদেবের কার্ত্তিক-গণেশের দল খসল! বুঝলে গিন্নি? আমাদের ছেলে নেই, আমরা মজা করে ঘরে বসে খবরের কাগজে যুদ্ধের সংবাদ পড়বো। আমাদের নেই—তা' আর নেবে কি?

ধনঞ্জয় নিজের আনন্দেই ছড়া কাটতে সুরু করল—

"কহেন কবি কালিদাস
পথে যেতে যেতে—
নেই তাই খাচ্ছ
থাক্‌লে কোথা পেতে?

হঠাৎ ধনঞ্জয় তার উদ্দাম নৃত্য থামিয়ে গিন্নির দিকে তাকিয়ে দেখলে, তার দুই চোখ জলে ভরা! কেমন যেন হক্‌চকিয়ে গেল ধনঞ্জয়।

নাচ আর ছড়া বলা হঠাৎ থেমে গেল।

ধনঞ্জয়ের মুখটা কেমন যেন বোকা-বোকা দেখাতে লাগলো।

কিন্তু কৈবল্যদায়িনী আর কোনো কথা বল্লে না! বোধ করি চোখের জল লুকোতে চকিতে ঘরের ভেতর চলে গেল!

এদিকে আর এক বিপত্তি!

যুদ্ধের খবর শুনে পাড়ায় যত ঝি চাকর ছিল—সব পোটলা-পুঁটলি বেঁধে বিনা নোটিশে নিজ নিজ দেশে রওনা হয়ে গেল। কারও মানা তারা শুনবে না! চ্যাপ্টা মুখ চীনারা কবে এসে বোমা ফেলে তার ঠিক কি? তাই মেদিনীপুর উড়িষ্যা ও বিহারের দেশোয়ালী ভায়েরা নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে প্রস্থান করল।

কৈবল্যদায়িনীর আশ্রয়ে যে ঝি-চাকরেরা ছিল তাদের অনেক রকম প্রলোভন দেখানো হল। দুই মাসের মাইনে আগাম দেয়া হবে, নতুন ধুতি-শাড়ী কিনে দেয়া হবে, দুই বেলা খাওয়া-দাওয়ার সুখ-সুবিধে করে দেয়া হবে…কিন্তু ভবী ভোল্‌বার নয়। দেশের বাড়ী…গরু জরু লেড়কা বাচ্চা তাদের মন টেনেছে। আর তারা কল্‌কাতা শহরে থাক্‌তে রাজি নয়। প্রাণ যদি বাঁচে তবে ফিরে এসে অনেক টাকা তারা আবার কামাই করতে পারবে।

এখন প্রত্যেক বাড়ীর কর্ত্তার বাজারের পথে দেখা হলে,—নিজেদের কুশল প্রশ্ন নয়। প্রথমেই জিজ্ঞেস করা, —চাকরটি আছে না চলে গেছে?

সকলেই কপালে করাঘাত করে নিজেদের দুর্ভাগ্যের কথা অপরকে জানায়।

সকলেরই প্রায় একই অবস্থা। কাজেই সকলেই সকলের সমব্যথী।

ধনঞ্জয় বল্লে, তাইত গিন্নি, কী দুর্দ্দিন এলো—

গিন্নি কৈবল্যদায়িনী বল্লে, তাইত! এই কাঁড়ি কাঁড়ি বাসন এখন কে মাজে—আমি শুধু তাই ভাবছি।

কোমরে এমন একটা বাতের ব্যথা চাগাড় দিয়ে উঠেছে যে কী বলব!

ধনঞ্জয় বল্লে, তাইত! আমার আবার সকাল সকাল অফিস! কাগজ পড়ে, দাড়ি কামিয়ে আর বাজার করার সময় পাইনে! কী যে গতি হবে একমাত্র মধুসূদনই জানেন।

ওপাশ থেকে হঠাৎ হুঙ্কার শোনা যায়! মহাদেব সিংহ-গর্জ্জন করছে।

—কেন, এইবার পরিবার পরিকল্পনার কেরামতি দেখাও।

সঙ্গে সঙ্গে মোহমুদ্গরধারিণীর মোহ-ভঙ্গকারী কণ্ঠস্বর শোনা গেল—

—ওরে লেণ্টু, মেণ্টু, সেণ্টু, গেণ্টু, তোরা দল বেঁধে বাজারে যা। ভাল ভাল মাছ তরী-তরকারী যা পাবি সব নিয়ে আসবি।

আর বুটু, মুটু, খুটু, পুটু, সুটু…তোরা সব বাসন মাজতে বসে যা। ঝি চাকর পালিয়েছে ত' বয়েই গেল! আমরা ত আর আটকুঁড়ির রাজ্যে বাস করি না! শত্তুরের মুখে

ছাই দিয়ে বেঁচে থাক আমার গোপালের দল—চোর আসুক, ছ্যাচোড় আসুক, ঝি-চাকর পালাক—আমাদের মারে কে! মাথার ওপর দর্পহারী মধুসূদন রয়েছেন না!

মোহমুদ্গরধারিণীর এই আস্ফালন শুনে এপাশে কৈবল্যদায়িনীর মনে হল, মা বসুন্ধরা, তুমি দ্বিধা হও,—আমি তার ভেতর ঢুকে আমার এই কালো মুখ লুকোই—

কিন্তু আজকের দিনে ইচ্ছে হলেই কোনো মনোবাসনা পূর্ণ হয় না।

কাজেই কৈবল্যদায়িনীকে সেই কালো মুখ নিয়েই কলঙ্ক-ভঞ্জনের জন্যে কালাচাঁদকেই দিন রাত ডাকাডাকি সুরু করতে হল!

ধনঞ্জয় ওদিকে রাগে কেবলই ফুলতে লাগ্‌ল আর আপন মনে বিড় বিড় করে বকতে থাকল, কী কুক্ষণেই পরিবার পরিকল্পনার প্ল্যানটা আমার মগজে বাসা বেঁধেছিল; এখন যে ধনে-প্রাণে বিনষ্ট হতে বসলাম!

এই পাড়ার দৈনন্দিন উত্তেজনা যেন কেমন আপনা-থেকেই ঝিমিয়ে এলো।

বাড়ীর কর্তারা গামছা পরে অন্দর মহলে মুখ লুকিয়ে বাসন মাজে, তারপর খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে জামা-কাপড়ে ভদ্র সেজে পান চিবুতে চিবুতে ছাতা হাতে অফিসের পথে হাঁটা দেয়।

সেই যে দ্বিজু কবি বলে গেছে—

"প্রাণ রাখিতে সদাই প্রাণান্ত—
জন্মিতে কে চাইত—যদি আগে সেটা জানতো।"

ইতিমধ্যে খবর পাওয়া গেল,—চ্যাপ্টা মুখ চীনারা হিমালয়ে দাঁত বসিয়ে দেখল, ওটা বড্ড শক্ত! তাতে দাঁতই শুধু ভাঙবে আর মুখই কেবল রক্তারক্তি হবে··· আসল কাজ বিশেষ এগুবে না!

কাজেই ওরা নাকি সব ফিরে চলে গেছে!

এইবার একজন দু'জন করে ঝি-চাকর ফিরে আস্‌তে লাগলো। বাড়ীর কর্তা-গিন্নিদের মুখে আবার হাসি ফিরে এলো।

ধনঞ্জয় আস্ফালন করে বল্লে, আরে বাবা, চিরদিন কি সবার একরকম যায়? আমাদের সুদিন শীগ্রি ফিরে আস্‌ছে। ওই যে শাস্ত্রে রয়েছে—

"চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে—
সুখানি চ দুখানি চ॥"

তা শাস্ত্রবাক্য ত' আর মিথ্যে হতে পারে না! তখন পুড়ে মরবে ওই পঙ্গপালের দল!

কিন্তু কিছুদিন বাদেই যে খবর এলো—তা গেরস্তদের একেবারে আশঙ্কাজনক।

গোটা অঞ্চলে রেশন ব্যবস্থা চালু হচ্ছে। এদিকে চাল-ডাল বাড়ন্ত, বাজার থেকে সরষের তেল একেবারে উধাও। শুধু নাই-নাই আর খাই-খাই শব্দ।

এর জন্যেই রেশন কার্ডের ব্যবস্থা!

সরকারী হুকুমে সবাইকে কার্ড করে নিয়ে আসতে হল। কিন্তু গেরস্তরা চোখে একেবারে আঁধার দেখলে।

সব কিছু ব্যাপারে লাইন দিতে হবে—

রেশন কার্ড নিয়ে লাইন—

দুধের বোতল নিয়ে লাইন—

সরষের তেলের জন্যে লাইন—

মাছের জন্যে লাইন—

কয়লার জন্যে লাইন—

কিসের জন্যে লাইন নয়??

ধনঞ্জয়ের অমন পাকানো গোঁফ ঝুলে পড়েছে।

গিন্নির কাছে গিয়ে কাঁদো কাঁদো সুরে বল্লে এখন আমাদের উপায়?

গিন্নি কৈবল্যদায়িনী বল্লে, প্রতিটি লাইনের জন্যে যদি একটি করে চাকর বহাল করতে হয় তা হলে মাসের শেষে কি পরিমাণ খরচ পড়ে সেটা হিসেব করে দেখ—

ধনঞ্জয় উত্তর দিলে, ওদের যদি লাইনে দাঁড় করিয়ে দেয়া যায়—তা হলে আদ্ধেক জিনিস ত' পথ থেকেই উধাও হয়ে যাবে!

গিন্নি বল্লে, আরো একটা কথা ভাববার আছে। এই সব চাকরদের খোরাকি দিয়ে রাখবে—না, আপ-খোরাকি বহাল করবে? যদি খোরাকি দিয়ে রাখো তবে রোজকার খোরাক আর মাইনে! কিন্তু এই হাতীর খোরাক জোগাবে কে শুনি? যদি আপ-খোরাকি হিসেবে রাখো—তাহলে আমাদের রেশন আর বাড়ী পর্য্যন্ত পৌছুবে না! পথের মাঝখানেই ধুলো হয়ে,—হাওয়া হয়ে মিশে যাবে—

এ বাড়ীতে কর্ত্তা-গিন্নি যখন হা-হুতাশ করছেন তখন পাশের বাড়ীতে মহাদেবের হাঁকডাক শোনা গেল—

—ওরে লেণ্টু, মেণ্টু, সেণ্টু···রেশনেরথলি নিয়ে যা—

—গেণ্টু আর ভুণ্টু যা···সরষের তেলের টিন নিয়ে—

বুটু, ফুটু, মুটু·· দুধের বোতল নিয়ে এগো—

পুটু, স্থটু, ঘুটু···মাছের বাজারে লাইন দে—

রণকুশলী বিজয়ী সেনাপতির মতো মহাদেব এক এক বাহিনীকে এক এক অঞ্চলে যুদ্ধজয়ের জন্যে পাঠাতে সুরু করল—

পঙ্গপাল বাহিনী সেনাপতির আদেশ পালন করতে কুইক্‌-মার্চ করে এগিয়ে যেতে লাগ্‌লো—

কিন্তু পাশের বাড়ীর কর্ত্তা-গিন্নি পরিবার পরিকল্পনায় জীবন-যুদ্ধে ব্যর্থ ও জর্জ্জরিত হয়ে জানালা দিয়ে জুল্‌-জুল্ করে তাকিয়ে রইল!

বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা

শ্রীসুধীর গুপ্ত

(১)

দেহ-নিবেদন করিবার আয়োজনে
মাতিয়াছি কত পুলকিত প্রসাধনে;
বাসর-বিলাসে অভিনব নদীয়ার
গাঁথিয়াছি কত সুরভিত ফুল-হার!
এবে সবই শেষ, সে বেশ ঘুচালো প্রভু,—
স্মৃতি সব বুকে বিবাগিনী কাঁদে তবু।

(২)

কপাল ভেঙেছে, বিবাগী হয়েছে প্রিয়;
ফেলে গেছে পিছে স্মৃতি সব লোভনীয়।
মধুর বিধুর নদীয়া-নিলয় ঘিরে
ভিড় করে প্রীতি-স্মৃতি শুধু ঘুরে-ফিরে;
বুকের বেদনা নয়ন ছাপায়ে বয়;
কা'রে ক'বো ব্যথা? এ ব্যথা বলারও নয়।

(৩)

যা'র'পরে ছিলো সবচেয়ে অধিকার
দরশ পরশ আর তো পাবো না তা'র।
পাপী তাপী শুনি সবারই সে মহাপ্রভু;
পদ-ছায়া দিতে মোরে তা'রও বাধা তবু!
কাল-সন্ন্যাসে হয়েছি সন্ন্যাসিনী;
সন্ন্যাস তা'র মোরে করে বিবাগিনী।

(৪)

বিরহে বিরহে পুড়ে পুড়ে অনিবার
বিষ্ণুপ্রিয়ার বাকী নাই কিছু আর।
নব প্রাণ-মন পাষাণ প্রভু কি দিয়া
গৃহ সন্ন্যাসই পেলো হায় আয়োজিয়া?
অশ্রু-সাগর মথিতে মথিতে দেখি,
অমিয়-নিমাই-ভাব-কায়া জাগে, একী!

(৫)

সে ভাব-রূপের—প্রেমের অবধি নাই;
সময়-সাগরে মহাভাবে ভেসে যাই।
অপার মিলনে—অপার বিরহ বুকে,
অপার বিরহে—অপার মিলন সুখে
নদীয়ার সাথে নীলাচল চির-বাঁধা;
এতো থই-হারা প্রেমও কি পেয়েছে রাধা?

(৬)

কে বলে পাষাণ বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রিয়;—
সবচেয়ে বেশী সে পেয়েছে প্রেমামিয়।
দেহের গণ্ডী চিরতরে ঘুচাবার
সে প্রেম নহিলে, সাধ্য আছিল কা'র!
পূজা-ঘরে ব'সে নিরালায় নদীয়ায়
প্রিয়-প্রেমে সবই একাকার হ'য়ে যায়।

সেকালের আমোদ-প্রমোদ

পৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এ বছরের শারদীয় দুর্গোৎসবের আনন্দময়-শুভদিন তো সামনেই এগিয়ে এলো। দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে আজকাল বাঙলাদেশের গ্রামে-শহরের সর্ব্বত্র পাড়ায়-পাড়ায় ছোট বড় নানা ধরণের বারোয়ারী-পুজোর যে হুজুক-হিড়িক, বেপরোয়া আমোদ-প্রমোদের আসর, ধুমধাম আড়ম্বর আর বিপুল সমারোহের ঘটা সুরু হয়ে যায়, সে অভিজ্ঞতা সকলেরই আছে। কিন্তু আজ থেকে একশো বছর আগে, আমাদের দেশে—বিশেষভাবে ইংরাজের হাতে-গড়া কলিকাতা-শহরে বারোয়ারি দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে কি ধরণের ধুমধাম সমারোহ আর বিচিত্র আনন্দ অনুষ্ঠানের আয়োজন-ব্যবস্থাদি হতো, সেকালের সুপ্রসিদ্ধ কথাশিল্পী মনীষী ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের রচিত সুপ্রাচীন 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' গ্রন্থে সে সম্বন্ধে পরম কৌতূহলোদ্দীপক নানান্ বিচিত্র তথ্য-বিবরণের হদিশ পাওয়া যায়। একালের অনুসন্ধিৎসু-পাঠকপাঠিকাদের অবগতির উদ্দেশ্যে, আপাততঃ, তারই কিছু নিদর্শন নীচে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

* * * *

(৺কালীপ্রসন্ন সিংহ রচিত 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত)

······বারো জনে একত্র হয়ে কালী বা অন্য দেবতার পূজা করার প্রথা মড়ক হতেই সৃষ্টি হয়—ক্রমে সেই অবধি "মা" ভক্তি ও শ্রদ্ধার অনুরোধে ইয়ারদলে গিয়ে পড়েন। মহাজন, গোলদার, দোকানদার ও হেটোরাই বারোইয়ারি পূজার প্রধান উদ্যোগী। সম্বৎসর যার যত মাল বিক্রী ও চালান হয়, মণ পিছু এক কড়া, দু কড়া ও পাঁচ কড়ার হিসাবে বারোইয়ারি খাতে জমা হয়ে থাকে, ক্রমে দুই এক বৎসরের দস্তুরি বারোইয়ারি খাতে জম্‌লে মহাজনদের মধ্যে বর্দ্ধিষ্ণু ও ইয়ারগোচের সৌখীন লোকের কাছেই ঐ টাকা জমা হয়, তিনি বারোইয়ারি পুজোর অধ্যক্ষ হন—অন্য চাঁদা আদায় করা, চাঁদার জন্য ঘোরা ও বারোইয়ারি সং ও রং-তামাসার বন্দোবস্ত করাই তাঁর ভার হয়।

এবার ঢাকার বীরকৃষ্ণ দাঁই বারোইয়ারির অধ্যক্ষ হয়েছিলেন, সুতরাং দাঁ মহাশয়ের আমমোক্তার কানাইধন দত্তই বারোইয়ারির বার্ষিক সাদা ও আর কাজের ভার পেয়েছিলেন।

দত্ত বাবুর গাড়ি রুনু রুনু ছুনু ছুনু করে সুড়িবাটা লেনের এক কায়স্থ বড় মানুষের বাড়ির দরজায় লাগ্‌লো। দত্ত বাবু তড়াক করে গাড়ি থেকে লাপিয়ে পড়ে দরওয়ানদের কাছে উপস্থিত হলেন। সহরের বড় মানুষের বাড়ির দরওয়ানরা খোদ হুজুর ভিন্ন নদের রাজা এলেও খবর নদারক! "হোরির বক্‌সিস্" "দুর্গোৎসবের পার্ব্বণী" "রাখি পূর্ণিমার প্রণামী" দিয়েও মন পাওয়া ভার! দত্তবাবু

অনেক ক্লেশের পর চার আনা কবলে একজন দরওয়ানকে বাবুকে এৎলা দিতে সম্মত কল্লেন। সহরের অনেক বড় মানুষের কাছে "কর্জ্জ দেওয়া টাকার সুদ" বা তাঁর "পৈতৃক জমিদারী" কিনতে গেলেও বাবুর কাছে এৎলা হলে, হুজুরের হুকুম হলে লোক যেতে পায়; কেবল দুই এক জায়গায় অবারিত দ্বার! এতে বড় মানুষদেরো বড় দোষ নাই, "ব্রাহ্মণ পণ্ডিত" 'উমেদার' 'কন্যাদায়' 'আইবুড়ো' ও 'বিদেশী ব্রাহ্মণ' ভিক্ষুকদের জ্বালায় সহরে বড় মানুষদের স্থির হওয়া ভার। এঁদের মধ্যে কে মৌতাতের টানাটানির জ্বালায় বিব্রত, কে যথার্থ দায়গ্রস্ত, এপিডেপিট কল্লেও বিশ্বাস হয় না। দত্তবাবু আধ ঘণ্টা দরজায় দাঁড়িয়ে রইলেন, এর মধ্যে দশ বারো জনকে পরিচয় দিতে হলো, তিনি কিসের জন্যে হজুরে এসেচেন—ও দুই একটা বেয়াড়া রকমের দরওয়ানি ঠাট্টা খেয়ে গরম হচ্ছিলেন, এমন সময় তাঁর চার আনা দাতুনে দরোয়ান ঢিকুতে ঢিকুতে এসে তাঁরে সঙ্গে করে নিয়ে হজুরে পেশ কল্লে!

হজুর দেড় হাত উঁচু গদির উপরে তাকিয়ে ঠেস দিয়ে বসে আছেন, গা আদুড়! পাশে মুনসি মশায় চস্‌মা চোকে দিয়ে পেস্কারের সঙ্গে পরামর্শ কচ্চেন—সাম্‌নে কতকগুলো খোলা খাতা ও এক ঝুড়ি চোতা কাগজ, আর এক দিকে চার পাঁচ জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাবুকে "ক্ষণজন্মা" "যোগভ্রষ্ট" বলে তুষ্ট কর্‌বার অবসর খুঁজচেন। গদির বিশ হাত অন্তরে দু'জন বেকার "উমেদার" ও একজন বৃদ্ধ "কন্যাদায়" কাঁদ কাঁদ মুখ করে ঠিক "বেকার" ও "কন্যাদায়" হালতের পরিচয় দিচ্চেন। মোসাহেবরা খালি গায়ে ঘুরঘুর কচ্চেন, কেউ হুজুরের কানে কানে দুচার কথা কচ্চেন—হজুর ময়ূরহীন কার্ত্তিকের মত আড়ষ্ট হয়ে বসে রয়েছেন। দত্তবাবু গিয়ে নমস্কার কল্লেন।

হজুর বারোইয়ারি পূজোর বড় ভক্ত, পূজোর কদিন দিবারাত্রি বারোইয়ারিতলাতেই কাটান। ভাগ্‌নে, মোসাহেব জামাই ও ভগিনীপতিরা বারোইয়ারির জন্য দিনরাত শশব্যস্ত থাকেন।

দত্তবাবু বারোইয়ারি বিষয়ক নানা কথা কয়ে হজুরি সবিস্‌ক্রিপশন্ হাজার টাকা নিয়ে বিদেয় নিলেন, পেমেন্টের সময় দাওয়ানজী শতকরা দু টাকার হিসাবে দস্তুরি কেটে ন্যান, দত্তজা ঘরপোড়া কাটের হিসাবে ও দাওয়ানজীকে খুসি রাখ্‌বার জন্য তাতে আর কথা কইলেন না। এদিকে বাবু বারোইয়ারি পূজোর ক' রাত্তির কোন্ কোন্ রকম পোশাক পরবেন, তারই বিবেচনায় বিব্রত হলেন।

কানাইবাবু বারোইয়ারি বই নিয়ে না খেয়ে বেলা দুটো অবধি নানা স্থানে ঘুরলেন, কোথাও কিছু পেলেন, কোথায় সমস্ত টাকা সই মাত্র হলো (আদায় হবে না, তার ভয় নাই), কোথায় গলা ধাকা, তামাশা ও ঠোনাটা-ঠানাটাও সইতে হলো।

বিশ বছর পূর্ব্বে কলকেতার বারোইয়ারি চাঁদা সাদায়া প্রায় দ্বিতীয় অষ্টমের পেয়াদা ছিলেন—ব্রহ্মোত্তর জমির খাজনা সাদার মত লোকের উনোনো পা দিয়ে টাকা আদায় কত্তেন—অনেকে চোটের কথা কয়ে বড় মানষেদের তুষ্ট করে টাকা আদায় কত্তেন।

একবার এক দল বারোইয়ারি একচক্ষু কাণা এক সোনার-বেণের কাছে চাঁদা আদায় কত্তে যান। বেণেবাবু বড়ই কৃপণ ছিলেন, "বাবার পরিবারকে" (অর্থাৎ মাকে) ভাত দিতেও কষ্ট বোধ কত্তেন, তামাক-খাবার পাতের শুক্‌নো নলগুলি জমিয়ে রাখতেন, এক বৎসরের হলে ধোবাকে বিক্রি কত্তেন তাতেই পরিবারের কাপড় কাচার দাম উসুল হতো। বারোইয়ারির অধ্যক্ষেরা বেণেবাবুর কাছে চাঁদার বই ধল্লে তিনি বড়ই রেগে উঠ্‌লেন ও কোন মতে এক পয়সাও বারোইয়ারিতে বেজায় খরচ কত্তে রাজি হলেন না, বারোইয়ারির অধ্যক্ষেরা অনেকক্ষণ ঠাউরে ঠাউরে দেখ্‌লেন, কিন্তু বাবুর বেজায় খরচের কিছুই নিদর্শন পেলেন না—তামাক গুলি পাকিয়ে কোম্পানির কাগজের সঙ্গে বাক্সমধ্যে রাখা হয়—বালিসের ওয়াড়, ছেলেদের পোশাক, বেণেবাবু অবকাশমত স্বহস্তেই সেলাই করেন—চাকরদের কাছে (একজন বুড়ো উড়ে মাত্র) তামাকের গুল, মুড়ো খেংরার দিনে দুবার নিকেশ নেওয়া হয়—ধুতি পুরনো হলে বদল দিয়ে বাসন কিনে থাকেন—বেণেবাবুর ত্রিশ লক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ ছিল, এ সওয়ায় তার সুদ ও চোটায় বিলক্ষণ দশ টাকা আস্‌তো, কিন্তু তার এক পয়সা খরচ কত্তেন না। (পৈতৃক পেশা) খাঁটি টাকায় মাকু চালিয়ে যা রোজগার কত্তেন, তাতেই সংসার নির্ব্বাহ হতো; কেবল বাজে খরচের মধ্যে একটা চক্ষু, কিন্তু চসমায় দুখানি পরকোলা বসান; তাই দেখে বারোইয়ারির

অধ্যক্ষেরা ধরে বসলেন, "মশাই! আপনার বাক্সে খরচ ধরা পড়েছে হয় চশমাখানির একখানি পরকোলা খুলে ফেলুন, নয় আমাদের কিছু দিন।" বেণেবাবু এ কথায় খুসি হলেন, শেষে অনেক কষ্টে দুটি সিকি পর্য্যন্ত দিতে সম্মত হয়েছিলেন!

আর একবার এক দল বারোইয়ারি পূজোর অধ্যক্ষ সহরের সিংগি বাবুদের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত, সিংগি বাবু সে সময় আপিসে বেরুচ্ছিলেন, অধ্যক্ষেরা চার পাঁচ জনে তাঁকে ঘিরে ধরে "ধরেছি" "ধরেছি" বলে চেঁচাতে লাগ্‌লেন। রাস্তায় লোক জমে গ্যালো। সিংগিবাবু অবাক্—ব্যাপারখানা কি ? তখন একজন অধ্যক্ষ বল্লেন, 'মহাশয়! আমাদের অমুক জায়গার বারোইয়ারি পূজোর মা ভগবতী সিংগির উপর চড়ে কৈলাস থেকে আস্‌ছিলেন পথে সিংগির পা ভেঙ্গে প্যাছে; সুতরাং তিনি আর আস্‌তে পাচ্চেন না, সেইখানেই রয়েচেন; আমাদের স্বপ্ন দিয়েছেন যে, যদি আর কোন সিংগির যোগাড় কত্তে পার তা হলেই আমি যেতে পারি। কিন্তু মহাশয়! আমরা আজ এক মাস নানা স্থানে ঘুরে বেড়াচ্চি, কোথাও আর সিংগির দেখা পেলাম না; আজ ভাগ্যক্রমে আপনার দেখা পেয়েচি কোন মতে ছেড়ে দেবো না। চলুন! যাতে মার আসা হয়, তারই তদ্বির কর্‌বেন।" সিংগিবাবু অধ্যক্ষদের কথা শুনে সন্তুষ্ট হয়ে বারোইয়ারি চাঁদায় বিলক্ষণ দশ টাকা সাহায্য কল্লেন।

এ ভিন্ন বারোইয়ারি চাঁদা সাধার বিষয়ে নানা উদ্ভট কথা আছে, কিন্তু এখানে সে সকল উত্থাপন নিষ্প্রয়োজন। পূর্ব্বে চুঁচড়োর মত বারোইয়ারি পূজো আর কোথাও হতো না,......গুপ্তিপাড়া, কাঁচড়াপাড়া, শান্তিপুর, উলো প্রভৃতি কলকেতার নিকটবর্ত্তী পল্লীগ্রামে ক বার বড় ধূম করে বারোইয়ারি পূজো হয়েছিলো। এতে টক্করাটক্করিও বিলক্ষণ চলেছিলো। একবার শান্তিপুরওয়ালারা পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ করে এক বারোইয়ারি পূজো করেন, সাত বৎসর ধরে তার উজ্জুগ হয়, প্রতিমেখানি ষাট হাত উঁচু হয়েছিল, শেষে বিসর্জ্জনের দিনে প্রত্যেক পুতুল কেটে কেটে বিসর্জ্জন কত্তে হয়, তাতেই গুপ্তিপাড়াওয়ালারা 'মা'র' অপঘাত মৃত্যু উপলক্ষে গণেশের গলায় কাচা বেঁধে এক বারোইয়ারি পূজো করেন, তাতেও বিস্তর টাকা ব্যয় হয়।
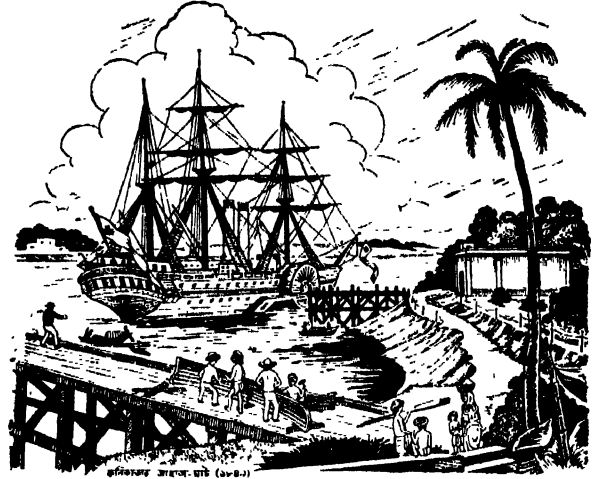
কলিকাতার জাহাজ-ঘাট (১৮৪৯)

বারোইয়ারি প্রতিমেখানি প্রায় বিশ হাত উঁচু—ঘোড়ায় চড়া হাইল্যাণ্ডের গোরা, বিবি, পরী ও নানাবিধ চিড়িয়া, সোলার ফুল ও পদ্ম দিয়ে সাজানো—মধ্যে মা ভগবতী জগদ্ধাত্রীমূর্ত্তি—সিংগির গা রূপলী গিল্‌টি ও হাতী সবুজ মখমল দিয়ে মোড়া। ঠাকুরুণের বিবিয়ানা মুখ—রং ও গড়ন আসল ইহুদী ও আরমানী কেতা; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও ইন্দ্র দাঁড়িয়ে জোড়হাত করে স্তব কচ্চেন। প্রতিমের উপরে ছোট ছোট বিলাতী পরীরা ভেঁপু বাজাচ্চে—হাতে বাদশাই নিশেন ও মাঝে ঘোড়া সিংগিওয়ালা কুইনের ইউনিকরন ও ক্রেষ্ট!

আজ বারোইয়ারির প্রথম পূজো শনিবার—বীরকৃষ্ণ দাঁ, কানাই দত্ত, প্যালানাথ বাবু ও বীরকৃষ্ণবাবুর ফ্রেণ্ড আহিরীটোলার রাধামাধব বাবুরো ব্যালা তিনটে পর্য্যন্ত বারোইয়ারিতলায় হাজরাও হয়েছিলেন—তিনটা বড় বড় অর্ণা মোষ, এক শ ভেড়া ও তিন শ পাঁটা বলিদান করা হয়েছে—মূল নৈবিদ্যির আগা তোলা মোণ্ডাটি ওজনে দেড় মণ! সহরের রাজা, সিংগি, ঘোষ, দে, মিত্র ও দত্ত প্রভৃতি বড় বড় দলস্থ ফোঁটা; চেলীর জোড়; টিকি ও তেলকধারী উদ্দি ও তক্‌মাওয়ালা যত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিদেয় হয়েচে—"সুপারিস্" "অনাহূতে" "বেদলে" ও "ফলারেরা" নিমতলায়

শকুনির মত টেঁকে বসে আছেন—কাঙ্গালী, রেও, অগ্রদানী, ভাট ও ফকির বিস্তর জমেছিল—পাহারা-ওয়ালারাই তাঁদের বিদেয় দেন—অনেক গরীব গ্রেপ্তার হয়! শেষে গাঁট থেকে কিছু বার কল্লে থানার দারোগা ও জমাদারের সূক্ষ্ম বিবেচনায় সে বারের মত রেহাই পায়!

ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এলো—বারোইয়ারিতলা লোকারণ্য। সহরের অনেক বাবু গাড়ি চড়ে সং দেখতে এসেচেন—সং ফেলে অনেকে তাঁদের দেখ্‌চে। ক্রমে মজলিশে দু এক ঝাড় জ্বেলে দেওয়া হলো—সঙেদের মাথার উপর বেল ল্যান্‌ঠন বাহার দিতে লাগলো। অধ্যক্ষ বাবুরো একে একে জমেয়াৎ হতে লাগলেন, নল করা থেলো হুঁকো হাতে ও পান চিবুতে চিবুতে অনেকে চীৎকার ও "এটা কর" "ওটা কর" করে হুকুম দিচ্চেন। আজ ধোপাপাড়ার ও চকের দলের লড়াই হবে। দেড় মণ গাঁজা, দুই মণ চরস, বড় বড় সাত গামলা দুধ ও বারোখানি বেণের দোকান ঝেঁটিয়ে ছোড় বড় মাঝারি এলাচ, কর্পূর, দারুচিনি সংগ্রহ করা হয়েচে—মিটে, কড়া, ভ্যালসা, অম্বুরি ও ইরাণী তামাকের গোবর্দ্ধন হয়েচে! এ সওয়ায় বিস্তর অন্তঃশিলে সরঞ্জম ও প্রস্তুত আছে। আবশ্যক হলে দেখা দেবে।

শহরে ঢি ঢি পড়ে গ্যাচে আজ রাত্তিরে অমুক জায়গায় বারোইয়ারি পূজোর হাফ আখড়াই হবে। কি ইস্কার গোচের স্কুল বয়, কি বাহাত্তুরে ইনভেলিড, সকলেই হাফ আখড়াই শুনতে পাগল! বাজার গরম হয়ে উঠল। ধোপাড়া বিলক্ষণ রোজগার কত্তে লাগলো! কোঁচান ধুতি, ধোপদস্ত কামিজ ও ডুরে শান্তিপুরে উড়ুনির এক রাত্তিরের ভাড়া আট আনা চড়ে উঠলো! চারপুরুষে পাঁচ পুরুষে ক্রেপ্‌ ও নেটের চাদরেরা অকর্ম্মণ্য হয়ে নবাবী আমলে সিন্দুক আশ্রয় করে ছিলেন, আজ ভলন্টিয়র হয়ে মাথায় উঠলেন। কালো ফিতের ঘুনুসি ও চাবির শিকলি হঠাৎ বাবুর মত স্বস্থান পরিত্যাগ করে, ঘড়ির চেনের অফিশিয়েটিং হলো—জুতোরা বেশ্যার মত নানা লোকের সেবা কত্তে লাগলো।

* * *

ঢং ঢং করে গির্জ্জার ঘড়িতে রাত্তির দুটো বেজে গ্যালো। ধোপাপাড়ার দল ভরপুর নেশায় ভোঁ হয়ে টল্‌তে টল্‌তে আসরে নাব্‌লেন। অনেকে আখড়া ঘরে (সাজঘরে) শুয়ে পড়লেন।......ডেড় ঘণ্টা ঢোল, বেহালা, ফুলুট, মোচোং ও সেতারের রং ও সাজ বাজ্‌লো—গোঁড়ারা দু শ বাহবা ও বেশ দিলেন—শেষে একটি ঠাকুরুণবিষয় গেয়ে (আমরা গানটি বুঝ্‌তে অনেক চেষ্টা কল্লেম, কিন্তু কোনমতে কৃতকার্য্য হতে পাল্লেম না) উঠে চলে গেলে চকের দল আসরে নাব্‌লেন।

চকের দলেরাও ঐ রকম গেয়ে শোভান্তরী! সাবাস! ও বাহবা! নিয়ে উঠে গ্যালেন—এক ঘণ্টার জন্য মজলিশ খালি রইলো, চায়নাকোট-ক্রেপের, নেটের ও ডুরে ফুলদার ট্যারচা চাদরেরা—পিঁপড়ের ভাঙ্গা সারের মত ছড়িয়ে পড়্‌লেন। পানের দোকান শূন্য হয়ে গ্যালো। চুরোট তামাক ও চরসের ধূঁয়ায় এমনি অন্ধকার হয়ে উঠলো যে, সে বারে "প্রোক্লেমেশানের উপলক্ষে বাজিতে" বা কি ধোঁ হয়েছিল! বড় বড় রিভিউয়ের তোপেও ত্র ধোঁ জন্মে না! আদ ঘণ্টা প্রতিমেখানি দেখা যায় নি ও পরস্পর চিনে নিতেও কষ্ট বোধ হয়েছিলো।

ক্রমে হঠাৎ বাবুর টাকার মত, বসন্তের কুয়াশার মত ও শরতের মেঘের মত ধোঁ দেখ্‌তে দেখ্‌তে পরিষ্কার হয়ে গ্যালো! দর্শকেরা সুস্থির হয়ে দাঁড়ালেন, ধোপাপুকুরের দল আসর নিয়ে বিরহ ধল্লেন। আদ ঘণ্টা বিরহ গেয়ে আসর হতে দলবল সমেত আবার উঠে গ্যালেন। চকবাজারেরা নাব্‌লেন ও ধোপাপুকুরের দলের বিরহের উতোর দিলেন। গোঁড়ারা রিভিউয়ের সোল্‌জারদের মত দল বেঁধে দু থান হলো। মধ্যস্থারা গানের চোতা হাতে করে বিবেচনা কত্তে আরম্ভ কল্লেন—এক দলে মিস্তির খুড়ো আর এক দলে দাদাঠাকুর বাঁদন্দার!

বিরহের পর চাপা কাঁচা খেঁউড়; তাতেই হার জিতের বন্দোবস্ত, বিচারও শেষ (মধুরেণ সমাপয়েৎ) মারামারিও বাকি থাক্‌বে না।

তোপ পড়ে গিয়েচে, পূর্ব্বদিক্‌ ফরসা হয়েচে, ফুরফুরে হাওয়া উঠেচে—ধোপাপুকুরের দলেরা আসর নিয়ে খেঁউড় ধল্লেন, গোঁড়াদের "সাবাস"! "বাহবা"! "শোভান্তরী"! "জিতা রও"! দিতে দিতে গলা চিরে গ্যালো; এরই তামাশা দেখ্‌তে যেন সূর্য্যদেব তাড়াতাড়ি উদয় হলেন!

বাঙ্গালিরা আজো এমন কুৎসিত আমোদে মত্ত হন বলেই যেন—চাঁদ ভদ্রসমাজে মুখ দেখাতে লজ্জিত হলেন! কুমুদিনী মাতা হেঁট কল্লেন! পাখীরা ছি! ছি! করে চেঁচিয়ে উট্‌লো! পদ্মিনী পাঁকের মধ্যে থেকে হাস্‌তে লাগ্‌লেন! ধোপাপুকুরের দল আসর নিয়ে খেঁউড় গাইলেন, সুতরাং চকের দলকে তার উতোর দিতে হবে। ধোপাপুকুরওয়ালারা দেড় ঘণ্টা প্রাণপণে চেঁচিয়ে খেঁউড়টি গেয়ে থাম্‌লে চকের দলেরা আসরে নাব্‌লেন, সাজ বাজ্‌তে লাগলো, ওদিকে আকড়াঘরে খেঁউড়ের উতোর প্রস্তুত হচ্ছে, আধ ঘণ্টার মধ্যে উতোরের চোতা মজলিশে দেখা দিলেন—চকের দলেরা তেজের সহিত উতোর গাইলেন! গোঁড়ারা গরম হয়ে "আমাদের জিত!" "আমাদের জিত!" করে চ্যাচাচেঁচি কত্তে লাগ্‌লেন—(হাতাহাতিও বাকি রইলো না) এদিকে মধ্যস্থরাও চকের দলের জিত সাব্যস্ত কল্লেন। হুও! হো! হো! হুর্‌রে ও হাততালিতে ধোপাপুকুরের দলেরা মাটির চেয়েও অধম হয়ে গ্যালেন—নেশার খোঁয়ারি—রাত জাগ্‌বার ক্লেশ ও হারের লজ্জায়—মুখুয্যেদের ছোট বাবু ও দু চার ধরতা দোয়ার একেবারে এলিয়ে পড়লেন।

চকের দলেরা ঢোল বেঁধে নিশেন তুলে গাইতে গাইতে ঘরে চল্লেন—কারু শুধু পা—মোজা পায়, জুতো কোথায় তার খোঁজ নাই। গোঁড়ারা আমোদ কত্তে কত্তে পেছু পেছু চল্লেন—ব্যালা দশটা বেজে গ্যালো, দর্শকরা হাফ আখড়াইয়ের মজা ভরপুর লুটে বাড়িতে এসে সুত্‌ ঠাণ্ডাই জোলাপ ও ডাক্তারের যোগাড় দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। ভাড়া ও চেয়ে নেওয়া চায়নাকোট, ধুতি চাদর জামা ও জুতোরা কাজ সেরে আপনার আপনার মনিববাড়ি ফিরে গ্যালো।

আজ রবিবার। বারোইয়ারিতলায় পাঁচালি ও যাত্রা। রাত্রি দশটার পর অধ্যক্ষেরা এসে জম্‌লেন; এখনো অনেকের "চোঁয়া ঢেকুর" "মাতা ধরা" "গা মাটি মাটি" সারে নি। পাঁচালি আরম্ভ হয়েছে—প্রথম দল গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী, দ্বিতীয় দল মহীরাবণের পালা ধরেচেন, পাঁচালি ছোট কেতার হাফ আখড়াই, কেবল ছড়া কাটানো বেশীর ভাগ, সুতরাং রাত্তির একটার মধ্যে পাঁচালি শেষ হয়ে গ্যালো।

যাত্রা। যাত্রার অধিকারীর বয়স ৭৬ বৎসর, বাব্‌রি চুল, উল্কী ও কানে মাকৃড়ি! অধিকারী দূতী সেজে গুটিবারো বুড়ো বুড়ো ছেলে সখী সাজিয়ে আসরে নাব্‌লেন। প্রথমে কৃষ্ণ খোলের সঙ্গে নাচ্‌লেন, তারপর বাসদেব ও মণিগোঁসাই গান করে গ্যালেন। সকেষ্ট সখী ও দূতী প্রাণপণে ভোর পর্য্যন্ত "কাল জল খাবো না!" "কাল মেঘ দেখ্‌বো না!" (সামিয়ানা খাটাইয়ে দিমু) "কাল কাপড় পরবো না!" ইত্যাদি কথাবার্ত্তায় ও "নবীন বিদেশিনীর" গানে লোকের মনোরঞ্জন কল্লেন। থাল, গাড়ু ঘড়া; ছেঁড়া কাপড়, পুরাণো বনাত ও শালের গাদী হয়ে গ্যালো। টাকা, আধুলি, সিকি ও পয়সা পর্য্যন্ত প্যালা পেলেন। মধ্যে মধ্যে "বাবা দে আমার বিয়ে" ও "আমার নাম সুন্দরে জেলে, ধরি মাছ বাউতি জালে' প্রভৃতি রকমওয়ারি সঙেরও অভাব ছিল না। ব্যালা আট্‌টার সময় যাত্রা ভাংলো, এক জন বাবু মাতাল পাত্র টেনে বিলক্ষণ প্যেঁকে যাত্রা শুন্‌ছিলেন, যাত্রা ভেঙ্গে যাওয়াতে গলায় কাপড় দিয়ে প্রতিমে প্রণাম কত্তে গ্যালেন (প্রতিমে হিন্দুশাস্ত্র সম্মত জগদ্ধাত্রীমূর্ত্তি), কিন্তু প্রতিমায় সিংগি হাতীকে কামড়াচ্ছে দেখে বাবু মহাত্মার বড়ই রাগ হলো ও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে করুণা সুরে—

"তারিণী গো মা কেন হাতীর উপর এত আড়ি।
মানুষ মেলে টেড টা পেতে তোমায় যেতে হতো
হরিণবাড়ি।
সুরকি কুটে সারা হতে, তোমার মুকুট যেতো গড়াগড়ি।
পুলিসের বিচারে শেষে সঁপ্‌তো তোমার গ্র্যানুবুড়ি।
সিঙ্গি মামা টের্‌টা পেতেন ছুটতে হতো উকীলবাড়ি॥"

গান গেয়ে, প্রণাম করে চলে গ্যালেন।

* * *

[ক্রমশঃ

কে বলে মা মৃন্ময়ী তুই
চিন্ময়ী মা চিরন্তনী।
নিত্যানিত্য আদি অন্ত
মহাবিশ্ব প্রসবিনী॥
শিবহৃদি বিলাসিনী বরাভয় দায়িনী,
সৃজনকারিণী মাগো দানব দলনী,
মোক্ষামোক্ষ সিদ্ধাসিদ্ধ, সর্ব কর্মে দাক্ষায়ণী॥
দুর্গমে নিস্তারিণী, (মাগো) কালভয়বারিণী,
বিশ্বপালিনী—ত্রিভুবনতারিণী,
তুই মা সাকার নিরাকারা—
গুণাতীত গুণমণি॥

রচনা—নবকুমার ভট্টাচার্য্য

সুর ও স্বরলিপি—দ্বিজেন ভট্টাচার্য্য

I{ ণা ৷ মা পা ৷ র্সা ৷´ ৷´ ৷´ ৷ ণা পা মণা পা ৷ মা রা রা ৷ ৷
কে ০ ব লে মা ০ ০ ০ মৃ ন ম০ য়ী তু ০ ই .

৷ রা মা রা ৷ সা রা ন্া সা ৷ সা রা সা রা ৷ নজ্ঞা ৷ ৷ ৷ }৷
চি ন্ ম য়ী ০ মা ০ চি র ন্ ত নী . . .

া জ্ঞা মা পা | রা া সা া | া ণ্া া পা | পা সা সা সা } |
নি ০ ত্যা নি ০ ত্য ০ আ ০ দি অ ন্ ত ০

া সা রা মা | পা ণা ণা মা | পা না র্সা র্রা | র্মজ্ঞা া া া |
ম ০ হা বি ০ শ্ব প্র স ০ বি ০ নী ০ ০ ০

ণা া মা পা | র্সা া া া | ণা া মা পা | র্সা া া া |
কে ০ ব লে মা ০ ০ ০

I{ মা পা পা পা | ণা ণা ধা ধা | না া র্সা া | া া া া |
শি ০ ব হৃ দি ০ বি লা সি ০ নী ০ ০ ০ ০ ০

না র্সা র্সর্রা র্রা | র্রা র্জ্ঞর্রা র্সা া | না র্সা নর্সা র্রর্সা | ণা া ধা ধা } |
ব রা ০০ ভ য় ০০ ০ ০ দা ০ য়ি০ ০০ নী ০ ০ ০

ধা ধা ধা ধা | ধা ধণা পা পা | মা পা পণা পা | মা া রা া |
সৃ জ ন বা রি ণী০ মা গো দা ন ব০ দ ল ০ নী ০

সা সা রা রা | মা া পা া | মা মা পা পা | না া র্সা া |
মো ০ ক্ষ মো ০ ক্ষ ০ সি ০ দ্ধা সি ০ দ্ধ ০

র্সা র্সা না র্সা | র্রা র্রা র্রা া | র্রা া সা র্রা | র্মজ্ঞা া া া |
স র্ ব ক র্ মে ০ দা ০ কা য় নী ০ ০ ০

ণা া মা পা | র্সা া া া | ণা া মা পা | র্সা া া া |
কে ০ ব লে মা ০ ০ ০

I সা সা সা সা | সা া ণা সা | পা পা রা া | া া রা রা |
দু র্ গ মে ০ নি স্ তা রি ণী ০ ০ ০ মা গো

রা া রা রা | রা সা রা রপা | পমা জ্ঞা া া | া া া া |
কা ০ ল ভ য় ০ বা রি০ ণী ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

{ মা পা পা পা | পা া পা মা | মা ণা ধা ণা | পা পধা ধপা া } |
বি ০ শ্ব পা লি ০ নী ০ ত্রি ভু ব ন তা রি০ ণী ০

পা সা র্সা না | র্সা া া র্সা | র্রর্সা র্সা ণা ণর্সা | ণর্সা র্রা া া |
তু ই মা সা কা ০ ০ র্ নি র ০ কা০ রা০ ০ ০ ০

র্সা ণা া পা | মা রা সা না | সা রা মজ্ঞা া | া া া া I
গু ণা ০ তী ত ০ গু ণ ম ০ ণি ০ ০ ০ ০ ০

।।। অসীমা ।।।

শ্রীমনীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
এম-এ-বি-এল

অপিসে গিয়ে একখানা চিঠি পেলুম। সবুজ খামে মেয়েলি হাতের গোটা গোটা অক্ষরে আমার নাম এবং অপিসের ঠিকানা লেখা।

খাম খুলে দু'বার চিঠিটা পড়ে একটু আশ্চর্য্য হলুম। আশ্চর্য্য হওয়ারই কথা। একখানা জমাটি প্রেমপত্র, আমাকেই উদ্দেশ করে লেখা। আমাকে—অর্থাৎ তিপ্পান্ন বছরের বুড়ো একটা ঝুনো অফিস-সুপারিন্টেণ্ডেকে প্রেম জানিয়েছে জলপাইগুড়ি থেকে অসীমা সেন নামক একটি মহিলা। আপনারা হয়ত মনে করতে পারেন নিছক ব্ল্যাক-মেলিং-এর উদ্দেশ্যে এটা একটা গূঢ় চক্রান্ত, কিন্তু আমি অতটা মনে করতে পারলুম না, কারণ এই অসীমা সেন আমার পরিচিতা। এক সময় একটু বেশী রকমের পরিচিতাই এ ছিল, তবে প্রেম নিবেদন করতে আমাদের কারুরই কোনদিন মনে পড়ে নি।

আজ থেকে প্রায় পঁচিশ বছর আগে—হ্যাঁ পঁচিশই হবে, সেটা ১৯৩৪ সাল, যখন আমরা বাগবাজার ষ্ট্রীটে লর্ড ক্লাইভের আমোলের এক জরাজীর্ণ বাড়ীর দোতলায় দু'খানা ঘর ভাড়া নিয়ে বাস করতুম, সেই সময় আমাদের দোতলার তৃতীয় ঘরখানা ভাড়া করে উঠে এল এই অসীমা সেন এবং তার প্রায়-বুড়ো স্বামী অবিনাশ সেন। অবিনাশ বাবুর প্রথম পক্ষের বউ মারা যাওয়ার পর নিছক ভাত-জল কে দেবে সেই চিন্তায় আকুল হয়ে, মাইনে দিয়ে রাঁধুনী রাখার পরিবর্ত্তে বিয়ে করেছিলেন এই বাপ-মা-মরা মামাতুত দাদা-বউদির গলগ্রহ অসীমাকে। অবিনাশবাবুর প্রথম পক্ষের ছেলেমেয়েরা তাদের মামার বাড়ীতে হয়তো ছিল কিম্বা ছিল না, অবিনাশ বাবু সে খবরও আর রাখতেন না। তিনি জানতেন তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের বউ অসীমাকে, দু'বছরের নতুন বাচ্ছা সুশীল ওরফে সুশীকে আর জানতেন লাল সুতোর বিড়ি এবং রেল অফিসের টাইপরাইটিং মেশিন। তিনি ছিলেন ই. আই. আর-এ টাইপিষ্ট। সন্ধ্যেবেলায় বিড়ি টানতে টানতে অপিসের গল্প বলাই ছিল তার একমাত্র অবসর বিনোদন।

১৯৩৪ সালের দু'বছর আগে আমি চাকরী পেয়েছিলুম। এখন যে অপিসে চাকরী করছি এই সরকারী অফিসেই পঁয়তাল্লিশ টাকা মাইনেয় ঢুকেছিলুম, এবং সরকারী চাকরী পাওয়ার এক বছর পরেই আমার বর্ত্তমানের স্বর্গতা জননী খুব আগ্রহ করে আমার বিয়ে দিয়েছিলেন। সে আমোলের গ্রাজুয়েট এবং ৪৫৲ টাকা মাইনের সরকারী চাকুরিয়া আমি, আমাকে হাজার এক টাকা নগদ এবং ত্রিশ ভরি সোনার গয়না দিয়ে আমার বিচক্ষণ শ্বশুর সাধাসাধি করে আমার হাতে মেয়ে তুলে দিয়েছিলেন। দোতলার দুখানা ঘরের চোদ্দ টাকা ভাড়া দিয়ে বাকী একত্রিশ টাকায় মা বউ ও আমি এই তিন-জনের সংসার বেশ স্বচ্ছন্দ ভাবেই চল্‌ছিল, এমন সময় এরা এসে আমাদের দোতলায় যে ঘরখানা ভাড়াটের অভাবে এতদিন তালাবন্ধ পড়ে ছিল সেই ঘরখানা মাসিক ছ'টাকায় ভাড়া নিলে। কল পায়খানা একতোলায় অন্য ভাড়াটের সঙ্গেই আমাদের উভয়কে ব্যবহার করতে হোত, এবং আমাদের ও অবিনাশ বাবুদের রান্না হোত ওপোরের ছাতে পাশাপাশি দুখানা টিনের চালায়। বাড়ীর এই ব্যবস্থায় সে আমলে আমাদের মনে কোন অস্বস্তি বা অভাববোধ ছিল না। তবে আমার ধারণা, অসীমা হয়ত' মধ্যে মধ্যে ক্ষীণ প্রতিবাদ জানাতো, কারণ অবিনাশ বাবু প্রায়ই বল্‌তেন, আমরা গেরস্ত ঘর, তালেবর ত নই, আমাদের এই ভালো।

বেঁটে খাটো রং ময়লা অসীমার চোখ মুখ ছিল খুব তীক্ষ্ণ। মনে হোত খুব বুদ্ধিমতী। তখন তার বয়স তার বল্‌তো কুড়ি, আমার স্ত্রী বলতেন তিরিশের একটুও ক

নয়। বউটি খুব পরিচ্ছন্ন থাকতে চেষ্টা করতো। সখও তার কম ছিল না। খুন্তি দিয়ে ছাতের শ্যাওলা চেঁচে ছাতের মেঝেটা পরিষ্কার করে ফেলেছিল,দেওয়ালের বালি-খসা সমস্ত জায়গায় নতুন পুরানো নানা রকম বিচিত্র ছবির ক্যালেণ্ডার ঝুলিয়ে ভাঙাগুলো চাপা দিয়ে ফেলতো, পুরাতন ছেঁড়া সুজনী দিয়ে জানলা দরজার পর্দা ঝুলিয়ে-ছিল। দুপুরে বসে বসে ছেলের কাঁথায় পুরানো কাপড়ের পাড়ের সুতো দিয়ে নানারকম লতাপাতা সেলাই করতো। একতোলার একমাত্র জলের কলটির সাময়িক অধিকার নিয়ে যখন সকলেই রাগারাগি করতো, তখন সে মাজা-বাসন ধোয়ার অপেক্ষায় চুপ করে দাঁড়িয়ে মিটি মিটি হাসতো। তারপর স্বামীকে অফিসে পাঠিয়ে দিয়ে ছেলেকে খাইয়ে আমার মা অথবা স্ত্রীর জিম্মায় সাময়িক ভাবে সঁপে দিয়ে নিজে স্নান করতে যেত গঙ্গায়। চৌ-বাচ্চার নোংরা তলানি জলে স্নান করতে তার মন সরতো না।

ওরা আসার প্রায় মাসখানেক পরে একদিন সকালে মা এসে আমাকে বল্লেন ওরে, অবিনাশবাবুর কাল রাত থেকে ভয়ানক জ্বর এবং সর্ব্ব শরীরে খুব ব্যথা হয়েছে। ওর বউ বল্‌ছে আমাদের ডাক্তারকে একবার ডেকে দিতে হবে। আমি বল্লুম, আচ্ছা।

পাড়ার হোমিওপ্যাথ ডাক্তার মতিবাবুর ফি এক টাকা, তাতেই তিনি ওষুধ ও দেন, ওষুধের জন্য স্বতন্ত্র কোন দাম লাগে না। বাজার থেকে ফেরার পথে মতিবাবুকে কল্ দিয়ে এলুম।

আধঘণ্টার মধ্যেই মতিবাবু এলেন। দোতলায় উঠে মতিবাবু আমাকেই ডাক দিলেন, ভদ্রতার খাতিরে ডাক্তা-রের সঙ্গে আমাকেই ওদের ঘরে যেতে হোল। ডাক্তার রোগী দেখে ব্যাগ থেকে ওষুধ বার করে মোড়া তৈরী করে আমাকেই দিলেন এবং ঔষধ ও পথ্য কখন কি দিতে হবে বউটিকে সেই সব নির্দেশ দিলেন। নাক পর্য্যন্ত ঘোম্‌টা দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বউটি সব শুনে নিলে। তারপর ডাক্তারের সঙ্গে সঙ্গে আমিও ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলুম।

কিন্তু রোগটি সহজ ছিল না। মতি ডাক্তার ঠিক ধরতে পারে নি, দু'দিন পরে বউটির আগ্রহে এলোপ্যাথ ডাক্তার ডাকা হোল এবং তিনি এসেই বল্লেন নিউমোনিয়া। সে আমোলে নিউমোনিয়া ছিল মারাত্মক রোগ, কারণ সাল-ফার গ্রুপের ওষুধ তখনও আবিষ্কৃত হয় নি। বেশ কিছু-দিন চেষ্টা করার পর অবিনাশ বাবু সেরে উঠলেন কিন্তু এই সূত্রে অসীমা সেনের ঘোম্‌টা গেল আমার কাছে খসে। আমি হলুম তার দাদা, তবে অবিনাশবাবু আমাকে ছোট ভাই বলেই মনে করতেন, তালব্যশয়ে আকার বলে এক-বারও মনে করেন নি।

অথচ অন্যদিকে আমার ঘরে চাপা অশান্তি দেখা দিলে। মা বল্লেন, রোগীকে দেখা শোনা করছ, ভালো, কিন্তু তাই বলে এতক্ষণ রোগীর ঘরে বসার দরকার কি। স্ত্রী বল্লেন, আমি বুঝি, ওঘরে এত টান কিসের! এর ফলে রোগী সেরে ওঠার মাসখানেক পরে আমাকে ও-বাড়ী ছেড়ে চলে আসতে হোল একেবারে দর্জ্জিপাড়ায়। স্ত্রী বল্লেন, খবর্দ্দার, শ্যামবাজারের দিকে একবারের জন্য বেড়াতেও যাবে না। আমি বল্লুম, আচ্ছা।

কিন্তু আসার দিন সিঁড়ির মাঝের ধাপে দাঁড়িয়ে অসীমা আমায় বলেছিল, বাড়ী ছেড়ে যাচ্ছেন যান, কিন্তু আমাদের যেন ছাড়বেন না। মনে রাখবেন, আপনি ছাড়া কলকাতা সহরে আমাদের আর কেউই নেই। অতএব দু'দিন পরে আবার এলুম এই বাড়ীতে। এসে দেখি আমার শোবার ঘরে অসীমারা উঠে এসেছে। অবিনাশ বাবু বল্লেন, দেখ ভাই, এই জন্য বাড়ীওয়ালা এক টাকা বেশী ভাড়া ধার্য্য করলো কিন্তু কি করবো, ওঁরা জোর করে এ-ঘরে এলেন, কাজেই—। কেন জানি না, আমার ঘরটাই অসীমার খুব বেশী পছন্দ হয়েছিল।

তিন বছর পরের ঘটনা। পাচ বছরের সুনীকে রেখে অবিনাশ বাবু আমার পরিত্যক্ত ঘর সমেত সমস্ত পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে পরপারে রওনা দিলেন। নিজের বাড়ীতে লুকোচুরী খেলে মাঝে মাঝে অফিসে পর্য্যন্ত ছুটী নিয়ে অসীমাদের কাজ করে দিতে হোল। শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকে যাওয়ার পর অসীমার মামাতো দাদা বল্লেন, তাহলে এবার আমাদের কাছেই চল্, আর কি করা যাবে বল্? অসীমা আমাকে আড়ালে বল্লে, দাদার কাছে যাবো না, দাদা সুবিধের লোক নয়। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকার লোভে দাদা আমাকে নিয়ে যেতে চাইছে, কিন্তু তা হবে না আমাকে ত ছেলে মানুষ করতে হবে।

বল্লুম, তাহলে আপনি থাকবেন কোথায় ?

সে বল্লে, এই বাড়ীতেই থাকবো, আপনি মাঝে মাঝে দেখাশোনা করবেন।

বল্লুম, মাসিক খরচ ? টাকা ত মোট হাজার তিনেক্ ভাঙ্গিয়ে খেলে সে আর ক'দিন ?

অসীমা বল্লে, তা বটে, কিন্তু দাদার কাছে গেলে আমি হব ঝি আর ছেলে হবে চাকর। টাকাও যাবে অথচ ছেলেও মানুষ হবে না।

আমি বল্লুম, এখানে থাকলে কিন্তু আপনার বদনামও হতে পারে।

একটু ভেবে নিয়ে অসীমা বলে, হোক, কিন্তু ছেলে আমায় মানুষ করতেই হবে। ছেলেকে আপনার মত করে লেখাপড়া শেখাবো, বলেই যেন লজ্জায় মাথা হেঁট করে ফেল্লে।

জানলা দিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে রইলুম। টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে। একখানা আলু বোঝাই মোষের গাড়ীর একটা চাকা পাশের এক গর্ত্তে পড়ে গেছে। গাড়োয়ান গাড়ী থেকে নেমে দু'হাত দিয়ে চাকাটা ঠেলে তোলার চেষ্টা করছে, ওদিকে কয়েকটা ছোট ছোট ছেলে বস্তার ফাঁক দিয়ে আলু চুরি করার সুযোগ খুঁজছে। রাস্তায় বিশেষ কোন লোক নেই। মনে হোল, রাস্তার গাড়োয়ান আলুগুলো নিরাপদে যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে, আর এদিকে ঘরের মধ্যে এক বিধবা মা তার নাবালক ছেলেকে মামাতো-মামার লুণ্ঠন থেকে বাঁচিয়ে মানুষ করে তোলার জন্য আকাশ পাতাল ভেবে কোন কূল-কিনারাই পাচ্ছে না।

গোটা কতক অশ্রাব্য মন্তব্য করে মামাতো দাদা দেশে চলে গেল। অসীমা এই বাড়ীতেই রয়ে গেল। তারপর এক বছরের সংবাদ আমি জানি। ঠোঙা তৈরী করে, বিড়ি বেঁধে, ও বাড়ীতে নতুন যে ভাড়াটে এল তাদের রান্না করে দিয়ে অসীমা সেন গর্ত্তয় পড়া মাল বোঝাই গাড়ীর চাকা ঠেল্‌তে লাগল। বাড়ীতে কাউকে না জানিয়ে আমি মাঝে মাঝে দেখা শোনা করতাম, তারপর আমার সরকারী চাকরীতে এল বদলীর হুকুম। ধরা গলায় অসীমা বল্লে, আপনিও যাবেন, তবে যান, কিন্তু আপনাকে কি চিঠি লিখ্‌তে পারবো।

বল্লুম, হ্যা, লিখ্‌বেন।

বল্লে, বাড়ীতে সেই চিঠি কেউ দেখ্‌লে আপনার কোন অসুবিধা হবে না ত ?

চম্‌কে উঠলুম। এত চেষ্টা করে যে-কথা ওর কাছে লুকিয়ে রেখেছি, সে কথা ও জানলে কি করে! ভগবান কি মেয়েদের এ বিষয়ে একটা সূক্ষ্ম চোখ দিয়েছেন!

সমাধান ওই করে দিলে। বল্লে, আপনার অফিসের ঠিকানায় খামে করে চিঠি দেব, যদি দরকার হয়।

একটু থেমে বলেছিলুম আচ্ছা। কিন্তু একখানা চিঠিও সে দেয় নি। কলকাতার বাসা উঠিয়ে বিদেশে বিদেশে ঘুরে তিন বছর পরে যুদ্ধের প্রথম হিড়িকে অল্প কয়েক দিনের জন্য কলকাতায় ফিরে বাগবাজারের পুরাতন বাড়ীতে খোঁজ করতে গিয়ে দেখলুম, সে বাড়ী ভেঙ্গে মাঠ করে সেখানে মস্ত বড় বাড়ী উঠ্‌ছে। ভবিষ্যতে সেন্ট্রাল এভিনিউ এখান দিয়ে যাবে সেই আশায় এখনই এক ধনী এখানে বড় বাড়ী হাঁকিয়েছেন। দু'একটা চেনা দোকানে খোঁজ করে অসীমাদের কোন তল্লাসই পেলুম না। মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে সে যাত্রায় ফিরতে হয়েছিল।

তারপর পৃথিবী উল্টেপাল্টে একাকার হয়ে গেছে। তেতাল্লিশের মন্বন্তর, ছেচল্লিশের দাঙ্গা, ভারতের স্বাধীনতা, বাস্তুহারাদের বিপর্য্যয়, কংগ্রেসীর শাসনের মূল্যবৃদ্ধি, আমার নিজের মাতৃবিয়োগ, পত্নী বিয়োগ এক কথায় গত দেড় যুগের মধ্যে দুমড়ে মুচড়ে ভেঙ্গে চুরে একাকার হয়ে গিয়েছি। এই সব চাপে পড়ে যে অসীমা সেন আমার মন থেকে ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল, সেই অসীমা সেন এতকাল পরে এই ১৯৫৯ সালে আমার অফিসের ঠিকানায় এক চিঠি লিখেছে জলপাইগুড়ি থেকে এবং আরও মজা এই যে, যে ভাষা সে জীবনে কোনদিনই আমাকে বলে নি, সেই ভাষাই সে এই চিঠিতে ব্যবহার করেছে। এমনও সন্দেহ হোল যে, অসীমা বোধ হয় ঠিক সুস্থ মস্তিষ্কে নেই।

সে লিখ্‌ছে, প্রিয় রমেশ, দীর্ঘদিন পরে তোমায় এত বেশী করে মনে পড়ছে যে তোমাকে চিঠি না লিখে আর পারলুম না। শুনে যেন রাগ কোরো না ভাই, বিশ্বাস কোরো, তুমি যাকে এতদিনে ভুলে গেছ সে এই দীর্ঘকাল ধরে প্রত্যহই তোমাকে স্মরণ করে। তুমি কিছুই জান

না, কিন্তু আমি ভাই রোজই তোমার সঙ্গে কথা কই, বিপদে পড়লে তোমারই পরামর্শ নেই, তুমিই আমাকে এতদিন ধরে প্রত্যহ বুদ্ধি দিয়ে এসেছো। হয়তো এমনি ভাবেই আমার জীবন কেটে যেত, কিন্তু আর পারছি না, এখন একবার তোমার সঙ্গে সামনা সামনি বলতে চাই। সারা জীবনের জমা খরচের হিসেব তোমার কাছে দাখিল করে তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই, আমার সম্বন্ধে তোমার মতামত। একবার দেখা দাও ভাই। ভক্ত যেমন করে ভগবানের দর্শন প্রার্থনা করে, আমিও ঠিক তেমনি করেই তোমার দর্শন চাই। বহুদিন ধরে তোমাকে বলার মত অনেক কথাই জমে উঠেছে, আমার মানসিক রমেশের কাছে সে সব কথা হাজার বার বলেছি, কিন্তু এখন আর তাতে তৃপ্তি পাচ্ছি না। তাই বাস্তব রমেশের দর্শন প্রার্থনা করছি। হুকুম দিলে ভক্ত ভগবানের কাছে উপস্থিত হতেও পারে, কারণ বর্ত্তমানে আমার অবস্থা বেশ স্বচ্ছলই হয়েছে। দুনিয়ায় একমাত্র তুমিই আছ যে শুনলে সুখী হবে, আমার সুশী আই. এ. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রথম চাকরী পেয়ে জলপাইগুড়িতে এসেছে। সে তোমার মতই লেখাপড়া শিখেছে।

শেষে লিখেছে, সূর্য্য হয়ত জানে না যে, সে পৃথিবীকে আলো দেয়, তাপ দেয়, প্রাণ দেয়। তুমিও হয়ত জানো না যে একমাত্র তুমিই আমার সারা জীবনের অন্ধকার গতিপথে আলো দেখিয়ে নিয়ে এসেছ। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তাই তোমায় শেষবারের মত মিনতি জানাই, ওগো আমার জীবনের আলো, তুমি একবারের জন্যও আমাকে চাক্ষুষ দেখা দাও, আমার জীবন-যুদ্ধের বুক-ফাটা কাহিনী নিজের কান দিয়ে শোন, তারপর তোমার যেমন খুসি হয় তেমনি করে আমাকে শাস্তি দিও কিম্বা —কিম্বা পার তো ক্ষমা কোরো। তুমি আমার সম্বন্ধে যা করবে, তাই—তাই আমি মাথায় পেতে নেব।

আজ আমি একান্ত আগ্রহে আর একবার জিজ্ঞাসা করি, কবে, কোথায় কি ভাবে তোমার দেখা মিলবে।

চিঠিখানা পড়ে মনে হোল সেই সুশী আজ আই. এ. এস্ হয়েছে এবং আই. এ. এসের মা আমাকে এমনি করে চিঠি লিখ্‌ছে। কিন্তু এর জবাব কি দেব! বুড়ো বয়সে এ কি এক নির্লজ্জ প্রেম নিবেদন! এত নগ্ন ভাবে এ কথাগুলো না বল্লেই ত ছিল ভালো। অবশ্য এই নগ্নত যে আমার কাছে সম্পূর্ণ নূতন তা নয়, কারণ আমার স্ত্রী এর চেয়েও বেশী নগ্নভাবে অসীমার সম্বন্ধে কুৎসি আলোচনা করেছে। তবে এটাও ঠিক যে সে নগ্নত ছিল রুক্ষ, বীভৎস, জ্বালাময়ী কিন্তু এই নগ্নতা মুখরোচ এবং সত্যি বলতে কি ভালোই লাগে।

খুব সাবধানে খোলা পোষ্টকার্ডে জবাব দিলুম ওপোরে পাঠ লিখলুম, শ্রদ্ধাস্পদাসু, এবং সম্বোধনে বরাবর 'আপনি' বলেই লিখে গেলুম। আর একটা বিষয় লক্ষ করে নিজেই চম্‌কে উঠলুম, স্ত্রীর মৃত্যুর কথা যখনই মনে হয়েছে তখনই মনটা খারাপ হয়ে গেছে, কিন্তু স্ত্রী-বিয়োগের এতদিন পরে স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ অসীমাকে জানাবার সময় মনটা এমন মুক্তির আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠলো যে, নিজের আনন্দে নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়লুম। পোষ্টকার্ডটা ডাক বাক্সে ফেলে দিলুম।

সপ্তাহ পরে জবাব এল; খামে ভরা জবাব। ভাষা ও ভাব পূর্বের মতই, বারবার করে বলছে, একবার এসো।

ভেবেচিন্তে দেখলুম, বহুকাল কলকাতার বাইরে যাই নি। সেই সাতবছর আগে কলকাতায় বদলী হয়ে আসার পর আর রেলগাড়ীর পাদানিতে পা দিইনি। অপর পক্ষে বেরোবার কোন বাধা নেই, কারণ সংসারের কোন চাপ নেই। আমি নিঃসন্তান ও বিগতপত্নীক। বিধবা বোন এবং ভাগ্নেভাগ্নীর সংসারে থাকি, টাকাকড়ি যা পাই ওদের জন্যেই খরচ করি, কারণ জানি, কষ্ট করে, ওদের বঞ্চিত করে জমিয়ে রেখে কোন লাভ নেই, কেন না ওদের না দিয়ে যা জমাব, আমার মরার পর সেটার সবটুকু ওরাই পাবে। আর নিজের বুড়োবয়সের জন্য কোনো পরোয়া নেই, যা পেন্সন পাবো, তাতে একার জীবন কেটেই যাবে। অতএব পনর দিনের ছুটি নিয়ে যাত্রা।

বোন জিজ্ঞাসা করলে, জলপাইগুড়িতে কে এমন বন্ধু আছে দাদা? তার কথা ত কোনদিন শুনি নি।

হেসে বল্লুম আমার সব বন্ধুকেই তুই চিনিস্ নাকি?

ছোট ভাগ্নে ক্লাস টেন্-এ ভূগোল পড়ছে। বল্লে, মামা তুমি দার্জ্জিলিং, কালিম্পং, গ্যাংটক এ সব জায়গায় যাবে?

মুখে বল্লুম দূর, অত কি যাওয়া যায় কিন্তু মনে মনে বেশ উৎসাহ পেলুম। ভাবলুম, অসীমা কি আমার সঙ্গে যাবে, সে কি এতটা স্বাধীন হয়েছে !

শিয়ালদহ ষ্টেশনটা ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত মনটা দারুণ ঘৃণা ও বিতৃষ্ণায় ভরে উঠলো। ছি ছি ছি ! এ আমি করছি কি ? কোথাকার কে একটা বিধবা ! তার নির্লজ্জ আহ্বানে এই পঞ্চাশোত্তর বয়সে পুঁটলী-পাটলা বেঁধে চব্বিশঘণ্টার যাত্রার কি যেন এক নেশায় বিভোর হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লুম। ছিঃ, আমাকে ধিক্। ধিক্কার দিতে দিতে একবার মনে হোল, গাড়ী প্রথম যেখানে থামবে সেখানেই নেমে পড়বো। বোতল থেকে জল বার করে মাথায় মুখে দিয়ে পরে ঠিক করলুম, জলপাইগুড়ি যাব না, শিলিগুড়ি থেকে সোজা দার্জ্জিলিং গিয়ে দিন পনেরো সেইখানে থেকে আবার কলকাতায় ফিরে আসবো। কিন্তু শিলিগুড়ি এসে মনে হোল, খবর দিয়েছি এই ট্রেণে যাচ্ছি, কথার খেলাপ করি কি করে, অতএব—

জলপাইগুড়ি ষ্টেশনে এসে নামতেই অসীমা দ্রুতপদে আমার দিকে এগিয়ে এল। আশ্চর্য্য, ঠিক সেই রকম চেহারাই আছে, কেবল মাথার চুলে পাক ধরেছে মাত্র। অসীমা কাছে এসে যেন অবাক্ হয়ে প্রথম প্রশ্ন করলে, রমেশ, তুমি বুড়ো হয়ে গেছ ?

গত চব্বিশ ঘণ্টা ধরে সারা ট্রেণপথটায় অসীমার ওপোর কেমন একটা ঘৃণা যেন পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল। ভেবেছিলুম আড়ালে একলা পেলে তাকে তার নির্লজ্জতার জন্য বেশ কড়া কড়া গোটা কতক কথা শোনাবো। কিন্তু আশ্চর্য্য, তার মুখখানা দেখামাত্রই তার ওপোর সমস্ত বিরুদ্ধভাব এক মুহূর্ত্তে চলে গেল। উপরন্তু মনে হোল, আমার বুড়ো হয়ে যাওয়াটা যেন অন্যায় এবং সেজন্য নিজেকে অপরাধী বলেই মনে হোল। চট করে কোন উত্তর দিতে পারলুম না !

কুলি ডেকে আমার বিছানা সুটকেশ জলের জায়গা সমস্ত টানাটানি করে অসীমা একটা ঘোড়ার গাড়ীতে নিয়ে গিয়ে তুল্লে। গাড়ীটা বোধ হয় আগে থেকেই সে ভাড়া করে রেখেছিল। মালপত্র উঠে গেলে সে গাড়ীতে উঠে আমার সামনে না বসে একেবারে পাশে বসল এবং বিনা ভণিতায় আমার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বল্লে, সত্যি রমেশ, তুমি আসাতে আমার এত আনন্দ হচ্ছে যে তা আর কি বলব ! তারপর উচ্ছ্বসিত হয়ে নানা বিষয়ে কথা বলতে বলতে গাড়ী যখন পোষ্ট অফিসের ধার দিয়ে রেস্‌কোর্সে'র পথে এগিয়ে চল্লো, তখন বল্লে, বাড়ীতে ছেলের সামনে আমি তোমাকে রমেশদা বলে ডাকবো, কেমন ?

এই প্রগল্‌ভার অস্বাভাবিক ব্যবহারে মনে মনে বিপন্ন বোধ করলেও মোটের ওপর কিন্তু ভালোই লাগছিল। তার প্রস্তাবে রাজী না হয়ে উপায় নেই।

বেশ বড় একখানি নতুন বাড়ী। বাড়ীর উঠানে গাড়ী গিয়ে ঢুকলো। নতুন পুতুল পেলে খুকীদের যেমন আনন্দ হয়, সেই রকম উজ্জ্বল আনন্দে অসীমা এক লাফে গাড়ী থেকে নামল। একটা ভুটীয়া চাকর দৌড়ে এসে গাড়ী থেকে মালপত্র নামাতে সুরু করলে, আর অসীমা বারাণ্ডায় দাঁড়ানো ড্রেসিং গাউন পরা তরুণ এক ভদ্রলোককে উদ্দেশ করে বল্লে, এই দেখ্ সুশী, এই আমার রমেশদা।

ড্রেসিং গাউন পরা আই.এ.এস্. সুশীল হাসিমুখে এগিয়ে এসে জোড় হাত করে আমাকে নমস্কার করলে, মুখে বল্লে, আসুন মামাবাবু, আপনার কথা আমি ছেলেবেলা থেকে এত শুনেছি যে, আপনাকে আজ নতুন দেখছি বলে মনেই হয় না।

এ বাড়ীর নিকট-আত্মীয় হতে এক মিনিটেরও বেশী সময় লাগল না।

আহারাদির পর ওদের খাটে শুয়ে একটা অদ্ভুত চিন্তায় বিভ্রান্ত হয়ে কখন ঘুমিয়েছিলুম মনে নেই, হঠাৎ গায়ের ওপোর একটা ঠাণ্ডাগোছের হাত পড়ায় চেয়ে দেখলুম এক মুখ পান চিবুতে চিবুতে একজোড়া হাসিমাখা দুষ্টামিভরা চোখ আমার দিকে চেয়ে আছে। সংস্কারবশে তাড়াতাড়ি উঠ্‌তে যাচ্ছি, সে বল্লে, শুয়েই থাকুন না মশাই, উঠছেন কেন ? এই কথা বলে বেশ ভালো করে জাঁকিয়ে সে আমার পাশে বসলো। তার হাতখানা কিন্তু আমার গায়ের ওপোরেই রইল।

আমি বল্লুম, আচ্ছা অসীমা, তুমি যে এই কাণ্ডটা করছো, কেউ দেখলে কি বলবে বল ত ?

হেসে উঠে সে বল্লে, কে দেখ্‌বে ? কেউ ত নেই ! ছেলে অফিসে, আর বাহাদুর খাওয়া দাওয়া সেরে বন্ধু-

মহলে বেড়াতে গেছে। বাইরের দরজা আমি বন্ধ করে এসেছি।

ভয়ে ভয়ে বল্লুম, অসীমা ছেলে বড় হয়েছে, সে যদি সন্দেহ করে?

না ভাই, তেমনভাবে ছেলেকে শিক্ষা দিই নি, গর্ব্বিত ভাবে অসীমা উত্তর দিলে, ছেলে জানে, তার মা সারা জীবনের হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রম দিয়ে তাকে মানুষ করে তুলেছে। সেই মায়ের দ্বারা কোন অন্যায় কিছু হতে পারে একথা ছেলে বিশ্বাসই করবে না।

দ্বিধাজড়িতভাবে বল্লুম তুমি কি আমাকে নিয়ে অপরাধ করতেই চাও?

খিল্ খিল্ করে হেসে উঠে অসীমা বল্লে, না ভাই, অপরাধ ঠিক নয়, বুড়ো বয়সের নিঃসঙ্গ জীবনে সামান্য একটু সঙ্গ চাই। আচ্ছা তুমিই বল ভাই, পৃথিবীতে কারুর কোন অসুবিধা না করে যদি একটু বন্ধুসঙ্গ লাভ করি, তাহ'লে অপরাধ কোথায়?

কিন্তু সমাজ?

ও ত একটা প্রচলিত সংস্কার মাত্র। কুসংস্কার না হয় নাই বল্লুম, কিন্তু সুসংস্কারও নয়। আচ্ছা তুমিই বল, মনের ক্ষুধাকে অন্যায়ভাবে চেপে রেখে, অস্বীকার করে, দিনের পর দিন উপবাসী থাকাটা ব্যক্তি, মন বা সমাজ কারুর পক্ষেই কি ভালো? আচ্ছা তুমিই বল, দুই বন্ধুর একসঙ্গে বসে গল্প করা বা দাবাখেলায় যদি অপরাধ না হয়, তাহলে বন্ধু ও বান্ধবীর মধ্যে অন্তরঙ্গতায় দোষটা কোথায়?

গম্ভীর হয়ে বল্লুম, তাহলে সম্বন্ধটা কি রকম দাঁড়াবে? প্রেমের সম্বন্ধ, না মা বোনের সম্পর্ক?

খিল্ খিল্ করে হেসে উঠে আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে অসীমা বল্লে, থামো থামো ন্যায়বাগীশ, আর বেশী বক্তৃতা দিতে হবে না। বলি সত্যিকার মা-বোনের ওপোর বাবুদের কতটা দরদ থাকে তা ত আমার অজানা নেই, তা আবার পাতানো মা-বোন! একটু গম্ভীর হয়ে বল্লে, অনেক দুঃখ ও অভাবের ভেতর দিয়ে এতখানি বয়স হয়েছে। হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খেটেছি, তাতে পেট ভরে নি, যুদ্ধের প্রথম ধাক্কায় মা-ছেলের পেটের ভাত যোগাতে তোমার সেই পোষ্ট অফিসের খাতায় জমা করে দেওয়া তিনহাজার টাকা কবে কোথায় মিলিয়ে গেছে, তার ঠিক নেই; মরণাপন্ন অবস্থায় দশজন বাবুর কাছে হাত পাতলে একজন হয়ত মুখ বেঁকিয়ে একটা পয়সা ছুঁড়ে দেয়, কিন্তু হাসিমুখে বাবুদের গায়ে পড়, প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা আপ্‌সে আস্‌বে। ছেলে মানুষ করা, বড় হওয়া, উন্নতি করা এগুলি আমার আগে দরকার, সংস্কার নিয়ে ধর্ম্ম নিয়ে যদি আমি উপোস করে বসে থাকতুম, তা হলে ঐ ছেলে আজ হাকিম না হয়ে গাঁটকাটা হোত।

সংসারের তিক্ত কঠোর অভিজ্ঞতা নিয়ে যে-নারী আজ জীবনের প্রান্তসীমায় পৌছে এই অতি বাস্তব যুক্তিকে প্রবল ভাবে, উলঙ্গভাবে প্রকাশ করবার সাহস, শক্তি ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে, প্রকৃতপক্ষে তার সাম্‌নে কোনো সামাজিক বা শাস্ত্রীয় নীতি একেবারেই অচল। চুপ করে আছি দেখে অসীমা যেন কণ্ঠস্বরে অনেকখানি ভয় ও সঙ্কোচ নিয়ে করুণ কাতরভাবে বল্লে, বল রমেশ, আমি কি অন্যায় করেছি, তুমি কি আমাকে ক্ষমা করতে পারবে না।

ম্লান হেসে অসহায়ভাবে বল্লুম, আমার ক্ষমা করা না-করায় তোমার কিছু আসে যায় কি?

সে বল্লে, নিশ্চয়েই আসে যায়। অপরের মতামত উপেক্ষা করার ক্ষমতা বোধ হয় মুনি-ঋষিদেরও ছিল না, আমি ত তুচ্ছ মানুষ! দেখ রমেশ, যুদ্ধ আমি জয় করেছি, কিন্তু জয়ের পন্থাটা কি তোমার কাছে একেবারেই ক্ষমার অযোগ্য?

মনে মনে শক্তিসঞ্চয় করে বল্লুম, দেখ অসীমা, যার শেষ ভালো তার সব ভালো, এ ছাড়া আর আমার বলবার কিছু নেই।

বিকেলে সুনীর সঙ্গে একই টেবিলে অসীমা আমাকে চা-জলখাবার খেতে দিয়ে ছেলেকে বল্লে, সুনী, তোর মামা বল্‌ছে, এতদূর যখন এলুম, তখন একবার দার্জ্জিলিংটা ঘুরে যাই। তা আমি রমেশদাকে বল্লুম যে, ছেলে যদি আমাকে ছাড়ে তা'হলে আমিও যাব। তা কি রে, তুই আমাকে ছাড়বি?

সুনী বল্লে, বেশ ত যাও না। তারপর আমার দিকে চেয়ে বল্লে, দার্জিলিং-এ ক'দিন থাকবেন মামাবাবু?

অসীমার সঙ্গে দার্জ্জিলিং যাওয়ার কথা মোটেই হয়নি, হঠাৎ তার এই কথায় আমি একেবারেই অবাক্ হয়ে

গেলুম। একটু অপ্রতিভ হয়ে বল্লুম, আমার ত মোটে পনর দিনের ছুটি, এর মধ্যে—

সুশীল বল্লে, এক সপ্তাহে দার্জ্জিলিং-এর সবই ঘোরা হয়ে যাবে। তারপর এখানে এসে দু'চার দিন থেকে রওনা দেবেন। আর মায়ের যখন সখ হয়েছে তখন মাকেও নিয়ে যান, আমি আমার চাপরাশীকে দিয়ে এক সপ্তাহের মত রান্না খাওয়ার ব্যবস্থা করে নেব।

উচ্ছ্বসিত হয়ে অসীমা ছেলেকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল, বল্লে, জানলে দাদা, ছেলে আমার My dear son, মায়ের কথায় ও কখনই 'না' করে না। তারপর কি কাজে হঠাৎ যেন দৌড়ে বাড়ীর ভেতর চলে গেল।

মায়ের চলে যাওয়ার পথের দিকে চেয়ে চেয়ে সুশীল বল্লে, জানেন মামাবাবু, মা যে কিভাবে ম্যানেজ করে আমার পড়াশুনা চালিয়ে এসেছেন, তা আগে ঠিক বুঝতুম না, কিন্তু এখন যত ভাবি তত অবাক্ হয়ে যাই। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, পড়াশুনা ছেড়ে কাজে লাগি, কিন্তু মা কিছুতেই ছাড়তে দেন নি। প্রায়ই বলতেন, তোমার রমেশ মামার মত বিদ্বান্ হতে হবে, কিন্তু আপনাকে ত কখনও দেখেছি বলে মনে পড়তো না। মাঝে মাঝে যখনই বলতুম, রমেশ মামার সঙ্গে দেখা করবো, তখনি মা জিভ কেটে বলতেন, এখন নয়, আগে তার মত মানুষ হয়ে ওঠে, তারপর গিয়ে তার সাম্‌নে দাঁড়িও। সত্যি মামাবাবু, আপনাকে দেখে যে আমার কি আনন্দ হচ্চে, তা আর কি বল্‌বো।

আই. এ. এস্. সুশীল, কিন্তু কথা কইছে একেবারে শিশুর মতো। মাতৃগর্ব্বে গর্ব্বিত সুশীল, মায়ের দুঃখে দুঃখী সুশীল, মায়ের উদারতায় প্রশস্ত বক্ষ সুশীল মায়ের প্রশংসায় একেবারে মুখর হয়ে উঠলো। এমন সময় তেমনি দৌড়ে অসীমা ঘরে এসে ঢুকেই কৃত্রিম কোপ দেখিয়ে বল্লে, কি হচ্চে সুশী, মামাকে একলা পেয়ে মায়ের নামে অনেক কিছু লাগানো হচ্চে বুঝি? সুশী চুপ করে গেল, আমি বল্লুম, অসীমা, ছেলে যা পেয়েছিস, এরকম ছেলে কোটিতে একটা হয়। মা-ছেলের এরকম সম্বন্ধ আমি এ পর্য্যন্ত কোথাও দেখি নি। এই প্রথম আমি অসীমাকে 'তুই' বলে কথা কইলুম।

একমুখ হেসে অসীমা বল্লে, ওমা সে কি? ও ত আমার ছেলে নয়, ও যে আমার ফ্রেণ্ড, My dear friend. তোমরা সব পণ্ডিতরাই ত বল তাই যে, ছেলে যতক্ষণ কোলে শুয়ে দুধ খায় ততক্ষণ ছেলে, বড় হলে পুত্র মিত্রবৎ। কি বলিস্ রে সুশী, এঁ্যা।

বল্লুম এবার তোর ছেলের বিয়ে দিয়ে ভাল একটি বউমা নিয়ে আয়।

অসীমা বল্লে, নিশ্চয়ই আনবো, কিন্তু ওর জন্তে আমি মেয়ে খুঁজতে পারবো না। ওর বউ আমি খুঁজবো কেন? ও যে কোন মেয়েকে পছন্দ করে আমাকে বলুক, আমি ব্যবস্থা করে তাকেই নিয়ে আসবো, তা সে যে জাতেরই হোক আর যেমনই হোক। কেমন রে সুশী? নিজের পায়ের জুতো ও নিজে মাপ দিয়ে পছন্দ করে কিনে আনুক, কি বল?

সুশী বল্লে, হ্যা মা, বউ কি পায়ের জুতো না কি?

অসীমা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে, পায়ের জুতো না হয় মাথার টুপিও বটে। ও একই কথা।

দার্জ্জিলিং-এর ধর্ম্মশালায় একটা ঘর পেয়ে সেখানেই ওঠা গেল। ধর্ম্মশালায় আমার ঠিক ইচ্ছে ছিল না, বল্লুম এর চেয়ে কোন হোটেলে—

বাধা দিয়ে অসীমা বল্লে, দেখবো দার্জ্জিলিং, বেড়াব পথে পথে, খামোকা হোটেলে একরাশ টাকা ঢেলে কি হবে? তা ছাড়া হোটেলে আছে নানা মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী, তারা নানারকম প্রশ্ন এবং সন্দেহ করে জীবনটা অতিষ্ট করে তুলবে। প্রথমেই বলবে তুমি বিধবা মানুষ, হোটেলে বসে মাছ মাংস খাও কেন, এর উত্তর তখন কি দেব?

হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লুম তবে খাও কেন?

অসীমা বল্লে, খেতে ভালো লাগে বলে, আর তা ছাড়া শরীরটা ত মজবুত রাখতে হবে। তারপর দেখ, সারা পৃথিবীর সমস্ত বিধবাই সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক খাদ্য যদি খেতে পারে, তা হলে বাংলা দেশের বিধবারা কি এমন স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে যে তাদের জন্ত নিয়ম বদলাতে হবে। একটু থেমে দুষ্টামির হাসি হেসে বল্লে, তা ছাড়া আমি বিধবা হব কেন, তুমি ত রয়েছে—

রাত্তিরে শোবার আগে যখন নোট বইয়ে হিসেব লিখছি তখন অসীমা বল্লে, জলপাইগুড়ি থেকে দার্জ্জিলিং আসা পর্য্যন্ত কত খরচ হোল, হিসেব রেখেছ?

আমি বল্লুম, নিশ্চয়ই।

সে বল্লে কত ?

আমি বল্লুম, রেল ভাড়া, কুলী ভাড়া, খাওয়া সবশুদ্ধ নিয়ে এ পর্য্যন্ত পড়েছে সত্তর টাকার মতন।

বুকের ভেতর থেকে মনি ব্যাগ বার করে পঁয়ত্রিশটি টাকা নিয়ে আমাকে দিয়ে বল্লে, এই নাও, আমার ভাগ পঁয়ত্রিশ টাকা।

অবাক্ হয়ে তার দিকে চেয়ে বল্লুম, কি রকম ? তুমি পয়সা দেবে এ রকম ত কথা ছিল না।

তোমার পয়সায় বেড়িয়ে বেড়াব এরকম কথাও ত ছিল না।

প্রতিবাদ করে বল্লুম, না, এটা ভালো নয়। খরচ আমি করবো।

জোর করে টাকাটা আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বল্লে না গো মশাই না, আমি ত তোমার বিয়ে করা বউ নই যে গলগ্রহ হয়ে থাকবো। আমি তোমার বান্ধবী। বন্ধুরা যখন দল বেঁধে বেড়াতে যায় তখন প্রত্যেকে নিজের নিজের খরচ করে। His his, whose whose এই হোল আমাদের নীতি।

টাকাটা হাতে নিয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে বল্লুম, তবে যে তুমি বল্লে অন্য পুরুষের কাছ থেকে টাকা উপায় করে ছেলে মানুষ করেছ।

সে বল্লে, হ্যাঁ করেছি, কিন্তু তাতে কি ? পরের বাড়ী রান্না করে মাইনে নিয়েছি বলে কি নিজের বাড়ী রান্না করেও মাইনে নিতে হবে ? বরঞ্চ অন্য কথা। দার্জ্জিলিং-এ আমি জোর করে তোমাকে এনেছি বলে তোমার খরচও আমার করা উচিত।

দিন কয়েক পরে দার্জ্জিলিং-এ ম্যাল-এর বেঞ্চিতে বসে কথা হচ্ছিল। আশে পাশে আর কোন লোক নেই। বল্লুম অসীমা, অফিস থেকে আরও দিন পনরর ছুটি আনিয়ে নিই।

খুকীর মত হেসে উঠে অসীমা বল্লে, এই রে, নীতি-বাগীশের ঘোড়া রোগে ধরেছে।

বল্লুম, তার মানে ?

মানে তুমি জানো। প্রথম প্রথম তোমার যেন গা ঘিন্ ঘিন্ করতো, তাই না ? করতোই ত। তুমিই ত আমাকে ডুবিয়েছ।

আঙুলে আঁচলের পাড় জড়াতে জড়াতে অসীমা বল্লে, দেখ রমেশ, আমার সেই দাদাকে দেখেছ ত ? যে-কোনো লোকের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে দু'টাকা একটাকা থেকে দুশো পাঁচশ টাকা মেরে দিতে তার কোন দ্বিধাই ছিল না, কিন্তু একবার হয়েছে কি, শীতকালে দাদা সন্ধ্যে আহ্নিক সেরে সিদ্ধি দিয়ে দুটী পান বেশ মৌজ করে খাচ্চে, এমন সময় কে এক নীচু জাতের মেয়ে এসে দাদার পা দুখানা জড়িয়ে ধরে কাঁদ্তে কাঁধতে কি যেন বলতে লাগল। দাদা প্রথমটা রেগে আগুন, তারপর দৌড়ে বাড়ীর ভেতর এসে হড়্ হড়্ করে বমি শুরু করলে। বল্লে আমি পান খাচ্চি, এমন সময় ও এসে আমাকে ছুঁয়ে দিলে, তাহলে ত ওর ছোঁয়াই আমার খাওয়া হয়ে গেল। এটা কিন্তু দাদার চালাকী নয়, এটা হোল তার আন্তরিক সংস্কার। সেই শীতের রাত্রে চান করে গঙ্গাজল খেয়ে তবে দাদার শান্তি। মেয়েদের মধ্যেও এই ছুঁৎসর্গ দেখেছি। যুদ্ধের সময় যখন নিতান্ত অভাবে পড়ে আমাকে অন্য পথ ধরতে হয়েছিল, তখন প্রথম প্রথম মনে হোত, চুলোয় যাক্ ছেলে মানুষ করা, মা-গঙ্গার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সকল জ্বালা জুড়োই। আমাদের দেশে পুরানো আমোলে কেউ যদি দেখ্‌ত তার স্ত্রীর সঙ্গে পরপুরুষে কথা হয়ত কইছে, তা হলে সে স্ত্রীকে খুন করেই বসতো, কিন্তু দমদম্ এয়ারপোর্টে স্বচক্ষে দেখেছি, স্বামীর সামনে স্বামীর বন্ধু স্ত্রীর মুখচুম্বন করছে। এটা হচ্চে তাদের কাছে আন্তরিকতার চিহ্ন, না-করাটাই অভদ্রতা। অনেক দেখে দেখে এখন আমার এইটাই বিশ্বাস হয়েছে যে, মানুষের সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক হৃদ্যতাই হচ্চে আসল সম্বন্ধ, নিজের কর্ম্মশক্তি ও কর্ত্তব্যবোধকে অটুট রাখাই হচ্চে মানুষের প্রধান সাধনা। এই জ্ঞানটুকু উপলব্ধি করার আগেই আমি বুড়ী হয়ে গিয়েছিলুম, মাথার অর্দ্ধেকচুল সেই জোরকরে উপবাস করার যুগে পেকে গিয়েছিল, কিন্তু যেদিন থেকে এই নতুন এবং তোমাদের ভাবায় এই অনাসৃষ্টি জ্ঞান পেয়েছি, সেদিন থেকে আজ পর্য্যন্ত শরীর ও মন বেশ তাজা আছে। কোন কিছুতেই আর ভেঙ্গে পড়ি না।

বল্লুম বক্তৃতা ত অনেক হোল, শেষ পর্য্যন্ত কালই কি ফিরতে চাও ?

সে বল্লে, নিশ্চয়, ছেলেকে বলে এসেছি। ফিরতেই হবে, নইলে ছেলের মনে অবিশ্বাস আসবে যে। ছেলে ভাববে মায়ের কথার ঠিক নেই। আর তোমার পক্ষেও দেখ, পনর দিনের ছুটি নিয়ে বেরিয়ে এখান থেকে আবার ছুটীর দরখাস্ত করলে সেটা কি ভদ্রতা হবে। ওটা কোরো না।

করুণভাবে অসীমার হাতখানি ধরে বল্লুম, কিন্তু ফিরতে যে মন চাইছে না।

সে বল্লে, এই রে, রোগে ধরেছে! একটু থেমে বল্লে, হবেই ত। অনেক দিনের উপবাসীকে খাবারের দোকানের মধ্যে বসিয়ে দিলে পেট না-ফাটা পর্য্যন্ত সে ক্রমাগতই গিলবে এবং শেষ পর্য্যন্ত রোগে পড়লে দোষ হবে খাবারগুলোর।

পরের দিন ষ্টেশনে আসার আগে সুটকেশ বিছানা গুছাতে গুছাতে অসীমা বল্লে, আমি ত রইলুমই রমেশ,—যখন খুসি হবে তখনই বেড়াতে আসবে, মন খারাপ করার ত কোন দরকার নেই। মাঝে মাঝে অভয় দাও ত আমিও তোমার কলকাতায় যেতে পারি।

ম্লানমুখে বল্লুম, বেশ ছিলুম অসীমা, তুমি আমার এক নতুন অভাববোধ জাগিয়ে দিলে। আচ্ছা এক কাজ কর, আমি তোমাকে বিধবা বিয়ে করি।

লাফিয়ে উঠে অসীমা বল্লে, ওরে বাপরে, আবার বন্ধন। না মশাই, ওর মধ্যে আমি নেই।

কেন, বিয়ে কি দোষের?

সে বল্লে, না দোষ নয়, কিন্তু এ-বয়েসে বিয়ে করলে বিয়ে করার পর মুহূর্ত্ত থেকে দুজনেরই মনে হবে ভুল করেছি, জড়িয়ে পড়েছি। তখন বিয়ে ভাঙ্গবার জন্য দুজনকেই উঠে পড়ে লাগতে হবে। তার চেয়ে তুমি কলকাতায় যাও, আমার মতন দু'একটা বুড়ী বান্ধবী জুটিয়ে নাও, নিজের কাজ নিয়ম মত কর, অবসর সময়ে স্ফূর্ত্তিতে দিন কাটাও, কেমন?

আশ্চর্য্য হয়ে বল্লুম, আচ্ছা অসীমা, তুমি নিজে থেকেই বলছ আমাকে অন্য বান্ধবী জুটিয়ে নিতে। আমি অন্য মেয়ের সঙ্গে মিশলে তোমার হিংসে হবে না।

হো হো হেসে উঠে সে বল্লে, না গো মশাই না, অত টুনকো মন আমার নয়। রামশ্যামের বন্ধুত্ব তখনই প্রগাঢ় হয় যখন রাম দেখে রাজ্যশুদ্ধ ছেলের সঙ্গে শ্যামের ভাব, আর শ্যাম দেখে ছোটবড় সকলেরই কাছে রামের আছে সমান আধিপত্য। একাধিপত্যের যুগ চলে গিয়ে গণতন্ত্রের যুগ এসেছে; এই মৌলিক পরিবর্ত্তনটা মনে রাখলে দাম্পত্যজীবনের হাজার হাজার অশান্তি এক মিনিটে সমাধান হবে।

জলপাইগুড়িতে দু'দিন থেকে কলকাতায় ফেরার দিনে সঙ্গোপনে অসীমাকে ধরে জিজ্ঞাসা করলুম, অসীমা একটা সত্য কথা বলবে।

বিস্মিত হয়ে সে বল্লে, সত্যি কথাই ত বলি, কারণ মিথ্যে বলার ত কোন দরকার হয় না। মন থেকে যতটা পরিমাণ সংস্কারকে তাড়িয়ে দিয়েছি, ততটা পরিমাণ মিথ্যা বলার দরকার ত হয় না। কিন্তু সে যাক্,—কি এমন কথা তুমি শুনতে চাও, যার জন্য এত ভূমিকা?

বল্লুম, তুমি কি আমাকে ভালবাস?

তৎক্ষণাৎ চোখা উত্তর বেরিয়ে এল। সে বল্লে, মোটেই নয়। একটু থেমে সে বল্লে, আমার কি বিশ্বাস জানো রমেশ, নিজেকে ছাড়া আমরা আর কাউকেই ভালবাসি না। অপরকে আমাদের ভালোলাগে, এই মাত্র। তবে এই ভালো-লাগার কম বেশী থাকতে পারে।

এমন সময় সুশীলের পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। অসীমা তার কথার সুর বজায় রেখে বল্লে; তাই বলছিলুম, দার্জ্জিলিং আমার তেমন ভালো লাগল না, কিন্তু তাই বলে তুমি যদি আবার আমায় সঙ্গে নিয়ে যেতে চাও, এবং তখন যদি হাতে আমার সময় এবং পয়সা থাকে, তাহলে কি যাব না রমেশদা, তা নয়। সুশীলের পায়ের শব্দ দূরে গিয়ে মিলিয়ে গেল।

বল্লুম, অসীমা, এটা কি তোমার মিথ্যা আচার হোল না। ছেলের কাছে লুকোচুরী কি খেলছ না?

অসীমা না ভেবে তখুনি উত্তর দিল। বল্লে, ছেলের কাছে তোমার সম্বন্ধে দুর্ব্বলতা প্রকাশ করার মত সংস্কার-মুক্তি আমার এখনও হয় নি। এইখানে এইটুকু সংস্কার থাকার জন্যই এই মিথ্যাচার করতে বাধ্য হচ্ছি।

এরপর অনেক দিন মনে হয়েছে যে, সংস্কার না থাকাই যদি ভালো হয়, তা হলে জীবজগতে জানোয়ারই শ্রেষ্ঠ, কারণ তাদের কোন সংস্কার নেই। বহুবার বহু রকমে অসীমার প্রতি ঘৃণায় মন ভরে গেছে, কিন্তু তবুও ভাবছি আবার কবে ছুটি নিয়ে জলপাইগুড়িতে যাওয়া যায়।

সমাজ-তান্ত্রিক ভারতবর্ষ ও সার্বজনীন পূজা

শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ।

যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
য দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।
নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ। নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

যিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সর্বভূতে মায়া, চেতনা, বুদ্ধি, নিদ্রা, ক্ষুধা, ছায়া, শক্তি, তৃষ্ণা, ক্ষান্তি, জাতি, লজ্জা, শান্তি, শ্রদ্ধা, কান্তি, লক্ষ্মী, বৃত্তি, স্মৃতি, দয়া, তুষ্টি, মাতা, ভ্রান্তি, চিতি প্রভৃতি রূপে নিত্য বর্ত্তমানা, আমরা তাঁহার শ্রীচরণে কায়মনোবাক্যে প্রণাম করি। এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এক এবং অদ্বিতীয় সত্য,—পরমব্রহ্ম। তিনিই পরমা শক্তি। সমস্ত সৃষ্টির মূলে একটী অখণ্ড চৈতন্য সত্তা। এই পরিদৃশ্যমান জগতে নানা বৈচিত্র্য ও বৈষম্যমধ্যে একমাত্র তাহারই প্রকাশ। ছান্দোগ্য উপনিষদ বলেন, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জাননিতি শান্ত উপাসীত। এই জগতে যাহা কিছু চেতন অচেতন সমস্তই ব্রহ্মময়, ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মে অবস্থিত এবং সমস্তই ব্রহ্মে লীন হইবে। সমস্ত এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্মের প্রকাশ জানিয়া তাহার উপাসনা করিবে। ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্র—ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চিৎ জগত্যাম্ জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথাঃ। মা গৃধ কস্যস্বিদ্ধনং। এই জগতে যাহা কিছু, তাহা সর্বপ্রাণীর অধীশ্বর পরমেশ্বর দ্বারা সৃষ্ট ও অধিকৃত। তাহা ত্যাগদ্বারা ভোগকর। কোন ধন নিজের বলিয়া লোভ করিও না। আমি এবং এই বিশ্বের যাহা কিছু সমস্তই ভগবানের, এই বোধ হৃদয়ে জাগ্রত হইলেই ক্ষুদ্র অহংবোধ লুপ্ত হয়—পার্থিব সকল বস্তুতে সকল জীবে সমত্ব প্রস্ফুটিত হয়। বৃহদারণ্যক বলেন—নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। ভারতের সকল ধর্মশাস্ত্র—বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, পুরাণাদির ঐ একটি কথাই প্রতিপাদ্য বিষয় এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে এক এবং অদ্বিতীয় সত্য, পরম ব্রহ্ম। এই বিশ্বে যে বৈচিত্র্য ও বৈষম্য তাহা ঐ এক এবং অদ্বিতীয় সত্য, পরমব্রহ্ম। এই কারণ বৈচিত্র্য ও বৈষম্য ভিন্ন গতি, স্থিতি ও লয় সম্ভব হয় না।

ভারতীয় সভ্যতা ও সমাজ ব্যবস্থার মূলে ছিল—এই পরিদৃশ্যমান জগতের সকল চেতন ও অচেতন পদার্থে সর্বত্র এবং সর্বকালে একটি অখণ্ড চৈতন্য সত্তা বোধ। এজন্য এই সভ্যতা ও সমাজব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভাবে ত্যাগধর্মী এবং ইহার ভিত্তি মূলে ত্যাগধর্মী শাশ্বত সনাতন ধর্ম। এই ধর্ম স্বতঃসিদ্ধ। ইহা কোন মনুষ্যবিশেষের প্রচারিত মতবাদ নহে। ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তিমূলে ভারতীয় ত্যাগধর্মী সমাজ ব্যবস্থা, এবং ভারতীয় সমাজব্যবস্থার মূলে ভারতীয় ত্যাগধর্মী ধর্মবোধ। এই ধর্মবোধ মানবতার জনক এবং ভোগের পরিপন্থী। ভারতীয় সভ্যতার উন্মেষ তপোবনের শান্তস্নিগ্ধ ভাবধারার পরিবেশে। ইহা অজ অব্যয়।

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সমাজ ব্যবস্থার মূলে কোন সর্বভূতাত্মক পরমব্রহ্ম বোধ নাই। পাশ্চাত্য মনীষীগণ তাহাদের সভ্যতার ও সমাজব্যবস্থার উন্মেষের যে সকল তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহারা প্রমাণ করিয়াছেন পাশ্চাত্য দেশে আদিম মনুষ্য জাতির কোন ধর্মবোধ ছিল না। তাহাদের ধর্মবোধের উৎপত্তির মূলে ছিল; প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিমিত্ত ভয় এবং বিস্ময়। তাহাদের ব্যবহার, আহার, বিহার ছিল পশুর মত। তাহারা বাস করিত পর্বতগুহায়। উলঙ্গ থাকিত, আহার ছিল আমমাংস, নরনারীর মিলন যথেচ্ছায় চালিত হইত। এই ভোগায়তন

নরনারী তাহাদের আত্মরক্ষা ও শারীরিক ভোগ মানবুদ্ধির অদম্য চেষ্টায় ক্রমে ক্রমে গুহাযুগ, প্রস্তরযুগ, ধাতুযুগ প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া বর্তমানে রকেটযুগে উপনীত হইয়াছেন। তথাপি তাঁহাদের শারীরিক ও মানসিক ভোগমান বৃদ্ধি চেষ্টার বিরাম নাই। আমাদের সৌর জগতের এক মাত্র পৃথিবী ও পার্থিব বস্তু তাহাদের তৃপ্তি প্রদান করিতে পারিতেছে না। এজন্য তাহারা মহা-জাগতিক রহস্য ও গ্রহ-গ্রহান্তরের রহস্য জানিতে তাহাদের সর্বশক্তি ও অর্থের অকুণ্ঠ ব্যবহার করিতেছেন। ভোগায়তন নরনারীর ভোগের পথে তৃপ্তি থাকিতে পারে না। এই জন্য ভারতীয় ঋষি বলিয়াছেন কাম উপভোগদ্বারা কামের উপশান্তি অসম্ভব। ইহা অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মতো ক্রমশঃ বর্ধনশীল। পাশ্চাত্য জাতির ভোগের উপকরণ এবং তন্নিমিত্ত জড় বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব, অশ্রুতপূর্ব, অভাবনীয় উন্নতি আজ ভারতবাসীর মহা বিস্ময়। ভারতের পরম দুর্ভাগ্য ভারতের দেবায়তন নরনারী আজ পাশ্চাত্য শিক্ষাধারায় শিক্ষিত হইয়া এই মরজীবনে ইন্দ্রিয় ভোগের লালসাকে প্রেয় মনে করিতেছেন। এই পৃথিবীতে পূর্বে যত প্রকার ভোগধর্মী সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল তাহার সমস্তই নষ্ট হইয়াছে; কিন্তু তাহার নিদর্শন পৃথিবীর বক্ষে আজিও বিদ্যমান। ভোগধর্মী সভ্যতা ভোগপথে চলিতে বাধ্য। সর্বদা অতৃপ্তি ও জীগীষার ভাব ভোগায়তন নরনারীকে ভোগের দিকে চালিত করিতেছে। এই সভ্যতা যতদিন আত্মঘাতী না হইবে ততদিন ইহার বিরাম নাই। ভারতীয় রাষ্ট্র প্রধানগণ এবং মনীষীগণ যতদিন ধর্মবোধহীন জীবন ভোগমান বৃদ্ধির মোহ অতিক্রম করিয়া, ভারতীয় ত্যাগধর্মী শাশ্বত ও সনাতন ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার উৎস হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিবেন এবং তাহার লক্ষ্যে চালিত না হইবেন, ততদিন ভারতের কল্যাণ নাই। জীবন-বোধ ও জীবন-ভোগ দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক। জীবন বোধের মূলে ইন্দ্রিয় সংযম এবং জীবন ভোগের মূলে ইন্দ্রিয়াসক্তি। একটি স্বর্গ অপরটী নরক।

সমাজ শব্দ সম+অজ (গমন)+ঘঞ্ দ্বারা নিষ্পন্ন। ইহার মূল অর্থ এক সঙ্গে গমন। এক ভাব এবং একলক্ষ্যে চলন। পিপীলিকা ও মধুমক্ষিকা প্রভৃতি কীটপতঙ্গাদি যেরূপ একতাবদ্ধ হইয়া তাহাদের জীবনরক্ষা করে এবং বংশবৃদ্ধি করে, তাহা জীবশ্রেষ্ঠ মনুষ্যগণের আদর্শস্থল। মানবেতর জীবগণের দেহ ভোগদেহ। কেবল মাত্র ভোগজন্য তাহাদের শরীর ধারণ। একমাত্র প্রাকৃতিক স্বভাবজ নিয়মে তাহারা তাহাদের জীবন রক্ষণ ও বংশবৃদ্ধির জন্য একতাবদ্ধ হইয়া বসবাস করে। এজন্য তাহাদের জীবন রক্ষার জন্য প্রয়োজন সীমিত—প্রাকৃতিক নিয়মে লভ্য ও একরূপ স্থিতিশীল। কিন্তু বুদ্ধিজীবিমানবজাতি কেবলমাত্র প্রাকৃতিক ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিয়া তাহাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারে না। মানবজাতির জীবনরক্ষার জন্য প্রধানত প্রয়োজন খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়। মানবেতর প্রাণীর বস্ত্রের প্রয়োজন নাই। তাহাদের খাদ্য ও আশ্রয় প্রাকৃতিক নিয়মে লভ্য। যদি তাহাদের খাদ্য ও আশ্রয় প্রাকৃতিক নিয়মে লভ্য না হয়, তাহা হইলে তাহাদের জীবননাশ অনিবার্য হয়। কিন্তু মানবজাতি শুধু প্রাকৃতিক নিয়মের উপর নির্ভর করিয়া থাকে না, তাহাদিগকে তাহাদের বুদ্ধিপ্রয়োগে খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হয়। মানবজাতি তাহাদের জীবনরক্ষার উপযোগী খাদ্যবস্ত্রাদির ব্যবস্থার জন্যই সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে অভ্যস্ত হয়। বিভিন্ন দেশের জলবায়ু, বিভিন্ন। এজন্য সেই সেই স্থানের নরনারীর খাদ্য, বস্ত্র এবং আশ্রয়-ও, বিভিন্ন রূপ। আবার এক দেশের বিভিন্ন ঋতুতে ও সময়ে বিভিন্ন বয়সের নরনারীর ও শিশুগণের খাদ্য বস্ত্রাদিও বিভিন্ন হয়। ইহা ব্যতীত বিভিন্ন ধর্মের অনুশাসনে খাদ্য, বস্ত্র আশ্রয় বিভিন্ন রূপ হয়। সভ্যতা ভেদে ও সমাজব্যবস্থা ভেদে ও রুচিভেদেও উহা আবার বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া থাকে।

বর্তমান জগতে যেরূপ দুই প্রকারের সভ্যতা, সেইরূপ দুই প্রকারের সমাজ ব্যবস্থা। একটী ব্যক্তি-কেন্দ্রিক, ভোগধর্মী। অপরটী সমাজতান্ত্রিক, ত্যাগধর্মী। অন্ধকার-বোধ না থাকলে যেমন আলোক বোধ হয় না, দুঃখ ভোগ না করিলে যেরূপ সুখের উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ ভোগধর্মী সমাজ ব্যবস্থা না বুঝিতে পারিলে ত্যাগধর্মী সমাজ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ উপলব্ধিতে আসিতে পারে না। ভোগধর্মী সমাজ ব্যবস্থায় সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম সহ মনের সর্বপ্রকার সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের সুব্যবস্থা থাকে। কিন্তু, সকল জীবের ইন্দ্রিয় ভোগের একটী সীমা নির্দিষ্ট আছে। সেই সীমা অতিক্রম

করিলে দুঃখভোগ ও রোগভোগ অনিবার্য হয়। তবে মনের ভোগের সীমা নাই। মানব মনের সীমাহীন কাম উপভোগের চেষ্টা যাহাতে সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা নষ্ট না করে, তাহার জন্য আছে মনুষ্যসৃষ্ট আইন। এজন্য ভোগধর্মী সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি ক্ষমতালব্ধ কতিপয় ব্যক্তির কল্পিত, পরে আইনসভায় অনুমোদিত আইন। এই আইন সৃষ্ট হয় রাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রয়োজনে ও ভোগায়তন ক্ষমতালব্ধ ব্যক্তিগণের প্রয়োজনে পরিবর্তনশীল। ইহার মধ্যে কোন চিরন্তনী মানবতা বা মানব মনের উৎকর্ষের নীতি থাকিতে পারে না। ব্যক্তির স্বার্থ যেখানে প্রধান, পরার্থ সেস্থলে অবহেলিত। বর্তমান জগতে ভোগধর্মী শাসন ব্যবস্থা দুই প্রকার। এক রাষ্ট্রতান্ত্রিক দ্বিতীয় গণতান্ত্রিক। রাষ্ট্রতন্ত্রে কতিপয় ক্ষমতালব্ধ ব্যক্তি একযোগে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্বার্থে তাহাদের শাসনতন্ত্র চালনা করেন। গণতন্ত্র তদ্রূপ তাহাদের নির্বাচিত কতিপয় ব্যক্তি একযোগে তাহাদের রাজনৈতিক স্বার্থে তাহাদের শাসনদণ্ড চালনা করেন। এজন্য গণতন্ত্রে, রাজনৈতিক দলতন্ত্র স্বাভাবিকভাবে গড়িয়া উঠে। রাষ্ট্রতন্ত্রে আছে সমষ্টিগত ভাবে সকলের সকল প্রকার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের চিন্তা। গণতন্ত্রে ব্যক্তিস্বাচ্ছন্দ্য স্বীকার করিয়া সর্বপ্রকারে তাহাদের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের কল্পনা। অতএব ঐ সকল দেশের সমাজ ব্যবস্থার মূলে কোথায়ও সমষ্টিগতভাবে তাহাদের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের বাধা অপসারণের জন্য আইন, কোথায়ও বা ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বাধা অপসারণ জন্য আইন। ভোগধর্মী সমাজব্যবস্থায় আইনের প্রয়োগ সর্বস্তরের সকল মানবের জন্য প্রযোজ্য হইলেও যাহাদের হস্তে ক্ষমতা তাহারা তাহা অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। যে স্থলে স্বার্থবোধ প্রধান, সেস্থলে অসন্তোষ স্বাভাবিক। ব্যক্তির ভোগের স্বার্থে যে সভ্যতা চালিত ও বর্দ্ধিত সেই সভ্যতায় মানবতা ধর্ম অবজ্ঞাত। আজ ভোগধর্মী সমাজে তাহাদের রাষ্ট্রের বা ব্যক্তির স্বার্থে যে সকল মারণাস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে বা এখনও হইতেছে তাহা এই ভোগধর্মী সভ্যতার ধ্বংসের জন্যই প্রস্তুত হইয়াছে।

ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার মূলে কোন দিন ক্ষমতালব্ধ কতিপয় মানবের সৃষ্ট আইন ছিল না। ইহার ভিত্তির মূলে ছিল মানবতা বোধ বা সকল মানবের এই জীবে পরম ব্রহ্মবোধ। এই ধর্মের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থায় সকল মানবের কল্যাণ ছিল ভারতীয় সমাজতন্ত্রের মূলে। এজন্য ভারতীয় সমাজতন্ত্র ছিল সুবৃহৎ ও ব্যাপক। "সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে" এই বোধ ছিল সমাজতন্ত্রের আদর্শ। ভোগের প্রতিযোগিতা সমাজে হেয় ছিল। ত্যাগের প্রতিযোগিতা ছিল চিরন্তনী নীতি। যে স্থলে ভোগের প্রতিযোগিতা—সেই স্থলে চিত্তশুদ্ধি, উদার মানবতাবোধ সম্ভব নয়। কর্তব্য বিশুদ্ধ থাকিতে পারে না। ভোগধর্মী সমাজব্যবস্থায় আইনের প্রয়োজন জনগণ কল্যাণ-নিমিত্ত সৃষ্ট হয় না, সৃষ্ট হয় শান্তি ও শৃঙ্খলারক্ষার জন্য রাজনৈতিক স্বার্থে। ভোগধর্মী সমাজে অগ্রে ব্যক্তির বা রাষ্ট্রের ভোগস্বার্থ, পরার্থ চিন্তা নিজ ভোগস্বার্থের পরবর্তী চিন্তা। কিন্তু ত্যাগধর্মী সমাজে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহাদের অগ্রে পরার্থ চিন্তা, পরে নিজের স্বার্থ চিন্তা। ইহা "ত্যক্তেন ভুঞ্জী'র মর্মার্থ। ভোগধর্মী সমাজের ভোগায়তন নরনারীগণ পরহিতের জন্য দান করেন নিজের মঙ্গল কামনা করিয়া। ভোগধর্মী সমাজের নরনারীর মনে পরের মঙ্গল করিলে আপনার মঙ্গল সাধিত হয় এই বোধ একেবারেই চিন্তার মধ্যে স্থান পায় না। যে স্থলে সমগ্র ইন্দ্রিয়বর্গ সহ মনের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রধান প্রতিযোগিতা, ইন্দ্রিয়সংযম চিন্তা সেই স্থলে অবান্তর। নদীর তট যেমন নদীকে বেগবতী রাখে সেইরূপ ত্যাগধর্মী সমাজবন্ধন মানবমনকে সংহত করে। সমাজতন্ত্রের জনগণ তাহাদের দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক উপলব্ধি করিয়া নিজের ও জগতের মঙ্গল করিতে সমর্থ হয়।

পাশ্চাত্যদেশের সমাজে যে সকল উপাসনা রীতি প্রচলিত আছে, তাহা ভারতীয় রীতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। পাশ্চাত্য দেশের নরনারীর বিশ্বাস তাহাদের জন্ম পরিগ্রহ জীবন ভোগের লক্ষ্যে। এজন্য তাহাদের জীবনের চরম লক্ষ্য অনন্ত সুখভোগ ইহ জীবনে এবং মৃত্যুর পরে পরলোকে। কর্মফলবাদ ও জন্মান্তরবাদ তাহাদের চিন্তার অতীত বিষয়। এজন্য তাহাদের উপাসনারীতি সকলের জন্য সহজ সরল ভাবে একপ্রকার। তাহাদের সাধনার স্তর ভেদ নাই। তাহাদের ধর্মকর্ম কতকগুলি অনুষ্ঠানের সমষ্টি মাত্র।

কিন্তু, ভারতীয় সমাজে জনগণের জীবনের চরম লক্ষ্য মোক্ষ বা মুক্তি। এজন্য ভারতীয় উপাসনা রীতি সকলের জন্য সহজ সরলভাবে একপ্রকার নহে। অধিকারী অনধিকারী ভেদে পৃথক। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত উপাসনা মনে, কোণে, বনে। এই সাধনা গুরু-মুখী। সাধনার স্তর ভেদ আছে এবং তাহাদের ধর্মানুষ্ঠানও পৃথক। পাশ্চাত্যে যে সকল ধর্ম আজ প্রধান তাহাদের মতে ভগবান এক এবং নিরাকার। কিন্তু ভারতীয় শাশ্বত ও সনাতন-ধর্মে এক এবং অদ্বিতীয় পরমব্রহ্ম বহুরূপে বহুভাবে লীলায়িত। তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি একই সময়ে নিরাকার ও সাকার—সগুণ ও নির্গুণ। সাধকের সাধনার হিতার্থে তিনি বহুরূপে সাধকের নিকট আবির্ভূত হইয়াছেন এবং এখনও হইতেছেন। এজন্য ভারতীয় সমাজতন্ত্রে যেমন ব্যক্তিগতভাবে উপাসনা আছে, তদ্রূপ সমষ্টিগত-ভাবেও দেবার্চনা আছে। ইহা কোন কোন স্থানে নিত্য এবং কোন কোন স্থানে নৈমিত্তিক। তীর্থক্ষেত্রে বহু দেব দেবীর নিত্য উপাসনা বর্তমান। তীর্থক্ষেত্রে যাইয়া সকলেই সমষ্টিগত ভাবে উপাসনা করিয়া থাকেন। আবার নৈমিত্তিক সমষ্টিগত উপাসনা তিথি-মাহাত্ম্যে দেব দেবীর সার্বজনীন পূজা হয়। পূর্বে ইহা ভারতের প্রতি পল্লী-সমাজে এই নৈমিত্তিক পূজা-অর্চনা হইত এবং সামাজিক-ভাবে সকলে ঐ সকল পূজা-অর্চনায় যোগদান করিতেন। এই নৈমিত্তিক পূজা-অর্চনার মধ্যে শারদীয় দুর্গাপূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা, কালীপূজা; সরস্বতীপূজা প্রভৃতি প্রধান। আমাদের বাল্যকালে দেখিয়াছি, পল্লীগ্রামে কেবলমাত্র ধনিগণ তাহাদের অবস্থানুসারে বহু আড়ম্বরে শারদীয় দুর্গাপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, কালীপূজা, দোল প্রভৃতি বার মাসে তের পার্বণ করিতেন। ঐ সকল পূজা, ধনীগৃহে হইলেও সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সম্পন্ন হইত। লক্ষ্মীপূজা সরস্বতীপূজা প্রভৃতি ও অন্যান্য ব্রত ধনীনির্ধন সকল গৃহে অনুষ্ঠিত হইত। ইহারও রূপ ছিল সমাজতান্ত্রিক। পল্লীসমাজে যেরূপ অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধাদি কার্য সামাজিক নিয়ম পদ্ধতিতে প্রতিপাল্য ছিল, দেবদেবীর পূজা অর্চনাও তদ্রূপ ভাবেই নিষ্পন্ন হইত। এই সকল সামাজিক কার্যে এবং দেব অর্চনায় দান ও ভূরি-ভোজন ব্যক্তি বিশেষের সাধ্যানুসারে, কোন কোন ক্ষেত্রে সাধ্যের অতিরিক্তভাবেও সম্পাদিত হইত। ভারতীয় পল্লীসমাজে ধনী, ধন উপার্জন করিতেন নিজের ভোগের জন্য নহে, নিজের কল্যাণের জন্য, সামাজিক সকল শ্রেণীর মানবের হিত ও সন্তোষের লক্ষ্যে। তখনকার দিনে সার্বজনীন অর্থে বা বলে দুর্গাপূজা, কালীপূজা, সরস্বতীপূজা প্রভৃতি ছিল না। উহা ব্যক্তিবিশেষের অর্থে সার্বজনীন ভাবে নিষ্পন্ন হইত। একমাত্র কোন বিশেষ কারণে, যেরূপ মহামারী প্রভৃতি উপস্থিত হইলে, সার্বজনীন অর্থে বারোয়ারী রক্ষাকালী প্রভৃতি দেবদেবীর অর্চনা হইত। এই উপলক্ষ্যে কবি, তরজার লড়াই প্রভৃতি হইত। এখন যেমন সার্ব-জনীন শারদীয়া, কালীপূজা প্রভৃতিতে কিছু পরিমাণ জুলুম-বাজী হইতেছে, তখন তাহার প্রয়োজনমাত্র ছিলনা। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে যাহার যেমন সামর্থ্য, তাহা তাহারা দান করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেন। আমরা এখন পাশ্চাত্য ধারায় শিক্ষিত হইতেছি ভোগধর্মী সভ্যতার মোহ আমাদের হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়েছে—পরহিতে বা পরের সন্তোষজন্য ত্যাগে যে নিজের কল্যাণ হয় ইহা আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। এই জন্য বর্তমানে ধনীগৃহে সমষ্টিগত ভাবে পূজাঅর্চনা উঠিয়া গিয়াছে, সামাজিক ভূরি ভোজন লুপ্ত হইয়াছে। এখন তৎস্থলে প্রীতিভোজ স্থান পাইয়াছে। এই প্রীতি সামাজিক ভাবে নহে বিশেষ ভাবে। ভারতের সহর ভোগধর্মী সভ্যতার অবদান বা অপদান। ধনীগণ তাহাদের পল্লীভবন ত্যাগ করিয়া সহরবাসী হইয়াছেন। সহরে ত্যাগধর্মী সমাজ কোথায়? এখানে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য। সমষ্টিগত কোন চিন্তা সাহরিক বা সহরবাসীর হৃদয়ে স্থান পায় না। তাহাদের সমাজ আপনাকে কেন্দ্র করিয়া আপনার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবী লইয়া। কোন মেস্ বা হোটেলে যাহারা একত্রে বাস করেন ও আহারাদি করেন তাহাদের মধ্যে যেমন কোন পারিবারিক বন্ধন সৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ সহরে যাহারা একত্রে বাস করেন—একই বাজারে দ্রব্যাদি ক্রয় করেন তাহাদের মধ্যে সামাজিক প্রীতির বন্ধন উৎপন্ন হয় না। সহরে একটি গৃহে যখন উৎসব চলে, তখন পার্শ্ববর্তী গৃহের কোন হৃদয়বিদারক ঘটনা সেই উৎসবের বাধক হয় না। শুধু গৃহস্থের কেন, একটি ফ্লাট-বাড়ীর একটি কক্ষে যখন বিবাহ উৎসব, তাহার দেয়ালের অপর পার্শ্বে কোন বিধবা নারীর একমাত্র সক্ষম পুত্রের

মৃত্যুর জন্য মর্মভেদী ক্রন্দন ইহা প্রায় নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। বর্তমানে ভারতের প্রতি সহরে যাহারা বাস করিতেছেন তাহাদের মধ্যে ভোগের প্রতিযোগিতা চলিতেছে পরহিতে ত্যাগ—যাহা ভারতীয় সভ্যতার ঐতিহ্য, তাহার সামান্য চিন্তাও কোন সহরবাসী নরনারীর হৃদয়ে আজ স্থান পায় না! ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে ভোগবাদ শুধু হেয় নহে, নরকের দ্বার বলিয়া বর্ণিত। ভারতীয় নীতিশাস্ত্র শুধু ত্যাগের উপদেশে পরিপূর্ণ। ইহার আদি মধ্য অন্ত শুধু ত্যাগের জয়গান। ধনী নির্ধনকে ধনদান করিবেন। জ্ঞানী অজ্ঞজনগণকে জ্ঞান বিতরণ করিবেন, কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠকে শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিবেন। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের প্রতি একান্ত স্নেহ পরায়ণ হইবেন। সক্ষম পুত্র তাহার মাতাপিতাকে স্বর্গাদপি গরীয়সী মনে করিবেন। সতী স্ত্রী তাহার স্বামীর সন্তোষবিধান তাহার জীবনের প্রধান কর্ম মনে করিবেন, পতি তাহার পত্নীকে মহাশক্তির অংশভূতা-জ্ঞানে মাতৃসমা জ্ঞান করিবেন, গৃহস্থ অতিথি পরায়ণ হইবেন। ভারতীয় সমাজতন্ত্রে সকলেই স্বীয় আত্মার কল্যাণ কামনায় স্ব স্ব ভোগেচ্ছাকে সংযত করিবেন। গত ১৩৭১ সালের ভারতবর্ষ পত্রিকার কার্তিক সংখ্যায় পল্লীকেন্দ্রিক ভারতবর্ষ প্রবন্ধে বিশেষ সমাজের ত্যাগধর্মী সভ্যতার কয়েকটী ঘটনা প্রকাশ করিয়াছি। এই প্রবন্ধে পল্লী-সমাজতান্ত্রিক কয়েকটী ঘটনা বিবৃত প্রকাশ করিয়া ইহার উপসংহার করিব। মনে হয় ইহা ১৯২০ সালের ঘটনা। আমি তখন একটী মহকুমা কোর্টে সদ্য ওকালতী আরম্ভ করিয়াছি। আমার কনিষ্ঠভ্রাতা জলধর চট্টোপাধ্যায় তখন সেই মহকুমা হইতে প্রকাশিত একটী সাপ্তাহিক পত্র "কল্যাণী"র সম্পাদক। সেই কোর্টে তখন সর্বপ্রথম একজন নমঃশূদ্র উকীল যোগদান করেন। তিনি মহকুমা বার লাইব্রেরীর সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হন কিন্তু, বার লাইব্রেরীর তদানীন্তন ভৃত্য তাহাকে জলদান এবং জলপানান্তে তাহার উচ্ছিষ্ট পানপত্র লইতে অস্বীকৃত হয়। বার লাইব্রেরীর অনতিদূরে কল্যাণীপ্রেস। জলধর তখন পূর্ণ যুবক। জলধর বার লাইব্রেরীর সম্পাদকের নিকট একটী আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। তাহার মর্মার্থ, তিনি নবাগত উকীল বাবুর অবৈতনিক ভৃত্য রূপে কার্য করিতে উৎসুক। সেই আবেদন গৃহীত হয় এবং যথারীতি একটী নিয়োগপত্র জলধরের নিকট প্রেরিত হয়। জলধর যথাসময়ে কর্মে যোগদান করেন এবং ভৃত্যরূপে লাইব্রেরী গৃহের কোন আসন গ্রহণ না করিয়া ভূমিতলে উপবিষ্ট হন। জলধর তখন ঐ মহকুমা পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে একটী বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি। জলধরকে ভৃত্যরূপে দেখিতে বহু লোকের সমাগম হইতে থাকে। এইভাবে কয়েকদিন গত হয়। পরে একদিন কোন অনিবার্য কারণে অন্যত্র যাওয়ায় তিনি কর্মে যোগদান করিতে অসমর্থ হন। বার লাইব্রেরী-সম্পাদক তজ্জন্য জলধরের কৈফিয়ৎ তলব করেন। জলধর তাহার কৈফিয়ৎ-এ বলেন, তিনি নবাগত উকীল বাবুর অনুমতি লইয়াই অন্যত্র গিয়াছিলেন। এই কৈফিয়ৎ অগ্রাহ্য হয়। কারণ, তাহার নিয়োগকর্তার অনুমতি লওয়া হয় নাই। এজন্য তাহাকে সতর্ক করা হয়। জলধর এই সকল ঘটনা এবং পত্রাদির সঠিক নকল তাহার সম্পাদিত কল্যাণী-পত্রিকায় প্রকাশ করেন। তখন কল্যাণীপত্রিকার সহিত কলিকাতা হইতে প্রকাশিত সকল প্রকার সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র-পত্রিকার আদান প্রদান ছিল। কল্যাণী-পত্রিকায় প্রকাশিত ঐ সম্বন্ধে যাহা কিছু, তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ তদানীন্তন প্রবাসী, সঞ্জীবনী, বিজলি, সন্ধ্যা প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় জলধরকে অমানুষের মধ্যে মানুষ সংজ্ঞায় অভিহিত করেন। ইহার ইংরাজী অনুবাদ তখনকার ষ্টেটস্‌ম্যান্‌, ইংলিসম্যান্‌ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইহা লইয়া বৃটিশ পার্লামেণ্টে আলোচনা হয়। তখন নবাগত উকীল বাবুর জলপান সমস্যার সমাধান হয়। কিন্তু বার লাইব্রেরীর সভ্যগণ হতমান হইয়া কল্যাণী পত্রিকার বিরুদ্ধে একযোগে দণ্ডায়মান হন। ফলে জলধর, বহু ক্ষতি স্বীকার করিয়া কল্যাণী প্রেস ও পত্রিকা জিলার সদরে স্থানান্তর করেন তথাপি বার-লাইব্রেরীর নিকট নতি স্বীকার করেন না।

জলধর ছিলেন একনিষ্ঠ সমাজসেবক। তিনি সহর-বাসী হইলেও মাঝে মাঝে তাহার পল্লীভবনে যাইতেন এবং পল্লীবাসীর সুখ-দুঃখে একান্ত ভাবে যুক্ত হইতেন। ভোগধর্মী সমাজব্যবস্থায় যেরূপ ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিরা অনাচার অত্যাচার আইনের বাধা অতিক্রমে সক্ষম, ত্যাগধর্মী সমাজ-ব্যবস্থায় তদ্রূপ সমাজপতিগণ ধর্মের অনুশাসনের উর্ধ্বে থাকিবার চেষ্টা করিতেন। জলধর সমাজপতিগণের দুর্নীতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন এবং গ্রামের যুবকগণ তাহার

সাহায্যে অগ্রসর হন। তন্মধ্যে যে পাঁচজন সক্রিয় ছিলেন তাহাদের 'পঞ্চকলি' আখ্যায় অভিহিত করেন দুর্নীতির পোষকগণ। সেই সময় গ্রাম্য একটি বালবিধবা গর্ভবতী হইয়াছেন প্রকাশ পায়। গ্রামের এই দুর্নীতির কণ্ঠরোধ কল্পে গোপনে তাহার গর্ভনাশের চেষ্টা হয়। গ্রাম্য এই চেষ্টার অর্থ অধিকাংশ ক্ষেত্রে গর্ভবতীর মরজীবনের পরিসমাপ্তি। জলধর এই সংবাদ জানিয়া তাহাকে নিজ বাটিতে আশ্রয়দানে তাহার জীবন রক্ষা করেন। যুবতী একটি কন্যা প্রসব করে। যুবতী এখন প্রৌঢ়া, জীবিতা। কন্যাটী বিবাহিতা, কয়েকটী পুত্র কন্যার জননী। একটি দুর্নীতির কণ্ঠরোধে অন্য দুর্নীতির আশ্রয়গ্রহণ যেরূপ অন্যায় তদ্রূপ দুর্নীতির প্রকাশ রুদ্ধ করিয়া দুর্নীতিকে প্রশ্রয়দান তদ্রূপ অন্যায়। সমাজের উচ্চস্তরের দুর্নীতির বাহ্যপ্রকাশ অবরুদ্ধ করিয়া দুর্নীতিদমনের হাস্যকর চেষ্টা আজিও চলিতেছে। ইহা দুর্নীতির প্রশ্রয় দান এ কথা বুঝিয়াও তাহারা বুঝিতেছেন না।

শ্রাদ্ধাদিতে সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয় তখনকার পল্লীসমাজে প্রশংসার্হ ছিল। এজন্য অনেক গৃহস্থ সাময়িক উত্তেজনায় এত অধিক ঋণগ্রস্ত হইতেন তাহার পরিশোধের সম্ভাবনা পর্যন্ত তাহাদের থাকিত না। 'সর্বমত্যন্তগর্হিতম্' এই ঋষিবাক্যের প্রচারের ব্যবস্থা পল্লীগ্রামের সমাজসেবীগণ করিয়াছিলেন। জলধর তাহার কন্যার বিবাহে নিমন্ত্রিতগণকে একমাত্র সুপেয় পানীয় এবং 'বাতাসা' দানে আপ্যায়িত করিয়া তাহার আদর্শ প্রচার করেন। পল্লীগ্রামের সমাজব্যবস্থার উন্নতিকল্পে একটি পল্লীকংগ্রেসের পরিকল্পনা জলধরের ছিল। এই পল্লীকংগ্রেসের সর্বপ্রথম অধিবেশন জলধর তাহার পল্লীগ্রামে করেন। তাহার প্রচারে ঐ কংগ্রেসের অধিবেশনে বহু জনসমাগম হয়। তদানীন্তন "ভারতবর্ষ পত্রিকা"র সম্পাদক সুসাহিত্যিক জলধর সেন ঐ কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেন। তাহার কিছুদিন পরে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় ভারতের তথা বঙ্গদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক অবস্থায় দ্রুত পরিবর্তন হইতে থাকায় ঐ পল্লীকংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন সম্ভব হয় নাই। তাহা হইলেও নিজগ্রামের উন্নতিকল্পে তাহার চেষ্টার কোন বিরাম ছিল না। সেই পল্লীগ্রামে ছিল জল কষ্ট এবং জলে কষ্ট। বর্ষাকালে ছিল জলে কষ্ট, গ্রীষ্মে ছিল জলকষ্ট। বিশুদ্ধ জল কোথায়ও ছিলনা, গ্রামটী নদী হইতে কিছু দূরবর্ত্তী। তবে কয়েকটি পুষ্করিণী ছিল। কিন্তু সেই পুষ্করিণীর জলকে বিশুদ্ধ রাখিবার কোন ব্যবস্থা একরূপ অসম্ভব ছিল। এজন্য তিনি স্বীয় পল্লীবাটীতে একটী জলাধার স্থাপন করেন। 'টিউবওয়েল'-এর পাম্পের প্রয়োগে জলাধারে জল সঞ্চিত হইত। তাহাতে 'পাইপ' সংযোগে গ্রামের কয়েকটী গৃহস্থের বাড়ীতে জল সরবরাহ চলিত. অনেকের পক্ষে অর্থের স্বচ্ছলতা না থাকায় তাহাদের ঘরে বসিয়া জল প্রাপ্তির সুযোগ হইত না, অবশ্য তাহারা 'টিউবওয়েল' হইতেই জল গ্রহণ করিতেন। তখনকার দিনে স্যানিটারী ল্যাট্রিন (বিজ্ঞান সম্মত পায়খানা) সহরে প্রচলিত হইলেও পল্লীর নিভৃত অঞ্চলে ইহার প্রচলন ছিলনা। জলধর তাহার পল্লীভবনে দ্বিতলে একটী এবং নিম্নতলে দুইটি বিজ্ঞানসম্মত পায়খানা স্থাপন করিয়া পল্লীবাসীর বিস্ময় উৎপাদন করেন। জলধরের সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ স্বদেশরঞ্জন তাহার কিশোর বয়সে সন্ত্রাসবাদীগণের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়েন এবং একজন অত্যাচারী রাজকর্মচারীর হত্যার চেষ্টার সংশ্রবে রিভলবার সহ ধৃত হন। তাহাদের দলের অন্যান্য সকলের সংবাদ গ্রহণের চেষ্টায় এই কিশোর বালকের উপর অস্বাভাবিক নির্যাতন করা হয় কিন্তু তাহার নিকট হইতে কোন প্রকার সংবাদ প্রাপ্তির আশা না থাকায় তাহাকে হত্যাচেষ্টার অপরাধে বিচারার্থ প্রেরণ করা হয়। শ্রীমানের তিন বৎসর সশ্রম শ্রীঘর বাসের হুকুম হয়। জলধরের চেষ্টায় শ্রীমানের সশ্রম শ্রীঘর বাসের অধিকাংশ সময় হাসপাতালে বিনাশ্রমে বাস সম্ভব হয়। তাহার পর শ্রীমান্ তাহার পল্লীভবনে অন্তরীন থাকেন। সেই স্থানে দশসহস্র টাকার মূলধনে একটী কুটীর শিল্পাশ্রম "পল্লীকল্যাণ প্রতিষ্ঠান লিঃ" নামে স্থাপিত হয়। এই "পল্লীকল্যাণ প্রতিষ্ঠান লিঃ" এক দিকে যেমন পল্লীসমাজের উন্নতিলক্ষ্যে কার্য করিত, অপর দিকে বেকার কর্মক্ষম ব্যক্তিগণের কর্মের ব্যবস্থা থাকিত। আমি আমার সুপরিচিত একটী মাত্র পল্লীসমাজের কথা বলিলাম এরূপ লক্ষাধিক পল্লী যাহা স্বাধীনতার যাংস্পর্শে অসীম সম্ভাবনা পূর্ণ ছিল, তাহা ভারত স্বাধীনতার পাদমূলে বলি প্রদত্ত হইয়াছে। যাহা ঐ পল্লীবাসীগণ স্বপ্নেও চিন্তা করিতে পারেন নাই, তাহাই বাস্তবে সংঘটিত হইয়াছে। বঙ্গের-তৃতীয়াংশের

সমাজসেবকগণের সমাজসংস্কারপরিকল্পনা ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়াছে। বঙ্গমাতার যে অংশ ছিল সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা, ধনধান্যে পুষ্পে-মৎস্যে ভরা, তাহা আজ পররাজ্য-গত। বঙ্গমাতার ঐ অংশে যাহারা ছিলেন স্বাধীনতার অগ্রদূত, সমাজসেবক, পল্লীর প্রাণকেন্দ্র, তাহারা সকলেই শুধু সে স্থান হইতে বিতাড়িত নন, তাহারা বঞ্চিত, রিক্ত, সর্বহারা। খণ্ডিত-ভারতের স্বাধীনতা গ্রহণের আজ অষ্টাদশবর্ষ অন্তে ভারতের সাধারণ নরনারীর কতটুকু উপকার সাধিত হইয়াছে তাহা আজ মর্মপ্রদাহী একটি গবেষণার বস্তু। বঙ্গমাতার একনিষ্ঠ সমাজসেবক জলধর আজ আর ইহ জগতে নাই। গত ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর মাসের একটী সন্ধ্যায় হতাশা-নিরাশা জড়িত হৃদয়ে রহস্যা-লাপের সঙ্গে সঙ্গে মানবলীলার পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। তাহার মৃত্যুসন্ধ্যায় তিনি অস্ত্র প্রয়োগের পরে শয্যাগত ছিলেন। তাহার স্থানীয় কয়েকটী গুণমুগ্ধ বন্ধু তাহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। নানা বিষয়ের আলোচনা চলিতেছিল। অকস্মাৎ জলধর তাহার একজন বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেন "আচ্ছা জীতেন বাবু! মৃত্যু সময়ে কি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর জীবকে দর্শন দান করেন, এবং মহেশ্বর কি বুকে আসিয়া বসেন?" জীতেন বাবু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন "হঠাৎ এ কথা কেন?" জলধর তখন নির্বাক, নিস্পন্দ, নিমিলিত চক্ষু। নাড়ীর গতি নাই হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ, শব্দহীন। এরূপ আকস্মিক মৃত্যুতে সকলে হতভম্ব হইয়া পড়েন। শ্রীগীতায় ভগবান বলিয়াছেন—জীব যে ভাবে ভাবিত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করেন, সেই ভাব তিনি প্রাপ্ত হন। জলধর তাহার অন্তকালে মহেশ্বরকে চিন্তা করিয়াছিলেন। তাহার কি শিবলোক প্রাপ্তি ঘটিবে? কে বলিবে মৃত্যু-রহস্য কি? মৃত্যুর পরপারে কি আছে?

ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি!! ওঁ শান্তি!!!

শিল্পী—শম্ভু রায়
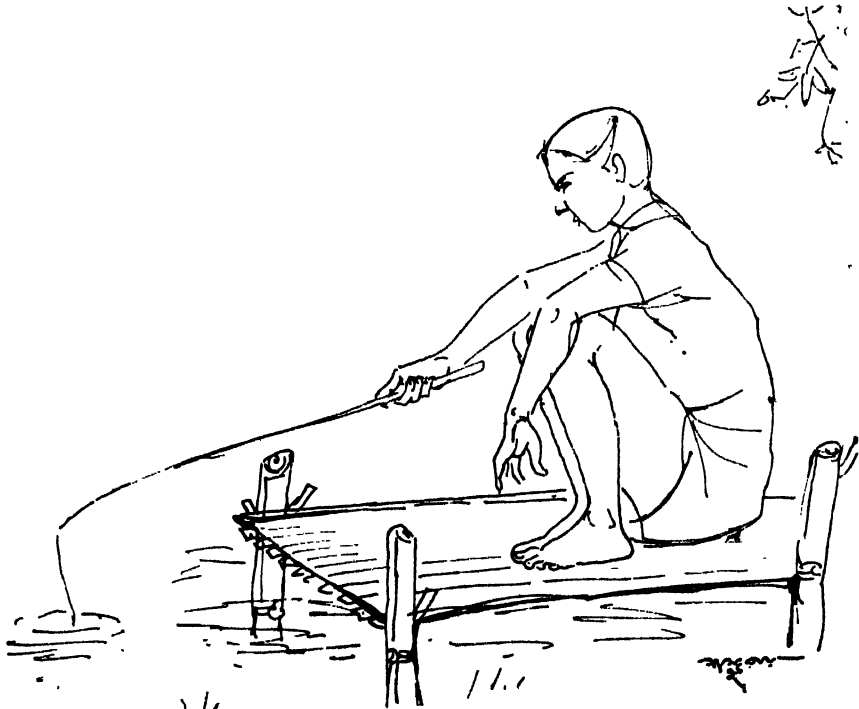
মুসাফির

তারাপ্রবণ ব্রহ্মচারী

দু'পাশে দেড়মানুষ প্রমাণ আমগাছের সারি। মধ্যিখান দিয়ে টাংগাগাড়ী চলছে। এদিক ওদিক দেখছে রূপসিং। গন্তব্যস্থল কতদূর—মুসাফিরখানা পৌছুতে কতপথ বাকি আরো। মাঝে মাঝে সইসকে জিগেস করে জেনে নিচ্ছে। ষ্টেশানে যাত্রীদের কাছে, সইসের মুখে মুসাফির-খানার কর্ত্রীর প্রশংসা শুনেছে অনেক। দূরের যাত্রীরা এ পথে এলে, দু'চারদিন থাকে। যারা থাকেনা, তারা মুসাফির খানার কর্ত্রী মিলাফাকে ডেকে, মিঠে গলার গান শোনে টাংগায় বসে বসে। চোখ বুজে বিশ্রাম নিয়ে নেয় এই অবসরে সইস-ঘোড়া।

এক গেলাস ঠাণ্ডা পানি দিতে বলে মিলাফাকে সওয়ারী। মুচকি হেসে, মাথার ওড়নায় মুখ ঢেকে, পায়ের মল বাজিয়ে ভিতরে চলে যায় মিলাফা। ফিরে আসে কালো কষ্টিপাথর রঙের সুরাই কাঁকে নিয়ে। সুরাই ঢাকা গেলাসে জল ঢেলে, সওয়ারার ঠোঁটে ঠেকিয়ে ধরে।

মুগ্ধচোখে চেয়ে থাকে সওয়ারী মিলাফার মুখের দিকে কিছুক্ষণ। ঠাণ্ডা পানিতে গলা ভিজিয়ে নেয় চুমুক দিয়ে সওয়ারী। খোশ মেজাজে বুলি আওড়ায়। বহুত খুসবু পানি সিরাজী। কেওড়া মেশানো সুগন্ধি জলে তেষ্টা মেটাতেই তো আসি তোর কাছে।

হেসে কুটি কুটি হয় মিলাফা। মাথা নুইয়ে কুর্ণিশ জানায়। বহুত বহুত সুক্রিয়া মেরে হুজুর, মেরে মালিক। হুজুর আমার, মালিক আমার, অনেক-অনেক ধন্যবাদ।

সইসকে আদেশ দেয় হুজুর মালিক, ঘোড়ার ঘুম ভাঙিয়ে দিতে—জাগিয়ে দিতে। যাত্রা সুরু হবে আবার। জেবে হাত পুরে দেয় সওয়ারী। টাকা বার করে। এক টাকা-দুটাকা—যা হাতে ওঠে। ইনাম দেয় মিলাফাকে। দাতা মালিকের যাত্রা পথের মংগল কামনা করে মিলাফা। সুস্থশরীরে ফিরে আসার কামনা করে।

মুসাফিরখানা ছেড়ে টাংগা চলতে সুরু করে। কিন্তু যতদূর দেখা যায়—পিছু ফিরে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে সওয়ারী। মিলাফার অমোঘ আকর্ষণ। যতদূর শোনা যায়—উৎকর্ণ হয়ে শোনে মিলাফার গলার কাতর আকুতি। দেওতা কৃপা করো! মালিকসে দূর রহে মুসিবৎ! দূর রহে।···মালিকের বিপদ যেন না হয়, না হয়···।

একটা স্নেহশীতল আমেজে মন ভরে ওঠে ঘরছাড়া বিদেশী যাত্রীর। নিজের নিবিড় আত্মীয়ের সহানুভূতির পরশ পায় বুঝি মিলাফার কথায়—আচার ব্যবহারে। মিলাফার নিখাদ সহানুভূতিই বারে বারে কাছে টানে পথিককে। নতুন যাত্রীকে পুরনো করে তোলে। পরিচিতদের চোখে মিলাফা সর্বগুণসম্পন্না। নাচ গানে, আদর আপ্যায়নে অদ্বিতীয়া। একাই একশো।

এই সমস্ত শুনে মিলাফাকে দেখবার কৌতূহল বেড়ে উঠেছে আরো রূপসিং-এর। অন্য জায়গা বাতিল করে দিয়েছে। মুসাফিরখানাতেই উঠবে মনস্থ করেছে। দু'দিন থেকে, বাপের নির্দেশ মতো, ব্যবসা সংক্রান্ত কাজ সেরে দেশে ফিরবে। কাঁচের চুড়ির আমদানি রপ্তানির কারবার রূপ সিং-এর বাবা দিলওয়ার সিং-এর। নানা দেশের বিচিত্র ধরণের কাঁচের চুড়ি নিয়ে গিয়ে রাজস্থানের গাঁয়ে গাঁয়ে পাঠানো আর মেলা-পার্বণে বিক্রিপাট করাই প্রধান ব্যবসা। লাভও হয় প্রচুর। এবারে কাশ্মীর চুড়ি নিতে এসেছে রূপসিং। বুড়ো-অথর্ব বাপ যোয়ান ছেলেকে পাঠিয়েছে গস্ত করতে।

* * *

…মুসাফিরখানার সামনে এসে টাংগা থামল। ঘোড়ার গলার ঘণ্টার আওয়াজে পাথুরে বাড়ীর দোতলা থেকে নেমে এলো মিলাফা। মুসাফির-অভ্যর্থনার চিরাচরিত রীতি পালন করল। পাখার বাতাস করল নতুন অতিথিকে। সযত্নে হাত ধরে নামাল টাংগা থেকে।

মিলাফার অনেক গুণের কথা শুনেছে আগে রূপসিং, এদেশে পদার্পণ করেই। কিন্তু এরকমটি আশা করেনি। একদৃষ্টে দেখছে মিলাফাকে। নিটোল স্বাস্থ্যের অধিকারিণী মিলাফা। পানের রসে ভেজা লাল টুকটুকে ঠোঁটের ফাঁকে, বকফুলের মতো সাদা সাজানো দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছে। হাসছে মিলাফা। বিনম্রিনীর হাসি।

রূপসিংকে দোতলায় নিয়ে এলো মিলাফা। লাল ফরাশ বিছানো ঘরে বসাল। ভালো লাগছে মিলাফাকে রূপসিং-এর। ভালো লাগছে শান্ত পরিবেশ।

নকরকে ডাকল মিলাফা। নির্দেশ দিল। এতখানি সড়ক ভেঙে গরীবখানায় আসতে মালিকের বহু তকলিফ হয়েছে। পসিনায় ভিজে যাচ্ছে সর্বাংগ। নরম তোয়ালেয় মুছিয়ে দিতে হবে এখুনি।

নাস্তার জন্য থালা ভর্তি মিঠাই রাখল রূপসিং-এর সামনে। রূপালীতবকের আতরপান আর গোলাপ সুগন্ধি জল আনাল। অভিবাদনের ভংগিতে, সামনের দিকে ঝুঁকে দুহাত এগিয়ে দিয়ে বলল মিলাফা, মেহেরবাণী করিয়ে।

মিলাফাকে দেখে অবধি এক অপূর্ব প্রাণের স্পর্শ পাচ্ছে রূপসিং। এক অপরিসীম আনন্দের ঢেউ দুলে উঠছে অন্তরের অন্তস্তলে। পঁচিশ বছর বয়স হ'ল রূপসিং-এর। জ্ঞান হবার পর থেকে এমন অদ্ভুত অনুভূতি হয়নি কখনো। এই নতুন। অভিভূত হ'য়ে পড়ছে রূপসিং সৌজন্যে।

…নাস্তা সারা হ'ল রূপসিং-এর। বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিয়ে, ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মিলাফা। খানিক পরেই ফিরে এলো আবার। সরম জড়ানো গলায় জানাল। মালিকের কাছে ক্ষমা প্রার্থিনী মিলাফা। জিনিসপত্তর অগোছালো যেন না রাখেন সরকার। নকর-নকরাণী নতুন একেবারে।

ঘাড় নাড়ল রূপসিং। অগোছালে রাখবে না কিছু। হাসল। হুঁশিয়ার হয়ে থাকবে। ভয় নেই।

* * *

অতিথির মনোরঞ্জনের জন্য রাতে গানের আসর বসাল মিলাফা। সারেঙ-তবলা বাজিয়ে এলো। আসর জমিয়ে গান ধরল মিলাফা। রাজস্থানের দেহাতীগীত। 'পানীড়ো ভরণ'মেঁ তো জদ্ আয়ুঁ…।' জল ভরিতে আসি যখন, কে যেন ডাকে তখন—বুঝি শ্যাম রায়…!

গাইতে গাইতে সরাব ঢালল গেলাসে। রূপসিং-এর মুখে তুলে ধরল। এক নিমেষে নিঃশেষ করল সরাবের গেলাস রূপসিং। সেলাম জানিয়ে গানের মজলিসের সমাপ্তি ঘোষণা করল মিলাফা। রাত অনেক হয়েছে। হুজুরের ঘুমের ব্যাঘাত হবে।

মধুক্ষরা কণ্ঠের আর একখানা গান শোনবার ইচ্ছে মনেই রয়ে গেল রূপসিং-এর। মুখ ফুটে বেরুতে পারল না। মিলাফার তকলিফ হ'তে পারে।

পরদিন ভোর।

সুখনিদ্রা ভাঙল রূপসিং-এর। হাত ঘড়ি নিতে গিয়ে হতভম্ব হ'য়ে গেল। নেই: সমস্ত ঘর খোঁজাখুঁজি করল। পেল না। স্পষ্ট মনে আছে, শোবার সময় তাকিয়ার ওপর খুলে রেখেছিল। দরজা ভেজানো ছিল. ভেজানোই আছে।

দরজায় টোকা মারছে মিলাফা। নাস্তা নিয়ে এসেছে। আসতে বলল ভিতরে রূপসিং। চুরির কথা শুনে লজ্জিত হ'ল খুব মিলাফা। দুঃখিত। সোনার কংকন দুটো খুলে ফেলল হাত থেকে। তাকিয়ার উপর রাখল।

বুঝতে আর বাকি রইল না কিছু রূপসিংএর। স্পর্শ-কাতর রমণীর বুকে চুরির ব্যথা বেজেছে। খেসারত দিতে চাইছে নিজেই।

মিলাফার উদারতা-আতিথেয়তা জীবনে ভুলতে পারবে না রূপসিং। মিলাফা চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের এদিকটা তার মনের মণিকোঠায় অমর হয়ে থাকবে। বলল, আমার দোষে গেছে। তোমার কসুর নেই। সাবধান করেছিলে আগেই। কংকন পর!

রাজী হ'ল না মিলাফা। একদিনের পরিচয়। মনে

হচ্ছে বহুদিনের। ঘনিষ্ঠা আত্মীয়া মনে হচ্ছে মিলাফাকে। একরকম জোর করেই কংকন পরিয়ে দিল রূপসিং।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল মিলাফা। আদমি দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে বছর দু'য়েক। লক্ষ্মীমন্ত লোক ছিল। থাকতে অনাসৃষ্টি ঘটেনি কখনো। দুচোখ ছল ছল করে উঠল মিলাফার।

মিলাফার খেদ শুনে, কান্না দেখে, বিব্রত বোধ করতে লাগল রূপসিং। গতস্য শোচনানাস্তি ইত্যাদি নীতিবাক্য বলে, চুরির চিন্তা থেকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করল মিলাফাকে। কিন্তু পারা গেল না। বাড়ীর অন্ধিসন্ধি তল্লাসি চালাল মিলাফা। নকর-নকরাণীদের ভর্ৎসনা করল। থানা-পুলিশের ভয় দেখাল। কিছুতেই কিছু হ'ল না। নকর-নকরাণীরা কাঁদাকাঁদি করে নিজেদের নিরপরাধ প্রমাণ করতে চেষ্টা করল।

দু'দিনের জন্য ব্যবসার খাতিরে এসে, থানা-পুলিশের হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়তে নারাজ হ'ল রূপসিং। কাজ সেরে তাড়াতাড়ি না ফিরলে, ব্যবসায় লোকসান হ'বে খুব। মিলাফাও জানাল, কারো ক্ষতি কখনো করেনি জ্ঞানতঃ। রূপসিং-এর ক্ষতি হ'ক, এটা চায় না। অগত্যা চুরিপর্ব নিয়ে আর বেশীদূর অগ্রসর হ'ল না মিলাফা। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল রূপসিং।

দুপুর।

বাইরের কাজ সেরে ফিরল রূপসিং। রাতের ট্রেনে রওনা হবে। বারান্দায় এসে হাজির হ'ল। মিলাফাকে জানাতে হ'বে। মোড়ায় বসে আছে মিলাফা। সামনের মোড়ায় বসল রূপসিং।

রূপসিং-এর বক্তব্য শুনল মিলাফা। বিষণ্ণের হাসি ফুটে উঠল মুখে চোখে। অন্তর্বেদনা ঝরে পড়তে লাগল প্রতিটি কথায় মিলাফার।

—প্রত্যেককেই নিজের জন ভেবে নিই। চলে যায় সকলে। আমার চলার পায়ে মুসাফিরখানার বেড়ি। আদমি দায়িত্ব দিয়ে গেছে। মৃত্যুর সময় বলে গেছে, ছেড়ে যাসনে কোথাও! মুসাফিরখানাই তোর জীবনসংগী। চলে যাবার ইচ্ছে হ'লেই, আদমির মুখখানা ভেসে ওঠে। ওর অক্ষম-অপটু পোড়া ডান অংগটা জল জল করে ওঠে। ঘরে আগুন লেগেছিল। নিজের জীবন বিপন্ন করে রক্ষে করেছে! দেহ পুড়েছিল আদমির। বুদ্ধি পোড়েনি। কাশীতে এসে মুসাফিরখানা খুলল। অনেক বাধাবিঘ্ন পেয়েছে। অনেক দুঃখু-কষ্ট সয়েছে। তবু চেষ্টা ছাড়ে নি। মুসাফিরখানার সুনাম ছড়িয়ে দিয়ে গেছে আদমিই। আদমির সাধের মুসাফিরখানা। ও আজ নেই। কান্নায় ভেঙে পড়ল মিলাফা।

মিলাফার মর্মবেদনা প্রাণে প্রাণে অনুভব করল রূপসিং। দু'চোখে জ্বালা ধরল। কি সান্ত্বনা দেবে মিলফাকে। ভাষা খুঁজে পেল না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল রূপসিং।

কান্না থামল মিলাফার। নিজেকে সংযত ক'রে নিল। প্রশংসার ফিরিস্তি-লেখা খাতা নিয়ে এলো ঘর থেকে। রূপসিং-এর সামনে খুলে ধরল। চোখ বুলিয়ে নিল রূপসিং। মুসাফিররা মিলাফা-মহিমা বর্ণনা করে গেছে নানাভাবে। রূপসিংও নিজের মনোগত ভাব প্রকাশ করল লেখায়। মিলাফা মিলাফাই। অফুরন্ত স্নেহের ভাণ্ডার।...

পড়ে শোনাল মিলাফাকে রূপসিং। খুশি আর ধরছে না মিলাফার চোখে-মুখে। উপচে পড়ছে। হরষে বিষাদ নেমে এলো হঠাৎ। ঠিকানা পড়ছে রূপসিং। বিলওয়ার চুড়িঅলা ...। বিলওয়ার নামটা স্মরণে আসতেই মাথার ভিতর প্রবল ঝাঁকুনি খেল যেন মিলাফা। অসম্ভব রকমের চঞ্চল হ'য়ে উঠছে মিলাফা। একটা ডুবে যাওয়া, তলিয়ে যাওয়া দুঃসহ যন্ত্রণা ভেসে উঠেছে আবার। মনের তলা থেকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে আবার।

এক এক করে সমস্ত পরিচয় জেনে নিল মিলাফা রূপসিং-এর কাছ থেকে। বিলওয়ারসিং-এর ছেলে রূপসিং। সৎমা আছে মুলুকে। খুব ছোট বয়সেই মা হারিয়েছে মাকে মনে পড়েনা।

কি যেন বলতে যাচ্ছিল মিলাফা, মুখে আটকে গেল দ্রুত পায়ে ঘরে চলে এলো। একি নির্মম পরিহাস বিধাতার। একি ভবিতব্যতা! মিলাফা ভুলতে চেষ্টা করছে বর্তমান। ভুলতে চেষ্টা করছে ব্যথাভরা বিগত স্মৃতি। পারছে না।

—বিলওয়ার সিং! কি নির্দয়-নির্মম মানুষ!

সেদিন ফাগুনের ত্রয়োদশী। পাবদায় বিরাট মেলা বসেছে। শিবপুজো উপলক্ষ্যে মেলা। বহু রকমের পসার নিয়ে, সারি সারি দোকান বসিয়েছে পসারীরা। বিকিকিনি চলছে।

সামনের ফাঁকা মাঠে ভিড় জমেছে। মিলাফা রঙিন ঘাগরা দুলিয়ে, বেণী ঝুলিয়ে নাচছে। গাইছে—কইয়াঁ চালু এ সহেলাঁ মাহারো ঘর সুনো ...। 'কোথায় যাই সই, শূন্য ঘর ছাড়ি...।'

গান থামল। চতুর্দিক থেকে পেলা পড়তে লাগল। দর্শক-শ্রোতাদের খুশির ইনাম! বাপের আদরিণী বেটি মিলাফা বায়না ধরল কাঁচের চুড়ি পরবে। আজ কামিয়েছে অনেক। মেয়ের আব্দারে বিরক্ত হয়ে উঠল ভিল সর্দার বাবল। চাঁদির বালা গড়িয়ে দেবে। শিশা ভেঙে গেলে পয়সা বরবাদ। মিলাফা নাছোড়বান্দা। দোকানে ঢুকে চুড়ি পরতে বসে গেল।

চুড়ি পরিয়ে, হাত ঘুরিয়ে দেখল বার দুয়েক দোকানী। সবুজ খুলেছে ভালো। সুন্দর মানিয়েছে। দোকানীর কথায় আনন্দে ডগমগ হয়ে উঠল মিলাফা। পিছু ফিরে তাকিয়েই অপ্রস্তুতে পড়ে গেল। বাবা চলে গেছে রেগে! পয়সা দেবেনা। হাত দু'টো বাড়িয়ে দিল। চুড়ি খুলতে ইংগিত করল। চুড়ি খুলছে দোকানী। টস টস করে চোখের জল পড়ছে মিলাফার, দোকানীর হাতের ওপর।

বিলওয়ার সিং সুরু থেকে সব ঘটনা লক্ষ্য করছিল নীম গাছের নীচে দাঁড়িয়ে। ছোট ভাইয়ের ব্যবহার অসহ্য হ'য়ে উঠল। দোকানে এলো। ভাইকে সরিয়ে দিয়ে, নিজেই সবুজ চুড়িতে ভরিয়ে তুলল মিলাফার দু'হাত।

মিলাফা দেখল বিলওয়ারসিংকে। একবার, দুবার—বারবার। লোকটার হৃদয় দেখল। মমতা দেখল। ভালো লাগল লোকটাকে। মিষ্টি হেসে কৃতজ্ঞতা জানাল মিলাফা।

এরপর থেকে রোজই একবার করে মিলাফারদের ডেরায় এসেছে বিলওয়ার। আসা-যাওয়ায় ঘনিষ্ঠতা জন্মেছে। দূরের দু'জন কাছাকাছি এসেছে। বাবাসাথী রামমন-বাবা-জাতবেরাদাররা—সকলেই বিলওয়ার সিং-এর সংগে মিলাফার অন্তরংগতা পছন্দ করে নি। রামমন সতর্ক ক'রেছে—মেলা ভাঙলে, বিলওয়ারের প্রেম প্রেম খেলাও ফুরবে।

রামমনের কথা জানিয়েছে বিলওয়ারসিংকে মিলাফা। জোরে হেসে উঠেছে বিলওয়ার সিং। বলেছে, রাজপুতের জান যায় তবু জবান টলেনা।

সকলকে অবাক ক'রে দিয়ে, বেকুব বানিয়ে, শাদি করেছিল মিলাফাকে বিলওয়ার। মিলাফা স্বামী গরবিনী হয়ে মহাসুখে কাটিয়েছিল ক'দিন। মেলা ভাঙার দিনে তারও বরাত ভাঙল যেন। রামমনের ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হ'ল। দেশে নিয়ে যেতে রাজী হ'ল না মিলাফাকে বিলওয়ার। অনেক অনুনয়-বিনয়েও মন ভেজাতে পারল না মিলাফা। বিলওয়ারের ধনুকভাঙাপণ—এখন নয়, শীগ্‌গির এসে নিয়ে যাবে।

একমাস দু মাস ...সাত মাস কেটে গেল। বিলওয়ার এলোনা। চিঠিপত্র দিলেও উত্তর আসেনা। এদিকে বিলওয়ারের ভবিষ্যৎ বংশধরের প্রাণের স্পন্দন উপলব্ধি করছে মিলফা নিজের দেহের মধ্যে—নিজের রক্তে—অস্থি-মজ্জায়।

রামমন-বাবা মিলাফাকে নিয়ে এলো জেশমেরে। স্বামীর দেশে। গ্রামবাসীদের জিগ্যেস করে করে, বিলওয়ারের মোকামের সন্ধান পেল ওরা। কিন্তু যে জন্য আসা, সে আশা ব্যর্থ হ'ল। বিয়ে করার কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করল বিলওয়ার। ভিল মেয়ের সংগে রাজপুতের বিয়ে হয় না। কিছু আদায়ের ফিকিরে সড়কের নর্তকীরা অসাধ্যকর্ম করতে পারে, অসম্ভব কথা বলতে পারে। সম্মানী লোকের ইজ্জত-হানির ভয় দেখানোই ওদের পেশা।

বিলওয়ারের যুক্তিবাণের আঘাতে অন্ধকার দেখল মিলাফা। দাঁড়াতে পারছে না—পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে যেন। মূর্চ্ছা গেল মিলাফা।

জ্ঞান হতে আত্মঘাতী হতে চাইল। দেশে মুখ দেখাবে না আর। নদীর জলে ডুবে মরবে এখানে।

আত্মহত্যা অন্যায়। একদিন নিজের ভুল বুঝবে বিলওয়ার। অনুশোচনায় দগ্ধ হ'বে। মিলাফাকে ঘরে ফিরিয়ে নেবে নিশ্চয়। রামমনই বুঝিয়ে সুঝিয়ে দেশে ফিরিয়ে আনল মিলাফাকে।

রামমনের দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হ'ল না আর। প্রায় চোদ্দমাস কাটল। বিলওয়ারের দিক থেকে কোনো সাড়াই পাওয়া গেলনা। মিলাফাকে ঘরে নেবার কোনো আহ্বানই এলো না।

অগত্যা রামমন একাই জেশমেরে এলো। বিলও-

য়ারকে বংশের ঽত্ব জন্মানোর কথা শোনাল। একবছরের হৃষ্টপুষ্ট রাজপুত শিশু মিলাফার কোল আলো করে খেলা করছে।

বিলওয়ারের হু'চোখে ঈষৎ হাসির বিদ্যুৎ খেলল যেন। কয়েক মুহূর্ত। ভয়ংকর গম্ভীর হ'য়ে উঠল বিলওয়ারের মুখখানা। রূঢ়কণ্ঠে বলল, ফের কোনো দিন দেখলে, জান যাবে। দূতগিরি করা ঘুচে যাবে জীবনের মতো।

ফিরে এসে, মিথ্যে আশা দিয়েছে রাসমন মিলাফাকে। মেজাজ ঠাণ্ডা বিলওয়ারের। আসবে। মিলাফাকে ছেলেকে নিয়ে যাবে।

এর কিছুদিন পর, অকস্মাৎ রাতের অন্ধকারে, আগুনের ফোয়ারা ছুটল। সর্বগ্রাসী আগুনের কবল থেকে মিলাফাদের ডেরা রেহাই পায়নি। রেহাই পায় নি মিলাফার বাবাও। দুর্বৃত্তরা এসে মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে বাচ্চাটাকে। ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে গেছে। ডান অংগটা খেসারৎ দিয়ে, আগুনের মৃত্যুশিখার মুখ থেকে বাঁচাল মিলাফাকে রাসমন।

মিলাফা যেন মরে বেঁচে রইল। স্বামী ত্যাগ করেছে। পুত্র নিখোঁজ হয়েছে। পিতা চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়েছে।

মিলাফাকে দেশে রাখতে ভয় পেল রাসমন। গ্রামের প্রধান খবর পেয়েছে, বিলওয়ার সিং-এর বাড়ীতে বহাল তবিয়তে রয়েছে মিলাফার বাচ্চা। বিলওয়ারের কোপে পড়েছে মিলাফা-রাসমন। যে কোনো মুহূর্তে, যে কোনো বিপদ আসতে পারে ওদের। গোপন সংবাদ গোপনে রাখল রাসমন। চুপিসারে, গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেল মিলাফাকে নিয়ে।

•• কাশীতে এলো মিলাফা-রাসমন।

* * *

এখনো অশান্তির কালোছায়া পিছু ছাড়েনি মিলাফার। ভুলতে পারেনি ওকে। দীর্ঘ চব্বিশ বছর পরেও, অতীতের ক্ষত জ্বালা ধরাচ্ছে মাথায়-বুকে নতুন করে। নতুন পরিস্থিতিতে পড়েছে মিলাফা। ছেলে এসেছে। রূপসিং এসেছে। বুকে চেপে ধরতে ইচ্ছে করেছে মিলাফার। প্রাণভরা স্নেহ উজাড় করে দিতে ইচ্ছে করেছে। পারেনি। অশুভ-আশংকায় দূরে সরে গেছে। পিছিয়ে গেছে। মিলাফার কলংকিত জীবনের কোনো পরশ যেন না লাগে রূপসিং-এর দেহে মনে। স্বর রুদ্ধ হয়ে এসেছে। বলতে পারেনি মিলাফা একটি কথাও। মিলাফা মা—একথাটাও না।

ধীরে ধীরে গয়নার বাক্সের কাছে এসে দাঁড়াল মিলাফা। বাক্সটার ভিতরের জিনিসগুলো বিলওয়ারের ওপর চরম প্রতিশোধের নিশানা। অসহায় দুর্বল মিলাফার জীবন যৌবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে বিলওয়ার। বিলওয়ার আমীর প্রতিপত্তিশালী। আমীর মুসাফির দেখলেই, বিলওয়ারের প্রতিচ্ছায়া দেখত যেন মিলাফা। একটা জাতক্রোধ জেগে উঠত বুঝি। সৌজন্যের মুখোশ পরে মোহমুগ্ধ করত মুসাফিরদের। ওদের জিনিস আত্মসাৎ করে আত্মতৃপ্ত পেত। বাক্সের জিনিসগুলো দেখত একবার করে রোজ। দেখে এখনো। বাক্সের কাছে এসে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠত। বঞ্চিতা নয় মিলাফা। সঞ্চিত করেছে অনেক কিছু।

আজ আর কোনো তৃপ্তি-আনন্দ পাচ্ছে না মিলাফা। অতৃপ্তির অসোয়াস্তি পেয়ে বসছে বড় বেশী। মনে হচ্ছে, এতদিন বাক্সবন্দী করে রেখেছে শুধু এক একজনের দীর্ঘ নিশ্বাস দুঃখ বেদনা।

বাক্সের ডালা খুলল মিলাফা। রূপসিং-এর হাত ঘড়িটা বার করল। বার দু'য়েক দেখল। ফিরিয়ে দেবে। যেখান থেকে নিয়েছে, রেখে আসবে গোপনে।

মিলাফা সুযোগ খুঁজছে। পাচ্ছে না। বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যে নামল। মুঠোর মধ্যে ঘড়ি নিয়ে চুপচাপ বসে আছে মিলাফা একভাবে। ধীর স্থির।

মিলাফার ঘরে এলো রূপসিং। বিদায় নিতে এসেছে : বাকি কাজ সারার তাগিদে একটু আগে থেকেই বেরুতে হচ্ছে। দশটাকার নোট দু'খানা চার পাই-এর ওপর রাখল রূপসিং। রূপসিংকে নির্নিমেষ নয়নে দেখছে মিলাফা। দেখল খানিক। অনেক দিয়েছে রূপসিং। খরচের চতুর্গুণ দিয়েছে। ঠোঁটের ফাঁকে ভেসে উঠছে মিলাফার পোশাকী হাসি। মাথা নুইয়ে বিদায়-অভিবাদন জানাল। বেরিয়ে গেল ঘর থেকে রূপসিং। মিলাফার মুঠোর ভিতরটা চিন চিন করে উঠছে থেকে থেকে।

...উৎকর্ণ হয়ে শুনছে মিলাফা। ঘোড়ার পায়ের নালের শব্দ—টক-টক-টক...।

টাংগাগাড়ী চলছে। রূপসিং চলে যাচ্ছে।

নিজেকে ধরে রাখা অসম্ভব হয়ে উঠল মিলাফার। এতক্ষণের সংযমের বাঁধে ভাঙন ধরল। আছড়ে পড়ল চার পাই-এর ওপর। দু'চোখে বন্যা নামল। পেয়েও হারাল। অভিশপ্ত জীবন মিলাফার। মুঠোর ঘড়িটা চেপে ধরল বুকে। দেওয়ার অবকাশ পেলনা রূপসিংকে।

একটা বেদনা-মধুর অনুভূতি যেন মিলাফার রক্তে নেচে বেড়াচ্ছে। মনে হচ্ছে, বুক থেকে ছিনিয়ে নেওয়া বাচ্চাকে ফিরে পেয়েছে আবার। বাচ্চার স্পর্শ পাচ্ছে।

রূপসিং-এর হাত ঘড়িটা আরো জোরে চেপে ধরল বুকে মিলাফা।

আমার দেশ

নরেন্দ্র দেব

কুমুদ কহ্লার পদ্ম অগণিত যেথা
মৃদরঙ্গ ভঙ্গে তোলে তরঙ্গ হিল্লোল,
উচ্ছ্বসিত আলিঙ্গনে বালুবেলা চুমি
গরজে উল্লাসে যেথা সমুদ্র কল্লোল!
হংস মিথুনেরা যেথা মৃণাল মথিয়া
সরসী সলিলে খেলে কিঞ্জল্ক মাখিয়া,
কত সাধু সন্ত যেথা সাধনার ধন
পবিত্র গাঙ্গেয় ভূমে গিয়াছে রাখিয়া।
তুঙ্গ শৈল শৃঙ্গ যেথা উচ্চে তুলে শির
আকাশ পরশ কল্পে গোপনে গরবী,
যেথা নিত্য তরু শাখে কুসুমের মেলা
অশোক, কিংশুক, জবা, কেতকী, করবী,
বিকশিত কুঞ্জে কুঞ্জে যূঁথী, জাঁতি বেলা,
রজনীগন্ধায় জাগে সন্ধ্যার সুরভি
সপ্ত সুর ছন্দে যেথা ওঠে বীণা রব
ভোরের ভৈরবী জাগে, সায়াহ্নে পূরবী।

* * *

সুনীল অম্বরে যেথা নবীন আষাঢ়
রচিতেছে বিরহীর নব মেঘদূত,
যেথায় সহস্ররশ্মি দিগন্ত ললাটে
ইন্দ্রধনু এঁকে দেয় অপূর্ব অদ্ভুত!
মধুপানে মত্ত যেথা ভ্রমর ভ্রমরী
গুঞ্জরি ফিরিছে কতো লুব্ধ মধুকর,
মলয় মাধুর্যে প্রীত রোমাঞ্চিত দেহ,
মিলিত প্রণয়ী কণ্ঠে ওঠে গাঢ় স্বর।
কুটীরে কুটীরে যেথা জনপদ বধূ
দেহলী দুয়ারে আঁকে শুভ্র আলিম্পন,
মুরজ, মুরলী, বীণা, মৃদঙ্গ সঙ্গম
রাগছন্দে বন্দনার তুলিছে কম্পন।
ত্রিবর্ণ পতাকা যেথা শোভে সৌধ শিরে
জীবন-যৌবন-চক্রে শান্তির প্রতীক,
চেয়ে চেয়ে যার পানে গর্বিত হৃদয়,
আনন্দ-চন্দনে লিপ্ত আঁখি অনিমিখ।

সুমেরু শিখর যেথা, যেথা বিন্ধ্যাচল,
হিমধবল নীলাচল, যেথা হিমালয়,
সমাহিত সমতটে বন্দর সুন্দর,
যক্ষের অলকাপুরী গন্ধর্ব আলয়।
বপ্রক্রীড়ারত মেঘ গগন প্রাঙ্গণে,
ক্ষণে ক্ষণে চমকিছে চপলা চঞ্চলা,
শ্রাবণ নিশীথে যেথা প্রাবৃট্ আঁধারে
অভিসারিকারা চলে স্খলিত অঞ্চলা।
দুলিছে কদলীপত্র পীতাভ হরিৎ,
প্রাচীর বেষ্টিত লতা ললিত ভঙ্গীতে,
তাল তমালের কুঞ্জে নারিকেল বনে
অবাক গুবাক যেথা বেণুর সঙ্গীতে।
মানস-সরসী তীরে তুষার কিরীটি
কৈলাসের শ্বেত-শৃঙ্গ হাসে অট্টহাসি
সেই তো আমার দেশ, যেথা কুঁড়েখানি,
শস্য ক্ষেত্র, নদীচর, বড় ভালোবাসি।

* * *

কেশরী, শার্দুল, ঋক্ষ, আছে করীদল,
ভুজঙ্গ, ময়ূর মায়া, মৃগ চিত্রধর,
সে আমার মাতৃভূমি চির অনুপম,
ধরণীতে শ্রেষ্ঠ দেশ—অপূর্ব সুন্দর!
সুস্বাদু সুমিষ্ট ফল, সুশীতল বারি,
ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণে জীবের সম্বল,
ধন্য আমি সেই দেশে লভেছি জনম
—বহু পুণ্যফলে মেলে হেন জন্মস্থল!
সুনির্মল নভস্তলে কলঙ্কিত চাঁদ
অকলঙ্ক জ্যোৎস্না ধারা করে বিতরণ;
হৃষিকেশ হৃদিস্থিত কৌস্তভের প্রায়
বক্ষে তার বিচ্ছুরিত প্রশস্ত কিরণ।
আমার স্বদেশ সে যে, আমার জননী
ধাত্রী-মাতা, সে ধন্যা বরেণ্যা ভারতী;
জন্মে জন্মে আমি যেন জন্মি এই দেশে,
গভীর শ্রদ্ধায় করি মায়ের আরতি।

দৈব ঔষধের আশ্চর্য সফলতা

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

"ভারতবর্ষ" পত্রিকায় আমি গত ফাল্গুন মাসের সংখ্যায় উপরোক্ত শীর্ষক একটি ছোট প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলাম, এবং তাহাতে কতকগুলি বহু-পরীক্ষিত ও কতকগুলি অল্প-পরীক্ষিত দৈব ঔষধের প্রাপ্তিস্থান জানাইবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। ইহার ফলে অনেকগুলি আনন্দদায়ক ঘটনা ঘটিয়াছে। সারা ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রদেশ সহর ও পল্লীগ্রামবাসী বহু রোগী ঐ সকল দৈব ঔষধের মধ্যে অনেকগুলি আনাইয়া ব্যবহার করিয়াছেন ও আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। তন্মধ্যে অনেকে আমাকে পত্র লিখিয়া এই "ভারতবর্ষ" পত্রিকার কর্তৃপক্ষকে ও আমাকে এই সংবাদ প্রচারের জন্য ধন্যবাদ জানাইয়াছেন।

কিন্তু সেই সঙ্গে, কোন কোন অপ্রীতিকর পরিস্থিতি দেখা দিয়াছে। সেই সকল বিষয়ে আমার ন্যায্য দায়িত্ব স্বীকার করিয়া, আমার সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণকে আমি আমার কৈফিয়ৎ দিতেছি, এবং কতকগুলি বিষয় জানাইতেছি।

১। এক ভদ্রলোক একটি দৈব ঔষধে উপকার না পাইয়া, আমার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া আমাকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে পত্রোত্তরে জানাইয়াছিলাম—

(১) দৈব ঔষধে অথবা আধুনিক বৈজ্ঞানিক ঔষধে, শতকরা ১০০ জন রোগী আরোগ্য লাভ করেন না। এলোপ্যাথিক ঔষধের যেটিতে শতকরা ৬০জন আরোগ্য লাভ করেন, সেই ঔষধটি ফলপ্রদ বলিয়া গণ্য হয়।

(২) আমার উল্লিখিত "বহু পরীক্ষিত" দৈব ঔষধগুলিতে শতকরা ৭৫ হইতে ৯০জন আরোগ্য লাভ করেন। যিনি দৈব ঔষধে শতকরা ১০০ জন রোগীর আরোগ্য আশা করেন, তাঁহাকে আমি দৈব ঔষধ ব্যবহার করিতে নিষেধ করিতেছি।

আমি বিনামূল্যে (ক) উচ্চ রক্তের চাপের জন্য এক টুকরা রূপা, এবং (খ) হৃদ্‌রোগের জন্য একটুকরা শিকড় দিয়া থাকি। উপরোক্ত ভদ্রলোক আমার পত্রোত্তর পাইয়া, আমার নিকট হইতে ঐ দুটি দৈব ঔষধ লইয়াছেন।

২। আমার উল্লিখিত অন্য দৈব ঔষধগুলি, কি উপায়ে পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে আমি ঐ প্রবন্ধে কিছু জানাই নাই। ইহার ফলে, অনেক রোগী ঐ সকল ঠিকানায় ঔষধ পাইবার জন্য পত্র লিখিয়াছেন, এবং কেহ কেহ পত্রোত্তর বা ঔষধ পান নাই। তাঁহারা আমাকে ইহা জানাইয়াছেন। আমি আমার এই ত্রুটির জন্য দুঃখিত, তবে স্থানাভাবের ভয়ে ঐ সকল সংবাদ দিতে পারি নাই। এক্ষণে আমার বক্তব্য এই—

(১) মাত্র কয়েকটি ঔষধ, রোগী নিজ ঠিকানা-যুক্ত খাম পাঠাইলে ঐ খামে বিনামূল্যে পাইতে পারেন।

(২) অধিকাংশ ঔষধ পাইতে হইলে রোগীকে নিজেকে যাইতে হয়, অথবা কাহাকেও পাঠাইয়া ঔষধ আনাইতে হয়।

(৩) প্রত্যেক রোগী নিজ ঠিকানাযুক্ত খাম পাঠাইলে, ঔষধ প্রাপ্তির উপায়ের সঠিক সংবাদ পাইতে পারেন।

৩। কোন কোন দৈব ঔষধ দাতা, প্রকৃত সৎ ব্যক্তি ও পরোপকারী। কিন্তু তাঁহাদের নিকট বিনামূল্যে দৈব-ঔষধের জন্য বহু ব্যক্তি যাইবার ফলে, তাঁহারা কখনও কখনও বিরক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন। এ সংবাদ যাঁহারা আমাকে জানাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে একটু ধৈর্য অভ্যাস করিতে অনুরোধ করিয়াছি। ঐ বিরক্তিটুকু, ঐ অমূল্য ঔষধের মূল্য মনে করিলে, সহজেই সহ্য করা যাইবে।

৪। কোন কোন দৈব ঔষধ দাতা কিছু অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে রোগীকে ঔষধটি দিবার সময় তাঁহাকে ৫।৭ দিন পরে খবর দিতে বলেন এবং যদি উহাতে আরোগ্য না হয়, তাহা হইলে কিছু টাকা দিলে একটি উৎকৃষ্ট দৈব ঔষধ দিতে প্রতিশ্রুতি দেন। সম্ভবতঃ, তাঁহারা প্রথমবারে দৈব

ঔষধটি না দিয়া অন্য কোন ঔষধ দেন। যাঁহারা আমাকে এই সংবাদ দিয়াছেন তাঁহাদিগকে আমি বলিয়াছি যে, ভবিষ্যতে ঐ সকল স্থানে গেলে, মাত্র একটিবার দৈব ঔষধ দিতে বলিবেন। ইহাতে ফল না হইলে সেখানে আর যাইতে বারণ করিয়া দিতেছি।

৫। অন্য কোন দৈব ঔষধদাতা রোগীকে নানা প্রকার কৌশলে বাধ্য করিয়া, তাঁহার নিকট বার বার টাকা আদায় করিয়াছেন, এ সংবাদও পাইয়াছি। আমি সকল রোগীকে অনুরোধ করিতেছি যে, যদি কোন দৈব ঔষধ দাতা ঐভাবে অর্থ চাহেন, তাঁহারা যেন কদাচ সেই ব্যক্তির কাছে ভবিষ্যতে আর না যান। ইতিমধ্যে কেহ সেখানে গিয়া থাকিলেও, অবিলম্বে সেই স্থান ও সেই ব্যক্তিকে বর্জন করিবেন।

এই কলিকাতা সহরে, সহস্রাধিক প্রকৃত উপকারী দৈব ঔষধ আছে। একটু সাবধানতার সহিত আত্মীয় বন্ধু বা পরিচিত ব্যক্তির নিকট সন্ধান করিলেই, অনেক ঔষধের সন্ধান পাওয়া যাইবে। এই অর্থ সঙ্কটের যুগে, অনেক দৈব ঔষধ সমাজের প্রভূত উপকার করিতেছে। সেইজন্য আমি পুনরায় বলিতেছি যে অনেক ফলপ্রদ ঔষধ **বিনা মূল্যে পাওয়া যায় এবং তাহা সেবন করিতে হয় না**, যথা, মাদুলী, আংটী, বালা, শিকড়। উহার দ্বারা অপকার হইবে না, উপকার না হইলেও ক্ষতি নাই। ঐ প্রকার ঔষধ পরীক্ষা করিবার জন্য প্রত্যেক সমাজ-সেবীকে আমি অনুরোধ জানাইয়া এই কৈফিয়ৎ শেষ করিলাম।

শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়
১৬৫ বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬

মৃত্যু ও মানুষ

শান্তশীল দাশ

মৃত্যু সে অনেক বড়ো, শক্তি তার অনন্ত অসীম ;
সে আসে যখন খুশি, যাকে খুশি নিয়ে চলে যায়,
কোন বাধা মানে না ক'। ব্যর্থ করে দিয়ে বিজ্ঞানের
সব শক্তি, নিয়ে যায় ইচ্ছামত আপন সদনে।

কত না সে শক্তিধর, বুঝি বা সে সর্বশক্তিমান্ ;
ধরিত্রীর প্রাণীকুল সদা ভীত ত্রস্ত তার নামে।
আতঙ্কে কাটায় দিন ; না-জানি কখন কার কাছে
এসে সে দাঁড়াবে আর বলবে, 'চল, হয়েছে সময়।'

তবু তার সব শক্তি ব্যর্থ এই মানুষের কাছে ;
আধিপত্য তার শুধু দেহ'পরে, কীর্তি মৃত্যুজয়ী ;
দেহ যায়, কীর্তি তার থেকে যায় চিরন্তন হয়ে ;
অম্লান সে যুগে যুগে, মানেনাক' মৃত্যুর বিধান।

কীর্তিমান এ-মানুষ : দেশে দেশে কালে কালে তার
গতি চির অব্যাহত ; নাই তার কোনও বন্ধন।
শাশ্বত কীর্তির দ্যুতি অনির্বাণ দীপশিখা হ'য়ে
জলে আর আলো দেয় ; পৃথিবী সে-আলোকে ভাস্বর।

মৃত্যু শক্তিমান বটে, সর্বশক্তিমান তবু নয়,
মৃত্যুঞ্জয় এ-মানুষ আপনার ঐশ্বর্য-গৌরবে।
সৃষ্টি তার অবিনাশী, কালজয়ী, যুগ হতে যুগে
মৃত্যুর সমস্ত শক্তি ব্যর্থ করে উন্নত ললাট।

সকালের রোদে স্নান করে ট্রেনটা স্টেশনে এসে পৌঁছুল।

ছোট্ট স্টেশন। এ্যাসবেস্টসের সংক্ষিপ্ত ছাউনির তলায় একদিকে টিকিটঘর; গৌরবে যাকে স্টেশন মাস্টারের কম্পার্টমেণ্টও বলা যেতে পারে। মান খুইয়ে রাত্তির বেলা সেটাই আবার একমেব পোর্টার ধনীরামের শোবার ঘর। আরেক দিকে একটি দীন চেহারার চায়ের স্টলকে ঘিরে ইতস্তত খানকয়েক বেঞ্চি ছড়ানো। সামনের দিকে প্ল্যাটফর্ম। প্ল্যাটফর্ম আর কি! এক ফালি লম্বা উঁচু জমির ওপর সামান্য কিছু সুরকি বিছানো; যার মাথার ওপর আচ্ছাদন বলতে সাঁওতাল-পরগণার আকাশ ছাড়া আর কিছু নেই।

মোট কথা কুলে-শীলে এবং বংশ-পরিচয়ে স্টেশনটা কুলীন নয়; নিতান্ত হরিজনদের দলেই সে ভিড় বাড়িয়েছে।

যাই হোক, ট্রেন থেকে নেমে স্টেশনের গেটে টিকিট জমা দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। সঙ্গে সঙ্গে চোখদুটি যেন মুগ্ধ হয়ে গেল।

সামনের দিকে যতদূর তাকানো যায়, সাঁওতাল পরগণার অপূর্ব বনশ্রী। বেশির ভাগই এখানে শালের গাছ। মাঝে মাঝে ইতস্তত দু-চারটে খেজুর, তাল আর সিসু।

টিলায় টিলায় পৃথিবী এখানে তরঙ্গিত। চড়াইর পেছনে এখানে উতরাই; উতরাইএর পিছু পিছু আবার চড়াই।

যতদূর দৃষ্টি যায়, একেবারে সেই দিগন্ত পর্যন্ত, মাটির রং হলুদ। মনে হয়, এক গৌরাঙ্গী আদিবাসিনী এই সাঁওতাল ডিহিতে অলস শিথিল দেহ এলিয়ে রয়েছে।

বেশিক্ষণ প্রকৃতির মধ্যে মগ্ন হয়ে থাকা গেল না। এখনও মাইল চারেক রাস্তা আমাকে যেতে হবে। তবেই সেই ছোট্ট শহরটায় পৌঁছুনো যাবে।

কলকাতা থেকে আসার সময় বন্ধু দেবেশ বলে দিয়েছিল, স্টেশন থেকেই টাঙ্গা পাওয়া যাবে। টাঙ্গা-ওলাদের বললেই তারা শহরে পৌঁছে দেবে।

লক্ষ্য করলাম স্টেশনের ডান পাশ ঘেঁষে তিন চারখানা ঘোড়ায়-টানা টাঙ্গা দাঁড়িয়ে আছে। একটা টাঙ্গা ঠিক করে মালপত্র চাপিয়ে নিজে উঠে বসলাম। মালপত্র আর কি! ফাইবারের মাঝারি একটা স্যুটকেশ আর একটা হোল্ড্অল।

ওঠা মাত্রই গাড়িটা চলতে শুরু করল।

এ সময় কেউ সাঁওতাল পরগণায় আসে না। টুরিস্ট আসার এটা মরসুম নয়! এ সময় অর্থাৎ বর্ষায়। টুরিস্ট আসবে সেই আশ্বিনে। আশ্বিন থেকে ফাল্গুন পর্যন্ত তাদের যাওয়া-আসা চলবে। আজকের দিনটা অবশ্য ব্যতিক্রম। সোনার টোপর মাথায় দিয়ে আজ রোদ উঠেছে। আকাশ জুড়ে মেঘেদেরও আনাগোনা নেই। তবে আমি জানি আজকের এত রোদ, এত আলোর উৎসব কাল আর থাকবে না। ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি নেমে যাবে।

এই বর্ষায় যখন কেউ আসে না তখন আমিই বা সাঁওতাল পরগণায় পাড়ি জমিয়েছি কেন? এ ব্যাপারে জবাবদিহি করতে গেলে বলতে হয়, আমি মানুষটা কিছু সৃষ্টিছাড়া। আমার রক্তের ভেতর বোধহয় একটা যাযাবরের আস্তানা আছে। দুটো দিনও সে আমাকে স্থির থাকতে দেয় না। কড়া পাওনাদারের মত অবিরত তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়।

আত্মীয়-স্বজন, ইয়ার-বক্সী—আমার ওপর যাঁদের দিলের আশনাই কিঞ্চিৎ বেশী, অনুগ্রহ করে আমার নামের আদিতে কিছু কিছু অলঙ্কার জুড়ে দিয়েছেন। কেউ বলেন, ছন্নছাড়া অমুকটা। কেউ বলেন, বাউণ্ডুলে অমুকটা। এতে আমার নামের মানহানি ঘটেছে বলে মনে হয় না। বরং বিনা ক্লেশে বিনা ব্যয়ে উৎকৃষ্ট ক'টি বিশেষণ লাভ করে চিত্ত পুলকিত হয়েছে।

দু-চারদিন খাচ্ছি-দাচ্ছি আর জীবন-ধারণ নামে ব্যাধটার তাড়া খেয়ে টাকার পেছনে ঘুরে মরছি। তার্-পরেই হয় কি, পায়ের তলা চুলবুলিয়ে ওঠে। রক্তের মধ্যেকার সেই বেদেটা ঘাড় ধাক্কা দিতে দিতে একেবারে বাঙলাদেশের দেউড়ি পার করে দেয়। আর আমিও কাঁধে একটা গাঁটরিয়া ফেলে পুরোপুরি মুসাফির বনে কখনও পাড়ি জমাই শিবালিকে, কখনও কাঞ্চীতে, কখনও উজ্জয়িনী আবার কখনও বা অমরকণ্টকে।

সেই বেদেটার দিনক্ষণ নেই; তার পাঁজিপুথিতে অশ্লেষা-মঘা-ত্র্যহস্পর্শের দেখা মেলে না। অযাত্রাতেই তার বোধহয় জয়যাত্রা। তার তাড়া খেয়ে এই বর্ষায় আমি এসেছি সাঁওতাল পরগণায়। বে-মরসুম জেনেও না এসে পারিনি!

যাই হোক আসার সময় টাঙ্গার খবরটাই শুধু দায় নি দেবেশ; চার মাইল দূরে সাঁওতাল ডিহির কোন্ ঠিকানায় উঠলে আমার সব চাইতে স্বাচ্ছন্দ্য বেশি হবে তারও সন্ধান দিয়েছে।

দেবেশ জানিয়েছিল, শহরের দক্ষিণ প্রান্তে ছোট্ট একটি বাড়ি আছে। অবশ্য হোটেল তাকে ঠিক বলা যায় না। এক বাঙালী ভদ্রমহিলা এবং তাঁর মেয়ে ঐ বাড়ির মালিক। টুরিস্ট আসার মরসুমে কিছু কিছু বোর্ডার তাঁরা রাখেন। রান্নাবান্না থেকে পরিবেশন, নিজেরাই সব কিছু করে থাকেন। অতিথিদের কিসে আরাম, কিসে সুবিধে—সব দিকে তাঁদের সতর্ক দৃষ্টি। এখানে এসে নিজের বাড়িতে থাকার স্বাচ্ছন্দ্যই পাওয়া যাবে।

দেবেশ বলেছিল, 'তা ছাড়া—'

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কী?'

'ভদ্রমহিলার মেয়েটি সুবেশা, সুকেশা, সুনয়না। মোট কথা চোখের সে আনন্দ।' বলে ঠোঁটের কোণে বিচিত্র হেসেছিল দেবেশ।

আমি জানতাম, বছর তিন চারেক আগে সাঁওতাল পরগণার এই শহরে এসেছিল দেবেশ। সম্ভবত ঐ ভদ্র-মহিলাদের বাড়িতেই ছিল। যাই হোক বাড়িওলীর সুবেশা সুকেশা মেয়ের কথায় আমিও হেসেছিলাম।

দেবেশ আবার বলেছিল, 'তার ওপর মেয়েটা আবার—'

'কী?' আমি উদ্গ্রীব হয়েছিলাম।

'ভারি রঙ্গিলা।'

'তাই নাকি!'

'হুঁ। নামটিও চমৎকার।'

'কি রকম?'

নাৰ আনন্দ। গেলেই বুঝতে পারবি সে সমর্পিতা হয়ে আছে।' বলে ঠোঁটের কোণে আবার হেসে উঠেছিল দেবেশ।

কৌতুকটা উপভোগ্যই। অতএব আমিও হেসেছিলাম।

দেবেশ আবার বলেছিল, 'যাচ্ছিস ভাল সময়েই। এখন অফ সীজন। ওখানে একটা বোর্ডারও থাকবে না। একেবারে নিরিবিলিতে 'দুজনে মুখোমুখি, গভীর সুখে সুখী, বাহিরে জল ঝরে অনিবার। জগতে কেহ যেন নাহি আর।' ব্যাপারটা খুব খারাপ হবে না।' বলেই ঠোঁটের প্রান্তের সেই নিঃশব্দ হাসিটাকে সশব্দ বিস্ফোরণের মধ্যে মুক্তি দিয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের কবিতটাকে কিঞ্চিৎ ওলট-পালট করে দিয়েছিল দেবেশ। গভীর সুখে সুখী নয়, রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'গভীর দুখে দুখি'। একবার ভেবেছিলাম, ভুলটা সংশোধন করে দিই। পরক্ষণেই খেয়াল হয়েছিল, ইচ্ছা করেই ভুলটুকু করেছে দেবেশ। উদ্দেশ্য সাধু। আমার পেছনে লাগা। যাই হোক কিছু না বলে আমি হেসেই যাচ্ছিলাম।

দেবেশ আবার বলেছিল, 'ওখান থেকে ফিরে এসে বলবি, দিনগুলো কেমন কাটল।' বলে চোখের কোণ দিয়ে একটা ইঙ্গিত দিয়েছিল।

ইঙ্গিতটা দুর্বোধ্য নয়। নিতান্তই সহজ এবং সরল। হেসে বলেছিলাম, 'নিশ্চয়ই বলব।'

চার মাইল চড়াই-উতরাই ভেঙে একসময় টাঙ্গাটা শহরে পৌঁছুল।

জায়গাটাকে বোধহয় শহর বলা উচিত নয়। বললে অনেক বেশি মর্যাদা দেওয়া হয়। আসলে অতখানি গৌরব তার প্রাপ্য না।

ইলেট্রিসিটির দাক্ষিণ্য অবশ্য আছে। তবে রাস্তাগুলো এখনও কাঁচা। পথে কদাচিৎ একআধটা মানুষ চোখে পড়ে। মানুষের তুলনায় নির্জনতা এখানে বড় বেশী। বাড়িঘর যে খুব একটা আছে, তা-ও নয়। অনেকখানি ফাঁকা জায়গার পর তবে একটা করে বাড়ি। মনে হল, জীবন-স্রোত-হীন এক নিস্তব্ধ নিস্পন্দ জনপদে এসে পড়েছি।

যাই হোক, দেবেশ যে ঠিকানা দিয়েছিল সেটা খুঁজে বার করতে খুব সময় লাগল না।

সাঁওতালপরগণার এই নগণ্য শহরে, ছবির মত দোতালা বাড়িটা সত্যিই বিস্ময়। বাড়িটা যেখানে সেটাই শহরের দক্ষিণ সীমান্ত। তারপর আর মানুষের বসতি নেই। চড়াই-উতরাইতে দোল খেয়ে শালের বন দূর দিগন্তের দিকে ছুটে গেছে।

টাঙ্গা থেকে নেমে একটুক্ষণ ইতস্তত করলাম। তারপর ভাড়া মিটিয়ে হোল্ড অল আর সুটকেশ নিয়ে পায়ে পায়ে বাড়ীটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

ডাকতে যাব, ঠিক সেই মুহূর্তে দোতলার বারান্দায় একটি বর্ষীয়সীকে দেখতে পেলাম। মহিলা বিধবা। পরণে ধবধবে থান এবং সাদা ব্লাউজ।

মহিলা যে একদা বেশ সুরূপা ছিলেন তার কিছু স্মৃতি শরীরময় এখনও ছড়িয়ে রয়েছে। তিনি শ্যামাঙ্গী। চোখ দুটি আয়ত। চিবুকের খাঁজ মনোরম; পানপাতার মত মুখের গড়ন। সব চাইতে বড় কথা, তাঁর সমস্ত দেহের ওপর বিচিত্র এক আভিজাত্য জড়ানো। সেটা ছোঁয়া বা দেখা যায় না; নিতান্তই সেটা অনুভবের ব্যাপার।

ইনিই যে দেবেশ-বর্ণিত বর্ষীয়সী তথা এ বাড়ির স্বত্বাধিকারিণী, দেখামাত্রই বুঝতে পারলাম। যাই হোক দোতলার বারান্দা থেকে তিনি বললেন, 'কাকে খুঁজছেন?'

তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'এটাই কি সুনন্দা লজ্?'

'হ্যাঁ।'

'দেখুন আমি কলকাতা থেকে আসছি। এখানে—'

আমার কথা শেষ হবার আগেই মহিলা বললেন, 'আপনি একটু দাঁড়ান। আমি আসছি।'

আমি প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই ভদ্রমহিলা নীচে নেমে আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'কী ব্যাপার বলুন তো?'

একটু আগে যে কথা বলা হয় নি, এবার তা-ই বললাম। ভদ্রমহিলাকে জানালাম, কলকাতা থেকে এই সাঁওতাল পরগণায় বেড়াতে এসেছি। দিন পনের কুড়ি থাকব। এই ক'টা দিন তাঁর বাড়িতেই আমার থাকার ইচ্ছা।

তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী চোখে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে

রইলেন মহিলা। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'আপনি আমাদের বাড়ির খোঁজ পেলেন কার কাছে?'

'যারা এখানে এসে আপনাদের বাড়িতে থেকে গেছে, তাদের কাছেই পেয়েছি।'

এ সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন না করে মহিলা বললেন, 'কিন্তু—'

'কী?' জিজ্ঞাসু চোখে আমি তাকালাম।

'এ সময় মানে এই বর্ষাকালে কেউ তো এখানে আসে না। তা আপনি হঠাৎ—' বলতে বলতে মহিলা থেমে গেলেন।

তাঁর না-বলা কথার মধ্যে একটা প্রশ্ন ছিল। সেটুকু বুঝতে অসুবিধে হল না। বর্ষায় সাঁওতালপরগণায় হানা দেবার কৈফিয়ৎ হিসেবে নিজের যাযাবরবৃত্তির কথা বলতে যাচ্ছিলাম। সেটা নিতান্ত কৌতুকের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে, ভাবতেই জবাবদিহিটাকে অন্য পথে ঘুরিয়ে দিলাম। বললাম, 'এই বর্ষাকালটা ছাড়া অফিস থেকে আমার ছুটি পাবার অসুবিধে। তাই—'

আর কোন প্রশ্ন করলেন না মহিলা। সম্ভবত আমার জবাবদিহি তাঁর সন্তোষজনকই মনে হয়েছে। ঘুরে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে তিনি ডাকতে লাগলেন, অর্পি—অর্পি, খোকনাকে নিয়ে একবার আয় তো।'

অর্পি! শব্দটা 'অর্পিতা'রই সংক্ষিপ্ত রূপ বোধ হয়। যাই হোক, অর্পিতার জন্য আমি উন্মুখ হয়ে রইলাম।

বেশিক্ষণ প্রতীক্ষা করতে হল না। একটুক্ষণ পরেই বাড়িটার ভেতর থেকে একটি তরুণী মধ্যবয়সী একজন সাঁওতালকে নিয়ে বেরিয়ে এল!

দেবেশ যে বর্ণনা দিয়েছিল, সেটা মিথ্যে নয়। তার মধ্যে বাড়াবাড়ি ছিল না। মেয়েটি অর্থাৎ অর্পিতা সত্যিই সুবেশা, সুকেশা এবং সুনয়না! দীপ্তবর্ণাও সে। এদিক থেকে শ্যামাঙ্গীমায়ের সে বিপরীত। তার সঙ্গে যে প্রৌঢ় সাঁওতালটি এসেছে সে যে ও বাড়ির চাকর শ্রেণীর মানুষ, দেখামাত্রই বোঝা গেল।

সাঁওতালটির দিকে তাকিয়ে বর্ষীয়সী মহিলা বললেন, 'বাবুর মালপত্র দোতালার তিন নম্বর ঘরে নিয়ে যা।'

সাঁওতালটি অর্থাৎ খোকনা প্রায় ছোঁ মেরে আমার হাত থেকে ফাইবারের স্যুটকেশ আর হোল্ডঅলটা নিয়ে চলে গেল। বাড়ির ভেতর সে অদৃশ্য হলে মহিলা এবার তরুণীটির সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেন, 'এ আমার মেয়ে অর্পিতা।' অর্পিতার দিকে ফিরে বললেন, 'আর ইনি কলকাতা থেকে আসছেন। দিন পনের কুড়ি আমাদের বাড়ি থাকবেন।'

অর্পিতা দুহাত তুলে ছোট্ট একটা নমস্কার করল। প্রতি-নমস্কারের জন্য আমিও হাত তুললাম।

নমস্কার পর্বের পরই প্রগলভ হয়ে উঠল অর্পিতা। বলল, 'আপনি কলকাতা থেকে আসছেন!' তার দু চোখে আলো নেচে উঠল যেন।

'হ্যাঁ।' আমি মাথা নাড়লাম।

অর্পিতা বলতে লাগল, 'কলকাতার লোক এলে আমার কি ভাল যে লাগে! মনে হয়—'

সবটা আর বলা হল না অর্পিতার। তার আগেই পাশ থেকে বর্ষীয়সী বলে উঠলেন, 'এখন বকবক না করে ভদ্রলোককে বাড়ি নিয়ে যা। সারা রাত হয়তো জেগে এসেছেন। স্নান সেরে খেয়েদেয়ে একটু বিশ্রাম করুন। তারপর যত ইচ্ছা কথা বলিস!'

অর্পিতা ঈষৎ লজ্জা পেল বোধহয়। ব্যস্তভাবে বলে উঠল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, চলুন—'

যেতে যেতে লজ্জার কথাটা কিন্তু একেবারেই ভুলে গেল সে। বলল, 'জানেন, এই বর্ষাকালটা আমার ভারি খারাপ লাগে।'

'কেন?' পাশাপাশি চলতে চলতে অর্পিতার দিকে তাকালাম।

অর্পিতা বলল, 'এ সময় আমাদের এখানে কোন বোর্ডার থাকে না। এতবড় বাড়ীতে শুধু মা, খোকনা আর আমি পড়ে থাকি। সকাল-বিকেল-রাত্রি-সন্ধ্যে, তিনজনে তিনজনের মুখ দেখি শুধু। অবশ্য—'

'কী?'

'সারা সহরটাই এ সময় নিঝুম হয়ে যায়। পথে বেরুলে কচিৎ এক আধটা লোক চোখে পড়ে। তবে—'

'কী?'

'কোনরকমে বর্ষাকালটা একবার পার করতে পারলেই সেই ফাল্গুন পর্যন্ত আমাদের এই সহরটা একেবারে সর-গরম। এই সময়টা ইণ্ডিয়ার নানা জায়গা থেকে টুরিষ্ট

আসে। বেশির ভাগ অবশ্য আসে কলকাতা থেকে। লোকজন, চিৎকার, চেঁচামেচি—টুরিস্ট আসার মরসুমটা আমার কি ভাল যে লাগে।'

আমি এবার আর কিছু বললাম না। দেবেশ যে বলেছিল, মেয়েটি রঙ্গিলা ধরণের—সেটা খুব সম্ভব পুরোপুরি সত্যি নয়। অর্পিতার প্রগল্‌ভতা হয়তো তার স্বভাবেরই খেলা।

যাই হোক অর্পিতা আবার বলে উঠল, 'এই বর্ষায় আপনি এসেছেন। তবু একটা নতুন মুখ দেখা গেল। যে ক'টা দিন থাকবেন, কথা বলে বাঁচব।'

কথায় কথায় আমরা দোতলার তিন নম্বর ঘরে এসে পড়লাম। ঘরখানি খুব বড় নয়। মাঝারি মাপের। সেই তুলনায় জানালাগুলি প্রকাণ্ড। এখান থেকে দক্ষিণ আর পুবের সীমাহীন প্রান্তর চোখে পড়ে। দৃষ্টিকে সুদূর দিগন্ত পর্যন্ত অবাধে মুক্তি দেওয়া যায়।

লক্ষ্য করলাম ঘরখানিতে আসবাবের বাহুল্য নেই। একটি সিঙ্গল-বেড খাট, একটি টী-পয় টেবিল, সুদৃশ্য একটি ড্রেসিং টেবিল আর একখানা ইজি চেয়ার—যা যা আছে সবই সুরুচিতে শোভন এবং চমৎকার ভাবে সাজানো।

আরো একটা ব্যাপার চোখে পড়ল। ইতিমধ্যেই ধোকনা আমার হোল্ড-অল খুলে খাটের উপর বিছানা পেতে ফেলেছে। অবশ্য এই মুহূর্তে ধোকনাকে কোথাও খুঁজে পেলাম না। আমরা আসার আগেই আমার স্যুটকেশ এ ঘরে রেখে এবং বিছানা পেতে দিয়ে সে চলে গেছে।

যাই হোক অর্পিতা আবার বলল, 'এখন আপনার সঙ্গে আর গল্প করব না। গল্প করছি দেখলে মা আমায় মেরে ফেলবে। আপনি স্নান করবেন তো?'

'হ্যাঁ।' আমি মাথা নাড়লাম।

'গরম জল লাগবে?'

'না।'

'তা হলে একটু বিশ্রাম করুন। আমি আপনার স্নানের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।' বলে আর অপেক্ষা করল না অর্পিতা, দ্রুত পা ফেলে চলে গেল।

স্নান সারতে না সারতেই ধোকনা এসে হাজির। লোকটা পরিষ্কার বাঙলা বলে। বলল, 'আসন পাতা হয়ে গেছে। মা আপনাকে খেতে ডাকছে।'

'চল!' আমি উঠে পড়লাম।

রান্নাঘর এবং খাবার জায়গা নীচের তলায়। রান্নাঘরের লাগোয়া বিস্তৃত বারান্দা সেখানে টেবিল চেয়ার পেতে বিলিতি দস্তুর অনুযায়ী খাবার ব্যবস্থা। অবশ্য মেঝেতে আসন পেতে দিশি প্রথায় আমাকে খেতে দেওয়া হয়েছে।

খেতে বসে লক্ষ্য করলাম সেই বর্ষীয়সী মহিলা অর্থাৎ অর্পিতার মা আমাকে পরিবেশন করছেন। আশে পাশে অর্পিতাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না।

প্রথম পরিচয়েই স্বভাবোচ্ছলা প্রগলভা মেয়েটা আমার প্রাণে কিছু দোলা দিয়েছিল। এই মুহূর্তে খেতে বসে তাকে কাছে পেলে খুশীই হতাম।

যাই হোক নিঃশব্দে মাথা নীচু করে খেয়ে যেতে লাগলাম। কিন্তু কতক্ষণই বা চুপচাপ থাকা যায়। মহিলা এক সময় প্রশ্ন করলেন, 'কলকাতায় আপনি কোথায় থাকেন?'

বললাম, 'ভবানীপুরে।'

এরপর স্ত্রীলোকসুলভ কৌতূহলে আমি কোথায় চাকরি করি, বিয়ে করেছি কি-না, বাবা-মা আছেন, না নাই, আমরা ক'জন ভাই-বোন—ইত্যাদি ইত্যাদি খুঁটিয়ে জেনে নিলেন।

দূরমনস্কের মত ভদ্রমহিলার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমার সমস্ত চেতনা নিজের অজ্ঞাতসারে সেই মেয়েটিকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল যেন। সেই মেয়েটি—অর্পিতা।

প্রশ্নোত্তরের ফাঁকে ফস্ করে এক সময় বলে বসলাম, 'আচ্ছা, অর্পিতা দেবীকে দেখছি না তো?'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'আর বোলো না বাবা—এই পর্যন্ত এসে হঠাৎ জিভ কেটে বললেন, ঐ দেখুন, আপনাকে 'তুমি' বলে ফেললাম। কিছু মনে করবেন না যেন।'

বিব্রত মুখে বললাম, 'একবার 'তুমি' বলে আবার যদি 'আপনি' 'আজ্ঞে' শুরু করেন তা হলে কিন্তু আমার খুব খারাপ লাগবে। আমি আপনার ছেলের বয়েসী। 'তুমি'ই বলবেন আমাকে।'

কুণ্ঠিত স্বরে ভদ্রমহিলা বললেন, 'কিন্তু—'

'না—কোন কিন্তু নয়।' জোরে জোরে আদুরে জেদী ছেলের মত আমি মাথা নাড়তে লাগলাম।

সঙ্গে সঙ্গে কোন উত্তর দিলেন না মহিলা। অনেকক্ষণ পর দ্বিধান্বিত স্বরে বললেন, 'বেশ, 'তুমি'ই বলব।' বলে একটু চুপ করে থেকে আবার শুরু করলেন, 'হঁ্যা, কি যেন বলছিলেম! অর্পির কথা জিজ্ঞেস করছিলে তো?'

'আজ্ঞে হঁ্যা।'

'ঐ দেখ—'বলে আঙুল বাড়িয়ে দোতলা আর এক তলার মাঝামাঝি সিঁড়ির বাঁকের কাছে সংক্ষিপ্ত যে করিডর আছে—সেদিকটা দেখিয়ে দিলেন মহিলা।

সবিস্ময়ে দেখলাম, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে অর্পিতা। করিডরটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে একটা জানালা। তার বাইরে সাঁওতাল পরগণার সীমাহীন উন্মুক্ত আকাশ। শুধু দাঁড়িয়েই নেই অর্পিতা, বাইরের আকাশে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ।

আশ্চর্য, আমি যখন দোতলা থেকে খোকনার সঙ্গে নীচে খেতে নামি তখন অর্পিতাকে লক্ষ্য করিনি।

মহিলা আবার বলে উঠলেন, 'মাঝে মাঝে কি যে হয় মেয়েটার! এই হয়তো ঘুরছে, ফিরছে, হাসছে, ছুটছে। তারপরেই হঠাৎ সব কিছু থামিয়ে মুখ কালো করে কোন একদিকে তাকিয়ে উদাসিনী হয়ে বসে রইল। তুমি যখন এলে অর্পি কেমন হাসি-খুশী। এখন ওর দিকে তাকালে সে কথা মনে হবে? ওকে নিয়ে কি যে করি!'

ভদ্রমহিলার ওপর বোধ হয় আত্মবিস্মৃতির ঘোর ভর করে বসেছে। আমার সঙ্গে তাঁর আজকেই যে প্রথম পরিচয় হয়েছে, সে কথা সম্ভবত তাঁর খেয়াল নেই। থাকলে অন্তত মেয়ের সম্বন্ধে নিজের দুশ্চিন্তাকে এমনভাবে উন্মুক্ত করে দিতেন না।

ভদ্রমহিলার কথায় আমার খুব যে একটা মনোযোগ ছিল, তা নয়। খাওয়া এবং তাঁর কথার ফাঁকে ফাঁকে আমার চোখদুটি বারেবারেই অর্পিতার দিকে, ফিরে যাচ্ছিল।

যাই হোক খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে দোতলায় নিজের ঘরখানিতে যাবার সময় একবার অর্পিতার পেছনে এসে দাঁড়ালাম। এত কাছাকাছি আমি দাঁড়িয়ে আছি তা যেন অনুভবই করতে পারছে না অর্পিতা। আমার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকালোও না সে। উঁকি দিয়ে তার মুখটা দেখতে চেষ্টা করলাম। সে মুখ গাঢ় এবং নিবিড় বিষাদে আচ্ছন্ন। একটু আগে যে প্রগলভা উচ্ছ্বাসময়ী মেয়েটিকে আমি দেখেছিলাম, এ যেন সে নয়।

বিষাদ আর উচ্ছ্বাস—এই দ্বৈতরূপের খেলা অর্পিতার মধ্যে কোথায় যে লুকিয়ে ছিল প্রথম দেখার মুহূর্তে বুঝতে পারিনি।

একবার ইচ্ছা হল অর্পিতাকে ডাকি। পরক্ষণেই নিজের অস্তিত্বের গহনে কার যেন ধমক খেলাম। এক-দিনের আলাপে এভাবে ডাকা সমীচীন নয়।

যাই হোক বিকেলবেলা আমাকে আবার অবাক করে দিল অর্পিতা। চারদিকে যেন ঢেউ তুলেই সে আমার ঘরে হাজির হল। প্রগলভ স্বরে বলল, 'যাক, ঘুম তা হলে ভেঙেছে!'

আমি কিছু বললাম না। স্থির নিবদ্ধ দৃষ্টিতে শুধু তাকিয়ে রইলাম।

আমার খাটের দূর প্রান্তে বসতে বসতে অর্পিতা আবার বলল, 'বাবা রে, বাবা। কি ঘুমটাই না ঘুমুতে পারেন। এর আগে আরো তিনবার উঁকি দিয়ে গেছি। যতবার এসেছি ততবারই দেখেছি আপনার নাক ডাকছে।'

কথাটা মিথ্যে নয়। কাল রাত্রে ট্রেনে এত ভিড় ছিল যাতে দু-চোখ মুহূর্তের জন্য বুঁজতে পারি নি। আজ দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর সেই জেগে থাকাটা সুদে আসলে পুষিয়ে নিয়েছি। ঘণ্টা চারেক প্রায় বেহুঁসের মত ঘুমিয়েছি।

ঘুমের জন্য কোনরকম কৈফিয়ৎ যে দেব, তা যেন আমার খেয়াল রইল না। সবিস্ময়ে তাকিয়েই আছি। খেয়ে দোতলায় আসার সময় অর্পিতার মুখে যে বিচিত্র বিষাদ লক্ষ্য করেছিলাম, এখন তার চিহ্নমাত্র নেই। উচ্ছ্বাসের স্রোতে তার চোখমুখ এখন ভাসো ভাসো।

অর্পিতা বলতে লাগল, 'কি, এখনও ঘুমের খোয়ারি কাটে নি! আরেক দফা ঘুমোবার মতলব নাকি?'

অন্যমনস্কের মত এবার উত্তর দিলাম, 'না, আর ঘুমুব না।'

মুখোমুখি

ফটো : রামকিঙ্কর ি

দৃশ্যপট

ফটো রথীন চক্রবর্তী

'তা হলে এক কাজ করুন।'

'কী ?'

'চটপট জামাকাপড় বদলে ফেলুন। আমিও শাড়িটা পাল্টে আসি।'

'কেন ?'

'কেন আবার, বেড়াতে যাব।' অর্পিতা বলতে লাগল, 'এই বর্ষাকালে আজকের মত রোদ এখানে কোনদিন থাকে না। এমন চমৎকার বিকেলটা ঘরে বসে মাটি করার কোন মানে হয় না। নিন, তাড়াতাড়ি যা বললাম, করে ফেলুন।' বলতে বলতে বেরিয়ে গেল সে।

আর আমার বিস্ময়টা প্রায় শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছুল। প্রথমদিনের আলাপেই যে তরুণী অসঙ্কোচে তার বেড়াবার সঙ্গী হতে ডাক দেয় তার সম্বন্ধে কিছু সংশয়ান্বিত হতে হয় বৈকি! দেবেশ বলেছিল, মেয়েটা রঙ্গিলা ধরণের। রঙ্গিলাই কী ? তার চরিত্রের দুর্জ্ঞেয় অংশে সন্দেহজনক কিছু নেই তো ?

সাঁওতাল পরগণার এই বাড়িটিতে আসার পর থেকে অর্পিতা যত কথা বলেছে, যেভাবে তাকিয়েছে, যেভাবে হেসেছে—তার সব, সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করলাম। একবার মনে হল, মেয়েটা আশ্চর্য সাবলীলা। পর মুহূর্তে মনে হল, তা নয়। তার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধেই কিছুটা যেন সন্দিহান হয়ে পড়লাম। দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটাও বাতিল করে দিতে হল। আমার চেতনার অতল থেকে কে যেন ফিসফিসিয়ে বলল, মেয়েটা ভাল না, ভাল না।

অর্পিতার ভাবনায় নিজেকে বেশিক্ষণ মগ্ন রাখতে পারলাম না। একটু পরেই সুবেশা হয়ে ঘরে এসে ঢুকল সে। কণ্ঠস্বরে বিস্ময়ের সঙ্গে কিছুটা বিরক্তি মিশিয়ে বলল, 'এখনও চুপ করে বসে আছেন! উঠুন—শিগ্‌গির উঠে পড়ুন।'

এক রকম জোর করেই সে আমাকে বিছানা থেকে তুলে ফেলল। অগত্যা জামাকাপড় বদলে অর্পিতার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম!

বর্ষার এই ক্ষান্তবর্ষণ দিনটিতে একটি সুদর্শনা তরুণীর সঙ্গে সাঁওতাল পরগণার চড়াই-উতড়াইতে হাঁটতে খুব খারাপ লাগার কথা নয়। আমার লাগছেও না।

সূর্যটা এখনও আকাশের পট থেকে অদৃশ্য হয়ে যায় নি। পশ্চিমদিকটা এখন লালে লাল। যে ভবঘুরে মেঘের টুকরোগুলো ইতস্ততঃ ভেসে বেড়াচ্ছে, এই মুহূর্তে সেগুলো রক্তাক্ত। মনে হয়, কোন তীরন্দাজ তাদের হৃদ্‌পিণ্ড শরবিদ্ধ করে রেখেছে।

হাঁটতে হাঁটতে সমানে কথা বলছে অর্পিতা। এই সহরে কোথায় কী দ্রষ্টব্য আছে তার বিস্তারিত বিবরণ দিচ্ছে। এখানে নাকি বহুকাল আগে আদিবাসীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে একবার বিদ্রোহ করেছিল। বিদ্রোহীদের একটা দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এই সহরের পশ্চিমে নাকি এখনও দেখতে পাওয়া যায়। অর্পিতা জানাল একদিন সেখানে আমাকে বেড়াতে নিয়ে যাবে সে।

মাইল সাতেক হাঁটতে পারলে এ শহরের দক্ষিণে একটা পাহাড়ী নদীর উৎসে নাকি পৌঁছুনো যায়। সেখানে হাজার হাজার হরিয়াল আর মুনিয়া পাখি দেখতে পাওয়া যাবে। তা ছাড়া আছে চিত্রাল আর রাশি রাশি বনমুরগী। অবশ্য মাঝে মাঝে দু-চারটে দাঁতাল শুয়োরও সেখানে হানা দেয়। সাহসে যদি কুলোয় জায়গাটা আমি গিয়ে দেখে আসতে পারি।

আরো একটা দর্শনীয় জায়গা হচ্ছে, এখানকার 'ইংরেজ কুঠি।' ইংরেজকুঠিটা একজন ইংরেজ বানিয়ে ছিলেন। তাঁর নেশা ছিল এ অঞ্চলের আদিবাসীদের অস্ত্রশস্ত্র, পোশাক, প্রাচীন পুঁথি, লোকসংগীত—ইত্যাদি ইত্যাদি সংগ্রহ করা। সমস্ত যোগাড় করে ছোটখাটো একখানা মিউজিয়াম তৈরি করে ফেলেছেন তিনি।

ইংরেজ ভদ্রলোক অনেক দিন হল, মারা গেছেন। জাতীয় সরকার তাঁর মিউজিয়ামটির দায়িত্ব নিয়ে জনসাধারণের জন্য তার দরজা খুলে দিয়েছেন।

অর্পিতা সমানে বলে যাচ্ছিল। মুখখানা তার উদ্ভাসিত, গলার স্বরে বিচিত্র দোলা। মনে হয় এই শহরের গৌরবে তারও একটা অংশ রয়েছে।

যাই হোক, আমি কিন্তু অর্পিতার সব কথা শুনতে পাচ্ছিলাম না। কিংবা পেলেও সেগুলো আমার চেতনায় রেখাপাত করতে পারছে না। ক্ষণে উচ্ছ্বসিতা, ক্ষণে বিষাদময়ী মেয়েটির কথা ভাবতে, ভাবতে আমি শুধু বিভ্রান্তই বোধ করছি।

আমার সৌভাগ্যই বলতে হবে। এবারের বর্ষায় রোদ মাথায় নিয়ে সাঁওতাল পরগণায় এসেছিলাম। দেখতে দেখতে তিনটে দিন কেটে গেল! আশ্চর্য্য, এখনও সেই রোদের আয়ু ফুরোয় নি। দিনগুলো শুকনো, ঝকঝকে, রমণীয়। অবিরাম বর্ষণে চারদিক যখন ভেসে যায় সেই সময় এই তিনটে দিন যেন তিনটি সোনার দ্বীপ।

এই তিন দিনে অর্পিতা আর অর্পিতার মাকে নিবিড়-ভাবে চিনবার সুযোগ পেয়েছি।

প্রথমে অর্পিতার মায়ের কথাই ধরা যাক। ভদ্রমহিলার স্বভাবের মধ্যে কোথাও কোন লুকোচুরি নেই। তাঁর সব দিকের সব দুয়ারই খোলা। সংসারের কাজকর্মের ফাঁকে একটু সময় পেলেই তিনি আমার কাছে এসে বসেছেন এবং নানারকম গল্প করেছেন।

তাঁর গল্পের অধিকাংশই নিজের জীবন-সম্পর্কিত। সংসারে অর্পিতা ছাড়া মহিলার আর কেউ নেই। বছর ছয়েক হল স্বামী মারা গেছেন।

স্বামী মানুষটা মার্চেন্ট অফিসে বিরাট চাকুরে ছিলেন। মাইনে পেতেন হাজার টাকার ওপর। কিন্তু খরচ করতেন তার চাইতে অনেক বেশি। কেউ তাঁর কাছে হাত পাতলে বিমুখ হত না। সুতরাং এই হাত-পাতার দল দিন দিন বেড়েই যাচ্ছিল।

ভদ্রলোক চিরদিন খরচই করে গেছেন। ফলে জমার ঘরটা শূন্যই থেকে গেছে।

ভদ্রলোক জগতের আর সবার কথাই ভেবেছেন। শুধু অর্পিতা আর অর্পিতার মা সম্বন্ধেই ছিলেন চূড়ান্ত উদাসীন। ফলে বছর ছয়েক আগে হঠাৎ তিনি যখন হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে চোখ বুজলেন তখন দেখা গেল নিজের স্ত্রী আর মেয়ের জন্য কোন ব্যবস্থাই করে যান নি। মেয়েকে নিয়ে সেদিন অর্পিতার মা বিশাল সমুদ্রে এসে পড়েছিলেন যেন।

যাই হোক, স্বামী ভদ্রলোকের প্রাণে কিছু সখের অবকাশ ছিল। সাঁওতাল পরগণার এই ছোট্ট নগণ্য শহরে এই বাড়িখানা তৈরি করিয়ে ছিলেন তিনি। মাঝে মাঝে ছুটি ছাটায় স্ত্রী আর মেয়েকে নিয়ে বেড়াতে আসতেন। সঞ্চয়ের মধ্যে এই বাড়িখানাই যা ছিল।

একদা যা ছিল নিতান্ত শখের, জীবন-ধারণের তাগিদে সেটাকেই অর্পিতার মা পেশার জিনিস করে তুলেছেন। না তুলে উপায়ই বা কি! সাঁওতাল পরগণার এই বাড়িটাকে মরসুমী টুরিষ্টদের জন্য তিনি হোটেল খুলেছেন।

আজকাল আর জীবন ধারণ সম্পর্কে কোন সমস্যা নেই। তবে অন্য দুশ্চিন্তা আছে অর্পিতার মায়ের। তাঁর দুর্ভাবনার কেন্দ্রে যে বসে আছে সে অর্পিতা।

মেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। তার বিয়ে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু সাঁওতাল পরগণার এই শহরে বসে কিভাবে যে পাত্রের সন্ধান করবেন তা-ই ভেবেই তিনি দিশেহারা। অবশ্য বাঙলা দেশে আত্মীয় স্বজনের কাছে ক্রমাগত চিঠি লিখে যাচ্ছে কিন্তু তারা খুব উৎসাহ দেখায় না। এখানে যে সব টুরিস্ট আসে মহিলা তাদেরও ধরেন। যে ক'দিন তারা এখানে থাকে মৌখিক খুবই সহানুভূতি দেখায়। এবং কলকাতায় ফিরেই রাজপুত্রের খোঁজ পাঠাবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু কলকাতায় পৌঁছেই সম্ভবত সাঁওতাল পরগণার প্রতিশ্রুতি তারা বেমালুম ভুলে যায়।

বিয়ের চিন্তাই শুধু নয়, মেয়েকে ঘিরে মহিলার দুশ্চিন্তা আরো একটি দিকে প্রবাহিত। তা এই রকম।

চিরদিনই অর্পিতা নাকি স্বতাবোচ্ছলা, উচ্ছ্বাসময়ী। জলের হাঁসের মত সংসারের কোন মালিন্যই তাকে স্পর্শ করতে পারে না। সবক্ষণই সে হাসছে, ছুটছে, নিতান্ত অকারণেই মেতে উঠছে।

কিন্তু বছর চারেক কি যে হয়েছে মেয়েটার! এই হয়তো সে উচ্ছ্বসিত, তার পরমুহূর্তেই বিষাদের গাঢ় যবনিকা তার ওপর নেমে আসে। নিতান্ত উদাসীনীর মত তখন চুপচাপ কোন একদিকে তাকিয়ে বসে থাকে সে। কেন যে মেয়ের এই রূপান্তর, কিছুতেই ভেবে পান না বলেই বিচিত্র আশঙ্কায় তাঁর বুক কাঁপতে থাকে।

যাই হোক এই তিনদিনে অর্পিতাকে কিন্তু একেবারেই বুঝতে পারি নি। শুধু মনে হয়েছে তার চারপাশে বিচিত্র সব যবনিকা আছে। সেই যবনিকাগুলির একটি তুলেও যে ভেতরে উঁকি দেব, সাধ্য কি।

প্রথমদিন অর্পিতাকে যে রূপে দেখেছি সেই একই রূপে বার বার সে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মুহূর্তে

উচ্ছ্বাসময়ী পরক্ষণেই বিষাদময়ী—এই দুই খেলার বাইরে আর কোনভাবেই সে আমার কাছে ধরা দেয় নি।

এই তিনদিনের প্রতিটি বিকেল অর্পিতা আমাকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে। একদিন সে আমাকে 'ইংরেজ কুঠি'র মিউজিয়ামে নিয়ে গিয়েছিল। আরেকদিন গিয়েছিল শহরের দক্ষিণে প্রান্তবাহিনী একটা নদীর দিকে।

লক্ষ্য করেছি দু-দিন আমাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে প্রগলভস্বরে কথা বলতে বলতে হঠাৎ চমকে দাঁড়িয়েছে অর্পিতা। তারপর পেছন ফিরে হনহনিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছে। তাকে অনুসরণ করে এসে দেখেছি, ছাদে অথবা সিঁড়িঘরে উদাসিনীর মত দাঁড়িয়ে থেকেছে সে।

আমার অনুমান, অর্পিতার জীবনে এমন একটা অনাবিষ্কৃত অন্ধকার অধ্যায় আছে যা তার সমস্ত প্রগলভতা এবং উচ্ছ্বাসের স্রোতকে মুহূর্তে স্তব্ধ করে দেয় এবং বিষাদের একটি আবরণ তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, এখানে যে ক'দিন আছি তার মধ্যে যদি সম্ভব হয় অর্পিতার জীবনের অজ্ঞাত দিকটাকে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করব।

অর্পিতার অজানা দিকটাকে জানার সুযোগ নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবেই আমার হাতে এসে গেল।

এখানে আসার পর প্রথম তিনটে দিন বেশ রোদ পেয়েছিলাম। তারপরেই বর্ষাকালটা তার আপন স্বভাবের মধ্যে ফিরে গেছে। এখন দিনরাতই বৃষ্টি পড়ছে। অতএব সাঁওতালপরগণার এই বাড়িটিতে আমরা ক'টি মানুষ সর্বক্ষণই নির্বাসিত হয়ে আছি।

অর্পিতার উচ্ছ্বাস আর বিষাদের খেলাটা যথারীতি চলছিলই। এতদিন আমি ছিলাম দর্শক। একটি আগন্তুকের পক্ষে দেখা ছাড়া আর কী-ই বা সম্ভব।

সেদিন নিজের সত্তার গভীরে কি বিপর্যয় ঘটে গেল, জানি না। সময়টা ছিল বিকেল আর সন্ধ্যের মাঝামাঝি একটা জায়গায় থমকানো। প্রকৃতির এই স্বদেশে অবিশ্রাম বৃষ্টি ঝরে যাচ্ছিল। বৃষ্টির চিকের ওপাশে বাইরের আকাশটা ছিল অস্পষ্ট, ঝাপসা।

আমার ঘরে নিজের খাটটিতে বসে ছিলাম। একটি চেয়ার টেনে আমার মুখোমুখি বসেছিল অর্পিতা। দুজনে গল্প করছিলাম।

অবশ্য গল্পের মধ্যে আমার অংশ খুবই সামান্য। অর্পিতাই সমানে কথা বলে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে দু-চারটে 'হুঁ' 'হাঁ' যুগিয়ে তার গল্পের উচ্ছ্বাসকে আমি অব্যাহত রাখছিলাম। মোটামুটি ভাবে বলা যায় সেদিন আমার ভূমিকা ছিল শ্রোতার।

প্রসঙ্গের কি অভাব ছিল অর্পিতার? সাঁওতাল পরগণার কথা, কতদিন কলকাতায় যাওয়া হয় নি তার কথা, সাঁওতাল পরগণার বৃষ্টির কথা—বিভিন্ন বিষয়ে অবিরাম বকে যাচ্ছিল সে।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ সেই অস্বাভাবিকতাটা ভর করেছিল অর্পিতার ওপর। চট করে উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল সে।

সেদিন আমার মধ্যে কী যে ঘটে গিয়েছিল, নিজের কাছেই তার স্পষ্ট কোন ব্যাখ্যা নেই। আমিও উঠে পড়েছিলাম। তারপর অর্পিতার পিছু পিছু হাঁটতে শুরু করেছিলাম।

দোতলা আর একতলার মাঝামাঝি সেই করিডরটার প্রান্তে চলে গিয়েছিল অর্পিতা। সেখানে জানালার গরাদ ধরে বাইরে উদাস দৃষ্টি মেলে দিয়েছিল সে। উচ্ছলা প্রগলভা মেয়েটা সেই মুহূর্তে আশ্চর্য বিষাদময়ী।

যাই হোক, পায়ে পায়ে তার পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। আর দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমার ওপর কি যেন একটা ভর করে বসেছিল। আত্মবিস্মৃত এক ঘোরের মধ্যে হাত বাড়িয়ে অর্পিতার একটা হাত নিজের মুঠির মধ্যে টেনে নিয়েছিলাম। আস্তে আস্তে অর্ধস্ফুট স্বরে ডেকেছিলাম, 'অর্পিতা—'

সঙ্গে সঙ্গে প্রায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত ঘুরে দাঁড়িয়েছিল অর্পিতা। তীক্ষ্ণ আর্ত একটা চিৎকার করে বলেছিল, 'না—না—না—' বলেই নিজের হাতটা আমার মুঠি থেকে মুক্ত করে নিয়েছিল।

আচ্ছন্নের মত বলেছিলাম, 'কী হল?'

অর্পিতা আবার চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'না—না—না—'

'কী না?'

আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আরেকবার চিৎকার করে উঠেছিল অর্পিতা। তারপর একরকম আমাকে ধাক্কা দিয়েই ছুটে একতলায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

আর বিভ্রান্তের মত আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। সেদিন আর অর্পিতাকে দেখতে পাই নি। দোতলা বাড়িটার কোথায় যে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিল, সে-ই জানে।

পরের দিন সকালে অর্পিতা যখন আবার আমার ঘরে এসেছিল তখন সে আশ্চর্য স্বাভাবিক। কিছুক্ষণ এলোমেলো কথার পর বলেছিল, 'আপনি আমার ওপর খুব রাগ করে রয়েছেন, তাই না ?'

বলেছিলাম, 'রাগ করব কেন ?'

'কালকের ব্যবহারের জন্যে।'

রাগ ঠিক করি নি। তবে বিস্মিত এবং বিভ্রান্ত বোধ করেছিলাম ঠিকই। যাই হোক এ প্রসঙ্গে আমি কিছু বলিনি।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অর্পিতা আবার বলেছিল, 'কেন কাল ও-রকম করেছিলাম জানেন ?'

আমি উদ্‌গ্রীব হয়েছিলাম, 'কেন ?'

'আপনি আমার হাত ধরে কী বলতেন, আমি জানতাম।'

'কী বলতাম ?'

আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে অর্পিতা বলেছিল, 'চার বছর আগে ঐ জানালাটার পাশে দাঁড়িয়ে আরেক জন আমার হাত ধরেছিল। সেদিন নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিতে পারি নি।'

রুদ্ধশ্বাসে বলেছিলাম, 'তারপর ?'

'তারপর আর কি, একদিন পূর্ণিমার রাত্রে আকাশের চাঁদকে সাক্ষী রেখে আমরা বিয়ে করেছিলাম।

অর্পিতা তা হলে বিবাহিতা! শুনতে শুনতে আমি শিউরে উঠেছিলাম। বলেছিলাম, 'ভদ্রলোকটি কে ?'

'আপনারই মত সাঁওতাল পরগণায় একজন টুরিস্ট।'

'কী নাম ?'

আমার কথাটা যেন শুনতে পায় নি, এমন ভঙ্গিতে অর্পিতা বলেছিল, 'আচ্ছা, আপনি তো কলকাতায় থাকেন ?'

'হ্যা।' আমি মাথা নেড়েছিলাম।

'কলকাতার কোথায় থাকেন ?'

'ভবানীপুরে।'

'ভবানীপুরে!' চোখদুটি যেন জ্বলে উঠেছিল অর্পিতার। বলেছিল, 'আপনাদের ঐ এরীয়ার একটা ঠিকানা দে[illegible] দয়া করে সেখানে একটি লোকের খোঁজ করবেন ?'

'নিশ্চয়ই করব। ঠিকানাটা দিন আর লোকটি[illegible] নাম বলুন—'

ঠিকানা আর নাম লিখে দিয়েছিল অর্পিতা।—[illegible] গঙ্গাপ্রসাদ মুখার্জি রোড। নাম, দেবেশ রায়। দে[illegible] চমকে উঠেছিলাম। ওটা আমার বন্ধু দেবেশের নাম এব[illegible] ঠিকানা। কাঁপা শিথিল স্বরে বলেছিলাম, 'দেবেশ রায়ে[illegible] সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক ?

'চার বছর আগে এই ভদ্রলোকই আপনার মত আমা[illegible] হাত ধরেছিল আর পূর্ণিমার চাঁদ সাক্ষী রেখে কাউকে না[illegible] জানিয়ে বিয়ে করেছিল।'

'এখানে বেড়াতে এসে আপনাদের বাড়িতে বুঝি উঠেছিল দেবেশ রায় ?'

'হ্যা। বিয়ের পর কলকাতায় যাবার সময় সে বলেছিল, দিনকয়েক পর এসে আমাকে নিয়ে যাবে। কিন্তু আর আসে নি। ঐ ঠিকানায় চিঠির পর চিঠি দিয়েছি। কোন উত্তর পাই নি।'

শুনতে শুনতে আমি শিউরে উঠছিলাম। একটা ঠাণ্ডা হিমাক্ত স্রোত মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে দুরন্ত দ্রুতবেগে ওঠা-নামা করতে শুরু করেছিল। সেটা অকারণে নয়। কেননা, দেবেশ আগে থেকেই বিবাহিত। তিনচারটি ছেলেমেয়েও আছে তার। সাঁওতালপরগণায় বেড়াতে এসে এ কি করে গেছে সে!

অর্পিতা আবার বলেছিল, 'যদি তার খোঁজ পান দয়া করে একবার পাঠিয়ে দেবেন। বলবেন আমি তার প্রতীক্ষায় আছি।'

আমি উত্তর দিই নি। কী উত্তরই না দিতে পারতাম!

অর্পিতা থামে নি। সমানে বলে যাচ্ছিল সে, 'জানেন, ছেলেবেলা থেকেই আমি খুব হাসি খুশী। আনন্দে মেতে থাকতে আমার খুব ভাল লাগে। কিন্তু যে মুহূর্তে তার কথা মনে পড়ে আমার নিঃশ্বাস যেন আটকে আসে।'

আমি নিশ্চুপ। ক্ষণে উচ্ছলা, ক্ষণে বিষাদময়ী মেয়েটার রহস্য সেদিন যেন কিছুটা বুঝতে পেরেছিলাম।

* * *

কলকাতায় ফিরে এসে দেবেশকে ধরলাম। বললাম,

'এ কি করেছিস হতভাগা! একটা মেয়ের অমন সর্বনাশ করলি কেন?'

প্রথমটা বুঝতে পারে নি দেবেশ। বলল, 'কিসের সর্বনাশ?'

সাঁওতালপরগণায় তার বিয়ের কথাটা স্মরণ করিয়ে দিতে হো হো করে উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে উঠল দেবেশ। বলল, 'তুইও যেমন! হোটেলওলীর মেয়েকে ঘরে আনতে আমার বয়ে গেছে। তাছাড়া আনবই বা কী করে? ঘরে বউ রয়েছে না? বিয়ের একটা অভিনয় করে ক'টা দিন ছুঁড়িটার সঙ্গে একটু আনন্দ ফুর্তি—বুঝলি কিনা!' বলে চোখের প্রান্ত কুঁচকে একটা ইঙ্গিত দিল।

ইঙ্গিতটা বুঝতে অসুবিধার কথা নয়। যাই হোক আমি আর কিছু বললাম না। এই মুহূর্তে সাঁওতালপরগণার ক্ষণে উচ্ছ্বাসময়ী ক্ষণে বিষণ্ণ মেয়েটির মুখ বার বার মনে পড়তে লাগল। একটি লম্পটের জন্য সারাজীবন শবরীর মত সে প্রতীক্ষা করবে!

বরষায়

অনিলকুমার সাধু

ঝর ঝর বরিষণ মেঘ গুরু গরজন
চঞ্চল সমীরণ হাহাকার,
নীপবন উল্লোল বারিধির কল্লোল
জলধারা ছলছল বারবার

*

চঞ্চল বিজুলি উঠিছে উজলি
গগন সন্ন্যাসী নৃত্য
সঘন বরষা অপরূপ ভরসা
উন্মনা বিহ্বল চিত্ত।

*

মেঘলোক বর্ণা ওড়ায়েছে ওর্ণা
ছায়ানীল উল্লাস গম্ভীর
অলকা পুরীতে প্রলয়ের ধ্বনিতে
উদ্বেল মহাগীতি মঞ্জীর।

*

মেঘের মৃদংগ ঝঞ্ঝা তরংগ
উঠিছে ডম্বরু ঝংকার
প্রলয়ের নটরাজ সেজেছে বুঝি আজ
তুলেছে প্রচণ্ড হুঙ্কার

*

দুরন্ত দুর্ব্বার বিপুল সম্ভার
পাগল প্লাবন ছন্দ
মেঘের ডম্বরু বেজে ওঠে গুরু গুরু
মহাকাশ তমসা অন্ধ।

*

ওগো মম রূপসী চম্পা প্রেয়সী
আজি এ বরষা সন্ধ্যা—
নির্জ্জন নিরালায় কার ধ্যানে প্রিয়া হায়
মঞ্জু অলকা গন্ধা।

*

ঘন ঘোর আষাঢ়ে বারিধারা ঝরঝরে
অন্তর করে মোর ক্রন্দন,
গরবিনী রানী মোর ঝরে আজি আঁখিলোর
জড়াতে ও স্নেহভুজ বন্ধন।

*

বেদনার ঢেউ ওঠে তোমারেই বুকে পেতে
উতরোল বিরহের পারাবার
ঝরঝর বরিষণ মেঘ গুরু গরজন
চঞ্চল সমীরণ হাহাকার।

*

মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের মতে একজন অতি কুৎসিত মানুষও নিজেকে অত কুৎসিত মনে করে না—যতটা কুৎসিত তাকে অপর লোক মনে করতে পারে। তবুও আর মনের অন্তরালে ফল্গুর মত বাসনা জাগে সুন্দরের গণ্ডীতে ধরা দেবার মত কি আমার কোন পথ নেই আর? এই হাহাকার এক জাতীয় মানুষের চিরন্তন লালসা।

মনে একবার সৌন্দর্য্যবোধ জাগলে সাধারণতঃ অপরের আনুষ্ঠানিক সৌন্দর্য্য দেখে অবচেতন মনে কম বেশী ঈর্ষার উদ্রেক হয় এবং সেই অবচেতন বা চেতন মনে নকল করার প্রয়াস জাগে। অবুঝ মানুষ সাধারণতঃ ঐ নকলচর্য্যার অনুরাগী বলেই সৌন্দর্য্য বিকৃতি এসে মনকে ক্রমশ পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় দূষিত করে।

নিজ আকৃতিগত প্রকৃত সৌন্দর্য্যমহিমা অপরকে অনেক সময় অতি কুৎসিত আকার ধারণ করায়। দেহগত গঠন প্রক্রিয়ায় নিজ নিজ সৌন্দর্য্য পরিচর্য্যার স্বতন্ত্র বিধান রয়েছে। নিজ দেহ গঠনের ছাঁচ অনুযায়ী যদি অপরের মার্জ্জিত সৌন্দর্য্যকলাকে আয়ত্ত করা যায় সেটা সৌন্দর্য্য চর্য্যাবিকার নয়,—মোটামুটি সুস্থ রুচিরই পরিচয় পরিচর্য্যার বিভিন্ন অভিজ্ঞতায়—নবনব চর্য্যাবিধানে দেয়।

এও সত্য মানুষ সৌন্দর্য্যের ভিখারী। কিন্তু প্র সৌন্দর্য্যের মানদণ্ড—আধুনিক সৌন্দর্য্য পিপাসুকদের জানা আছে কিনা সন্দেহ। তাই নিতান্তই কৃত্রিম সৌ প্রসাধন ও পোষাকের গণ্ডীতে আবদ্ধ থেকে সুন্দ পরিচয় দিতে গিয়ে দৈহিক সৌন্দর্য্যমানকে আড়ালে রে আদি সত্যকে অস্বীকার করে চলেছেন। পরিণ দেখা দেয় বিলাসিতা। এই বিলাসিতা মনকে বি কামনা ও লালসার অধীনস্থ করে জীবনের নবসংস্কার বুকে সমাধি সূচনা করে।

কাজে কাজেই আসল রূপ ও সৌন্দর্য্য শব্দের পরি সূত্র কোথায়? সেই পরিচিতি পেতে হলে সৌন্দ পিপাসুদের দেহবিন্যাসসূত্রে আবদ্ধ করতে হবে মনকে সামঞ্জস্য পূর্ণ দেহগঠন প্রকৃত রূপ-লাবণ্য তথা সৌন্দর্য্যে চরম স্বীকৃতি দেয়। এ চর্য্যায় যথেষ্ট ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্যের একান্ত আবশ্যক। একবার চিন্তা করুন সেই বহু যুগ আগে

কথা। ক্লিয়োপেট্রা,—এ্যাপোলোর কথাই ধরুন। তাঁদের সৌন্দর্য্যের ঐতিহ্য বিশ্ব বিদিত। ক্লিওপেট্রার নাকই তাঁকে সৌন্দর্য্যের রাণী করেনি বা এ্যাপোলোর চোখ ও চুলই তাঁকে সুন্দরের শ্রেষ্ঠ রাজা করেনি—করেছিল প্রথমতঃ তাঁদের সুসামঞ্জস্য পূর্ণ দেহ গঠন, দ্বিতীয়তঃ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমতাপূর্ণ গঠন। পোষাক ও প্রসাধনে রূপ ও সৌন্দর্য্যকে তুলে ধরার যুক্তি তাঁদের কাছে অতি নগণ্য ছিল।

সুতরাং দেহগঠন আকৃতি ও প্রকৃতির মধ্যে যে কুরূপ বা অসামঞ্জস্য পূর্ণ অবস্থা রয়েছে তাকে সুরূপ বা সুসামঞ্জস্য কি প্রণালীতে আনা একান্ত সম্ভব যে সম্ভাব্যের ওপর নির্ভর করে আসল রূপ ও সৌন্দর্য্যের মানদণ্ড সে বিষয়ে আজ বিশদভাবে আলোচনা করতে গিয়ে আমায় প্রথমেই আপনাদের কাছে পরিবেশন করতে হবে দেহ বিদ্যার সংক্ষেপ বার্ত্তা।

বয়স ভেদে—উচ্চতা অনুযায়ী মানুষ যদি অতি মোটা হয় তাকে বিলাসপূর্ণ পরিচর্য্যার অবগুণ্ঠনে রেখে সুগঠনা সুন্দরী বা সুন্দর বলে ঘোষণা করা যায় না। তা না থেকে যদি দেহ ব্যক্তিগত আকার থাকতো তার ওপর যদি রুচিসম্মত বিলাসপূর্ণ রূপচর্য্যায় অধিকতর সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায় তা অপরের কাছে খুব একটা হাসি বা বিদ্রূপের ব্যাপার হয় না।

মানুষ মোটা হয় কেন জানেন?—সাধারণতঃ তেল, চর্ব্বি, ঘি এবং শ্বেতসার ইত্যাদি খাদ্য যখন দেহে চর্ব্বির আকারে জমতে থাকে তখন।

বিজ্ঞানের দিক্ থেকে চিন্তা করতে গেলে একথাই সত্য বলে স্বীকৃতি দেবে যে গলার কাছে থাইরয়েড গ্রন্থির অন্তঃরস এই সব চর্ব্বিজাতীয় বস্তুকে দহন কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করে। কাজেই এই অন্তঃরসের যথার্থ অভাব হলে দেহে চর্ব্বি আসার পথ খুঁজে পায়। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে ঐ গ্রন্থির অন্তঃরসের অভাব ছাড়াও মানুষ চর্ব্বিতে মোটা হতে পারে।

আরও একটা যুক্তি আছে। স্বাভাবিক ভাবে খাদ্য দ্রব্য হজম ক্রিয়ার ফলে ঐ ভুক্ত খাদ্যের যে চরম পরিণতি হয়—তা থাইরয়েড অন্তঃরস' দহন ক্রিয়ায় সাহায্য করে, কাজে কাজেই থাইরয়েডে—রসের অভাব হলে দেহে

পিতা পুত্র

বিশ্বশ্রী মনতোষ রায় ও অরবিন্দশ্রী মলয় রায়

শুদ্ধমতে দহন ক্রিয়া চলতে পারে না,—পারেনা বলেই দেহময় অবিরত দূষিত পদার্থ সৃষ্টি হতে থাকে। সেগুলিকে বিনষ্ট করার মত উপযুক্ত পরিমাণে অন্তঃরস না থাকায় ঐ দূষিত পদার্থ দেহের ভেতর জমে জমে—সারা দেহটাকে বিষাক্ত করে কত কি রোগের সম্মুখিন করে।

ভুলকরে অনেকে খাদ্য খাবার কমিয়ে চর্ব্বি কমাতে চায়। এই বিচার-বিহীন খাদ্য মাত্রা কমাবার ফল ধারণ করে সম্পূর্ণ উল্টো। তাতে দেহ রক্ষা করার জন্য যে তাপের প্রয়োজন সেই উত্তাপ সৃষ্টি হতে না পারার ফলে এবং দেহে অধিক মাত্রায় চর্ব্বি থাকার ফলে দহন ক্রিয়াও ঠিক্ মত চলতে পারে না, তাতেও চর্ব্বি বেড়ে যায়।—সুতরাং ঐভাবে খাদ্য কমিয়ে কি লাভ? শুধু দেহটাকে দুর্ব্বল করা ছাড়া কিছু নয়। তাতে থাইরয়েড ধীরে ধীরে আরও দুর্ব্বল (atrophy) হতে থাকে। এই ভাবে খাদ্য কমিয়ে (dicting) রোগা হবার প্রয়াসকে বিজ্ঞান ব্যর্থ করে দিয়ে দানকরে কতকগুলি উৎকট রোগের উপসর্গ; যেমন—হৃদ্‌যন্ত্রের দোষ, নাড়ীরদোষ, স্নায়বিক দুর্ব্বলতার লক্ষণ,

শ্বাস-প্রশ্বাসের গণ্ডগোল, পাকস্থলীর গণ্ডগোল, গায়ের চামড়া খসখসে হয়ে যাওয়া, চুল, দাঁত, কোষ্ঠবদ্ধতা, মাথার যন্ত্রণা, বাত, যৌনাঙ্গের কর্ম্মকুশলতায় পরিবর্ত্তন, মেয়েদের মাসিকের গণ্ডগোল, এমনকি ঘুমন্ত অবস্থায় বিছানায় প্রস্রাব করে ফেলা ইত্যাদি এমন আরও কত কি।

তাই খাদ্যবিচারে বা খাদ্যনিয়ন্ত্রণের বেলায় লক্ষ্য রাখতে হবে সর্ব্বদা যাতে খাদ্যে প্রয়োজন মত "আয়োডিন" বস্তুটি থাকে। কারণ এই আয়োডিন থাইরয়েড গ্রন্থিকে অন্তর্মুখী রস প্রস্তুত করাতে যথেষ্ট সাহায্য করে।

তাই আপনাদের আজ আমি এমন কতগুলি নীতি-নির্দ্দেশের সাথে নতুনকরে পরিচয় করাবো যেগুলি অতি বিশ্বাস ও আন্তরিক ভাবে অন্তত "তিন মাস" যদি অভ্যাস করতে পারেন *নিশ্চয়ই আপনাদের দেহের অস্বাভাবিক ছবি দূর হয়ে গিয়ে আসল রূপ ও সৌন্দর্য্য ফিরে পাবেন।*

আমার প্রথাটির মধ্যে যে সব খাদ্য ও যোগ-ব্যায়াম নির্দ্দেশ করা থাকবে তাতে ঐ থাইরয়েড গ্রন্থিকে সচল ও স্বাভাবিক করে তুলতে যথেষ্ট শক্তি ও সামর্থ্য রাখবে।

দ্রুতগতিতে এই কার্য্য সাধনকরার নিমিত্ত আমার ঐ প্রথার সাথে আরও জরুরী তুটি প্রথা সংযুক্ত করবো। একটি হল "ভেপার বাথ" বা "বাষ্পস্নান" অপরটি জোলাপবিধি"।

পরপর সমস্ত বিধিনির্দ্দেশ সাজিয়ে বলে যাচ্ছি এই তিনমাসে কোনদিন কি অভ্যাস কোরবেন কতটুকু ও কোন সময়।

এই বিধি সুরু করার আগের দিন আপনার শরীরের ওজন এবং মাপ নিয়ে তারিখ দিয়ে লিখে রাখুন। প্রতি ১৫ থেকে ২১ দিন অন্তর ওজন নেবেন। মাঝে একবার মাপ নেবেন। আরও ভাল হয় যদি একটি পূর্ণ দেহের ছবি তুলে রাখতে পারেন।

এই বিধি পালন কালে যদি শরীরে কোন অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন ঘটে বা কিছু বুঝে নিতে চান যোগ ও ব্যায়াম কথা অন্য কিছু বিষয় বস্তু জেনে নিতে চান—নিঃসঙ্কোচে পত্র দ্বারা আমার ঠিকানায় 30 B, W. C. Banerjee Street, Calcutta-6 অথবা টেলিফোন 55-8201-এ যোগাযোগ করতে পারেন।

এবার লক্ষ্য করুন আপনাদের পূর্ণ ব্যবস্থা পত্র। প্রথমে বলছি আপনারা কি কি ব্যায়াম অভ্যাস করতে পারে পুরুষ-মহিলা সবাই। এই ব্যায়ামগুলি সম্বন্ধে এক কথা আছে। প্রথম পর্য্যায়ের ব্যায়ামগুলি আমার মতে সকালে অভ্যাস করলে ভাল হয়। কিন্তু এমনও তো হতে পারে সকালে অসুবিধা,—সেক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে বিকেলে অভ্যাস করতে হবে, তবে সকালেও কিন্তু ব্যায়াম থাকবে যে পর্য্যায়টি আমি বিকেলের জন্য রেখেছিলাম। প্রথম পর্য্যায়ের ব্যায়ামগুলি মোটামুটি তিন সেট করে অভ্যাস করতে পারেন। প্রত্যেক সেটে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী রিপিটেশান করবেন। একটু বিশ্রাম নিয়ে ফের সুরু করবেন। এভাবে তিন সেট হবে। কতকগুলি ব্যায়াম ওজন নিয়ে অভ্যাস করার নির্দ্দেশ থাকছে সেগুলি যারা *ডাম্বের সংগ্রহ করতে পারবেন কোরবেন তবে তার ওজন ধরুন সুবিধা অনুযায়ী ৫ থেকে ১০ পাউণ্ডের বেশী হবেনা।* আর যারা এই লোহার ডাম্বের সংগ্রহে অসমর্থ তারা কোন কোন ব্যায়াম গুলি আধ খানা ইঁট নিয়ে আবার কোন ব্যায়াম পুরা ইঁট নিয়ে অভ্যাস করতে পারেন। প্রথম থেকে ১০ নং ব্যায়াম পর্য্যন্ত তিনমাত্রা অভ্যাস করার পরও যদি আপনার মেজাজ বা দম থাকে তাহলে নিশ্চই আপনি ফের ২নং ব্যায়াম থেকে ১০নং পর্য্যন্ত একমাত্রা করে অভ্যাস করতে পারেন। আর এই ব্যায়াম বিধি পালন করার অব্যবহিত পরে কোন্ বিধি পালন করতে হবে সে সংবাদ আপনারা পাবেন পরে আপনাদের "খাদ্য তালিকার" মধ্যে। এবার আমি পর পর ব্যায়ামগুলি সাজিয়ে যাচ্ছি। ব্যায়ামগুলি বুঝতে অসুবিধা হলে দয়া করে আমার সাথে যোগাযোগ করার অনুরোধ রইলো।

প্রথম পর্য্যায়ের ব্যায়াম

(সকালে বা বিকালে)

1 Breathing—15 times.

2 Standing alternate Side bending with weight—

3 wide standing front bending wirh weight—

4 Standing waist bending side crossing with weight—

5 wall Back bending—

6. সর্ব্বাঙ্গাসনে পবন মুক্তাসন—

7. Sitting h'p rol-ling—

8. পশ্চিমোত্থান হলাসন with weight or without weight—

9. Standing hands up with weight—

10. উড্ডীয়ান—

11. শবাসন ৫ থেকে ১০ মিঃ

দ্বিতীয় পর্য্যায়ের ব্যায়াম

(বিকেলে বা সকালে)

1. Breathing—6 times

2. হলাসন বা শশঙ্গাসন—
3. ভুজঙ্গাসন—
4. পদহস্তাসন—

প্রতিটি দু'বার কিম্বা তিনবার এবং প্রতিবার ৩০ সেঃ অভ্যাস ও ৩০ সেঃ বিশ্রাম।

5. Standiug clock and anti-clock round—3 sets

6. শবাসন—২।৩ মিঃ

7. Side lying legs up—3 Sets for each leg.

8. শবাসন—১০।১৫ মিঃ

ব্যায়ামের দিক দিয়ে মোটামুটি এই নির্দ্দেশগুলি পরিমাণে একটু কম বেশী করে নিশ্চয়ই নিতে পারেন শরীরের চাহিদা অনুযায়ী।

—খাদ্য—

এবার বলছি ঐ ব্যায়ামকে অবলম্বন করে কি জাতীয় খাদ্য কোন্‌দিন কি পরিমাণ গ্রহণ কোরবেন এবং সেই সঙ্গে ব্যায়ামের মাত্রা ও সময় কি ভাবে পরিবর্ত্তন করতে হবে।

তিনমাসকে ছ' ভাগ করলে ১৫ দিন করে পাওয়া যাচ্ছে। এই প্রতি ১৫ দিনকে আপনারা এক একটি অনুশীলন বলে ধরে নিন। সুতরাং আপনাদের এই খাদ্য তালিকা ও ব্যায়াম তিন মাসে ছ' ভাগে কি পরিমাণ পাচ্ছে লক্ষ্য কোরবেন খেয়াল করে।

প্রথম অনুশীলন :—(১৫ দিন)

ব্যায়াম :—যেমন নির্দ্দেশ দেওয়া আছে (পুরামাত্রা)

খাদ্য :—সকাল ৬-৩০ মিঃ। ১টা পাতিলেবুর রস ১ গ্লাস ঠাণ্ডা জলে মিশিয়ে নুন ছাড়া খাবেন।

৭—৩০ মিঃ—১টা অর্দ্ধসেদ্ধ ডিম ও পরিমাণমত

মিঃ এশিয়া শ্রী
দুলাল দত্ত

সেলাড্-জল। এরপর ব্যায়াম সুরু হবে (৯৫।৩০মিঃ পর) ব্যায়াম করার সময় আধখানা পাতিলেবু ২ চামচে মধু ১ গ্লাস ঠাণ্ডা জলে মিশিয়ে রাখবেন। ব্যায়াম করতে করতে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়বেন তখন একটু একটু করে মুখে নিয়ে খানিকক্ষণ রেখে গিলে খেয়ে নেবেন, ব্যায়াম শেষ হয়ে যাবার পর একটু বিশ্রাম নিয়েই—"ভেপার বাথ" অর্থাৎ "বাষ্পস্নান"। এই বাষ্পস্নান হবে ১২ থেকে ১৮ মিনিট। (বাষ্পস্নান কি নিয়মে নিতে হয় পরে আমি বলে দিচ্ছি ছবিসহ)। বাষ্পস্নান নেবার পূর্ব্বে ১ গ্লাস গরম জলে আধখানা বা ইচ্ছানুযায়ী পুরা একটি লেবুর রস মিশিয়ে পান করে নেবেন। প্রচুর ঘাম বের হবে। সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা অবস্থায় ঘাম মুছে নিয়ে একটা কম্বল বা ঐ জাতীয় কিছুর উপর সটান চোখ বুঁজে শুয়ে পড়বেন গায়ে ভারি কিছু ঢাকনা দিয়ে। ঐ অবস্থায় কিছু সময় পাউডার দিয়ে নিজে নিজে পেটের চর্ব্বিতে

একটু দলাই মলাই করে দেবেন। তাতে চর্ব্বি শীঘ্র নরম হবে। তারপর ইচ্ছা অনুযায়ী ঠাণ্ডা জলপান করতে পারেন। অন্ততঃ ৪০ মিঃ পরে ইচ্ছে করলে স্নান করতে পারেন—নচেৎ মাথায় মাত্র ঠাণ্ডা জল দিয়ে ধুয়ে দিতে পারেন এবং গা'টা মুছে দেবেন। ইচ্ছে করলে ১ দিন অন্তর ১ দিন স্নান করতে পারেন ঠাণ্ডা জল দিয়ে। তবে যথেষ্ট বিশ্রাম নেবার পর নচেৎ ঠাণ্ডা লেগে যাবার সম্ভাবনা থাকতে পারে।

বেলা ১২৷১ টায়ঃ—সিদ্ধ ও রুচিমত কাঁচা শাকসব্জি, আধ পোয়া মাছ (খুব হালকা করে ঝোল) খাবার পর ৫ মিঃ বাদে ১ গ্লাস ঘোল ছেঁকে খাবেন।

বেলা ৪ টা পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে অন্ততঃ তিনপোয়ার মত ঠাণ্ডা জল পান।

বেলা ৪৷৷০ টার সময়ঃ—আধ গ্লাস কমলা বা মুছাম্বি অথবা বাতাবীলেবুর রস (টক্ হলে একটু গ্লুকোজ দিতে পারেন) এবং এক বা আধ ছটাক ছানা।

সন্ধ্যে ছ'টায়ঃ—দ্বিতীয় পর্য্যায়ের ব্যায়াম। এই ব্যায়ামের পর ২ গ্লাস বা একটু কমবেশী ঠাণ্ডা জলে চায়ের চামচের দু'থেকে আড়াই চামচ "গ্লুকোজ ডি" মিশিয়ে পান কোরবেন।

রাত ৯ টায়ঃ—সব্জি সেদ্ধ ।৵০ পোয়া, এক ছটাক মাছ, একটু শশা কুচি, ১ কাপ স্কিম্‌ড্ মিল্ক (সর তোলা দুধ), দাঁত মেজে শোবেন। শোবার পূর্ব্বে ১ গ্লাস গরম জলে তিন চামচ ইছবগুলের ভুষি এবং আধখানা পাতি লেবুর রস মিশিয়ে জোলাপরূপে এই ১৫ দিন প্রত্যহ খাবেন। জোলাপ খাবার কিছুক্ষণ বাদে যদি ঠাণ্ডা জল খাবার চাহিদা থাকে বা খেলে ভাল বোধ কোরবেন মনে করেন তবে খেতে পারেন।

দ্বিতীয় অনুশীলন (১৫ দিন)=মোট ১ মাস।

ব্যায়ামঃ—উল্লিখিত ব্যায়ামগুলি পুরা মাত্রা অভ্যাস না করে কমিয়ে চার-ভাগের-তিনভাগ অভ্যাস কোরবেন। অর্থাৎ পুরা ব্যায়ামগুলি অভ্যাস করতে আপনার যতটুকু সময় যেতো তার চারভাগের তিন-ভাগ সময় অভ্যাস কোরবেন সুতরাং ব্যায়ামের মাত্রা স্বভাবতই একটু কমিয়ে নিতে হবে। ওটা নিজেরা সুবিধামত ক'ময়ে নেবেন এবং বিকেলের ব্যায়াম অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্য্যায়ের ব্যায়ামও পুরা-মাত্রা অভ্যাস না করে ঐ নিয়মে কমিয়ে দেড় মাত্রা অভ্যাস কোরবেন।

খাদ্য :—

সকাল ৬৷৷০ টায়—পূর্ব্ববৎ।

„ ৭৷।০ টায়—১ কাপ হরলিকস্—একটু ফল এবং ১ টা অর্দ্ধসিদ্ধ ডিম।

তার পরই ব্যায়াম—

ব্যায়ামের সময় ২ চামচ গ্লুকোজ-ডি ১ গ্লাস ঠাণ্ডা জলে মিশিয়ে পূর্ব্বনিয়মে অল্প অল্প করে খাবেন।

ব্যায়ামের পর "বাষ্পস্নান"।—সময় ১০ থেকে ১৫ মিঃ।

বাষ্পস্নানের পূর্ব্বে গরম এক গ্লাস লেবুর জল-নুন ছাড়া—। (লেবু ১টা।)

বাষ্পস্নানের পরে—সাধারণ এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল পান করতে পারেন। এবং পূর্ব্বনির্দ্দেশ অনুযায়ী পেটে একটু দলাই মলাই করে দেবেন পাউডার দিয়ে।

দুপুরে-১২৷১২৷৷৷১টার ভেতর

আধ ছটাক কড়াই শুটি সেদ্ধ, এক ছটাক মাছ, ১ কাপ মসুর ডালের সুপ্, অল্প করে সেলাড্।

বেলা তিনটায়ঃ—১ গ্লাস ঘোল ছেঁকে নিয়ে সঙ্গে সামান্য নুন লেবু দিতে পারেন।

বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদঃ—আধ গ্লাস ফলের রস, অল্প করে ছানা।

রাত ৮টা থেকে ৯টার ভেতরঃ—১গ্লাস মত টমেটোর সুপ্ বা সব্জির সুপ্ সঙ্গে ১টা মুরগীর ডিম দিতে পারেন। অথবা আমলেট একটা, একটু মাছ।

জোলাপঃ—তিন দিন অন্তর ১ দিন বন্ধ। সপ্তাহে দু'দিন বাদ যাবে। পরিমাণ ও নিয়ম পূর্ব্ববৎ। পরে ঠাণ্ডা জল পান করতে পারেন।

তৃতীয় অনুশীলন (১৫ দিন)=মোট দেড়মাস।

ব্যায়ামঃ—উল্লিখিত ব্যায়ামগুলি পুরামাত্রা অভ্যাস না করে এবার সব অর্দ্ধেক করে অভ্যাস করুন। সুতরাং সময়ও অর্দ্ধেক লাগবে অভ্যাস করতে। এবং বিকেলের ব্যায়াম নির্দ্দিষ্ট মাত্রা থেকে মাত্র ১ মাত্রা করে অভ্যাস কোরবেন॥

খাদ্য—

সকালে :—১ গ্লাস পাতলা বার্লির জলে পাতিলেবু বা কমলা লেবুর রস মিশিয়ে মোটামুটি গরম অবস্থায় খেতে হবে।

সকাল ৭॥ টায় :—সর তোলা দুধ দিয়ে ১ কাপ বোর্ণভিটা, একটু ফল।

তারপর ব্যায়াম।

ব্যায়ামের পূর্ব্বে ২ চামচে মধু এবং আধখানা পাতিলেবুর রস সহ ১ গ্লাস ঠাণ্ডা জল—পূর্ব নিয়মে পান করতে পারেন।

তারপর সেই বাষ্পস্নান।
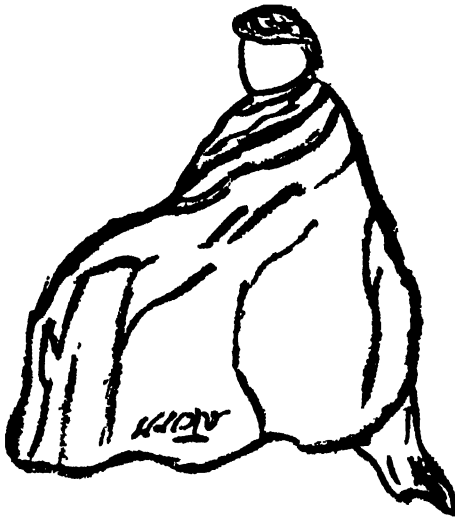
ভেপারবাথ্ (বাষ্পস্নান)

১ দিন অন্তর ১ দিন। সময় ৮ থেকে ১০ মিঃ। বাষ্পস্নানের পূর্ব্বে ১ গ্লাস গরম লেবুর জল পান কোরবেন। লেবু ১টা বা একটু কম।

বাষ্পস্নানের পর—ইচ্ছানুযায়ী এক কাপ গরম কফি খেতে পারেন বা হরলিকস্।

বেলা ১২ থেকে ১টার ভেতর :—

আধ ছটাক কড়াই শুটি সেদ্ধ অথবা সোয়াবীন সেদ্ধ টমেটো সস্ দিয়ে খাবেন। আধ ছটাক সেদ্ধ সব্জি এবং মাছ বা মাংসের ষ্টু, আধ ছটাক।

দু'ঘণ্টা বাদে—১ গ্লাস ঘোল ছেঁকে খাবেন।

বিকেল ৫টা থেকে ৬টার ভেতর—যে কোন ফলের রস এক ছটাক।

রাত ৮টা থেকে ৯টার মধ্যে :—এক ছটাক মাছ বা মাংসের ষ্টু সব্জি সেদ্ধ এক ছটাক। খাওয়া শেষে আধ কাপ মত হরলিকস্।

জোলাপ :—শোবার পূর্ব্বে ১ দিন অন্তর এক দিন ইছব গুলের ভূষি লেবু দিয়ে অথবা ঘন দুধে মিশিয়ে।

তার পর ইচ্ছে করলে ঠাণ্ডা জল পান করতে পারেন।

চতুর্থ অনুশীলন (১৫ দিন) = মোট ২ মাস।

ব্যায়াম :—উল্লিখিত পুরা মাত্রা থেকে এক মাত্রা করে অভ্যাস করতে পারেন। এবং বিকেলে আপাততঃ ঐ ১৫ দিন কোন ব্যায়াম কোরবেন না।

খাদ্য :—

সকালে ১ গ্লাস হরলিকস্

সকালে ৭॥ টায় একটা অর্দ্ধ সেদ্ধ ডিম, দই দিয়ে অল্প করে সেলাড্, একান্ত প্রয়োজন বোধ করলে আধ কাপ কফি।

তার অল্প পরে ব্যায়াম,—নির্দ্দেশ মত

ব্যায়াম কালে ইচ্ছে করলে সাধারণ জল খেতে পারেন মাত্র।

ব্যায়ামের পরই বাষ্পস্নান—সময় :—৫মিঃ মাত্র।

বাষ্পস্নানের পূর্ব্বে ১ গ্লাস গরম জল পান করতে পারেন আধখানা লেবুর রস সহ।

বলাবাহুল্য বাষ্পস্নানের সময় ও পরে যথাযথ নিয়ম-নির্দ্দেশ অবশ্য পালন কোরবেন।

এবার নিজে নিজে অবশ্যই তেল মালীশ কোরবেন অন্ততঃ আধ ঘণ্টা। সেই তেল হয় ভাল সরষে তেল অথবা ভাল অলিভ অয়েল। তারপর সাধারণ স্নান। সাবান দেবেন না। খুব করে ঘষে ঘষে সেই তেলটা তোয়ালে বা গামছা দিয়ে তুলে দেবেন। কষ্ট হলে সপ্তাহে ১ দিন বা দুদিন সাবান ব্যবহার করতে পারেন।

বেলা ১২ থেকে ১টার ভেতর :—

এক ছটাক কড়াই শুটি সেদ্ধ, অল্প মসুর ডাল সহ কাঁচা পেঁপের জুষ ছেঁকে নিয়ে এক কাপ। জুষ তৈরীর সময় নুন দেবেন না। খাবার সময় নুন লেবু-গোলমরিচ দিয়ে খাবেন —পূর্ব্বের টমেটো জুষের বেলায়ও নুন দিয়ে তৈরী করবেন না। খাবার সময় একটু দিতে পারেন। মাছ বা মাংসের ষ্টু এক ছটাক।

বেলা ছ'টার সময়—একটা ডাবের জল।

বিকেল ৪ থেকে ৬ টার ভেতর:— ১ গ্লাস ঘোল ছেঁকে (মিষ্টি দেবেন না) আধ গ্লাস কমলালেবুর রস বা পাকা পেঁপে। খুব খিদে থাকলে একটু ছানা খেতে পারেন।

রাত ৮ টা থেকে ৯ টার ভেতর:—সোয়াবীন সেদ্ধ এক ছটাক, মাছ বা মাংসের ষ্টু এক ছটাক এবং ১ কাপ মসুর ডালের সুপ ছেঁকে খাবেন।

জোলাপ:—দু'দিন অন্তর ১ দিন পূর্ব্ব নিয়ম অনুযায়ী। শোবার সময় জল খেতে পারেন।

পঞ্চম অনুশীলন (১৫ দিন) আড়াই মাস।

ব্যায়াম—

তৃতীয় পর্য্যায়ের ব্যায়াম যে কোন ১ বেলা

1. Breathing—10 times.
2. Standing waist bend side crossing—(10×2)2
3. ভুজঙ্গাসন 3 (30-30)
4. বিভক্ত সর্ব্বাঙ্গাসন—: (6×2) 2 to 3 sets.
5. মৎস্যাসন বা সুপ্তবজ্রাসন— 3 (30-30)
6. শশঙ্গাসন—3 (30-30)
7. Hip rolling—(10×2) 2
8. শবাসন—১০ মিঃ

খাদ্য

সকালে—হরলিকস—১টা ডিম, একটু শশা যে কোন একটু ফল

বেলা ১০টায়—ঘোল একগ্লাস ছেঁকে নুনলেবু দিয়ে খাবেন।

দুপুরে—এককাপ বা একটু কম ভাত, মাছের ঝোল, তরকারী, ডাল, দই-ভাত ও আমলকীর চাটনী।

বিকেলে:—সোয়াবীন সেদ্ধ এক ছটাক টমেটো সস দিয়ে—১কাপ মাখন তোলা দুধ।

রাত্রে—সুজির রুটি ২টি। লাউ বা পেঁপের তরকারী মাছ বা সহজ মাংস দেড় ছটাক মত।

রাত্রে শোবার পূর্ব্বে—১টা লেবু দিয়ে মিছরির জল এক গ্লাস পান কোরবেন।

ষষ্ঠ অনুশীলন (১৫ দিন)—মোট ৩ মাস পূর্ণ।

ব্যায়াম

চতুর্থ পর্য্যায়ের ব্যায়াম—যে কোন ১ বেলা

1. Breathing—10 times.
2. Standing side bending—(15×2) 3
3. Chair Deeps—3 Sets,
4. Hands up Baithak—3 sets
5. সর্ব্বাঙ্গাসনে হলাসন ও পবনমুক্তাসন—1: 6×3 and 1 : 7×3
6. সলভাসন—(10×2) 3
7. Sitting Hip rolling—(15×2) 3
8. Lying waist raiseds Hands up Deep Breathing 7×3
9. শবাসন—10 minutes.

খাদ্য

জোলাপ:—সকালে ঘুম থেকে উঠে খুব ভাল হয় যদি এক বা দেড় মাত্রা করে ত্রিফলার জল একগ্লাস পান করেন। অগত্যা ইছবগুলের ভূষি ২ চামচে গরম দুধের সঙ্গে মিশিয়ে একটু মিষ্টি দিয়ে খেয়ে নেবেন।

তারপর:—

বোর্নভিটা এককাপ, ১টা অর্ধ সেদ্ধ ডিম বা জলে পোচ, অথবা নরম করে আমলেট। ১ পিস্ টোষ্ট।

বেলা ১০টায়:—একটু ছানা ও ঘোল নুনলেবু দিয়ে ছেঁকে খেয়ে নেবেন।

দুপুরে:—মসুর ডাল ও আমলকী দিয়ে তৈরী সুপ ১ কাপ (আমলকী ১টা বা দুটোর সঙ্গে একটু মিষ্টি দিতে পারেন খেতে কষ্ট হলে) এক কাপ মত ভাত, মাছের ঝোল, সজনা, ঢেঁড়স সেদ্ধ বা কাঁচা পেঁপে সেদ্ধ। দইভাত নুন লেবু জল দিয়ে এবং যে কোন একটু ফল।

বিকেলে:—খুব পাতলা করে সরতোলা গরম দুধ বা ঘোলে কাঁচা বেল সেদ্ধ করে বা পাকা বেলের সরবৎ একগ্লাস বা কম বেশী।

রাত্রে:—কড়াইশুটি সেদ্ধ আধ ছটাক—টমেটো সুপ দেড়কাপ, একটু মাছ বা মাংসের ষ্টু, শোবার সময় ঠাণ্ডা জলে আধখানা লেবু অর্ধ চামচে জোয়ানের গুঁড়া—সিকি চামচে বীটনুন মিশিয়ে খেয়ে শুয়ে পড়বেন।

ভেপার বাথ্ বা বাষ্পস্নান

কি নিয়মে নিতে হয়?—শরীর যতটা সম্ভব পোষাক বিহীন অবস্থায় ১টা জলচৌকীতে বসবেন। সামনে ১টা কম্বল বা ভারি কিছু রাখবেন এবং দুটো বালতি রাখবেন, মাথায় একটা ভিজা তোয়ালে রাখুন। দু'কেট্‌লী (বড়) খুব গরম জল (ধুয়া উঠ্‌বে) বালতিতে ঢেলে একটা সামনে আর একটা পেছনে রাখুন। এবার সমস্ত শরীরটা পা থেকে গলা পর্য্যন্ত বালতী সহ ভাল করে মুড়ে দিন, (মনে আছে—তার আগেই গরম ১ গ্লাস লেবু জল খেয়ে নেবেন) চুপ চাপ থাকুন নির্দ্দেশিত সময় পর্য্যন্ত। ক্রমশই ঘাম সুরু হবে। জল ঠাণ্ডা হয়ে গেলে চট্ করে অপরকে বলুন জল বদলে দিতে।

সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেলে শুকনো গামছা বা তোয়ালে দিয়ে বেশ করে গা'মুছে ফেলুন। এবার শুয়ে পড়ুন চিৎ হয়ে কিছুর ওপর—সারা গা ঢাকা দিয়ে। পেটে বুকে পাউডার দিয়ে দলাই মলাই খানিকক্ষণ করে চুপকরে থাকুন চোখ বুঁজে।

ফের ঘাম আসবে। ঐ ঢাকনার ভেতর বার বার মুছে নেবেন ঘাম,—সম্পূর্ণ বিশ্রাম বোধ করার পর উঠে খানিক-ক্ষণ বসে থেকে তারপর দাঁড়াবেন ও পোষাক বদল করে নেবেন। (বলাবাহুল্য বাষ্পস্নান কালীন যতটা সম্ভব দরজা জানলা বন্ধ থাকবে। কাজ শেষে আস্তে আস্তে এক এক করে খুলবেন)।

আমার এই প্রবন্ধ পড়ে যারা এই অশ্রুতপুর্ব্ব নীতি-পদ্ধতি পালন করে অতি মোটা থেকে রোগা মানে দেহ সুগঠন করার ইচ্ছা কোরবেন তারা অন্ততঃ আমায় দয়া করে একবার জানিয়ে রাখবেন বা যোগাযোগ—করতে পারলে অনেক ভাল হয় সঠিক ও শুদ্ধ নির্দ্দেশ পাবার জন্য।

আমার খুব বিশ্বাস আছে এই পদ্ধতি পালন করলে আপনাদের দেহ মেদমুক্ত তো হবেই উপরন্তু সৌন্দর্য্য এবং অধিক কর্ম্মক্ষমতা লাভ করতে সক্ষম হবে। সহসা কোন রোগও আক্রমণ করতে সাহস পাবেনা।

দ্রষ্টব্য :—

(১) পঞ্চম ও ষষ্ঠ অনুশীলন অভ্যাসকালীন ভেপার বাথ্ আর নেবেন না, স্নানের সময় খুব ভাল করে তেল মালিশ কোরবেন এবং ভাল সাবান ব্যবহার করতে পারেন তবে প্রত্যহ নয় মাঝে মাঝে।

(২) এই তিন মাস নববিধান অনুশীলনকালীন জল-পানের মাত্রা কমাবেন না।

(৩) এই প্রথা অবলম্বন করাকালীন কিছু দিন মাথা ঘুরতে পারে-গা'ঝিমঝিম করতে পারে। কোন ভয় কোরবেন না।

(৪) যাদের প্রেসারের গণ্ডগোল রয়েছে তারা পরামর্শ নিয়ে অভ্যাস কোরবেন।

(৫) শরীর, বয়স, ওজন হিসেবে, খাদ্য, ব্যায়াম, বাষ্প-স্নান এবং জোলাপের মাত্রা অবশ্যই কিছু কম বেশী করে নিতে পারেন।

(৬) মেয়েদের মাসিককালীন মাত্র ব্যায়াম ও ভেপার বাথ্ বন্ধ রাখবেন।

প্রতিভার কৌতুক? অথবা?

জ্যোতির্ময়ী দেবী

অনেকদিন আগের কথা। ১৩৩৬ সাল। কাশীতে গিয়েছি। পৌষ মাস।

খ্যাতনামা শিল্পী শ্রীভবেশচন্দ্র সান্যালের জননী তখন কাশীতে রয়েছেন, ঘটনাচক্রে তাঁর কাছে গিয়ে পড়েছি।

তিনি বললেন, 'জ্যোতু, এবারে প্রয়াগে অর্দ্ধকুম্ভ। থেকে যাও কিছুদিন একসঙ্গে যাওয়া যাবে।'

একে কাশী হেন তীর্থ স্থান, তাতে কুম্ভমেলার আহ্বান। ব্রাহ্মণ পরিবার ভালো সঙ্গ ও সঙ্গী। থাকার কোনো অসুবিধা নাই।

বিনা দ্বিধায় রয়ে গেলাম। কুম্ভমেলার পরেই জয়পুরে ফিরব ঠিক করলাম।

নানা কারণে মন অতিশয় আর্ত্ত আর উদ্‌ভ্রান্তও। তীর্থের আহ্বানে মন টান্‌ল।

সহসা খবর পেলাম ৺কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কাশীতে তখন রয়েছেন, শ্রীসুরেশ চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে (উত্তরা সম্পাদক)।

তার আগের বৎসর ১৩৩৫ সালের প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ইন্দোর অধিবেশনে তাঁর সঙ্গে এবং কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজীর অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ও সুরেশের সঙ্গে একটু আলাপ হয়। সুরেন্দ্রবাবু তার কয়েক বৎসর আগে 'অলকা' নামে একখানি মাসিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন। কাশী থেকে পত্রিকাটি বেরুতো।

সেই সময়ে আমারো একটি উগ্র ও উদ্ধত লেখা 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় বেরোয় 'নারীর কথা' নামে। প্রথম লেখা সেটি।

তাই থেকেই এই পরিচয় মাসিক পত্র ও পত্রিকার মারফৎ। আমাদের বেলায় সেকেলে বাড়ী। তাতে রাজস্থানী পর্দা। মোগল আমলের ঐতিহ্যবাহী। চিঠিপত্র ছাড়া সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয় সেকালে বাড়ীতে অননু-মোদিতই ছিল।

যাহোক। তবু তখন লুপ্ত 'অলকা' সম্পাদক সুরেন্দ্র-বাবুর বাড়ীতে একটি টাঙ্গায় করে এ-বাড়ীর একটি বালককে সঙ্গে নিয়ে গেলাম।

কিছু পর্দা মানি কিছু মানিনা তখন সেই রকমের যুগ। গিয়ে শুন্‌লাম বাইরের ঘরে আরো কে কে আছেন। এবং কেদারবাবুও আছেন। অন্তঃপুরের ও বাইরের সীমানার এক ঘরে বসে আছি চিরকালের মেয়েদের মত। সহসা সুরেন্দ্রবাবু বেরিয়ে এসে বললেন, বাইরের ঘরে বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক এবং সাহিত্যিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই আছেন। এবং তিনি বলছেন যে জ্যোতির্ময়ীর বাবার সঙ্গে তাঁর বেশ পরিচয় ছিল, তিনি জয়পুরে গিয়ে-ছিলেন একসময়ে। আমি তাঁর সামনে যেতে কেন কুণ্ঠিত হচ্ছি?

অপ্রতিভভাবে গিয়ে তাঁকে ও কেদারবাবুকে প্রণাম করে বসলাম। বিদ্বান পণ্ডিত বিদগ্ধ সমাজে যাতায়াত এবং কথাবার্ত্তা বলার কোনো কালেই অভ্যাস নেই।

তাঁরা কথা কইছেন। আমি পিছনের ও পাশের আলমারী ভরা বইয়ের নামগুলি দেখছি। বাংলা ও ইংরাজী নানা রকমের বই।

সহসা সুরেন্দ্রবাবু বললেন সহাস্যে, 'পড়াশোনার অভ্যেস আছে বুঝি?'

একটু 'হ্যাঁ, না', করে কি একটা জবাব দিলাম।

এবারে সকৌতূহলে সুরেন্দ্রবাবু বললেন ··কিন্তু দেখছি বৈদ্যজাতের মধ্যে মেয়েপুরুষদের মধ্যে যেন একটু অন্য বর্ণের (ব্রাহ্মণ কায়স্থের) চেয়ে পড়াশোনার চর্চা বেশী। 'নয়?'

কেদারবাবু তো চমৎকার মানুষ। তাঁর কাছে বামুন

স্ত্রী পাঠ্য বইয়ে ভক্তিহীনা বৈদ্যকন্যা কিন্তু নীরবেই আছে। এবং তার এই কথাতে মনে উঠেছে অন্য কথা।

কেদারবাবু বললেন, হ্যাঁ বৈদ্যদের মধ্যে মেয়েদের মাঝে অন্যজাতের চেয়ে একটু পড়াশোনা ও শিক্ষার বিস্তার দেখা যায়…।

সুরেন্দ্রবাবু সমর্থন করলেন। রাখালদাস বাবুরও সমর্থন আছে মনে হল।

অতঃপর একজন বললেন 'হ্যাঁ। তবে ওঁরা সংখ্যায়ও কম কিনা—তাই ওঁদের সমাজ খুব সংহত। সেই জন্যেই শিক্ষিত হবার সুযোগ পান বোধহয়।

একজন কে বললেন, 'আদম সুমারীর রিপোর্টে বৈদ্য ব্রাহ্মণ কায়স্থদের সংখ্যানুসারে—কাদের মেয়ে কত শিক্ষিত এবং শতকরা কত সংখ্যা, তাতে যা দেখা গেছে ব্রাহ্মণের সংখ্যা চৌদ্দ পনর লক্ষ—কায়স্থও প্রায় তাই। বদ্যি মাত্র দু'লক্ষ। পূর্ব বাংলার বদ্যি নিয়ে বুঝি ৫।৬ লক্ষ। কিন্তু তাঁরা যে কিছু সাঙ্কর জাত তাতে আর তাঁদের সন্দেহ নেই।…আমি শুনছি অনেকক্ষণ বসে বসে।

এতক্ষণ আমি যা ভাবছিলাম! এবারে সঙ্কোচ না করে বলে ফেললাম, 'কিন্তু বৈদ্যজাতির মধ্যে কোনো বড় বা মহৎ প্রতিভার জন্ম আজ অবধি হয়নি তো!'

দাদামশাই (কেদারবাবু) অধ্যাপক মশাই প্রত্নতত্ত্ববিদ্ প্রমুখ সকলে আশ্চর্য্য! তাঁদের চোখে প্রশ্ন 'অর্থাৎ'?

সেকালে ঘরোয়া পড়াশোনা করা মেয়ে হলেও সাহসে ভর করে বললাম, তাঁরা সবাই মাঝারি মানুষ। মাঝারি ভাবেই জগতে বেঁচে থাকেন। শেষ সীমানাতেও মাঝারিই রয়ে যান। শিক্ষা দীক্ষা বিদ্যা পাণ্ডিত্য জ্ঞান বুদ্ধি থাকলেও এমন বিশেষত্বহীন (Mediocre) জাত ভারতবর্ষে আর আছে কিনা সন্দেহ। তাঁদের মধ্যে বিরাট প্রতিভার জন্ম কখনো কোনোদিন হয়নিই মনে হয় আমার।

তাঁরা পুনশ্চ অবাক হলেন। সুরেন্দ্রবাবু বললেন 'তার মানে?'

এবারে বৈদ্যদুহিতার সাহস বেড়ে গেছে।

তাঁরা সবাই সকলেই হয় ব্রাহ্মণ নয় কায়স্থ। বহু বর্ণও আছেন। কিন্তু বৈদ্য কই?

দেখুন না কবি জয়দেব, চৈতন্য মহাপ্রভু ব্রাহ্মণ। রাজা রামমোহন রায়, শ্রীরামকৃষ্ণদেব, বিদ্যাসাগর মশাই, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, অবধি যত মহৎ ও বিরাট প্রতিভা সবই ব্রাহ্মণ বংশের। আবার কায়স্থ দেখুন মাইকেল মধুসূদন, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, সত্যেন্দ্র বসু প্রমুখ নানা বিষয়ে নানাদিকে প্রতিভাশালী ও যুগন্ধর মহাপুরুষ এঁরাও কায়স্থ কুলতিলক।

এমন কি অন্য নানাস্তরের গুণী প্রতিভাও বদ্যি জাতে পাওয়া যায় না। যেমন ভূদেববাবু, রাজনারায়ণবাবু, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ—এমন কি রেভারেণ্ড কালীমোহন, কৃষ্ণমোহন, লালবিহারী দে, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীদের মতও একটি দীপ্তিমান জীবন বৈদ্যসমাজে পাবেন না। অনেক সময় ব্রাহ্মণ কায়স্থ ছাড়া অন্য জাতিবর্ণেও প্রতিভার স্ফুরণ দেখা গেছে যেমন ব্রজেন্দ্র শীল, মেঘনাদ সাহা এঁরা। কিন্তু বৈদ্যদের মধ্যে সবাই মাঝারি স্তরেরই মানুষ।

বলতে পারেন ভক্ত-কবি রামপ্রসাদ সেন—ঈশ্বর গুপ্ত। কিন্তু তাঁরা কিছুটা অসাধারণ মানুষ হলেও অসাধারণ প্রতিভানন। এদিকের পর্য্যায়ে দেখুন না ভারতচন্দ্র, কবিকঙ্কণ, দাশু রায়কে। জাতিবর্ণ নিয়ে আলোচনা। অস্বস্তি সকলেরই। থেমে গেল। তারপর অজাতশত্রু দাদামশাইয়ের নানারকম আলোচনা এবং সরস স্নিগ্ধ মন্তব্যের (আজ আর মনে নেই) মধ্যে সুরেন্দ্রবাবুর অট্টহাসি ও কথায় রাখালদাসবাবু গম্ভীর স্নিগ্ধ আলাপের মাঝে এসে পড়ে আমার সেই সেদিনের দেখাশোনা শেষ হয়ে গেল।

* * *

তারপর দীর্ঘকালই কেটে গেছে। জীবনপথের আরো জানা অজানা পথে এসেছি গিয়েছি। এইকথা আবার ভেবেছিও।

মনে মনে এবং কখনো সাধারণ ভাবে কারুর সঙ্গে আমারো এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু সত্যই ত্রৈ-

ধরণের লোকোত্তর প্রতিভাবান পুরুষ আমি তো বৈদ্য-সমাজে দেখিনি বলেই মনে হয়।

এমন কি নারী সমাজেও অতি স্বল্প-প্রতিভ নারী জগতেও যে কজন কর্মী, লেখিকা, গুণশালিনী নারী আছেন তাঁরাও ব্রাহ্মণ অথবা কায়স্থ।

স্বর্ণকুমারী, অনুরূপা, নিরুপমা দেবীরা ব্রাহ্মণ। মান-কুমারী, গিরীন্দ্রমোহিনী, প্রসন্নময়ী, প্রিয়ম্বদা, লজ্জাবতী বসু প্রমুখ নারীরা ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ। একালের নানা কবি লেখিকাও প্রায় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ দুহিতা। সীতাদেবী, শান্তাদেবী ব্রাহ্মণ কন্যা।

বলতে পারেন কেউ কেউ—কবি কামিনী রায় এবং কর্মজগতের লেডী বসুর (অবলা বসুর) কথা। এঁরা বৈদ্য কন্যা।

সে যাক্। এই বৈদ্যকন্যার কিন্তু স্বজাতির ক্ষুদ্র এই "মূষিকাঞ্জলির মত প্রতিভা"তে (মহাভারতের বিদুলা উপাখ্যান স্মরণ করুন) মন ভরল না। দেখলাম নেই। প্রতিভা বৈদ্য জাতির নেই।

* * *

খুঁজি 'বৈদ্য বর্ণ বিনির্ণয়' 'জাতিতত্ত্ব বারিধি' 'বল্লাল-মোহমুদ্গার।' বৈদ্যজাতির কত কুলজী কথা। কিন্তু প্রতিভা তো বইয়ের তথ্যের পাতায় লুকিয়ে থাকে না! সে তো স্বপ্রকাশ সূর্য্যের মত।

নাঃ, তারা আমার 'বৈদ্য প্রতিভা নির্ণয়ের মোহমুদ্গার-রূপেই 'লগুড়' নিয়ে আমার কাছে এগিয়ে এলো।

দেখলাম হায়! কোথায় রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, মহা-প্রভু, জয়দেব, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথের মত কেউ? কোনো দিকের কোনো প্রতিভার অতি ক্ষীণ আলোর রশ্মি রেখাটুকুও যেন বৈদ্য জাতির নর-নারীর গায়ে পড়েনি।

* * *

খুঁজে পেতে পেলাম কেশবচন্দ্র সেনকে ধর্মজগতে। কিন্তু দ্রষ্টা ও বিরাট যুগোত্তর লোকোত্তর পুরুষ খুঁজছিলাম।

পেলাম বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অনুসন্ধিৎসু অসাধারণ কর্মী গুণী ও গুণগ্রাহী পুরুষ দীনেশচন্দ্র সেনকে। কিন্তু মন বলল স্রষ্টা কই? এতো তথ্য ও তত্ত্ব।

এত নানা ভাবের ঐশ্বর্য্য নিয়ে উৎসবময় সাহিত্য প্রাঙ্গণে ধর্মকর্মের সাধনার জগতের বিরাটের প্রাঙ্গণে বৈদ্য প্রতিভা কই? সবাই ব্রাহ্মণ! সবাই কায়স্থ!

সহসা দেখলাম বৈদ্য জাতির নিজের প্রতিভা নেই বটে, কিন্তু তাঁরা প্রতিভা চেনেন। প্রতিভার পূজা করেন। করতে পারেন। অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাময় অকপট গুণ মুগ্ধ সে পূজা, পূজারিণী নারীর মত।

দেখতে পেলাম চৈতন্যদেবের পাশের কবিরাজ গোস্বামী, মুরারী গুপ্তকে।

দেখলাম শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের সঙ্গে গভীর শ্রদ্ধাবান ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনকে—নীরব আত্মপ্রচারহীন ভক্ত, 'কথামৃত'কার মাষ্টার মশাই শ্রীম'কে।'

পরমপুরুষের ও নানা মহাত্মার জীবনীকার শ্রীঅচিন্ত্য সেনগুপ্তকে।

দেখি, শ্রীমধুসূদন ও বিবেকানন্দ জীবন আলোচক বিশ্লেষক শ্রদ্ধাবান কবি মোহিতলাল মজুমদারকে।

দেখতে পেলাম রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনে ও শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগে—কবির নীরব ভক্ত, কবির পরমঅনুরাগী অধ্যাপক মোহিতচন্দ্র সেনকে। দেখলাম সাধক-সন্ত কথায় আশ্চর্য কলাকার ক্ষিতিমোহন সেনকে।

নারী যেমন পরম অবনম্রতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রতি-যোগিতাহীন গুণগ্রাহিতায় মহত্তর পরমের পূজা করেন, মহৎ ও মহত্ত্বকে শ্রদ্ধা করেন, বৈদ্যজাতি যেন তাই করে চলেছেন একান্ত আত্মবিস্মৃতভাবে! অন্যকে মহৎকে প্রচার ও পূজা করেই কি তাঁর তৃপ্তি?

... ...

সকৌতুকে সঙ্গোপনমনে এলো কমলাকান্তের একটি অমর উক্তি। সেই উক্তি একটু পরিবর্ত্তন করে বোধহয় বলা যায় "বৈদ্যপতির বিদ্যাবুদ্ধি বুঝি নারিকেলের মালার মত আধখানা। কখনো পরিপূর্ণ দেখিলাম না।"

বন্দেমাতরম

শ্রীজ্ঞান

দানবদলনী, মহিষমর্দ্দিনী দেবী দুর্গার মহাপূজার সময় এল। কিন্তু এবারকার পূজা অন্য বারের মতন হবে না। এবারের পূজায় থাকবে না জাঁকজমক, দেখা যাবে না আলোর ঝল্‌কানি, হবে না সাজের বাহার—শুধু থাকবে ঐকান্তিক ভক্তি ও একাগ্রতা দিয়ে মহাশক্তির আরাধনা ও আবাহন। শক্তিরূপিনী দেবী দুর্গার কাছে শুধু অজুতকণ্ঠে প্রার্থনা ধ্বনিত হবে—শক্তি দাও, সাহস দাও, শৌর্য্য দাও, আর দান কর বিজয়! শত্রুকে দমন করে, হনন করে যেন আমরা বিজয়ী হতে পারি! শত্রুর আসুরিক শক্তিকে পরাজিত করে যেন আমাদের দেবশক্তি জয়ী হয়! স্থায়ী শান্তি যেন ফিরে আসে আমাদের দেশে!

ভারতকে খণ্ডিত করে এক বিশেষ ধর্ম্মের ধ্বজা তুলে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে 'পাকিস্তান' নামক যে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছিল, তা ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ, জোট-নিরপেক্ষ, শান্তিতে বিশ্বাসী এই অহিংস ভারতকে গত আঠার বৎসর যাবৎ নানা ভাবে উত্যক্ত করে, শেষে সশস্ত্র বাহিনী লেলিয়ে দিয়ে যুদ্ধ আরম্ভ করেছে! এতদিন ধরে তাদের নানা অত্যাচার সহ্য করে দেশের স্বাধীনতাকে আজ বিপন্ন হতে দেখে ভারত আজ অস্ত্রধারণ করতে বাধ্য হয়েছে, বাধ্য হয়েছে দুর্বিনীত শত্রুকে শিক্ষা দিতে, সায়েস্তা করতে। ভারতের সহিষ্ণুতার ও শান্তিকামিতার সুযোগ নিয়ে এতদিন ধরে পাকিস্তান যে অন্যায়, যে অত্যাচার, যে অশিষ্ট আচরণ করে এসেছে, তার সমুচিত জবাব দেবার একান্ত দরকার হয়ে পড়েছে বলে ভারতের বীর বাহিনী আজ রণক্ষেত্রে এগিয়ে চলেছে, ঝাঁপিয়ে পড়েছে বৈদেশিক অস্ত্র-সাহায্যপুষ্ট উদ্ধত, আত্মম্ভরি শত্রুর বুকের ওপর দুর্জ্জয় শক্তিতে। ভারতের সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় প্রধান মন্ত্রী ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় ও বিশেষ করে ভারতের স্থলবাহিনী ও বিমান বাহিনীর বীরশ্রেষ্ঠ সর্ব্বাধিনায়কদ্বয়ের সুপরিকল্পিত সুপরিচালনায় ভারতের স্থল ও বিমান বাহিনী প্রচণ্ড শক্তিতে শত্রুকে আঘাত হেনেছে, আর সে ভীম আঘাত সহ্য করতে না পেরে বিদেশী সাহায্যপুষ্ট শত্রুসেনা রণে ভঙ্গ দিয়ে পশ্চাদপসরণ করছে, আর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য হীন উপায়ে ভারতের অসামরিক অধিবাসীদের ওপর কাপুরুষের মতন বোমা বর্ষণ করে চলেছে। শুধু তাই নয়, অবস্থা সঙ্গীন দেখে এখন শত্রুপক্ষের নায়করা তাদের আর এক মুরুব্বি, ভারতের আর এক মহাশত্রু, চীনকে তাদের সাহায্য করবার জন্যে ডাকছে। আর সেই ডাকে সাড়া দিয়ে চীনও ভারতকে অসুবিধায় ফেলবার জন্য ও পাকিস্তানের ওপর ভারতীয় বাহিনীর চাপ কমাবার জন্য ভারতের পূর্ব্ব-সীমান্তে সিকিমরাজ্যে ও লাদাকে আক্রমণ চালাবার জন্য উদ্যত হয়ে আছে।

আর শুধু সুবিধা বুঝে ভারতের ওপর হামলা করাতেই চীনের চাতুরীর শেষ নয়, পাকিস্তানকে ভারত আক্রমণে

প্ররোচিত করবার পর এখন সে লুকিয়ে অস্ত্রশস্ত্র দিয়েও যে পাকিস্তানকে সাহায্য করছে তার প্রমাণও পাওয়া গেছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে পাওয়া পাকিস্তানের বিরাট অস্ত্রভাণ্ডার আজ শূন্য প্রায়। ভারতের দুর্দ্ধর্ষ স্থল ও বিমান বাহিনীর প্রচণ্ড আঘাতে তার বিরাট ও দুর্ভেদ্য সাঁজোয়া বাহিনীর অধিকাংশ "ট্যাঙ্ক" আজ ক্ষতিগ্রস্ত ও শব্দের চেয়ে দ্রুতগতি সম্পন্ন 'স্যাবর' জেট বিমান বহরের বহু বিমান ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। দুর্দ্ধর্ষ ভারতীয় জওয়ানদের 'ট্যাঙ্ক' ধ্বংসী কামানের গোলায় ও দুঃসাহসী ভারতীয় বৈমানিকদের ভারতে তৈরী 'ন্যাট' বিমানের আক্রমণে পাকিস্তানের ট্যাঙ্ক ও বিমানবাহিনী আজ পঙ্গু হয়ে পড়েছেই শুধু নয়, এখন তারা আক্রমণ ছেড়ে আত্মরক্ষায় ব্যাপৃত রয়েছে! আমেরিকায় তৈরী তথাকথিত দুর্ভেদ্য যে 'প্যাটন' ট্যাঙ্কের শক্তিতে ও আমেরিকার অতি দ্রুতগতি সম্পন্ন 'স্যাবর' জেট বিমানের গর্ব্বে পাকিস্তান বাহিনী মোহান্ধ ও উদ্ধত হয়ে উঠেছিল, আজ ভারতীয় স্থল ও বিমান বাহিনীর পাল্টা মারে তাদের সে মোহ ভঙ্গ হয়েছে—কাশ্মীর বিজয়ের স্বপ্ন তাদের শেষ হয়ে গেছে। এখন পাকিস্তান শেষ রক্ষা করবার জন্য তাদের উস্কানিদাতা মুরুব্বি চীনের দ্বারস্থ হয়েছে। কম্যুনিষ্ট চীনও এই সুযোগে একনায়কতন্ত্রী, ধর্ম্মান্ধ ও 'সিটো,' 'সেন্টো,' 'ন্যাটো' প্রভৃতি পশ্চিমী জোটবদ্ধ পাকিস্তানের সঙ্গে জোট মেলাতে কিছুমাত্র দ্বিধা না করে ভারতের ওপর হামলা চালাবার জন্য উদ্যত হয়ে রয়েছে। ভারতের বীর বাহিনীও অবশ্য তার মোকাবিলা করবার জন্যে তৈরী হয়ে রয়েছে।

দেশের এই সংকটকালে যুদ্ধ ক্ষেত্রে জওয়ানদের শক্তি যোগাতে আজ সকলকেই একতাবদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসতে হবে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করতে। তোমরাও চেষ্টা কর সক্রিয় ভাবে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় সাহায্য করবার। পূজার খরচ বাঁচিয়ে প্রতিরক্ষা তহবিলে দান কর। তোমাদের এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানও একত্র হয়ে শক্তি যোগাবে যুদ্ধরত জওয়ানদের। ক্ষুদ্র হোক, বৃহৎ হোক যে কোনও রকমের সাহায্যই আজ দেশের দরকার। তোমাদের শক্তিকেও তোমরা ক্ষুদ্র ভেব না। রামায়ণে আছে যখন শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কায় যাবার জন্য সমুদ্রের ওপর সেতু নির্ম্মাণ করছিলেন, তখন যে যেভাবে পারে সেই ভাবে তাঁকে সাহায্য করেছিল, এমন কি ক্ষুদ্র কাঠবিড়ালীরাও তাদের সর্ব্বাঙ্গে করে ধুলা বয়ে নিয়ে এসে নির্ম্মিয়মাণ সেতুর ওপর তাদের আস্তরণ বিছিয়ে দিয়ে সেতু নির্ম্মাণে সাহায্য করেছিল। শ্রীরামচন্দ্র কাঠবিড়ালিদের এই প্রচেষ্টাকে সশ্রদ্ধচিত্তে অভিনন্দিত করেছিলেন।

এই যুদ্ধকালিন অবস্থায় অশান্ত ও বিক্ষুব্ধ পরিবেশে এবছরের মহাপূজার আয়োজন হচ্ছে। মনে হচ্ছে এই বোধ হয় মহাশক্তির, মহাদেবী দুর্গার বোধনের প্রকৃষ্ট সময়। সুদূর অতীতে ত্রেতা যুগে শ্রীরামচন্দ্র এই দেবী দুর্গার বোধন করেছিলেন লঙ্কার সমুদ্র সৈকতে রাক্ষস রাবণকে সংহার করবার জন্যে। আজও সেই সময় এসেছে, সেই অসুর শক্তি জাগ্রত হয়েছে। সেই শত্রুকে, সেই দুষমনকে ভীম আঘাত হানবার জন্যে অসুরনাশিনী দেবী দুর্গার আবাহন করে, আরাধনা করে বর চাইতে হবে—চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য প্রার্থনা করতে হবে। আসমুদ্র হিমাচলের জাগ্রত জনতা আজ সেই প্রার্থনাই করছে, তোমরাও তার সঙ্গে যোগ দাও। আর ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের সেই অমর মন্ত্র "বন্দেমাতরম"কে স্মরণ করে দেবী দুর্গার সামনে সমস্বরে গেয়ে ওঠ,—

সপ্তকোটিকণ্ঠ কলকলনিনাদ করালে,
দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃতখর করবালে,
অবলা কেন মা এত বলে।
বহুবলধারিণীং
নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং
মাতরম।

বল,—

বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমল-দলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী
নমামি ত্বাং।

আর সমস্বরে বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে দেবীদুর্গা ও ভারতমাতার বন্দনা করে উচ্চারণ কর "বন্দেমাতরম" ধ্বনি।

***

সমুদ্রের এক বিচিত্র প্রাণী

গৌর আদক

তোমাদের মধ্যে প্রায় অনেকেই পুরীর সমুদ্র দেখেছ। সমুদ্রের তীর থেকে দাঁড়িয়ে দেখলে কি মনে হয়, যেন একটি বিরাট জলরাশি পৃথিবীকে ঘিরে আছে। তীরের উপর থেকে শুধু ঐ জলরাশি আর তার এক একটি বিরাট বিরাট ঢেউ ছাড়া আর বিশেষ কিছুই আমাদের চোখে পড়ে না। কিন্তু ঐ বিরাট জলরাশির ভিতরে কি বিরাট ব্যাপারই না চলেছে, তা তোমরা না দেখলে ভাবতে পারবে না। ছোট বড় নানান রকমের প্রাণী ঘুরে বেড়াচ্ছে ঐ জলের তলায়। সেই সমস্ত প্রাণীর চেহারা আর জীবন যাত্রা দুই-ই অদ্ভুত। ঐ অদ্ভুত রকমের এক প্রাণীর কথাই আজ তোমাদের কাছে বলবো।

সমুদ্রের বেশ কিছুটা নিচে গেলে এক রকম প্রাণী দেখা যায়, নাম তার "জলের জঙ্গল"। নামটা তোমাদের কাছে বেশ একটু অদ্ভুত লাগছে, তাই নয়? তবে এই রকম অদ্ভুত অদ্ভুত নামের প্রাণী প্রচুর আছে সমুদ্রের তলায়। অদ্ভুত প্রাণীদের মধ্যে "জলের জঙ্গল"ও একটি। এদের দূর থেকে দেখলে ঠিক মনে হয় যেন নানান রকম গাছের একটি জঙ্গল হয়ে আছে, কিন্তু আসলে ওটা গাছের জঙ্গল নয়, তারা এমন ভাবে বসে থাকে যেন মনে হয় একটি গাছের জঙ্গল হয়ে আছে।

এই সমস্ত প্রাণীর চেহারা এবং জীবন যাত্রা দুই-ই অদ্ভুত। এদের শরীর অন্যান্য প্রাণীদের মতন রক্ত মাংসে গড়া নয়। তবে লেজের দিকটায় সামান্য কিছু আছে। এছাড়া প্রায় সমস্তটাই কাদা। এক জায়গায় এমন ভাবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে যে, দেখলে মনে হয় যেন কত শান্তশিষ্ট। কিন্তু ঐ শান্তশিষ্ট ভাবে দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যেই যত সব কলা-কৌশল। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বটে, কিন্তু সব সময়ই শিকার খুঁজতে ওরা ব্যস্ত থাকে। শিকার খোঁজার ব্যাপারটাও একটু অদ্ভুত! এক একজন এক একটি ফাঁদ পেতে রাখে। ফাঁদগুলিও একটু বিচিত্র ধরণের। যেমন কোনটার গায়ে মনে হয় যেন ফুল ফুটে আছে; যদি কোন প্রাণী ঐ ফুলের কাছে যায়, যাওয়া মাত্রই সেই ফুলের মতন ফাঁদটি তাকে হিংস্র ভাবে ভক্ষণ করে। আবার ধর, কেউ বা একটি জলের স্রোত তৈরী করে বসে আছে। সেই স্রোতের মুখে ছোট ছোট প্রাণীরা পড়লে তারা বড় অসহায় হয়ে পড়ে এবং স্রোতের টানে একেবারে এদের পেটের ভিতর চলে যায়। আবার কেউবা একটি স্প্রিংওয়ালা চাবুক তৈরী করে রেখেছে। যেই শিকার কাছে আসে অমনি তাকে চাবুক দিয়ে মেরে জখম করে ফেলে তাকে মনের সুখে আহার করে।

এই প্রাণীগুলি দিনের পর দিন এরকম করেই তাদের জীবন অতিবাহিত করে চলেছে। ভাবো তো, কত আনন্দেই না আছে "জলের জঙ্গল" ঐ বিচিত্র প্রাণীগুলো।

জর্জ এলিয়ট
রচিত

সাইলাস মারনার
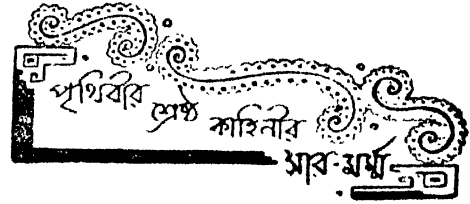
সৌম্য গুপ্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

খৃষ্টমাস-পর্বোপলক্ষে সারা রাভেলো গ্রাম আনন্দোৎসবে মাতোয়ারা। জমিদার ক্যাসের 'রেড-হাউস' ভবনেও সাড়ম্বরে সাজানো, ভূরিভোজ, পান ভোজন আর নৃত্য-গীত-বাদ্যের বিরাট আসর...। রাভেলোর বাসিন্দারাই নয়, জমিদার বাড়ির এই সাংবৎসরিক উৎসব-অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সপরিবারে নিমন্ত্রিত হয়ে আসতেন আশপাশের অন্য আরো পাঁচ সাতখানা গ্রামের বহু বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি, আত্মীয়-বন্ধু, চেনা-অচেনা নানান অতিথি-অভ্যাগতের দল। বছরের পর বছর পুরুষানুক্রমে, এই রীতিই চলে আসছে রাভেলো গ্রামের জমিদার বাড়িতে। নববর্ষের সন্ধ্যায় এই সব নিমন্ত্রিত অতিথি-অভ্যাগতদের সাদর-সম্বর্দ্ধনার উদ্দেশ্যে, প্রতি বছরই 'রেড-হাউস' ভবনে ভূরি-ভোজন আর নাচ গান-আনন্দোৎসবের যে বিরাট অনুষ্ঠানের আয়োজন হতো, সেটি ছিল জমিদার ক্যাসের বিশেষ গর্ব্বের ও আত্মপ্রসাদের বিষয়। তাই অন্যান্য বছরের মতো এবারের নববর্ষোৎসবটিকেও সর্বাঙ্গীণ-সার্থক করে তোলার জন্য জমিদার ক্যাস্ স্বয়ং সোৎসাহে তাঁর ভাই কিম্বল্ এবং বড় ছেলে গডফ্রে আর অসুর-

কর্ম্মচারীবৃন্দের সহযোগিতায় প্রচুর অর্থব্যয়ে অতিথি-সম্বর্দ্ধনার বিপুল আয়োজন করেছিলেন 'রেড-হাউস' ভবনে। এবারের নবসংবৎসর-অনুষ্ঠানের আয়োজনে জমিদার ক্যাস্ এবং তাঁর বড় ছেলে গড্‌ফ্রের এতখানি আগ্রহ দেখা দিয়েছিল—বিশেষ একটি কারণে। অর্থাৎ, গডফ্রের মনে মনে বাসনা ছিল—তাদের পাশের গ্রামের বোনেদী-পরিবারের রূপসী-তরুণী মিস্ ন্যান্সী ল্যামিটারকে বিবাহ করবে এবং সে স্পষ্টই জানতো যে জমিদার ক্যাস্‌ও এ বিষয়ে এতটুকু ওজর-আপত্তি তুলবেন না। তবে গডফ্রের আশঙ্কা ছিল—হয়তো তার মেজোভাই ডান্‌সি হতভাগা এ বিবাহে বাধা দেবে···যে বেয়াড়া-বেপরোয়া বাউণ্ডুলে-বদমায়েশ লোক ড্যান্‌সি···কখন যে টাকার লোভে বদখেয়ালীর ঝোঁকে আচমকা কি সর্ব্বনাশ করে বসবে—তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই! তাছাড়া ড্যান্‌সি হতভাগা আবার গড্‌ফ্রের এমন কয়েকটা গোপন-কীর্ত্তিকলাপ আর কেলেঙ্কারীর কাহিনী জানে যে হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় কারো কাছে সে সব ফাঁশ করে দিলেই, ন্যান্সী ল্যাটিমারকে বিবাহ তো দূরের কথা, গড্‌ফ্রে বেচারীর পক্ষে শেষ পর্য্যন্ত সমাজে বাস করাও নিতান্ত অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে এবং সেই সঙ্গে পৈত্রিক জমিদারী-লাভের আশাও তাকে ত্যাগ করতে হবে—চিরদিনের মতোই! তবে সৌভাগ্যক্রমে আপাততঃ সুবিধাটুকু এই যে—ড্যান্‌সি হতভাগা কয়েক মাস হলো গ্রাম থেকে নিরুদ্দেশ···ফেরারী হয়ে কোথায় কোন্ অজানা জায়গায় বাস করছে, কেউ তার কোনো সঠিক সন্ধান জানে না! ···কাজেই এই সুযোগে···ড্যান্‌সি হতভাগা গ্রামের বাইরে থাকতে থাকতেই গড্‌ফ্রে যদি ন্যান্সী ল্যাটিমারকে প্রস্তাব জানিয়ে বিবাহ করতে পারে···তাহলে হয়তো বিপদ তেমন সঙ্গীন হয়ে উঠবে না! বিবাহের পর, ড্যান্‌সি হতভাগা যদি কোনোদিন আবার এ গ্রামে ফিরে এসে গোলমাল বাধিয়ে বসে, তাহলে তখন না হয় তাকে আগের মতোই বেশ কিছু মোটা টাকা ঘুষ দিয়ে বশ করে হাতের মুঠোয় আটকে রাখলেই চলবে! গোপন-কথাও ফাঁশ হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকবে না তেমন বিশেষ।

জমিদার-বাড়ির উৎসব-সমারোহের বিপুল-আয়োজনের মাঝে এমনি নানান্ চিন্তায়-উদ্বেগে গড্‌ফ্রের মন সেদিন রীতিমত চঞ্চল হয়ে উঠলো···ন্যান্সী ল্যাটিমারের সঙ্গে কখন তার দেখা হবে···কতক্ষণে তাকে বিবাহের প্রস্তাব জানাবে—এই ভাবনাতেই সে সারাক্ষণ অধীর-ব্যাকুল।

গড্‌ফ্রের মন যখন ড্যান্‌সির কুৎসা-রটানোর দুর্ভাবনা আর ন্যান্সী ল্যাটিমারের সঙ্গে বিবাহের চিন্তায় বিভোর, ঠিক সেই সময়ে শীতের প্রচণ্ড তুষার পাতের মধ্যেই রাভেলো গ্রামের প্রান্তে নিরালা-নির্জ্জন পথে ক্লান্ত-শ্রান্ত-অবসন্নভাবে দূরে লাল-রঙের পাঁচিলে-ঘেরা জমিদার-বাড়ির পানে এগিয়ে চলেছিল—জীর্ণ-মলিন পোষাক-পরা এক শীর্ণকায়া তরুণী···তার কোলে ছেঁড়া-কম্বলের টুকরোতে জড়ানো ফুলের মতো অপরূপ ফুটফুটে-সুন্দর ছোট্ট একটি ঘুমন্ত শিশু-কন্যা। তরুণীর নাম—মলি···সে আসলে হলো—রাভেলো গ্রামের জমিদার ক্যাসের বড় ছেলে গড্‌ফ্রের স্ত্রী এবং তরুণীর কোলের ঘুমন্ত শিশু-কন্যাটি হলো—গড্‌ফ্রেরই সন্তান। বছর কয়েক আগে, নিরীহ-সরল গড্‌ফ্রে বেচারী নিজের ক্ষণিক দুর্ব্বলতার মোহে জমিদার বাড়ির এবং গ্রামের লোকজন সকলের অজ্ঞাতসারে গোপনে বিবাহ করেছিল ভিন-গাঁয়ের এই নগণ্য সাধারণ দীন-দরিদ্র অনাথা-তরুণী মলিকে···কেবলমাত্র ড্যান্‌সি ছাড়া রাভেলো কিম্বা আশপাশের গ্রামের কেউই এ বিবাহের কোনো খবরই জানতো না এতটুকু। কারণ, গ্রামের লোকজন সকলেরই ধারণা ছিল যে জমিদার-বাড়ির মেজ ছেলে ড্যান্‌সি বেয়াড়া-বদমায়েশ-বাউণ্ডুলে বটে, কিন্তু তার বড় ভাই গড্‌ফ্রে একটি আদর্শ-পুরুষ···যেমন সুসভ্য-মার্জ্জিত-সুন্দর গড্‌ফ্রের আচার-ব্যবহার, তেমনি নিরীহ-সরল-নিষ্পাপ-নির্ম্মল তার স্বভাব-চরিত্র। কাজেই গড্‌ফ্রের মতো বোনেদী-ঘরের খাঁটি-চরিত্রের মানুষ যে গোপনে মলির মতো সামান্য মেয়েকে বিবাহ করেছে, এ সন্দেহের বিন্দুবাষ্পও গ্রামের লোকজনদের কারো মনে কখনো ঠাঁই পায়নি কোনোদিন। গড্‌ফ্রে বেচারীও তাই ক্ষণিক দুর্ব্বলতার ঝোঁকে গোপনে মলিকে বিবাহ করে ফেললেও, লোক-লজ্জা আর সামাজিক কুৎসা-কলঙ্ক, নিন্দা-অপমানের গ্লানি থেকে রেহাই পাবার উদ্দেশ্যে এ বিবাহের কথা আর

ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করেনি কারো কাছে কোনোদিন। গড্‌ফ্রের এই অদ্ভুত আচরণের ফলে, মলির মনে কিন্তু ক্রমেই রীতিমত আক্রোশ আর ক্ষোভের ভাব সৃষ্টি করে তুলেছিল···বিশেষতঃ শিশু-কন্যাটির জন্মের পর মলি যখন বার-বার গড্‌ফ্রের কাছে প্রস্তাব করেছিল যে তাদের গোপনে বিবাহের কথা এবার প্রকাশ্যে সবাইকে জানিয়ে জমিদার-পরিবারে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ দিতে, তখন গড্‌ফ্রে সদর্পে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার ফলে মলির মনোভাব আরো বেশী ক্ষিপ্ত-উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। মলি মনে মনে মতলব এঁটেছিল যে গড্‌ফ্রের এই অপমান-অবহেলার চূড়ান্ত প্রতিশোধ নেবে সে এবার নববর্ষের উৎসবের দিনটিতে রাভেলো গ্রামের জমিদার বাড়িতে শিশু-কন্যাকে কোলে নিয়ে সশরীরে সটান গিয়ে হাজির হবে—লোকজন সবাইকার সামনে···সভার ভীড়ে সকলের কাছে নিজের মুখে খোলাখুলিভাবে গড্‌ফ্রের সঙ্গে তার গোপনে বিবাহের কথা·····—ছোট এই শিশু-কন্যার আসল পরিচয়—সব কিছুই জানিয়ে দেবে গ্রামের ছোট-বড় প্রত্যেকটি মানুষকে !···

কিন্তু মলির মনের এই তীব্র বাসনা শেষ পর্য্যন্ত আর মিটলো না! কারণ, মলির ছিল—আফিম খাওয়ার বেয়াড়া নেশা···এই নেশাই অবশেষে তার পক্ষে কাল হয়ে দাঁড়ালো !

[ক্রমশঃ

— –

চিত্রগুপ্ত
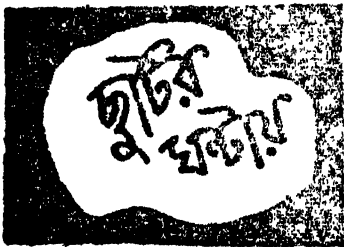
এবারে শোনো—বিজ্ঞানের আরেকটি বিচিত্র মজার খেলার কথা।

দৈনিক আবহাওয়ার অবস্থা কেমন—অর্থাৎ, দিনটি শুকনো-গরম অথবা স্যাঁৎসেঁতে-ঠাণ্ডা ধরণের, সেটির সঠিক-আন্দাজ পাবার জন্য সচরাচর বিশেষ-ছাঁদের 'থার্মোমিটার' (Thermometer) বা 'তাপমাত্রা-পরীক্ষার' যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। তোমরা অনেকেই হয়তো এমনি ধরণের দৈনিক আবহাওয়ার তাপমাত্রা পরীক্ষার 'থার্মোমিটার' যন্ত্র দেখেছো। কিন্তু এ সব 'থার্মোমিটার' ব্যবহার না করেও, আরেকটি অভিনব উপায়ে তোমরা খুব সহজেই এবং দিব্যি অনায়াসেই দৈনিক আবহাওয়া শুকনো গরম অথবা ঠাণ্ডা-স্যাঁৎসেঁতে রয়েছে কিনা সঠিকভাবেই জানতে পারো। আপাততঃ, দৈনিক আবহাওয়া সঠিকভাবে জানবার সেই অভিনব-উপায়টির কথা বলি। তবে এ উপায়ে আবহাওয়ার তাপমাত্রা পরখ করে দেখতে হলে অবশ্য গোটাকয়েক সাজ-সরঞ্জাম জোগাড় করা প্রয়োজন তার একটা মোটামুটি ফর্দ্দ তোমাদের গোড়াতেই জানিয়ে রাখি। অর্থাৎ, আজব-মজার এই কারসাজি দেখানোর জন্য চাই—কাঁচের আবরণ-বিহীন একখানি রঙীন ছবি, (coloured picture) একখানা ব্লটিং-কাগজ (Blotting paper), এক পাত্র পরিষ্কার জল, খানিকটা গুঁড়ো নুন, (cooking salt) এবং অল্প একটু 'কোবাল্ট-ক্লোরাইড্' (Cobalt chloride)। 'কোবাল্ট-ক্লোরাইড্' ছাড়া বাকী সামগ্রীগুলি সংগ্রহ করা কঠিন কাজ নয়। 'কোবাল্ট-ক্লোরাইড' পদার্থটি তোমরা বাজারে যে কোনো ভালো রাসায়নিক ওষুধের দোকানে কিনতে পাবে। রঙীন-ছবিটি কিন্তু নীল-রঙের আকাশ, নীল-রঙের পাহাড় আর নীল-রঙের জল আঁকা প্রাকৃতিক-দৃশ্য সম্বলিত হলেই ভালো হয়।

এ সব সামগ্রী সংগ্রহ হবার পর, খেলার কায়দা পরখ করে দেখবার আগেই পাত্রের জলে চায়ের চামচের দুই চামচ পরিমাণে 'কোবাল্ট ক্লোরাইড' আর চায়ের চামচের এক-চামচ পরিমাণে গুঁড়ো-নুন মিশিয়ে আগাগোড়া বেশ ভালোভাবে 'তরল-মিশ্রণ' বানিয়ে নিতে হবে। তারপর সেই 'তরল-মিশ্রণে' আনকোরা শাদা ব্লটিং-কাগজখানিকে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখো। 'তরল-মিশ্রণে' ব্লটিং-কাগজখানিকে এভাবে ভিজিয়ে রাখার ফলে, ভিজা-ব্লটিং-কাগজের ধবধবে-শাদা রঙ ক্রমেই গোলাপী-বর্ণের হয়ে উঠবে। বিজ্ঞানের বিচিত্র রাসায়নিক-প্রক্রিয়ায় 'তরল-মিশ্রণে'

ভিজানো ব্লটিং-কাগজের রঙ গোলাপী হয়ে উঠলেই, সেটিকে সাবধানে জলের পাত্র থেকে তুলে রৌদ্র-তাপে কিম্বা উনানের আঁচের পাশে রেখে আগাগোড়া বেশ ভালোভাবে শুকিয়ে নিতে হবে। এভাবে শুকিয়ে নেবার সময় তোমরা দেখে অবাক হবে যে বিজ্ঞানের বিচিত্র-নিয়মে ভিজা ব্লটিং-কাগজখানির গোলাপী-রঙ ক্রমেই বদলে গিয়ে আগাগোড়া বেশ নীল-বর্ণের হয়ে উঠেছে।
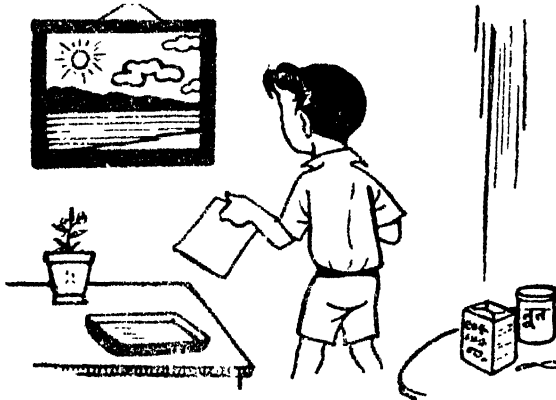
বিজ্ঞানের বিচিত্র-রহস্যময় ঠিক এমনি রীতি অনুসরণে তোমরা 'থার্মোমিটার' বা 'তাপ-মাত্রা' পরীক্ষার যন্ত্র না কিনেও সহজে এবং সঠিক ভাবেই দৈনিক-আবহাওয়ার অবস্থা জানতে পারবে। অর্থাৎ, এবারে উপরের নক্সাতে যেমন দেখানো হয়েছে, দেয়ালের গায়ে টাঙানো কাচের আবরণ-বিহীন (Without glass covering) তেমনি-ধরণের নীল রঙের আকাশ নীল রঙের পাহাড় আর নীল রঙের জল আঁকা চমৎকার একখানি প্রাকৃতিক দৃশ্যের নক্সাদার-ছবির নীল রঙের জায়গাগুলির উপরে সযত্নে সেঁটে বসিয়ে দাও ঐ 'তরল-মিশ্রণে' ভিজানো গোলাপী রঙের ব্লটিং-কাগজের টুকরো। তাহলেই কিছুক্ষণ বাদেই আলো-বাতাসের সংস্পর্শে এসে, গোলাপী রঙের ঐ ভিজা ব্লটিং-কাগজের টুকরো ক্রমশঃ শুকিয়ে গিয়ে নীল রঙে রূপান্তরিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তোমরা সুস্পষ্টভাবে জানতে পারবে যে দৈনিক আবহাওয়ার অবস্থা বেশ গরম ও শুকনো ধরণের হয়েছে। কিন্তু, দৈনিক আবহাওয়ার অবস্থা যদি ভিজা ও স্যাঁৎসেঁতে ধরণের থাকে তাহলে ঐ দেয়ালে-টাঙানো ছবির নীল-রঙের জায়গাগুলিতে তোলা 'তরল-মিশ্রণে'-ভিজানো ব্লটিং-কাগজের টুকরোর আগের মতো তাড়াতাড়ি শুকিয়ে নীল-রঙে রূপান্তরিত না হয়ে বরং আরো বেশীক্ষণ গোলাপী আভায় রঙীন থাকবে। তাই দেখেই তোমরা অনায়াসে আন্দাজ করতে পারবে যে দৈনিক আবহাওয়ার অবস্থা কেমন, তাপমাত্রা কতখানি, এবং দিনটি শুকনো গরম কিম্বা স্যাঁৎসেঁতে-ভিজা ধরণের কিনা।

এই হলো—বিজ্ঞানের অভিনব-উপায়ে বিচিত্র রাসায়নিক-প্রক্রিয়ায় দৈনিক আবহাওয়ার অবস্থা পরখ করে দেখার মোটামুটি নিয়ম।

এবারে এই পর্যান্তই। পূজোর ছুটিতে এ খেলাটি তোমরা নিজেরাই হাতে-কলমে পরীক্ষা করে দেখো আগামী সংখ্যায় এমনি ধরণের আরেকটি বিচিত্র-অভিনব বিজ্ঞানের খেলার কথা বলবো তোমাদের।

মনোহর মৈত্র

১। রেখা সাজানোর আজব হেঁয়ালি :
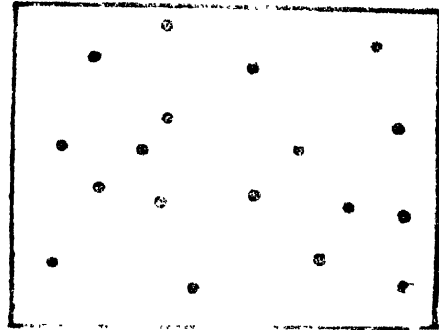
উপরের চৌকোণা-নক্সাটির ভিতরে এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে রয়েছে মোট আঠারোটি কালো-বিন্দু। এই আঠারোটি কালো বিন্দুকে যথাস্থানে বজায় রেখে এমন কায়দায় মাত্র ছয়টি সরল-রেখা (Straight line) এঁকে সাজাও, যে উপরের কালো বিন্দুগুলির প্রত্যেকটি যেন স্বতন্ত্র-ঘরে বিভক্ত করে বসানো থাকে। তোমাদের মধ্যে যারা, এ হেঁয়ালির সঠিক-সমাধান করে, সেটির প্রতিলিপি এঁকে সটান আমাদের দপ্তরে পাঠিয়ে দিতে পারবে, আগামী কার্ত্তিক সংখ্যায় আমরা ছাপার হরফে তাদের প্রত্যেকের নাম-ধাম প্রকাশ করে সবাইকে জানিয়ে দেবো।

২। 'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা :

গ্রামের জমিদারবাবুর ছেলের অন্নপ্রাশন···ভূরি-ভোজের বিরাট আয়োজন। নানা রকমের বড়-বড় মাছ কুটছে জেলে-বৌয়েরা। তাদের দলের একজন জেলে-

বৌ হঠাৎ একটা বড়-মাছের পেট কেটেই হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠলো। আচম্‌কা তার কান্নার আওয়াজে—"কি হলো…কি হলো!"…সোরগোল তুলে সবাই রীতিমত ব্যস্ত হয়ে উঠলো। লোকজনের প্রশ্নের জবাবে জেলে-বৌ বললে,—মাছটার পেট কেটে দিতেই, সেটা অমনি শোঁ করে দিব্যি পাখা মেলে আকাশে উড়ে গেল! ও মা, কি হবে বলো তো গো!"

জেলে-বৌয়ের কথা শুনে লোকজন সবাই অবাক হয়ে আকাশের পানে তাকিয়ে দেখলো—বাস্তবিকই মাথার উপরে পাখা মেলে উড়ে চলেছে খুবই পরিচিত বিশেষ একজাতের একটি পাখী। এ দৃশ্য দেখে, গোড়াতে ঠিক ঠাওর করতে না পারলেও, খানিকবাদেই চিন্তা করে লোকজনেরা বুঝলো যে জেলে-বৌ বেশ মজার একটা হেঁয়ালি ফেঁদেছে তাদের কাছে…অর্থাৎ, মাছের নামটি আসলে কি—তাই নিয়েই ফেঁদে বসেছে সে এই আজব হেঁয়ালি।…তোমরা কেউ বলতে পারো—জেলে-বৌয়ের সেই মাছের নামটি আসলে কি ছিল?

রচনা : শিখা বাগচী (কলিকাতা)

৩।

চার অক্ষরে নাম মোর—
অস্ত্র ক্ষুরধার!
শেষ দুই অক্ষর বাদে,
বুঝায় পশু এক।
মাঝের দুই আখর গেলে,
বনি অলঙ্কার।
খুঁজে পেতে আসল নাম—
ভেবে-চিন্তে দেখ!

রচনা : নবকুমার শামমল (চেতুয়া রাজনগর)

গতমাসের ধাঁধা ও হেঁয়ালীর উত্তর :

১। আগাগোড়া ভালভাবে গুণে-গেঁথে হিসাব করে দেখলে—মোট চৌকোণা-ঘরের সংখ্যা হবে প্রায় বত্রিশটি।

২। কুশল

৩। মাচা

গতমাসের তিনটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

বৈকুণ্ঠ, ইন্দিরা, পৃথ্বা, সুধীরা, হিরণ্ময়ী, কল্যাণী (কলিকাতা), পূরবী, সুস্মিতা, সমীর ও সন্দীপ মুখোপাধ্যায় (লক্ষ্ণৌ), ফণীন্দ্র ও রোচনা সাহা (কলিকাতা), রিণি ও রণি মুখোপাধ্যায় (কাইরো), কুলু মিত্র (কলিকাতা) বাপি, বুতাম ও পিন্টু গঙ্গোপাধ্যায় (বোম্বাই), কবি, অধীশ ও অমিতাভ হালদার (দিল্লী), পুপু ও ভুটিন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), দেববর বন্দ্যোপাধ্যায় (ব্যাঙ্গালোর), সৌরাংশু ও বিজয়া আচার্য্য (কলিকাতা), অমিয়, শিবানী ও বাপ্পা রায় (কৃষ্ণনগর), মিঠু ও বুবু (কলিকাতা)।

গতমাসের দুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

শম্মিষ্ঠা ও সঙ্ঘমিত্রা রায় (কলিকাতা), রাণা ও বুনা মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), বিশ্বনাথ ও দেবকীনন্দন সিংহ (গয়া), প্রশান্ত, অমৃত, রাণা, সুনীত, ভাস্কর, অমিয়, অভীন্দ্র, মৃণাল, গৌতম, শিবু ও তিনকড়ি (কলিকাতা), অশোক ও সুমিতা গঙ্গোপাধ্যায় (শেওড়াফুলি), শচীন, কল্যাণ, ইন্দ্র, রজত, বিমল ও বিশ্বতোষ (কলিকাতা), পাপু, ছোটন, অপি, লক্ষ্মী, বাবুন, রত্না, চিত্রিতা, নন্দা ও কুমকুম (কলিকাতা)।

গতমাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

মদন, দ্বিজেন, রথীন, সুনীল, রাম, দেবী, উমা ও দেবকান্ত (কলিকাতা) 'মিলন-মন্দির' পাঠাগারের সভ্যবৃন্দ (হুগলী), খুশী, শ্যামা ও ঋষি (উত্তরপাড়া), রবীন্দ্র, দীপিকা ও ঝুনঝুন বন্দ্যোপাধ্যায় (বেনারস), কমলা ও রেণুকা বিশ্বাস (কলিকাতা), পুতুল, সুমা, হাবলু ও গাবলু মুখোপাধ্যায় (হাওড়া)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

স্থানাভাবের কারণে গতমাসের 'ধাঁধা ও হেঁয়ালির' উত্তরদাতাদের সকলের নাম এই সংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভবপর হলো না। আগামী কার্ত্তিক সংখ্যায় তাঁদের নাম যথারীতি প্রকাশিত হবে।

প্রজাপতি

নন্দিনী সরকার

প্রজাপতি প্রজাপতি
কতরকম রঙ—
সারাদিন ঘোরে ফেরে
কত নানা ঢং।
ফুলে ফুলে উড়ে উড়ে
কত মধু খায়,
কিচি মিচি বনে বনে
পাখি ডেকে যায়।
প্রজাপতি প্রজাপতি
আয়না কাছে
কেন উড় সারাদিন
ফুল গাছে গাছে?
বই দেবো খাতা দেবো
রঙ দেবো পায়—
ধরা দিলে রেখে দেবো
সোনার খাঁচায়॥
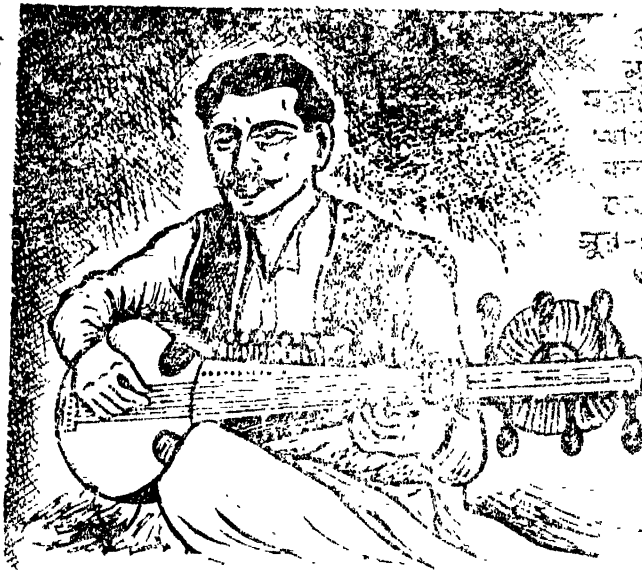
ভারতবর্ষের সঙ্গীতকলাবিদ্-শিল্পী মহলে এই ধরণের 'স্বরোদ'-ও একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আসছে আজ থেকে বহুকাল পূর্ব্বেই। এটি আমাদের দেশের অন্যতম জনপ্রিয় ও সুর-সাধনার উপযোগী বিচিত্র-অভিনব একটি তার-যন্ত্র!

আরেকটি সুপ্রাচীনকালের ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র হলো এই 'তানপুরা'। সঙ্গীতের আসরে বিচিত্র-সুন্দর এই তার-যন্ত্রটির ব্যবহার আমাদের দেশে সেই পুরাকাল থেকে আজো পর্য্যন্ত অব্যাহতভাবেই চলে আসছে। ভারতীয় সঙ্গীতকলাবিদ্-সমাজে 'তানপুরা' বাদ্য-যন্ত্রটি অধুনাবধি অনেকের কাছেই একান্ত অপরিহার্য্য হিসাবে সবিশেষ সমাদর লাভ করে আসছে।

ভারতের আরেকটি অভিনব-বিচিত্র বাদ্য-যন্ত্র হলো — উত্তর-অঞ্চলের পার্ব্বত্য কুলু-উপত্যকার গ্রাম্য-অধিবাসীদের পরম-প্রিয় নির্ম্মিত এই অতিকায়-ছাঁদের বাঁশী, ওজনে ভারী হলেও, এ বাঁশী খুবই সুরেলা।

জাতীয় প্রতিরক্ষা ও দ্রুত শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির সমস্যা

শ্রীদ্বিজেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী

ভারতের উপর চীনা আক্রমণ এবং বর্ত্তমানে পাকিস্থানের আক্রমণের ফলে আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলোর উপর একটা সুপরিকল্পিত অথচ সুদূর প্রসারী আঘাত এসে লেগেছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী বৎসরাধিক কাল পূর্ব্বে বলেছিলেন যে, পরিকল্পনাগুলোই হলো আমাদের জাতীয় জীবনের রক্ত প্রবাহিনী নাড়ি এবং ইহাদের সফলতার উপরই আমাদের জাতীয় প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম-কাণ্ডের ভিত্তিমূল দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য। সুতরাং ইহা স্বাভাবিক যে, প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আবশ্যকতানুসারে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে এবং তা করাও উচিত। সাথে সাথে আমাদের জাতীয় আর্থিক উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টায় যে সকল বাধা-বিপত্তি দেখা দেয়, সরকারের পক্ষ থেকে তা'ও যথাশীঘ্র অপসারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। জাতীয় সঙ্কট-কালে সরকারী হুকুম-নামাগুলোর বয়ান যথাসম্ভব স্পষ্ট হওয়া এবং প্রদত্ত আদেশ খুবই তৎপরতার সহিত কার্য্যে রূপায়িত হওয়া উচিত। কিন্তু ইহা তখনই হতে পারে, যখন সরকারী কার্য্যক্রম এবং হুকুম-নামাগুলো খুবই ব্যবহারিক ধরনের হয়। সরকারী ফাইল-দোরস্ত আমলা-শাহীর চিন্তা, কর্ম্ম ও ব্যবহারে অথবা নিয়মতন্ত্রে এমন পরিবর্ত্তন হওয়া উচিত যাতে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক বাদ-বিতণ্ডা ও বৈধানিক কাল-হরণের কৌশল সমুচিত পরিহার করা যায়। অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক ইহাই যে, জাতীয়-সঙ্কট মুহূর্ত্তেও সরকারী কাজ কর্ম্ম আজো এতটা 'গয়ং-গচ্ছ' গতির হয়ে রয়েছে যা' কোনো একটা পরিকল্পনাকেই বাস্তবে রূপায়িত করতে চার অথবা পাঁচ বছর পর্য্যন্ত সময় লাগিয়ে দেয়।

প্রতিরক্ষা বিষয়ক কর্ম্মোদ্যোগে এবং আর্থিক উন্নয়ন মূলক কার্য্যক্রমে দ্রুতসাধনের বা ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্য ১৯৬৩-৬৪ সালের জন্য একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা প্রস্তুত হয়েছিলো। সমাজ-সেবা কার্য্য এবং অন্য কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যয়-সঙ্কোচ করে একটি সংশোধিত পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছিল, যাতে কৃষি, বিদ্যুৎ সরবরাহ ও পরিবহনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর বিশেষ মনোযোগ দেওয়া যায়। আমাদের প্রধান মন্ত্রীও বারংবার বলেন যে, পরিকল্পনাগুলোর এমন ভাবে রদ বদল করা উচিত যাতে দেশবাসীগণ অধিকতর আকৃষ্ট হতে পারে এবং নিজেদের জাতীয় উন্নয়ন প্রচেষ্টায় অংশীদার মনে করতে পারে। এর ফলে প্রতিটি উন্নয়নমূলক কার্য্যক্রম যথা সম্ভব দ্রুততার সহিত বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে। অদ্যাবধি আমাদের পরিকল্পনার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য এবং প্রাপ্তসাফল্যের মধ্যে দূরত্ব অনেকখানি বিদ্যমান রয়েছে। তথাপি পরিকল্পনা-গুলোর বাস্তবে রূপায়ণের কর্ণধারগণ অসাফল্যের কারণ হিসেবে কোনো-না-কোনো ওজোর আপত্তি ও খোঁজ খবর করে দেখিয়ে দেন, যদিও উক্ত অসাফল্যের মূল কারণ হচ্ছেন স্বয়ং তাঁরাই। তাঁরা কোটি কোটি মানুষের ত্যাগের উপর নির্ভরশীল উন্নয়ন প্রচেষ্টা বা পরিকল্পনাগুলোর অসাফল্যের হেতু ও তার দায়িত্ব নিজেরা মেনে নিতে অস্বীকার করে থাকেন অথবা এড়িয়ে যান। সরকারী নীতি এরূপ হওয়া উচিত যাতে জাতির দুর্ব্বলতম অংশের সংরক্ষণের সর্ব্বাধিক সুযোগসুবিধা হতে পারে এবং ভারতের আপামর জনসাধারণও যাতে সরকারের পরিকল্পনাগত কার্য্যক্রমের মধ্যে পরিপূর্ণ অথচ নিষ্কলুষ স্বদেশ-প্রেম আর সমত্ব-বোধ নিয়ে সম্মিলিত হতে পারে। এর ফলে ভারতের অর্থ ব্যবস্থা অতি শীঘ্রই আত্ম-নির্ভরশীল হয়ে গড়ে উঠার সুযোগ পেতে পারে। পরন্তু আজ পর্য্যন্ত পরিকল্পনা কমিশনের ধাঁচটি কতকটা এমনই রয়েছে যে, যদ্দ্বারা আমাদের আর্থিক ক্রমোন্নয়ন সন্তোষপ্রদ হয় নি।

আমাদের পরিকল্পনাগুলো কী আসমুদ্র হিমাচল ভারতের ৪৬ কোটি ২০ লক্ষ মানুষের জন্য ? যদি যথার্থ জনকল্যাণের উদ্দেশ্য এর প্রতিটি অংশেই থাকে, তবে গভীর স্বদেশ প্রেম নিয়ে মনোযোগ সহকারে সক্রিয় ও বিশ্বস্ত ভাবে যথানিয়মে আর যথাসময়ে কার্য্যসমাধা করার কঠোর শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে ব্যবহারিক আচরণে প্রমাণ করারও খুবই আবশ্যকতা রয়েছে।

পরিকল্পনা কমিশন তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার আকৃতি হ্রাস করতে অনিচ্ছুক এবং উক্ত পরিকল্পনায় পুঁজি বিনিয়োগের মাত্রায় কোনো প্রকার কাট ছাঁট করাটা ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের গুরুত্ব আরোপ করে এমন নিয়মাধীনে রেখেছেন যা' জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ ব্যতীত অন্য কেহই করতে অসমর্থ। সর্বমোট পুঁজির মধ্যে কিছু কিছু হ্রাস করার সুযোগ সুবিধা অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু কোনো অবস্থায়ই অঙ্গরাজ্যগুলোকে দেয় কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তা ৪০০ কোটি টাকার অধিক দেওয়া যাবেনা, যা' পূর্ব্ব-স্থিরীকৃত সাকুল্য টাকার পরিমাণ থেকে ৫০ কোটি কম। কোনো কোনো অঙ্গরাজ্য নিজেদের পরিকল্পনার আকৃতি হ্রাস করার বিষয়ও স্থির করে ফেলেছিলেন। ১৯৬১—৬২ সালে অঙ্গরাজ্যগুলো অতিরিক্ত কর দ্বারা ১০০ কোটি টাকা একত্র করেছিলো, যখন পাঁচ বৎসরের মধ্যে এই প্রকার সংগ্রহের মাত্রা ৬১০ কোটি টাকা স্থির করা হয়েছিলো। গত আর্থিক বৎসরে অঙ্গরাজ্যগুলো ৭১ কোটি টাকা অতিরিক্ত কর ধার্য্য করে একত্রিত করেছিলো। কিন্তু গত বৎসর এই আশঙ্কায় টাকার এই পরিমাণটা বাড়াবার দরকার থাকা সত্বেও বিক্রয় কর অধিকতর বাড়ানো যায় নি, কেননা দ্রব্যমূল্য মাত্রাধিক রূপে বেড়ে যেতে পারতো। এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হলেও এ-কথা উল্লেখ যোগ্য যে কর্তৃপক্ষের সতর্কতা সত্বেও গত বৎসর এবং বর্ত্তমানে দুর্ম্মূল্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। যা' হউক, বিক্রয় দ্বারাই সব টাকাটার এক চতুর্থাংশ সংগৃহীত হওয়ার নিয়ম। প্রায় সব কয়টি বাণিজ্য সমিতি অথবা চেম্বার অব কমার্স তাদের সমর্থনের আশ্বাসও দিয়েছিলেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মত ছিলো এই যে, জন সাধারণের মধ্যে যদিও পরিকল্পনা সম্বন্ধে যথেষ্ট সমর্থন এবং উৎসাহ রয়েছে, তবু তাদের উপর ক্ষমতাতিরিক্ত করের বোঝা এতটা অধিক চাপানো অনুচিত হবে। কোনো শিল্পপতি এরূপ মত প্রকাশ করেছিলেন যে, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অবশ্যই বাস্তবে রূপায়িত করা উচিত। কেবল ইহাই নহে, তাঁর মতে যদি বিশেষ উৎসাহ সৃষ্টি করা যায় তবে পরিকল্পনার নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য অপেক্ষাও অধিক উৎপাদন সম্ভব হতে পারে। উক্ত শিল্পপতির বিশ্বাস এই ছিলো যে, জাতীয় আর্থিক ব্যবস্থায় অতিরিক্ত পরিমাণ পুঁজিগত অর্থ সংগ্রহ করা অধিক কঠিন হবে না।

উৎপাদন ক্ষেত্রে বহুমুখী বৃদ্ধির জন্য আমাদের জাতীয় আর্থিক নীতিগুলোর কতকটা পরিবর্ত্তন করাও একান্ত আবশ্যক। এতে কোনো বাক্-বিতণ্ডা নেই যে আমাদের জাতীয় শ্রমশিল্প সম্পর্কিত নীতির মধ্যে অনেক প্রকার বিধি-নিষেধ বর্ত্তমান রয়েছে। যদি কলকারখানা ও কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়িয়ে তুলতে হয় তবে এই নীতির একটা ব্যবহারিক পরিবর্ত্তন করতে হবে। শ্রীঅশোক মেহতা বিশেষ দায়িত্ব নিয়ে উপাধ্যক্ষ হয়ে আসার বৎসরাধিক-কালপূর্ব্বে অনুষ্ঠিত পরিকল্পনা কমিশনের এক বৈঠকে যে ধরনের সিদ্ধান্তগত সলা-পরামর্শ হয়েছিলো তা'তে এরূপ আভাস তখন পাওয়া যায় নি, যদ্দ্বারা আমাদের পরিকল্পনাগুলোর কর্ণধারগণ বর্ত্তমান সঙ্কটাবস্থার জাতীয়-গুরুত্ব বিবেচনা করে এমন কোনো ব্যবহারিক পরিকল্পনা তৈরী করছেন যাতে প্রতিরক্ষার আয়োজন ও উন্নয়ন প্রচেষ্টা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি হতে পারে। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ মতো পরিকল্পনা দ্রুত অথচ সুষ্ঠু রূপায়নের তদারকী করার জন্য 'পরিকল্পনা কমিটি' গঠিত হবার পরে ও অন্ততঃ পক্ষে অদ্যাবধি বর্ত্তমান পরিকল্পনা দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে এতটা উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করা হয়নি এবং হচ্ছে না যাতে জনসাধারণ নিজেদের পরিকল্পনার অংশীদার হিসেবে মনে করতে পারে। যতদিন পুরানো নীতি-নিয়ম বজায় থাকবে, ততদিন ইহা সম্ভব নয়।

আমাদের শিল্পোৎপাদন ক্ষমতা সম্বন্ধে ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং-সংস্থা বৎসরাধিক কালপূর্ব্বে একটি সমীক্ষা-কার্য্য পরিচালনা করেছিলেন। এই সমীক্ষার ফলে আমরা জানতে পারি যে কল-কারখানাগুলোর উৎপাদন-ক্ষমতার প্রায় অর্দ্ধেকটা অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়ে রয়েছে। ঐ

সময়ে জানা যায় যে, নির্দিষ্ট ২১৫টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১১০টি এরূপ অবস্থায় চলেছে যাদের কেবল শতকরা ৭৫ ভাগ উৎপাদন ক্ষমতা কার্য্যে নিয়োগ করা হয়েছিল। অবশিষ্ট ১০৫টি কল-কারখানার মধ্যে ৩৩টি শতকরা ৬৫ থেকে ৭৫ ভাগ এবং ৭২টি কল-কারখানা শতকরা ৩৫ ভাগেরও কম উৎপাদন ক্ষমতা কার্য্যে প্রয়োগ করে। বৈদ্যুতিক-শক্তির স্বল্পতা, কাঁচা-মালের দুর্ম্মূল্যতা, কারখানার অ-লাভ-প্রদ উপকরণ এবং উৎপাদন কার্য্যে প্রয়োজনীয় পুঁজির স্বল্পতা প্রভৃতি প্রতিকূল কারণে শিল্পোৎপাদন কম হয়েছে। এমনও দৃষ্টান্ত রয়েছে যে, মালগাড়ীর নির্ম্মাতাগণ যথা-সময়ে মালগাড়ী তৈরী করে নি এবং উৎপাদনকার্য্য স্থগিত থাকে। এদিকে রেলের মালগাড়ীর অভাবে নানাধরনের শিল্প-কারখানার উৎপাদনও হ্রাস পায়। উক্ত সমীক্ষায় আরো জানা যায় যে, কেবলমাত্র ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পেই অনিয়োজিত উৎপাদনমূলক কর্ম্মক্ষমতা প্রতি মাসে ৩লাখ ৪১ হাজার ৮ শত ৫২ মেশিন-ঘণ্টা ছিলো। এখন সরকারী প্রতিরক্ষামূলক শিল্পে উৎপাদন খানিকটা বেড়ে থাকলেও কারখানাগুলোর অনিয়োজিত ক্ষমতা দ্বারা ভারতের সামগ্রিক প্রতিরক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি উৎপাদন করতে পরিকল্পনা কমিশন অসমর্থ। সুতরাং বর্ত্তমানে এরূপ দরকার হয়ে পড়েছে যে, আমাদের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় দ্বারা ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য .উৎপাদনকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান-গুলোর পরিপূর্ণ উপযোগ হওয়া উচিত এবং প্রতিরক্ষার সকল প্রকার আবশ্যক দ্রব্যাদি উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে তৈরী করে তার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। পূর্ব্ব, পশ্চিম ও উত্তর,—এই তিন দিকে ভারতের শত্রুরা আক্রমণমূলক উদ্দেশ্যে সক্রিয় থাকায় এবং ভারতের সীমান্ত এলাকায় ও অন্যান্য স্থানে দেশ রক্ষায় নিযুক্ত আমাদের জওয়ানদের জন্য (যুগপৎ ভারতময় সামগ্রিক ভাবে সামরিক প্রস্তুতির জন্যও) পরিবহনের অধিকতর সুযোগ সুবিধা দরকার। কিন্তু অটোমোবাইল শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে ইহাও বলা হয় নি যে, আমাদের দেশের প্রতিরক্ষার জন্য পরিবহন সংক্রান্ত কী কী অথবা কোন কোন ধরণের অটোমোবাইল সাজ-সরঞ্জামের আশু প্রয়োজন। প্রকৃত পক্ষে; যদি এই সকল কারখানার পরিপূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতা কাজে লাগানো যায় তা হলে দেশের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সাজ সরঞ্জামের ভাণ্ডারে ইঞ্জিনিয়ারিং ও অটোমোবাইল দ্রব্যের চাহিদা মতো সব কিছুই পাওয়া যেতে পারে মনে করা যায়। এখন আমাদের অর্থ ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচিত এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাতে এই সকল কারখানায় যে পরিমাণ উৎপাদন ক্ষমতা উৎপাদন কার্য্যে ব্যবহৃত হতে পারছে না তার যথাযথ হিসেব রাখা সম্ভব হয়। উৎপাদনের প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা দেওয়া হলে যাতে তন্মুহূর্ত্তেই পূর্ণোদ্যমে কাজে লেগে যেতে পারে সে বিষয়েও তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা উক্ত মন্ত্রণালয় দু'টির অত্যাবশ্যক কর্ত্তব্য বলে মনে হয়। বর্ত্তমানে কয়েকটি সঙ্কটকালীন আদেশের বলে বিদেশীমুদ্রা সঞ্চয়ের জন্য বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহারের উপর কয়েকটি বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। পরন্তু এবিষয়েও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন যাতে উক্ত আদেশাবলীর দ্বারা উৎপাদন মূলক কার্য্যে কোনো কু-প্রভাব পতিত না হয়। কাঁচামাল কারখানা পর্য্যন্ত পৌছানোর বিষয়েও সর্ব্বাধিক মনোযোগ দিতে হবে।

বৎসরাধিক কালপূর্ব্বেই প্রতিরক্ষা-উৎপাদনমন্ত্রণালয় ব্যক্তি-গত ক্ষেত্রের সহযোগিতাদ্বারা প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত দ্রব্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধির ঘোষণা করেছেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের উৎপাদন বিভাগ প্রতিরক্ষার জন্য প্রাইভেট কারখানা-গুলোর সংযোগিতায় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন করার এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছেন। আরো জানা গিয়েছে যে, প্রতিরক্ষা মূলক উৎপাদনের এক বিস্তৃত কার্য্যক্রম প্রস্তুত হয়েছে বা হচ্ছে। প্রত্যেক স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তি এবং রণবিজ্ঞানী ইহা সম্যক্ উপলব্ধি করেন যে, দেশের প্রতিরক্ষার জন্য এবং বিশেষতঃ যুদ্ধ পরিচালনার্থ সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আর প্রাথমিক কার্য্য হচ্ছে দেশের শিল্প-শক্তির ভিত্তি দৃঢ় করা। যদিও সরকারী এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে কোনো প্রত্যক্ষ সঙ্ঘর্ষ বিদ্যমান নেই, তবুও ইহা বলা অত্যাবশ্যক যে, সরকারী শিল্প ক্ষেত্রে উৎপাদন কার্য্যে বিপুল পুঁজি নিয়োজিত থাকা সত্ত্বেও কোনো নতুন পরিকল্পনা সরকারী ক্ষেত্রের উপর সমর্পন করে দেওয়া কতটা যুক্তি-যুক্ত তা অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বিবেচনা করে দেখা কর্ত্তব্য। যদি এই সঙ্কট কালে ও ব্যয়-হ্রাসের উপর মনোযোগ দেওয়া না হয় তবে ইহা কেবল স্বদেশ কল্যাণের বিপরীত কার্য্য বলেই মনে করা হবে না, পরন্তু স্বদেশের

প্রতি চরমবিশ্বাসঘাতকতা এবং স্বদেশ-দ্রোহিতা বলে বিবেচিত হতে পারবে। কেননা, আমলা নিয়ন্ত্রণে পরিকল্পনার জন্য ব্যয় প্রয়োজনাতিরিক্ত হয়ে থাকে এবং উৎপাদন হ্রাস পায়, এরূপ কোনো কোনো ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গিয়েছে। যদি শিল্প-সংক্রান্ত কার্য্যক্রমের একটা সুষ্ঠু ছক তৈরী করে সংশ্লিষ্ট শিল্প কারখানাগুলোকে ইহা জানিয়ে না দেওয়া হয় যে, তাদেরকে কখন, কোথায়, কী পরিমাণ এবং কী কী উৎপাদন করতে হবে এবং প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত দ্রব্যসম্ভার যথাযথ রূপে নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য পর্য্যন্ত প্রস্তুত করা দরকার, তা হলেই খুবই চিন্তা ভাবনা করে পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে। এই কর্ম্মটি কেবল কয়েকটি বাঁধা ধরা বুলির ধ্বনি তুলেই সম্ভব হতে পারে না। আজ অতি-যথার্থ বাস্তবিক চিত্রটি তো ইহাই যে, শিল্প কারখানাগুলো ইহা একেবারেই জানেনা যে, বর্ত্তমান সঙ্কটকালে তাদের কী কী কাজ কতটা করতে হবে এবং তা কী ভাবে সম্ভব হবে। অবিলম্বে প্রত্যেকটি শিল্পক্ষেত্রে, বিশেষতঃ গুরুত্ব পূর্ণ শিল্পক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত দ্রব্যাদি উৎপাদনের জন্য ছোটো ছোটো সমবায় সমিতি স্থাপন করা উচিত যারা এমন কার্য্যক্রম তৈরী করবে যাতে সময় ও শক্তির অপব্যয় হবেনা। আর দেশের প্রতিরক্ষার অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদির নিখুঁত উৎপাদন এখন থেকেই পূর্ণমাত্রায় সম্ভব হবে। এস্থানে আরো উল্লেখ করা প্রয়োজন যে গোলা বারুদ, নানারকমের অত্যাধুনিক ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র, ট্যাঙ্ক, বিমান, জাহাজ, অটোমোবাইল, ঔষধপত্র, বিশেষ-ধরণের খাদ্যদ্রব্য, সামরিক পোষাক পরিচ্ছদ ও ব্যাজ (প্রতীক), ইঞ্জিন ইত্যাদি সমরায়োজনের বা প্রতিরক্ষার কার্য্যে অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির কারখানায় খুবই সতর্কতা সহকারে অতি স্বদেশ প্রেমিক ব্যক্তিদের বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর তাদের ব্যক্তিগত ও আত্মীয় স্বজনের বিস্তৃত পরিচয় গ্রহণ করে নিযুক্ত করার ব্যবস্থায় আরো তীক্ষ্ণদৃষ্টির কঠোরতা এবং সদা সতর্কতা থাকা দরকার। কী ব্যক্তিগত, কী সরকারী,—প্রত্যেকটি কারখানায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা এমন ব্যক্তিদের হাতে থাকা দরকার যাঁরা স্বীয় মাতৃভূমি ভারতের কল্যাণার্থে চরম স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ এবং যুগপৎ যাঁরা প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত দ্রব্যাদি উৎপাদনের কারখানায় শত্রু-রাষ্ট্রের ছদ্মবেশী গুপ্তচর ও অন্তর্ঘাতি কার্য্য-কলাপে লিপ্ত লোকদের সম্বন্ধে সদা-সতর্ক থেকে, এই ধরণের গুপ্তশত্রুদের সম্বন্ধে অবিলম্বে চরম দণ্ডের ব্যবস্থায় বাস্তবিক পক্ষে কার্য্যকরী সহায়ক হতে পারবেন, যাতে কারখানায় উৎপাদিত সমরাস্ত্র এবং সমরায়োজনের বিভিন্ন দ্রব্যাদি নিকৃষ্ট বা অকেজো না হতে পারে, ক্রমবর্দ্ধমান উৎপাদনে কোনো বাধা বিপত্তি সৃষ্ট হতে না পারে এবং উৎপাদিত সমরাস্ত্র ও বিবিধ যুদ্ধ-সামগ্রীর কোনো বর্ণনা শত্রুরাষ্ট্রে না পৌছাতে পারে। মোট কথা দেশ, জাতি ও রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষার অন্যতম উপায়স্বরূপ সমরায়োজন মূলক বা প্রতিরক্ষা-মূলক দ্রব্যাদি উৎপাদনের কারখানায়, "চাকরী করি মাইনে পাই"—এই মনোভাবের সক্রিয় স্বদেশপ্রেম-বিহীন ব্যক্তি-দের স্থান একেবারেই হওয়া উচিত নহে। কারণ, এই ধরণের অতি-আত্মকেন্দ্রিক লোকগুলোই দেশ জাতি ও রাষ্ট্রের প্রধান শত্রু বলে গণ্য হয় এবং এদের দ্বারা আত্ম-স্বার্থের জন্য যে কোনো দেশদ্রোহিতামূলক কুকর্ম্ম সংঘটিত হতে পারে। কয়েক মাস পূর্ব্বে রাঁচির ভারী-যন্ত্রাদি নির্ম্মাণের কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে আমাদের রাষ্ট্রের যে বিপুল আর্থিক ও যান্ত্রিক ক্ষতি হয়ে গেলো, তা একটা জাতীয় বিপদের সঙ্কেত বলেই শিল্পপতি, রাষ্ট্র নেতা, প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত দায়িত্বশীল ব্যক্তি এবং দেশের প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিক নাগরিকদের মনে করা উচিত। উৎপাদনই হলো জাতির অন্যতম আশা ভরসা এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বা সমরায়োজনের প্রাণকেন্দ্র। শত্রুদেশ বা শত্রুরাষ্ট্র তার গুপ্তচর, তার পঞ্চম বাহিনী এবং তার দ্বারা নিযুক্ত অন্তর্ঘাতি কার্য্যকলাপে লিপ্ত অতি গোপনচারী লোকদের দ্বারা যুদ্ধের আধুনিক প্রণালী অনুসারে আমাদের এই প্রাণ-কেন্দ্রে সর্ব্বদাই বিশেষভাবে আঘাত করতে সচেষ্ট থাকবে।

যা হউক, গত বৎসর পর্য্যন্ত আমাদের নির্দ্ধারিত লক্ষ্য এই ছিল যে, জাতীয় আয়ের শতকরা ৫ ভাগ পর্য্যন্ত প্রতিরক্ষা-উৎপাদনের জন্য ব্যয় হবে, যাতে তৎকালীন উৎপাদন ব্যবস্থার বিবেচনায় উৎপাদনের পরিমাণ দ্বিগুণ হতে পারে। অবশ্য ভারতের উত্তর-সীমানায় চীনের আক্রমণ হওয়ায় এইরূপ প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিলো বলে ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু এখন আমাদের দেশ পাকিস্থানের আক্রামণমূলক কার্য্য-কলাপে পূর্ব্ব ও পশ্চিম

দিক থেকেও আক্রান্ত হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এই আশঙ্কা একেবারেই অমূলক বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। কাজেই এখন আরো অধিক পরিমাণে পুঁজি নিয়োগ করে প্রতিরক্ষা মূলক অস্ত্র-শস্ত্র ও অন্যান্য সামগ্রীর উৎপাদনের পরিমাণ বহুগুণ বাড়িয়ে তোলার জরুরী প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। কিন্তু এই লক্ষ্যে পৌছাতে গেলে ব্যাপক অথচ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণকে অবিরাম প্রযত্ন করতে হবে। মন্থরগতির কার্য্যক্রম দ্বারা ইহা সম্ভব হতে পারে না। আমরা জানি যে বিগত চার বৎসরের মধ্যে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির শতকরা হার আশানুরূপ নয়। পক্ষান্তরে ঐ সময় মধ্যে শিল্পোৎপাদনের শতকরা হারও বেশী বৃদ্ধির দিকে যায় নি। অবশ্য সরকারী পরিচালনায় অস্ত্র-শস্ত্রের কারখানা-গুলোতে গড় পড়তা উৎপাদন বেড়েছে। যা হউক, এখন ভারতের জাতীয় সঙ্কটমুহূর্ত্তে, বিশেষতঃ উত্তর পূর্ব্ব পশ্চিম দিক থেকে আমাদের মাতৃভূমির উপর সামরিক আক্রমণের আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় ব্যাপক ও সুদৃঢ় শিল্প প্রচেষ্টার ভিত্তির উপর জাতীয়প্রতিরক্ষার ব্যূহ নির্ম্মাণ করতে হবে আরো দুর্ভেদ্য রূপে। এইরূপ পরিস্থিতিতে আর্থিক উন্নয়নের কর্ম্মোদ্যোগ বাড়িয়ে যাওয়া আর এজন্য দৃঢ় পদক্ষেপে জাতির প্রতিটি খাঁটি নাগরিকের অগ্রসর হওয়াই জাতীয়স্বার্থের জন্য অতি প্রয়োজনীয়।

যাত্রাপথে

শ্রীচিন্তাহরণ সরকার

যুগে যুগে
অনন্তের কোল হতে
　　অনন্তের কোলে
ছুটিয়াছে বিরাম বিহীন
　　মিলনের সুর,
যাত্রাপথে শ্রান্ত মলিন
　　তবু সে মধুর!

পথপ্রান্তে জাগিয়াছে
বারে বারে কত আশা
জাগিয়াছে কত তৃষা,
শ্রান্ত আঁখির কুহেলিকা পথে
　　ছুটিয়াছে লুব্ধ চিতে
　　মরীচিকা পানে,
মিলে নাই কোন দিন
　　কোন পুরস্কার
লভিয়াছে ক্ষত হৃদে
　　ব্যর্থ তিরস্কার!
ভাবিয়াছো ক্ষণে ক্ষণে
আর না চলিবে পথ
　　তব মনোরথ
সাধ্য কি তোমার!

অচলন চলন্ত সদা,
চলিবে লক্ষ্যহীন
　　দিশেহারা
ভাঙ্গি অমা-নিশার
　　অমা কারা,
　　নির্দ্দেশে তাহার,
চালাইছেন যিনি সাগর জঙ্গম
　　জ্যোতিষ্ক মণ্ডল
অন্তহীন অনন্ত মেখলা
　　বিশ্ব ভূমণ্ডল।
যাত্রী! হয়োনা হতাশ
ছুটে চলো সম্মুখের পানে
লোকে লোকে নূতন আলোকে
　　মিলিবে পরশ,
　　স্নিগ্ধ প্রাণে
　　লভিবে হরষ।
ভেবো না, মিটিবে না আশ
বিফল যাত্রী, নিষ্ফল প্রয়াস!
না পাওয়ার মাঝে তুমি
　　পাবে গো প্রচুর—
বিরহের মাঝে বাজে
　　মিলনের সুর।

মা লক্ষ্মীর মাঠ

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য
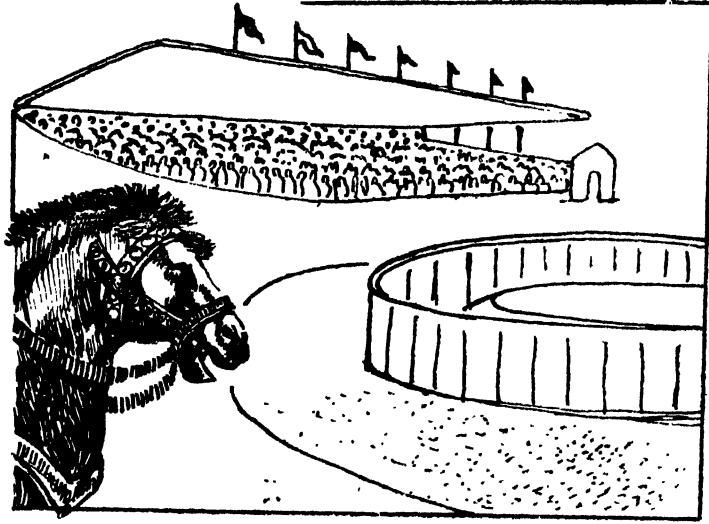
অভিজিৎ রায়ের শিরায় অভিজাত রক্ত বইছে। কত হাজার বছরের পুরাণ অভিজাত সেই রক্ত কে জানে? কোন সুপ্রাচীন কালে গঙ্গার পলিমাটীতে গড়ে উঠা বঙ্গভূমির শ্যামল তৃণাস্তৃত অরণ্যের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিলেন রায়বংশের পূর্বপুরুষ ঘোড়ার পিঠে চড়ে তা' কারো মনে নেই। কেউ তা' জানে না। কিন্তু অভিজিৎ তা কল্পনার চোখে দেখতে পায়। তাঁর সঙ্গে আরও লোক এসেছিলেন, তাঁরাও ঘোড়ার পিঠে চেপেই এসেছিলেন। কিন্তু সবই কি কল্পনা? অভিজিতের মনের রঙীন খেলা? হতে পারে। কিন্তু কল্পলোকের সকল বস্তু সকল ভাবনা, সকল চিত্রের মধ্যে একটি চিত্র সত্য—সে হচ্ছে তাঁরা ঘোড়ার পিঠে চড়ে এসেছিলেন—যেমন করে এসেছিলেন ভারতবিজয়ী আর্যেরা—আর্য বিজয়ী গ্রীক, শক, হূণ, মোগল-পাঠানের দল। সবাই এসেছিলেন অশ্বের পিঠে চড়ে। আর্যদের দেবতা সূর্য, সাতটি অশ্বের রথে চড়ে তিনি পূর্ব থেকে পশ্চিমে চলেছেন সীমানাহীন আকাশের বুক চিরে। আর্যদের দিগ্‌বিজয়ের প্রতীক অশ্বমেধ-যজ্ঞের ঘোড়া। সে যজ্ঞের অনুষ্ঠান ত্রেতা যুগের অবতার রাম করেছেন। করেছেন দ্বাপরের ধর্মাবতার যুধিষ্ঠির। সভ্যতার প্রতীক অশ্ব।

আরবীয় অশ্বের পিঠে চড়ে ভারতে এসেছে তাতার বীরগণ, শুধু ভারত কেন, চীন, মধ্যএশিয়া আর ইউরোপের কত দেশ তাদের অশ্বখুরের ধ্বনিতে কেঁপে উঠেছে—সেই অশ্বখুরের ধূলিতে মলিন হয়েছে তাদের স্বাধীনতা।

অভিজিৎ উপলব্ধি করেছে তাদের বংশের সেইদিনই অবনতি সুরু হয়েছে—যেদিন তাদের পূর্বপুরুষেরা ঘোড়া পোষবার শক্তি হারিয়েছে—বা ঘোড়ার প্রতি অবহেলা করেছে। আর্যদের পতনের কারণ, ভারতীয়দের পরপর বিদেশীদের কাছে পরাভবের কারণ, ঘোড়ার প্রতি অবহেলা। রাণা প্রতাপের বীরত্বের কারণ তাঁর অশ্বের প্রতি ভালবাসা—চৈতককে বাদ দিয়ে রাণা প্রতাপকে যেন চিন্তাই করতে পারে না অভিজিৎ।

আকাশের গ্রহগণের প্রভাবে মানুষের জীবন গড়ছে ভাঙছে। মানুষের জীবন তো আর কিছু নয়—গ্রহগণের খেলা মাত্র। ওরা যেমন খেলছেন—তেমন হচ্ছে আমাদের

ভাগ্য। সেই গ্রহগণের সঙ্গে মর্ত্যের যে জীবের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ যোগ সে হচ্ছে অশ্ব। সূর্যের সাত অশ্ব, তাদের সাত রঙ্। তেমনি প্রত্যেক গ্রহের অশ্বের ভিন্ন ভিন্ন রঙ্। চাঁদের অশ্ব সাদা, মঙ্গলের অশ্ব লাল, শনির অশ্ব কাল বা নীল। কখন কোন গ্রহ তোমার প্রতি প্রীত তিনি তোমায় পারিতোষিক দেন—নানাভাবে দেন।—কাউকে দেন, ব্যবসার মারফতে, কাউকে রাজসেবার মারফতে, কাউকে দেন চিকিৎসা কার্যের পুরস্কার—। কিন্তু অশ্বের মারফতে যে পুরস্কার দেন সেটা হচ্ছে গ্রহগণের ডাইরেক্ট্ দান—প্রত্যক্ষ করুণা।

অভিজিতদের গ্রামের ছেলে নিকুঞ্জ, পনের বছর বয়সে খিদিরপুরে পাঁচ টাকা বেতনে মসলার দোকানে কাজ পেল। সেই পাঁচ টাকা জমিয়ে জমিয়ে সে একদিন অশ্বের মারফত করুণাভিক্ষা করল গ্রহগণের—যারা মানুষের জীবন গড়ছেন ভাঙছেন। মাত্র কুড়িটি টাকা নিয়ে নিকুঞ্জ মা লক্ষ্মীর মাঠে ঢুকল, এক শনিবারের দুপুরে। ফিরে এল বিকালে একটি হাজার টাকা নিয়ে। পরের দিন নিকুঞ্জ নিজেই একটা মসলার দোকান করল,—কেন করবে সে চাকুরী? গ্রহ যার প্রতি প্রসন্ন তার আবার ভয় কি? সেই হাজার টাকার মসলার দোকান থেকে নিকুঞ্জের কত কিছু ব্যবসা হ'ল—যাতে সে হাত দিয়েছে তাতেই সোনা ফলেছে—এখন সে খিদিরপুরে পাঁচটা বাড়ীর মালিক—তাদের দাম কম পক্ষে পাঁচ লাখ টাকা। এই সব ঘটনা অভিজিৎ নিজের চোখেই দেখেছে।

ইংরেজেরা ভারতে আর যাই করে গিয়ে থাকুক—ভারতে তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি দুটি রেসকোর্স—দুটি 'মা লক্ষ্মীর মাঠ'।—রয়েল কেলকাটা টার্ফ ক্লাব কোলকাতায় ১৮৪৭ সনে; আর রয়েল ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া টার্ফ ক্লাব বোম্বেতে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে। মা লক্ষ্মীর ময়দান দুটি প্রতিষ্ঠার পর ভারতবাসীর প্রতি গ্রহগণের দান সোজা-সোজি নেবে আসছে—আর কোন মাধ্যমের অপেক্ষা রাখছে না। কত ভাগ্যবান পুরুষ মা-লক্ষ্মীর মাঠে এসে গ্রহ গণের অশ্ব সকলের সঙ্গে যোগাযোগ করা মাত্র তাঁদের করুণা পেয়েছেন। অভিজিৎ সেই সকল ভাগ্যবান পুরুষ-নারীর কথা ভাবে, আর উৎসাহে তার বুকটা ভরে উঠে। নিজের দুর্ভাগ্যের দুর্দশার কথা একটুকু তার মনে পড়ে না।

অভিজিতের অল্প বয়সে বাপ মারা যান। বিধবা মা তাকে অতি কষ্ট করে মানুষ করেছেন। তার দাদা সঞ্জিৎ অল্প বয়সে চাকুরী নিয়ে কোলকাতায় এসেছিলেন। বাপ মারা যাওয়ার পর পিতৃশ্রাদ্ধে যে তিনি একবার দেশে গিয়েছিলেন, তারপর আর যান নি। মাকে আগে তিনি মাসে মাসে অল্প অল্প টাকা পাঠাতেন, তার নিজের সংসার বড় হয়ে উঠার ফলে সেটা বন্ধ হয়ে গেল। তারপর ধীরে ধীরে তার চিঠি পত্রও কমে আসতে লাগল। অভিজিতের স্বপ্ন ছিল সে বড় হয়ে স্কুলের পড়া শেষ করে কোলকাতার কলেজে পড়বে। দাদাকে সে সব জানিয়ে দু এক বার পত্রও লিখেছে। উত্তর সে পায় নি। কিন্তু তার মায়ের কাছে লেখা দাদার পত্রে জেনেছে দাদার সংসারে অভাব অনটনের দুঃখ যন্ত্রণার বর্ণনা। তাতে তার মন শুধু নিরাশ হয়েছে।

অভিজিতের মেট্রিক পরীক্ষায় ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্না হলেন। গ্রামের স্কুল থেকে সে বৃত্তি পেয়ে গেল। প্রেসিডেন্সি ডিভিসানে তৃতীয় স্থান অধিকার করল্ সে। কোলকাতার কলেজগুলি থেকে নিমন্ত্রণ আসতে লাগল তার স্কুলে। হেড মাষ্টারের আশীর্বাদ আর উপদেশ নিয়ে বিদ্যাসাগর কলেজে এসে ভর্তি হল অভিজিৎ। আর্টস্ নিল সে। বিদ্যাসাগর কলেজে অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে সুরু হল তার উৎফুল্ল কলেজ-জীবন। দাদার বাসায় সে যায় নি। হেড্‌মাষ্টারের চিঠি নিয়ে সে সোজা কলেজ হোষ্টেলে এসে উঠেছিল। মার কাছ থেকে চিঠি পেয়ে তার দাদাও উল্লসিত হয়ে হোষ্টেল থেকে তাকে বেলে-ঘাটায় বাসায় নিয়ে গেলেন। দাদার আদর বৌদির কপট আহ্লাদ দুই-ই অনুভব করেছিল অভিজিৎ। কিন্তু দাদার সংসারের এতগুলি কাচ্চা-বাচ্চার কোলাহলে দরিদ্র্য যেন মুখর হয়ে তার মনটাকে পীড়িত করে ফেলল। কলেজ-জীবনের ভাববিলাস আর আমোদ যেন মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। দাদা বৌদির প্রতি তার অভিমান আর রইল না।

কলেজের পড়া করতে করতে অভিজিতের স্কন্ধে কখন কাব্যসরস্বতী এসে ভর করলেন তা' সে ঠাহর করতে

পারেনি। পারল যখন গ্রামের বাড়ীতে বসে কলেজের এক বন্ধুর চিঠিতে সে আই এ পরীক্ষার ফলাফল জানল। কোন রকমে প্রথমবিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে সে। মাত্র লজিকে একটা লেটার পেয়েছে। আর তাদেরি স্কুলের একটা ছেলে মেট্রিকে তার চেয়ে একশ নম্বর কম পেয়েছিল—সেই কলেজের নাম রেখেছে। আই এস, সি পরীক্ষায় ষ্ট্যাণ্ড করেছে। লেটার পেয়েছে অংকে, ফিজিক্সে, কেমিষ্ট্রীতে। অভিজিতের ইংরেজি সাহিত্যে এম-এ পাশ করে সারা জীবন কাব্য-রচনার স্বপ্নসৌধ মুহূর্তে যেন ধূলিসাৎ হয়ে গেল। কোলকাতায় ফিরে এসে দাদার সঙ্গে দেখা করল। দাদার মুখ দেখেই সে আর কিছু চাইতে পারল না। বলতে পারল না, তোমার বাড়ী থেকে যদি পড়তে দাও দাদা। কলেজে গিয়ে ধর্ণা দিল। হোষ্টেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট দয়া করে হোষ্টেলে থাকতে দিলেন।—কলেজেও ফ্রি পড়তে পেল অভিজিৎ ফিলজফিতে অনার্স নিতে হল তাকে। তারপর আরও দুর্যোগ এল তার জীবনে। মা তার মারা গেলেন। বি-এ পরীক্ষায় অনার্সে সে পেল না। শুধু পাস কোর্সে পাশ করে গেল। তার চেয়ে অনেক কম নম্বর পেয়েছিল সুভাষ। সে সংস্কৃত অনার্স নিয়ে ফার্ষ্ট ক্লাস পেয়ে গেল।

তারপর আর তার পড়া শোনা হবার কথা নয়। দাদার চেষ্টায় পোর্ট কমিশনে একটা চাকুরী পেল কেরাণীর। দাদার বাসায় গিয়ে উঠল। মাইনে যা' পেল প্রতিমাসে দাদার হাতে তুলে দিল। নিজের প্রয়োজনের টাকাও তার হাতে রইল না। টিউশানি করতে বাধ্য হল দাদা বৌদির অজ্ঞাতে,—নইলে তার সে উপার্জনেও তাদের হাত পড়বে। প্রাইভেটে এম-এ পড়তে লাগল সে। কিন্তু প্রত্যেক বছর ফি দেওয়ার সময় পড়া থামিয়ে সাবজেক্ট্ পাল্টাতে লাগল। কি সাবজেক্টে পরীক্ষা দিলে তার লাক খুলতে পারে সেটাই যেন স্থির করা একটা সমস্যা। কয়েকবার সাবজেক্ট পালটে শেষ পর্যন্ত এম-এ পরীক্ষায় বসে গেল অভিজিৎ—দাদা বৌদিকে না জানিয়ে। কোন রকমে থার্ড ক্লাস পেল ইকনমিক্সে। দুঃখের কাহিনী সে একদিন বলে ফেলল প্রবীণ সহকর্মী নীলাঞ্জন চক্রবর্তীকে। নীলাঞ্জনবাবু অনেক সান্ত্বনা দিলেন। বললেন, 'বলব কী অভিজিৎ—তোমরা ছেলে মানুষ। আমাদের ভাগ্যে কি আছে জানি না—ভাগ্য অনেক সময় দিতে চাইলেও আমরা ঠিক বাছাই করতে পারিনে বলে ঠকে যাই। দেখলে না, তুমি আই-এ না পড়ে যদি আই-এস-সি পড়তে ফার্ষ্ট হতে—ফিলজফি অনার্স না নিয়ে সংস্কৃত নিলে ফার্ষ্ট ক্লাস পেতে। ইকনমিক্স না নিয়ে ফিলজফিতে এম এ-দিলে আর কিছু না হোক থার্ডক্লাস পেতে না। বড় কঠিন ব্যাপার অভি-এ ঠিক যেন ঘোড়া বাছাই করা। ভাগ্য তোমাকে দুই হাতে ঢেলে দেওয়ার জন্যে তৈরী তুমি শুধু ঘোড়াটা সঠিক বাছাই করতে পারলেই হল। চল না একদিন মা লক্ষ্মীর মাঠে।

অভিজিৎ বহুদিন দেখেছে কত লোক জুটেছে রেস কোর্সে। রোজ অফিসে সে আসাযাওয়ার পথে সে দেখে যাচ্ছে এই রেস কোর্সে। নীলাঞ্জন দা এই রেস কোর্সেরই নাম দিয়েছেন মা লক্ষ্মীর মাঠ। এই মাঠে ঘোড়ার খুরের ধূলিতে লক্ষ লক্ষ মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। তার কত বার সাধ হয়েছে এই মাঠে প্রবেশ করবার, কিন্তু সাহস হয় নি। শুধু শুধু পয়সা নষ্ট হবে হয়ত। কিন্তু নীলাঞ্জন দার ভরসা পেয়ে টিউশানির পনরটি টাকা পকেটে করে তার পিছে পিছে একদিন সত্যি সত্যি প্রবেশ করল অভিজিৎ। চেনা অচেনা কত লোকের উৎফুল্ল আবেগে মা লক্ষ্মীর মাঠে যেন একটা কিসের ঢেউ বয়ে চলেছে—স্রোত বয়ে চলেছে। সে স্রোতে ভেসে পড়ল অভিজিৎ। তার ঘোড়া জিতল···সে পেল নগদ নগদ ছয়শ সাঁইত্রিশ টাকা। নীলাঞ্জনদা মার খেয়েছেন। কিন্তু সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। অভিজিৎকে মাথায় নিয়ে নাচলেন। তারপর আরো তিনটি ইয়ারকে টেনে নিয়ে টেক্সীতে তুললেন অভিজিৎকে। টেক্সী সোজা গিয়ে দাঁড়াল একটা হোটেলের সামনে। এই হোটেলের পাশদিয়ে অভিজিৎ জীবনে কখনও আসেনি। হোটেলে বাজনা বাজছে। একটি উলঙ্গমেম নাচছে। সবাই খাচ্ছে আর দেখছে। একটা টেবিলের পাশে পাঁচজন গিয়ে বসল। অভিজিৎকে কিছুই করতে হল না, বলতে হল না। নীলাঞ্জন দার আদেশে মদ আসল, আর বয়ের কানে কানে কি বললেন তিনি অভিজিতের জন্য এল মিষ্টি সিরাপ। কিন্তু সেও কড়া কম নয়। অনেক রাত পর্যন্ত সকলে কাটাল সেখানে।

চারজন নর্তকীর সঙ্গে নাচলেন নীলাঞ্জনদা তিন ইয়ার নিয়ে। নর্তকীদেরও মদ খাওয়ান হল অভিজিতের টাকাতে। অভিজিত না বলতে পারল না। যে নর্তকী উলঙ্গ হয়ে নেচেছিল সেও একবার এসে অভিজিতের মাথায় চুমু খেয়ে গেল। সবাই বুঝতে পেরেছে তার মাথায় আজ কাঠাল ভাঙ্গা হচ্চে। নর্তকীদের ও ইয়ারদের নিয়ে নীলাঞ্জনদা নীচে এসে তিনটা টেকসী করলেন। একটাতে তুললেন অভিজিতকে। ড্রাইভারকে বললেন সোজা বেলেঘাটা চলে যাও। নিজে চার নর্তকী আর তিন ইয়ারকে নিয়ে অন্য দুই টেক্‌সীতে চড়লেন। ওদের টেক্‌সী কোথায় গেল, কে জানে? অভিজিতের টেক্‌সী যখন বাড়ীর কাছে গেল সে টেক্‌সীভাড়া চুকিয়ে দিয়ে হিসাব করে দেখল তার আর মাত্র সাঁইত্রিশ টাকা আছে।

অভিজিতের রাত্রে দেরীতে বাড়ী ফেরা নিয়ে তার বৌদি প্রায়ই ঘ্যান ঘ্যান করে! দাদা-বৌদিতে প্রায়ই ঝগড়া হয়। সেদিন বাড়ীতে ঢুকবার আগে ঝগড়া বেশ জমেছে। অভিজিৎ বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঝগড়ার কিছুটা শুনল। বৌদির মুখে যা শুনল তাতে তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্বাঙ্গ যেন জ্বলে উঠল। দাদা বৌদির সঙ্গে একমত হয়ে স্থির সংকল্প প্রকাশ করলেন—'আজ আসুক মজা দেখাচ্ছি। রোজ এমন রাত করে ফিরলে; তুমি আর ওর ভাত রাঁধবে না। যেদিকে পথ দেখে সেদিকে সে যেন চলে যায়। জানিয়ে দেবে এ-কথা।' ঠিক সেই সময় ঘরে প্রবেশ করল অভিজিৎ। একটা আকস্মিক উত্তেজনায় তার বিকৃত কণ্ঠস্বর যেন অসুরের মত গর্জে উঠল—"না, আর জানাতে হবে না আমাকে। আমি এখনি চললুম। তোমাদের কষ্ট দিয়ে বৌদির স্বাস্থ্য নষ্ট করে আমি এখানে থাকব না।" দাদা বৌদি দুজনেরই তখন মেজাজ চড়া ছিল সপ্তমে। কেউ অভিজিৎকে একটু মিঠে গলায় সাধল না। এত রাতে কোথায় যাবে সে জানে না,—তবু একটা বিছানার মধ্যে কয়টা জামা প্যাণ্ট ঢুকিয়ে বেরিয়ে পড়ল। দাদার বাচ্চাগুলি জেগে থাকলে হয়ত, ওরা চীৎকার করত, 'গাগা' তুমি যাবে না' বলে কাঁদত। কিন্তু তখন তার স্নেহের বন্ধন সব নিদ্রিত, দাদার ভ্রাতৃস্নেহ মৃত, বৌদির কপট আদরের মুখোস উন্মোচিত। অনায়াসে সে বেরিয়ে চলে এল। চেপে বসল একটা রিক্‌শায়। আদেশ করল চল সিদ্ধেশ্বরী বোর্ডিংএ। সেখানে একটা ঘর নিয়ে থাকে তার অফিস-বন্ধু নিখিল। তার কাছেই আজ রাত্রে তাকে আশ্রয় নিতে হবে।

সে-সব দিনের কথা মনে পড়ে অভিজিতের। মা লক্ষী তো তার উপর প্রসন্না হয়েই ছিলেন। প্রথম প্রার্থনাই তিনি শুনেছিলেন। তাঁর প্রথম ঘোড়াই তাকে ছয়শ' সাঁইত্রিশ টাকা দিয়েছিল। কিন্তু নীলাঞ্জনদা তাকে ভিন পথে নিয়ে গেল—যে পথে মা লক্ষ্মীর অভিশাপ রয়েছে ছড়ানো। যে যাবে সে পথে তার আর রক্ষা নেই। নিকুঞ্জ মা লক্ষ্মীর আশীর্বাদে একটি হাজার টাকা নিয়ে সোজা মসলার দোকান খুলল খিদিরপুর বাজারে। সে হাজার টাকায় এখন লক্ষ লক্ষ টাকা এসেছে—আসছে—আরও আসবে। মা লক্ষ্মীর মহিমা যে বুঝতে পেরেছে, সেই পায় তার কৃপা। কিন্তু মা যদি আবার কৃপা করতেন অভিজিৎ আর ও-পথে যেত না, হাটত না নীলাঞ্জনের সঙ্গে একপা-ও। রেস্ কোর্সের পাশ দিয়ে যাবার ও আসবার সময় রোজ একথা তার মনে পড়ে। অভিজিৎ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে সারাটি মাঠ—তার বেড়া; তার চোখের সামনে ভেসে উঠে সেই সব ঘোড়ার ছবি—যাদের পিঠে ভর করে নেবে আসে মা লক্ষ্মীর আশীর্বাদ। এই সুন্দর মাঠ—কত সুন্দর এই মাঠ—১৮৩৭ সালে এর সৃষ্টি। তারপর কত মহাত্মা পুরুষ, ভাগ্যবান পুরুষ এ মাঠে এসেছেন। এসেছেন সম্রাট পঞ্চম জর্জ, রাণী মেরী, আবিসিনিয়ার সম্রাট। এসেছেন দালাই লামা, পাঞ্চেন লামা, ধনকুবের আগা খাঁ। এঁরা সকলেই মা লক্ষ্মীর বর-পুত্র। মা লক্ষ্মীর কৃপাপ্রাপ্ত। অভিজিৎ কতদিন বেড়ার ধারে এসে মা লক্ষ্মীকে প্রণাম জানায়। প্রবেশ করতে সে পারে না। তার হাতে পয়সা থাকে না বলে। মেসের পয়সা তাকে দিতে হয়, তারপর দাদাকেও টাকা দিতে হয়। ভাইপো ভাইঝি কয়টির কষ্টের কথা ভেবে অভিজিৎ দাদাকে টাকা দেয় বৌদির প্রতি রাগ থাকা সত্বেও।

এর পরেও কয়েকবার প্রবেশ করেছে অভিজিত মা-লক্ষ্মীর মাঠে। মা প্রসন্ন হন নি। কেন জানি না, হন নি। প্রত্যেকবার তার টাকা মারা গিয়েছে। কিন্তু সেই যে বার বেলেঘাটার তন্ত্রাচার্য জীবেন্দ্র পুরাণরত্নের আশীর্বাদ ও

নম্বর নিয়ে গেল, অভিজিতের আগেকার সকল ক্ষতি একদিনে পূরণ হয়ে গেল। অভিজিৎ টাকা কয়টি নিয়ে তন্ত্রাচার্যের কাছে সোজা চলে গেল। রাস্তায় কত লোক তাকে ডাকল। নীলাঞ্জনদা, বীরেশবাবু, মিসেস গোমেশ। কারও কথাই সে শুনল না। তন্ত্রাচার্য মহাশয় সব শুনে প্রীত হলেন, কিন্তু চিন্তায় যেন তাকে কেমন পীড়িত করে ফেলল, বললেন, 'দেখ অভি, তোমার টাকা এসেছে বটে এ টাকা থাকবার নয়। তুমি টাকাটা সৎ কাজে খরচ কর। অর্থাৎ পূজা-পার্বণ কিছু কর। গ্রহগণের পূজা দরকার। মা শ্যামারও পূজা করা প্রয়োজন। জান তো মা শ্যামা নিজে হচ্ছেন মহালক্ষ্মী। তার কৃপা ছাড়া এ-সব দ্যূতক্রীড়ার ভাগ্য খুলতে পারে না। তুমি টাকাগুলি বাজেভাবে খরচ করো না। তাছাড়া আমাকে কিছু দক্ষিণা দেবে, আমি তোমায় ঘোড়ার রঙ্ দেখে, জকি দেখে, তাদের ঘোড়ার পিঠে কত ওজন দিচ্ছে তা দেখে, নক্ষত্রের প্রভাব দেখে, কোন্ ঘোড়া জিতবে তার গণনা শিখিয়ে দোব।' তন্ত্রাচার্য সেদিন মিঃ দাগাকে ঘোড়ার নম্বর বলে দিলেন। দাগা পেয়ে গেলেন মস্ত একটা দান। কিন্তু মিঃ দাগা কত টাকা দিলেন আচার্যকে? তিনি যে যা দেয় তা নিয়েই খুশী। তা দিয়েই মায়ের পূজা করেন —পূজার শেষে কারণ-বারি পান করেন। তখন মায়ের আদেশ পান। তন্ত্রাচার্যের শক্তি দেখে আশ্চর্য হয়েছে অভিজিৎ! কিন্তু আচার্যদেব নিজে মা লক্ষ্মীর মাঠে যান না কেন? তিনি যদি যেতেন আর গণনা করে ঘোড়া ধরতেন, সব টাকা তো তাঁরই ঘরে চলে আসত। কিন্তু আচার্যদেব তো সংসারের টাকা পয়সা, ধনদৌলত সব কিছুকে তুচ্ছ বলে জেনেছেন। তাই ওপথে যান না। যে যা' দেয়, তা দিয়ে মায়ের পুজো করেন, পুজোর প্রসাদ খেয়ে-পিয়ে জীবন ধারণ করেন, সাধন-ভজনের শক্তি সঞ্চয় করেন। কতবার ইচ্ছা হয়েছে অভিজিতের তন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে তন্ত্রাচার্যের মত ঐসব বিদ্যা আয়ত্ত করে। কিন্তু তন্ত্রাচার্য সে দীক্ষা দেন নি। বারবার বলেছেন—'এ বড় কঠিন পথ বাছা, এ পথে এসোনা।' আচ্ছা, নাইবা শেখালেন গণনা, কিন্তু দিব্যদৃষ্টিতে যে ঘোড়া জিতবে দেখতে পান, সেই ঘোড়ার নামটা কেন বলেন না তিনি অভিজিৎকে। তাহ'লে অভিজিতেরও আনন্দ হয়—প্রভুর পূজার্চনার টাকাও আসে। তবু আকারে ইঙ্গিতে যা প্রকাশ করেন তিনি, তা থেকেই অনেক লাভ করেছে অভিজিৎ। গত শীতের মরসুমে পেয়েছে পাঁচটা দান—ছোট হোক, তবু মন্দ নয়। প্রভুর কথা বুঝতে না পেরে তিন দিন মারও খেয়েছে।

রেসের মাঠে ঘোরাফেরার খবরটা দাদা বৌদির পেতে দেরী হয় না। বৌদি বলেছেন, এবার তোমার ভাই ঠিক রসাতলে গেল। দাদাও স্থির করলেন রবিবার যদি বাসায় আসে তাহলে তিনি ছেলেমেয়েদের নিয়ে হাসি ঠাট্টা তামাসা করতে দেবেন না। এমন হীনচরিত্র কুলাঙ্গারকে তিনি সহ্য করবেন না আর। কিন্তু দাদার সব সংকল্প শূন্যে মিলিয়ে গেল রবিবারের সকালে যখন বৌদি হাতে অভিজিতের দেওয়া পঞ্চাশ টাকা দামের সিল্কের শাড়ীখানা নিয়ে তার ঘুম ভাঙাতে গেল। দাদার জন্যেও একটা সিগারেট কেস নিয়ে গিয়েছিল অভিজিৎ, আর ভাইপো ভাইঝিদের জন্যে জামা, ফ্রক। দাদা মধুর হেসে ঘুম থেকে উঠে অভিজিৎকে ডাকলেন—কিরে অভি বড় সকাল সকাল যে? প্রমোশন হয়েছে নাকি এত খরচ করছিস?

'না প্রমোশন হবে কি করে? মা লক্ষ্মীর মাঠে গিয়েছিলুম। পেলুম পাঁচশো টাকা। তাই—'

'মা লক্ষ্মীর মাঠে? রেসে পেয়েছিস? খবরদার আর যাস নি ও পথে। নীলাঞ্জনদা রসাতলে গেল রেসের নেশায়। তার কত ধার কত দেনা! বৌএর গয়না বিক্রী করে এখন তিনি রেস্ খেলেন! তার সাকরেদ হয়েছিস নাকি?'

'না, দাদা সাকরেদ কারো হইনি।' বলে সাফাই গেয়েছিল অভিজিৎ।

তারপর অভিজিতের রেসে যাওয়ার সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। দাদা তার বিয়ের প্রস্তাব করেছিলেন নানাস্থানে কিন্তু এই এক অপবাদে সব বিয়ে ভেঙ্গে যেতে লাগল। একটা কি রকম প্রতিক্রিয়া দেখা গেল অভিজিতের মনে। রেসের দিকে মনোযোগ কমিয়ে টিউশনির দিকে অভিনিবেশ করল সে। তাতে ফলাফল কিছুটা নিশ্চিত। মাসের শেষে মাইনেটা প্রায় ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। মারা যে যায় না, সেকথাটাও একেবারে মিথ্যে নয়। জগন্নাথ হোড়ের ছেলেকে দু-মাস পড়িয়ে

একটি পয়সাও সে পায় নি। কিন্তু আবার নিতাইবাবুর মেয়েকে পড়াতে পেয়ে যেন একটা সৌভাগ্যের দ্বার খুলে গেল তার। মাসে মাসে পঞ্চাশটি টাকা। তারপর পড়াতে এলেই ভাল খাবার আর চা। নিতাইবাবুর স্ত্রীর স্নেহ। গৌরী ছাত্রী ভাল। তাকে বোঝাতে হয় না তত বেশী। এও যেন ঠিক ঘোড়া ধরার মত। ঠিক যদি ধরতে পার তোমার সৌভাগ্য। যদি না পার তুমি রসাতলে গেলে। অভিজিৎ মা লক্ষ্মীর মাঠে বহুদিন যায় নি। কিন্তু তার মনে হতে লাগল মা লক্ষ্মীর মাঠ সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। যা কিছু করছ—সব যেন ঘোড়ার লেজ ধরা। ভুল ধরেছ কি গিয়েছ।

নিতাইবাবুর একমাত্র মেয়ে গৌরী। পেনসান নিয়ে রিটায়ার করবেন একবছর পরে। অভিজিতের কাছে তারই আগে তিনি কন্যা সম্প্রদান করে নিশ্চিন্ত হতে চান। তিনি অভিজিতের দাদা সজিতের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। অভিজিতের ভাগ্য দেখে সজিতেরই হিংসা হতে, লাগল। সে নিতাইবাবুকে সাবধান করে দিল। বলল 'ছেলে আপনি ভাল পাবেন বটে কিন্তু একটি বড় রোগ আছে তার—বড় নেশা একটা—ঘোড় দৌড়ের নেশা। নইলে সে সব রকমে ভাল। নিতাইবাবু কথাটা বিশ্বাস করেছিলেন বটে। কিন্তু মিথ্যে হলেই খুশী হতেন। তবু স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে শেষ পর্যন্ত অভিজিতকেই কন্যা দান করা স্থির করে ফেললেন। সব রকমে অভিজিতের মত ভালো ছেলে আর কোথায় পান নি তিনি। রিটায়ার করে নৈহাটীতে গিয়ে পৈত্রিক বাড়ীতে বাস করবেন শেষ বয়সে। মেয়েকে কাছে না রাখলে তার চলবে না। তখন অভিজিতকে ডেইলী প্যাসেঞ্জারী করতে হবে নৈহাটীর বাড়ী থেকে। এই সব প্রস্তাবেই অভিজিৎ রাজী। এমন ছেলে কোথায় পাবেন নিতাইবাবু? তিনি রিটায়ার করার একমাস আগে কন্যা দান করলেন। গোপনে খবর নিয়ে তিনি জানলেন গত একটা বছরে একদিনও রেসে যায় নি অভিজিৎ।

হস্তাচার্য বলেছিলেন এ বিবাহে অভিজিৎ সুখী হবে। সজিৎ ও তার বৌদি সেটা ভেবে কেমন ঈর্ষ্যা অনুভব করেছিল। কিন্তু নিতাইবাবুকে এ ব্যাপারে স্থির সঙ্কল্প দেখতে পেয়ে আর কোনও অজুহাতে অভিজিতের রেসের নেশার কথা উত্থাপন করে নি। শুধু মনে মনে ব হেসেছে—'যাক দেখা যাবে, বুড়োর কি সুখটা হয়?'

নিতাইবাবুর কন্যা গৌরীর সঙ্গে বিয়ে হয়ে গে অভিজিতের। মেস ছেড়ে নৈহাটী শ্বশুর বাড়ীতে থে ডেইলী প্যাসেঞ্জারী করে সে খিদিরপুরে অফিস কর লাগল। নিয়মিত খেয়েদেয়ে শরীর বেশ ভাল হ'ল তার কিন্তু মন তার প্রফুল্ল হতে পারল না। গৌরী যেদিন ব বৌয়ের অর্থাৎ সজিতের স্ত্রীর কাছে শুনেছে স্বামী তা রেসের খেলার জন্য পাগলা ছিল এককালে—সেইদিন থেকেই তার পেছনে লেগেছে। অভিজিৎ অফিস থেকে বেরিয়ে কোথায় গেল—শনিবার কোথায় গেল, সব খবর তার জানা চাই। অভিজিতকে অজস্র প্রশ্নে সে উত্যক্ত করে তুলত। তার কেবল সন্দেহ—অভিজিৎ রেসে যায় বুঝি। সেখানে টাকা নষ্ট করে বুঝি। বেসুরে বায়ুতে পেলে মানুষ স্ত্রীর গয়না বেচে রেস খেলে—মদ খায়, খারাপ মেয়ে-মানুষের বাড়ী যায়! এসব কথা গৌরী ভালকরেই জানে। অভিজিতও যদি যায়! সেই দুশ্চিন্তায় তার ঘুম হয় না। অভিজিৎকে সন্দেহ করে। সেই সন্দেহের খোঁচাতেই অভিজিৎ কেমন জর্জরিত। কতবার ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে সে বলেছে! "বিশ্বাস কর গৌরী, ওপথে আমি আর যাই নে।" গৌরী ঠোঁট বেঁকিয়ে বলেছে—'পুরুষ মানুষকে বিশ্বাস?'

অবিশ্বাসের গঞ্জনা সয়ে সয়ে অভিজিৎ যেন কেমন হয়ে গিয়েছিল। যে মাত্র কিছুদিন আগে ছিল বিনীতা ছাত্রী, বিয়ের পরদিন থেকেই সে যেন রূপান্তরিত হয়েছে দুর্বিনীতা গৃহকর্ত্রীতে। নিতাইবাবুর উত্তরাধিকারিণী সে। অভিজিৎ তার ভাগ্যে সৌভাগ্যবান্ এ জ্ঞান তার টন্‌টনে। তার এই জ্ঞানের উত্তাপে অভিজিৎ যেন জলছিল নিত্য। মনে পড়ল লাকী ঘোড়া যেমন টাকা আনে—সে টাকার আবার জ্বালাও আসে,—মা লক্ষ্মীর মাঠের সব কথা মনে পড়ে অভিজিতের। কেমন একটা প্রবল আকর্ষণ অনুভব করে সে। কী সুন্দর মাঠ! সম্রাট পঞ্চম জর্জ, রাণী মেরীর পদার্পণে ধন্য এই মাঠ—ইংরেজ রাজত্বের শ্রেষ্ঠ কীর্তি এই মাঠ। তার আকর্ষণ অবহেলা করার সাধ্য আছে অভিজিত রায়ের? শীতের শনিবার। অফিস থেকে সকাল সকাল পালাল অভিজিৎ। মালক্ষ্মীর মাঠে চুপি চুপি

প্রবেশ করল সে—সন্দেহ-দগ্ধ পত্নী যেমন করে প্রথম পরকীয় প্রেমের পথে প্রথম পা বাড়ায়।

দৌড়াবে কে? পালেস্কা, একোনাইট, হাতারস্‌-ফিল্ড, শয়তান, মেড্রাস্ কুইন। একোনাইটের নামে উৎসর্গ করল অভিজিৎ—পকেটে যা ছিল। 'মা লক্ষ্মী' অনেকদিন পরে ছেলেকে আসতে দেখে বুঝি প্রসন্না হয়েছিলেন। তিনি দুহাতে ঢেলে দিলেন। টাকা নিয়ে একা একা মাঠ থেকে বেরুল অভিজিৎ। মনের অতৃপ্ত আকাংক্ষা যা যা এত দিন তাকে পীড়িত করছিল সব মেটাল—অল্প সময়ে যা সম্ভব। গৌরীর জন্য একখানা শাড়ী কিনল, স্কার্ফ কিনল, পাঁচশত টাকায়, শ্বশুরের জন্যে কিনল একখানা বালাপোষ, শাশুড়ীর জন্যে একটা কাশ্মিরী শাল। প্রায় এক হাজার টাকা তার খরচ হয়ে গেল। তবু পকেটে রয়েছে সাতশ' নব্বই টাকা। এত সব নিয়ে যখন সে নৈহাটী ষ্টেশানে নামল তখন রাত সাড়ে দশটা।

নিতাইবাবু মেয়ের উদ্বেগ আর ছটফটানিতে ঘরে না থাকতে পেরে ষ্টেশনে এসে টহল দিচ্ছেন। এক একটা গাড়ী আসছে যাত্রীরা ছুটে চলছে। তিনি তাদের মুখের দিকে তাকাচ্ছেন, আর খুঁজছেন অভিজিৎকে। এক একবার ভাবছেন আজ জামাইকে কিছু শোনাবেন—তার পরক্ষণেই কোলকাতার রাস্তার বিপদের কথা ভেবে মনটা তার কেমন আঁৎকে উঠছে। শীতের রাতে নটা থেকে টহল দিয়ে দিয়ে শরীরটা তার কাঁপছে। এমন সময় বগলে তিনটি প্যাকেট নিয়ে সাড়ে দশটার ট্রেণে নেবে এল অভিজিৎ। তাকে দেখতে পেয়ে নিতাইবাবুর মনে যে একটা উদ্বেগনাশী স্বস্তি এল, তাতে আর জামাতাকে তিনি ভৎর্সনা করতে পারলেন না। অভিজিৎ রিকশা ডাকল। সেই রিক্‌শায় উঠে বসেই সে দেখল নিতাইবাবু শীতে কাঁপছেন। একটা প্যাকেট খুলে শ্বশুর মশাইর হাতে দিয়ে অভিজিৎ বলল, নিন বাবা, এটা গায়ে দিন, আপনি শীতে কাঁপছেন।

রিকশায় বাড়ী পৌছতে পাঁচ মিনিট লাগল। বালাপোষ গায়ে প্রফুল্লমুখে নেবে বাড়ীতে ঢুকলেন নিতাইবাবু। তার পেছন পেছন জামাতা অভিজিৎ। তার বগলে দুই প্যাকেট। এগিয়ে গিয়ে শাশুড়ীকে প্রণাম করে তার হাতে দিল কাশ্মিরী শালখানা—গৌরীর হাতে দিল চারশত পঞ্চাশ টাকা দামের শাড়ীটা। যে-যে ভাষায় গালি দেবে বলে গৌরী তৈরী করেছিল নিজেকে সব ভুলে গেল শাড়ী দেখে। পাঁচ খানা একশ টাকার নোট দিল অভিজিৎ গৌরীকে শ্বশুর শাশুড়ীর সামনেই। এ দিয়ে গৌরী যেন একটা অলঙ্কার গড়াতে পারে। গৌরী ভুলেই গিয়েছিল যে অভিজিৎকে যোগ্য শিক্ষা দেওয়ার দৃঢ় সংকল্প করে ছিল সে। বিস্ময় আর আনন্দের উদ্বেলতা সংযত করে সে সহাস্যে প্রশ্ন করল, "এত টাকা কোথায় পেলে গো? লটারীতে নাকি?"

শ্বশুর শাশুড়ীর সপ্রশ্ন দৃষ্টির সামনে অভিজিৎ স্ত্রীকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলল, "হ্যাঁ, এও লটারীই বটে, তবে মা লক্ষ্মীর মাঠে-ঘোড়ার খুরে ধূলির সঙ্গে উড়ে এসেছে এ-টাকা।'

বালাপোষ গায়ে শ্বশুর, শাল হাতে শাশুড়ী, শাড়ী আর টাকা হাতে স্ত্রী একে অন্যের মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

ততক্ষণে অভিজিৎ কাপড় জামা খুলে ফেলে স্নানের ঘরে চলে গেছে।

যুদ্ধ ও দেশবাসীর কর্ত্তব্য—

আমরা ১৯১৪ সালে প্রথম জার্মান যুদ্ধ ও ১৯৩৯ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছিলাম। উভয় যুদ্ধে সমগ্র পৃথিবীর বহু দেশের কত কোটি মানুষ ও কত লক্ষ কোটি মূল্যের জিনিষ নষ্ট হইয়াছে আজও তাহার হিসাব করা যায় নাই। প্রথম যুদ্ধের ক্ষতি পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই দ্বিতীয় যুদ্ধ আসিয়া উপস্থিত হয় এবং এবারে তাহা সমগ্র জগতে ছড়াইয়া পড়ায় ভারতবর্ষকে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। প্রথম যুদ্ধে আমরা টাকা ও মানুষ দিয়া ইংরাজকে সাহায্য করিয়াছিলাম—সে জন্য দ্বিতীয় যুদ্ধে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ইংরাজকে ভারত ছাড়া করার আন্দোলন করি ও তাহার ফলে হাজার হাজার দেশনেতা কারাগারে থাকিতে বাধ্য হয়। ঐ সময়ে শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু গোপনে ভারত হইতে ইউরোপে পলাইয়া যান ও পরে জাপানে আসিয়া ব্রহ্ম সীমান্তে ভারতের বিরুদ্ধে—ইংরাজের কবল হইতে পরাধীন ভারতকে মুক্ত করার জন্য সংগ্রাম করেন—কিন্তু বিভ্রান্ত ভারতবাসীরা তাঁহাকে সাহায্য না করায় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল—কিন্তু আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও ভারতে ক্রমবর্দ্ধমান অসন্তোষ দেখিয়া ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ইংরাজ ভারতকে স্বাধীনতা দান করিয়া ভারত ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। কিন্তু চলিয়া যাইবার পূর্বে ইংরাজ ভারতকে দুই-ভাগে ভাগ করিয়া দিয়া যান। হিন্দু প্রধান ভারত হইল ভারত রাষ্ট্র এবং মুসলমান প্রধান ভারত হইল পাকিস্তান। পাকিস্তান আবার দুই ভাগে বিভক্ত—প্রায় চারদিকে ভারত রাষ্ট্র বেষ্টিত পূর্বাঞ্চল (পূর্ব্ববঙ্গ) হইল পূর্ব্ব পাকিস্তান এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও পাঞ্জাবের পশ্চিমাংশ লইয়া হইল—পশ্চিম পাকিস্তান। তখন লোক মনে করিয়াছিল যে মুসলমানপ্রধান অংশগুলি পাইয়া মুসলমানগণ সন্তুষ্ট থাকিবে ও সুখে-শান্তিতে বাস করিবে। দক্ষিণ-ভারতে হায়দ্রাবাদ ও পশ্চিম-ভারতে রাজকোট লইয়া মুসলমানগণ গণ্ডগোল আরম্ভ করিয়াছিল—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সেখানে শান্তি স্থাপিত হয়। কাশ্মীররাজ্য লইয়া পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ গোড়াতেই গোলমাল করে—কিন্তু শান্তিকামী ভারতরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী জহরলাল নেহরু যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দেন—ফলে কাশ্মীরের বৃহত্তর অংশ ভারত-রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত থাকে ও ক্ষুদ্রতর অংশ পাকিস্তানের হাতে থাকে—সে অংশ আজাদ কাশ্মীর নামে পরিচিত হয়। পাকিস্তানের কর্ত্তারা তদবধি গত ১৭।১৮ বৎসর সমগ্র কাশ্মীর রাজ্য পাকিস্তানের মধ্যে পাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল। তাহাদের চেষ্টায় ঐ স্থানে চিরদিন অশান্তি সৃষ্ট হইত এবং তাড়া খাইলেই পাকিস্তানীরা পলায়ন করিত। তাহারা এ বিষয়ে বার বার রাষ্ট্রসংঘের নিকট অভিযোগ করিয়াছে—কিন্তু তাহাদের যুক্তিহীন কথা কেহ শুনে নাই। বার বার তাহাদিগকে বিফল হইতে হইয়াছে।

এই ত কাশ্মীর সমস্যার কথা—পূর্ব্ব পাকিস্তানের ৪ দিকে ভারতরাষ্ট্র—ভারতের মানুষ চিরদিন শান্তিকামী—তাহারা কখনও পররাজ্য গ্রাসের চেষ্টা করে না—বিশেষ করিয়া প্রধান মন্ত্রী জহরলাল নেহরু দুইটি বিশ্বযুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতি দেখার পর যুদ্ধ বিরোধী ছিলেন বলিয়া ভারতরাষ্ট্র পাকিস্তানের অত্যাচার ও অনাচার ১৭।১৮ বৎসর ধরিয়া সহ্য করিয়াছিলেন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে কতবার যে ভারতরাষ্ট্রকে পাকিস্তানী অনাচারের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসংঘে নালিশ করিতে হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। বিরোধ মীমাংসার জন্য শত শতবার ভারত ও পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী, বড় বড় সরকারী কর্মচারী, পুলিস কর্তৃপক্ষ প্রভৃতি মিলিত হইয়া আপোষের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু কোন ফললাভ হয় নাই। পাকিস্তান বার বার প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছে—বার বার রাষ্ট্রসংঘের সভায় ত্রুটি স্বীকার করিয়াছে—কিন্তু কাজে কিছুই করে নাই।

তাহার পর কয় বৎসর পূর্বে আসিল চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণ। ভারতের সমগ্র উত্তর-প্রান্ত হিমালয় পর্বত দ্বারা সুরক্ষিত—ভারত সেদিক দিয়া কখনও বিপদের আশঙ্কা করে নাই। মোগল পাঠান প্রভৃতি আক্রমণকারীরা উত্তরপশ্চিম-সীমান্তের পার্বত্য পথ দিয়া ভারত আক্রমণ করিত—ইংরাজ আসিয়াছিল জাহাজে সমুদ্র পথে। এবারে চীন তিব্বত জয় করিয়াই হিমালয়ের পথে সুউচ্চ পর্বতমালার উপর দিয়া হঠাৎ ভারত আক্রমণ করিয়া কয়েক শত মাইল পার্বত্য জমি দখল করিয়া লইল। ভারত ঐ-দিকে বেশী সৈন্য রাখিত না—কাজেই ঐ পথে সৈন্য লইয়া যাইতে বিলম্ব হইল—কিন্তু ভারতীয় সৈন্য দেখিয়াই চীনা সৈন্যরা পশ্চাদপসরণ করিল—ভারত উত্তর দিকে ঘাঁটি স্থাপন করিয়া ভারতকে সুরক্ষিত করিল।

ভারতের উত্তরে ও তিব্বতের দক্ষিণে নেপাল, ভুটান ও সিকিম রাজ্য অবস্থিত। চীন সে সকল দেশের সহিত মৈত্রী প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় বিফল হইল এবং ভারত ঐ তিনটি দেশের সহিত নূতন করিয়া মৈত্রী বন্ধন করিয়া তাহার ঐ প্রান্ত সুরক্ষিত করিল। কিন্তু পাকিস্তান ভারতের শত্রু বলিয়া চীনের সুবিধা হইল—চীন বার বার পাকিস্তানকে ভারতের সহিত যুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিল। বাহিরের দেশগুলির মধ্যে আমেরিকা পৃথিবীর সবাপেক্ষা বড় ধনী ও জনবহুল রাজ্য। আমেরিকা যুদ্ধ না চাহিলেও ব্যবসার প্রসার চায়—সে জন্য সে ভারতকে যেমন পণ্যদান ও যুদ্ধোপকরণ সরবরাহ করিয়া সাহায্য করিত, তেমনই পাকিস্তানকেও তাহার প্রয়োজন মত পণ্য ও যুদ্ধোপকরণ সাহায্য করিয়াছে। সর্ত ছিল ভারতের সহিত যুদ্ধে পাকিস্তান কখনও আমেরিকার প্রদত্ত অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহার করিবে না। পাকিস্তান চিরদিন বিশ্বাসঘাতক, কাজেই চীনের কথায় এবং চীনের অর্থ ও যুদ্ধ সরঞ্জাম সাহায্য পাইয়া পাকিস্তান ভারতের সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল।

ভারতরাষ্ট্রের অন্তর্গত কাশ্মীর রাজ্য ও পাকিস্তান অধিকৃত আজাদ কাশ্মীর পাশাপাশি অবস্থিত—কাশ্মীর পাহাড় ও জঙ্গলের দেশ। উভয় রাজ্যের মধ্যে যাতায়াতের জন্য বহু গিরিপথ আছে—সে সকল পথ সুগম না হইলেও একেবারে দুর্গম নহে। ভারত জানিত, পাকিস্তান চীনের প্ররোচনায় ও চীনা সাহায্যে শীঘ্র যুদ্ধ করিবে—তাই ভারতরাষ্ট্রও পাকিস্তানের সহিত যুদ্ধের জন্য কাশ্মীরে নিজেদের প্রস্তুত রাখিয়াছিল। আগষ্ট মাসের প্রথমেই ভারত খবর পাইল যে পাকিস্তান বহু হানাদার সৈন্যকে নানা বেশে কাশ্মীরের মধ্যে প্রেরণ করিয়াছে—যখন সে সংবাদ নানাভাবে সমর্থিত হইল, তখন গত ৫ই আগষ্ট তারিখে ভারতীয় সৈন্যরা হানাদার বিতাড়ন কার্য্য আরম্ভ করিল। ঐ দিনটি ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় দিন। এই সুদীর্ঘ প্রায় ১৮ বৎসর ভারতরাষ্ট্র পাকিস্তানের সকল অনাচার ও অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়া আসিতেছিল। বিশ্বব্যাপী বিরাট যুদ্ধের ভয়ে ভারতরাষ্ট্র এতদিন পাকিস্তানী আক্রমণের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ করে নাই—শুধু আক্রমণের বাধাদান করিয়া কর্তব্য শেষ করিয়াছে। ৫ই আগষ্ট হইতে পাল্টা আক্রমণের ফলে দেখা গেল—কয়েক দিনের মধ্যে শুধু হানাদারদের ধ্বংস করা হইল না—আজাদ কাশ্মীর অংশটুকু অতি সহজে ভারতের কুক্ষীগত হইল। পাকিস্তানী হানাদার একদল নিহত হইল, একদল প্রাণভয়ে কোথায় পলায়ন করিল তাহার হদিশ মিলিল না। তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র, গাড়ী প্রভৃতি ভারতরাষ্ট্রের সৈন্যরা দখল করিয়া নিজেদের কাজে ব্যবহার করিল। এই সুযোগে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য ভারতীয় সৈন্যরা পশ্চিম পাকিস্তানে অর্থাৎ পশ্চিম পাঞ্জাবে যাইয়া প্রবেশ করিল। আমরা পাকিস্তানকে যেরূপ শক্তিশালী মনে করিয়াছিলাম, কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল পাকিস্তানী সৈন্যরা তেমন শিক্ষিত ত নহেই অস্ত্র-সম্ভারও অধিক শক্তিশালী নহে। ৫ই আগষ্ট হইতে আজ (১৮ই সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানের বহু সহর ও জমি ভারতীয় সৈন্যরা দখল করিয়াছে। বহু পাকিস্তানী সৈন্য নিহত ও আহত হইয়াছে, তাহারা বহু অস্ত্রশস্ত্র, সাঁজোয়া গাড়ী প্রভৃতি ফেলিয়া পলাইয়াছে, সেগুলি ভারত দখল করিয়া যুদ্ধের কার্য্যে ব্যবহার করিয়াছে। লাহোর পশ্চিম পাকিস্তানের একটি অংশের রাজধানী ছিল, কয়েক-দিন অবরোধের পর ভারতীয় সৈন্যরা লাহোর অঞ্চলের অনেকখানি জায়গা দখল করিয়াছে। যুদ্ধের সময় পাকিস্তানী সৈন্যরা আমাদের কয়েকটি সহরের উপর বোমা ফেলিয়াছে—আমাদের কিছু সৈন্য নিহত হইলেও পাকিস্তানের ক্ষতির তুলনায় আমাদের ক্ষতি যৎসামান্য বলা যায়। পাকিস্তান রণক্ষেত্রে বার বার পরাজিত হইয়া পোরবন্দরে যাইয়া ভারতীয়

এলাকা আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু সেখানে সুবিধা করিতে পারে নাই। তাহারা পূর্ব্ব পাকিস্তান হইতে বিমান পাঠাইয়া মেদিনীপুর জেলার কলাইকুণ্ডা নামক স্থানে বিমানক্ষেত্রে বোমা ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু তাহাদের চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। দুই দিন তাহাদের বিমান বারাকপুরে বোমা ফেলিতে আসিলে আমাদের বিমান বিধ্বংসি কামান সে সকল বিমানের অধিকাংশকে ধ্বংস করিয়াছে। এই ভাবে বর্তমানে যুদ্ধ চলিতেছে। পাকিস্তান আমেরিকার প্রদত্ত অস্ত্রশস্ত্র যুদ্ধে ব্যবহার করায় আমেরিকা তাহাদের উপর বিরূপ হইয়াছে।

আমাদের ভারতীয় সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্রে যে সাহস ও বীর্য্যের পরিচয় দিয়াছে তাহা কল্পনাতীত বলা যায়। সারা ভারতের সৈন্যরা এই যুদ্ধে যোগদান করায় ভারতরাষ্ট্রের পক্ষে এই যুদ্ধ পরিচালনা আদৌ কষ্টকর হয় নাই।

দুই জন খ্যাতিমান বাঙ্গালী—

যুদ্ধ ক্ষেত্রে এ পর্য্যন্ত বহু বাঙ্গালী সৈনিক নিহত হইয়াছে তন্মধ্যে দুই জনের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য (১) পার্লামেণ্টের সদস্য, প্রবীণ দেশ সেবক শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের ২২ বৎসর বয়স্ক পুত্র অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায় নিহত হইয়াছেন। (২) প্রাক্তন অধ্যাপক হরিচরণ ঘোষের দৌহিত্র এড্‌ভোকেট শ্রীরাম চৌধুরীর পুত্র তপন চৌধুরী ২১ বৎসর বয়সে যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণ দিয়াছেন। আমাদের শাস্ত্র বলে—সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ দিলে স্বর্গ লাভ হয়—কাজেই পুত্রদের এই বীরোচিত মৃত্যুতে তাহাদের পরিবারবর্গ বিচলিত না হইয়া উহা গৌরবজনক বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন।

উ থাণ্টের ব্যর্থ দৌত্য—

রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল উ থাণ্ট পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে বিবাদ দেখিয়া উভয় দলকে শান্তিরক্ষার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন—পত্র দিয়া কোন ফল না হওয়ায় তিনি নিজে আসিয়া পাকিস্তানের জঙ্গী প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁর সহিত প্রথম করাচীতে দেখা করেন ও আপোষের সর্ত্ত সম্বন্ধে আলোচনা করেন।' তাহার পর তিনি দিল্লীতে আসিয়া ভারতরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ডাক্তার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর সহিতও ২দিন ধরিয়া আপোষ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ভারত আপোষের কোন সর্ত্ত দেয় নাই—বিনাসর্ত্তে উভয় পক্ষের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে সম্মত ছিল—কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তান প্রদত্ত সর্ত্তে সম্মত হইতে পারে নাই কাজেই শেষ পর্য্যন্ত উ থাণ্টকে বিফল মনোরথ হইয়া আমেরিকায় ফিরিয়া যাইতে হইয়াছে। তবে তিনি আশা লইয়া গিয়াছেন যে ভারতের মনোভাবে তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাহার বিশ্বাস যদি পাকিস্তান নিজের অবস্থা সম্বন্ধে পুনরায় বিবেচনা করিয়া দেখে, তাহা হইলে তাহার আত্মরক্ষার জন্য সে যুদ্ধবিরতিতে বিনা সর্ত্তে সম্মত হইবে পাকিস্তান এখন জগতের সকল শক্তির কাছে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া বেড়াইতেছে। অধিকাংশ দেশ উভয় জাতির যুদ্ধে এক পক্ষকে সাহায্য করিতে সম্মত হয় নাই। কারণ আজ বাহিরের কোন দেশ দুইটি বিরোধী পক্ষের একটিকে সমর্থন করিলে সারা বিশ্বে যুদ্ধ ছড়াইয়া পড়িবে ও ফলে পৃথিবী ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। পাকিস্তান যতদিন না তাহার মনোভাব পরিবর্তন করে, ততদিন পৃথিবী হইতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা দূর হইবে না।

দেশবাসীর কর্ত্তব্য—

ভারত কখনও যুদ্ধ চাহে নাই—শান্তিতে বাস করিবার জন্য যে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পাকিস্তান ভারতের ঘাড়ে যুদ্ধ চাপাইয়া দিয়াছে। যুদ্ধ করিতে সে এখন বাধ্য হইয়াছে—সে জন্য সে যতটুকু প্রস্তুত ছিল, আজ প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছে। এ অবস্থায় প্রধান মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের আহ্বানে সাড়া দেওয়া ছাড়া ভারতের অন্য উপায় নাই। দেশের স্বাধীনতা আনয়নের জন্য ভারতবাসী বহু বৎসর যাবৎ সংগ্রাম করিয়াছে—সে জন্য সে সর্বদা আত্মদান করিতে অগ্রসর হইয়াছে। আজ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বর্তমান যুদ্ধে তাহাকে অধিকতর আত্মদান ও কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে। যুদ্ধের প্রধান উপকরণ মানুষ ও অর্থ। ভারতে লোকবলের অভাব নাই—৬০ কোটি অধিবাসীর একাংশ যদি জীবনবলি দিতে অগ্রসর হয়, তবে যুদ্ধের জন্য কখনই ভারতে মানুষের অভাব হইবে না। ভারত গত ১৮ বৎসর ধরিয়া দেশের উন্নয়ন কাজের জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করিতেছে—ইংরাজ ভারতবাসীকে সর্বপ্রকারে নিঃস্ব করিয়া রাখিয়া গিয়াছিল

পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের উরি-হাজি পীর খণ্ড ভারতীয় মুক্তি-ফৌজ মুক্ত করার পর পাকিস্তানের অধীনে থাকাকালীন সেখানকার অধিবাসীদের চরম দুরবস্থার কথা শুনে কাশ্মীরের ওয়ার্কস ও পাওয়ার মন্ত্রী শ্রীগুলাম রসুল কর ঐ স্থানের অধিবাসীদের মধ্যে চিনি, কেরসিন তৈল ও জামা কাপড় বিতরণের জন্য গমন করেন। ওখানকার অধিবাসীরা ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদয় ব্যবহারে এরূপ অভিভূত হয়ে পড়েন যে তাদের মধ্যে লুক্কায়িত হানাদারেরাও স্বেচ্ছাকৃত ভাবে অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করে। এখানে একজন হানাদারকে শ্রীকরের হাতে তার রাইফেলটি তুলে দিতে দেখা যাচ্ছে।

পাকিস্তান যে ভারতে তার সশস্ত্র সৈন্যবাহিনীর লোকেদেরই হানাদার রূপে হামলা চালাবার জন্যে পাঠিয়েছিল তার একটি প্রমাণ। এখানে যার ছবি দেখা যাচ্ছে সে হচ্ছে পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর একজন সৈন্য এবং তার নাম ক্যাপ্টেন্ মাসুদ্। মাসুদকে জম্মু এলাকায় পাঠান হয়েছিল বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ সাঁকোগুলি, সৈন্যবাহিনীর যন্ত্রপাতি এবং অফিসারদের বাসস্থান প্রভৃতি উড়িয়ে দেবার জন্য। কিন্তু কয়েকবার চেষ্টা করেও আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীর সতর্কতায় মাসুদের চেষ্টা সফল হতে পারে নি। হাজি পীর পাসের যুদ্ধে ক্যাপটেন মাসুদ ধরা পড়ে এবং তার নিকটে প্রাপ্ত কাগজপত্র থেকে এই সব তথ্য জানা যায়।

পাঞ্জাবের জলন্ধরের গ্রামবাসীরা পুলিশের সহযোগিতায় বহু পাকিস্তানি ছত্রীসৈন্যকে ধরে ফেলে। এখানে পাকিস্তানি ছত্রীসৈন্যদের কাছ থেকে পাওয়া নানা রকম অস্ত্র-শস্ত্র

জাতীয় প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারে দিল্লীর লৌহ ব্যবসায়ীরা মুক্ত হস্তে দান করেন। গত ৯ই সেপ্টেম্বর লৌহ ব্যবসায়ীদের একটি প্রতিনিধিদল প্রধান মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর হাতে নগদ ৫০,০০০৲ হাজার টাকা অর্পণ করেন।

কাশ্মীরের জনগণ কর্তৃক সংগঠিত প্রতিরক্ষা বাহিনীর "ওয়েল ফেয়ার কমিটি" জওয়ানদের খাদ্য পানীয় প্রভৃতি সরবরাহ করে তাঁদের আনন্দ দেন।

—সকল প্রকার উন্নতির জন্য ভারত চেষ্টিত হইয়াছিল—শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পথঘাট, কারখানা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠায় ভারত গত কয় বৎসরে বহুশত কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছে। কিন্তু এখন যুদ্ধের প্রয়োজনে আরও অধিক অর্থের প্রয়োজন। যুদ্ধ অধিকদিন চলিলে সকল উন্নয়ন কার্য্য বন্ধ করিতে হইবে ও সেই টাকা দিয়া যুদ্ধ চালাইতে হইবে। তাহা ছাড়াও প্রত্যেক ভারতবাসীকে এখন সংযত থাকিয়া সংঘবদ্ধভাবে যুদ্ধে সাহায্য করিতে হইবে। সে জন্য চাই কষ্ট স্বীকার। যুদ্ধের প্রয়োজনে অর্থদানের জন্য সকলপ্রকার বিলাসিতা ত্যাগ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। সুখের কথা—সকল বিরোধী দলের রাজনীতিকরা প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রীজির আহ্বানে সাড়া দিয়া যুদ্ধের সময় দলাদলি ও রাজনৈতিক মতভেদ বন্ধ করিয়া যুদ্ধে সাহায্য দানে সম্মত হইয়াছেন।

আমরা ভারতরাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ দেশ বলিয়া ঘোষণা করিয়া হিন্দু মুসলমান সকল অধিবাসীদিগকে সমান অধিকার দান করিয়াছিলাম। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর দেখা গেল—একদল মুসলমান রাষ্ট্রবিরোধী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে—তাহারা গোপনে সংবাদ সরবরাহ করিয়া পাকিস্তানকে সাহায্য করিতেছে—এ অবস্থায় ঐ সকল রাষ্ট্রবিরোধী মুসলমানকে গ্রেপ্তার করিয়া বন্দী করিয়া রাখা ছাড়া উপায় নাই। পাকিস্তান ঐ একই কারণে বহু পাকিস্তানবাসী হিন্দুকে হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই।

আর একদল রাষ্ট্রবিরোধী প্রচারকার্য্য চালাইয়া দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে। তাহাদের লইয়া রাষ্ট্রের সমস্যা—তাহারা প্রকাশ্যে কিছু না করিয়া গোপনে রাষ্ট্রের ক্ষতি সাধনে তৎপর। দেশবাসীকে তাহাদের মিথ্যা প্রচার হইতে সাবধান থাকিতে হইবে। তাহারা যে সকল মিথ্যা গুজব প্রচার করিবে, তাহা গ্রহণ করিয়া বিচার করিয়া দেখিতে হইবে এবং সরকার পক্ষের বিবৃতি শুনিয়া তদনুসারে চালিত হইতে হইবে। সেনাপতি বা প্রধানমন্ত্রীকে যেমন সকল প্রকার সতর্কতার সহিত রাজ্য চালাইতে হয়—তেমনই সাধারণ নাগরিককেও যুদ্ধের সময় সকল প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করিয়া চলিতে হয়। ধীর ও স্থিরভাবে সকল বিষয়ে বিবেচনা করিয়া যদি প্রত্যেক ভারতবাসী রাষ্ট্রের এই বিপদে সাহায্য করিতে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে আমাদের যুদ্ধে জয় লাভ অবশ্যম্ভাবী এবং আমরা আমাদের স্বর্গত নেতা ও প্রধানমন্ত্রী জহরলালের আদর্শে দেশকে পুনর্গঠন করিয়া দেশবাসীর সকল প্রকার উন্নতি বিধানে সমর্থ হইব, সন্দেহ নাই।

যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি—

গত ৫ই আগষ্ট হইতে ১৩ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ৪০ দিনে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধে দুইপক্ষের ক্ষয়ক্ষতি নিম্নরূপ :—

পাকিস্তানের পক্ষে ১৬ জন অফিসার সমেত ১৮৪৭ জন পাক সৈন্য খতম। ৭জন অফিসার সমেত ৩২০ জন বন্দী। ২৫০টি ট্যাংক ধ্বংস। ৪ জন চালক সমেত ৩৪টি দখল। ৫৫টি বিমান ধ্বংস।

ভারতের পক্ষে ৩৭ জন অফিসারসহ ৬১২ জন সৈন্য নিহত। ৫০টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস।

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস—

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁহার সহিত মতের মিল না হওয়ায় সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীনির্ম্মলেন্দু দেকে পদচ্যুত করিয়াছিলেন, তাহার ফলে গত ১১ই সেপ্টেম্বর শনিবার প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির এক সভায় সভাপতি অজয়বাবুর কার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। তথায় স্থির হইয়াছে যে, অজয়বাবুকে সভাপতির পদ হইতে অপসারণ করা হইবে। ঐ প্রস্তাবের পক্ষে ৩১০ জন সদস্য ভোট দেন এবং মাত্র ১জন উহার বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিলেন।

পাকিস্থানী উপজাতি বিদ্রোহ—

'কাবুলটাইমস' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, পাঠান উপজাতিদের আক্রমণের ফলে পাকিস্থানের পশ্চিম সীমান্তে একটি ক্যান্টনমেণ্ট খুব ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে দুইদল উপজাতি প্রকাশ্য বিদ্রোহ করিয়াছিল। তাহারা স্বাধীনতা লাভের জন্য পাকসৈন্যদের তাড়াইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছে। পাকিস্থান একদিকে ভারতীয় সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিতেছে আর একদিকে তাহাদেরই কোন কোন নিজস্ব লোক বিদ্রোহ করিতেছে।

শ্রীঅতুল্য ঘোষ—

গত ১২ই ভাদ্র শনিবার কংগ্রেস নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ ৬২তম জন্মদিনে পশ্চিমবঙ্গের বহুলোক তাঁহাকে তাঁহার বাড়ীতে যাইয়া অভিনন্দন জানাইয়াছে। সকাল ৯টায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ও বেলা ১২টায় কংগ্রেস সভাপতি

শ্রীকামরাজ নাদার তাঁহার বাড়ীতে যাইয়া অতুল্যবাবুকে অভিনন্দন জানান এবং তিনজনে অতুল্যবাবুর গৃহে মধ্যাহ্ন ভোজন করেন।

সীমান্ত গান্ধী সংবাদ—

সীমান্ত গান্ধী বর্ত্তমানে আফগানিস্থানে আছেন। শ্রীকমলনয়ন বাগাজ নামক একজন ভারতীয় নাগরিক কাবুলে যাইয়া খান আবদুল গফর খাঁ সাহেবের সহিত দেখা করিলে তিনি বলিয়াছেন তিনি একটি পাকতুনিস্থান-রাজ্য গঠন করিতে চান। ভারতবর্ষ যদি তাঁহার সে প্রস্তাব সমর্থন করে তাহা হইলে তিনি ভারতে যাইতে পারেন। ১৬ বৎসর ধরিয়া তিনি পাকিস্থানকে এ বিষয়ে অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু কোন ফল হয় নাই।

সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ—

ভারতের রাষ্ট্রপতি জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত স্যার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ গত ৫ই সেপ্টেম্বর ৭৫ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়াছেন। ঐদিন তাঁহাকে সারা ভারতবর্ষের সকল স্থানের লোক অভিনন্দন জানাইয়াছেন। তিনি তাঁর সারাজীবন শিক্ষকের কার্য্য করায় দেশের শিক্ষকরা তাঁহার জন্মদিনে শিক্ষক-দিবস পালন করেন।

যুদ্ধের জন্য বাড়তি কর—

গত ১৯শে আগষ্ট কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীটি, টি কৃষ্ণমাচারি দিল্লীতে লোকসভায় ১৯৬৫।৬৬ সালের জন্য এক অতিরিক্ত বাজেট পেশ করেন। নূতন বাজেটে কয়েকটি জিনিসের উপর অতিরিক্ত কর বসানো হইবে। ফলে বৎসরে ১৭৭ কোটি টাকা আয় বাড়িবে।

বিদেশীদের পাকিস্থান ত্যাগ—

পশ্চিম-পাকিস্থানে যুদ্ধ চলার ফলে সেখান হইতে বিদেশীরা সকলেই সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যাইতেছেন। পশ্চিম-পাকিস্থানবাসী জাপানীরা সকলেই প্রায় দেশে চলিয়া গিয়াছেন। তাহার পর আমেরিকাবাসীরাও বিমানে করিয়া দেশে ফিরিয়া গিয়াছেন। লাহোরের শঙ্কাজনক অবস্থার পর আর কোন বিদেশী পশ্চিম-পাকিস্থানে থাকিতে সাহস করেন না।

স্বামীকে বশে রাখুন

আরাধনা বন্দ্যোপাধ্যায়

সকলেই এমন স্বামী চান, যিনি ভাল রোজগার করবেন, কথাবার্তায় মিঠে হবেন, স্বাস্থ্যবান্ ও রূপবান্ হবেন, আর সকলের উপরে স্ত্রীর অনুগত হবেন। কিন্তু অনুগত স্বামী লাভ করা যে সকলের কপালে সম্ভব হয় না তা আপনি জানেন—তার জন্যে সকলেই ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়ে থাকেন অবশ্যই, ভাগ্য সব কিছুর জন্যই দায়ী—শুধু অনুগত স্বামীর জন্যে নয়। কিন্তু আপনারও একটা দায়িত্ব আছে,—স্বামী অনুগত হবে, কি অবাধ্য হবে তা আপনার উপরেও অনেকখানি নির্ভর করে।

অনেকে মনে করেন রূপই হচ্ছে স্বামীকে বশে রাখবার প্রধান মন্ত্র। সময়ে সময়ে তা' মনে হতে পারে, কিন্তু এ-ধারণা ভ্রমাত্মক। উজ্জ্বলাকে দেখেছেন, বা তার কথা শুনেছেন কি? তার মত সুন্দরী কোলকাতায় কয়টি আছে? কিন্তু তার সঙ্গে স্বামীর বা স্বামীর বাড়ীর লোকেদের কি রকম সম্পর্ক তা কি জানেন? জানলে আপনার ভয় হবে। উজ্জ্বলা এত রূপ দিয়েও তার স্বামীকে বশে রাখতে পারল না।

বিয়ের পর উজ্জ্বলার রূপের প্রশংসায় তার শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা পঞ্চমুখ ছিল। সকলের মন উজ্জ্বলার দিকে। স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ী, দেবর, ননদ সকলে উজ্জ্বলাকে খুশী করার জন্যে তার রূপের স্তুতি করেছে। উজ্জ্বলার সৌভাগ্য-সূর্য তখন মধ্যগগনে। তার মত সুখী কে? কিন্তু কত অস্থায়ী সে সুখ! সে বুঝতেও পারল না, কেমন করে তার প্রতি সকলের ঔদাসীন্য ধীরে ধীরে নেমে এল। স্বামীর মন তার কাছ থেকে কত দূরে চলে গেছে। কিন্তু কেন এমন হল? উজ্জ্বলার শ্বশুরবাড়ীর লোকেদের সঙ্গে আলাপ করে আসুন,—ঘুরে আসুন উজ্জ্বলার শোবার ঘর, আপনাকে আর বুঝিয়ে দিতে হবে না যে উজ্জ্বলা কতটা আত্মকেন্দ্রিক। সব সময় সে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। কারো সুখ দুঃখ বা মনের দিকে তার নজর নেই। সে চায় সকলে তার স্তুতি করুক, সকলে তার জন্যে ব্যস্ত থাকুক—স্বামী সর্বদা অনুগত, আজ্ঞাবহ হয়ে সেবা করুক, কিন্তু কারো প্রতি যেন তার নিজের কোন কর্তব্য নেই। এমন আত্মকেন্দ্রিক নারী স্বামীকে বশে রাখবে তা আশা করা যায় না। বরং সে উল্টো কাজ করল। সে তার রূপ-বশীভূত স্বামীকে অনবরত আত্মকেন্দ্রিক চাহিদায় আর আবদারে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। তার আরো ভাল শাড়ী চাই, গয়না চাই, কত কি চাই, স্বামী বেচারা এত টাকা পাবে কোথায়? ব্যবসার নামে সে প্রতারণায় লিপ্ত হল। তাতে অর্থাগম তার হল প্রচুর সন্দেহ নেই। কিন্তু পাপের পয়সা তাকে আরো বেশী পাপের পথে নিয়ে গেল—নিয়ে গেল সুরা ও বারনারীর লালসায় বহু দূরে—উজ্জ্বলার কাছে থেকে দূরান্তরে। তার উপর আর উজ্জ্বলার কোন প্রভাব রইল না।

আচ্ছা এবারে বলি বিমলার কথা। দেখতে কি যে বিশ্রী মেয়েটি! কিন্তু স্বাস্থ্য ভাল তার। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন

থাকার অভ্যাস আছে। নানা ছন্দের খোপা সে বাঁধতে জানে। কাজ করতে পারে সব রকমের! বাসন মাজা, রান্না করা, কাপড় জামা ইস্ত্রী করা, রুগীর সেবা, সব কাজ সে করতে পারে। গল্পের মোটা বই নিয়ে উজ্জ্বলার মত সে বসে থাকে না। সংসারের সব কাজ সেরে যখন সে অবসর পায় বৃদ্ধা শাশুড়ীকে মহাভারত পড়ে শোনায়। স্বামী তার খুব বেশী রোজগার করে না, দামী শাড়ী সে এনে দিতে পারে না, কিন্তু স্বামী যা এনে দেয় তা নিয়েই সে খুশী। 'অমুকের স্বামী অত টাকা দিয়ে তার জন্যে কী চমৎকার শাড়ী এনে দিয়েছে' তার গল্প বলে স্বামীকে সে খোঁচা দেয় না। স্বামীর বাড়ীর লোকেরা তার জন্যে কিছু করবার যেন সুযোগই পায় না। বিয়ের আগে তার স্বামীর তাড়িপানের দোষ ছিল, খারাপ জায়গায় যাতায়াতের দোষও ছিল। কিন্তু তার জন্যে ভড়্‌কে যায় নি বিমলা। সে ভালভাবে স্বামীর চরিত্রটা বুঝতে চেষ্টা করেছে—আর বুঝেছে, জীবনের নানাক্ষেত্রে ব্যর্থতাই তাকে বিপথগামী করেছিল। কিন্তু বিমলা কেমন করে স্বামীকে বুঝিয়েছে একবার দু'বার, বা অনেক বারের ব্যর্থতাতেই পুরুষমানুষ দমবে কেন—কেন যাবে, এপথে ও পথে,—কেন খাবে সে তাড়ি। বিমলা আজ তার পাশে রয়েছে তার সব ব্যর্থতার—পরাজয়ের অংশীদার হয়ে—দুঃখ বল, সুখ বল বিমলাকে নিয়ে ভাগ করে পেতে হবে সব। যে স্নেহের স্পর্শ পায় নি বলে বিমলার স্বামী এতদিন অপ্রকৃতিস্থ ছিল,—বিমলার সুস্থ মনের ছোঁয়াচ পেয়ে সে কেমন নবজীবন ফিরে পেল। বিমলার স্বামী বিমলার একান্ত অনুগত। কিন্তু শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা তার জন্যে বিমলার প্রতি ঈর্ষান্বিত নয়। কারণ বিমলা বাড়ীর প্রত্যেকের প্রতি মনোযোগ সমান রেখে চলছে—প্রত্যেকের প্রতি তার সেবাবুদ্ধি জাগ্রত। রূপ ছাড়া স্বামী বশে রাখা যায় না, একথা যাঁরা ভাবেন তাঁরা বিমলার সংসার দেখে আসুন।

স্বামীকে বশে রাখা যে শুধু আপনার নিজের স্বার্থেই প্রয়োজন তা নয়। যে-স্বামী আপনার বশে নেই, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তিনি নানা দোষে জর্জরিত—তিনি অসুখী। অসুখী মানুষ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে সুখের লালসায় নানা পথে—বিপথে, কুপথে ছোটে। অর্থ অপব্যয় করে; আবার, অর্থের প্রয়োজনে অনেক রকম পাপ কার্যে জড়িত হয়ে পড়ে। ভেজালের ব্যবসায়ে মেতে ওঠে, জাল নোট তৈরীর কারখানা খোলে, ভেজাল ঔষধ প্রস্তুত করে, আরো কত কী সর্বনেশে নেশায় তাকে পেয়ে বসে,—সমাজ তার অসামাজিক কাজে ধ্বংসের পথে ছুটে যায়।

তাই সকলের আগে স্বামীকে বশে রাখুন। অনুগত স্বামী সুখী পরিবার গঠনে সহায়ক। অনুগত স্বামী সুখী স্বামী। আপনার স্বামীকে সুখী করুন তিনি অনুগত হবেন। তিনি আপনার অনুগত হলে দেখবেন সমাজে কেমন শৃঙ্খলা ফিরে আসছে, শান্তি ফিরে আসছে। মনে রাখবেন, আপনার সুখ শান্তির জন্যেই শুধু আপনি দায়ী নন—সমাজের সুখ, শান্তি, শৃঙ্খলার জন্যেও আপনি দায়ী। তাই বলি স্বামীকে বশে রাখুন—শুধু রূপের জোরে নয়, গুণের জোরে সুপথে টেনে রাখুন দৃঢ় হাতে লাগাম ধরে—সমাজ, সংসার সুখের হবে।

আপনার সাফল্য কামনা করি।

—

সুপর্ণা দেবী

ইতিপূর্বে মহিলাদের দৈহিক স্বাস্থ্য এবং অঙ্গ-সৌষ্ঠবের উন্নতিসাধন করার উদ্দেশ্যে, বিবিধ ধরণের সহজ-সরল-অনায়াস-সাধ্য ব্যায়াম-পদ্ধতির মোটামুটি হদিশ দিয়েছি। এবারে বলছি—সৌখিন-সুন্দর সুরুচিসম্মত বিবিধ উপায়ে মহিলাদের রূপশ্রী-শোভা বিকশিত করে তোলার উপযোগী সাজসজ্জা ও প্রসাধন-কলার অভিনব বিচিত্র কয়েকটি প্রাচীন এবং আধুনিক রীতি।

সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য মনীষী ওয়েষ্টারমার্ক (westermarck) তাঁর বহু পঠিত 'Human Marriage' গ্রন্থে বলেছেন —প্রসাধন একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। পৃথিবীর প্রত্যেক সৃষ্টজীবমাত্রেরই নিজের দেহকে বিচিত্র সাজে-সজ্জায় অপরূপ শোভায় সৌন্দর্য্য শ্রীমণ্ডিত করে তোলার আগ্রহ বাসনা বোধহয় প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। দৃষ্টান্ত হিসাবে —সচরাচর দেখা যায়, মিলনের আগে ইতর পশুপক্ষীদের দেহে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের বিচিত্র শোভা বিকশিত হয়ে ওঠে···পৃথিবীর অসভ্যতম জাতি—যাদের মধ্যে বস্ত্র ব্যবহারের রীতিও প্রচলিত নেই, তারাও অভিনব উপায়ে বিবিধ প্রাকৃতিক ও জান্তব সাজে আভরণে নিজেদের দেহকে সাজিয়ে তুলতে বিশেষ ভালোবাসে। কাজেই মোটামুটিভাবে বলা চলে যে মানুষের এই চিরাচরিত প্রসাধন অনুরাগ আসলে হলো-স্বভাবজাত একটি নৈসর্গিক প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তির উন্মেষের ফলেই, নর-নারী সকলেই বিবিধ উপায়ে প্রসাধন কলার চর্চ্চা করে আবহমানকাল রূপে সৌন্দর্য্যে, সাজে সজ্জায়, অলঙ্কার আভরণে বিচিত্র ধরণে নিজেদের সৌখিন-পরিপাটি ছাঁদে সাজিয়ে তোলার জন্য সদা সর্ব্বদা সযত্নে কত কি চেষ্টা করে আসছে!

আদিম মানবসমাজে সভ্যতা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেহকে সুস্থ সবল রাখা আর বিচিত্র সাজে সজ্জায় সুন্দর রূপলাবণ্যময় করে তোলার নানা উপায় উদ্ভাবিত ও অনুসৃত হয়ে এসে, এই সব রীতিগুলি ক্রমশঃ মানুষের—বিশেষ ভাবে মহিলাদের নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মপদ্ধতি হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তারই ফলে, সুপ্রাচীন কাল থেকে অধুনাবধি পৃথিবীর সকল সুসভ্য জাতির নর নারীই প্রসাধনকলার বিবিধ উন্নতিসাধন ও নিত্য নব উপায় উদ্ভাবন সম্বন্ধে যথেষ্ট আগ্রহ অনুরাগ প্রকাশ করে রীতিমত সজাগ ও তৎপর হয়ে উঠেছেন। পাশ্চাত্য-দেশে প্রসাধন কলার এই সব চিরাচরিত নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতির নাম দেওয়া হয়েছে— 'Toilet'। দাঁত মাজা, মুখ ধোয়া, তৈল মর্দ্দন, স্নান, গাত্র মার্জ্জনা, কেশবিন্যাস, ক্ষৌরকর্ম্ম, পোষাক পরিচ্ছদ, অলঙ্কার ব্যবহার প্রভৃতিও এই ধরণের 'Toilet' বা প্রসাধনকলার অন্যতম বিশিষ্ট অঙ্গ। এ সব নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতিকে ঠিক দেহসজ্জার রীতি বলা চলে না বটে··· তবে কাজগুলি দেহকে সুস্থ সবল ও মার্জ্জিত সুন্দর করে তোলার উপায় বলেই, সুসভ্য মানব সমাজে এগুলিকেও 'Toilet' বা প্রসাধনের অঙ্গ হিসাবে গণ্য করা হয়। এ কাজগুলি আসলে কিন্তু আয়ুর্ব্বেদের বিধান···অর্থাৎ, ইংরাজীতে যাকে বলা যায়—Hygienic Treatment।

প্রাচীন ভারতে প্রসাধন কলার রীতিমত কদর ছিল এবং এ বিষয়ে যুগে যুগে যথেষ্ট আলাপ আলোচনা, পরীক্ষা নিরীক্ষা, গবেষণা, বিধি নিয়ম, শাস্ত্র রচনা ও ব্যাপক অনুশীলনও চলতো—সে প্রমাণ মেলে আমাদের সুপ্রাচীন বৈদিক ইতিহাসে···সেকালের চিন্তাশীল বিজ্ঞ ঋষিরাও তাঁদের রচিত শাস্ত্র গ্রন্থে চৌষট্টি কলার অন্যতম হিসাবে প্রসাধন কলাকেও বিশিষ্ট একটি গৌরবের আসন দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নি। প্রাচীন ভারতের সুপ্রসিদ্ধ মনীষী সুশ্রুত তাঁর রচিত 'চিকিৎসিতাধ্যায়' গ্রন্থের চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদে শরীর সুস্থ নীরোগ ও সুন্দর রাখার বিবিধ উপায় আলোচনা প্রসঙ্গে মানুষের দৈনন্দিন প্রসাধনের যে তালিকাটি দিয়েছেন, সেটিতে সৌখিন বিলাস ও নিত্য প্রয়োজনীয়—উভয়বিধ প্রসাধনেরই উল্লেখ আছে। বলা বাহুল্য মনীষী সুশ্রুত অবশ্য স্বাস্থ্যোন্নতি এবং দৈহিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিকল্পেই এ সব উপায়ের উল্লেখ করেছেন···কিন্তু নিত্য নিয়মিত এ সব উপায় অনুসরণকালে মানুষ ক্রমশঃ সৌখিন খেয়ালের ঝোঁকে অনেকক্ষেত্রে শাস্ত্রোল্লিখিত বিধি নিয়মের মাত্রা ছাড়িয়ে নানা রকম বিলাস ব্যসন ও রীতিমত বাবুয়ানির মোহে আত্মহারা হয়ে আসল উদ্দেশ্য ভুলে মেকীর মায়ায় মেতে উঠেছেন এবং তার ফলে, উপকারের চেয়ে শেষ পর্য্যন্ত তাঁদের অপকারই ঘটেছে সবিশেষ। তাহলেও মনীষী সুশ্রুতের প্রস্তাবিত প্রসাধন কলার ক্রিয়াকর্ম্ম পদ্ধতিগুলি অধুনাবধি ভারতের সর্ব্বত্রই সুপ্রচলিত এবং প্রায়শঃ নিত্যানুষ্ঠিত।

মনীষী সুশ্রুতের মতে, সুসভ্য-মানুষের দৈনন্দিন প্রসাধনের একান্ত আবশ্যকীয় কর্ত্তব্যগুলি হলো—

১। দন্ত ধাবন বা দাঁত মাজা। প্রাচীনকালের ভারতে অবশ্য আধুনিক-যুগের মতো টুথ-ব্রাশ ব্যবহারের প্রচলন ছিল না, তবে বিজ্ঞানসম্মত-উপায়ে নানা ধরণের কাঠের দাঁতন আর দন্ত-মঞ্জক চূর্ণাদির সাহায্যে নিত্যনিয়মিতভাবে দাঁত-মাজার যথোচিত ব্যবস্থা করা হতো। দাঁত-মাজার

ব্যবস্থা ছাড়াও, প্রতিদিন নিয়মমতো 'জিহ্বা-নির্লেখন' বা 'জিভ-ছোলা' রীতিটিরও বিশেষ উল্লেখ রয়েছে মনীষী সুশ্রুতের প্রাচীন-গ্রন্থে। একালের মতো 'প্লাষ্টিকের' তৈরী সৌখিন সুন্দর 'জিহ্বা-নির্লেখন' বা 'জিভ ছোলা' নিত্য-ব্যবহার্য্য প্রসাধন সামগ্রী সেকালে ছিল একান্তই দুর্লভ… তবে সেকালে ছিল—সোনা, রূপো কিম্বা কাঠের তৈরী 'জিভ ছোলা' বা 'জিহ্বা নির্লেখন' ব্যবহারের রেওয়াজ।

২। অভ্যঙ্গ—অর্থাৎ, নিত্যনিয়মিতভাবে মাথায় এবং সারা শরীরে তৈল লেপন করাও ছিল মনীষী সুশ্রুত উল্লিখিত প্রাচীন প্রসাধন রীতির অন্যতম কর্ত্তব্য।

৩। স্নান—প্রত্যহ নিয়মিতভাবে এক অথবা একাধিক-বার শীতল বা উষ্ণ জলে স্নান করা ছিল প্রাচীন ভারতের প্রসাধন কলার একান্ত আবশ্যকীয় রীতি। মনীষী সুশ্রুতের মতে, স্নানের পূর্ব্বে কিছুক্ষণ ব্যায়াম চর্চ্চা করাও—দৈহিক স্বাস্থ্যসৌন্দর্য্য বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ উপকারী।

৪। উদ্‌ঘর্ষণ—অর্থাৎ, স্নানের সময় 'ফেণক' বা সাবান জাতীয় উপকরণাদি ব্যবহারে দেহের ক্লেদ-ঘর্ম্ম প্রভৃতি অপরিচ্ছন্নতা সাফ্ করে স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্যের উন্নতি সাধন।

৫। উৎসাদন—বা 'গাত্রমর্দ্দন'…অর্থাৎ, ইংরাজীতে সচরাচর যাকে 'Massaging' (বা দৈহিক দলাই-মলাই) বলা হয়ে থাকে। সুশ্রুতের মতে—এভাবে প্রসাধনের ফলে, শরীরের পেশী ও ধমনীগুলি সুস্থ সবল ও সুপুষ্ট হয়ে ওঠে এবং রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়াও অব্যাহত থাকে।

৬। কেশ প্রসাধন ও ক্ষৌরকর্ম্মাদির সাহায্যে নিয়মিত-ভাবে হাত পায়ের নখ এবং দেহের অবাঞ্ছিত রোম প্রভৃতি কর্ত্তন করাও ছিল—প্রাচীন ভারতের সুপ্রচলিত রীতি।

৭। অঞ্জন প্রলেপন বা চোখে নিত্যনিয়মিতভাবে কাজল পরার রীতিও ছিল প্রাচীন ভারতীয় প্রসাধন কলার বিশেষ একটি অঙ্গ। প্রাত্যহিক স্নান এবং হাত মুখ ধোয়ার পর নিয়মিত 'অঞ্জন প্রলেপন' বা 'কাজল' ব্যবহারের ফলে, শুধু শোভা বর্দ্ধনই নয়, চোখের সুস্থতাও অনায়াসেই বজায় রাখা সম্ভব হতো সুদীর্ঘকাল যাবৎ।

৮। অনুলেপন চন্দনাদি ধারণ… অর্থাৎ, স্নানাদির পর, নিত্য নিয়মিতভাবে দেহে সুগন্ধ চন্দনের প্রলেপ ও চন্দন চূর্ণ ছড়িয়ে অঙ্গ সুরভিত করা—এ ছিল প্রাচীন ভারতীয় প্রসাধন কলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৯। পুষ্প ও রত্নাদি ধারণ এবং সৌখিন বস্ত্র পরিধান—এগুলিও ছিল সেকালের প্রসাধন চর্চ্চার নিত্যনৈমিত্তিক রীতি। কারণ, প্রাচীন ভারতীয় সমাজে প্রত্যেকেরই ধারণা ছিল—যে পুরুষ বা নারী পুষ্প ও রত্নাদি ধারণে সক্ষম, তাঁর সংসারে অভাব নেই এবং মনেও আনন্দ স্ফূর্ত্তি আছে অফুরন্ত। কাজেই মনে যাঁর দুশ্চিন্তা নেই এবং ঘরেও অভাব অনটন ঘটে না, তিনি বাস্তবিকই বিলক্ষণ সুখী… এবং মনে এই সুখ আছে বলেই, স্বাভাবিক নিয়মানুসারে তাঁর শরীরও বেশ সুস্থ সবল, নীরোগ ও সুন্দর থাকতে বাধ্য। সম্ভবতঃ, তৎকালীন সমাজের অভিনব এই ধারণার বশবর্ত্তী হয়েই মনীষী সুশ্রুত তাঁর সুপ্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থে পুষ্প ও রত্নধারণ এবং সৌখিন বসন ভূষণ পরিধানকেও নর-নারীর স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্যোন্নতির অন্যতম উপায় হিসাবে সাগ্রহে উল্লেখ করেছেন।

১০। পদ-প্রক্ষালন ও পাদাভ্যঙ্গ…অর্থাৎ, নিত্য নিয়মিত প্রয়োজনবোধে, বিশেষভাবে—প্রাতে শয্যা-ত্যাগের পর ও রাত্রে শয্যাগ্রহণের পূর্ব্বে, পথে ভ্রমণান্তে গৃহে ফিরে এসে এবং মলমূত্রাদি ত্যাগের পর, পরিষ্কার জলে ধুয়ে পায়ের কাদা ধুলা ময়লা সাফ্ করে ফেলা—মনীষী সুশ্রুত প্রবর্ত্তিত প্রসাধন কলার অন্যতম আবশ্যকীয় রীতি। তাছাড়া সুশ্রুতের মতে, দীর্ঘপথ ভ্রমণান্তে পায়ের পেশীগুলি সুস্থ সবল এবং রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া স্বাভাবিক রাখার উদ্দেশ্যে, মাঝে মাঝে কিছুক্ষণ কাল 'পাদাভ্যঙ্গ' বা 'তেল মালিশের' রীতিটিও পালন করা একান্ত আবশ্যক।

১১। পাদুকা ধারণ রীতি অনুসরণ সম্বন্ধেও সুশ্রুত বিশেষভাবে উপদেশ দিয়েছেন—তাঁর সুপ্রাচীন গ্রন্থে। প্রাচীন ভারতের জনগণ—প্রধানতঃ বৈদিক যুগের ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের লোকজনেরা অবশ্য পাদুকা ধারণ বিষয়ে খুব বেশী আগ্রহশীল ছিলেন না। প্রাচীনকালের পাদুকা শুধু কাঠের সাহায্যেই নয়, চামড়া দিয়েও তৈরী করা হতো—তার উল্লেখ পাওয়া যায় তখনকার আমলের সুবিখ্যাত শাস্ত্র গ্রন্থ 'গৌতম সংহিতার' ৯ম অধ্যায়ে বিশিষ্ট একটি শ্লোকে। সুশ্রুতের মতে, পাদুকা ধারণ নিছক সৌখিন-বিলাসিতা নয়…বরং স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় হিসাবে এ রীতির সবিশেষ উপকারিতাও আছে।

১২। উষ্ণীষ ধারণ প্রথাটিও সুশ্রুতের মতে, প্রসাধনের অন্যতম আবশ্যকীয় অঙ্গ।

১৩। ছত্র ধারণ—প্রাচীন প্রসাধন কলার এটিও আরেকটি প্রয়োজনীয় রীতি। প্রখর তপন তাপ ও বর্ষার ধারা বর্ষণের প্রকোপ থেকে দেহ ও স্বাস্থ্য রক্ষার উদ্দেশ্যেই ছত্র ব্যবহারের প্রথা আমাদের দেশে প্রচলিত হয়েছে।

১৪। বর্ম্ম ধারণ—অর্থাৎ, শীতাতপ বর্ষার উপদ্রবে দৈহিক স্বাস্থ্য যাতে কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেজন্যই প্রাচীনকাল থেকেই 'বর্ম্ম ধারণ' বা যথোপযুক্ত সূতী, রেশমী বা পশমী পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহার রীতি ভারতীয় প্রসাধন কলার বিশিষ্ট অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল।

১৫। দণ্ড ধারণ—অর্থাৎ, লাঠি ব্যবহারের রীতিও প্রাচীন ভারতের প্রসাধন কলার অন্যতম অঙ্গ ছিল। কারণ সেকালে গ্রাম ও নগরাঞ্চলের পথঘাটের অবস্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এখনকার মতো এমন পাকা ধরণের ও আলোকোজ্জ্বল ছিল না···তাই সে সব পথে স্বচ্ছন্দে যাতায়াতের সুবিধার জন্য এবং বিষাক্ত সাপ-খোপ, কীট পতঙ্গাদির আক্রমণ থেকে দেহরক্ষার উদ্দেশ্যেই সম্ভবতঃ এই 'দণ্ড ধারণ' বা লাঠি ব্যবহারের রীতি প্রচলিত হয়েছিল। প্রয়োজনের খাতিরে এ রীতির প্রচলন হলেও, কালে কালে কিন্তু 'দণ্ড ধারণ' বা লাঠি ব্যবহার করা সৌখিন-বিলাসের বিশিষ্ট অঙ্গ হয়ে উঠেছে।

১৬। চামর-ব্যজন—রীতিটি সম্ভবতঃ প্রাচীন ভারতে প্রসাধন-কলার আবশ্যকীয় অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল—মশা-মাছির উপদ্রব থেকে শরীর-রক্ষার উপায় হিসাবে।

সুশ্রুত বর্ণিত ভারতীয় প্রসাধন-কলার এ সব প্রাচীন রীতি মুখ্যতঃ স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় হলেও, কালে কালে বিভিন্ন কারণে এগুলি ক্রমশঃ আড়ম্বরপ্রিয়তা ও আতিশয্যদোষে সৌখিন বিলাস···এমন কি, অনাচারেও পরিণত হয়ে ওঠে। তবে দৈহিক স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রবর্ত্তিত প্রসাধন কলার এই সব রীতির অধিকাংশই প্রাচীন ভারতের আচার পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে উঠে পাপ-পুণ্যের আকারে ধর্ম্মের আবরণে লোক সমাজে প্রবেশলাভে উত্তরোত্তর স্থায়ীভাবে শিকড় ছড়িয়ে বসেছে। স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য বিধানকল্পে মনীষী সুশ্রুত প্রসাধন কলা সম্বন্ধে যে সব উপদেশাবলী দিয়েছেন, ভারতের প্রাচীন স্মৃতিতে ও পুরাণে সেগুলি সদাচার হিসাবে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে। কারণ, সুষ্ঠুভাবে দেহরক্ষা যে ধর্ম্মেরই অঙ্গ—সে কথা প্রাচীন ভারতের জনগণ অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই প্রসাধন রীতিকে জাতীয় চৌষট্টি কলার মধ্যে অন্যতম প্রধান আসন দানে সবিশেষ আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছিলেন। মহাকবি কালিদাস সুস্পষ্ট ভাষাতেই বলেছেন—"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"! বাস্তবিকই, প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম্মে শারীরিক শুদ্ধি ও সুস্থতায় উপর যে বিশেষ লক্ষ্য ছিল, শাস্ত্রোক্ত নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতির তালিকা অনুসন্ধান করে দেখলেই তার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

[ক্রমশঃ]

—

ঘর-সাজানোর বিচিত্র-বাহারী গাছ

রুচিরা দেবী

পরিপাটি সুন্দর মনোরম ছাঁদে ঘর বাড়ি সাজাতে সবাই ভালোবাসেন। তাই ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকল সুগৃহিণীরই আজকাল রীতিমত আগ্রহ অনুরাগ দেখা যায়—ছোট বড়, শস্তা এবং দামী নানান্ ধরণের সৌখিন সুন্দর সামগ্রী কিনে বা সংগ্রহ করে কিম্বা সংসারের দৈনন্দিন কাজকর্ম্মের অবসরে নিজের হাতে বিবিধ ছাঁদের বিচিত্র কারুশিল্পোপকরণাদি বানিয়ে অভিনব উপায়ে ঘর বাড়ি সাজানোর দিকে। তাঁদের এই আগ্রহ অনুরাগ আর

কলানুশীলনের অদম্য উৎসাহ পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে, এবারে অল্প ব্যয়ে এবং সহজ সরল উপায়ে মনোরমভাবে ঘর সাজানোর উপযোগী বিচিত্র অভিনব বিশেষ এক ধরনের কারুশিল্প সামগ্রী রচনার কথা বলছি। অভিনব সৌখিন এই কারুশিল্প সামগ্রীটি হলো—কয়েক টুকরো তামার (Copper) অথবা টিনের তারের (Galvanized wire) সাহায্যে সুদৃশ্য সুন্দর ছাঁদে আঁকাবাঁকা কতকগুলি ডাল-পালা বানিয়ে, সেগুলিতে নকল মুক্তা (Artificial Pearls) কিংবা রঙীন পুঁতির সারি গেঁথে ঘর সাজানোর উপযোগী ছোট বড় বিভিন্ন ধরনের বিচিত্র অপরূপ 'বাহারী গাছ (Decorative Tree) রচনা করা। এ পদ্ধতিতে বানানো 'রঙীন পুঁতি' বা 'নকল মুক্তার' বাহারী গাছটির চেহারা দেখতে কেমন হবে, নীচের নক্সাটিতে তার সুস্পষ্ট পরিচয় পাবেন।

তৈরী ঘর-সাজানোর বাহারি-গাছ
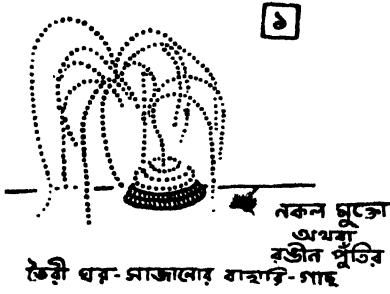
তামার অথবা টিনের তারে 'নবল-মুক্তা' কিম্বা 'রঙীন পুঁতির' সারি গেঁথে এ-ধরনের 'বাহারী গাছ' বানাতে হলে, টুকিটাকি যে সব সাজ সরঞ্জাম প্রয়োজন, গোড়াতেই তার একটা মোটামুটি ফর্দ্দ দিয়ে রাখি। অর্থাৎ, এ ধরণের সৌখিন সুন্দর 'বাহারী গাছ' বানানোর জন্য চাই—অন্ততঃ পক্ষে, কুড়ি পঁচিশ ফুট লম্বা ১৮ নম্বর তামার অথবা টিনের তার (Approximately 20 to 25ft long No 18 copper or Galvanized wire). প্রয়োজনমতো ছোট বড় সাইজের কয়েক 'ছালি' (Strands) 'নকল মুক্তা' (Artificial pearls) বা 'রঙীন পুঁতি', গাছটিকে পাকাপোক্ত ও খাড়াভাবে সেটে বসিয়ে রাখার জন্ম কাঁচের (glass-made) কিম্বা চীনামাটির (Chinaclay pot) অথবা মাটির (Terracotta or clay-made) তৈরী ছোট একটি সুদৃশ্য ছাঁদের টব বা পাত্র, এক বাণ্ডিল মজবুত 'ক্রুশ বোনার' সুতো (Crochet-chord) কয়েকটা 'গালা কাঠি' (Shellac sticks), একটি মোমবাতি, একবাক্স দেশলাই, 'ড্যুরোফিক্স' বা 'প্লায়োবণ্ড' জাতীয় এক টিউব 'সেলুলয়েড-সিমেণ্ট (Celluloid cement) বা 'এ্যাডেসিভ্-সলিউশান্' (Adhesive solution), তার কাটবার উপযোগী একখানি ভালো কাঁচি একখানি ছুরি এবং কিছু চুমকি বা রাংতা-জরির টুকরো। এই ধরণের বাহারী গাছ রচনায় ১৮ নম্বরের তারটি বিশেষ ভাবে বাছাই করে নেবার কারণ—এ তার বেশ মজবুত ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। তাছাড়া এ ধরণের তামার বা টিনের তার ব্যবহার করার আরেকটি সুবিধা—বাহারী গাছটিকে আঁকাবাঁকা বা খাড়া সিধা…কারু শিল্পীর খেয়াল খুশীমতো যে কোনো ছাঁদে, তারগুলিকে অনায়াসেই প্রয়োজনানুযায়ী ধরনে বাঁকিয়ে ডালপালা বানিয়ে তোলা যাবে…তারের তৈরী সে সব ডালপালার ভারে বাহারী গাছটিও সহজেই বেঁকে-নুয়ে পড়বে না এবং মজবুত গড়নের ডালপালাগুলিতে একের পর এক নকল মুক্তা বা রঙীন পুঁতি গেঁথে সুসজ্জিত করে তোলাও খুব একটা কষ্টসাধ্য কাজ হয়ে দাঁড়াবে না।

উপরের ফর্দ্দমতো সাজ-সরঞ্জামগুলি সংগ্রহ করার পর, প্রথমেই নীচের ২নং নক্সার ছাঁদে—বাহারী গাছের মোটামুটি একটি 'কাঠামো' বানিয়ে নিতে হবে।

বাহারি-গাছ বানানোর কাঠামো
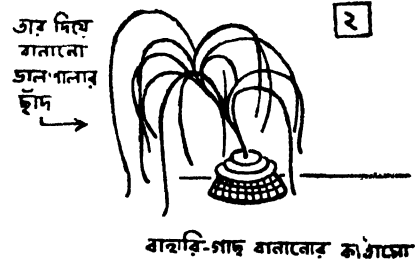
ধরুন,—যে বাহারী গাছটি বানানো হবে, সেটির আকার—চার ফুট দীর্ঘ। এই আকারের বাহারী গাছ বানাতে হলে, গোড়াতেই তামার অথবা টিনের তারটিকে পরিপাটি ছাঁদে কেটে কয়েকটি টুকরোতে ভাগ করে নেওয়া চাই। তারের এই টুকরোগুলির মধ্যে একটার মাপ হবে—অন্ততঃপক্ষে, তিন ফুট লম্বা। এটি দিয়ে রচিত হবে—বাহারী গাছের গোড়া। গাছের গোড়া রচনার জন্ম তিন ফুট লম্বা তারের এই টুকরোটি ছাড়াও, গাছের ডাল পালা রচনার জন্ম দুই ফুট লম্বা মাপের আরো দশ বারোটি তারের

টুকরো কেটে নেওয়া দরকার। এভাবে বিভিন্ন মাপে ও লম্বা আকারে তামার অথবা টিনের তারটিকে টুকরো করে কেটে নেবার পর, গাছের গোড়া রচনার জন্য ছাটাই করে রাখা তিন ফুট লম্বা তারের টুকরোকে সুষ্ঠু পরিপাটী ভাবে একত্রে জুড়ে আগাগোড়া বেশ পাকাপোক্ত ধরণে গোছা করে জড়িয়ে বাঁধুন। একসঙ্গে জড়িয়ে গোছাবাঁধা এই তারের যে প্রান্তের যে অংশটি বাহারী গাছের গোড়া রচনার জন্য আলাদা ছেড়ে রাখা হয়েছে, সেই অংশটিকে কাপড়ের ফিতা জড়িয়ে বেশ ভরাট ও পাকাপোক্ত ধরনে এঁটে কাঁচের কিম্বা চীনা মাটির অথবা মাটির পাত্রের ভিতরে খাড়াভাবে বসিয়ে দিন—তাহলেই বাহারী গাছটী আর সহজে নড়বে না, পড়বে না। গাছের গোড়াটিকে এমনিভাবে এঁটে বসানোর পর, সুষ্ঠুভঙ্গীতে হাতের আঙুলের মৃদু চাপ দিয়ে, একত্রে গোছা করে জড়িয়ে বেঁধে রাখা ঐ দশ বারোটি তারের টুকরোগুলিকে একের পর এক উপরের ২নং নক্সার ছাঁদে সুদৃশ্য ধরণে বেঁকিয়ে হেলিয়ে দিন। গাছের ডালপালাগুলি রচনাকালে, হেলানো বেঁকানো প্রত্যেকটি তারের টুকরো যাতে বরাবর যথাযথ স্থানে ও আকারে বজায় থাকে, সেজন্য ছোট ছোট আরো কয়েকটি তারের টুকরো কেটে নিয়ে, সেই ছোট টুকরোগুলির সাহায্যে বাহারী গাছে ডালপালার কাঠামোগুলিকে পরিপাটি ধরণে 'ঠেকো' দিয়ে রেখে, প্রত্যেকটি 'ঠেকো দেওয়া' তারের টুকরোকে খুব মিহি তার বা রেশমী-সুতোর পাক দিয়ে জড়িয়ে আগাগোড়া বেশ মজবুত ও পাকাপোক্তভাবে বেঁধে নেওয়া চাই। এমনিভাবে মিহি তার কিম্বা রেশমী সুতো জড়ানোর সময়—গাছের গোড়া থেকে সুরু করে ডালপালাগুলিকেও পরিপাটিভাবে বেঁধে নিতে হবে। এই পদ্ধতিতে সুতো বা তার জড়ানোর ফলে, ডালপালাগুলি বরাবরই গাছের কাণ্ডের সঙ্গে বেশ শক্ত ও অটুটভাবে আঁটা থাকবে···সহজেই আলগা হয়ে পড়বে না।

এ কাজের পর, গাছের কাঠামো আর ডালপালাগুলিতে নকল মুক্তা অথবা রঙীন পুঁতি গেঁথে বসানোর পালা। কিন্তু স্থানাভাবের কারণে, আপাততঃ সে বিষয়ে বিশদ পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়—আগামীবারে তার হদিশ দেবার বাসনা রইলো। [ক্রমশঃ

'কাট্-ওয়াক্' সেলাইয়ের নক্সা

হিরন্ময়ী দেবী

সংসারের নিত্যনৈমিত্তিক-কর্ম্মের অবসরে যে সব মহিলা নিজের হাতে নানা রকমের সূচীশিল্প সামগ্রী রচনা করতে ভালবাসেন, তাঁদের কাজের সুবিধার জন্য এবারে অভিনব-উপায়ে সৌখিন সুন্দর বিশেষ এক ধরণের সেলাই পদ্ধতির মোটামুটি পরিচয় দিচ্ছি। সূচীশিল্পী সমাজে এ পদ্ধতিটি সচরাচর 'কাট্-ওয়ার্ক' সেলাইয়ের কাজ নামেই সুপরিচিত। এ ধরণের সৌখিন সুন্দর বিচিত্র নক্সাদার সূচীশিল্পের কাজ করা খুব একটা কঠিন এবং ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার নয় ···কয়েকদিন যত্নে চেষ্টা করলেই, সূচীশিল্পানুরাগিণীরা
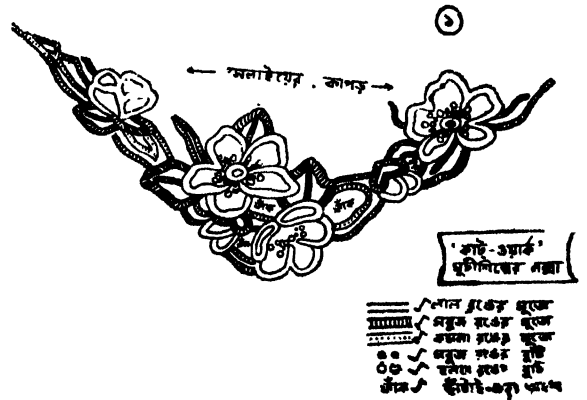
অনায়াসেই নিজেদের হাতে সেলাইয়ের কাজ করে এ ধরণের বিচিত্র সামগ্রী বানাতে পারবেন—বিশেষতঃ, যাঁরা এমব্রয়ডারী সেলাইয়ের কাজে অল্প-বিস্তর দক্ষতা লাভ

করেছেন, তাঁদের পক্ষে, 'কাট্-ওয়ার্ক' সূচীশিল্প-পদ্ধতিটির কলা কৌশল আয়ত্ত করা নিতান্তই সহজ।

৪৮৫ পৃষ্ঠার ছবিতে ফুল পাতার টেবিল ক্লথ ও টি কোজির যে সহজ সরল নক্সা নমুনাটি দেখানো হয়েছে, রঙ্গীন সুতোর সাহায্যে এম্ব্রয়ডারী সেলাইয়ের কাজ করে খদ্দর, লিনেন (Linen), ম্যাট (Matte), প্রভৃতি যে কোনো মোটা-ধরণের কাপড়ের উপর সুদৃশ্য সুন্দর ছাঁদে 'কাট্-ওয়ার্ক্' সূচী-শিল্পের অপরূপ চিত্র ফুটিয়ে তোলা যাবে।

'কাট্ ওয়ার্ক' সূচীশিল্প পদ্ধতিতে কাজ করে কাপড়ের বুকে উপরের ফুল পাতার নক্সাটিকে পরিপাটি ধরণে রচনার জন্য প্রথমেই একখানি ১৫½" ইঞ্চি লম্বা মাপের এবং দুইখানি ৫½" ইঞ্চি লম্বা এবং ৬" ইঞ্চি চওড়া মাপের—অর্থাৎ ছোট বড় আকারের মোট তিন খানি আলাদা আলাদা প্রতিলিপি এঁকে বা 'ট্রেসিং (Tracing) করে নিতে হবে। বলা বাহুল্য—প্রয়োজনবোধে, উপরোক্ত মাপের চেয়ে ছোট বা বড় আকারেও ফুল পাতার নক্সাটিকে এঁকে বা 'ট্রেসিং' করে নেওয়া যেতে পারে।

'কাট্-ওয়ার্ক' সূচীশিল্পের নক্সাদার 'টি-কোজি' ও 'টেবিল-ক্লথ'

সেলাইয়ের কাপড়ের বুকে প্রতিলিপি আঁকার বা ট্রেসিঙের সুবিধার জন্য—উপরের ২নং চিত্রে ফুল পাতার নক্সাটির খুঁটিনাটি নমুনাগুলি বড় আকারে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই নমুনা অনুসারে, প্রয়োজনানুযায়ী ছোট বা বড় আকারে নক্সাটি প্রথমে একখানি শাদা কাগজে নিখুঁত পরিপাটি ছাঁচে এঁকে নেবেন। তারপর সেই নক্সা আঁকা কাগজখানির নীচে এক টুকরো কার্ব্বন-কাগজ রেখে, সেলাইয়ের কাপড়ের কোণে এবং কিনারায় যথাস্থানে বসিয়ে, ফুল পাতার প্রতিলিপিটিকে আগাগোড়া বেশ সুস্পষ্টভাবে 'ট্রেসিং' করে নিতে হবে।

এমনিভাবে সেলাইয়ের কাপড়ের উপর ফুল পাতার নক্সার হুবহু প্রতিলিপি 'ট্রেসিং' করে নেবার পর, প্রয়োজনানুযায়ী রঙ্গের সুতো দিয়ে 'রানিং ষ্টিচ' (Running stitch) পদ্ধতিতে সূচীশিল্পের ছোট ছোট ফোঁড় তুলে প্রতিলিপিটিকে আগাগোড়া সেলাই করে নিতে হবে। এ কাজ সারা হলে, 'রানিং-ষ্টিচ' ফোঁড়গুলির উপর 'বাটন হোল্' পদ্ধতিতে (Button-hole stitch) সেলাই দিয়ে কাপড়ের বাইরের দিকের কিনারা বরাবর ফাঁশ বেঁধে (The knotted edge towards the outside section of the cloth) নেবেন। কারণ, কাপড়ের উপর বিভিন্ন রঙ্গের সুতোর সাহায্যে এম্ব্রয়ডারী সূচীশিল্পের কাজ করে ফুল পাতার নক্সাটিকে আগাগোড়া নিখুঁত ছাঁদে রচনার পর, 'কাট ওয়ার্ক' সূচীশিল্পের রীতি অনুসারে ফুল পাতার ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট অপ্রয়োজনীয় অংশগুলি এবং কাপড়ের বাইরের দিকের কিনারায় বাড়তি কাপড়ের টুকরো আর 'বাটন্ হোল্' সেলাইয়ের ফাঁশের অপ্রয়োজনীয় সুতোর ছালি-গুলিকে কাঁচির সাহায্যে সযত্নে সাবধানে ও পরিপাটিভাবে ছাঁটাই করে বাদ দেওয়া দরকার। তবে মনে রাখবেন এভাবে বাড়তি কাপড়ের অংশগুলি ছাঁটাইয়ের আগে এম্ব্রয়ডারীর কাজটুকু আগাগোড়া শেষ করে নক্সাদার সূচীশিল্পের কাপড়টিকে বেশ ভালোভাবে ইস্ত্রি করে (properly ironed and preesed) নেওয়া আবশ্যক ...নাহলে ছাঁটাইয়ের কাজেরও অসুবিধা ঘটবে এবং এম্ব্রয়ডারী করা নক্সার ফাঁকে ফাঁকে ছাটাই করা অংশগুলি সুদৃশ্য সমান ও নিখুঁত পরিপাটি ছাঁদের হয়ে উঠবে না।

উপরের ফুল পাতার নক্সাটিকে মনোরম সুন্দরভাবে রচনার জন্য—ফিকে গোলাপী, ফিকে বেগুনী, হাল্কা নীল, ফিকে সবুজ অথবা হাল্কা হলুদ রঙ্গের খদ্দর, দো-সুতী, লিনেন, ম্যাট বা ঐ ধরণের কোনো মোটা কাপড় ব্যবহার করাই ভালো। ফুলগুলি সেলাই করবেন, কাপড়ের সঙ্গে বেশ মানানসই দেখায়—এমন ধরণের লাল রঙ্গের সুতোয় ...ফুলের পাপড়ির ভিতরের পরাগ বিন্দু ও গোলাকার চক্রটি রচনা করবেন—ফিকে হলদে বা সাদা রঙ্গের সুতোয়। পাতাগুলির জন্য চাই—কাপড়ের ও ফুলের সঙ্গে

মানানসই বোধ হয়—এমন ধরণের ফিকে অথবা গাঢ় সবুজ রঙের সুতো। আশপাশের আঁকাবাঁকা ডালপালার জন্য ব্যবহার করবেন—গাঢ় কমলা হালকা বাদামী রঙের সুতোর হালি। তবে প্রয়োজনবোধে, এ নিয়ম ছাড়াও, সূচীশিল্পীর নিজস্ব রুচি অনুসারে মানানসই ধরণের অন্য কোনো রঙের সুতো দিয়েও এ নক্সাটিকে রূপদান করা যেতে পারে।

এই হলো, কাপড়ের উপরে 'কাট ওয়ার্ক' সূচীশিল্পের কাজ করে এবারের নক্সা নমুনাটিকে ফুটিয়ে তোলার মোটামুটি রীতি।

—

সুধীরা হালদার

বাঙলা দেশের শারদীয় উৎসবটা এ বছর নিতান্তই সন্দেশ বিহীন অবস্থাতেই কাটলো···পূজোর দিনে দেবীকে পরম উপাদেয় সন্দেশ অর্ঘ্য দিয়ে ভক্তি নিবেদন বা প্রিয়জনদের পাতে বাঙালীর চির আদরের এই বিশেষ ধরণের মিষ্টান্ন পরিবেষণ করে প্রীতি সম্ভাষণ জানাবারও উপায় নেই আজকাল। তাই এবারে খোয়া ক্ষীর দিয়ে পাক করার উপযোগী অভিনব মুখরোচক বাঙলা দেশেরই বিশেষ ধরণের একটি মিষ্টান্ন রান্নার কথা বলছি। এ মিষ্টান্নটির নাম—'ক্ষীরের চিতই'।

অপরূপ সুস্বাদু এই বিশেষ ধরণের মিষ্টান্ন বানানোর জন্য যে সব উপকরণ প্রয়োজন, গোড়াতেই সেগুলির মোটামুটি তালিকা দিয়ে রাখি। অর্থাৎ, 'ক্ষীরের চিতই' খাবার রান্নার জন্য চাই—একপোয়া খোয়া ক্ষীর, দুই সের দুধ, এক পোয়া চিনি, আধ পোয়া ময়দা এবং এক পোয়া ঘি। উপকরণগুলি সংগ্রহ হলে, খোয়া ক্ষীরের তালটিকে আগাগোড়া বেশ মিহিভাবে গুঁড়িয়ে নিন এবং পরিষ্কার একটি রন্ধন পাত্রে দুই পোয়া দুধের সঙ্গে মিহিভাবে গুঁড়ানো এই ক্ষীরটুকু মিশিয়ে ফেলুন। তারপর রন্ধন পাত্রটিকে উনানের আঁচে চাপিয়ে এই 'মিশ্রণটিকে' কিছুক্ষণ বেশ ভালোভাবে জ্বাল দিয়ে ক্ষীরটুকু আগাগোড়া ডেলার মতো ধরণে পাক করুন। এমনিভাবে পাক করে নেবার পর উনানের উপর থেকে রন্ধন পাত্রটি নামিয়ে, সযত্নে অন্য একটি পরিষ্কার পাত্রে তুলে রেখে ক্ষীরের ডেলাটুকু আগাগোড়া বেশ ভালোভাবে জুড়িয়ে নিন। অতঃপর, জুড়োনো ক্ষীরটুকু থেকে ক্ষীরের সাজের মতো ছাঁদে ছোট ছোট কয়টি 'চাকতি' বা 'লেচি' বানিয়ে ফেলুন।

এ কাজটুকু সারা হলে, ময়দার সঙ্গে আন্দাজমতো পরিমাণে অল্প একটু 'ময়েন' মিশিয়ে, সেটিকে দুধের সঙ্গে গুলে মণ্ডের (pulp) মতো বেশ ঘন থক্‌থকে ধরণের করে নিন। তারপর উনানের আঁচে রন্ধন পাত্র চাপিয়ে চিনির রস পাক করে রাখুন। চিনির রসে কয়েক ফোঁটা গোলাপ জল মিশিয়ে দিলে, খাবারটি বেশ সুগন্ধময় হয়ে উঠবে। চিনির রস পাক করে নেবার পর, পুনরায় উনানের আঁচে রন্ধন পাত্র চাপিয়ে, সে পাত্রে ঘি গরম করে নিন এবং ইতিপূর্ব্বে বানিয়ে রাখা ক্ষীরের চাকতি বা লেচিগুলিকে ময়দা-গোলা দুধের ঘন থক্‌থকে মণ্ডে ডুবিয়ে রন্ধন পাত্রের ঐ ফুটন্ত ঘিয়ে ভেজে বাদামী রঙের বানিয়ে তুলুন। এমনি ভাবে ভেজে নিয়ে, বাদামী রঙের ক্ষীরের চাকতিগুলিকে রন্ধন পাত্র থেকে তুলে চিনির রসে ফেলে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখুন। তাহলেই বেশ সহজ সরল উপায়ে পূজোর উৎসবে প্রিয়জনদের পাতে সাদরে পরিবেষণের উপযোগী বিচিত্র মুখরোচক 'ক্ষীরের চাকতি' মিষ্টান্ন পাক করার কাজ শেষ হবে। এই হলো—'ক্ষীরের চাকতি' রান্নার মোটামুটি পদ্ধতি।

আগামী সংখ্যায় এমনি ধরণের আরেকটি অভিনব উপাদেয় ভারতীয় খাবার রান্নার বিষয় আলোচনা করার বাসনা রইলো।

॥ ঈপ্সা ॥

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

লক্ষ্ণৌ থেকে কলকাতায় বদলি হয়ে এসে শেখর পুরোন বন্ধু সুধাকরের খোঁজে বেরোল। ওর সঙ্গে অনেকদিন যোগাযোগ নেই শেখরের। সংযোগ রাখা বড় কঠিন। সুধাকর নিজে একটু কুণো স্বভাবের মানুষ। কলেজ আর বাড়ির মধ্যে ওর পৃথিবী সীমাবদ্ধ। বন্ধুবান্ধবরা ওর কাছে গেলে তবে ওর দেখা পায়। ও নিজে বড় একটা বেরোয় না। বইটই নিয়ে থাকতেই ভালোবাসে। অনুযোগ করলে বলে, 'ভাই বেরোতে তো চাই কিন্তু কিছুতেই পেরে উঠি না। কী যে স্বভাব আমার। স্বভাব যায় না মলে।'

'কিন্তু তুমি কারো বাড়ি যাবেনা কারো খোঁজ খবর নেবেনা শুধু আমরাই তোমার কাছে বার বার আসব তাই কি হয়? রেসিপ্রোসিটি না থাকলে কি বন্ধুত্ব থাকে?'

শেখর অনেকদিন অভিযোগ করেছে।

কিন্তু সুধাকর হাসিমুখে শুধু চুপ করে থেকেছে কোন প্রতিবাদ করেনি।

ধীরে ধীরে অনেকেই ওর সঙ্গে মেলা মেশা ছেড়ে দিয়েছে।

রাগ করে কি অভিমান করে নয়। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সংসারের আরো পাঁচ রকমের দায়িত্ব বাড়ে, নতুন নতুন সম্পর্ক গড়ে ওঠে পুরোণ সম্পর্ক গুলি তখন আপনিই নিষ্প্রভ হয়ে আসতে থাকে। স্নেহ প্রীতি ভালোবাসা ক্ষেত্রান্তরিত হয়। এইই নিয়ম সংসারের। শেখর আর তার বন্ধুদের মধ্যেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। তবু শেখর যতদিন কলকাতায় ছিল নিজেই ওর খোঁজ খবর নিত। এই অসামাজিক বন্ধুটির বিরুদ্ধে যত অভিমানই মনের মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠুক ওর কাছে গেলে তা আর থাকত না। কথায় বার্তায়, হাসিটুকুতে এমনই একটা মাধুর্য আছে সুধাকরের যে তা দেখলে মনের মধ্যে বেশিক্ষণ রাগ পুষে রাখা যায়না।

যতদিন কলকাতায় ছিল শেখর নিজেই বন্ধুর খোঁজ খবর নিত। আগের মত ঘন ঘন যাওয়া আর হয়ে উঠত না তবে মাসে দুদিন একদিন যেতই।

কিন্তু ব্যাঙ্কের কর্তারা তাকে আর কলকাতায় রাখলেন না। প্রমোশন দিয়ে লক্ষ্ণৌ পাঠিয়ে দিলেন। বদলীর চাকরিতে দেশ দেখা যায় কিন্তু ছেলে পুলে হয়ে গেলে বড় অসুবিধা। তাদের পড়াশুনোর ভারি ব্যাঘাত হয়।

লক্ষ্ণৌ থেকে শেখর সুধাকরকে গোড়ার দিকে চিঠিপত্র লিখেছে। কিন্তু জবাব পেয়েছে খুব দেরিতে আর দুচার লাইনে। অথচ নানা রকম ঝামেলা শেখরেরই তো বেশি। ব্যাঙ্কের কাজে নানা ঝঞ্ঝাট। তারপর সংসার আছে। কখনো কলহ, কখনো মিলন। স্ত্রীর গঞ্জনা সহ্য করেও তার মনোরঞ্জন করতে হয়। দুরন্ত ছেলে মেয়েকে সামলে রাখতে হয়। আবার বাপের ওপর যাতে বিরূপতা না আসে সেদিকেও নজর না রাখলে চলে না। সংসারী মানুষের কি কাজের অন্ত আছে? কিন্তু এদিক থেকে সুধাকরের কোন ঝক্কি ঝামেলা নেই। কলেজে পড়ায়। ঢের ছুটি পায়। বিয়ে টিয়ে করেনি। একান্নবর্তী পরিবারে থাকলেও ওর গায়ে কোন আঁচ লাগেনা। তেতলায় সব চেয়ে নিরিবিলি কোণের ঘর খানি সে বেছে নিয়েছে। কলেজের সময়টুকু ছাড়া সেখানেই থাকে। বন্ধু বান্ধব কেউ গেলে ওর ভাইপো-ভাইঝিরা সেই ঘরে নিয়ে যায়। কেউ যদি ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার ঘরে বসে গল্প করে সুধাকর কোন রকম অসহিষ্ণু

হয়ে ওঠে না। বরং খুশি হয় বলেই মনে হয় শেখরের। কিন্তু অন্যের ঘরে সে কিছুতেই যাবে না। আচ্ছা মানুষ যা হোক!

অনেক লেখালেখির পর শেষ পর্যন্ত তিন বছর বাদে ফের কলকাতায় ফিরে আসতে পারল শেখর। বন্ধু বান্ধবদের আগেই বলেই রেখেছিল। একটা বাসাও ঠিক হয়ে গেল টালিগঞ্জ অঞ্চলে। দক্ষিণ দিকেই বাসা খুঁজছিল শেখর। কারণ এবার কর্তারা তাকে দক্ষিণ পাড়ার ব্রাঞ্চেরই ভার দিয়েছেন। একটু গুছিয়ে টুছিয়ে নিয়ে শেখর পুরোণ বন্ধু বান্ধবদের খোঁজ নিতে বেরোল।

প্রথমেই মনে পড়ল তার সুধাকর চক্রবর্তীর নাম। প্রথম যে রবিবারটা পেল সেই দিনই গিয়ে হাজির হল সুধাকরদের আমহার্ষ্ট স্ট্রীটের বাড়িতে।

বহুদিনের পুরোন তিনতলা বাড়ি। বহুকালের চেনা।

সদর দরজায় দাঁড়িয়ে কড়া নাড়তেই পনের ষোল বছরের একটি ছেলে ভিতর থেকে বেরিয়ে এল।

সুধাকরের অনেক ভাইপোর মধ্যে একটি। নামটা ঠিক মনে পড়ল না শেখরের। কিন্তু সেই বিস্মৃতিটুকু বুঝতে না দিয়ে হেসে বলল 'কি কেমন আছ? তোমার ছোট কাকার খবর কি?'

ছেলেটি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আপনি কিছু জানেন না?'

'না।'

'ছোট কাকা তো নেই?'

'মানে এ বাড়িতে নেই?'

'আপনি কি কিছুই শোনেন নি?'

'না আমি তো কলকাতায় ছিলাম না। লক্ষ্ণৌতে ছিলাম। একবছরের মধ্যে ওর সঙ্গে আমি আর কোন যোগাযোগ রাখতে পারিনি। চিঠি লিখলে তো ও জবাব দিতনা।'

ছেলেটি বলল 'ছোট কাকা মারা গেছেন।'

শেখর একটুকাল স্তম্ভিত হয়ে থেকে বলল, 'সেকি! কী হয়েছিল? ছেলেটি বলল, 'গল ব্লাডার অপারেশন করাতে গিয়ে মারা গেছেন। আমরা কিছুই জানিনে। ওঁরা নিজেরা নিজেরাই সব করেছেন।'

'নিজেরা নিজেরা মানে?'

'আপনি তা হলে কিছুই জানেন না দেখছি। মারা যাওয়ার সাত আট মাস আগে ছোট কাকা বিয়ে করেছিলেন।'

আর একবার অবাক হল শেখর সরকার। বিয়ে করবেনা বলেই তো ঠিক করেছিল সুধাকর। চল্লিশ পার করে দিয়ে কজনে আর বিয়ে করে? গ্যাসট্রাই-টিসের রোগী। স্বাস্থ্য চিরকালই খারাপ। সেই জন্যেই বিয়ে করবেনা। সবাই তাই জানত। কিন্তু এই বয়সে বিয়ে করল বন্ধুবান্ধবকে একটা খবর পর্যন্ত দিলনা।

শেখর একটু চুপ করে থেকে বলল 'এত কাণ্ড। একটা চিঠি দিয়েও জানায়নি।' ছেলেটি বলল 'ছোট কাকা কাউকেই কিছু জানাননি। বাবা মেজো কাকা সেজো কাকা কাউকে না। তাই নিয়েই তো ওঁদের সঙ্গে ঝগড়া। চলুন ভিতরে গিয়ে বসবেন।'

শেখর বলল 'না আর ভিতরে যাবনা। যার জন্যে আসা সেই যখন নেই গিয়ে কি হবে।'

'ছোট কাকার ঘরখানা দেখে যেতে পারতেন। আমরা সে ভাবেই ঘরটি রেখে দিয়েছি। অবশ্য তাঁর বইটইগুলি তিনি সব নিয়ে গিয়েছিলেন। চেয়ার, র‍্যাক, আলনা; দুএকখানা ছবি এই সবই শুধু ওঘরে পড়ে আছে।'

তিনতলার সেই ছোট ঘরখানিতে কতদিন বন্ধুর সঙ্গে বসে বসে গল্প করেছে শেখরের মনে পড়ল। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে বিচরণের ক্ষমতা ছিল সুধাকরের। অবশ্য সব-চেয়ে বেশি আনন্দ ছিল সাহিত্যে। সাহিত্যের কথা উঠলে সে আর থামতে চাইত না। কিন্তু চাকরি আর সংসার-যাত্রার চাপে পড়াশুনোর আর তেমন সময় পেত না শেখর। উৎসাহও ক্ষীণ হয়ে এসেছিল।

সাহিত্যে তেমন সজীব সক্রিয় অনুরাগ এখন আর শেখরের তেমন নেই। কিন্তু এই সাহিত্য-প্রেমিক বন্ধুটিকে ভালোবাসত।

শেখর একটু দ্বিধাগ্রস্ত হল। যাবে নাকি একবার সেই ঘরে? ছাদের ওপর সেই ঘর। মাঝে মাঝে ছাদে এসেও বসত দুজনে। কথা বলতে বলতে সুধাকর মাঝে মাঝে পশ্চিমের রঙীন আকাশের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকত। তারপর একেক সময় হেসে বলত, 'লোকে কেন

যে এখানে সেখানে যাবার জন্যে ছুটোছুটি করে আমি কিছু বুঝতে পারিনে শেখর।'

'করবে না? সবাই কি তোমার মত কুণো? অকাল বৃদ্ধ?'

সুধাকর হাসত, 'যত গালাগালই তুমি আমাকে দাও আমি সত্যি অন্য কোথাও যাওয়ার কারণ খুঁজে পাইনে। আমি এখানে বসেই সব দেখতে পাই শেখর। ওই দু একটি নারকেল গাছ, আর এই আকাশ পট আর পটে নানা রঙের খেলা দেখতে আমার কত ভালো লাগে। কোনদিন আমার কাছে এসব পুরোণ হয় না। তুমি ভেব না আমি বানিয়ে বলছি। ইচ্ছা করে কবিত্ব করছি। সামান্য কয়েকটি বস্তুর মধ্যেই আমার এই রূপদর্শন সীমাবদ্ধ হয়ে আছে! এ হয়তো আমার অক্ষমতা। মনের জড়তা। কিন্তু কী করব বল। কিছুতেই এই ঘর আর ঘরের সামনের এই ছাদটুকু ছেড়ে কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না।'

সুধাকর বলত।

লক্ষ্ণৌতে কতবার শেখর যেতে বলেছে বন্ধুকে, সে কিছুতেই যায়নি। মাঝে মাঝে গিরিডি মধুপুর রাঁচী হাজারিবাগের মত কাছাকাছি জায়গায় সপরিবারে চেঞ্জে গিয়েছে শেখর। গিয়ে সুধাকরকে চিঠি দিয়েছে, 'চলে এসো। জায়গাটা তোমার খুব ভালো লাগবে। বেশ নিরিবিলি। ঠিক তুমি যেমনটি চাও তেমনি।'

কত জায়গায় গিয়ে কত লোভ দেখিয়েছে শেখর। কত পাহাড় পর্বত ঝরণা নদী আর অরণ্য-প্রকৃতির কথা লিখেছে। কিন্তু বন্ধুকে কিছুতেই নড়াতে পারেনি। আশ্চর্য মানুষ! দুতিনখানা চিঠি লিখে দুচার ছত্রের জবাব পেয়েছে শেখর, 'রাগ কোরো না। জানোই তো আমি নড়চড়ায় অপারগ। একটুও ঝক্কি ঝামেলা আমার পোষায় না। অচেনা জায়গা অপরিচিত পরিবেশের সঙ্গে আমি নিজেকে মোটেই মানিয়ে নিতে পারিনে। তাই বাধ্য হয়ে আমি আমার শামুকের খোলাটুকুর মধ্যে বাস করি।'

পরিচিত পরিবেশ কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছেড়েছিল সুধাকর। একটি অপরিচিতা নারী তাকে চিরদিনের অভ্যস্ত জীবন থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

শেখর সুধাকরের ভাইপোর সঙ্গে বাড়ির ভিতরে গেল না। ওর দাদা বউদিদের সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা এই মুহূর্তে শেখরের ছিল না। যদি সম্ভব হয় পরে আর একদিন এসে ওঁদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে যাবে।

শেখর বরং ছেলেটিকেই বলল, মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসতে।

হেসে বলল, 'তোমার নামটা যেন কি? ভুলে যাচ্ছি কিছু মনে কোরো না।'

ছেলেটি হেসে বলল, 'মনে করব কেন? আমার সঙ্গে তো বেশি কথাবার্তা আপনার হত না। আপনি তো ছোট কাকার সঙ্গেই শুধু কথা বলতেন। আমরাও তখন কেউ ভয়ে কাছে যেতাম না। আমার নাম ঝণ্টু।'

'ঝণ্টু তাহলে চল, আমাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসবে। যেতে যেতে ওর কথা আরো কিছু শুনতে পারব।'

'একটু দাঁড়ান। আমি জামাটা পরে আসি।'

ঝণ্টু ভিতরে চলে গেল।

শেখর দরজার সামনে থেকে সরে কয়েক পা এগিয়ে গেল রাস্তার দিকে। পাছে বাড়ির আর কারো সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। পাছে গতানুগতিক কতকগুলি সান্ত্বনার কথা বলতে হয়। বন্ধুর মৃত্যু সংবাদ তার মনকে একটা শূন্যতায় ছেয়ে ফেলেছে। এখন সামাজিক শিষ্টাচারে তার বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই।

ঝণ্টু সত্যিই দুতিন মিনিটের মধ্যেই চলে এল। ছিটের একটা হাফসার্ট গায়ে দিয়ে এসেছে। বেশ সুদর্শন ছেলেটি। ঠোঁটে গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে। লম্বা ছিপছিপে। অনেকটা সুধাকরের মতই দেখতে।

ওকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাস ষ্টপে এসে দাঁড়াল শেখর। কাকার কথা কাকিমার কথা ঝণ্টু বলতে বলতে এল।

'ছোট কাকিমা খুব সুন্দরী। জানেন শেখর কাকা?'

'তাই নাকি?'

'খুব সুন্দরী। অমন সুন্দরী বউ আমাদের বাড়িতে আর আসেনি। কিন্তু এসেও তো থাকতে পারলেন না।'

'কেন?'

'জাতে সোনার বেনে কিনা! বাবা সেজো কাকা

মেজো কাকা, মা কাকিমারা সবাই বিরুদ্ধে। একসঙ্গে খাবেন না, ছোঁবেন না। বাছবিচার কত। এভাবে কি কেউ থাকতে পারে? ছোটকাকা সব বুঝতে পেরে কাকিমাকে নিয়ে অন্য জায়গায় চলে গেলেন। সবাইকে ছেড়ে যেতে তার খুবই কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু কি করবেন। কাকীমার অসম্মান তো সইতে পারেন না। তাই চলে গেলেন।'

'কোথায় গেলেন?'

'কী জানি। কাউকে ঠিকানা দিয়ে যান নি। জানিনে ভাইদের মধ্যে কি ঝগড়াঝাটি হয়েছিল। রাগ করেই চলে গিয়েছিলেন ছোটকাকা।'

শেখর ভাবল, আশ্চর্য, সুধাকরের মত অমন নরম স্বভাবের মানুষও অত করে রাগ করতে পারে, জেদ করতে পারে ভাবা যায় না। এই বয়সে ওর মত লোক বিয়ে করতে পারে তাই কি শেখর ভাবতে পেরেছিল?

'তোমার কাকীমার বয়েস কত হবে?

হঠাৎ এই অশোভন প্রশ্নটি শেখরের মুখ থেকে বেরিয়ে গেল। অতটুকু ছেলে। মেয়েদের বয়সের কীই বা জানে।

কিন্তু ঝণ্টু বেশ সপ্রতিভ। হেসে বলল, 'বয়েস বেশি না শেখরকাকা। আমার চেয়ে মাত্র পাঁচ ছ' বছরের বড়। গত বছর বি, এ, পাশ করেছেন। ছাত্রী ছিলেন ছোট কাকার। কয়েকবছর ধরেই জানাশোনা হয়েছিল।'

ঝণ্ট ফের মুখ টিপে একটু হাসল।

'ও তাই বলো। ভিতরে ভিতরে এত সব কাণ্ড করেছিল সুধাকর!'

বন্ধুর মৃত্যু শোকের কথা ভুলে গিয়ে তার অসঙ্গত প্রণয় আর অকাল বিবাহের ব্যাপারেই উৎসাহিত হয়ে উঠল শেখর। সুধাকরের ষোড়শবর্ষীয় ভাইপো যেন এখন তার বন্ধুর জায়গা নিয়েছে।

একটা থ্রি বি বাস চলে গেল। শেখর তাতে উঠল না। সে আরো শুনতে চায়। মৃত বন্ধুর তরুণী স্ত্রীর কথা জেনে নিতে চায় সে।

'তারপর? সুধাকর মারা যাওয়ার পর পর বুঝি তোমার কাকীমা তার বাপের বাড়িতে ফিরে গেলেন?'

ঝণ্টু মাথা নাড়ল, 'না শেখর কাকা। বাপের বাড়িতে যাবেন কি। সেখান থেকে তিনিও যে ঝগড়া করে এসেছেন। সবাইর অমতে ছোট কাকাকে বিয়ে করেছেন। বামুন হলেই বা কি। বয়সে তো অনেক বড়। প্রায় দ্বিগুণ। কারোরই মত ছিল না। ওরা লুকিয়ে লুকিয়ে রেজিষ্টি করেছিলেন।'

'তারপর?'

'তারপর জানাজানি হওয়ার পর অনেক গোলমাল ঝামেলা। ছোটকাকা মারা যাওয়ার পর কাকীমার বাপের বাড়ির সবাই তাঁকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কাকীমা কিছুতেই যান নি। আশ্চর্য তেজ। আমাদের বাড়িতেও আসেননি। অনেক সাধাসাধি করেছিলেন বাবা আর মেজো কাকা গিয়ে। কিছুতেই এলেন না। ওঁরা যে ছোট একটা বাসা ভাড়া করে ছিলেন কাকীমা এখনো সেখানেই আছেন। একা একা থাকেন। কাকার বইটই যা আছে সব আগলে রাখেন। থাকবার মধ্যে কতকগুলি বই ছাড়া তো আর ছোটকাকার কিছু নেই।'

'একা একা থাকেন? বল কি?'

ঝণ্টু বলল, 'তাই তো শুনেছি। কোন্ একটা স্কুলে টিচারি নিয়েছেন। নিজের খরচ নিজেই চালাবেন। আর কারো নাকি সাহায্য নেবেন না। বাড়িওয়ালা নাকি খুব ভালো। তাঁরা মেয়ের মত দেখেন। খোঁজ-খবর নেন। তাঁর দুটি মেয়েও নাকি কাকীমার দেখাশোনা করে। কাছে কাছে থাকে। বেশি অসুবিধে হয় না।'

আর একটা বাস এসে দাঁড়াল। বেলা দুপুর হয়ে গেছে। আর দেরী করা চলে না।

হঠাৎ শেখর সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, 'তাঁর ঠিকানাটা কি ঝণ্টু? তোমার কাকীমার ঠিকানাটা।'

'তাতো জানিনে শেখরকাকা। ঠিকানা আমরা কেউ জানিনে। উঠুন, আপনার বাস ছেড়ে দিচ্ছে।'

লজ্জিত হয়ে শেখর বাসে উঠে পড়ল। ঝণ্টু হাত তুলে চেঁচিয়ে বলল—'আবার আসবেন।'

শেখর হেসে ঘাড় কাত করল।

ভিতরের দিকে একটু এগিয়ে যেতেই বসবার জায়গা পেল।

বসে ভাবতে ভাবতে চলল শেখর। ঝণ্টু কি সত্যিই ঠিকানা জানে না? এত কথা জানে, এত খবর রাখে,

কেবল ঠিকানাটাই জানে না এও কি সম্ভব? না কি ইচ্ছা করেই বলেনি ঝণ্টু? ওকে হয়তো বারণ করে দেওয়া হয়েছে।

আরো কয়েকবার আসা যাওয়া করলে ঠিকানা জোগাড় করা হয়তো কঠিন হবে না শেখরের পক্ষে। ঠিকানা পেলে সে একবার যাবে। একটিবার অন্তত দেখে আলাপ করে আসবে। দেখবে কী এমন রূপ মেয়েটির যাতে সুধাকরের মত বিবেচক ব্যক্তি আকৃষ্ট হয়েছিল, যার জন্যে অন্য সব আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে চলে এসেছিল। সেই মেয়েটিকে একবার দেখবে শেখর। নিজের পরিচয় দিয়ে তার সঙ্গে আলাপ করবে। সুধাকরের জীবনের শেষ পর্বের কথাগুলি শুনবে। ওই তরুণী রূপবতী মেয়েটি একটি স্বাস্থ্যহীন প্রৌঢ় পুরুষকে কেন ভালোবেসেছিল ক্রমে সে কথাও জানতে পারবে শেখর।

মেয়েটি শুধু সুন্দরী নয়, তার সাহসও আছে। সেই সাহস কি শুধু একবার বিধিনিষেধ ভেঙেই খুসি থাকবে? অত রূপ, অত কম বয়স—ও মেয়ে নিশ্চয়ই আর একজনের ঘরণী হবে। কিন্তু তার আগে একবার ওর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে আসবে শেখর।

'কী মশাই শুনতে পারছেন না। কতক্ষণ ধরে ডাকছি আপনাকে। কী ভাবছিলেন বলুন ত?' কবে এলেন কলকাতায়?'

ব্যাঙ্কের হেড অফিসের পরাশর সান্যাল পুরোণ সহকর্মী। এখন রিটায়ার করেছেন। দেখতে পেয়েই আলাপ জুড়ে দিয়েছেন। ভদ্রলোক বড় বেশি কথা বলেন।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছিলেন। সীটটি খালি পেয়ে এসে বসলেন শেখরের পাশে। তারপর পরম অন্তরঙ্গের মত জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই অসময়ে কোথায় গিয়েছিলেন?'

শেখর বলল, 'এক বন্ধুর বাড়িতে! গিয়ে শুনলাম বন্ধুটি মারা গেছে।'

বৃদ্ধ বলে উঠলেন 'আহাহা।'

এক অস্বস্তিকর লজ্জা আর অপরাধবোধের সঙ্গে এতক্ষণে শেখরের খেয়াল হল সে মৃত বন্ধুর কথা অনেকক্ষণ ভাবেনি।

আশ্বিন

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

কাশফুলে নদী তীর এত অমলিন
কেন জানো?—এসেছে যে মধু আশ্বিন।
সারাটা আকাশ দেখো অপরূপ নীল
মনে হয় আমাদের কেয়াভাঙা ঝিল।
শিস্ দেয় কি মধুর হীরেমন পাখী
মনে হয় কথা বলে ছোট মেয়ে রাখী।

শিউলির ফুলগুলি টুপটুপ ঝরে
তুলে নাও চটপট সাজিখানি ভরে।
হাওয়া দেয় হামাগুড়ি আজ ধানক্ষেতে
প্রজাপতি উড়ে যায় কি খুশীতে মেতে।
হাঁসের মতন সাদা মেঘ যায় ভেসে
যেন কোন সুন্দর বহু দূর দেশে।

পূজার ছুটির দিন বাজায় যে বীণ্—
তাই এত ভালো লাগে নীল আশ্বিন।

ব্লাক-আউট

হোম-গার্ড : ও-মশায়, শুনছেন !···মতলবটা কি আপনার···শুনি ?···সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার পর থেকেই দেখছি, আপনি নাগাড় এই বাজারের দোকানগুলোর আশপাশে ঘোরাঘুরি করে বেড়াচ্ছেন সারাক্ষণ ! ···কি উদ্দেশ্যে··কাকে খুঁজছেন ?···জবাব দিন স্পষ্টাস্পষ্টি··· নইলে···

পথচারী গৃহস্থ : আজ্ঞে, দোকানে ভিড় দেখে আমাকে পথে দাঁড় করিয়ে ছেলে-মেয়েরা পূজোর কেনা-কাটা সারতে সেই যে বাজারে সেঁধিয়ে-ছেন···ফেরবার আর নামটি নেই ! কাজেই হন্যে হয়ে তাঁদের খুঁজে বেড়াচ্ছি এতক্ষণ !···কিন্তু 'ব্লাক-আউটে'র অন্ধকারে তাঁদের ঠিকমত চিনে ঠাওর করে নিতে পারছি না কোথাও·· তাই এই অন্ধকারে হয়রাণ হয়ে তাঁদের সন্ধানে এভাবে পথে ঘুরে ঘুরেই···

শিল্পী—পৃথ্বী দেবশর্ম্মা

পুষ্পধনু

একাঙ্ক—কৌতুক নাটিকা

নারায়ণ চক্রবর্তী

পাত্র পাত্রী

ব্রজগোপাল বক্সী…টালিগঞ্জ থানার অফিসার-ইন্-চার্জ।
শিশির সুর…টালিগঞ্জ থানার সেকেণ্ড অফিসার।
সমীরণ সেন…টালিগঞ্জ থানার সদ্য নিযুক্ত সাব্ ইন্সপেক্টার।
মালবিকা গুপ্ত…স্কটিশ চার্চ কলেজের থ্রি-ইয়ার- ডিগ্রী কোর্সের ছাত্রী।
সঞ্জীব দাশ…ধনীর খেয়ালী ছেলে।
বিপিন বাগচী…সঞ্জীবের বন্ধু।
রামনচ্ছত্র তেওয়ারী…টালিগঞ্জ থানার কনেষ্টবল।
সুকুমার, শান্তি, বিমান…টালিগঞ্জ থানার পুলিশ অফিসার।
সন্ন্যাসীচরণ সাধু খাঁ…কলকাতাবাসী জনৈক ভদ্রলোক।
ট্যাক্সি ড্রাইভার…জনৈক সর্দারজী।
হিন্দুস্থানী গোয়ালা, বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা, প্রৌঢ় ভদ্রলোক।

প্রথম দৃশ্য

থানা

[ঘরে লম্বা লম্বা চার পাঁচ খানা টেবিল পাতা, তার সামনে বসে চার পাঁচ জন পুলিশ কর্মচারী কাজ করছেন। দেওয়ালে দেওয়ালে নানা ধরণের চার্ট ঝুলছে। র‍্যাকের ওপর এক গাদা নথিপত্র। এক পাশে ব্ল্যাকবোর্ডে সাদা হরফে থানার ক্রাইম চার্ট লেখা

ইউনিফর্ম পরা একজন সশস্ত্র কনেষ্টবল বারান্দায় টহল দিচ্ছে। লোক-জন আসছে, যাচ্ছে]

সময় সকাল ন' টা

(পেছনের দরজা দিয়ে থানার অফিসার-ইন-চার্জ ব্রজগোপাল বক্সীর প্রবেশ। ইউনিফর্ম পরা গোল গাল চেহারা, বয়স প্রায় চল্লিশ)

সমীরণ। (ডায়েরী লেখা থামিয়ে মুখ তুলে) নমস্কার বড় বাবু—

ব্রজগোপাল। (চেয়ার টেনে বসে) নমস্কার। নাকতলার সেই চুরির কেসটা কতদূর হল সমীরণ ?

সমীরণ। চোর এখনো পালিয়ে বেড়াচ্ছে স্যার—

ব্রজগোপাল। আর বেশীদিন পালিয়ে থাকলে তোমাকেই এ থানা ছেড়ে পালাতে হবে সমীরণ—

সমীরণ। চেষ্টার তো ত্রুটি করছি না স্যার, কিন্তু—

ব্রজগোপাল। ও সব কিন্তু টিন্তু চলবে না সমীরণ আমি কাজ চাই। ছ' মাস হল এ থানায় এসেছ, এর মধ্যে ক' টা কেসে চার্জ শীট দিয়েছ শুনি ?

সমীরণ। চারটে কেসে স্যার

ব্রজগোপাল। ব্যাড্, ভেরি ব্যাড্। ডেপুটি কমিশনার সাহেব ভয়ানক অসন্তুষ্ট হয়েছেন তোমার ওপর, আমাকে সেদিন ডেকে বললেন তোমার ওপর কড়া নজর রাখতে—

সমীরণ। নাকতলার এই চোরটাকে আমি যে করেই হোক ধরে ফেলব স্যার।

ব্রজগোপাল। হ্যাঁ তাই কোরো, তা না হলে আমাদের প্রেষ্টিজ থাকবে না, বলতে গেলে থানার নাকের ডগায় এই চুরি—

সমীরণ। চোরটাকে আমি নাকের জলে চোখের জলে এক করে ছাড়ব স্যার—

ব্রজ। এই তো চাই। ব্রাইট ইয়ংম্যান তুমি, এম, এ, পাশ করে ডাইরেক্ট সাবইন্সপেক্টার হয়ে পুলিশ ফোর্সে ঢুকেছ, কিন্তু প্রথম থেকেই রেকর্ড এমন খারাপ করলে কি চলে ?

শিশির। ওর একটা বিয়ে দিয়ে দিন বড়বাবু, দেখবেন ওর এফিশিয়েন্সি চড় চড় করে বেড়ে যাবে—

ব্রজ। বেশ কথা বলেছ শিশির, এবার গোয়েন্দাগিরি শিকেয় তুলে রেখে ঘটকালির কাজেই লেগে যাই—

সমীরণ। (লজ্জায় রাঙা হয়ে) কী যে বলছেন স্যার—

ব্রজ। ঐ দেখ শিশির, বিয়ের কথাতেই সমীরণের ফর্সা মুখ খানা কেমন লাল হয়ে উঠেছে—ছিঃ, এত লজুক তুমি? এ যে মেয়েছেলেরও অধম দেখছি। জানোতো, —পুলিশের কাজে লজ্জা ঘৃণা ভয়, তিন থাকতে নয়—

সমীরণ। আস্তে আস্তে সব কেটে যাবে স্যার—

ব্রজ। আস্তে আস্তে কাটলে তো চলবে না সমীরণ, ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার চেয়েও তাড়াতাড়ি তোমার এ লজ্জা আর সঙ্কোচ যাতে কাটে আমি তার ব্যবস্থা করব শিগ্‌গিরই—

[একজন এ এস্ আই এক গাদা কাগজ পত্র নিয়ে ব্রজগোপালের সামনে রাখল। পাতা উল্টে দেখতে লাগলেন ব্রজগোপাল]

ব্রজ। (কাগজে সই করতে করতে) শিশির—

শিশির। আজ্ঞে?—

ব্রজ। মেছোহাটার মাছ নিয়ে মারামারির কেস-এর আসামীদের কাগজ পত্র সব তৈরী করেছ?

শিশির। এই হয়ে এলো স্যার—

ব্রজ। সেন্ট্রি—

রামনচ্ছত্র। (বারান্দা থেকে ভেতরে এসে সামরিক কায়দায় স্যালুট করে) হুজুর—

ব্রজ। সিপাহী গরীবুদ্দীন আউর সনাতন কো বুলাও, —হাজত কা আসামী লোগকো কোর্ট মে লে যায়গা—

রামনচ্ছত্র। বহোত আচ্ছা হুজুর—

রামনচ্ছত্রের প্রস্থান

[সদলবলে সন্ন্যাসীচরণের প্রবেশ, সঙ্গে দাড়িওয়ালা এক সর্দারজী [

ব্রজ। কাকে চান আপনারা?

সন্ন্যাসী। আপনাকেই স্যার—

ব্রজ। কেন বলুন তো?

সন্ন্যাসী। ট্যাক্সি নাম্বার ড ব্লউ বি তিন সাত পাঁচ নয় সোয়ারী নিতে অস্বীকার করেছে তাই ধরে এনেছি থানায়, —এই যে, এই সর্দারজীই ট্যাক্সি ড্রাইভার—

ব্রজ। (ধমকদিয়ে) সওয়ারী লেনে ইন্‌কার কাহে কিয়া?

সর্দারজী। ম্যায় ভুখা হুঁ, খানেকে লিয়ে ঘর যাতা থা, ওহি সে সওয়ারী লেনে নেহি সেকা বড়াবাবু—

ব্রজ। সকাল সোয়া নটায় ভুখা হুঁ। ক্যা তাজ্জব বাৎ! যাইয়ে, বাবুকো আভি জাগহ মাফিক পঁহুচা দিজিয়ে, নেহি তো লাইসেন্স ক্যানসেল হো জায়গা—ওহে শিশির

শিশির। আজ্ঞে—

ব্রজ। একটা ডায়েরী করে রাখো তো,—কী নাম আপনার?

সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীচরণ সা্ধু খাঁ—

সর্দারজী। (ভয় পেয়ে) ডায়েরী মৎ করিয়ে বড়াবাবু ম্যায় মাফি মাংতা হুঁ। আইয়ে বাবুজী, আপকো তুরন্ত চিড়িয়া মোড় পঁহুচা দেতা হুঁ—আইয়ে আইয়ে—সেলাম বড়াবাবু—

ব্রজ। সেলাম—

(সর্দারজী ও সদলবলে সন্ন্যাসীচরণের প্রস্থান)

ব্রজ। নাঃ, এই ট্যাক্সি ড্রাইভারগুলোকে ভালোভাবে শায়েস্তা না করলে আর চলবে না—

সমীরণ। (লিখতে লিখতে মুখ তুলে) তা যা বলেছেন স্যার—সেদিন—

(এক বৃদ্ধা বিধবা মহিলার প্রবেশ)

বৃদ্ধা। এটা কি টালিগঞ্জ থানা বাবা?

ব্রজ। হ্যাঁ। কী চান আপনি?

বৃদ্ধা। আমি থানার বড়বাবুকে খুঁজছি—

ব্রজ। আমিই এ থানার বড়বাবু, আপনার কি দরকার বলুন?

বৃদ্ধা। তুমিই বড়বাবু? তুমি আমাকে বাঁচাও বাবা—

ব্রজ। কী হয়েছে আপনার?

বৃদ্ধা। আমার একমাত্তর ছেলে বিনোদ, আমায় নাড়ি ছেঁড়া ধন,- ও: হো হো হো হো—

(ডুকরে কেঁদে উঠলেন)

ব্রজ। ওকি কাঁদছেন কেন? আ: থামুন থামুন,— কী হয়েছে বিনোদের?

বৃদ্ধা। (সরোদনে) আমাকে ফাঁকি দিয়ে কোথায় যেন চলে গেছে,—বউমা তো আহার নিদ্রে ছেড়েই দিয়েছে—

ব্রজ। আহা মারা গেছে বুঝি? কিন্তু আমরা তো—

বৃদ্ধা। বালাই ষাট, আমার বিনোদ মারা যাবে কেন? মারা যাক তার শত্তুর—

ব্রজ। কী মুস্কিল, তা হলে কি হয়েছে চটপট বলেই ফেলুন না,—আমাদের সময় বড়ো কম—

বৃদ্ধা। পরশু রাত্তিরের কথা, বৌমার সঙ্গে কি নিয়ে যেন তুলকালাম ঝগড়া করে কাল সকালে সেই যে একবস্ত্রে বেরিয়ে গেছে, আর ফিরে আসে নি,—হায় হায়,—আমার কী হবে গো,—ওরে বিনোদ রে,—তুই কোথায় গেলিরে, বৌমা যে কেঁদে কেঁদে অন্ধ হলরে—

ব্রজ। (ব্যস্ত ভাবে বাধা দিয়ে) ও, তাই বলুন, আপনার ছেলে নিখোঁজ? এক কাজ করুন আপনি,—কোণের দিকে ঐ যে ছেলেটি বসে কাজ করছে, ওর কাছে যান, ও-ই সব ব্যবস্থা করবে,—ওহে শান্তি—

শান্তি। বলুন স্যার—

ব্রজ। এর ছেলের বর্ণনাটা লিখে রাখো তো, রেডিও স্টেশনে একটা ম্যাসেজ পাঠিও,—যান, চলে যান ঐ দিকে, —হ্যাঁ হ্যাঁ—

বৃদ্ধা। (যেতে যেতে মুখ ঘুরিয়ে) আমার ছেলেকে ফিরে পাবো তো বাবা ?—

ব্রজ। যদি ফিল্মষ্টার হবার আশায় বোম্বে পাড়ি না দিয়ে থাকে তো নিশ্চয়ই পাবেন—

(একজন হিন্দুস্থানী গোয়ালার প্রবেশ, হাতে লম্বা লাঠি)

গোয়ালা। এহি থানা বা ?

ব্রজ। হাঁ, ক্যা মাংতা তুম্ ?

গোয়ালা। হমার ভঁইস ভুলা গৈল বা—

ব্রজ। ওহে সুকুমার, ডায়েরীতে টুকে রাখো তো এর মোষের ডেস্‌ক্রিপশনটা,—যাও, ও বাবুকে পাস যাও—

গোয়ালা। (যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে) জয় হিন্দ্ বড়াবাবু, হমার ভঁইস মিলি কি না—

ব্রজ। মিলি মিলি, জরুর মিলি—

(হিন্দুস্থানী গোয়ালা সুকুমারের কাছে গিয়ে দাঁড়াল)

(জনৈক প্রৌঢ় ভদ্রলোকের প্রবেশ, ধুতি পাঞ্জাবি মলিন, জুতোতে তালি দেওয়া, গালে দু' দিনের না-কামানো দাড়ি, মাথার চুল উস্কো খুস্কো)

ব্রজ। কাকে চান ?

ভদ্রলোক। বড়বাবু কে ? আপনিই কি ?

ব্রজ। হ্যাঁ আমিই বড়বাবু—

ভদ্রলোক। নমস্কার স্যার। আমি একটা ে ফাইল করতে এসেছি—

ব্রজ। বেশ তো। বসুন ঐ চেয়ারটায়। হ্যাঁ, এব বলুন—

ভদ্রলোক। (বসে সামনে ঝুঁকে, গলা নামিয়ে আমার কথাটা একটু গোপনীয় স্যার—

ব্রজ। এখানে তো বাইরের লোক কেউ নেই, সব থানা স্টাফ্, আপনি স্বচ্ছন্দে বলুন—

ভদ্রলোক। ইয়ে—মানে,—আমার মেয়েটিকে খুঁ পাচ্ছি না—মানে কাল বিকেলে গান শিখতে গিয়ে অ ফিরে আসে নি,— মেয়েটা আমার গান অন্ত প্রাণ—

ব্রজ। হুম্। কতো বয়েস আপনার মেয়ের ?

ভদ্রলোক। লোককে বলি ষোলো সতেরো, বি আসল বয়েস কুড়ি—

ব্রজ। বিয়ে হয় নি ?

ভদ্রলোক। বিয়ে দেবার টাকা কোথায় পাব স্যার মাইনে যা পাই তা দিয়ে তো খেতে পরতেই কুলোয় ন ছেলে দুটো বেকার বসে আছে—

ব্রজ। কোথায় গান শিখতো আপনার মেয়ে ?

ভদ্রলোক। পাড়াতেই অনিল বোসের গানের স্কু আছে, সেখানেই সপ্তাহে তিন দিন গান শিখতে যেতে কল্যাণী—

ব্রজ। কতো বয়েস হবে অনিল বোসের ?

ভদ্রলোক। এই সাতাশ আঠাশ হবে—

ব্রজ। তা তিনি আছেন তো ? না তিনিও উধাও ?

ভদ্রলোক। আসবার সময়ে দেখে এলাম স্কুল বন্ধ অথচ অন্য দিনে এ সময়ে দু' তিনটি মেয়ে গান শিখতে আসে—

ব্রজ। হুম্, বুঝেছি। গান ভালোবাসতে গিয়ে গানের মাষ্টারকেই ভালোবেসে ফেলেছে আপনার মেয়ে, সময়মতো বিয়ে না দিলে এরকমটিই হয়। যাক্—আপনি ও টেবিলের ঐ অফিসারের কাছে যান,—বিমান—

বিমান। আজ্ঞে—

ব্রজ। এই ভদ্রলোকের এফ্-আই-আরটা লিখে নাও, তারপর ইনভেস্টিগেশনে বেরিয়ে পড়—

বিমান। আপনি আসুন এদিকে—

ভদ্রলোক। কল্যাণীকে ফিরে পাবো তো বড়বাবু, ? আমি অবশ্য ও-মেয়ের মুখদর্শন করতে চাই না, কিন্তু ওর মা বড্ড উতলা হয়ে পড়েছে—

ব্রজ। ওরা যদি বুদ্ধিমান হয় আর সঙ্গে বেশ কিছু টাকা থেকে থাকে তবে অবশ্য দেরী হবে। আচ্ছা: যান আপনি বিমানের কাছে—

(ভদ্রলোক বিমানের টেবিলে গিয়ে দাঁড়ালেন)

ব্রজ। কৈ জেনারেল ডায়েরীটা দেখি একবার,—হুঁ, হুঁ, হুঁ,—বেশ বেশ,—এই তো, সমীরণতো বেশ গুছিয়ে ডায়েরী লিখেছে দেখছি—

শিশির। কাগজে কলমের কাজে সমীরণের খুঁত ধরবার উপায় নেই স্যার—

ব্রজ। যত গোলমাল শুধু মানুষের সঙ্গে কথা বলবার ব্যাপারে—

শিশির। বিশেষ করে সে যদি আবার মেয়ে মানুষ হয় তা হলে তো কথাই নেই—

সমীরণ। কী যা তা বলছ শিশিরদা, অবশ্য আমি আজ কালকার উগ্র আধুনিকা মেয়েদের সংশ্রব এড়িয়েই চলতে চাই, তা বলে তোমরা আমায় যতটা মুখচোরা ভাবছ ততটা আমি নই—

শিশির। না হলেই ভালো ভাই—

(ব্যস্ত সমস্ত ভাবে থানার ঘরে ঢুকলো মালবিকা, তন্বী তরুণী বেশ ভূষায় আধুনিকা, মুখখানা সুশ্রী, হাতে এক গাদা বই খাতা, ব্লাউজে আঁটা লেডিজ ফাউন্টেন পেন। অলঙ্কারের বাহুল্য নেই, বাঁ হাতে লেডিজ রিস্ট্‌ওয়াচ্)

মালবিকা। (সমীরণকে লক্ষ্য করে) দেখুন আমি বড্ড বিপদে পড়ে আপনাদের এখানে এসেছি, আমাকে একটু হেল্প করবেন, প্লীজ—

সমীরণ। (ব্রজগোপালকে দেখিয়ে দিয়ে) হেল্প্‌? আমি ?—ইয়ে—মানে—ঐ, উনিই এ থানার ও, সি,—আপনার যা কিছু বলবার আছে ওঁকেই বলুন—

মালবিকা। মাপ্‌ করবেন, আমি চিনতে পারি নি আপনাকে—আমার নাম মালবিকা গুপ্ত, ভীষণ মুস্কিলে পড়েই আপনাদের কাছে ছুটে এসেছি—

ব্রজগোপাল। আপনি যে হাঁপাচ্ছেন এখানো, বসুন না ঐ চেয়ারটাতে, একটু জিরিয়ে নিন—

মালবিকা। বসব ? কিন্তু আমার যে কলেজে যাবার বেলা হলে গেল—

ব্রজ। (হাতঘড়ি দেখে) এই তো সবে সাড়ে ন'টা, অনেক সময় আছে কলেজে যাবার, আপনি বসুন ঐ চেয়ারটাতে,—বসুন, বসুন—হ্যাঁ,—ভাটস্‌ রাইট—

মালবিকা। আচ্ছা: বলছেন যখন তখন না হয় বসছি; কিন্তু ভয় হচ্ছে মনে—

ব্রজ। ভয় ?

মালবিকা। হ্যাঁ, চারদিকে কেমন একটা অপরাধ অপরাধ গন্ধ—

ব্রজ। হাসালেন আপনি, অপরাধের আবার গন্ধ থাকে নাকি ? সে যাক্‌, এবার বলুন কী আপনার অভিযোগ—বই চুরি গেছে ?

মালবিকা। না না—

ব্রজ। তবে কি ইয়ারিং ?—না ? তবে নিশ্চয়ই আংটি—

মালবিকা। না না; সে সব কিছুই নয়; আমি ভীষণ এক মুস্কিলে পড়ে আপনাদের শরণাপন্ন হয়েছি—

ব্রজ। তা হলে সেই মহা মুস্কিলের কথাটাই বলে ফেলুন চটপট;—দেখি আমরা তার আসানের ব্যবস্থা করতে পারি কি না—আপনি থাকেন কোথায় ?

মালবিকা। আমি থাকি টালিগঞ্জে, সেখান থেকে স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়তে যাই—

ব্রজ। তা বেশ তো, নিজের পছন্দমতো কলেজে পড়বার অধিকার তো সবারই আছে—

মালবিকা। আমি স্কটিশের থার্ড ইয়ার ডিগ্রী কোর্সের ছাত্রী। এতদিন বাড়ি থেকে বাসেই বেশ যাতায়াত করছিলাম—

ব্রজ। এখন বাসরুট পাল্টে গেছে বুঝি ? কিন্তু আমরা তো—

মালবিকা। আরে না। বাসরুট পাল্টাবে কেন ? আমার কলেজে যাওয়া আসার পথে এক বিঘ্ন দেখা দিয়েছে—

ব্রজ। বিঘ্ন ?

মালবিকা। আজ্ঞে হ্যাঁ, মূর্তিমান বিঘ্ন। কিছু দিন ধরে এক ভদ্রলোক রোজ আমার পিছু নিচ্ছেন, রাস্তা ঘাটে আমার অনুসরণ করছে—

ব্রজ। অ, বুঝলাম, নতুন রোমিও?

মালবিকা। না না। রোমিও হতে যাবে কেন? বলতে পারেন মণ্টেগু—

ব্রজ। মণ্টেগু?

মালবিকা। হ্যাঁ, শেকস্‌পীয়ার পড়েন নি বুঝি? রোমিওর বাবার নাম ওটা—

ব্রজ। রোমিওর বাবা? তার মানে?

মালবিকা। মানে যে লোকটি আমার পিছু নিয়েছে সে বয়েসে আমার বাবার চেয়ে বড় বই ছোট হবে না—

ব্রজ। ও, এই ব্যাপার? তা এতে আপনার ভাবনাটা কি? আপদে বিপদে আপনার মতো সুন্দরী তরুণীকে রক্ষা করাই তাঁর উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই—

মালবিকা। কিন্তু তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়াটাই যে আমার কাম্য স্যার, আর সেই উদ্দেশ্যেই আপনার কাছে আসা—

ব্রজ। অ। তা হলে আর একটু খোলসা করে বলুন সব কথা—

মালবিকা। মাসখানেক আগের কথা। আমি বাসে চেপে কলেজে যাচ্ছি, লক্ষ্য করলাম যে লেডিজ সীটের লোহার আংটা ধরে এই লোকটা একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। বিশ্রী দৃষ্টি। ভীষণ অস্বস্তি বোধ হতে লাগলো আমার—

ব্রজ। তারপর?—

মালবিকা। পরদিনও ঐ একই ব্যাপার লক্ষ্য করলাম—ভীড়ের জন্য কাছে আসতে পারে নি, দূর থেকে তাকিয়ে আছে দেখলাম। আমি বিরক্ত হয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিলাম—

ব্রজ। তারপর?—

মালবিকা। কয়েক দিনের মধ্যে ওর সাহস যেন আরও বেড়ে গেল—হেদুয়ার মোড় থেকে কলেজের গেট পর্যন্ত আমার সঙ্গে সঙ্গে যেতে আসতে শুরু করল—

ব্রজ। বটে! তারপর?—

মালবিকা। তার পর এই ক' দিন ধরে নানা ছুতো-নাতায় আমার সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করছে, দেখুন তো, কী বিশ্রী স্বভাব লোকটার—

ব্রজ। জুতো খুলে এক ঘা বসিয়ে দিচ্ছেন না কেন ওর নাকে?

মালবিকা। লোকটা ইয়ংম্যান হলে হয়তো করতাম, কিন্তু বাপের বয়সী বলেই তা পারছিনা। রা লোক তো আর অত তলিয়ে দেখবে না ব্যাপা হয়তো শেষে আমাকেই দুষবে, বিশ্রী কেলেঙ্কারী একটা—

ব্রজ। হুম্। সবই বুঝলাম। আপনার [illegible] তারিফ করি মালবিকা দেবী। ঠিক আছে। এ লোকদের শায়েস্তা করবার উপায় আমাদের ভালো ভা[illegible] জানা আছে, আপনি ভাববেন না, আমি এক্ষুণি ব্যবস্থা করছি—

মালবিকা। তাই করুন স্যার, আমাকে বাঁচান—

ব্রজ। সমীরণ—

সমীরণ। (ডায়েরী লিখতে লিখতে মুখ তুলে) বলছেন স্যার?

ব্রজ। মালবিকা দেবীর কেসটা তোমাকে দিলাম—

সমীরণ। সে কি স্যার।

ব্রজ। তুমি সাদা পোষাকে মালবিকা দে[illegible] কাছাকাছি থাকবে দিন কয়েক, যে বাসে উনি চাপে[illegible] তুমিও সেই বাসে চাপবে, হেদুয়া থেকে কলেজ [illegible] পর্যন্ত ওর অনুসরণ করবে। কিন্তু খুব গোপনে, যে[illegible] যেন টের না পায়—

সমীরণ। আমি?—ইয়ে—আর কাউকে পাঠা[illegible] হয় না স্যার?

ব্রজ। না, হয় না, তুমিই যাবে। সব সময় নজ[illegible] রাখবে সেই বুড়োর ওপর যে বয়স ভাঁড়িয়ে ছোকরা সে[illegible] মেয়েদের পেছনে পেছনে ঘুরতে চায়—

মালবিকা। ঠিক বলেছেন স্যার। সিং ভে[illegible] বাছুরের দলে মিশতে চায় লোকটা। বুশ শার্ট অ[illegible] ট্রাউজার্স পরে ছোকরা সাজার শখ ওর খুব, পাকা চু[illegible] কেন যে কলপ লাগায় নি তাই ভাবি—

ব্রজ। হ্যাঁ, আর একটা কথা সমীরণ, বুড়োর কি[illegible] বেচাল দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে এ্যারেষ্ট করে নিয়ে আস[illegible] থানায়। পথে ঘাটে প্রেম করবার মজাটা বুঝিয়ে দে[illegible] ভালো করে—

মালবিকা। আপনার কথায় আমার মনটা খুব হাল্কা হয়ে গেল স্যার—বাপ্‌স, যা ভাবনা হয়েছিল—

সমীরণ। কিন্তু—মানে—আমি যে, আমি কি পারব স্যার ?

ব্রজ। এর মধ্যে কোনো কিন্তু নেই সমীরণ, আর না পারারও কোনো কারণ নেই। এই ভদ্রমহিলা বিপদে পড়ে আমাদের সাহায্য চাইছেন, দুর্বৃত্তের হাত থেকে এঁকে বাঁচানো আমাদের পবিত্র কর্তব্য—

সমীরণ। সে তো ঠিক কথাই স্যার—কিন্তু—মানে আমার হাতে যে নাকতলার চুরির কেসটা আছে—

ব্রজ। সেটা নাকে তেল দিয়ে দিন দুই ঘুমুলেও এমন কিছু ক্ষতি হবে না—

সমীরণ। শিশিরদাকে যদি—

ব্রজ। না না, শিশিরের অন্য কাজ আছে। আরে এটা তো তোমারই যোগ্য কাজ সমীরণ! ইয়ং লেডির সাহায্যে তো ইয়ংম্যানরাই এগিয়ে যাবে,—যাও, কোয়ার্টাসএ গিয়ে চটপট ইউনিফর্ম ছেড়ে এসো গে—আর এত ভয়ই বা পাচ্ছ কেন ? তোমার ঘরে তো আর বউ নেই যে পঞ্চাশ গণ্ডা জবাব দিহি করতে হবে—

সমীরণ। (লজ্জা পেয়ে) যাচ্ছি স্যার,—পোষাকটা ছেড়ে আসি গে—

ব্রজ। তাড়াতাড়ি এসো, এঁর আবার কলেজের বেলা হয়ে যাচ্ছে—

মালবিকা। (হাতঘড়ি দেখে) কী সর্বনাশ, পৌনে দশটা বেজে গেল। আপনি একটু তাড়াতাড়ি করুন না সমীরণ বাবু,—প্লীজ—

সমীরণ। এই যে, যাবো আর আসব—(স্বগতঃ) বড়বাবু আমাকে আচ্ছা ফ্যাসাদে ফেললেন তো, এসব আধুনিকা তরুণীদের ধারে কাছেই যেতে চাই না আমি, অথচ সেই আমাকে নিয়েই টানাটানি,—জ্বালাতন—

ব্রজ। চুপ করে কি ভাবছ সমীরণ? যাও, এ কেসটা ভালো করে হ্যাণ্ডেল করতে পারলে ডেপুটি কমিশনার সাহেবের কাছে ভালো রিপোর্ট পাঠাবো আমি—

সমীরণ। (নিষ্প্রাণ স্বরে) এই যে যাই স্যার—

(সমীরণের প্রস্থান

ব্রজ। আপনি একটু বসুন মালবিকা দেবী—সমীরণ এই এলো বলে, অফিসার হিসেবে বা মানুষ হিসেবে সমীরণ ছেলেটি খুবই ভালো, বিয়ে শাদী করেনি বলে মেয়েদের ব্যাপারে একটু শাই এই যা একটু দোষ—

মালবিকা। হ্যাঁ, আমার কেসটা না নেবার জন্য নানা ওজর আপত্তি খাড়া করছিলেন দেখলাম—

ব্রজ। আপনিও লক্ষ্য করেছেন ? হাঃ হাঃ হাঃ,—এবার আমাকে একটু মাপ করতে হবে কিন্তু—

মালবিকা। ঠিক আছে, আমার জন্য ব্যস্ত হতে হবেনা আপনাকে, আপনি নিজের কাজ কর্ম করুন না—

ব্রজ। আমাকে এক্ষুণি বেরুতে হবে একটা খুনের কেস তদন্ত করতে—

মালবিকা। খুন! খুনের কেস!! হাউ ইন্টারেসটিং, শ্যামা বা মিতাকেও আনবেন নিশ্চয়ই—

ব্রজ। তা দরকার হলে রিকিউজিশন করি বই কি আমরা, তবে এই কেসে তার প্রয়োজন হবে না—

মালবিকা। ও, তার মানে সূত্র ধরে ধরে এগিয়ে গিয়ে আপনি নিজেই খুনীর সন্ধান পেয়ে গেছেন, তাই না ?

ব্রজ। হ্যাঁ, অনেকটা তা-ই বটে—

মালবিকা। বাঃ, আপনি দেখছি দ্বিতীয় বসন্ত লাহিড়ী স্যার—

ব্রজ। (খুশীর স্বরে) না না, এখনো অত উঁচুতে উঠতে পারিনি মালবিকা দেবী—

মালবিকা। সত্যি, পুলিশের কাজ কী ভীষণ ইনটারেসটিং,—সব সময়ে রোমাঞ্চ, সব সময়ে থ্রিল, সব সময়ে—

ব্রজ। —পাবলিক আর খবরের কাগজের গালাগাল, উপরিওয়ালাদের তর্জন গর্জন,—বলে যান মালবিকা দেবী, বলে যান—

মালবিকা। যান, আমি কি তাই বললাম ? এ আপনি নেহাৎ বাড়িয়ে বলছেন স্যার—

ব্রজ। বিন্দুমাত্রও বাড়িয়ে বলিনি মালবিকা দেবী, পুলিশের অদৃষ্টে প্রশংসা বড়ো একটা জোটে না। রোগে যে ভোগে সেই জানে রোগের জ্বালার মর্ম। আচ্ছাঃ, আপনি বসুন,—সেন্ট্রি—সেন্ট্রি—

রামনচ্ছত্র। (ঘরে ঢুকে সামরিক কায়দায় স্যালুট করে) ফরমাইয়ে হজুর—

ব্রজ। সিপাহী রামনগিনা আউর পরিমল কো

বুলাও জলদি, হামারা সাথ বাহর যায় গা, জিপ্ ড্রাইভার কো ভি বুলাও—

রামনচ্ছত্র। আভি বুলাতা হুঁ হুজুর—

[প্রস্থান

ব্রজ। আমি তা হলে চলি, কেমন? গুড্লাক্—

[প্রস্থান

মালবিকা। (হাতঘড়ি দেখে) প্রায় দশটা বাজে যে, কই, এখনো তো সমীরণবাবু এলেন না—

শিশির। ভাববেন না, আসবে এক্ষুণি। সমীরণ একটু লাজুক বটে, কিন্তু ডিউটিতে পাকা—

মালবিকা। উনি কি পারবেন আমাকে ঐ বুড়োর হাত থেকে বাঁচাতে?

শিশির। খুব পারবে, খুব পারবে;—ওর জিমনাষ্টিক করা ফিগারটা দেখেননি তো;—এক ঘুষিতেই কাৎ করে দেবে আপনার রোমিওর বাবা কে;—ঐ যে নাম করতে না করতেই হাজির—

(সাদা পোষাকে সমীরণের প্রবেশ)

মালবিকা। (স্বগতঃ) সাদা পোষাকে সমীরণবাবুকে কী চমৎকারই না মানিয়েছে; খাসা চেহারা ভদ্রলোকের—(প্রকাশ্যে; অনুযোগের সুরে) আপনি কিন্তু বড্ড দেরী করে ফেলেছেন সমীরণ বাবু; আমার কলেজের দেরী হয়ে যাবে না?

সমীরণ। দেরী? কই না, এমন তো কিছু দেরী করিনি আমি—

মালবিকা। চলুন তা হলে; তাড়াতাড়ি বাস ষ্টপে যাই; বুড়ো হয়তো হাঁ করে বসে আছে আমার জন্যে—

সমীরণ। চলুন—(করুণচোখে শিশিরের দিকে তাকিয়ে) তবে যাই শিশিরদা—

শিশির। যাও ভাই, বিজয়ী হয়ে এসো—

(মালবিকার পেছনে পেছনে সমীরণের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

সুসজ্জিত ড্রইং রুম

দুই বন্ধু বিপিন আর সঞ্জীব বসে গল্প করছে। সময় সকাল সোয়া ন'টা।

বিপিন। কিরে সঞ্জীব, তোর এ্যাড্ভেঞ্চার কতদূর এগুলো?

সঞ্জীব। আমার এ্যাড্ভেঞ্চারের ঘোড়া এখনো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে বিপিন—

বিপিন। সে কি রে—এত তোর উৎসাহ, উদ্যম,—সব ব্যর্থ হ'ল?

সঞ্জীব। প্রায় তাই। আমাকে যেন বিষ নজরে দেখেছে মেয়েটা—কথা বলতে গেলেই মুখ ঘুরিয়ে নেয়, কপালে ফুটে ওঠে বিরক্তির কুঞ্চন রেখা—

বিপিন। তাতে ঘাবড়াবার কি আছে বল? সে তো তোর ঐ খোলসটাকেই অপছন্দ করেছে, কিন্তু ঝিনুকের খোলসের ভেতর থেকে আসল মুক্তার মতো ঝকঝক করতে করতে যেদিন তুই তোর ছদ্মবেশটা ঘুচিয়ে বেরিয়ে আসবি সেদিন কি তোর নবরূপ দেখে মুগ্ধ সেই মেয়ের রাঙা ঠোঁটের কোণে সুধাস্নিগ্ধ হাসিটুকু ফুটে উঠবে না?

সঞ্জীব। কী জানি ভাই, ভয় হচ্ছে তখন আরও না বেঁকে বসে—

বিপিন। আরে না,—তুই মিছে ভেবে মরছিস। তবে তোকে লেগে থাকতে হবে,—জানিস তো,—'রমণীর মন, সহস্র বর্ষের সখা সাধনার ধন?'

সঞ্জীব। তা সাধনার তো কোন ত্রুটি করিনি বিপিন, নিজের গাড়ি থাকতেও আপিস টাইমের বোঝাই বাসে উঠছি রোজ,—লোকের কনুইএর ধাক্কা খেয়ে খেয়ে পাঁজরে ব্যথা হয়ে গেছে, সাতখানা ট্রাউজার আর সাতখানা বুশ শার্ট দ্বিতীয়বার পরবার অযোগ্য হয়ে পড়ে আছে, ঘামের গন্ধ আর দমচাপা ভীড়ের মাঝখানে স্যাণ্ডুইচ্ হয়ে থাকতে থাকতে শরীর আমার অর্দ্ধেক হয়ে গেল। সত্যযুগের কোন্ তপস্যাটা এর চেয়েও কঠোর ছিল শুনি?

বিপিন। তা এখন কাঁদুনি গাইলে চলবে কেন সঞ্জীব, তুই নিজেই তো তোর এই উৎকট খেয়ালের শীকার হয়েছিস—

সঞ্জীব। উৎকট খেয়াল? একে তুই উৎকট খেয়াল বলছিস বিপিন? যে মেয়েকে জীবন-সঙ্গিনী করব তাকে একটু বাজিয়ে দেখব না? আমি যাকে বিয়ে করব সে যে অন্য কোনো ছেলের সঙ্গে প্রেম করেনি সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত হতে চাই বিপিন—

বিপিন। তা বেশ তো, বুড়োর ছদ্মবেশে মেয়েটির

পেছনে পেছনে তো মাসখানেক ধরে ঘুরলি, কী লাভ হ'ল তা থেকে ?

সঞ্জীব। লাভ হয়েছে বৈ কি বিপিন, মেয়েটির নাড়ি নক্ষত্র সব কিছু জানা হয়ে গেছে আমার—

বিপিন। একটু বিস্তৃত হ', আমিও একটু শুনি—

সঞ্জীব। মেয়েটি সত্যিই যাকে বলে অপাপবিদ্ধা, এই একমাস ধরে দেখছি তো, একদিনের জন্যও বেচাল হতে দেখলাম না—

বিপিন। কোনো 'বয় ফ্রেণ্ডের' সঙ্গে মিশতে দেখিস নি ওকে ?

সঞ্জীব। একদম না। বই-খাতা নিয়ে বাড়ি থেকে বার হয়ে সোজা বাসস্টপে চলে আসে,—পাড়ার ফচ্‌কে রকবাজ ছোঁড়াগুলো মাঝে মাঝে ওর দিকে টীকাটিপ্পনী ছুঁড়ে মারে বটে, কিন্তু তাদের দিকে তাকায়ই না মেয়েটা—

বিপিন। একদম পিউরিটান বল—

সঞ্জীব। বাসে লেডিজ সিটটিতে চুপটি করে বসে থাকে, আসে পাশের সুবেশ সুরূপ ছেলেগুলোর দিকে চোখ তুলে তাকায় না পর্যন্ত—

বিপিন। বাঃ, তুই তো এই রকম মেয়েই খুঁজছিলি সঞ্জীব—

সঞ্জীব। হ্যাঁ, মনে হচ্ছে খোঁজার পালা শেষ হল এতদিনে—

বিপিন। তারপর ?

সঞ্জীব। তারপর বাস থেকে নেমে সোজা কলেজে চলে যায়। টিফিনের সময়ে বা অফ্ পিরিয়ডে মাঝে মাঝে দু' একজন সহপাঠিনীর সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়ে এসে চিনে-বাদাম কেনে বটে কিন্তু সহপাঠী কাউকে দেখিনা ওর সঙ্গে—

বিপিন। বাঃ, আদর্শ মেয়ে একেবারে—

সঞ্জীব। অথচ আর পাঁচটা মেয়েকে তাদের বয় ফ্রেণ্ডদের সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করতে করতে রেস্তোঁরাতে ঢুকতে দেখি রোজ—

বিপিন। সত্যি, এ যুগে এ রকম মেয়ে বোধ হয় আর দ্বিতীয়টি নেই রে সঞ্জীব— .

সঞ্জীব। আমারও তাই মনে হয় বিপিন,—আর সে জন্যই তো আমার গায়ে পড়া আলাপের চেষ্টাতে রেগে আগুন হয়ে গেল কাল—

বিপিন। সে হয়তো তোর লোল চর্ম শুভ্রকেশ দেখে—

সঞ্জীব। না রে, আমি হলফ করে বলতে পারি যে আসল চেহারা নিয়ে দেখা দিলেও আমাকে আমল দেবে না সে,—ওর যে নেচারই নয়—

বিপিন। তা হলে আর দেরী করছিস কেন ? এবার ওর বাবার কাছে গিয়ে বিয়ের কথাটা পাড়ি গে চল—

সঞ্জীব। না বিপিন, আরও কিছুদিন যাক। মেয়েটাকে বিরক্ত করতে বেশ মজা লাগে,—ধনুকের মতো ওর ভুরু দুটো কেমন বাঁকা হয়ে ওপরে উঠে যায়, শাঁখ-সাদা গালে আবিরের ছোপ লাগে, পাৎলা ফুরফুরে ঠোঁট দুটো কঠিন ভাবে চেপে বসে আর দেহের দুর্গে বন্দী যৌবন যেন বিস্ফোরণের পূর্বমুহূর্তে পৌঁছে যায়—

বিপিন। মেয়েটি দেখছি তোর মতো ঘোর গদ্যলোকের মনেও কাব্যরসের সঞ্চার করেছে সঞ্জীব—

সঞ্জীব। তা যা বলেছিস বিপিন, আজকাল আধুনিক, অনাধুনিক সব রকমের কবিতাই গোগ্রাসে গিলছি—

বিপিন। (হাত ঘড়ি দেখে) ওঃ, কথায় কথায় সাড়ে নটা বেজে গেল, এবার আমি উঠি সঞ্জীব, আপিসের বেলা হয়ে গেল—

সঞ্জীব। আরে তাইতো, আমাকে ও যে উঠতে হবে ছদ্মবেশের সন্ধানে—ওর কলেজ টাইম হয়ে এলো যে—

বিপিন। (উঠে দাঁড়িয়ে) আচ্ছা তুই বেছে বেছে বুড়োর ছদ্মবেশটা নিলি কেন বলতো সঞ্জীব ? তোর আসল চেহারাটা কী এমন দোষ করল ?

সঞ্জীব। আসল চেহারা নিয়ে মেয়েদের পেছনে পেছনে ঘুর ঘুর করার বিপদ আছে বিপিন, পুলিশের নজরে পড়বার ভয় তো আছেই, এমন কি রাস্তায় অন্য কোনো সন্তানের সঙ্গে মোলাকাৎ হবারও বিলক্ষণ ভয় আছে। কি দরকার অত রিস্ক নেবার ? এদিকে বুড়োদের সাত-খুন মাপ, কেউ তাকিয়েও দেখে না, মনে ভাবে মামা খুড়ো জ্যাঠা মেসোর কেউ হবে হয়তো—

বিপিন। খাসা মৎলবখানা তোর সঞ্জীব, যা তবে, জয়ী হয়ে ফিরে আয়—কাল সকালে এসে শুনবো তোর

আজকের সফল এ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী,—এখন আমি চলি তা হলে—

সঞ্জীব। সকাল সকাল আসিস কিন্তু—

বিপিন। আচ্ছা—

উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

পথ

[দূর থেকে ভেসে আসছে ট্রাম, বাস, রিক্সার শব্দ। রাস্তা দিয়ে পথ চলতি নানা লোকের আনাগোনা হেদুয়ার মোড়ের কাছে মালবিকা আর সমীরণ]

সময় :—দিন সাড়ে দশটা

সমীরণ। কই মালবিকা দেবী, কাউক তো আপনার পিছু নিতে দেখলাম না,—অফিস টাইমের এই ভীষণ ভীড়ে বাসে চেপে আমার চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হওয়াই সার হল দেখছি—

মালবিকা। আমি কিন্তু আজও তাকে দেখেছি সমীরণবাবু—

সমীরণ। সে কি! কোথায়?

মালবিকা। যে বাসে আমরা এলাম সেই বাসে। পেছন দিকে দাঁড়িয়েছিল, চোখে সান গগল্‌স্, মাথায় কাঁচা পাকা চুল, পরনে, ঘি রংএর বুশ শার্ট আর সাদা ট্রাউজার্স, হাতে একটা লেদার কেস, দেখেননি তাকে?

সমীরণ। ঐ মাছি না ঢোকা প্রচণ্ড ভীড়ে এত সব লক্ষ্য করেছেন আপনি? আপনার চোখ তো খুব—

মালবিকা। বাঃ, রোজই দেখছি যে তাকে—

সমীরণ। কিন্তু আপনি বলেছিলেন যে এই রাস্তাটুকু পার হবার সময়েই সে এসে আপনাকে বিরক্ত করে, কিন্তু কই, কোথাও দেখছি না তো তাকে—

মালবিকা। হয়তো ভীড়ের জন্য এই ষ্টপে নামতে পারে নি,—চলুন এগুনো যাক, রাস্তায় এ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়,—কে কী আবার ভাববে—

সমীরণ। বেশ তো, চলুন—

দুজনে এগিয়ে যেতে লাগল।

মালবিকা। আপনি পাশে থাকায় কী যে ভালো লাগছে,—আজ আমার একটুও ভয় করছে না,—ঐ যে আমাদের কলেজ দেখা যাচ্ছে—

সমীরণ। ও কলেজ আমার চিরচেনা—

মালবিকা। তাই নাকি? আপনি তা হলে স্কটি ছাত্র? কী মজা—

সমীরণ। এর মধ্যে আবার মজাটা কোথায়?

মালবিকা। যান, আপনি ভা—রি বেরসিক, এ ভাবে দমিয়ে দেন মানুষকে—(হঠাৎ সমীরণের হাত ধ সমীরণবাবু—সমীরণবাবু—

সমীরণ। কী, কী বলছেন?

মালবিকা। ঐ, ঐ যে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছে দিকে,—ঐ-ঐ—ঐ দেখুন—সেই বুড়োটা,—দেখলেন?

সমীরণ। হ্যাঁ, তাই তো, আপনার বর্ণনার সঙ্গে হু মিলে যাচ্ছে দেখছি,—আপনার পর্যবেক্ষণ শক্তির প্রশং করি মালবিকা দেবী—

মালবিকা। (হাত ছেড়ে দিয়ে) প্রশংসাটা এক মুলতুবী রেখে সরে দাঁড়ান তো এখন, একটু দূর থেে শুধু লক্ষ্য রাখবেন লোকটার ওপর—আর আমি ইঙ্গি করলেই ছুটে আসবেন—

সমীরণ। সেই ভালো—

(সমীরণ একটু দূরে সরে গেল, প্রায় ছুটতে ছুটে সঞ্জীব এসে ঢুকলো,—বৃদ্ধের ছদ্মবেশে)

সঞ্জীব। (স্বগতঃ) বাঁধকে বাঁধকে বলে এত চীৎকা করলাম তবু বাসটা ছেড়ে দিল, ভেবেছিলাম যে আজকে দিনটা বুঝি বৃথাই গেল, কিন্তু না, ভগবান রক্ষা করেছেন ঐ যে মালবিকা দাঁড়িয়ে, কিন্তু ওর কাছ থেকে ছিটকে দূরে সরে গেল সুন্দর মতো ঐ ছেলেটি কে? চেহারা খানা তো খাসা, কিন্তু মনট অত নোংরা কেন? সদর রাস্তায় পরের মেয়ের সঙ্গে—গায়ে পড়ে আলাপ করা!—মনে হয় মালবিকা ওকে আজ আচ্ছা শিক্ষা দিয়েছে—

(মালবিকা আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতে লাগল, সঞ্জীব তাড়াতাড়ি এগিয়ে তাকে ধরে ফেলল। নিরাপদ দূরত্ব রক্ষা করে তাদের অনুসরণ করল সমীরণ। দু চার জন কলেজের ছাত্র ছাত্রী গল্প করতে করতে তাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল)

সঞ্জীব। (পেছন থেকে) ইয়ে—শুনছো—

মালবিকা। (তীর বেগে ঘুরে দাঁড়িয়ে তীব্র কণ্ঠে) কী?—

সঞ্জীব। আজ এত দেরী করলে যে?

মালবিকা। দেরী!

সঞ্জীব। হ্যাঁ, বাস ষ্টপে আসতে? জানো, পাঁচ ছ খানা বাস ছেড়ে গেল তবু তোমার দেখাই নেই, আমার এই বুকের ভেতরটা যা করছিল না—

মালবিকা। আমার যখন খুশী তখন আসব, তাতে আপনার কি?

সঞ্জীব। আমার কি! হেঃ হেঃ হেঃ, কী যে বলে—

মালবিকা। এখন মানে মানে সরে পড়ুন তো এখান থেকে। কেন আমাকে বিরক্ত করেন রোজ?

সঞ্জীব। বি-ক্ত!—আহা রাগ করছ কেন মালবিকা?

মালবিকা। কী? আপনি আমার নাম ধরে ডাকছেন? এত বড় আস্পর্দ্ধা আপনার?

সঞ্জীব। নাম তো ডাকবার জন্যই মালবিকা, এতে আবার আস্পর্দ্ধার কী আছে বলোতো?

মালবিকা। আবার? আপনার দুঃসাহস দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি আমি—

সঞ্জীব। নাম ধরে ডাকবার অধিকার তো এক দিন পাবোই মালবিকা, না হয় একটু আগাম ডেকে নিলাম, তাতে ক্ষতি কি?

মালবিকা। তাতে ক্ষতি কি!

সঞ্জীব। হ্যাঁ, মনের মধ্যে যে নামের জপ অহরহ চলছে, মুখ ফস্কে যদি সে নামটা এক আধবার বেরিয়েই যায় তাতে আসে যায় কিবা কার?

মালবিকা। কী আসে যায় জানতে চান? হবে আপনার হাজত বাস—

সঞ্জীব। কী বললে? বাসর ঘরের বদলে হাজত ঘর। ওটা যে কয়েদীদের থাকবার জায়গা মালবিকা, তোমার আমার মতো প্রেমিকযুগলের নয়—

মালবিকা। হয় কি নয় জানতে চান?

সঞ্জীব। আহা হা, রাগ করছ কেন মালবিকা, আর হাজতের কথাই বা তুলছ কেন? রসাভাস হচ্ছে যে—

মালবিকা। আপনার মনে রসের মাত্রা একটু বেশী হয়ে গেছে বলেই মনে হচ্ছে, রসুন, এখুনি তার চিকিৎসা করছি—

সঞ্জীব। (স্বগতঃ) এঃ, রেগে একেবারে আগুন হয়ে গেছে, কালো দুই চোখে যেন বিদ্যুৎ ঝলকাচ্ছে, উনুনের গনগনে আঁচের মতো মুখখানা,—এমনি মেয়েকেই বিয়ে করে সুখ। এবার নিজের আসল পরিচয়টা দেব নাকি? এক মুহূর্তে সব রাগ গলে জল হয়ে যাবে। হুঁ হুঁ— কলকাতা সহরের ওপর বাড়ি, নিজের গাড়ি, মোটা ব্যাঙ্ক ব্যালান্স, ব্যাস্, মেয়েরা আর কীই বা চায়! কিন্তু তার আগে একটু আগে দেখা ঐ সুন্দর মত ছোকরাটার খোঁজ নিতে হচ্ছে তো, ছোকরা কেটে পড়ে নি এখনো, সেই থেকে আঠার মতো আমাদের পেছনে লেগে আছে,— ভালো আপদ যা হোক—

(প্রকাশ্যে) যে চিকিৎসা করবার অনেক সময় পাবে পরে, কিন্তু আগে বলোতো ঐ ছোকরাটি কে?

মালবিকা? ও তো আমার বন্ধু,—সমীরণ—

সঞ্জীব! মিছে কথা!

মালবিকা। কি আশ্চর্য! মিছে হতে যাবে কেন?

সঞ্জীব। কিন্তু তোমার সঙ্গে তো ওকে এর আগে কখনো দেখিনি—তা হলে ও তোমার বন্ধু হবে কি করে?

মালবিকা। আমার সম্বন্ধে সব কিছুই জেনে বসে আছেন এ ধারণা আপনার কোত্থেকে জন্মালো?

সঞ্জীব। ধারণা জন্মেছে এক মাস ধরে তোমার পেছনে পেছনে ঘুরে, তোমার সম্বন্ধে সব রকম খোঁজ খবর নেবার ফলে—

মালবিকা। (শ্লেষের সঙ্গে) আমার সম্বন্ধে এত খোঁথ খবর নিচ্ছেনই বা কেন শুনি? এতে আপনার লাভটা কি?

সঞ্জীব। লাভ! তোমাকে বিয়ে করব এই আমার লাভ, তুমি আমার হবে এই আমার লোভ, একে আমার ডীপ্ loveএর অভিব্যক্তিও বলতে পারো মালবিকা—

মালবিকা। বিয়ে আপনার মতো গঙ্গাযাত্রীকে! কেন, বাংলা দেশে কি বিয়ের অভাব আছে নাকি?

সঞ্জীব। বিয়েও ভেজাল দিচ্ছে আজকাল,—ও খেয়ে কিছু ফল হবে না মালবিকা,—আর আমাকে তুমি গঙ্গাযাত্রী বলছ? এটা তোমার রজ্জুতে সর্পভ্রম হচ্ছে—

মালবিকা। আমার চোখে তো আর চাল্‌শে ধরেনি যে আপনাকে নব্য-যুবক ভাবব—

। শুধু বাইরের আবরণ দিয়েই কি ভেতরের মানুষটিকে চেনা যায় মালবিকা, ? তুমি সুরঙ্গমার মতোই ভুল বুঝছ আমাকে—

মালবিকা। থাক আমাকে আর রবীন্দ্রনাথ শেখাতে হবেনা, আপনার স্বরূপটি দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আমার কাছে—

সঞ্জীব। (স্বগত:) সম্ভ সান দেওয়া ছুরির মতো কী বুদ্ধিদীপ্ত কথা! ইচ্ছে হয় অনন্ত কাল ধরে ওর পাশে বসে শুধু কথাই বলে যাই। (প্রকাশ্যে তুমি রাজি হয়ে যাও মালবিকা,—আমার সঙ্গে—বিয়ে হলে খুবই সুখে থাকবে,—আমার অনেক টাকা,—বাড়ি গাড়ি সব আছে আমার, বলো, বলো মালবিকা—তুমি রাজি ? ও বাউণ্ডুলে ছোকরাটা রাঙামুলো, দেখেই মনে হচ্ছে যে ওর পকেট একেবারে গড়ের মাঠ—

মালবিকা। (স্বগতঃ) নাঃ, রাস্তার মাঝখানে জ্বালিয়ে মরলে বুড়োটা—এই নাছোড়বান্দা লোকটাকে তাড়াবার একটা সুন্দর ফন্দী আমার মাথায় এসেছে, দেখিইনা প্রয়োগ করে, না হয় একটু বেহায়া মেয়ের অভিনয়ই করলাম—এ ওষুধে বুড়োর প্রেমজ্বর জীবনের মতো ছেড়ে যাবে,—সমীরণবাবু হয়তো কী ভাববেন—তা ভাবুন গে, আগে এর হাত থেকে তো বাঁচি—

সঞ্জীব। (স্বগতঃ) টাকা, বাড়ি, গাড়ির কথা শুনে ওর মনটা একটু নরম হয়েছে বলে মনে হচ্ছে—(প্রকাশ্যে) চুপ করে কী ভাবছ মালবিকা, ওই ছোকরাটার দিকেই বা বার বার তাকাচ্ছ কেন ? ও কাছে থাকতে কিছু বলতে সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে বুঝি ?

মালবিকা। না আর কোনো সঙ্কোচ নেই আমার জেনে রাখুন ঐ ছেলেটির সঙ্গেই আমার—মানে—আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে—

সঞ্জীব। (আর্তস্বরে) কী! কী বললে তুমি? ঐ রাঙামূলোটার সঙ্গে তোমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে ?

মালবিকা। (দৃঢ়স্বরে) হ্যাঁ, আজ বিকেলেই রেজিষ্ট্রি আপিসে আমাদের বিয়ে হবে,—এ কথাটা জানাতেই তো ও আজ আমার জন্য অপেক্ষা করছিল এখানে ?

সঞ্জীব। এঁ্যা! একী সর্বনেশে কথা বলছ তুমি মালবিকা, এদিকে আমি যে তোমাকে ভীষণ ভালোবেসে ফেলেছি,—আমার উপায় কী হবে মালবিকা ?

মালবিকা। উপায় ?…উপায় অবশ্য একটা আছে—

সঞ্জীব। (অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে) আছে ? উপায় তা হলে আছে ? বলো মালবিকা কী সেই উপায় ?

মালবিকা। খবরের কাগজে পাত্রী চাই বিজ্ঞাপন দিয়ে চল্লিশ বেয়াল্লিশ বছরের কোনো বিধবা টিধবা দেখে বিয়ে করে ফেলুন। তা হলেই পথে-ঘাটে যুবতী মেয়েদের পেছনে পেছনে ঘোরার রোগটা একেবারে সেরে যাবে—

সঞ্জীব। (স্বগতঃ) কী সর্বনাশ, মেয়েটা বলে কি ? এখন দেখছি এই বুড়োর ছদ্মবেশটাই হয়েছে যতো গোলমালের মূল—(প্রকাশ্যে) ইয়ে—শোনো মালবিকা, আমার এই বাইরেরটা যা দেখছ তা মায়া—

মালবিকা। মায়া!

সঞ্জীব। হ্যাঁ, মায়া,—মানে,—মরীচিকা মাত্র, মানে, —মনের ভ্রমও বলতে পারো,—আসলে আমার বয়েস কিন্তু বেশী নয়—

মালবিকা। (বিদ্রূপের সুরে) নাঃ, বেশী হবে কেন ? পঞ্চাশ বাহান্নর বদলে, এই—বড়োজোর বাইশ তেইশ—

সঞ্জীব। (সাগ্রহে) সত্যিই তাই,—সত্যিই তাই মালবিকা,—মালবিকা, কি বলব,—এটা সদর রাস্তা,—তা না হলে এক্ষুনি বুঝিয়ে দিতাম তোমার অনুমান কত খাঁটি—

মালবিকা। ঢের হয়েছে —আমাকে আর বোঝাতে হবে না, পথ ছাড়ুন,—আমার কলেজের দেরী হয়ে যাচ্ছে—

সঞ্জীব। তা হলে যাবার আগে তুমি শুধু বলে যাও যে ঐ ছেলেটির সম্বন্ধে একটু আগে যা কিছু বললে সে সবই মিথ্যে—

মালবিকা। সত্যিই হোক আর মিথ্যেই হোক, আপনার তাতে কি ? আর আপনাকে অতশত কৈফিয়ৎ দিতেই বা যাবো কেন ? আপনি তো আর আমার গার্জেন নন—

সঞ্জীব। এখন নই বটে, কিন্তু তুমি রাজি হলে হতে কতক্ষণ ?

মালবিকা। কী। আবার সেই কথা ? এটা একটা রঙ্গমঞ্চ নয় এ কথাটা মনে রাখবেন—

সঞ্জীব। আমাকে দয়া করো মালবিকা, আমি তোমাকে সত্যি সত্যিই ভালোবাসি, আমার সত্যিকারের পরিচয়টা পেলে তোমার সব বিতৃষ্ণা দূর হয়ে যাবে—(মালবিকার হাত ধরে) ও ছোকরার চেয়ে আমি কোনো অংশেই কম নই মালবিকা—

মালবিকা। (সবলে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে, তীব্র স্বরে) বটে! এতদূর? দাঁড়ান, আপনাকে এক্ষুণি শায়েস্তা করছি আমি—সমীরণ—এই সমীরণ,—শুনছো?

সমীরণ। (ছুটে কাছে এসে) কী ব্যাপার?

মালবিকা। এই ছাখো না এই বুড়োটা কী সব অসভ্যতা করছে,—তোমার ভাবী স্ত্রীকে রাস্তার লোক এসে অপমান করে যাবে আর তুমি তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে?

সমীরণ। (স্তম্ভিত হয়ে) আমার ভাবী স্ত্রী! এ আপনি বলছেন কি? আমি তো কিছুই—

মালবিকা। (বাধা দিয়ে) ও, সঙ্কটের মুখে পড়ে প্রেমকে অস্বীকার করাই বুঝি তোমার ধর্ম সমীরণ? হয়তো বেগতিক দেখলে একটু পরে আজ বিকেলে হাকিমের কাছে আমাদের রেজেষ্ট্রি করে বিয়ে করবার কথাটাও অস্বীকার করে বসবে—

সমীরণ। (বিস্ময়ে হতবাক হয়ে) প্রেম! রেজিষ্ট্রি করে বিয়ে!—এ সব আপনি বলছেন কি মালবিকা দেবী?

মালবিকা। তবে কি আমি এই বুঝব যে এই বুড়োটার সামনে আমাকে না চেনার অভিনয় করছ সমীরণ? ও, তুমি বুঝি ভেবেছ যে এ লোকটা আমার কোনো আত্মীয়? তাই আমাদের গোপন কথাটি যাতে ফাঁস হয়ে না যায় সে জন্য আমায় চিনতে চাইছ না?

সমীরণ। না চেনার অভিনয়! এ কথার মানে?

মালবিকা। (সমীরণের কথায় কান না দিয়ে) তবে কোনো দরকার ছিল না তার, কারণ লোকটা আমার কোনো ঘনিষ্ঠ আত্মীয় নয়—

সঞ্জীব। বর্তমানে ঘনিষ্ঠ নই সত্যি, কিন্তু ভবিষ্যতে হতে চাই ঘনিষ্ঠতম,—অবশ্য যদি উনি মাকাল ফল দেখে না ভোলেন, হীরে ফেলে কাচখণ্ড আঁচলে বাঁধতে না চান—

সমীরণ। আই সি। কিন্তু আপনি এই মহিলার পিছু নিয়ে তাঁর বিরক্তি উৎপাদন করছেন কেন তার সন্তোষজনক কৈফিয়ৎটা দিন তো—

সঞ্জীব। আপনার কাছে কোনো কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নই আমি—

সমীরণ। আলবৎ বাধ্য, কৈফিয়ৎ আপনাকে দিতেই হবে—

সঞ্জীব। (তেজের সঙ্গে) কখনোই নয়—

সমীরণ। হাজতে নিয়ে তুললেই বুঝতে পারবেন বাধ্য কি না—

সঞ্জীব। ঈশ,—হাজতের ভয় দেখাচ্ছে আমাকে? হাজতে বাস করতে হবে উল্টে আপনাকেই—

সমীরণ। আমাকে?

সঞ্জীব। হ্যাঁ, আপনাকে। মালবিকার অভিভাবকদের লুকিয়ে তাকে বিয়ে করবার প্ল্যান করেছেন আপনি,—মালবিকা এখনো আইনের চোখে নাবালিকা,—আপনার বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে গুরুতর অভিযোগ আনতে পারি তা জানেন?

সমীরণ। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ?

সঞ্জীব। ঠিক তাই,—কাগজে কাগজে হেড লাইন বার হবে,—'নাবালিকা ফুসলাইবার অভিযোগে ভদ্রবেশী যুবক গ্রেপ্তার'—আমাকে বেশী ঘাটাবেন না,—যান—

সমীরন। কিন্তু আমি তো এঁকে কস্মিন কালেও চিনি না, আমি এখানে এসেছি শুধু কর্তব্যের খাতিরে—

সঞ্জীব। বা বা—চমৎকার। তোফা! দেখলে, দেখলে মালবিকা,—যাকে চিরজীবনের সাথী করতে যাচ্ছিলে তার স্বরূপটা একবার দেখলে? পুলিশের নাম শুনেই ভয় পেয়ে তোমার সঙ্গে সব সম্পর্ক বেমালুম অস্বীকার করছে। তার চেয়ে তুমি ঐ মাকাল ফলকে ত্যাগ করে আমাকে বরণ করে নাও,—দেখবে সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে সব সময়ে তোমার পাশে দাঁড়িয়ে আছি,—তখন

'আমরা দু'জনে স্বর্গ-খেলনা
গড়িব এ ধরণীতে—
মুগ্ধ ললিত অশ্রুগলিত গীতে।
পঞ্চ শরের বেদনা মাধুরী দিয়ে।
বাসররাত্রি রচিবই মোরা, প্রিয়া—

মালবিকা। দোহাই আপনার, এ ভাবে পথে ঘাটে রবীন্দ্রনাথকে হত্যা করবেন না—

সমীরণ। বাসর ঘরে যাবার বদলে শ্মশানভূমিতে যাবার উদ্যোগ-আয়োজন করুন গে, মানাবে ভালো—

সঞ্জীব। এ্যাই দেখুন,—আপনিও আমার এই বাহ্যি-রূপটা দেখেই ভুল বুঝলেন: কি বলব, এটা রাস্তা না হয়ে যদি আমার বাড়ি হত তা হলে এই ভুল বোঝাবুঝির অবসান এক্ষুণি ঘটিয়ে দিতাম—

সমীরণ। ভুল আমি আপনাকে বুঝিনি মশায়, আপনিই বরং আমাকে ভুল বুঝেছেন। যাক, এখন মানে মানে আমার সঙ্গে চলে আসুন তো—

সঞ্জীব। সে কি! কোথায়?

সমীরণ। আপাততঃ টালীগঞ্জ থানায়,—

সঞ্জীব। থানায়? তার মানে?

সমীরণ। তার মানে আমি একজন পুলিশ অফিসার, এই দেখুন আমার আইডেন্‌টিটি কার্ড—

সঞ্জীব। একি! হ্যাঁ, হ্যাঁ,—তাইতো, আপনি তো দেখছি সত্যি সত্যিই পুলিশ অফিসার! মালবিকা, ধিক্ তোমাকে,—শেষ কালে কিনা পুলিশের প্রেমে পড়লে!

সমীরণ। ও সব প্রেম-ফ্রেমের কথা এখন রাখুন, চলে আসুন আমার সঙ্গে—

সঞ্জীব। কিন্তু আমার অপরাধটা কি শুনি?

সমীরণ। প্রকাশ্য রাজপথে মালবিকা দেবীর বিরক্তি উৎপাদন—

সঞ্জীব। হাসালেন আপনি, প্রেম নিবেদনে আবার বিরক্ত হয় নাকি কোনো মেয়ে, আর রাস্তার কথা বলছেন? জানেন না,—(সুর করে)

"প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে।
কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে—"

মালবিকা। আপনার এ জঘন্য কথার আমি তীব্র প্রতিবাদ করছি, সব মেয়েই সমান নয় যে আপনার মতো বাহাত্তুরের সঙ্গে পথে-ঘাটে প্রেম করতে যাবে, বুঝলেন? সমীরণ,—কী দেখছ, ধরে লক্-আপে নিয়ে যাও ওকে—

সমীরণ। এবার সুড়সুড় করে চলে আসুন তো আমার সঙ্গে লক্ষ্মী ছেলের মতো—

সঞ্জীব পলায়নোদ্যত

ওকি পালাচ্ছেন কোথায়? আমার হাত থেকে পালিয়ে বাঁচা অত সহজ নয়, বুঝলেন? তবে রে,—ধরি তো ওর চুলের মুঠি শক্ত হাতে—(এক লাফে এগিয়ে গিয়ে সঞ্জীবের চুলের মুঠি ধরতেই পাকা চুলের পরচুলোটা সমীরণের হাতে উঠে এলো. বেরিয়ে এলো তোফা এ্যালবার্ট টেরি কাটা সঞ্জীবের কাঁচা চুল।)

মালবিকা। (চীৎকার করে) কী আশ্চর্য! একী ব্যাপার?

সমীরণ। একী? এ যে পরচুলো দেখছি…ও, বুড়ো সাজা হয়েছিল বুঝি? লোকটা তা হলে নিশ্চয়ই কোনো ক্রিমিন্যাল—(পুলিশের বাঁশিতে ফুঁ দিল)

সমীরণ। চোর—চোর—ধর—ধর—

সঞ্জীবের পলায়ন

নেপথ্যে। জনতার চীৎকার } ধর—ধর—ঐ পালাচ্ছে চোর,—ধর—ধর—ধর—

এক দৌড়ে সমীরণের প্রস্থান।

মালবিকা। যাঃ বাবা, এ কী? ভোজবাজী দেখলাম নাকি?

(পরচুলাটা রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে) নাঃ, সত্যিই তো পরচুলা এটা—লোকটা কি তা হলে একটা ক্রিমিন্যাল?—ভাগ্যিস সমীরণবাবু ছিলেন, তা না হলে কী যে হ'ত ভাবতেও ভয় হচ্ছে—উঃ কী ভয়ানক মৎলববাজ ঐ ছদ্মবেশী! সমীরণবাবু আবার কোথায় গেলেন? এতক্ষণ কাছাকাছি, পাশাপাশি ছিলেন, মনে কতো ভরসা ছিল,—এখন কিন্তু ভী-ষ-ণ-একা একা লাগছে ওর সঙ্গে আমার আজই রেজিষ্ট্রী করে বিয়ে হবে আমার এই কথাগুলো শুনে ওঁর মুখখানার যা অবস্থা হয়েছিল—ভাবলেও হাসি পাচ্ছে, কিন্তু এটা যে আমার একটা নিখুঁৎ অভিনয়,—এ কথাটা তো জানানো হল না তাঁকে—আজ আর আমার কলেজ করা হবে না, যাই খুঁজে বার করিগে সমীরণকে। নিজের কাছে স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে ব্যাপারটা অভিনয় না হলেই বরং বেশী খুশী হতাম আমি—(নিশ্বাস ফেলে) কিন্তু সমীরণ কি আর বিশ্বাস করবে আমার কথা! আমার আর কোনো কথা!

(মন্থর পদে প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

থানা

সময় বেলা বারোটার কাছাকাছি।

[দৃশ্য পট প্রথম দৃশ্যের মতোই, তবে থানায় অন্যান্য অফিসাররা অনুপস্থিত। বারাণ্ডায় অন্য সেন্ট্রি পাহারা দিচ্ছে। ব্রজগোপাল, শিশির, সঞ্জীব আর মালবিকা উপস্থিত। সঞ্জীব তার আসল চেহারায় একটা চেয়ারে কাঁচুমাচু হয়ে বসে আছে।]

ব্রজগোপাল। হুম্, সবই তো শুনলাম,—কিন্তু আপনার বৃদ্ধের ছদ্মবেশ ধারণের কৈফিয়ৎটা ঠিক যুৎসই বলে মনে হচ্ছে না সঞ্জীববাবু—

সঞ্জীব। বিশ্বাস করুন বড়বাবু, এ ছাড়া আমার আর কোনো অভিসন্ধি ছিল না,—

ব্রজগোপাল। মালবিকা দেবী কি বলেন?

মালবিকা। আমি ওর কথার এক বর্ণও বিশ্বাস করি না স্যার,—সমীরণবাবু বলেছেন লোকটা ক্রিমিন্যাল, আমারও তাই মনে হয়—

ব্রজ। তাইতো, কেসটা বেশ জটিল দেখছি—

মালবিকা। সমীরণবাবুকে দেখছি না যে? তিনি কোথায় গেলেন স্যার?

ব্রজ। সমীরণ গেছে সঞ্জীববাবুর বাড়িতে তার ষ্টেটমেণ্ট্ ভেরিফাই করে দেখতে, এখুনি আসবে—

মালবিকা। মিছিমিছি হয়রান হবেন ভদ্রলোক, ক্রিমিন্যালদের ষ্টেটমেণ্টের আবার মূল্য কি বলুন?—

ব্রজ। তবু ন্যায়বিচারের খাতিরে সব কিছুই আমাদের খতিয়ে দেখতে হয় মালবিকা দেবী—

মালবিকা। দেখতে চান দেখুন, তবে সবই হবে পণ্ডশ্রম—

সঞ্জীব। এই আমি নাকে খত দিচ্ছি স্যার,—মেয়েদের কাছ থেকে একশ' গজ দূরে থাকব চিরকাল। বাপস্,—যে মেয়েকে দেখে মনে হয়েছিল যে ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না, তার পেটে পেটে এত? শেষ কালে কিনা পুলিশ লেলিয়ে দিল আমার বিরুদ্ধে।—

ব্রজ। কিন্তু শুধু নাকে খত দিলেই আপনার অপরাধের গুরুত্ব কমে যাবে না সঞ্জীববাবু,—সত্যি সত্যি বুড়ো হলে তবুও বা একটা কথা ছিল, কিন্তু আপনার মতো একজন যুবক বুড়োর ছদ্মবেশে একটি যুবতী মেয়েকে পথে ঘাটে বিরক্ত করছে এটা একটা সাংঘাতিক অপরাধ,—(জোরে) শিশির—

শিশির। বলুন স্যার—

ব্রজ। পেনাল কোড্‌টা খুলে দেখতো এ ধরণের অপরাধের জন্য কী কী শাস্তি বিধান আছে—

শিশির। এক্ষুনি দেখছি স্যার—(তাক থেকে বিরাট মোটা একটা বাঁধানো বই পেড়ে এনে টেবিলে রেখে তার পাতা ওল্টাতে লাগল)

সঞ্জীব। (ভীত চোখে ভীষণ-দর্শন বইটার দিকে তাকিয়ে) ওরে বাবা,—ঐ মোটা বইটাই কি পেনাল কোড্? মনে হচ্ছে যে ওর পেটের ভেতর থেকে হাজার হাজার কঠোর শাস্তি বেরিয়ে আসবার জন্য আঁকুবাঁকু করছে—

ব্রজ। ঠিক বলেছেন, যে অন্যায় করে পেনাল কোড্ তাকে সহজে ছেড়ে দেয় না—

সঞ্জীব। সত্যি বলছি, মালবিকা দেবী সম্বন্ধে খোঁজ খবর নেওয়া ছাড়া আমার আর কোনো খারাপ উদ্দেশ্য ছিল না,—আমাকে আপনি দয়া করুন বড়বাবু, ঐ মোটা বইটা যদি একবার আমার ওপর চেপে বসে তা হলে আমি আর বাঁচব না স্যার—

ব্রজ। দয়া আমি করতে পারি না সঞ্জীববাবু, আইনে বাধে,—তবে মালবিকা দেবী যদি কেসটা তুলে নিতে রাজী হন তবে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা—

সঞ্জীব। মালবিকা দেবী—

মালবিকা। (তীব্র কণ্ঠে) খবরদার! আপনি আমার নামও উচ্চারণ করবেন না—

সঞ্জীব। (চেয়ার ছেড়ে উঠে মালবিকার কাছে নতজানু হয়ে বসে) আমার ধৃষ্ট ব্যবহারের জন্য আমি সত্যি সত্যিই অনুতপ্ত মিস্ গুপ্ত,—যদি কোনো অন্যায় করেই থাকি তার কি কোনো ক্ষমা নেই?

মালবিকা। ক্ষমা? ক্ষমা চাইছেন আপনি?

সঞ্জীব। হ্যাঁ, এই গললগ্ন-রুমাল-বাসে কৃতাঞ্জলি-করপুটে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি মিস্ গুপ্ত—

(পকেট থেকে রুমালখানা বার করে গলায় জড়িয়ে জোড় হাত করল)

মালবিকা। আমি,—আমি এখুনি কিছু বলতে পারি না, সমীরণবাবু আগে আসুন—

সঞ্জীব। (উঠে দাঁড়িয়ে) সত্যিই আমি ঘুণাক্ষরেও জানতাম না যে সমীরণবাবুর সঙ্গে আপনার মধুরতম সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে—এমন কি বিয়েও স্থির হয়ে গেছে—জানলে কক্ষণো আপনার সামনে গিয়ে দাঁড়াতাম না—

মালবিকা। (লজ্জায় রাঙা হয়ে) আঃ, আপনি থামুন তো! কী সব আবোল তাবোল বকে চলেছেন ?

ব্রজ। (স্বগতঃ) ব্যাপারটার মধ্যে একটা রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি যেন, সমীরণের সঙ্গে মালবিকার বিয়ে পাকা হয়ে গেছে! (প্রকাশ্যে) এ আপনি কি বলছেন সঞ্জীববাবু ? এ খবর আপনি কোথায় পেলেন ?

সঞ্জীব। খবর পেয়েছি মিস্ গুপ্তর কাছে। আজ বিকেলেই রেজেষ্ট্রী হবার কথা। তবে হয়তো বাপ-মাকে লুকিয়ে বিয়ে হচ্ছে বলে সমস্ত ব্যাপারটা দুর্ভেদ্য গোপনীয়তায় ঢাকা ছিল—

ব্রজ। তাই কি মালবিকা দেবী ? সঞ্জীববাবু যা বললেন সব সত্যি ?

মালবিকা। একটা ক্রিমিন্যালের কথায় কেন কান দিচ্ছেন বড়বাবু,—

ব্রজ। উঁহুঃ, কথাটা ঠিক হল না মালবিকা দেবী, আমরা পুলিশের লোক, কান আমাদের সবার কথাতেই দিতে হয়, তা ছাড়া সঞ্জীববাবু যে একজন ক্রিমিন্যাল সে তথ্যও প্রমাণিত হয়নি এখনো—

সঞ্জীব। (আগ্রহের সঙ্গে) লাখ কথার এক কথা বলেছেন স্যার,—সমীরণবাবু ফিরে আসুন, তা হলেই বুঝতে পারবেন আমার কথা সত্যি না মিথ্যে—

ব্রজ। সমীরণ তো দেখছি আচ্ছা ধাপ্পাবাজ—দিব্বি লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করেছে,—আবার আমাদের কাছে বলে কিনা আধুনিকা শিক্ষিতা মেয়েরা ওর দু'চোখের বিষ, তাদের ছায়া মাড়াতেও নাকি তার ঘেন্না হয়—

মালবিকা। বটে! এ সব কথা বলেছেন সমীরণবাবু ? এত দম্ভ তার ? আচ্ছাঃ—

ব্রজ। অথচ দেখুন, লুকিয়ে লুকিয়ে আপনার মতো শিক্ষিতা আধুনিকা তরুণীর সঙ্গে শুধু প্রেমই নয়, একেবারে বিয়েও ঠিকঠাক করে ফেলেছে রাস্কেলটা—

সমীরণের প্রবেশ। পরণে পুলিশ অফিসারের ইউনিফর্ম

সমীরণ। কাকে রাস্কেল বলছেন বড়বাবু ? সঞ্জীববাবুকে ? কিন্তু ওঁর স্টেটমেণ্ট তো অক্ষরে অক্ষরে ঠিক—

সঞ্জীব। (উৎসাহে লাফিয়ে উঠে) দেখলেন স্যার, দেখলেন ? আমি বলিনি আপনাকে যে একবর্ণও মিছে কথা বলিনি আমি ?

ব্রজ। তা হলে আপনার অন্য স্টেটমেণ্টটাও সত্যি নিশ্চয়ই—

সঞ্জীব। নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই,—দেখছেন না, মিস্ গুপ্তের মুখ চোখ কেমন লাল হয়ে উঠেছে,—আহা—ঠিক যেন নবসূর্যের রক্তকিরণে মাখা—

সমীরণ। অন্য স্টেটমেণ্ট। সঞ্জীববাবু কি আরও একটা স্টেটমেণ্ট দিয়েছেন নাকি স্যার…

ব্রজ। হ্যাঁ, আর সেটা ভেরিফাই করবার ভার নিলাম আমি নিজে,—তুমি বুঝি ভেবেছ যে ডুবে ডুবে জল খাবে আর একাদশীর বাবাও জানতে পারবে না, না ?

সমীরণ। ডুবে ডুবে জল খাওয়া! এ আপনি বলছেন কী স্যার ?

ব্রজ। আমি একজন ঝানু পুলিশ ইনস্‌পেক্টার,—এ লাইনে বাইশ বছর কাজ করে চুল পাকালাম,—আর সেই আমাকেই তাপ্পী!

সমীরণ। আপনাকে তাপ্পী! আমি ?

ব্রজ। তুমি এই মালবিকা দেবীকে আগে থেকে চিনতে না ?

সমীরণ। কস্মিন্ কালেও না—

ব্রজ। একে তুমি নিভৃত নির্জনে প্রেম নিবেদন করো নি ?

সমীরণ। প্রেম নিবেদন।

ব্রজ। আকাশ থেকে পড়লে দেখছি। আজ বিকেলে মালবিকা দেবীর সঙ্গে তোমার রেজিষ্ট্রি করে বিয়ে হবে না ?

সমীরণ। বিয়ে! এর সঙ্গে! এ সব আপনি কী বলছেন স্যার ?

ব্রজ। চমৎকার অভিনয়! পুলিশের চাকরী ছেড়ে রঙ্গ মঞ্চে অভিনয় করলে তুমি নাম করতে পারবে সমীরণ।

সমীরণ। সত্যি বলছি বড়বাবু, অভিনয় আমি করছি না—

ব্রজ। মালবিকা দেবী, দেখলেন? দেখলেন সমীরণের কাণ্ডটা একবার? ভাঙ্গবে তবু মচকাবে না, আপনি জলজ্যান্ত সামনে বসে আছেন তবু ওর দুঃসাহসের বহরটা একবার দেখলেন?

শিশির। বাসর ঘরে এর সমুচিত সাজা দিতে ভুলবেন না কিন্তু মালবিকা দেবী—আপনাকে নিয়ে এ রকম তামাসা করবার মজাটা বেশ ভালো ভাবেই পাইয়ে দেবেন—

মালবিকা। (স্বগতঃ] তাই তো, এখন আমি কি করি? কৌতুকের ফাঁস যে এখন গলায় চেপে বসেছে—এখন সত্যি কথা বললেও এঁরা কেউ বিশ্বাস করবেন না—উল্টে নির্লজ্জ বেহায়া ভাববেন আমাকে, ঐ সঞ্জীবটা খিক খিক করে অসভ্যের মতো হাসবে, তার চেয়ে শুধু সমীরণের কাছেই যদি নির্লজ্জ হই তো কেমন হয়? আহা, কেমন বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে!

শিশির। কি ভাবছেন মালবিকা দেবী? কী শাস্তি দেবেন তার কোনো প্ল্যান ঠিক করছেন বুঝি?

মালবিকা। সমীরণ! আমাকে এতগুলো লোকের সামনে অস্বীকার করার মানে?

সমীরণ। আপনাকে অস্বীকার?

মালবিকা। (আবেগের সঙ্গে] এই কি তোমার প্রেমের মহৎ প্রতিশ্রুতিগুলির পরিণাম? গঙ্গার ধারে আকাশের চাঁদকে সাক্ষী রেখে পাতার মর্মরের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে আমার কানে কানে এত দিন ধরে যে সুধা ঢেলেছ সেগুলো কি তবে গরল? তার মধ্যে কি কোনো আন্তরিকতাই ছিল না?

সমীরণ। [হতবুদ্ধির মতো] আপনি—আপনি—মানে তুমি এ সব কী বলছ মালবিকা?

মালবিকা। আমরা যদি পরস্পরকে ভালোবেসে থাকি তবে তার মধ্যে তো কোনো অন্যায় নেই সমীরণ, অন্ততঃ আমার ভালোবাসায় তো এক বিন্দুও ফাঁকি নেই—

সমীরণ। মালবিকা, তুমি কি সত্যি সত্যিই আমাকে ভালোবাসো! এ কি তোমার প্রথম দর্শনের প্রেম? আমার এখন মনে হচ্ছে যে আমিও তোমাকে—

ব্রজ। [গলা খাঁখারি দিয়ে] এ ধরণের কথার জন্য থানার এ ঘরটা তেমন অনুকূল নয় সমীরণ। তুমি বরং এক কাজ কর,—হাজতঘরটা থানার এক কোণে, বেশ নিরিবিলি, আসামীও কেউ নেই আজ। তোমরা দুটিতে ওখানে গিয়ে মিনিট দশেক প্রেমালাপ করে এসো। আমি ততক্ষণ সঞ্জীববাবুর কেসটার ফয়সলা করে ফেলি—

শিশির। হ্যাঁ তাই যাও মালবিকা—সমীরণ,—হাজত ঘরটা প্রেমালাপের পক্ষে তেমন সুপ্রশস্ত হয়তো নয়,—মাথার ওপরে চাঁদ-হাসা আকাশের বদলে আছে নীচু কংক্রীটের ছাত,—সুগন্ধবহ পরিমলের বদলে আছে কয়েদীগুলোর ফেলে যাওয়া বোঁটকা দুর্গন্ধ,—শিশিরের ছোঁওয়া লাগা শিহরিত ঘাসের সবুজ আঁচলের বদলে রেঁায়া ওঠা ভোটকম্বল আর পিকের কুহুতানের বদলে আছে সেন্ট্রি বদলের বাজখাঁই আওয়াজ—

মালবিকা। চলো সমীরণ, এঁরা যখন বলছেন, সেই হাজত ঘরেই চলো। হৃদয় যেখানে পূর্ণ, সেখানে অন্য সব অপূর্ণতা তুচ্ছ হয়ে যাবে, —চলো—

[সমীরণের হাত ধরে টানতে টানতে মালবিকা বেরিয়ে গেল]

[ব্রজগোপাল স্মিতমুখে তাদের গমন-পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন। শিশির পেনালকোডের আড়ালে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল আর সঞ্জীব বিমর্ষ মুখে মাথা নীচু করল]

আস্তে আস্তে যবনিকা নেমে এলো।

খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

ইংলিশ কাউণ্টি ক্রিকেট লীগ :

১৯৬৫ সালের ইংল্যাণ্ডের ইংলিশ কাউণ্টি ক্রিকেট লীগ খেলায় গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান ওরস্টারশায়ার কাউণ্টি ক্রিকেট দল লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। ইংলিশ কাউণ্টি ক্রিকেট লীগের খেলায় তারা গত বছর প্রথম চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল। ১৯৬২ সালে রার্ণাস-আপ এবং ১৯৬৩ সালে চতুর্দ্দশ স্থান পেয়ে ওরস্টারসায়ার দল উপর্যুপরি দু'বছর (১৯৬৪-৬৫) লীগ চ্যাম্পিয়ান হ'ল।

আলোচ্য বছরের প্রতিযোগিতার শেষ দিকে ওরস্টারসায়ার, নর্দাম্পটনশায়ার এবং গ্লামর্গ্যান এই তিনটি দলের মধ্যে চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভের প্রশ্নটি সীমাবদ্ধ ছিল। নর্দাম্পটনসায়ার যখন তাদের লীগের খেলা শেষ করে ২৮টা খেলায় ১৪০ পয়েণ্ট তুলে লীগ তালিকার শীর্ষস্থান অধিকার ক'রেছিল সেই সময়ে তাদের দুই নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী ওরস্টারসায়ার দলের ছিল ২৭টা খেলায় ১৩৪ পয়েণ্ট এবং গ্লামর্গ্যান দলের ২৭টা খেলায় ১৩০ পয়েণ্ট। ওরস্টারসায়ার তাদের শেষ খেলায় সাসেক্সকে ৪ উইকেটে পরাজিত ক'রে যে ১০ পয়েণ্ট সংগ্রহ করে তারই জোরে তারা নর্দাম্পটনসায়ার দলের থেকে চার পয়েণ্ট বেশী পেয়ে লীগ তালিকার শীর্ষস্থান লাভ করে।

অন্যদিকে গ্লামর্গ্যান তাদের শেষ খেলায় দুর্ব্বল এসেক্স দলের কাছে অপ্রত্যাশিতভাবে ৫ উইকেটে পরাজিত হয়ে যুগ্মভাবে নর্দাম্পটনসায়ার দলের সঙ্গে রানার্স-আপ হওয়ার সুযোগ হাত-ছাড়া করে। গত বছর ওরস্টারসায়ার দলের উঠেছিল ২৮ টা খেলায় ১৯১ পয়েণ্ট এবং এ বছর ২৮টা খেলায় ১৪৪ পয়েণ্ট। আগামী শীতের মরশুমে যে এম সি সি দলটি অস্ট্রেলিয়া সফরে যাবে সেই দলে ১৯৬৪ ও ১৯৬৫ সালের ইংলিশ কাউণ্টি ক্রিকেট লীগ চ্যাম্পিয়ান ওরস্টারসায়ার দলের কোন খেলোয়াড়ই নির্ব্বাচিত হন নি। দ্বিতীয়স্থান অধিকারী নর্দাম্পটনসায়ার দল থেকে ডেভিড লার্টার এবং তৃতীয়স্থান অধিকারী গ্লামর্গ্যান দল থেকে জেফ্রে জোন্স কেবল নির্ব্বাচিত হয়েছেন। ব্যাপারটা খুবই তাজ্জব!

ডেরেক স্যাকলটন :

ইংল্যাণ্ডের প্রাক্তন টেস্ট বোলার এবং হ্যাম্পসায়ার কাউণ্টি দলের সভ্য ডেরেক স্যাকলটন তাঁর প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে ২,৫০০ উইকেট পাওয়ার গৌরব লাভ করেছেন। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় তাঁর উইকেট পাওয়ার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২,৫০৫টি। স্যাকলটনকে নিয়ে এ পর্য্যন্ত ১১ জন বোলার প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় আড়াই হাজার উইকেট পাওয়ার গৌরব লাভ করেছেন। স্যাকলটন প্রতি ক্রিকেট মরসুমে একশত বা তার বেশী ক'রে উইকেট পেয়েছেন ১৭বার। এ ব্যাপারে তাঁকে অতিক্রম ক'রে আছেন একমাত্র উইলফ্রেড রোডস —তিনি প্রতি মরসুমে একশত বা তার বেশী উইকেট

পেয়েছেন ২৩ বার। বর্ত্তমানে যাঁরা ইংলিশ কাউন্টি ক্রিকেট লীগে খেলছেন তাঁদের মধ্যে বেশী উইকেটপাওয়ার তালিকার শীর্ষস্থানে আছেন ডেরেক স্যাকলটন।

টেস্ট ক্রিকেট খেলায় স্যাকলটনের পরিসংখ্যান দাঁড়িয়েছে—ব্যাটিং: খেলা ৭, ইনিংস ১৩, নট আউট ৭ বার, মোট রান ১১২, এক ইনিংসে সর্ব্বোচ্চরান ৪১ এবং গড় ১৮·৬০। বোলিং: বল ২০৭৮, মেডেন ৯৬, রান ৭৬৮, উইকেট ১৮ এবং গড় ৪২·৬০।

আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়ানুষ্ঠান:

বুদাপেস্তে অনুষ্ঠিত চতুর্থ আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়ানুষ্ঠানে ৩৪টি দেশের প্রায় দু'হাজার ছাত্র-ছাত্রী যোগদান করেন। অনুষ্ঠানে সর্ব্বাধিক পদক জয় করে রাশিয়া (৫৮টি)। সর্ব্বাধিক স্বর্ণ পদক জয় করে এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা হাঙ্গেরী (১৬টি)।

পদকলাভের তালিকা

প্রথম ছটি দেশ

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ	মোট
হাঙ্গেরী	১৬	৮	১৪	৩৮
আমেরিকা	১৪	৯	৯	৩২
রাশিয়া	১৩	২৭	১৪	৫৪
ইতালি	৬	২	১	২
জাপান	৫	०	২	৭
পোল্যাণ্ড	৪	৪	৪	১২

দূরপাল্লার সাঁতার:

ভাগীরথী নদীতে মুর্শিদাবাদ সুইমিং এসোসিয়েশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ৪৫ মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতায় (জঙ্গীপুর সদর ঘাট থেকে বহরমপুর) ক'লকাতার স্টেট ট্রান্সপোর্টের দেবী দত্ত এবং ১৩ মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতায় (জিয়াগঞ্জ [illegible]ের ঘাট থেকে বহরমপুর গোরাবাজার ফেরীঘাট [illegible]) বি এন আর দলের লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত প্রথম স্থান লাভ করেন। ৪৫ মাইল সাঁতারে যোগদানকারী ৯ জনের মধ্যে ৫জন নির্দ্দিষ্টপথ অতিক্রম করেছিলেন। এঁদের মধ্যে একমাত্র মহিলা সাঁতারু ছিলেন অল্পবয়সের বালিকা ক'লকাতার রেখা ঠাকুর। তিনি চার ঘণ্টা পঞ্চাশ মিনিট সাঁতার দিয়ে প্রায় দশ মাইল পথ অতিক্রম ক'রে অবসর নেন। ১৩ মাইল সাঁতারে যে পনের জন যোগদান করে-ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন মহিলা আগরতলার অরতী দাশগুপ্তাকে নিয়ে চোদ্দজন নির্দ্দিষ্ট পথ অতিক্রম করেছিলেন।

প্রতিযোগিতার ফলাফল

৪৫ মাইল সাঁতার: ১ম দেবী দত্ত (স্টেট ট্রান্সপোর্ট, কলকাতা)—১১ ঘণ্টা ১৬ মিনিট; ২য় আনন্দ হাজরা (বিবেকানন্দ সমিতি, বহরমপুর)—১২ ঘণ্টা ১১ মিনিট ১৯ সেকেণ্ড; ৩য় নিতাইচন্দ্র পাল (সেণ্ট্রাল এয়ার কম্যাণ্ড, কলকাতা)—১২ ঘণ্টা ১৯ মিনিট ৩ সেকেণ্ড।

১৩ মাইল সাঁতার: ১ম লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত (বি এন আর)—২ ঘণ্টা ২৭ সেকেণ্ড; ২য় বৈজনাথ নাথ (ক্যালকাটা স্পোর্টস এসোসিয়েশন)—২ ঘণ্টা ২৮ মিনিট ৫ সেকেণ্ড; ৩য় মধুসূদন দাস (বিবেকানন্দ ব্যায়াম সমিতি, বহরমপুর)—২ ঘণ্টা ৩৩ মিনিট।

অবিরাম সাঁতারে রেকর্ড:

কলেজ স্কোয়ার পুষ্করিণীতে সেল্ফ কালচার ইনষ্টিটিউটের সভ্য দিলীপ দে (বয়স ৩৩) ৭৯ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট সাঁতার কেটে অবিরাম সাঁতারে প্রফুল্ল ঘোষ প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় রেকর্ড (৭৯ ঘণ্টা ২৪ মিনিট) ভেঙ্গে দিয়েছেন।

গিলেট ক্রিকেট কাপ:

ইংল্যাণ্ডের লর্ডস মাঠে আয়োজিত ১৯৬৫ সালের গিলেট কাপ নক-আউট ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে (এক দিনের খেলা) ইয়র্কসায়ার কাউন্টি দল ১৭৫ রানে সারে কাউন্টি ক্রিকেট দলকে পরাজিত ক'রে গিলেট কাপ জয় করেছে। এই নক-আউট ক্রিকেট প্রতিযোগিতা, যার খেলার মেয়াদ মাত্র একদিন, ১৯৬৩ সালে আরম্ভ হয়েছে। সাসেক্স কাউন্টিদল উপর্যুপরি দু'বছর (১৯৬৩-৬৪) গিলেট কাপ জয়ের গৌরব লাভ করেছে।

আন্তঃস্কুল সন্তরণ প্রতিযোগিতা:

১৯৬৫ সালের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের আন্তঃস্কুল সন্তরণ-প্রতিযোগিতায় যে পাঁচটি নতুন রেকর্ড হয়েছে তাঁর মধ্যে সেণ্ট্রাল ক্যালকাটার কুমারী অপু ব্যানার্জি একাই দুটি রেকর্ড করেছেন।

নতুন রেকর্ড

বালক বিভাগ

১০০ মিটার চিৎ সাঁতার: পি ভট্টাচার্য্য (হুগলী) রেকর্ড সময়: ১ মিনিট ১৬-৫ সেকেণ্ড।

১০০ মিটার বুক সাঁতার: পরিমল চন্দ্র (উত্তর কলকাতা) রেকর্ড সময়: ১ মিনিট ২৬·৩ সেকেণ্ড।

বালিকা বিভাগ

১০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল: অপু ব্যানার্জি (মধ্য কলকাতা), রেকর্ড সময়: ১ মিনিট ২৪-৯ সেকেণ্ড।

১০০ মিটার চিৎ সাঁতার: অপু ব্যানার্জি (মধ্য কলকাতা), রেকর্ড সময়: ১ মিনিট ৩৮ সেকেণ্ড।

১০০ মিটার বুক সাঁতার: লতিকা সাহা (উত্তর কলকাতা), রেকর্ড সময়: ১ মিনিট ৪৪-৬ সেকেণ্ড।

চ্যাম্পিয়নশীপ

ছাত্র বিভাগ

ব্যক্তিগত: এস দাস (উত্তর কলকাতা) এবং এস বড়াল (মধ্য কলকাতা)—৬ পয়েন্ট।

দলগত: উত্তর কলকাতা—৪ পয়েন্ট।

ছাত্রী বিভাগ

ব্যক্তিগত: অপু ব্যানার্জি (মধ্য কলকাতা)—১০ পয়েন্ট।

দলগত: মধ্য কলকাতা—১৭ পয়েন্ট।

জাতীয় জুনিয়র ফুটবল:

কটকে অনুষ্ঠিত ১৯৬৫ সালের জাতীয় জুনিয়র ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে দিল্লী ১—০ গোলে অন্ধ্রপ্রদেশকে পরাজিত ক'রে ডাঃ বি সি রায় ট্রফি জয়ী হয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশ দলের রাইট-হাফের এক আত্মঘাতী গোলে জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়।

বাংলা দল কোয়ার্টার ফাইনালে ০—১ গোলে দিল্লীর কাছে পরাজিত হয়েছিল। অন্ধ্রপ্রদেশ কোয়ার্টার ফাইনালে ৩—০ গোলে গত বছরের ডাঃ বি সি রায় ট্রফি বিজয়ী রাজস্থানকে পরাজিত করেছিল। এক দিকের সেমি-ফাইনালের তৃতীয় দিনে দিল্লী ২—১ গোলে মহারাষ্ট্রকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে ওঠে। প্রথম দিনে ১—১ গোলে এবং দ্বিতীয় দিনে ২—২ গোলে এই দু'দলের খেলা ড্র হয়েছিল। অপর দিকের সেমি-ফাইনালে অন্ধ্রপ্রদেশ ১—০ গোলে উড়িষ্যাকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে দিল্লীর সঙ্গে মিলিত হয়।
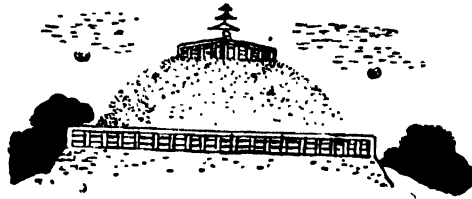
সম্পাদকদ্বয়—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,) কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে ২৩।৯।৬৫ তারিখে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ফুটন্ত কুঁড়ি

শিল্পী - অংগলি চ্যাটি
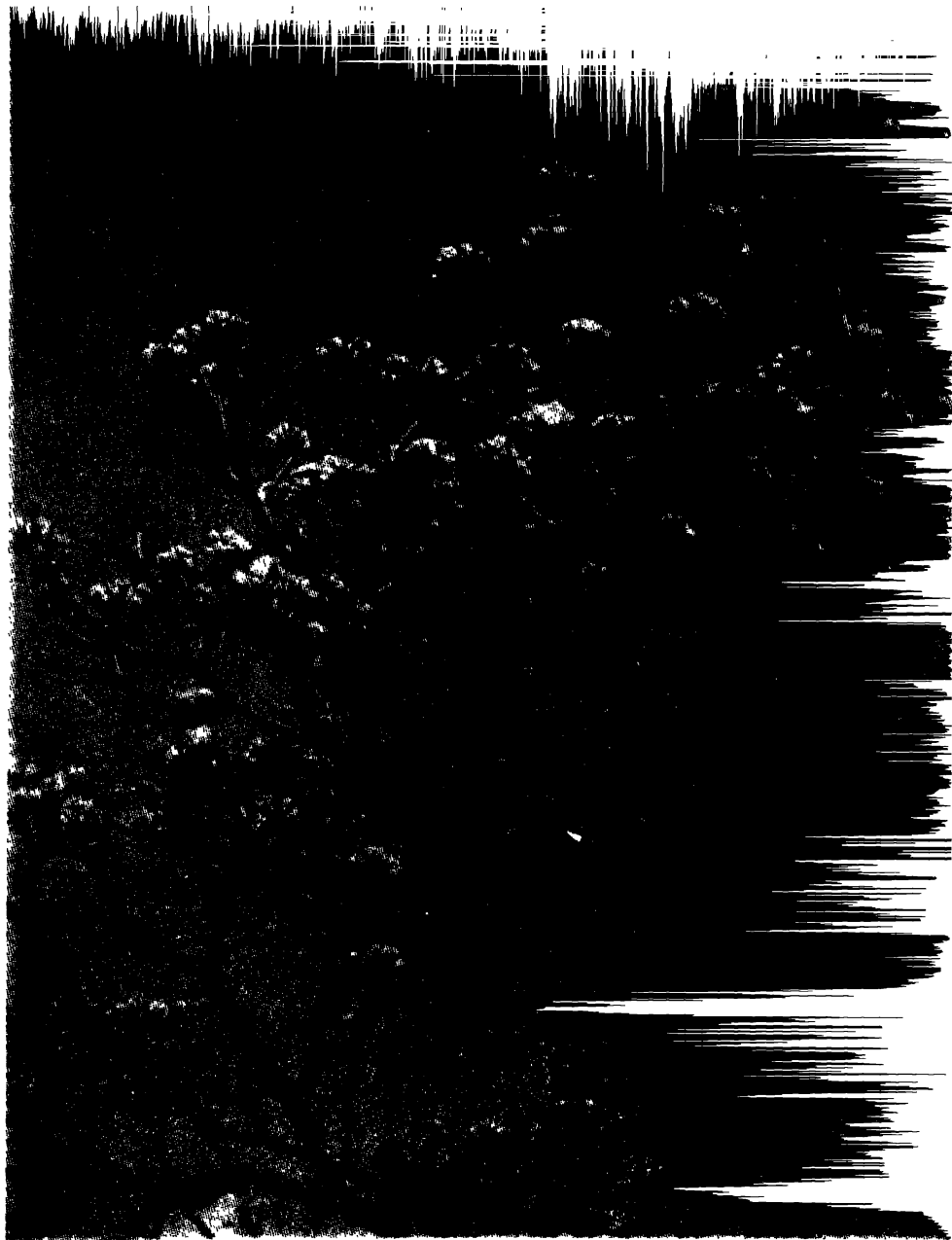
ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ও

কার্ত্তিক—১৩৭২

প্রথম খণ্ড | ত্রিপঞ্চাশত্তম বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

সৃষ্টিতত্ত্ব

শ্রীরাধাবল্লভ দে

সাংখ্যমতে জগৎ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বে রচিত। আমাদের ভিতর পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুই তত্ত্ব রহিয়াছে। পুরুষ প্রকৃতি হইতে পৃথক হইলেও অনাদিকাল হইতে উভয়েই নিত্য। সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য-সত্তাই পুরুষ বা পরমাত্মা নামে অভিহিত। এই পরমাত্মাই দেহাবচ্ছিন্ন হইয়া অগণিত জীবে জীবাত্মারূপে বিরাজমান। আর প্রকৃতি বলিতে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণের সাম্যাবস্থাকে বুঝায়। এই তিনগুণ প্রকৃতিতে যখন সাম্যাবস্থায় থাকে তখন তাহাকে আমরা অব্যক্তা প্রকৃতি নামে অভিহিত করি। অব্যক্তা প্রকৃতিতে কোন ক্রিয়া হয় না। চৈতন্যরূপী জীবাত্মার প্রতিবিম্ব যখন মন, বুদ্ধি, অহংকার সমন্বিত চিত্তে চিদাভাসরূপে প্রতিফলিত হয় তখনই প্রকৃতির তিনগুণের তারতম্যের সৃষ্টি হয়। এই বৈষম্যই সৃষ্টির কারণ। প্রকৃতি তাহার গুণত্রয়ের অসাম্যের দ্বারাই কর্ম আরম্ভ করে। এই কর্মের প্রথম বিকাশ মহত্তত্বে। মহত্তত্ব অর্থাৎ বুদ্ধির বিকাশ। মহত্তত্ব হইতে অহংতত্ত্ব অর্থাৎ আমি আমার রূপ ব্যক্তিত্বের আভাস সৃষ্টি। এই অহংতত্ব হইতে একাদশ ইন্দ্রিয়ের (মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়) সৃষ্টি। একাদশ ইন্দ্রিয় হইতে পঞ্চ সূক্ষ্মতন্মাত্র (রূপ, রস,

স্পর্শ ও শব্দ), পঞ্চ তন্মাত্র হইতে স্থূল পঞ্চ মহাভূত (ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম)। ইহাই সৃষ্টি-তত্ত্বের অতি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ।

সাংখ্য মতে পুরুষ প্রকৃতি পৃথক, বেদান্ত মতে পুরুষেরই প্রকৃতি, সাংখ্য মতে পুরুষ বহু, বেদান্ত মতে পুরুষ এক এইরূপ খুঁটি-নাটি নিয়ে সাংখ্যের সহিত বেদান্ত কি অং প্রসিদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থের সহিত মতভেদ থাকিলেও উপরো সৃষ্টিতত্ত্বের বিশ্লেষণে সাংখ্যমত সর্ব্ববাদিসম্মত।

নারী

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

কী রূপ—রাখিলে বিধি মানব কঙ্কালে,
রক্ত মাংস মেদ মজ্জা—স্নায়ুতন্ত্রী দিয়ে
অপরূপ নিরমিলে রমণীর রূপ
সেই রূপ দেখি আমি পুরুষের চোখে।

বাসনার বৃন্ত পরে পল্লবিনী লতা—
উদ্দাম যৌবনশ্রী স্তবকে স্তবকে।
ওষ্ঠাধরে স্মিতহাসি লজ্জারুণ আভা,
বঙ্কিম ভ্রূলতা তলে অপাঙ্গের চকিত ভঙ্গিমা
বন্দী হয় বারবার প্রণয়ের মৌন আবেদনে।
আমার উন্মন মন মধুকামী মধুপের মত
পুষ্পের বন্দনা গানে গুঞ্জরিয়া ফিরে।

নারীর উত্তুঙ্গ বুক সুঠাম সুডোল
অতুলন রূপে রসে, কঠিন কোমলে
পুরুষের কামনার নব লীলাভূমি।
আসঙ্গের উষ্ণ আস্বাদনে সত্তার বিলুপ্তি সাথে,
মেতে ওঠে মনপ্রাণ সৃষ্টির উল্লাসে।
পানোন্মত্ত মত্ততায় আঁকড়িয়া ধরে বুকে দেহবল্লীলতা,
ছুটে চলে রসাতলে আত্মহারা কামনার বেগে।

হে নারী দাঁড়াও তুমি সম্মুখে আমার,
দে বারে নাহি চাই কেবল তব কঙ্কাল আশ্রয়
নিঃশঙ্ক অস্থিতে গড়া পঞ্জর পাতে বিকৃত ভয়ান;
দেখিবনা শ্বেতশুভ্র সুমসৃণ তোমার করোট
আপনার রূপহীন কাঠিন্য গৌরবে
ব্যঙ্গ করে রমণীর কৃষ্ণ কেশপাশে আগুল্‌ফলম্বিত।
দেখ যেও না বিম্বাধরে প্রেতিনীর চাপা অট্টহাস
আকর্ণ বিস্তৃত তব ব্যাদিত বয়ানে।

তোমারে দেখিতে চাহি যেথা তুমি চলিয়াছ
দেবের দেউলে—
হাতে লয়ে পুষ্পসাজি, মূর্তিমতী ঊষা সীমন্তিনী,
সমর্পিছ আপনায় গললগ্ন চেলাঞ্চলে বিনম্র প্রণামে

তোমারে দেখেছি আমি গৃহের প্রাঙ্গণে,
ক্ষিপ্রহাতে রচিতেছ সুচারু কবরী সঘন
কোমল কৃষ্ণ;
কুন্দশুভ্র দশন দংশনে ধরা আছে বেণীর বন্ধনী,
অর্ধব্যক্ত বাহুমূলে সুপুষ্ট লাবণ্য ভারে
দোলায়িত কর তুমি যৌবনের গরিষ্ঠ গরিমা,
স্বেদগন্ধী কেশের সৌরভে অপরূপ আলস্য মন্থর।
তুমি ত' দিয়েছ ধরা প্রণয়ীর প্রণয় পীড়নে,
আবেশ রভস বশে, সঘন নিঃশ্বাসে,—
সংজ্ঞাহারা আনন্দের অস্ফুট উচ্ছ্বাসে সচকিত
রাত্রির প্রহর।

পরিহরি দিবসের লজ্জা আবরণ,
হে রমণী, প্রকাশিলে নগ্নতার রমণীয় রূপ
দয়িতের আশ্লেষ চুম্বনে,
বক্ষতটে নাভিতটে চিরন্তন ঢেউ খেলাখেলি।

হে বিধাতঃ, এই নারী সৃষ্টিরূপা তোমার মানসকন্যা,
রূপবন সৌন্দর্যের চিন্ময় প্রতিমা।
মাতা কন্যা ভগ্নী রূপে নর্ম সখী রূপে,
মর্ত্যলোকে এনে দিলো সুষমা স্বর্গের,
কুশ্রীতায় করিল সে রূপের আরোপ,
রূপের অন্তরে দিলো অরূপের রহস্য আভাস,
তাই তুমি বারবার হে রসোত্তম,
আপনারে দেখিতেছ রমণীর রূপের মুকুরে।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সাত

তোমাদের বলেছি কিনা মনে পড়ছে না, কাশ্মীর থেকে ওরা দুই বোন বাসন্তীপুরে ফিরে এলেও ওদের মা—শ্রীমতী সুষমা দেবী—কি একটা কনফারেন্সে দুমাসের জন্যে পাড়ি দিয়েছিলেন লণ্ডনে।

ওরা ফিরে আসার মাসখানেক বাদে এল তাঁর তার—তিনি আকাশ পথে—আগামী মাস পয়লায় গৃহ আলো ক'রে ফের গৃহিণী হবেন।

এই দুমাসে গানের সূত্রে আমাদের ঘনিষ্ঠতাটা বেশ গাঢ় হ'য়ে উঠেছিল বৈ কি—অন্ততঃ মূর্ছনার সঙ্গে আমার। কারণ শমিতাকে আমার ভালো লাগলেও সে জানত এড়িয়ে যাবার কৌশল। তার আদর্শ ছিল—খানিকটা সাধুজিই বটে। অন্ততঃ তাঁর প্রভাবে প'ড়েই যে সে হিঁদুয়ানির কোঠায় ফিরে এসেছিল—একথা সেই একদিন বলে কথায় কথায়।

শ্রীমতীর আসন্ন প্রত্যাবর্তনের খবরে আমি খুব খুশী হই নি। কেন—বলাই বাহুল্য।

কিন্তু তিনি এসে পড়ার পরেই ভয় কেটে গেল। কারণ,পয়লা নম্বর সাধুজিকে তিনি মনে প্রাণে শ্রদ্ধা করতেন তাঁর চাল চলন দেখেই মনে হল; দোসরা: আমার গান শুনেই তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করলেন মন্ত্রীগৃহে ভোজে। তেসরা: আমাকে তিনি সবার কাছে পেশ করলেন বিখ্যাত গায়ক ও কবি ব'লে। অতঃপর মাঝে মাঝেই তাঁর ওখানে আসর সুরু হ'ল। শেষে হ'ল কি, গানের আসরও স্থানান্তরিত হ'ল তাঁর সুন্দর মিউজিক-হলে। সঙ্গে সঙ্গে আমার আরো পদবৃদ্ধি হ'ল বৈ কি—যখন আমাকে বহনের জন্যে তাঁর প্রাইভেট ক্যাডিলাক এসে হাজিরি দেওয়া সুরু করল।

মনটা আমার যে এহেন সমাদরে সমারোহে আরাম পেয়েছিল একথা আশা করি না বললেও চলতে পারে। কেবল, কেন জানি না, মনে হত থেকে থেকে যে, এত আলোর পিছনে কি একটা যেন ছায়া রয়েছে থম্‌কে। আমার ভুল হয় নি—শোনো।

আমার বন্ধুবর্গের মধ্যে কেউ কেউ বলেন—আমার নানা গুণ থাকলেও একটি দোষে সব গুণ ডুবেছে—আমার নেই দায়িত্বজ্ঞান। এতে আমি মনে দুঃখ পাই, কিন্তু শোক করি না। কারণ বাইরে থেকে দেখলে যে আমার এই ধরণেরই একটা ছবি ফুটে ওঠে—এ কল্পনা করতে আমার বাধে না। কেবল একটা কথা আমার মনে হয়: যে, আমার'পরে সুবিচার করা খুব সহজ নয় এইজন্যে যে, আমার জীবনের ঘটনালোক অনেক সময়েই দৈনন্দিন ঘটনা-চক্রের বাইরেই আসন পেতেছে। অন্য ভাষায় বলতে গেলে: আমার জীবনে খুব বেশি ঘটেছে সেই জাতীয় ঘটনা, যাদেরকে বলি অঘটন। আশ্চর্য নগরের

যারা পুরবাসী তাদের পক্ষে দৈনন্দিন নগরের বাসিন্দাদের কাছে সুবিচার প্রত্যাশা করা সাজে না।

আশ্চর্যের পালা আসছে ব'লেই তোমাদের কৌতূহল জাগাতে এটুকু ব'লে রাখা। এবার সুরু করি ড্রামা—প্রথম অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্ক। এতক্ষণ হয়েছে তো শুধু বিষ্কম্ভক—Prologue.

আট

নাটকের অবতারণা করার আগে একটি কথা বলা দরকার। মূর্ছনা যেদিন সব প্রথম শমিতাকে ঠেশ দিয়ে নানা কথা আমাকে বলে সেদিন এটুকু বুঝতে আমার বেগ পেতে হয় নি যে, ও শমিতাকে আমার চোখে খানিকটা ছোট করতেই চেয়েছিল। তাই কথাচ্ছলে থেকে থেকে ঠাট বজায় রাখতে দিদির প্রশংসা করলেও প্রতি স্তুতির আড়াল থেকেই উঁকি দিত এই ইঙ্গিত যে, শমিতা খানিকটা ভান ক'রেই পাঁচজনের চোখে বড় হ'তে চেয়েছে—যার নাম অসামান্যা হওয়ার তৃষ্ণা।

কিন্তু সুষমাদেবীর সঙ্গে নানাসূত্রে শমিতার সম্বন্ধে আলোচনা হওয়ার পরে আমার আর সন্দেহ রইল না যে, শমিতা অন্য থাকের মেয়ে, লোকের চোখে বড় হবার লোভে সে ভাণ বা অভিনয়ের পথ ধরে নি। জেদ অবশ্য ছিল, কিন্তু ওর মনে সে-জেদেরও ছোঁয়াচ লেগেছিল শুধু সাধুজির পুণ্য সংস্পর্শে। তাঁর কাছে দীক্ষা না নিলেও সে তাঁকে গুরুর মতনই ভক্তি করত। তাকে সবচেয়ে অভিভূত করেছিল তাঁর নির্মল চরিত্র, বৈরাগ্য ও ভক্তি সঙ্গীত। সুষমাদেবী আমাকে আরো বলেন যে শমিতার মধ্যে এই আশ্চর্য রূপান্তর দেখার ফলেই প্রথমে তাঁরও জীবনে নানা পরিবর্তন আসে—শমিতাকে সমীহ করার পিছনেও ছিল এই পরিবর্তনের ফলে গড়ে ওঠা এক নবদৃষ্টিভঙ্গি। এ-সূত্রে আমি আরো চমকে উঠেছিলাম সত্যিকার সাধুর চরিত্রপ্রভাবের ঐন্দ্রজালিক শক্তির কথা ভেবে। কারণ এ-বিলিতি পরিবারেও যে-শক্তি স্বদেশী ভাবধারার জোয়ার টেনে আনতে পারে, সে-শক্তিকে জাদুকরী নাম দিলে অত্যুক্তি হবে না।

~~কিন্তু~~ তবু শুধু মূর্ছনা নয়, সুষমাদেবীও সত্যিই চাইতেন না যে, শমিতা 'কুনো' হ'য়ে পড়ুক ধর্মের প্রভাবে। ধর্মকে শ্রদ্ধা করতে শিখলেও ধর্মেরও যে কড়াকড়ি হ'তে পারে এই নিয়ে তাঁর মাঝে মাঝেই শমিতার সঙ্গে তর্ক বাধত। অ- অপরের সামনে তিনি শমিতার হ'য়েই লড়তেন। কিন্তু —বলি। এই ঘটনাটি আমাকে সচকিত ক'রে দিয়েছি ব'লেও বর্ণনা করা দরকার।

আমরা সময়ে সময়ে বাসন্তীপুরের কাছে একটি হ্রদে যেতাম পিকনিক করতে। রাজাসাহেবের একটি মোটর বোট ছিল সে হ্রদে। শমিতা ও মূর্ছনাকে নিয়ে সুষমা দেবী দু তিন দিন গিয়েছিলেন সেখানে। আমার ভা- ছিল মোটর-বোটে গান করার।

সেদিন গেয়েছিলাম শমিতারই অনুরোধে কান্তকবির রচনা একটি গান :

"কবে তৃষিত এ-মরু ছাড়িয়া যাইব তোমার
রসাল নন্দনে ?
কবে তাপিত এ-চিত হইবে শীতল তোমার করুণা
চন্দনে ?"

এ-গানটির মর্ম এই যে, এ-জগতে মানুষ বড় একলা—এখানকার পরিবেশ নীরস। রস মিলতে পারে কেবল ভগবানের সান্নিধ্যে। খানিকটা তোমাদের খৃষ্টদেবের দৃষ্টিভঙ্গিই বলব : অর্থাৎ এ-জগৎটা হ'ল অবাস্তর—দুঃখময়। ক্ষতিপূরণ মিলতে পারে কেবল ওপারে—hereafter. গানটির শেষে অন্তরায় ছিল :

"কবে ভবের সুখ দুখ চরণে দলিয়া
যাত্রা করিব গো শ্রীহরি স্মরিয়া,
চরণ টলিবে না, হৃদয় গলিবে না
কাহার ব্যাকুল ক্রন্দনে।"

গানটি শেষ হ'তেই মূর্ছনা ঠেশ দিয়ে বলল ব্যঙ্গ হেসে : "দিদি, বৈরাগিণী ভেক ধরতে না ধরতে তুই হলি কী ? পিকনিকে এসেও শ্মশান-সঙ্গীত ! ধন্যি মেয়ে !"

শমিতার মুখ রাঙা হ'য়ে উঠল, কিন্তু সে জবাব দিতে গিয়েই নিজেকে সামলে নিয়ে হ্রদের দিকে চেয়ে রইল। মোটর বোট তখন হ্রদের মাঝে, কিন্তু ইঞ্জিন বন্ধ। অস্তসূর্যের কিরণে হ্রদের জলে সিঁদুরের আভা এমন চমৎকার দেখাচ্ছিল…

সুষমা দেবী শমিতাকে বিমনা দেখে মূর্ছনাকে ধমকে বললেন : "তোর মুখের যেন আগল নেই মূর্ছা ! অসিত কী চমৎকার গাইল বল্ তো ! না অসিত, তুমি বেশ

করেছ। এ-গানটির যেমন ভাব তেম্নি সুর। তুমি গাইলেও কী চমৎকার! Thank you, my great artist! মূর্ছা কী বুঝবে কাকে ধর্ম বলে, আর কাকে শ্মশান। ও জানে শুধু ফ্যাশান।"

মূর্ছনা ছিল দারুণ অভিমানী। ধমক খেয়ে চোখে আঁচল দিয়ে উঠে গেল মোটর-বোটের অন্য দিকে।

শমিতা তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে তার কণ্ঠবেষ্টন ক'রে বলল: "ছি ছি, মা-র বকুনি কি গায়ে মাখতে আছে ভাই? না, আমারই ভুল হয়েছিল, মানছি। এ-গানটি অসিতকে গাইতে না বললেই ভালো হ'ত। সত্যিই তো, পিকনিকে এসে বৈরাগ্যের গান গাওয়া মানায় না। যেখানকার যা। তুই মন খারাপ করিস নে ভাই। তাহ'লে আমাদের পিকনিকে আসাই মিথ্যে হবে।"

মূর্ছনা ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলল: "আ-হা! ম'রে যাই, যেন অসিত আমার জন্যেই পিকনিকে এসেছে।"

সুষমা দেবী বললেন: "কী বাজে বকছিস তুই? অসিত এসেছে আমাদের সবারই জন্যে।"

মূর্ছনা দমবার মেয়ে নয়, পিঠ পিঠ জবাব দিল আমার দিকে চেয়ে: "বলো তো অসিত বুকে হাত দিয়ে—এ-কথা কি সত্যি? তুমি—"

"শমিতা থামছিল, এবার মূর্ছনার মুখ চেপে ধরে বলল: "কী যা-তা বলিস মূর্ছা? থাম্!"

মূর্ছনা মুখ ছাড়িয়ে নিয়ে বলল: 'য-তা যে আমি বলি নি—তা আর কেউ জানুক বা না জানুক তুই জানিস খুব ভালো ক'রেই। কিন্তু যেতে দে এ-আলোচনা।" ব'লেই সুষমাদেবীর দিকে চেয়ে: 'কেবল একটি অনুরোধ করছি মা, তোমার পায়ে পড়ি আর কখনো আমাকে ডাক দিও না তোমাদের পিকনিকে। দিলে তোমরাই ভুগবে। তাছাড়া অসিত এসেছে দুদিনের জন্যে—তার যা ভালো লাগে তাই কোরো। আমি যে সুরেলাদের মাঝে প্রায়ই বেসুরা গাই জানোই তো—তাই কেন মিথ্যে আমাকে ডাকাডাকি?"

ব'লেই ফের চোখে আঁচল। আর গান হ'ল না—আলাপও জমল না। সবই কেমন যেন ভেস্তে গেল।

নয়

অসিত বলল: সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম এল না। মূর্ছনা যে ঈর্ষার বশে সংযম হারিয়েছিল তাকে ঈর্ষা ব'লে সনাক্ত করতে অবশ্য আমার বেগ পেতে হয় নি। কিন্তু ওর কথার মধ্যে যে কিছুটা সত্য ছিল তাও তো অস্বীকার করা যায় না। মূর্ছনা ও শমিতার সঙ্গে আমি গান শিখতাম একসঙ্গে পীতবাসের কাছে। শিখতাম ওদেরই বাড়ীতে রোজ সন্ধ্যাবেলা। মূর্ছনার চেয়ে শমিতা অনেক ভালো গাইত—গলা ছেড়ে না গাইলেও সেটা বোঝা যেত। এই নিয়ে আগে কথা কাটাকাটিও হয়েছে বৈকি। তাছাড়া এমনও হয়েছে যে, মূর্ছনা এসেছে কিন্তু শমিতা আসে নি। সেদিন আমার মন যেন কান পেতে থাকত ওর চরণধ্বনির জন্যে—একথাও তো না মেনে পারি না। অতএব কী করা যায়?

"অনেক রাত পর্যন্ত ভাবতে ভাবতে শেষ রাত্রে ঘুমিয়ে প'ড়ে মূর্ছনাকে স্বপ্ন দেখলাম। বললাম তাকে: "শমিতা সুকণ্ঠী হ'লে কী হয়? মেয়েদের সব চেয়ে বড় সম্পদ—রূপ। কাজেই তোমারই জিৎ।" বলতেই মূর্ছনা আমার কাছে স'রে এসে হেসে আমার হাত দুটি টেনে নিল নিজের দুহাতের মধ্যে। অমনি আমার ঘুম ভেঙে গেল। তার পরে ওর রূপের চিন্তায়ই মন আবিষ্ট হ'য়ে উঠল।

আমি স্থির করলাম—আর না। যা ভালো লাগছে তার নাম আমাদের শাস্ত্রীরা দিয়েছেন প্রেয়। বলেছেন তার সঙ্গে শ্রেয় মিশ খায় না। এ-দুইয়ের মধ্যে বিরোধ চিরন্তন। একথার প্রত্যক্ষ ভাষ্য পেলাম বোধহয় প্রথম সেই দিন—স্বপ্নের নির্দেশে। মনকে বোঝালাম প্রেয় চেয়ে শ্রেয়কেই বরণ করতে হবে—ওদের ছোঁয়াচ এড়িয়ে চলাই পন্থা।

মন মুখভার করল। ওদের জোর ক'রে এড়িয়ে চলা মানে বিশ্রী কাণ্ড—scene! সে কি হয়?

দোলায়মান মন নিয়ে পরদিন সকালে উঠেই গেলাম সাধুজির কাছে। দেখি তিনি কী বলেন। তাঁকে বললাম: "এখন থেকে আমি শুধু আপনার কাছে গান শিখতে আসব সকালে। সন্ধ্যায় ওদের ওখানে যাব না আর!"

"সাধুজি টেলিপ্যাথি জানতেন বোধহয়। আমার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বললেন: "তুমি যে সময়ে বুঝেছ

—প্রেয় ছেড়ে শ্রেয়কে বরণ করতে চেয়েছ, এতে সত্যিই ভারি খুশী হয়েছি বাবা।"

আমি মুখ নিচু ক'রে র'লাম, কিছু বললাম না। তিনি হঠাৎ বললেন: "একটা গান শুনবে বাবা?" ব'লেই ধ'রে দিলেন ভাবাবেশে:

'কোন্ ভাবে কে সাজায় ডালা, কার টানে কে
কোথায় চলে,
কোন্ সাধে কে গাঁথে মালা, কার ঢঙে কে কথা বলে,
মনের বাজে খরচ এ তো,
থাকলে পুঁজি দেখা যেতো,
আমার পুঁজি বন্ধু তুমিই—আর কেউ নয় ধরাতলে।
চিন্তা এখন হোক: যেন নাথ, তোমার পথেই
চরণ চলে।
কোথায় কে দেয় আশা—পরে ভাঙে তাকে কোন্
নিঠুরে,
বিমুখ কখন এলো কাছে—স্বজন স'রে গেল দূরে,
এ নিয়ে তো ঢের ভেবেছি,
লেনাদেনার গান গেয়েছি,
এখন এ সব থাক না—শুধু প্রাণ যেন সেই
গানেই গলে—

যে-গান তোমার সুরে বাঁধা শুধু তোমার কথাই বলে।'

গানটি তিনি এমন অপরূপ ঢঙে গাইলেন—সুর ও ভাবের সমন্বয়ে—যে আমার বুকের মধ্যে একটা তার বেজে উঠল। কে যেন বলল: এরি নাম দৈববাণী—কান দাও এবার।

বাড়ী ফিরে অনেকক্ষণ ভাবলাম। মনের সঙ্গে অনেক ল'ড়ে শেষে ঠিক করলাম যে শুধু মনের বাজে খরচ বন্ধ করাই নয়—যেখানে অপব্যয় হবার সম্ভাবনাই ষোলো আনা, সেখানে না থাকাই ভালো। তোমাদের খৃষ্টদেবের প্রার্থনা মনে পড়ল: 'Lead us not into temptation'. সে-সময়ে সাধুজির মতন গভীর বৈরাগ্য আসে নি অবশ্য, কিন্তু বৈরাগ্যের সুর তো আমার অজানা ছিল না। তাই ভেবেচিন্তে সেদিন সন্ধ্যায় গেলাম মন্ত্রী নিবাসে সব ব'লে খালাস হ'তে। সাধুজি সবে এসে বসেছেন। আমি গিয়েই, ভণিতা রেখে বললাম সুষমাদেবীকে: "মাসিমা! এবার বাংলাদেশে ফিরতেই হচ্ছে কিছুদিনের জন্যে।"

তিনি চমকে উঠে বললেন: "সেকি অসিত? কই কালও তো কিছু বলো নি।"

আমি তখন ফশ্ ক'রে মিথ্যা বললাম—যার জন্যে পরে চিত্তগ্লানি হয়েছিল যথেষ্ট, কারণ সত্যিই মিথ্যা বলতে আমার লজ্জায় মাথা কাটা যায়। বললাম: "কলকাতা থেকে এক তার এসেছে, আমার এক বন্ধুর অসুখ।"

সাধুজি হেসে বললেন: "দেখলে তো বাবা, কলমবাড়া পথে চললে মানুষ কী ভাবে নেমে আসে। নৈলে তোমার মতন স্বভাব সত্যবাদী কি এমন টপ্ ক'রে মিথ্যার আড়ালে আশ্রয় নিতে পারত?"

যিনি চিরদিনই সোজা পথের পথিক, রাজা মন্ত্রী কারুরই তোয়াক্কা রাখতেন না, তিনি আমাকেই রেয়াৎ করবেন কেন?

কিন্তু অপ্রতিভ হ'য়ে আমার অবস্থা হ'ল শোচনীয়। মান বাঁচাতে কী বলব ভাবছি, এমন সময় লজ্জানিবারণ বাঁচিয়ে দিলেন, মন্ত্রীসাহেব ঘরে ঢুকে বললেন; "অসিত, তোমার গান শুনতে চান্ রাণী সাহেবা। Congratulations!'

মনটা খুশী হ'ল। আমাদের মধ্যে আড়ষ্ট ভাবটা কেটে গেল। একথা সেকথা ব'লে তিনি বিদায় নিলেন এই আশ্বাস দিয়ে যে, দুচারদিন বাদেই দিন ঠিক ক'রে আমাকে খবর দেবেন।

কিন্তু গান সেদিন জমল না আর। একটু বাদে শমিতা ও মূর্ছনা দুজনেই উঠে গেল। মাসিমা বললেন: "কাল যা হ'য়ে গেছে মন থেকে মুছে ফেলো বাবা, লক্ষ্মীটি!"

"এখন থেকে ওঁকে মাসিমাই বলব—যে-নামে তাঁকে ডাকতাম—তিনি নিজেই চেয়েছিলেন ব'লে।

দশ

বাংলোতে ফিরে এসে ইকমিক কুকার নামিয়ে খেয়ে-দেয়ে বারান্দায় আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে আথাল-পাথাল ভাবছি একটা সামান্য কথার বোমাফাটার ফলে কী তছনছ হয়ে যায় আমাদের জীবনযাত্রায়—এমন সময়ে মাসিমার কাডিলাক শ্—শ্—শ্ শব্দে এসে থামল গাড়ী বারান্দার নিচে।

রাত তখন বেশি হয়নি, সবে ন-টা। কিন্তু এসময়ে

তো মন্ত্রীসাহেবের মোটর আসে না।—ও কে? হঠাৎ বুকের রক্তে ঢেউ উঠল: গাড়ী থেকে নামল—শমিতা!

ও নিজেই মোটর হাঁকিয়ে এসেছিল। আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলল: "কথা আছে।"

আমি ওকে দেখেই উঠে দাঁড়িয়েছিলাম, বললাম: "বোসো আমার চেয়ারে, আমি একটা চেয়ার আনাচ্ছি—বেয়ারা!"

ও বলল: "না বেয়ারাকে বিদায় ক'রে দাও," ব'লে লন-এর ঘাসের উপরেই ব'সে প'ড়ে আমাকে বলল: "বোসো, আকাশের তারার নিচেই আমার বলা সহজ হবে যা বলতে এসেছি"

আমি আশ্চর্য হ'য়ে বসলাম ঘাসের উপরেই ওর পাশে। বুকের মধ্যে রক্ত এত উচ্ছল হয়ে উঠেছে যে মুখে কথা ফুটল না।

সেদিন আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ টলটল করছিল। শমিতার গম্ভীর মুখে বিষাদের ছোঁওয়া। তাই বুঝি আরো মায়াময় দেখাচ্ছিল ওকে।

ও খানিকক্ষণ মুখ নিচু ক'রে থেকে হঠাৎ মুখ তুলে বলল: "যা বলতে এসেছি বলা সহজ নয় অসিত, বিশেষ আমার মতন কুনো মেয়ের পক্ষে। তবু বলতেই হবে।"

আমার বুকের রক্ত আরো দুলে উঠল। বললাম: "কী এমন কথা?"

ও জোর ক'রে বলল: "আমাদের এখানে এসে তোমাকে অপদস্থ হ'তে হয়েছে খানিকটা—কী বলব—আমাদের দুই বোনের জন্যেই বৈ কি। তাছাড়া আর কী বলব? তাই—তাই—প্রথম কথা, এ জন্যে তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি। না, শোনো, আমার কথা শেষ হয় নি।

"দ্বিতীয় কথাটা এই যে, তুমি আমাদের জন্যেই সাধুজির কাছে গান শেখা ছেড়ে চলে যেতে চাইছ—ভাবতেও আমার যেন লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে।"

আমি কী বলব ভেবে না পেয়ে সান্ত্বনার সুর ধরলাম: "কিন্তু এজন্যে তো তুমি দায়ী নও শমিতা!"

শমিতা বলল: "এক সংসারে পাঁচজন থাকলে একের ভুল ভ্রান্তি অপরকে বর্তায় তাই মূর্ছনা অসংযমী ব'লে আমি পার পেতে পারি না—না, চাইও না, সত্যি বলছি, বিশ্বাস কোরো।"

আমি বললাম: "করি শমিতা। কারণ তুমি যে স্বভাবে সত্যবাদিনী আমাকে সাধুজি বলেছেন।"

শমিতা ম্লান হাসল: "আমরা স্বভাবে যা আচরণেও কি তার পরিচয় দিয়ে থাকি সব সময়ে? স্বভাবে তো তুমিও সত্যবাদী অসিত। তবুও দেখ পাকে চক্রে প'ড়ে মিথ্যেকথার আশ্রয় নিতে—" ব'লেই থেমে গিয়ে—"কিন্তু ঐ দেখ, ঝোঁকের মাথায় ব'লে ফেললাম যা বলতে চাই নি।—না শোনো। আমি এ-ব্যাপারে কার দোষ কতখানি সে-আলোচনা করতে তোমার কাছে আসি নি। কুমারী মেয়ের এসময়ে একলা তোমার কাছে আসাটা যে দৃষ্টিকটু তাও আমি জানি বৈকি। তাই বাড়ী গিয়ে আমি বলব না কাউকেই আমি কোথায় গিয়েছিলাম। চেপে ধরলে মিথ্যাই বলব—যে বেড়াতে গিয়েছিলাম সেই হ্রদে একা। কেমন? এর পরেও কি বলবে আমাকে স্বভাবে সত্যবাদিনী?"

আমি হেসে বললাম: "বলব শমিতা। কারণ শুধু এই যে, তুমি যখন বাধ্য হয়ে মিথ্যে কথা বলবে তখনও মনে মনে নিজেকে সে-জন্যে ক্ষমা করবে না। প্রার্থনা করবে—ভবিষ্যতে যেন এমন সংকটে আর না পড়ো যেখানে মিথ্যা না ব'লে পার পাওয়া যায় না। স্বভাবে মিথ্যাবাদী যারা তারা মিথ্যার সাফাই গেয়েও আত্মপ্রসন্ন হ'য়ে ওঠে, চায় না নিজেদের শোধরাতে, পণ নেয় না যে, আর পা বাড়াবো না মিথ্যার থানায়। সংসারে সব প্রগতিই এই ভাবে হয় শমিতা, ওঠার পরে পড়া—পড়ার পরে ফের ওঠা—আরো উঁচুতে—সাধুজিও কি সেদিন বলেন নি ঠিক এই কথাই তাঁর নিজের দৃষ্টান্ত দিয়ে?"

শমিতার মুখের বিষাদ কেটে গেল। ও চোখ তুলে আমাকে বলল প্রসন্ন কণ্ঠে: "ধন্যবাদ অসিত। বহু ধন্যবাদ। কারণ—কারণ এর পরে তোমাকে বলা সম্ভব হবে যা বলতে এসেছি—মানে তৃতীয় কথাটা।"

"তৃতীয়?"

"হ্যাঁ। আমি তোমাকে অনুরোধ করতে এসেছি—রাণীসাহেবাকে গান না শুনিয়ে তুমি যেও না। তাহ'লে বাবা বড্ড false positionএ পড়বেন।"

আমি একটু ভেবে বললাম: "আচ্ছা। কেবল—আমিও একটি পাল্টা অনুরোধ করব—রাখবে বলো?"

শমিতা অকুণ্ঠেই বলল: "রাখব, আর কারণ কী বলব? কারণ এই যে, তুমি এমন কোনো অনুরোধ কাউকেই ক'রতেই পারো না যা সে রাখতে পারে না।"

আমি হেসে বললাম: "এবার I must return the compliment, বলি—বহু ধন্যবাদ, ওরফে সাধ্বী, সাধ্বী!"

শমিতা সায়-দেওয়া হাসি হাসল না, বলল: "কিন্তু—এবার বলি আমার শেষ অনুরোধ—কটা হ'ল?"—

আমি হেসে বললাম: "গুণি নি, তবে মনে হয় গুটি তিনেক অনুরোধ কানের মধ্যে দিয়ে মরমে পশেছে।"

শমিতা মৃদু হেসেই গম্ভীর হ'য়ে গেল, বলল: "তাহ'লে চতুর্থ অনুরোধটি এই যে, তোমার কাছে কয়েকটি বাংলা গান শিখতে চাই।"

এবার আমি সত্যিই আশ্চর্য হলাম। বললাম: "আমার কাছে? স্বয়ং সাধুজি থাকতে?"

শমিতা বলল: "আমি তোমার কাছে চাই রজনীকান্ত ও দ্বিজেন্দ্রলালের কয়েকটি কীর্তন শিখতে। সাধুজি জানেন না তাঁদের গান।"

আমি হেসে বললাম: "এ আমার মহৎ সম্মান, শমিতা! ভাবতেও আমার বুক দশ হাত হচ্ছে!"

"ঠাট্টা রাখো।"

"ঠাট্টা নয়—এবার নিজর্লা সত্যি কথা বলেছি। ফিতে থাকলে মেপে দেখাতাম।" ব'লেই তক্ষণি রসনার রাশ টেনে বললাম: "আমি শেখাতে রাজী আছি—কেবল একটি সর্তে।"

"কী?"

"তোমাকে গলা ছেড়ে গাইতে হবে।"

শমিতা একটু ভেবে বলল: "আচ্ছা গাইব, কিন্তু কেবল তোমার সাম্‌নে।"

আমি বললাম: "রাজী। কিন্তু চুক্তিটা ভুলো না কাজ হাসিল হবা মাত্র।"

এবার ও হাসল খুশী হয়েই: "না, আমি স্বভাবে সত্যবাদিনী যে—এ তো তুমিই বলেছ, তাই ভয় কি?"

"এবার অকুতোভয় হ'লাম সত্যিই" ব'লে ওর হাসিতে যোগ দিতেই গেটে ঢুকল মূর্ছনার ছোট জ্যাগুয়ার টু-সিটার।

আমরা উঠে দাঁড়াতেই মূর্ছনা ব'লে উঠল: "এ কী! দিদি!"

শমিতা বিব্রত কণ্ঠে বলল: "অসিতকে শুধু বলতে এসেছিলাম—"

মূর্ছনা বলল: "আমার কাছে তো তোমার জবাবদিহি নেই দিদি, কেন মিছে মিথ্যের ফুলঝুরি কাটছ?" ব'লেই আমার দিকে ফিরে: "আমার আজ নিমন্ত্রণ আছে এক জায়গায় এক বলডান্সে। যাবার পথে মা তোমাকে ব'লে যেতে বললেন যে, বাবা ঠিক করেছেন সাত আট দিনের মধ্যেই রাণীসাহেবা তোমার গান শুনবেন বাড়ীতে। মাকে কী বলব? তুমি তার আগে চ'লে যাবে না থাকবে মা জানতে চান।"

আমি শমিতার মুখের দিকে চেয়ে বললাম: "শমিতা ও আমাকে থাকতে বলেছে, তুমিও বলছ—"

মূর্ছনা বলল: "আমাকে কেন জড়াচ্ছ অসিত? আমি সাতেও নেই পাঁচেও নেই—তাছাড়া আমি কারুর জবানীতেও কথা কই না। আমি এসেছি নিরালায় তোমাকে আমার মনের কথা শোনাতে নয়, মা-র মুখপাত্রী হ'য়ে শুধু একটা মেসেজ দিতে—যে, তিনি ও বাবা চান তুমি রাণীসাহেবাকে গান শোনাও। এর উত্তর তুমি তাঁদের দিও আজই রাত্রে টেলিফোনে। গুড নাইট।"

ব'লেই তৎক্ষণাৎ মোটরে উঠে ষ্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে গেল।

শমিতা একটু চুপ করে থেকে মুখ তুলে বলল: "ওর 'পরে রাগ কোরো না অসিত। বুঝতেই তো পারো কেন ও এমন রুখে উঠেছে।"

আমি বললাম: "পারি শমিতা। কিন্তু দুদিনের জন্যে এসে তোমাদের প'রিবারে আমি অশান্তির কারণ হ'তে চাই না। আরো এই জন্যে যে, তোমাদের কাছে আমি বহু আদর যত্ন পেয়েছি। তাছাড়া সাধুজির এত স্নেহ পেয়েছিও তো কতকটা তোমার বাবা মারই প্রসাদে। —কে জানে মূর্ছনা আবার কী বাধিয়ে বসে? তাই আমার মনে হয় যে, আমার এখন মানে মানে প্রস্থান করাই ভালো।"

শমিতা দৃঢ়স্বরে বলল—"না। তোমাকে থাকতেই হবে। অশান্তিকে এড়িয়ে শান্তি পাওয়া যায় না—এ তুমিও জানো। তাছাড়া—" ব'লে মুখে জোর ক'রে হাসি টেনে: "আমাকে কথা দিয়েছ—চুক্তিও হয়ে গেছে তোমারই ভাষায়। এর পরে তোমাকে আমি যদি অব্যাহতি না দিই?"

আমি হঠাৎ প্রফুল্ল হয়ে উঠলাম, বললাম হেসে: "তাহ'লে অগত্যা আমাকে থাকতেই হবে। বারবার মিথ্যাবাদী হ'লে শুধু অনুতাপের দৌলতে তো আর সত্যবাদী হ'য়ে ওঠা যায় না।"

শমিতা বলল খুশী হ'য়ে: "তাহ'লে কথা দিচ্ছ যে পালিয়ে আত্মরক্ষা করবে না?"

"আত্মরক্ষা?"

শমিতা কথাটা ব'লেই ভুল বুঝেছিল, আতপ্ত কণ্ঠেই বলল: "না অসিত, আমি মুখ ফসকে ব'লে ফেলেছি। আমি বলতে চেয়েছিলাম—আমাদের বাঁচাতে চেয়ে তুমি গান শেখা ছেড়ে দেবে না।"

আমি কথার মোড় সহজ দিকে ফেরাতে চেয়ে বললাম: "না, আরো একটু বলেছিলে—তোমাকে গান শেখাতে হবে, আর রাণীসাহেবাকে গান শোনাতে।"

"হ্যাঁ। রাজী?"

"না রাজী হ'য়ে করি কী বলো—শুধু কথা দিয়েই তো নয়, তার উপর চুক্তি করার পর?"

"তিন সত্যি?"

"রাজী রাজী রাজী। হ'ল?"

মনটা হাল্কা হ'য়ে গেল ওর হাসিতে। [ক্রমশঃ

শিল্পী—শম্ভু রায়

নৈতিক জাগরণে সাহিত্যের দায়িত্ব

কৃষ্ণচন্দ্র দে

নৈতিক জাগরণে সাহিত্যের দায়িত্ব বিরাট। এই বিরাটত্বকে বিশ্লেষণ ক'রলে দেখা যায় যে, সাহিত্য-সৃষ্টিকে সাধারণতঃ দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত সমালোচক কুইলার কাউচ এই দু'টি ভাগের নাম দিয়েছেন Literature of power অর্থাৎ সৃষ্টিমূলক বা রসধর্মী সাহিত্য এবং Literature of knowledge অর্থাৎ জ্ঞানবাদী সাহিত্য। এই জ্ঞানবাদী সাহিত্য এমনই একটি সাহিত্য যা পড়লে জ্ঞান হয়, বুদ্ধি পরিশীলিত হয় এবং মনন তীক্ষ্ণতাপ্রাপ্ত হয়।

নৈতিক জাগরণে সাহিত্যের যে একটা বিশেষ দায়িত্ব আছে একথা সর্বজনবিদিত। কারণ জ্ঞানবাদী সাহিত্যই নৈতিক জাগরণের সহায়ক। যদিও রসধর্মী সাহিত্যও পাশাপাশি থেকে নৈতিক জাগরণে প্রেরণা সঞ্চার করে থাকে। এই দু'ধরণের সাহিত্যই মানবজীবনের নৈতিক উন্নতির পথপ্রদর্শক।

আদিমযুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত ধারাবাহিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে মানুষের নৈতিক জাগরণের কত অভাবনীয় পরিবর্তন হয়েছে এবং তা সম্ভবও হয়েছে সাহিত্যের মাধ্যমে। যুগযুগান্তর ধ'রে সাহিত্যিকগণ তাঁদের সাহিত্যে মানবজীবনের ভাল মন্দ ঘটনাগুলি সংস্থাপন. ক'রে জনগণের সামনে তুলে ধরেন, আর মানুষ তা থেকে শিক্ষালাভ ক'রে নৈতিক উন্নতির যথাসাধ্য চেষ্টা করে। এইভাবে আজ বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সাহিত্যের মাধ্যমে নৈতিক জাগরণ এক বিস্ময়কর সৃষ্টি।

নৈতিক জাগরণে সাহিত্যের দায়িত্ব যে কতখানি সে সম্বন্ধে কিছু সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক আলোচনা এই প্রবন্ধে সন্নিবেশিত হ'ল।

ষোড়শ শতাব্দীতে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম নৈতিক জাগরণের নানাবিধ অন্তরায়ের উল্লেখ ক'রে চমকপ্রদ সাহিত্যে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তারপর সপ্তদশ শতাব্দীতে মগ ও পর্তুগীজ দস্যুদের উপদ্রবে মানব-সমাজে তাণ্ডব দেখা দিল। ফলে মানুষের নৈতিক অবস্থা ক্রমশঃ পতনোন্মুখ হয়েছিল।

এইভাবে মানব-চেতনা অবলুপ্ত হ'য়ে সমাজ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলল। দেশবাসী বিশেষ ক'রে সাহিত্যিকগণ লেখনী ধারণ ক'রে কোনপ্রকারে বাঁচিয়ে রাখলেন সমাজকে। উনিশ শতক থেকে এই পতনোন্মুখ সমাজের সংস্কার সুরু হ'ল। সাহিত্যের মাধ্যমেই সমাজকে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হল।

রামমোহন রায় থেকে সুরু করে আজ রবীন্দ্রযুগ পর্যন্ত সকল মনীষীই নৈতিক চেতনা জাগরণের চেষ্টায় এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের লেখনীতে ফুটে উঠল মানব-জীবনের নৈতিক অবনতির অবস্থা এবং সমাধানের পথ দেখিয়ে জাগিয়ে তুললেন মানবের নৈতিক চেতনা।

রামমোহন ছিলেন সমন্বয়ের পথপ্রদর্শক। সাহিত্যের মাধ্যমে তিনি আন্দোলন করেছিলেন সামাজিক সমস্যার বিরুদ্ধে। সেই সমসাময়িক যুগের চাষীদের দুরবস্থাও তিনি সাহিত্যের মধ্যে লিপিবদ্ধ ক'রে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেছিলেন, শুধু তাই নয়, শিক্ষা-দীক্ষায়, ধর্ম ও সংস্কৃতিতে সমাজ অনেক পেছিয়ে আছে দেখে তিনি স্বয়ং কর্মের দ্বারা জাগিয়ে তুলেছিলেন সেযুগের সমাজকে। জাগিয়ে তুলেছিলেন মানবের নৈতিক চেতনাকে।

এই সময় সাহিত্যে লেখনী ধারণ ক'রে এগিয়ে এলেন ঈশ্বরগুপ্ত। পাশ্চাত্যের পাদমূলে স্বদেশবাসী নৈতিকতা জলাঞ্জলি দিয়ে গর্ববোধ করছিল দেখে তিনি ক্ষুব্ধ হলেন এবং লিখলেন "স্বদেশের কুকুর ধরিব, বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া"। সাহিত্যের মাধ্যমে, কর্মের মাধ্যমে সমাজের মলিনতা দূর ক'রে নৈতিক জাগরণের চেষ্টায় ব্রতী হলেন

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সাহিত্যে তাঁর দান অবিস্মরণীয়। এরপর সাহিত্যের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হলেন অমিতশক্তিশালী মহাপুরুষ ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র। সাহিত্যের মাধ্যমে তিনি প্রবৃত্ত হলেন ধর্ম সংস্কারের কাজে। ক্রমে ক্রমে শশধর তর্কচুড়ামণি, চন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ সাহিত্যিকগণ স্বদেশবাসীর নৈতিক জাগরণের কাজে লেখনী ধারণ করেছিলেন।

১৮৪৯-৫০ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যের মাধ্যমে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নবজাগরণের সাড়া এনেছিলেন। সেই সময় সমাজের উন্নতি ক'রে নৈতিক জাগরণের চেষ্টায় সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ মনীষী গণ।

ইতিমধ্যে সাহিত্যের মাধ্যমে কাব্যের মাধ্যমে, নৈতিক জাগরণের চেষ্টায় লেখনী ধরলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় ভাবধারায় নিস্নাত হ'য়ে তাঁর সাহিত্য ও কাব্যকে এক অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা মণ্ডিত করে তুলেছিলেন। রামমোহনের প্রবর্তিত সমন্বয় রবীন্দ্রনাথে এসে তার চূড়ান্ত সার্থকতা প্রাপ্ত হয়েছিল।

যে ভয়াবহ পৈশাচিকতা ও কদাচার সমাজে প্রবেশ ক'রে নৈতিক চেতনা বিনষ্ট করেছে তা সমূলে উচ্ছেদ করার কাজে আবির্ভূত হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি বলেছিলেন, "সুষ্ঠু আচার আচরণ ও সমাজ ব্যাপারে মানুষের স্বাধীন চিন্তাশক্তি ফিরে না এলে সমাজের উন্নতি সম্ভব নয়।' সুতরাং প্রথমে সমাজকে সর্বপ্রকার মলিনতা থেকে মুক্ত করে তাকে গড়ে তুলতে হবে। সমাজকে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব না হ'লে নৈতিক জাগরণও সম্ভব নয়।

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র সেই সমাজ পুনরুদ্ধারের কাজে এগিয়ে এলেন। সমাজের দৈনন্দিনের বাস্তব ঘটনাগুলি তিনি সাহিত্যের মাধ্যমে তুলে ধরতেন জনসাধারণের সামনে। তিনি সেগুলিকে বাস্তবরূপ দিয়ে সাহিত্যে এমনভাবে ফুটিয়ে তুলতেন যাতে সমাজ বুঝতে পারে যে বহু কুরীতি সমাজে প্রবেশ করেছে এবং তার মূলোৎপাটন করা প্রয়োজন, নইলে নৈতিক জাগরণের কোন সম্ভাবনাই নেই।

এইভাবে নৈতিক জাগরণের চেষ্টায় জ্ঞানবাদী ও রসবাদী সাহিত্যের মাধ্যমে সাহিত্যিকগণ যুগ যুগ ধরে চেষ্টা ক'রে আসছেন। জ্ঞানবাদী ও রসবাদী সাহিত্যের মধ্যে রয়েছে পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। কেননা, একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির পুষ্টিসাধন সম্ভব নয়। এই দুইয়ের যুগপৎ শ্রীবৃদ্ধিতেই সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি। সাহিত্যিক নারায়ণ চৌধুরী এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন—"জ্ঞানবাদী সাহিত্যের দাবি অতৃপ্ত বা অপূর্ণ রেখে সত্যিকার রসসাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব নয়, একথা যদি আমরা মনেপ্রাণে হৃদয়ঙ্গম করতে পারতুম তা হলে একতরফা রসসাহিত্য সৃষ্টির অভিমান মন থেকে আমাদের কবেই উবে যেত। জ্ঞানসাহিত্য রস-সাহিত্যে প্রয়োজনীয় শক্তিসঞ্চার করে; জ্ঞানের ভিত্তি-ভূমি ব্যতিরেকে রসসাহিত্যের প্রাকার নড়বড়ে ও শিথিল হতে বাধ্য।"

নৈতিক জাগরণের অনেকাংশই নির্ভর করে সাহিত্যের উপর। কারণ সাহিত্য হচ্ছে সহিতত্বের অর্থাৎ সমষ্টির সঙ্গে সম্পর্কের প্রতীক, আর জীবন হচ্ছে ব্যক্তির প্রতীক। জীবন অর্থে এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে জীবনের আধ্যাত্মিক, আত্মিক, নৈতিক দিকের কথা। এসব মিলিয়ে আমাদের জীবন পূর্ণ; আর সেই পূর্ণতার সার্থক রূপ জাগরূক রয়েছে সাহিত্যের পাতায় পাতায়। সুতরাং জীবনচর্চা আর সাহিত্যের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি না ক'রে যদি সাহিত্যিক-গণ সাহিত্যরচনা করেন তাহ'লে নৈতিক জাগরণ সম্ভব হবে। এরজন্য প্রয়োজন আত্মোন্নয়ন। নিজে শুদ্ধ হলে, নিজের মন উন্নত হলে, তবে তো অন্যকে মহৎ কল্পনায় অনুপ্রাণিত করা সম্ভব হবে! সেজন্যই প্রয়োজন সাহিত্যের মাধ্যমে চিত্তশুদ্ধ করা।

শুধুমাত্র সাহিত্যসৃষ্টিই যথেষ্ট নয়। সাহিত্যিকগণের দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন যে, তাঁদের রচিত সাহিত্যের মধ্যে নৈতিক জাগরণের প্রণোদনা কতদূর রয়েছে। জীবনা-নুভূতির দিকে লক্ষ্য রেখে সাহিত্য সৃষ্টি করলেই প্রকৃত মর্যাদা লাভের সম্ভাবনা দেখা যাবে।

আত্মোন্নয়নের সাধনা ব্যতিরেকে ব্যক্তি জীবনের উন্নয়নের সাধনা কল্পনা করা নিরর্থক। ব্যক্তি জীবনের চিন্তা, কর্ম ও আচরণকে পরিশুদ্ধ করবার চেষ্টা না ক'রে যাঁরা লেখনীর মাধ্যমে সমষ্টি উন্নয়নের কথা সাহিত্যে লিপি-বদ্ধ করেন তাঁদের সে সাহিত্য শুধুমাত্র ব্যবসায়িক ভিত্তির উপরই হয় প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ব্যবসায়িক মূল্যমানই কি সাহিত্যের একমাত্র মর্যাদা? সমষ্টি যেমন ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে নয়, তেমনি সাহিত্যও সমাজকে বাদ দিয়ে হয় না। প্রকৃত সাহিত্যের মর্যাদা সেই সাহিত্যেরই, যে সাহিত্যে ব্যক্তির আধ্যাত্মিক, আত্মিক, নৈতিক স্বভাবের পরিশোধন ক'রে জাগরণের পথনির্দেশ লিপিবদ্ধ হয়।

সুতরাং নৈতিক জাগরণে সাহিত্যের দায়িত্ব অনেক-খানি। কেননা, সাহিত্যের মাধ্যমেই সম্ভব হবে সমাজের উন্নতি, সমষ্টির উন্নতি, ব্যক্তি জীবনের উন্নতি; আর এগুলির উন্নতি হলেই নৈতিক জাগরণ সম্ভব হবে। তাই সাহিত্য ব্যতিরেকে নৈতিক জাগরণ সম্ভব নয়।

সঙ্গীতের দ্বৈতরূপের প্রকাশ

শ্রীরাসবিহারী ভট্টাচার্য

সঙ্গীতের দুটি রূপ ও দুটিকে নিয়েই সে সম্পূর্ণ। ব্যবহারিক বা ক্রিয়াসিদ্ধ (প্রাকটিকাল) ও ঔপপত্তিক বা শাস্ত্রীয় (থিওরেটিক্যাল)। এই দুই রূপ ও বিকাশকে নিয়ে সঙ্গীত তার পরিপূর্ণরূপে মনুষ্য সমাজে শিক্ষা, শিল্প ও সংস্কৃতির উৎপাদন হিসাবে পরিচিত। ব্যবহারিক হাতে-নাতে করার জিনিষ—যাকে বলি আমরা 'সাধনা' ও সেই সাধনাকে সচল ও রূপান্বিত করার জন্য যে উপায় বা নির্দেশের প্রয়োজন তাদের এক কথায় বলি 'ঔপপত্তিক' বা 'থিওরি'। একটি প্রতিপাদ্য ও কাম্য ও অপরটি শাস্ত্র, নির্দেশ, উপায় বা প্রণালী।

ইংরাজী 'থিওরি' শব্দটি কিন্তু সামান্য বা ইউনিভার্সাল অর্থেরই প্রকাশক, বিশেষ বা ব্যষ্টি অর্থে নয়। সঙ্গীতের ব্যাকরণ, সঙ্গীতের বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, মূর্তিতত্ত্ব বা আইকোনোগ্রাফী, মনোবিজ্ঞান,—এ সমস্তই সামান্যভাবে 'থিওরি' শব্দের অন্তর্গত, অন্যথা 'থিওরি' শব্দের দ্বারা বুঝি আমরা সঙ্গীতের ব্যাকরণ। ব্যাকরণ বিজ্ঞান থেকে আলাদা, কিন্তু ব্যাকরণও আবার বিজ্ঞানের কাছে ঋণী। তেমনি সাহিত্য ব্যাকরণ নয়, বিজ্ঞান সাহিত্য নয়, দর্শন মূর্তিতত্ত্ব নয়, কিংবা মূর্তিতত্ত্ব মনোবিজ্ঞান নয়, সকলেই যে যার আসনে প্রতিষ্ঠিত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ব্যাপক 'থিওরি' শব্দটির মধ্যে অঙ্গাঙ্গীভাবে ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান, মূর্তিতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান ও সৌন্দর্যতত্ত্ব বা এস্থেটিক উপাদান বা বিকাশগুলি নিহিত থাকলেও তাদের কাজ ও উপযোগিতা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন। তাই বিভিন্নভাবে সেগুলিকে দেখে সঙ্গীতের মধ্যে তাদের বিকাশ, স্বরূপ ও সার্থকতা নিরূপণ করাই সঙ্গীতশিল্পী ও সঙ্গীতশাস্ত্রীদের কর্তব্য।

সঙ্গীতের প্রাণই হল 'রাগ'। 'রাগ' স্বরসমষ্টির সন্নিবেশ বা রূপায়ণ এবং তার মধ্যে মনোবিজ্ঞানের একটি স্থান আছে। সেজন্য 'রাগ'কে আমরা বলি আন্তার-বাহ্যবগাহী বা 'সাইকোমেটিরিয়েল' পদার্থ। কেননা মনের বাইরে বাহ্যজগতে ও মনে তথা অন্তঃকরণে দুজায়গাই তার ক্রিয়া-চঞ্চল ভাব ও গতি আমরা লক্ষ্য করি। 'রাগে'র স্বর-কাঠামো থাকে বাইরের জগতে, কিন্তু তাদের সংবেদন হয় মনে। এখানে ব্যাকরণের সঙ্গে সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের পাই সার্থকতা। স্বরগুলির আরোহণ অবরোহণ নিয়ে সামাজিক মানুষের কাছে রাগের রূপ যখন বিকাশ হয়, তখন কথার সম্ভার তাকে অর্থবান করে, আর তখনি সার্থকতা দেখা দেয় সাহিত্যের। সুর, স্বর-সংবাদ ও স্বর-সংগঠনের পাশা-পাশি কথা, ছন্দ, বৃত্তি, রীতি, তাল ও রসানুবিদ্ধ ভাবকে নিয়ে সঙ্গীতের জগতে দেখা দেয় সাহিত্য। তারপর রাগের কাঠামোর মধ্যে যখন বিবর্তন বা পরিবর্তনের ভাব দেখা দেয় তখনি পূর্বাপরের চিন্তাধারা সৃষ্টি করে ইতিহাস। একথাও সত্য যে, একই রাগের মধ্যে যখন বিচিত্র রূপের সৃষ্টি হয়, তখনি পূর্বাপর সামাজিক রুচি ও পরিবেশের জ্ঞান না থাকলে তার সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ও স্বতন্ত্র দৃষ্টি প্রতি-ভায় দেখা দেয় দৈন্য। তারপর রাগের বিকাশের পেছনে চরম-আদর্শ মানুষের কি থাকতে পারে এই প্রশ্নের চাহিদা মেটাতে প্রয়োজন হয় দর্শনের। সঙ্গীতের আদর্শকে চাক্ষুষ ও প্রত্যক্ষ করার জন্য মানুষের সমাজে দেখা দিল ক্রমে মূর্তির কল্পনা, দেবত্বের বা দেবীত্বের আরোপ এবং সম্ভব হল সঙ্গীতকে অপার্থিব প্রমাণ করার জন্য। অনুসন্ধ সঙ্গীত শিল্পীর কাছে তখন মূর্তিতত্ত্বের তথা আককোনো-গ্রাফীর এলো প্রয়োজন। সুতরাং দেখা যায় সঙ্গীতের প্র্যাক্টিক্যাল বা ব্যবহারিক তথা সাধনার অংশ ছাড়া থিওরি বা ঔপপত্তিক বিষয়ের ক্ষেত্রে ব্যাকরণের চাহিদা ছাড়াও প্রয়োজন হয় বিজ্ঞান, সাহিত্য, মূর্তিতত্ত্ব, দর্শন ও মনোবিজ্ঞানের। অন্যথা রাগের ঔপপত্তিক

বা থিওরেটিক্যাল জ্ঞান হয় আংশিক অসম্পূর্ণ কিংবা বিকৃত।

একথাও সত্য যে, সঙ্গীতের শিক্ষা বা অনুশীলনকে পরিপূর্ণ করে তুলতে গেলে আমাদের প্রয়োজন হয় দুটি রূপ বা বিকাশের—ঔপপত্তিক ও ব্যবহারিক—থিওরি ও প্রাক্‌টিস্‌। নিজের জীবনে সঙ্গীতের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করার সঙ্গে সঙ্গে অপরের প্রতি যখন কর্তব্যের চেতনা জাগে তখনি লক্ষ্য যায় সঙ্গীতের দ্বৈতরূপের প্রতি এবং উপলব্ধিও হয় তাদের প্রয়োজনীয় ও সার্থকতার কথা। দুটি রূপই সঙ্গীত-বিহঙ্গের দুটি পাখা, দুটি পাখার সংযমতা নিয়েই সঙ্গীত বিহঙ্গ হয় গতিশীল অন্যথা একটির অভাবে অন্যটি হয় পঙ্গু ও পরাধীন, স্বাধীনতার আস্বাদন থেকে সে হয় বঞ্চিত।

সঙ্গীতের দ্বৈতরূপ—ব্যবহারিক ও ঔপপত্তিকের ক্ষেত্রে প্রশ্ন হতে পারে কোনটি আগে, কেননা আদির সমাদর ও সম্মানই আগে ও তারপর পরবর্তীর। সঙ্গীতের স্বর, ছন্দ, রাগ, তাল প্রভৃতির সৃষ্টি আগে তারপর তাকে নিয়ন্ত্রিত ও সুরক্ষিত করার জন্য সঙ্গীতিক ব্যাকরণ, বিজ্ঞান, ইতিহাস, প্রভৃতি জন্ম। কিন্তু তাই বলে সমাদরের নির্বাচন নির্দিষ্ট হবে না পূর্ববর্তী ও পরবর্তীর নজিরে, আর তারি জন্য সুর বা সঙ্গীতের তথা ব্যবহারিকের সমাদর হবে না আগে ও থিওরীর পরে। ইট ও চুন-সুরকি দিয়ে ইমারত তৈরী হলেও ইমারতের চেয়ে ইট ও চুণ-সুরকিকেই লোকে বেশী সম্মান দেয় না, বরং দ্বৈতরূপের কথা ভুলে গিয়ে দুটিকে অভিন্নভাবে সমান সমাদর দান করে। সঙ্গীতের দ্বৈতরূপের বেলায়ও তাই। ব্যবহারিককে সুপরিকল্পিত করার জন্য ঔপপত্তিক বা থিওরীর সৃষ্টি হলেও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে দুটির প্রতি শিল্পী ও সমঝদারের সমান দৃষ্টি থাকা উচিত। অবশ্য একথাও সত্য যে, ইট ও চুন-সুরকি দিয়ে যেমন ইমারত তৈরী হয়, তেমনি কেবল থিওরির শাসন দিয়ে স্বর, রাগ, মূর্ছনা, অলংকার-সমন্বিত রাগ বা সঙ্গীত সৃষ্টি হয় না; থিওরি ব্যবহারিক সঙ্গীতের অনুসঙ্গী ও সহায়ক এবং নিয়ামকও বটে উপমাটি সদৃশ না হলেও পূর্ববর্তী পরবর্তীর বিচারক্ষেত্রে বেমানন নয়, আর তারি জন্য সঙ্গীতসেবীদের উচিত ছায়া ও কায়ার অভিন্নতার মধ্যে থিওরি ও প্রাক্‌টিস্‌—ঔপপত্তিক ও ব্যবহারিককে সমান চোখে দেখা। দুটির সহযোগ না থাকলে সঙ্গীতের চাক্ষুষ রূপ সাধক ও শ্রোতার অন্তরে আসন গ্রহণ করতে পারে না।

কে তুমি ?

কবিকঙ্কণ হেমন্ত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

গোধূলির ছায়া লাগা সন্ধ্যায়
কে তুমি দাঁড়িয়ে আছো একা,
জোনাকির দীপজ্বালা হাতে।
লাজ লাগে রজনী গন্ধায়,
মন দিয়ে দেখা নয় চোখদিয়ে দেখা,
ঘুম তাই নেই আঁখি পাতে।

বারে বারে ইশারায় ডাক—
কিযে ছাই বল বুঝিনাক।

প্রভাতের চিক চিক আকাশে
গোলাপের লাল রং যেই না—
কাজলের ঘোমটায় চুমদেয়।

শির শির ফুর ফুর বাতাসে
ওড়না উড়ায়ে আসে সেই না ?
দুধ রাঙা প্রভাতের প্রাণলয়।
লাজ-রাঙা ভীরু চোখে ডাক—
কে তুমি অমন চেয়ে থাক।

রোদ জ্বালা ঘুঘুডাকা দুপুরে
কার যেন হাত ছানি দেখেছি,
মুগ্ধ মুখর তাই তালবন।
তটিনীর টল টল মুকুরে,
কার যেন ছায়া ছবি পেয়েছি;
বিস্ময়ে ভরে তাই প্রাণমন।
কে তুমি কাহার ছবি আঁক—
ইশারার কথা বুঝিনাক।

পঞ্চম নায়ক

জয়শ্রী চক্রবর্তী

পাশের ঘর থেকে ভেসে এলো—কনক বৌদির উদ্দাম হাসির শব্দ।

রাত বোধহয় বারোটা।

কাছের কোন বাড়ী থেকে—ঘড়িতে সময় ঘোষণা হোল তার কিছু পরে।

তখনো আর্তনাদের মত হাসিটা—চিরে বেরুচ্ছে যেন গোটা বাড়ীটার বুক থেকে।

আশ্চর্য! এতটুকু দ্বিধাবোধ নেই কনক বৌদির। পাশের সব ঘরগুলোর—মানুষের ঘুম ভেঙে যাচ্ছে—বার বার। বিরক্তিতে—বিক্ষোভে সবাই প্রায় অসহিষ্ণু! তবু, ভ্রুক্ষেপ নেই কনক বৌদির।

তবে সব রাত নয়।

শনিবারের রাতের—হাসি! দুরন্ত সেই রাতটাকে নিয়ে মরে যাচ্ছে যেন বীভৎস হাসিটা।

আর অন্ধকার—ঝুপ, ঝুপে—নিঃঝুম নিশুতি রাত। চারদিকে—থোকা থোকা অন্ধকার জমে। জমাট ভারি—,আর ঘন ঘন!

শুধু একখানি ঘর ছাড়া—সব জায়গাতে নিশ্ছিদ্র আঁধারে—এলো পাথাড়ি ভাবে ঢাকা।

কনক বৌদির ঘরে শুধু আলো জ্বলছে। হ্যারিকেনের নিষ্প্রভ—বোবা মন্থর আলো। ডুবু ডুবু আলোর চোখ দুটো যেন—মৃদু ইশারায় জ্বলছে!

তা হোক। হ্যারিকেনের পেট মোটা পাত্রে বোতল খানেক কেরাসিন তেল ঢেলেছে কনক বৌদি। কেননা আলোটা অনেকক্ষণ জ্বলবে। পুড়ে, পুড়ে কালো ঝুলে—সাদা কাঁচের চক্‌চকে চিম্‌নীটা—ভরে যাবে। তার পরেই—মন্থর বিলাপের আলোটা নিভে যাবে—শেষ রাতের পরে।

আর তখুনি হয়তো কোন কোন শনিবারের রাতের বিরতি ঘটে, বিস্ময়কর ছেদ টেনে।

তারপর, সবাই একে একে—ক্লান্তি ভেঙে উঠে যায়। রথিন আর তার বৌ রত্না, সব প্রথমে বিদায় পর্ব সারে। ওদের তাস খেলার মতই, আকর্ষণীয় নব পরিণয়ের জীবনে, গল্প করে—বাকি রাতটা জেগে কাটিয়ে দেওয়া।

ওরা উঠে গেলেই কনক বৌদি কেমন যেন একটা কাঙাল দৃষ্টি নিয়ে—ওদের দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

সেও—মুহূর্ত কয়েক মাত্র।

সবাই চলে যায়।

সব শেষে যায় নিখিল। চৌকাঠের ওপর চটি শুদ্ধ পা রেখে—জ্বলন্ত সিগারেটটা—শেষ করে নিতে যে টুকু সময় নেয়!

কনক বৌদির ঘর তখন ফাঁকা! অবসাদ জড়ানো অবাক নিস্তব্ধতা—থম্ থম্ করে চারদিকে। আর সে সময়—কনক বৌদি তার মনটাতে বড় রকমের এক শূন্যতাকে অনুভব করে।

দূরে—আর কাছের নিশুতি রাতের—ঝুপ্সি বুড়ির মত—কালো চুল ছড়ানো—অন্ধকারটা বসে—বসে, বিচিত্র হাসি হাসে।

কনক বৌদি তখন বোধহয় আর নিজেকে ফাঁকি দিতে পারে না। ফাঁকা মনের—বে-পরোয়া বাতাসটা হঠাৎ যেন সব গুলিয়ে দেয়।

একটু ঘোলাটে চোখে সে চেয়ে থাকে—সামনে দাঁড়ানো মানুষটার দিকে।

আর সেই মানুষটাও কেমন—মাংস লোভী পশুর মত চেয়ে থাকে এদিকে।

কিছুটা আবেশ জড়ানো দৃষ্টি বিনিময় হয়।

তারপর মিঠে সুরের রেশ টানার মত করে, কনক বৌদি বলবে—আগামী শনিবারের আগেও একবার কিন্তু এসো।

নিখিল এদিক ওদিক তাকিয়ে চাপা সুরে বলে উঠবে—হয়তো আগামী কালই আসতে পারি। বলে কেমন নিমেষহারা দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে—ভিজে গলায় বলবে—জানো কনক, প্রতিদিনের একটা আকর্ষণ অনুভব করছি। আর সেটা যেন দিন আর ক্ষণে শুধু বেড়ে যাচ্ছে—তিলে তিলে। আমি আজ কাল কেমন যেন হয়ে যাচ্ছি! শোন কনক, বলে, এগিয়ে আসে নিখিল।—কাঁপা হাতে—কনক বৌদির একটা হাত টেনে নেয় সে! তারপর—আরও গাঢ় ও আর্দ্রতা ভরেওঠা গলার স্বরে বলে চুপি চুপি—সেই প্রথম শনিবারের বন্ধন কিন্তু আমাদের দুর্ভেদ্য বর্মের মত ঘিরে রেখেছে। এই চলতি তিন মাসে—অসংখ্যবার তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি।—কেন এমন হয় বল তো?

উত্তর দিতে পারেনা কনক বৌদি।

ভাবে, হয়তো হয়, এমনি। শুধু শুধু, এমনি এমনি। এমনি হয় যে তারও। কিন্তু 'কেন' হয় তা কে জানে? —কেউই জানে না।

আর তেমনি না জানার—অবাক জিজ্ঞাসাটি বুকে চেপে নিখিল চলে যায়—হাওয়াই চটিপরা পায়ের নিঃশব্দ তালে তালে।

চৌকাঠ পেরিয়ে বারান্দা। তার পর ঝোপে-ভরা বাগানটা। কাঠের ছোট গেটটা পেরিয়ে নর্থ ষ্টেশন রোডের বড় রাস্তাটা—অন্ধকারে পড়ে থাকা সরীসৃপের মত বিভীষিকা নিয়ে জেগে।

সেখানে দাঁড়িয়ে—পড়বে নিখিল।

এলাকার চার পাশে বিচ্ছিন্ন নীরবতা। ঝোপ ঝাড় আর রাতের ঝির্ ঝিরে বাতাসটা—কেমন ভুতুড়ে মনে হয়। আর জঙ্গলের ওপর সামিয়ানা টাঙানোর মত আকাশটা আরো বিস্ময়কর—আরো রহস্যময়! সেদিকে চেয়ে—শরীরের ভেতর চল্‌কানো রক্তটা সহসা হিমের মত ঠাণ্ডা আর জমাট হয়ে আসে। আর সেই ভাবে সে হেঁটে যায়—নর্থ ষ্টেশন রোড ধরে।

আর কিছু দূরে এগিয়ে গিয়ে উত্তরমুখী ষ্টেশনের ডিসট্যান্ট সিগ্‌ন্যালের আলোটা দেখে, সেই হিম রক্তটা গরম আর তরল হয়ে যায়।

নিখিল চলে গেলেই কনক বৌদির হাত পা কেমন ঝিমিয়ে আসে। বিবশ ক্লান্ত চোখে ঘুমের একটা আমেজ জড়িয়ে ওঠে।

অন্ধকার হয়ে যায় মনের দেউড়ি। ঐ যেন দেওয়ালী উৎসবের লক্ষটা আলো জ্বলে ওঠা-রাত্রির সহসা অবসান। সব আলো নিভে যাওয়ায় ভয়ার্ত অন্ধকার!

একটা ভয় ও ব্যথা মেশানো আড়ষ্টতা নিয়ে কনক গড়িয়ে পড়ে মাটিতে। তারও আগে দরজায় খিল দিয়েছে আর শুয়ে পড়ে হাত বাড়িয়ে হ্যারিকেনের আলোটা নিভিয়ে দেয়।

রাত ক্রমশঃ গাঢ় তন্দ্রাচ্ছন্নতায় ডুবে যায়। জানালার ও পাশে ঝোপ ঝাড় ভরা জঙ্গলটার ফাঁকে ঘুরে বেড়ানো অসংখ্য ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক শোনা যায়। আর খানিকটা এলো মেলো বাতাস ছুটোছুটি করার—সাঁ সাঁ শব্দ বিচিত্র করে ভেসে ওঠে।

কনক বৌদি তখন গাঢ় এবং গভীর ঘুমে অচৈতন্য। সেই উচ্ছল শব্দের হাসির মানুষের আর সাড়া নেই।

যখন রাত শেষ হয়, কনক বৌদি ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে। শ্রীমন্ত ঠাকুর বাবাজীর হরিনাম শোনা যায়। পূবমুখী গঙ্গার রাস্তাটা ধরে করতাল বাজিয়ে বিচিত্র সুরে সে গান গায়।

আর পাশের বাড়ীর দোতলার আঁতুড়ে ভাইঝিটার পরিত্রাহি চিৎকার আর কান্না! ভোরের জগতের একটা নতুন সংবাদ যেন সরবরাহ হয়।

কনক বৌদি যায় কলঘরে স্নান সেরে নিতে। ভোরের স্নান নাকি পূণ্য স্নান!

তারপরেই কনক বৌদি ঠাকুর ঘরে এসে পুজো করতে বসে। প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় যাবে তাতে। সেটাও যেন তার বিশেষ আত্মমগ্ন হওয়ার সময়।

নিজের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরকে খুঁজে পাবার অনুসন্ধিৎসা। এ হেন বিশেষ সময়টির—বিরতি ঘটিয়ে যখন সে রান্নাঘরে ঢোকে—তখন বেলা অনেকটা। সূর্যের আলোটা তখন ঝলসে দেয় বাড়ীটাকে।

রান্না সারা হয়ে যায় বেশ তাড়াতাড়ি। এক বেলা

নিরামিষ তরকারী ভাত। অন্য বেলা উপবাস। বিধবার এটা নাকি সাত্বিক নিয়মানুষ্ঠানের একটি বিশেষ অংগ। অন্ততঃ কনক বৌদি তা মনে মনে স্বীকার করে নেয়।

আর এক বেলার খাওয়ার কথাটাও সে ভুলে যায়। রোমহর্ষক কয়েকটি গল্পের বই—কনক বৌদির ঘরেই থাকে। তারই একটা টেনে নিয়ে—ন্যাড়া ছাতের ওপর চিলে কোঠায় উঠে আসে।

পাতা বহুল—কচি আমড়া ভরা গাছটা অর্ধেক অংশের ভার নিয়ে—ছাতের দক্ষিণ কোণে হেলে পড়েছে। তাতে ওখানে খানিকটা—মিষ্টি ছায়া পড়ে থাকে—খানিক ভিজে বাতাসের সংগে মিশে।

কখনো কনক বৌদি সেখানে বসে থাকে চুপ চাপ! বাড়ীর চৌহদ্দির সীমানার-ওপারে মজা শ্যাওলা-জমা পুকুরটায়—কতকগুলো জলো হাঁসের গাভাসানো সাঁতার কাটা আর ঘামের গন্ধে মাতাল হওয়া, দেবীদের বাঁধা গরুটার—বিস্ময়কর চিৎকার অনেক সময়—বিমনা করে দেয় তাকে।

যখন বেলা পড়ে যায়—বিদ্যা নিকেতনের ছুটি পাওয়া ছেলেপুলেগুলো—পাড়া মাৎ করা চিৎকারে নিয়ে খোলা মাঠে—ছাড়া পাওয়া বাছুরের মত লাফায়, তখন বৌদির সচেতন ভাবটা জেগে ওঠে। আস্তে আস্তে মনে পড়ে যায়—খাওয়া তখনো হয়নি।

তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এসে, কাণা উঁচু কাঁসিতে ভাত আর তরকারী মিশিয়ে—কোন রকমে খেয়ে উঠে—কনক বৌদি, ঘরের কাজগুলো সেরে নেবে।

এই হোল তার প্রাত্যহিক ইতিহাস।

পরের দিনই হয়তো নিখিল আসবে। উড়ো উড়ো মাথার চুল আর কবি কবি চেহারা নিয়ে।

বাড়ীর কেউ কেউ তখন গা টেপা টেপি করে মুচকি হাসির ইশারায় দুলে উঠবে।

শুধু রত্না আর রথিন নির্বিকার। কনক বৌদির ওপর বিশ্বাস আর আশ্বাস তাদের সমপরিমাণ।

সেই সংগে শনিবারের খেলার রাতের নেত্রী হিসেবে তুলনা খুঁজে পায়না ওরা।

শনিবারের মফঃস্বল সন্ধ্যায়—প্রাণবন্ত সময় সন্ধিক্ষণে কনক বৌদির ঘরটা—সমবেত গুঞ্জনে—মুখরিত হয়ে ওঠে। মাত্র জন ছয়েক মানুষের ভারি নিঃশ্বাসে চাপ ঘরের রূপ বদলে দেয়।

রথিন আর রত্না ছাড়া, বাকি খেলোয়াড় সব বাইরের মানুষ। ওদের তিন জনকে আমদানী করেছে রথিন। তার বন্ধু নিখিল, বিক্রম, জয়ন্ত।

তাস খেলায় ওরা নাকি এক একজন বিশেষ পারদর্শী।

তবে, বিক্রমের বিক্রম খেলার প্রথম দফায় সুরু হয়ে যায়। যদিও—শেষ পর্যন্ত—জয়ের সম্ভাবনা থাকে না আদৌ!

তার পর সকলের সমবেত হাসি—কথা চিৎকার জেহাদ—আর গুণ গুণ করা গানের কলি, শনিবারের রাত্রিটাকে যেন—একটা জীবন এনে দেয়।

অন্ততঃ কনক বৌদি তা বলে।

শুনিয়ে বোধহয়, বলে সবাইকে—শনিবার রাত্রি আমার জীবনের শনি অন্ধকার কাটিয়ে দেয়। এই রাত্রের—কাছে যেন আমি ক-ত ভাবে ঋণী!

জয়ন্তর জিভ শুকিয়ে ওঠে। কথাটা ঠোঁটের আগায় এসেও, বেরুতে চাইতনা। এই নতুন নতুন পরিচয়ে কি করেই বা জিজ্ঞেস করা যায়—ভদ্রমহিলার জীবনে কেন শনি অন্ধকার এনেছিল? কিসের দুঃখে কনক বৌদি সকলের সামনে এমন কথা বলে?

জয়ন্ত একদিন চুপি চুপি জিজ্ঞেস করেছিল রথিনকে। —ব্যাপার কি বলতো? তোমরা তো থাকো একই বাড়ীতে। কিসের দুঃখ কনক বৌদির? আর এই আক্ষেপের সুর কিসের?

রথিন বলেছিল—এই এত বড় বাড়ীটার বাড়ীউলী কনক বৌদি। টাকা পয়সা অলঙ্কার সবই আছে জানি, শুধু জানিনা তার বৈধব্য জীবনের করুণ ইতিহাসটা কবে থেকে সুরু!

রথিনও জানেনা। জানবে কি করে? কদিন তারা ভাড়াটে হয়ে এসেছে এখানে? সেই অল্প কদিনে কিছু জানা সম্ভব নয় এবং সে কৌতূহল মনেও জাগেনি তার। কেউ জানলনা, জয়ন্ত রথিন, রত্না বিক্রম। শুধু একদিন—আর সেই শেষ দিনে কনক বৌদি নিজেকে সামলাতে পারেনি।

শনিবারের রাতটা বেশী হয়নি। খেলার আসর ভেঙেছে তাড়াতাড়ি। সবাই চলে গেছে।

চৌকাঠের ঐ পারে জলন্ত সিগারেট হাতে নিয়ে নিখিল দাঁড়িয়ে। সেই প্রথম, ইশারা করলো কনক বৌদি। নিখিল যেন একটু ঘরে এসে বসে।

নিখিল বসলোনা। সবদিকে ভয়ে ভয়ে তাকালো। যদিও বাড়ীটা তখন নিস্তব্ধ গাঢ় আচ্ছন্নতায় নীরব—তবু একটা কুণ্ঠা কণ্ঠ পর্যন্ত উঠে আসে। কেন না—রাত তখন এগারোটা।

ধরা পড়ে যাওয়ার মত অসহায় ভাবে কেঁদে উঠলো কনক বৌদি। নিখিলকে সে সব কিছু বলতে চায়। কেমন যেন হাল্কা করে নিতে চায় নিজেকে।

কৌতূহলী নিখিল সমানে দাঁড়িয়ে থাকে—একের পর এক জলন্ত সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে ছেড়ে।

পাগলের প্রলাপের মত কনক বৌদি বললো—'আমায় ক্ষমা কোর নিখিল। সব শুনে ক্ষমা কোর আমায়। বিধবার দণ্ড—বিধাতা দিক। কিন্তু তুমি···গলার স্বর নিঃশব্দ কান্নায় ভেঙে পড়লো! থেমে পড়লো বাকি কথাটা।

নিখিল কিছু বুঝতে পারেনি। কেমন যেন বেকুব-বনে যাওয়ার অসহায় দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে ছিল।

বোবা অন্ধকারের ছায়ার ভেতর—কনক বৌদির বসে-থাকা দেহটা যেন কাঁপছে।

গলা বন্ধ হয়ে আসে নিখিলের। হাতের শেষ না হওয়া সিগারেটটা—দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

কনক বৌদি—সাদা আঁচলের তলায় চোখ মোছে! বিস্ময়ে চেয়ে থাকে নিখিল। তার জীবনের প্রথম প্রেমের নায়িকা কনক বৌদি, বড় অভিনব হয়ে উঠেছে—শনি-রাত্রের অন্ধকারে।

সেই রাতে নিজের জীবনের পোড়া ইতিহাসের পাতা মেলে ধরলো—কনক বৌদি। রাত্রির চাপা বাতাসটা অসম্ভব ভারি করে দিচ্ছিল—নিখিলের কাণ দুটোকে। তবু, শোনবার একটা অদম্য ব্যাকুল—আগ্রহ বুকের চাপা নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে ছটফটিয়ে ওঠে।

পোড়া ইতিহাসের—বিধ্বস্তা নায়িকা—কণ্ঠ খুলে বলে—অভিনব সেই শনিবারের রাত্রে।

অদ্ভুত শান্ত-গলার স্বর কনক বৌদির! মনে হোল—এ' যেন আর এক মানুষ।

"নিখিল, তুমি বিশ্বাস করবে না, মেয়েদের প্রথম ভালবাসার ফুল ফোটে কত সুন্দর হয়ে। তোমরা জানো না ঐ সৌন্দর্যের ওজন কত!

তাই জানলো না বোধহয়, আমার জীবনের প্রথম নায়কটি। অথচ সেই ছেলেবেলার সুকুমারকে দেখে মনে হোত—কত সহজ ও। আর কত সহজ ওর সরল অনুভূতি। গভীর অনুভবে—ওর চোখের দৃষ্টি সব সময় উজ্জ্বল হয়ে থাকতো।

স্কুলে যাবার পথে প্রথম আবিষ্কার করি তাকে। সেও আমাকে প্রথম দেখে প্রথম প্রেমের দৃষ্টিতে। আমার বয়স তখন তেরো পূর্ণ হয়েছে সবে। সে বয়সে কিছু না বুঝলেও, বুঝেছিলাম এইটুকু, সুকুমার আমাকে খুব ভালবাসে। সেই সংগে আমিও তাকে ভীষণ ভালবেসে ফেলি। মনে হোত তাকে—বড় শান্তশিষ্ট গোবেচারা বলে। আর কত প্রাণস্পর্শী কথা, কেমন গুছিয়ে সাজিয়ে আমাকে বলতো!

ওই, পেয়ারা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে কতদিন চুরি করা সন্ধ্যেতে—আমরা দুজনে শুধু গল্প করেছি। আমার ডাক-নাম ছিল লক্ষ্মী। সুকুমারের ভারি পছন্দ ছিল নামটা। আমি বলতাম ওকে—আমি দুষ্টু বলে, আমার নাম রেখেছে লক্ষ্মী। সুকুমার বলতো—'না, তুমি লক্ষ্মী বলেই. তোমার নাম স্মরণ করে দুটো পরীক্ষায় আমি পার হয়েছি। প্রথমটা গ্র্যাজুয়েট সম্মান লাভ। দ্বিতীয়—চাকরীর দরজা পার হওয়া। সে সব তো আমার লক্ষ্মীর ভাগ্যেই হোল।' বলে ও' কেমন যেন মুগ্ধ হয়ে আমাকে দেখতো।

তারপর আরো বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে গেল। 'লক্ষ্মী' নামে লটারীর টিকিট কেটে রাতারাতি তার বড়লোক হয়ে যাওয়া। ভেবেছিলাম—মনটাও বুঝি ওর, আরো বড় হয়ে গেল। কিন্তু দেখা গেল প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির সংগে সংগে তার মনের পরিবর্তন আকস্মিকভাবে ঘটে গেল। সেই বয়সে একটা ভীষণ আঘাত পেলাম। তখন পনেরো উত্তীর্ণ হয়নি। অর্থাৎ বছর দুয়েকের ভালবাসায়—নির্মম ছেদ টেনেছে সুকুমার। প্রথম প্রথম সুকুমার পালিয়ে বেড়াতো—আমাকে দেখা দেবার ভয়টা যেন তার বেশী

ছিল। তারপর অনেকদিন ওর দেখা পাই নি। কোথায় যে বাড়ী জানতাম না। ও' আসতো আমাদের বাড়ীতে। মায়ের সংগে আলাপ জমিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু কখনো আমাকে বলেনি তার বাড়ী কোথায়। বলতো শুধু সোদপুরে থাকি। আর মাঝে মাঝে আসতো সুকুমারের এক বোন সুষমা। আমার সংগে তার ভাব ছিল খুব।

সুকুমার দেখা দিত না বলে, মাঝে মাঝে মাকে লুকিয়ে ভীষণ কাঁদতাম একলা ঘরে বসে। কখনো শুনতে পেতাম—তার এখানের এক বন্ধুর বাড়ীতে সে আসে নিয়মিত। অথচ আমার সাহস হোত না সেখানে গিয়ে দেখা করার। ভাবতাম—একদিন ঠিকই আসবে সুকুমার। কখনো ওই পেয়ারা গাছের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলতাম—তুমি তো দেখেছো সব, তুমি যদি বেঁচে থাকো, তাহলে সুকুমার ঠিক আসবে। তোমাকে সে যে সাক্ষী করেছিল। মনে রেখো কিন্তু! দেখতাম আমার কথায় যেন সাড়া দিচ্ছে গাছটা, বাতাসে মাথা নেড়ে নেড়ে। সেই বয়সে—ভীষণ সান্ত্বনা পেতাম ওই দেখে।

আর একদিন যখন ঠিক ওই গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে আছি—হঠাৎ দেখলাম সুষমাকে আসতে। অথচ সেও অনেকদিন আসেনি। ওকে দেখে যেন হঠাৎ বাঘের মত লাফ দিয়ে দুহাতে জড়িয়ে ধরে সুষমাকে বলে উঠলাম—আগে বল তোর দাদার চিঠি এনেছিস কিনা—তবে ছাড়বো। মাঝে মাঝে সুষমাই এনে দিত তার দাদার প্রেমপত্র। তাই ওকে পেয়ে আমার আনন্দটা বেশী হোল যেন।

আমাকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললো—এনিছি।

হাতটা বাড়িয়ে বললাম—দে। আমার এই ভাব দেখে ও যেন কতকটা ব্যঙ্গ ভরে হেসে উঠলো! কেমন উপহাসের সুরে বললো—'পাগল হলি! চিঠি কোথায়! তবে চিঠি দেবার মালিক আমায় তোমার কাছে পাঠিয়েছে। হাসিতে দেখলাম—এক ধরণের চাপা ওর সমস্ত মুখের রেখাগুলো খুব স্পষ্টতর হ'য়ে উঠেছে। কতকটা জোরালো গলায় ও বললো আমাকে—'চিটির আশা ছেড়ে দাও এবার। দাদার বিয়ের ঠিক। এই খবরটা তোকে দিতে বলেছে দাদা। মনে হয়, দাদা আর এখন তোর কথা ভাবেনা।' সুষমার ঠোঁটে চাপা হাসি খানিকটা উছলে উঠলো। বোঝা গেল এতে ওর আনন্দ ছিল কিছু। কেননা সুষমা তার নিজের বোন ছিল না। দূরসম্পর্কের বোন। হঠাৎ দুঃখে কেঁদে ফেলতে কেমন আমার লজ্জা হোল। বিশেষ করে সুষমার সামনে নিজের ব্যথাটাকে কিছুতেই প্রকাশ করতে পারলাম না। কেননা সুষমা সেটাই আমার দেখতে চাইছিল।

সেই প্রথম আমার আঘাত। সেই প্রথম প্রেম। আর সেই মুগ্ধমতী প্রথম নায়িকার পতন হোল—একটি লাঞ্ছিত পরাজয়ের অন্ধকারে পড়ে গিয়ে।

সেই প্রথমা নায়িকার নায়ক যখন বিশ্বাসঘাতকতার ভূমিকা নিয়ে চলে গেল, তখন থেকে আমার গভীর বিশ্বাস হোল পুরুষ বোধহয় কখনো ভালবাসতে পারেনা তার প্রেমিকাকে।

কিন্তু পারে এ কথাটা প্রমাণ করবার জন্য আমার জীবনে অকস্মাৎ আবির্ভাব হোল দ্বিতীয় নায়কের। তাপস প্রথম প্রতিপন্ন করতে চাইলো সবাই ভালবাসতে পারেনা। কিন্তু পারে কেউ কেউ। আমি বিশ্বাস করলাম না। কোন কথাই মনকে স্পর্শ করলো না, তাপসকে ভালবাসতে পারলাম না। নির্মম ভাবে তাকে ফিরিয়ে দিলাম।

কিন্তু আশ্চর্য তপস্যা করেছিল তাপস। আমাকে পাওয়ার জন্য তার দুশ্চর সাধনা আমাকে মুগ্ধ করলেও, বশ করতে পারল না। ভীষণ সংশয় আর অবিশ্বাসে ক্রমশঃই তাকে ঘৃণার সংগে দূরে সরিয়ে দিলাম। যার প্রেমের আসল নকলটা দেখে নেবারও, প্রবৃত্তি জাগলো না একবার। ভেবেছিলাম এও বোধহয় ভণ্ড প্রেমিক। যাই হোক পরে শুনেছিলাম আমার জন্যেই নাকি তাপস মরেছে। কাগজে পড়েছিলাম—উদ্বন্ধনে মৃত্যু একটি যুবকের।

আশ্চর্য! তাতে আমি একটুও বিচলিত হইনি। ভেবেছিলাম প্রবৃত্তির তাড়নার ঐ অসহিষ্ণুতার মৃত্যু। যে মৃত্যু কখনো সুন্দর নয় আমার কাছে।

তারপরেই আমার বাবা মারা গেলেন। বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান আমি তখন। আর এই বাড়ীটা।

জানো নিখিল, এ বাড়ীটা আমাকে মাঝে মাঝে কেমন বিভ্রান্ত করে দেয়। এখানে কত স্মৃতি! সব কিছুর

সাক্ষী এই বাড়ীটা। আর এখানে বসেই পেয়েছি তোমাকে, না—না—না নিখিল, তুমি অমন করে বিচলিত হয়োনা। আগে সবটা শুনে নাও। সব শুনে তুমি আমাকে হয়তো সান্ত্বনা দেবে।

নিখিল ঘর্মাক্ত কপাল মুছলো। কিন্তু সে অপাঙ্গে চেয়ে থাকে—কনক বৌদির দিকে।

কনক বৌদি সুর পাল্টে সুরু করলো—'বাবা মারা যাবার পর থেকে মা চেষ্টা করতে লাগলেন আমার বিয়ে দেবার জন্যে। আর খুব তাড়াতাড়ি তিনি এক পাত্র জুটিয়ে ফেললেন। পাত্র নাকি আমাকে পছন্দ করে মাকে জানিয়েছে বিয়ে করবে বলে। মা দেখলেন অদ্ভুত সুন্দর সুকান্তি সেই পুরুষ। কথাবার্তা আর চালচলনে, মা বোধহয় মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তাই চট করেই আমার বিয়েটা মা সেরে ফেললেন।

বিয়ের রাত্রে দেখলাম স্বামীকে। সেদিকে তাকিয়ে আমি কেমন দিশাহারা হয়ে গেলাম। মনে হোল এমন স্বামী বোধ হয় কেউ পায়না। এক নতুন অনুভূতির স্বাদ পেলাম। মনে হোল, জীবন অভিযানের নতুন পথ ধরে আমি চলেছি। আর এক নতুন আনন্দ আমাকে জড়িয়ে ধরে। আর ভেবেছিলাম এই পথই আমায় দেবে জীবনের শ্রেষ্ঠ পাথেয়!

তুমি বিশ্বাস করো নিখিল, মেয়েরা যখন প্রথম স্বামী পায়, সংসার পায়, তখন তারা নিজেদের পর্যন্ত ভুলে যায়। আমারও তাই হোল।

শ্বশুর ঘর করতে গিয়ে দেখলাম—সেখানে স্বামীই একমাত্র প্রাণী। আর একখানা ছোট ঘর। শুনলাম শ্বশুর-শাশুড়ী ননদ-দেওর আমার কিছুই নেই। অবশ্য স্বামী তা আগে বলেনি। আবার তা নিয়ে কেউ তেমন মাথাও ঘামায় নি।

প্রথম প্রথম কেমন ফাকা লাগতো। স্বামী কি একটা বিজনেস পার্টিতে শেয়ার হোল্ডার ছিলেন। সে সব কোনদিন ভালো করে খোঁজ নিইনি। কেননা ওই সময়—আমার যা দরকার ছিল—তাই পেতাম তাঁর কাছ থেকে। আর এত কেউ আমাকে ভালবাসতে পারে,—এটা ভাবতেও আমার কাছে আশ্চর্য লাগতো, যখন কোন শূন্যতা অনুভব করতাম—স্বামী তখন আমাকে আদর করে বলতেন—আমি তো আছি। দেখবে তোমার আমার মধ্যে আরো কতজন আসবে। তখন আমাদের সংসার ভরে যাবে। কথাগুলো শুনতে—গিয়ে, কেমন এক অদ্ভুত ধরণের আনন্দ পেতাম।

কেবল মনে হোত, এ সংসার ভরে যাবে—প্রেমে পুণ্যে সন্তানে।

হঠাৎ একদিন ভোরে দুঃস্বপ্ন দেখে—ভয় পেয়ে স্বামীকে জড়িয়ে ধরলাম। স্বামী আমাকে বুকের মধ্যে চেপে নিয়ে বললেন—ভয়? কিসের ভয় রাণী? এই তো আমি তোমার কাছে।" বলে তিনি আমার মাথায়—গায়ে হাত বোলাতে লাগলেন। তখন কিন্তু মুখে কিছুই গুছিয়ে বলতে পারলাম না। শুধু বললাম—স্বপ্ন দেখলাম, তোমায় কারা যেন খুন করছে উঃ রক্তে তোমার শরীর ভেসে যাচ্ছে…। বলতে বলতে অসহায়ের মত ডুকরে কেঁদে উঠলাম। শুনে কেমন যেন হাসলেন তিনি। আবার বললেন, কপালের কাছে মুখ এনে—পাগল! এই তো আমি। লক্ষ্মী মেয়ের মত একটু ঘুমোও তো! তাঁর আদরে আমি আবার ঘুমিয়ে পড়লাম!

সকাল বেলায় ঘুম ভেঙেই মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল। বিশ্রী স্বপ্নটা যেন পেয়ে বসেছে।

আর ঠিক, সেই দিনের সন্ধ্যেতে—দেরাজের ওপর থেকে পেলাম একটি ভাঁজ-করা চিঠি। স্বামীর লেখা দেখে বুঝলাম। আলোতে সেটা মেলে ধরলাম—

তিনি লিখেছেন:—

রাণী আমার

আজ থেকে তোমায় ভিখারিণী সাজিয়ে চলে গেলাম। লক্ষ্মীটি রাগ কোরনা। ক্ষমা কর—আমায়। আমি একজন ফেরারী আসামী। তোমার মা ভালো করে খোঁজ না নিয়ে তোমার বিয়ে দিয়েছিলেন। সে দুর্ভাগ্য তাঁর এবং তোমারও। কিন্তু যে পরম সৌভাগ্যের লোভে—এত বড় প্রতারক সেজে তোমায় বিয়ে করেছিলাম—আজ তার কপালেও খাঁড়া পড়লো। চাতুরী করেই তোমাকে লাভ করেছিলাম। কেননা এ ছাড়া আমার উপায় ছিলনা।

জীবনে কোন একদিন একটা খুনের অপরাধে দীর্ঘদিন পালিয়ে থাকি। তারপর ফেরারী জীবনের বছর দুয়েক

কেটে যেতে ভাবলাম—আর বোধহয় পুলিশ আমাকে খুঁজে পাবেনা। তাই নতুন জায়গায় এসে একটি ঘর বাঁধবার বড় আশা হয়েছিল। আর তোমার মত এক লক্ষ্মী মেয়ে হবে আমার গৃহের আলো। সে আশা আমার সৌভাগ্যক্রমে আংশিক মিটেছিল। কিন্তু আজ বড় দুদিন আমার। আমার চেয়ে অনেক বেশী তোমার। হয়তো সেই জন্যে আর নিজেকে স্থির রাখতে পারছিনা। তুমি জানোনা খুনী অপরাধীর কোথাও বেঁচে থাকবার পথ রাখেন না ভগবান। তাই আমার আজ ঘর ভেঙে গেল। পথের কাঙালের চেয়েও আমি করুণ!

শোন রাণী, গতকাল পুলিশ খবর পেয়ে এসেছে আমার খোঁজ নিতে। হয়তো কয়েক দিনের মধ্যে ধরা পড়ে যাব। তাই নিজে থেকে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা দিচ্ছি। এই পালানো ভয়ার্ত—জীবনটাকে আর সহ্য করতে পারছিনা। হয়তো পরিণামে আমার ফাঁসি হবে। এখন থেকেই তুমি জেনে রাখো আমি মরে গেছি। হয়তো সান্ত্বনা নিয়ে তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে।

সব শেষে বলি, আমার সে অপরাধ কি জানো? কয়েক বছর আগে লীনা নামে একটি মেয়েকে ভাল বাসতাম ভীষণ ভাবে। শেষে একদিন জানলাম লীনা অন্য পুরুষের প্রতি আসক্ত! তার এই বিশ্বাসঘাতকের রূপ আমাকে অমানুষ করে দিল। একদিন জোর করে ওর মুখে নাইট্রিক এসিড ঢেলে দিয়ে পালালাম। আর সেদিন থেকেই—আমার বাড়ী, আমার মা বাবা ভাই বোন—সব কিছুকে বিসর্জন দিয়ে দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়ালাম। কাগজে পড়েছিলাম হস্‌পিটালে লীনার মৃত্যু হয়েছে।

মনে পড়ে—সায়েন্সের ভালো ছাত্র বলে কলেজে সুনাম ছিল। ল্যাবরেটরী থেকে নাইট্রিক এসিড জোগাড় করেছিলাম। লীনার মুখে ঢালতে গিয়ে—আমার আঙুল একটা পুড়ে গিয়েছিল। একদিন তুমি দেখে বলেছিলে—বিশ্রী দাগটা কিসের? তোমায় বলেছিলাম—এটা আমার দগ্ধ স্মৃতি। কিছু জানতে চেওনা—এ সম্বন্ধে। তোমার মনের চেপে রাখা সেদিনের কৌতূহল আজ মিটিয়ে দিলাম। এবার আমায় ক্ষমা কর রাণী।

তোমার সৌমেন।

কনক বৌদি চুপ করলেন একটু। উদাসভাবে তাকালো জানলার বাইরে। কোথাকার ভিজে মাটির কাঁচা গন্ধটা ভেসে আসছে বাতাসের সংগে। জোরে জোরে নিঃশ্বাস টানে কনক বৌদি।

নিখিল তেমনি চুপ করে। তেমনি সে অবাক শ্রোতা।

কনক বৌদি আবার সুরু করলো—অন্য সুরে।—'চিঠিতে যা লেখা ছিল সবই তোমায় বললাম নিখিল। ও' চিঠিটা মাঝে মাঝে আজও পড়ি। পড়ে পড়ে আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। কেন ওটা বার বার পড়ি জানিনা। শুধু মনে হয়, আমার জীবনের একটা মস্ত বড় অস্তিত্ব ওতে ঘুমিয়ে আছে।

অথচ তারপর থেকে খুনে স্বামীকে আমি ঘৃণা করি। কোথায় সে গেল—কি হোল, কোন খোঁজই আর আমি নিইনি। কিন্তু ভুলতে আমি আজও পারিনা নিখিল। স্বামীর বড় আশা ছিল আমাকে নিয়ে সংসার করার। পুরুষের এ ধরণের বাসনা আমাকে পাগল করে। তাই ঘৃণার সংগে—আজও তাঁকে স্মরণ করি।

হ্যাঁ, এখানেই কিন্তু আমার সব শেষ হোল না। বিচিত্র জীবন আমার।—সবটা শুনে নাও নিখিল—"কনক বৌদি ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকালো নিখিলের দিকে।"

নিখিল নিশ্চুপ। বিমূঢ় বিভ্রান্তের মত দাঁড়িয়ে।

চাপা হাসিতে দাঁত চেপে বললো কনক বৌদি—তার পর কি হোল শোন। সেই আঘাতে মা বিছানা নিল। আর তার একমাস পরেই—আমাকে ছেড়ে মা চলে গেল। সে সময় মায়ের মৃত্যুটা আমাকে বড় নিঃসহায় করে তুললো। বয়স তখন কত জানো?—মাত্র একুশ! সেই বয়সে তৃতীয় নায়কের—আবির্ভাব ও অন্তর্ধান আকস্মিক বলে মনে হোল বটে। কিন্তু আমি পর পর—আঘাতে কেমন স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিলাম।—

সমস্ত বাড়ীটাতে তখন আমি একলা। হঠাৎ ধানবাদ থেকে ছোট মাসীমা বেড়াতে এলেন। এসেই তিনি বিস্ময়ে কপালে চোখ তুললেন। মুখে কিছু বললেন না বটে। ভাবখানা এই এত বড় বাড়ীটা—আর গয়না টাকা—সবই এখন কনকের একার? কেমন একটা গোপন ঈর্ষায় তিনি জ্বলে উঠলেন। হয়তো, নিতান্ত অভাব থেকে

সেই ঈর্ষার জন্ম হয়েছিল। একগাদা ছেলেমেয়ে—তিনি অভাবের সংসারে দিনরাত কাঁদতেন। অথচ এখানে এসে দেখলেন আমার একার ভোগের কত প্রাচুর্য! আর তখন থেকেই ঈর্ষাটা মনের আড়ালে বড় রকমের বাসা বাঁধলো। কিন্তু মুখে ভারি মিষ্টি ছিলেন। মাতৃহীনা বোনঝিকে দেখে তাঁর শোকের অন্ত রইলো না।

তারপর থেকে আমাকে যত্ন-আদর করতে সুরু করলেন। রেঁধে খাওয়ানো থেকে সুরু করে, পরণের কাপড়টা পর্যন্ত কেচে দেওয়া। তখন ভাবতাম—মায়ের অভাব মাসীমাই পূর্ণ করছে।

তার ভেতরেই, কয়েকদিনের জন্য চলে গেলেন ধানবাদে। আবার ফিরে এলেন তার দিন পনেরো পরে। এসেই কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন—লক্ষ্মী, তোর বিয়ের সব ঠিক করেছি সেখানে। তোর মা নেই বলে কি আমি দেখবো না? আর আমরা দেখে শুনে না পার করলে, কেই বা তোকে দেখবে শেষটায়।

এখানে বলে রাখছি। মাসীমা আমার বিয়ের ব্যাপারটা জানতেন না। মায়ের সংগে মাসীমার দীর্ঘদিন মুখ দেখাদেখি ছিল না। শুনেছিলাম, আমার বয়স যখন খুব অল্প, সে সময় আমার বাবার অসুখে মাসীমা এসেছিলেন। তখন তিনি কুমারী। জামাইবাবুর সেবা করতে এসে নাকি প্রেমে পড়লেন। সে কথা টের পেয়ে মা একদিনের মধ্যেই বোনকে তাড়ালেন। আর তারই কিছুদিন পর মাসীমার অন্যত্র বিয়ে হয়ে যায়। কিন্তু কেউ আর কারো খোঁজ নিতেন না। তা ছাড়া আমার দাদু দিদিমা আমার মা-মাসীকে খুব ছোট বয়সে রেখে মারা যান। দূর সম্পর্কের এক কাকা ওঁদের মানুষ করেছিলেন। যাই হোক মায়ের মৃত্যুর পর মাসীমা এসেছিলেন এবং সব খোঁজ খবর নিয়েই।

হ্যাঁ, সিঁদুরটা আমি আগেই মুছে ফেলেছিলাম—রাগ করে, ভেবেছিলাম একজন খুনে প্রতারকের জন্য এই সত্যের লাল রেখাটাকে লেপে রাখার দরকার কি? যে জীবনের মূল্য এত বড়—অথচ তাই যখন মিথ্যে মূল্যহীন হয়ে গেল, আর কিসের শ্রদ্ধায় তাকে বাঁচিয়ে রাখা?

তবে, নিজেকে বিধবা সাজাইনি। বড় নির্দয় নিষ্ঠুর ওই সাজ। অতখানি বীভৎস করতে পারি না নিজেকে। যদিও তা আমার করা উচিত ছিল। কেন না স্বামীর মৃত্যুটাই আমাকে স্বাভাবিকভাবে ধরে নিতে হয়েছিল। কিন্তু তার জন্যে নিজেকে এত করুণ করবো কেন?

তাই আবার যেন ফিরে গেলাম কুমারী জীবনে। কখনো ভাবতাম না—আমার বিয়ে হয়েছিল। অবশ্য তখন পাড়াময় আমাকে নিয়ে হাসাহাসি চলতো। নানা ধরণের মন্তব্য। কিন্তু সে সবের জন্য আমি কোনদিন বিভ্রান্ত হইনি।

হ্যাঁ! মাসীমার প্রস্তাবে কেন যে হঠাৎ রাজী হয়ে গেলাম—আজও ঠিক বুঝতে পারি না। আসলে কতকটা অসহায় অবস্থায় পড়ে আমি সায় দিয়েছিলাম। শুধু মনে হয়েছিল, কি নিয়ে জীবনে বেঁচে থাকবো? আর বেঁচে থাকবার কথাটা মনে হলেই, বড় কষ্ট হোত আমার। যেটার জন্যে সব কিছু একে একে ভাঙতে বসেছিল। অথচ টাকা, বাড়ী, গয়না—এগুলো তো জীবনের সম্পদ নয়। এবং তা কোনদিনই জীবনকে সমৃদ্ধিশালী করে না। আমি চেয়েছিলাম একজনকে পাশে নিয়ে একটু ভরসা আর ভালবাসা নিয়ে বাঁচতে। যার চার পাশের ভেতর আমার জীবনটা আগলানো একটি ফুল গাছের মত বেড়ে উঠবে! শুধু সেই ক্ষীণ আশাটাই, মনের কোথায় যেন দুলে উঠলে—তারপর ধানবাদে গিয়ে আমার গতিমুক্তি হোল। আমারই টাকা গয়না দিয়ে আমাকে পার করলেন মাসীমা।

শুভদৃষ্টির সময় দ্বিতীয় স্বামীকে (চতুর্থ নায়ক) আমি প্রথম দেখলাম। বেশ ভালো করেই। জমিদার গোছের চেহারা। বিপুল মেদবহুল দেহ—আর পুরু একজোড়া গোঁফ—মানুষটার রূপের বিশেষ বৈশিষ্ট্য বলে মনে হোল। তা ছাড়া মাথাটা ছোট গোল দেহের তুলনায়। মাথার চুলে কদম ছাঁট দেওয়া—খাড়া খাড়া মতন দাঁড়িয়ে। মনে হোল পৌষের ধান কাটা মাঠের মত অবিকল! রংটা বীভৎস কালো! আর চোখ দুটো যেন গায়ের বর্ণকে আরো প্রকট করবে বলে—লাল রং ধারণ করেছে। সে যেন কয়লার গাদায় আগুন জ্বলছে!

না, ভয় পাইনি আমি। বড় অদ্ভুত বিস্ময় জেগেছিল। ভেবেছিলাম, কি আশ্চর্য আমার জীবন। সে জীবনের জন্য তখন, কোন করুণা, ঘৃণা, আক্ষেপ, বিক্ষোভ, বিরোধ, কিছু জাগলো না। শুধু সেই অপরিমিত বিস্ময়টা বুকে চেপে কেমন যেন গতিহীন, অচঞ্চল, স্থবির হয়ে গেলাম।

বিয়ের পর, শ্বশুর বাড়ী গিয়ে অবাক! দেখলাম স্বামীর যেমন বিপুল দেহটার মত—তাঁর দৌলতেরও অভাব নেই। মাসীমা আমাকে বললেন—'লক্ষ্মী, এখানে তুই সুখে থাকবি। আর তোর খালি বাড়ীটায় তালা ঝুলিয়ে লাভ কি! বরং আমরা এখন ওখানে গিয়ে থাকি। তোর মেসো এখন কলকাতায় বদলী হচ্ছে। তাই আগড়পাড়ায় থাকলে আমার সুবিধে হবে।'

চিন্তা করে শেষে, মাসীর প্রস্তাবে সায় দিলাম।

তারপর মাঝে মধ্যে বাড়ীতে আসতাম। দেখতাম নতুন সংসারে ভরে উঠেছে—খালি বাড়ীর বুকটা! দেখে কেমন আনন্দ হোল। ভাবলাম, আমার বাড়ী তো আছেই। ওরা যদি আনন্দ করে এখানে থাকে তাতে দোষ কি? আর সবই তো আমার আপন জন।

বাড়ীতে যখন আসতাম—মাসীমা যত্ন করতেন—খাওয়াতেন। কোন আদরের ত্রুটি রাখতেন না। আর মনে মনে তখন এই ভেবে বোধহয় আনন্দ পেতেন, লক্ষ্মী তার শ্বশুর ঘরের অত ঐশ্বর্য ছেড়ে—কখনোই আর এ বাড়ীর অধিকার নিতে আসবে না। আর সেই আশা নিয়েই তিনি বিয়ে দিয়েছিলেন—বড় লোকের বাড়ীতে। কিন্তু অকস্মাৎ তাঁর দুরাশায় ভাঁটা পড়লো। সেই সংগে পুড়লো আমার কপাল!

বিয়ের মাত্র আড়াই মাস পরে—একদিন খেতে বসে—বড় রকমের একটা ঢেঁকুর তুলে স্বামী আমার স্বর্গলাভ করলেন। সেটা নাকি হঠাৎ হার্টফেল।

সিঁদুর মুছে যখন—সেই প্রথম বিধবা সেজে বাড়ী এলাম তখন মাসীমা মাথার চুল ছিঁড়ে, কপাল চাপড়ে কাঁদতে লাগলেন। আমায় শেষে জড়িয়ে বললেন—লক্ষ্মী, তুই আমার জন্যে শেষে বিধবা হলি? আগে কি জানতাম—বিয়ে না হতে হতে, হারামজাদাটা পটল তুলবে?' বলেই, আবার বিকট চিৎকার করে কাঁদতে সুরু করলেন।

তখন মনে হোল মাসী মা হঠাৎ এক নির্বিবাদী পরলোকবাসীর উদ্দেশ্যে ঐ ধরণের বিশেষণ (হারামজাদা) কেন প্রয়োগ করলেন? মৃত্যু তো তার নিজের ইচ্ছায় হয়নি। নিজের খায়া মৃত্যু নয়। ঈশ্বরের সদিচ্ছায় সেই মৃত্যু! অথচ সেই করুণ মৃত্যুর জন্য এত উষ্মা কেন?

পরে কিন্তু সেটা আমার কাছে পরিষ্কার হোল। তিনি মরে যাওয়াতেই যে মাসীমার কপাল ভেঙেছিল। মাসীমা কখনো ভাবতে পারেন নি আবার আমার নিজের অধিকারে আমি ফিরে আসতে পারি। কিন্তু সেটার জন্য যেন একমাত্র দায়ী হলেন—সেই স্বর্গবাসী মানুষটা! খানিকটা না হেসে পারলাম না। আর সেই আক্ষেপে আক্রোশে মাসীমা প্রায় নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা করলেন। এ যেন তিনি এক শোকার্ত পাগলিনীর ভূমিকা অভিনয়ে নেমেছেন। আর সেই দৃশ্যের রসজ্ঞ দর্শক বলতে আমি শুধু একজন!

যাই হোক, মাসীমায় অভিসন্ধি শেষে টের পেলাম তার কয়েক মাস পরে। কতকটা জুলুমের সংগে তিনি বাড়ীটার অধিকার পেতে চান। শেষে ঘৃণায় বিরক্তিতে একদিন মরিয়া হয়ে বললাম—আপনারা বাড়ী ছেড়ে দিয়ে চলে যান। আমি বাড়ীতে ভাড়াটে বসাবো।" শুনে তিনি আর্তনাদ করে কেঁদে বললেন—লক্ষ্মী তুই আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছিস? তোর মেসোর বয়স হয়েছে, ভাই বোনগুলো কচি নাবালক—আর তাদের একটু মুখ চাইলি না।

'দৃঢ় ভাবে বললাম না। তোমরা যেখানে খুশী গিয়ে মরো। আমার দেখবার দরকার নেই।'

তার পরের ঘটনা বেশ জটিল হয়ে পড়লো। শেষে নিজের অধিকার কেড়ে নিতে, শেষ পর্যন্ত পুলিশ ডাকতে হয়েছিল। তারাই আমাকে এক রকম বাঁচালো!

শেষে ওরা চলে যেতে, ভাড়া বসালাম। যদিও সেই সব পুরোন ভাড়াটে আর নেই। নতুন নতুন মানুষের ভীড় আজ এই বাড়ীতে। আর এই বাড়ীতেই পড়ে থাকা আমার পোড়া ইতিহাসটা—ঘুমিয়ে আছে যেন পুরোন বিছানায় শুয়ে।

রথিন আর রত্না আসবার পর থেকেই—আমার শনিবারের রাত্রির সূচনা। প্রথম প্রথম ওদের সংগেই রাত জেগে জেগে তাস খেলতাম।—ক্রমেই সেই আসরে সংখ্যা বেড়েছে। সকলেই আমার ছোট।"

হাঁফাতে হাঁফাতে এক রকম চুপ করলো—কনক বৌদি। নিখিল দম ছাড়লো।

বোবা আলোটার পাশে, কনক বৌদির ছায়াটা পড়েছে। সেদিকে সে বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। একবার চকিতে নিঃশ্বাস পড়লো বড় রকমের।

রুদ্ধ বাতাসের বেয়াড়া স্তব্ধতা। কেমন একটা যেন অবাক চুপি চুপি ভাব।

ভাল লাগছিল না নিখিলের নিশুতি রাতের নিঃঝুম পরিবেশটা—আলো আঁধারীর রহস্যময় দোলায় যেন দুলছে—ওই ছায়াটা। সে বুঝি পঞ্চমনায়কের একমাত্র নায়িকার ছবি।

নিখিলের বুকে জেগে ওঠে, বিচিত্র ইসারা সঙ্কুল বিস্ময়। আর থম্‌কে থাকা চোখের পাতা দুটো ক্রমশঃ ভারি হতে থাকে।...

কনক বৌদি হ্যারিকেনের পল্‌তেটা একটু নাবিয়ে দিল। স্তিমিত হয়ে এলো আলোটা। সমস্ত ঘরখানা, সহসা এক ভূতুরে সন্ধ্যার মত ছায়ান্ধকারে ঢেকে যায়। আর সেই ভয় পাওয়া অন্ধকারে মেঝের পড়ে থাকা ছায়াযাকে ভূতের শরীর বলে মনে হোল!

নিখিল হঠাৎ যেন দেখলো—সেই বিভীষিকার স্বপ্নকে।

আর নিজেকে, সেই অন্ধকার থেকে ছিঁড়ে নেবার জন্য—একটা ব্যাকুল অস্থির ছটফটানি—যন্ত্রণার সুর বেজে উঠলো বুকের কোথায় যেন।

পা দুটো ছড়িয়ে সোজা টান করে বসে আছে কনক বৌদি। মুখ ঘোরানো জানলার দিকে। জোনাকির আলো ছড়ানো মধ্যরাত্রির বিচিত্র সাজে যেন মুগ্ধ হয়েছে কনক বৌদির চমকানো চোখ দুটি। মাথার ওপর চুড়ো করে বাঁধা খোঁপাটা, ঈষৎ আল্‌গা হয়ে পড়েছে ঘাড়ের কাছে। দেহের উর্দ্ধ অংশ—কতকটা কুঁজো বুড়ির মত ঝুঁকে সামনের দিকে। বড় অদ্ভুত মনে হোল সেই বিচিত্র ভঙ্গীতে বসে থাকাটা।

ছায়া থেকে চোখ সরিয়ে আনলো নিখিল। এবার কায়ার দিকে এসে দৃষ্টি তার থামলো!

সাদা থান কাপড়ে ঢাকা—মূর্তিটা অন্ধকারেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পঞ্চম নায়কের দুটি চোখ অদ্ভুত ভাবে নড়ে চড়ে ওঠে ওদিকে চেয়ে।

কনক বৌদি মুখ ঘোরালো। চৌকাঠের ওপর দাঁড়ানো মানুষটার দিকে একবার নিমেষ-হারা দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলো বড়—খোকা—বোকা—গোবেচারা ভাব যেন নিখিলের।

ছেলেটার বোকামী বৈকি! এই কাঁচা বয়সে তাসের আড্ডায় পড়ে-পাওয়া কনক বৌদিকে—প্রথম প্রেমের নায়িকা করে নিয়ে, বেচারা প্রেম সাগরে হাবু ডুবু খেলো! আর ছিনে জোঁকের মত ছিনিয়ে নিল—ছেলেটাকে—সর্বহারা কনক বৌদি।

আসলে নিখিল সেটাই যেন ভাবছিল—চুপি চুপি। তবে কনক বৌদির ভাবনা কি? এতটা গভীরে নিখিল যেতে পারেনি এতদিনে।—আসলে সেটাই তার কাঁচা বয়সের মন। নিখিল যেন রাতারাতি একটা দুরভিসন্ধির—ফাঁদ দেখে ফেলেছে। আর এই ফাঁদটার ওপর পা দেবার জন্য তার সর্বনাশা বয়সটা ঝাঁপ দিতে চাইছিল।

কনক বৌদি বললো অদ্ভুত গলার স্বর করে—দেখো নিখিল, তোমাকে ভালবাসাটা! আমার আনন্দ নয়, সুখ নয়—দুঃখ-ঘৃণা নয়! এ আমার মৃত্যু! এবং এই মৃত্যু নিয়ে আমি বেঁচে থাকতে চাই। তাই অনুরোধ করি, তুমি আমাকে ফেলে কখনো চলে যেওনা—আমার এ মৃত্যুকে শাস্তি দাও তুমি।'

কনক বৌদি চুপ করলো।

নিখিল, অস্বস্তিতে একটু নড়ে চড়ে উঠলো।

কনক বৌদি প্রশ্ন করলো—নিখিল তুমি চুপ করে কেন?

নিখিল এতক্ষণে মৃদু একটু হাসলো। আর ওর চোখ দুটো ডোবা ডোবা যেন অথৈ ঘুমের জলে। সেই দৃষ্টিকে জোর করে উদ্ভাসিত করে সে বললো—কনক, এখুনি আমি চলে যাব। আর আমাকে বাধা দিওনা।' বলে সে যাবার জন্য প্রস্তুত হোল।

সে সময় কনক বৌদির মুখখানা ভীষণ ভাবে ফ্যাকাসে বর্ণ হোল। নিখিল তা অনুমানে বুঝলো। তার পর সে অন্ধকার জানলার দিকে চোখ ফেরালো।—

জানলার পাশেই—জঙ্গল ভরা বাগান। তাকে বেড় দেওয়া ছ' ফুট উঁচু পাচীল। পাচীলের ও পিঠেই—এক

রাবে নর্থ ষ্টেশন রোড। ওই ষ্টেশন রোডের ওপর কয়েকটা সাইকেল রিক্সা চলাচলের—শব্দ শোনা গেল। নিখিল সেই শব্দকে অনুসরণ করে বললো—এখনো কিন্তু গাড়ী পাওয়া যাবে। আজ বোধহয় আর হেঁটে যেতে পারবনা ষ্টেশন পর্যন্ত। এখুনি গেলে রিক্সা ধরতে পারবো।"

নিখিল দ্রুত পায়ে—বারান্দা পেরিয়ে গেল। কনক বৌদি পেছন পেছন এগিয়ে এলো।—

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালো নিখিল। অদ্ভুত মুখভঙ্গী করে সে বলে উঠলো—'তোমার পঞ্চম নায়কের জীবনে এই শেষ শনিবার রাত্রি। মনে রেখো কিন্তু। গুড নাইট কনক চললাম।"

নিখিল যেন কতকটা দৌড়ে পালালো অন্ধকারে। সারা বাড়ীটার অসহায়—অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলো একা কনক বৌদি। অসংখ্য জোনাকি-জ্বলা রাত্রিটা কেমন তার অদ্ভুত মনে হোল। আর থাবা থাবা মুঠো মুঠো অন্ধকার—অত বড় আকাশটাকেও ঢেকে দিয়েছে। আর একটিও তারা চোখে পড়ছে না। আমা-বস্যার আড়ালে, চাপা পড়ে থাকা—চাঁদটার জন্যে সহসা দরদে ভরে গেল যেন মনটা। সে বুঝি এই শনিবার রাত্রের আর এক মন। যার খোঁজ ছিল না অনেকদিন।

খোঁজ পেয়ে বুঝি, পা টিপে টিপে এগিয়ে যায় কনক বৌদি।

অন্ধকারেও চিনতে ভুল হয় না পেয়ারা গাছটাকে অবশ্য এতদিনে তার মাথাটা আরো উঁচু হয়েছে। অসংখ্য ফলে ভরে গেছে।

তারই নিশ্চুপ ছায়ায় দাঁড়িয়ে সহসা চমকালো কনক বৌদির চোখ দুটো।

কে এখানে দাঁড়িয়ে না? না, একজন নয়। দুজন। ওরা দুজনে বুঝি দাঁড়িয়ে।

সেই-ই প্রথম নায়ক—আর তার প্রথমা নায়িকা।

ভুলে যাও এই ভয়ে

রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার স্মৃতির টুকরোগুলোকে যতনে রাখবে বলে
আমি রেখে গেনু খড়কুটো ভরা তিথি,
আবেগী মনের দুর্ব্বল কোণে পুষে রাখবার ছলে,—
কেবল তোমার নয়নের জলে তি তি'।

গ্রীষ্মের খরা পাছে বেশী লাগে তোমার কোমল দেহে
তাই সহনের দীক্ষা দিলুম দিয়ে;
নোতুবা তোমার স্মৃতির অতলে থাকবো লুপ্ত গেহে,
এই ভয় ছিলো সত্যি বলছি প্রিয়ে!

আকাশ যখন কান্নার স্রোতে ভাসাবে বিপুল মহী
ভাঙ্গা চাল বেয়ে ভাঙ্গাবে তোমার ঘুম
সেই দিনটিতে পাছে ভুলে যাও আমার প্রেয়সী অয়ি!
তাই দেখনিকো কুঁড়ে সারাবার ধুম।

শরতের ঐ শোভা দেখে পাছে হও গো আত্মহারা
তাইতো দিই নি রাখতে হৃদয় বলে,
মহামায়া পাছে পুজার ছোঁয়াচে করে দেয় কাছ ছাড়া
তাই তো কেবল তুমিই রিক্ত হ'লে।

হৈমন্তিকে পাছে ভুলে যাও ধনীর দুলালী হয়ে
তাই তো রাখিনি ক্ষেত খামারের কণা;
দুঃখের মাঝে কাটায়েছি দিন কত না যাতনা সয়ে
ভয় হয় পাছে হও গো অন্যমনা।

রাক্ষুসে শীতে কামড় সয়েছি হাড়ে হাড়ে কেঁপে কেঁপে
কাঠের আগুনে ঝলসে নিয়েছি দেহ—
তবুও আয়েসী মনকে দিইনি মোটা পুরু লেপ চেপে
আমার স্মৃতিকে পাছে কেড়ে নেয় কেহ!

এই ভয় নিয়ে বসন্ত গেছে ঝরায়ে গাছের পাতা
বিরাগী হ'লেই সর্ব্বনাশ তো জানা;
তাই ইচ্ছাকে পুঁতে দিয়ে গেছি খুলিনি মনের খাতা
তোমারেও আমি খুলতে করেছি মানা।

ইচ্ছে করেই এ সব করেছি দোষ নেবে নাকো জানি
যদিও তোমার ঘৃণার পাত্রে রবো
তবুও কালকে যদি মনে রাখো ওগো ও আমার রাণি!
ওই সব স্মরে তবেই ধন্য 'হবো।

একথা সবাই জানেন যে নাট্যকার হিসাবে যাঁরা বিশ্বব্যাপী খ্যাতি লাভ করেছেন, বার্নাড শ তাঁদের অন্যতম। তবে অন্যান্য খ্যাতিমান নাট্যকারদের সঙ্গে তাঁর নাটকের বক্তব্য ও রচনাশৈলীর যথেষ্ট পার্থক্য আছে। বার্নাড শ-এর নিজের ভাষায় বলি—"আমি কোন সাধারণ নাট্যকার নই। নীতিবিরুদ্ধ ও ধর্মবিরোধী নাটক রচনায় আমি একজন বিশেষজ্ঞ। সামাজিক ব্যাপারে ও যৌনবিষয়ে জাতিকে আমার নিজের মতবাদে বিশ্বাসী করে তোলার সুবিবেচিত উদ্দেশ্য নিয়েই আমি নাটক লিখি। এছাড়া আমার নাটক লেখার অন্য কোন কারণ নেই।"

বস্তুতঃ প্রত্যেক নাটকেই শ তাঁর কোন না কোন মতবাদ প্রচার করেছেন এবং সমাজনীতি, ধর্মনীতি ও জীবনবোধ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার নতুন মূল্যায়নের চেষ্টা করেছেন। আমাদের চিরাগত সংস্কারগুলিকে বুদ্ধিদীপ্ত ব্যঙ্গ-কৌতুকে আঘাত করাই যেন তার লেখনী ধারণের মূল উদ্দেশ্য। তাই তাঁর নাটক বুঝতে হলে তাঁর জীবনদর্শনের সঙ্গে পরিচয় থাকা দরকার।

'বিবাহ বন্ধন'কে সভ্যসমাজ একটি পবিত্র বন্ধন বলে স্বীকার করে নিয়েছে। একনিষ্ঠ প্রেম, সতীত্ব প্রভৃতিকে আমরা প্রশংসা করি। শ কিন্তু বিয়ের পক্ষপাতী নন। তাঁর মতে বিয়ে হল লাম্পট্য-বিধি (Licentious institution) বা বিচারবুদ্ধিহীন গ্রন্থি (Irrational knot)। তিনি বলেন বিয়ের নামে ধর্ম-কর্ম স্রেফ বাজে কথা। বিয়ে হল কোন মানুষের সঙ্গে দীর্ঘকাল যৌন সম্পর্ক গড়ে তোলার একটা উপায় মাত্র। এতে যৌনাচারের সুযোগ অত্যন্ত বেশি হওয়ায় মানুষের সৃষ্টি শক্তির অপচয় ঘটে। বিয়ের ফলেই নারী পুরুষের দাসীত্ব করতে ও অসংযত যৌনসংসর্গের প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হয়। বিয়ে হলে মিথ্যাশ্রয়ী সংকীর্ণ জীবন গড়ে ওঠে এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশের কোন সুযোগই থাকে না।

মানুষের যৌন স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছামিলনে শ পূর্ণ বিশ্বাসী। তিনি মনে করেন—একই স্বামীর ঔরসে বারজন সন্তানের জন্ম হওয়া থেকে বিভিন্ন বারজন পুরুষের ঔরসে বারজন সন্তানের জন্ম হওয়া সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর। কোন্ লোক কতবার কার সঙ্গে যৌনমিলন ঘটিয়েছে তার

বার্নাড শ

দ্বারা সে লোকের চরিত্র ভাল কি মন্দ তা সিদ্ধান্ত করা উচিত নয়। যৌন-ক্ষুধাকে খাওয়া বা স্নান করার মত অত্যন্ত সাধারণ ও স্বাভাবিক ঘটনা হিসাবে ধরা উচিত। বিয়ের বিরুদ্ধে শ-এর বিদ্রোহ হল—তাঁর নিজের ভাষায়—"Revolt against its sentimentality, its romance, its amorism. even against its elevating happiness."

বিয়ে-প্রথার অন্তঃসারশূন্যতাকে তিনি তাঁর "Getting Married" নাটকে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের সাহায্যে প্রকাশ করেছেন।

শুধু বিয়ে নয়, প্রেম সম্পর্কেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী অন্য নাট্যকারদের থেকে আলাদা। শ তাঁর কোন নাটকেই রোমান্সের মায়ালোক সৃষ্টি করে প্রেমের বন্দনা-গান রচনা করেন নি। প্রেম তাঁর মতে মানুষের জৈবিক পিপাসারই নামান্তর মাত্র। তিনি বলেন, প্রেমের ব্যাপারে নারী শিকারী এবং পুরুষ শিকার। নারী শিকারী-মনোবৃত্তি নিয়েই পুরুষকে ধরে এবং শ-এর নায়ক ট্যানারের মতে নারীর পুরুষের প্রতি ভালবাসা অনেকটা সৈনিকের বন্দুকের উপর কিংবা সঙ্গীতজ্ঞের বেহালার উপর ভালবাসার মত।

অবশ্য নারীর শিকারী মনোবৃত্তির জন্য শ কখনও নারীকে তিরস্কার করেন নি, বরং এটাকে তিনি প্রকৃতি-প্রদত্ত নারীর সহজাত বৃত্তি বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। শোপেনহাউর বলেছিলেন-"Women are a under sized, narrow shouldered, borowed hipped and short-legged race" f শ শোপেনহাওয়ারের মত নারী বিদ্বেষ কোথাও প্রচার করেন নি তবে তাঁর দৃষ্টিতে নারী হল "bow constructor"

এমন কি যে নারী গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করেছে তার প্রতিও শ-এর কোন ঘৃণা বা বিদ্বেষ নেই। শ-এর মতে দারিদ্র্য, নারীর স্বাধীন জীবিকা অর্জনের সুব্যবস্থার অভাব এবং নারীর প্রতি কু-ব্যবহারই গণিকা-বৃত্তির কারণ। এ প্রসঙ্গে আমরা শ-এর "মিসেস ওয়ারেনস প্রফেসন" নাটকটির কথা স্মরণ করতে পারি। শ স্পষ্টই বলেছেন—"No normal woman would be a proffessional prostitute if she could better herself by being respectable, nor marry for money if she could afford to marry for love."

বর্তমানকালের চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতি শ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। ভাবতে বিস্ময় লাগে যে তাঁর মত চিন্তাশীল লোক কলেরা বা বসন্তের টিকা নেওয়াকে ওঝার মন্ত্রে বিশ্বাস করার মতই অবৈজ্ঞানিক কুসংস্কার বলে মনে করতেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির চেষ্টার নামে জীবজন্তুর নির্যাতন বা হত্যা করার তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন।

সমাজের আইনকানুন সম্পর্কেও শ-এর মতামত আমাদের চিন্তার উদ্রেক করে। যদিও তিনি Galsworthyর মত "Justice", "The silver Box" প্রভৃতি ধরণের গ্রন্থ রচনা করে শাসনতন্ত্রের বিশদ আলোচনার মধ্যে যান নি তবু বিচারপদ্ধতি ও আইন-প্রসঙ্গে তিনি তাঁর মত স্পষ্ট ভাষায়ই ব্যক্ত করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—"The system as a whole is a mere scaffolding with no moral sanction and the feelings it rests on are malice and vengeance both ignoble and destructive."

রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থ ব্যতীত অন্য কোন কারণে কোন শাস্তিবিধানের নীতিকেই শ সমর্থন করেন নি। শ মনে করেন—ভালই হল মন্দের একমাত্র প্রতিশেধক। হিংসা জন্ম দেয় প্রতিহিংসার; শাস্তি যদি বিদ্বেষবিহীন না হয় তবে সেই বিদ্বেষ আবার নতুন বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলে।

শ তাঁর জীবনদর্শন তাঁর নাটকের চরিত্রের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। অনেকে মনে করেন, শ-এর নাটকের চরিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে ওঠে নি। প্রচারধর্মিতা নাট্যরসকে ক্ষুণ্ণ করেছে। ইবসেনের নাটকেও আমরা প্রচারধর্মিতা লক্ষ্য করি তবু তার সৃষ্ট চরিত্র অনুভূতি ও আবেগের উত্তাপে পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে। শ তাঁর Pygmalion এবং John Bull's other Island ছাড়া অন্য কোন নাটকে সেন্টিমেন্টকে প্রাধান্য দেন নি। তাই অনেক সমালোচক মনে করেন যে শ-এর নাটক যতটা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে নাড়া দেয় ততটা হৃদয় স্পর্শ করে না। ইবসেনের ব্যক্তিস্বাধীনতার জয়গান শ-কে প্রভাবান্বিত করেছিল কিন্তু—তাঁকে অভিভূত করে নি। ইবসেন ছিলেন ট্র্যাজিডিয়ান কিন্তু শ হলেন কমেডিয়ান। তাছাড়া পরিহাস রসিকতা ও কৌতুকহাস্য সৃষ্টিতে শ যে অসামান্য দক্ষতা দেখিয়েছেন তা অন্য কোন নাট্যকার দেখাতে পারেন নি।

শ-এর নাটকের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি তাঁর প্রত্যেক নাটকের সঙ্গে দীর্ঘ মুখবন্ধ (preface) যোগ করেছেন। এই মুখবন্ধগুলি থেকে আমরা শ-এর গভীর

পাণ্ডিত্য ও মৌলিক চিন্তাশক্তির পরিচয় পাই। এই প্রসঙ্গে "Heartbreak House" ও "The plays of puritans" নাটকগুলির মুখবন্ধের কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার রীতি আমাদের দেশে আছে। শ-এর পরিচয় আমি শ-এর নিজের ভাষায়ই দিচ্ছি। শ তাঁর আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন—

"Shaw is an Irishman, a vegetarian, a fluent liar, a social-democrat, a lectnrer and dedatore, a lover of music, a fierce opponent of the present status of women and an insister on the seriousness of art."

এর থেকে সংক্ষেপে শ-এর প্রায় পূর্ণাঙ্গ পরিচয় আর কা'রও পক্ষে বোধহয় দেওয়া সম্ভব নয়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মঞ্জরী ভাবসাধনা ও শ্রীশ্রীনরোত্তম ঠাকুর

অধ্যাপিকা মৃণালিনী ঘোষ

শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের উৎস আবিষ্কারের অত্যুৎসাহ বহু পণ্ডিতকে ষোড়শ শতাব্দীর সীমানা ছাড়িয়ে পঞ্চদশ চতুর্দশ-ত্রয়োদশ-দ্বাদশ-একাদশ শতাব্দীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভক্তি-রস-স্রোতের মধ্যে টেনে নিয়ে গেছে। কিন্তু তাতে করে ইতিহাস-খনিত্রের তীক্ষ্ণতা যতখানি প্রমাণিত হয়েছে সেই পরিমাণে ইতিহাসের নিরপেক্ষ নীতির যথার্থতা প্রমাণিত হয়েছে কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। অন্ততঃ একথা দ্বিধাহীন চিত্তেই ঘোষণা করা চলে যে ষোড়শশতাব্দীতে বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্ম যে একটি বিশিষ্টরূপ ধারণ করে ইতিহাসের কোন শীর্ণ রসধারার ক্রম-স্ফীততায় নয়, একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিজীবনের জীবন-সাধনাতেই তার উৎসস্থল অন্তর্নিহিত। অন্যান্য বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মত শ্রীমদ্ভাগবতই এই ভক্তিবাদের প্রেরণার মূলে রয়েছে এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত এর উৎপত্তিও স্বাধীনভাবেই হয়েছিল।১ চৈতন্য-চন্দ্রামৃতের টীকায় আনন্দী মশায় লিখেছেন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং তাঁর সম্প্রদায়ের প্রবর্তক, তাঁরই পার্ষদগণ সাম্প্রদায়িক গুরু, অন্য কেউ নন।২

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মূল পুরুষ শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব বাংলার ধর্মজীবনে (এবং সাহিত্যজীবনেও) এক যুগ-প্রবর্তক চিরস্মরণীয় ঘটনা। শ্রীগৌরাঙ্গ পূর্ণ ভগবান কৃষ্ণেরই অবতার, কৃষ্ণস্বরূপেই তিনি রাধিকার শুভ্র ভাব-কান্তি বা দেহকান্তি লাভ করেছিলেন। তাঁর অন্তঃকৃষ্ণত্ব এবং বহির্গৌরত্ব গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের নিকট অপ্রকট ছিল না এবং ভাগবতের নিম্নোক্ত শ্লোকটি তাঁদের উক্ত ধারণার মূলে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥"

স্বরূপ গোস্বামীর বিখ্যাত কড়চাটিও এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য :—

রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মা
—দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহ ভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈকমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতি সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণ-স্বরূপম্॥

"কৃষ্ণের প্রণয় বিকৃতি হ্লাদিনী শক্তি রাধা, একাত্ম্যে তাঁরা একাত্ম হয়েও পৃথিবীতে (বৃন্দাবন ধামে) দেহভেদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন; বর্তমানে আবার সেই দুই ঐক্য লাভ করেছে, রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত চৈতন্যাখ্য সেই প্রকট কৃষ্ণস্বরূপকে আমি প্রণাম করি।"৩

১। দ্রষ্টব্য :—চৈতন্য সম্প্রদায় ও মাধ্ব সম্প্রদায়—ডঃ সুশীলকুমার দে, 'নানানিবন্ধ'—পৃষ্ঠা ৬৯

২। "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুঃ স্বয়ং সম্প্রদায়প্রবর্তকস্তৎ-পার্ষদা এবং সাম্প্রদায়িকতা গুরবো নান্যে।"

৩। তুলনীয় :—'জয় জয় কান্ত। কান্তি কলেবর
জয় জয় প্রেয়সী ভাব বিনোদ

শ্রীগৌরাঙ্গকে বাংলাদেশ গ্রহণ করেছে শ্রীকৃষ্ণের অবতাররূপে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের এই গৌরাঙ্গ অবতার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য দ্বারা অন্যান্য অবতার থেকে পৃথক। ইনি শ্রীকৃষ্ণের মহিমা ও ঐশ্বর্য প্রকাশক নন৪, ইনি হলেন রাধা-কৃষ্ণের যুগল প্রকাশ এবং গৌরাঙ্গ অবতারের উদ্দেশ্য হল রাধাপ্রেম প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আত্মবিসর্জনকারী প্রেম শ্রীরাধার মধ্যে যে রূপ গ্রহণ করেছে সেই প্রেমের মাধুরী দ্বারা শ্রীরাধার হৃদয় কি ভাবে স্পন্দিত, নন্দিত ও পবিপ্লাবিত হয় তা প্রত্যক্ষগোচর করার জন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গৌরাঙ্গরূপে নদীয়াতে আবির্ভূত হয়েছিলেন।৫

শ্রীগৌরাঙ্গে রাধাকৃষ্ণ দুই মিলে এক হয়ে গিয়েছে বলে ৬ গৌরাঙ্গোত্তর যুগে বৈষ্ণব সাধনার মর্মস্থান অধিকার করেছে যুগলসাধনা। রাগমার্গে ভক্তির প্রচারের জন্যই শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব।

"যে লাগিত অবতার কহি সে মূল কারণ।
প্রেমরস নির্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গে ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত। আদিলীলা, প্রথম পরিচ্ছেদ।

রাগমার্গে ভক্তির বিশেষ লক্ষণীয় প্রকাশ রাগাত্মিকা ও রাগানুগারূপে। প্রেষ্ঠ ব্রজরাজনন্দনে যে আত্মবিসর্জনকারী আবেগময়ী তৃষ্ণা তারই নাম রাগ এবং রাগময়ী ভক্তিকেই বলা হয় রাগাত্মিকা ভক্তি। রাগাত্মিকাভক্তির প্রকাশ পরিদৃষ্ট হয় শ্রীরাধার ও ব্রজগোপীগণের ব্যাকুল কৃষ্ণসঙ্গা-ভিলাষের মধ্যে। এইরূপ রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগত যে ভক্তি তারই নাম রাগানুগা ভক্তি। রূপগোস্বামী তাঁর 'ভক্তি রসামৃত সিন্ধু'র পূর্ব বিভাগে সাধন ভক্তি-লহরীতে বলেছেন,

"ইষ্টে স্বারসীকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্‌ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা॥
বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু।
রাগাত্মিকা মনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে॥ ৭

শ্রীগৌরাঙ্গদেবে ছিল রাগাত্মিকা ভক্তির প্রাবল্য; কিন্তু গৌরাঙ্গোত্তর যুগে মঞ্জরীভাবের সাধনার মধ্যে দিয়ে সাধকের যে কৃষ্ণপ্রীতি প্রকাশিত হয়েছে তা রাগানুগা ভক্তিরই এক বিশিষ্ট আকার। শ্রীগৌরাঙ্গদেব ছিলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের অবতার কিন্তু গৌরাঙ্গ-পরবর্তী বৈষ্ণব গোস্বামীগণ ছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গরূপ শ্রীকৃষ্ণের উপাসক বা নিত্যদাস। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গে প্রকটিত লোকোত্তর রাধাভাবের অধিকারী তাঁরা হতে পারেন না; তাঁদের সাধনার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণযুগলের সেবিকা মঞ্জরীগণের নিষ্কাম ভক্তি ভাব। রূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বল নীলমণি' গ্রন্থে আমরা এই মঞ্জরীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ভাবে পরিচিত হই।

শ্রীরূপমঞ্জরী, শ্রীরতিমঞ্জরী, অনঙ্গমঞ্জরী ইত্যাদি মঞ্জরী-গণ রাধাকৃষ্ণের যুগলসেবায় সর্বদা ব্যাপৃতা। যুগলের এঁরা হলেন নিত্যদাসী নিত্য-উপাসিকা ও বিচিত্র অপাকৃত নর্মের অতিরসজ্ঞ সহচরী। শ্রীনরোত্তমদাসের ভক্তি-তত্ত্ব-সারে বলা হয়েছে,

---

জয় ব্রজ সহচরী লোচন মঙ্গল
জয় নদীয়া বধূ নয়ন আমোদ।"
(গোবিন্দদাস)

৪। "কেবলার শুদ্ধপ্রেম ঐশ্বর্য না জানে,
ঐশ্বর্য দেখিলে নিজ সম্বন্ধ না মানে।"
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

৫। স্বরূপ দামোদরের কড়চায় বলা হয়েছে—
"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয় মহিমা কীদৃশো বানয়ৈব বা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভো
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ।"

৬। "মৃগমদ তার গন্ধ, যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নিজ্বালাতে যৈছে কভু নহে ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ যৈছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥"
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

৭। অর্থাৎ "ইষ্টে স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতাই রাগ, তন্ময়ী অর্থাৎ সেই রাগময়ী যে ভক্তি তাহাই হইল রাগাত্মিকা ভক্তি। আর ব্রজবাসিগণের ভিতরে অভিব্যক্তরূপে বিরাজমানা যে রাগাত্মিকা ভক্তি তাহার অনুসৃতা ভক্তিই রাগানুগা ভক্তি নামে খ্যাত।"

(শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ-দর্শনে ও সাহিত্যে পৃঃ ২৩৫-ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত)

রাধিকার সখী যত রাধিকার সহচরী
তাহা বা কহিব কত প্রিয় শ্রেষ্ঠ নামধরি
মুখ্য সখী করিব গণন। প্রেম সেবা করে অনুক্ষণ।
ললিতা বিশাখা তথা শ্রীরূপমঞ্জরী সার
চিত্রা চম্পক লতা— শ্রীরতিমঞ্জরী আর
রঙ্গদেবী, সুদেবী কথন। অঙ্গ মঞ্জরী মঞ্জুলালী
তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুরেখা শ্রীরসমঞ্জরী সঙ্গে
এই অষ্টসখী লেখা কস্তুরিকা আদি রঙ্গে
এবে কহি নর্ম সখীগণ। প্রেম সেবা করে কুতূহলী।

মঞ্জরীগণের কৃষ্ণপ্রেম "আত্মসুখৈক তাৎপর্য" নয়, কৃষ্ণসুখৈক তাৎপর্য। অর্থাৎ মঞ্জরীগণের কৃষ্ণপ্রেম স্বার্থে স্ফুরিত হয় নাই, স্ফুরিত হয়েছে প্রিয়তমা সখীর (অর্থাৎ শ্রীরাধার) মিলনানন্দ দর্শনার্থে। মঞ্জরীগণ রাধাকে ভালবাসেন, তাই রাধারাণীর প্রাণবল্লভ গোবিন্দকেও তাঁরা ভালবাসেন।৮ রাধাবিযুক্ত কেবল গোবিন্দ তাঁদের উপাস্য নয়। কারণ,

রাই ছাড়া কানু তেজহারা ভানু
রসহীন রসের নিধি।

চরিতামৃত বলেন,

সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন
কৃষ্ণসহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন,
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়
নিজ কেলি হৈতে তাহে কোটি সুখ পায়।

গোপীগণের বিশুদ্ধ কৃষ্ণসুখৈক তাৎপর্য প্রেমের নিকট স্বয়ং কৃষ্ণকেও পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। গোপীপ্রেম যে তাঁরও সাধ্যাতীত একথা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ স্বীকার করেছেন ভাগবতে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভাষায়,

সখী হইতে হয় এই লীলার বিস্তার।
সখী বিনা এই লীলা পুষ্ট নাহি হয়।
সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়।
সখী বিনা এই লীলায় অন্যের নাহি গতি
সখীভাবে যে তাঁরে করে অনুগতি।

রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়।

শ্রীরাধাই সখীগণের বা মঞ্জরীগণের সাক্ষাৎ উপাস্যা। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রিয়তম বলেই এদেরও প্রীতির পাত্র। সেজন্যে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রতিবিলাস কখনো সখীদের বা মঞ্জরীদের লক্ষ্য হতে পারে না। তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য প্রিয়তমা রাধার পরম সুখদর্শন করে হৃদয় পরিতৃপ্ত করা।৯

মঞ্জরীদের মত গৌরাঙ্গ শিষ্য বৈষ্ণব গোস্বামীগণও যুগলধ্যান, যুগল-জ্ঞান, যুগল-দর্শন ও আস্বাদনই একমাত্র রস, একমাত্র আনন্দ ও একমাত্র সাধনারূপে গ্রহণ করেছিলেন।

শ্রীশ্রীনরোত্তমঠাকুরের বৈষ্ণব সাধনায় মঞ্জরীভাব ও রাগানুগাভক্তি বিশেষভাবেই পরিস্ফুট হয়েছে। শুদ্ধ মাধুর্যময় ব্রজের যিনি ভক্ত, রাগানুগাভক্তির তিনিই প্রকৃত অধিকারী। কারণ তাঁর সকল ভাব, সকল আরাধনা, সকল ক্রিয়াকর্ম ব্রজরাগানুযায়ী হয়ে থাকে। শ্রীশ্রীনরোত্তমঠাকুরের জীবন দর্পণেও মুকুরিত হয়ে উঠেছিল ব্রজমাধুরী পান করার জন্য একটি অতি নির্মল রাগজনিত প্রাণের আর্তি বা ব্যাকুলতা। একমাত্র যুগলকিশোরের সেবা ও ভজনা ছিল তাঁর হৃদয়ের নিত্যসিদ্ধভাব।

"নরোত্তম দাসের মনে প্রাণ কাঁদে রাত্রি দিনে
পাছে ব্রজ প্রাপ্তি নাহি হয়।"

(প্রার্থনা)

অনন্যচিত্তে কৃষ্ণসেবাই ঠাকুরমহাশয়ের একমাত্র কামনা।

"অন্য অভিলাষ ছাড়ি জ্ঞান কর্ম পরিহরি
কায়মনে করিব ভজন।
সাধু সঙ্গে কৃষ্ণসেবা না পূজিব দেবী দেবা
এই ভক্তি পরম কারণ।"

সখীভাব ও মঞ্জরীভাব অনেকটা একই হলেও ঠিক এক নয়, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। সখীরা যদি শ্রীরাধার

৮। "গোবিন্দ সখীজনের সাক্ষাৎ প্রাণেশ্বর নহে, প্রাণেশ্বরীর বল্লভ বলিয়াই প্রাণেশ্বর।" ঠাকুরাণীর কথা পৃঃ ১৮৪।

৯। "নিত্যসিদ্ধা কিঙ্করীগণ ও তাঁহাদের গণপ্রবিষ্টা সাধন-সিদ্ধা দাসিকাগণ শ্রীরাধাতে বিশেষ প্রীতিশালিনী। ইহাই নিত্যসিদ্ধা সেবিকার ভাব। শ্রীরাধা ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণের অন্য সুখের জিনিস নাই। শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন ঘটাইয়া সেবাপরা সখীদের পরম প্রীতি।"
ব্যাখ্যা—প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা—পৃঃ ১৩৪।

কায়ব্যূহস্বরূপা হন তা হলে মঞ্জরীদেরও সখীদের কায়ব্যূহ স্বরূপা বলা যেতে পারে। সখীরা বা মঞ্জরীরা সঙ্গতা নন, সঙ্গমথিতা। স্মর্তব্য যে গোপীরা বা মঞ্জরীরা এখানে রাধার প্রিয় নর্মসখী, প্রতিদ্বন্দ্বী নন। তাই শ্রীচৈতন্য-প্রভুর দাসানুদাস নরোত্তমঠাকুর প্রার্থনা করেছেন,

"কালিন্দীর তীরে কেলি কদম্বের বন
রতন বেদীর পরে বসাব দুজন
শ্যাম গোরা হৃদে দিব চন্দনের গন্ধ
চামর ঢুলাব করে হেরিব মুখচন্দ
গাথিয়া মালতীর মালা দিব দোঁহার গলে
অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বূলে।"

মঞ্জরীভাবের অতিগূঢ় ও মধুর মনোভাবটি অপূর্ব বাণী-রূপা লাভ করেছে উপযুক্ত পংক্তিগুলিতে। ঠাকুর-মহাশয় শ্রীরাধাশ্যাম যুগলকিশোরের ভক্ত, সেবক ও নিত্য-দাস। ভক্তি ও প্রেমের মূল উপকরণ ভক্তের বা প্রেমিকের সেবা করার স্পৃহা বা ব্যাকুলতা। ব্রজে এই সকল প্রকার ভক্তিভাব ও প্রেমভাব পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছে ও সর্বোৎকর্ষতা প্রাপ্ত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ-সেবকের আদর্শ তাই ব্রজভাব প্রাপ্তি; ব্রজানুগা প্রেমের অনুশীলন ও ব্রজাঙ্গনাদের আশ্রয় লাভ করে পরমতত্ত্বের সমাধি প্রাপ্তি।

"জীবনে মরণে গতি রাধাকৃষ্ণ প্রাণ পতি
দোঁহার পীরিতি রস সুখে
যুগল সঙ্গতি যারা মোর প্রাণ গলে হারা
এই কথা রহুক মোর বুকে।
যুগল চরণ সেবা এই ধন মোরে দিবা
যুগলের মনের পীরিতি
যুগল কিশোররূপ কামরতি গণ ভূপ
মনে রহু ও লীলা পীরিতি॥১০

রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জসেবাই হল যুগল উপাসকের প্রেম সেবা কারণ প্রেমই এক্ষেত্রে সেবা স্বরূপে প্রকাশিত হয়। যে হেতু মঞ্জরীগণ সখীগণের কায়ব্যূহ স্বরূপা সুতরাং সেবা প্রাপ্তির মহাগৌরব লাভ করতে হলে তাঁদের পক্ষে সখীদের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া অন্যগতি নেই। ঠাকুর মহাশয়ও, কাজে কাজেই, কখনো শ্রীরূপমঞ্জরীর আশ্রয়, কখনো বা ললিতা সখীর আশ্রয় ভিক্ষা করেছেন। যুগলের পদসেবার অধিকার শ্রীরূপমঞ্জরীর, ললিতাসখী রাধাশ্যামের তাম্বূল সেবাধিকারিণী। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর এঁদের আশ্রয় ও কৃপাভিক্ষা করে নিত্য বৃন্দাবনের যুগলের পাদপদ্মসেবার ও তাম্বূল সেবার অধিকার প্রাপ্ত হতে চেয়েছেন।

"শ্রীরূপমঞ্জরী পাদ পদ্ম করি ধ্যান
সংক্ষেপে করিল অষ্টকালের আখ্যান।" (স্মরণ মঙ্গল)
"সখীগণ জ্যেষ্ঠ যেহ তাঁহার চরণে
মোরে সমার্পিবে কবে সেবার কারণে।"

উপযুক্ত পংক্তিগুলিতে নরোত্তম মঞ্জরীর অন্তরতম আকৃতি দেদীপ্যমান হয়ে উঠেছে। কিন্তু শুধু পাদপদ্ম সেবা বা তাম্বূল সেবার অধিকার পেয়েই নরোত্তম মঞ্জরীর প্রার্থনা শুদ্ধ হয় নি, তিনি রতিমঞ্জরীরও শরণাপন্ন হয়েছেন শ্রীঅঙ্গে চামর ব্যজনের অসীম সৌভাগ্য প্রাপ্তির মানসে।

"শ্রীরতি মঞ্জরী করে চামর বাতাস।
উথলিল কত শত রসের বিলাস।
শ্রীরতি মঞ্জরীপ্রাণ তুয়া পাদপদ্মধ্যান,
দয়া করে লইনু শরণ॥" (স্মরণ মঙ্গল)

শ্রীনরোত্তম ঠাকুর তাঁর ভাবে, ভাষায়, ব্যবহারে মঞ্জরী-প্রেমাশক্তি ও ব্রজপ্রীতিরই অপূর্ব ছবি চিত্রিত করে গিয়েছেন। প্রেমভক্তি-সিদ্ধান্ত প্রকাশের সময়ে ঠাকুর মহাশয় ভাবাবিষ্ট হয়ে প্রেমনেত্রে কেবল বৃন্দাবনের রসশোভা দর্শন করতেন।১১

১০। প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা-প্রকাশক' শ্রীনগেন্দ্রকুমার রায় পৃঃ ৭৫ ৭৬

১১। "ঠাকুর মহাশয় ভাবাবিষ্ট হইয়া প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আহা! বৃন্দাবনের আজ কি শোভা—আমি মুখে আর কত বর্ণন করিব···
আমার রাধা যেন আজ মূর্তিমান শ্যাম অনুরাগ হৃদয় ধন্য হও।"
ব্যাখ্যা—প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা—পৃঃ ১৭৯-১৮০
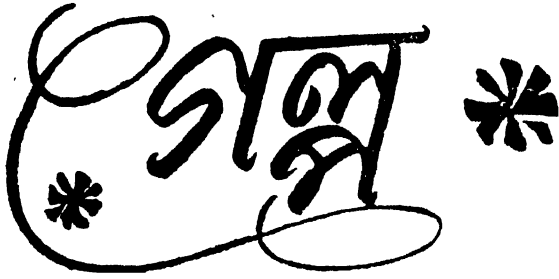
প্রদোষ-মায়া

ছায়া দেবী

বৈকালিক সূর্য্যের পড়ন্ত আলোয় নীল-পাহাড়ির বুক ঝিকমিক করছে। শেষ বর্ষার রেশ এখন ও মিলিয়ে যায় নি এই পাহাড়ি অঞ্চল থেকে, চতুর্দিকের গাছপালাগুলো সতেজ সবুজ শোভায় জল্‌ছে! মুক্তাবিন্দুর মতই এক এক ফোঁটা জল গাছের পাতায় লেগে রয়েছে। এদিক ওদিক রঙীণ ফার্ণ ও বুনো গোলাপের ঝোপ, যেন মোম দিয়ে গড়া এমন সব উজ্জল বিচিত্র গড়নের অর্কিড বড় বড় গাছের মাথায়, নানা রকম পাতায় ফুটে রয়েছে। মাথায় বড় বড় সাদা ঝুটি ময়ূরকণ্ঠি বুটি দেওয়া লম্বা ল্যাজওয়ালা পাখী ঝোপের ফাঁকে ফাঁকে নাচ্‌ছে, মাঝে মাঝে তাদের ডাক শোনা যাচ্ছে ফিউ…ফি…ফিউ …ফি…। মানুষের মনকে মোহিত করে মাতাল করে ঝির্‌ঝিরে হাওয়ায় ভাস্‌ছে মিশ্র ফুলের সুবাস!

দু'বার ডাকেও সচেতন হল না হেমেন্দ্রকিশোর। সামনে চা জল খাবারের ট্রে হাতে দাঁড়িয়ে আধাবয়সী পাহাড়ি ঝি ঝরিয়ার মা। ও বাবু, ও বাবু—কী হইছে তোর সাড়া দিস্ না কেনে? চা আর খাবার যে জুড়ায়ে জল হঁয়ে যেইছে। এতক্ষণে চমকে ফিরে তাকান হেমেন্দ্র-কিশোর, কী রে চা এনেছিস—দে, হাত বাড়ান তিনি। এতক্ষণ মন কুথাকে ছিলো সস্নেহ ভঙ্গিতে বলে ঝরিয়ার মা। সত্যিই তো তিনি কি এই পৃথিবীতে ছিলেন তার পলাতক মন কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলো এতক্ষণ? স্মৃতিও কখনো কখনো এত জীবন্ত মূর্ত্তি ধারণ করতে পারে আশ্চর্য্য। বারান্দার পাশে আয়নায় তাঁর চোখ পড়লো, ইজি চেয়ারে বসা শ্যামবর্ণ দোহারা ভরাট গম্ভীর মুখ, কেবল চোখ দুটো বড় বড়—অদ্ভুত স্বপ্নময়।

একটু হাসলেন তিনি, সময় কত অতীত হয়েছে ২৫ থেকে ৩৫ দশ বছর কিম্বা তারও বেশি। রূপালি চুল কি দু'এক গাছা চক্‌চক্ করছে? কি জানি খুঁজে দেখতে হবে। কত বয়স হলো তার? ৪০,৪২? নাঃ ঠিক মনে পড়ছে না, হিসেব করতে হবে।

আবার তাঁর দৃষ্টি ঘুরে যায় পাশের টেবিলে, আই-ভরি কলারের সোনালি বর্ডার দেওয়া খামখানা মুখ খোলা অবস্থায় পড়ে আছে। ভেতর থেকে উঁকি মারছে পুরু নীলরঙা কাগজ। একটু ভাবলেন তিনি। আজ ১৫ই পরশু সতেরো তারিখ আর সময় বেশি নেই, এর মধ্যে সব ঠিক করে ফেলতে হবে। ঝরিয়ার মাকে ফের ডাকলেন তিনি। এই শোন্ পরশুদিন একজন মায়ীজি আস্‌বেন—বুঝলি, ঘর দোর একটু পরিষ্কার করে রাখ্, একলা না পারিস্ আর একটা ঝি না হয় জোগাড় করে আন।

আনন্দ কলরব করে ওঠে ঝরিয়ার মা, কী বল্‌লি বাবু আমাদের মায়িজী মালিকান আস্‌বে? কিছু ভাবিস না বাবু, আমি সব ঠিক করে রাখবো। আমি আছি রাজুয়া আর মোতি চাপরাশীও আছে, বেশি দরকার বুঝলে ঝরিয়াকেও ডেকে আনবো—ও তুই ভাবিস না বাপ্। একটুখানি থেমে ফের বলে, সোহাগিন না থাক্‌লে কি বাড়ী মানায়? কথাটা শুনে লজ্জিত ও বিব্রত মুখে চুপ করে থাকেন তিনি, কী উত্তর দেবেন ভেবে পান না যেন।

পরক্ষণেই পকেটে হাত ঢুকিয়ে নোটের গোছা বার করেন তিনি, এইনে এখন, চাপরাশী সঙ্গে নিয়ে যা, যা লাগবে কিনে আনিস। টাকার দরকার হলে বলিস্ আবার দেবো। ঝরিয়ার মা হাস্‌তে হস্‌তে চলে গেলো। বাবুর মনের মানুষ আস্‌ছে যথাসাধ্য সে করবে বৈকি।

মিশনারীদের সংস্পর্শে আসা ঐ আধা-ক্রীশ্চান আধা-পাহাড়ি নারীটির রুচি ও পরিচ্ছন্ন-বোধ অনেক সহুরে সভ্য মেয়েদের চেয়ে বেশি, এটাও তিনি লক্ষ্য করেছেন।

এবার তিনি উঠবেন, পাহাড়ের পথ ঘুরে বাজারের দিকে একবার যাবেন, কয়েকটা প্রয়োজনীয় আর সৌখীন জিনিস কেনা দরকার সুস্মিতার জন্য। নারীর সংস্পর্শবিহীন সংসার তার, ঠিক বুঝতে পারছেন না কি কি লাগা উচিত। ভাবতে চেষ্টা করলেন সুস্মিতা কি কি তখন ভালোবাসতো—তফাৎ কি হয়নি ২২ আর ৩২শে? হয়তো কিছু কম বেশি। চঞ্চল হয়ে সামনের দিকে তাকালেন ঐ গাঢ় নীল আকাশপটে কার যেন একখানা হাসিমাখা মধুর মুখ ফুটে উঠলো! বন্য ফুলের সুবাস বড় বেশি তীব্র মদির হয়ে উঠেছে। মেঘে মেঘে সোনালি লালের খেলা, তারই স্বর্ণাভ রশ্মি বিশ্ব প্রকৃতিকে করেছে মনোরম।

যখন ফিরলেন তখন রাত অনেকটা! ঘরে ঢুকেই থমকে গেলেন—এর মধ্যেই ঘরের যথেষ্ট সাজ বদল হয়েছে, এককোণ থেকে ধূপের ধোঁয়ায় আর তাজা ফুলের সৌরভে গোটা ঘর আমোদিত। আস্তে আস্তে পাশের ঘরে ঢুকলেন, দেখে চমৎকৃত হয়ে গেলেন সে ঘরটা প্রায় একজন নারীর শয়ন কক্ষে রূপান্তরিত হয়েছে। পরিষ্কার ঝাড়াঝুড়ো ঘর, জানালায় পর্দা, টেবিল ঢাকা কুশনের ওয়াড়গুলি বদলে গিয়েছে। টেবিল চেয়ার, ছোট্ট ড্রেসিং টেবিল সবই সুন্দরভাবে গুছিয়ে রাখা, সেণ্টার টেবিলে প্রকাণ্ড ফুলের ঝাড়, দুই ঘরের মাঝখানে সোনালি চিকনের কাজ-করা সাদা নরম পর্দা হাওয়ায় দুলছে। জানালার ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্নার আলো এসে ঘরে পড়ছে। পাশেই নেওয়ার খাটে জিনিসগুলো রেখে জানলার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

পূর্ণচন্দ্রের আলোয় চারিদিক যেন মায়াময়, দূরে আঁকা আবছা নীল পাহাড়ের চূড়া। সেদিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে রইলেন তিনি, সুস্মিতা! সুস্মিতা! এতদিন পরে সে কি এল তার শূন্যজীবন পূর্ণ করতে? ভাবতে ভাবতে তাঁর যেন মোহ উপস্থিত হলো। ধীরে ধীরে এক টুকরো কালো মেঘ চাঁদকে একবার ঢেকে ফেলতেই তাঁর মনে হলো কার যেন হারিয়ে যাওয়া কালো আঁখির ছায়া! সে যেন বলছে, এতদিন পরে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হলো! হঠাৎ উঠে গিয়ে পাশের আলমারীটা খুলে রেশম কাপড়ে সযত্নে মোড়া ফটোখানা বার করলেন। অপূর্ব লাবণ্যময়ী রূপ, স্নিগ্ধ মৃদু হাসি আর কোমল মধুর দৃষ্টিতে যেন কোন নিরুপমা! পেছনে গঙ্গার তীরের ব্যাক গ্রাউণ্ড, জলে পানসি দেখা যাচ্ছে। ঘাসে ছড়ানো বইখাতা। এই ছবি তিনি তুলে ছিলেন। শুধু কি এইটে, আরো কত। দু'খানা ছবিই তিনি রেখে দিয়েছিলেন তার মনের অক্ষয় স্মৃতির সম্পদ! এ আর এমন কি? তাঁর হৃদয়ের গভীরে রক্তের রঙে কত যে ছবি আঁকা। তাঁর সুস্মিতা আসবে···কত দীর্ঘ পথ পার হয়ে···কত দুঃখের রজনী ভোর করে এবারে তারা মিলিত হবেন।

কোথায় কোন দূরে করুণ বেহাগে বাঁশী বেজে উঠলো। হয়তো কোন পাহাড়ি যুবকের প্রেমিকার কাছে প্রেম নিবেদন। তাঁর সমস্ত হৃদয় আলোড়িত করে যেন ঝড় উঠ্‌লো! আজ যৌবনের প্রান্তে এসে একি মোহ? তিনি তো ভুলেই গিয়েছিলেন···পাবার বাসনা তো ত্যাগই করে-ছিলেন, কর্মের স্তূপে নিজকে ডুবিয়ে ছিলেন, তবে? অস্থির ভাবে পায়চারী করতে লাগলেন তিনি, তবে কি করবেন সুস্মিতা সুস্মিতা···না না সুস্মিতাকে ছাড়তে পারবেন না।

কিছুক্ষণ পরে ঘরে এসে ঢুকলেন হেমেন্দ্রকিশোর। এত সুন্দর রান্না বোধহয় বহুকাল খাননি। নাঃ মুরগীর কাবাবটা ভালোই করেছিস ঝরিয়ার মা। খেতে বসে রান্না ঘরে ওদের আনন্দ কলরবটা বেশ অনুভব করতে পারছিলেন তিনি। নূতন মাইজী আসবার খবরটা বেশ সযত্নে বিতরিত হয়েছে বুঝতে আর বাকি থাকলো না তাঁর, একটু হাসলেন তিনি। স্লিপিং গাউনটা পরে ইজিচেয়ারটা জানলার সামনে টেনে আনলেন। প্রসন্ন চিত্তে মোটা সিগারেটটা ধরিয়ে বস্‌লেন। হঠাৎ একটা কথা মনে হতেই চম্‌কে উঠলেন, কিন্তু···কিন্তু সুস্মিতা যদি না আসে? হয়তো সে আসবেই না, তিনি বৃথাই এত কল্পনা করছেন। তাই কি? সে কি সত্যিই আসবে না? তিনি ত্রস্তে ব্যস্তে উঠে গিয়ে খামটা নিয়ে এলেন। হাতে নিয়ে এক লহমা ভাবলেন, পৃথিবীতে সব আশ্বাস বাক্যই কি সত্য হয়? কোন অঘটন কি ঘটে না?

স্নেহ ভালবাসা এমন কি হারজিতের প্রশ্নকে তুচ্ছ করে

ঘটনা স্রোত কি প্রবল হয়ে উঠে না? তাই যদি না হবে তাহলে তিনি সেদিন কি করে অরুণাংশুর পথ ছেড়ে সরে দাঁড়িয়ে ছিলেন? তারই চোখের সামনে তুলে নিয়ে গেল সুমিতাকে মানে সেই দিনের ইন্দুলেখা ভট্টাচার্য্যকে। সুমিতা সে তো তাঁরই দেওয়া প্রিয়নাম। সখীকে মধুনামে ডাকা! স্বেচ্ছায় সরে গিয়েছিলেন, অনিবার্য্য পরিণতিকে মেনে নিয়েছিলেন। বাধা দেবার প্রবৃত্তি জাগেনি তা নয় তবু প্রবল ইচ্ছাকে দমন করে স্বেচ্ছায় সরে গিয়েছেন। শত্রু সৃষ্টি আর করেননি, কার জন্যেই বা করবেন?

সুমিতাকে একদিন না একদিন তাঁর জীবনসঙ্গিনী করে আনবেন বলে স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলেন। উভয় পক্ষের বাড়ী থেকেই বাধা বিঘ্নতো কম ভোগ করেন নি? এজন্যে আপত্তি ছিল অনেক দিক থেকে। জাতিগত বাধা, অর্থগত বাধা, সব বাধাই ক্রমে নিজের যোগ্যতায় চূর্ণ করবেন, কোন প্রতিবন্ধকতাকেই গ্রাহ্য করবেন না এই ছিল সঙ্কল্প। তবু পরে সেই পরাজয়কেই মেনে নিয়েছিলেন ভ্রূ কুঞ্চিত করে ভেবেছিলেন, সত্যি কি পরাজয়? না এইই ভালো হলো? একটা বিরাট বাস্তব সত্য তাঁর চোখের সামনে উদ্ঘাটিত হয়েছিল, তখনো লম্বা লেজুরওয়ালা ফরেন ডিগ্রী আনা হয়নি, উদ্যোগ চল্‌ছে মাত্র। এ ছাড়া—এ ছাড়া সুরূপতো ছিলেন না তিনি-অন্ততঃ সুন্দরের প্রধান সংজ্ঞা সেই ফর্সা রংটাই তো ছিল না।

অরুণাংশুর কথা মনে পড়লো, সেতো একে বারে অপরিচিত ছিলনা। কোকড়ানো সোনালী চুল, উন্নত নাসা, রক্তিম গৌরবর্ণ, লম্বা চওরা সুঠাম দেহ ভঙ্গি, কেবল ধূসরাভ চক্ষু দুটি না থাকলে কন্দর্প বলায় আপত্তি ছিল না কারো। কী অপূর্ব হাসি তার। মনে পড়লো তার হাসি মাখা মুখ।

সে হাসিতে শুধু মেয়েরা কেন পুরুষরাও মোহিত হয়ে যেতো। যেন রাঙ্গাগোলাপ ঠোঁটে এক টুকরো স্ফটিক আলো। সেই আলোর রং যদি সুমিতার মনকে ধীরে ধীরে রঙীন করে তোলে তাহলে দোষ দেবার কি ছিল? এখানে প্রতিবাদ চলেনা। আর প্রতিযোগিতা ঈর্ষ্যা বোধ কি জাগে নি? প্রেমে মানুষ জ্ঞান হারায়। তবুও শুভ বুদ্ধিকেই বড় করেছিলেন। সব বুঝে ঘর-ভাঙ্গা সাইক্লোনের ঝড় আর তোলেন নি বরং সব দিকথেকে সুমিতায় নির্ব্বাচনের প্রশংসা না করে পারেন নি। বিলাতি ডিগ্রীধারী জীবনেপূর্ণ প্রতিষ্ঠিত বাড়ী ও গাড়ীর মালিক, অতিশয় সুভদ্র মার্জিত রুচি, মালিন্য বিহীন নিখুঁত ব্যবহার! এই অরুণাংশু ব্যানার্জ্জি ঘরে বাইরে সকলেরই কাম্য ছিল।

মনের বেদনাকে নীরবে বহন করেছিলেন, খুব ঘনিষ্ঠ ছাড়া কেউ আভাষ মাত্র পায় নি। তিনিও সানন্দে সমর্থন করেছিলেন, সুমিতার বিয়ে পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেছিলেন, একজন পরিচিত বন্ধু হিসাবে বিয়েতে যেতেও দ্বিধা করেন নি, দেখে এসেছিলেন রূপসী কন্যা, রূপের জয় যাত্রা! মুগ্ধ হয়েছিলেন তাকে দেখে ওদের কী অকৃত্রিম আনন্দ। কিছুক্ষণ পরে যখন চলে এসেছিলেন তখন হঠাৎ কানে গিয়েছিল একটা কথা; দেখলি ভাই কণা, কালো কুলো মোষটাকে? ইন্দু আবার ওকেই মনে মনে পছন্দ করে রেখেছিল! কার কথা বলছো বড়দি? হেমেন্দ্র কিশোর বাবুর? তা ছাড়া অমন রূপ আর কার? একে নীচু জাত তাতে কিংবা এমন লাখ পঞ্চাশ আছে। তাতে আবার নিজের বাপের মতও ছিলনা, বামন হয়ে চাঁদ ধরবার দুরাশা!

অপর কণ্ঠটিও কানে এসেছিল, যাই বল বড়দি সাধারণ বাঙালীর ঘরে কী এমন খারাপ? আমিতো বহুদিন থেকেই ওঁকে জানি। থাম্ থাম্ কিযে বলিস তার ঠিক নেই। কোথায় আমাদের ঘরে বাইরে আলো করা অরুণ-ইন্দু আর কোথায় ওই আলকাতরার জালা…সবটা শুনবার জন্য অপেক্ষা করেন নি, নেমে গিয়েছিলেন।

তারপর…তারপর সুমিতার ঘর তার সেই নিদারুণ বৈধব্যের সংবাদ যখন জান্‌তে পারলেন তখন তিনি কায়রোতে। অরুণাংশুর অকাল মৃত্যুর সংবাদে তিনি আন্তরিক দুঃখিত হয়েছিলেন। মাত্র ৮ বছরের দাম্পত্য জীবন। এত সুখ কি বিধাতার সহ্য হলোনা! ঈশ! সুমিতার এখন কী অবস্থা! সত্যি আফশোষ তাঁরও কম হয় নি। কিছুদিন পরে কোলকাতায় ফিরে এসে শুনলেন, সে এক বিচিত্র ব্যাপার। সুমিতা নিদারুণ কষ্টে আছে। অরুণাংশুর এত সম্পত্তির সে বিশেষ কিছুই পায় নি কারণ সম্পত্তি নিয়ে নানা ঝঞ্ঝাট চল্‌ছে। আকস্মিক মৃত্যুর ফলে অরুণাংশুর কোন উইল নেই। তার ভাইরা নানারকম বিশ্রী ক্যাক্‌রা বার করে মামলা মোকর্দ্দমা করেছে। এমনকি

দু'টি পুত্র কন্যার জননী সুমিতার বিয়েটা বৈধ কিনা সে প্রশ্নও উঠেছে। টাকা হয়ত পরে কিছু পাবে তবে সে এখন বিশ বাঁও জলের তলায়।

সব চেয়ে বড় কথা, তখন সুমিতার জীবনে সম্মানের প্রশ্নটাই বড় হয়ে উঠেছে। নীলনয়না ক্লারা ডেভিসের পুত্র জন সমেত আকস্মিক আবির্ভাবে। কাগজ পত্রের প্রমাণ সহ নানা রকম ফটো কোর্টে দাখিল করেছে ক্লারা ডেভিস। সম্পত্তিতে অধিকার, বৈধ পত্নীত্বের অধিকার তারই। অথচ এই রকম কোন ঘটনার কথা অরুণাংশু জীবিত থাকতে কেউই জানতে পারেনি।

ব্যাপার এমন জটিল এবং সহস্র কৌতূহলের কারণ হয়ে উঠেছিল। প্রথম দিকে সম্পূর্ণ নীরব ও নিশ্চুপ ছিলেন হেমেন্দ্র কিশোর। যখন বুঝলেন এবার নিশ্চেষ্ট থাকলেই সুমিতার বিপদ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাবে এবং ছেলে মেয়েগুলো মানুষ হবে না। ব্যাপার বুঝে আর নিশ্চেষ্ট থাকা সম্ভব হয় নি। তখন তাঁকে প্রয়োজন হয়েছিল সুমিতার। সেই একান্ত বিপদের দিনে বন্ধুর মতো পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন হেমেন্দ্র কিশোর। ক্লারা ডেভিসকে লণ্ডনেই চিনতেন, এই সুন্দরী শ্বেতাঙ্গিনীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল কোনও এক সূত্রে। যাই হোক তারপরে তিনি কি করেছিলেন বা না করেছিলেন সে ইতিহাস প্রকাণ্ড, সে কথা আপাততঃ থাক। তবে শেষ পর্য্যন্ত প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে অনেক ঝামেলা মিটেছিল, এমনকি ঘোর অপমান ও অসম্মানের বৃত্ত থেকে কিয়দংশে রক্ষা পেয়েছিল সুমিতা। দূর করেছিলেন বিচারকদের মন থেকে অপঘাত মৃত্যুর ছায়া। বহু চেষ্টায় খারিজ করেছিলেন কারা ডেভিসের বৈধ পত্নীত্ব। যদিও সবটা খারিজ করা সাধ্য ছিল না, কারণ সে উপায় অরুণাংশু রাখেনি।

এ সময়টা অত্যন্ত প্রয়োজন ছাড়া সুমিতার সঙ্গে দেখা করেন নি বা আভাসেও পুরোন প্রসঙ্গ টেনে আনেন নি, নি, শুধু শেষ বিদায়ের দিনে কোন চপলতা না করেই ব্যঞ্জনায়-বেজেউঠেছিল পত্র ঝরার সুর।'

তা'হলে কালই তুমি চলে যাবে?

হ্যাঁ!

না গেলে কি হয় না?

না। বলেই মুখ তুলে তাকিয়ে ছিলেন হেমেন্দ্র-কিশোর। এক জোড়া সজল কালো চোখের ব্যাকুল দৃষ্টি আর মেঘের মতো ছড়ানো চুল। সে চোখে কী যে ছিল!

অত্যন্ত কোমল গলায় বলেছিলেন, কেন সুমিতা যাওয়াই তো মঙ্গল। কবে ফিরবে বল, কবে ফিরবে তুমি? গভীর আকুতিতে সহস্র বীণার তার তার মনের মর্ম মূলে বেজে উঠ্‌লো। নিঃশব্দে চেয়ে রইলেন তাঁর চিরদিনের স্বপ্নমুকুল কি ফুল হয়ে আজ ফুটবে! কিছুক্ষণের জন্য বোধ হয় পৃথিবীকে ভুলেই গিয়েছিলেন, বলিষ্ঠ হাতে সুমিতার হাতটা চেপে ধরেছিলেন। তুমি তো সবই বোঝ আবার কি ভুল করবে সুমিতা? হয়ত আর আমি ফিরবো না, না ফিরলেও ক্ষতি নেই। তোমার স্বাধীনভাবে আলাদা হয়ে থাক্‌বার সব ব্যবস্থাই করে গেলাম। সামনের মাস থেকে কাজে জয়েন করবে। দীপু আর মিনুও এখন থেকে ভালো লরেটোতে পড়বে। একটু থেমে আবার বল্লেন, নিজে সুখী হও, ছেলে-মেয়েদের সুখী করো, ওদের মানুষ করে তোল।

সবি কি এখানেই শেষ? চিঠি দিলেও কি উত্তর দেবে না? সমস্ত প্রাণ মথিত হয়ে যায় সে স্বরে!

চিঠি দিলে···যদি প্রয়োজন হয় লিখো নিশ্চয় তার উত্তর পাবে। আশা করি সে রকম কোন প্রয়োজন হবে না তোমার, হাসলেন তিনি।

আর যদি কোন দিন তোমায় ডাকি, সাড়া কি দেবেনা? বল সেও কি উপেক্ষা করবে? বুক ভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল সুমিতার।

চকিত নেত্রে চেয়ে চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন হেমেন্দ্র কিশোর, বহু কষ্টে নিজেকে দমন করে বলেছিলেন শুধু চোখ দিয়ে চোখকে দেখাতো নয় মন দিয়ে মনকে জানতে হয়, সেই সাধনা আমাদের নেই তাই কেবল পেয়ে হারাতে হয়। এ পৃথিবীতে যে ফুল ঝরে যায় সেকি আর ফোটে? যে রক্ষীণ নক্ষত্রের আলো হারিয়ে যায় সে কি আর ফিরে জলে? ভালো করে ভেবে দেখো বুঝে দেখো সুমিতা। তবুও যদি চাও ডেকো কিম্বা নিজেই যেও, এবার আমি যাই—আমার দরজা খোলাই রইলো তোমার জন্যে। চিঠি হাতে কি এতক্ষণ ধ্যান করছিলেন

তিনি—এতক্ষণে সংবিত ফিরলো। চারিদিক শান্ত নিস্তব্ধ দু' একটা রাত-জাগা পাখীর ডাক ছাড়া। জ্যোৎস্না কিরণ ঝরে পড়ছে ঐ দূরের ঝর্ণাধারার ওপর।

এতদিন পরে সেই চিঠি এলো, নীলকাগজটা টেনে বার করলেন, পরিষ্কার মুক্তা হরফ পর পর সাজানো, একী লেখা না মনের কথা সোনালি রেখায় আঁকা? সবটা পড়লেন, আবার পড়লেন, তারপরে চেয়ে রইলেন শেষ কয়েকটা লাইনের ওপর।

…"বহু বিনিদ্র রজনী কাটে সংশয় যন্ত্রণায়, পীড়িত অন্তর ঘুরে মরেছে অশান্ত বেদনায়। কত যে দগ্ধ হয়েছি মনে মনে, কে জানবে আমার বেদনার পরিমাপ! আমার জীবন সবই কি ভ্রান্তি মায়া এক রাত্রের দেওয়ালী! ভুলকে তো ফুল বলেই গ্রহণ করেছিলাম, সে দিন, তার মধ্যে ফাঁকিতো ছিল না কিছু। মধু সৌরভের ভরা রঙীণ গোলাপে শুধু তো কাঁটা ছিল না কীটও ছিল সে তো জানতাম। প্রথমে বেদনায় বিবশ হয়ে গিয়েছিলাম, ঘন তিমিরে আলো খুঁজে পাইনি। পরে ভেবে দেখেছি বৃথা ক্ষোভ যা এসেছিল জোয়ারের জলে আপনি ভেসে গেছে ভাটার টানে, বিনা সাধনার ধন অলভ্য অপ্রাপ্য বুঝিনি তখন।

তাই তো নীরবে ছিলাম এতদিন, সহস্র কর্মের অন্তরালে। জানতে হবে নিজেকে, কালের নিকষে এ রংও সোনা কিনা? হায় সোনালি পাখার প্রজাপতি বুঝি তুমি ক্ষণিকের স্বপ্ন। কত দুঃখের পথ পার হয়ে ডেকেছি তোমাকে তাকি তুমি জানো? মরু অনলে জলেছি তাই খুঁজেছি কত কৃষ্ণ বারিধি, বলে দাও এও কি মরীচিকা হবে? প্রতি রাতের তারার আলোয় দেখেছি তোমার মুখ, দেখেছি আশ্বাস ভরা জ্যোতির্ময় চোখ! প্রতি নিয়ত শুনেছি তোমার ডাক, বল সে ডাক কি মিথ্যে? এতদিন ধরে নিজেকে তো ভুলতে চেয়েছিলাম পারলাম কই? যে তরু শুকিয়ে গিয়েছে কেন তাতে ফুল ফোটানোর অভিলাষ? তবুও প্রতীক্ষা করেছি শুভ লগ্নের যে দিন তুমি আমায় ডাক দেবে।

পৃথার কাছে দেখলাম তোমার চিঠি।…"পৃথা মাপ করো অন্য নারীকে হৃদয় দিয়ে প্রেমের অভিনয় করতে পারবো না, অনেক নারীই এসেছে আমার কাছে, কিন্তু কাউকে গ্রহণ করতে পারি নি সম্ভবও নয়।

শুধু আমার "যে" কোন দিন যদি "সে" আসে তাকে ফেরাতে পারবো না, শুধু সেই আমার হবে। আর যদি না এসেও সুখী হয় তাতে আমারো সুখ। ভুল বুঝোনা পৃথা তুমি কাউকে নিয়ে সুখী হও…

তাই আমায় যেতেই হবে আমার যে ডাক এসেছে, আমি যাবো। দীর্ঘ প্রতীক্ষার হোক অবসান। এতদিনে মৃত্যু ঘটেছে ইন্দু লেখা ব্যানার্জির এখন সুস্মিতার নব জন্ম।"……

চিঠিটা টেবিলের উপর রাখলেন। খোলা জানালা দিয়ে সামনের দিকে তাকালেন, বহু দূরে উজ্জ্বল শ্বেতাভ নীল আলো দেখা যাচ্ছে, ক্ষীণ একটা হুইসিলের আওয়াজ শোনা গেল, পাকদণ্ডীর রাস্তা বেয়ে বেয়ে ট্রেন আসছে। এ রকম একটা ট্রেণে করে তার সুস্মিতাও আসবে…স্তব্ধ রাতে তিনি শুনতে পেলেন ট্রেণের ঝক্ ঝক্ শব্দ।

তাঁর টেলিগ্রাম পেলে কি করবে সুস্মিতা ভাবতে ভাবতে প্রসন্ন হাসি ফুটে উঠলো মুখে। বহু দূর থেকে যেন সমুদ্র কল্লোলের মত একটা অস্ফুট গর্জন শোনা যাচ্ছিল, ট্রেণ বোধ হয় স্টেশনে ইন করলো।

স্টেশন মাস্টারের জরুরী স্লিপ পেয়ে ছুটে এসেছেন তিনি। রেল লাইনের দু'পাশে স্তূপীকৃত হত আহত দেহ, মৃতদেহগুলো কুলি দিয়ে সরান হচ্ছে। অতিকায় দৈত্যের মত কতকগুলো বগী উল্টে পড়ে আছে। রেলের স্লিপার আর লাইনের কিছু অংশ ভেঙে চুরে ফাঁক হয়ে গিয়েছে। আহতদের করুণ আর্তনাদে বহুদূর কম্পিত হচ্ছে। স্টেশনের দিকে কিছু কিছু লোক আসতে সুরু করেছে। ঘর্মাক্ত কলেবর স্টেশন মাষ্টার পাগলের মত ছোটোছুটি করছেন। চারিদিকে অসহনীয় দুর্গতির চিহ্ন।

ডাক্তার চৌধুরী ডাক্তার চৌধুরী শীঘ্র আসুন চেষ্টা করলে হয়ত এখনো অনেকে বাঁচতে পারে। কি সর্বনাশ হলো। হায় ভগবান, হায় ভগবান এখনো কত যে কষ্ট আছে কপালে।

ভাববার এক মুহূর্ত আর অবসর পেলেন না। তক্ষুণি কাজে লেগে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে লাইনের দক্ষিণ

দিকের মাঠে ত্রিপল আর বাঁশ দিয়ে দু'টো অস্থায়ী তাঁবু গড়া হলো, একটা থাকবে বেশি আহতরা অপরটা যারা ভয় পেয়ে বা সামান্য আঘাতে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে তারা। এক পাশে সম্পূর্ণ মৃতরা। নানা জায়গায় টেলিগ্রাম পাঠানো হয়েছে ট্রেণে সেবক বৃন্দ ও ডাক্তারের দল আসবেন।

ডাক্তারবাবু একবার এদিকে আসুন দেখুন তো বেঁচে কিনা? এক জায়গায় খোলা মাঠে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন লোক। অল্প ষ্ট্রেচার, বাঁশ কাটিয়ে খাটুলি বানানো হচ্ছিল অদূরে; সেই পাশ দিয়ে ছুটে যেতে যেতে মনে হলো কে যেন তীক্ষ্ণ চোখে দূর থেকে তার দিকে তাকিয়ে আছে, কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করলেন।

নিমীলিত নয়ন ঠোঁটের কোণায় যেন শান্ত হাসির ভাব, কপালের এক পাশে তার পিছন দিকে সামান্য রক্ত রেখা জমাট বেধে গিয়েছে, শ্বেত কমলিনীর মতো ও কে পড়ে আছে! পাগলের মতো ছুটে গেলেন। তখন তার কী যে হচ্ছিল বুকের ভেতরে! কোন রকমে ভীড় সরিয়ে ঢুকলেন, দুজন নার্স জানা লোকক্কে থাকতে বলে সবকে সরে যেতে বল্লেন।

হ্যাঁ, প্রাণ আছে! ভালো করে কান পেতে শুনলেন, খুব ক্ষীণ ভাবে নাড়ী চলছে। আঘাত খুব গুরুতর নয় আচম্‌কা ঝাঁকুনি লেগে হয়তো এ রকম হয়েছে। সযত্নে তুলো দিয়ে রক্ত মুছিয়ে দিলেন, পকেট থেকে ব্রাণ্ডির বোতল বার করে মুখে একটু ঢেলে দিলেন তারপর অপেক্ষা করতে লাগলেন। তাঁর জীবন মরণ সবি নির্ভর করছে একটি কথা একটু চাহনির উপর। হায় তার মনকি এই আশঙ্কাই করছিল। শেষে দৈবও কি প্রতিকূল হবে?

স্যার, কিছু যদি মনে না করেন, উনি কি আপনার কোন নিকট আত্মীয়া? অত্যন্ত বিরক্ত কণ্ঠে বলেন, কেন তাতে দরকার কি সঞ্জীব?

অত্যন্ত কুণ্ঠিত স্বরে উত্তর আসে না মানে আরো অনেক আহত অসুস্থর ভীড় বেড়েছে ওইদিকে, কেবল একজনের দিকে মন দিলে···কথাটা আর শেষ হয় না।

হ্যাঁ হ্যাঁ আমার অতি বড় নিকট আত্মীয়া বুঝলে? যাও যত তাড়াতাড়ি পারো একটা খাটুলি কিম্বা ষ্ট্রেচার নিয়ে এসো, একে এক্ষুনি আমার বাড়ীতে নিয়ে যেতে হবে।

আজ্ঞে স্যার এক্ষুনি চেষ্টা করছি আপনি ভাববেন না।

একটু দূরে কয়েকজন মিলে কত কি জটলা করছে কোন দিকেই তাঁর কান নেই। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন মেঘে ঢাকা ক্ষীণ চাঁদের দিকে, তেমনি কোমল আর পাংশু। কিন্তু এখনো তো জ্ঞান ফিরে এলোনা, যদি ফিরে না আসে? ভাবতেই যেন সামনের গাঢ় নীলাকাশ, তৃণ সবুজ মাঠ বিবর্ণ ধূসর হয়ে গেল! ঘড়ির দিকে তাকালেন, তার পরেই ব্লাউজের একটা বোতাম খুলে দিলেন। মাথা নীচু করে কান পেতে শুনবার চেষ্টা করলেন, একী! হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন।

"সরে যাও তুমি সরে যাও"···কে যেন ফিস্ ফিস্ করলো। দূর্ একি মনের ভ্রম! মাথা তুলে আস্তে আস্তে কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। কিন্তু জ্ঞান তো ফিরছে না হার্টের স্পন্দন থেমে গেলো নাকি? হার্টটা একটু ভালো করে দেখ্‌তেই হবে! নাড়ীটা ধরে থাকলেন! "যাও সরে যাও ইন্দুর কাছ থেকে, মিসেস্ অরুণাংশু ব্যানার্জির কাছে তুমি কেন? ওকে স্পর্শ করলে বিপদে পড়বে বুঝলে, ও আমার, তুমি কি জানোনা? মৃত্যুর পরপার থেকে কেমন করে আসবে সে? এদিকে ওদিকে তাকালেন না কোথাও কিছু নেই, একটু দূরে ডাউন ট্রেন এসে থেমেছে, বোধ হয় একদল ডাক্তার নার্স, পুলিশ ও রিপোর্টারের দল এসে থেমেছে।

সঞ্জীব কেন এত দেরী করছে, কতক্ষণ বাড়ীতে যে নিয়ে যেতে পারবেন। "হাঃ হাঃ বড় লোভ তাই না? তা হবেনা তা হবেনা অরুণাংশুর বউকে তুমি পাবে না।' নাঃ এখানকার আবহাওয়া অসহ্য, আর কিছুতেই থাকা সম্ভব নয়।

আমি কোথায়? একটা ক্ষীণ আওয়াজ বেজে উঠলো। এই যে সুমিতা মিথ্যা তুমি আমার কাছে, কেমন বোধ করছে এখন? ভাল। শুধু মাথাটায় বড় ব্যথা, একটু জল দেবে?

হাঁ করো জল দিই, কোন ভয় কোরনা ভাল হয়ে যাবে। মুখটা মুছিয়ে দিলেন।

তোমার কাছে এসেছি, আর আমার ভয় কি।

বিজয় শোন তুমি একটু এঁর কাছে দাঁড়াও তো, দেখি যদি একটা ষ্ট্রেচার জোগাড় করতে পারি। সুমিতা তোমাকে বাড়ীতে নিয়ে যাবো সেখানে সারিয়ে তুলবো, যাবে না ? অল্প একটু হাসলো সুমিতা বড় মধুর সে হাসি। যাবেনা কেন ? যাবেনা ? তোমার কাছেই তো এসেছিলাম, সেকি ভুলে গিয়েছ ?

সুমিতা সুমিতা আজ আমার আনন্দ রাখবার জায়গা নেই শুধু যদি তোমাকে সারিয়ে তুলতে পারি তবেই।

একটু সরুন স্যার ডাক্তাররা একে পরীক্ষা করবেন পিছন থেকে শোনা গেল সঞ্জীবের গলা, ইনি আপনার নিতান্ত আপনার জন কিনা স্যার তাই এঁদের নিয়ে এলাম। মনে হলো যেন বিনয়ের অবতার। তাঁর ভ্রু কুঞ্চিত হলো, তার সামনে এসে দাঁড়ালেন জনা চারেক লোক। একজন মোটা মত টাক্‌পড়া বয়স্ক লোক এগিয়ে এলেন, তাহলে এঁর অবস্থাটা একবার ভালো করে পরীক্ষা করতে হয়, তারপর অবস্থা সে রকম বুঝলে···বলেই সামনের লোকটিকে কী যেন ইঙ্গিত করলেন। আজ্ঞে হ্যাঁ সে রকম যদি হয় তাহলে সে রকম ব্যবস্থা তো করতেই হবে। বিরক্তি চেপে তিনি বল্লেন, সে রকম হলে নিশ্চয় করতে হবে। কিন্তু এটা সে রকম কেস্ নয়।

টাকপড়া লোকটি এগিয়ে এসে বল্লেন, ওঃ আচ্ছা আচ্ছা আপনার ধারণাটা কি শুনি ?

আচমকা ঝাঁকুনিতে নার্ভে শক্ লেগেছে আর জেনারেল উইক্‌নেস্ এ ছাড়া কিছুই নয়, আঘাত সামান্যই। পরিপূর্ণ বিশ্রাম ও আহার পেলেই সব সেরে যাবে।

ও আচ্ছা ' আচ্ছা আগে আমরা তো পরীক্ষা করি তারপরে না হয় আপনার মূল্যবান মতের কথা চিন্তা করবো।

কি বিশ্রী কথা বলার ভঙ্গি, সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল তাঁর, তবুও সুমিতার কথা ভেবে চুপ করে গেলেন। কিন্তু কি রকম যেন অজ্ঞাত সন্দেহ হচ্ছিল তাঁর।

দেখুন ডাক্তার চৌধুরী ওঁকে আর এখানে এক মিনিট রাখা চলে না ওঁর ব্রেনের একটা শিরা ছিঁড়ে গিয়েছে হার্টেও গুরুতর ধাক্কা লেগেছে তা ছাড়া পেটেরও কোন কোন যন্ত্র স্থানচ্যুত।

শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন তিনি। সেকী! কি বলছেন আপনারা এর কিছুই তো দেখ্‌লাম না আমি। না তা আর দেখবেন কেন বিলাত ফেরত ডাক্তার যে আপনি হাঃ হাঃ আপনার মতের দাম দিতে গেলে ইনি আর প্রাণে বাঁচবেন না। কই হে জ্যোতিশ কোথায় গেলে ডাউন ট্রেনে একে তুলতে হবে। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বল্লেন, কোন প্রয়োজন নেই, এখানেই নার্স আর ডাক্তারের বন্দোবস্ত হবে, যখন অত রকম অসুস্থ তখন ট্রেনের ঝাঁকুনিতে বিপদ বাড়াবার কোন দরকার নেই। আমিও একজন চিকিৎসক, আমার মতামতকে অগ্রাহ্য করতে পারেন না আপনারা।

একজন দাঁত উঁচু ঘোড়ামুখো লোক এগিয়ে এসে বললো, এই পাহাড়ে জায়গায় ভালো ভালো যন্ত্রপাতি নেই, কী চিকিৎসা করবেন শুনি, মশাই এর কি দৈবী ক্ষমতা আছে নাকি মন্তর তন্তর ? আমরা চারজন, মশাই একলা পেরে উঠবেন না আমাদের কাছে, কী জানেন আপনি ? ইন্দুলেখা ব্যানার্জ্জিকে আমরা কোলকাতায় বড় হাসপাতালে নিয়ে যাবো বা স্পেশালিষ্ট দেখানো হবে। সে-যা আমরা বুঝবো তাই হবে। আপনার মতের কি দাম ?

সেই মুখে কিল চড় ঘুঁসি মারবার প্রচণ্ড ইচ্ছাকে দমন করলেন হেমেন্দ্রকিশোর। আমার বাড়ীতে পেশেন্ট কেবিন আছে সেখানে ওঁকে নিয়ে যাবো এবং যতদূর সম্ভব যান্ত্রিক ব্যবস্থাও হবে, আমি এক্ষুনি নিয়ে যেতে চাই, আপনারা যান অন্য আহতদের দেখুন গে।

তুমি থামো ছোকরা, ডাক্তার এস, এন ব্যানার্জ্জিকে আর লম্বা চওড়া উপদেশ দিতে হবে না। মিসেস্ অরুণাংশুকে তোমার বাড়ীতে নিয়ে যাবার তুমি কে হে ?

এত অপমান বোধ হয় কল্পনাও করতে পারেন নি। এই মুহূর্ত্তে কি করবেন তিনি ভেবে পেলেন না। যদি একটা ফোনও করতে পারেন তা হলে হয়তো একটা ব্যবস্থা করতে পারবেন, কিন্তু সুমিতাকে ছেড়ে যাওয়া মানেই তো ···ওঃ কি বিপদেই যে পড়লেন তিনি। ধারে কাছে কি কেউ নেই ? বিজয়! বিজয়টা বা গেলো কোথায়, কাকে যে বিশ্বাস করবেন ?

হঠাৎ ব্যাকুল হয়ে ঝুঁকে পড়লেন সুমিতার মুখের দিকে, সুমিতা সুমিতা, তুমি কি এদের সঙ্গে যেতে চাও ? নিজের ইচ্ছাটা জানাও। জানাও সুমিতা।

চোখ খুলে তাকালো সুমিতা, মুখে স্পষ্ট ভীতির চিহ্ন, এরা এখানে কেন ? তাড়িয়ে দাও শিগ্‌গীর তাড়িয়ে দাও এদের, শকুনির দল ! দূর করে দাও এদের।

আশাকরি ডাক্তার ব্যানার্জ্জি এর পরে আর আপনারা বিরক্ত করবেন না, নিজের কানেই তো মতামত শুনলেন ? যান সরে পড়ুন।

কী আমরা সরে পড়বো ? দেখি কাকে সরতে হয় ? ঘোড়ামুখো লোকটা কুকুরের মতো দাঁত বার করলো। বেঁটে মোটা কালো কানে লম্বা চুলওয়ালা লোকটা এগিয়ে এলো, তা হলে বাঁশ আর দড়ি নিয়ে আসি, মেয়েটাকে বেঁধে ফেলি ?

সে কিরে তাজা কলিজা কি হিম হয়ে গেল, রক্ত কি গরম নেই ? সেই ফিস্‌ফিসে স্বর পরিচিত ভঙ্গি। স্বর লক্ষ্য করে যেন মনে হলো, একটু দূরে গাছতলার দিকে পেছন করে দাঁড়িয়ে একটা লোক, পরনে গাঢ় হলুদ রঙের পোষাক, যেন চামড়া দিয়ে গড়া।

আরক্ত চোখ মেলে সুমিতা চিৎকার করে উঠ্‌লো বাঁচাও বাঁচাও শকুনের পাল ঘিরে ধরেছে আমায়—ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে।

রোগিণীর ডিলিরিয়াম হয়েছে, পোঁতন খাটুলি নিয়ে এসো এক্ষুনি ট্রেনে তুলতে হবে। স্যার একটা খাটুলি পেয়েছি ওরা তৈয়ারী করছিল—কেড়ে এনেছি, ভাল করে বাঁধা নেই তবু এতেই চলবে মনে হয়। আপনি মার মাথার দিকটা ধরুন আমি পায়ের দিক ধরি।

বিজয় এসেছো উঃ প্রাণে বাঁচলাম তোলো তোলো শিগ্‌গীর তোলো, হরবক্স সিংকে ডাকলে ভালো হতো। আস্তে অতি সাবধানে সুমিতাকে শোয়ালেন, মাথার নীচে কোটটা খুলে দিলেন। চল বিজয় গাড়ীর দিকে, হরবক্স্ সিং আছে তো ওখানে ? ওকি কথা বলছোনা কেন, খাটুলি ওঠাও, আরে কি হলো তোমার ?

হাত···হাত যে নাড়তে পারছি না স্যার, হলুদ রঙা পা এগিয়ে এসেছে বিজয়ের পেছনে, স্যারমরলাম মরলাম দম বন্ধ হয়ে গেল। ধরাস করে অজ্ঞান হয়ে পড়লো বিজয়। পেছনে দাঁড়িয়ে তীব্র কুটিল জিঘাংসা মাখানো দৃষ্টি, ওকে ? তিনি স্থাণুর মত হয়ে গেলেন।

ইন্দু আমার ইন্দু তুমি যাবে তো আমার সঙ্গে ? আরক্ত চোখে তাকালো সুমিতা, ইন্দু কে ? সে কোথায় ? সে কোথায় বল, তুমি কে ?

আমি কে ইন্দু, কে আমি ? একবার চেয়ে দেখো চিনতে পারো কি না ?

তুমি ! তুমি এসেছো ? মন্ত্রমুগ্ধ হরিণীই মতো অপলকে চেয়ে রইলো সুমিতা।

হ্যাঁ আমি এসেছি ইন্দু তোমায় নিয়ে যেতে, বল তুমি যাবে ? তুমি না বললে নিয়ে যেতে পারছি না যে। বল বল শিগ্‌গির বল দেরী হয়ে যাচ্ছে যে।

সবই শুনতে পেলেন হেমেন্দ্রকিশোর, কিন্তু তিনি কি সজ্ঞানে আছেন না কি জমাট বাঁধা বরফ হয়ে গিয়েছেন ? পরিষ্কার শুন্‌তে পেলেন সুমিতার কথা।

হ্যাঁ যাবো যেখানে খুসী আমায় নিয়ে চল, আর তো এখানে আমার প্রয়োজন নেই। কি আর হবে এখানে থেকে ? কী করুণ সে স্বর !

সেই লোক চারজন ছুটে এসে খাটুলি ধরলো। খাটুলি নড়ে উঠলো।

সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করে তিনি ডাকলেন, সুমিতা সুমিতা !! কিন্তু কোন সাড়া নেই।

সুমিতা তুমি কোথায় যাচ্ছ, ওরা তোমাকে কোথায় কোন নরকে নিয়ে যাচ্ছে ? সুমিতা সুমিতা একবার সাড়া দাও।

সুমিতা একবার এদিক আর একবার ওদিক তাকালো কিন্তু তাঁকে চিনতে পারলো না, একান্ত অপরিচিতার ভঙ্গিতে মুখ ফিরিয়ে নিল। তার পরেই ঝুঁকে পড়া সোনালি চুলের মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসলো, রহস্য মধুর সে হাসি। চোখটা যেন একটু লাল হয়েছে।

আমি জানি কোথায় এসেছি, নিয়তির দুর্লঙ্ঘ্য লেখন এড়াবার উপায় নেই, তবে চল চল আর দেরী কেন ? আমার চারপাশে এত ভীড় কেন ? আমার রঙীন স্বর্গে এরা কেন, এদের সরিয়ে দাও। এখানে শুধু তুমি আমি দু'জন।

সুমিতা সুমিতা তুমি কি পাগল হলে। ক্লারা ডেভিসের কথা মনে নেই ? তুমি যাবার আগে একটা কথাও বলে যাও।

সুমিতার দেহে যেন তড়িৎ স্পন্দন জাগলো, আমার

কে ডাকছে কে ডাকে দূর পৃথিবী থেকে দরজাটা খুলে দাও না একবার। চোখটা একটু পরিষ্কার, কণ্ঠে অনুনয়ের সুর। সেটুকু লক্ষ্য করলেন হেমেন্দ্রকিশোর, সমস্ত বেদনা কণ্ঠে ঠেলে দিলেন তিনি, তুমি ওদের মতেই কি চলবে, স্বেচ্ছায় ওদের সঙ্গে যাবে? একবারও কি ভাববে না আমি শুধু সারিয়ে তুলতে চেয়েছিলাম। তুমি সেরে উঠলে যেখানে যেতে চাইবে আমিই পাঠিয়ে দেবো।

এখানেও সেই মোহ, সেই ডাক! পৃথিবীর ডাক, কি যেন শুনতে পাচ্ছি কি যেন ডাকছে···দরজা বন্ধ করে দাও ওগো শুনছো আমায় নিশি ডাকছে যে, বন্ধ করো দরজা। আশা নেই, আশা নেই, না মরলে আশা নেই···ক্ষীণ স্বরে বিড় বিড় করতে করতেই চোখ বন্ধ করলো সুমিতা। স্থির অচেতন দেহ, আর কোন সাড়া নেই।

খাটুলি তুলে উঠে চলতে সুরু করলো, নিজের অজ্ঞাতসারেই হাতলটা জোরে চেপে ধরলেন মাথাটা কেমন যেন ঝিম্‌ঝিম্ করছে! একী অদ্ভুত পরিস্থিতি, এতো স্বপ্নেও ভাবেন নি। হায় কেন বৃথা দুরাশা পোষণ করেছিলেন তিনি। তিনি তো ডাকেন নি স্বেচ্ছায় সুমিতা এসেছিল তার কাছে। আর এখন? কার সঙ্গে কোথায় চলে যাচ্ছে। কোন কিছু করবার উপায় বা অধিকার তার আজ নেই, বারবার তার চরম পরাজয়! ওঃ তিনি যেন ভাবতে পারছেন না।

"সরে যাও বন্ধু সরে যাও"···তাঁর আচ্ছন্ন চোখের সামনে জেগে উঠলো ক্রূর ব্যঙ্গ হাস্যে ভরা রুক্ষ ধূসর চোখ, পাংশু হলুদ মুখ আর রক্তাভ ঠোঁট। চোখের চাউনি পলকে পলকে ক্ষুধিত ও হিংস্র হয়ে উঠছে, সুন্দর মুখে শ্বাপদ চক্ষু।" ক্লারা ডেভিসকে ছেড়ে আমি ইন্দুকে গ্রহণ করেছিলাম, গ্রহণ করেছিলাম প্রাণ দিয়ে। তাই ক্লারা সরাতে চেয়েছিল ইন্দুকে। কিন্তু ক্লারার এক মুহূর্তের ভুলে আমিই সরে গেলাম পৃথিবী থেকে। আর তুমি কি ভেবেছিলে বন্ধু হাঃ হাঃ কি ভেবেছিলে এই সুযোগে হাঃ হাঃ···ইলেকট্রিক শক্ খেয়ে যেন খাটিয়া ছেড়ে দিলেন। হন হন করে ওরা চলতে লাগলো। তিনি শুধু একবার চেঁচিয়ে একবার বলতে গেলেন, মিথ্যে মিথ্যে কথা, এত বড় মিথ্যে কিন্তু ভালো করে গলার স্বর ফুটলো না। ওকি ওদিকে খাটুলি নিয়ে যাচ্ছ কেন ট্রেন তো ওদিকে নয় আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন, ও দিকে কেন? ও দিকে কেন? সেই নিঃসীম প্রান্তরে ঝড়ো হাওয়া তাঁর কথা ভাসিয়ে নিয়ে গেল। শুধু দূর থেকে শুনতে পেলেন আকাশে বাতাসে ক্ষীণ কান্নার সুর। লাল বাতি জ্বালিয়ে ডাউন ট্রেন চলে গেল ঝক্‌র ঝক্ ঝকর ঝক্ করতে করতে চলে গেল ঐ পাহাড়ের বাঁকে। আর দেখা গেলো না শুধু শোনা গেল গুম্ গুম্ ঝড়াৎ··ই ই ই ই······তীক্ষ্ণ সিটির আওয়াজ চমকে উঠলেন হেমেন্দ্র কিশোর।

তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন, ঘামে ড্রেসিং গাউন ভিজে সপ্ সপ্ করছে। এ্যাসট্রে আর চুরুটের বাক্স উলটে গিয়েছে। কোথা থেকে যেন একটা পোড়া পোড়া গন্ধ উঠছে, বোধ হয় আধ জ্বলন্ত চুরুটটা ঘুমের ঘোরে পাপোষের উপর পড়ে গিয়েছিল। রাত্রি এখন কত? ঠিক অনুমান করতে পারলেন না, উঠে জানালার ধারে দাঁড়ালেন, মধ্য গগনের চাঁদ পশ্চিম দিকে ঢলে পড়েছে, শুক তারা হীরক কুচির মতোই জ্বলছে। মাথাটা কেমন যেন ভার ভার লাগছে। কোনটা সত্য, এই এখন না সেই তখন?

স্বপ্ন! স্বপ্ন কি এমন হয়? সদা জাগ্রত পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বাইরে কি কিছু সত্য নেই? স্বপ্ন কি শুধু মাত্র অবচেতন মনের কল্পনা আর কিছু নয়? কত কিছু ভাবতে লাগলেন উঠে একটা সিগারেট ধরালেন, ঘুরতে লাগলেন আবার বসলেন, অতিরিক্ত আশা তাই নয়?

আবার ভাবতে বসলেন, সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন আবার একটা ধরালেন এবং না টেনেই ফেলে দিলেন। আকাশের কালো অন্ধকারে নীলাভ রেখা, বাগানের ফুলে ফুলে ঝির ঝিরে হাওয়া, ইউক্যালিপটাসের ডাল দুলছে, বন ঝাউয়ের আড়ালে অস্তমিত চাঁদ! সুমিতা সুমিতা সামনের গাছ থেকে টুপ করে একটা বড় সাদা ফুল ঝরে পড়লো। বুকের ভিতর যেন কেমন করতে লাগলো, কেন ইন্দুকে ভুলে গিয়েছিলেন? সুমিতা তার কাছে বড় হয়েছিল? নানা ইন্দু কেউ নয় কিছু নয় সে শুধু স্বপ্ন।

শ্রান্ত হৃদয়ে ক্লান্ত মস্তিষ্কে অবসন্ন ভাবে জানালার কাছে বসলেন, দূরে তাকিয়ে থাকলেন সুদূর আকাশের প্রথম ঊষার আবির্ভাব সূচনা। তাঁর জীবনেও কি মূর্তিমতী ঊষা মূর্ত হবে না? কেন হবে না আর কয় ঘণ্টা বাকি? সুমিতার জন্যে ঠিক মত ব্যবস্থা করতে পারবেন তো? জানালার গরাদে হেলান দেন, প্রভাতী হাওয়া পালক বুলিয়ে যায় তপ্ত ললাটে, রঙীন সিঁদুরের আভাস ছড়িয়ে পড়ে দিগন্তে। যেন এক নূতন স্বপ্নের আশায় চোখ বন্ধ করেন হেমেন্দ্র কিশোর চৌধুরী।

বাবরের আত্মকথা

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় এম-এ

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

পরদিন শনিবার, ৩রা এপ্রিল সকালে কয়েক জনকে কর্ম্মনাশা নদী পার হওয়ার উপযুক্ত স্থান নির্দ্ধারণের জন্ত ঠিক করে নিজেও রওনা হই। ঘোড়ার পিঠে এক ক্রোশ নদীর উজানে এসেও যখন নদী পারের সুবিধা জনক স্থান মিললো না—তখন আমার অভ্যাস মত নৌকায় উঠে শিবিরে চলে আসি। সেনাবাহিনী চুসের এক ক্রোশ দূরে শিবির ফেলেছিল। এই দিন আমি আবার ওষুধ ব্যবহার করি। ওষুধটি একটু বেশী রকমের উত্তেজক ছিল। ফলে আমার শরীর লাল হয়ে ওঠে। মনে হচ্ছিল যেন চামড়া ফেটে রক্ত বেরিয়ে আসবে। এতে আমি বেশ অস্বস্তি অনুভব করছিলাম। কাছেই একটি পঙ্কিল ছোট নদী।

পরদিন সকালে আমরা এই জায়গাতেই ছিলাম কারণ ঐ নদীর ধারের রাস্তা মেরামত করার প্রয়োজন ছিল। আবদুল আজিজের চিঠি নিয়ে যে হিন্দুস্থানী হরকরা এসেছিল চিঠির উত্তর দিয়ে তাকে সন্ধ্যায় ফেরত পাঠানো হলো।

সোমবার (১৫ই এপ্রিল) সকালে নৌকায় উঠি। বাতাস অনুকূল না থাকায় গুণ টানার প্রয়োজন হয়। গত বছর সেনাবাহিনীকে বক্সারের বিপরীত দিকে একটা জায়গায় অনেকদিন থাকতে হয়। সেই জায়গায় পৌছিয়ে নদী পার হয়ে তীরে নামি। জল থেকে ডাঙ্গায় ওঠার জন্ত সেবার সি ড়ি তৈরী করা হয়েছিল। সিঁড়ির সংখ্যা ছিল চল্লিশের বেশী কিন্তু পঞ্চাশের কম। দেখা গেল ওপরের কয়েকটি সিঁড়ি বাদে আর সব সিঁড়ি জলে ভেসে গেছে। আবার নৌকায় উঠে মোদক খাই। শিবির থেকে কিছু উজানে একটা দ্বীপের মত জায়গা দেখে সেই খানেই নৌকা নোঙর করে কুস্তিগিরদের কুস্তির কসরৎ দেখাতে বলা হয়। রাতের নমাজের সময় শিবিরে ফিরে আসি। গত বৎসর গঙ্গা নদী সাঁতরে পার হয়ে যেখানে এবার শিবির পড়েছে সেই জায়গাটা দেখতে এসেছিলাম। কেউ বা ঘোড়ার পিঠে, কেউবা উঠের পিঠে নদী পার হয়েছিল। সেদিন আমি আফিং খাই।

পরদিন মঙ্গলবার সকালে কাশিম বখ্‌দি, মহম্মদ আলি হাইদার কিতাবদার (লাইব্রেরিয়ান) এবং বাবা শেখের সঙ্গে বাছাই করা শ খানেক লোককে শত্রুপক্ষের সংবাদ সংগ্রহ করার জন্ত পাঠানো হয়। এই জায়গাতেই বঙ্গদেশের দূতকে আমার তিনটি প্রস্তাব তার প্রভুকে জানানোর জন্ত আদেশ দিই।

বুধবার ইউনিস্ আলি ফিরে আসে। মহম্মদ জেমান মির্জ্জার কাছে বেহারের শাসক পদে তাকে নিযুক্ত করা সম্বন্ধে তার মনোভাব কি জানবার জন্য তার কাছে ইউনিস আলিকে পাঠানো হয়েছিল। মহম্মদ জেমান (খোরাসানের রাজা বদিউজ্জমান মির্জ্জার পুত্র এবং বাবরের জামাতা) এলোমেলো গোছের একটা উত্তর দেয়। বেহারের শেখজাদা বংশের একজন একখানা চিঠি নিয়ে আসে। তাতে সংবাদ ছিল যে শত্রু পক্ষ বেহার ত্যাগ করে পালিয়েছে।

বৃহস্পতিবার বেহারীদের রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কতকগুলি চিঠি মহম্মদ আলি জং এর পুত্র তারদি মহম্মদের মারফৎ পাঠাই। তার সঙ্গে যায় কয়েক জন তুর্কি ও হিন্দু আমির, আর দুই হাজার তীরন্দাজ সৈন্য। খাজা মুরশিদ্ ইরাকিকে বেহার সরকারের দেওয়ান নিযুক্ত করে তাকেও তারদি মহম্মদের সঙ্গে পাঠানো হয়। সেখ জইন ও ইউনুস আলির সঙ্গে মহম্মদ জেমান মির্জ্জা কয়েকটি আবেদন পত্র পাঠিয়ে বেহারে যাওয়ার সম্মতি

জানায়। তার নানা প্রার্থনার মধ্যে বিশেষ একটি হলো যে, তার সঙ্গে যাওয়ার জন্য কিছু সৈন্য নিযুক্ত করা। তার প্রার্থনা পূরণ করে কিছু সৈন্য নেওয়া হয় এবং সে নিজেও কয়েক জনকে নির্ব্বাচন করে।

১লা সাবান্, শনিবার (১০ই এপ্রিল) এই জায়গায় তিন চার দিন কাটিয়ে পুনরায় যাত্রা করি। এই দিন দল ছাড়া হয়ে একাকী ভোজপুর এবং বিহিয়া (সাহাবাদ জেলায়) পরিদর্শন করে শিবিরে ফিরে আসি।

সংবাদ সংগ্রহের জন্য মহম্মদ আলি এবং আরও কয়েক জনকে পাঠানো হয়েছিল। তারা পথে একদল বিবর্ম্মাকে দেখতে পায়। তাদের হটিয়ে দিয়ে যেখানে সুলতান মহম্মদ ঘাঁটি করেছিল তার কাছাকাছি যেয়ে পৌছায়। সুলতান মহম্মদের সঙ্গে ছিল দুই হাজার সৈন্য। আমার অগ্রগামী প্রহরী সৈন্যদের আগমনবার্ত্তা শোনা মাত্র ভয়ে ব্যাকুল হয়ে দুটি হাতীকে হত্যা করে দ্রুত বেগে সরে পড়ে। তার একজন কর্ম্মচারীকে কয়েক দল সৈন্য সহ আমাদের পক্ষের খোঁজ খবর নিতে পাঠিয়েছিল। আমাদের কুড়িজন সৈন্যের একটি দলের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হওয়ার পর তাদের অনেকেই পালিয়ে যায়। কয়েক জনকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামিয়ে বন্দী করা হয়। এক জনের শিরচ্ছেদ করে তাদের দলের দুই জন প্রধান লোককে বন্দী করে আমার সামনে হাজির করা হয়।

পরদিন সকালে আমরা আবার রওনা হই। আমি নৌকায় উঠি। এই সময় মহম্মদ জেমান মির্জ্জাকে আমার নিজের তোষাখানা থেকে সম্মানসূচক একটা পুরা পোষাক, ছোরা, কটিবন্ধ, একটি যুদ্ধ ঘোটক এবং একটি ছত্র উপহার দেওয়া হয়। বেহার সুবার ভারপ্রাপ্ত হওয়ায় সে নতজানু হয়ে আনুগত্য ও সম্মান জানায়। বেহার সরকারের রাজস্ব এক কোটি কুড়িলক্ষ টাকা স্থির করে এই টাকা আমার কোষাগারে পাঠানোর ভার দেওয়ান হিসাবে মুর্শিদ ইরাকির ওপর ন্যস্ত করা হয়।

বৃহস্পতিবার (১৫ই এপ্রিল) আমাদের বিশ্রামস্থল থেকে আবার যাত্রা করি। আমি নৌকায় উঠি। সমস্ত নৌকা পাশাপাশি এবং সারিতে আনার জন্য আদেশ দিই। সারিবদ্ধ হওয়ার পর একসঙ্গে নৌকা চালানোর নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। নৌকায় নদীর প্রস্থের অর্দ্ধেকের বেশী ভরতি হয়ে যায়। অবশ্য সমস্ত নৌকা এক সারিতে চালানো সম্ভব হলো না। কারণ নদীর গভীরতা কোনও জায়গায় কম, কোনও জায়গায় বেশী, কোনও জায়গায় স্রোতের টান প্রবল, কোনও জায়গায় নদীর জল স্থির। এই সব কারণে অনেক সময় সমান দূরত্বে নৌকাগুলি রাখা গেল না। নৌকার সারির সঙ্গে জলে একটা কুমির (ঘড়িয়াল) দেখা গেল। মানুষের উরুর মত মোটা বেশ বড় গোছের একটা মাছ কুমিরের ভয়ে জল থেকে লাফিয়ে নৌকায় পড়ে। সেটাকে ধরে আমার কাছে নিয়ে আসা হয়।

গন্তব্যস্থলে পৌছিয়ে আমি কয়েকটি নৌকার নামকরণ করি। যে নৌকাটি রাণা সঙ্গর সাথে যুদ্ধের আগে তৈরী হয়েছিল সেই 'বাবুরি' নামের নৌকাটির নতুন নাম দিই—'আয়েস'। ঐ বছরেই আরাইস্ খাঁ একটা নৌকা তৈরী করে পেশকোস হিসাবে আমাকে উপঢৌকন দেন। সেই নৌকার ওপর একটা উঁচু মঞ্চ নির্ম্মাণের আদেশ দিয়ে নৌকার নাম দিই আরাসি (অলঙ্কার)। সুলতান জালাল-উদ্দিন যে নৌকাটি আমাকে পেশকোশ হিসাবে উপহার দেন তার ওপর আগেই একটা মঞ্চ তৈরী করা হয়েছিল। সেই মঞ্চের ওপর আর একটি মঞ্চ তৈরীর আদেশ দিয়ে এর নাম দিই 'গুনিয়াইস্' (বিস্তার)। আর একটা ছোট নৌকা-যেটা সাধারণতঃ যখন তখন যে কোনও কাজে, আমার ভৃত্যরা ব্যবহার করতো তার নাম দিই 'ফরমাস'।

পরদিন শুক্রবার আমি এখানেই থাকি। মহম্মদ জেমান মির্জ্জার বেহার যাত্রার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হলে সে ক্রোশ দুই দূরে শিবির ফেলে। সেই দিনই সে ফিরে এসে আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যায়। বাংলাদেশ থেকে দুইজন গুপ্তচর এসে আমাকে জানায় যে মকদুম আলিমের নেতৃত্বে বাঙ্গালীরা চব্বিশ ভাগে বিভক্ত হয়ে গণ্ডক নদীর তীরে ঘাঁটি গেড়ে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। সুলতান মামুদের অধীন একদল আফগান তাদের পরিবার-বর্গ ও আসাবাবপত্র দূরে পাঠিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা করেছিল, কিন্তু তা করতে না দিয়ে তাদের সেনাদলের সঙ্গে যেতে বাধ্য করা হয়েছে। এই সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, একটা যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় আমি মহম্মদ জেমান মির্জ্জাকে বেহার যেতে নিষেধ করে এক আদেশ পাঠাই

এবং শেখ ইস্কান্দারকে তিন চার'শ লোক সঙ্গে নিয়ে আগেই বেহারে পাঠিয়ে দিই।

শনিবার (১৭ই এপ্রিল) দুদু এবং তার পুত্র জালাল খান বেহার খাঁর একজন পত্রবাহক আমার কাছে আসে। (দুদু বেহারের আফগান রাজা সুলতান মহম্মদ সা লোহানির স্ত্রী এবং তার নাবালক পুত্র জালালউদ্দিন লোহানির অভিভাবিকা। সুলতান মহম্মদ ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান)। জানা গেল যে বাঙ্গালীরা তাদের সন্দেহের চোখে দেখছে। তারা যে কোনও সময়ে আমার শিবিরে উপস্থিত হতে পারে তাদের এই মনোগত অভিপ্রায় আমাকে জানানোর ব্যবস্থা করে তারা বাঙ্গালীদের চোখে ধূলো দিয়ে পালিয়ে এসে নদী পার হয়ে বেহার প্রদেশে এসে পৌঁচেছে। আমার প্রতি আনুগত্যপ্রদর্শন এবং বশ্যতাস্বীকার করার জন্য তারা এই দিকেই আসছে।

এই দিনই বাংলার দূত ইসমাইল মিতার কাছে খবর পাঠাই যে আমি যে তিনদফে লিখিত প্রস্তাব তাঁর হাতে দিয়েছিলাম এবং যা তিনি বাংলার দরবারে পাঠিয়ে ছিলেন তার উত্তর পেতে অনেক দেরী হয়ে যাচ্ছে! তিনি অবশ্যই জরুরি চিঠি নিয়ে তাঁর দরবারকে জানিয়ে দেবেন যে প্রস্তাবগুলির প্রত্যেকটির যথাযথ জবাব অবিলম্বে আমি চাই। তাঁর প্রভু যদি সত্যই বন্ধুজনোচিত মনোভাব ও শান্তিরক্ষার ইচ্ছা পোষণ করেন তা হলে সেই কথা প্রকাশ করতে তাঁর কোনও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। যদি সত্যই তাঁর ঐ মনোভাব থাকে তাহলে সে কথা জানাতে যেন এক মুহূর্ত বিলম্ব না করেন।

রবিবার সকালে তাব্দি মহম্মদ জং এর কাছ থেকে একজন সংবাদবাহক আসে। তার কাছ থেকে জানা গেল যে ৫ই সাবন বুধবার তার অগ্রগামী সৈন্যরা বেহারের এক দিকে পৌঁছালে সেখানকার শিকদার অন্য ফটক দিয়ে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করে।

এই দিনই আমি আবার যাত্রা করে আরা পরগণায় এসে নামি। এখানে সংবাদ পাই যে খরিদের (কালিয়া জেলার বাঁশদি তহশীলের অন্তর্গত একটি পরগণা এবং সিকেন্দারপুরের চার মাইল দূরে অবস্থিত) সেনাবাহিনী গঙ্গা ও সরযুর মোহনায় সমবেত হয়ে একশো কি দেড়শটি নৌকা সংগ্রহ করেছে। আমি তখনও বঙ্গ দেশের সঙ্গে সদ্ভাব পোষণ করে আসছি। সব সময়েই আমি এই মনোবৃত্তি অবলম্বন করে থাকি যে যার সঙ্গে আমার সদ্ভাব আর শান্তির চুক্তি বিদ্যমান আছে—আমার কথা থেকে কোনও কাজ সেই শান্তির প্রথমেই যেন ব্যাঘাত না করে। এরা অবশ্য আমার গতিপথে বাধা সৃষ্টি করে আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করছে না, তবুও আমার উল্লিখিত নীতির বলে এবং এতদিন তাদের সঙ্গে সদ্ভাব পোষণ করায় মনে করলাম যে বাংলার দূত ইসমাইল মিতার সঙ্গে মোল্লা মহম্মদ মজাহারকে বাংলায় পাঠানো উচিত। স্থির করলাম যে মোল্লা আমার আগেকার তিনটি প্রস্তাব পুনরায় উত্থাপন করে তার কি প্রতিক্রিয়া হয় জেনে আমার কাছে ফিরে আসবে।

সোমবার বাংলার দূত আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য আসে। তাকে বাংলায় ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে জানিয়ে দিলাম যে আমি এগিয়ে যাব, না পিছিয়ে আসবো, তা নির্ভর করবে আমার নিজের মেজাজের ওপর। বিদ্রোহ যেখানেই দেখা দেবে সেখানেই উপস্থিত হয়ে বিদ্রোহ দমন করবো। কিন্তু আমি এইটুকু তাকে জানাচ্ছি যে তার প্রভুর রাজ্য—জলে ও স্থলে ক্ষতিগ্রস্ত করার আমার ইচ্ছা নেই। তবে তাঁরও সেইরকম মনোভাব দেখাতে হবে। আমার তিনটি প্রস্তাবের একটি হচ্ছে—আমি যে পথ ধরে চলেছি সেই পথ থেকে খরিদের সৈন্য সরিয়ে নেওয়ার আদেশ দিতে হবে। আমি কয়েকজন তুর্কিকে খরিদের সৈন্যদের সঙ্গী হিসাবে দিতে চাই যাতে তারা নিরাপদে সরে যেতে পারে। এই আশ্বাসও দিতে পারি যে তাদের কোনও ক্ষতি করা হবে না। তারা নিরাপদে তাদের বাড়ী ফিরে যেতে পারবে। যদি তিনি আমার পথ মুক্ত করতে অস্বীকার করেন এবং আমার প্রস্তাবগুলি অবহেলা করেন তাহলে তাঁর মাথার উপর যে বিপদই ঘনিয়ে উঠুক তার জন্য তিনিই দায়ী হবেন এবং এর পর যে অপ্রীতিকর ঘটনার উদ্ভব হবে তার জন্য একমাত্র তিনিই দোষী হবেন।

বুধবার (২১শে এপ্রিল) বাংলার রাজদূত ইসমাইল মিতাকে সম্মানসূচক পোষাক সহ অন্যান্য উপহার দিয়ে বিদায় দিই।

বৃহস্পতিবার দুদু ও তাঁর পুত্র জালাল খাঁর কাছে

বুধবার পুনরায় ঘাগরা ও গঙ্গা এই দুই নদীর মধ্যবর্ত্তী জমি পরীক্ষার জন্য খলিফাকে পাঠাই। আমি ঘোড়ায় চড়ে দক্ষিণ দিকে আরার কাছাকাছি আসি। উদ্দেশ্য জলপদ্মের ক্ষেত পর্য্যবেক্ষণ। পদ্মবনে আমি যখন ঘুরছি, সেখ গুরণ কয়েকটি টাট্‌কা পদ্মবীচি আমাকে দেয়। ওগুলো দেখতে অবিকল পেস্তার মত এবং খেতেও সুস্বাদু। এই ফুলকে আমরা বলি নিলুফর। হিন্দুস্থানীরা একে বলে কাওয়েল কাকেরি, আর এর বীচিকে বলে দুদা। শোন নদী নিকটেই শুনে ঘোড়ায় উঠে সেইদিকে গেলাম। শোন নদীর ভাটিতে মুনিরে অনেক রকম গাছের বাগান আছে। আমরা শিবির ছেড়ে এতদূর এসেছি, আর মুনির যখন এত নিকটে তখন সেখানে যাওয়া উচিত মনে করি। শোন নদীর ভাটিতে তিন চার ক্রোশ যাওয়ার পর মুনিরে পৌঁছাই। এখানে সেখ ইয়াহিয়ার সমাধি আছে। সেখ সরাফউদ্দিন ইয়াহিয়া মুনির, বেহারের খ্যাতনামা সুফি সম্প্রদায়ের একজন সিদ্ধ-পুরুষ। তিনি নিজামউদ্দিন আউলিয়ার সমসাময়িক। ১৩৮০ সালে তিনি পরলোকগমন করেন। শোন এবং গঙ্গার সঙ্গম স্থানে তাঁর সমাধি ক্ষেত্র মুসলমানদের কাছে অতি পবিত্র স্থান বলে গণ্য)।

মুনিরের উদ্যানগুলি ঘুরে আমি সমাধি ক্ষেত্র পরিদর্শন করি। তারপর শোন নদীর ধারে এসে নদীতে নেমে স্নান করি। দুপুরের নমাজ, সময় হওয়ার কিছু আগেই সেরে নিয়ে শিবিরে ফিরে আসি। কয়েকটি ঘোড়া পথচলার পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সুতরাং আমাদের নতুন ঘোড়া সংগ্রহ করতে হয়। ক্লান্ত ঘোড়ার পরিচর্য্যার জন্য কয়েকজনকে সেখানেই রেখে আসতে হলো। ক্লান্তি দূর হলে তারা যেন ধীরে সুস্থে ঘোড়াগুলিকে শিবিরে ফিরিয়ে নিয়ে আসে এই নির্দ্দেশ দিলাম। এই রকম ব্যবস্থা না করলে আমাদের অনেকগুলি ঘোড়াকেই হারাতে হতো। বারো মাইল পথ আসতে হয়েছে। তা ছাড়া নানা জায়গায় ঘুরে দেখতে আমাদের মোটের উপর সেদিন প'নরো ষোল মাইলের মত পথ চলতে হয়েছে। রাতের প্রথম প্রহরের ছয় ঘড়ির (রাত প্রায় সাড়ে আটটা) পর আমরা শিবিরে ফিরে আসি।

বৃহস্পতিবার (২৯শে এপ্রিল) সকালে সুলতান জুনি[illegible] বিরলাস জোনপুর থেকে সৈন্য নিয়ে ফিরে আসে। [illegible] বিলম্বের জন্য আমি অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করি[illegible] তাকে প্রত্যাভিবাদন করি না। কিন্তু কাজি জিয়া[illegible] ডেকে পাঠিয়ে তাকে আলিঙ্গন করি।

এই দিনই আমি তুর্কি ও হিন্দু আমিরদের এ[illegible] আলোচনা বৈঠকে ডাকি। কোন্ খানে নদী পার হও[illegible] সুবিধাজনক এই সম্বন্ধে তাদের অভিমত গ্রহণ করি। [illegible] পর্য্যন্ত ঠিক হয় যে গঙ্গা ও সরযূ নদীর মাঝখানে একটা [illegible] জায়গায় ওস্তাদ আলি তার কামান সাজাবে এবং গো[illegible]ন্দাজদের প্রস্তুত রেখে সেখান থেকে অনবরত গোলাব[illegible] করবে। দুই নদীর সঙ্গমস্থলের কিছু ভাটিতে একটা দ্বীপে[illegible] মত জায়গায় বিপরীত দিকে, যেখানে অনেকগুলি নৌ[illegible] জমায়েত হয়েছে, মুস্তাফা বেহারের দিকের গঙ্গার তী[illegible] কামান বন্দুক, গোলাগুলি নিয়ে গোলা বর্ষণের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকবে। তার অধীনে কয়েকজন গোলন্দাজ সৈন্যকেও নিযুক্ত করা হবে। মহম্মদ জেমান মির্জ্জা এবং আরও অনেককে মুস্তাফার পেছনে ঘাঁটি করে তাকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে। ওস্তাদ আলি কুলি ও মুস্তাফার কাজে সহায়তার জন্য কয়েকজন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করতে হবে। যে সব শ্রমিক মাটি খোঁড়া, মাটি ফেলে জায়গা উঁচু করা, কামানগুলি যথাস্থানে স্থাপন ইত্যাদি কাজ করবে এবং যারা কামান বন্দুক প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্র ও গোলা বারুদ বহন করে আনবে তাদের কাজের দিকে

লক্ষ্য রাখাই হবে তত্ত্বাবধায়কদের কাজ। আশাকরি, সুলতান এবং র্ধারা—যাদের ওপর কাজের ভার পড়েছে—তারা দ্রুত যাত্রা করে হলদিঘাটের কাছে সরযূ নদী অতিক্রম করবে এবং যখন কামান ইত্যাদি বসানোর কাজ শেষ হবে তখন তারা শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকবে। এইভাবে শত্রুদের নানাদিক দিয়ে আক্রমণ করতে হবে।

সুলতান জুনিদ ও কাজি জিয়া আমাকে জানায় যে আট ক্রোশ উজানে নদী পার হওয়ার একটা ভাল জায়গা আছে। একজন নৌকার মাঝি, সুলতান জুনিদ, মহম্মদ খাঁ ও কাজি জিয়ার লোকজন সঙ্গে নিয়ে জারদরুকে সেই পার হওয়ার জায়গাটা দেখে আসতে ও সম্ভব হলে সেইখানে নদী পার হয়ে যেতে আদেশ দিই। আমার লোকেরা সংবাদ পায় যে বাঙ্গালীরা হলদিঘাটে পাহারা দেওয়ার জন্য একদল লোক নিযুক্ত করার মতলব করেছে। সেকেন্দার পুরের শিকদার ও মামুদ খাঁয়ের কাছ থেকে খবর এলে যে তারা হলদিঘাটের কাছে প্রায় পঞ্চাশটি নৌকা সংগ্রহ করে মাঝি মাল্লাও ভাড়া করেছে। কিন্তু বাঙ্গালীরা এদিকে আসছে শুনে তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। সরযূ নদী পার হওয়ার একটা পথ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে মনে করে যারা নদী পার হওয়ার জায়গা ঠিক করতে গেছে তাদের ফিরে আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করে আমি শনিবারেই আমিরদের আবার আলোচনা সভায় ডাকি। তাদের বলি শিকেন্দারপুর চতুর্ম্মুখ থেকে অযোধ্যা এবং বারহাজ (গোরখপুর জেলার একটি শহর) পর্যন্ত সরযূ নদীতে হেঁটে পার হওয়ার অসংখ্য জায়গা আছে। আমার মতলব এই রকম :—সেনাবাহিনীকে কয়েকভাগে ভাগ করে প্রধান দলটিকে হলদিঘাটে নদী পেরিয়ে শত্রুপক্ষের দিকে এগিয়ে গিয়ে তাদের প্রতিরোধ-পরিখা থেকে বের করে এনে যতক্ষণ না ওস্তাদ আলি কুলি ও মুস্তাফা নদী পার হয়ে এসে কামান প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র সাজিয়ে গোলাবর্ষণ সুরু করতে পারে ততক্ষণ তাদের লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। আমি স্বয়ং গঙ্গা পার হয়ে ওস্তাদ আলি কুলিকে সাহায্য করার জন্য একদল সৈন্য নিয়ে সতর্ক হয়ে আক্রমণ সুরু করার জন্য অপেক্ষা করবো। সেনাবাহিনীর প্রধান দল পথ করে নিয়ে শত্রুর কাছাকাছি পৌছালে আমার দিক থেকে আক্রমণ সুরু করবো। মহম্মদ জেমান মির্জ্জা এবং অন্যান্য যাদের বেহারের দিকের গঙ্গার তীর থেকে কাজ করতে বলা হয়েছে তারা মুস্তাফাকে সাহায্য করার জন্য যুদ্ধে নেমে পড়বে।

এই রকম বন্দোবস্ত ঠিক করে গঙ্গার উত্তরের সেনা বাহিনীকে চারভাগে ভাগ করা হলো। আসকারির অধীন সৈন্যদের নিয়ে গঠিত হলো প্রথম দল, অধিনায়ক স্বয়ং আসকারি। দ্বিতীয় দলের অধিনায়ক হলো—সুলতান জালালউদ্দিন সারকি। তৃতীয় দল গঠিত হলো কাশিম হোসেন সুলতান। বিয়াকুব সুলতান, তাং ইতিমিস সুলতান, মামুদ খাঁ লোচেনি গাজিপুরি কুকি বাবা কাসকে, তুলমিশ উজবেক, কুরবন চিরখি, হুসেন খাঁ এবং উজবেক সুলতানদের নিয়ে তাদের সঙ্গে থাকবে দরিয়া খনিয়ারা (যারা নদীর তীর এবং নদীর স্রোতের দিকে লক্ষ্য রেখে নদী পার হওয়ার ব্যবস্থা করে)। চতুর্থ সৈন্যদলের পরিচালনার ভার দেওয়া হলো মুসা সুলতান ও সুলতান জুনিদ বিরলাসের ওপর। তাদের সঙ্গে ছিল জোনপুরের বিশ হাজার সৈন্য। প্রতিটি বিভাগের সৈন্যদের যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত করে তাদের অশ্বপৃষ্ঠে চড়িয়ে রবিবার সন্ধ্যাতেই যুদ্ধ যাত্রায় রওনা করে দেওয়ার জন্য কয়েকজন দক্ষ কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করা হলো।

[ক্রমশঃ

পূজার তিন রূপ

"পথচারী"

সন্ধ্যার আগমনে নিস্তব্ধ হয়ে এসেছে সর্ব্বত্র। পূজার শেষে অবসন্ন দেহে শান্তির আশায় এসে বসি সুরধুনি তীরে। বাসায় ফেরা পক্ষীর কলরব, আর সুরধুনির কুলু কুলু তান, তাতে নীল গগনের শান্ত শশী—ধীর মন্থর গতিতে উদয়নের সঙ্গে সঙ্গে ঢেউয়ের দোলায় দুলে চলেছেন চন্দ্রিমা। সে এক অরূপের রূপের দোলা। মন এক একবার হয়ে আসে শান্ত, আবার কল্পনার ডানা মেলে চলে উড়ে—কোন অচেনা দেশে। এমন সময় কাঁসর ঘণ্টার ধ্বনিতে মনে করিয়ে দেয় পূজার কয়দিনে কিরূপ আনন্দে বা নিরানন্দে কেটেছিল। বরাহনগর রামকৃষ্ণ সেবায়তনে দেখি আগের দিনের ন্যায় সপ্তমী পূজার আনন্দে ভোর হতেই আশ্রম প্রাঙ্গণ মুখরিত। কিন্তু ঢাকের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যায় নিস্তব্ধ। সুললিত কণ্ঠে মন্ত্রও সমস্বর উচ্চারিত চণ্ডীপাঠের ধ্বনি ভিন্ন অন্য কোন শব্দ শুনতে পেলাম না। আর বিশ্বজননীর অমৃত ক্ষরিত করুণ নয়ন পানে অনিমেষে চেয়ে আছে তার সন্তান দল। স্বামিজীর কথা—ভুলিও না তুমি জন্ম হতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত। এ যেন তারই এক রূপ, আর আশ্রমপিতা বসে আছেন যোগাসনে। মাঝে মাঝে চেয়ে দেখছেন পূজার উপকরণে কোন বিঘ্ন ঘটছে কি না? ষোড়শ উপচারে চলেছে পূজা। মা বসে আছেন দশভূজা রূপে। পাশে অন্য কোন মূর্ত্তি নাই; কিন্তু মা থেকে গণেশ পর্য্যন্ত প্রত্যেকের পূজা চলেছে নিখুঁত ভাবে। পূজকের আসনে সমাসীন সন্ন্যাসী ও তন্ত্রধারক ব্রাহ্মণ। পূজকের ধ্যানগম্ভীর মূর্ত্তি ও তন্ত্র-ধারকের ত্যাগদীপ্ত প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাদের পরিচয় জানতে গিয়ে আলাপ হয় একজন স্বামিজীর সঙ্গে—তার মধুর সংলাপে আমাকে সেদিনের মত সেখানে থেকে যেতে হয়। শুনি পূজা করছেন নীলানন্দ ও তন্ত্রধারক শ্রীবিজয় চৌধুরী। পূজা সমাপনান্তে হয় জনে জনে প্রসাদ বিতরণ। বর্ত্তমানে যে এই ভাবে প্রসাদের ব্যবস্থা হতে পারে, তাতে সত্যই আনন্দ না হয়ে পারে না। সন্ধ্যায় "চাঁদনী সংঘের" ছোট ছোট বালক-বালিকারা "রাজা রামকৃষ্ণ" অভিনয় করে বহু দর্শককে আনন্দ দেয়। এর ভিতর অনেকে পুরস্কার লাভে সক্ষম হয়।

বহু বৎসর বাদে শান্তিপূর্ণ পূজা ও নিরাবিল আনন্দ দেখে মনে পড়িয়ে দেয় বাল্যকালের পূজার কথা। তখন ছিল না বারোয়ারী, ছিল জমিদার বা বড়লোকের বাড়িতে পূজা। দেখতাম, জমিদার পূজার সময় আকুল ভাবে চেয়ে আছেন সর্ব্বক্ষণ মায়ের পানে। আর সকলের আনন্দের জন্য প্রসাদ ও যাত্রাগানের ব্যবস্থা করতেন। আজ জমিদার নাই, কিন্তু রাজকীয় পূজা চালান সম্ভব একমাত্র বারোয়ারীতে। বারোয়ারী পূজা কয়েক বৎসর থেকেই দেখছি আড়ম্বরের ত্রুটি নাই। কিন্তু আকুলতা বা পূজারীর দিকে লক্ষ্য আছে বলে মনে হয় না। এ বৎসর আশা করেছিলাম—দেখব তার অন্য রূপ। তাই বেরিয়ে পড়ি কলকাতার বারোয়ারী পূজা দেখতে। যা দেখি তাতে হয়ে পড়ি নিরানন্দ। কোন কোন মণ্ডপে পূজা চলেছে দায়সারা, কারণ কর্ত্তা যে কে তার পাত্তা নেই। বাইরে চলেছে আনন্দ হুল্লোড়, আর নিষিদ্ধ চটুল গানের ছড়াছড়ি। এই দেখে মনে পড়ে ছোট একটি সত্য ঘটনা।

একজন সৎ ব্রাহ্মণ স্বাস্থ্যের জন্য যান মধুপুরে। ঠিক সেই সময় একজন বড়লোক যান হাওয়া পরিবর্ত্তনে। ব্রাহ্মণ নিত্যকার নিষ্ঠানুযায়ী স্নানান্তে বসেন চণ্ডীপাঠে। সুললিত কণ্ঠধ্বনিতে রাস্তায় জমে যায় শ্রোতার ভীড়। ধনী ব্যক্তি নিত্যকার অভ্যাস মত ছড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন প্রাত-ভ্রমণে। তিনি জানতেন—ঠিক ঠিক চণ্ডীপাঠ বাড়ীতে হলে অপুত্রক হয় পুত্রবান। চণ্ডীপাঠ শুনে তার নিকট হাজির হয়ে বলেন, আমাদের বাড়ীতে পাঠ করতে পারবেন? ব্রাহ্মণ তার সাজ পোষাকে বুঝতে পারেন এ বিরাট ধনাঢ্য ব্যক্তি। রাজি হয়ে বলেন—শনিবার ৮ টায় যাব।

ফিরবার পথে পুত্রলাভের আনন্দে বলেন, আপনার প্রাপ্য অবশ্য পাবেন। ব্রাহ্মণ আনন্দ চিত্তে সুমধুর ছন্দে পথে বলে চলেছেন।

সুন্দর আবেশে করিব পাঠ
পূরিবে তোমার মনস্কাম্॥
পূর্ণ হবে আমার আশ্
নাহি চাহি প্রীতি পাশ্॥

হাতে তার চণ্ডী, অন্য হাতে পট্টবস্ত্র—বেলা আটটায় এসে পৌছেন দরদালানে। ঘরটি কোচ ও রাজ-রাজড়ার ছবিতে সুসজ্জিত ছিল। চাকর বলে—আপনি বসুন বাবু আসছেন। বেলা দশটায় প্রসাধন করে বেরিয়ে আসেন কর্ত্তা ও গিন্নী। দশটি টাকা টেবিলে রেখে বলেন—আপনি চণ্ডীপাঠ করুন, আমরা বাজার থেকে বেড়িয়ে আসি। অসহায় ভাবে ব্রাহ্মণ চাকরকে বলেন, কোথায় চণ্ডীপাঠ করব। সাহেব-ঘেঁষা চাকর বলে, কৌচে বসেই করে ফেলুন। চণ্ডীর বর্ণনা শেষে দশ টাকার সৎ ব্যবহার করে ফেরেন ব্রাহ্মণ বাড়ী।

বারোয়ারী পূজায় মন হতে হয় না শান্ত, তাই বেরিয়ে পড়ি স্থান হতে স্থানান্তরে। কোথাও দেখি মায়ের রং এর খেলা, কোথাও বা নৃত্যেরঃছন্দ। আবার বেশি অবাক করল, অদ্ভুত মনের অদ্ভুত রূপের বাস্তব রূপ। যে রূপের প্রকাশ একমাত্র কলিযুগে সম্ভব। মায়ের আঘাতে মহিষের পীঠ থেকে বেরিয়েছে মহিষাসুর। আবার কোথাও ভক্ত অসুরের স্থানে আয়ুব। বহু ঘোরার পর মায়ের পৌরাণিক রূপ দেখে আনন্দ পেলাম। কিন্তু পথচারীর কথায় হই ব্যথিত। বলে এ আর কি দেখবি, অন্যজায়গায় চল। হায়, কলিযুগে একি অবস্থা! মাকে চায় না মায়ের রূপে দর্শন করতে। যেখানে হয়েছে আর্টের খেলা সেইখানেই ভীড়। অবশ্য এসব জায়গায় আলো ও সাজসজ্জার ছড়াছড়িতে হয়ে উঠেছে রঙ্গমঞ্চ।

নবমীর ভোর হতে না হতেই চঞ্চল হয়ে ওঠে মন। বেরিয়ে পড়ি ঘরে ঘরে পূজা দেখার আশায়। কয়েকটি বাড়ীর পূজা দেখলাম, সাজ সরঞ্জাম বা লোকের ভীড় নাই বললেই চলে। গৃহকর্ত্তা যতদূর সাধ্য যোগাড় করেছেন পূজার সামগ্রী, আর আকুলতা নিয়ে আছেন বসে। পিতৃ-পুরুষের পূজা ছিল আড়ম্বরপূর্ণ; বর্ত্তমানে কালচক্র করেছে গ্রাস, তবু মায়ের টান যেয়েও যায় না। কিন্তু যেখানে একটি নীলপদ্মের অভাবে মা হন না সন্তুষ্ট, সেই রাজকীয় পূজা কি করে হবে এই সামান্যতে পরিপূর্ণ। এক একবার মা এক এক রূপ ধারণ করে নিয়েছেন পূজা। ভক্তেরা সেই সেই রূপে পূজা করে বার বার পেয়েছে তাঁর কৃপা। মনে পড়ে বহুদিন আগে একজন ব্রাহ্মণ গ্রামের এক পূজা দেখতে গিয়ে দেখেন পিতৃপুরুষের প্রতিষ্ঠিত পূজা সাধ্যাতীত হলেও গৃহকর্ত্তা আয়োজন করেছেন ক্ষমতা অনুযায়ী, আর মাত্র পাঁচ টাকা দিয়ে বিদায়ের ব্যবস্থা করে ছিলেন পূজারীর। পূজায় বসে পূজারী কখন পৈতে নেড়ে, কখন অন্য মন্ত্র পড়ে অতিবাহিত করেন সময়। পূজান্তে ব্রাহ্মণ পূজারীকে সুধানোতে বলেন, মাত্র পাঁচ টাকায় এই রকম পূজা হয়। জানত ঠিক ঠিক পূজা করতে গেলে কত খাটতে হয়। ব্রাহ্মণ আবার চুপি চুপি বলেন, এতে তোমার যে ক্ষতি হবে। উত্তরে বলেন, প্রাণপ্রতিষ্ঠা করলে তবে "তো" ক্ষতি, পুতুল পূজায় কি কোন ক্ষতি হয়! পূজা শেষ হয়ে গেছে কয়েকদিন আগেই, কিন্তু ঐ কয়দিনের সুকৃতি ও বিকৃতি রূপের চিন্তায় মনকে বার বার করে তুলেছে চঞ্চল। মা একরাতের পূজায় হয়েছেন সন্তুষ্ট, আবার এই রাজ-রাজেশ্বরী রূপে হয়েছেন প্রতিষ্ঠিতা। তাই ভাবি, তিন দিনে যে পূজা দেখলাম তার কোনটি ঠিক?

টিউশনি

রথীন সরকার

প্রাতরাশ সেরে সবেমাত্র টিউশনিতে বেরুবার তোড়জোড় করছি! বাইরে পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনলাম, রাজেনবাবু আছেন, রাজেনবাবু?

মনটা মুষড়ে গেলো। জানি এ অসময়ে ননীবাবুর আসবার হেতুটা কি। কেনই বা তিনি এ সময়ে আসেন। তবু নিজেকে সংযত করে বললাম, ননীবাবু যে, আসুন আসুন।

দরজা খোলাই ছিলো। ননীবাবু সটান ভেতরে এসে চেয়ারে জাঁকিয়ে বসলেন। বললেন, এই যে আছেন দেখছি। ভালোই হল। তা আসল কথাটা বলি—গোটা দশেক টাকা হবে?

ননীবাবুর এ রকম আসা নতুন নয়। প্রায়ই আসেন। হাত পাতেন। আর আমি যতদূর পারি বন্ধু হিসেবে দু' দশ টাকা সাহায্য করি। তারপর সুযোগ সুবিধে মতো সে টাকা ননীবাবুও শোধ করে দেন। তবু মাসের শেষে সবারই হাতে একটু টানাটানি যায়। আর আমিও তো সামান্য একজন কেরাণী।

একটু ইতস্তত করতে ননীবাবু হয়তো আমার মনের কথা বুঝলেন। বললেন, জানি আপনার হাত টানাটানি যাচ্ছে। তবু না চেয়েও তো উপায় নেই। আর তাছাড়া চাইবোই বা কার কাছে!

এরপর কিছু বলতে বাধলো। ভেতর থেকে একটা দশ টাকার নোট এনে ননীবাবুর হাতে দিয়ে বললাম, হঠাৎ টাকার প্রয়োজন পড়লো যে?

ননীবাবু বললেন, আরে মশাই ওই সুশান্তটার জন্যে। ওর ছেলের আবার অন্নপ্রাশন। কিছু একটা নিয়ে যেতে হয়, শুধু হাতে তো যাওয়া যায় না।

বছর চল্লিশেক বয়স ননীবাবুর। রোগাটে চেহারা। পাতলা চুল। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। বললাম, সুশান্ত কে?

ননীবাবু বললেন, সে অনেক কথা মশাই। আপনার কি শুনবার সময় হবে? টিউশনিতে বেরুচ্ছেন বোধহয়। থাক্ আজ আর বিরক্ত করবো না।

বললাম, না না বিরক্ত আর কি। আপনি বলুন—নির্বিঘ্নে বলুন। আমার যথেষ্ট সময় আছে। আচ্ছা একটু দাঁড়ান—চায়ের ব্যবস্থা করে আসি, নইলে জমবে কেন।

ননীবাবু হাসলেন। বললেন, প্রস্তাবটা মন্দ বলেন নি। কিন্তু এখন কি গৃহিণীকে বিরক্ত করা সমীচীন হবে।

বোধহয় কথাটা অন্তরালবর্তিনীর কর্ণকুহরে প্রবেশ করে থাকবে—তাই শাড়ির খসখস আওয়াজ আর চুড়ির রিনিঝিনি শব্দ আমাদের সান্ত্বনা দিয়ে গেলো। বললাম, শুনলেন তো—আমাদের প্রস্তাবটা যে উনি সর্বান্তঃকরণে মেনে নিয়েছেন তারই জানান দিয়ে গেলেন।

ননীবাবু হো হো করে হাসলেন। তারপর অনেকক্ষণ পরে বললেন, তাহলে গোড়া থেকেই বলি। বৈঠকখানা রোডে তখন একটা সস্তার মেসে থেকে পড়াশুনা করি। গ্রামের ছেলে, পয়সার জোর নেই। আর তাছাড়া তখন সবেমাত্র ইউনির্ভাসিটিতে ঢুকেছি, অনেক টাকা পয়সা খরচ হয়ে গেছে। হাতে একটি কপর্দকও নেই। বাড়িতে চিঠি লিখে যে টাকা আনিয়ে নেবো তারও উপায় নেই। জানিতো বাড়ির অবস্থা। গাঁয়ে একটা মুদিখানা দোকান চলে কি চলে না। তবু তারই আয়ে তিনিটি প্রাণীর ভরণ-পোষণ করতে হয়। তার উপর যদি আবার ছেলেকে পড়ার খরচ পাঠাতে হয় তাহলেই হয়েছে। সুতরাং ডাঃ খরকে বলে রেখেছিলাম। একদিন ক্লাশ থেকে বেরুতেই

ডাঃ ধর বললেন, এই যে শোন তুমি, একটা টিউশনির কথা বলেছিলে না ?

বললাম, হ্যাঁ স্যার—পেলে খুব ভালো হয়। বুঝতেই তো পারছেন অবস্থা।

ধর বললেন, আছে একটা করবে? আশি টাকা দেবে। সপ্তাহে দুদিন পড়াবে।

বললাম, কোন ক্লাশের স্যার ?

—ইণ্টারমিডিয়েট।

বলবো কি মশাই হাতে যেন স্বর্গ পেলাম। আজকের বাজারের তুলনায় টাকাটা কীই বা এমন! তবু কমই বা কি? তখনকার বাজারে আশিটা টাকা কি কম হলো। পনেরো টাকা মন চাল। কুড়ি টাকায় তখন দিব্যি মেসে এবেলা ওবেলায় জলখাবার পাওয়া যায়। আর ত্রিশ টাকায় তো একেবারে রাজকীয় ব্যাপার।

ডাঃ ধর বললেন, তবে তুমি ওবেলায় আমার সঙ্গে দেখা করো। তোমাকে আমি নিজেই নিয়ে যাবো।

গেলাম সন্ধ্যাবেলায়। এস্প্ল্যানেডে বিরাট বাড়ি, গাড়ি, ফোন। লাখপতি আর কি! যেতে যেতেই তো দারোয়ান দেখিয়ে দিলো। বসে আছি তো বসেই আছি। কারও পাত্তা নেই। অনেকক্ষণ পরে সুবোধ মিত্র নামলেন।

ডাঃ ধর বললেন, এই যে আপনাকে যার কথা বলছিলাম এই আমার সেই এফিসিয়েণ্ট ছাত্র ননী বোস।

সুবোধ মিত্র আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বললেন, কিন্তু একি পারবে, একেবারে যে ছোকরা।

ডাঃ ধর বললেন, না না আপনি কিছু ভাববেন না, ও ঠিক পারবে। আমি খুব ভালভাবে জানি ননীকে।

সুবোধ মিত্র আর কিছু বললেন না। চুপ করে থাকলেন।

কিন্তু মশাই বলবো কি—প্রথম দিন পড়াতে গিয়েই বাধা পেলাম। পড়াবো কাকে? চাকর তো ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে গেলো। বসে আছি তো বসেই আছি—ছাত্রের দেখা নেই। কাকস্য পরিবেদনা। এক সময় তো ছাত্র ঢুকলো। অর্থাৎ সুশান্ত ঢুকলো। বই পত্র নয়—হকি ষ্টিক দোলাতে দোলাতে। ভড়কে গেলাম।

সুশান্ত বললো, এই দেখুন আপনি বসে আছেন তো। আজকে আর পড়বো না মাষ্টার মশাই। এই খেলার সিজিনে আর পড়াশুনা হবে না। শুধু শুধু আপনাকে কষ্ট দিলাম। আপনি বরং কাল আসবেন মাষ্টারমশাই।

কীই আর বলবো। বলবার কিছুই নেই। তবু উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, আচ্ছা বেশ কালকেই আসবো। কিন্তু কালকে আবার যেন এমনি ভাবে বসে থাকতে না হয়।

বোধ হয় কথাটায় সুশান্ত একটু লজ্জা পেলো। বললো, কি যে বলেন মাষ্টার মশাই। কালকে আমি সকাল সকাল মাঠ থেকে ফিরে আসবো। এসে দেখবেন আমি ঠিক পড়তে বসেছি।

বয়স আর কতই হবে সুশান্তর। হয়তো বাইশ তেইশ। কিন্তু দেখলে মনে হয় যেন আঠাশ উনত্রিশ। একটা জৌলুস আছে চেহারায়। শুধু জৌলুস কেন, বেশ পুরুষ পুরুষ বলিষ্ঠ চেহারা, দেখলে শ্রদ্ধার চেয়ে ভয়ই হয় বেশী। একটু হিংসাও। বড়লোকের ছেলে। যা হবার তাই হয়েছে—অধিক আদর যত্নে শরীরটাই বলিষ্ঠ হয়েছে, মগজের দিক দিয়ে একটুও বাড়েনি। ফলে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যে একটা নর্ম্যাল ষ্ট্যাণ্ডার্ড আছে বুদ্ধির, সেটুকু উৎরোতে পারেনি। বরং তার থেকে একটু পিছিয়েই রয়েছে। আর তাই পর পর দু বছর একই ক্লাশে ডিগবাজী খেয়েও উৎরোতে পারেনি। এর আগে যে সব টিউটর ছিলেন তাঁরা হয়তো তেমন কেয়ার নিয়ে পড়াননি, কিংবা সুশান্তই তাঁদের এড়িয়ে চলেছে। কিন্তু আমার তো তা নয়। পাশ না করাতে পারলে টিউশানি থাকবে না। আর টিউশানি না থাকা মানেই আবার সেই অগাধ জল। মেসের খরচ জুটবেনা, পড়ার খরচ জুটবে না।

পরদিন অবশ্য যথারীতি সুশান্ত পড়তেই বসেছিলো। কিন্তু পড়বে কি! মন পড়ে আছে মাঠে। যতবার মনোযোগ দিয়ে পড়াতে যাই, ততবারই সুশান্ত উসখুস করে। আর বারবার উঠে বাইরে যায়। বুঝতে পারি বাইরে উঠে যাবার অর্থ কি? বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যে সব গুণগুলো এসে জোটে, তার একটা গুণ এসে জুটেছে সুশান্তর অর্থাৎ সুশান্ত সিগারেট খেতে শিখেছে।

বাইরে থেকে ঘুরে আসতেই বললাম, দেখো হে, বারবার উঠে গেলে তোমারও ক্ষতি হয় আমারও পড়াবার

এনার্জি থাকে না। বরং এক কাজ করো আমার সামনেই তুমি সিগারেট খাও। এতে আমি কিছু মনে করবো না।

সুশান্ত লজ্জা পেলো। আমি যে এমন প্রস্তাব করতে পারি সুশান্ত হয়তো ভাবতে পারেনি। লজ্জায় মুখ নীচু করে বললো, কি যে বলেন—

বললাম, না না লজ্জার কিছু নেই। এতে তোমার উপকারই হবে। আর তাছাড়া ছেলে বড়ো হলে যেমন বাপের বন্ধু হয় তেমনি শিক্ষকেরও।

সুশান্তর মুখ এবার উজ্জ্বল হলো। হাসি ফুটলো। বললো, সত্যি মাষ্টারমশাই খাবেন? নিয়ে আসবো?

বললাম, আনো।

সুশান্ত ছুটে গিয়ে একটিন সিগারেট এনে টেবিলের উপর নামিয়ে রাখলো। আমার দিকে একটা এগিয়ে দিয়ে বললো, নিন্ ধরুন মাষ্টারমশাই। তারপর নিজেও একটা ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লো।

বলবো কি মশাই, সেইদিন থেকে আমি প্রথম সিগারেট খেতে শুরু করলাম। প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা হতো। খুব কাশতাম। তারপর ধাতস্থ হয়ে গিয়েছিলো। আর সুশান্তও সেদিন থেকে আমার সামনেই খেতে শুরু করলো। কথায় বলে না, গরু পুষতে হলে গরুর সঙ্গে গরু হতে হয়। এও একরকম তাই। ছাত্র ঠ্যাঙ্গানো একরকম গরু পোষাই। আর বিশেষ করে সে ছাত্র যদি গরুর মতো গরু হয়।

হ্যাঁ এর মধ্যে আবার একটা অঘটন ঘটে গেলো। বাড়ি থেকে এক লম্বা চিঠি: মার সিরিয়াস অসুখ। অতএব পত্রপাঠ যাওয়া প্রয়োজন। কি করি—মহা-ফ্যাসাদে পড়লাম। হাতে একটা পয়সা নেই। আবার টিউশনির টাকাও চাওয়া যায় না। মাত্র দিন দশেক পড়িয়েছি—সুতরাং একটা চক্ষু লজ্জা আছে। অবশেষে বন্ধু বান্ধবের কাছে ধার-ধুর করে ছুটলাম। সুশান্তকে একটা খবর পর্য্যন্ত দিতে পারলাম না।

গিয়ে দেখি এলাহি কাণ্ড। মা মরমর। বাঁচে কি বাঁচে না—টাইফয়েড্। বাবা বুড়ো মানুষ, নিজেই চোখে দেখতে পান না—তারপর মার এই অবস্থায় একেবারে ভেঙ্গে পড়েছেন। কি করি মাকে নিয়ে, ছুটলাম শহর হাসপাতালে। দেড়মাস যমে মানুষে টানাটানি হলো। অনেক টাকা পয়সা খরচ হলো। তারপর একটা ছোট ভাইও আছে। সুতরাং তাঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে আর গ্রামে ফেলে রাখতে ইচ্ছা হলো না। মাস তিনেকের মধ্যে একটা বাসা ঠিক করে ওদের সবাইকে নিয়ে যাবো, এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে কলকাতায় ফিরে এলাম।

কিন্তু এসেই বা হলো কি! টিউশনিটা গেছেই। আর তাছাড়া পড়াশুনাও হবে না। প্রাণে যদি বাঁচতে হয় তবে আগে একটা চাকরীর দরকার। যে কোন রকমের একটা চাকরী। নইলে এতগুলো প্রাণ কলকাতায় এনে কি—না খাইয়ে মারবো। সুতরাং চাকরীর খোঁজ করতে লাগলাম। কিন্তু বলবো কি মশাই চাকরী তো দূরের কথা দরজায় দরজায় কপাল ঠুকে কপালই ফুললো—তাতে ফল কিছু ফললো না। এদিকে মহা চিন্তায় পড়েছি। ডাঃ ধরকে গিয়ে যে সমস্ত অবস্থার কথা বলবো তারও উপায় নেই। ডাঃ ধর ট্রান্সফার হয়ে গিয়েছেন দিল্লী। আবার বন্ধু বান্ধবের কাছে যে হাত পাতবো তাতেও লজ্জা করে। বলবো কি মশাই, সে সব দিনগুলোর কথা চিন্তা করলে আজ সত্যিই ভয় করে।

তা যাক্। নিজের ঘরে একদিন শুয়ে আছি, মেসের চাকরটা এসে খবর দিলো একজন বাবু ডাকছেন। বললাম, উপরেই নিয়ে আয় না তাকে!

চাকর চলে গেলো।

কিছুক্ষণ পরে সুশান্তকে ঘরে ঢুকতে দেখে চমকে উঠলাম, একি সুশান্ত তুমি?

সুশান্ত বললো, উঃ আপনাকে কত খুঁজেছি জানেন মাষ্টারমশাই। এই মেসেও একদিন এসে ঘুরে গিয়েছি। কিন্তু কেউ বলতে পারেনি।

বললাম—সেকি! কিন্তু আমাকে তো এখানে সবাই চেনে—

সুশান্ত বললো, কিন্তু চিনলো আর কই। বলেছিলাম মাষ্টারমশাই আছেন? কিন্তু কেউ বলতে পারলো না।

বুদ্ধির বহর দেখে এবার হাসি পেলো। মাষ্টারমশাই আছেন বললে কি কেউ কাউকে চিনতে পারে! এখানে কি একজন মাষ্টারমশাই থাকেন। কলেজের মাষ্টার, স্কুলের মাষ্টার, আবার প্রাইভেট মাষ্টারও থাকেন।

সুতরাং কোন মাষ্টারমশাইয়ের খোঁজে এসেছে সুশান্ত? নাম বলতে না পারলে কি কেউ কাউকে চিনতে পারে!

সুশান্ত বললো, তা যাক্ যে জন্যে এসেছি। মেট্রোয় একটা ভালো ইংরাজী বই হচ্ছে, যাবেন মাষ্টারমশাই? চলুন যাই—

মুহূর্তে মুখ আমার কালো হয়ে গেলো। কি করে বোঝাবো সুশান্তকে আমার সমস্যা কোথায়? এখন আনন্দ আর ফুর্ত্তি করবার সময় নয়। আমাকে বাঁচতে হলে আর কিছু নয়, সামান্য একটা চাকরীর প্রয়োজন।

বললাম, তুমি যাও সুশান্ত। শরীরটা আমার দুদিন থেকে খারাপ যাচ্ছে। কিছু মনে কোরনা।

সুশান্ত কিছু না বলে দরজা পর্য্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে এলো। বললো, এই দেখুন, আপনাকে আসল কথাটাই বলা হলো না। আপনি আর যান না কেন মাষ্টারমশাই? কালকে যাবেন আমি আবার পড়বো। এখন তো আর সিজিন টিজিন নেই, আমি এবার মন দিয়ে পড়বো। বলে সুশান্ত দুমাসের একশ ষাটটি টাকা টেবিলের উপর নামিয়ে রাখতেই আমি যেন হাতে স্বর্গ পেলাম। বলবো কি মশাই, আনন্দে আত্মহারা হয়ে তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে বললাম, একটু দাঁড়াও।

সুশান্ত বেরিয়ে যাচ্ছিলো ঘুরে দাঁড়ালো। বললো, কিছু বলছেন মাষ্টারমশাই?

বললাম, হ্যাঁ তুমি মেট্রোয় যাবে বলছিলে না, দাঁড়াও আমিও যাবো।

—আপনি যাবেন!

—হ্যাঁ।

সুশান্ত আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলো। বোধহয় কিছু বুঝে উঠতে পারছিলো না। হঠাৎ আমার এমন আত্মহারা হয়ে উঠবার কারণটা কি!

আমি পাঞ্জাবী গায়ে চড়িয়ে রাস্তায় এসে একটা ট্যাক্সি নিলাম। সুশান্ত বাধা দিতে চাইলো। কিন্তু ওর আপত্তি টিকলো না। আমার পকেটে তখন কড়কড়ে একশ' ষাটটি টাকা। কে বলবে যে দুদিন আগেও সামান্য কয়টি টাকার জন্যে বন্ধুবান্ধবের দোরে দোরে ঘুরে বেড়িয়েছি!

কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে আসতেই সুশান্ত ট্যাক্সী থামালো। বললো, আপনি একটু বসুন মাষ্টার মশাই, আমি এক্ষুণি ঘুরে আসছি।

সুশান্ত চলে গেলো। আমি বসে আছি। মিনিট পাঁচেকও হয়নি। একটি মেয়েকে সাথে করে সুশান্ত এগিয়ে এলো। বললো, মাষ্টার মশাই, আপনি একটু নেমে আসুন।

—নামবো?

সুশান্ত বললো, হ্যাঁ নেমে আসুন একটু।

নামতেই মেয়েটি পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো। তা কতই বা বয়স মেয়েটির। সতেরো আঠারো। ছিপছিপে লম্বা। গায়ের রঙ উজ্জ্বল গৌর না হলেও ফর্সাই বলা চলে। দিব্যি টানা টানা চোখ। পাতলা ঠোঁট। মুখের গড়নটুকু ভারি মিষ্টি। দেখে মনে হয় বড়লোকের কোন আদুরী দুলালী নয়, বরং মধ্যবিত্ত ঘরের গৃহস্থ মেয়ে।

বললাম, কে?

সুশান্ত বললো, আমরা একই ক্লাশে পড়ি মাষ্টার মশাই। এর নাম ফুল্লরা বসু।

মুখে বললাম, ভালো।

কিন্তু মন প্রসন্ন হতে পারলো না। পারবে কেমন করে? আমি তো এতটা আশা করিনি। কেঁচো খুঁড়তে সাপ উঠবে। আর তাছাড়া বুঝতেই তো পারছেন সুশান্তর একটা গুণই নয়, আরও গুণ আছে। পড়াশুনার দিক দিয়ে যথারীতি এগুতে না পারলেও সুশান্ত আর আর দিক দিয়ে পিছিয়ে নেই।

তা যাক্ আর বেশী গুণের কথা বলবো না। গুণ তো ওর শুধু একটাই নয় হাজারটা। আর তা বলতে গেলে সারাদিন সারারাতেও কুলোবে না। শুধু একটা ঘটনার কথা বলি। দিন তিনেক বাদে একদিন পড়াতে গিয়েছি। দেখি সুশান্ত খুব মনোযোগ দিয়ে কি একটা পড়ছে। আশ্চর্য হলাম। এমনটা তো কোনদিন দেখিনি। যাকে সন্ধ্যার পর সাধারণতঃ পাওয়াই যায় না, তাকে এমন মনোযোগ দিয়ে পড়তে দেখাটা আশ্চর্য বৈকি!

বললাম, কি পড়ছো ওটা?

সুশান্ত একটু থতমত খেলো। বললো, লজিক।

আমার কেমন সন্দেহ হলো। বললাম, কই দেখি কোন চ্যাপ্‌টারটা পড়ছো।

সুশান্ত এবার একটু গাঁইগুঁই করতে লাগলো, ও কিছু নয়, ও কিছু নয় মাষ্টার মশাই।

আমার কিন্তু ততক্ষণে জিদ চেপে গিয়েছে। না দেখে ছাড়বো না। সুশান্ত পড়তে পারে আর আমি মাষ্টার হয়ে দেখতে পারি না এমন কি গোপনীয় জিনিষ। বললাম, দাও, বলছি আমার হাতে দাও।

সুশান্ত এবার কাঁচুমাচু হয়ে বইটা হাতে দিতেই সাপও বেরুলো না কেঁচোও বেরুলো না। বেরুলো একটা ফটো। শ্রীমতীর। অর্থাৎ ফুল্লরার বিশেষ ভঙ্গিমার একটা ছবি। শ্রীমান এতক্ষণ ধরে সেইটেই নিরীক্ষণ করছিলো। খুব মনোযোগ দিয়ে তার রসাস্বাদ করছিলো। কি বলবো বলুন। কিছুই বলতে পারলাম না। চুপ করে থাকলাম। মন বিষিয়ে গেলো। ওদের সমাজকেই দোষারোপ করতে লাগলাম। বাবা কখনও ছেলের খোঁজ খবর নেন না। নিজের ব্যবসা নিয়েই মেতে আছেন। আর মা আজ ষোল বছর আগে মারা গেছেন, সুতরাং তাঁর কথা স্বতন্ত্র। অধিক আদরে যত্নে লালিত হলে যা হয় তাই হয়েছে সুশান্ত। আর তা ছাড়া বয়স হয়েছে, কিছু বলাটাও শোভন নয়।

বললাম, এটা কোথায় পেলে?

সুশান্ত বললো, ওই দিয়েছে।

বললাম, হঠাৎ দিতে গেল যে?

সুশান্ত বললো, হঠাৎ নয় মাষ্টার মশাই। ওর জন্মদিনে ওটা আমাকে প্রেজেণ্ট করেছে।

চুপ করে থাকলাম। অনেকক্ষণ কোন কথাই বলতে পারলাম না। আর তাছাড়া এ নিয়ে মাতামাতি করতে বাধলো। শালীনতায় বাধলো।

বললাম, ওকে একবার আমার কাছে নিয়ে আসতে পারো?

সুশান্ত লাফিয়ে উঠলো। বললো, পারবো না কেন, নিশ্চয়ই পারবো। ওকে নিয়ে আসবো মাষ্টার মশাই?

বললাম, আজ নয়। কালকে একবার নিয়ে এসো আমার কাছে।

পরদিন যথারীতি সুশান্ত এনে হাজির করলো ফুল্লরাকে। বললাম, তোমার সাথে একটু কথা আছে মা, বসো!

ফুল্লরা আমার দিকে অবাক হয়ে তাকালো। আমার মা ডাকটা শুনে একটু আশ্চর্যই হলো। তখন কতই বা বয়স আমার। বড়োজোর ত্রিশ। অথচ চেহারায় তো সুশান্তের চেয়ে ছোটই দেখায় আমাকে। তাই আমার মুখে মা ডাকটা যেন বরদাস্ত হলো না ফুল্লরার।

সুশান্তকে বললাম, সুশান্ত তুমি একটু পাশের ঘরে যাও তো, এর সঙ্গে গুটিকয় কথা আছে।

সুশান্ত পাশের ঘরে চলে গেলে চশমার কাচটা মুছে পরিষ্কার করে নিলাম। তারপর সোজাসুজি তাকিয়ে বললাম, তুমি কি ওর ভালো চাও?

এ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলো না ফুল্লরা। আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বললো, এ আপনি কি বলছেন!

বললাম, বলছি তুমি কি ওর ভালো চাও? ও জীবনে উন্নতি করুক, প্রতিষ্ঠিত হোক, লেখাপড়া শিখুক, একি তুমি চাও?

ফুল্লরার মুখে এবার হাসি ফুটলো। বললো, এতো সবাই চায়।

বললাম, হ্যাঁ সবাই চায় বলেই আমিও আশা করছি তুমিও চাও। আর তা চাইতে হলে কি করতে হয় জানো?

ফুল্লরা চোখ তুলে তাকালো। বললো, কি?

বললাম, তোমাকে ওর কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে হবে মা। অন্ততঃ সুশান্তের মুখের দিকে তাকিয়ে তোমাকে এ কাজটুকু করতেই হবে। এতে তোমারও ভালো হবে, ওর-ও ভালো হবে। ও অবুঝ কিন্তু তুমি তো অবুঝ নও মা। তাই তোমাকে বলছি, এ প্রতিশ্রুতিটুকু তুমি আমাকে দাও। অন্ততঃ এ সময়টুকু তুমি ওর কাছ থেকে দূরে সরে থাকবে।

ফুল্লরা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলো। তারপর বললো, আচ্ছা মাষ্টারমশাই সে প্রতিশ্রুতিটুকু দিলাম। যথাসাধ্য সে প্রতিশ্রুতি রাখবার চেষ্টা করবো।

আজ বলতে লজ্জা করে কিন্তু সেদিন আমি নিজের স্বার্থকেই বড়ো করে দেখেছিলাম। জানতাম সুশান্ত পাশ

না করতে পারলে আমার টিউশানি থাকবে না। আর টিউশানি না থাকা মানেই সেই বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হওয়া। কিন্তু সেদিন বুঝতে পারিনি মশাই—যে এর ফল হিতে বিপরীত হবে। হলোও তাই। সুশান্ত খায় না, দায়না, পড়াশুনা করে না, মনমরা হয়ে পড়ে থাকে। কি ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারলাম না। অথচ এদিকে পরীক্ষা এগিয়ে আসছে। মহা সমস্যায় পড়লাম। একদিন ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে তোমার বলো তো ?

সুশান্ত বলতে চায় না। বললো, কই কিছু না।

কিন্তু আমিও নাছোড়বান্দা। একটু চাপ দিতেই সব বেরিয়ে পড়লো। সাবধান করে দেবার পর থেকে নাকি ফুল্লরা আর সুশান্তকে আমলই দেয় না। সব সময় এড়িয়ে এড়িয়ে চলে। কলেজে দেখা হলে কথা বলে না। যেন সুশান্ত ফুল্লরার দুচোখের বিষ হয়ে গিয়েছে। সব সময় একটা দুর্ভেদ্য প্রাচীর খাড়া করে রেখেছে। সে প্রাচীর ভেদ করে সুশান্ত এগুতে পারে না। তা সত্বেও সুশান্ত বেহায়ার মতো ফুল্লরার বাড়িতে ধাওয়া করেছিলো। কিন্তু ফুল্লরা নিজেই তাকে দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে।

সব শুনে দুঃখ হলো। চুপ করে থাকলাম। ভাবতেই পারিনি যে ফুল্লরা এতখানি নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পারবে। এতখানি ডাইরেক্ট এ্যাক্শান নেবে। অথচ সমস্ত কিছুর মূলে তো আমি। আমার প্ররোচনাতেই তো সব কিছু ঘটেছে। কি বলে এখন সুশান্তকে সান্ত্বনা দেব!

বললাম, তুমি একবার ফুল্লরাকে ডেকে আনতে পারো ?

সুশান্ত মুখ নিচু করে বললো, কিন্তু ও যে আমাকে একেবারেই আমল দেয় না মাষ্টারমশাই।

বললাম, তুমি শুধু একবার বলো যে মাষ্টারমশাই ডেকেছেন।

সুশান্ত বললো, আচ্ছা বলবো।

পরদিন কিন্তু সত্যি সত্যিই ফুল্লরাকে হাজির করলো। আর বলবো কি মশাই, সেদিন থেকে যেন আমারও দায়িত্ব ফুরিয়ে গেলো। যতক্ষণ সুশান্ত পড়তো ততক্ষণ ফুল্লরা সামনে বসে থাকতো। ধমকে ধমকে পড়াতো। কিছু গাফিলতি দেখলেই চোখ রাঙাতো। আর আমি নির্বাক দর্শক হয়ে থাকতাম। কিছু করতে হতো না আমাকে যা কিছু করবার সমস্তই করতো ফুল্লরা। সমস্ত ক্ষমতা যেন ফুল্লরা কেড়ে নিয়েছিলো। মাঝে মাঝে অনুযোগ করতো, দেখুন তো মাষ্টারমশাই—এ রকম পড়াশুনা করলে ওকি পাশ করতে পারবে ?

আমি ধমকাতাম।

সুশান্ত বলতো, আমার দ্বারা হবে না মাষ্টারমশাই। আমি পাশ করতে পারবো না। আপনি বরং ফুলুকে ভাল করে দেখিয়ে দিন ওই আপনার মুখ রাখবে।

শুনে শুনে রাগ হতো। সারা শরীর জ্বলে যেত। ধমকাতাম, বকতাম। কিন্তু কোন ফল হতো না।

তারপর যথারীতি মহেন্দ্রক্ষণ এগিয়ে এলো। দু'জনেই ফি দাখিল করলো। একজনের সিট পড়লো কালীঘাট উইমেন্স কলেজে, আর একজনের বঙ্গবাসীতে। তবু যথাসাধ্য দুজনের প্রস্তুত করিয়ে দিলাম। ফুল্লরাকে নিয়ে ভয় ছিলো না। ভয় ছিলো সুশান্তকে নিয়ে। ভালো করে পড়াশুনা করেনি। যাও বা পড়ে তাও ভুলে যায়। কিছু মনে রাখতে পারেনা। আর ভয় সেখানেই—জানা প্রশ্ন পড়লেও লিখতে পারবে না।

আমাকে প্রণাম করে দুজনেই গেল পরীক্ষা দিতে। বিকেলবেলায় আশায় আশায় গেলাম। সুশান্ত কি করছে! কিন্তু বলবো কি মশাই, সুশান্ত নেই। কি ব্যাপার ? খোঁজ নিয়ে জানলাম দু' ঘণ্টা আগে সুশান্ত বেরিয়ে গিয়েছে ক্লাশ থেকে। ছুটলাম কালীঘাটে। গিয়ে দেখি সুশান্ত সেখানে ট্যাক্সী নিয়ে হাজির। মুহূর্তে কান মাথা আমার গরম হয়ে উঠলো। মাথার মধ্যে ঝিম-ঝিম করতে লাগলো। মনে হলো ছুটে গিয়ে ঐ অবাধ্য ছেলেটাকে গোটা দুই ঠাশ ঠাশ করে চড় কষিয়ে দিই। উপযুক্ত শিক্ষা হোক ছেলেটার।

কিন্তু কিছুই করতে পারলাম না। নিজেকে সংযত করে নিয়ে বললাম, তুমি এখানে যে ?

সুশান্ত বললো, ফুল্লরার জন্যে অপেক্ষা করছি মাষ্টার-মশাই। আমার হবে না, আমি পাশ করতে পারবো না।

মুহূর্তে আমার সর্বশরীর রী রী করে জ্বলে গেলো। হয়তো কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু তখনই ঘণ্টা বেজে উঠলো। আর ফুল্লরা দেখি হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসছে।

বললাম, কেমন হলো পরীক্ষা ?

ফুল্লরা বললো, ভালো মাষ্টার মশাই।

দু'জনের উত্তর মিলিয়ে দেখলাম। ফুল্লরা ভালভাবেই পাশ করবে। ফার্ষ্ট ডিভিশনে না যাক্ সেকেণ্ড ডিভিশনে তো যাবেই। আর ফেল্ করবে সুশান্ত। উঁহু ফেল করবে। আড়াইটে প্রশ্নর উত্তর লিখেছে তাতে পাশ করবার কোন সম্ভাবনাই নেই।

সুশান্তর দিকে তাকিয়ে এবার আমারই লজ্জা হলো, দুঃখ হলো। ছি ছি এতদিন যা পড়িয়েছি তা সবই পণ্ডশ্রম হলো। কোন কাজেই তা লাগলো না। বলবো কি মশাই ঘৃণায় আর বিরক্তিতে চুপ করে থেকেছি। সারা পথ একটি কথাও বলিনি।

এরপর মাস তিনেক পরে ওরা হঠাৎ একদিন আমার মেসে এসে হাজির।

—কি ব্যাপার ?

সুশান্ত প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালো। বললো, মাষ্টার মশাই আমরা পাশ করেছি। ও ফার্ষ্ট ডিভিশনে গিয়েছে, আর আমি কোন রকমে কানের পাশ দিয়ে উৎরে গেছি।

হাসলাম। বললাম, যাক্ তবু বাঁচিয়েছো। আমি তো আশাই করতে পারিনি তুমি পাশ করবে !

সুশান্ত বললো, আমিও আশা করতে পারিনি মাষ্টার-মশাই। তা যাক্ আপনি পরশু দিন যাবেন—আমাদের বিয়ে। অবশ্য অবশ্য যাবেন মাষ্টারমশাই। না গেলে খুব দুঃখ পাবো।

সুশান্ত একখানা কার্ড এগিয়ে দিলো। সোনার জলে কোণাকুণি ভাবে লেখা 'শুভবিবাহ'। আর উপরে একটা রঙিণ প্রজাপতির ছবি।

সত্যি বলতে কি মশাই, সেদিন আমি ওদের বিয়ের মাঝে গিয়ে দাঁড়াতে পারিনি। অন্তর থেকে সায় পাইনি। কি করে যাবো ! সে বিয়েতে একজনের বিরাট ত্যাগ ছাড়া আর কি দেখতে পেতাম সেদিন।

কিন্তু ওরা আবার ছ' বছর পরে কালকে এসেছিলো। ভারি সুন্দর ফুটফুটে একটা ছেলে হয়েছে মশাই ওদের। বারবার করে অনুরোধ করে গিয়েছে ছেলেটির অন্নপ্রাশনে যেন অবশ্য অবশ্য যাই। জানি এবার না গেলে ওরা সত্যি সত্যিই খুব দুঃখ পাবে।

কাহিনী শেষ করে ননীবাবু উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, ঐ দেখুন কথায় কথায় কত বেলা হয়ে গেছে। ছি ছি, আপনার বোধহয় আবার টিউশনির বেলা হয়ে গেলো।
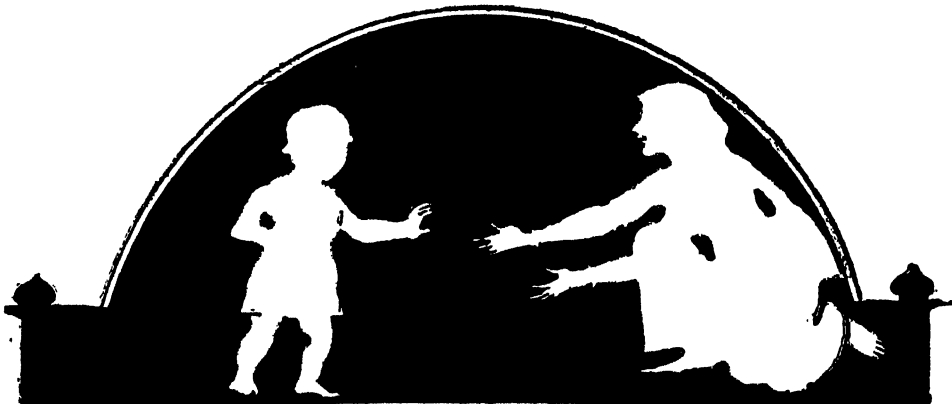
দক্ষিণ অ্যাং

শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

১৪

সকাল সাড়ে সাতটায় তিরুশিরাপ্‌পল্‌২লী জংশন স্টেশনের সামনে থেকে পুদুক্‌কোট্‌টৈ-এর বাস্ ছাড়লো। আমার উদ্দিষ্ট স্থান সিতন্নবা২সল্‌২। পুদুক্‌কোট্‌টৈ হয়ে যেতে হবে।

সাতাশ মাইল পথের দুধারে শুধুই তেঁতুলগাছ। প্রত্যিটি গাছে নম্বর দেওয়া। আবাদ করা তেঁতুলগাছ বলেই এই ব্যবস্থা বোধ হয়।

তেঁতুল দক্ষিণাপথের আহার্য প্রস্তুতিতে অপরিহার্য বস্তুটি অন্যতম ফসল হিসাবে পরিগণিত। শেয়ার বাজারের দর উঠা নামার খবরের মত, পুলি২র দৈনিক দামের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

শুধু পুদুক্‌কোট্‌টৈ-এর পথেই নয়, সারা মাদ্রাজ প্রদেশেই মফঃস্বল অঞ্চলের প্রধান সড়কের দুপাশে দেখা যায় প্রচুর তেঁতুল গাছ। আর মাঠে তাল।

মাঠের মাটি বেশীর ভাগই লাল,—লোম্ জাতীয়। (Red loam soil)

দু'ঘণ্টা লাগলো পুদুক্‌কোট্‌টৈ পৌছতে।

এখান থেকে সিতন্নবা২সল্‌২ গামী বাস ধরতে হবে। প্রাইভেট্ বাস্ সার্ভিস্ আছে।

যদিও বাস্ সার্ভিস্-এর নাম, গন্তব্য স্থান ইত্যাদি তমিল্‌র্ ভাষাতেই লেখা, তবু চিনে নেওয়া অসম্ভব হলোনা। কারণ, বাস্-এর মাথায় তমিল্‌র্-এ লেখা কোম্পানীর নামের প্রথম অক্ষর দুটি ইংরেজী।

অনেক দোকানের সাইন্‌বোর্ডও ওই ভাবে লেখা হয়।

এই ধরণের মিশ্রিত লেখা বহিরাগতদের কাছে কৌতুককর হলেও ওর পিছনে একটা গূঢ় কারণ আছে।

তমিল্‌র্ ভাষায়, যদি লিখতে হয় টি, পি, অরুণাচলম্ তাহলে, সতর্ক লেখক লিখবেন T. P. অরুণাচলম্।

T. P. টা ইংরেজীতে না লিখলে অপরে হয়তো ঐ অংশটি D. P.,—T. B., বা D. B, পড়তে পারেন। কারণ, তমিল্‌র্ ভাষায় ট-এ হ্রস্বই ('টি') ও ড-এ হ্রস্বই ('ডি') একই অক্ষরে লেখা হয়। তেমনি, প-এ হ্রস্বই ও ব-এ হ্রস্বই লিখতে একই অক্ষর ব্যবহৃত হয়।

সংস্কৃতের তুলনায় তমিল্‌র্-এ প্রায় প্রতি বর্গেই অন্যূন তিনটি অক্ষরের অভাব দেখা যায়। ক হতে ঙ এই বর্গে খ, গ ও ঘ নেই। অনুরূপভাবে চ বর্গে ছ, জ ও ঝ,—ট বর্গে ঠ, ড ও ঢ,—ত বর্গে থ, দ, ধ,—প বর্গে ফ, ব, ভ এবং য বর্গে শ নেই। † ষ, স, হ এবং ড় নেই। দুটি 'ল'

† ষ, স, হ এবং জ হিসাবে চারটি অক্ষর আধুনিক তমিল্‌র্ লিপিতে প্রচলিত হয়েছে।

আছে যার মধ্যে একটি * ড় এর মত উচ্চারিত হয়। ঢ় নেই। একটি দ্বিতীয় * র আছে যার উচ্চারণ কর্কশ। অনেকটা র+হ-এর মিশ্রিত ধরনের। ং এবং ঁ নেই। হসন্ত-এর ব্যবহার ব্যাপক।

স্বরবর্ণ বিভাগে ঋ এবং ৯ নেই। 'এ' দুটি। একটির উচ্চারণ হ্রস্ব ও অপরটির দীর্ঘ। 'ও' অক্ষরটিও দুটি। ন দুটি। চ অক্ষরটি স্থান বিশেষে শ-এর স্থান অধিকার করে। একটি দুরূহ উচ্চারণ যুক্ত অক্ষর আছে, যার উচ্চারণ অনেকটা 'ল'-এর মত। বর্গীয় ব নেই। প্রয়োজন বোধে প অক্ষরটিই বর্গীয় ব-এর জন্য ব্যবহৃত হয়। উপরোক্ত বহু অক্ষরের তারতম্য হেতু তমিল্‌র্‌ ও সংস্কৃতোৎপন্ন ভাষা ভাষীদের মধ্যে একই শব্দের উচ্চারণে প্রভেদ ও বিভ্রাট ঘটে।

তমিল্‌র্‌ লিপিতে ক আছে কিন্তু গ নেই। তাই তমিল্‌র্‌ লিপিতে লিখিত কোপাল শব্দটিকে কি পড়তে হবে তা তমিল্‌র্‌ লিপি-জ্ঞান থাকলেও তমিল্‌র্‌ ভাষী ছাড়া অপরের পক্ষে বোঝা বিশেষ কষ্ট সাধ্য।

উক্ত কোপাল-এর উচ্চারণ হবে গোপাল।

তেমনি লেখায় যা ইমকিরি, আসলে তা হিমগিরি। লেখা হয় 'অরি' কিন্তু পড়তে হয় 'হরি'।

তমিল্‌র্‌ ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ভাষাটিতে যুক্ত অক্ষরের প্রয়োগ নেই।

পুদুক্‌কোট্টৈ হতে যাত্রার আধঘণ্টা পরে সিত্তন্নবাৎসল্‌-এর স্টপেজ-এ যখন বাস্‌ থেকে নামলাম তখন বেলা সাড়ে দশটা।

জনমানবহীন এক প্রান্তরে বাস্‌টা আমায় নামিয়ে দিয়ে ঝড়ের বেগে অদৃশ্য হয়ে গেলো। কণ্ডাক্টর ইশারায় দেখিয়ে দিয়ে গেলেন সিত্তন্নবাৎসল্‌ কোন্‌ দিকে।

দিনটা ছিলো মেঘলা।

একটু আগেই বেশ এক পসলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল।

বাস্‌-এর পথ ছেড়ে একটা সরু মেটে রাস্তা ধরে দূরের পাহাড়টার দিকে এগিয়ে চললাম। দুপাশে শুধু চাষের ক্ষেত,—লোকালয় নেই।

মিনিট কুড়ি বেশ জোর পায়ে হাঁটবার পর পাহাড়টার কাছে পৌছলাম। রাস্তার ওপরেই রয়েছে প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সতর্কীকরণ নোটিস বোর্ড। বুঝলাম ঠিক জায়গায়ই এসেছি।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সতর্কীকরণের নোটিস্‌ ছাড়া স্থানটির পরিচিতি বা ইতিহাস সম্বন্ধীয় কোনও কথাই লেখা নেই। কোথাও নামের একটা ফলক কিংবা কোনও সরকারী কর্মচারীও নেই। দ্রষ্টব্যগুলি কোন্‌দিকে তা বোঝাবার কোনও ব্যবস্থাই করা হয়নি।

যাই হোক, শোনা ছিল যে, এখানের পাহাড়ের গুহায় আছে অপরূপ কতকগুলি বহুবর্ণ প্রাচীর-চিত্র। সেই সূত্রের উপর নির্ভর করেই পাহাড়ে চড়তে লাগলাম!

কিছুটা ওঠার পরেই মাটি ও গাছপালার সংস্পর্শহীন পিছেল অখণ্ড শিলার জন্য পথ হয়ে উঠলো দারুণ বিপজ্জনক।

কোনও প্রকারে পাহাড়ের চূড়ায় পৌছে গুহার সন্ধানে অনেকক্ষণ ঘুরলাম।

ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে একটা পাথরের ওপর বসে পড়তেই দৃষ্টি পড়লো নীচের দিকে। পাহাড়ের সানুদেশ হতে যতদূর দেখা যাচ্ছে শুধু ক্ষেত আর ক্ষেত। বেশীর ভাগ ক্ষেতেরই ফসল কাটা হয়ে গেছে। তাই লোকজনের চিহ্ন নেই। পাহাড়টিতেও শুধু আমি একা।

উঠে একেবারে চূড়ায় গিয়ে দাঁড়ালাম। নীচের বিশাল ও আদিগন্ত বিস্তৃত সেই শূন্য পরিবেশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে পড়ে গেলো নির্জন দ্বীপে নির্বাসিত Alexander Selkirk এর উক্তি:

I am monarch of all I survey,

My right there is none to dispute ; সে এক অদ্ভুত অনুভূতিময় কয়েকটি মুহূর্ত!

ঘণ্টাখানেক বৃথাই ঘোরাঘুরি করে পাহাড় থেকে নামতে লাগলাম।

টিপ টিপ করে বৃষ্টি শুরু হলো।

প্রায় সমতলে পৌচেছি এমন সময় দেখতে পেলায় কে একজন লাঠি হাতে ছুটে আসছে। ভয় হলো।

এই লোকালয়বর্জিত স্থানে, বিশেষ করে যেখানে

---

* এই রচনার সর্বত্র দ্বিতীয় 'ল' দ্বিতীয় 'র' ও অন্ত্যস্থ ধ' বুঝাতে ল২, র২ এবং ব২ লেখা হয়েছে।

আমার ভাষা কেউ বুঝবে না সেখানে, ঐ লোকটি দুর্বৃত্ত হলে তো আত্মরক্ষার কোনও উপায়ই নেই!

আমি সমতলে পৌছতেই লোকটি সামনে এসে দাঁড়ালো। আমার আপাদ মস্তক দেখে নিয়ে যা জিজ্ঞাসা করলো তার কিছুই বুঝতে পারলাম না।

বাস্-এর ড্রাইভার বোধহয় তাকে বলে গেছেন যে, একজন যাত্রীকে তিনি সিত্তন্নবাসল্-এ নামিয়ে এসেছেন।

লোকটিকে প্রশ্ন করলাম: চিত্তিরম্ এঙ্গে? ছবি কোথায় আছে?

: চিত্তিরম্-আ?—ছবি? লোকটি জানতে চাইলো।

বললাম: আম্।—হ্যাঁ।

সে ডান হাতের তালুটা চিত করে আমার সামনে ধরে হাসতে লাগলো।

দু আনা দিলাম। তাতে তার সন্তুষ্টি হলো না।

বললো: আর আনা কোড়ু। ছ' আনা দাও।

আরও দু আনা দিলাম।

সে, চেঁচিয়ে উঠলো: ইল্লে'ল্লে, আর্'না। অর্থাৎ হবে না হবে না, ছ' আনাই চাই।

অগত্যা তাই দিতে হলো।

পয়সাগুলি গুণে পকেটে ফেলে বললো: বাং শেট্টি। এসো শেঠ।

উত্তরাঞ্চলের আগন্তুকদের সম্বন্ধে দক্ষিণ ভারতের নিম্নবিত্ত জনসাধারণের ধারণা যে, তারা সবাই * শেট্টি অর্থাৎ শেঠ।

প্রায় তিন ফার্লঙ্ হাঁটবার পর একটা ঘর দেখা গেলো। তারই অদূরে একটা সিঁড়ি উঠে গেছে পাহাড়ের গায়ে, বেশ উঁচুতে অবস্থিত একটা তারের জাল দেওয়া বন্ধ দরজা পর্যন্ত। বুঝলাম ঐটিই আমার ঈপ্সিত গুহার প্রবেশ পথ। সমতলের ঘরটিতে থাকে সরকারী প্রতিহারী।

আমার সঙ্গীটি প্রতিহারীকে ডেকে আনলো। দুজনের মধ্যে কিছুক্ষণ কথাবার্তা হলো। দর্শকের কাছ থেকে আদায় উসুল কেমন হবে সেই বিষয়েই বোধহয়। তারপর চাবি নিয়ে দুজনেই চললো আমার সঙ্গে।

গুহার দরজা খুলে দিতেই চোখের সামনে উন্মুক্ত হলো যেন দ্বিতীয় অজন্তা!

সারা গুহার দেওয়াল, ছাদ ও স্তম্ভে অপূর্ব চিত্রাবলী আর পাথরের গায়ে উৎকীর্ণ দুইজন তীর্থঙ্কর এবং কয়েক জন অর্হৎ-এর মূর্তি।

পল্লবরাজ প্রথম মহেন্দ্র বর্মণের রাজত্বকালে (৬৪০-৬৭০ খৃ: অ:) এগুলি রচিত হয়েছিলো। মহেন্দ্র প্রথম জীবনে জৈন ধর্মাবলম্বী ছিলেন। পরবর্তী কালে শৈব হন। গুহাটি প্রকৃত পক্ষে একটি জৈন মন্দির। নাম অরহিবর্ কোয়িল্ অর্থাৎ অর্হৎ এর মন্দির।

পাণ্ডিয়রাজ অবনী শেখর শ্রীবল্লভ খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রথম দিকে গুহার পুরোভাগে একটি মণ্ডপ সংযোজন করেছিলেন। বর্তমানে সেই মণ্ডপটির ভিত্তি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

বিশেষজ্ঞদের মতে অঙ্কনগুলির রচনায় Fresco-secco রীতি অনুসৃত হয়েছিল। উক্ত রীতিতে, পাথরের উপর চুণের প্রলেপ দিয়ে তার উপর হয়েছে অঙ্কনগুলির সৃষ্টি।

দক্ষিণ ভারতের অনেক মন্দিরেই রঙীণ প্রাচীর চিত্রণ থাকলেও এ ধরণের সূক্ষ্ম অঙ্কন আর কোথাও নেই। উত্তর ভারতেও বাগ গুহা এবং অজন্তা ছাড়া সিত্তন্নবাসল্-এর সঙ্গে তুলনা করার মত চিত্রাবলী আর কোথাও দেখিনি।

অঙ্কনে লাল, হলুদ, কমলা, সবুজ, নীলাভ সবুজ, পাঁশুটে, সাদা ও কাল রঙ ব্যবহৃত হয়েছে। রঙগুলি খনিজ পদার্থ হতে প্রস্তুত। সরকারী পরীক্ষায় এই তথ্য সমর্থিত।

গুহার ছাদটিতে চিত্রিত হয়েছে জল, পদ্মপাতা, পদ্মফুল ও কুঁড়ি, হাঁস, মাছ ও হাতীর প্রতিকৃতি। স্তম্ভগুলির একটিতে আছে রাজা মহেন্দ্র ও তাঁর স্ত্রীর ছবি। অপরটিতে এক অপরূপ সুললিত দেহ-বল্লরী-সম্পন্না অপ্সরা। তার বাম-বাহুটি গজহস্ত ভঙ্গীতে লতায়িত। দক্ষিণ-পাণিতে অভয়-মুদ্রা।

দুঃখের বিষয়, মাত্র একটি গুহাই অবশিষ্ট। যদি

---

* কথাটি সংস্কৃত শ্রেষ্ঠী শব্দের সমার্থবোধক।

একটি প্রাচীর চিত্রণ—সিতন্ন বাসল্

একাধিক এরূপ গুহা থাকতো তো নিঃসন্দেহে জগৎ-সমক্ষে সিতন্নবাসল্ অজন্তার সম-মর্যাদা পেতো।

তিরুশিরাপ্পল্লীতে ফিরতে বিকেল হলো।

সন্ধ্যার গাড়ীতে তঞ্চাবুর রওনা হতে হবে। কাজেই তল্পিতল্পা গুছিয়ে নিয়েই ছুট দিলাম স্টেশনের দিকে।

নির্দিষ্ট প্ল্যাট্‌ফর্ম-এ পৌছে গাড়ী আসার দেরী দেখে পায়চারি করছি, এমন সময় কানে বাংলা কথার আওয়াজ ভেসে এলো।

চোখে পড়লো একটু দূরে এক বাঙ্গালী পরিবার।

এগিয়ে গিয়ে উচিত ব্যবধান থেকে শুনতে লাগলাম তাঁদের কথাবার্তা। উদ্দেশ্য, অনেক দিন না-শোনা বাংলা-কথা শোনা।

বছর বারোর এক কিশোরী, তার বছর ষোলর দাদা, মা, বড় মামা ও বৃদ্ধা দিদিমার পার্টি। তাঁরা মাদ্রাজগামী।

কিশোরীটির সঙ্গে বৃদ্ধার বচসা চলেছে।

বৃদ্ধার ছেলে, অর্থাৎ মেয়েটির মামা, অপর প্ল্যাট্‌ফর্ম থেকে ফল কিনে আনতে গিয়েছিলেন। বৃদ্ধা তা দেখে বলেন,—বিনোদ আবার গাড়ী আসার সময় ও নাটফরমে গেলো কেন!

কিশোরীটি তাতে হেসে বলেছে,—নাটফরম্ নয় দিদিমা, প্ল্যাট্‌ফর্ম।

ওতেই বচসার উৎপত্তি।

বৃদ্ধা চটে গেছেন। তিনি কিছুতেই মানতে চান না যে, কথাটা প্ল্যাট্‌ফর্ম্।

কিশোরীটির বড় ভাইও তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করলো। বৃদ্ধা আরও চটে কিশোরীকে বললেন: তোরা বড্ড বাচাল। আমরা সারা জীবন নাটফরম্ বলে এলুম। নাটমন্দির, নাটসায়েব, নাটফরম্ এ সব আমাদের কালের কথা।

ঠিক বেঠিক তোরা কি করে জানবি লা?—আমার শাশুড়ীও নাটফরম্ বলতেন।

এমন সময়ে বৃদ্ধার ছেলে এসে পড়লেন। মেয়েটি তাঁকে ধরলো: বড় মামা, তুমি কোনটা ঠিক বলো তো। দিদিমা কিছুতেই প্ল্যাট্‌ফর্ম বলবে না। সেই থেকে নাট-ফরম্ নাটফরম্ করছে। ইংরেজী জানেনা, বুড়ী!

ওই কথায় বৃদ্ধা তো রেগে আগুন।

শেষ পর্যন্ত বিনোদবাবুও যখন ভাগনীর কথায় সায় দিলেন, বৃদ্ধা তখন বললেন: তা হবেও বা। কালে কালে তো কতই হলো। তোদের কালে এখন হয়তো পেল্লাটফরম্ হয়েছে। আমাদের সময় কিন্তু নাটফরম্‌ই ছিলো।—এমন সময়ে দেখা গেলো গাড়ী আসছে।

হুড়োহুড়ি ঠেলাঠেলি শুরু হলো। প্ল্যাট্‌ফর্ম্ জুড়ে আরম্ভ হলো যেন ভূতের নৃত্য।

বৃদ্ধার কথাই ঠিক।

নাটফরম্‌ই বটে। তখনকার পরিস্থিতিতে নাট-মঞ্চ বললে বরং আরও ঠিক হতো। [ক্রমশঃ

বাংলার বৈষ্ণব দর্শন

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বহু প্রাচীনকাল হইতে বাংলা দেশে দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা ও পঠন পাঠন চলিয়া আসিতেছে। দেড় শত বৎসর পূর্ব পর্যান্ত সংস্কৃত ভাষাতেই সে কার্য করা হইত, তাহার ইতিহাস কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ আশুতোষ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। বাংলা দেশে বাংলা ভাষাতেও দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা কম পুরাতন নহে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের পরে তাঁহার পার্ষদগণ শুধু সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়া ক্ষান্ত থাকেন নাই। দুরূহ দার্শনিক বিষয়সমূহ বাংলা ভাষায় লিখিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃত, বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবৎ, জয়ানন্দ ও লোচন দাসের চৈতন্য মঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থ আসলে মহাপ্রভুর জীবন চরিত হইলেও সেগুলি দার্শনিক তত্ত্বে ও তথ্যে পরিপূর্ণ। এ যুগে যাঁহারা বাংলার বৈষ্ণব দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। তিনি চব্বিশ পরগণার ভাটপাড়ার অধিবাসী ছিলেন ও দীর্ঘকাল কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক রূপে কাজ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময়ে তিনি একজন সুবক্তা বলিয়া পরিচিত ছিলেন এবং যাঁহাদের তাঁহার ভাষণ শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছে তাঁহারা তাঁহার সুমধুর কণ্ঠস্বর ও অসাধারণ বিশ্লেষণ শক্তিতে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন নাই।

তাঁহার পূর্বেই বাংলা দেশে একদল মনীষী বিপথগামী হিন্দুদিগের মধ্যে নূতন করিয়া হিন্দু ধর্ম প্রচারের প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন এবং সেজন্য কাজ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি, পরিব্রাজক আচার্য-শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন, তন্ত্রশাস্ত্রের অন্যতম প্রচারক শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। সেন মহাশয় পরবর্তীকালে কৃষ্ণানন্দ স্বামী নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার লিখিত গীতার ব্যাখ্যা আজও ভক্তিরসপিপাসুরা শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিয়া থাকেন। হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়ায় তাঁহার ভক্তরা তাঁহার স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার জন উড্‌রফ শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের নিকট তন্ত্রশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া ইংরাজী ভাষায় তন্ত্র সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন এবং গুরু শিবচন্দ্রের নাম অমর করিয়া গিয়াছেন। শিবচন্দ্র নদীয়া জেলার কুমারখালি গ্রামের অধিবাসী ছিলেন (উহা এখন পাকিস্তান) এবং স্বগৃহে কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার পূজা করিতেন। তাঁহার বংশধরগণ সেই মূর্তি আনিয়া হাওড়া শহরের নিকট বাকসাড়া গ্রামে প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার পূজা করিয়া থাকেন। তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের ভাষণ বা রচনা সমূহ সংগৃহীত ও গ্রন্থকারে প্রকাশিতে হয় নাই, এখনো সে কার্য সম্পাদনের সময় চলিয়া যায় নাই।

পরবর্তী যুগে তর্কভূষণ মহাশয় বাংলার বৈষ্ণব দর্শন সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি সরকারী কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কাশীধামে বাস করিতেন এবং কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হইয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি টোলে সংস্কৃত পড়িলেও পরিণত বয়সে ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে ডি, লিট্ উপাধি দিয়া তাঁহার পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি দান করিয়াছিল।

সম্প্রতি তর্কভূষণ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র অধ্যাপক বটুকনাথ ভট্টাচার্যের চেষ্টায় তাঁহার লিখিত প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকের নাম বাংলা বৈষ্ণব দর্শন। মূল্য, সাতটাকা, কলিকাতা, ২৫৪, বিধান সরণি হইতে

শ্রীগুরু লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত। সম্প্রতি পরলোকগত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ শশিভূষণ দাসগুপ্ত মহাশয় এই গ্রন্থের মুখবন্ধে লিখিয়াছেন, "বাংলা দেশ যে সকল পণ্ডিতের জন্য গর্ব অনুভব করিতে পারে তর্কভূষণ মহাশয় অবিসংবাদিত ভাবে তাঁহাদের মধ্যে একজন অগ্রণী, ন্যায়, বেদান্ত, স্মৃতি, মীমাংসা, সাহিত্য, অলঙ্কার প্রায় সর্বক্ষেত্রেই তাঁহার সমান পারদর্শিতা ছিল। কিন্তু একজন প্রগাঢ় নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিকের চিত্ত যে আবার কতখানি রসস্নাত হইয়া মধুর ভাবে দেখা দিতে পারে তাহা তর্কভূষণ মহাশয়ের ভক্তি শাস্ত্রের আলোচনা হইতে বোঝা যাইত। জীবনের শেষদিকে তিনি বাংলার বৈষ্ণব দর্শনের গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন এবং এ বিষয়ে বহু প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। প্রবন্ধগুলি একদিকে তথ্য সমৃদ্ধ, অন্যদিকে যুক্তি ও বিচার পরিপূর্ণ। তিনি দুরূহ দার্শনিক বিষয়গুলি যথাসম্ভব সরল ও সরস ভাবেই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।"

আলোচ্য গ্রন্থে প্রথমেই ভারতীয় দর্শনে বাঙালীর দানের কথা বলা হইয়াছে। আচার্য শঙ্করের পূর্ববর্তী দার্শনিক শবর স্বামী কুমারীল ভট্ট হইতে আরম্ভ করিয়া শঙ্কর পূর্ববর্তী বাঙালী আচার্য শান্ত রক্ষিত পর্যন্ত পণ্ডিতগণের মতবাদ তিনি আলোচনা করিয়াছেন। পরবর্তীকালে বাংলাদেশে যে সকল দার্শনিক পণ্ডিত দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা ও প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন তর্কভূষণ মহাশয় তাহাদের সকলের মতবাদ সরলভাবে প্রথম বারো পৃষ্ঠায় সর্বসাধারণের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন।

তাহার পর শত পৃষ্ঠা গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের আলোচনায় পূর্ণ। আচার্য শঙ্করের পর রামানুজ হইতে বল্লভাচার্য পর্যন্ত বহু মনীষী ভক্তিবাদের প্রচার করিয়াছেন। তাহার পর মহাপ্রভুর অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ আলোচনা করিয়া তিনি ঐ অধ্যায় শেষ করিয়াছেন। ছোট ছোট বহু প্রবন্ধে পারমার্থিক রস মুক্তি ও ভক্তির কথা আলোচিত হইয়াছে।

শ্যামের বাঁশী ও সাহিত্যে রাধা নামক সাতটি প্রবন্ধে তিনি রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়াছেন।

মোটের উপর তর্কভূষণ মহাশয় সে যুগে যে ভাবে বাঙালী পাঠককে বাংলার বৈষ্ণব দর্শন বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা এই গ্রন্থ পাঠ করিলে বুঝা যায় এবং বিস্মিত হইতে হয়। আশ্চর্যের কথা সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যাপনা তাহাকে করিতে হইত। স্মৃতির অধ্যাপকের পক্ষে দর্শনের এই জটিল বিষয়ের সরল আলোচনা পাঠককে মুগ্ধ করে। সে যুগের অধ্যাপকমণ্ডলী শুধু নিজের অধ্যাপনার বিষয়ের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখিতেন না সকল গ্রন্থ ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পণ্ডিত সমাজে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার যে চেষ্টা করিতেন তাহা তর্কভূষণ মহাশয়ের কথা মনে করিলেই উপলব্ধি করা যায়। আমরা তাঁহার পদতলে বসিয়া শিক্ষা লাভের সৌভাগ্য পাইয়াছিলাম এবং দীর্ঘকাল তাঁহার সান্নিধ্য ও কৃপালাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলাম, সে জন্য তাঁহার টুকরা প্রবন্ধগুলির এই সংকলন গ্রন্থ দেখিয়া আনন্দে আপ্লুত হইয়াছি এবং বিশ্বাস করি এই গ্রন্থের পাঠকগণ বাংলা সাহিত্যের একটা বিশিষ্ট দিক দেখিবার ও জানিবার যথেষ্ট সুযোগ লাভ করিবেন। বিশেষ করিয়া কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ এই সহজ সরল ভাষায় লিখিত কঠিন বিষয় সমূহের সহিত পরিচয় লাভ করিলে অবশ্যই লাভবান্ হইবেন।

কাঙ্গাল ও গিনিপিগ্

রমেশ মজুমদার

—গিনিপিগ্ আদর করছিস্—কর, খুব আদর কর, তৃপ্তি পাবি। ময়নাও পুষেছিস্ দেখ্ছি! বেশ আছিস!

—সত্যি খুব ভাল লাগে।

—তা—কি খাওয়াচ্ছিস আদর করে?

—কচি ঘাসের ডগা।

সামনে এগিয়ে যায় উন্মাদিনী।

জ্যোতির্ম্ময় আর উন্মাদিনী প্রায় সমবয়সী। ছোটবেলা থেকে এক সাথে, খেলাধূলা ছুটোপুটি করে বড় হয়েছে। তারপর এসেছিল বিচ্ছেদ। যখন বিচ্ছেদ এলো তখন দু'জনকে যৌবন স্পর্শ করতে চলেছে। কিন্তু যেন সে স্পর্শ আগে পেলো উন্মাদিনী।

ঠিক তখনই চেহারা পাল্টে গেল। শরীর যেন ফুলে উঠলো। রসে উন্মাদ হলো যেন। উন্মাদিনী নামটা ঠিক তখন সে লাভ করেনি। নামটা পেয়েছিল ছেলেবেলা। দিয়েছিল তার ঠাকুরদা।

কিন্তু তার নামটা সার্থক হয়েছিল যৌবনের স্পর্শে! আর সেই খেলার ছলে ছেলেখেলাটার হাত থেকে এড়িয়ে নিয়ে গেল টানতে টানতে তার ঠাকুরদা। নিয়ে গেল বড় ছেলের কাছে গিরিডিতে।

জ্যোতির্ম্ময় গালে হাত দিয়ে বসলো। ভাবলো অনেক।

তারপর দীর্ঘ বারো বছর পর ফিরে এলো উন্মাদিনী। আজ তার বয়স ছাব্বিশ। বিয়ে হয়নি। সম্পর্ক হতে গিয়ে ভেঙ্গে গেছে কয়েক জায়গায়।

আজও সে উন্মাদিনী। অতি মাত্রায় উচ্ছল। উদ্বেলিত রস-তরঙ্গ। সব সময় উপচে পড়ে। অথচ সে এম-এ পাশ করেছে। তবু তার হাসি-উচ্ছলতা নেহাৎ ছেলেমানুষীর মাত্রা ছাড়িয়ে যায়।

আর তা দেখে লোকে বলতো ছেলেমানুষ। তখন গম্ভীর হতো উন্মাদিনী। ভাবতো নিজের সম্পর্কে। কেন সে এমন ছেলেমানুষ হয়ে যায়! কিন্তু তার হাত থেকে অব্যাহতি পায় না। ভেতর থেকে কে যেন হাসিয়ে নাচিয়ে মাতিয়ে দিয়ে যায়।

আজ কয়েকদিন হলো সে বাড়ী ফিরেছে। কয়েকবার দেখাও হয়েছে জ্যোতির্ম্ময়এর সাথে। আবার এই সকালে তার আবির্ভাব। বাল্যবন্ধু জ্যোতির্ম্ময়।

—তারপর, কেমন আছো?

—সে কথা তো প্রথম সাক্ষাতেই পেয়েছো—ভাল আছি। আবার একই কথা বলছো কেন আহ্লাদিনী। জ্যোতির্ম্ময় বললে।

আহ্লাদিনী নামটা দিয়েছিল জ্যোতির্ম্ময় নিজেই। উন্মাদিনী নাম সে শুনলেই রেগে যেতো।

রাগ কি উন্মাদিনীর হয়নি কলেজ জীবনে? কলেজের ছেলেরা কত ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে। পিছু নিয়েছে তার দিনের পর দিন। আরো বেশী উন্মাদিনী করেছে তাকে।

সেই সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী উন্মাদিনী আজ জ্যোতির্ম্ময়ের কাছে আহ্লাদিনী। জ্যোতির্ম্ময় অনেক ভেবে দেখেছে, যে ভাবটা উন্মাদের মত দেখা যায় সেটা আসলে আহ্লাদের ভাব।

—একটা গল্প শুনতে পেলে খুশী হতাম। উন্মাদিনী বললে।

—কি গল্প?

—তোমার জীবনের দু' একটি কাহিনী।

—তা কি ভাল লাগবে? জ্যোতির্ম্ময় জবাব দেয়।

—কেন ভাল লাগবে না দ্যুতি! যা ভাল তা চিরকাল ভাল। এমন একটা কথা বলো যা ভাল লাগবে। আর তা বলে তোমার মন হাল্কা হবে।

এই দ্যুতি নাম রেখেছিল বান্ধবী। আদর করেই

ডাকতো সে। আর তা শুনে দ্যুতি তার ঠিক্‌রে পড়ে যেন।

লেখাপড়া যা শিখেছিল তাতে পেটের ভাত জোগাড় করবার পক্ষে যথেষ্ট। অনেক কষ্টে গ্র্যাজুয়েট হয়েছিল। তারপর একটা চাকরী পেয়েছিল কোন এক বড় পেপার-মার্চ্চেণ্ট অফিসে। মাইনে পেতো তখন দুশো টাকা।

সকাল দশটা থেকে রাত আটটা পর্য্যন্ত তাকে খাতা-পত্র লেখালেখি করতে হতো। তার হিসেব নিকেশ, ষ্টক্ এ্যাকাউন্ট সব কষতে হতো।

মালিকের ছেলের একটি বিশিষ্ট বন্ধু ছিল। নাম তার অবনী। সেও চাকরী করতো। তবে পেপার মার্চ্চেণ্ট অফিসে নয়। এক সরকারী দপ্তরে।

গান লিখতো দ্যুতি। আধুনিক গান। চমৎকার শব্দ-যোজনা করে গভীর অর্থব্যঞ্জক গান রচনা করতো। আর সে গান পড়ে শোনাতো অবনীকে। সে ও-গান শুনবার জন্য সত্যিই উৎকণ্ঠিত হতো কিনা, তা কে বুঝবে? সেটা তার ভেতরের রহস্য।

তবু দ্যুতিকে আসতে বলতো প্রায়ই। শ্যামবাজারে নিজের বাড়ীতে, নিয়েও আপ্যায়ন করতো। খবরাখবর নিত। পরামর্শ দিত। সৎ পরামর্শের বিপরীত দিকেই চাপ বেশী। কাগজ কত ষ্টক থাকে? কত টাকা হাত দিয়ে যায়? বড়লোক হতে হয় কি করে সেই অসৎ পন্থা অবলম্বনের যুক্তি।

দ্যুতি সব বোঝে! মনে মনে হাসে। মুখে প্রকাশ পায় না। যদি কখনো সে হাসির ছোঁয়া তার মুখে এসে লাগে, তখন অবনী তাকে মৃদু তিরস্কার করে।

শুধু বড়লোক হবার পরামর্শ নয়, আরো পরামর্শ দেয়। যারা মালিকের ছেলে বিজয়ের বান্ধবী, তাদের সম্পর্কে কথা বলে। কুৎসা যত গায়। আর জানতে চায় তাদের অন্যান্য খবর।

চাকরী বাঁচাবার খাতিরে দ্যুতি সব শুনে মালিকের বন্ধু ও আত্মীয়দের নমস্কার করে। তাদের সম্মান প্রদর্শন করে। দুষ্ট বুদ্ধি এড়িয়ে উল্টোপথে চলে। কর্ত্তব্যের পথে, মনুষ্যত্বের পথে তার দৃষ্টি।

নজর তার সর্ব্বদা সংসারের উপর। তার মা-বাবা ছোট ভাই আছে। এই মোট চারটি প্রাণীকে বাঁচতে হবে। আর এই ছোট সংসারটাকে বাঁচিয়ে রাখার ভার তার উপর। তাই সর্ব্বদা পথ দেখে পা ফেলতে হয়। পাছে বুঝি কোন ত্রুটিতে তার চাকরী যায়।

কিন্তু যে ভয় করেছিল তাই হলো।

মালিকের ছোট মেয়ে গঙ্গাজল একদিন কি কুক্ষণে চেয়েছিল দ্যুতির দিকে। দ্যুতির সেদিন ছিল নেমন্তন্ন। ছুটির দিন। মেয়েটা দোতলার সিঁড়ির জানলার কাছে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছিল। আর তখনি চারটি চোখের মিল হলো দ্যুতির সাথে।

গঙ্গাজল স্বাস্থ্যবতী। সুন্দরীও বটে। আধুনিকাও নিশ্চিত। দ্যুতি যতক্ষণ তাদের বাড়ীতে ছিল, ততক্ষণ গঙ্গাজল তার সামনে এসে দাঁড়ায়নি। দূর থেকেই ঘুরে ফিরে লক্ষ্য করেছে।

যতক্ষণ দেখা গেছে তাকে, তার দিকে দৃষ্টি পড়ে ছিল, এবং সেই প্রথম দৃষ্টিতে ভালোবাসাটা ভালবাসায় পরিণত হলো।

গঙ্গাজলের দৃষ্টিতে কেন যেন ভাললেগেছিল দ্যুতিকে।

দ্যুতি সেদিন অর্দ্ধেক মন নিয়েই ফিরেছিল বাড়ীতে। অর্দ্ধেক মন পড়েছিল সেই গঙ্গাজলের কাছে। তার মন কেড়ে নিয়েছিল সে।

মাঝে মাঝে কাজের অছিলায় দ্যুতিকে যেতো হতো মালিকের বাড়ীতে। দৃষ্টি বিনিময় হয়ে যেতো সহসা। কখনো হয়তো দেখা পেতো না মোটেই। কিন্তু কোথেকে কে যেন এর মূলে আঘাত হানলো।

গঙ্গাজল নোংরা তো নয়ই, বরং পরিষ্কার। মনটাও হয়তো তাই।

যখন এমনিভাবে কয়েকমাস কেটে গেল, তখন সহ-কর্মীদের কেউ কেউ সন্দিহান হয়েছিল। এমন কি দ্যুতির সাথে অন্য বিষয় নিয়ে হাসি-ঠাট্টাও করেছে।

গঙ্গাজল সকাল দশটায় প্রায়ই দোতলার জানলা ধরে দাঁড়িয়ে থাকতো। দ্যুতিকে দেখতে পেয়ে জানলার মৃদু শব্দ করে অন্য দিকে চেয়ে মুচকি হাসতো।

একদিন দ্যুতিকে বাড়ীতে ডেকে পাঠালো মালিক। বললে, তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে জ্যোতির্ম্ময়। তুমি একটা ভীষণ অন্যায় করেছো। পাশের ঘরে গঙ্গাজল আছে। সে কাল রাতে কাঁদতে কাঁদতে বলছিল। আমি এমন

আশা করিনি তোমার কাছে। সুতরাং তোমার চাকরী থাকবে কিনা সে সম্পর্কে তুমিই চিন্তা করো। অবশ্য আমার কন্যা গঙ্গাজলের ইচ্ছা নয় যে তোমার চাকরী থাকে।

—আমাকে বিদায় দিন।

জ্যোতির্ম্ময় অর্থাৎ দ্যুতির সারা গায়ের রক্ত মাথায় উঠে গেছে। নিজেকে আর সামলাতে পারলো না। কর্ম্ম থেকে অব্যাহতি চাইলো।

উঠে দাঁড়ালো চলে যাবার জন্য। চিন্তা করবার অবকাশ নেই। বিদায় নিয়ে মুক্ত আকাশের নিচে শান্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচবে।

মালিক বললে, দাঁড়াও। তোমার যা পাওনা হয়েছে তা ক্যাশিয়ারের কাছ থেকে নিয়ে যাও, চিঠি দিয়ে দিচ্ছি।

এরপর চিঠি নিয়ে নমস্কার করে বিদায় নিল দ্যুতি। মুখ হলো কঠিন। বুক হলো জ্বালাময়। যা সে ধারণা করতে পারেনি। তাই সম্ভব হলো। একটা মেয়ে এতবড় হিংস্র হতে পারে, এত বড় নির্ম্মম?

তবুও হলো। কিন্তু কেন? এ কেনর জবাব দিতে পারে সেই মেয়েটিই এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিরাই।

গঙ্গাজলের ছিল চাপা ক্রোধ। সে ক্রোধ দ্যুতির ভীরুতা এবং দীর্ঘসূত্রতার জন্য।

অসহায় হয়ে পড়লো দ্যুতি। চারটি প্রাণী দারুণ সঙ্কটের সম্মুখীন। একদিন অ'হ্লাদিনী এসেছিল নারীর আনন্দদায়িনী রূপ নিয়ে, আর এ নারী এলো অভিশাপ নিয়ে।

সারাটা দিন পার্কে-ময়দানে ঘুরে-ঘুরে সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরলো। বুকটা ভেঙ্গে গেছে। সমগ্র বিশ্বাস বস্তুটা পঙ্কে নিমজ্জিত হয়েছে। পৃথিবীর প্রেম-ভালবাসা বস্তুটা ঘৃণার বিষয় হয়ে দাঁড়ালো।

মা-বাবা তাকে দৈনিককার মত আদর আপ্যায়ন করলো। কিন্তু দ্যুতি বিষণ্ণ ভাবাপন্ন।

—কি হয়েছে তোর?

মা প্রশ্ন করে কাছে এগিয়ে যায়।

চেপে যায় দ্যুতি। বলে, মনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল মা, বোধহয় চাকরীটা থাকবে না।

—কেন রে? কি হয়েছে? কি দোষ পেয়েছে তোর?

দারুণ উৎকণ্ঠা মায়ের। আকাশ থেকে ধপাস করে মাটিতে পড়ে যায় যেন। বল, আমি কি করতে পারি তোর—এই চাকরীর জন্য? তোর মালিকের পা জড়িয়ে ধরবো বাবা?

—ছিঃ, না মা, তোমাকে মালিকের পা ধরতে হবে না।

—কেন, কিসের অপমান আর অপরাধ? তারা যদি চাকরী থেকে বরখাস্ত ক'রে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারে পশুর মত, সেখানে মৃত্যুপথযাত্রীদের কেউ যদি তাদের পা ধরে, তাহলে মান-অপমান এবং অপরাধের প্রশ্ন আসে কোথায়?

—না, মা, তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি চাকরী জুটিয়ে নেবো। তার জন্য অত ব্যস্ত হবে না।

মা বুঝতে পারলো হয়তো তার চাকরী নেই! পাশের বাড়ীর মেয়ে-বৌরা কান পেতে শুনলো। তারপর থেকে দু' একজন যাতায়াত করলো। ভাব লক্ষ্য করলো। পরদিন দশটার পর তাদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেল। সাড়ে দশটা বাজতেই তাদের মুখ খুললো,—ছেলে আপিসে যায় না বুঝি?

মা নীরব। অনেকক্ষণ পরে বললে, না বাছা, চাকরী নেই। অন্য জায়গায় খোঁজ করছে।

—আমাদের কর্ত্তাকে যদি একটু ধর-পাকড় করতে পারে তাহলে একটা চাকরী হয়ে যেতে পারে।

মহিলাটির স্বামীর একটি ছোট বইয়ের দোকান আছে। দশ-বারোখানি বই বের হয়েছে। সুতরাং সে দোকানে একজন গ্রাজুয়েট ছেলের কি চাকরী হতে পারে, তা দ্যুতি এবং তার মায়ের অজানা নেই। তারা সুযোগ বুঝে নিজের ওজন বাড়াচ্ছে।

বিপদ সম্মুখে, সুতরাং ভদ্রমহিলা চুপ করে রইলেন। দ্যুতি চাট্টি খেয়ে চাকরীর সন্ধানে বের হলো।

চাকরী যে দ্যুতির উপস্থিত নেই, এ খবরটা রাতেই পাড়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল। দ্যুতিকে পাড়ার যুবতীরা ভালবাসতো, অনেকেই মনে আশা পোষণ করতো তাকে স্বামীরূপে পাবার জন্য। আজ তারা দ্যুতিকে দেখে যে

বাইরের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল, সে তাড়াতাড়ি ভেতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলে।

দ্যুতির ক্ষতস্থানে সহসা আর একটা আঘাতে রক্তপাত হলো যেন। পথ বেয়ে চলে সে মাথা নীচু করে।

গলি পেরিয়ে সবে বড় রাস্তায় পা দেবে এমন সময় একটা প্রাইভেট গাড়ী এসে তার সামনে থামলো। দ্যুতির গতিরোধ হলো। ভেতরে কে আছে তা দেখবার মত মনের অবস্থা ছিল না, তাই দেখতে পায়নি সে।

—শুনুন।

নারীকণ্ঠ শুনে ফিরে চাইলো গাড়ীর ভেতরে। কিন্তু যাকে দেখলো, সে সেই মালিক-কন্যা গঙ্গাজল। নিজেই গাড়ী ড্রাইভ্ করে এসেছে একা-একা। হাতে তিন-চারখানা দশ টাকার নোট। সে ক'টা দ্যুতির দিকে এগিয়ে ধরে বললে, এই চল্লিশ টাকা রাখুন, তবু দু'দিন চলবে!

ঘৃণার দৃষ্টি মেলে চাইলো সেদিকে দ্যুতি। বললে, অসংখ্যবার ধন্যবাদ। দরকার হবে না, যেতে পারেন।

চলে গেল পাশ কাটিয়ে ছেলেটা। শুনতে পেলো মেয়েটা বললে, গরীব মানুষের আবার ডাঁট বেশী।

গাড়ী ধুলো উড়িয়ে চলে গেল।

এরপর প্রায় পনেরো দিন ঘুরে-ঘুরে দ্যুতি চাকরী পেয়েছিল পোর্ট কমিশনার্সের কেরাণী পদে। মাইনে আড়াইশো টাকা। সেই চাকরী আজো বর্ত্তমান।

আর সেই চাকরী পাবার পর থেকে কত মেয়ে আর কত মেয়ের মা-বাবা ঘোরাঘুরি করছে দ্যুতির পাশে, আর তার মায়ের পাশে। কত মিষ্টি কথা। যারা একদিন অবজ্ঞায় আর উপেক্ষায় মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল, আজ তাদের দরজা দ্যুতির জন্য অবারিত।

আহ্লাদিনী বসে বসে তার কাহিনীটুকু শুনলো নীরবে দুই হাঁটুর ভেতর মুখ রেখে। পরে বললে, তুমি আমাকে ভালোবাসো না?

—কেন বাসবো না আহ্লাদিনী! তুমি যে আমার সাতরাজার ধন। তোমার উপর আমার কত বিশ্বাস। তুমি বাল্যসহচরী যে! তোমার সাথে তো আমার কোন লাভ-লোকসানের বেসাতি নয়।

—তাহলে এই গিনিপিগগুলো? ওদের এত আদর-যত্ন কেন?

—ওরা শান্ত, নিরীহ! অকৃতজ্ঞ নয়। ওরা এ আদরের মর্য্যাদা দেয়। ময়নাটাও তাই।

—একদিন আমাকেও অমনি করে আদর করো না দ্যুতি। আহ্লাদিনীর কণ্ঠ সহসা ভারী হয়ে উঠলো আবেগে আর উচ্ছ্বাসে। পরে গলা একটু পরিষ্কার করে বললে, আমার ভারী ইচ্ছে করে অমন করে কেউ আমায় ভালবাসুক, অমনি করে আদর করুক, আর কিচ্ছু চাইনে দ্যুতি! আমি কারো কাছে তা পাইনি!

কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো শিশুর মত মেয়েটা। দ্যুতির চোখ ঝাপসা। অন্যদিকে চেয়ে আছে।

জাহানারা ও বুন্দীরাজের কথা

কমলেন্দু ভট্টাচার্য

বন্দিনী জাহানারা। একদিন যাঁর শক্তি ছিল অপরিসীম! তাঁর ইচ্ছায় হতো সাম্রাজ্য শাসন। আদেশ গণ্য হত সম্রাটের আদেশ বলে। সে ছিল রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে প্রধান পরামর্শদাত্রী। রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্মচারী নিয়োগ, মনসবদারের পদোন্নতি, বিদেশী রাষ্ট্রদূতগণের সঙ্গে আলোচনা সবই ছিল তাঁর ক্ষমতাধীন।

আজ নিঃস্ব, রিক্ত, দীনতম একটি নারী—আগ্রাদুর্গে মুমূর্ষ পিতার শয্যাপার্শ্বে বসে অন্তিম দিনের প্রত্যাশায়। পৃথিবীর বুক হতে প্রিয়জনেরা একে একে অপসৃত। ভয়ঙ্কর এক রক্তক্ষয়ী ইতিহাসের সাক্ষী মাত্র সে। কিন্তু তাঁর অন্তরে আজো অহর্নিশি জ্বলছে এক অনির্বাণ প্রেমের দীপ শিখা। তার দেবতার স্মৃতি। নির্জন প্রাসাদের নিঃসঙ্গ দিনগুলো ভরে ওঠে সেই স্মৃতিকথায়। অবশিষ্ট জীবনের একমাত্র সম্বল।

সেই প্রথম দিন। সম্রাটনন্দিনী জাহানারা তখন তরুণী। মহলের ঝারোখার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। অপসৃয়মাণ এক অশ্বারোহী এগিয়ে গেলেন দরবারের দিকে। মণিমুক্তার আলোকচ্ছটায় সমুজ্জ্বল ময়ূর সিংহাসনে সমাসীন সম্রাট শাহজাহান। অসংখ্য বেলোয়ারির বর্ণালী আলোকধারায় প্লাবিত দরবার কক্ষ। দামী কারুকার্যময় কার্পেটে আচ্ছাদিত প্রশস্ত হর্ম্যতল। কিংখাবে মোড়া স্তম্ভ ও প্রাচীর গাত্র। বহুমূল্য আভরণে ভূষিত পরিষদবৃন্দ। প্রত্যেকে যেন এক একটি তারকা আর সম্রাট নিজে সেই তারকাপুঞ্জের মধ্য তারাটি।

অশ্বারূঢ় পুরুষ তাঁর অশ্ব 'যবদ্বীপ' হতে অবতীর্ণ হয়ে মরাল গতিতে দরবারে প্রবেশ করে সম্রাটকে অভিবাদন করলেন।—উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, প্রশস্ত বক্ষ, ক্ষীণকটি পুরুষ। উন্নত ললাটে যেন রাজটীকা আঁকা। অবয়বে ক্ষাত্রোচিত শৌর্য ও মর্যাদার পরিচয়। অপরূপ জ্যোতির্ময় এক পুরুষ! স্বপ্নের আবেশভরা কান্তি নিয়ে এসেছেন দরবারে। এ যেন নিষধরাজ নল পুনর্বার অবতীর্ণ হয়েছেন মর্ত্যে।

সমুদ্রের ন্যায় গভীর, সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল দু'টি আঁখি:

এতদিন বুঝি এই পুরুষপ্রধানকেই খুঁজে ফিরেছেন শাহজাদী! আজ এসেছেন সেই চির আকাঙ্ক্ষিত পুরুষ। তাঁর আত্মার দোসর। অনন্তকাল একে অনুসরণ করবেন শাহজাদী।

হৃদয়ে স্পন্দন জাগল। নারী মনে সুপ্ত চির দয়িতার ঘুম গিয়েছে ভেঙে। আজ বুঝি শাশ্বতের মধ্যে বিলীন হতে চলেছে জাহানারা। সাবিত্রীর মত মৃত্যুকে জয় করবে সে। অমৃতকুম্ভের সন্ধান মিলেছে তাঁর।

প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাট শাহজাহানের কন্যা জাহানারা তার হৃদয়ের প্রথম পূজা নিবেদন করলেন একজন সামন্ত বীরকে। সে-পুরুষ রাজস্থানের বুন্দীরাজ্যের রাজা,—জাহানারার দুলেরা।

সারা বিশ্ব একজনের প্রতিকৃতিময় হয়ে উঠে। সমস্ত ঐশ্বর্যের চাইতেও আকর্ষণীয়। নতুন কামনার আবেগে ভরে উঠে মন। সুখ সুপ্ত রাতে স্বপ্ন জাগে মনে,—'শুভ্র উষ্ণীষ, কোষবদ্ধ তরবারি ঝুলন্ত কটিতে, উন্নত গ্রীবা এক পুরুষ আসছেন ছুটে। অশ্বক্ষুরের আঘাতে আঘাতে বাতাসে উড়ছে ধূসর বালু। কৃতকরপুটাঞ্জলি জাহানারা নারীর অন্তরের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যলয়ে পূজায় সমাসীন। সেই পুরুষ কাছে এসে বলিষ্ঠ বাহুর বন্ধনে বেষ্টন করলেন তাঁকে। স্মিত হাস্যে টেনে নিলেন বক্ষে। সেখানে এক চিরন্তন তৃপ্তির রাজ্য। অনাস্বাদিত আনন্দের ধারা। তার উষ্ণ অধরের মদিরায় সুধা।

—তারপর সারা হিন্দুস্থানে ঘনিয়ে এলো অন্ধকার। চক্রান্তের কুটিল জাল বিস্তৃত দিকে দিকে। বৈরী শক্তিগুলো সক্রিয়। নেমে আসছে এক মহা অমঙ্গলের ছায়া।

হাট থেকে ফেরা
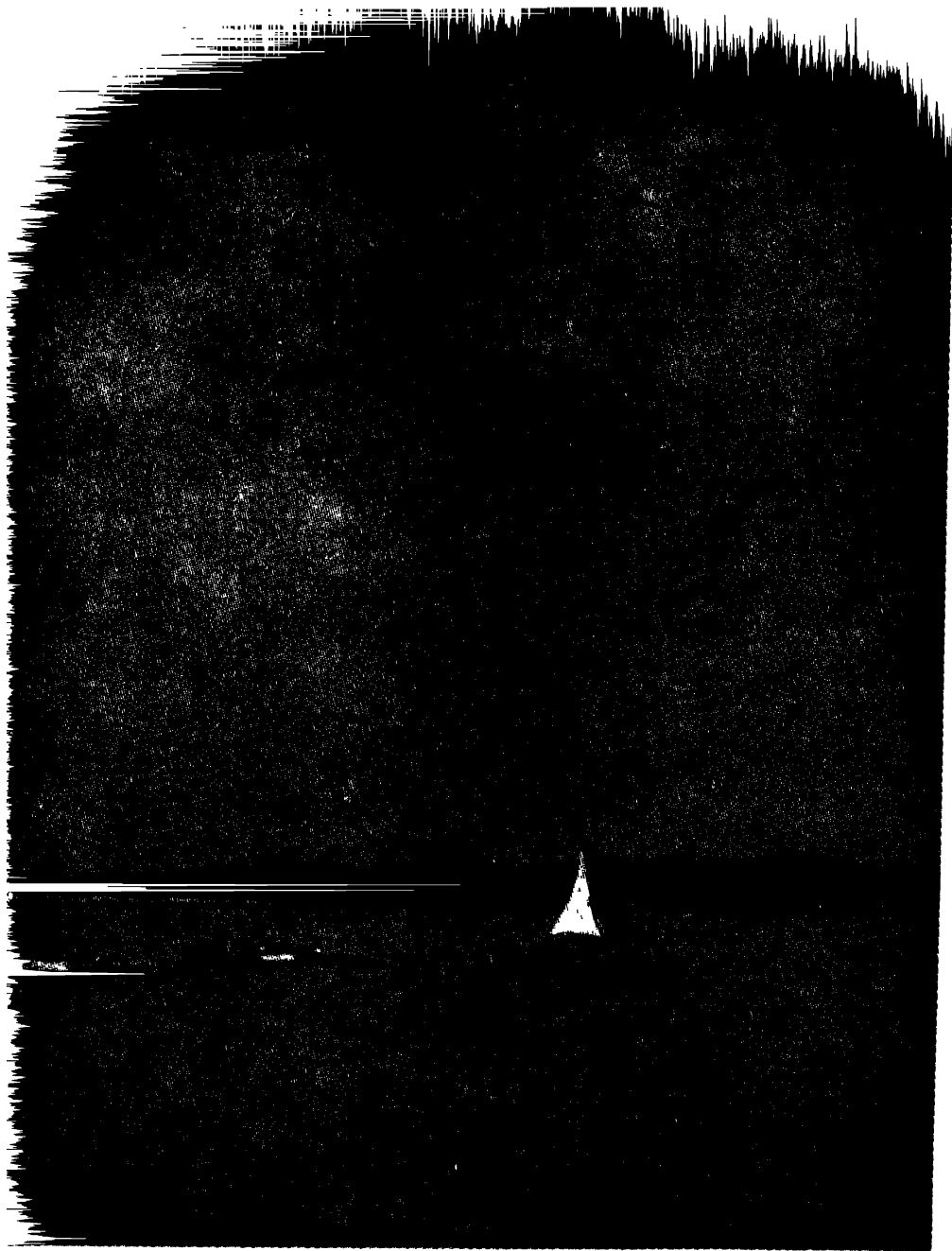
ফটো : দ্বিজেন নাগ

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

বার্ধক্যভারপ্রপীড়িত সম্রাট। চারিদিকে ক্ষমতা-লোভীদের চক্রান্ত। উৎকণ্ঠায় আকুলিত শাহজাদী;—তাঁর বীর প্রিয়তমও কি তাঁকে, তাঁর পিতাকে ও যুবরাজ দারাকে ত্যাগ করবেন?

পিতার ন্যায় জাহানারাও চায় যুবরাজ দারা হবেন সারা হিন্দুস্তানের সম্রাট! আকবরের মহান স্বপ্ন মূর্ত হয়ে উঠবে হিন্দুস্তানে। সেই মহামানবের মহত্বে ভরা একমাত্র দারার অন্তর।

রাজকার্যে প্রাসাদে এসেছিলেন বুন্দীরাজ। মুখে তাঁর সেই চিরপ্রশান্ত অনাবিল হাসি। ঝারোখার অপর প্রান্ত হতে অভিবাদন করলেন শাহজাদাকে। একটা দারুণ সন্দেহ নিরসন হয়েছিল শাহজাদীর! বুন্দীরাজ যখন এক হারানো অতীতের মধ্যে মগ্ন হয়ে বলেছিলেন, 'সম্রাট কুমারী! আপনার শ্রদ্ধের পিতা একদিন দুঃসময়ে রাজস্থানে আশ্রয় ভিক্ষা করেছিলেন; আমরা তাঁর সম্মানে একটি তোরণ নির্মাণ করেছিলাম। আজো সেখানে অহর্নিশি জ্বলছে অনির্বাণ দীপশিখা। আজ আমি আমার তরবারি সাক্ষী রেখে শপথ করছি, সম্রাট-কুমারীর জন্য, সম্রাটের জন্য ও যুবরাজ দারার জন্য আমার জীবন উৎসর্গ করবো!' আনন্দের শিহরণে কম্পিতা হলেন শাহজাদী। ঝারোখার এই ব্যবধান যদি খসে পড়ত! দু'টি একাত্ম নরনারীর আনন্দলোকে পৌছবার বন্ধন এই প্রাচীর।

পৃথ্বীরাজের যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে সংযুক্তার কথাগুলো প্রতিধ্বনিত হ'লো শাহজাদীর কণ্ঠে,—'বীরের মৃত্যু মানুষকে অমরতা দান করে। স্বামিন তুমি আমার কথা ভেবো না। সেই অমরত্বের পথে অগ্রসর হও। যদি মৃত্যু আসে, পরপারে আমি তোমার সাথে আবার মিলিত হবো।'

সেদিন আকাশ ছিল স্বচ্ছ। পদ্মরাগ মণিখচিত ধরণীর উৎসব কক্ষে তারকার উজ্জ্বলদীপ শিখা। যমুনার কলতানে ছিল বীণার মধুর ঝঙ্কার।

স্বপ্নের আবেশ-মাখা দিনগুলো অতিবাহিত হচ্ছিল কালের আবর্তে। দীর্ঘ অদর্শনের পর ছত্রেরার একখানা চিঠি এলো। এই প্রথম তিনি শাহজাদীকে সম্বোধন করেছেন, 'দেবী'। আরো লিখেছেন জাহানারা যদি সংযুক্তা হতো তাহলে তিনি পৃথ্বীরাজ হয়ে কনৌজ অভিযান করতেন। তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন সংযুক্তার অমর কথাগুলো, 'নারী সরোবর, আর পুরুষ রাজহংস, নারীর সেই হৃদয়সরোবরে সাঁতার কেটে চলে। যখন দূরে সরে যায় তখন পুরুষ নিঃস্ব।...

সেদিন বসেছিল দরবার-ই-খাসের অধিবেশন। আপন মহলে ছিলেন শাহজাদা। প্রাচীরের পাশে পাশে নানা বর্ণের জ্বলন্ত প্রদীপ শিখা। শাহজাদীর পরিচারিকা গুলরুখের ওড়না প্রদীপ শিখার সংযোগে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠে। দাবানল-ভীতা বনহরিণীর ন্যায় ছুটতে থাকে গুলরুখ। জাহানারা ছুটে যান। আচম্বিতে নিজের বসন প্রান্ত ছুড়ে দিলেন সেই আগুনে। প্রলয়ঙ্কর এক অগ্নির পরিবেষ্টনে আবদ্ধা হ'লো দু'টি নারী।

জনাকীর্ণ দরবার। চিৎকার করলে ছুটে আসবে মানুষ। দরবারে আছেন ছত্রেরা। সে কি আসবে? দগ্ধ বসনে অনাবৃতপ্রায় দেহ—তাঁর দর্শনে আসবে কি? শিউরে ওঠেন শাহজাদী। যদি ছত্রেরার সম্মুখে অন্য মানুষ তাঁকে স্পর্শ করে। নীরব দর্শক হয়ে থাকতে হবে মাত্র তাঁকে। রুদ্ধ হয়ে রইলো বাক্। অগ্নির দহনেও অস্ফুটকণ্ঠে দাঁড়িয়ে রইলেন শাহজাদী।

যুবরাজ দারা ভগ্নী জাহানারাকে বল্খের সুলতান-বংশজ সেনাপতি নজবৎ খানের সাথে বিয়ে দিয়ে সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করতে মনস্থ করেছিলেন। ভ্রাতা যখন এ বিষয় সম্রাটের সমীপে উত্থাপন করার সম্মতি চেয়েছিলেন, জাহানারার চোখের উপর ভেসে উঠেছিল, 'বিশাল বনরাজির মধ্যে উন্নততম একটি বৃক্ষ। শিকামোর বৃক্ষের ন্যায় বায়ুর গতিতে আন্দোলিত হয় সে উর্ধ্ব শির; সে এক পুরুষ, অভিজাত রক্ত তার শিরায়, উপশিরায়। তারই পাশে আর একটি পুরুষ। অপূর্ব রাজোচিত অবয়ব। যেন মেরুশিখরে অগ্নিগর্ভ বিস্ফুর প্রতিকৃতি। তাঁর সুললিত কণ্ঠ নিঃসৃত সঙ্গীতে জাগে সূর্যলোকে নৃত্যের ছন্দ। মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে ধ্বনিত প্রভাত-আজানের মত পবিত্র সে সুর।

সম্রাটনন্দিনী ও বুন্দীরাজের প্রেমকথা গুঞ্জরিত হয়ে উঠলো দিল্লীর অভিজাত মহলে।

আওরঙ্গজেবের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধে গিয়েছিলেন ছত্রেরা।

বুন্দীরাজ শাহজাদীকে একটি ঘন লাল রেশমের পদ্মরাগ মণি মুক্তা ও হীরকখচিত প্রবালজড়িত কাঁচুলী উপহার পাঠিয়েছিলেন। প্রেমাস্পদের সে উপহার অক্ষয় হয়ে উঠল শাহজাদীর কাছে। জাহানারা প্রত্যুত্তরে 'গজদন্তে খচিত ত্বলেরার একখানা আলেখ্য' প্রার্থনা করে পাঠালেন।

কন্যা জাহানারা ও শ্রেষ্ঠ সামন্তের মধ্যে পত্র বিনিময়ের সংবাদ সম্রাটের কর্ণগোচর হলো। গোপন নির্দেশ সহ ছদ্মবেশী সম্রাটের দূত প্রেরিত হল দাক্ষিণাত্যে আওরঙ্গজেবের শিবিরে!

চিঠির উত্তর এলো। অন্তরাত্মা কেঁদে উঠল শাহজাদীর। হায় নিষ্ঠুর দেবতা। একি লিখেছ তুমি।—'মুঘলরাজকুমারীর আলেখ্য-সংগ্রহে চৌহান রাজপুতের চিত্রপট শোভা পায় না।'

অশ্রুর প্লাবন নামল দু'টি নয়ন বহে। এ অশ্রু একটি নারীর তাঁর প্রেমের কাছে চরম আত্মনিবেদন। ভারতের ভাগ্যবিধাতার কন্যা ইতিপূর্বে এমন নত আর কারো কাছে হননি। প্রেমহীনা নারীর জীবন সূর্যবিহীন দিবসের মত। জাহানারা যাঁকে নিবেদন করেছেন তাঁর নারীত্বের সমস্ত ঐশ্বর্য সেই পুরুষ কি শেষে হিন্দুস্তানের অপমানকারী. ধর্মান্ধ, কূট আওরঙ্গজেবের লোভে বশীভূত হলেন? হায় প্রিয়তম! পৃথিবীর সমস্ত সত্যবাদী সাধুজন এসেও যদি তোমার বিরুদ্ধে আমায় কিছু বলত, আমি বিশ্বাস করতাম না, যতক্ষণ না তোমার মুখে শুনতাম।

সম্রাট শাহজাহানের অসুখের দুঃসংবাদ ছড়িয়ে পড়ল রাজ্যময়। শত্রুরা মিথ্যা রটনা করল 'সম্রাট-মৃত।' বাংলার শাসনকর্তা শাহজাদা শুজা তাঁর সৈন্যবাহিনী সহ রাজধানীর দিকে অগ্রসর হতে আরম্ভ করলেন। দাক্ষিণাত্য হতে অগ্রসর হতে লাগল আওরঙ্গজেব ও মুরাদের যৌথবাহিনী! দারার বীর পুত্র সুলেমান শুকো তাঁর সুশিক্ষিত বাহিনী নিয়ে শুজাকে প্রতিরোধ করতে অগ্রসর হলেন।

সুস্থ হয়ে উঠলেন সম্রাট। দিল্লী' থেকে আগ্রাতে স্থানান্তরিত হলো দরবার। উদ্দেশ্য দেশবাসী জানুক সম্রাট জীবিত। রাজপুত বীর বুন্দীরাজ ও রামসিংকে সম্রাট তাঁর শ্রেষ্ঠ অমাত্যের আসন দিলেন।

গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শের জন্য বুন্দীরাজকে আহ্বান করা হলো খাসমহলে। একটি ধূসর রক্তগ্রীব কপোত দূত প্রেরিত হয়েছিল।

মহলের সূর্যমুখী বীথির মধ্যস্থ পথ দিয়ে আসবেন তিনি। গন্ধরাজকুঞ্জের অন্তরালে আত্মগোপন করে রইলেন শাহজাদী তাঁর প্রিয়তমের দর্শন আশায়।

সেই অদর্শনের বিষণ্ণ দিনগুলোয় কেউ যদি দিল্লীর সিংহাসনের জন্য দৌলতাবাদের অথবা গুলবরগার যুদ্ধে বিজয়ী রাজপুত বাহিনীর অপূর্ব-গাঁথা শোনাত, আনন্দের শিহরণে নেচে উঠত শাহজাদীর মন। মনে হতো, সেই বিজয় গর্বে সেও গরবিণী। বিজয়ী সেনাপতির পাশে দণ্ডায়মান সে। কখনো মধুর স্বপ্ন জেগে উঠে মনে। কল্পনার চোখে দেখতে পায়,—'ভারতের সিংহাসনে বসেছেন উদারমনা দারা। সম্রাট আকবরের স্বপ্ন মূর্ত হয়ে উঠেছে সাম্রাজ্যের সুদূর প্রান্তসীমাব্যাপী। সেদিন সমস্ত ঐশ্বর্যের কামনা ত্যাগ করে জাহানারা তাঁর দেবতার সাথে বাকী জীবন ফতেপুরে মহামানব মিলন তীর্থে অতিবাহিত করবেন।'

সমস্ত কামনার রাজ্যে শুধু একটি অস্তিত্ব। অন্তরে জাগরিত হয় নিত্য নব আনন্দের লহরি। জাহানারা তখন সম্রাটকুমারী নন—আনন্দলোকের একটি সত্তা মাত্র। বসন্তের সমাগমে নব পত্রপুঞ্জের ন্যায় অন্তরে সঞ্চারিত হয় প্রেম। অন্তর বলে ওঠে, যে চিঠি পেয়েছিল সে ত্বলেরার কাছ হতে, তা সত্য নয়।

সম্রাটের আহ্বান পেয়ে বীর বুন্দীরাজ আওরঙ্গজেবের শিবির হতে পালিয়ে আসেন। আওরঙ্গজেব তাঁর দক্ষিণাত্য পরিত্যাগ বন্ধের চেষ্টা করেছিলেন। হরবংশ কুমার তাঁর বীর অনুচরবৃন্দসহ ভয়ঙ্কর খরস্রোতা নর্মদা অতিক্রম করে চলে আসেন। আওরঙ্গজেবের বাহিনী তাঁকে অনুসরণ করেছিল, কিন্তু আক্রমণ করতে সাহস পায়নি।

প্রিয়তম যখন পিতার সহিত সাক্ষাৎ করতে এলেন মনে হয়েছিল এক বীর অপরাজেয় পৌরুষ নিয়ে তামাম হিন্দুস্থানের ঘনায়মান অন্ধকার দূর করতে নব বলে বলীয়ান্ হয়ে এসেছেন। তাঁর আঁখির প্রভায় বিদ্যুৎ জ্বালা। গভীর ভাবে উৎকণ্ঠিত তিনি। অখণ্ড সাম্রাজ্যে বিশ্বাসী সেই বীরের কণ্ঠ হতে নির্গত হয়েছিল এক গভীর মর্মবেদনা।

ছুলেরা কোন এক সুদূর অতীতের মধ্যে হারিয়ে গেলেন। সেই সুদূর হতে তাঁর কণ্ঠ যেন প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল,—'শাহজাদী! চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময় হতে আমরা রাজপুতগণ অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন দেখেছি। বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে আমরা সংগ্রাম করে আসছি। ইস্‌লামের প্রথম অভিযানের দিন হতে আমার পূর্বপুরুষগণ যুদ্ধ করেছেন বারে বারে। বীরশ্রেষ্ঠ মাণিক রায়ের বীরত্বের কাহিনী আজো চারণ কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়। চৌহান গোগা মামুদ গজনির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তাঁর চল্লিশজন পুত্রসহ নিহত হন। আজমীরের চৌহান বংশের সন্তান সুলতান মামুদকে তাঁর রাজধানী অবরোধ ত্যাগ করে পলায়ন করতে বাধ্য করেছিলেন। রাজকুমারী! ভারতীয় যোদ্ধারা দেশ দেশান্তরে অভিযান করে নররক্তে মাটিকে রঞ্জিত করেনি। যাঁরা বিশ্ববিজয়ী গ্রীক বাহিনীকে পরাজিত করেছিল, তাঁরা কি পারত না বিশ্ব বিজয়ের স্বপ্ন দেখতে! কিন্তু ভারতীয় কোন যোদ্ধা দেশ-দেশান্তর অভিযান করে একটিও মস্‌জিদ ধ্বংস করেনি—একটি গীর্জার ও পবিত্রতা নষ্ট করেনি। আর পবিত্র আল্লাহ্‌র নামে যুগযুগান্ত ধরে ভারতের মাটিতে কাফেরের রক্তে স্রোত বহে গেছে। হাজার হাজার ভাস্কর্যমণ্ডিত পবিত্র মন্দির ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। ভারতের ঐশ্বর্য-নিঃশেষিত হয়েছে। নগর—কোটের পবিত্র মন্দিরের পবিত্র অনির্বাণ শিখা নির্বাপিত করেছিলেন মামুদ গজনি। তারপর স্তিমিত কণ্ঠে বলতে লাগলেন তিনি,—'একমাত্র সম্রাট আকবরের মধ্যে আমাদের চিরন্তন স্বপ্নের সার্থক রূপ দেখতে পেয়েছিলাম আমরা। তাই রাজপুত হয়েছিল মুঘলসাম্রাজ্যের প্রধান সহায়।

আবার আঁখিতে তাঁর জ্বলে উঠল আগুন। তিনি বললেন, 'আওরঙ্গজেব ভারতবাসীকে ঘৃণা করেন। তাঁর অন্ধ বিশ্বাস, পবিত্র কোরাণের দুই মলাটের মধ্যে যারা স্বর্গকে আবদ্ধ করেছে, একমাত্র তাদের সঙ্গে তিনি স্বর্গের একচ্ছত্র অধিকার দাবী করেন।

অভিভূত শাহজাদীর অস্ফুট কণ্ঠ হতে নির্গত হলো, 'সংযুক্ত'।

রক্তের উত্তেজনা শান্ত হলো। তাঁর মুখার্থ রক্তিম হলো। ক্ষণেক থেকে তিনি ধীরে ধীরে বললেন, 'পৃথ্বীরাজের কাছে সংযুক্তা ছিলেন পার্থিব সুখদুঃখের উর্ধ্বে। প্রেমের জন্য রাজপুত প্রাণ বিসর্জন দিতে পরাঙ্মুখ হয়নি কখনো। রাজকুমারী, তোমার অবগুণ্ঠন ছিন্ন করে আমার মণিবন্ধের বন্ধন এঁটে দাও। তোমার স্মৃতি আমায় সংগ্রামে দুর্বার করবে।

জাহানারার সমস্ত অন্তর নিঃশেষিত হয়ে নির্গত হলো একটি স্বস্তির পরম তৃপ্তির নিঃশ্বাস। তিনি অবগুণ্ঠন ছিন্ন করে ছুলেরার মণিবন্ধে বেঁধে দিলেন। ছিন্ন অবগুণ্ঠন তাঁর অধর স্পর্শ করলো।

সেলিম চিশ্‌তির পুণ্য স্মৃতি বিজড়িত আকবরের নির্মিত ফতেপুরে গিয়েছিলেন শাহজাদী পুণ্যতীর্থ দর্শনে। সেই প্রশস্ত প্রাসাদতল! সমস্ত ধর্ম ও সংস্কৃতির অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে সেখানে। মহান পুরুষের স্বর্গীয় আত্মার কাছে প্রার্থনা করলেন, 'সাম্রাজ্যের অমঙ্গল দূর করে দাও।' এক গভীর মোহে কোন অশরীরী আত্মার অনুপ্রেরণায় কক্ষ হতে কক্ষান্তরে উদ্বেল প্রাণে ঘুরলেন শাহজাদী!

যুদ্ধযাত্রা আসন্ন। ছুলেরা এসেছিলেন সেখানে রাজকুমারীর দর্শনে। তিনি জানলেন—রাজকুমারী সে রাত্রি ফতেপুরে অবস্থান করবেন। চারিদিকের অবস্থা ভয়াল। এ সিদ্ধান্ত ছুলেরার মনঃপুত হলো না। তবুও বাধ্য হয়ে আগামী প্রভাত-পর্য্যন্ত সেখানে অবস্থান করার সঙ্কল্প নিলেন। প্রাসাদের নিম্নতলে থাকবে তাঁর বিশ্বস্ত অনুচরবৃন্দ। স্বয়ং উপরতলে গম্বুজের নিম্নে একটি প্রকোষ্ঠে বাস করবেন স্থির করলেন।

ঐশ্বর্যের আড়ম্বরতা ও আভিজাত্যের দাম্ভিকতা গেছে মুছে। স্বহস্তে টেবিলের ওপর সাজালেন তরমুজ, বাবরের কাবুল উদ্যান হতে আনা সোনালী আঙ্গুর আরো নানা ফল। তাম্বুল সাজালেন পান্না খচিত পাত্রে। রাজকুমারী জাহানারা হৃদয়েশ্বরকে আজ স্বহস্তে ফলাহার করাবেন।

প্রথম বাসর গামিনী নব বধূর ছন্দে ভরা মরাল গামিনী জাহানারা। মঙ্গোলী দার্ঢ্যতা, ইরাণী সুষমা ও ভারতীয় কোমল গান্ধার রাগ সুর ও ছন্দের দ্যোতনায় দেহের প্রতি রেখায় আবেগে স্ফুটিত। ধমনীতে প্রবাহিত রক্তের ধারায় শাশ্বত শান্তির পরম তৃপ্তি।

ছুলেরা সেদিন বলেছিলেন,—'রাজকুমারী, তোমার কোন সংবাদ না পেয়ে ভেবেছিলাম, আমাকে হয়ত

বিস্মৃত হয়েছো! কিন্তু আমার অন্তরের সমস্ত কল্পনা দিয়ে তোমার রূপ আঁকতাম,—তা স্মরণ করতাম অহর্নিশি। আজ তোমায় দেখার পর, অদৃষ্ট ভিন্ন কেউ আর আমায় প্রতিরোধ করতে পারবে না।

বসন্তের ফুলবনের পরাগে আবেশিত ভ্রমরের ন্যায় প্রেমের মদিরায় মত্ত মন গুঞ্জরণে মুখরিত হলো। অবগুণ্ঠনের সোনালী সূতো দিয়ে চম্পক পুষ্পাধার হতে কয়েকটি ফুল তুলে মালা গাঁথলেন শাহজাদী। যুদ্ধের পূর্বে প্রত্যেক যোদ্ধা তাঁর প্রিয়-জনের সাথে মিলিত হন। দুলেরা কি জাহানারার সঙ্গে একটি মুহূর্তও ব্যয় করবেন না?

পুরানো প্রাসাদের রুদ্ধ নিঃসীমতা লয়ে নেমেছে অন্ধকার। নিদ্রাভ্রমণকারীর ন্যায় একের পর আর এক কক্ষ পরিভ্রমণ করতে লাগলেন জাহানারা। কি যেন এক অজ্ঞাত দুর্নিবার আকর্ষণ! নিজের অজ্ঞাতে এসে দাঁড়ালেন দুলেরার কক্ষের দ্বারে। মৃদু স্পর্শ দিয়ে অর্গলের উপর অঙ্গুলী অবলেপনে সঞ্চালিত করতে লাগলেন। যেন কোন চুম্বকের শক্তি লৌহকে আকর্ষণ করছে।

সেই মৃদু স্পর্শেই উন্মুক্ত হলো দুয়ার। দ্বার প্রান্তে ব্যাঘ্রচর্মের উপর শায়িত বীর সৈনিক। সুন্দরতর মুখখানি চন্দ্রকিরণে সমুদ্ভাসিত। মস্তকে তাঁর শুভ্র উষ্ণীষ। গলায় মুক্তার হার। কটিতে বাঁধা কোষবদ্ধ তরবারি। অমন সুন্দর ইতিপূর্বে আর মনে হয়নি দুলেরাকে। আবেগে প্রকম্পিত অভিসারিকা অবসন্ন হয়ে নিদ্রিত দয়িতের পাশে এলিয়ে পড়লেন। সুষুপ্ত সেই পুরুষের বসনাভ্যন্তরে মস্তক হলো লুপ্ত। এক গভীর মোহ। বুঝি ডুবে যাচ্ছেন এক মহাপ্রশান্তির সাগরে। অনাস্বাদিত তৃপ্তিতে ভরে উঠল মন। সহস্র রজনীর পূর্ণতা লয়ে এসেছে বুঝি এই একটি রাত।

কক্ষান্তরে ইতস্তত: পদবিক্ষেপের ধ্বনি ভেসে উঠল। স্বর্গ হতে চ্যুত হলেন সম্রাটকুমারী। দ্রুতপদ সঞ্চালনে নিজের কক্ষে ফিরে গেলেন। অলক্ষ্যে পড়ে রইলো অর্ধসমাপ্ত মালা।

প্রভাতের প্রথম আলো বিচ্ছুরিত হলো ধরণীর পূর্বকোণে। চলে গিয়েছিলেন দুলেরা। দিনের আলোয় গত রাতের দুলেরার অতিবাহিত কক্ষে এসে দেখলেন, তার ফেলে যাওয়া মালাখানি পড়ে নেই। মনে হলো শাহজাদীর, 'এই মালা তাঁদের জীবনের যোগসূত্র চিরন্তন করে রাখব।'

মাতা মমতাজের সমাধি মর্মর তাজমহলের উদ্যানে শেষ মিলনের দিন। দুলেরা পরেছিলেন মস্তকে হরিদ্রাভ উষ্ণীষ। সেই উষ্ণীষ বিছিয়ে দিয়েছিলেন শাহজাদী আসন করে। জীবনের শেষ কথা বলার সেই লগ্নে নজবৎ খানের অশুভ ছায়া ফুটে উঠেছিল শাহজাদীর চোখে। তাঁর কিছু বলার পূর্বাহ্নেই দুলেরা সহসা বলেছিলেন 'আওরঙ্গজেবের সেনাবাহিনীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঘৃণা করি নজবৎ খানকে। সর্বাগ্রে আমি তার অপসারণ চাই।

আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছিল জাহানারার। দুলেরা কি তাঁকে অবিশ্বাস করেন? উষ্ণ কণ্ঠে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'কেন?'

দুলেরা ধীর দৃঢ়তা সহকারে উত্তর দিলেন, 'আমি তাঁকে ভীষণ ঘৃণা করি।'

মনে পড়ে শাহজাদীর ফতেপুরে নজবৎ খানের নাম উচ্চারণ করায় চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন দুলেরা। শাহজাদী সেই বিদায় বেলা দুলেরার সমস্ত সন্দেহ নিরসন করবার জন্য মুখমণ্ডলের অবগুণ্ঠন সম্পূর্ণ উন্মোচন করে দিলেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে দুলেরা জানুক— নজবৎ খানের ন্যায় ব্যাক্তিকে সে বরণ করতে পারেনা।

দুলেরার শেষ ইচ্ছা ছিল, 'গৃহযুদ্ধে যদি যুবরাজ দারা বিজয়ী হন আর তিনি জীবিত থাকেন, তাহলে হিমালয়ের কোন প্রান্তদেশের পার্বত্য মন্দিরে তীর্থ যাত্রা করবেন। চম্বলের যুদ্ধই তাঁর জীবনের শেষ যুদ্ধ। পৃথিবীর রক্তাক্ত পথে আর তিনি চলবেন না। বিদায় সম্ভাষণের পূর্বে শাহজাদী তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আমি কি সেই পবিত্র পর্বতে তীর্থযাত্রা করতে পারব?'

অপূর্ব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল দুলেরার নয়ন। গমনোদ্যত দুলেরা উত্তর দিয়েছিলেন, 'পর্বতের পাদদেশে আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করবো। সেখানে যদি তোমাকে না পাই তবে সূর্যালোকের দেশে অনন্ত-কাল ধরে প্রতীক্ষায় থাকব।'...

—নানা গুজবে মুখরিত যুদ্ধের সংবাদ আসছিল রাজধানীতে। সবার শেষে এলো এক রক্তাক্ত ধূলি

ধূসরিত দূত। মূর্তিমান দুর্ভাগ্যের মত যুদ্ধের সংবাদ বহে।—বিজয় প্রায় সম্পূর্ণ হয়েও নিষ্ঠুর দুর্ভাগ্যের কাছে পরাজিত দারার বাহিনী।

সব শেষ। ভাগ্যের অনুলিখন সুনির্দিষ্ট হয়ে গেছে। সবার শেষে শাহজাদীর হিন্দু পরিচারিকা কোয়েল নিয়ে এলো একজন রাজপুত সৈনিককে বুন্দীরাজের অশ্বারোহী সৈনিক। ফতেপুরে এ ছিল ছুলেরার সঙ্গে। প্রভুর শেষ বার্তা নয়ে এসেছে আজ। শাহজাদীর কাছে নিবেদন করবে সে বার্তা। অবিশ্রান্ত রক্তপাতে সৈনিকের জীবন-প্রদীপ প্রায় নির্বাপিত। শুধু বুঝি প্রভুর শেষ কাহিনী শোনাবার জন্ম তখনো জীবিত। তাই এত দূরদূরান্ত ছুটে এসেছে সে।

শাহজাদী স্বহস্তে তাহার পরিচর্যা করলেন। ক্ষত-স্থান পরিষ্কার করলেন গভীর মমতাভরা হাতে। যেন এক প্রিয়বন্ধু এসেছে আহত হয়ে।

মূর্চ্ছিত প্রায় কণ্ঠে সাশ্রুনেত্রে সৈনিক বললে, 'শত্রুর গোলাবর্ষণে বিপর্যস্ত হলো দারার অগ্রসরায়মান সৈন্যগণ। আচম্বিত সেই আক্রমণে পলায়মান তখন সৈন্যগণ। নিহত হলেন বিশ্বস্ত সেনাপতি রুস্তম খান। কিন্তু দুর্দমনীয়কে বিক্রমে তখন বুন্দীরাজ নজবৎখানের অশ্বারোহী বাহিনীর আক্রমণ করে মুরাদের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। নিজ সৈন্যগণকে চিৎকার করে ডাক দিয়ে বললেন, 'পলাতকদের জীবন অভিশপ্ত! ক্ষাত্রধর্মানুশাসনে আজ আমরা আবদ্ধ। জয় ভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করবো না।' শত্রুর গোলার আঘাতে আহত প্রভুর হস্তী পলায়ন করল। হস্তীপৃষ্ঠ হতে অবতীর্ণ হয়ে তিনি অশ্বা-রোহণ করে শত্রুর বূহ ভেদ করে মুরাদকে লক্ষ্য করে মহাকালসম অব্যর্থ বর্শা উত্তোলন করলেন। আচম্বিতে একটি গোলা এসে প্রভুর ললাটে বিদ্ধ হলো। সঙ্গে সঙ্গে বিজয়ের শেষ সম্ভাবনা অস্তমিত হয়ে গেল। আমার বিশ্বাস নজবৎখানের গোলার আঘাতে নিহত হয়েছেন প্রভু।

বিগলিত নয়নধারায় সেই মুমূর্ষু সৈনিক আরো বললেন, 'প্রভুর পবিত্র দেহকে ঢোলপুর নদীর তীরে দাহ করতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যুদ্ধশেষে চুপি চুপি আমি তাঁর শবের পাশে এসে গলার মুক্তার হার দেখে ভাবলাম, 'বেগমসাহেবা হয়ত তাঁর পিতার সর্বশ্রেষ্ঠ ও বিশ্বাসী সামন্তের স্মৃতিচিহ্ন এ হার গ্রহণ করবেন।'

ভক্তিভরে সেই পরিচিত হার গ্রহণ করলেন শাহজাদী। অবগুণ্ঠনের অন্তরালে পরম যত্নসহকারে বক্ষে স্থাপন করলেন।

সৈনিক আবার বললে, 'একদিন প্রভুর নির্দেশে আওরঙ্গজেবের শিবিরে গিয়েছিলাম বার্তা নয়ে। আমি শুনলাম নজবৎখান আওরঙ্গজেবকে বলছেন, 'সম্রাটের ইচ্ছা নয় তাঁর কন্যা জাহনারাকে বন্ধের রাজবংশজাত সন্তানের সঙ্গে বিবাহ দেন, কিন্তু তিনি বুন্দীরাজের পৌত্তলিক মন্দিরের পূজারিণী স্বীকৃত হবেন কী? আওরঙ্গজেব তাঁকে উত্তর দিয়েছিল, 'তাই আমরা সমবেত শক্তি দিয়ে ধর্মদ্রোহী, ইসলামের শত্রুকে দিল্লীর সিংহাসনে বসতে দেব না।' প্রভুর কাছে এ কথা আমি বলে-ছিলাম। তারপর দেখেছি তিনি কখনো আর নজবৎ-খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে সাদর সম্ভাষণ বিনিময় করতেন না।

ছুলেরাকে আরো গভীরভাবে চিনতে পারলেন শাহ-জাদী। তাঁর মনের উৎস পরিষ্কার হয়ে উঠল সেদিন। এ বিশ্বাস হলো দৃঢ়তর, নিশ্চয়ই তিনি সূর্যালোকের দেশে থাকবেন প্রতীক্ষায়।

অবসন্ন সৈনিককে সেদিন দুর্গে রেখে শুশ্রূষা ও সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন। সৈনিক থাকে নি। শুধু শেষবারের মত বলে গেল, 'আমার কাজ সমাপ্ত। এবার আমি প্রভুর অনুসরণ করবো। যাবার বেলায় উর্ধ্বে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সৈনিক বললে, 'আমি ভবিষ্যৎ বাণী করে যাচ্ছি আজ, 'এই শেষ ; রাজপুত সামন্ত আর কখনো মুঘল পতাকাতলে সমবেতভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হবে না।
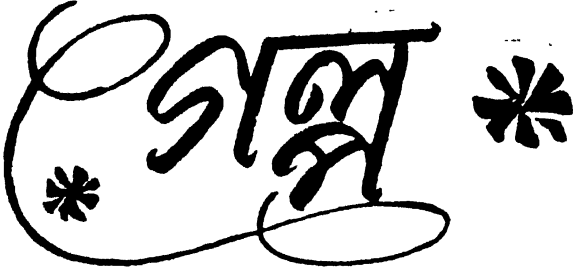
দুই বন্ধু

সন্তোষকুমার অধিকারী

অফিস থেকে বেরিয়ে এসে অনেকক্ষণ ফুটপাথে দাঁড়িয়ে রইলেন দীননাথ ; নাথ-শিপিং এজেন্সির ম্যানেজার দীননাথ সান্যাল। দারোয়ান আগেই জিজ্ঞেস করেছিল, ট্যাক্সি ডেকে দেবে কিনা। না—বলে বেরিয়ে এসেছেন। ট্যাক্সিতে গেলে এখনই ফুরিয়ে যাবে পথ। তারপর দীননাথ ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলেন—কোথায় যাওয়া যেতে পারে। বাড়ীতে? না। কোন আনন্দ নেই সেখানে। সারাদিনের প্রচণ্ড পরিশ্রমের পর শরীর ও মন দুইই অবসন্ন। একটানা ও একঘেয়ে খাটুনির শেষে বেরিয়ে এসেছেন। এখন সাড়ে পাঁচটা। কোথায় যাওয়া যেতে পারে? একটু হাঁপ ছাড়বার মত, মনের ভারটাকে নামিয়ে রাখার মত স্বচ্ছন্দ আবহাওয়া কোথায়? দীননাথ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলেন।

বেশীক্ষণ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা যায়না। ব্রেবোর্ণ রোড ধ'রে এগিয়ে চললেন। পাশ দিয়ে অগণিত লোক চলেছে। সারাদিনের শ্রমে তারা কিন্তু নির্জীব হয়ে পড়েনি। অত্যন্ত দরিদ্র কেরাণীটির চোখেও ঘরে ফেরার উৎসাহ। কিন্তু দীননাথের চোখে নেই।

অথচ কেন নেই? বাড়ীতে ত' তাঁরও স্ত্রী ছেলে-মেয়ে রয়েছে। তাহলে? দীননাথ সেখানে নিঃসঙ্গ। তাঁর কোন সাথী নেই। কারও অবসর নেই তাঁর দিকে তাকাবার। এমন কি তাঁর যে প্রয়োজন আছে এ কথা ভুলে গেছে যেন সবাই।

চিরদিনই এমনটা ছিল না। দীননাথ মোটামুটি সু[খী] ছিলেন। ছোট্ট একটা চাকরি করতেন। যা' মাই[নে] পেতেন, ঘর ভাড়া দিয়ে খুব বেশী কিছু থাকতো না। সপ্তাহে একদিনও ভাল মাছ কিনবার সামর্থ্য ছিল না। ভাল শাড়ি একখানাও ছিলনা তাঁর স্ত্রী শ্যামলীর। ছ[েলে]-মেয়ের স্কুলের মাইনে আর পোষাক জোগাতে গি[য়ে] বন্ধ করতে হয়েছিল অফিসে টিফিন। প্যাণ্ট ছিঁড়ে গে[লে] তালি দিয়েই চালাতে হ'য়েছে তাঁকে। তবুও সুখী ছিলে[ন] দীননাথ। বাড়ী ফিরলেই কাছে এসে বসতো শ্যামলী নিজের হাতে স্বামীর জামা খুলে দিয়ে হাতপাখা দি[য়ে] বাতাস করতো। চা মুড়ি দিয়ে অভ্যর্থনা যেন অপরূ[প] হ'য়ে ছিল। মাঝে মাঝে সন্ধ্যায় স্ত্রী আর ছেলে-মেয়ে[র] হাত ধরে বেড়াতে যেতেন। জীবনে অভাব ছিল, দুঃ[খ] ছিল, কিন্তু তৃপ্তিও কম ছিল না।

কিন্তু এ'ভাবে দিন চলছিল না—অভাব প্রতিদিন বাড়ছিল। এমন সময় হঠাৎ নাথ-শিপিং এজেন্সিতে এ[ই] চাকরিটা পেয়ে গেলেন দীননাথ। এখানে মাইনেটা ভাল, খাটুনিও প্রচণ্ড।

খাটুনি বেশী হওয়াতে দুঃখ ছিলনা দীননাথের। তাঁ[র] জীবনে তখনও প্রেরণা এসেছে—টাকা চাই। টাকা এল, বাড়ীর স্বাচ্ছন্দ্য এল। এমন কি প্রতিবেশীদের কাছে ঈর্ষার পাত্র হ'য়ে উঠলেন দীননাথ। তারপর কখন যে যৌবনের প্রখর মধ্যাহ্ন অপরাহ্নের ছায়াতে ম্লান হ'য়ে এল—তা খেয়াল হ'লোনা। কিন্তু একদিন বাড়ী ফিরে হঠাৎ অবসন্ন বোধ করলেন তিনি। বড় ক্লান্ত বোধ করলেন। চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বসে মনে মনে ভাবলেন—শ্যামলী যদি এসে মাথাটায় একটু হাত দেয়! কিন্তু শ্যামলী তখন সিনেমা দেখতে গেছে। মেয়ে কলেজের পড়া করছে; ছেলেরা বাড়ী নেই। দীননাথ অবশ হয়ে বসে রইলেন।

হঠাৎ আয়নার দিকে চোখ পড়লো। আয়নাতে এক প্রৌঢ়লোকের চেহারা চোখে পড়লো দীননাথের।

অনেকদিন পরে আজ নিজের যৌবনের চেহারাটা মনে করবার চেষ্টা করলেন দীননাথ। কিন্তু পারলেন না।

মনে হলো এই বিষণ্ণ নিঃসঙ্গতাই যেন আজীবন সঙ্গী তাঁর। দীননাথ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন।

অথচ অভাব কি তাঁর? ছেলে ও মেয়ে দুটিতেই কলেজে পড়ছে। ও'রা পলিটিক্যাল তর্ক করে এবং নেহরুর মুণ্ডপাত করে। ছোট ছেলে দুটি স্কুলের ছাত্র। গিন্নীর স্বাস্থ্য বেশ ভালো। সারাদিনের পর বিকেলে তিনি বন্ধুদের বাড়ী বেড়াতে যান। চাকর এসে দীননাথের সামনে একটি সন্দেশ ও চা রেখে গেল। আর দীননাথ নিজের হাতে নিজের কপাল টিপ্‌তে লাগলেন। আট-চল্লিশ ইঞ্চি পাখার হাওয়াটা কেমন যেন গরম বোধ হ'তে লাগলো।

আজ সকালেই ত। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কপালের ওপর থেকে কগাছা পাকা চুল একটা একটা করে তুলে ফেলছিলেন দীননাথ। কিন্তু ধরা পড়ে গেলেন। শ্যামলী ভাতের থালা নামিয়ে বলল—চুল তুলে কি আর বয়েস কমানো যায়? তারপর হাসতে হাসতে ঠাট্টার সুরে বলল—নাকি, নতুন ক'রে রঙ্‌ লাগ্‌ছে মনে?

দীননাথ লালদীঘির ভেতরে এসে পড়েছিলেন। ট্রাম-গুলি বেরিয়ে যাচ্ছে এক এক করে। কোনটা বালিগঞ্জ যাবে, কোনটা পার্কসার্কাসে। সবগুলি ট্রামই ভর্তি। লোক ঝুলছে বাইরে। এখান থেকে ওঠা যাবে না।

দীননাথের মনে পড়লো, এক সময় কলেজ ষ্ট্রীটে আড্ডা দেওয়ার একটা জায়গা ছিল তাঁর। তখন একটু আধটু লিখতেন তিনি। কিন্তু লেখা নষ্ট হয়ে গেছে অনেকদিন। এখন আর লেখা আসেনা। কি ক'রে আসবে? মন ত আর সেদিন নয়।

কেউ বোঝেনা। বন্ধুরা ঈর্ষা করে, তাকে এড়িয়ে যায়। পুরণো বন্ধুদের অনেকেই নানাদিকে ছিটকে গেছে। দীন-নাথ নিজেও খুব মিশুক নয়। দিনান্তে আড্ডা দেওয়ার মত একটি জায়গা তাঁর নেই।

দীননাথ ভাবছিলেন—তিনি ত বেশী কিছু চাননি। একটু শান্ত ভদ্র পরিবেশ। আর কিছু না থাক, সহজ ব্যবহার; যেখানে গল্প করতে পারা যায় মন খুলে। চিৎকার করে হেসে উঠতে বাধা নেই। একটু আন্ত-রিকতার, মমতার স্পর্শ।

ট্রাম ছেড়ে দিয়ে হেঁটে চললেন দীননাথ। ডালহৌসি স্কোয়ারের ভীড়টা হালকা হয়ে আসছে। কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট্‌ ধরে এগিয়ে চললেন তিনি।

হঠাৎ কোথা থেকে একঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া ছিট্‌কে এল। পলকে সমস্ত শরীর জুড়িয়ে গেল যেন। দীননাথ চেয়ে দেখলেন তিনি আকাশ-ভবনের সামনে এসে পড়েছেন। রাস্তা পার হ'লেই ময়দান। গড়ের মাঠের মধ্যে কলকাতা নেই। একটা অবাধ মুক্তির স্পর্শ লাগ্‌লো সর্বাঙ্গে।

কাল রাত্রের কথা মনে পড়লো। বাড়ী ফিরে শুন্‌লেন—বড় ছেলেকে নিয়ে শ্যামলী গান শুন্‌তে গেছে। সিনেমার কয়েকজন আর্টিষ্ট্‌ এসেছে গাইতে। সেখানেই। রাত্রে খেতে বসে স্ত্রীকে বললেন দীননাথ—আগে তোমাকে কতদিন বড় বড় সঙ্গীত সম্মেলনীতে নিয়ে যেতে চেয়েছি। তখন যাওনি, আর ওই সব প্যানপ্যানে ঘ্যানঘেনে আধুনিক সঙ্গীত শুন্‌তে ছুটেছিলে?

দীননাথের কথা শুনে তাঁর ছেলে প্রমোদ মুখ তুললো—কি বললেন বাবা? বরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান প্যানপেনে? স্ত্রী আর একধাপ এগিয়ে বললেন—তুমি গানের কিছু বোঝো নাকি?

দীননাথ আর কথা বাড়ান নি। তিনি বুঝতে পারছেন যে তিনি যুগের থেকে পেছনে রয়ে গেছেন।

মেয়ে স্কুলফাইন্যাল পাশ ক'রে কি নেবে, এমন একটা সমস্যা দেখা দিয়েছিল। দীননাথ বললেন—তুই দর্শন নে নীলা, ওটা আমার সাব্‌জেক্ট ছিল।

বাপের কথা শুনে মেয়ে মুখ ফেরালো। বড় ছেলে বললো—এখন আর দর্শন নিয়ে কোন লাভ নেই বাবা। ও কমার্স নিক্‌।

দেখা গেল মেয়ের ইচ্ছেও তাই।

বাড়ীতে কথা বলাই ছেড়ে দিয়েছেন দীননাথ। তাতে কারো কোন ক্ষতি হয়নি। বরং অকারণ একটা প্রতি-বন্ধকতার হাত থেকে সবাই যেন বেঁচে গিয়েছে।

জনবিরল পথ দিয়ে মাঝে মাঝে এক একটা গাড়ী উল্কার বেগে ছুটে যাচ্ছে। অনেক দূরে চৌরঙ্গীর নিওন আলোগুলো জ্বলছে আর নিভ্‌ছে। পেছনে গঙ্গার মৃদু শীতল বাতাস। অনেকদিন পর একটি নীরব সুস্থির

শান্তিকে উপভোগ করলেন দীননাথ। একটি সহজ আনন্দের আস্বাদ পেলেন—যা' সেই শৈশব জীবনেই শুধু পেয়েছিলেন।

অনেক আশা ছিল মনে; অনেক আকাঙ্ক্ষা। প্রথম যেদিন চাকরি পেলেন সেদিন কি উল্লাস তাঁর। ডালহৌসির একটা বিরাট অট্টালিকার একতলায় একটা লম্বা চওড়া রেজিষ্টারের সামনে বসে সে কি আনন্দ? সেদিন কি জানতেন দীননাথ—যে আগুন দেখলে পতঙ্গের মনে সেই একই উল্লাসের সাড়া জাগে!

আজ একটা অফিসের কর্মকর্তা দীননাথ। কিন্তু মনে এক অপরিসীম বিষণ্ণতা বোধ। নিরুৎসুক আশাশূন্য জীবন। মনে হচ্ছে পৃথিবী তাঁকে ছেড়ে এগিয়ে গেছে। ট্রেনের ছেড়ে যাওয়া ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মত তিনিও অবাঞ্ছিত, পরিত্যক্ত।

—দীনু না?

কে যেন পেছন থেকে এসে ঘাড়ে হাত রাখলো। দীননাথ চমকে উঠলেন। সামনে যে এসে দাঁড়িয়েছে, তার গায়ে সিল্কের ঢোলা পাঞ্জাবী আর পায়জামা। সমস্ত মুখ ভর্তি খোঁচা খোঁচা সাদা দাড়ি। মাথায় চুল একটাও কালো নেই। কিন্তু তার টকটকে ফর্সা রঙের জৌলুস আগের মতই আছে। আর আছে সেই টানা বিশাল দুটি কালো চোখ। দীননাথ স্তব্ধ হ'য়ে থেকে বললেন—হিরণ্ময়?

হ্যাঁ, আমি। কতদিন পরে তোকে দেখলাম। কতদিন পরে রে?

—তা' বোধ হয় বাইশ তেইশ বছর হ'বে।

—বোধ হয়। তোর বিয়েতে আমার যাওয়া হয়নি। তখন আমার হবু স্ত্রীকে খুসী করতে নৈনিতালে। তা কেমন আছিস্?

—একরকম। তুই?

হিরণ্ময়ের মুখে হাসির আভাস জাগলো। বললো—যেমন থাকা উচিত তেমনই আছি। চল্ এগিয়ে যাই। খেলা দেখতে এসেছিলাম। এখন বেড়াতে বেড়াতে চলেছি। তেষ্টা পেয়ে গেছে।

দুজনে এগিয়ে চললো গল্প করতে করতে। হিরণ্ময়ের মুখে তেমনি সরল হাসি। সেই প্রথম বয়সের মত প্রাণ খোলা চিৎকার তার গলায়। দীননাথ খুসী হ'লো—হিরণ্ময়ের জীবনের আনন্দ তাহ'লে অম্লান রয়েছে।

চৌরঙ্গীতে এসে একটা হোটেলে ঢুকলো দু'জনে। হিরণ্ময়ই অর্ডার দিল—কিস্‌ফ্রাই আর কফি। গরম কফিতে চুমুক দিয়ে বললো হিরণ্ময়—কেমন আছিস বল্? তোর বউ কেমন আছে?

—ভালো। সকলেই ভাল আছি। কিন্তু…জানিস্ হিরণ্ময়, অনেক দিন পরে তোর সঙ্গে দেখা। তোকেই আজ মন খুলে বলতে ইচ্ছে হচ্ছে: জীবনে বড় নিঃসঙ্গ হয়ে গেছি। মনে হচ্ছে, এতদিন ধ'রে শুধু আলেয়ার পেছনে ছুটে চলেছি। যা' পেলে মন ভরে ওঠে, তাই পাইনি।

হিরণ্ময় বললো—ছেলে মেয়ে কটি?

—চারটি।

—কে কি করছে?

—সবাই পড়াশোনা করছে এখনও। বড়টি এবার বি, এ, দেবে।

—বাঃ! তোকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন অনেক কিছু ঘটে গেছে তোর জীবনে। যাক্, ভগবান না করুন, দুঃখ পাওয়ার মত কিছু ঘটেনি। চাকরি করছিস কোথায়?

দীননাথ একটু অপ্রতিভস্বরে বললো,

—চাকরিও মোটামুটি ভালই করি। কিন্তু যা' বলছিলাম—শান্তি নেই। আনন্দ নেই জীবনে। মনে হয়, সারাটা জীবন নষ্ট করলাম; কিছুই পেলাম না। কিছু করতেও পারলাম না।

এবারে হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলো হিরণ্ময়। হাসতে হাসতে বললো—তুই ঠিক আগের মতই সেন্টিমেন্টাল রয়ে গেছিস দীনু! সুখ কি অমনি আসেরে, সুখকে জয় করে আনতে হয়। নিঃসঙ্গ? পৃথিবীতে সকলেই নিঃসঙ্গ। কোন একজন মানুষের চিন্তার সঙ্গে আর একজনের চিন্তার কোন মিল নেই। না থাকুক্। তাতে কি যায় আসে। আমার সুখ আমার মনে। আমার গুরুর মন্ত্র কি জানিস? যাক্‌গে, মরুক্ গে। যা কিছু ঘটুক্, ভাল মন্দ যা' কিছু আসুক্‥ …আমি বলি—যাক্ গে, মরুক্ গে। আমার কোন দুঃখ নেই, নিঃসঙ্গতা বোধ ও নেই?

হোটেল থেকে হিরণ্ময় বললে—একটু কাজ আছে। আয়।

হিরণ্ময় একটা ট্যাক্সি ধরলো। তারপর নিউমার্কেটের পাশের রাস্তাটায় ঘুরে গিয়ে একটা দোকানের সামনে গাড়ী দাঁড় করালো। তার ইঙ্গিতে দোকান থেকে একজন লোক ছুটি প্যাক্ করা নতুন বোতল দীননাথের হাতে দিয়ে গেল।

ট্যাক্সি ঘুরে গেল চৌরঙ্গীর দিকে। আর সেই অবসরে দীননাথ বললো—তুই মদ ধরেছিস ?

হিরণ্ময় হেসে উঠ্‌লো—ওই ত' তোর আঁকড়ে-ধরা নীতিবোধ। বল্‌লাম না, দুঃখকে এড়াতে হ'লে মনের মধ্যে থেকে ওই বাঁধনগুলো ছিঁড়ে ফেল্‌তে হবে ? আর ভয় নেই ; আমি বাড়ীতে আমার ঘরের মধ্যে ব'সে তবে ড্রিঙ্ক করি। বাইরে কখনও না।

বাড়ীর কথায় দীননাথ বললো—তুই সেই বালিগঞ্জে তোদের প্রাসাদেই থাকিস ত ?

—হ্যাঁ সেখানেই, তবে একখানা মাত্র ঘর আমার নিজের জন্যে রেখেছি। বাকিটা ভাড়া দিয়েছি।

—একখানা মাত্র ঘর ? দীননাথ হাত চেপে ধরলো হিরণ্ময়ের—তুই একা থাকিস ? তোর বউ ? ছেলে-মেয়ে ?

—আমার একটি ছেলেই আছে শুধু। সে ত' সিনেমা জগতের ষ্টার। নিউ আলিপুরে আলাদা ফ্ল্যাট্ নিয়ে থাকে।

আর বউ ?

হঠাৎ সশব্দে হেসে উঠ্‌লো হিরণ্ময়, তারপর মুখ নামিয়ে বললো—সবাই জানে, তুই জানিস্ না ? আমার এক দূর সম্পর্কের ভাই বোম্বেতে থাকে। ইঞ্জিনিয়ার। শোভনা গত এগারো বছর ধরে তার সঙ্গেই রয়েছে।

পার্ক ষ্ট্রীটের মোড়ে এসে আটকে পড়েছিল ট্যাক্সি। হঠাৎ দরজা খুলে মাঝ রাস্তাতেই নেমে পড়লো দীননাথ। বললো—আজ যাচ্ছি ভাই, আর একদিন কথা হ'বে।

আর একটি ট্যাক্সি ধরবার চেষ্টায় ফুটপাথের কাছে এসে দাঁড়ালো দীননাথ। ঘড়ির দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠেছে সে—রাত নটা বেজে গেছে। তার ছোট মেয়ে রীণা বলেছিল—আজ একটু তাড়াতাড়ি ফিরতে।

দীননাথ ব্যাকুল হয়ে ট্যাক্সি খুঁজতে লাগলো।

মহামৃত্যুঞ্জয় শোয়েৎজার

শ্রীসুধীর গুপ্ত

[জার্মানীর মানুষ ডাক্তার অ্যালবার্ট শোয়েৎজার বর্ত্তমান পৃথিবীর বিস্ময়কর প্রতিভাধর মহামানব ছিলেন। তিনি একাধারে দার্শনিক, গবেষক, ধর্ম্মবিদ্, সঙ্গীতসাধক, সেবাব্রতী, মানবপ্রেমিক ও চিকিৎসক ছিলেন। আফ্রিকার কুষ্ঠরোগাক্রান্ত দুর্গত মানুষদের সেবায় জীবনের সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর ব্যয় করিয়া নব্বই বৎসর বয়সে ইনি সম্প্রতি লোকান্তরপ্রাপ্ত হন। নিঃস্বার্থ মানবপ্রেমের জন্য বহু নির্যাতন, এমন কি ফরাসী সরকারের হস্তে তাঁহাকে দুঃসহ নির্বাসন-দণ্ডও সহ্য করিতে হইয়াছিল।]

ধাতৃ ধরা জীবিতেরে রাখে বুকে ক'রে।
মৃত্যু দেয় দ্বারে দ্বারে বারে
বারে হানা,
মানে না সে জীবনের সীমানারও মানা ;
প্রাণ পক্ষিবৃন্দে লয় শ্যেন সম হ'রে।
তবু মহামৃত্যুঞ্জয় সভ্যতার ক্রোড়ে
বিবর্দ্ধিত হয় যা'রা, তাহাদের ডানা
উল্লঙ্ঘিয়া চ'লে যায় মৃত্যুরও সীমানা ;
বিশ্ব যায় বিচ্ছুরিত প্রাণ-রঙ্গে ভরে।

জলদর্চ্চি-প্রজ্ঞা-দীপ্ত সেবা-তৃপ্ত প্রাণ
আফ্রিকার কাফ্রীদের কল্যাণে সঁপিয়া,
যুদ্ধ-দীর্ণ এ যুগেও করিলে প্রমাণ
সভ্যতা-সংবাহী যায় উল্লাসে ভাঙিয়া
ভেদ-জাত গণ্ডী যত। অমর মহান,
মৃত্যুঞ্জয়-মন্ত্র গেলে এ মর্ত্ত্যেরে দিয়া।

সেকালের আমোদ-প্রমোদ

পৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

হাফ্-আখ্ড়াই, ফুল-আখ্ড়াই, যাত্রা, পাঁচালি, সঙের আসর প্রভৃতির ব্যবস্থা ছাড়াও, বারোইয়ারি (বারোয়ারী) দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে সেকালে রীতিমত ধূমধাম-আড়ম্বর ও প্রচুর অর্থব্যয়ে লোকরঞ্জনের জন্ম আরো যে সব বিচিত্র অনুষ্ঠানের জমজমাট মজলিসের আয়োজন হতো, ৺কালী প্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের সুপ্রসিদ্ধ 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' গ্রন্থে তার নিখুঁত-অপরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। একালের অনুসন্ধিৎসু-পাঠকপাঠিকাদের কৌতূহল-নিবারণের উদ্দেশ্যে নীচে সেকালের সেই সব বিচিত্র কীর্ত্তিকলাপের কয়েকটি চিত্তাকর্ষক বিবরণ উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

* * *

(৺কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত)

······রবিবারটা দেখ্তে দেখ্তে গ্যালো, আজ সোমবার—শেষ পুজোর আমোদ, চোহেল ও ফররার শেষ, আজ বাই, খ্যাম্টা, কবি ও কেত্তন।

বাইনাচের মজলিশ চূড়োন্ত সাজানো হয়েছে, গোলাপ মল্লিকের ছেলের ও রাজা বেজেন্দরের কুকুরের বের মজলিশ এর কাছে কোথায় লাগে? চক্-বাজারের প্যালানাথ বাবু বাই মহলের ডাইরেক্টরী, সুতরাং বাই ও খ্যাম্টা নাচের সমুদায় ভার তাঁকেই দেওয়া হয়েছিল। সহরের নন্নী, ছুন্নী, মুন্নী, খন্নী ও সন্নী প্রভৃতি ডিগ্রী, মেডেল ও সার্টিফিকেটওয়ালা বড় বড় বাইয়েরা ও গোলাপ, শাম, বিদ্ধু, খুদু, মণি ও চুণী প্রভৃতি খ্যাম্টাওয়ালীরা নিজ নিজ তোবড়া তুব্ড়ি সঙ্গে করে আস্তে লাগ্লেন—প্যালানাথবাবু সকলকে মা গোঁসাইয়ের মতসমাদরে রিসিভ্ কচ্চেন—তাঁদেরও গরবে মাটিতে পা পড়্চে না।

প্যালানাথবাবুর হীরের ওয়াচ গার্ডে ঝোলান আধুলির মত মেকাবী হন্টিঙের কাঁটা নটা পেরিয়েচে। মজলিশে বাতির আলো শরদের জ্যোৎস্নাকেও ঠাট্টা কচ্চে, সারঙ্গের কোঁয়া কোঁয়া ও তবলার মন্দিরের রুনুঝুনু তালে "আরে সাঁইয়া মোরারে তেরি মেরো জানরে" গানের সঙ্গে এক তায়ফা মজলিশ রেখেচে। ছোট ছোট "ট্যাস্ল" "হামামা" ও "ভাজিরা" "এ কোণ থেকে ও কোণ, এ চৌকি থেকে ও চৌকি" করে ব্যাড়াচ্চেন (অধ্যক্ষদের ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলে ও মেয়েরা) এমন সময় একখানা চেরেট গুড়্ গুড়্ করে বারোইয়ারিতলায় "গড্ সেভ্ দি কুইন" লেখা গেটের কাছে থাম্লো। প্যালানাথ-বাবু দৌড়ে গ্যালেন—গাড়ি থেকে জরি ও কিংখাপ মোড়া জরির জুতোসুদ্ধ একটা দশমুনী তেলের কুপো ও এক কুটে মোসাহেব নাব্লেন, কুপোর গলায় শিকলের মত মোটা চেন ও আঙ্গুলে আঠারটা করে ছত্রিশটা আংটি।

প্যালানাথবাবুর একজন মোসাহেব "বড়বাজারের পচ্চুবাবু তুলোর ও পিস্‌গুড্ডের দালাল, বিস্তর টাকা। বেশ লোক" বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। পচ্চু বাবু মজলিশে ঢুকে মজলিসের বড় প্রশংসা কল্লেন, প্যালানাথ বাবুকে ধন্যবাদ দিলেন, উভয়ে কোলাকুলি হলো, শেষে পচ্চুবাবু প্রতিমে ও মাতালো মাতালো সঙেদের (যথা কেষ্ট, বলরাম, হনুমান্ প্রভৃতি) ভক্তিভরে প্রণাম কল্লেন ও বাইজীকে সেলাম করে দুখানি আমেরিকান চৌকি জুড়ে বস্‌লেন। দুটি হাত, এক কুড়ি পানের দোনা, চাবির থোলো ও রুমালের জন্য আপাতত কিছুক্ষণের জন্য আর দুখানি চৌকি ইজারা নেওয়া হলো, কুটে মোসাহেব পচ্চ বাবুর পেছন দিকে বস্‌লেন, সুতরাং তাঁরে আর কে দেখ্‌তে পায়? বড়মানষের কাছে থাক্‌লে লোকে যে "পর্ব্বতের আড়ালে আছ" বলে থাকে, তার ভাগ্যে তাই ঠিক ঘট্‌লো।

পচ্চু বাবুর চেহারা দেখে বাই আড়ে আড়ে চেয়ে হাস্‌চে, প্যালানাথ বাবু আতর, পান, গোলাব ও তোব্‌রা দিয়ে খাতির কচ্চেন; এমন সময় গেটের দিকে গোল উঠ্‌লো—প্যালানাথ বাবুর মোসাহেব হীরেলাল রাজা অঞ্জনারঞ্জন দেব বাহাদুরকে নিয়ে মজলিশে এলেন।

রাজা বাহাদুরের গিল্টিকরা গালাভরা আশা সকলের নজর পড়ে এমন জায়গায় দাঁড়ালো! অঞ্জনারঞ্জন দেব বাহাদুর গৌরবর্ণ, দোহারা—মাথায় খিড়কীদার পাগড়ি—জোড়া পরা—পায়ে জরির লপেটা জুতো, বদ্‌মাইসের বাদ্‌শা ও স্নাকার সদ্দার! বাই, রাজা দেখে কাছ বাগে সরে এসে নাচতে লাগ্‌লো, "পূজোর সময় পরবস্তি হই যেন" বলেই তব্‌লচী ও সারেঙ্গীরা বড় রকমের সেলাম বাজালে, বাজে লোকেরা সং ও বাই ফেলে কোন অপরূপ জানোয়ারের মত রাজা বাহাদুরকে একদৃষ্টে দেখ্‌তে লাগলেন।

ক্রমে রাত্তিরের সঙ্গে লোকের ভিড় বাড়্‌তে লাগ্‌লো, সহরের অনেক বড়মানুষ রকম রকম পোশাক পরে একত্র হলেন, নাচের মজলিশ রনুরনু কত্তে লাগ্‌লো, বীরকৃষ্ণ দাঁর আনন্দের সীমা নাই, নাচের মজলিশের কেতা ও শোভা দেখে আপনা আপনি কৃতার্থ হলেন, তাঁর বাপের শ্রাদ্ধতে বামুন খাইয়েও এমন সন্তুষ্ট হতে পারেন না।

ক্রমে আকাশের তারার মত মাথালো মাথালো বড়মানুষ মজলিশ থেকে খস্‌লেন, বুড়োরা সরে গ্যালেন, ইয়ারগোচের ফচ্‌কে বাবুরা ভাল হয়ে বস্‌লেন, বাইরা বিদেয় হলো—খ্যামটা আসরে নাবলেন।

খ্যাম্‌টা বড় চমৎকার নাচ। সহরের বড়মানুষ বাবুরা প্রায় ফি রবিবারে বাগানে দেখে থাকেন। অনেকে ছেলে-পুলে, ভাগ্নে ও জামাই সঙ্গে নিয়ে একত্রে বসে খ্যাম্‌টার অনুপম রসাস্বাদনে রত হন। কোন কোন বাবুরা স্ত্রীলোকদের উলঙ্গ করে খ্যামটা নাচান—কোনখানে কিস্ না দিলে প্যালা পায় না—কোথাও বলবার যো নয়!

সেকালের সারেঙ্গীওয়ালা
(প্রাচীন চিত্রের প্রতিলিপি হইতে)

বারোইয়ারিতলায় খ্যাম্‌টা আরম্ভ হলো, যাত্রার যশোদার মত চেহারা দুজন খ্যামটাওয়ালী ঘুরে ঘুরে কোমর নেড়ে নাচতে লাগলো, খ্যাম্‌টাওয়ালারা পেছন থেকে "ফণির মাথার মণি চুরি কল্লি, বুঝি বিদেশে বিঘোরে পরাণ হারালি" গাচ্চে, খ্যাম্‌টাওয়ালীরা ক্রমে নিমন্ত্রেদের সকলের মুখের কাছে এগিয়ে এগিয়ে অগ্‌গরদানী ভিকিরীর মত প্যালা আদায় করে তবে ছাড়লেন! রাত্তির দুটোর মধ্যেই খ্যাম্‌টা বন্ধ হলো—খ্যামটাওয়ালীরা

অধ্যক্ষমহলে যাওয়া আসা কত্তে লাগলেন, বারোইয়ারিতলা পবিত্র হয়ে গ্যালো।

* * *

বাই-নাচ ও থ্যাম্‌টার মতোই কবি গান ও কীর্ত্তনের রীতিমত কদর ছিল—সেকালের এই সব বারোইয়ারি আসরের প্রমোদ-বিলাসী দর্শক শ্রোতাদের কাছে। কথিত আছে—প্রাচীন কলিকাতার হিন্দু সমাজের শিরোমণি রাজা নবকৃষ্ণ স্বয়ং ছিলেন সেকালের কবিওয়ালাদের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক…তাঁ'রই উৎসাহে অনুগ্রহে সে আমলে রাম বসু, হরু ঠাকুর, নিলু, রামপ্রসাদ ঠাকুর ও জগা প্রভৃতি বহু সুবিখ্যাত কবিওয়ালা সবিশেষ কলানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। সেকালের কবি গান আর কীর্ত্তনের আসর কি ধরণের জমজমাট আনন্দমুখর হয়ে উঠতো—৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের সুপ্রসিদ্ধ 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' গ্রন্থে, তারও সুস্পষ্ট মনোরম পরিচয় মেলে।

* * *

…এদিকে বারোইয়ারিতলায় জমিদারী কবি আরম্ভ হলো, ভাল্‌কোর জগা ও নিম্‌তের রামা ঢোলে "মহিম্নস্তব" "গঙ্গাবন্দনা" ও "ভেট্‌কিমাছের তিনখানা কাঁটা" "অগ্‌গরদ্বীপের গোপীনাথ" "যাবি তো যা যা ছুটে ছুটে যা" প্রভৃতি বোল্ বাজাতে লাগ্‌লো; কবিওয়ালা বিষমের ঘরে (পঞ্চমের চার গুণ উঁচু) গান ধল্লেন—

চিতেন।

বড় বারে বারে এসো ঘরে মকদ্দমা করে ফাঁক্।
এই বারে, গেরে, তোমার কল্লে সূর্পণখার নাক্॥

অন্তরাই।

ক্যামন সুখ পেলে, কম্বলে শুলে, ব্রহ্মোত্তর, দেবত্তর
বড় নিতে জোর করে।
এখন জারী গ্যালো, ভূর ভাংলো তোমার, আস্তো
জুলুম্ চলবে না!
পেনেলকোডের আইনগুণে মুগুজ্যের পোর
ভাংলো জাঁক॥
বেআইনির দফারফা বদমাইসি হলো খাক্॥

মোহাড়া।

কুইনরে থাসে, দেশে, প্রজার দুঃখ রবে না।
মহামহোপাধ্যায় মথুরানাথ মুসড়ে গিয়েচেন।
বংসধ্বংসকারী লেটোর, জেলায় এসেচেন।
এখন গুমি গেরেপ্তারি লাঠি দাঙ্গা ফোর্জ্জ চলবে না॥

জমিদারী কবি শুনে সহুরেরা খুসি হলেন, ছু চার পাড়াগেঁয়ে রায় চৌধুরী, মুন্‌সি ও রায় বাবুরা মাতা হেঁট কল্লেন, হুজুরী আম-মোক্তাররা চোক্ রাঙ্গিয়ে উঠ্‌লো, কবিওয়ালারা ঢোলের তালে নাচ্‌তে লাগ্‌লো!

স্ক্যাভেঞ্জারের গাড়ি সার বেঁধে বেরিয়েচে। ম্যাথরেরা ময়লার গাড়ি ঠেলে জক্‌সেনের ঘাটে চলেচে। বাউলেরা ললিত রাগে খরতাল ও খঞ্জনীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সহস্র নাম ও

"ঝুলিতে মালা রেখে, জপ্‌লে আর হবে কি।
কেবল কাঠের মালার ঠক্‌ঠকী, সব ফাঁকি।'

লোকের দুয়ারে দুয়ারে গান করে বেড়াচ্চে। কলু ভায়া ঘানি জুড়ে দিয়েচেন। ধোপারা কাপড় নিয়ে চলেচে। বোঝাই করা গরুর গাড়ি কোঁ কোঁ শব্দে রাস্তা জুড়ে যাচ্চে —ক্রমে ফরসা হয়ে এলো! বারোইয়ারিতলায় কবি বন্ধ হয়ে গ্যালো, ইয়ারগোছের অধ্যক্ষ ও দর্শকেরা বিদেয় হলেন, বুড়ো ও আধবুড়োরা কেত্তনের নামে এলিয়ে পড়্‌লেন; দেশের গোঁসাই, গোঁড়া, বৈরাগী ও বষ্টম একত্র হলো—সিম্‌লের শাম ও বাগবাজারের নিস্তারিণীর কেত্তন! সিম্‌লের শাম উত্তম কিত্তুনী—বয়স অল্প—দেখ্‌তে মন্দ নয়, গলাখানি যেন কাঁসি খন্‌খন্ কচ্চে। কেত্তন আরম্ভ হলো —কিত্তুনী "তাথইয়া তাথইয়া নাচত ফিরত গোপাল ননি চুরি করি খাঞৗছে, আরে আরে ননি চুরি করি খাঞৗছে তাথইয়া তাথইয়া" গান আরম্ভ কল্লে, সকলে মোহিত হয়ে পড়লেন! চার দিক থেকে হরিবোল ধ্বনি হতে লাগ্‌লো, খুলিরে হাঁটু গেড়ে বসে সজোরে খোল বাজাতে লাগলো! কিত্তুনী কখন হাঁটু গেড়ে কখন দাঁড়িয়ে মধু বিষ্টি কত্তে লাগলেন—হরিপ্রেমে এক জন গোঁসাইয়ের দশা লাগ্‌লো, গোঁড়ারা তাঁকে কোলে করে নাচ্‌তে লাগ্‌লো। আর যেখানে তিনি পড়েছিলেন, জিব দিয়ে সেইখানের ধূলো চাটতে লাগলো!……

* * *

…এদিকে বারোইয়ারিতলায় কেত্তন বন্ধ হয়ে গ্যালো, কেত্তনের শেষে এক জন বাউল সুর করে এই গানটি গাইলে।

বাউলের সুর

আজব সহর কল্‌কেত্তা

রাঁড়ি বাড়ি জুড়ি গাড়ি মিছে কথার কি কেতা।
হেতা ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে বলিহারি ঐক্যতা ;
যত বক বিড়ালে ব্রহ্মজ্ঞানী, বদ্‌মাইসির ফাঁদ পাতা।
পুঁটে তেলির আশা ছড়ি, শুঁড়ী সোনারবেণের কড়ি,
খ্যাম্‌টা খান্‌কির খাসা বাড়ি, ভদ্রভাগ্যে গোলপাতা।
হদ্দ হেরি হিন্দুয়ানি, ভিতর ভাঙ্গা ভড়ংখানি,
পথে হেগে চোখরাঙ্গানি, লুকোচুরির ফের গাঁতা।
গিল্টি কাজে পালিশ করা, রাঙ্গা টাকায় তামা ভরা,
হুতোম দাসে স্বরূপ ভাষে, তফাৎ থাকাই সার কথা।

গানটি শুনে সকলেই খুসি হলেন। বাউলে চার আনার পয়সা বক্‌সিস পেলে ; অনেকে আদর করে গানটি শিখে ও লিখে নিলেন।

বারোইয়ারি পুজো শেষ হলো, প্রতিমেখানি আট দিন রাখা হলো, তার পর বিসর্জ্জন করবার আয়োজন হতে লাগ্‌লো। আমমোক্তার কানাইধনবাবু পুলিস হতে পাস করে আন্‌লেন। চার দল ইংরেজি বাজনা, সাজা তুরুক্‌-শোয়ার নিশেন ধরা ফিরিঙ্গি, আশাসোঁটা, খড়ি ও পঞ্চাশটা ঢাক একত্র হলো। বাহাদুরী কাট তোলা চাকা একত্র করে গাড়ির মত করে তাতেই প্রতিমে তোলা হলো ; অধ্যক্ষেরা প্রতিমের সঙ্গে সঙ্গে চল্লেন, দু পাশে সঙেরা সার বেঁদে চল্লো। চিৎপুরের বড় রাস্তা লোকারণ্য হয়ে উঠ্‌লো, রাঁড়েরা ছাতের ও বারাণ্ডার উপর থেকে রূপো-বাঁদান হুকোয় তামাক খেতে খেতে তামাশা দেখ্‌তে লাগলো, রাস্তায় লোকেরা হাঁ করে চল্‌তি ও দাঁড়ানো প্রতিমে দেখ্‌তে লাগলেন। হাটখোলা থেকে যোড়াসাঁকো ও মেছোবাজার পর্য্যন্ত ঘোরা হলো, শেষে গঙ্গাতীরে নিয়ে বিসর্জ্জন করা হলো। অনেক পরিশ্রমে যে বিশ পঁচিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করা হয়েছিল, আজ তারি শ্রাদ্ধ ফুরুলো। বীরকৃষ্ণ দাঁ ও আর আর অধ্যক্ষেরা অত্যন্ত বিষণ্ণ বদনে বাড়ি ফিরে গ্যালেন। বাবুদের ভিজে কাপড় থাকলে অনেকেই বিবেচনা কত্তো যে বাবুরো মড়া পুড়িয়ে এলেন !

•• ... ...

* * *

সেকালের দুর্গোৎসব সম্বন্ধে ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় নিপুণ ভঙ্গীতে "হুতোম প্যাঁচার নক্সা" গ্রন্থে আরো যে সব বিচিত্র কৌতূহলোদ্দীপক কীর্ত্তিকলাপের কাহিনী বর্ণনা করেছেন, প্রসঙ্গক্রমে তারও কিয়দংশ নীচে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো। আজ থেকে একশো বছর আগে আমাদের দেশে দুর্গোৎসব অনুষ্ঠান কিভাবে প্রতিপালিত হতো, নীচের উদ্ধৃতাংশ থেকে একালের অনুসন্ধিৎসু-পাঠকপাঠিকারা সুস্পষ্টভাবেই তার নিখুঁত-মনোরম পরিচয় পাবেন।

* * *

(৺কালীপ্রসন্ন সিংহ রচিত 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত)

দুর্গোৎসব বাঙ্গালা দেশের পরব, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে এর নাম গন্ধও নাই ; বোধ হয়, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমল হতেই বাঙ্গালায় দুর্গোৎসবের প্রাদুর্ভাব বাড়ে। পূর্ব্বে রাজারাজড়া ও বনেদী বড় মানুষদের বাড়িতেই কেবল দুর্গোৎসব হতো, কিন্তু আজকাল পুঁটে তেলীকেও প্রিতিমা আনতে দ্যাখা যায় ; পূরকার দুর্গোৎসব ও এখনকার দুর্গোৎসবে অনেক ভিন্ন।

ক্রমে দুর্গোৎসবের দিন সংক্ষেপ হয়ে পড়লো ; কৃষ্ণনগরের কারিকরেরা কুমারটুলী ও সিদ্ধেশ্বরীতলা জুড়ে বসে গ্যালো, জায়গায় জায়গায় রংকরা পাটের চুল, তবলকীর মালা, টিন ও পেতলের অসুরের ঢাল তলওয়ার নানা রঙ্গের ছোবান প্রিতিমের কাপড় ঝুলতে লাগলো ; দর্জ্জীরা ছেলেদের টুপি, চাপকান ও পেটী নিয়ে দরোজায় দরোজায় বেড়াচ্চে ; "মধু চাই !" "শাখা নেবে গো !" বলে ফিরিওয়ালারা ডেকে ডেকে ঘুচ্চে। ঢাকাই ও শান্তিপুরে কাপুড়ে মহাজন, আতরওয়ালা ও যাত্রার দালালেরা আহার নিদ্রে পরিত্যাগ করেছে। কোনখানে কাঁসারীর দোকানে রাশীকৃত মধুপর্কেরবা টি, চুমকি ঘটি ও পেতলের থালা ওজন হচ্চে। ধুপ ধুনো, বেণে মসলা ও মাথাঘষার একট্টা দোকান বসে গ্যাচে। কাপড়ের মহাজনেরা দোকানে ডবল পর্দ্দা ফেলেচে ; দোকান ঘর অন্ধকারপ্রায়, তারি ভেতরে বসে যথার্থ পাই লাভে বউনি হচ্চে। সিঁদুরচুপড়ি, মোমবাতি, পিঁড়ে ও কুশাসনেরা অবসর বুঝে দোকানের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তার ধারে অ্যাকুডক্টের উপর

বার দিয়ে বসেচে। বাঙ্গাল ও পাড়াগেঁয়ে চাক্‌রেরা আরসি, ঘুন্‌সি, গিল্‌টির গহনা ও বিলিতী মুক্তো একচেটের কিন্‌চেন; রবরের জুতো, কমফরটর, ছিট ও স্ত্রাজওয়ালা পাগড়ি অগুন্তি উঠ্‌চে; ঐ সঙ্গে বেলোয়ারি চুড়ি, আঙ্গিয়া, বিলিতী সোনার শীলআংটি ও চুলের গার্ডচেনেরও অসঙ্গত খদ্দের। এত দিন জুতোর দোকান ধুলো ও মাকড়সার জালে পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু পুজোর মোরশুমে বিয়ের কনের মত ফেঁপে উঠ্‌চে; দোকানের কপাটে কাই দিয়ে নানা রকম রঙ্গীণ কাগজ মারা হয়েচে, ভেতরে চেয়ার পাড়া, তার নীচে এক টুকরো ছেঁড়া কারপেট। সহরের সকল দোকানেরই শীতকালের কাগের মত চেহারা ফিরেচে। যত দিন ঘুনিয়ে আসচে, ততই বাজারের কেনা ব্যাচা বাড়চে, ততই কলকেতা গরম হয়ে উঠ্‌চে। পল্লীগ্রামের টুলো অধ্যাপকেরা বৃত্তি ও বার্ষিক সাদতে বেরিয়েচেন, রাস্তায় রকম রকম তরবেতর চেহারার ভিড় লেগে গ্যাচে। কোনখানে খুন, কোনখানে দাঙ্গা, কোথায় সিঁদচুরি, কোনখানে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কাছ থেকে দু ভরি রূপো গাঁটকাটায় কেটে নিয়েচে, কোথাও মাগীর নাকে থেকে নথটা ছিঁড়ে নিয়েচে, পাহারাওয়ালারা শশব্যস্ত পুলিস বদমাইস পোরা, চোরেরা পুজোর মোরশুমে দেদার কারবার ফলাও কচ্চে, "লাগে তাক্ না লাগে তুকো" "কিনি তো হাতী, লুটি ত ভাণ্ডার" তাদের জপমন্ত্র হয়েচে; অনেক পার্ব্বণের পূর্ব্বে শ্রীঘরে ও বাস্কুলে বসাত কচ্চে; কারো পুজোয় পাথরে পাঁচ কিল; কারো সর্ব্বনাশ! ক্রমে চতুর্থী এসে পড়্‌লো।

এবার অমুক বাবুর নতুন বাড়িতে পূজার ভারি ধুম। প্রতিপদাদি কল্পের পর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিদায় আরম্ভ হয়েচে, আজও চাকে নাই—ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে বাড় গিস্ গস্ কচ্চে। বাবু দেড় ফিট উচ্চ গাদির উপর তসরকাপড় পরে বার দিয়ে বসেচেন, দক্ষিণে দেওয়ান টাকা ও সিকি আধুলির তোড়া নিয়ে খাতা খুলে বসেচেন, বামে হবাশ্বর ন্যায়লঙ্কার সভাপণ্ডিত, অনবরত নস্য নিচ্চেন ও নাসানিঃসৃত রঙ্গীণ কফজল আজিমে পুচ্চেন। এদিকে জহরী জড়ওয়া গহনার পুঁটুলি ও ঢাকাই মহাজন ঢাকাই শাড়ার গাঁট নিয়ে বসেচে, মুন্সি মশাই, জামাই ও ভাগ্নেবাবুরা ফর্দ্দ কচ্চেন, সামনে কতকগুলি প্রতিমেফ্যালা দুর্গাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ, বাইয়ের দালাল, যাত্রার অধিকারী ও গাইয়ে ভিক্ষুক "যে আজ্ঞা" "ধর্ম্ম অবতার" প্রভৃতি প্রিয়বাক্যের উপহার দিচ্চেন। বাবু মধ্যে মধ্যে কারেও এক আধটা আগমনী গাইবার ফরমাস কচ্চেন। কেও খোসগল্প ও অন্য বড়মানুষের নিন্দাবাদ করে বাবুর মনোরঞ্জনে উপক্রমণিকা কচ্চেন,—আসল মতলব বৈশারন হৃদে রয়েচে, উপযুক্ত সময়ে তীরস্থ হবে। আতরওয়ালা, তামাকওয়ালা, দানাওয়ালা ও অন্যান্য পাওনাদার মহাজনরা বাইরে বারাণ্ডায় ঘুচ্চে- পূজো যায় তথাচ তাদের হিসেব নিকেশ হচ্চে না। সভাপণ্ডিত মহাশয় সরপটে পিরিলীর বাড়ির বিদেয় নেওয়া ও বিধবাদলের এবং বিপক্ষপক্ষের ব্রাহ্মণদের নাম কাটচেন; অনেকে তাঁর পা ছুঁয়ে দিব্বি গালচেন যে, তাঁরা পিরিলীর বাড়ি চেনেন না; বিধবা বিয়ের সভায় যাওয়া চুলোয় যাক, গত বৎসর শয্যাগত ছিলেন বল্লেই হয়। কিন্তু বানের মুখে জেলেডিঙ্গীর মত তাঁদের কথা তল্ হয়ে যাচ্চে, নামকাটাদের পরিবর্ত্তে সভাপণ্ডিত আপনার জামাই, ভাগ্নে, নাতজামাই, দৌত্তর ও খুড়তুতো ভেয়েদের নাম হাঁসিল কচ্চেন; এদিকে নামকাটারা বাবু ও সভাপণ্ডিতকে বাপান্ত করে পৈতা ছিঁড়ে গালে চড়িয়ে শাঁপ দিয়ে উঠে যাচ্ছেন। অনেক উমেদারের অনিয়ত হাজ্‌রের পর বাবু কাকেও "আজ যাও" "কাল্ এসো" "হবে না" "এবার এই হলো" প্রভৃতি অনুজ্ঞায় আপ্যায়িত কচ্চেন—হজুরীসরকারের হেকমৎ ত্থাখে কে? সকলেই শশব্যস্ত পূজার ভারি ধুম!

ক্রমে চতুর্থীর অবসান হলো, পঞ্চমী প্রভাত হলেন—ময়রারা দুর্গোমোণ্ডা ও আগাতোলা সন্দেশের ওজন দিতে আরম্ভ কল্লে। পাঁঠার রেজিমেণ্টকে রেজিমেণ্ট বাজারে প্যারেড্ কত্তে লাগ্‌লো, গন্ধবেণেরা মসলা ও মাথাঘষা বেঁধে বেঁধে ক্লান্ত হয়ে পড়লো। আজ সহরের বড় রাস্তায় চলা ভার; মুটেরা প্রিমিয়মে মোট বইচে, দোকানে খদ্দের বসবার স্থান নাই। পঞ্চমী এইরূপে কেটে গ্যালো। আজ ষষ্ঠী; বাজারে শেষ কেনাবেচা, মহাজনের শেষ তাগাদা, আশার শেষ ভরসা। আজ আমাদের বাবুর বাড়িরও অপূর্ব্ব শোভা; সব চাকর-বাকর নতুন তকমা, উর্দি ও পড় প:। ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে, দরজার দুই দিকে পূর্ণকুম্ভ ও আম্রসার দেওয়া হয়েচে, ঢুলীরা মধ্যে মধ্যে রোশন-

চৌকি ও শানাইয়ের সঙ্গে বাজাচ্চে, জামাই ও ভাগ্নে বাবুরা নতুন জুতো ও নতুন কাপড় পরে কররা দিচ্ছেন, বাড়ীর কোন বৈঠকখানার আগমনী গাওয়া হচ্ছে, কোথাও নতুন তাসজোড়া পরকান হচ্চে, সমবয়সী ও ভিক্ষুকের ম্যালা লেগেচে, আতরের উমেদারেরা বাবুদের কাছে শিশি হাতে করে সাত দিন ঘুচ্চে, কিন্তু বাবুদের এমনি অনবকাশ যে দু ফোঁটা আতর দানের অবসর হচ্চে না।

এদিকে সহরের বাজারের মোড়ে ও চৌরাস্তায় ঢুলী ও বাজন্দারের ভিড়ে সেঁদেনো ভার। রাজপথ লোকারণ্য; মালীরা পথের ধারে পদ্ম, চাঁদমালা, বিল্লপত্তর ও কুচো ফুলের দোকান সাজিয়ে বসেচে; দইয়ের ভার, মণ্ডার খুলী ও লুচি কচুরীর ওড়ায় রাস্তা জুড়ে গেছে; রেও ভাট ও আমাদের মত ফলারেরা মিমো করে নিচ্চে—কোথায় যায়?

ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় সহরে প্রিতিমার অধিবাস হয়ে গ্যালো, কিছুক্ষণ ঢোল ঢাকের শব্দ থাম্‌লো, পূজোবাড়িতে ক্রমে "আন্ রে" "কর রে" "এটা কি হলো" কত্তে কত্তে যষ্ঠীর শর্ব্বরী অবসন্না হলো, সুখতারা মৃদু পবন আশ্রয় করে উদয় হলেন, পাখিরা প্রভাত প্রত্যক্ষ করে ক্রমে ক্রমে বাসা পরিত্যাগ কত্তে আরম্ভ কল্লে; সেই সঙ্গে সহরের চারি দিকে বাজনা বাদ্দি বেজে উঠলো, নবপত্রিকার স্নানের জন্ম কর্ম্মকর্তারা শশব্যস্ত হলেন—ভাবুকের ভাবনায় বোধ হতে লাগ্‌লো, যেন সপ্তমী কোরমাথান নতুন কাপড় পরিধান করে হাসতে হাসতে উপস্থিত হলেন।

এদিকে সহরের কলাবউয়েরা বাজনা বাদ্দি করে স্নান কত্তে বেরুবেন, বাড়ির ছেলেরা কাঁসর ও ঘড়ি বাজাচ্চে বাজাতে সঙ্গে সঙ্গে চল্লো—এদিকে বাবুর কলাবউয়েরও স্নানের সরঞ্জাম বেরুলো, আগে আগে কাড়ানাগরা, ঢোল ও সানাইদারেরা বাজাতে বাজাতে চল্লো, তার পেছনে নতুন কাপড় পরে আশাসোঁটা হাতে বাড়ির দরওয়ানেরা, তার পশ্চাৎ কলাবউ কোলে পুরোহিত, পুঁথি হাতে তন্ত্রধারক, বাড়ির আচার্য্যি বামুন, গুরু ও সভাপণ্ডিত, তার পশ্চাৎ বাবু, বাবুর মস্তকে লাল সাটিনের রূপোর রামছত্তা ধরেচে। আশে পাশে ভাগ্নে, ভাইপো ও জামাইয়েরা, পশ্চাৎ আমলা ফয়লা ও ঘরজামাইয়ে ভগিনীপতিরা, মোসাহেব ও বাজে দল, তার শেষে নৈবিদ্দ, লণ্ঠন ও পুষ্পপাত্র, শাঁখ ঘণ্টা ও কুশাসন প্রভৃতি পূজার সরঞ্জাম মাথায় মালীরা। এই প্রকার সরঞ্জামে বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর বাবুর ঘাটে কলাবউ নাওয়াতে চল্লেন, ক্রমে ঘাটে পৌঁছুলে কলাবউয়ের পুজো ও স্নানের অবকাশে হুজুরও গঙ্গায় পবিত্র জলে স্নান করে নিয়ে স্তব পাঠ কত্তে কত্তে অনুরূপ বাজনা বাদ্দির সঙ্গে বাড়িমুখো হলেন।

[ক্রমশঃ

মৃত্যুরও মৃত্যু

রণজিৎ মুখোপাধ্যায়

বহুত্বে ভরা পৃথিবী। লোকালয়, অরণ্য প্রভৃতি।
একক সত্তায় কি আছে এমন বলো করণীয়?
দৈন্য, জরা, ক্লৈব্য, অপ্রেম, মৃত্যুর পৃথিবীর যতি
ভাঙতে মরিয়া হয় বন্দীব্যথা কি আছে কেন্দ্রীয়?
নেই, শূন্য; আয়ুহীন। অনশ্বর মৃত্যুর অধীন।
একক পারো না দিতে আকাঙ্ক্ষার চিরায়ু-আকাশ।
জমাট আবৃত হয়ে থাকবেই ক্ষীণ নিশিদিন,
নির্জন দ্বীপের মন হয়নাকো অস্থির বাতাস।

এবার বহুময় হও। শোনো,
নিঃসঙ্গ কথা শোনো!
বহুর অতল প্রান্তরে হারিয়ে যাও, একাকার,
তুমিও নয়, বহুও নয় এমন স্বভিন্ন কোনো
প্রসুপ্ত মূর্ত্তি পেলে দেখবে সে-ই ঈপ্সিত তোমার।

ভূমি-বহু-ময় সত্তা! সে সময় চোখে পড়বেই
জরারও জরা, মৃত্যুরও মৃত্যু; অপ্রেমের খেই।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

দীপেন কিছু বলে নি। স্থির নিষ্পলকে মহিলার দিকে তাকিয়েই থেকেছে শুধু।

বাবা সুধাময় লাহিড়ী আত্মমগ্নতার যে সুরক্ষিত দুর্গে তার জীবনটাকে পুরে একেবারে 'সীল' করে দিয়েছিলেন বাইরের কোন তরঙ্গই সেখানে পৌঁছয় না। সবই দুর্গের দেওয়ালে আঘাত খেয়ে ফিরে যায়। তথাপি সেই অবরোধের মধ্যে বাস করেও দেশভাগের খবরটুকু জেনেছিল দীপেন। জেনেছিল দেশের বিধাতারা এই বিপুল ভারতবর্ষকে ভাগ-বাটোয়ারা করে নিয়েছেন। সবার অনেচ্ছার বসে কোথায় কোন চুক্তিপত্রে দু-চার্টি স্বাক্ষর পড়েছে আর তারই ফলে একদা প্রভাতে দেশটা দু' টুকরো হয়ে গেছে।

বাইরের জগতের দুয়ার যার বন্ধ; তা ছাড়া চিরদিনই নিজেকে ছাড়া আর সব দিকেই যে নিঃস্পৃহের মত পিঠ ফিরিয়ে রেখেছে তার কাছে এ সংবাদ পৌঁছেছিল কোন রন্ধ্র দিয়ে? সম্ভবত এর উত্তর একটাই যে দুর্গেই আশ্রয় নেওয়া যাক আর যত নিরাপদই ভাবা যাক, ভূমিকম্পের মত কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে, পায়ের তলার ভিত দুলে উঠবেই। দেশভাগ সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে যে সর্বব্যাপী বিপর্যয় এনেছিল, আত্মকেন্দ্রিকতার দ্বীপে বিচ্ছিন্ন আর নির্বাসিত থেকেও তা টের না পেয়ে পারে নি দীপেন। মাটির তলায় আপন পথে কোন অদৃশ্য তরঙ্গে বাহিত হয়ে সে খবর তার কাছে ঠিক ঠিক পৌঁছে গিয়েছিল।

কিন্তু দেশভাগের খবরটুকু জানা পর্যন্তই। দীপেনের এই জানাটা শীতে কোন্ কার্নিভ্যাল আসছে, পরবর্তী একটি প্রোমোশনের জন্য বড় সাহেবের কি পরিমাণ মনোরঞ্জন প্রয়োজন অথবা নতুন ডিনার স্যুট কী বেরুল—ইত্যাদি জানার চাইতে বেশি চমকপ্রদ নয়। অর্থাৎ দেশ ভাগ তার প্রাণে কোন বিস্ময়ই শিখান্বিত করে তুলতে পারে নি।

অতএব সাতচল্লিশের পনেরই আগস্টের পর রাষ্ট্রীয় জীবনে কতখানি ধ্বস নেমেছে, সমাজ জীবন ভেঙেচুরে কোন অতল অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে, ছিন্ন-ভিন্ন মানুষগুলি হতাশায় পুড়ে পুড়ে কিভাবে একরাশ ছাইএর মধ্যে নির্বাণ লাভ করছে—এ-সব দীপেনের জানার কথা নয়। তাই বুঝি সেদিন নীলা চৌধুরীর মায়ের সেই কথাগুলি তার স্নায়ুর কেন্দ্রে কেন্দ্রে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে যাচ্ছিল। আত্মমগ্নতায় ভারে তার জীবনটাকে বাবা সুধাময় লাহিড়ী কষে বেঁধে একবারে এক সুরের যে গৎটা বাজিয়ে দিয়েছিলেন সেখানে তালকাটার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল।

যাই হোক মহিলা আবার বলে উঠেছিলেন, 'ক্যাম্পের পরিবেশ একেবারে বিষাক্ত। খেয়ে কোনরকমে প্রাণে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা সেখানে আছে। কিন্তু বাবা, সেটুকুই

তো সব নয়। জন্তু জানোয়ারও তো খেয়ে বেঁচে থাকে।'

অর্ধস্ফুটে দীপেন কী বলেছে, নিজের কাছেই তা স্পষ্ট হয় নি।

মহিলা অর্থাৎ রমাদেবী আবার বলেছিলেন, 'বেঁচে থাকাটাই তো সব নয়। মানুষের মত বাঁচতে হবে আর সেইটাই আসল কথা। কিন্তু সেখানে তার ব্যবস্থা নেই।'

ক্যাম্প জীবন সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ দীপেন যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই বলে উঠেছে, 'কেন?'

'ওখানে জীবনের সব দিক থেকেই মানুষকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে এনে জড়ো করা হয়েছে। সব মানুষের তো এক ধাত বা এক স্বভাব না। তা যদি থাকত তা হলে সমাজে এত স্তর এত শ্রেণী থাকবে কেন?' রমাদেবী বলে গেছেন, 'এই দেখুন না, আমরা যে ক্যাম্পে থাকতাম সেখানে তাঁবুর ভেতর থাকার ব্যবস্থা। আমাদের পাশাপাশি যারা থাকত তাদের কেউ হালচাষী, কেউ দেশে চিটেগুড়ের ব্যবসা করত, কেউ নৌকোর মাল্লা, কেউ ঢপের দলের অধিকারী। এমনি নানা ধরণের মানুষ। মানুষ বা তার বৃত্তির জন্যে আমার ঘৃণা নেই কিন্তু অন্য দিক থেকে সমস্যা আছে।'

'কী সমস্যা?'

'রুচির।'

বুঝতে না পেরে দীপেন বলেছিল, 'মানে?'

রমাদেবী বলেছিলেন, 'বুঝতে পারছেন না? বেশ, বুঝিয়ে দিচ্ছি। এই আমাদের কথাই ধরুন। পূর্ব বাঙলার যেখান থেকে আমরা এসেছি তাকে মধ্যবিত্ত সমাজ বলা যেতে পারে। চিরদিন মোটামুটি সচ্ছলতার মধ্যেই আমাদের জীবন কেটেছে। মধ্যবিত্তের জীবনটা কেমন?' বলে দীপেনের দিকে তাকিয়েছেন তিনি।

দীপেন নিজে উচ্চবিত্ত সমাজের মানুষ। মধ্যবিত্ত জীবনের রূপরেখা সম্বন্ধে তার কোন ধারণাই নেই। ধারণা হবে কোথা থেকে? নিজে ছাড়া অন্য কোন দিকে অন্বেষণ বা জিজ্ঞাসা থাকলে তো? অতএব বিব্রতমুখে তাকে তাকিয়েই থাকতে হয়েছে।

রমাদেবী নিজের থেকেই মধ্যবিত্ত জীবনের একটা চেহারা সামনে তুলে ধরেছিলেন। এ সমাজের আদিতে-অন্তে একটি ছোট্ট আকাঙ্ক্ষা মিশে আছে। তার নাম 'শিক্ষা'। ছেলেবেলা থেকেই এরা লেখাপড়া লেখা-পড়া করে পাগল। সেই সঙ্গে আছে আরো গভীর এক পিপাসা। পৃথিবীর যেখানে যত রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ আছে সব কিছুর মধ্যেই সে সমুদ্রস্নান করতে চায়; সব কিছুই পরম লোভীর মত করায়ত্ত করাতেই তার যত সুখ। পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে চলে গান-বাজনা-অভিনয়। কেউ বা আবার মাতে খেলাধুলোয়, কেউ সমাজ সেবায়। মোট কথা, জীবন চারদিকে যে আলোর মেলা সাজিয়ে রেখেছে, যে সুধার উৎস খুলে দিয়েছে তার সবটুকু সাধ্যে না কুলোলেও যতটুকু সম্ভব লুট করে নিতেই তার যত আনন্দ।

তারপর বড় হয়ে স্কুল-কলেজের গণ্ডী পেরিয়ে কেউ হয় কেরাণী, কেউ অধ্যাপক, কেউ অফিসার। কিন্তু আশৈশবের শিক্ষা দীক্ষা তাদের রুচিকে এমন এক তাবে বেঁধে দেয় যাতে অস্বাস্থ্যকর কোন গৎ বাজানো প্রায় অসম্ভব। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও আছে।

রমাদেবী বলে যাচ্ছিলেন, 'যে রুচি দিয়ে আমরা নিজেদের গড়ে তুলেছি, ক্যাম্পে এসে তার চিহ্নমাত্র খুঁজে পাই নি। এখানে ছত্রিশ জাতের বাস; তাতে তো আপত্তি নেই কিন্তু রুচিটাই ছাত্রশ রকমের।' একটু থেমে আবার বলেছিলেন, 'লোক যে তারা খারাপ, এ কথা আমি বলি না। তবে—'

প্রথম পরিচয়ের দিন থেকে মহিলাকে কখনই সরলা গ্রাম্য মনে হয় নি দীপেনের। আবার খুব একটা শিক্ষিতা মার্জিতা বলতেও বেধেছে। কিন্তু সেই মুহূর্তে রমাদেবীর সম্বন্ধে তার শ্রদ্ধাই হয়েছে। মহিলাকে রীতিমত শিক্ষিতা আর জীবন-সচেতন মনে হয়েছে তার। সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে দীপেন প্রশ্ন করেছে, 'কী?'

'যেভাবে তারা জীবন কাটায় তার সঙ্গে আমাদের জীবন মেলে না।'

'কি রকম?'

'ধরুন আপনার ওপর আমার যদি রাগ হয় তা হলে কী করব? নিশ্চয়ই আপনার মাথাটা ফাটিয়ে ফেলব না কিংবা কুৎসিত কোন গালাগাল দিয়ে উঠব না। যতখানি সম্ভব সংযত থেকে আমার রাগটা আপনাকে বুঝিয়ে দেব। কিন্তু—'

'কী ?'

'ওদের মধ্যে সে বালাই নেই। রাগ হলে মেয়েকেই হয়তো বাপ এমন গালাগাল দিয়ে উঠল যা শুনতেই আমাদের আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হয়। ওরা কিন্তু এই গালাগালটাকে তেমন সাঙ্ঘাতিকই ভাবে না। যাই হোক ক্যাম্পের মধ্যে গালাগালি, চিৎকার, মারামারি আর অকথ্য খিস্তি প্রায় সবসময় লেগেই ছিল। আর ছিল নীচতা, হীনতা, দলাদলি। এ সব থেকে কেউ যে গা বাঁচিয়ে থাকবে তার উপায় নেই। যেমন করে হোক, সবাই মিলে তাকে পাঁকের মধ্যে নামিয়ে আনবেই।'

দীপেন অনুমান করতে পেরেছিল, বিপরীত স্বভাবের হাজার কয়েক প্রাণীকে একটা বড়সড় খাঁচার মধ্যে পুরে দিলে যা অবস্থা দাঁড়ায়, সেইরকম ভয়াবহ কিছু একটা প্রতিমুহূর্তে ক্যাম্পে ঘটতে থাকত। এই সীমাহীন নোংরামির উর্ধ্বে জলের হাঁসের মত ভেসে থাকা সেখানে প্রায় অসম্ভব। কিংবা কেউ যে নিজের পছন্দমত আলাদা একটি জগৎ সৃষ্টি করে সেখানে বেঁচে থাকবে—তা-ও প্রায় অভাবিত ব্যাপার।

রমাদেবী আবার বলেছিলেন, 'এই সব গালাগাল-খিস্তি-দলাদলি তবু কোন রকমে সয়ে থাকা যায়, কিন্তু—'

'কী ?'

'বিপদটা ছিল আরেক দিক থেকে।'

'কোন্ দিক থেকে ?'

এবার কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন রমাদেবী। তারপরে খুব আস্তে আস্তে শুরু করেছিলেন, 'ক্যাম্পের ভেতর নরকের কারখানা চলতে আরম্ভ করেছিল—'

'নরকের কারখানা!' দীপেন চকিত হয়ে উঠেছিল।

'হ্যাঁ—' আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে কঠিন যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখে রমাদেবী বলেছিলেন, 'মাস দুই তিন ক্যাম্পে কাটাবার পর হঠাৎ আমার নজরে পড়েছিল সন্ধ্যের অন্ধকার হলেই কলকাতা থেকে একদল লোক ক্যাম্পে আসছে। কারো গায়ে চক্কোর চক্কোর ছাপ-মারা জামা; কারো চক্কোরের বদলে হাতী-ঘোড়া-মেয়েমানুষ কি খবরের কাগজের ছাপ মারা। পরনে থাকত সরু সরু প্যান্ট। কেউ কেউ আবার গিলে-করা পাঞ্জাবি পরে কুঁচনো ধুতি লুটিয়ে আসত। গলায় সোনার হার। ফিনফিনে জামার পকেটে গোছা গোছা নোট দেখা যেত। কেমন করে ঠোঁটের কোন টিপে ধরে তারা যেন হাসত আর পিচ্ পিচ্ করে পানের পিচকি ফেলত। তাদের চোখগুলো কেমন যেন গোলাপী আর ঢুলুঢুলু। ওদের দেখলেই আমার বুক কেঁপে উঠল; নিশ্বাস আসত আটকে আটকে। আমার মন-প্রাণ ঘ্রাণ—সব বলত, ঐ লোকগুলো ভাল না।' বলতে বলতে হঠাৎ তিনি থেমে গেছেন।

রমাদেবীর মুখচোখ দেখে সেই মুহূর্তে দীপেনের মনে হয়েছিল, মহিলা যেন সোনারপুরের সেই ছায়াচ্ছন্ন বাগানে, মশা আর পানায় আকীর্ণ পুকুরটার পাড়ে দাঁড়িয়ে নেই। ক্যাম্প-জীবনের স্মৃতি একটা শ্বাসরুদ্ধ দুঃস্বপ্নের মধ্যে তাঁকে যেন টেনে নিয়ে গেছে।

মহিলার কথা বলার ভঙ্গি এবং ক্যাম্প জীবন নামে একটা অজ্ঞাত অজানিত দিকের কাহিনী—সব একাকার হয়ে দীপেনকে যেন প্রভাবিত করে ফেলেছিল। রমাদেবীর দুঃস্বপ্নের কিছুটা ক্রিয়া তার ওপরেও শুরু হয়েছিল বুঝি। চাপা রুদ্ধশ্বাসে সে বলেছিল, 'তারপর ?'

তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন নি রমাদেবী। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ তীক্ষ্ণ উত্তেজিত স্বরে বলতে আরম্ভ করেছেন, 'তারপর আর কি; সেই লোকগুলো রাত একটু বেশি হলে ক্যাম্পের বয়স্থা মেয়েদের নিয়ে উধাও হয়ে যেত। শুনেছি তারা নাকি কলকাতার দিকে যেত।'

'তারপর ?'

'তারপর আর কি!' বিচিত্র মৃদু হেসে রমাদেবী বলেছেন, 'তারপর ভোর হবার আগেই লোকগুলো মেয়েদের ক্যাম্পে ফিরিয়ে দিয়ে যেত।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। এক সময় রমাদেবীই আবার বলে উঠেছেন, ক্যাম্পের রক্ষণাবেক্ষণ করার দায়িত্ব যাদের হাতে, এতগুলো মানুষের জীবন মরণ যাদের ওপর নির্ভর সেই অফিসারদের অনেকের সঙ্গেই ঐ লোকগুলোর যোগ সাজস ছিল। আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে মেয়েরা অফিসারদের সঙ্গে বেশি ঢলাঢলি করতে পারত তারাই সব চাইতে সুযোগ সুবিধে বেশি পেত। ঢলাঢলি বলতে আমি কী বলছি, বুঝে নিন।'

দীপেন শিউরে উঠেছে, 'বলেন কি!'

রমাদেবী এবার আর কিছু বলেন নি। শুধু বিকৃত মুখে মাথা নেড়ে গেছেন।

দীপেন আবার বলেছে, 'আচ্ছা, ঐ মেয়েগুলো যে ওভাবে চলে যেত তাতে ওদের বাবা-মা বা অভিভাবকেরা আপত্তি করত না?'

এবার বিচিত্র হেসেছেন রমাদেবী। বলেছেন, 'সে এক আশ্চর্য ব্যাপার—'

'কিরকম?'

'মানুষ—মানুষ যে কী হয়ে গেছে, এই দেশভাগ যে তাদের কোথায় নামিয়ে নিয়ে গেছে ভাবতে গেলে আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়।' বলতে বলতে অস্থির অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল রমাদেবী দু-চোখ হঠাৎ দপদপিয়ে উঠেছে। মুখের রেখাগুলি ভয়ানক রকমের কঠিন, চোয়াল দৃঢ়বদ্ধ!

দীপেনের মনে হয়েছে মহিলাকে ঘিরে একটা অদৃশ্য আগুনের বৃত্তই বুঝি ঘুরে যাচ্ছে। আর সেই আগুনের দহন যেন দীপেনের গায়ে এসেও খানিকটা লেগেছিল। সে কিছু না বলে তাকিয়েই ছিল।

রমাদেবী তীক্ষ্ণ গলায় শরীরের সবটুকু শক্তি ঢেলে দিয়ে চিৎকার করে উঠেছেন, 'আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন দীপেনবাবু, ঐ লোকগুলোর সঙ্গে মেয়েদের কলকাতায় যাবার ব্যাপারে তাদের বাপ-মায়েরও সায় ছিল।'

রুদ্ধস্বরে দীপেন এবার বলেছে, 'কী বলছেন আপনি!'

'ঠিকই বলছি।' বলেই চুপ করে গেছেন রমাদেবী। কিছুক্ষণ পর অন্যমনস্কের মত আবার শুরু করেছেন, 'আপনাকে একটু আগেই তো বলেছি দেশভাগ মানুষকে পশুর স্তরে নামিয়ে নিয়ে গেছে।'

দীপেন কী বলবে ভেবে পায় নি। বুকের ভেতর অনেকখানি অস্বস্তি নিয়ে নিঃশব্দে রমাদেবীর দিকে শুধু তাকিয়ে থেকেছে। কোন্ দেশের কথা বলছিলেন রমাদেবী? বাঙলাদেশেরই তো? কোন্ যুগের? কোন্ শতাব্দীর? বাপ-মা স্বেচ্ছায় আড়কাঠির সঙ্গে নিজের মেয়েদের পাঠিয়ে দেয়! এই কথাটা যতবার সে ভাবতে চেষ্টা করেছে ততবারই তার মাথার মধ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটে গেছে যেন। এতকাল নিজের দিকে তাকিয়ে তাকিয়েই জীবনের পঁচিশ ছাব্বিশটা বছর কেটে গেছে। নিজেকে ছাড়া আর কোন দিকে তাকাবার অবকাশ বা রুচি তার ছিল না। কিন্তু 'অহং'মগ্নতার বাইরে বিশাল-ব্যাপ্ত যে জগৎ সেখানে তার অজ্ঞাতসারে এত ধ্বস নেমেছে এত বিপর্যয় ঘটে গেছে, এটাই যেন এক পরম বিস্ময়ের ব্যাপার। বিস্ময়ের এবং যন্ত্রণার।

রমাদেবী আবার বলেছেন, 'এ সব দেখে শুনে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। মেয়ে মানে নীলা বড় হয়েছে। তার জন্যেই দেশ ছেড়ে চলে আসা। কিন্তু তাকে নিয়ে এ কোন্ বেড়া আগুনে এসে পড়লাম! দিনরাত নীলাকে আগলে আগলে রাখতাম। পারতপক্ষে তাঁবুর বার হতে দিতাম না। একবার স্নানের সময় শুধু ও বেরুত। তা-ও আমিই পাহারা দিয়ে নিয়ে যেতাম। কিন্তু এভাবে তো সারা জীবন কাটানো যায় না।' একটু চুপ করে থেকে দৃষ্টিটাকে মজা পুকুরের ওপাড়ে ছড়িয়ে দিয়ে দূরমনস্কের মত আবার আরম্ভ করেছেন, 'কিন্তু কী করব, কিছুই ভাবতে পারছিলাম না। শুধু বুঝতে পারছিলাম, নীলাকে নিয়ে সেই নরক থেকে কোথাও পালাতে হবে। কিন্তু—'

ফিসফিসিয়ে দীপেন প্রশ্ন করেছে, 'কী?'

দৃষ্টিটা পুকুরের ওপারে রেখেই রমাদেবী বলে গেছেন, 'কোথায় যাব সেই নরক থেকে? আমার স্বামী পাকিস্তান থেকে আসার পরই তো বিছানায় পড়েছিলেন—'

'কেন?'

'আপনাকে তো আগেই বলেছি, সেই সময় থেকে ওঁর পক্ষাঘাতের লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করেছিল। উনি যদি সুস্থ সবল থাকতেন তবু না হয় একটা উপায় হত। কিন্তু অসুস্থ শয্যাশায়ী মানুষটা আর কী করতে পারেন।'

আস্তে আস্তে মাথা নেড়েছে দীপেন, 'তা তো ঠিকই—'

রমাদেবী বলেছেন, 'আমার স্বামী সারাদিন তাঁবুর ভেতর শুয়ে থাকতেন। ক্যাম্পে যে নরকের কারখানা চলছে সে-সব তাঁকে জানাতাম না। জানালে অস্থির হয়ে পড়বেন। এদিকে আমি মেয়েছেলে মানুষ; চিরদিন পূর্বঃ বাঙলাতেই থেকেছি। এই নতুন দেশে; হ্যাঁ এ দেশ

আমাদের কাছে নতুন বৈকি ; কাকে ধরব, কোথায় যাব — কোথায় গেলে সম্মান বাঁচাতে পারব, কিছুই জানি না। ক্যাম্প থেকে চলে গেলেই তো হয় না! এতগুলো ছেলে-পুলে নিয়ে, তার ওপর অসুস্থ স্বামীকে নিয়ে কী খাব? ভেবে ভেবে যখন মাথাটা পুরোপুরি খারাপ হতে বসেছে ঠিক সেই সময় মণিময় দত্তের সঙ্গে আমার পরিচয় হল।'

দীপেন এবার চমকে উঠেছে, 'মণিময় দত্ত!'

'হ্যাঁ'—একটু যেন অবাক হয়েই রমাদেবী দূর প্রান্ত থেকে দৃষ্টিটাকে ফিরিয়ে এনেছেন। বলেছেন, 'আপনি তাকে চেনেন নাকি!'

দত্তসাহেবের নাম তো মণিময়। ঝোঁকের মাথায় দীপেন প্রায় বলেই ফেলেছিল, চেনে। কিন্তু মুহূর্তে নিজেকে প্রবল এক ঝাঁকানিতে সচেতন করে তুলে জোরে জোরে মাথা নাড়তে নাড়তে বলেছিল, 'না—না, আমি চিনব কেমন করে?'

কথাটা বুঝি পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় নি রমাদেবীর! তীক্ষ্ণ চোখে কিছুক্ষণ তাকে বিশ্লেষণ করে বলেছেন, 'মণিময় দত্ত একটা বিরাট কোম্পানির হর্তাকর্তা বিধাতা। অনেক টাকা মাইনে পায়।'

'অ—' এবার নিস্পৃহের মত সংক্ষিপ্ত একটি উত্তর দিয়ে আগের ভুলটা সংশোধন করে নিয়েছে দীপেন।

'জানেন, ভারি অদ্ভুত ভাবে মণিময় দত্তের সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়েছিল—'

'অদ্ভুতভাবে?'

'হ্যাঁ—'

[ক্রমশঃ

ব্রহ্মসূত্র কাব্যানুবাদ

পুষ্পদেবী সরস্বতী. শ্রুতিভারতী

শঙ্করাচার্য্য মত

অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা (১।১।১)

১। নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক

ব্রহ্মই একমাত্র নিত্য বস্তু হয়
ব্রহ্ম ছাড়া যাহা কিছু অনিত্যতাময়।

২। ইহামুত্র ফলভোগ বিরাগ

ইহলোক পরলোক যত কিছু ভোগ
করিয়া সকল ত্যাগ মোক্ষ লক্ষ্য হোক।

৩। শম দম উপরতি তিতিক্ষা সমাধান,
শ্রদ্ধা এই দ্বারা হয় জ্ঞানের অর্জ্জন।
শম অর্থে সংসার এতে নিবৃত্ত হইয়া,
মনকে সংযত রাখ শ্রীহরি স্মরিয়া।
দম অর্থে ইন্দ্রিয়ের সংযম বিধান,
উপরতি কর্ম্মত্যাগ সন্ন্যাস গ্রহণ।
তিতিক্ষায় শীত গ্রীষ্ম সুখ দুখ সহা,
সমাধান অর্থ হয় সমাধিতে যাহা।
বৈষয়িক চিন্তা ছাড়ি মনস্থির করো
শ্রদ্ধা অর্থে আস্থাবান মহাজন উপর।

৪। মুমুক্ষুত্ব = মোক্ষলাভ আকাঙ্ক্ষা যাহার
শঙ্কর বলেন ব্রহ্ম জ্ঞান অধিকার
উপায় ব্রহ্মাত্ম জ্ঞান। উপেয় কি জান?
যতনেরে লভে যাহা উপেয় তা মান
নিবর্ত্ত্য অজ্ঞান মোহ সরাইয়া দূরে
ব্রহ্মনে করো লাভ হৃদয়ের পুরে।
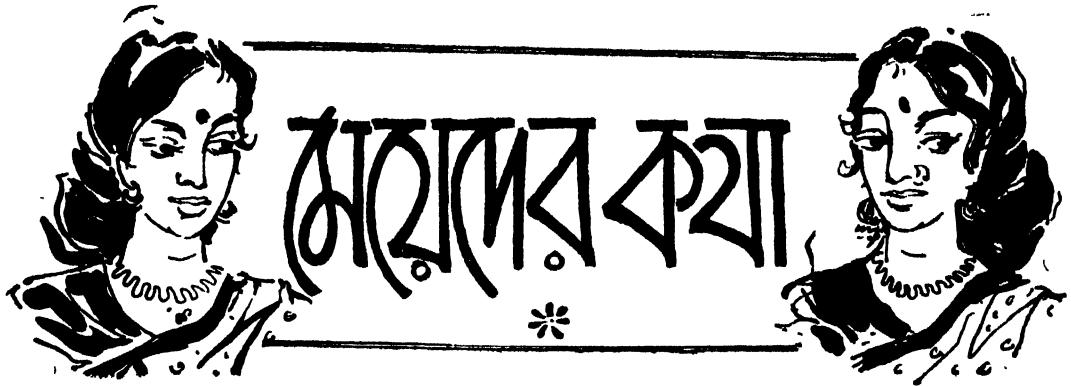
ব্রতের স্বরূপ

শ্রীবাণী চক্রবর্তী এম-এ

ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্বর্গই পুরুষার্থ অর্থাৎ এইগুলি সমস্ত লোকের আকাঙ্ক্ষিত। এই চতুষ্টয়ের মধ্যে মোক্ষ পরম পুরুষার্থ। আবার ধর্ম, অর্থ ও কাম—এইগুলির মধ্যে ধর্মই প্রধান। এই ধর্মের অন্যতম অনুষ্ঠান ব্রতরূপে প্রতিপাদিত হয়।

কোন কিছু কামনা করিয়া যে ধর্মীয় অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাকে বলে ব্রত। "বৃঞ্ বরণে" এই ধাতু হইতে ব্রত কথাটি আসিয়াছে। বরণ অর্থাৎ অভীষ্ট কোন বিষয় বা বস্তুকে স্বীকৃতি দেওয়া। এই স্বীকৃতি মূলে রহিয়াছে ইচ্ছা। ইহা হইতেই 'বর' শব্দটি নিরূপিত হইয়াছে অর্থাৎ বিবাহব্যাপারে কনে বা কনের অভিভাবকগণ কর্তৃক যে ব্যক্তিকে বহুলোকের মধ্যে পছন্দ করা হইয়াছে বা ঈপ্সিত হইয়াছে, সেই বররূপে অভিহিত হয়। অতএব বৃ ধাতুর অর্থ ইচ্ছা করাও বুঝায়। ইহার ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিতে গেলে দেখা যায়—বৃধাতুর সহিত ক্ত প্রত্যয় যোগে ব্রত পদটি নিষ্পন্ন। তখন তাহার অর্থ দাঁড়ায়—যাহা ইচ্ছা করা হয় অথবা সাধারণভাবে শুধু ইচ্ছা।

মহামহোপাধ্যায় পি, ভি, কাণের মতে বৃধাতুর বিভিন্ন অর্থ আছে। যথা—আদেশ বা আইন, অনুবর্তিতা বা কর্তব্য, ধর্মীয় ও নৈতিক অনুষ্ঠান, পবিত্র আচার বা অনুষ্ঠান, তথা যে কোন প্রকার আচার বা ব্যবহারের নমুনা। উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির ইচ্ছাই অপরের নিকট আদেশ বা আইনকানুন বলিয়া পরিগণিত হয়। ভক্তগণ বিশ্বাস করেন যে দেবতাগণ কতকগুলি নির্দেশ দেন যাহা তাঁহারা স্বয়ং অনুসরণ করিবেন এবং সমস্ত জীবগণও তাহা অনুসরণ করিয়া চলিবে। অতএব ব্রতের অপর অর্থ দাঁড়ায় বিধি বা আদেশ। কিন্তু যেখানে কোনও আদেশ প্রতিপালন করা হয়, সেখানে কর্তব্য কর্মগুলি বহুদিন ধরিয়া সম্পন্ন করিতে হয়, সেইগুলিই রীতি নীতি বা কর্তব্য। আবার যখন লোকেরা বিশ্বাস করে বা অনুভব করে যে তাঁহারা ভগবৎ নির্দেশিত কিছু কার্য অবশ্যই পালন করিবে, তখন তাহা ঈশ্বর আরাধনার বা পূজার্চনার কর্তব্যরূপে প্রতিপাদিত হয়। তাঁহাদের আচার ব্যবহার এবং জীবনযাত্রার রীতি নীতিতে যে বিধিনিষেধ পালন করা হয় তাহাও পবিত্র ব্রত বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। এই ব্রত হইতেছে ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা আচার। দেবতার অর্চনা দ্বারা ঈপ্সিত দ্রব্য লাভ করিবার জন্য ইহা বিশেষ তিথিতে বা মাসে বা নির্দিষ্ট সময়ে পালিত হইয়া থাকে। ইহা সাধারণতঃ খাদ্যদ্রব্য বা আচার ব্যবহারের বিধিনিষেধের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। এই ব্রতগুলি আবার প্রায়শ্চিত্তরূপেও পরিগণিত হয়। যথা ব্রহ্মচারী ব্রত, স্নাতকব্রত, গৃহস্থের ব্রত ইত্যাদি।

অমরসিংহ তাঁহার অমরকোষে নিয়ম ও ব্রতকে একার্থক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ব্রত অর্থে পুণ্যজনক

উপবাস প্রভৃতিকে বুঝায়। যথা—'নিয়মো ব্রতমস্ত্রী তচ্চোপবাসাদিপুণ্যকম্'।

অগ্নিপুরাণে ব্রত সম্বন্ধে বলা আছে—

"শাস্ত্রাদিতো হি নিয়মো ব্রতং তচ্চ তপো মতম্।
নিয়মাস্তু বিশেষাস্তু ব্রতস্যৈব দমাদয়ঃ॥
ব্রতং হি কর্তৃসন্তাপাত্তপ ইত্যভিধীয়তে।
ইন্দ্রিয়গ্রামনিয়মান্নিয়মশ্চাভিধীয়তে॥"

অর্থাৎ নিয়মবদ্ধ বিষয়ই ব্রত—এইরূপ শাস্ত্রের নির্দেশ, তাহাই তপোরূপে পরিগণিত হয়। বিশেষ নিয়ম এবং অপর নিয়মই ব্রতের বিশেষ ব্যাপার। ব্রত তপস্যারূপে অভিহিত হয়। কারণ কষ্ট করিয়া ব্রতানুষ্ঠানকারী ব্যক্তি ব্রত পালন করিয়া থাকেন, এবং ইন্দ্রিয়াদির সংযমহেতু ইহা নিয়ম বলিয়াও অভিহিত হয়।

জৈমিনিসূত্রের ভাষ্য দিতে গিয়া শবরস্বামী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ব্রতদ্বারা মানস কর্মই অভিহিত হইয়া থাকে। যথা 'আমি ইহা করিব না' এইরূপ মনের সঙ্কল্প। সেই ব্রত কিরূপ? যেমন স্নাতকের ক্ষেত্রে সূর্যোদয় দেখিবে না এইরূপ বিধি থাকায় যাহাতে সূর্যোদয় দেখা না হয় তাহারই মানস সঙ্কল্প কর্ম কর্তব্য। এইরূপ কর্তব্য পালনের নামই ব্রত।

"ব্রতমিতি চ মানসং কর্মোচ্যতে ইদং ন করিষ্যামীতি যঃ সঙ্কল্পঃ। কতমৎ তদ্ ব্রতম্। নোদ্যন্তমাদিত্যমীক্ষেতেতি। যথা তদীক্ষণং ন ভবতি তথা মানসো ব্যাপারঃ কর্তব্যঃ। তস্য পালনম্—" শবরস্বামীর ভাষ্য।

মনুসংহিতার ভাষ্যকার মেধাতিথি বলিয়াছেন—'মানসঃ সঙ্কল্পো ব্রতমুচ্যতে—শাস্ত্রবিহিতমিদং ময়া কর্তব্যমিদং বা ন কর্তব্যমিত্যেবম্।'

অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত এই কার্যটি আমার করা উচিত বা না করা উচিত—এইরূপ মানস সঙ্কল্পই ব্রত।

যাস্কের নিরুক্তগ্রন্থে উল্লিখিত আছে—

'ব্রতমিতি কর্মনাম নিবৃত্তিকর্ম বারয়তীতি সতঃ। ইদমপীতরদ্ ব্রতমেতস্মাদেব বৃণোতীতি সতঃ। অন্নমপি ব্রতমুচ্যতে যদাবৃণোতি শরীরম্।'

'অর্থাৎ ব্রত হইতেছে এমন এক কর্মের নাম যাহা সদ্ব্যক্তিগণকে নিবৃত্তিকর্ম করিতে সর্বদা বারণ করে। ইহাও অন্য ব্রত, যাহা সদ্ ব্যক্তিগণকে বরণ করে। অন্নকেও ব্রত বলা হয় যাহা শরীরকে রক্ষা করে।

এই ব্রত বেদ, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ্, সূত্র, সংহিতা প্রভৃতি সকলের মধ্যেই নির্দিষ্ট হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ দেখা যায় ঋগ্বেদে আছে মুনিগণ দেবতার ব্রতগুলিকে যে প্রশংসা করেন, তাহা অপর দেবতাগণও লঙ্ঘন করেন না। যথা—

"ন যস্যেন্দ্রো বরুণো ন মিত্রো ব্রতমর্যমা ন মিনন্তি রুদ্রঃ।
নারাতয়স্তমিদং স্বস্তি হুবে দেবং সবিতারং নমোভিঃ॥"

ঋগ্বেদ, ২, ৩৮, ৯,

অর্থাৎ আমি আমার উন্নতির জন্য নমস্কার সহযোগে বন্দনা করি দেবতা সবিতাকে, যাহার ব্রত ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, অর্যমা বা রুদ্র বা দেবতাদের শত্রুরাও লঙ্ঘন করে না।

ইহা দ্বারা সূচিত হয় যে বৈদিক মুনিগণ বিশ্বাস করেন যে কেবলমাত্র দেবতাগণই নহেন, এমনকি অসুররা পর্যন্ত এই ব্রতকে লঙ্ঘন করিতে পারে না। আর যদি কোন ব্যক্তি এই ব্রত অমান্য করে, তাহা হইলে তাহাদের শাস্তি দেওয়া হইবে।

ব্রতের সাধারণ অর্থ দুই প্রকারে সংহিতা, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ্ ও সূত্রগুলিতে নির্দেশ করা আছে।

প্রথমতঃ, ইহা ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা আচার, অথবা যখন কোন ব্যক্তি কোন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠিত করিতে গেলে খাদ্যদ্রব্য ও ব্যবহার প্রণালীতে যে বিধিনিষেধ পালন করে, তখন তাহা ব্রত।

দ্বিতীয়তঃ, ইহা বিশেষভাবে নির্দিষ্ট কতকগুলি খাদ্য। যেমন আমরা দেখি যখন কোন ব্যক্তি ধর্মীয় রীতি বা অনুষ্ঠানে নিরত থাকে, তখন তাহার রক্ষার জন্য যে খাদ্যদ্রব্য নির্দিষ্ট হয়, তাহাও ব্রত।

তৈত্তিরীয় সংহিতায় বলা আছে—

"তস্যৈতদ্ ব্রতম্। নানৃতং বদেন্ন মাংসমশ্নীয়ান্ন স্ত্রিয়মুপেয়ান্নাস্য পল্পূলনেন বাসঃ পল্পূলয়েয়ুরেতদ্ধি দেবাঃ সর্বং ন কুর্বন্তি।" ২, ৫, ৫, ৬।

অর্থাৎ ইহাই তাহার ব্রত। সে অসত্য কথা বলিবে না, মাংস খাইবে না, স্ত্রীতে উপগত হইবে না, অথবা তাহার বস্ত্র লবণ দ্বারা সিক্ত জলে ধুইবে না। এই সমস্ত বিষয় দেবতারা করে না।

সেইরূপ সাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণেও আছে—

"তস্য ব্রতমুদ্যন্তমেবৈনং নেক্ষেতাস্তং যন্তং চেতি।" ৬,৬।

অর্থাৎ ব্রত পালন করিতে হইবে, যথা সে উদিত সূর্যকে দেখিবে না বা অস্তগত সূর্যকেও দেখিবে না।

জৈমিনীয়ন্যায়ের ভাষ্যকার শবরস্বামী ইহাকে প্রজাপতিব্রত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা আছে—

"অন্নং ন নিন্দ্যাৎ। তদ্ ব্রতম্।...অন্নং বহু কুর্বীত তদ্ ব্রতম্।...ন কং চন বসতৌ প্রত্যা চক্ষীত। তদ্ ব্রতম্। তস্মাদ্যয়া কয়া চ বিধয়া বহ্বন্নং প্রাপ্নুয়াৎ।" ৩, ৭-১০।

অর্থাৎ অন্নকে নিন্দা করিও না, তাহাই ব্রত। অনেক পরিমাণে অন্ন প্রস্তুত করিবে, তাহাই ব্রত। কাহাকেও স্থান দিতে অস্বীকৃত হইবে না, তাহাই ব্রত। সুতরাং যে কোন প্রকারে প্রচুর অন্ন লাভ করিবে।

ব্রতের দ্বিতীয় অর্থও সংহিতা প্রভৃতিতে নির্ধারিত হইয়াছে। যথা তৈত্তিরীয় সংহিতায় আছে—

"অথৈকং স্তনং ব্রতমুপৈত্যথ দ্বাবথ ত্রীনথ চতুর এতদ্বৈ ক্ষুরপবি নাম ব্রতং...যবাগূ রাজন্যস্য ব্রতং...আমিক্ষা বৈশ্যস্য পয়ো ব্রাহ্মণস্য।" ৬, ২, ৫, ১।

অর্থাৎ দীক্ষিত ব্যক্তি ব্রত পালন করিবে গরুর একটি বাঁট হইতে প্রাপ্ত দুগ্ধ দিয়া, পরে দুইটি হইতে, পরে তিনটি হইতে, তারপর চারটি হইতে, ইহাকে ক্ষুরপবি নামক ব্রত বলে। ক্ষত্রিয়ের যবাগূ দ্বারা ব্রত, আর বৈশ্যের আমিক্ষা দ্বারা ব্রত পালন করিতে হয়।

সূত্র যুগেও ব্রত সম্বন্ধে দেখা যায়, যথা আপস্তম্বশ্রৌত সূত্রে আছে—

"দক্ষিণেনাহবনীয়মবস্থায় ব্রতমুপৈষ্যন্ সমুদ্রং মনসা ধ্যায়তি। অথ জপত্যগ্নে ব্রতং চরিষ্যামীতি ব্রাহ্মণঃ। বায়ো ব্রতপত আদিত্য ব্রতপতে ব্রতানাং ব্রতপতে ব্রতং চরিষ্যামীতি রাজন্যবৈশ্যৌ।" ৪, ৩, ১-২।

এই সূত্রগ্রন্থে আরও বলা আছে যে—

"অথ ব্রতং চরতি ন মাংসমশ্নাতি ন স্ত্রিয়মুপৈতি নাস্যাগ্নিং গৃহাদ্ধরন্তি নান্যত আহরন্তি। যোস্যাগ্নিমাধাস্যন্ স্যাৎ স এতাং রাত্রিং ব্রতং চরতি ন মাংসমশ্নাতি ন স্ত্রিয়মুপৈতি।" ৫, ৭, ৬।

অর্থাৎ ব্রত আচরণ করিতে মাংস খাইবে না, স্ত্রীতে উপগত হইবে না, গৃহ হইতে ইহার অগ্নিকে হরণ করিবে না, অন্যস্থান হইতে অগ্নি আহরণ করিবে না। যে ব্যক্তি অগ্নির আধান করিতে প্রবৃত্ত হইবে, সে এই রাত্রিতে ব্রত আচরণ করিবে, মাংস খাইবে না, স্ত্রীতে উপগত হইবে না।

আবার ব্রতের দ্বিতীয় অঙ্গ (খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি)ও সূত্র গ্রন্থে দেখা যায়। যথা—"গার্হপত্যে দীক্ষিতস্য ব্রতং শ্রপয়তি দক্ষিণাগ্নৌ পত্ন্যাঃ।"

আপস্তম্বশ্রৌতসূত্র, ১০ ১৭।৬

অর্থাৎ গার্হপত্য অগ্নিতে দীক্ষিত ব্যক্তির ব্রত শ্রপণা করিবে, দক্ষিণাগ্নিতে পত্নীর ব্রত অর্থাৎ দুগ্ধ ইত্যাদি দিবে।

গৌতমধর্মসূত্রে আছে—

"স বিধিপূর্বকং স্নাত্বা ভার্যামধিগম্য যথোক্তান্ গৃহস্থধর্মান্ প্রযুঞ্জান ইমানি ব্রতান্যনুকর্ষেৎ। স্নাতকঃ।"

১।৯।১-২

অর্থাৎ সে বিধি অনুসারে স্নানান্তে ভার্যা লাভ করিয়া যথোক্ত গৃহস্থধর্মে প্রবৃত্ত হইয়া এই ব্রতগুলি অনুষ্ঠিত করিবে। যথা স্নাতকব্রত।

বৌধায়নধর্মসূত্রেও আছে—

"অথ যদি ব্রহ্মচার্য্যাব্রত্যমিব চরেৎ। মাংসমশ্নীয়াৎ স্ত্রিয়ং বোপেয়াৎ সর্বাস্বেবার্তিষু। অন্তরাগারেঽগ্নিমুপসমাধায় সম্পরিস্তীর্যাগ্নিমুখাৎ কৃত্বা অথাজ্যাহুতীরুপজুহোতি।" ৩।৪।১-৩

অর্থাৎ যদি ব্রহ্মচারী অব্রত্য আচরণ করে, যথা সমস্ত ঋতুতে মাংস ভক্ষণ করে বা স্ত্রীতে উপগত হয়, তাহা হইলে গৃহে অগ্নি স্থাপন করিয়া অগ্নিমুখ হইয়া অগ্নিতে আহুতি দান করিবে।

আপস্তম্বধর্মসূত্রে আছে যে—

"পাণিগ্রহণাদধি গৃহমেধিনোর্ব্রতম্। কালয়োর্ভোজনম্। অতৃপ্তিশ্চান্নস্য। পর্বসু চোভয়োরুপবাসঃ।" ২।১।১।১-৪

অর্থাৎ বিবাহের দিন হইতে স্বামী-স্ত্রী ব্রত-অনুষ্ঠান করিবে। যথা দিনে দুইবার ভক্ষণ করিবে, পরিতৃপ্তি পর্যন্ত খাইবে না এবং পর্বে উপবাস করিবে।

সংহিতাযুগে ব্রত সম্বন্ধে মনুসংহিতায় নির্দেশ আছে—

"এতদেব ব্রতং কুর্যুরুপপাতকিনো দ্বিজাঃ।
অবকীর্ণিবর্জং শুদ্ধ্যর্থং চান্দ্রায়ণমথাপি বা॥" ১১।১১৬

ইহা প্রায়শ্চিত্তবিষয়ে ব্রত। যথা উপপাতকগ্রস্ত দ্বিজাতি-

গণ পাপশুদ্ধির নিমিত্ত পূর্বোক্ত গোবধ ব্রতই পালন করিবে অথবা চান্দ্রায়ণও করিতে পারিবে, কিন্তু অবকীর্ণী ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত ইহা নহে, তাহা অন্য প্রকার।

আরও দেখা যায়—

"গুরুতল্পব্রতং কুর্যাদ্রেতঃ সিক্ত্বা স্বযোনিষু।

সখ্যুঃ পুত্রস্য চ স্ত্রীষু কুমারীষন্ত্যজাসু চ॥" ১১।১৬৯

স্বযোনি অর্থাৎ সহোদরা ভগিনী, সখার স্ত্রী, পুত্রের স্ত্রী, কুমারী এবং অন্ত্যজা রমণীতে রেতঃপাত করিলে গুরুতল্প-ব্রত কর্তব্য।

"পৈতৃষ্বস্রেয়ীং ভগিনীং স্বস্ত্রীয়াং মাতুরেব চ।

মাতুশ্চ ভ্রাতুরাপ্তস্য গত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ॥" ১১।১৭০

অর্থাৎ পিসতুত ভগিনী, মাসতুত ভগিনী এবং মাতার সহোদর ভ্রাতার কন্যাতে উপগত হইলে চান্দ্রায়ণ করিবে।

পুনরায়—"বিপ্রদুষ্টাং স্ত্রিয়ং ভর্তা নিরুন্ধ্যাদেকবেশ্মনি।

যৎ পুংসঃ পরদারেষু তচ্চৈনাং চারয়েদ্ ব্রতম্॥" ১১।১৭৫

অর্থাৎ যদি কোন স্ত্রীলোক ব্যভিচারিণী হয় তাহা হইলে তাহাকে তাহার স্বামী একটি ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে এবং পুরুষের পক্ষে পরস্ত্রীগমনের যেরূপ প্রায়শ্চিত্ত ইহাকে দিয়া তাহা করাইবে।

আর—"যো যেন পতিতেনৈষাং সংসর্গং যাতি মানবঃ।

স তস্যৈব ব্রতং কুর্যাত্তৎসংসর্গবিশুদ্ধয়ে॥" ১১।১৮০

অর্থাৎ এই সকল পতিত ব্যক্তিগণের মধ্যে যে লোক যে কর্ম করিয়া পতিত হইয়াছে তাহার সেই কর্মের যেরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে যে ব্যক্তি তাহার সহিত পূর্বোক্ত প্রকার সংসর্গ করিবে তাহাকেও সেই প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, তবে তাহার ঐ দোষ হইতে শুদ্ধি হইবে। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায়ও আছে—

"যাগস্থক্ষত্রবিট্‌ঘাতী চরেদ্ ব্রহ্মহনিব্রতম্।

গর্ভহা চ যথাবর্ণং তথাত্রেয়ীনিষূদকঃ॥" ৩।২৫১

অর্থাৎ ব্রহ্মহত্যাকারী পুরুষের প্রতি যে ব্রত উপদিষ্ট হইয়াছে (যথা দ্বাদশবার্ষিকব্রত প্রভৃতি) যজ্ঞে নিযুক্ত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের-হত্যাকারী ব্যক্তি তাহাই আচরণ করিবে। গর্ভ-বধেও যে বর্ণের পুরুষবধে যে প্রায়শ্চিত্ত নির্দিষ্ট আছে সেই বর্ণের গর্ভবধে সেই ব্রত অনুষ্ঠিত করিবে। আত্রেয়ী হত্যা করিলেও সেই ব্রত আচরণ করিবে।

আবার দেখা যায়—

"চরেদ্ ব্রতমহত্বাপি ঘাতার্থং চেৎ সমাগতঃ।

দ্বিগুণং সবনস্থে তু ব্রাহ্মণে ব্রতমাদিশেৎ॥" ৩।২৫২

অর্থাৎ হত্যা না করিয়া হত্যার জন্য আগত হইলেও ব্রত আচরণ করিবে। সোমযাগ অনুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণকে হত্যা করিলে দ্বাদশ বার্ষিক প্রভৃতি ব্রত দ্বিগুণ আচরণ করিবে।

মহাভারতেও ব্রত সম্বন্ধে দেখা যায় যে ব্রত ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধে অথবা আচার ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ কতকগুলি বিধিনিষেধ পালিত হয়। যথা মহাভারতের বনপর্বে আছে—

"চতুর্থেঽহনি মর্তব্যমিতি সঞ্চিন্ত্য ভাবিনী।

ব্রতং ত্রিরাত্রমুদ্দিশ্য দিবারাত্রং স্থিতা ভবেৎ॥" ২৯৫।৩

অর্থাৎ চতুর্থ দিনে মৃত্যু হইবে ইহা চিন্তা করিয়া নারীগণ ত্রিরাত্র ব্রতের উদ্দেশ্যে দিবারাত্র নিযুক্ত থাকিবে।

আবার উদ্যোগপর্বে আছে—

"অষ্টৌ তান্যব্রতঘ্নানি আপো মূলং ফলং পয়ঃ।

হবির্ব্রাহ্মণকাম্যা চ গুরো র্বচনমৌষধম্॥" ৩৯।৭০

অর্থাৎ অসমর্থ লোকের পক্ষে জল, মূল, ফল, দুগ্ধ ও ঘৃত-ভক্ষণে, রোগীর পক্ষে ঔষধ ভক্ষণে এবং সকলের পক্ষেই ব্রাহ্মণের অনুরোধে ও গুরুর আদেশে অন্য দ্রব্য ভক্ষণে ব্রত নষ্ট হয় না।

শান্তিপর্বে আছে—

"স্ত্রীশূদ্রং পতিতঞ্চাপি নাভিভাষেদ্ ব্রতান্বিতঃ।

পাপান্যজ্ঞানতঃ কৃত্বা মুচ্যেদেবং ব্রতো দ্বিজঃ॥" ৩৫।৩৯

অর্থাৎ ব্রতে নিযুক্ত হইয়া স্ত্রীলোক, শূদ্র ও পতিতের সহিত কথা বলিবে না, না জানিয়া এই সব পাপ করিলে ব্রতী দ্বিজ ব্যক্তি এই প্রকারে পাপ হইতে মুক্ত হইবে।

মহাভারতে আরও আছে যে কেবলমাত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠানই নহে কোন আচার বা ব্যবহারের রীতি বা পদ্ধতিও ব্রত বলিয়া নির্দিষ্ট হইবে। কারণ দেখা যায় যে সভাপর্বে যুধিষ্ঠিরের উক্তি আছে—

"আহূতোঽহং ন নিবর্তে কদাচিত্তদাহিতং শাশ্বতং বৈ ব্রতং মে॥"

অর্থাৎ ইহাই তাঁহার শাশ্বত ব্রত যে তিনি পাশাখেলায় আহূত হইয়া কখনও তাহা পরিত্যাগ করেন না।

মনুসংহিতার মেধাতিথিভাষ্যে উল্লিখিত আছে—

"মানসোঽধ্যবসায়ো ব্রতম্। ইদংময়া যাবজ্জীবং কর্তব্যমিতি ষৰ্দ্ধিহিতম্। যথা স্নাতকব্রতানি।"

অর্থাৎ মনে মনে নিশ্চয় (স্থিরসঙ্কল্প) করা, তাহার নাম ব্রত। 'আমি যতদিন বাঁচিব ততদিন এই কর্ম করিব' ইত্যাদি প্রকারে যাহা কর্তব্য তাহাই ব্রত। ইহার উদাহরণ যেমন স্নাতকব্রত, প্রজাপতিব্রত প্রভৃতি। কর্তব্যকর্মে প্রবৃত্ত হওয়া কিংবা নিষিদ্ধ কর্ম হইতে নিবৃত্ত হওয়া ইহার কোনটাই সঙ্কল্প ব্যতীত সম্ভব নহে।

কোন বিষয়ে চিত্তের যে সম্যক্ দর্শন অর্থাৎ মনে মনে দেখা—যাহার পর যথাক্রমে সেই বিষয়টি পাইবার ইচ্ছা এবং তদনন্তর সে সম্বন্ধে অধ্যবসায় অর্থাৎ স্থির সঙ্কল্প জন্মে। এইগুলি সব মনেরই ব্যাপার বা ক্রিয়া। সকল প্রকার কর্মানুষ্ঠানেরই এইগুলি কারণ হইয়া থাকে। কোন প্রাণীর কোন ব্যাপার ঐ সঙ্কল্প ব্যতীত হইতে পারে না। যেহেতু সকল কাজ করিবার আগে প্রথমতঃ সেই কাজটির স্বরূপ কি তাহা ঠিক করিয়া লওয়া হয়। কাজেই 'এই পদার্থটি (কর্মটি) এই প্রয়োজন সাধন করে; এই প্রকার যে জ্ঞান তাহাই এখানে 'সঙ্কল্প' পদের অভিপ্রেত অর্থ। তাহার পর জন্মে সেই বিষয়টি সম্বন্ধে প্রার্থনা বা ইচ্ছা। ইহারই নাম কাম বা কামনা। এই কামনা হইতেই ব্রত আচরণ করিতে ইচ্ছা জন্মে। যথা মনুসংহিতায় বলা হইয়াছে—

"সঙ্কল্পমূলঃ কামো বৈ যজ্ঞাঃ সঙ্কল্পসম্ভবাঃ।

ব্রতানি যমধর্মাশ্চ সর্বে সঙ্কল্পজাঃ স্মৃতাঃ॥" ২।৩

অর্থাৎ কামনার মূলে থাকে সঙ্কল্প। যজ্ঞ, ব্রত, যমধর্ম—এই সমস্ত সঙ্কল্প হইতে সম্ভূত হয়।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় ব্রতের অঙ্গভূত ধর্মগুলি নির্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—

"ব্রহ্মচর্যং দয়া ক্ষান্তির্দানং সত্যমকল্কতা।

অহিংসা স্তেয়মাধুর্যে দমশ্চেতি যমাঃ স্মৃতাঃ॥" ৩।৩১৩

অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য, দয়া, ক্ষান্তি, দান, সত্যকথা বলা, অকুটিলতা, অহিংসা, স্তেয়, মাধুর্য ও দম—এই দশটি যমরূপে স্মরণ করা হইয়া থাকে।

আবার—

স্নানং মৌনোপবাসেজ্যাস্বাধ্যায়োপস্থনিগ্রহাঃ।

নিয়মা গুরুশুশ্রূষা শৌচাক্রোধাপ্রমাদতা॥" ৩।৩১৪

অর্থাৎ স্নান, মৌন, উপবাস, ইজ্যা, স্বাধ্যায়, লিঙ্গনিগ্রহ, গুরুশুশ্রূষা, শৌচ, ক্রোধ ও অপ্রমাদ—এই দশটি নিয়ম।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার টীকা মিতাক্ষরায় আছে—

"এবং শ্রৌতস্মার্তানি কর্মাণ্যভিধায়েদানীং গৃহস্থস্যস্নানাদারভ্য ব্রাহ্মণস্যাবশ্য কর্তব্যানি বিধিপ্রতিষেধাত্মকানি মানসসঙ্কল্পরূপাণি স্নাতকব্রতান্যাহ।"

যথা মানস সঙ্কল্পরূপ স্নাতকব্রত। শ্রৌত ও স্মার্ত কর্মসকল বলিয়া গৃহস্থের স্নান হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণের অবশ্যকর্তব্য বিধি ও নিষেধাত্মক মানসসঙ্কল্পরূপ স্নাতকব্রত বলা হইয়াছে।

অগ্নিপুরাণে ব্রতের দশ প্রকার ধর্ম কথিত হইয়াছে। যথা—

"ক্ষমা সত্যং দয়া দানং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।

দেবপূজাগ্নিহরণং সন্তোষোঽস্তেয়মেব চ॥

সর্বব্রতেষ্বয়ং ধর্মঃ সামান্যো দশধা স্মৃতঃ।

পবিত্রাণি জপেচ্চৈব জুহুয়াচ্চৈব শক্তিতঃ॥" ১৭৫।১০-২০

অর্থাৎ ক্ষমা, সত্য, দয়া, দান, শৌচ, ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, দেবপূজা, অগ্নিহরণ, সন্তোষ ও অচৌর্যবৃত্তি—এই দশটি সমস্ত ব্রতের সাধারণ ধর্ম। পবিত্র সকল জপ করিবে এবং শক্তি অনুসারে বহন করিবে।

নিবন্ধযুগে ব্রতসম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ ধর্মশাস্ত্রনিবন্ধকার ও সমাজসংস্কর্তা স্মার্তভট্টাচার্য রঘুনন্দন ব্রতলক্ষণ করিতে গিয়া প্রথমে প্রাচীন নিবন্ধকারগণের মত উল্লেখ করিয়া পরে স্বসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

রঘুনন্দন প্রথমে নারায়ণ উপাধ্যায়ের মত উত্থাপন করিয়াছেন।

যথা—

দীর্ঘকালানুপালনীয়ঃ সঙ্কল্পো ব্রতমিতি

নারায়ণোপাধ্যায়ানাং স্বরসঃ।" (একাদশীতত্ত্ব, পৃঃ ৪২৮)

অর্থাৎ দীর্ঘকাল ধরিয়া পালনীয় সঙ্কল্পই ব্রত—ইহা নারায়ণ উপাধ্যায়ের মত।

আবার শ্রীদত্ত, হরিনাথ, বর্ধমান প্রভৃতির মত, যথা—

"স্বকর্তব্যবিষয়ো নিয়তঃ সঙ্কল্পো ব্রতমিতি

শ্রীদত্তহরিনাথবর্ধমান প্রভৃতয়ঃ।

সঙ্কল্পশ্চ ভাবে ময়ৈতৎ কর্তব্যমেব নিষেধে ন
কর্তব্যমিতি জ্ঞানবিশেষঃ।"

অর্থাৎ নিজের কর্তব্যবিষয়ক নিয়ত সঙ্কল্পই ব্রত। সঙ্কল্পের অর্থনিরূপণে ভাবপক্ষে 'আমা কর্তৃক ইহা কর্তৃব্য; আবার নিষেধে ইহা কর্তব্য নহে' এইরূপ জ্ঞানবিশেষই ব্রত।

এই সব মতগুলি উত্থাপন করিয়া রঘুনন্দন দেখাইয়াছেন যে প্রাচীন নিবন্ধকারগণের মতে সঙ্কল্পই ব্রতরূপে নিরূপিত হইয়াছে।

কিন্তু রঘুনন্দনের মতে সঙ্কল্পই ব্রত নহে। এখানে তিনি সঙ্কল্প কাহাকে বলে তাহা নির্দেশ করিয়াছেন। যথা অভিধানে আছে—

"অতএব সঙ্কল্পঃ কর্মমানসমিত্যাভিধানিকাঃ" অর্থাৎ মানসিক কর্মই সঙ্কল্প।

আবার যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতিতে উক্ত হইয়াছে—

"একভক্তেন নক্তেন তথৈবাযাচিতেন চ।
উপবাসেন চৈকেন পাদকৃচ্ছ্র উদাহৃতঃ॥

ইত্যাদি যাজ্ঞবল্ক্যাদ্যুক্তেঃ একভক্ত নক্তনাযাচিতভোজনোপবাসাদিষু পাদকৃচ্ছ্রাদিত্বাভিধানাচ্চ"

অর্থাৎ একভক্ত, নক্ত, তথা অযাচিত এবং উপবাস দ্বারা পাদকৃচ্ছ্র ব্রত রূপে নিরূপিত হইয়াছে।

আর বরাহপুরাণের বচনে পাওয়া যায়—

"একাদশ্যাং নিরাহারো যো ভুঙ্‌ক্তে দ্বাদশীদিনে।
শুক্লে বা যদি বা কৃষ্ণে তদ্ব্রতং বৈষ্ণবং মহৎ॥"

অর্থাৎ শুক্লপক্ষে বা কৃষ্ণপক্ষের একাদশীতিথিতে আহার না করিয়া যে ব্যক্তি দ্বাদশীদিনে ভোজন করে তাহাকে মহান্ বৈষ্ণব ব্রত বলা হয়।

এই প্রকারে যাজ্ঞবল্ক্যের বচনে ও বরাহপুরাণের বচনে যেহেতু কেবলমাত্র সঙ্কল্পই ব্রতরূপে নিরূপিত হয় নাই, সেই জন্য রঘুনন্দন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে সঙ্কল্পই ব্রত নহে, কিন্তু সঙ্কল্পবিষয়ক কর্মই ব্রতরূপে অভিহিত হয়। যথা—

"ন সঙ্কল্পো ব্রতং কিন্তু সঙ্কল্পবিষয়তত্তৎকর্মৈব ব্রতমিতি।"
(একাদশীতত্ত্ব, পৃঃ ৪২৮)।

রঘুনন্দনের পূর্ববর্তী নিবন্ধকার শূলপাণি ব্রতের সংজ্ঞা নিরূপণ করিয়াছেন। যথা—

"তত্র দীর্ঘকালানুপালনীয়তত্তদিতিকর্তব্যতাকলাপসহিতা নিয়ত সংকল্পবিষয়ো ব্রতমিতি ব্রতলক্ষণম্।"
(ব্রতকালবিবেক, পৃঃ ৬)।

অর্থাৎ দীর্ঘকাল ধরিয়া পালনীয় সেই সেই ইতিকর্তব্যতাবিশিষ্ট সর্বদা সঙ্কল্পবিষয়ই ব্রত—ইহাই ব্রতের লক্ষণ।

শূলপাণির এইরূপ ব্রতের সংজ্ঞা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে রঘুনন্দনও শূলপাণির মত অনুসারেই ব্রতের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। শূলপাণিও সঙ্কল্পকে ব্রত বলেন নাই, বরং সঙ্কল্পের বিষয়কেই ব্রত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আবার শূলপাণি যে ব্রতের সংজ্ঞায় 'সেই সেই ইতি কর্তব্যতাবিশিষ্ট' অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও রঘুনন্দনের ব্রতলক্ষণে দেখা যায়। যথা—

"তৈনৈতাদৃশেতিকর্তব্যতাকঃ সঙ্কল্পবিষয়ো ব্রতমিতি ব্রতলক্ষণম্"—অর্থাৎ এতাদৃশ ইতিকর্তব্যতাবিশিষ্ট সঙ্কল্প বিষয়ই ব্রত। (একাদশীতত্ত্ব, পৃঃ ৮৩০)।

অতএব দুই মত সম্যক অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে রঘুনন্দন শূলপাণির অনুকরণেই ব্রতলক্ষণ করিয়াছেন। মৈথিল নিবন্ধকার বাচস্পতিমিশ্রের মতেও সঙ্কল্প ব্রত নহে, কিন্তু ব্রত সঙ্কল্পবিষয়ক।

যদিও ব্রত হইতেছে শাস্ত্রবিহিত নিয়ম এবং নিয়ম বলিতে কামচারের বিশেষ নিবৃত্তি বুঝায়। যথা অশ্রাদ্ধভোজী। এখানে পাণিনির সূত্র 'ব্রতে'—তাহাতে ণিন্ প্রত্যয় হইয়া অশ্রাদ্ধভোজী পদ নিষ্পন্ন হয়। তাহা দ্বারা বুঝা যায় যে, ভোজন হইলে অশ্রাদ্ধীয় অন্নই ভোজন করিবে—এইরূপ অর্থ বৈয়াকরণরা করিয়া থাকেন। এখানে ভোজনরূপ প্রবৃত্তিতে নিয়মবিধি করা হইয়াছে। কিন্তু রঘুনন্দনের মতে সেইরূপ ব্রত এখানে গ্রহণীয় নহে। কারণ তাহা হইলে ঋতুকালে স্ত্রীতে গমনকারী ব্যক্তিরও সঙ্কল্পের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। সেখানে "ঋতুকালগমনং যস্যাস্তি স ঋতুকালাভিগামী, ব্রতে ণিন্নিতি"। অর্থাৎ স্ত্রীর ঋতুকালে গমন করে যে সেই ঋতুকালাভিগামী। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ঋতুকালগমনে সঙ্কল্প করিতে হয় না। অতএব পাণিনির সূত্রানুসারে ব্রতলক্ষণ করিলে অতিব্যাপ্তি দোষ হয় বলিয়া রঘুনন্দন তাহা বর্জন করিয়াছেন।

সঙ্কল্প হইতে ব্রতগুলি উদ্ভূত হয়। যথা মনুর বচনে পাওয়া যায়—

"সঙ্কল্পমূলঃ কামো বৈ যজ্ঞাঃ সঙ্কল্পসম্ভবাঃ।

ব্রতা নিয়মধর্মাশ্চ সর্বে সঙ্কল্পজাঃ স্মৃতাঃ॥"

অর্থাৎ কামনার মূলে থাকে সঙ্কল্প। যজ্ঞ, ব্রত, যমধর্ম—এই সমস্ত সঙ্কল্প হইতে জাত হয়।

কি প্রকারে ব্রতগুলি সঙ্কল্প হইতে সম্ভূত হয় তাহা রঘুনন্দন দেখাইয়াছেন। যথা এই কর্মদ্বারা এইরূপ ইষ্ট ফল সাধিত হয়—এই প্রকার বুদ্ধি সঙ্কল্পরূপে অভিহিত হয়। তারপর ইহার ইষ্টসাধনহেতু ইহা অবগত হইলে সেই বিষয় অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা হয়। এই ইচ্ছাই প্রবৃত্তি উৎপাদন করে। অতএব ইহা অনুষ্ঠিত করিতে যত্ন কর—এই প্রকার অর্থদ্বারা বুঝা যায় যে ব্রত প্রভৃতি সঙ্কল্প হইতেই উৎপন্ন হয়। সংকল্প ব্যতীত ব্রত সম্পাদিত হইতে পারে না। ব্রত হইতেছে নিয়মরূপ ধর্ম।

বরাহ পুরাণে সঙ্কল্প সম্বন্ধে বলা আছে—প্রাতঃকালে বিদ্বান্ ব্যক্তি সঙ্কল্প করিয়া উপবাস, ব্রত প্রভৃতি করিবে। ইহা অপরাহ্নে বা মধ্যাহ্নে হইবে না, কারণ ঐ দুইটি কাল পিতৃকাল বলিয়া কথিত হয়।

কর্মের আরম্ভ কি হইবে তাহা বলা হইতেছে। যথা—

"আরম্ভো বরণং যজ্ঞে সঙ্কল্পো ব্রতজাপয়োঃ।

নান্দীশ্রাদ্ধং বিবাহাদৌ শ্রাদ্ধে পাকপরিক্রিয়া॥

নিমন্ত্রণন্তু বা শ্রাদ্ধে প্রারম্ভঃ স্যাদিতি শ্রুতিঃ॥

অর্থাৎ যজ্ঞকার্যে ঋত্বিক্ বরণ যজ্ঞের আরম্ভ, সঙ্কল্প ব্রত ও জপের আরম্ভ, বিবাহ প্রভৃতিতে নান্দীশ্রাদ্ধ এবং শ্রাদ্ধে পাকপরিক্রিয়া অর্থাৎ সাগ্নিক ব্যক্তির দর্শন, শ্রাদ্ধে অগ্নির আধানহেতু সেই অগ্নিকে পাক বিধান ইত্যাদি শ্রাদ্ধ কর্মের আরম্ভ। অথবা ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ শ্রাদ্ধ কর্মের আরম্ভ।

সঙ্কল্পই যে ব্রতের আরম্ভ তাহা রাঘবভট্টধৃত বিষ্ণুর বচনে পাওয়া যায়। যথা—

"ব্রতযজ্ঞবিবাহেষু শ্রাদ্ধে হোমেঽর্চনে জপে।

আরব্ধে সূতকং ন স্যাদনারব্ধে তু সূতকম্॥"

অর্থাৎ ব্রত, যজ্ঞ, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, হোম, অর্চনা ও জপ আরম্ভ হইলে সূতকাশৌচ হইবে না. আরম্ভ না, হইলে সূতকাশৌচ হইবে।

ইহার তাৎপর্য এই যে, ব্রত, যজ্ঞ, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, হোম প্রভৃতির কার্য একবার আরম্ভ হইলে ব্রতকারীর অন্তর্বর্তী-কালীন কোনও মরণাশৌচ ও জাতাশৌচ তাহার ব্রত নিষ্পাদনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিবে না। একমাত্র আরব্ধ কর্মানুষ্ঠানের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম প্রযোজ্য। কিন্তু কর্মারম্ভের পূর্বে অশৌচ পতিত হইলে ব্রতীর প্রতিনিধি সেই কর্ম সম্পন্ন করিবেন, ব্রতী স্বয়ং তাহা নিষ্পন্ন করিতে পারিবেন না।

এখানে বিবেচ্য যে. পূর্বোক্ত বচনে 'আরব্ধে সূতকং ন স্যাৎ, এই অংশ দ্বারাই কর্মের আরম্ভ না হইলে সূতক অশৌচ হইবে—এইরূপ অর্থও প্রতীত হয় এবং অনারব্ধে তু সূতকম্' এই অংশ পুনরুক্তি দোষদুষ্ট হয়। অতএব তাহা পরিহারের জন্যই নিবন্ধকারগণ ব্যাখ্যা করেন যে —জনন ও মরণজনিত যাদৃশ অশৌচ কর্মকর্তার কর্মে প্রতিবন্ধক হয়, কর্মের আরম্ভ হইলে সেইরূপ অশৌচ কর্মকর্তার প্রতিবন্ধক হয় না। ইহা দ্বারা দ্যোতিত হয় যে প্রতিনিধি দ্বারা কর্মানুষ্ঠান করিলে কর্মারম্ভের পর প্রতিনিধির অশৌচ পতিত হইলে সেই প্রতিনিধি দ্বারা সেই কর্ম অনুষ্ঠিত হইবে না। তখন অশৌচহীন যে কোন ব্যক্তি ব্রতীর প্রতিনিধি হইয়া কার্য সম্পন্ন করিবে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই বিষয়ে মতভেদ আছে। যেমন ভট্টপল্লী সম্প্রদায়ের মতে কর্মের পারিভাষিক আরম্ভ অর্থাৎ শাস্ত্রীয় আরম্ভ হইলে পর কর্মকর্তার অশৌচ আরব্ধকার্যে প্রতিবন্ধক হইবে না। তন্মতে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করার পর কোন অশৌচ উপস্থিত হইলে তাহা বিবাহ প্রভৃতি কার্যে বাধক হইবে না।

কিন্তু পূর্বাঙ্গবাসিগণের মতে ইহার অন্যরূপ ব্যাখ্যান দেখা যায়। তাঁহারা বলেন—

"গর্ভিণী সূতিকা নক্তং কুমারী চ রজঃস্বলা।

যদাঽশুদ্ধা তদান্যেন কারয়েৎ ক্রিয়তে সদা॥"

(ব্রততত্ত্ব, পৃঃ ৪৭৮)

এই বচনের ব্যাখ্যানে স্মার্ত ভট্টাচার্য রঘুনন্দন বলিয়াছেন—

"পূজাদিকমন্যেন কারয়েৎ, কায়িকমুপবাসাদিকং স্বয়ং ক্রিয়তে"—এই বাক্যের সঙ্গে একবাক্যতা করিয়া আরব্ধে সুতকং ন স্যাৎ' এই বচন প্রতিনিধিদান বিষয়ে প্রতি-প্রসববৎ হইবে। তাহাতে আরব্ধ পূজাদিকার্যে কর্মকর্তার অশৌচ উপস্থিত হইলে তিনি অন্য কাহাকেও প্রতিনিধি-রূপে বরণ করিয়া দিতে পারিবেন। এই বরণকার্য বিষয়ে তাহার অশৌচ প্রতিবন্ধক হইবে না। বিবাহে প্রতিনিধি দান সম্ভব না হইলেও কন্যা বিবাহ বিষয়ে 'পিতা দদ্যাৎ স্বয়ং কন্যাম্'—এই বচনানুসারে নান্দীমুখ দ্বারা আরব্ধ বিবাহে পিতার অশৌচ উপস্থিত হইলে বিবাহাঙ্গীভূত কন্যা-দানে পিতা অন্যকে প্রতিনিধি করিতে পারেন। পুত্র বিবাহে ইহার কোন প্রতিপ্রসব নাই।

রঘুনন্দনের মতে সঙ্কল্প ব্রতের অঙ্গ। যথা—

"অতএব সঙ্কল্পাঙ্গকমেব বিচার্যত ইতি বিশেষঃ"। এখানে উল্লেখযোগ্য, শূলপাণি ব্রত যে সঙ্কল্পমূলক তাহা মনুর বচন উত্থাপন করিয়া দেখাইয়াছেন। কিন্তু সঙ্কল্প যে ব্রতের অঙ্গ তাহা স্পষ্টতঃ নির্দেশ করেন নাই।

এখানে আরও বিচার্য যে শূলপাণি তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত বিবেকে বলেন—"ব্রতপদং নিয়তসঙ্কল্পবিশেষবাচকম্" অর্থাৎ ব্রতপদ সর্বদা সঙ্কল্পের বাচক হওয়ায় ব্রত ও সঙ্কল্প অভিন্ন হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপ অর্থ নির্দেশ করিলে শূল-পাণির মতের সহিত রঘুনন্দনের মতের বিরোধ হয়। এই বিরোধের মীমাংসাকল্পে রঘুনন্দন বলেন যে "নিয়তঃ সঙ্কল্প-বিশেষো যত্র" অর্থাৎ বহুব্রীহি সমাস করিয়া সর্বদা সঙ্কল্প-বিশেষ যেখানে হয়—এই অর্থ দ্বারা অন্যপদ প্রধান বহুব্রীহি সমাসের অর্থ হয় দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত প্রভৃতি, তাহার বাচক হইতেছে ব্রত। এইরূপে দেখা যায় যে রঘুনন্দন স্বকীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে শূলপাণির মতে যে বিরোধের সম্ভাবনা হয় তাহা খণ্ডন করিয়াছেন। এইরূপ অর্থ না করিলে শূলপাণির স্বকীয় উক্তিতে বিরোধ হয়। যথা শূলপাণির মতে—"বৈ বৈ ব্রতৈরপোহেত"—এইরূপ বচন দ্বারা মরণেতেও ব্রতপদের অর্থ প্রযুক্ত হইয়াছে। কারণ মরণের দ্বারাও পাপ দূরীভূত হয় এবং দ্বাদশ বার্ষিক প্রভৃতি ব্রতপদের অন্বয় যে করা হইয়াছে তাহা বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে।

আবার লক্ষ্য করা যায় যে মৈথিল নিবন্ধকার শ্রীদত্ত প্রভৃতির মতেও "স্বকর্তব্যবিষয়ো নিয়তঃ সঙ্কল্পো ব্রতম্"—এইরূপে লক্ষণে স্বকর্তব্যবিষয়ে সর্বদা সঙ্কল্প হয় যাহাতে তাহাই ব্রত। এইজন্যই রঘুনন্দনের মতে বিনিগমনা হয় পূর্বোক্ত বরাহপুরাণ বচনে একাদশী ব্রত প্রভৃতি এবং যাজ্ঞ-বল্ক্য বচনে একভক্ত, নক্ত, অযাচিত, উপবাস প্রভৃতি ব্রত।

সঙ্কল্প কি প্রকারে অনুষ্ঠিত হইবে তাহাও রঘুনন্দন নির্দেশ দিয়াছেন। যথা "প্রাতঃসন্ধ্যাং ততঃ কৃত্বা সঙ্কল্পং বুধ আচরেৎ" অর্থাৎ প্রাতঃকালে সন্ধ্যা করিয়া পরে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সঙ্কল্প অনুষ্ঠান করেন। আবার মহাভারতের শান্তি-পর্বে আছে—

"গৃহীত্বৌডুম্বরং পাত্রং বারিপূর্ণমুদঙ্মুখঃ।
উপবাসন্তু গৃহ্ণীয়াদ্ যদ্বা সঙ্কল্পয়েদ্বুধঃ॥"

অর্থাৎ উডুম্বর পাত্র জলপূর্ণ অবস্থায় গ্রহণ করিয়া উত্তর-দিকে মুখ করিয়া উপবাস গ্রহণ করিতে হয়, অথবা প্রাজ্ঞ-ব্যক্তি সঙ্কল্প করিবেন। এখানে সঙ্কল্প করা পক্ষান্তরপ্রাপ্তি হইতেছে। তাহাতে তাম্রপাত্রের অভাবে সঙ্কল্পমাত্রই করিতে হয়। কিন্তু কল্পতরু গ্রন্থে 'যদ্বা' দ্বারা নক্ত প্রভৃতি ব্রতের কথা বলা হইয়াছে। রঘুনন্দনের মতে এই মত ঠিক নহে। কারণ তাহা হইলে পূর্বোক্ত বচনে তৎপদের অধ্যাহার করিতে হয় এবং উপবাসপদের বৈয়র্থ্যাপত্তি বুঝায়।

ব্রত গ্রহণ করার পর তাহার অনুষ্ঠান না করিলে যে দোষ হয় তাহা ছাগলেয় মুনির বচনে পাওয়া যায়। যথা—

"পূর্বং ব্রতং গৃহীত্বা যো নাচরেৎ কামমোহিতঃ।
জীবন্ ভবতি চণ্ডালো মৃতঃ শ্বা চৈব জায়তে॥"

অর্থাৎ পূর্বে ব্রত গ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি কামের দ্বারা মোহিত হইয়া ব্রতের অনুষ্ঠান না করে, সেই ব্যক্তি বাঁচিয়া থাকিয়াও চণ্ডালে পরিণত হয় এবং মৃত্যুর পরে কুকুররূপে জন্মে।

এই বিষয়ে প্রায়শ্চিত্তও নির্দেশ করা আছে। যথা পদ্মপুরাণে আছে—লোভহেতু, মোহহেতু বা প্রমাদহেতু যখন ব্রতভঙ্গ হয়, তিনদিন তাহার উপবাস করিতে হয়। শূলপাণি তাঁহার প্রায়শ্চিত্তবিবেকে 'বা' শব্দের সমুচ্চয় অর্থ করিয়াছেন। তাহাতে সূচিত হয় কেশমুণ্ডনও কর্তব্য।

এখানে আরও আলোচ্য যে ব্রত ভাবরূপ পদার্থ, ইহা অভাবরূপ নহে। কারণ 'অনন্ত হরিকে পূজা করিবে' এইরূপ সঙ্কল্প বিশেষের ভাবরূপ এবং 'উদিত সূর্যকে দেখিবে

না' এইরূপ সঙ্কল্প বিশেষের অভাবরূপ দেখা যায়। তাহা হইলে ব্রতের কোথাও অভাবরূপত্ব হেতু 'নিষেধঃ কালমাত্রকে' ইত্যাদি দ্বারা ব্রত নিষেধের বিষয় হউক—এইরূপ যদি কেহ আশঙ্কা করেন তাহার উত্তরে রঘুনন্দন বলেন তাহা ঠিক নহে। কারণ নিষেধ কেবল নিষেধই বুঝায়, কিন্তু ব্রতে সঙ্কল্প প্রভৃতি ইতিকর্তব্যতা থাকার দরুণ ভাবঘটিত অর্থ হইয়াছে। অতএব ব্রত কখনও নিষেধ নহে। কারণ নিষেধে ইতিকর্তব্যতা নাই বলিয়া তাহা ব্রতপদবাচ্য হইবে না। অতএব একাদশীতে উপবাসমাত্রের ব্রতত্ব বলা হইয়াছে, একাদশীতে খাইবে না—এখানে ব্রতপদত্বহেতু অভোজন আশঙ্কা নাই, কিন্তু উপবাস দ্বারা ভোগমাত্রেরই বর্জন বুঝাইয়াছে। সুতরাং যেরূপ একাদশীতে খাইবে না এখানে বচনহেতু উপবাসরূপ ব্রতপদত্ব বুঝায়, সেইরূপ খাইবে না স্থলেও ব্রতত্ব নিরূপিত হইয়াছে।

বঙ্গদেশে রঘুনন্দনের পূর্ববর্তী নিবন্ধকারগণের যে সব গ্রন্থ পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে এক শূলপাণি ব্যতীত কেহই ব্রতের সংজ্ঞা নির্ধারণ করেন নাই। জীমূতবাহন তাঁহার কালবিবেকগ্রন্থে ব্রতের দশটি ধর্মের কথা উল্লেখ করিয়াছেন পরে ব্রতে যে সঙ্কল্প করিতে হয় তাহা বলিয়াছেন। রঘুনন্দনের শিক্ষাগুরু শ্রীনাথাচার্যচূড়ামণিও ব্রতের সংজ্ঞা নির্দেশ করেন নাই। আবার গোবিন্দানন্দও ব্রতের সংজ্ঞা আলোচনা করেন নাই। কিন্তু সঙ্কল্প কিভাবে করিতে হয় তাহা বলিয়াছেন। একমাত্র রঘুনন্দনই ব্রত সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

প্রসূতি-পরিচর্য্যা ও শিশুমঙ্গল

ডাঃ কুমারেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-বি

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

নবজাত-শিশুর যথাযথ পুষ্টি হচ্ছে কিনা বুঝতে পারা যায়—নিম্নলিখিত লক্ষণগুলির দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখলেই। অর্থাৎ

১। শিশু ওজনে বাড়ে না অথবা কমে যায়?

২। মাঝে মাঝে অল্প ও কঠিন দাস্ত হয়, অথবা বার বার সামান্য পরিমাণ পায়খানা করে।

৩। শিশুর পেট পড়ে যায়, এবং পেটের মাংস পেশী শিথিল হয়ে ওঠে।

৪। শিশুর মূত্রও পরিমাণে কমে যায়।

৫। শিশু সর্ব্বদাই খাবার জন্যে আকুল হয়ে থাকে এবং খাবার আগে ও পরে বেশ কিছুক্ষণ কাঁদে, এমন কি, খেতে খেতেও অনেক সময় হঠাৎ ককিয়ে কেঁদে উঠে—দেখে মনে হয় সে যেন পেটে ব্যথা অনুভব করছে। তাছাড়া সে সর্ব্বদাই বিরক্ত হয় ও ঘ্যান ঘ্যান করে।

৬। দুর্ব্বল শিশুরা যথাযথ আহারাভাবে ক্রমেই আরও দুর্ব্বল হয়, এবং কেমন যেন একটা আচ্ছন্ন ভাব তাকে সদাই ঘিরে থাকে। সামান্যক্ষণ স্তন্যপান করেই ঘুমিয়ে পড়ে, আবার আচমকা ঘুম থেকে জেগে উঠে কাঁদতে আরম্ভ করে। তাছাড়া স্তন্যপানের সময় জোরে জোরে টেনে খেতেও পারেনা। আবার অনেক সময়ে কেমন যেন একটা আচ্ছন্ন ভাবেও ঘুমোতে দেখা যায়। কাজেই এ সব ক্ষেত্রে প্রসূতির উচিত—নিত্য শিশুর ওজন পরীক্ষা করে দেখা…অর্থাৎ শিশু কতটা দুধ পান করছে—বেশী না কম? যদি দেখা যায় শিশু কম পরিমাণে দুধ পান করছে, তা হলে স্তন্যদান বন্ধ না করে প্রয়োজনমতো পরিমাণে অন্য কোনো অতিরিক্ত-পরিপূরক পরিবর্ত্ত-খাদ্য অথবা কৃত্রিম,—দুধ দিতে হবে। তবে এ ব্যবস্থা অভিজ্ঞ ধাত্রী বা চিকিৎসকের পরামর্শানুসারে করাই ভালো। সকালের দিকে স্তনে বেশী দুধ থাকে—যত বেলা হয় প্রসূতির স্তনের দুধ পরিমাণে ততই কমতে থাকে। সেজন্য শিশুকে ওজন বুঝে দুধ পান করানো দরকার। গরুর দুধে অভিজ্ঞ ধাত্রী বা চিকিৎসকের পরামর্শানুযায়ী সামান্য পরিমাণে জল, চুণের জল ও চিনি মিশিয়ে স্তন্য-দুগ্ধের সমতা এনে প্রত্যহ দু তিন বার দিলেই চলে…তবে প্রতিবারেই এভাবে দেওয়ার দরকার নেই। প্রথম প্রথম জলের অংশ বেশী দেওয়া ভাল, পরে অবশ্য জলের পরিমাণ ক্রমেই কমানো চলে। তবে দুধের বোতলের চুষিতে খুব বড় মুখ বা গর্ত

থাকলে, সচরাচর শিশু আর স্তন্যপানে আগ্রহান্বিত হবে না। তাই এ বিষয়ে নজর রাখা প্রয়োজন। তাছাড়া কোনো সময়ে শিশুর হঠাৎ অজীর্ণ, অতিসার দেখা দিলে বা তাড়াতাড়ি ওজনে বাড়লে এই কৃত্রিম দুধের মাত্রা কমিয়ে দিতে, এমন কি, বন্ধ করেও দিতে হতে পারে। শুধু ল্যাকটোজ (Loctose) বা দুগ্ধজাতীয় চিনি দিলেও কৃত্রিম পরিপূরক খাদ্যের কাজ হয়; তবে এ সব ক্ষেত্রে ছানার জলই সব চেয়ে ভাল। এক পাঁইট বা তিন পোয়া গরুর দুধে, কুসুম গরম অবস্থায় একটা জাংকেট (Junket Tablet) বড়ি দিয়ে মিনিট পাঁচেক ঢেকে রাখবার আগে বেশ নেড়ে চেড়ে মিশাতে হয়। তারপর দুধটুকু যখন দইয়ের মত জমে ঘন হয়ে যায়, তখন চামচে দিয়ে ভাল করে ঘেঁটে নিয়ে দুধভরা পাত্রটি উনানের উপর বসিয়ে ফোটাতে হয়। ফোটানোর ফলে, যখন ছানার জল দই থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যাবে, তখন পাত্রটিকে উনানের উপর থেকে নামিয়ে, পরিষ্কার পাত্রে একটি ছাকনীর উপর পরিষ্কার কাপড় দিয়ে, ছেঁকে নিতে হবে। প্রতি পাঁচ আউন্স ছানার জলের মাপে এক চামচ ল্যাকটোজ্ দিয়ে সেটিকে আবার ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে নিয়ে দুধের বোতলে ভরে রেখে সময় মত শিশুকে পান করানো যাবে।

প্রসূতির স্তনে প্রয়োজনমতো পরিমাণে শিশুর আহারোপযোগী দুধ সঞ্চারের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত উপায়-গুলি অনুসরণ করা যেতে পারে।

(১) শিশুকে নিয়মিত তিন অথবা চার ঘণ্টা অন্তর স্তন্য দান করতে হবে। তবে রাত্রি দশটায় স্তন্য দিয়ে ভোর ছটার আগে আর স্তন্যপান করাবেন না।

(২) যদি অতিরিক্ত খাদ্য দিতে হয়, তাহলে সেটি ওজন পরীক্ষা ও স্তন্যদানের পরে দেওয়াই ভালো।

(৩) প্রতিবার স্তন্যদানের পর, স্তনদ্বয় হতে দুধ গেলে দিতে হবে। প্রায় কুড়ি মিনিট সময় স্তন্য দেওয়া হলে, মিনিট দুই করে প্রতি স্তন বুড়ো আঙুল ও তর্জনী দিয়ে টিপে, দুধ বার করে দিয়ে স্তন দুটিকে ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে বেশ শুখনো করে না মুছলে প্রসূতির স্তনে দুধ থাকলেও শুকিয়ে যায়।

(৪) স্তন্য দুগ্ধ বাড়ানোর জন্য প্রসূতিকে প্রত্যহ প্রচুর জল খেতে হবে। সকালে ঘুম থেকে উঠে একগ্লাস জল খেলে, প্রসূতির দাস্তও পরিষ্কার হবে এবং স্তনেও দুধ জন্মাবে বেশী পরিমাণে। স্তন্যদানের সময়ও প্রতি বারে প্রসূতির পক্ষে খানিকটা জল খাওয়া দরকার। অন্ততঃ পক্ষে, প্রতিদিন প্রায় দু তিন সের জল খাওয়া উচিত।

(৫) সাদাসিধে সুষম খাদ্যের কথা আগেই বলা হয়েছে। কোকো, চা ও কফি খেতে প্রসূতিরা অনেকেই ভাল-বাসেন। তাহলেও নিয়মিতভাবে খানিকটা দুধ খেতে হবে এবং চা আর কোকোর সঙ্গেও দুধ মিশিয়ে পান করা চাই। দেড় সের দুধ পান এমন কিছু বেশী নয়। তাছাড়া কোনও কৃত্রিম-খাদ্যই দুধের মত উপকারী নয়। প্রসূতির পক্ষে, এ সময়ে কোনও মাদকদ্রব্য সেবন না করাই বিধেয়। লেডী ব্যারেট বলেন—"যে সব মা সন্তানবতী হয়ে মাদকদ্রব্য গ্রহণ করেন, তাঁরা খুনীর চেয়েও অপরাধী।"

(৬) প্রসূতির কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখার জন্য, ফলমূল, খেজুর, শাকসব্জী, চোকলাসুদ্ধ আটার রুটি, ডাল, কিস্‌মিস্, খাবার কথা আগেই বলা হয়েছে। তাছাড়া টোমাটো, ডুমুর ও কমলালেবু প্রভৃতি খাওয়াও প্রসূতির বিশেষ উপকারী।

(৭) সকাল সন্ধ্যায় খোলা-জায়গায় মুক্ত-বাতাসে কিছুক্ষণ পায়চারী করা এবং জল, বৃষ্টি ও রোদ মাথায় করেও ঘুরে বেড়ানোও প্রসূতির পক্ষে বিশেষ হিতকারী।

(৮) রোদ পোয়ানোর মত সুষ্ঠু সহজ ও স্বাস্থ্যকর উপায় বোধহয় আর নেই। ধীরে ধীরে মৃদু রোদ পোয়ানোই ভাল কারণ, প্রথম প্রথম রোদের তাপ অনেকেরই তেমন সহনীয় বোধ হয় না। তবে দশ পনের মিনিট থেকে সুরু করে, ধীরে ধীরে সময় বাড়ানো যেতে পারে। আমাদের দেশে মেয়েরা একদিন এ বিষয়ে সজাগ থাকলেও, আজকাল আর প্রায় রোদ পোয়াতে দেখা যায় না। অবশ্য লুসায় সুইজারল্যাণ্ডে বরফের দেশে রোদ পোয়াতে আমাদের দেশ থেকেও দু একজনকে যেতে দেখেছি (Alpmi School in the sun)।

৯। আমাদের মতো গ্রীষ্মপ্রধান দেশে প্রসূতির পক্ষে ঠাণ্ডা জলে প্রত্যহ স্নান করাই ভালো। শীতের দিনে দরকার হলে ঠাণ্ডা ও গরম জল মিশিয়ে স্নান করলেই চলবে। স্নানের সময় বেশ জোরে জোরে গাত্র মার্জনা

করবেন। স্নানের পর কড়া বা খসখসে তোয়ালে দিয়ে গা মুছে ফেলবেন।

১০। প্রসূতির পক্ষে নিয়মিত বিশ্রাম, নিদ্রা একান্ত আবশ্যক। রাত্রে দশটার মধ্যে শয্যা গ্রহণ করাই ভালো। অকারণে উত্তেজিত হলে ঘুম হবে না। কাজেই বেশ শান্ত চিত্তে ও মন প্রফুল্ল রেখে শয্যা গ্রহণ করতে হবে।

১১। রোজ সকালে ও সন্ধ্যায়—অথবা স্নান ও গা ধোবার সময় নিয়মিত স্তনদ্বয় ঠাণ্ডা জলে অথবা পর পর ঠাণ্ডা ও গরম জলে মিনিট পাঁচেক ধোবেন। গরম জল ব্যবহার করলে, প্রথমে গরম জলে ও পরে ঠাণ্ডা জলে স্তন ধৌত করাই ভালো। তবে সব সময়ে ঠাণ্ডা জলে স্তন দুটিকে ধুয়ে ও মার্জ্জনা করে, ভাল করে মুছে ফেলতে হবে। স্তনের চুষি বা বোঁটা টেনে টেনে ঘসে পরিষ্কার করবেন। বুক থেকে স্তনের বোঁটার দিকে সংবাহন করতে হয়। এ সময়ে সামান্য একটু সরিষার বা জলপাইয়ের তেল অথবা পাউডার দিয়েও সংবাহন করা যায়। সংবাহন করার সময় এক হাতে স্তন ধরে অপর হাতে প্রথামত উপায়ে সংবাহন করতে হবে। গরম জল ও ঠাণ্ডা জলে ধোয়া, আর সংবাহন করতে দশ পনের মিনিট সময় লাগে। কিন্তু এর ফলে ছয় সাত সপ্তাহ দুধ শুকিয়ে গেলেও পুনরায় দুধ জন্মাতে দেখা যায়। শিশুর কম আহারের কথা আগেই বলা হয়েছে, এখন খাওয়ানো বেশী হলে, কি করা যাবে সে বিষয়টি বিবেচনা করে দেখা যাক।

১। বেশী পরিমাণে খেলে শিশুর পেটে ব্যথা, বায়ু-প্রবণতা ও অজীর্ণতার ফলে, অস্বস্তি ও যাতনায় ছট্‌ফট করে আর কাঁদে। অভিজ্ঞতার অভাবে গোড়ার দিকে শিশু কাঁদলেই, প্রসূতি মনে করেন, শিশুর সম্ভবতঃ ক্ষিদে পেয়েছে তাই তাঁরা ব্যস্ত হয়ে তাকে খেতেও দেন। অনেকের আবার অযথা খাওয়ানোর বাতিকও দেখা যায়।

২। অনেক সময় শিশুর বারবার বেশী পাতলা দাস্ত সবুজ রঙের (Greendiarrhoea) পায়খানা হতে থাকে। সবুজ পায়খানা শিশুদের একরকম আমাশয় রোগেও দেখা যায়। এ রোগ কম খেলেও হতে পারে আবার বেশী খাওয়ানো হলে মলও বেশী জন্মায়।

৩। অনেক সময় শিশুরা খাওয়ার পরে এবং খেতে-খেতেও আচমকা দুধ তোলে।

৪। অনেক সময় শিশুর প্রথমে ওজন বেড়ে কিছুদিন একভাবে থেকে পরে ওজন কমতে থাকে।

অনেক সময় শিশুদের ক্ষুধাহীনতা ও অরুচি দেখা দেয় আর পেট ফাঁপে বা ফুলে ওঠে।

৬। মল মূত্র অস্বাভাবিক ও বেশী-বেশী হবে।

৭। গায়ের চামড়া কর্কশ, ও লাবণ্যহীন হয়ে ওঠে এবং চুলকণাদি দেখা দেয়। বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে দুধের বোতলে খেলেও শিশুদের এই একই অবস্থা হয়।

এ উপসর্গের বন্ধের উপায় হলো—খাওয়া কমানো। প্রতিবার স্তন্যদানের সময়ে, প্রথমে এক আউন্স বিশুদ্ধ জল বোতলে খাওয়ানো হলে, স্তন্য বা বোতলের দুধ খাওয়াবেন। যদি তিন ঘণ্টা অন্তর শিশুকে খাওয়ানো অভ্যাস করানো হয়ে থাকে, তাহলে সময় বাড়িয়ে দিয়ে চার ঘণ্টা করবেন। পরীক্ষামূলক ওজনের পর খাওয়ার সময়ও পরিবর্ত্তন করা ও মাত্রা কমানো চাই। এবং খুব তাড়াতাড়ি দুধ না বেরোতে পারে সেজন্যে (Nipple Shield) স্তনের বোঁটা, রবারের ঢাকনী দিয়ে ঢেকে দেওয়া যায়। মায়ের অজ্ঞতার জন্য বেশী পরিমাণে খাওয়ানোর ঝোঁক দেখা যায় এবং তার বিষময় ফল শিশু সারা জীবন ভোগ করে—অজীর্ণতা প্রভৃতি রোগের প্রকোপে; তাই শিশুকে বেশী খাওয়ানোর চেয়ে কম খাওয়ানো ভাল। কারণ, শিশুর হজম-শক্তি একবার কমে গেলে, দীর্ঘদিন পরেও ঠিক হবে না এবং তার ফলে, শিশু বরাবরই অসুস্থ, ঘ্যান-ঘ্যানে ও পেঁচোয় পাওয়া হবে।

প্রসূতির স্তন দিয়ে অযথা দুধ গড়িয়ে পড়লে, বুঝতে হবে যে সেটি ঘটেছে বেশী দুধের জন্যে নয়, স্তনের পেশীর স্থিতি স্থাপকতা শক্তি কমেছে বলেই।

প্রসূতির স্তন্যদুগ্ধে যদি বেশী স্নেহ-পদার্থ (Fat) থাকে (যা পরীক্ষা ছাড়া বোঝা যাবে না), তাহলে প্রসূতির খাদ্যে মাখন, তেল ও ঘি জাতীয় স্নেহ পদার্থের পরিমাণ যথাসম্ভব কমিয়ে দিতে হবে। শিশু যেন তাড়াতাড়ি দুধ না খায়, সেদিকে যেমন নজর দেওয়া প্রয়োজন, তেমনি আবশ্যক—খেতে খেতে সে যাতে না ঘুমিয়ে পড়ে তার দিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখা। শিশুকে খাওয়ানো সময়মত দুধ না হলে, প্রসূতির স্তন্যদুগ্ধ ক্রমেই কমে ও শুখিয়ে যায়।

প্রস্থতির স্তনদুগ্ধ দরকার হলে, পরীক্ষাও করা যায়, যদিও আমাদের দেশে সচরাচর এ বিষয়টি বিশেষ চিন্তা করে দেখা হয় না. পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞদের পরীক্ষার ফলে জানা গেছে যে স্তনদুগ্ধে এক থেকে সাত শতাংশ স্নেহ পদার্থ থাকে। সে তারতম্য সকাল ও সন্ধ্যে বেলায় যেমন হয়, তেমনি আবার খাওয়ানর সময় প্রতিবার স্থরু ও শেষ দিকেও হয়। পরীক্ষা করবার সময় সেজন্যে চব্বিশ ঘণ্টার বা সারা দিনের দুধের নমুনা নিতে হয়। কি ভাবে স্তনদুগ্ধের পরিমাণের এই নমুনা নেওয়া হয়—আপাততঃ, তারই মোটামুটি হদিশ দিই।

সকাল ছটা—শিশুকে খাওয়ানোর আগে এক থেকে দু চামচ দুধ প্রথম স্তন থেকে একটি বিশুদ্ধ জীবাণু শূন্য পাত্রে রেখে অন্য স্তন থেকে দুধ খাওয়ান শেষ হলে অল্প একটু নমুনা নিয়ে রাখুন।

সকাল দশটা—শিশুকে তিন মিনিট দুধ খাওয়ানোর পর, প্রথম ও সেই ভাবে দ্বিতীয় স্তন থেকে এক বা দু' চামচ দুধ নিন।

বেলা দুটো—সকালের মত পদ্ধতিতে দুটি স্তন থেকেই আলাদা ভাবে নমুনা সংগ্রহ করে রাখুন।

সন্ধ্যা ছটায়—অনুরূপ-পদ্ধতিতে নমুনা নিয়ে রাখুন। এভাবে অদল বদল করে নিলে মোটামুটি সারা দিনের দুধের একটা গড়-পড়তা হিসাব রাসায়নিক পরীক্ষার ফলে পাওয়া যায়।

অনেক সময় যমজ শিশুদের খাওয়ানো সমস্যা হলেও মোটামুটিভাবে দেখা যায় যে প্রস্থতির স্তনে যথেষ্ট দুধ সঞ্চার হয়। পরিমাণে কম হলেও, যমজ শিশুদের স্তন্য দানের পর, বাকি পরিমাণটুকু কৃত্রিম দুধের সাহায্যে পরিপূরণ করা যেতে পারে। যমজ শিশুদের স্বতন্ত্রভাবে স্তন্যদানে সময় লাগে বেশী এবং প্রস্থতিরও বেশ কষ্ট হয়। সেজন্য যমজ শিশুদের স্তন্যদানকালে প্রস্থতি বসে দুহাতের নীচে বালিশ দিয়ে, তার উপর দুদিকে দুটি শিশুকে শুইয়ে দিতে হবে। দুহাত খালি থাকে এমন ভাবে বসে, হাত দিয়ে স্তন ধরে, দুজনকে এক সঙ্গে স্তন দেবেন, এবং প্রতিবারে শয্যাস্থান অদল বদল করে শিশুদের শোয়াবেন। যদি স্থবিধা হয়, আধঘণ্টার ব্যবধান রেখে দুজনকে স্তন্য দান করা যায়, তবে তিন ঘণ্টার পরিবর্তে চারঘণ্টা অন্তর স্তন্যদান করাই ভাল। তাছাড়া যমজ শিশুদের ক্ষেত্রে, সর্ব্বদাই পরীক্ষামূলক ওজন দেখে তাদের অতিরিক্ত-পূরক খাদ্য বা কৃত্রিম দুধ দেওয়াই স্থবিবেচনার কাজ। (ক্রমশঃ)

—

রূপচর্চ্চা

স্থপর্ণা দেবী

প্রাচ্য-প্রতীচ্যের বহু বিশিষ্ট রূপচর্চ্চাবিশারদেরাই অভিমত প্রকাশ করে থাকেন যে যান্ত্রিক-সভ্যতা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক-সমাজে কৃত্রিম-জীবনযাত্রার বিবিধ রীতি-নীতি অনুসরণের ফলে, দুনিয়ার নর-নারী দিন-দিন স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য ও রূপ-লাবণ্যহীন হয়ে উঠছেন। তাঁদের এই শ্রী-সৌন্দর্য্য ও স্বাস্থ্যহীনতার অন্যতম কারণ দেহ-চর্য্যা সম্বন্ধে ঔদাস্য। আমাদের দেহে নিত্য-দিন নানান কারণে নানা ক্লেদ, নানা বিষ পুঞ্জিত হয়। সে বিষ, সে ক্লেদ যদি প্রত্যহ নিত্য-নিয়মিতভাবে যথারীতি নিষ্কাশিত না করি, তাহলেই স্বাস্থ্যহানি ঘটে। কারণ, দৈহিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে লাবণ্য, ও সৌন্দর্য্যের সম্পর্ক খুবই নিবিড়। তাই স্বাস্থ্য-হানি ঘটবার সঙ্গে সঙ্গে রূপ-লাবণ্যেরও অবসান ঘটে। কাজেই রূপ-লাবণ্য বা স্বাস্থ্য-শ্রী কোনোটিই যাতে ক্ষতি গ্রস্ত না হয়, সেজন্য একান্ত আবশ্যক—পর্য্যাপ্ত আলো বাতাস, নিয়মিত ও স্থপরিমিত পুষ্টিকর খাদ্য-পানীয় এবং সেই সঙ্গে চাই—ব্যায়ামজনিত নৈত্যনৈমিত্তিক অঙ্গ-চালনা।

দৈহিক গঠনের পারিপাট্য ছাড়াও আমাদের গায়ে যে ত্বক্‌ বা চামড়া আছে, তার স্বাস্থ্যের উপর বর্ণের দীপ্তি,

কমনীয়তা ও মসৃণতা নির্ভর করে। এই গাত্র ত্বক্‌কে নিত্য-নিয়মিতভাবে ঘর্ষণ-মর্দ্দন প্রক্ষালণে ক্লেদহীন রাখা প্রয়োজন। নিয়মিতভাবে শুধু স্নানেই এ কাজ হয় না। স্নানের আগে প্রতিদিন নি মিতভাবে, অন্ততঃপক্ষে একবার যথারীতি সর্ব্বাঙ্গে বেশ ভালো করে তৈল মর্দ্দন অথবা কেবলমাত্র হাতের সাহায্যে সারা দেহটিকে আগাগোড়া ঘর্ষণ মর্দ্দন করা চাই। এ ব্যবস্থার ফলে, গাত্র-ত্বক্ শুধু যে লাবণ্যদীপ্ত ও উজ্জ্বল থাকবে তাই নয়, উপরন্তু, ঠাণ্ডা লেগে সর্দ্দি, কাসি, জ্বর প্রভৃতির দুর্ভোগ আশঙ্কাও দূর হবে। কারণ, গাত্র ত্বক্ অস্বাস্থ্যকর ও ক্লেদযুক্ত থাকলে ঠাণ্ডা রোধ বা প্রতিষেধ করতে পারে না বলেই সচরাচর সর্দ্দি, কাসি, জ্বর প্রভৃতির উপদ্রব ঘটতে দেখা যায়। আধুনিক রূপচর্চ্চা বিশারদেরা বলেন যে দৈহিক স্বাস্থ্য ও রূপ লাবণ্য-শ্রী অটুট রাখার জন্য পুরুষ ও নারী সকলের পক্ষেই নিত্য নিয়মিত এভাবে অঙ্গ প্রসাধন করা একান্ত আবশ্যক। অন্যথায়—গাত্র-ত্বক্ ক্রমেই মলিন কর্কশ হয়ে উঠবে এবং দৈহিক স্বাস্থ্যেরও উত্তরোত্তর অবনতি ঘটবে। তাছাড়া নানা রকম চর্ম্মরোগের উপদ্রবেও কষ্ট যাতনার সীমা থাক্‌বে না।

অঙ্গ-প্রসাধন সম্বন্ধে এই সব বিশেষজ্ঞেরা যে রীতি অনুসরণ করতে বলেছেন প্রসঙ্গক্রমে তার মোটামুটি হদিশ দিয়ে রাখি।

প্রতিদিন স্নানের আগে সর্ব্বাঙ্গে, ঘষে ঘষে তৈল মর্দ্দন অথবা শুধু হাতের সাহায্যে সারা দেহটিকে ঘর্ষণ মর্দ্দনের পর, শুকনো তোয়ালে বা গামছার সাহায্যে শরীরটিকে আগাগোড়া বেশ ভালোভাবে মুছে নেবেন। তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে, সর্ব্বাঙ্গে সাবান মেখে পরিপাটিভাবে ঠাণ্ডা অথবা গরম জলে স্নান সেরে দেহটিকে আগাগোড়া তৈল এবং ক্লেদমুক্ত করে তুলবেন। স্নানান্তে শুকনো-পরিচ্ছন্ন গামছা বা তোয়ালে ব্যবহার করে জলসিক্ত দেহটিকে আগাগোড়া বেশ ঝরঝরেভাবে মুছে ফেলবেন। গা মোছার পর, দুই হাতে অল্প পরিমাণে অঙ্গ-প্রসাধনের জন্য বিশেষভাবে তৈরী—আধ পাঁইট বিশুদ্ধ গোলাপজলের সঙ্গে বড় চামচের একচামচ ভালো ও-ডি-কোলোন (o-de cologne) মেশানো 'তরল মিশ্রণ' (Liquid Mixture), মুখে, গলায়, কাঁধে, বুকে, পিঠে ও দুই বগলে বেশ ভালো করে ঘষে মাখবেন। এভাবে গোলাপজল-মিশ্রিত ও-ডি-কোলোন নিত্য গায়ে-পিঠে, গলায়-মুখে ও বগলে ঘষে-মাখার ফলে, গাত্র-ত্বক্ মসৃণ কোমল, বর্ণোজ্জ্বল ও বরাবর লাবণ্য দীপ্ত থাকবে। তাছাড়া অঙ্গ প্রসাধনী এই মিশ্রণটি নিত্য-নিয়মিতভাবে ব্যবহারের ফলে, শুধু যে শারীরিক-আরাম বোধ করবেন তাই নয়, বগলে অস্বস্তিকর ঘাম জমে বেয়াড়া দুর্গন্ধ আর জামায় দাগ ধরার উপদ্রব থেকেও রেহাই পাবেন। স্নানের পর, দেহের উর্দ্ধাংশের মতোই শরীরের নিম্নাংশে—অর্থাৎ, হাঁটুর নীচে থেকে পায়ের গোড়ালি পর্য্যন্ত অঙ্গেও তেল মাখার ভঙ্গীতে গোলাপজল ও ও-ডি কোলোন মিশ্রিত এই অঙ্গ প্রসাধনীটি মেখে নেওয়া আবশ্যক। নিত্য নিয়মিত এভাবে অঙ্গ-প্রসাধনী মিশ্রণটি ব্যবহারের ফলে, পায়ের ত্বক্ ও আগাগোড়া বেশ কোমল, বর্ণোজ্জ্বল, সুঠাম ও লাবণ্য-দীপ্ত থাকবে···এমন কি, শীতের প্রকোপে বা ধুলা মাটির সংস্পর্শেও সহজে পায়ের তলা ফেটে গিয়ে বিশ্রী বেয়াড়া হয়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দেবে না।

নিত্য-নিয়মিত এভাবে অঙ্গ প্রসাধন করলে, দৈহিক রূপ-লালিত্য সুদীর্ঘকাল অক্ষয় অটুট থাকবে···স্নিগ্ধ সুরভিতে আরাম পাবেন এবং দেহ-মনের স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে।

প্রসঙ্গক্রমে, আরেকটি দরকারী কথাও বলে রাখা যেতে পারে। অনেক সময় অকারণে অনেকেরই মুখ ঘেমে এমন বেয়াড়া হয়ে ওঠে যে রূপ-শ্রী-সৌন্দর্য্যের বাহারটুকু পর্য্যন্ত বজায় থাকে না এবং সেজন্য অনেকখানি অস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে হয়। এ দুর্ভোগের প্রতিবিধানকল্পে আধুনিক রূপচর্চ্চাবিশারদেরা অনেকেই অভিমত প্রকাশ করেন যে নিত্য নিয়মিতভাবে মৌসাম্বী, কমলালেবু, বাতাবি অথবা পাতিলেবুর রস পান করলে মুখের তৈলাক্ত-ভাব ঘোচে। তবে আমাদের দেশে সকলের পক্ষে—বিশেষতঃ, আজ-কালকার এই মাগ্‌গী-গণ্ডার দিনে, এ ব্যবস্থামতো চলা সহজসাধ্য নয়। কাজেই এ অস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিকার হিসাবে অনায়াসেই অন্য উপায় অবলম্বন করা যায়। সে উপায়টি হলো—প্রতিদিন নিয়মিতভাবে এক 'গেলাস পাতিলেবুর অথবা বার্লির সরবৎ পান করা'। পাতিলেবুর সরবৎ তৈরীর জন্য বিশেষ কোনো

অসুবিধা নেই। প্রত্যহ সকালে স্নানের পর নিয়মিত ভাবে এক গেলাস ঠাণ্ডা জলে একটি পাতিলেবুর রস মিশিয়ে পান করলেই যথেষ্ট উপকার পাবেন। বার্লির সরবৎ বানানোর জন্য পরিষ্কার একটি পাত্রে বড় চামচের চার চামচ ভালো বার্লির সঙ্গে আন্দাজমতো পরিমাণে জল মিশিয়ে, পাত্রটিকে উনানের আঁচে বসিয়ে রেখে'মিশ্রণটিকে' খানিকক্ষণ ভালোভাবে ফুটিয়ে জালে সুসিদ্ধ করে নিন। এ ভাবে ফোটানোর সময়, বড় হাতলওয়ালা চামচ বা হাতার সাহায্যে পাত্রের মিশ্রণটিকে মাঝে মাঝে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করা দরকার। ফুটন্ত-জলে কিছুক্ষণ জাল দেবার ফলে, বার্লিটুকু আগাগোড়া বেশ সু-সিদ্ধ হয়ে উঠলেই, উনানের উপর থেকে 'মিশ্রণটিকে' নামিয়ে নিয়ে, অন্য একটি পরিষ্কার পাত্রে ঢেলে রাখুন। এবারে সদ্য জাল দেওয়া সু-সিদ্ধ এই 'তরল বার্লিতে' চায়ের পেয়ালার চার পেয়ালা পরিমাণ ফুটন্ত গরম জল মিশিয়ে, পাত্রের মুখে ঢাকা চাপা দিয়ে 'মিশ্রণটিকে' সযত্নে পরিচ্ছন্ন স্থানে রেখে জুড়োতে দিন। কিছুক্ষণ বাদে 'মিশ্রণট' জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হলে প্রয়োজনমতো পরিমাণে অল্প একটু চিনি এবং একটি পাতিলেবুর রস নিঙড়ে মিশিয়ে বার্লির সরবৎ পান করুন।

এইভাবে নিত্য-নিয়মিতভাবে বার্লির বা পাতিলেবুর সরবৎ বানিয়ে পান করলে, অচিরেই মুখের ঘর্ম্মাসিক্ত তৈলাক্তভাব আর অস্বাচ্ছন্দ্যকর অসুবিধা দূর হবে এবং দৈহিক স্বাস্থ্য রূপলাবণ্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে।

ঘর-সাজানোর বিচিত্র-বাহারী গাছ

রুচিরা দেবী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ইতিপূর্ব্বে গত সংখ্যায় নকল মুক্তা অথবা রঙীন-পুঁতি গেঁথে ঘর সাজানোর উপযোগী বিচিত্র বাহারী গাছের কাঠামো আর ডালপালা রচনার যে মোটামুটি হদিশ দিয়েছি, তেমনি পদ্ধতিতে কাজ করে বাহারী গাছের ছাঁদটি আগাগোড়া বানিয়ে নেবার পর, সেটিতে কি উপায়ে নকল মুক্তা বা রঙীন-পুঁত গেঁথে বসাতে হবে—এবারে তার কথা বলি।
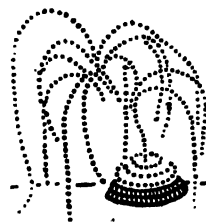
তৈরী ঘর-সাজানোর বাহারি-গাছ

উপরের ১নং চিত্রের নমুনামতো নকল-মুক্তো অথবা রঙীন পুঁতির সাহায্যে ঘর সাজানোর উপযোগী বাহারী-

বাহারি-গাছ বানানোর কাঠামো
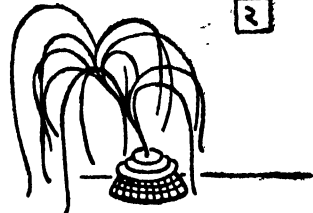
গাছ বানানোর জন্য, গোড়াতেই উপরে ২নং চিত্রে দেখানো

নক্সার ছাঁদে তার দিয়ে তৈরী ডালপালা সমেত গাছের কাঠামোটিকে পুরোপুরি রচনা করে নেওয়া চাই। এ কাজ সুষ্ঠুভাবে সারা হলে, নীচের ৩নং ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে, তেমনিভাবে তার দিয়ে বানানো ডালপালাগুলি বাদ দিয়ে গাছের অন্যান্য সব অংশে অল্প একটু রঙের প্রলেপ মাখিয়ে নেবেন। তারপর গাছের সেই রঙ মাখানো অংশগুলির উপর 'গালা-কাঠি' (Shellac sticks) তাতিয়ে, 'তরল গালার' (a thin coating of the worm shellac paste) মিহি-প্রলেপ লাগিয়ে দিন এবং তপ্ত তরল গালার প্রলেপ নরম ও কাদাটে ধরণের থাকতে থাকতেই, তার উপর সুষ্ঠু-পরিপাটি ছাঁদে চুম্‌কি আর রাংতা-জরির কুচি গুলিকে যথাযথস্থানে এঁটে বসিয়ে নেবেন। তাহলেই গাছটি আগাগোড়া বেশ ঝিক্ মিকে ও বাহারী দেখাবে। এ কাজের সময়, কারুশিল্পী যদি নিখুঁত পরিপাটি ও মানানসইভাবে রঙ,তরল গালার প্রলেপ আর রাংতা-জরি-চুম্‌কির কুচিগুলিকে গাছের বিভিন্ন অংশে সাজিয়ে নিতে পারেন, তাহলে অভিনব বিচিত্র এই শিল্প-সামগ্রীর রূপ শোভা যে আরো অনেকখানি মনোরম সুন্দর হয়ে উঠবে—সে কথা বলাই বাহুল্য।

এ কাজ শেষ করে, গাছের ডালপালাগুলিতে নকলমুক্তা অথবা রঙীণ পুঁতি গেঁথে বসানোর পালা। তার দিয়ে বানানো ডালপালায় মুক্তো বা পুঁতি গেঁথে বসানোর সময়, কারুশিল্পীর রুচি ও প্রয়োজনানুসারে বিভিন্ন ডালপালার সঙ্গে নতুন করে ছোট ছোট মাপের আরো কয়েকটি তার জুড়ে নেওয়া যেতে পারে এবং সে সব তারেও নানা রঙের পুঁতি বা নকল মুক্তো গেঁথে বসানো যায়। এ-ধরণের বাড়তি কাজটুকু না করলে অবশ্য ক্ষতি নেই···তবে সুষ্ঠুভাবে করতে পারলে, গাছের বাহার যে আরো বাড়বে—এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। আগাগোড়া পরিপাটি এবং মানানসইভাবে একের পর এক গাছের সব ডালপালাগুলিতে রঙ-বেরঙের পুঁতি অথবা নকল মুক্তো গেঁথে বসানোর পর, প্রত্যেকটি ডালের প্রান্তভাগে নোলকের মতো ছাঁদে 'সেলুলয়েড-সিমেন্ট' বা 'এ্যাডেসিভ্ সলিউশান্' (Celluloid-cement or Adhesive Solution) দিয়ে প্রয়োজনমতো আকারের একটি করে 'গোলাকার' (Round) ফল বানিয়ে পাকাপোক্ত ধরণে সেটিকে এঁটে বসিয়ে দিতে হবে। পুঁতি বা মুক্তো গেঁথে-বসানো ডালপালার প্রান্তভাগে এ ধরনের নোলকের মতো 'গোলাকার-ফল' এঁটে বসানোর অর্থ হলো—নিছুক্তনবাদেই 'সেলুলয়েড-সিমেন্ট' অথবা 'এ্যাডেসিভ্-সলিউশান' দিয়ে বানানো এই সব ফল শুকিয়ে আগাগোড়া বেশ জমাট ও মজবুত পাকাপোক্ত হয়ে ওঠার ফলে, ডালপালার তার থেকে তরল-গালার উপর গেঁথে বসানো পুঁতি বা মুক্তো সহজেই খসে-ঝরে পড়বার সম্ভাবনা থাকবে না। এবং সব জমাট ফলের ওজনের ভারে গাছের ডালপালাগুলিও হেলে-নুয়ে যথাযথ আকারে নিজেদের ছাঁদ বজায় রেখে কারুশিল্প সামগ্রীটির শ্রী-শোভা আরো বেশী বাড়িয়ে তুলবে।

নকল মুক্তো অথবা রঙীণ পুঁতি গেঁথে ঘর সাজানোর উপযোগী বিচিত্র বাহারী গাছ রচনার এই হলো মোটামুটি পদ্ধতি।

—

কার্পেট আর ক্রশ-ষ্টিচ্ সেলাইয়ের নতুন নক্সা

সুলতা মুখোপাধ্যায়

ঘরকন্নার নিত্যনৈমিত্তিক কাজকর্মের অবসরে যে সব মহিলা সূচীশিল্পের চর্চ্চা করে থাকেন, তাঁদের সুবিধার জন্ম এবারে কার্পেট বোনা আর ক্রশ্-ষ্টিচ্ সেলাইয়ের উপযোগী বিচিত্র সুন্দর একটি নতুন ধরণের ফুল-পাতার 'প্যাটার্ণ' (Pattern-design) বা নক্সার নমুনা দেওয়া হলো।

৬৫২ পৃষ্ঠার ছবিতে সুদৃশ্য ছাঁদের যে ফুল-পাতার নক্সা নমুনাটি দেখানো হয়েছে, কার্পেটের কাপড়ে সেটিকে নিখুঁত পরিপাটি ও যথাযথভাবে রূপদানের জন্য, বিভিন্ন রঙের রেশমী বা পশমী সুতোর সাহায্যে উপরোক্ত 'প্যাটার্ণের নির্দ্দেশানুযায়ী একের পর এক 'ঘর' গুণে বুনে নিলেই চলবে। তবে 'ক্রশ্-ষ্টিচ্' সেলাইয়ের কাজ করে এ নক্সাটিকে ফুটিয়ে তুলতে হলে, নক্সা রচনার আগে—কাপড়ের যে অংশে ক্রশ্-ষ্টিচ্ সূচীশিল্পের কাজ করবেন, সেইখানে এক টুকরো কার্পেট বা ক্যানভাস্ এঁটে নেবেন। সেলাইয়ের কাপড়ের উপর এভাবে কার্পেট বা ক্যানভাসের টুকরো এঁটে নেবার মোটামুটি রীতি হলো—সূচীশিল্পের কাপড়ের যথাযথস্থানে কার্পেট বা ক্যানভাসের টুকরোটিকে

আগাগোড়া সমানভাবে (flat) বসিয়ে চারদিকের কিনারা কাঁচা সেলাইয়ের ফোঁড় তুলে টেঁকে নেবার পর সেই কার্পেটের বা ক্যানভাসের টুকরোর উপর যেভাবে কার্পেট বোনা হয়, ঠিক তেমনি পদ্ধতিতে ঘর গুণে গুণে নক্সাটিকে নিখুঁত পরিপাটি ছাঁদে বুনে নেবেন। এমনিভাবে প্রত্যেকটি 'ঘর' বুনে নক্সাটি পুরোপুরি তোলা হলে, কার্পেট বা ক্যানভাসের টুকরোর চারদিকের কিনারায় ইতিপূর্ব্বে কাপড়টিকে এঁটে রাখার জন্য যে কাঁচা সেলাই দিয়েছিলেন—সেই সেলাইটি সুষ্ঠুভাবে ছাঁটাই করে ফেলবেন। তারপর একটি একটি করে কার্পেটের সুতোগুলি (অর্থাৎ, যা দিয়ে কার্পেটটি রচিত হয়েছে) টেনে নিন—তাহলে কাপড়ের উপরে পরিপাটি ছাঁদে নক্সা নমুনার নিখুঁত প্রতিলিপিটি আগাগোড়া সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে। এভাবে টানাটানির ফলে, সদ্য বোনা নক্সার সুতোগুলি হয় তো অল্পস্বল্প আলগা বা ঢিলা হয়ে যেতে পারে—তবে কার্পেটের সমস্ত সুতো খুলে নেবার পর যদি নক্সা বোনা কাপড়টির উপর ঈষৎ গরম ইস্ত্রি চালিয়ে দেওয়া হয়, তাহলেই আলগা ঢিলা সুতোগুলি আবার যথাস্থানে ও যথাযথভাবে চেপে বসবে—সূচীশিল্প সামগ্রীটির বাহারও খুলবে চমৎকার।
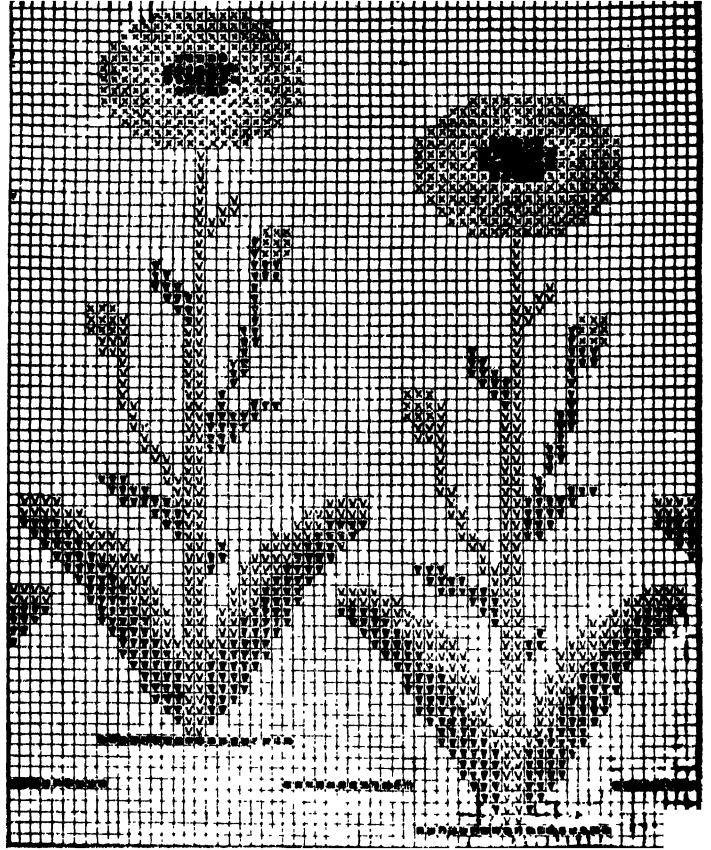
উপরোক্ত ধরণের সূচীশিল্প রচনার এই হলো মোটামুটি পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে কাজ করে, কার্পেট বা ক্রশ-ষ্টিচ্ সূচীশিল্পের উপযোগী যে কোন নক্সাই সুচারুভাবে রচনা করা সম্ভব। আপাততঃ, উপরের ফুল-পাতার নক্সা নমুনাটি রচনার জন্য যে সব রঙের রেশমী বা পশমী সুতো ব্যবহার করতে হবে—তার হদিশ দিই। অর্থাৎ, ফুল-পাতার নক্সা নমুনাটিকে পরিপাটিভাবে রূপদান করতে হলে—উপরের ছবিতে দেখানো—

"×" চিহ্নিত ঘরগুলি রচনা করতে হবে—ফিকে-কমলালেবু রঙের রেশমী বা পশমী সুতোয়; "▬" চিহ্নিত ঘরগুলির জন্য বেছে নেবেন—গাঢ়-লালচে রঙের রেশমী বা পশমী সুতো; "V" চিহ্নিত ঘরগুলি ভরে তুলবেন—ফিকে সবুজ রঙের রেশমী বা পশমী সুতো দিয়ে; এবং "V" চিহ্নিত ঘরগুলির জন্য ব্যবহার করবেন—গাঢ় সবুজ রঙের রেশমী বা পশমী সুতো। এই নিয়ম ছাড়াও, সূচীশিল্পীর ব্যক্তিগত রুচি ও পছন্দ অনুসারে উপরোক্ত সুতোর রঙের পরিবর্ত্তন সাধনও করা যেতে পারে। তবে প্রসঙ্গক্রমে, হদিশ দিয়ে রাখি যে এ ধরণের নক্সা রচনাকালে কার্পেট বোনার কাজের সময় 'চার-খেই' পশমী সুতো এবং 'ক্রশ-ষ্টিচ্' সেলাইয়ের কাজের সময় রেশমী সুতো ব্যবহার করাই সমীচীন—এটি সর্ব্বদাই খেয়াল রাখা দরকার।

বারান্তরে, এমনি ধরণের আরো কয়েকটি নতুন নক্সা-নমুনার পরিচয় দেবার বাসনা রইলো।

বিজয়ার অভিবাদন—

বাঙ্গালীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গা পূজার পর বিজয়ার উৎসব চিরাচরিত প্রথা। চীন ও পাকিস্তানের সহিত যুদ্ধের ভয়াবহ অবস্থা এবং ভারতের সর্ব্বত্র দারুণ খাদ্যাভাব সত্ত্বেও বাঙ্গালী সাধ্যমত যথারীতি দুর্গোৎসব সম্পাদন করিয়া দশমী তিথিতে বিজয়ার উৎসব করিয়াছে। আমরাও প্রতিবৎসরের মত 'ভারতবর্ষের' পাঠক, লেখক, গ্রাহক, বিজ্ঞাপন দাতা প্রভৃতি সকলকে যথাযোগ্য প্রীতি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম, নমস্কার ও অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি। মায়ের কৃপায় দেশের এই দুর্যোগময় অবস্থা দূর হউক। আসুন সকলে মিলিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রার্থনা জানাই।

পূজায় সঙ্কট—

মহাপূজার মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বে ভারতের সহিত পাকিস্তানের যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় কলিকাতা, তাহার শহরতলী ও অন্যান্য বহু স্থানে রাত্রিতে আলো জ্বালা বন্ধ হইয়াছিল। ভাগ্যক্রমে অবস্থা কিছু পরিবর্ত্তনের ফলে মহাপূজার কিছু দিন পূর্ব্বে আলো জ্বালা আরম্ভ হয়। ফলে পূজার আড়ম্বর যতই কমিয়া যাউক না কেন অন্ধকারে পূজার উৎসব করিতে হয় নাই। তবে আলোক-সজ্জা একেবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তাছাড়া পূজার অল্প দিন পূর্ব্ব হইতেই নানাস্থানে অবিরাম বর্ষা নামায় পূজার আনন্দ বহু পরিমাণে কমিয়া গিয়াছিল। এমন কি পূজার পাঁচ দিনও মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইয়া পূজার সকল কার্য্যে বাধাদান করিয়াছে। এ বৎসর সপ্তমী পূজা দুই দিন করিতে হয়। তাহার ফলে তিন দিনের পূজা চারি দিনে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই সকল অসুবিধা সত্ত্বেও কলিকাতা ও সহরতলীতে সার্ব্বজনীন দুর্গাপূজার সংখ্যা কমে নাই, বরং বাড়িয়াছে। তবে সকল স্থানেই সার্ব্বজনীন পূজার কর্ম্মকর্ত্তারা অন্যান্য পূজার খরচা কমাইয়া যুদ্ধের সাহায্যের জন্য প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারে অর্থদান করিয়াছে। দেশবাসী যে তাহাদের বিপদের কথা একেবারে ভুলিয়া যায় নাই এই ঘটনায় তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

খাদ্যোৎপাদন আন্দোলন—

বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে দেশবাসী কয়েকটি বিষয়ে উপকৃত হইয়াছে। একদিকে ভারতের সকল স্থানে বামপন্থী রাজনীতিক দলগুলি তাহাদের বিভেদের কথা ভুলিয়া দেশের শাসনভারপ্রাপ্ত কংগ্রেসদলকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছে। অবশ্য বিভিন্ন বামপন্থী রাজনীতিক দলের উগ্র-স্বভাব বিশিষ্ট কর্ম্মীরা এই বিপদের সময়েও দেশের স্বার্থের কথা চিন্তা না করিয়া এমন প্রচার কার্য্য চালাইয়া ছিল যে, শাসকগণ সারা ভারতে তাহাদের কয়েক হাজার কর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করিয়া আটক করিয়া রাখিতে বাধ্য হইয়াছে। সে যাহা হউক, অধিকাংশ বামপন্থী কংগ্রেসের সহিত একযোগে কাজ করায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে। দ্বিতীয় কথা— ৮ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিলেও খাদ্য উৎপাদন সম্বন্ধে আমরা উপযুক্ত চেষ্টা করি নাই। নানা কারণে দেশে কৃষিকার্য্য অবহেলা-প্রাপ্ত হইয়াছে এবং কৃষির জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও লোক সংখ্যা অত্যধিক বাড়িয়া যাওয়ায় আমাদের উৎপন্ন খাদ্যের দ্বারা আমরা দেশবাসীর চাহিদা মিটাইতে পারিনা। সেজন্য আমেরিকা, কানাড়া, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য শস্য প্রতি বৎসর আমদানী করিতে হয়। যুদ্ধের পরিস্থিতিতে আমদানী ব্যাপারে বাধা পড়িতেছে এবং রাজনীতিক কারণে আমেরিকা প্রভৃতি দেশ আর খাদ্য শস্য পাঠাইতেছেনা। সকল কথা বিবেচনা করিয়া ভারতবর্ষের শাসকদল অধিক পরিমাণে খাদ্য শস্য উৎপাদনে মনোযোগী হইয়াছেন। কিন্তু এ-বিষয়ে শুধু সরকার চেষ্টা করিলে বেশী লাভ হইবে না। নানা অসুবিধা সত্ত্বেও দেশবাসীকে এ বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা

খাল্‌রা খেম করণের সাঁজোয়া যুদ্ধে পাকিস্তান-পরিত্যক্ত এম-৪৮ পেটন্ ট্যাঙ্ক।

পাকিস্তান কর্তৃক আম্বালার ১৫০ বৎসরের পুরাতন সেন্টপল গীর্জ্জার উপর বোমাবর্ষণের ফলে গীর্জ্জাটি বিধ্বস্ত হয়।

৪৮ ঘণ্টার মধ্যে দু'বার বোমা ফেলা হয়েছিল।

চিত্রে দ্বিতীয়বার বোমা বর্ষণের পর বিধ্বস্ত গীর্জ্জার ধ্বংসাবশেষ দেখা যাচ্ছে।

ফ্লাইট লেঃ ডি. এন. রাঠোর (বামে) এবং ফ্লাইং অফিসার পি, কে, নেব। এরা 'হালওয়ারা বিমানক্ষেত্রের উপর বিমান যুদ্ধে প্রত্যেকে একটি করে পাকিস্তানী 'সেবার' বিমান ধ্বংস করেন।

করিতে হইবে। গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংলণ্ডের লোক তাহাদের ফুল বাগান নষ্ট করিয়া সেই স্থানে খাদ্য শস্যের চাষ করিয়াছিল। এমন কি বড় বড় শহরে ছাদের উপর টবে নানারূপ খাদ্য দ্রব্য উৎপন্ন করা হইয়াছিল। ভারতবর্ষে জমির অভাব নাই কিন্তু চাষের জন্য উদ্যমের অভাব। চাষের জন্য জল, সার, উৎকৃষ্ট বীজ প্রভৃতির অভাব থাকা সত্ত্বেও আমরা যদি সকল শক্তি দিয়া খাদ্য উৎপাদনে অগ্রসর হই তাহা হইলে সম্পূর্ণভাবে না হইলেও আংশিক ভাবে আমরা খাদ্য সমস্যার সমাধান করিতে পারিব। সম্প্রতি এ বিষয়ে সরকার ও দেশবাসীর চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে দেখিয়া আমরা আশান্বিত হইয়াছি। যদি এক বৎসর কাল উপযুক্ত ভাবে চেষ্টা করা যায় তাহা হইলে খাদ্যের জন্য বিদেশের মুখাপেক্ষী না হইয়াও দেশবাসীকে পর্য্যাপ্ত খাদ্য প্রদানে সমর্থ হইবে।

শিয়ালকোট রণাঙ্গনের কোনও স্থানে লেঃ জেঃ হরবক্স সিং একজন ভারতীয় সেনাবাহিনীর অফিসারকে নির্দ্দেশ দিচ্ছেন।

একটি অধিকৃত পাকিস্তানী ট্যাঙ্ক পিছনে দেখা

যুদ্ধের বর্ত্তমান অবস্থা—

রাষ্ট্রসঙ্ঘের নির্দ্দেশে পাকিস্তানের সহিত ভারতের যুদ্ধের বিরতি ঘোষণা হইয়াছে বটে কিন্তু পাকিস্তান যুদ্ধ বন্ধ করে নাই। যুদ্ধ-বিরতি ঘোষণার পর প্রত্যহই পাকিস্তান ভারতের কোননা কোন অংশ আক্রমণ করিতেছে। ফলে ভারতকে তাহাতে বাধা প্রদান করিতে হইতেছে, ইহাতে ভারতের পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্তে সর্ব্বদা যুদ্ধ লাগিয়াই আছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে বিষয়টি জানাইয়া কোন সুফল হয় নাই। ওদিকে পৃথিবীর বহু রাষ্ট্র যেমন ভারতের এই দুর্দ্দিনে তাহাকে সমর্থন করিতেছে, তেমনি ইংলণ্ড ও আমেরিকা মৌখিক নিরপেক্ষতা, দেখাইয়া তলে তলে পাকিস্তানকে সাহায্য করিতেছে। ইহার ফলে ভারতের অবস্থা সঙ্গীন হইয়া পড়িয়াছে। যদিও সোভিয়েট রাশিয়া ভারতকে সাহায্য করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রতিশ্রুতি দিতেছে কিন্তু ভারতের এই দুর্দ্দিনে তাহার খাদ্যাভাব প্রকট হইয়া উঠিতেছে। আমেরিকা হইতে গম ও চাউল আসা বন্ধ হওয়ায় ভারতবাসীকে অর্দ্ধাহারে জীবন যাপন করিবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। এতদিন বৃটেন ও আমেরিকা হইতে ভারতের বহু প্রয়োজনীয় দ্রব্য ভারতে আসিত। এখন ক্রমে ক্রমে সে সকল দ্রব্যের আমদানী বন্ধ হওয়ায় ভারতের ক্ষতি হইতেছে। ভারতের যুদ্ধ সরঞ্জাম প্রস্তুতের কারখানাগুলি অহোরাত্র পরিশ্রম করিয়াও প্রয়োজনীয় অস্ত্র সরবরাহ করিতে সমর্থ হইতেছে না। খাদ্যাবস্থা সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি।

ভারতের শাসকগণ মুখে যাহাই বলুন না কেন কার্য্যতঃ শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছেন। এই অবস্থায় দেশবাসীকে অতিশয় ধীর ও স্থির ভাবে কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে। প্রধানমন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া সকল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা দিবারাত্র দেশের সর্ব্বত্র এইকথা বলিয়া বেড়াইতেছেন। আমরাও এসময়ে দেশবাসীকে অধিকতর শান্ত থাকিয়া কর্ত্তব্যপালনে আহ্বান জানাইতেছি।

যুদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহ—

পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেন যুদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে গত একমাস যাবৎ প্রত্যহ কয়েকটি স্থানে সভা করিয়া বেড়াইতেছেন। সম্প্রতি তিনি বারাকপুর মহকুমার দশটি স্থানে সভা করিয়া কয়েক লক্ষ টাকা সংগ্রহ

করিয়াছেন। তিনি যেখানেই যাইতেছেন লোকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ দান করিতেছে। আজ যুদ্ধের জন্য দেশবাসীকে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া ভারতের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইবে। ভারতবাসী যে একথা উপলব্ধি করিয়াছে ইহাই আমাদের পক্ষে আনন্দের কথা।

শিক্ষার জন্য রাশিয়া যাত্রা—

ভারতবর্ষের লেখক, অধ্যাপক নারায়ণ চৌধুরী এম-এ রুস গভর্ণমেণ্টের বৃত্তি পাইয়া সম্প্রতি সমবায় সম্পর্কে

অধ্যাপক নারায়ণ চৌধুরী

উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য এক বৎসরের মেয়াদে রাশিয়া গিয়াছেন। তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার বড়কোপিলাগ্রামের শ্রীকুমারেশ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র এম-এ পাশ করার পর তিনি গত ৮বৎসর সরকারী সমবায় আন্দোলনের সহিত যুক্ত ছিলেন। কলেজে অধ্যাপনার সহিত পশ্চিমবঙ্গ সমবায় ইউনিয়নের তিনি কর্ম্মী ছিলেন। তিনি সুলেখক ও সুবক্তা বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। আমরা তাঁহার জীবনে উন্নতি কামনা করি।

পরলোকে প্রাক্তন মেয়র—

কলিকাতার প্রাক্তন মেয়র ও পশ্চিমবঙ্গ বিধান-পরিষদের সদস্য রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার গত ২৩শে অক্টোবর শনিবার সকালে তাঁহার ২০৩।১ বিধান সরণীর বাসভবনে মাত্র ৫৪ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। ভারতবর্ষ কার্য্যালয়ের পাশেই তাঁহার বাসভবন অবস্থিত, কাজেই তাঁহার মৃত্যুতে আমরা বিশেষ বেদনা অনুভব করিতেছি। তাঁহার ৭৫ বৎসরের বৃদ্ধা মাতা, স্ত্রী, তিন পুত্র, তিন কন্যা, চার ভাই প্রভৃতি বর্ত্তমান। ১৯১১ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি ১৯৪০ সালে কলিকাতা হাইকোর্টের এ্যাড্‌ভোকেট ও সলিসিটর হন। কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার হইয়া তিনি দুই বৎসর মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি ডাঃ প্রতাপ চন্দ্র মজুমদারের পৌত্র ও ডাঃ জিতেন্দ্র নাথ মজুমদারের পুত্র ছিলেন। কলিকাতার বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। তাঁহার মৃত্যুতে কলিকাতার একজন উদীয়মান সমাজসেবীর অভাব হইল।

বিনোদ বিহারী কুণ্ডু চৌধুরী—

হাওড়া জেলার মহিয়াড়ী গ্রামের জমিদার হরগোপাল কুণ্ডু চৌধুরীর পুত্র বিনোদ বিহারী কুণ্ডু চৌধুরী গত ৪ঠা আশ্বিন ৬৪ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতা কম্বুলিয়াটোলা লেনস্থ বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার অর্থের দ্বারা সারাজীবন বহু লোকের উপকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চার পুত্র প্রভৃতি বর্ত্তমান।

পূজা ও প্রার্থনা

শ্রীজ্ঞান

এ বছরের তিনটি মহাপূজা শেষ হল। দেবী দুর্গার মহা পূজা, মহালক্ষ্মীর পূজা ও মহাকালীর পূজা শেষ হল। ভাই-ফোঁটাও হয়ে গেল। এই সব পূজার সময় সকলেই নানারকম প্রার্থনা নিশ্চয়ই করেছ মহাশক্তির কাছে—নানা রকম ইচ্ছা করেছ প্রকাশ, চেয়েছ কত রকমের বর আদ্যাশক্তির কাছে। কিন্তু সে সব প্রার্থনা কি শুধুই নিজেদের ছোট বড় ইচ্ছা পূরণের ও স্বার্থসিদ্ধির জন্যেই করেছ? নিশ্চয়ই তা নয়। তোমরা, দেশের কিশোর কিশোরীরা, কখনই তা করতে পার না। শত্রুর আক্রমণে দেশ যখন বিপদ্‌গ্রস্ত, বিদেশী চক্রান্তে দেশের শান্তি যখন বিঘ্নিত, খাদ্যসঙ্কটে দেশের মানুষ যখন বিপর্যস্ত তখন ক্ষুদ্র স্বার্থের কথা চিন্তা না করে নিশ্চয়ই তোমরা দেশের কথা, জাতির কথা, শান্তির কথা ভেবে প্রার্থনা করেছ। প্রার্থনা করেছ দেশ যেন শত্রু আক্রমণের বিপদ থেকে মুক্ত হয়, বিদেশী চক্রান্ত যেন দেশের অখণ্ডতা নষ্ট করতে না পারে, দেশের খাদ্যাভাব ও অন্যান্য অভাব যেন দূর হয়, আমরা যেন পর-নির্ভরশীলতা কাটিয়ে উঠে স্ব-নির্ভর হতে পারি, অস্ত্র-শস্ত্র, খাদ্য-দ্রব্য প্রভৃতি সব কিছুই যেন আমরা দেশেই উৎপন্ন করতে পারি, আর সর্বোপরি নিজেদের অজস্র দোষ-ত্রুটির সংশোধন করে যেন সত্যকার মানুষ হয়ে উঠতে পারি। নিশ্চয়ই তোমরা, দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকেরা, মহাপূজার মহালগ্নে এই প্রার্থনা নিবেদন করেছ, এই সঙ্কল্প গ্রহণ করেছ। তোমাদের এই প্রার্থনা মহাদেবী পূর্ণ করবেন বলেই আমার বিশ্বাস।

পূজার পর ভাই-বোনেদের চির-নতুন আনন্দোৎসব ভাইফোঁটাও শেষ হয়েছে। কিশোরী বোনেরা ভাইদের ও দাদাদের কপালে ফোঁটা দিয়ে প্রার্থনা করেছ—'যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা, ভাই যেন হয় লোহার ভাঁটা।' তোমাদের এই প্রার্থনা নিশ্চয়ই পূর্ণ হবে, তোমাদের হাতের চন্দনতিলক কপালে ধারণ করে তোমাদের অনেক ভাই-দাদারা সত্য সত্যই লোহার ভাঁটার মতন সমর্থ হয়ে উঠে যমকে ফাঁকি দিয়ে রণক্ষেত্রে শত্রুর মোকাবিলা করবে। সীমান্ত সংগ্রামে শত্রুধ্বংসে রত জওয়ান ভাইরাও বাংলার বোনেদের ভাইফোঁটার শুভেচ্ছায় নববলে বলীয়ান হয়ে উঠে শত্রুনিধনে সমর্থ হবে।

রণক্লান্ত জওয়ান ভাইদের ভাইফোঁটার উপহার পাঠিয়ে উৎসাহিত করেছ কি তোমরা? যদি না করে থাক তো সে ব্যবস্থা করবার জন্য উদ্যোগী হও। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মেয়েরা তাদের যথাসাধ্য করছে, আর বাংলার বালিকারা কি পেছিয়ে থাকবে? তোমরাও উঠে পড়ে লাগ। নিজ হাতে প্রস্তুত উপহার সামগ্রীই সব চেয়ে উপযোগী। তা যদি সকলের পক্ষে করা সম্ভব না হয়

তাহলে কিনে পাঠাতে হবে এবং সে জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। পূজা, বিচিত্রানুষ্ঠান, সঙ্গীত, জলসা প্রভৃতিতে তো তোমরা চাঁদা তুলে থাক। এ ব্যাপারেও সেই রকম করে টাকা সংগ্রহ করবে। তবে জোর জবরদস্তি যেন না করা হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখ। চাঁদা মানে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যে যা দেয় তাই—এ কথাটা সবসময় মনে রেখ। বিচিত্রানুষ্ঠান, জলসা ইত্যাদি নিজেরা আয়োজন করে টিকিট বিক্রী করে টাকা তুলতে পার। সংবাদপত্রে নিশ্চয়ই পড়েছ—কয়েকটি মেয়ে জুতা পালিশ করে অর্থ সংগ্রহ ক'রে প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করেছে। তাদের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে তোমরাও অন্য উপায়ে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা কর—তারপর সংগৃহীত সকল অর্থ একত্র করে তাই দিয়ে জওয়ান ভাইদের উপযোগী দ্রব্যাদি কিনে পাঠিয়ে এবারকার ভাইফোঁটার উৎসবকে সার্থক করে তোল। আর সেই সঙ্গে স্মরণ কর, মাতৃভূমি রক্ষায় রণক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জনকারী শহীদ ভাইদের। স্মরণ কর—বীর যোদ্ধা অভিজিৎ, তপন, ভাস্কর প্রবালকে—স্মরণ কর আরও শত শত শহীদজওয়ানদের। প্রার্থনা কর তাঁদের স্বর্গগত আত্মার শান্তির জন্য, প্রার্থনা কর যেন তাঁদের মত সুসন্তানে আমাদের দেশ ভরে ওঠে, প্রার্থনা কর তাঁদের মত আরও শত শত বীর ভায়েদের জন্যে। মহাশক্তি তোমাদের প্রার্থনা নিশ্চয়ই পূর্ণ করবেন এবং শক্তি যোগাবেন সকলের মনে।

***

জর্জ এলিয়ট
রচিত

সাইলাস মারনার

সৌম্য গুপ্ত

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আফিমের নেশায় বুঁদ হয়ে কোনোমতে টলতে টলতে শীতের প্রচণ্ড তুষার-পাতের মধ্যেই মলি তার ফুটফুটে সুন্দর শিশু-কন্যাকে বুকে জড়িয়ে নিরালা নির্জ্জন পথ মাড়িয়ে বড়দিনের আনন্দোৎসবে মাতোয়ারা রাভেলো গ্রামের জমিদার-বাড়ি 'রেড-হাউসের' পানে এগিয়ে চলেছিল। জমিদার ক্যাসের বড়ছেলে গড্‌ফ্রের ক্ষণিক দুর্ব্বলতা আর অবহেলার ফলে, মলি এতকাল তার শিশু-কন্যাকে নিয়ে যে দুঃসহ দারিদ্র্য-কষ্ট ভোগ করে আসছিল এবারে সে সবের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি-সাধনের উদ্দেশ্যে, ভোরের আলো ফোটবার সঙ্গে সঙ্গেই একরত্তি দুধের বাছাকে বুকে নিয়ে ভিন-গাঁয়ের জীর্ণ কুটীর ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়েছিল। তারপর সারাটা দিন অনাহারে অবিশ্রান্তভাবে কন্‌কনে হিম-বাতাস আর তুষার-পাতের দুর্ভোগ সহে একটানা এতখানি সুদীর্ঘ পথ মাড়িয়ে সন্ধ্যার সময় রাভেলো গ্রামে এসে পৌঁছানো—রীতিমতই প্রাণান্তকর ব্যাপার! কাজেই হাড়-কাঁপানো শীতের কষ্টে আর পথশ্রমের ক্লান্তিতে অসহায়া মলি বেচারী নিতান্তই দুর্ব্বল অবসন্ন হয়ে পড়েছিল···খিদেয়-চেষ্টায়, ভাবনায়-উদ্বেগে তার জীর্ণ দেহ-মন মুশড়ে-ঝিমিয়ে এমনই অসাড়-আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল যে সে আর বেশী দূর এগুতে পারলো না—রাভেলো গ্রামের প্রান্ত-সীমায় পৌঁছেই ক্লান্তিতে-অবসাদে চেতনা হারিয়ে

ঘুমন্ত শিশু-কন্যাকে বুকে জড়িয়ে ধরেই হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে বরফে-ঢাকা নিরালা পথের মাঝেই জংলী ফার্জ-গাছের ঘন ঝোপ-ঝাড়ের পাশে ঠাণ্ডা-কন্‌কনে মাটির বুকে লুটিয়ে পড়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলো।

মাথায় অদ্ভুত-ছাঁদের ছোট্ট একটি পশমী-টুপি আর সর্বাঙ্গে পুরোনো ময়লা ছেঁড়া একখানা শালের টুকরোতে পরিপাটিভাবে জড়ানো অবস্থায় মলির শিশু-কন্যাটি এতক্ষণ মায়ের কোলে পরম নিশ্চিন্ত-আরামে ঘুমিয়ে ছিল···মলির প্রাণহীন দেহ পথে লুটিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঠাণ্ডা কন্‌কনে হিম-তুষারের স্পর্শে সে বেচারীর ঘুম আচমকা গেল ভেঙে···বড়-বড় চোখ দুটি মেলে আশপাশে চারিদিকে তাকিয়ে দেখে—সন্ধ্যার আবছা-অন্ধকারে অজানা অচেনা এক নিরালা নির্জন জংলা প্রান্তরের মাঝে পড়ে রয়েছে সে পাশেই বরফে ঢাকা পথের প্রান্তে ক্লান্ত নিস্পন্দ জীর্ণ দেহভার লুটিয়ে দিয়ে চিরনিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে চোখ মুদে শুয়ে রয়েছে তার মা। সন্ধ্যার অন্ধকারে নিরালা নির্জন এই অপরিচিত পরিবেশে মাকে হঠাৎ এমন অসহায় অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে শিশুকন্যা ব্যাকুল ভাবে তার নরম কচি দুটি হাতের ঠেলা দিয়ে মলিকে ডাকলে,—মা···মা···ওমা··

কিন্তু কন্যার সে ডাকে মায়ের ঘুম আর ভাঙ্গলো না··· মলি তখন ইহলোকের মায়া কাটিয়ে পরলোকে পাড়ি দিয়েছে চিরদিনের মতোই। মায়ের সাড়া না পেয়ে শিশু কন্যা তখন আশপাশে চারিদিকে তাকিয়ে দেখে—কোথাও কোনো জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই··এমন কি, কারো বাড়ী ঘর আশ্রয়টুকুও নজরে পড়ে না। নিরালা নির্জন সেই জংলী প্রান্তরের ত্রিসীমানার কাছাকাছি কোনোখানে···ঘনায়মান সন্ধ্যার অন্ধকারে সারা জায়গাটা ঘিরে আবছা আকাশের নীচে বড় বড় দৈত্যের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে একরাশ ঝাঁকড়া জংলী ঝোপ ঝাড় আর গাছ-পালার সারি···দিগন্তবিস্তৃত জমি আগাগোড়া ছেয়ে গেছে শুভ্র তুষারকণার ধবল আস্তরণে। আশপাশের এমন বিচিত্র শোভার মাঝে সদ্য মা-হারা শিশু-কন্যার হঠাৎ নজরে পড়লো—সামনেই কিছুদূরে কোথায় যেন জংলী ঝোপঝাড়ের আড়ালে খড়ে-ছাওয়া ছোট একটি গ্রামের কুটীরের উন্মুক্ত-দরজার ফাঁক দিয়ে দিব্যি সুস্পষ্টভাবে ফুটে বেরিয়ে আসছে উজ্জ্বল-আলোর রোশ্‌নি-ঝলক। দূরান্তের সেই উজ্জ্বল-আলোর রোশ্‌নি-আভায় যাদু-মায়ার কি অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল কে জানে···কারণ, সে আভা নজরে পড়তেই মলির শিশু-কন্যার মুশড়ে-পড়া মন বিচিত্র আবেগে-উৎসাহে ভরে উঠলো···সে আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করে তুষারাচ্ছন্ন পথের প্রান্তে নিষ্প্রাণ-নিস্পন্দ মায়ের কোল ছেড়ে হামাগুড়ি দিয়ে সরে এসে পরম-কৌতূহলভরে পলকহীন-দৃষ্টিতে দূরের কুটীরের উন্মুক্ত-দরজার ফাঁক দিয়ে বাইরে বেরিয়ে-আসা আলোক ছটার পানে তাকিয়ে রইলো। স্তব্ধ-বিস্ময়ে কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকার পর, মজার খেলনা ভেবে হাত বাড়িয়ে আলোটাকে ধরবার আশায় মনের আবেগে জমি থেকে সটান উঠে দাঁড়িয়ে কোনোমতে টলতে টলতে বরফে-ঢাকা প্রান্তর পার হয়ে সে সিধা এগিয়ে চললো দূরের জংলী-ঝোপঝাড়ের আড়ালে খড়ে-ছাওয়া রাভেলো-গ্রামের প্রান্ত সীমার সেই ছোট কুটীরের উন্মুক্ত-দরজার দিকে।

গ্রামের প্রান্তে খড়ে-ছাওয়া সেই ছোট্ট কুটীরটিই ছিল নিঃসঙ্গ সাইলাস্ মার্নারের নিরালা আশ্রয় নীড়। পাড়াপড়শী লোকজনের সংস্পর্শ এড়িয়ে নিভৃত এই কুটীরের অন্তরালে একা নিজের খেয়াল-খুশীমতো কাজে-কর্মে আর ভাবনা-চিন্তায় বিভোর হয়ে সুদীর্ঘ এতকাল সে যেমনভাবে দিন কাটিয়ে এসেছে, আজো নববর্ষের সন্ধ্যায় সাইলাস একা তেমনি নিঃসঙ্গভাবেই তার ঘরের কোণে বসে জানলার বাইরে আবছা-আকাশের পানে উদাস-দৃষ্টি মেলে দিয়ে চিন্তামগ্ন হয়ে ভাবছিল—নিজের অতীত-জীবনের সুখ-দুঃখ মেশানো কত সব পুরোনো স্মৃতির টুকরো-টুকরো ছবি। এ সব চিন্তায় সে তখন এমনই মশগুল-আত্মহারা যে শীতের হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা-কনকনে ভাব থেকে আরাম পাবার জন্য, ঘরের কোণে জ্বালিয়ে-রাখা গনগনে আগুনের চুল্লীতে দরকার মতো কাঠকুটো জোগান দেওয়া বা কুটীরের খোলা দরজাটা ভেজিয়ে বন্ধ করার দিকেও তার এতটুকু হুঁশ ছিল না। সাইলাস্ ভাবছিল···তার সেই হারানো সোনার মোহরের কথা···পাড়াপড়শীরা এসে সেদিন সকালেই তাকে বিশেষ-ভাবে জানিয়ে গেছে যে বছরের শেষ দিনটিই হলো—পরম পুণ্য তিথি···রাত জেগে পুরোনো বছর শেষ হবার

আর নতুন বছর সুরু হবার শুভ-সন্ধিক্ষণে গির্জ্জার ঘণ্টা-ধ্বনি শুনলে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে অতি-অভাগাদেরও নাকি বরাত খুলে যায়—সৌভাগ্যের সূচনা হয়। সাইলাস্ তাই অধীর আগ্রহে সন্ধ্যা থেকেই ঠায় জেগে বসে আছে—রাত ঠিক বারোটার সময় পুরোনো আর নতুন বছরের শুভ-সন্ধিক্ষণে গ্রামের গির্জ্জার পবিত্র ঘণ্টাধ্বনি শোনবার আশায়…দেবতার দয়ায় সৌভাগ্যক্রমে যদি তার হারানো রতন…অর্থাৎ চোরের হাতে খোয়ানো এত বছরের সযত্নে-সঞ্চিত সোনার মোহরগুলি আবার সে ফিরে পায়! কাজেই, কুটীরের দরজা খোলা রইলো বা ঘরের কোণে জ্বলন্ত-আগুনের চুল্লীতে ঠিকমতো কাঠকুটো জোগান দেওয়া হলো কিনা, সেদিকে নজর রাখার খেয়ালটুকুও ছিল না তখন সাইলাসের।

দুনিয়ার সব কিছু ভুলে সাইলাস্ যখন এমনি চিন্তায় বিভোর-তন্ময়, সেই ফাঁকে তার দৃষ্টির অগোচরে নিঃশব্দে বাইরের আবছা-অন্ধকার তুষারাচ্ছন্ন-প্রান্তর পার হয়ে টলমল করে হাঁটতে হাঁটতে কুটীরের খোলা-দরজা দিয়ে সরাসরি ভিতরে ঘরের কোণে জ্বলন্ত আগুনের চুল্লীর সামনে এসে হাজির হলো অজানা-অচেনা ছোট্ট এক-রত্তি এক অতিথি—মলির অসহায়া শিশু কন্যা…মাথায় তার অদ্ভুত-ছাঁদের পশমী-টুপি, টুপির নীচেই একরাশ কোঁকড়া সোনালী চুলের গুচ্ছ…অপরূপ ফুটফুটে সুন্দর তার চেহারা…অঙ্গে জীর্ণ মলিন শস্তা-দামের ছিটের জামার সঙ্গে জড়িয়ে পাক খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে ল্যাজের মতো ঝুলছে শতছিন্ন পুরোনো পশমী শালের লম্বা একটি টুকরো, পায়ে একজোড়া ছেঁড়া পশমের মোজা। ঘরে ঢুকেই আগন্তুক-শিশুটি কৌতূহলভরে কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে তাকিয়ে রইলো জ্বলন্ত চুল্লীর আগুনের উজ্জ্বল রোশনির পানে…তারপর মনের স্ফূর্ত্তিতে সোৎসাহে হাত বাড়িয়ে সদ্য ডিম-ফুটে-বেরুনো হাঁসের বাচ্চার মতো বিচিত্র কলস্বরে নিরালা কুটীর মাতিয়ে তুলে সে টলমল করতে করতে ছুটে এগিয়ে গেল ঘরের কোণে জ্বলন্ত চুল্লীর কাছে —আগুনের উজ্জ্বল আভাটুকু মুঠোয় ধরবার আগ্রহে …এমন সময় হঠাৎ তার নজর পড়লো—চুল্লীর সামনেই ইট বাঁধানো বেদীর একপাশে সযত্নে বিছানো রয়েছে চটের তৈরী আটপৌরে ছাঁদের জীর্ণ মলিন একটি ওভারকোট। ওভারকোটটি ছিল শীতের দিনে হাড় কাঁপানো হিমে-ঠাণ্ডায় বাইরে বেরুনোর সময় সাইলাসের অঙ্গরক্ষার সম্বল …সেদিন বিকালে প্রচণ্ড তুষারপাতের মধ্যে গ্রামের পথে ঘোরাঘুরির ফলে, ওভারকোটটি ভিজে সপ্‌সপে হয়ে যায়…তাই বাড়ী ফিরেই সাইলাস্ তার পোষাকটিকে আগুনের তাপে রেখে শুকিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে, ঘরের কোণে জ্বলন্ত-চুল্লীর সামনে ইট-বাঁধানো বেদীর উপর সযত্নে মেলে দিয়েছিল, কিন্তু নানান্ ভাবনা চিন্তায় বিভোর থাকার দরুণ, শুকনো পোষাকটিকে যথাস্থানে তুলে রাখার কথাটা আর খেয়ালই করেনি সে এতটুকু। কাজেই পোষাকটি এতক্ষণ পর্য্যন্ত ঠায় বিছানোই পড়ে ছিল আগুনের চুল্লীর সামনে ইট বাঁধানো বেদীর একপাশে।

লোকে কথায় বলে,—শিশুর মন…নতুন কোনো সামগ্রী দেখলেই শিশুর মনে পুরোনো জিনিষটির প্রতি আর বিশেষ তেমন আগ্রহ মায়া থাকে না…নতুন সামগ্রীর দিকেই তার রীতিমত ঝোঁক জাগে…এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাই ঘটলো! সাইলাসের ওভারকোটের দিকে নজর পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই মলির শিশু-কন্যার মনেও ভাবান্তর দেখা দিলো…জ্বলন্ত আগুনের উজ্জ্বল-রোশনির মায়ায় ভুলে সে সোৎসাহে সাইলাসের চটের ওভারকোটের উপর দিব্যি আরামে বসে মনের আনন্দে আবোল তাবোল বিচিত্র কলধ্বনিতে নিস্তব্ধ-কুটীর মাতিয়ে তুলে আপন খেয়ালে মশগুল হয়ে জামার বোতামগুলি নিয়ে খেলা সুরু করে দিলে। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই সারা দিন বাইরে পথে হিমে ঠাণ্ডায় আর দৌড় ঝাঁপের ক্লান্তিতে অবসন্ন তার দেহ ঘরের কোণে জ্বলন্ত আগুন তাপের আরাম পরশ পেয়ে গভীর ঘুমে এলিয়ে পড়লো। (ক্রমশঃ)
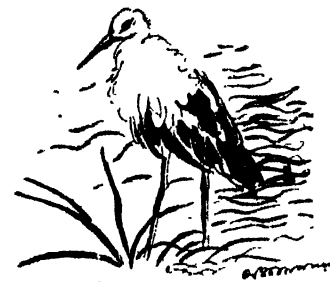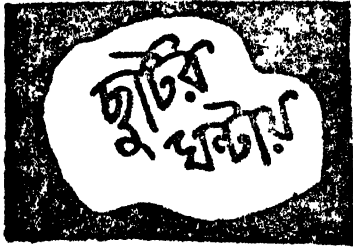
এবারে শোনো—বিজ্ঞানের আরেকটি আজব মজার খেলার কথা।

এ খেলাটির নাম—'সাবান-জলের কেরামতি'। খেলার কলা-কৌশল নিতান্তই সহজ-সরল হলেও, এটি থেকে তোমরা বিজ্ঞানের অভিনব-বিচিত্র একটি রহস্যের আসল পরিচয় জানতে পারবে।

এ খেলাটি পরখ করে দেখতে হলে, যে সব টুকিটাকি উপকরণের প্রয়োজন—গোড়াতেই তার ফর্দ দিয়ে রাখি। অর্থাৎ, এজন্য চাই—এক টুকরো ভেলভেট কাপড় (A piece of Velvet cloth)। একবাটি ঠাণ্ডা জল (Cold water) একবাটি গরম জল (Hot-water) আর এক বাটি সাবান জল (Soap-water)...এবং সেই সঙ্গে তিন টুকরো সমান মাপের সুতী কাপড়ের ফালি (Three pieces of cotton cloth of equal size)।

উপরের ফর্দমতো বিভিন্ন উপকরণগুলি সংগ্রহ করার পর, খেলার কেরামতি পরখ করে দেখার পালা। তবে সে পালা স্থুরু করবার আগে, কয়েকটি দরকারী কথা বলে রাখি।

নিত্য-নিয়মিতভাবে বাড়ীতে সচরাচর ঠাণ্ডা জল, গরম জল আর সাবান জলে হাত মুখ ধোয়া, স্নান করা বা কাপড় কাচার সময় তোমরা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছো যে ঠাণ্ডা জলের বদলে গরম জলে এবং গরম জলের চেয়েও সাবান জল ব্যবহার করলে, ধুলো, কাদা, ময়লা দাগ সহজেই বেশ সাফ্ সুতরো বা পরিষ্কার হয়ে যায়। এমনটি ঘটবার কারণ—ঠাণ্ডা জলের চেয়ে গরম জলের...এবং গরম জলের চেয়েও সাবান জলের ভিজানোর ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত বেশী হয় বলেই। অর্থাৎ, বিজ্ঞানীদের মতে, ঠাণ্ডা জলের ছোট-ছোট বিন্দু কণাগুলি প্রকৃতির বিচিত্র নিয়মানুসারে সর্বদাই একসঙ্গে জোট বেঁধে থাকতে চায়। ঠাণ্ডা জলের ছোট ছোট বিন্দু কণাদের এমনি জোট বেঁধে থাকার চিরাচরিত স্বভাবটিকে বিজ্ঞানের ভাষায় নাম দেওয়া হয়েছে—Surface Tension' বা 'শীর্ষ চাপ'। এই 'শীর্ষ চাপ' বা 'Surface Tension' থাকার ফলে, কোনো কিছুর উপর ঠাণ্ডা জলের বিন্দু কণা পড়লেও, সেটি চট্ করে ভিজিয়ে তোলে না বা সহজেই অন্য বস্তুর সঙ্গে মিশে যায় না। কাজেই সচরাচর দেখা যায় যে ঠাণ্ডা জলের স্পর্শে সব কিছুই ভিজিয়ে তুলতে বেশ খানিকটা বিলম্ব হয় এবং সময়ও বেশী লাগে। তবে জল গরম করলে, বিজ্ঞানের বিচিত্র বিধানে এই 'শীর্ষ চাপ' বা 'Surface Tension' কমে যায়। কাজেই ঠাণ্ডা জলের চেয়ে গরম জলে অপেক্ষাকৃত কম সময়ে এবং আরো সহজে সব কিছুরই মলিনতা কাটে ও বেশী চটপট আগাগোড়া দিব্যি পরিষ্কার ঝকঝকে হয়ে ওঠে। আবার গরম জলের সঙ্গে যদি সাবান মেশানো হয়, তাহলে সে জলে সব কিছুই আরো অল্প সময়ে, আরো সহজে এবং আরো পরিষ্কারভাবে ভিজিয়ে ধুয়ে সাফ্ করে নেওয়া যায়।
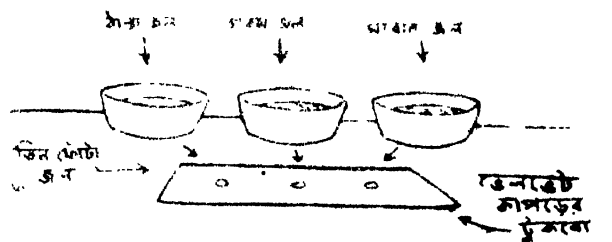
বিজ্ঞানীদের এই কথাটি কতখানি খাঁটি, তোমরা নিজেরাই বরং হাতে কলমে পরখ করে দেখে নাও। উপরের ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে, তেমনিভাবে পাশাপাশি তিনটি আলাদা আলাদা পাত্রে ঠাণ্ডা, গরম এবং সাবান-মেশানো জল সাজিয়ে রাখো। তিন রকমের জল-ভরা এই পাত্র তিনটির সামনে উপরের ছবির নমুনানুসারে এক টুকরো ভেলভেটের কাপড় পেতে রেখে, স্থুরু করো তোমাদের পরীক্ষার পালা।

প্রথমেই, পাশাপাশি সাজানো ঠাণ্ডা জল, গরম জল আর সাবান জলের পাত্র তিনটির প্রত্যেকটিতে আলাদা আলাদাভাবে সমান মাপের ছোট একটি কাগজ বা কাপড়ের টুকরো ফেলে লক্ষ্য করে ছাখো যে ঐ তিনটি টুকরোর মধ্যে কোনটি আগে ডোবে এবং কোনটি পরে। বলা বাহুল্য, এভাবে পরীক্ষার ফলে, দেখবে—সবার আগে ডুববে সাবান জলে ভেজানো টুকরোটি, তারপর গরম জলে ভাসানো টুকরোটি এবং সব শেষে ঠাণ্ডা জলে ভেজানো টুকরোটি। তাহলেই সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলবে যে সাবান জলেরই ভিজিয়ে দেবার ক্ষমতা সব চেয়ে বেশী...তার চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষমতা গরম জলের...এবং তিনটির মধ্যে ভেজানোর ক্ষমতা সব চেয়ে কম হলো—ঠাণ্ডা জলের।

এছাড়া ঠাণ্ডা, গরম আর সাবান গোলা জলের ভেজানোর ক্ষমতা কম বা বেশী পরখ করে দেখার আরেকটি উপায় আছে···আপাততঃ, সেটির পরিচয় দিই।

এবারে ঠাণ্ডা, গরম ও সাবান গোলা জলের পাত্র থেকে আলাদা আলাদাভাবে অল্প একটু জল তুলে নিয়ে ভেলভেটের কাপড়ের টুকরোটির উপরে পাশাপাশি তিনটি ফোঁটা ফেলে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করলেই দেখবে—সাবান জলের ফোঁটাটিই সবার আগে ভেলভেটের টুকরোর সঙ্গে মিশে গিয়ে কাপড়টিকে সহজেই ভিজিয়ে দিয়েছে। গরম জলের ফোঁটা ভেলভেটের টুকরো ভিজিয়ে তুলতে সময় নিচ্ছে অপেক্ষাকৃত বেশী এবং ঠাণ্ডা জলের ফোঁটার ভিজানোর সময় লাগছে তার চেয়েও আরো কিছুক্ষণ বেশী।

এবারের বিচিত্র রহস্যময় বিজ্ঞানের খেলাটির এই হলো—আসল পরিচয়।

——

মনোহর মৈত্র

১। ছেঁড়া কাগজের টুকরোর হেঁয়ালিঃ

পুজোর ছুটির পর স্কুল খুললেই বাৎসরিক পরীক্ষার পালা সুরু হবে। ভোম্বল তাই পড়ার ঘরে বসে ভূগোলের বইখানা খুলে ম্যাপ দেখে পৃথিবীর বিখ্যাত একটি দেশের প্রধান প্রধান সহরের নামগুলি মুখস্থ করছিল, এমন সময় মা তাকে পাঠালেন বাজারে—সংসারের দরকারী কয়েকটী জিনিষ-পত্র কিনতে। সেই ফাঁকে, ভোম্বলের ছোট ভাই—চার বছর বয়সের খুদে-শয়তান গাবলু এসে হাজির পড়ার ঘরে। টেবিলের উপরে দাদার ভূগোলের বইখানা খোলা পড়ে থাকতে দেখে, দস্যি-ডানপিটে গাবলুর হাত নিশপিশ করে উঠলো। সে আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করে ভূগোলের বইয়ের পৃথিবীর বিখ্যাত দেশের যে ম্যাপের ছবিখানি ছিল (অর্থাৎ, ভোম্বল এতক্ষণ যে ম্যাপখানি দেখে প্রধান প্রধান সহরের নামগুলি মুখস্থ করছিল), মনের আনন্দে সেখানি কুচি-কুচি করে ছিঁড়ে ফেললো নিমেষের মধ্যেই। ম্যাপখানি ছিঁড়ে ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই ভোম্বল ফিরে এলো বাজার থেকে···বাড়ীর ভিতরে মায়ের হাতে সন্ত-সওদা-করা জিনিষপত্র পৌঁছে দিয়ে পড়ার ঘরে ঢুকেই দেখে—সর্ব্বনাশ!···গাবলু হতভাগা ভূগোলের বই থেকে ম্যাপের ছবিখানা ছিঁড়ে একেবারে কুচি-কুচি করে ফেলেছে! রাগে ভোম্বলের আপাদ-মস্তক জ্বলে উঠলো···ঠাশ-ঠাশ করে গাবলুর মাথায় সজোরে কয়েকটা চড় মারতেই, গাবলু তারস্বরে কান্না জুড়ে দিলে। হট্টগোল শুনে মা তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলেন পড়ার ঘরে। মাকে দেখেই ভোম্বল নালিশ করলে,—"ত্থাখো তো গাবলু হতভাগা আমার ভূগোলের বইয়ের ম্যাপখানা ছিঁড়ে কুটি কুটি করে কি কাণ্ডটাই না বাধিয়েছে!···সামনেই পরীক্ষা আসছে ম্যাপ না হলে, এখন পড়বো কেমন করে?"···

গোলমাল মেটানোর উদ্দেশ্যে মা ভোম্বলকে বুঝিয়ে বললেন,—'তা করবে কি বল, যে বেয়াড়া দুষ্টু হয়েছে তোর ভাই!···পারিনে আর দিনরাত ওর দৌরাত্ম্যের জ্বালায়··· তা, তুই বাবা বড় হয়েছিস! লক্ষ্মী মানিক আমার! এ আর এমন কি শক্ত কাজ! ম্যাপের ছেঁড়া টুকরোগুলোকে বরং ঠিকমতো সাজিয়ে পরপর আঠা দিয়ে জুড়ে নিয়ে পড়ার কাজটুকু চালিয়ে নে!···যে দিনকাল পড়েছে···ফট্ করে আবার একখানা নতুন বই কেনার খরচ!···

মায়ের কথামতো ভোম্বল কিছুক্ষণ চেষ্টা করলো বটে কিন্তু কিছুতেই ছেঁড়া কাগজের টুকরোগুলিকে যথাযথভাবে সাজিয়ে পৃথিবীর সেই বিখ্যাত দেশের ম্যাপখানাকে আর নিখুঁত-পরিপাটি ছাঁদে জোড়া দিতে পারলো না। ভোম্বলের হায়রানি দেখে, মা শেষে নিজেই সেই ছেঁড়া কাগজের টুকরোগুলিকে একের পর এক যথাযথভাবে সাজিয়ে নিখুঁত পরিপাটি ছাঁদে পৃথিবীর বিখ্যাত দেশের ম্যাপখানি আগাগোড়া জোড়া দিয়ে দিলেন। নীচের ছবিতে পৃথিবীর সেই বিখ্যাত দেশের ম্যাপের ছেঁড়া টুকরোগুলির নমুনা দেওয়া হলো।
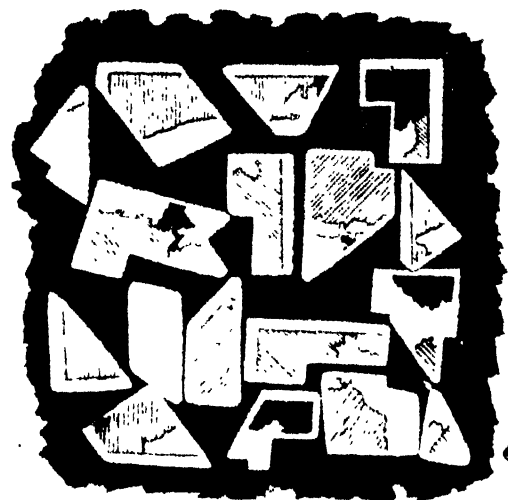
তোমরা চেষ্টা করে গ্যাখো তো—এই টুকরোগুলিকে একের পর এক যথাযথ ভাবে সাজিয়ে পৃথিবীর সেই বিখ্যাত দেশের ম্যাপটিকে আগাগোড়া নিখুঁত-পরিপাটি ছাঁদে জোড়া দিতে পারো কিনা। যদি পারো তো বুঝবো—ভুগোলের পরীক্ষায় এবার তোমরা ভালো নম্বরই পাবে।

২। **'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা :**

পরমাত্মগ্রহভরে
প্রভু চাকরী দিলেন ধরে!
তবে উল্টে যদি দাও,
মোর সদাই দেখা পাও!

রচনা : বিজনকুমার ঘোষ (জগদ্দলপুর)

৩। পাঁচ অক্ষরে রচিত—প্রাচীন ভারতের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এক সাম্রাজ্যের রাজধানীর নাম। প্রথম দুই অক্ষরে—বাঙলা দেশের অন্যতম প্রধান কৃষিজাত ফসলের নাম বোঝায়। প্রথম ও তৃতীয় অক্ষরে বোঝায়—ভারতের সুপ্রাচীন একটি ভাষা। প্রথম এবং শেষাক্ষর মিলে বোঝায়—বিয়ের বর অথবা জিনিষপত্র রাখার উপকরণ। শেষ দুই অক্ষরে স্থান হয়ে যায়। বলো তো, প্রাচীন ভারতের সেই রাজধানীর নামটি আসলে কি?

রচনা : গৌতম ঘোষ (কলিকাতা)

গতমাসের 'ধাঁধা আর হেঁয়ালির' উত্তর

১। নীচের ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, ঠিক তেমনি ধরণে ছয়টি সরল রেখা এঁকে দিলেই, অনায়াসেই এ হেঁয়ালির সঠিক-সমাধান করতে পারবে।

২। চিতল মাছ ৩। হরিয়ার
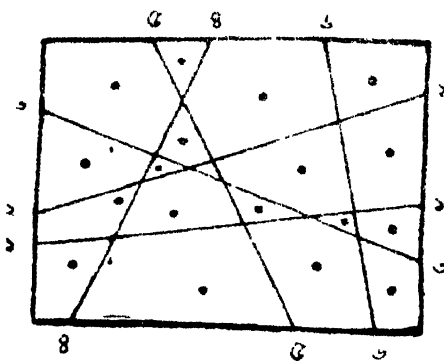
গতমাসের তিনটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

কুলু মিত্র (কলিকাতা), কবি, অনীশ ও অমিতাভ হালদার (দিল্লী), সৌরাংশু ও বিজয়া আচার্য্য (কলিকাতা) রিমি ও রনি মুখোপাধ্যায় (কাইরো), রোচনা ও ফণীন্দ্র-নাথ সাহা (কলিকাতা), পুতুল সুমা, হাবলু ও টাবলু (হাওড়া), পুপু ও ভুটিন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), সত্যেন, সঞ্জয়, মুরারি ও সুনীল (ভিলাই), রাণা ও বুন (কলিকাতা) দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় (বোম্বাই). বুবু ও মিঠু গুপ্ত (কলিকাতা), ইন্দিরা ও বৈকুণ্ঠ দেবশর্ম্মা (ইছাপুর), বিজয়েন্দ্র, বিনয়েন্দ্র, রমেন্দ্র, সুধীর ও মেনী (হাজারীবাগ), রণাংশু ও বাণী চক্রবর্ত্তী (কাটিহার)

গত মাসের দুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

শর্ম্মিষ্ঠা ও সংঘমিত্রা রায় (কলিকাতা), বিশ্বনাথ ও দেবকীনন্দন সিংহ (গয়া), পাপু, ছোটন, অর্চি ও মালা (কলিকাতা), ক্ষেপা, খজু ও খুকু (রাণাঘাট), সমীর, শচীন ও দিলীপ (আমেদাবাদ), লোটু, পুপু, সোনা ও মোনা বন্দ্যোপাধ্যায় (রাঁচী), অমিয়, রাণা, প্রশান্ত, অভী, সুনীল, তিনকড়ি, অমৃত, অমর, কৃষ্ণপাল, ভাস্কর ও মৃণাল (দুর্গাপুর), গৌতম ঘোষ (কলিকাতা), দিজেন্দ্র মোহন সরকার (কলিকাতা)।

গতমাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

সুধীশ, কল্যাণ, ইন্দ্র, শচীন, রজত, বিমল, বিশ্বতোষ, ভবেন, জগদীশ, কল্যাণী, ইন্দুরাণী, চিত্রলেখা ও সুমিত্রা (কানপুর), হাসি ও শৈলেন সেন (কলিকাতা), চিত্রতা, কুলকুল, টুলটুল ও কুমকুম মৈত্র (হাওড়া), বিমান, অকুল, নব, নীলিমা, সুনীল, প্রভাত, রেখা, বেলা, ভবানী, বীরেন, লোকেশ ও হিমানী (জব্বলপুর), সুমিতা, অশোক, মণী, রবীন, হরিদাস ও অজয় (পাটনা), প্রভাতী আচার্য্য ও অলকা মজুমদার (ভদ্রপুর) ;

[বিশেষ বিজ্ঞপ্তি : স্থানাভাবের কারণে, 'কিশোর-জগতের' যে সব সভ্য-সভ্যার নাম গতমাসে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি, নীচে সেই তালিকাটি মুদ্রিত হলো]

গত ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত দুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

পূর্ণিমা ও দীপেন মুখোপাধ্যায় এবং সুমিত্রা ও আরতী বন্দ্যোপাধ্যায় (দক্ষিণেশ্বর), দ্বিজেন্দ্রমোহন সরকার (কলিকাতা), গাবলু, মণি ও বুটু সিংহ (মদনপুর). দীপালী, অপর্ণা, রীতা, রাণু, রুমা, সীমা, রাজু ও প্রদীপ বাগচী (কোচ), প্রার্থনা, দেবীশঙ্কর, রাণাশঙ্কর ও পুতুল (নন্দীগ্রাম), গৌতম ঘোষ (কলিকাতা). শিবরাম, নন্দরাম গোপাল ও কুমার শশাঙ্কশেখর মিশ্র (কুরনান), রণবীর ও দীপঙ্কর নিয়োগী (কলিকাতা), মিনতিরাণী. দিলীপ, গোকুল ও রেবারাণী ঘোষ (নাগপুর), ধর্ম্মদাস রায় (বিদ্যাধরপুর), সুনীতিকুমার, মনোরমা, গৌরীবালা ও মদনমোহন মিশ্র (রাগপুর). বীণা, পূর্ণিমা, তাপসী, ও বাসু মণ্ডল (বিদ্যাধরপুর), জীবনকৃষ্ণ সরকার (কৃষ্ণনগর) ;

গত ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

জোনাকী বাগচী (কলিকাতা)।

দেওয়ালীর ছুঁচো-বাজী

পরের গায়ে ছুঁচো-বাজী—
ছুঁড়তে ভারী মজা…
পাল্টা-জবাব আছে এর—
খেতে হবে সোজা।

শিল্পী—পৃথ্বী দেবশর্মা

খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

আই এফ এ শীল্ড :

১৯৬৫ সালের আই এফ এ শীল্ড ফুটবল প্রতিযোগিতার তৃতীয় দিনের ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ১—০ গোলে মোহনবাগান দলকে পরাজিত ক'রে মোহনবাগান দলের সমান অ'টবার আই এফ এ শীল্ড জয় করেছে। ২২শে সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত প্রথম দিনের ফাইনাল খেলা গোলশূন্য অবস্থায় ড্র ছিল। দ্বিতীয় দিনের (২৪শে সেপ্টেম্বর) ফাইনাল খেলা ইস্টবেঙ্গল দলের মাঠে অনুপস্থিতির কারণে অনুষ্ঠিত হয়নি। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের এক সাধারণ সভার দিন ধার্য্য হয়েছিল ২৫শে সেপ্টেম্বর। এই সভার কথা উল্লেখ ক'রে ২৪শে তারিখের আয়োজিত দ্বিতীয় দিনের ফাইনাল খেলায় ইস্টবেঙ্গল দলের পক্ষে যোগদান সম্ভব নয় জানিয়ে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব কর্তৃপক্ষ এই দিনের খেলা স্থগিত রাখতে অনুরোধ করেছিলেন। এই আবেদন অগ্রাহ্য করে ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখেই দ্বিতীয় দিনের শীল্ড ফাইনাল খেলার আয়োজন করা হয়েছিল। পরে, ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে আই এফ এ-র গভর্ণিং বডি ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের আবেদনপত্র পুনর্বিবেচনা করে জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তৃতীয় দিনের ফাইনাল খেলার আয়োজন করেন।

এই তৃতীয় দিনের শীল্ড ফাইনাল খেলা উন্নত পর্যায়ের হয়নি; বরং প্রথম দিনের অমীমাংসিত খেলার মান অনেক উন্নত ছিল। তৃতীয় দিনের শীল্ড ফাইনালে দুই দলের খেলোয়াড়রা গোল দেওয়ার সুযোগ হাত-ছাড়া করেন এবং খেলার শেষ মিনিটে ইস্টবেঙ্গল দলের সেণ্টার ফরওয়ার্ড অসীম মৌলিক যে ভাবে জয়সূচক গোল দেন এবং ইস্টবেঙ্গল দলের রাইট ব্যাক শান্ত মিত্র গোল লাইনের উপর থেকে বল টেনে এনে যে ভাবে দলের পতন রোধ করেন তা একমাত্র নাটকীয় কাণ্ড বলেই উল্লেখ করতে হয়।

মোহনবাগান দলের পরাজয়ের প্রধান কারণ, আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়দের গোল দেওয়ার অক্ষমতা এবং দুর্ভাগ্য। ইস্টবেঙ্গল দলের তুলনায় মোহনবাগান দলের সামনে গোল দেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ বেশী মিলেছিল। একটার উল্লেখই যথেষ্ট হবে। প্রথমার্দ্ধের খেলার ২৫ মিনিটে মোহনবাগান দলের সেণ্টার ফরোয়ার্ড অশোক চ্যাটার্জি গোল দেওয়ার যে সুবর্ণসুযোগ হেলায় নষ্ট করেন তার তুলনা এই দিনের খেলায় আর নেই। মাত্র পাঁচ গজ দূরে ইস্টবেঙ্গল দলের গোল এবং একমাত্র অসহায় গোলরক্ষক দাঁড়িয়ে—এই অবস্থায় বল পেয়েও তিনি গোল দিতে পারেননি, বাইরে বল সট করেন। খেলা ভাঙ্গার তিন মিনিট আগে এই অশোক চ্যাটার্জিরই মারা-বল ইস্টবেঙ্গল দলের গোলের ক্রসবারে লাগলে এই দিনের খেলায় দ্বিতীয় বার মোহনবাগানের দুর্ভাগ্যের পরিচয় দেয়।

মৈনুদ্দৌল্লা গোল্ড কাপ :

হায়দরাবাদের ফতে ময়দানে অনুষ্ঠিত ১৯৬৫ সালের মৈনুদ্দৌল্লা গোল্ড কাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে

হায়দরাবাদ দল ১০০ রানে স্টেট ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া দলকে পরাজিত ক'রে প্রথম গোল্ড কাপ জয়ী হয়েছে।

প্রথম দিনের খেলায় ৮ উইকেট খুইয়ে হায়দরাবাদ ৫৬৩ রান সংগ্রহ করে। ৯ম উইকেটের জুটি ওয়াহিদ ইয়ার খাঁ (৫৮ রান) এবং গোকুল ইন্দর দেব (৭০ রান) প্রথম দিনের খেলার শেষ ৮১ মিনিটে দলের ১২৫ রান তুলে অপরাজিত ছিলেন।

দ্বিতীয় দিনে ৪৩৩ রানের মাথায় হায়দরাবাদ দলের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। গোকুল ইন্দর দেব দলের সর্ব্বোচ্চ ১১৩ রান করে নট আউট থাকেন। দ্বিতীয় দিনের খেলা ভাঙ্গার নির্দ্দিষ্ট সময়ের পাঁচ মিনিট আগে ব্যাঙ্ক দলের প্রথম ইনিংস ২৬৮ রানের মাথায় শেষ হলে হায়দরাবাদ দল ১৬৫ রানে অগ্রগামী হয়।

তৃতীয় দিনের খেলা ভাঙ্গার নির্দ্দিষ্ট সময়ের ৪০ মিনিট আগে হায়দরাবাদ দলের ২য় ইনিংস ৩০৪ রানের মাথায় শেষ হলে হায়দরাবাদ দলের থেকে ৪৬৯ রানের পিছনে পড়ে ব্যাঙ্ক দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা হাতে পায় এবং এই দিনের বাকি সময়ের খেলায় এক উইকেট খুইয়ে ৪১ রান সংগ্রহ করে।

চতুর্থ দিনের অর্থাৎ শেষ দিনের খেলায় ক্ষত বিক্ষত উইকেটে ব্যাঙ্কদলের পক্ষে জয়লাভের প্রয়োজনীয় আর ৪২৯ রান সংগ্রহ করা খুবই অসম্ভব ছিল। তবুও তারা শেষ পর্য্যন্ত লড়ে শেষ দিনে ৯ উইকেটের বিনিময়ে ৩২৮ রান তুলেছিল—৩৬৯ রানের মাথায় ব্যাঙ্ক দলের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়।

হায়দরাবাদের পক্ষে সেঞ্চুরী করেন প্রথম ইনিংসে গোকুল ইন্দরদেব (নট আউট ১১৩ রান) এবং দ্বিতীয় ইনিংসে জয়সীমা (১১১ রান)। অপর দিকে ব্যাঙ্ক দলের প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরী করেন অজিত ওয়াদেকার (১০৮ রান) এবং দ্বিতীয় ইনিংসে হনুমন্ত সিং (১০৬ রান)।

আন্তঃ রাজ্য ব্যাডমিণ্টন:

পূর্ব্বাঞ্চলের ফাইনাল

আন্তঃ রাজ্য ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার পূর্ব্বাঞ্চলের ফাইনালে পশ্চিম বাংলা পুরুষ ও জুনিয়ার বিভাগে এবং উত্তর প্রদেশ মহিলা বিভাগে জয়ী হয়ে ইণ্টার জোনে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে।

সংক্ষিপ্ত ফলাফল

পুরুষ বিভাগ: পশ্চিম বাংলা ৫—০ খেলায় উত্তর প্রদেশকে পরাজিত করে।

মহিলা বিভাগ: উত্তর প্রদেশ ৩—০ খেলায় পশ্চিম বাংলাকে পরাজিত করে।

জুনিয়ার বিভাগ: পশ্চিম বাংলা ২—১ খেলায় উত্তর প্রদেশকে পরাজিত করে।

উত্তরাঞ্চলের ফাইনাল

পুরুষ বিভাগে রেলওয়ে ৪—১ খেলায় দিল্লীকে, মহিলা বিভাগে রেলওয়ে ৩—০ খেলায় দিল্লীকে এবং জুনিয়র বিভাগে রাজস্থান ২—১ খেলায় পাঞ্জাবকে পরাজিত করে ইণ্টার-জোন প্রতিযোগিতায় খেলবার যোগ্যতা অর্জ্জন করেছে।

ডেভিস কাপ:

টোকিওতে অনুষ্ঠিত ১৯৬৫ সালের ডেভিস কাপ লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার পূর্ব্বাঞ্চলের ফাইনালে ভারতবর্ষ ৪—১ খেলায় জাপানকে পরাজিত ক'রে ইণ্টার জোন ফাইনালে স্পেনের সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে। এই নিয়ে ভারতবর্ষ তিন বার (১৯৬২-৬৩ ও ১৯৬৫) ইণ্টার জোন ফাইনালে উঠলো। ১৯৬২ সালে মেক্সিকোর কাছে ০—৫ খেলায় এবং ১৯৬৩ সালে আমেরিকার কাছে ০—৫ খেলায় ভারতবর্ষ পরাজিত হয়েছিল। এই ইণ্টার জোন ফাইনাল খেলায় বিজয়ী দেশই চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে অর্থাৎ ফাইনালে গত বারের ডেভিস কাপ বিজয়ী অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে খেলবে। ভারতবর্ষ বনাম স্পেনের ইণ্টার জোন ফাইনাল খেলাটি হবে স্পেনের বারসিলোনা সহরের ক্লে কোর্টে।

ইউরোপীয়ান এ্যাথলেটিক কাপ:

প্রথম ইউরোপীয়ান এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতার পুরুষ এবং মহিলা বিভাগে সর্ব্বাধিক পয়েণ্ট সংগ্রহ করে রাশিয়া প্রথম স্থান লাভ করেছে।

চূড়ান্ত ফলাফল

পুরুষ বিভাগ: ১ম রাশিয়া (৮৬ পয়েণ্ট); ২য় পশ্চিম

জার্মনী (৮৫ পয়েন্ট) এবং ৩য় পোল্যাণ্ড ও পূ্ জার্মানী (৬৯ পয়েন্ট)

মহিলা বিভাগ : ১ম রাশিয়া (৫৬), ২য় পূর্ব জার্মানী (৪২) এবং ৩য় পোল্যাণ্ড (২৮)

জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতা :

নব-নির্মিত নদার্ণ রেলওয়ের (নিউ দিল্লী) সুইমিং পুলে অনুষ্ঠিত ২২তম জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় ভারতীয় সুইমিং ফেডারেশনের অনুমোদিত ষোলটি ক্রীড়া সংস্থার মধ্যে তেরটি যোগদান করেছিল। সার্ভিসেস, মহীশূর এবং উড়িষ্যা যোগদান করেনি। পুরুষদের গতবারের দলগত চ্যাম্পিয়ান সার্ভিসেস দল যোগদান না করায় পুরুষ বিভাগের মাত্র একটি অনুষ্ঠানে (১০০ মিটার বাটার ফ্লাই) নতুন ভারতীয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভারতীয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠার সূত্রে মহিলা বিভাগে রিমা দত্ত (রাজস্থান) ও মার্গারেট টার্নবুল (দিল্লী) এবং বালক বিভাগে রবার্ট বুস (বোম্বাই) বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। পশ্চিম বাংলার পক্ষে নতুন ভারতীয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয় বালক বিভাগের ৪ × ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল রিলে, ১০০ মিটার বাটারফ্লাই এবং ১০০ মিটার বুক সাঁতার অনুষ্ঠানে।

আলোচ্য প্রতিযোগিতায় মোট ১০টি নতুন ভারতীয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

দলগত চ্যাম্পিয়নশিপ

পুরুষ বিভাগ : ১ম রেলওয়ে (১২৯ পয়েন্ট), ২য় বাংলা (৫২ পয়েন্ট), ৩য় কেরালা (৪০ পয়েন্ট), ৪র্থ বোম্বাই (২৯ পয়েন্ট) এবং ৫ম দিল্লী (২৫ পয়েন্ট)।

মহিলা বিভাগ : ১ম বোম্বাই (৫২ পয়েন্ট), ২য় দিল্লী (৪৯ পয়েন্ট), ৩য় রাজস্থান (২১ পয়েন্ট), ৪র্থ বাংলা (১৩ পয়েন্ট) এবং ৫ম গুজরাট (৮ পয়েন্ট)

বালক বিভাগ : ১ম বাংলা (৫৩ পয়েন্ট), ২য় বোম্বাই (৩৭ পয়েন্ট), ৩য় দিল্লী (৩২ পয়েন্ট), ৪র্থ ইউ পি (পয়েন্ট) এবং ৫ম ত্রিপুরা (১২ পয়েন্ট)।

বালিকা বিভাগ : ১ম বাংলা (৪০ পয়েন্ট), দিল্লী (৩৫ পয়েন্ট), ৩য় পাঞ্জাব (৭ পয়েন্ট), ৪র্থ গুজরাট (৪ পয়েন্ট) এবং ৫ম ইউ পি (৩ পয়েন্ট)।

ওয়াটার পোলো

ফাইনাল : রেলওয়ে ৭ : বোম্বাই ৬

বাংলার পক্ষে প্রথম স্থান লাভ

বালক বিভাগ

৪ × ১০০ মিটার ফ্রিষ্টাইল রিলে : ১ম বাংলা ; সময় ৪মি: ৪৩.১সে: (নতুন ভারতীয় রেকর্ড)।

১০০ মিটার বাটারফ্লাই : ১ম রাজীব সাহা ; সময় ১মি: ১৭.৬সে: (নতুন ভারতীয় রেকর্ড)।

১০০ মিটার বুক সাঁতার : ১ম গৌরাঙ্গ মল্লিক ; সময় ১মি: ২৪.৯ সে: (নতুন ভারতীয় রেকর্ড)

৪০০ মিটার ফ্রিষ্টাইল : ১ম জগৎ আইচ ; সময় ৫মি: ২৭.৯সে:।

পুরুষ বিভাগ

৪০০ মিটার ফ্রিষ্টাইল : ১ম নিমাই দাস ; সময় : ৫মি: ১৭.৫সে:।

২০০ মিটার ফ্রিষ্টাইল : ১ম নিমাই দাস ; সময় : ২মি: ৩১.৯সে:।

বালিকা বিভাগ

১০০ মিটার ব্যাকস্টোক : ১ম অপু ব্যানার্জি ; সময় ১মি: ৩৬.৫সে:।

১০০ মিটার ব্রেস্টষ্ট্রোক : ১ম মীরা দে ; সময় ১মি: ৩৯.৪সে:।

সম্পাদকদ্বয়—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,) কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে ৫।১১।৬৫ তারিখে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দুই বৃন্তে — শিল্পী—দীপক

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওঃ

অগ্রহায়ণ—১৩৭২

প্রথম খণ্ড | ত্রিপঞ্চাশত্তম বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

ললিতলীলা রাস

দণ্ডিস্বামী ১০৮ শ্রীযুক্ত হৃষিকেশাশ্রম

শরতের স্বচ্ছ সুন্দর শুভ্র শান্ত আকাশ, নবোঢ়ার ন্যায় কুণ্ঠিতচরণে গুণ্ঠিতশরীরে হেমন্তঋতুর মধুময়ী উপস্থিতি, রসিককুলচূড়ামণি শ্রীশ্যামলরায়ের অপরূপ লীলামাধুরী-বিকাশের স্থানরূপে স্থিরীকৃত বৃন্দাবনের শোভা সৌন্দর্য্য সমধিক বর্দ্ধিত, বৃন্দাবনের প্রতিটি লতাতরুপল্লব শারদীয় শোভার স্নেহ স্পর্শেসমৃদ্ধ, হেমন্তের শান্ত-প্রলেপে সমধিক প্রশান্তির কুঞ্জরূপে প্রতিভাত, বনানীর প্রান্তরে গিরি-গোবর্দ্ধনের অধিত্যকায়, যমুনার সৈকতভাগে সর্ব্বত্র যেন মাধুর্য্যের প্রেমধারা প্লাবন চিরসুন্দর বৃন্দাবনকে সুন্দরতর করিয়া তুলিয়াছে, সন্ধ্যোত্তর বৃন্দাবন নব নব রূপে তাহার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের পশরা লইয়া উপস্থিত হইয়াছে, ব্যগ্র নভোমণ্ডলে সুন্দর শশধর সমুদিত হইয়াছে, অনন্ত নক্ষত্র পরিমণ্ডিত নিশানাথ ধীরে, অতি ধীরে আকাশমণ্ডলে পরিক্রমা আরম্ভ করিয়াছেন। নিশাকরের করস্পর্শে কুমুদকুল কুলবধূর অবগুণ্ঠন ত্যাগকরিয়া আপন অন্তর বিকশিত করিয়া যেন আনন্দ প্রকাশ করিতেছে, বিকশিত-বদনা কুমুদিনীর স্পর্শধন্য সমীরণ সমগ্র বনমণ্ডলকে সুরভি-স্নাত করিতেছে, এই মধুর মধুময় অবসরে মাধব-মুকুন্দ-মুরারি বনমধ্যে প্রবেশ করেন।

অচিন্ত্যৈশ্বর্য, অপ্রমেয়স্বরূপ চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণ আজ

বৃন্দাবন লীলার মধ্যে এক শ্রেষ্ঠ অনুপম অধ্যায় সংযোগ করিবার অভিলাষ করিয়াছেন, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" অর্থাৎ যে যেভাবে যেরূপে প্রার্থনা করে আমি তাহাকে সেইভাবে, সেইরূপে কৃতার্থ করিয়া থাকি—শ্রীভগবানের এই শাশ্বতবাণীকে সার্থক ও মহিমান্বিত করিবার জন্যই এই শারদীয় শোভাসমৃদ্ধ বৃন্দাবনে শ্রীভগবান্ অপূর্ব্ব এক লীলাবিলাস করিবার ইচ্ছা করিলেন—

'ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ।"
(ভাগবত ১০।২৯।১)

যাঁহার ইচ্ছায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হয় যিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ, যাঁহার ঐশ্বর্য্য অনন্ত, যিনি আত্মারাম, যিনি সদা-সর্ব্বদা পরিপূর্ণ সেই শ্রীভগবান বৃন্দারণ্যের শারদ-শুভ্র, উৎফুল্ল-মল্লিকাকুল-লালিত সুন্দরী শর্ব্বরী সন্দর্শনে ক্রীড়া করিতে অভিলাষী হইয়াছেন—না, তাঁহার তো কোন অপূর্ণতা নাই, তিনি যে সদা সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ে পরিপূর্ণ, কিন্তু ভক্ত অভিলাষ চরিতার্থ করিতে যাইয়া নবজলধর-কান্তি কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার ভাগবত ঐশ্বর্য্যকে আবৃত করিয়া কেবল মাধুর্য্যাভিলাষী ভক্তগণের মনোবাঞ্ছা পরিপূরণ করিতে নিজেকে নব-নটবর শ্যামসুন্দররূপে প্রকাশিত করিয়াছেন।

বারে বারে যুগে যুগে তিনি ভক্তজন মনো-বিনোদন করিতে কতভাবে কতরূপে আসিয়াছেন, শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয়শক্তি যোগমায়াকে অবলম্বন করিয়া অচিরকালে ভবিতব্য রাসক্রীড়া বিলাসের ইচ্ছা করিয়াছেন, কিছুকাল পূর্ব্বে চীর-হরণ লীলা প্রসঙ্গে ব্রতক্লিষ্ট ব্রজকুমারীগণকে তিনি তাহাদের প্রত্যাশিত কামনা পরিপূর্ণ করিবেন অঙ্গীকার পূর্ব্বক বরপ্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণলীলা-সাধিকা যোগমায়া আপন মহিমায় সমগ্র জগৎকে বুঝি মুগ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন, জ্যোৎস্নাস্নাত বৃন্দাবন-বনভূমির এক রমণীয় প্রান্তে মদনমনোহর শ্যামসুন্দর অবস্থিত তাঁহার অমল কমল বিনির্ন্দিত নয়ন যুগল বৃন্দারণ্যের সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে নিবদ্ধ, প্রকৃতিরাণী আজ অতি নিখুঁত ভাবে অঙ্গ সজ্জা করিয়াছেন, কুসুমিত বৃন্দাবনে যেন একমাত্র মাধুর্য্যরসই বিরাজ করিতেছে, সহসা একটা ঝংকার—পরক্ষণেই সমগ্র বিশ্ব স্তব্ধ। আকাশে ধীরে অপসৃয়মান শিতাংশু স্থির, তরুপল্লবে যেন কিসের শিহরণ, সুনীল সলিল কালিন্দীকূলে যেন আনন্দহিল্লোলের ললিত-লহরী, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মোহন মুরলী-বিবরে স্বীয় বিম্ববিনিন্দিত অধর স্থাপন করিয়াছেন, বুঝি রসিকনাগরের সরস অধরস্পর্শে বেণুকন্যা আন্তর আনন্দ প্রকাশ করিতে চাহিতেছে। সুন্দরী গোপনাগরীগণের মনোহর বংশীনিনাদ আচম্বিতে প্রবেশ করিল ব্রজের অন্তঃপুরের অন্তরঙ্গনে, গোপাঙ্গনার অন্তরঙ্গনে সে সুন্দর মধুর মুরলীরব প্রবিষ্ট হইল। আবিষ্ট গোপললনাপুঞ্জ বুঝিলেন এই সংকেতের তাৎপর্য্য, প্রস্তুতির অবসরও তাঁহারা পাইলেন না প্রাণপ্রিয় কান্ত কৃষ্ণের সেই অস্ফুট আহ্বান তাঁহাদিগকে আবিষ্ট করিয়া ফেলিল। প্রিয়-মিলন সম্ভাবনার সমুজ্জ্বল স্বপ্ন বুঝি সার্থকতার দ্বারে করাঘাত করিতেছে তাই গোপবালার দুগ্ধ দোহন কর্ম্ম তদবস্থায় পরিত্যক্ত হইল। রবিবেশনকারিণী গোপরমণীর সে কার্য্য পড়িয়া রহিল, জননীর হৃদয় সর্ব্বস্বরূপে পরিগণিত স্তন্যপানরত অতৃপ্ত শিশুটিকেও পরিত্যাগ করিতে হইল, প্রাকৃত জগতে জীবনের রঙ্গমঞ্চে পতিরূপে পরিকল্পিত ভর্ত্তার শুশ্রূষা পরিত্যক্ত হইল, মোহনমধুর মুরলীরব গোপীগণকে কেবল কৃত্য বিরহিত করিয়া ক্ষান্ত হইল না—দেহ, গেহ, প্রাকৃত জগৎকে বুঝি বিস্মৃত করিয়া দিয়াছে তাই ভোজনরতা গোপললনার ভোজন পরিত্যক্ত হইল, অঙ্গসজ্জায় বিলেপন, প্রমার্জ্জন অঞ্জন-অঙ্কন প্রসাধনরত গোপসুন্দরীগণ সব পরিত্যাগ করিয়া অনতিক্রম্য আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া বৃন্দাবনের আনন্দ নিকেতনের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। সংসারের স্বার্থসজ্ঘাতজনিত কল্পিত সম্পর্কের দাবী লইয়া আত্মীয় স্বজনগণ যে নিষেধবাণী উচ্চারণ করিল তাহা কৃষ্ণাবিষ্টচিত্ত কৃষ্ণঃখ্যালীগোপীগণের কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইলনা, ছোট্ট কর্ণকুহর অপর্য্যাপ্ত মাধুর্য্য রসবর্ষী বেণুনিনাদে ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে সেখানে যে সামান্য স্থানও অবশিষ্ট নাই। ত্বরিত গমনশীলা ললনাগণ শ্যামসুন্দর সেবিত কুন্দ-কদম্ব-কেতকীকুসুম-সুরভিত, কালিন্দী সলিল-সরসিত, সবুজ-মসৃণ, সুন্দর-শষ্প-কেশর-রঞ্জিত, মধু-মাধবী-মালতী-বল্লরী-বিরাজিত, শাল-তাল-তমাল-তরুশোভিত মধুর বৃন্দাবনের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। তখনও মধুর-মুরলী অবিরল সুরসৃষ্টি করিয়া

চলিয়াছে। সুর-সূত্রের আকর্ষণে বিহ্বল বিহগের ন্যায় যেন গোপবালারা 'সুর-নায়কের' নিকটে উপস্থিত হইতে চলিয়াছেন। অদূরেই প্রাণপ্রিয় কান্ত-কমললোচন নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ অবস্থিত, গোপবালাগণের আকুললোচন সেই বংশীবাদনরত শ্যামসুন্দরের শ্রীঅঙ্গে নিবদ্ধ, নব-পল্লব-বিমণ্ডিত, শাখা-প্রশাখা বিশোভিত, বিবিধ-বল্লরী-বলম্বিত মহীরুহের মূলভূমিতে তিনি অবস্থিত রহিয়াছেন। শাখা-পল্লবের ছিদ্রপথে নিশাকরের কররাজি তাঁহার শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করিয়া আপন আনন্দে আত্মহারা হইয়া নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতেছে, মোহনবংশী ধ্বনি স-চকিত তরুণ হরিণ-হরিণী হিরণ্যবর্ণ আপন অঙ্গকান্তি লইয়া সেই সঙ্গীতসুধাপান করিতে শান্তভাবে অবস্থান করিতেছে। নব-নটবর যশোদাকুমার অপরূপ ভঙ্গীতে বংশীবাদন করিতেছেন। মধুর অধরের সব মধু বোধকরি বেণুকন্যা মুরলীই পান করিয়া ফেলিতেছে, বুঝি ঈর্য্যাকুল গোপীকুল গমনকে আরও ত্বরান্বিত করিলেন। শ্যামলরায়ের শ্রীরূপে বুঝি ত্রৈলোক্যলক্ষ্মী বিরাজ করিতেছেন। কৃষ্ণপ্রেয়সী-গণের ঈর্য্যা আরও বাড়িয়া যায়। নবজলধররূপ শ্রীশ্যাম মনোহর, পরিধানে তাঁহার সমুজ্জ্বল পট্টপীতাম্বর, গলদেশে বনমালা, শিরোদেশে কনকময় মুকুট, তদুপরি শিখিপুচ্ছ শোভা পায়। সৌন্দর্য্যের শতচন্দ্র বুঝি শ্রীকৃষ্ণদেহে বিরাজিত, মাধুর্য্য বুঝি মূর্ত্তিমান্। কৃষ্ণপ্রেয়সীগণ আরও নিকটবর্ত্তী হন, প্রাণপ্রিয়ের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে উপনীত হন। সহসা সঙ্গীত সুধায় ছেদ পড়ে—সে বিচ্ছেদের ছেদ পড়ে মধুর সু-পেশল বাক্যসুধাধারাবর্ষণে। রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ স্বভাবসিদ্ধ নায়কের ভঙ্গিমায় কোমল-কণ্ঠে প্রশ্ন করেন ব্যাকুলিত বিহ্বলিত গোপীবৃন্দকে—

'স্বাগতং বো মহাভাগাঃ প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ।
ব্রজস্যানাময়ং কচ্চিদ্ ব্রূতাগমনকারণম্॥

(ভাগবত ১০।২৯।১৮)

যিনি সর্ব্বজ্ঞ, যাঁহার জ্ঞান সদাসর্ব্বদা অবাধিত, উপনিষৎ এই মহাসত্য প্রকাশ করিতে যাইয়া উদাত্ত গম্ভীর স্বরে যাঁহার স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

'যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ যঃ সর্ব্ববিদ্ যস্যৈষ মহিমা ভুবি'

যিনি 'সর্ব্বজ্ঞ' অর্থাৎ সাধারণভাবে সর্ব্ববিষয়ে যাঁহার জ্ঞান রহিয়াছে, যিনি বিশেষভাবে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভূত-ভৌতিক নিখিল প্রাণিগণচয় সম্পর্কে অভ্রান্তদ্রষ্টা, যাঁহাকে ভক্তগণ "ভগবান্" এই আখ্যায় অখ্যায়িত করিয়া, ভক্তিরূপ সাধন সম্বল করিয়া তাঁহার উপাসনায় আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন—এহেন চিরারাধিত-প্রত্যয় শ্রীকৃষ্ণ অচির-ভবিতব্য ললিতলীলারঙ্গ মাধুর্য্য সূচনায় ভক্ত-মনোরঞ্জন-মানসে নিজেকে "অজ্ঞ"রূপে প্রকাশ করিতেছেন। তিনি প্রশ্ন করিতেছেন—হে গোপাঙ্গনাগণ! ব্রজভূমির কল্যাণ তো? তোমাদের কি প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিব? অহো ভক্ত-বশ্যতা। অন্য লীলায় তিনি নিজের ঐশ্বর্য্যকে এইভাবে লুক্কায়িত করেন নাই, ভক্ত ভগবৎকৈঙ্কর্য্য প্রার্থনা করিত, ইনি এক পৃথক ভগবান্—ইনি ভক্তকৈঙ্কর্য্য কামনা করিতে-ছেন, কি করিতে হইবে জানিতে চাহিতেছেন। চতুর-চূড়ামণি রসিকনাগর বৃন্দাবন-ধন নন্দকুমার এবার এক অভিনবরূপে প্রকাশিত হইলেন, শিক্ষকের গাম্ভীর্য্য ও অভি-ভাবকের আকুলতা লইয়া মিলন লালায়িত গোপবালাগণের প্রতি উপদেশ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। বলিলেন ঘোরা রজনী, তাহাতে শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যভ্রমণ রমণীগণের পক্ষে কোনক্রমেই সমীচীন হইতে পারেনা। শ্যামলকিশোর যেন গাম্ভীর্য্যের বৃথা আবরণে কৈশোর্য্যের কমনীয়তাকে আবৃত করিতে চাহিলেছেন। বলিলেন—তোমরা আপন অঙ্গনে প্রতীক্ষারত পরিবার পরিজনের মধ্যে ফিরিয়া যাও, বলিলেন সুন্দর শশাঙ্ক কররঞ্জিত কুসুমিত বৃন্দাবনের শোভা সৌন্দর্য্য পরিদৃষ্ট হইয়াছে—এখন গৃহে প্রতিগমন কর। বলিলেন—আমার প্রতি স্বভাব-সিদ্ধস্নেহ সম্পর্ক স্মরণ করিয়াই তোমরা এইভাবে এইস্থানে উপনীত হইয়াছ—বেশ, আমার সন্দর্শন হইল—এখন গৃহে গমনপূর্ব্বক আবশ্যকীয় কর্ত্তব্যসমূহ পরিপালন করিয়া স্বধর্ম্ম রক্ষা কর। এই নবীন অভিনব শিক্ষকটী প্রাজ্ঞোচিত প্রশান্তি সহকারে জানাইলেন—স্ত্রীলোকের পতিশুশ্রূষাই পরমধর্ম্ম সুতরাং "প্রতিযাত ততোগৃহান্"। এদিকে নিশীথের বৃন্দাবন নিঃস্তব্ধ তরুপল্লব নিস্পন্দ, স্বর্ণকান্তি সুন্দরী রমণীনিচয় নির্ব্বাক তাঁহাদের গণ্ড বহিয়া কেবল অজস্র অশ্রুর ধারা। অভিমানাহত প্রত্যাখ্যাত গোপীবৃন্দ নীরবে চরণাঙ্গুষ্ঠাগ্র ভাগ দ্বারা ভূ-বিলেখনরত—বুঝি মাধবের এই প্রত্যাখ্যানে মাধবীর গর্ভগৃহে যাইয়া এই বিড়ম্বনার কবল হইতে মুক্ত হইতে চাহেন অর্দ্ধ-অবনত বদন কিঞ্চিদুন্নত হইল. অশ্রু-

প্লাবিত লোচন প্রমার্জিত হইল; প্রাণপ্রিয়ের এই অপ্রত্যাশিত অপ্রিয় কঠোর বচনে বিচলিত হৃদয় সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল, নীরব কণ্ঠ সরব হইল—

"কিঞ্চিৎ সংরম্ভ গদ্‌গদগিরোঽব্রুবতানুরক্তাঃ"

গোপীবৃন্দ সমুচিত উত্তর দিলেন। দেহ-গেহ-ধর্ম্ম পরিত্যাগী আত্মসমর্পণ ভূমিকার শেষসোপানে উপনীত গোপীবৃন্দ সুচতুর শ্যামসুন্দরের চাতুর্য্যে বিমূঢ় হইলেন না।

তাঁহাদের নিষ্ঠার নিকট—প্রাকৃত নিয়ম, বিধি-বিধান অকিঞ্চিৎকররূপে পরিগণিত হইল। নিখিল বিশ্ব-প্রপঞ্চের শরণ্য, বিবুধ-গণবরেণ্য পরমপুরুষের শ্রীচরণ প্রান্তে স্ব-স্ব ভাবানুরূপ আত্মসমর্পণ জুগুপ্সিত নহে, ইহাই প্রমাণিত হইল, অনাথশরণ আর্ত্তবন্ধু প্রিয় কৃষ্ণের কৃপা হইল। যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ, জগন্মধ্যে গোপীপ্রেমের বিশুদ্ধতা বিকাশ করিবার অভিপ্রায়েই এই চাতুর্য্য-পরম্পরার প্রকাশ করিয়াছেন, অনুরক্ত গোপীজনসর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়া প্রত্যাখ্যাত হইলেও বিশুদ্ধ স্নেহ-শ্রদ্ধা সম্ভ্রম প্রীতি নীতিমতে প্রতিনিবৃত্ত হন নাই—এই অনুপম অনুরাগের প্রচারের অভিপ্রায়েই বুঝি এই বাক্-চাতুরী। কৃষ্ণ-পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ গোপবালাগণ অতঃপর স্ববাসনা চরিতার্থ করিবার আশ্বাস পাইলেন সুতরাং

ইতি বিক্লবিতংতাসাং শ্রুত্বা যোগেশ্বরেশ্বরঃ।
প্রহস্য সদয়ং গোপীরাত্মারামোঽপ্যরীরমৎ।

(১০।২৯।৪২)

প্রেয়সী গোপরমণী নিচয়ের বাহুবন্ধনে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শোভমান, যিনি অবাঙ্মনসগোচর, শ্রুতি যাঁহাকে "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তেঽপ্রাপ্য মনসা সহ"—প্রভৃতি দুরূহজ্ঞাপক বাক্যদ্বারা দূর হইতে সশ্রদ্ধ প্রণতি জ্ঞাপন করিয়াছে তিনি শ্রীকৃষ্ণ অভিনব লীলাবিলাস বিকাশচ্ছলে গোপাঙ্গনাকরবদ্ধ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসাগরে নিমজ্জিত গোপললনাগণ আপন সৌভাগ্য চিন্তায় বুঝি কিছু গর্ব্বিত, সৌন্দর্য্য সূর্য্য শ্রীশ্যাম তাঁহাদের করায়ত্ত ভাবিয়া বুঝি কিছু মান মদিরা মত্ততার অভ্যুদয়। লক্ষ্মীনিবাসের গোপীবল্লভ-রূপ দেখিয়া বুঝিবা গোপললনাগণের মনোমধ্যে সৌভাগ্য মদের অভ্যুদয় হইয়াছে! অনুগৃহীত অনুরক্ত জনের কল্যাণকারী প্রেমের ঠাকুর দয়ালু দেবতা শ্রীকৃষ্ণ কিছু নৈষ্ঠুর্য্যের আবরণে শিক্ষা দিলেন—

তাসাং তৎ সৌভগমদং বীক্ষ্য মানং চ কেশবঃ।
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত॥

(১০।২৯।৪৮)

সহসা প্রেমের অগাধ সাগর পরিশুষ্ক হইয়া গেল, সৌভাগ্য-সূর্য্য অস্তাচলের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াছে বৃন্দাবন ধন করুণাকেতন সৌন্দর্য্য সুধাধাম শ্যামসুন্দর অন্তর্হিত হইয়াছেন, যাঁহার রূপসাগরে গোপললনারা আত্মবিসর্জ্জন দিয়াছিলেন তিনি সহসা কোন অজানা রাজ্যে আত্মগোপন করিয়াছেন। অতৃপ্ত-হৃদয় গোপীগণ যেন অনুভব করিলেন বৃন্দাবনের মাধুর্য্য বিলুপ্ত, সমগ্র জগতে যেন সীমাহীন শূন্যতা বিরাজ করিতেছে, আকুলঅন্তর গোপীগণ বৃন্দাবনের প্রতিস্থানে নীলমণির অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইলেন মদনমোহনের মোহনভঙ্গিমা, তাঁহার গতি প্রীতি রতি, হাস্য, লাস্য, বদন বচন, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সুষমা, স্মরণ করিয়া গোপীকুল আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। কুঞ্জে কুঞ্জে অনুসন্ধান-রত গোপীগণ মঞ্জু মাধবী মালতীকে প্রশ্ন করেন দয়িতের কথা, মৃদু গুঞ্জনশীল ভ্রমরপুঞ্জকে জিজ্ঞাসা করেন প্রাণপ্রিয়ের বার্ত্তা। বিরহব্যাকুল ললনাকুল বিরহ বেদনার চরমতম সীমায় উপনীত, তাঁহারা কৃষ্ণভাবনায়, কৃষ্ণস্মরণে, কৃষ্ণমননে কৃষ্ণকথনে তাদাত্ম্যলাভ করিলেন, যাহার পরিণতি বিবিধ কৃষ্ণলীলার নিপুণ অনুকৃতিতে প্রকাশ পাইল—"

"লীলা ভগবত স্তা স্তা হ্যনুচক্রু স্তদাত্মকাঃ।

অনুসন্ধানরত গোপীবৃন্দ বিস্ময়-বিমিশ্র অন্তরে সহসা প্রেমাস্পদের চরণচিহ্ন আবিষ্কার করিলেন, ততোধিক বিস্ময় বিমিশ্র নয়নে আবিষ্কার করিলেন কৃষ্ণপ্রিয়-তমার চরণ চিহ্ন, তাঁহাদের হৃদয়সর্ব্বস্ব এইভাবে প্রেয়সী-সহ অন্তর্দ্ধান করায় তাঁহাদের বেদনা বর্দ্ধিত হইল, ব্যাকুলিত, বিরহিত গোপবালাগণ আরও অগ্রসর হইলেন; নিপুণ নয়নে নিরীক্ষণ করিলেন, অনুভব করিলেন, সেই কৃষ্ণ-প্রেয়সীর সৌভাগ্যের বিষয়। কান্তকৃষ্ণদর্শন লালায়িত গোপীকুল সহসা সেই চিহ্নিত কৃষ্ণপ্রেয়সীর সন্দর্শন করিলেন, চক্ষু তাঁহার উদ্‌ভ্রান্ত, হৃদয় বিদীর্ণ, প্রিয়তম তাঁহাকেও পরিত্যাগ করিয়াছেন, সৌন্দর্য্যমদিরার মত্ততায় তিনি কান্তকৃষ্ণের স্কন্ধে আরোহণের অভিলাষ করিয়া ছিলেন—এই মান-মদিরার প্রায়শ্চিত্ত তাই বিরহের তপ্ত অনলে। পরিচিতা সখী আপন সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের

কথা জানাইল। বিরহতপ্ত গোপললনাগণ কালিন্দীকূলে আসিলেন, সমবেতভাবে দয়িতের আবাহন-গীতি গাহিলেন, অন্তরের সঞ্চিত শোক তাঁহাদিগকে ব্যথাতুর করিয়াছিল। বিবর্ণবদন, বিশীর্ণহৃদয় গোপীবৃন্দের কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া গেল, হৃদয়-বেদনা অব্যক্তস্বরে ক্রন্দনের রূপ লইল। যমুনার পুলিনে বিরহিত গোপীকুল কান্ত-কৃষ্ণের সন্দর্শন মানসে ক্রন্দনাকুল। বুঝি এই অশ্রুনদীর বন্যার মধ্য হইতেই প্রিয় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাব। অশ্রুস্নাত প্রেমপুণ্ডরীক সহসা প্রিয়পতি সূর্য্যের করস্পর্শে প্রস্ফুটিত হইল। প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ যেমন আচম্বিতে অন্তর্হিত হইয়া ছিলেন, ঠিক তেমনই সহসা সমুদিত হইলেন। অশ্রুপ্লাবিত লোচনে গোপীবৃন্দ প্রত্যক্ষ করিলেন, বনমালী, রাস-রস-বিহারী নটবর শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্র তাঁহাদের সম্মুখে বিরাজিত।

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মান-মুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ-স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ॥ (১০।৩২।২)

এই শ্লোকের সাক্ষান্মন্মথঃ এই বিশেষ বিশেষণটীর তাৎপর্য্য সু-গভীর, টীকাকার শ্রীধরস্বামিপাদ বিশেষরূপে ইহার আলোচনা করিয়াছেন। মূলতঃ যিনি মন্মথের হৃদয়েও মন্মথ-বিকার সৃষ্টি করিতে সমর্থ তিনি কখনও মন্মথ-বিকারে বিকারী নহেন। রাসলীলা মান্মথী লীলা নহে। নিষ্প্রাণ দেহপিঞ্জরে সহসা বুঝি প্রাণ-সঞ্চার হইয়াছে, সহসা প্রিয়তমের সন্দর্শনে প্রীত্যুৎফুল্ললোচন গোপীগণ—"উত্তস্থুর্যুগপৎ সর্ব্বাস্তন্বঃ প্রাণমিবাগতম্"॥ বিরহ বিভীষি-কার অবসান হইয়াছে, হৃদয়-সর্ব্বস্ব শ্যামসুন্দর লোচনসমক্ষে সমুদিত, সুতরাং প্রেমাস্পদের মধুর সান্নিধ্যে, গোপীগণ ভাবের তারতম্য ও বৈচিত্র্য অনুসারে বিবিধ প্রকারে হৃদয়ের ভাব অভিব্যক্ত করিতেছেন। কোন অধীরা কমল-লোচন শ্রীকৃষ্ণের করকমল স্বীয় কোমলকরে স্থাপন করিলেন। কোন মধুরা মুগ্ধ বিস্ময়ে মাধবের মুখারবিন্দ সন্দর্শনে বিমূঢ়'র ন্যায় অবস্থান করিতেছেন—বুঝি বিরহিত নয়নযুগল প্রিয়রূপামৃত পান করিতেছে। এইভাবে প্রেমের প্রাথমিক প্রাগল্ভ্য অতিক্রান্ত হইল, যোগিগণের শুদ্ধ-হৃদয়ে যাঁহার আসন কল্পিত হয় তিনি গোপীজন কল্পিত উত্তরীয়াসনে সমুপবিষ্ট হইলেন। অনুরাগী গোপীগণ কৌশল সহকারে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সহসা ললনাকুলকে ব্যাকুল করিয়া অন্তর্দ্ধান রহস্যের কারণ জানিবার জন্য ব্যগ্রতাপ্রকাশ করিলেন। কুশলী প্রবক্তার ন্যায় শ্রীশ্যামসুন্দর গোপীপ্রশ্নে সমুচিত উত্তর দিলেন। ভক্তবাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন-পূর্ব্বক বলিলেন—তোমরা যেভাবে আমার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছ তাহার প্রতিদান দিবার সামর্থ্য আমার নাই, তোমরা সৌজন্য ও সাধুভাবশে আমাকে এই প্রেমের ঋণ হইতে মুক্ত করিবে। বৃন্দাবনবনবিহারী বনমালী লীলা করিতে যাইয়া আপন ভগবত্তাকেও ভক্তের নিকট সমর্পণ করিতেছেন।

ভক্ত যেমন হৃদয়-সর্ব্বস্বের পাদমূলে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার চরণ সান্নিধ্যলাভ করিয়া কৃতার্থ হয়, ভক্তাধীন ভগবান্‌ও ভক্তের শুদ্ধ প্রেমের মন্দিরে আপন ঐশ্বর্য্যকে সঙ্কুচিত করিয়া কেবল মাধুর্য্যময়রূপ লইয়া উপস্থিত হন। এই ষোড়শ সহস্র গোপীগণে পরিবৃত রাসবিহারী মহারাসের সূচনা করিলেন, যেন পরমেশ্বর প্রকৃতিপুঞ্জ লইয়া নবতম লীলায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। ষোড়শ সহস্র গোপবালা মণ্ডলাকারে রহিয়াছে—মধ্যে নবীন নটবরবপু শ্যামমনোহর মুরলীধর মোহনমুরলীতে মধুর ঝংকার তুলিলেন, সে সুরের ললিতলহরী দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িল, বৃন্দাবনের আকাশমণ্ডল শত শত দিব্যবিমান-মণ্ডিত হইয়া নব শোভায় শোভিত হইয়া উঠিল। দেব-গন্ধর্ব্ব-কিন্নর সিদ্ধ-চারণ, মুনি-ঋষি, স্বর্গকন্যা অপ্সরাগণ সকলেই সমবেত হইলেন। নন্দনন্দনের বেণুসঙ্গীতের ইঙ্গিতে সুন্দরী গোপ-কন্যাগণের চরণ নূপুর নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল, সেই ভাগবত তৌর্য্যত্রিক সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে নূতন শিহরণ জাগাইল, বন্য পশু পক্ষী চঞ্চল হইয়া উঠিল, লীলাসন্দর্শনে সমাগত বৈমানিকগণের রমণীবৃন্দ মদনমূর্চ্ছায় বিমূঢ় হইয়া গেলেন। মণ্ডলাকারে রাসলীলা আরম্ভ হইয়াছে, অচিন্ত্যৈশ্বর্য্য শ্রীভগবান্ আপন অপ্রমেয় মাধুর্য্য-বিকাশের জন্য ষোড়শ সহস্র গোপীর প্রতিটীর বাহুবন্ধনে নিবদ্ধ থাকিলেন, ভাগবতীশক্তি যোগমায়া প্রভাবে এককৃষ্ণ ষোড়শ সহস্র গোপরমণীর দয়িতরূপে যুগপৎ প্রকাশিত হইয়া তাঁহাদের চির আকাঙ্ক্ষা কামনার পরিপূরণ করি-লেন। মাধবকে তাঁহারা মধুরভাবেই চাহিয়া ছিলেন—সেই প্রার্থনা পরিপূরণ করিতে জগদীশ্বর অপরূপ রাসলীলার অবতারণা করিলেন, রাসপূর্ণিমা মধুর লীলার সূচনা মাত্র। অব্যয়, অক্ষয় নির্ব্বিকার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের রাস-ক্রীড়ার উপ-

সংহার প্রসঙ্গে ঋষি বলিয়াছেন—"সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধ-সৌরতঃ" ১০।৩৩।২১

ষোড়শ সহস্র গোপাঙ্গনার বাহুবন্ধনে নিবদ্ধ থাকিয়াও তিনি বিকার-বিহীন। তাঁহার হৃদয়ে কামের লেশমাত্র নাই, রাসলীলার অন্তিম শ্লোকে আছে—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতিপ্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥

ব্রজরমণীবৃন্দের সহিত শ্রীভগবানের এই রাসলীলা যিনি শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ ও বর্ণন করিবেন তিনি অচিরেই শ্রীভগবানে পরাভক্তি লাভ করিয়া সত্বর হৃদ্রোগরূপে কামের করাল কবল হইতে মুক্তিলাভ করিবেন। এই শ্লোকের শেষে 'ধীর' এই পদটী ব্যবহৃত হইয়াছে, অর্থাৎ যিনি ধৈর্য্য-সম্পন্ন বিবেকী জিতেন্দ্রিয় তিনিই রাস-রসাস্বাদনে সম্যক্‌রূপে সমর্থ। ভাগবতী লীলা ভক্তজনের প্রতি অনু[গ্রহ] প্রকাশের জন্যই হইয়া থাকে, তাই এই 'রাসপঞ্চাধ্যায়[ীর]' অন্ত্যভাগে আছে—

অনুগ্রহায়ভূতানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥
(১০।৩৩।[৩৬])

প্রাণী-নিচয়ের প্রতি স্বীয় অনুপম অনুগ্রহ প্রকাশ করি[বার] জন্য শ্রীভগবান্ মানুষদেহ ধারণ পূর্বক তাদৃশ লীলাবি[লাস] করিয়া থাকেন যাহা শ্রবণ ও স্মরণ করিয়া অনুগৃহীত ভ[ক্ত]গণ তাঁহার চরণ-চিন্তনে তৎপর হইবেন।

পরিশেষে রাস বিহারীর শ্রীচরণপ্রান্তে কোটী কো[টী] প্রণাম-পরম্পরা নিবেদন করি, প্রার্থনা করি—

রাসেশ্বর! রসাসার-রাস-মণ্ডল-মণ্ডন।
রমতাং হৃদয়ে নাথ! ত্বমেব শরণং মম॥

স্পষ্ট কথা

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ সান্যাল

একটি কথা আজকে আমি যাচ্ছি ব'লে হৃষীকেশ,
সাহেবী ঐ পোষাকটিতে তোমায় কিন্তু মানায় বেশ।
কেবল আমার একটি দুঃখ—
তুমি যে ভাই, আস্ত মুক্ষু;—
নইলে তোমায় বুঝলে কিনা, চিন্‌তো গোটা বাংলাদেশ!
তোমার মতো এ সংসারে কাহার আছে মামার জোর!
পকেট মেরে কাটিয়ে জীবন—এখন হ'লে সিঁদেল চোর!
হায়রে কপাল, ছিলে কশাই,—
সেজেছ আজ গুরুমশাই!—
চক্ষে তোমার লেগেই আছে অহঙ্কারের ভাঙের ঘোর।
একটি লাইন লিখতে গেলে কয়টি কলম ভাঙতে হয়?—
বিদ্যেবুদ্ধির সাথে তোমার আছে সবার পরিচয়!
যতোই সাহেব হ'য়ে থাকো—
ইংরেজীটা শিখলে নাকো;—
বাংলা ভাষার 'বোধোদয়ে' হয়নি তোমার বোধোদয়!

ক'রলে নাকো লেখাপড়া—বুঝবে কি ভাই, মর্ম তার!
টাকার দেমাক্?—লক্ষপতি অনেক আছে চর্মকার!
নর্দমাতে তোমার মতো
খুঁজলে পাবে মানুষ কতো;—
জন্ম-ইতর—কেমন ক'রে জানবে ভদ্র ব্যবহার!
জানি—বি, এ, এম্,-এর উপর চিরটাকাল তোমার রোষ
টিট্‌কারি দাও অধ্যাপকে—খোঁজো তাহার হাজার দোষ
সকল পেশার শ্রেষ্ঠ যাহা,
তোমার কাছে ঘৃণ্য তাহা;—
কমল-মধুর মর্ম কিসে জানবে তুমি বুনো মোষ
"কাব্যটাব্য বুঝিনাকো"!—ভাবছো সেটা মহৎ গুণ?—
ফুলের কুঞ্জ কোথায় তাহার ঠিকানা কি পায় শকুন?
হায় পোড়াকাঠ, তোমার লেগে
লিখবে না কেউ রাত্রি জেগে!—
স্পষ্ট কথা শুনে কেন মুখটি এখন করছো চুপ?

এগারো

সোফিয়া: একটা প্রশ্ন করব দাদা?"

অসিত: কী?

সোফিয়া: শমিতা চাপা মেয়ে হ'য়েও হঠাৎ একলা এল কেন আপনার কাছে?

বার্বারা: এ তোমার অন্যায় প্রশ্ন দিদি। দাদাকে এভাবে জেরা করা ঠিক নয়।

অসিত: না না। জেরার প্রশ্নই উঠেনা, এ নিয়ে কোনো কথাও ওঠে নি বাসন্তীপুরে। আমি এরপরে বেশি দিন ছিলামও না সেখানে। তবে শমিতা কেন এসেছিল সেদিন তার ব্যাখ্যা মিলবে গল্পটা আর একটু এগুলেই। তাই শোনো।

একটু থেমে অসিত সুরু করল:

শমিতাকে কথা না দিয়ে আমার উপায় ছিল না সেদিন। মানুষ এমন পাকে পড়ে—যখন তাকে দিয়ে নানা শক্তি অনেক কিছুই করিয়ে নেয় যা সে স্বপ্নেও ভাবে নি। তাই ঠিক যেমন শমিতাও ভাবে নি কোনো দিন যে, সে আমার কাছে গান শিখতে চাইবে, তেম্নি আমিও ভাবিনি পীতবাস থাকতে আমি তাকে গান শেখাবার ভার নেব। সবার ওপর, দশচক্রে প'ড়ে প্রস্থান করার মুখেই পড়লাম আমি আটক। একেও যদি অভাবনীয় না বলি তবে অভাবনীয় আর কার নাম?

কিন্তু যতই মনকে বোঝাই শমিতার সাম্নে যা মনে হয়েছিল নির্দোষ, ও চ'লে যাওয়ার পরেই মনে হ'তে লাগল anything but safe: যেদিকে চাই—রেড সিগন্যাল।

কিন্তু তবু শমিতার একটা কথা আমার মনকে কেবলই ধমকাতে থাকে: পালিয়ে আত্মরক্ষা করার মধ্যে আর যাই থাকুক না কেন, পৌরুষ নেই।

পরদিন গিয়ে ফের সাধুজিকে সব কথা খোলাখুলি ব'লে শেষে বললাম এ-অভিমানের কথাও—পৌরুষের অভিমান।

শুনে তিনি খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন: "এখানে আমার কিছু বলা সাজেনা বাবা। কারণ শমিতা বা তুমি আমাকে হাজার ভক্তি করোনা কেন, প্রতি মানুষের জীবনে সংসারে এমন সময় আসেই আসে যখন ভক্তিভাজনের কথাও অলংঘ্য মনে হয় না। তোমাদের এ ঘোরালো অবস্থাটা খানিকটা সেই জাতের। তাই আমি কোনো মন্তব্যই করব না। তাছাড়া একথা আমি কোনোদিনই মনে করি নি যে, আমি অভ্রান্ত তত্ত্ব-দর্শী। তাই বলব কেমন ক'রে—কিসে কী হয়? শুধু একটি কথা আমি বলতে চাই: যে, শমিতাকে যদি গান শেখাতেই চাও—একলা শিখিয়োনা, আমার সাম্নে শিখিও, আর শেখাবার সময় সকালবেলা হ'লেই ভালো হয়।

আমি হেসে বললাম: "আপনার কথার ভঙ্গিতে বিশেষ

ভরসা না পেলেও আমি মেনে নিতে রাজী ষোলো আনা। যদি বলেন—রাণীসাহেবাকে গান শুনিয়েই এখান থেকে প্রস্থান করব—এমন কি তার আগেও পাততাড়ি গুটোতে পারি যদি আপনি নিজে দায়িত্ব নেবেন কথা দেন।”

সাধুজি হো হো ক'রে হেসে উঠলেন: “আমি? আমি কে বাবা? আমি নিজের দায়িত্ব নিয়েই টাল সামলাতে পারি না—তা অ...ার রাজবাড়ীর আবহাওয়ায় গড়ে ওঠা মন্ত্রীবাগার তথা রাজরাণীর মন রাখার দায়িত্ব। তবে আমারও মনে হয় একটা কথা: যে, রাণীসাহেবাকে গান শোনানো তোমার কর্তব্য। কারণ তুমি আমার কাছে গান শেখার জন্যেও ঋণী ওঁর কাছে—অন্ততঃ খানিকটা—কেন না তিনিই তোমাকে তাঁর নিজের বাংলোয় থাকতে দিয়েছেন। কিছু পেলে কিছু দিতেই হয়—এ সংসারের এমন একটি নৈতিক বিধান যার মার নেই। তাই এখন তো তুমি থাকো কিছুদিন—অন্ততঃ যত দিন রাণীসাহেবাকে গান শোনানো না হয়। তারপর কী করবে না করবে সেটা না হয় সকলে মিলে ঠিক করা যাবে। কী বলো বাবা?”

আমি বললাম হেসে: “কিন্তু সাধুজি, সেদিন যে বললেন—প্রেয় ছেড়ে শ্রেয়কে বরণ করাই ভালো?

সাধুজি হাসলেন, বললেন: “ভালো তো অনেক কিছুই বাবা, কিন্তু এক পরিবেশে যা ভালো, পরিবেশ বদলালে যে তা মন্দ হ'য়ে দাঁড়ায় এ তুমি নিশ্চয়ই দেখেছ বহুবার নয় কি? তাছাড়া রাজাসাহেব একটি কথা বলেন আমার মন নিয়েছে: I am not my brother's keeper; আমি জুড়ে দিতে চাই সিস্টর বা ডটারের কাঁপারও নই আমি।”

“শিষ্যার?”

“শিষ্যা আমার নেই। আমার কেবল একটি স্নেহের পাত্রী আছে—তুমি জানো: শমিতা। তবে রাজাসাহেব ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন—সেই আমার শিষ্যা হবে যদি তাকে মনের মতন ক'রে গ'ড়ে নিতে পারি।”

“রাজা সাহেব এখন কোথায় জানেন কি?”

“কাল চিঠি পেয়েছি তিনি জার্মানীতে সেই সেণ্ট থেরেসার কাছে, যাঁর নাম তুমি শুনেছ নিশ্চয়ই। তোমার কথা রাজাসাহেবকে লিখেছিলাম। তিনি উত্তরে লিখেছেন—রাণীসাহেবাও লিখেছেন তোমার গা... কথা। আরো লিখেছেন তোমাকে ধ'রে রাখতে—তি... না ফেরা পর্যন্ত। কিন্তু তাঁর ফিরতে এখনো দু মাস... ততদিন তুমি এখানে টিকতে পারবে কি না কে জানে?”

ব'লেই গান ধরলেন:

“এগিয়ে চলার ডাক নয় মন, পেছিয়ে আসার এলো পা...
যা শিখেছিস ভুলতে হবে, ভুল শেখা যে কাঁটার মালা।

“কিন্তু একথা তুমি হাড়ে হাড়েই জানো, তাই তোম... জন্যে আমি ভয় করি না: ভয় পাই কেবল একজনে... জন্যে। কিন্তু আবার ভাবি—” ব'লেই ফের সুর করে:

“কোন্ পথে কোন্ সুরের ডাকে চলতে হবে—
জানে সে কে?—
মন্ত্র তোমার অন্তরে যে নিত্য জপে গোপন থেকে।

“এই কথাটি যেদিন বুঝব বাবা, সেদিন আর আব... কিছুই থাকবে না। কিন্তু সেদিন আমারও আসে... তোমারও না। তাই তুমিও চলো আমিও চলি—ওরা চলুক যে যে সুরের ডাক শুনেছে সেই পথে। শে... মিলবই তো এক জায়গায় গিয়ে। আর...আর সবচে... বড় কথা এই যে, ভয় তার নাগাল পায় না যে ... করে না।

বারো

সাধুজি সেদিন অন্য সুর গাইলেন ব'লে একটু ভর... পেলাম বটে, কিন্তু মনের অস্বস্তি পুরো কাটল না বাসায় ফিরতেই টেলিফোন করলেন মাসিমা নিজে রাত্রে ওখানেই থেকে হবে মূর্ছনার জন্মদিন।

মনটা খুশী হল। কারণ শমিতার সঙ্গে ওর ক্রমাগ... সংঘর্ষের আঁচ আমাকে লাগত ব'লে সত্যিই চাইতা... ওর সঙ্গে একটা মিটমাট হয়। কিন্তু কে না জানে... আমরা যা চাই বেশি ক'রে তাই যায় ফ'স্কে!

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় মন্ত্রীভবনে পৌঁছে দেখি সাধুজি ঈষৎ ভাবাবস্থা। কোনো কোনো দিন ওঁর এ-অব... হ'লে উনি গান গাইতে পারতেন না—সুরের কো... একটা আরাম কেদারায় গা এলিয়ে চুপ ক'রে ব'... থাকতেন—আধা-জাগা, আধা-ধ্যানস্থ।

আমি পৌঁছতেই মূর্ছনা হাসিমুখে “এসো অসি... ব'লে এক পেয়ালা কফি ঢেলে দিল। মনটা আম...

ভরসা পেল বৈ কি। সংকটতারণকে মনে মনে ধন্যবাদ দিলাম।

ওর জন্যে আমি একটি বই নিয়ে গিয়েছিলাম উপহার। অতুলপ্রসাদের গীতিগুচ্ছ। ও অতুলপ্রসাদের গান সত্যিই ভালোবাসত—বিশেষ করে তাঁর প্রেমের গান ও বাউল সুরের "অতুলন ভঙ্গি"।

সেদিনও আমাকে বলল তাঁর একটি বাউল গান গাইতে। আমি গাইলাম :

আমায় রাখতে যদি আপন ঘরে
বিশ্বঘরে পেতাম না ঠাঁই,
স্বজন যদি হ'ত আপন
হ'ত না মোর আপন সবাই।

গাইতে গাইতে শেষের দিকে মনের মধ্যে নেমে এল এক আশ্চর্য পট-পরিবর্তন—যা গানের ইন্দ্রজালে প্রায়ই ঘটে দেখেছি : যেখানে ছিল ছায়া—হ'য়ে এল আলো। মনের যত জমাট বেদনা স্বচ্ছ হ'য়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে চোখে ফুটে উঠল এক অপরূপ আলো, জগতের সব কালো যেন ধুয়ে মুছে ভেসে গেল।

গান গাইতে গাইতে আবেশ কার না আসে? কিন্তু বাসন্তীপুরে গানের সময় এতটা ভাবাবেশ আমার হয় নি কখনো এর আগে। এক আশ্চর্য আলোয় দেখলাম—এক ব্যাপ্ত সৌন্দর্যের রাজ্যে আমার মন যেন পাখা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে—যার কোথাও কোনো সীমান্ত নেই।...

এমন সময়ে হঠাৎ কাঁধে ঠেকল একটি সস্নেহ স্পর্শ। চোখ চাইতেই দেখি মাসিমা পাশে দাঁড়িয়ে—আর সামনে রূপার থালায় যা যা থাকা উচিত সবই অপর্যাপ্ত পরিমাণে সাজানো।

আমি হেসে বললাম : "এত খাবে কে মাসিমা? আমি কি রাক্ষস?"

"এত কোথায় বাবা! খাও। তুমি ইকমিক কুকারের খাবার খাও এটা আমার ভালো লাগে না। কুকারের খাও। প্রায় উপোষেরই সামিল—নৈলে কি এত রোগা হ'য়ে যেতে? তোমার বাড়ীর লোক যদি দেখত—"

"আমার আবার বাড়ী কোথায় মাসিমা? এতক্ষণ কী শুনলেন তবে গান?"

মাসিমা কি বলতে গিয়ে চুপ ক'রে গেলেন, বাঁচালো তখন শমিতা, বলল : "মানে তোমার ছেলে বলতে চাইছেন যে ওঁর বসুধৈব কুটুম্বকম্—এটুকু আর বুঝতে পারলে না মা?"

মাসিমার চোখে জল ফের চিক্ চিক্ করে উঠল, কিন্তু সাম্‌লে নিয়ে বললেন : "পেরেছি রে মেয়ে, পেরেছি—তোর আর অত ব্যাখ্যান করতে হবে না, থাম্। ওর যেটা আসল পরিচয় সেটা ওর গানে কবিতায়ই পেয়েছি আমি—আর তোদের অনেক আগে।"

মূর্ছনা বলল : "ওস্তাদজি মিথ্যে বলেন না মা—ওর মাথাটি চিবিয়ে খেলে তুমিই আদর দিয়ে দিয়ে।"

"তুই থাম তো পোড়ামুখী!" ধমক দিয়েই মাসিমা আমার দিকে চেয়ে বললেন হাসিমুখে : "ও মেয়ের কথা ধোরো না বাবা। ও বড় সেয়ানা। তাই যা মনে জানে, বলবে ঠিক তার উল্টোটা।"

শমিতা বলল : "কী জানে শুনি?"

মাসিমা বললেন : "কী জানে? জানে সংসারে উদাসীর স্নেহের মূল্য কত। মুখে ও পোড়ামুখী বলবে ও হ'ল মেম সাহেব—কিন্তু বলো দেখি ওকে—" অদূরে ধ্যানস্থ পীতবাসকে দেখিয়ে—"ঐ ঠাকুরটির পায়ে একটু কম গড় করতে, অম্‌নি দেখবে—ফোঁশ্—মেয়ে ধরেছেন নিজমূর্তি।" ব'লে একটু হেসে : "বাবা! আমরা মেয়ে মানুষ ব'লেই যে কিছু বুঝি না—ভেবো না। নীড়ে পাখি ঘুমোতে পারে তো শুধু এই জন্যেই সেখানেও আকাশের ডাক পৌঁছয়। তবু কি জানো বাবা, নীড়টা তার নিজের হাতে গড়া কিনা, তাই তার মায়া যেন কেটেও কাটতে চায় না।"

সন্ধ্যাটা অনাবিল আনন্দে কেটে গেল আরো এই জন্যে যে, খাওয়া দাওয়ার পরে সাধুজি বিভোর হ'য়ে গাইলেন গানের পর গান। মূর্ছনা তো আনন্দে অধীর। শেষে শমিতার কণ্ঠ বেষ্টন ক'রে আমার কাছে ধ'রে এনে বলল : "একে গান শেখাবে কবে? মনে রেখো কথা দিয়েছ।"

আশ্চর্য! জ্বালার লেশও নেই তো আর! মনে হ'ল মেঘ কেটে গেছে—passig cloud!

শেষে উঠব উঠব করছি এমন সময়ে পাশের ঘরে টেলিফোন এল রাজবাড়ী থেকে। মাসিমা উঠে গেলেন। মিনিট কয়েক বাদে ফিরে এসে বললেন : "রাণীসাহেবার

সুরোধ—তুমি পরশু সন্ধ্যায় তাঁর কাছে গাও—রাজা সাহেবের তার এসে গেছে।"

আমি বললাম: "তার?"

মাসিমা বললেন: "হ্যাঁ, রাণীসাহেবা রাজাসাহেবকে তার করেছিলেন যে তাঁর, মানে রাজাসাহেবের, জন্মোৎসব করবেন। জন্মদিন পরশু। রাজাসাহেব তার পাঠিয়েছেন তাঁকে আশীর্বাদ ক'রে। তাই কালই গান হোক এই রাণীসাহেবার ইচ্ছা। অবিশ্যি আমাদের সকলেরই ডাক পড়েছে—বাকায়দা।"

তেরো

ড্রামা, ড্রামাটিক শুনতে চমৎকার। স্টেজের কথা মনে করিয়ে দেয় ব'লে আরো যেন পুলক জাগে ভাবানুষঙ্গে। কিন্তু জীবনে যখন নাটুকে অঘটন ঘটে—না, ভাষ্য রেখে আগে মূলকে পেশ করি।

রাণীসাহেবার সভায় আমাদের ছয়জনেরই যাবার কথা ছিল। কিন্তু সাধুজি যেতে পারলেন না। তাঁর মন্দিরের এক চাকরের হঠাৎ কলেরা হওয়ার দরুণ তাঁকে ছুটতে হ'ল হাঁসপাতালে—তার দেখাশুনো করতে। আর মন্ত্রী-সাহেব কাছে একটা হিন্দুমুসলমান দাঙ্গা সামলাতে উধাও হলেন বরকন্দাজ নিয়ে—কাজেই সভার সভাসদ হলাম আমরা চারজন মাত্র।

রাজাসাহেবের রোল্‌স্ রয়েসে ক'রে যখন চলেছি রাজবাড়ীতে তখন মনে মনে সে কত জল্পনাকল্পনা—ভাবতে আজ হাসি পায়, কিন্তু সে-সময়ে গায়ে কাঁটা দিয়েছিল, পরিষ্কার মনে আছে। রাণীসাহেবা না জানি কেমন বিদেশিনী! কী ব'লে আমাকে খাতির করবেন—আমি কী বলব—শমিতাকে যে-দুটি গান এ-দুদিনে যত্ন ক'রে শিখিয়েছিলাম সে-গানদুটি সে রাণীসাহেবার সামনে না জানি কেমন গাইবে…এই সব চিন্তায় মশগুল হ'য়ে তো পৌঁছলাম রাজবাড়ীর সিংহদ্বারে।

সভায় গিয়ে আমরা চারজন বসতেই দুই চাপরাশী মিলে পান এলাচ ফরসী এগিয়ে দিল। আমি ধূমপান সুরু করতে না করতে এক দাসী এসে মাসিমার কানে কানে কী বলল। তিনি রাজাসাহেবের সভাগৃহের এক পাশে টাঙানো চিক তুলে অদৃশ্য হলেন।

ছবিটা মনে ছ'কে নেও। ওদিকে বরকন্দাজ তথা পরিচারকের দল সন্ত্রস্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে। সভায় আমি বোল-বোলায় সশব্দে তামাক টানছি। শমিতা আমার এ পাশে ঠায় মুখ নিচু ক'রে ব'সে। ও পাশে মূর্ছনা থেকে থেকে এদিক ওদিক তাকিয়ে আমার দিকে কটাক্ষ ক'রেই চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। শমিতা ফিশ ফিশ ক'রে বলল: "আশ্চর্য—অতিথি একটিও নেই আমরা চারজন ছাড়া!"

মনটা একটু দ'মে গেল। ভাবছি মনে মনে—কী ব্যাপার! কিন্তু কেউ কোথাও নেই!—কাকে শুধাই? খানিক আগের পুলকশিহরণের রেশ বানের জলে বালির বাঁধের মতন ডুবে গেছে—এমন সময় মাসিমা বেরিয়ে এলেন চিকের মধ্যে থেকে।

মূর্ছনা শুধালো: "ব্যাপার কী মা?"

মাসিমা ঈষৎ অপ্রসন্নকণ্ঠে বললেন: "বিশেষ কিছু নয়, রাণীসাহেবার হঠাৎ মাথা ধরেছে—আধ ঘণ্টার বেশি গান শুনতে পারবেন না। তাই তোদের গান আজ হবে না। শুধু অসিতই গাইবে।"

রাণীসাহেবা আধঘণ্টার বেশি গান শুনতে পারবেন না শুনেই আমার মেজাজ তিরিক্ষি হ'য়ে উঠেছিল। আমি বললাম: "কিন্তু তিনি কোথায়?"

মাসিমা ঈষৎ ঝাঁঝালো সুরে বললেন: "কোথায়! চিকের আড়ালে। আর কোথায়?"

এবার আমার আশ্চর্য হওয়ার পালা। বললাম: "চিকের আড়ালে? সে কি! তিনি সভায় এসে বসবেন না?"

মাসিমা যেন জোর ক'রে শান্ত সুরে বললেন: রাণী-সাহেবা বাইরের অতিথির সামনে বেরোন না তো।"

আমি বললাম: "কিন্তু সাধুজির কাছে যে শুনেছিলাম তিনি পর্দানসীন নন?"

মাসিমা বললেন ঈষৎ কুণ্ঠিত সুরে: "না তা নন বটে। তবে…মানে…তিনি এ-সভায় এসে বসতে চান না।"

আমি বললাম: 'তাহ'লে আমিও গাইতে চাই না—বলবেন রাণী সাহেবাকে'—ব'লেই উঠে পড়লাম।"

সোফিয়া ও বার্বারা চমকে উঠল একসঙ্গেই। সোফিয়া বলল: "উঠে পড়লেন? মানে—?"

অসিত (হেসে): মানে, সোজা দোরের দিকে টিপ ক'রে চললাম with great dignity plus velocity।

বার্বারা (রুদ্ধশ্বাসে) : তারপর ?

অসিত : তারপর আর কি ? হৈ হৈ ব্যাপার রৈ রৈ কাণ্ড যাকে বলে। মাসিমা ফের ছুটলেন চিকের অন্দরে। মূর্ছনা উঠে দাঁড়ালো তটস্থ হ'য়ে। শমিতা উঠে দুপা এগিয়ে চেঁচিয়ে আমাকে ডাকল : "অসিত, কোথায় যাচ্ছ ?"

আমি "বাড়ী" ব'লেই বেরিয়ে হন হন ক'রে নেমে সটাং রাজদ্বার পার। গেটের বাইরে পা দিতেই পিছনে পদশব্দ শুনে ফিরে তাকালাম। দেখলাম এক ভদ্রবেশী রাজপুরুষ ছুটেছেন। আমার কাছে এসে বললেন : "কী করলেন অসিত বাবু! রাণী সাহেবার এ-অপমান !—"

আমি পিঠ পিঠ জবাব দিলাম : "মানের দাবি তাঁকেই সাজে যিনি অপরের মান রাখতে শিখেছেন, যাঁর বোধোদয় হয়েছে যে, অতিথি আর উমেদার এক বস্তু নয়।"

ভদ্রবেশী একটু থতমত খেয়ে বললেন : "কিন্তু হেঁটে যাচ্ছেন কোথায় ? মোটর—"

আমি বললাম : "কথায় বলে—গোড়া কেটে আগায় জল ! মোটরে কাজ নেই, পায়ে হেঁটে চলাফেরা ক'রে আমি আরামও পাই, থাকিও ভালো।

চোদ্দ

সোফিয়া : তারপর দাদা ?

অসিত : আমার বাংলোয় ফিরে আরামকেদারাটি লন-এ টেনে এনে হেলান দিয়ে উদাস ভাবে ভাবছি—কী করলাম ! ভালো না মন্দ ? সাধুজি কী বলবেন ? মূর্ছনা, শমিতা, মাসিমা কী ভাবে নেবেন···এই সব—এমন সময়ে মাসিমার অভ্যুদয় তাঁর নিজের ক্যাডিলাকে।

নেমেই আমার পিঠে দিলাশা দিয়ে বললেন : "ব্রাভো মাই বয় ! চলো এক্ষুণি।"

আমি আশ্চর্য হ'য়ে বললাম : "সে কি মাসিমা ? কোথায় ?"

"আমার ওখানে। আর কোথায় ?—শোনো বাবা," ব'লেই আমার চিবুকে হাত দিয়ে : "আমি ঝোঁকের মাথায় সাবাস দিই নি। আমার সত্যিই কোনোদিনই ভালো লাগে নি রাণীসাহেবার গুমর বা চালচলন। তাই আমি এ-ব্যাপারে তোমার দিকে জানাতেই ছুটে এসেছি—আরো এই জন্যে যে তোমাকে এভাবে অপদস্থ করার জন্যে দায়িক আমরাই তো। তাই প্রায়শ্চিত্তের ভারও আমাকেই নিতে হবে।"

আমি কুণ্ঠিত হ'য়ে বললাম : "সে কী কথা মাসিমা আপনারা দায়িক কেমন ক'রে ? আপনারা তো কেউই জানতেন না—"

মাসিমা বললেন : "না, জানতাম। তবে খেয়াল করি নি। সদাসর্বদা এইরকমই দেখে দেখে ভুলে বসেছিলাম—কেউ আমীর হ'লেই যে আর সবাইকে তার পায়ে গড় করতে হবে ভদ্রসমাজে এমন কোনো 'কোড' নেই। কিন্তু সে পরের কথা। তুমি চলো তো আমার ওখানে—কিছু অন্ন তো মুখে দাও—তার পরে সব কথা হবে—যদিও কীই বা আছে বলবার ?"

* * *

মাসিমা আমাকে তাঁর বৈঠকখানা ঘরে বসিয়েই গেলেন সোজা রান্নাঘরে। লুচি, মাছ, মাংস সবই এলো—এক-ঘণ্টার মধ্যেই। তিনি ছিলেন পাকা গিন্নি। নানা রকম টিনের খাবার মজুদ থাকত।

খাওয়ার সময়ে কিন্তু তিনি একটিবারও তুললেন না রাজবাড়ীর কথা। একথা সেকথা—হাসি গল্প। সেদিন প্রথম বুঝলাম আমাকে তিনি কতখানি স্নেহের চোখে দেখেন। নৈলে কি আমাকে এভাবে ভোলাতে চাইতেন অপমানের গ্লানি ?

কিন্তু খাওয়া শেষ ক'রে যেই দুটো পান মুখে তুলেছি, উর্দিপরা দৌবারিক এসে বলল নকিবি সুরে : মন্ত্রীসাহেব সেলাম দিয়েছেন লাইব্রেরিতে।

পনেরো

প্রকাণ্ড লাইব্রেরি। মন্ত্রীসাহেবের রুচি ছিল ঘর সাজানোর। তা ছাড়া লাইব্রেরিতে যখন যেভাবে ইচ্ছা এলিয়ে শুয়ে ব'সে পড়বেন ব'লে সব রকম আসন সোফা টেবিল কাউচ ডাইভানই শোভমান। চোখে ঠেকল শুধু তাঁর পাশের টেবিলে একটি মদের বোতল ও গেলাস।

ঢুকতেই মন্ত্রীসাহেব উঠে দাঁড়ালেন, মুখ শ্রাবণের মেঘের মতন গম্ভীর, কিন্তু কুলীন কায়দায় অভিবাদন করতে ভুললেন না। আমি একটু দূরে একটা বেতের চেয়ারে বসতে যাব—এমন সময়ে ওপাশ থেকে শমিতা

ডাকল ইশারা ক'রে। ওর কাছে যেতেই বলল মৃদুস্বরে: "বোসো অসিত এইখানে—এ-চেয়ারটা বেশ নরম।"

তারপরেই মাসিমার প্রবেশ, বসলেন আমার পাশেই একটা চেয়ারে।

মন্ত্রীসাহেব বললেন: "মূর্ছনা কোথায়?"

বলতে না বলতে মূর্ছনার অভ্যুদয়। সে আমার দিকে একবার বাঁকা কটাক্ষ ক'রেই দাঁড়িয়ে রইল শমিতার পাশে। বুঝলাম—একটা রীতিম'ত কনফারেন্স।

একটু বাদে মন্ত্রীসাহেব গেলাসে ফের চুমুক দিয়ে বললেন: "আমি এইমাত্র ফিরেই সব খবর পেলাম। রাণী-সাহেবা নিজে টেলিফোন করেছেন।"

আমি বললাম: "ও।"

মন্ত্রীসাহেব বললেন: "শুধু ও? ব্যস্?"

আমার বুকের পাঁজরায় রক্ত আছড়ে আছড়ে পড়ছে, কিন্তু আমি যে মনে মনে প্রতিজ্ঞা ক'রে এসেছি যে আর দীন করব না—তাই বললাম: "এক্ষেত্রে আর কী বলব বলুন?"

মন্ত্রীসাহেব শুধালেন: "রাণীসাহেবা কী বললেন শুনতে চাইবে আশা করেছিলাম।"

বললাম: "আপনি নিজে থেকে না বললে এ বিষয়ে কৌতূহল প্রকাশ করাটা পাছে"—

মাসিমা বাধা দিয়ে স্বামীকে বললেন: "যা বলবার বলো না—এত পাঁয়তাড়ার মানেটা কী?"

মন্ত্রীসাহেব তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন: "তুমি কেন কথার পিঠে কথা কও শুনি?—হ্যাঁ, শোনো অসিত—যদিও আমি জানতাম না যে উনি তোমাকে আজই নিয়ে আসবেন আদর ক'রে খাওয়াতে—কিন্তু—ভালোই হয়েছে। এস্পার ওস্পার যা হবার হ'য়ে যাক আজ রাতেই।'

মাসিমা ফোঁশ ক'রে উঠলেন: "এস্পার ওস্পার হ'তে হয় তো সেটা তোমাতে আর রাণীসাহেবাতে হ'লেই ভালো হয় না কি?"

মন্ত্রীসাহেব রুক্ষ স্বরে বললেন: "তুমি একটু থামবে?—" ব'লে আমার দিকে ফিরে বললেন: "জানো, এতে ক'রে তুমি আমাদেরই সবচেয়ে অপদস্থ করেছ?"

আমি শান্তকণ্ঠে বললাম: "আমি সত্যিই অত্যন্ত দুঃখিত। কারণ আপনাদের পরিবারে আমি যে আদর-যত্ন এতদিন পেয়ে এসেছি তার এ-প্রতিদান দিতে আমার একটুও ইচ্ছে ছিল না বিশ্বাস করবেন। কিন্তু—"

"কিন্তু—?"

"আমি বলতে যাচ্ছিলাম যে, হয়ত আমাকে ক্ষমা করা একটু সহজ হ'লেও হ'তে পারে যদি মনে রাখেন যে, নবাবী চালচলন আমার আদৌ জানা ছিল না।"

"কিন্তু ভদ্রতা ব'লে যে একটা জিনিষ আছে সেটা?"

উদ্যত তীক্ষ্ণ জবাবটাকে নিরস্ত ক'রে বললাম: "এ-জেরাটা আমাকে না ক'রে অন্যত্র করলে হয়ত বেশি ফল পেতেন।"

"ভাষার গাঁথুনি আছে মানি—কেবল মানেটা ইন-কোহেরেন্ট ঠেকছে।"

"সে-দোষ ভাষার নয় স্যর। ভাষার ব্যঞ্জনা শুধু কথার মানের ঠিক দিলে মেলে না। একটু দরদ থাকা চাই।"

মন্ত্রীসাহেব বললেন: "তোমার কথা আমি মন দিয়ে শুনেছি ব'লেই বোধ হয় বুঝতে পারছিনে—কেমন ক'রে এ-কাণ্ডটার দায়িত্ব তুমি রাণীসাহেবার ঘাড়ে চাপাতে চাচ্ছ! অন্ততঃ তাঁর কাছে যে তুমি সুভদ্র নাম কিনে আসোনি এটা তোমার জানার কথা।"

আমি বিরক্ত হ'য়ে বললাম: "যারা সত্যি ভদ্র তারা নাম কিনবার জন্যে ভদ্রতার মাশুল দেয় না—সামাজিকীতে ভদ্রতা শোভন ব'লেই ভদ্র হ'য়ে থাকে।"

মন্ত্রীসাহেবের লোহিতায়মান মুখের দিকে চেয়ে মাসিমা বললেন: "ডিটো, কেবল আমি এইটুকু জুড়ে দিতে চাই যে ভদ্রতাও একতরফা কারবারী নয়—তার প্রদান চলে না আদান বিনা।"

মন্ত্রীসাহেব বললেন: "অর্থাৎ রাণীসাহেবাই আগে অসিতের সঙ্গে অভদ্রতা করেছেন এই তো? কিন্তু—আতিথ্যের তাঁর কোথায় ত্রুটি হয়েছিল একটু দেখিয়ে দেবে কি?"

মাসিমা বললেন: "অতিথিকে পান-তামাক-এলাচ গোলাপজল, আতর সরবরাহ করাকেই যারা আতিথ্যের চরম নিদর্শন মনে করে তাদের দেখিয়ে দেওয়া যায় না: অতিথিকে ডেকে এনে চিকের আড়ালে গর্দিয়ান হ'য়ে

ব'সে তাঁকে মাইনে-করা ওস্তাদের মতন গান শোনাতে হুকুম করলে ত্রুটি হয় ঠিক কোন্‌খানে।"

উৎকণ্ঠায় মূর্ছনার মুখ কালো হ'য়ে এল, সে বলল: "তুমি কেন বাগড়া দাও মা, চুপ করো না।" বিতৃষ্ণা এল ওর 'পরে কারণ আমার সবচেয়ে খারাপ লাগে এই মামুলি ভয়। তাই ওর দিকে আর না তাকিয়ে মন্ত্রীসাহেবের দিকে চেয়ে বললাম: "মাসিমা মিথ্যা বলেননি স্যর। আমি শুধু এইটুকু জুড়ে দিতে চাই যে, আমাকে বেশি বেজেছে যেটা সেটা ঠিক অভদ্রতা নয়—তার নাম অশোভনতা বলাই ভালো। কারণ সত্যি বলছি রাণীসাহেবা আমাকে অপমান করতেই যে মোতিমহলের জুড়িগাড়ি পাঠিয়ে আমাকে নিয়ে যাননি এটুকু বুঝবার মতন বোধোদয় আমার হয়েছিল।"

মন্ত্রীসাহেব ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরে বললেন: "শুনে আপ্যায়িত হ'লাম। কিন্তু তা হ'লে কোনখানে তিনি মানী অতিথির মানহানি করলেন জানতে পারি কি?"

আমি বললাম আতপ্ত কণ্ঠে "ঠাট্টা তামাসায় লক্ষ্যভেদ হবে না স্যর! কেননা আমি শুরুতেই মেনে নিয়েছি যে এ-ব্যাপারটার মধ্যে আমি কোনো মানহানির গন্ধ পাইনি। তবে এভাবে ওঁর কাছে গান করতে হবে এ আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল বলেই হয়ত এ ভঙ্গির অশোভনতা আমাকে বেশি বেজেছিল।"

আর একটু মদ ঢেলে বললেন: "কিন্তু এত বেশি বাজল কেন সেইটাই জানতে চাইছিলাম জ্ঞানলাভের আশায়!"

বললাম: "গায়ের জ্বালাকে প্রশ্রয় দিলে আর যা-ই হোক না কেন জ্ঞানলাভ হয় না স্যর, মন অশান্ত হ'লে সরল কথাও প্যাঁচালো ঠেকে। নইলে আপনাকে এ-শাদাকথাটা বোঝাতে এত বেগ পেতে হ'ত না যে, শোভনতার স্ট্যাণ্ডার্ড সর্বত্র এক নয়। সমাজে প্রতি মানুষই নিজের মনে ভদ্রতার সৌজন্যের শীলতার এক একটা ছক কেটে রাখে। গোল বাধে তখনই যখন এর ছকের সঙ্গে ওর ছকের হয় গরমিল।"

মন্ত্রীসাহেবের মুখে বাঁকা হাসি ফুটে উঠল, বললেন: "একালের ছেলেরা কি আজকাল rigmarole হেঁয়ালিতে কথা কওয়া শুরু করেছে না কি?"

আমি এবার শান্ত কঠিন সুর ধরলাম, বললাম: "আপনার সঙ্গে এ-ধরণের মিথ্যে তকরার করতে হবে জানলে আমি আসতাম না। মাসিমা বলেছিলেন আপনি একটা বোঝাপড়া চান তাই এসেছিলাম। তবে যদি অনুমতি করেন এখন উঠি?"

মন্ত্রীসাহেব চড়া সুর এক পর্দা নামিয়ে বললেন: না, বোসো। কারণ আমিও বুঝতেই চাচ্ছি, কথায় লকড়ি খেলবার আমার সময় নেই।"

বললাম: "কিন্তু কথার লকড়ি খেলা তো এ নয় স্যর! একটু শান্তভাবে বুঝতে চেষ্টা করলে আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারতেন কেন আমাকে বেজেছে, আর কোথায়। রাগ করবেন না: আমি আপনাদের রাণীসাহেবার হুকুম-বরদারও নই, চাকরির উমেদারি করতেও আসি নি এখানে। তাঁর সভায় আমি গিয়েছিলাম অনুরুদ্ধ হয়েই, উপযাচক হ'য়ে না। অথচ ওখানে গিয়ে যে ভঙ্গিতে ওঁর সামনে গান শোনাবার ব্যবস্থা হ'ল সে ভঙ্গিটা আমার মনে হয়নি নিমন্ত্রিত অতিথির পক্ষে স্বস্তিকর। এটা দুঃখের কথা—কিন্তু তবু মনে রাখবেন আশাকরি যে, আমি রাণীসাহেবার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলাম গান গেয়ে সাধ্যমত তাঁকে আনন্দ দিতেই—সীন করতে নয়।"

মন্ত্রীসাহেব চেঁচিয়ে ব'লে উঠলেন: 'আমি সবই মনে রেখেছি হে বাক্যবীর,—কেবল তুমিই বেমালুম ভুলে যেতে চাচ্ছ দেখি যে, যেটা হল সেটা সীনই বটে। সীনটা যাকে তাকে নিয়ে হলে আমার টনক নড়ত না—কিন্তু কাকে নিয়ে হল সেটা তুমিও একটু মনে রাখবে কি?—স্বয়ং রাণীসাহেবা।"

মাসিমা বললেন: রাণীসাহেবার নাম করত তোমার রোমাঞ্চ হয়—কিন্তু বাইরের লোকের না-ও হতে পারে এ-শাদা কথাটা কি তুমি বুঝবে না কোনো দিনই?"

মন্ত্রীসাহেব বললেন: "বোঝো না সোঝো না তবু কথা বলতে যাবে সব তাতে। কোনো মানহানির গুরুত্ব কি নির্ভর করে না কার মানহানি হল তার ওপরে?"

মাসিমা বললেন: "এতই যদি মান নিয়ে টন্‌টনানি তবে যাঁর মানহানি হ'ল তাঁকেই দাও না কেন বোঝাপড়া করতে? তুমি কেন খামকা তাঁর দালালি করতে যাও শুনি?"

মন্ত্রীসাহেব তপ্ত কণ্ঠে বললেন: একটু সমঝে কথা কইতে হয়। বলতে চাও কি এই নিয়ে রাণীসাহেবা যাবেন একজন—অর্থাৎ—অসিতের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে?"

আমি আর পারলাম না, বললাম ঈষৎ তীব্রকণ্ঠেই: "এতে অসম্মত হবার এক্তিয়ার তাঁর মঞ্জুর—কেবল এই সর্তে যে, যাকে ডাকা হ'য়েছে অতিথি ব'লে তাকে মোসাহেবি করতে হুকুম করলে 'না' বলবার এক্তিয়ারও তার সমান মঞ্জুর।"

মন্ত্রীসাহেব বললেন: "বাজে কথা যেতে দাও—'

মাসিমা বললেন: "বাজে কথা মোটেই নয়—the wearer knows where the shoe pinches"

মন্ত্রীসাহেবের মুখ লাল হ'য়ে উঠল, বললেন: "বলছি বার বার কথার ওপর কথা কোয়ো না—"

মাসিমা বললেন: "কইব না কেন শুনি? তোমার হুকুম?"

মূর্ছনা শুষ্ককণ্ঠে বলল: "আঃ মা, কী করো? বাবা—"

মাসিমা বললেন: "তোর যত আদিখ্যেতা বাবাকে নিয়ে। কেন ও অমন হুকুম করবে শুনি? আমরা কি দাসী, না বাঁদী?"

মন্ত্রীসাহেবের স্বর একটু নেমে এল, বললেন: "আহা, এসব কথা কেন? তবে অসিতের ব্যাপারে তুমি গায়ে প'ড়ে—"

মাসিমা বললেন: "অসিতের ব্যাপার মানে? আমিই তো ওকে পাঠিয়েছিলাম—ও কি জানত এসব নবাবী কাণ্ড-কারখানা? আমার কথায়ই না ও গিয়েছিল ভদ্র-সভায় ভদ্রতার প্রত্যাশা ক'রে। পেল সেখানে অপমান—সে-ও তো আমারই জন্যে।"

মন্ত্রীসাহেব বললেন: "আহা, অপমান এখানে কোথায় হ'ল শুনি? তুমি কি বলতে চাও যে রাণীসাহেবা বেরিয়ে এসে বসবেন একজন—মানে—অসিতের সঙ্গে একাসনে? আকাশের চাঁদ যারা হাতে চায় তাদের সুবুদ্ধি বলা চলে কি?"

আমি আর থাকতে পারলাম না। বললাম: "ক্ষমা করবেন স্যর, কিন্তু সুবুদ্ধির সম্বন্ধে আপনার যে ধারণা অন্যের ধারণার সঙ্গে তার মিল তো না-ও থাকতে পারে? এমন কি, রাজা-রাজড়াদেরও মধ্যে সুবুদ্ধি নিয়ে মতভেদ নেই কি? এ আমার তর্কের ঝোঁকে বলা নয়—কারণ রাজমহলে এটা অভাবনীয় হ'লেও বাংলা দেশে এমন অনেক রাজা-রাজড়া আছেন যাঁরা দরিদ্র অতিথির সঙ্গে পঙ্‌ক্তিভোজন ক'রে থাকেন, একাসনে ব'সে গান শোনা তো কোন্ কথা।—না, শুনুন স্যর, অনেক স'য়েছি আপনার জুলুম, কিন্তু আপনি যে রকম তেরিয়া হ'য়ে উঠছেন তাতে আমার মরীয়া হওয়া ছাড়া আর পথ দেখি না। আপনি ক্রমাগত রাণীসাহেবা রাণীসাহেবা বলতে বলতে যে রকম গদগদ হ'য়ে উঠছেন, আমাদের সঙ্গে তাঁর একাসনে বসাকেও যেভাবে চাঁদ-হাতে-পাওয়ার সঙ্গে তুলনা করছেন, তাতে মনে হয় তাঁর পাতের পোলাওকেও হয়ত আপনি প্রসাদ মনে করেন মনে মনে—'

"কী বলছ তুমি?" How dare you! মন্ত্রীসাহেব হুংকার দিয়ে উঠলেন।

আমি বললাম: "শুনুন—অকারণ তর্জন-গর্জন করবেন না—আমি বলতে চেয়েছিলাম রাণীসাহেবার প্রতিমূর্তিকে যদি আপনি আপনার প্রাণের মন্দিরে প্রতিমা ক'রে তুলতে চান তাতে আমাদের কোনোই আপত্তি নেই—পূজ্য-নির্বাচনের ব্যাপারে পূজারী স্বাধীন। গোল বাধে তখনই যখন আপনার নমস্য প্রতিমার পায়ে আপনি আমাকে ফুল দিতে হুকুম করেন। রাজাসাহেব বা রাণীসাহেবা পূজনীয় হতে পারেন আপনাদের কাছে—যাঁরা তাঁদের প্রজা বা কর্মচারী, কিন্তু আমাদের কাছে ওঁরা মানুষ মাত্র—তার বেশিও না, কমও না। কাজেই আমাদের যদি ওঁরা ডাকেন ওঁদের সঙ্গে মেলামেশা করতে, তবে ওঁদেরই ভুলতে হবে ওঁদের এই সব পদবি—কেননা প্রীতির সভায় পদবি অবান্তর।"

মন্ত্রীসাহেব হো হো ক'রে হেসে উঠলেন: "এসব ডিমক্রাটিক বুলি আমার জানা আছে হে জানা আছে। এসব শিখেছ তোমরা সাহেবদের বেদবাক্য থেকে।"

আমি পিঠ পিঠ জবাব দিলাম: "আমারও জানা আছে স্যর, যে সাহেবিয়ানাকে ব্যঙ্গ করেন আপনারা আড়ালে আবডালেই।"

মন্ত্রী সাহেবের চোখ দিয়ে এবার আগুন ছুটল: "তুমি কী বলতে চাও শুনি?"

"বাবা"—ব'লে মূর্ছনা কেঁদে উঠল।

"চুপ কর্, কাঁদতে হবে না," উঠলেন মাসিমা ঝঙ্কার দিয়ে, "একটু ঠেকে শিখুক ও যে, সংসারে জুলুম চলে শুধু গলগ্রহদের ওপর।"

"থামবে তুমি?" মন্ত্রী সাহেব চেঁচিয়ে উঠলেন, "আমি জানতে চাই অসিত কোন্ আস্পর্ধায় অমন কথা বলে। কী বলতে চায় ও?"

আমি বললাম: "সাহেবদের ব্যঙ্গ করছিলেন এইমাত্র। কিন্তু বুকে হাত দিয়ে বলুনতো স্যর, যদি মোতিমহলে আজ অতিথি যেত একজন সাহেব গায়ক তা হ'লে রাণীসাহেবা চিকের আড়াল থেকে তাঁকে হুকুম করতেন কি?"

"অফ কোর্স নট্—" মন্ত্রী সাহেব সজোরে টেবিলে ঘুঁসি মারলেন—একটা শ্যাম্পেনের গেলাস পড়ে ঝন ঝন ক'রে ছত্রাকার হ'য়ে ছড়িয়ে পড়ল—"সাহেব আর আমরা সমান না কি?"

মাসিমা উঠে দাঁড়ালেন, বললেন: "মরি মরি! নইলে আর এ দশা তোমাদের! সাহেবরা তোমাদের মতন খেতাবীদের সমান ননই তো—হ'লে কি ওঁদের টেবিলের প্রসাদ পেয়ে ধন্য হ'তে ছুটতে রোজ এমন হন্তদন্ত হ'য়ে? কেবল—কয়লাকে ধুলে তার ময়লা ঘোচে না এই যা মুস্কিল, তাই তোমাদের "সাহেবিয়ানার বাধা—শুধু রঙটা হয় না শাদা, তবু চেষ্টার ত্রুটি নেই ভিনোলিয়া মাখো রোজ গাদা গাদা।"

মূর্ছনা ভয় পেয়ে মাসিমার মুখ চেপে ধরল কেঁদে: "কী সব অকথা কুকথা বলছ মা?"

মন্ত্রীসাহেবও উত্তেজনায় উঠলেন দাঁড়িয়ে, বললেন: "কী আর করবেন বল্? নিজের মা ছিলেন নেটিভ মেম, বাপ—ফিরিঙ্গি সাহেব—বোধ হয় সেই গুমরে নিজেকে ভাবেন কুইন ভিক্টোরিয়া—রঙটা ভিনোলিয়া না মেখেও একটু কটা বলে।"

হঠাৎ পিছন থেকে শমিতার কণ্ঠ চমকে দিল সবাইকে—"বাবা!" আমরা সবাই ওর দিকে ফিরতেই ও মন্ত্রীসাহেবের চোখে চোখ রেখে বলল দৃঢ় শান্ত কণ্ঠে: "বাবা! অতিথির সামনে মাকে এভাবে মা-বাপ তুলে, অপমান করতে তোমার লজ্জা করল না? চলো মা—এ বাড়ীতে আর এক মুহূর্তও নয়।" ব'লেই ও এসে মাসিমার কোমর জড়িয়ে ধরে দাঁড়াল। মাসিমা ওর বাহুবেষ্টনী থেকে নিজেকে একটু ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন: "তোর বাবার কি লজ্জা কোথাও আছে রে মেয়ে, যে লজ্জা করবে এসব বলতে? যত জুলুম জবরদস্তি ওর বাড়ীতে ক্লাবে গিয়ে ঐ কটা চামড়াদের কাছে হুজুর হুজুর।" কণ্ঠে তাঁর জ্ব'লে উঠল অন্তর্দাহের জ্বালা: "মরি মরি! মুরদ যে কত জানতে যেন কারুর বাকি আছে! চতুর্বর্গ লাভ হয় ওঁদের কিসে? না, সাহেবদের সঙ্গে মদের বোতল নিয়ে ঢলাঢলি করতে। ভাবেন বুঝি এইসব ক'রে ওদের কাঁধে কাঁধ ঘষলেই ওদের দলে ভর্তি হওয়া যায়। অন্ধ জাগো, না কিবা রাত্রি কিবা দিন! হায় রে দাঁড়কাক! ময়ূরের পালক চড়িয়ে ভাবো ময়ূরসমাজে কল্কে পাবে! এরা আবার বলে ভদ্রতার কথা, পাঠ দেয় কালচারের, আওড়ায় সভ্যতা-সম্বন্ধে লম্বা লম্বা বুলি! ভদ্রতা, ডিগ্‌নিটি, এটিকেট! হা কপাল! মনে যার নেই আত্মসম্মানের লেশ কথায় কথায় যে বলে: 'চাকর কুকুর'—সেও নিজের লেজের কুণ্ডলীর ওপর চ'ড়ে হাঁকে এর নাম সিংহাসন!—জানেও না যে সভ্যতা মানে বো বাঁধতে জানা নয়···মেম বুকে নিয়ে নাচানাচিও না।—সভ্যতার গোড়াকার কথা হ'ল মানুষকে মানুষ বলে শ্রদ্ধা করতে শেখা—শুধু মর্কটের মতন নকল ক'রেই যারা ভাবে—"

শমিতা ওঁর মুখে হাত চাপা দিল: "আর না মা, লক্ষ্মীটি! চলো তুমি আমার ঘরে, একটু ঠাণ্ডা হও—তোমার অসুখ করবে নৈলে।" বলেই আমার দিকে ফিরে: "অসিত! তুমি পারো তো মূর্ছনাকে নিয়ে একটু বেড়িয়ে এসো।—বাবা! তুমি একটু ক্লাবে যাবে এখন?—কিন্তু আর খেয়ো না।"

অবাক হ'য়ে গেলাম ওর শান্ত কণ্ঠে। আর প্রত্যক্ষ করলাম সংযমের শক্তি। গনগনে আগুনে জল দিলে যেমন ভস্ ক'রে সব তাপ যায় নিভে, ঠিক যেন তেমনি করেই ঘরের সঞ্চিত উত্তাপটা জল হয়ে গেল চক্ষের নিমেষে।

সোফিয়া (রুদ্ধকণ্ঠে): তারপর?

অসিত: মাসিমার মুখ রাগে রক্তবর্ণ হ'য়ে উঠেছিল, তিনি কাঁপছিলেন থরথর করে: শমিতা এসে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরতেই ভেঙে পড়লেন, ছোট শিশুর মতন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন ওর কাঁধে মাথা রেখে। মা যেমন ছোট মেয়েকে আদর ক'রে বুকে টেনে নেয় শমিতা ঠিক তেমনি করে নিল ওঁকে টেনে। তারপর ধীরে ধীরে নিয়ে গেল ওর শোবার ঘরে। মন্ত্রীসাহেব হতভম্ব মতন হ'য়ে চেয়ে রইলেন জানলার দিকে।

মূর্ছনা আমার বাহুমূলে আঙুল দিয়ে ঠেলল। আমি বেরিয়ে এসে মোটরে উঠে বসলাম।

বাঙ্গালার ইতিহাস কোন্‌পথে ?

রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

বাঙ্গালার ইতিহাস আদি যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া সেন রাজগণের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত বেদ, পুরাণ, তন্ত্র এবং কতকগুলি বিশেষ বিশেষ কাব্যগ্রন্থই রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু ইংরাজ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ হিন্দুশাস্ত্রের রূপকময় পরিবেশনের অর্থ ঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম না হওয়ায় তাঁহারা কোথাকার বিষয় বস্তুকে কোথায় লইয়া গিয়া ফেলিয়াছেন তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন দেখান অতি সহজ হইলেও তাঁহাদের নির্দ্দেশিত পথাবলম্বী ঐতিহাসিকগণ যেন তাহা মানিয়া লইতে ইচ্ছুক নহেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি কেবলমাত্র একটি বিশিষ্ট স্থান নির্ণয় প্রসঙ্গেই আলোচনা করিতেছি। সেটি হইতেছে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মহাসামন্ত শশাঙ্কদেবের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ নগর প্রসঙ্গে।

শ্রদ্ধেয় কানিংহাম সাহেব এই কর্ণসুবর্ণ নগরকে সিংভূম জেলায় লইয়া গিয়া ফেলিয়াছেন, আবার শ্রদ্ধেয় ক্যাপ্তেন পেয়ার্ডসাহেব কর্ণসুবর্ণ নগরকে বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত রাঙ্গামাটি নামক স্থানে লইয়া গিয়া রাখিয়াছেন। কেহ কেহ আবার বেহার প্রদেশের কর্ণগড়ে উহাকে লইয়া স্থাপন করিয়াছেন।

আদিযুগে সমগ্র বাংলাদেশ সমুদ্রশাখার ব্যবধানে সাতটি বিভাগে বিভক্ত ছিল। ঐ সমুদ্রশাখাগুলি পরবর্ত্তীকালে নদনদী ও খালবিলে পরিণত হইয়াছে। ঐ সাতটি বিভাগ এইরূপ :—পূর্ব্ব আর্য্যাবর্ত্ত (সমগ্র রংপুরজেলা ও দিনাজপুর জেলার পূর্ব্ব অংশ), অঙ্গ (মিথিলার নিম্ন হইতে বর্ত্তমান মালদহের উত্তরে প্রবাহিত কালিন্দী নদী পর্য্যন্ত), পুণ্ড্র (বর্ত্তমান দিনাজপুর জেলার পশ্চিম অংশ, বগুড়া ও মালদহের পুর্ব্ব অংশ), গৌড় (মালদহ জেলার মধ্য বিভাগ, উত্তরে কালিন্দী, পবনদূতের মতে যমুনা এবং ভট্টগ্রন্থের মতে কর্ণ, পূর্ব্বে মহানন্দা, দক্ষিণে তৎকালীন সমুদ্রশাখা বর্ত্তমান পদ্মা, পশ্চিমে একটি বিশিষ্ট নদীর ব্যবধানে পশ্চিম বিভাগ), বঙ্গ (ঢাকা এবং তৎপার্শ্বস্থ উত্তর পূর্ব্ব ও পশ্চিমস্থিত জেলা সমুহের কিয়দংশ), কলিঙ্গ (বর্ত্তমান মেদিনীপুর) এবং সুহ্ম।

মহাসামন্ত শশাঙ্কদেবের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ নগর সুহ্মের একাংশে অবস্থিত ছিল। তজ্জন্যই শ্রদ্ধেয় কানিংহাম সাহেব নামের সামঞ্জস্য দেখিয়া উহাকে সিংভূম জেলায় লইয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বোঝা উচিত ছিল যে, সুহ্ম পূর্ব্ব আর্য্যাবর্ত্তাধীন রাজ্য, সিংভূমের ন্যায় পশ্চিম আর্য্যাবর্ত্তাধীন রাজ্য নহে। এস্থানে প্রকাশ থাকে যে, নেপালের পর হইতে মূল গঙ্গা, রাজমহলের পর হইতে বড় গঙ্গা (রামায়ণের মতে জাহ্নবী এবং পবনদূতের মতে সরস্বতী) এবং মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ছাপঘাটী হইতে বর্ত্তমান কপিলাশ্রম একই নদীর স্রোতগতি। আদিতে এই স্রোতগতির সাগর-সঙ্গমস্থল ছিল নেপাল, তৎপরে হয় রাজমহল, তৎপরে হয় ছাপঘাটী, ইহার পরে হয় নবদ্বীপ তৎপরে বর্ত্তমান কপিলাশ্রম। এই কারণেই মহাদেব (মহাসমুদ্র) পঞ্চানন আখ্যা লাভ করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, নেপাল হইতে ছাপঘাটী পর্য্যন্ত গঙ্গার স্রোতগতিই তৎকালীন (ষষ্ঠ শতাব্দীতে) পশ্চিম আর্য্যাবর্ত্ত ও পূর্ব্ব-আর্য্যাবর্ত্তের সীমারেখা।

দশম একাদশ শতাব্দীতে বঙ্গের (পূর্ব্ববঙ্গের) খড়্গ ও বর্ম্ম বংশীয় রাজগণ অত্যন্ত প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়াছিলেন এবং ঐ সময়ে যতদূর সম্ভব বঙ্গ এবং বর্ত্তমান রাঢ় প্রদেশের দক্ষিণাংশের মধ্যে সমুদ্রশাখা প্রবাহিত ছিল। একাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে আদিশূরবংশীয় রণশূর বর্ত্তমান রাঢ় প্রদেশের দক্ষিণাংশ শাসন করিতেন আর গুপ্ত বংশীয় কর্ণসেন মেদিনীপুরে রাজত্ব করিতেন। ইনি গৌড়েশ্বর প্রথম মহীপালের ভায়রা-ভাই ছিলেন এবং

তাঁহার প্রযত্নে যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন। দিগ্বিজয়ী বীর রাজেন্দ্র চোল রাঢ়পতি রণশূরকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া দণ্ডভুক্তির (বেহার প্রদেশে) পথে গৌড় আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন কিনা তাহার কোন সন্ধান মিলে না। এই কর্ণসেন মহাসামন্ত শশাঙ্কদেবের পূর্ব্বপুরুষ, যিনি ষষ্ঠ শতাব্দীতে কর্ণসুবর্ণ নগরে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তিনি নহেন। তিনি ছিলেন যদুবংশাধীন চেদী রাজবংশীয় কায়স্থ। অনুমান, মেদিনীপুররাজ কর্ণসেন বঙ্গীয় (পূর্ব্ববঙ্গের) রাজগণের জলপথে আক্রমণ ভয়ে ভীত হইয়া রাঢ়পতি রণশূরের সহযোগিতায় বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত রাঙ্গামাটি নামক স্থানে নিজনামে (কর্ণসেনাপুরী) সৈন্যাবাস প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কালক্রমে ঐ কর্ণসেনাপুরী "কাণ সোনা পুরীতে" পরিবর্ত্তিত হয়। শ্রদ্ধেয় ক্যাপ্তেন লেয়ার্ডসাহেব এই নামের সামঞ্জস্যসহ কতকগুলি ইটপাথর দেখিয়া উহাকে কর্ণসুবর্ণনগর বলিয়া পরিচিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এস্থানে আরও একটি বিষয়ের আলোচনা প্রয়োজন। ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে ঐসব ইংরাজ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের কর্ম্মতৎপরতা আরম্ভ হয়। ঐ সময়ে হেষ্টিংশের পার্শি ভাষার শিক্ষক রাজা নবকৃষ্ণদেবের পৌত্র রাজা রাধাকান্তদেব জীবিত ছিলেন। তিনি হয়ত লেয়ার্ডসাহেবের নির্দ্দেশ মূলে নিজে দেববংশীয় কায়স্থ বলিয়া তাঁহার শব্দকল্পদ্রুম গ্রন্থের "অথ গ্রন্থকর্ত্তুর্বংশবর্ণনশ্লোকাঃ" মধ্যে রাঙ্গামাটিকেই কর্ণসুবর্ণ নামে পরিচিত করিয়াছেন। কেন না কলিকাতায় বসবাসের পূর্ব্বে তাঁহাদের বসবাস ছিল ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত মূড়াগাছায়, তৎপূর্ব্বে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ রাঙ্গামাটি অঞ্চলে বসবাস করিতেন। এই বিভ্রান্তিকর বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া লেয়ার্ডসাহেবের উক্তিকেই সকলে মানিয়া লন। পরবর্ত্তী গ্রন্থকার প্রাচ্যবিদ্যার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কোথাও লেয়ার্ড সাহেবকে সমর্থন করিয়াছেন, আবার কোথাও তাঁহাকে সমর্থন করেন নাই। কাজেই ধরিয়া লইতে পারা যায় যে, তিনি উহাকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করিতে না পারিলেও ইংরাজ শাসকদের ভয়ে ঐরূপ বিভ্রান্তিকর বর্ণনায় প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি বিশ্বকোষে নবকৃষ্ণদেবের জীবনী মধ্যে রাঙ্গামাটিকে কর্ণসুবর্ণ নামে অভিহিত না করিয়া কানসোনা নামে পরিচিত করিয়াছেন। তিনি অপর এক স্থানে লিখিয়াছেন, "কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙ্গামাটি) ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রাচীন ইষ্টক স্তূপ মধ্য হইতে সময়ে সময়ে এখানকার গুপ্ত রাজগণের সময়ে প্রচলিত বহু স্বর্ণমুদ্রা বাহির হইয়াছে, তাহা হইতে কবিগুপ্ত জয় মহারাজ, নরগুপ্ত, প্রকটাদিত্য, বিষ্ণুগুপ্ত, চন্দ্রাদিত্য প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। এই সকল গুপ্তরাজগণ কে কোন্ সময়ে রাজত্ব করেন, তাহা জানিবার উপকরণ এখনও বাহির হয় নাই।" (বিশ্বকোষ, বঙ্গদেশ—গৌর প্রভাব)। হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পরে মগধের মাধব গুপ্তের পুত্র আদিত্য সেন সমগ্র পশ্চিম আর্য্যাবর্ত্তের একছত্রাধিপতি হইয়া গৌরধর্ম্ম প্রচার কল্পে নিজ বংশধরগণকে পশ্চিম আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্ব অংশে প্রতিষ্ঠিত করেন। অনুমান এই সকল গুপ্ত বংশীয় রাজা তাঁহারই বংশধর। কাজেই দেব বংশ ঐ স্থানে কোন দিনই রাজত্ব করেন নাই।

মহাসামন্ত শশাঙ্ক দেবের অবসানে গৌড় মণ্ডল কামরূপপতি ভাস্কর বর্ম্মার অধীন হয়। তিনি যদুবংশাধীন অপর শাখা সম্ভূত কবিশূরকে কর্ণসুবর্ণ নগরে প্রতিষ্ঠিত করেন। হয়ত শশাঙ্ক দেবের পুত্র (তাঁহার নাম কোথাও মিলে না) এই কবিশূরের আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। কবিশূরের পুত্র মাধব শূর পুণ্ড্রবর্দ্ধনে মহাসামন্ত পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তৎপুত্র আদিশূর, আদিশূরের পুত্র ভূশূর রাজ্যচ্যুত হইয়া বর্ত্তমান রাঢ় প্রদেশের দক্ষিণে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। অনুমান, এই সময়ে শশাঙ্ক দেবের বংশধরগণ ভূশূরের সহিত আসিয়া রাঙ্গামাটি অঞ্চলে বসবাস স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিকগণ এযাবৎকাল লেয়ার্ড সাহেবকেই সমর্থন করিয়া বলিতেছেন। হঠাৎ স্বাধীনতা লাভের পর প্রত্নবিভাগের দৃষ্টি পড়ে রাঙ্গামাটির লাল মাটির দিকে।

গত ইং ১৯৬২ সালে বিভিন্ন পত্রিকার মাধ্যমে আমি জানিতে পারি যে, সরকারী অর্থব্যয়ে পূর্ব্বোক্ত রাঙ্গামাটি যাহা সামন্ত শশাঙ্ক দেবের রাজধানী বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে তথায় খননকার্য্য আরম্ভ হইতেছে। উল্লিখিত বিষয় অবগত হওয়ার পরে ভারতবর্ষ, ভারত জ্যোতি, জনসেবক, সংহতি, ইন্দ্রপ্রস্থ (দিল্লী) এবং স্থানীয় কয়েকটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় বিভিন্ন প্রবন্ধের

মাধ্যমে আমি প্রচার করিয়া আসিতেছি যে, মহাসামন্ত শশাঙ্ক দেবের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ নগর মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত রাঙ্গামাটিতে ছিল না। অথচ অদ্যাবধি কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বা ঐতিহাসিক আমার মতবাদের প্রতিবাদ বা সমর্থন করিতেছেন না। প্রত্নবিভাগ হয়ত তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা লুপ্ত হওয়ার ভয়ে একতরফা ভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যত্ন লইয়াছেন। আর ঐতিহাসিকগণ হয়ত তাঁহাদের রচিত নিজ নিজ বৃহদাকার মূল্যবান্ গ্রন্থসমূহের ভবিষ্যৎ চিন্তার ভয়ে প্রত্ন বিভাগের বিভ্রান্তিকর বর্ণনাকেই সমর্থন করিতেছেন। কেননা গণতন্ত্রের আওতায় সওদাগরী রাজত্বের মাধ্যমে শিক্ষার দোহাই দিয়া বিশিষ্ট বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীগণও নিজেদের অন্যায়ের গুছাইয় লহিবার চেষ্টা করিতেছেন।

সম্প্রতি পরম্পরায় শোনা যাইতেছে যে রাঙ্গামাটির খননের ফলে উহাকেই কর্ণসুবর্ণ নগর বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। ঐতিহাসিকগণও নাকি উহাই সমর্থন করিয়াছেন। যদি তাহা সত্য হয়, তাহা হইলে ঐতিহাসিকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার কতকগুলি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করিয়া আমাকে এবং আমার সহৃদয় পাঠকবর্গকে সন্তুষ্ট করিবেন। আদি যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া গিয়াসুদ্দিন বাদশাহের রাজত্ব কাল পর্য্যন্ত কর্ণসুবর্ণ নগর বাঙ্গালার ঐতিহাসে একটি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। কাজেই ইহার স্থান নির্ণয় যদি সঠিকভাবে না হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালার ইতিহাস কোন দিনই সংশোধিত হইবে না।

আদি যুগে জহ্নুমুনি এবং রাজা ভগীরথের লীলাক্ষেত্র এই কর্ণসুবর্ণ নগর। মহাভারতের যুগে এই কর্ণসুবর্ণ নগরই দ্বিতীয় মৎস্যাধিপতি বিরাট রাজার উত্তর গোশালা। বৌদ্ধ যুগে এই কর্ণসুবর্ণ নগরই আদিতে বৌদ্ধ, তৎপরে শৈব, তৎপরে পুনরায় বৌদ্ধ পীঠস্থানরূপে গৃহীত হইয়াছিল। সেন রাজাদের রাজত্বকালে এই কর্ণসুবর্ণ নগরেই সুপণ্ডিত মন্ত্রীদ্বয় হলায়ুধ ও পশুপতি উহাকে শাক্ততন্ত্রবাদের পীঠস্থানরূপে পরিণত করিয়া বৌদ্ধতন্ত্রবাদকে বাঙ্গালার বাহিরে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। আবার গিয়াসুদ্দিন বাদশাহ বাঙ্গালায় মুসলমান প্রতিষ্ঠা সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে গৌড় রাজধানী হইতে এই নগরের পার্শ্ব দিয়া দেবকোট (দিনাজপুর জেলায়) পর্য্যন্ত উচ্চ জাঙ্গাল (রাজপথ) প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই বারে শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিকবৃন্দকে কতকগুলি প্রশ্ন করিতেছি। আশা করি তাঁহারা এই পত্রিকার মাধ্যমে আমার যুক্তির স্বপক্ষেই হউক, আর বিপক্ষেই হউক—যুক্তিপূর্ণ উত্তর দান করিবেন।

১। সুহ্ম বর্ত্তমানে কোন্ জেলার অন্তর্গত এবং তাহার কোন অংশ কর্ণসুবর্ণ নামে প্রসিদ্ধ? কেননা কবি রাম-শর্ম্মার "দিগ্বিজয় প্রকাশ" শীর্ষক ভৌগোলিক গ্রন্থে লিখিত আছে:

"গৌড়স্য পশ্চিমে ভাগে বীর দেশস্য পূর্ব্বতঃ
দামোদরোত্তরভাগে সুহ্মদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।৭।৬

এ স্থানে গৌড়ের অবস্থিতি সর্ব্বজনসুবিদিত, দামোদর বলিতে দামোদর নদ নহে, বর্ত্তমান রাঢ় প্রদেশের দক্ষিণ অংশ অর্থাৎ তৎকালীন বন্য বিভাগ (দাম অর্থাৎ বন উদরে যাহার,আদিতে ঐ প্রদেশের নাম হয় দামোদর, তৎপরেদস্যু-গণেরআবির্ভাবে উহার নাম হয় "পুণ্ড্র", ইহা দ্বিতীয় পুণ্ড্র, আদিতে গৌড়-সুহ্ম এবং দামোদর প্রদেশের মাঝে বহুদূর বিস্তৃত সমুদ্র ছিল; ঐ দামোদর প্রদেশ বা দ্বিতীয় পুণ্ড্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে উহার নাম হয় "বর্দ্ধমান") এবং বীরদেশ (বী = প্রজনন, র = পাবক; অর্থাৎ পাবকের প্রজনন ক্ষেত্র, বর্ত্তমান সাঁওতাল পরগণার উত্তর সীমা হইতে ছোটনাগ-পুরের শৈলমালা পর্য্যন্ত ভূভাগের গভীর বনে দাবানল প্রজ্বলিত হইত বলিয়া উহা বীরদেশ নামে খ্যাত) বলিতে এস্থানে বর্ত্তমান রাঢ় প্রদেশের উত্তর অংশ (বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত সমসেরগঞ্জ ও ফরাক্কা থানা সহ সাঁওতাল পরগণা)। উপরোক্ত বর্ণনা মধ্যে সুহ্ম প্রদেশের উত্তরে কোন প্রদেশ ছিল কিনা তাহার নাম নাই। কাজেই ধরিয়া লইতে হইবে যে বীরদেশ উহাকে উত্তর পশ্চিমে বেষ্টন করিয়াছে।

২। কর্ণ (ভট্টগ্রন্থে কর্ণ, পবনদূতে যমুনা ও চলতি নাম কালিন্দী) এবং ভাগীরথী (গঙ্গা বা ছোট গঙ্গা) নদী-দ্বয়ের সাঙ্গমস্থল কোথায়? কেননা ভট্টগ্রন্থে বর্ণিত আছে:

"কর্ণসেননামধেয়ঃ কর্ণপুরস্য ভূপতিঃ ॥৬
ক্ষত্রপঃ কায়স্থো রাজা মহাসুরো মহাবলিঃ।
কর্ণস্বর্ণ রাজ্যস্থাতা উক্তঞ্চ ভারতে যথা ॥৭

কর্ণভাগীরথী সন্ধিঃ নয়নরঞ্জনশ্চ হি।
যত্র কর্ণপুরং রাজা নির্ম্মাণ বহুকৌশলৈঃ ॥৮

৩। সকড়ীগলিঘাটের পরপার (যে স্থানে কালিন্দী নদী গঙ্গার শাখা রূপে প্রবাহিত হইয়াছে) হইতে এই "কর্ণভাগীরথীসন্ধিঃ" স্থল পর্য্যন্ত পবনদূতে বর্ণিত ত্রিবেণী, পরবর্ত্তীকালে রচিত কীর্ত্তিবাসের ত্রিবেণী (হুগলীর ত্রিবেণী) হইতে স্বতন্ত্র নহে কি ?

৪। পবনদূত রচনাকালে হুগলীর ত্রিবেণী প্রবাহিত হইয়াছিল কি ?

৫। পুণ্ড্রবর্দ্ধন কোথায় ? এককালে পলাশীর গৌরবময় ক্ষেত্র হইতে গোরাবাজারের গোরাপল্টনের আবাসস্থলের মাঝে পুণ্ড্রবর্দ্ধননামে কি কোন নগর ছিল ? কেননা বিশ্বকোষ পুণ্ড্রবর্দ্ধন শব্দে বর্ণিত আছে :—

"খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে যে সময়ে চীন পরিব্রাজক হিউন্সিয়াং এখানে আগমন করেন, তখন পূর্ব্ব ভারতের অনেক বৌদ্ধাচার্য্য এখানে অবস্থান করিতেন। পুণ্ড্র বর্দ্ধন নগরের প্রায় আড়াই ক্রোশ পশ্চিমে গগনস্পর্শী চূড়া বিলম্বিত বাশিভা সজ্যারামের নিকট তিনি অশোক রাজ নির্ম্মিত স্তূপ ও সুবৃহৎ বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তিসমন্বিত একটি বৌদ্ধ বিহার দর্শন করিয়াছিলেন।"

এ স্থানে বাশিভা সজ্যারামের প্রকৃত অর্থ হইতেছে রক্তবর্ণ ভাতি যুক্ত বিহার বা মঠ। কেননা "বাশি" শব্দের অর্থ লোহিত বর্ণ, "ভা" শব্দের অর্থ ভাতি এবং সজ্যারামের অর্থ বৌদ্ধ বিহার বা মঠ।

৬। ঐ বাশিভা সঙ্ঘারামেরই (রক্ত বর্ণ ভাতি যুক্ত বিহার বা মঠের·) অপর নাম 'লো-তো-যেই-চি' বা রক্তবিটি (রক্ত বসনা অপ্সরী) নহে কি ?

৭। রক্তবিটির সন্ধানে অক্ষমতা অপ্রকাশ্য রাখিবার উদ্দেশ্যেই ইংরাজ ইতিহাসিকগণ উহাকে 'লো-তো-মো-চি" বা রক্ত মৃত্তিকা নামে কল্পনা করেন নাই কি ?

কেননা চীন পরিব্রাজক উহাকে 'লো-তো-মো-চি' নামে অভিহিত করেন নাই, তিনি উহাকে 'লো-তো-বেই-চি' নামেই পরিচিত করিয়াছেন।

৮। মালদহ জেলাতেও আদিনার (পাণ্ডুয়ার) পশ্চিমে অপর একটি স্থানের নাম নাকি রাঙ্গামাটি বলিয়া আছে, কিন্তু উহার মাটি লাল কি না তাহা আমি সঠিক অবগত নহি। ঐতিহাসিকগণ ইহার সন্ধান করিয়াছেন কি ?

৯। ভট্টগ্রন্থে বর্ণিত "কর্ণভাগীরথী সন্ধিঃ স্থলে ভাগীরথীর মুখ কেন এবং কোন বাদশাহের দ্বারা বিলুপ্ত হইয়াছে তাহা ঐতিহাসিকগণ অবগত আছেন কি ?

এই ভাগীরথীই রাজা ভগীরথের আদি ভাগীরথী। ইহার পার্শ্বেই রাজা ভগীরথের রাজধানী ভাগীরথীপুর অবস্থিত ছিল। তাহার সমর্থন মিলে বিশ্বকোষ পুণ্ড্র-বর্দ্ধন শব্দে। যেমন—"বর্ত্তমান মালদহ সহরের পরপারে যে কালিন্দী নদী বহিতেছে, এক সময়ে ভাগীরথী এই অঞ্চল দিয়া প্রবাহিত হইত। মালদহের দুই ক্রোশ পশ্চিমে ভাগীরথীপুর নামে একখানি গণ্ডগ্রাম রহিয়াছে।" এই কালিন্দীরই অপর নাম কর্ণা। আদিতে এই ভাগীরথী কালিন্দীর শাখারূপে প্রবাহিত হইয়া যতদূর সম্ভব বর্ত্তমান তর্ক্তিপুরের নিম্নে (যে স্থানে সগর বংশ তারণ হইয়া ছিল) সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছিল। আর বড় গঙ্গা (জাহ্নবী বা সরস্বতী) বর্তমান ছাপঘাটী বা ধুলিয়ানের মাঝে কোন স্থানে সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছিল। পরে বগড়ী ভূমির (নূতন বসতি স্থলের) উদ্ভব হইলে বড়গঙ্গা ও এই ভাগীরথীর মিলিত স্রোত ধারার কিয়দংশ লইয়া দ্বিতীয় ভাগীরথীর সৃষ্টি হয় এবং মূল ধারা পদ্মা নাম ধারণ করে। এই দ্বিতীয় ভাগীরথী রাজা ভগীরথের বা জহ্নুমুনির ভাগীরথী নহে। ইহা প্রকৃতি কর্ত্তৃক সৃষ্ট। প্রকৃতিরও অপর নাম ভগীরথ। কাজেই এই দ্বিতীয় ভাগীরথী ও "ভাগীরথী" আখ্যা লাভ করিয়াছে।

১০। গুপ্তবংশীয় রাজগণেররাজত্ব লাভের কিছুদিন পূর্ব্বেই মেগাস্থিনিস ভারতে আসিয়াছিলেন। তিনি পাটনা হইতে গঙ্গার স্রোত ধারায় ৩০০ মাইল দূরে গঙ্গার সাগরসঙ্গম দেখিয়া ছিলেন বলিয়া লিখিয়াছেন। এই বর্ণনানুসারে তৎকালে গঙ্গার সাগরসঙ্গম কোথায় ছিল, তাহা ঐতিহাসিকগণ স্থির করিয়াছেন কি ?

১১। যে সময়ে (৬ষ্ঠ শতাব্দীতে) মহাসামন্ত শশাঙ্ক দেবের পূর্ব্বপুরুষ কর্ণদেব (ভট্টগ্রন্থে কর্ণসেন) কর্ত্তৃক কর্ণসুবর্ণ নগরে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সময়ে বগড়ী-ভূমি ও তৎসহ দ্বিতীয় ভাগীরথীর সৃষ্টি হইয়াছিল কি ?

১২। সেন রাজগণের পূর্ব্বে বগড়ীভূমির কোন অংশের নাম কোথাও মিলে কি ?

১৩। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ, নাকি প্রমাণ করিয়াছেন যে রাঙ্গামাটির মৃত্তিকা বহু প্রাচীন এবং ষষ্ঠ শতাব্দার বহু পূর্ব্বে এই মৃত্তিকা গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু ঐ স্থানে দ্বিতীয় ভাগীরথীর পূর্ব্বপারের মৃত্তিকা কত প্রাচীন তাহা তাঁহারা স্থির করিয়াছেন কি ?

১৪। বিশ্বকোষ গঙ্গা শব্দে বর্ণিত আছে :—"পূর্ব্ব-কালে গৌড় নগরের দক্ষিণে সাগর সঙ্গম ছিল।" এবং "কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিণী পাঠে জানা যায় যে ললিতাদিত্য যখন গৌড়ে আগমন করেন, তখন গৌড়ের পরই পূর্ব্ব সমুদ্র প্রবাহিত ছিল (রাজতরঙ্গিণী ৫ তরঙ্গ)"। ঐতি-হাসিকগণ মানিতে ইচ্ছুক নহেন কি ?

১৫। শ্রদ্ধেয় ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেন—"ঈশান বর্ম্মণ মৌখরির হড়হা লিপিতে (৫৫৪ খৃষ্টাব্দে) গৌড়জনদের বর্ণনা করা হইয়াছে 'গৌড়ান্ সমুদ্রাশ্রয়ান্'। এই কথার সমর্থন পাওয়া যায় একাদশ শতকের গুর্গি লিপিতে। এই লিপিতে হ ইয়াছে "The Lord of gonda lies in the watery port of the sea." (বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব্ব, ১৫৩ পৃষ্ঠা)।

একাদশ শতাব্দীতেও গৌড়ের গৌড়েশ্বরী অথবা শ্রীশ্রীপাতালচণ্ডী (দেবী পাটলা) সমুদ্র শাখার উপকূলেই বাস করিতেন, শ্রদ্ধেয় ডাঃ রায় মহাশয়ের এই উক্তিতে সমর্থন মিলে না কি ?

এই পাতালচণ্ডীই মুনিঋষিগণের প্রতিষ্ঠিত গৌড়েশ্বরী। আদিতে এই পাতালচণ্ডীকে কেন্দ্র করিয়া মুনিঋষিগণ ঐ স্থানে বসবাস করেন। পরে মহিষী পালক ও গোপালকগণ ঐ দ্বীপকে চারণ ক্ষেত্ররূপে গ্রহণ করিলে উহার নাম হয় গৌড় (গৌ—গাভী এবং মাহিষী ; ড=শব্দ এবং ত্রাস ; অর্থাৎ যে স্থানে গাভীর শব্দ উত্থিত হয় এবং মাহিষী ত্রাস আনয়ন করে তাহাই বিস্তাপতির আভ্যসার গৌড় । পরবর্তী কালে গৌড়ে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইলে পাতাল-চণ্ডীর প্রায় তিন ক্রোশ দক্ষিণে এবং তর্ত্তিপুরের প্রায় চারিক্রোশ উত্তরে গৌড়েশ্বরী নামক অপর একটি বেদী প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৬। কোন কোন পুরাণকারক এবং মুসলমান ঐতিহাসিক অঙ্গ, গৌড় ও সুহ্মকে (আদি নদীয়াকে রাঢ় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, ঐতিহাসিকগণ ইহার প্রকৃত তথ্য আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন কি ?

১৭। পুণ্ড্র বর্দ্ধন ও গৌড় মহানন্দা নদীর ব্যবধানে পাশাপাশি রাজধানী অথচ প্রত্যেক স্থলেই পুণ্ড্র বর্দ্ধন বরেন্দ্র মধ্যে কিন্তু কোন কোন স্থলে গৌড় রাঢ় মধ্যে গৃহীত হইয়াছে, ইহার প্রকৃত কারণ কি ?

(ব—বসতি, র—কামবহ্নি, কাম বহ্নির বসতি স্থলের মধ্যে ইন্দ্র, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার সৌন্দর্য্যময় স্থলই বরেন্দ্র নামে খ্যাত। রা=বিভ্রম, ঢ=অশোভা, অর্থাৎ বিভ্রান্তি কর ও শোভাবিহীন ভূভাগ রাঢ় নামে পরিচিত)।

১৮। তিরুমলগিরির আবিষ্কৃত দশম শতাব্দীর শিলা-লিপিতে গৌড়পতি মহীপালের রাজ্য উত্তর রাঢ়ে বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। এই উত্তর রাঢ় অঙ্গ, গৌড় ও সুহ্ম একত্রে (হিমালয় পাদদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া গৌড় ও সুহ্মের দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত) নহে কি ?

১৯। এই মহীপালের রাজত্বকালে পূর্ব্বোক্ত আদিশূর বংশীয় রণশূর দক্ষিণ রাঢ়ের দক্ষিণাংশ শাসন করিতেন। এই দক্ষিণ রাঢ় বড় গঙ্গা ও দ্বিতীয় ভাগীরথীর (মুর্শিদাবাদে প্রবাহিতা পশ্চিম পার নহে কি ?

২০। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়ের ১ম ভাগের ১১৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—"এতন্মধ্যে ব্রহ্ম-পুরীর বর্ত্তমান নাম ব্রহ্মপুর ইহা মালদহ হইতে ৫ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে ভাগীরথীর ১ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত, আবার পবনদূতে গঙ্গার পশ্চিম তীরে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মোত্তর নামক দুইটি গ্রামের কথা লিখিত আছে। এই গ্রাম দুইটিই কি একযোগে আদিশূরের সময়ে ব্রহ্মপুরী বা ব্রহ্মকোটী আখ্যালাভ করে নাই ?

ব্রহ্মের বর্ত্তমান নাম ব্রাহ্মণগ্রাম (বর্ত্তমান কালিয়াচক থানা মধ্যে গৌড়ের পরপারে সুজাপুরের পার্শ্বে), ব্রাহ্মণ-গ্রামের উত্তরে ব্রহ্মোত্তর পূর্ব্ব নামেই পরিচিত, আর আদিভাগীরথীই ঐ অঞ্চলে গঙ্গা নামে পরিচিত।

২১। শ্রদ্ধেয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত বাঙ্গলার ইতিহাস ১ম ভাগের ৮২ পৃষ্ঠায় শশাঙ্কদেবের মুদ্রা-প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে : "তাঁহার যেসমস্ত মুদ্রা শশাঙ্কনামে মুদ্রাঙ্কিত তৎসমুদায়ের এক পার্শ্বে নন্দীর পৃষ্ঠে উপবিষ্ট

মহাদেবের মূর্ত্তি ও অপর পৃষ্ঠে পদ্মাসনে সমাসীনা লক্ষ্মীর মূর্ত্তি আছে।"

রাঙ্গামাটি খননের ফলে ঐরূপ কোন নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে কি ?

২২। ঐরূপ কোন নিদর্শন পাওয়া গেলে তাহা কোন কালে স্থানান্তরিত হইয়া আসিতে পারে না কি ?

২৩। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস রাজন্যকাণ্ডের ১ম ভাগের ৬৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে :—"কোন প্রাচীন পুস্তক বা খোদিত লিপিতে শশাঙ্কর নামান্তর নরেন্দ্র গুপ্ত বাহির হয় নাই বরং তাঁহার যে সুপ্রাচীন মোহর আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে তিনি মহাসামন্ত শশাঙ্কদেব নামে পরিচিত হইয়াছেন।"

ঐতিহাসিকগণ কি বলিতে চান যে শশাঙ্ক গুপ্ত বা নরেন্দ্র গুপ্ত এবং মহাসামন্ত শশাঙ্কদেব একই ব্যক্তি এবং তাঁহারা একই রাজ্যের রাজা ছিলেন ?

২৪। এই শশাঙ্কদেব এবং শশাঙ্ক গুপ্ত যদি একই ব্যক্তির নাম হয় তাহা হইলে হর্ষবর্দ্ধনের মিত্ররাজ কামরূপপতি ভাস্করবর্ম্মা পুণ্ড্রবর্দ্ধন আক্রমণ করিয়া এক শশাঙ্ককে হত্যা করার পরেও কোন্ শশাঙ্ক মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত হর্ষবর্দ্ধনকে ব্যাতিব্যাস্ত করিয়া রাখিয়াছিল ?

২৫। বর্ত্তমান মাণিকচক থানার পশ্চিমাংশ, প্রাচীন শিবগঞ্জ থানার পশ্চিমাংশ এবং সমগ্র কালিয়াচক থানা দুইটি গঙ্গা নাম্নীয় নদীর দ্বারা বিধৌত। একটির ডাক নাম ভাগীরথী, অপরটি বড়গঙ্গা। গৌড় কোনটির তীরে অবস্থিত ?

২৬। বিশ্বকোষ, বঙ্গদেশ শব্দ মধ্যে লিখিত আছে : "তবকৎ-ই-নাসিরী নামক ইতিহাসে লিখিত আছে, লক্ষ্মণাবতী নামক রাজ্যের অন্তর্গত নদীয়া নগর রায় লছমনিয়ার রাজধানী, গঙ্গার উভয় কুলে ঐ রাজ্যের দুইটি বাহু আছে।"

এই নদীয়ানগর আদি নদীয়া (নদী+যা বা গতি, অর্থাৎ যাহার চতুর্দ্দিকে নদীর গতি প্রবাহিত ; উত্তরে কালিন্দী, পূর্ব্বে ভাগীরথী, দক্ষিণে ও পশ্চিমে বড়গঙ্গা) বা সুহ্মের একাংশের অর্থাৎ কর্ণসুবর্ণের অপর নাম নহে কি ?

২৭। বিশ্বকোষ লক্ষ্মণাবতী শব্দে উল্লিখিত হইয়াছে লক্ষ্মণাবতী বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানী, ইহার অপর নাম গৌড়, গৌড়েশ্বর মহারাজ লক্ষ্মণ সেন (মতান্তরে সেন বংশীয় শেষ রাজা লছমনিয়া) গৌড় রাজধানীর নানাবিধ সংস্কার সাধন করিয়া 'লক্ষ্মণাবতী' নাম রাখিয়া ছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত নদীয়া এবং এই লক্ষ্মণাবতীই কি আদি ভাগীরথীর দুইটি বাহু নহে ?

২৮। বিশ্বকোষে 'বঙ্গদেশ' শব্দে বর্ণিত আছে :—"তবকৎ-ই-নাসিরী নামক ইতিহাসে লিখিত আছে… নদীয়া এবং লক্ষ্মণাবতী উভয় নগরই রাঢ় প্রদেশে বিদ্যমান।" বর্ত্তমান নদীয়া বগড়ীভূমির অন্তর্গত। সুতরাং এস্থানে রাঢ় বলিতে বড়গঙ্গা ও মহানন্দার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগকে বুঝাইতেছে না কি ?

২৯। এই নদীয়া নগরেরই অপর নাম লক্ষ্মণ নগর বা লখ্নোর নহে কি ?

৩০। সেন রাজগণের রাজত্ব কালে মিথিলা, অঙ্গ, গৌড়, সুহ্ম—(আদি নদীয়া), চোউলা (চৌ-চারি, উলা=বেলা, চতুর্দ্দিক বেলা-বেষ্টিত ভূখণ্ড ; গৌড়ের দক্ষিণ-পূর্ব্বস্থিত দ্বীপ), গোমেদ (এই দ্বীপের রাজা ছিলেন গোপতি নাথ, কাজেই প্রথমে এই দ্বীপটির নাম ছিল গোপতিপুর, পরে গৌতম ঋষির অভিশাপে রাজার গাভীসকল ধ্বংস হইলে উহার নাম হয় গোমেদ—বিশ্বকোষ গোমেদ শব্দ দ্রষ্টব্য। বর্ত্তমান নাম গোপীনাথপুর বা ভোলাহাট, একটি প্রকাণ্ড বিলের ব্যবধানে গৌড়ের পূর্ব্বপার্শ্বে মহানন্দার দক্ষিণ এবং পশ্চিম পারে অবস্থিত, এই বিলটি বিভিন্ন নামে উহাকে দক্ষিণপশ্চিমে বেষ্টন করিয়াছে)। মৌরসুধাবাদ (মুর্শিদাবাদ) এবং দ্বিতীয় নদীয়া (বর্ত্তমান নদীয়া) এই নয়টি দ্বীপ সেন রাজগণের সময়ে গৌড় কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং গৌড়ই আদি নবদ্বীপ নহে কি ?

ঐ সময়ে বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ দ্বীপরূপে গৌড়ের দক্ষিণস্থ সমুদ্র বক্ষে উদ্ভূত হইয়াছিল, তজ্জন্যই উহার নাম হয় মৌরসুধাবাদ। কেন না মৌর অর্থে বেষ্টিত এবং সুধা অর্থে জল অর্থাৎ চতুর্দ্দিক জল বেষ্টিত আবাদ (পার্শিভাষায়) ভূভাগ। সেইরূপ মুর্শিদাবাদের দক্ষিণে আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের উদ্ভব (অনেকে

[দ্বী]পে নয়টি) হইয়া নবদ্বীপ আখ্যা লাভ করে। পরে ঐ [দ্বী]পগুলি খাল বিলের ব্যবধানে এক যোগে চতুর্দ্দিক [নদী]বেষ্টিত (অনুমান, উত্তরে পাগলাচণ্ডী, পশ্চিমে দ্বিতীয় ভাগীরথী, পূর্ব্বে পদ্মা, ও দক্ষিণে জলাঙ্গী) হইয়া নাম গ্রহণ করে নদীয়া। কাজেই পরবর্ত্তীকালে বড় গঙ্গার ধ্বংস লীলার ফলে আদি নদীয়ার নাম বিলুপ্ত হয়।

৩১। ইংরাজ রাজত্বের আদিতে যে সময়ে জেলা গঠন হয়, সেই সময়ে 'মালদহ' নামে কোন জেলা সংগঠিত হইয়াছিল কি ?

৩২। প্রথমে, জেলা গঠন কালে উত্তরে কালিন্দী, পূর্ব্বে মহানন্দা, দক্ষিণে পদ্মা ও বড়গঙ্গা, পশ্চিমে বড়গঙ্গা মধ্যস্থিত ভূভাগকে পার্শ্ববর্ত্তী জেলা সমূহের (রাজশাহী, দিনাজপুর, ভাগলপুর, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ) মধ্যে বিভক্ত করিয়া দেওয়া হয় নাই কি ? এবং এই সময়ে পুর্ণিয়া জেলাও মালদহের ন্যায় ভাগলপুর মধ্যে গণ্য ছিল না কি ?

৩৩। পরবর্ত্তীকালে ঐ সব জেলা হইতে ঐ অংশকে এবং তৎসহ উত্তর ও পূর্ব্বস্থিত জেলা সমূহের অতিরিক্ত কিয়দংশ লইয়া মালদহ জেলা গঠিত হয় নাই কি ? এবং পুর্ণিয়াকে ভাগলপুর হইতে বিচ্ছিন্ন করা হয় নাই কি ?

৩৪। তৎকালীন (প্রথম জেলা গঠন কালের) ভৌগোলিক বিবরণ বর্ত্তমান সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতেছে কি ?

৩৫। বিশ্বকোষে বঙ্গদেশ শব্দ মধ্যে কর্ণসুবর্ণ নগরের বিবরণ প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে :—"শশাঙ্কের সহিত ব্রাহ্মণ প্রভাব কিছুদিনের জন্য এদেশ হইতে অন্তর্হিত হইল। এমন কি তৎকালে এদেশে বেদবিৎ কর্ম্মঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন না। তাই ত্রিপুরপতি ধর্ম্মপালকে মিথিলা হইতে বেদবিৎ ব্রাহ্মণ আনাইতে হইয়াছিল।"

এই মৈথিলী ব্রাহ্মণগণের কোন নিষ্করভোগী বংশধর মুর্শিদাবাদের রাঙ্গামাটিতে বসবাস করিতেছেন কি ?

মহাসামন্ত শশাঙ্ক দেবের অবসানে তৎকালীন উত্তর-রাঢ় হইতে বেদবিৎ ব্রাহ্মণের বিলোপ ঘটে, যাঁহারা অবশিষ্ট ছিলেন তাঁহারা বহু পূর্ব্বেই ক্রিয়াকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সপ্তসতী আখ্যা লাভ করিয়া ছিলেন। পরে আদিশূর কনৌজ হইতে ৫ জন বেদবিৎ ব্রাহ্মণ আনাইয়া আদি ভাগীরথীর উভয় তীরে (তৎকালীন উত্তর রাঢ়) কঙ্কগ্রামে (দেশজনাম কাঁকগোল), হরিপুরে, কামাতে, ব্রহ্মপুরে এবং বটতলীতে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ বংশধরগণ তৎকালীন উত্তর রাঢ়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে রাঢ়ী আখ্যা লাভ করেন। আর মহানন্দার পূর্ব্বপারে যে সব আদি বাঙ্গালি ব্রাহ্মণ ছিলেন তাঁহারা বারেন্দ্র নামেই পরিচিত থাকেন।

আদিশূরের পুত্র ভূশূরের সিংহাসনচ্যুতি এবং বর্ত্তমান রাঢ় প্রদেশে তাঁহার পলায়নের সঙ্গে সঙ্গে ঐ পঞ্চ রাঢ়ী ব্রাহ্মণ ভূশূরের সহিত বর্ত্তমান রাঢ় প্রদেশে যাইয়া বিভিন্ন গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হন এবং রাঢ়ী ব্রাহ্মণ বংশধরগণ নিজ নিজ গ্রামের নামানুসারে উপাধি মণ্ডিত হন। কাজেই ভূশূরের সিংহাসনচ্যুতির জন্য তৎকালীন উত্তর রাঢ়ে পুনরায় বেদবিৎ ব্রাহ্মণের অভাব ঘটে। এই কারণে পাল বংশীয় রাজগণ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের দোহাই দিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিস্তার কল্পে মিথিলা হইতে বেদবিৎ ব্রাহ্মণ আনাইয়া তৎকালীন উত্তর রাঢ়ে (শোভানগর, আড়াই ডাঙ্গা, মথুরাপুর, অমৃতি, বাঙ্গিটোলা প্রভৃতি স্থানে) প্রতিষ্ঠিত করেন।

বৌদ্ধ মতবাদ প্রচার জন্য এই মৈথিলী সমাজ সেন-রাজগণের আগমনে স্থগিত হন। আর ঐ সঙ্গে কনৌজ হইতে পুনরায় একদল বেদবিৎ ব্রাহ্মণ আগমন করেন। বল্লাল সেন তাঁহাদিগকে বঙ্গাল প্রদেশে (বঙ্গের আইল বা সীমা ইংরাজ রাজত্বকালীন রাজসাহী, পাবনা এবং মালদহের কিয়দংশ) প্রতিষ্ঠিত করেন। ফলে এই নবাগত কনৌজ দল নাম গ্রহণ করেন দক্ষিণ বারেন্দ্র আর পূর্ব্বোক্ত বাঙ্গালী বরেন্দ্র সমাজের নাম হয় উত্তর বারেন্দ্র।

আদিশূরের সময় হইতে তাঁহার চেষ্টায় সপ্তসতী ব্রাহ্মণ-গণ কনৌজাগত ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে যজন যাজন কার্য্যে শিক্ষা লইতেছিলেন। বল্লাল সেনের কৌলীন্য প্রথা-প্রবর্ত্তন সময়ে ইহারাই "বর্ণ ব্রাহ্মণ" আখ্যা লাভ করেন। পরে কর্ম্মগুণে নিজ সমাজচ্যুত হইয়া অনেক বৈদিক, বারেন্দ্র ও রাঢ়ী ভায়েরাও ইহাদের সহিত যোগদান করেন।

৩৬। গৌড়ের শেষ রাজধানী টাঁড়া কি গৌড় রাজ-

ধানীর পরপারে আদি ভাগীরথীর পশ্চিমে অবস্থিত ছিল না ?

৩৭। বর্ত্তমানে টাঁড়ার রাজধানীর কোন স্মৃতি মিলে কি ?

৩৮। ঢাকার নবাবী আমলের সমসাময়িক কালে এই টাঁড়া নগরী বড়গঙ্গার জলপ্রবাহে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল কিনা তাহা কেহ বলিতে পারেন কি ?

সম্রাট সাজাহানের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত এই টাঁড়া নগরী ধ্বংস প্রাপ্ত হয় নাই। কেন না সাহ সুজা ঔরঙ্গজেবের নিকট পরাজিত হইয়া এই টাঁড়া রাজধানীতে আশ্রয় লইয়াছিলেন। পরে ঔরঙ্গজেবের সৈন্য বাহিনী তাঁহাকে পুনরায় আক্রমণ করিলে, তিনি জলপথে টাঁড়া হইতে সপরিবারে আরাকানে পলায়ন করেন।

৩৯। যে কারণে টাঁড়া নগরী ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল সেই কারণেই গৌড়ের বাদশাহী আমলে কর্ণসুবর্ণ নগরের স্মৃতিও বিলুপ্ত হইতে পারে নাকি ?

অনুমান, গিয়াসুদ্দিন বাদশাহের রাজত্বকালেই কর্ণসুবর্ণ নগর বড় গঙ্গার জলপ্রবাহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল কেন না তিনি ঐ রাজধানীকে কাঁকজোল আখ্যা দিয়া পূর্ব্বদিকে অমৃতি পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন এবং তথা বল্লাল সেনের "ফুলবাড়ী কেল্লার" অনুকরণে অপর এক ফুলবাড়ী কেল্লা স্থাপন করিয়াছিলেন।

বার্দ্ধক্য

রমা দেবী কাব্যতীর্থ

সুবিস্তীর্ণ স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে
শব্দহীন তন্দ্রাতুর দূর চক্রবালে
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুভ্র মেঘদল—
সোনালী চিলের সারি অক্লান্ত চঞ্চল।
তারি মাঝে বসে আছ স্থির অচঞ্চল
শুভ্র রৌপ্য রেখাময় তুমি অস্তাচল।
রিক্তভার বৃক্ষশাখা নিরাসক্ত মন
সুদূর অতীতখানি কর রোমন্থন।
বুঝি তুমি হারায়েছো দিশা
হালভাঙা নাবিকের মত
চোখে তাই নামিয়াছে নিশা
ফুরায়েছে আয়োজন যত।
হে বার্দ্ধক্য, তব মৌনভার
আকাশ প্রান্তর আর নক্ষত্রের দল
পারেনা বহিতে তাই করে ছল ছল
হে সৌম্য বিষাদ তব নয়ন স্তিমিত
অভিমানে নতমুখী প্রেয়সীর মত
প্রয়োজন ফুরায়েছে আজ
শুধু অবসর আছে নাহি কোনো কাজ।
তাই বুঝি মনোরথ ধায়
সুদূর দিগন্তে ফিরে সবারে শুধায়
কোথা গেলো সেই নারী ?
যাহারে ঘিরিয়া মোর নক্ষত্রের ছিলো আলোড়ন
যাহার লাগিয়া পুষ্প কোরেছি চয়ন
মধুময় সে রজনী বিস্মৃতির প্রায়
লুপ্ত হয় নাই সেই দুর্ল্লভ সঞ্চয়।
গহীন তিমির মাঝে কল্যাণ তারকা
সূর্য্যালোকে মাঝে যেন কুয়াসায় ঢাকা
ললিত দেহলী তটে লাবণ্যের ঢেউ
হে আকাশ হে বনানী জানকি তা কেউ ?
শক্তিমতী সেই নারী ম্লানাভ অতীত
রূপ হোতে রূপান্তরে কোথা অন্তর্হিত
চলমান পৃথিবীর আদিম বেদন
জলে স্থলে নভোনীলে করে সে ক্রন্দন।
বাতায়ন তলে ক্ষীণ আঁখি তারকা
নির্ব্বাক নিস্পন্দ যেন ভীরু দীপশিখা
অব্যক্ত ভাষায় তার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত
অনিশ্চিত প্রত্যাশায় ছিনু রোমাঞ্চিত
আমি সেই নারী—
মহামুনি তপস্বীর ধ্যান ভঙ্গকারী।

সবুজ আপেল

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

রমাদির কথা মনে পড়বার নয়।

কেননা, পঁয়ত্রিশ বছর আগে মাত্র একদিন এবং তাও অত্যন্ত সীমিত সময়ের পলকে রমাদিকে দেখেছিলাম। লম্বা একহারা চেহারা ফর্সা ধবধবে রঙ, টানাটানা আয়ত দুটি নয়ন কিন্তু বড় যেন বিষণ্ণ! লম্বা লম্বা আঙুলে পিয়ানোর চাবি টিপে ক্লান্তির সুর ঝঙ্কারে গান গাইছিলেন রমাদি। পিয়ানোর সেই ক্লান্তির সুরে মিহি চিকন গলায় রবীন্দ্র সঙ্গীত,—হ্যাঁ, তাও আমার মনে পড়বার কথা নয়।

কেননা, পঁয়ত্রিশ বছর আগে মাত্র একটি সন্ধ্যা ধুসর মুহূর্তে সে গান শোনা। তাও আবার সে-গান শেষ করতে পারলেন না রমাদি। সমুদ্রের ভাঙা কান্নার হাওয়ায় সে-গানের সুর শুধু মূর্চ্ছাহত হয়ে রইলো।

তাঁর মা এসে ঘরে ঢুকলেন। রমাদির মা। ঠিক তাঁর বিপরীত। স্থূল চেহারায় অত্যন্ত সাজগোজের আধিক্য। রেশমী শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে স্বাস্থ্যের দীপ্তি। আর একটা উগ্রতা তাঁর সর্বশরীরে পরিব্যাপ্ত।

'রমা, তুমি আবার গান গাইছো? ডাক্তারের বারণ, এই শরীরে—শাসনের কণ্ঠ আমাদেরও তিরস্কৃত করলো। মেয়েকে এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দিকেও তীর্যক দৃষ্টিতে তাকালেন। অর্থাৎ, 'তোমাদেরই বা কী আক্কেল বাপু, গানের পরিশ্রম কী ওই রোগা মেয়ের শরীরে সয়!'

গান মূর্চ্ছাহত তো হলই,—আমরাও যেন মরমে মরে গেলাম।

বড়দি কুণ্ঠিতস্বরে বললেন, ''না মাসিমা, গান কিন্তু আমরা শুনতে চাইনি। আমরা তো জানি রমাদির অসুখ আর তার জন্যেই সমুদ্রের ধারে এই চেঞ্জে আসা।

রমাদির মা আপ্যায়িত হলেন না মোটেই বড়দির এ-কথায়। আর আমাদের দিকেও ফিরে তাকালেন না।

বড়দি কী ভাবলেন জানি না; আমি কিন্তু দশবছরের বালক এ কথায় আহত হলাম। সেই অল্প বয়সেই আমার যেন মনে হল, প্রকারন্তে রমাদির মা আমাদের অপমানই করলেন। তাঁদের এ সুসজ্জিত ঘর, এই পিয়ানো, এই সুর, না, না, এ যেন আমাদের জন্যে নয়। আমাদের এই সাজ পোশাকে, সাধারণ মধ্যবিত্তের অবস্থায় এখানে আসাই চলে না।

'নীলসিন্ধু' বড় বাড়ি। সামনে কেয়ারি করা লন সবুজ ঘাসের আস্তরণ আর চারিদিকে মরসুমী ফুলের সজ্জা বাড়ির পূর্বদিকে ঝাউবন আর দক্ষিণে বিস্তৃত সমুদ্র। পুরীর এই আভিজাত্যপূর্ণ বাড়িতে যাঁরা থাকেন, তাঁরা সমাজের ওপরতলার লোক। আমাদের এখানে অনধিকার প্রবেশ।

রমাদি কিন্তু তাঁর মায়ের এই কঠিন ব্যবহারে লজ্জিত হলেন বোধহয়। তিনি বললেন, 'আমারই একটু গান গাইতে ইচ্ছে করছিলো মা। বিছানায় শুয়ে শুয়ে রোগের চিন্তায় জর্জরিত হয়ে উঠছিলাম।

রমাদির মা বললেন, 'কিন্তু এ-শরীরে ষ্ট্রেইন করা তো ডাক্তারের একেবারে নিষেধ। এমন কী বেশি কথাবার্তা বলাও বারণ।

রমাদির মা বলে গেলেন।

আমরাও উঠে পড়লাম।

বড়দি বললেন, 'আর একদিন আসবো ভাই। আর এসে অল্পক্ষণ থাকবো। সত্যিই বিশ্রামই আপনার শুধু দরকার।'

রমাদি আমাকে আপেল আর বিস্কুট দিলেন। আপত্তি

জানাতে গেলে বললেন, 'তাহলে কিন্তু আমি দুঃখ পাবো। মনে করবো যে তুমি আমাকে দিদি বলে মনে করো না।'

আপেলটা খুবই মিষ্টি,—কিন্তু তার গায়ে ফিকে সবুজ রঙে রক্ত বর্ণের যে ছটা তা কেন জানি না আমার দশ-বছরের বালক মনে বেদনারই সঞ্চার করেছিলো।

বড়দি প্রায়ই যেতেন 'নীলসিন্ধু' বড় বাড়িতে। রমাদির সঙ্গে তাঁর কেমন করে না জানি একটা আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো।

নীলসিন্ধুর অনতিদূরে একটা একতলা ছোট বাড়িতে আমরা উঠেছিলাম। পুরীর সমুদ্রতীরে কিছুদিন কাটিয়ে যাবো। আমাদের মধ্যবিত্তের সংসার। হৈচৈ আনন্দ-গুঞ্জনে কয়েকটি দিনের প্রবাস-ভ্রমণ।

এখানে-ওখানে বেড়াতে যাওয়ার পালা। পুরীর জগন্নাথ মন্দির, সোনার গৌরাঙ্গ, গম্ভীরা—এ সব তো আছেই। তাছাড়া ভুবনেশ্বর, কোনারক, চিল্কা—আর সকাল বিকেল সন্ধ্যা রাত্রি জুড়ে সমুদ্রের তটে বসে সমুদ্র দেখা, প্রায় একমাসের মধ্যে প্রতিটি দিন যেন এক একটা উৎসবের আনন্দে মেতে থাকা।

কত পরিবারের সঙ্গে আত্মীয়তা হলো কিন্তু তবু তার মধ্যে একটি সন্ধ্যার কয়েককলি রবীন্দ্র সঙ্গীতের ক্লান্ত সুর আর একটা ফ্যাকাশে শরীর থেকে থেকে আমার মনকে আকর্ষণ করতো। কিন্তু কী যেন এক দুস্তর বাধার প্রাচীর, সে প্রাচীর ডিঙিয়ে আমি আর কোনদিনই রমাদির নীলসিন্ধুর বড় বাড়িতে যেতে পারিনি।

বড়দির মুখেই শুনতাম যে রমাদি আমার কথা জিগ্যেস করেন। আর মাঝে মাঝে আমার জন্যে পাঠিয়ে দেন সবুজ আপেল যার গায়ে রক্ত বর্ণের ছটা।

আপেল খেতে নাকি রমাদি খুবই ভালোবাসেন। বড়দি তাই মাঝে মাঝে আপেল কিনে নিয়ে যেতেন রমাদির জন্যে।

রমাদির জন্যেই নাকি তাঁর বাপ-মা পুরী এসেছেন। ওঁর নাকি হার্টের রোগ। সমুদ্রের হাওয়ায় পরিপূর্ণ বিশ্রাম নেওয়ার নির্দেশ ডাক্তারের। তাই ফ্ল্যাগ ষ্টেশনের ধারে নীলসিন্ধু বড় বাড়ির এই বিস্তীর্ণ গৃহখানি ওঁর বাবা কিনেছেন।

রমাদিরা ব্রাহ্ম। ওঁর বাবা কোন একটা বড় রাজ এষ্টেটের ম্যানেজার। বিয়েও হয়েছে তাঁর কোন এক ধনীর আদুরে দুলালীর সঙ্গে। কিন্তু সে বিবাহ নাকি সুখের হয়নি।

দশবছরের ছেলে—এ কথাটি জেনেছিলাম। কিন্তু এর গুরুত্ব কিছুই বুঝতাম না। শুধু ওই লম্বা একহারা চেহারা, ফর্সা ধবধবে রঙের রুগ্‌ণা তরুণীটির প্রতি কোথায় যেন একটা মমতা-বোধ আমার মনের মধ্যে গ্রথিত হয়েছিলো। রমাদির জন্যে মাঝে মাঝে মন কেমন করতো কিন্তু ওর মার কথা ভেবে আমার সাহস হতো না যে আর ও বাড়ির দরজা মাড়াই। তাছাড়া পাড়াপড়শীরা রটনা করেছিলেন রমাদির নাকি টি, বি। তাই ও বাড়ি যাওয়া আমার পক্ষে নিষিদ্ধ। নিতান্ত বড়দি মানতেন না; তাই তিনি যেতেন। বড়দি যখন রমাদির কাছে যেতেন আমি তাঁকে আপেলের কথা স্মরণ করিয়ে দিতাম।

পঁয়ত্রিশ বছর বাদে আবার পুরী এসেছি।

সপরিবারে আবার হৈচৈএর সংসার। কয়েকদিনের অবকাশ যাপনের পালা নীল-সমুদ্র সৈকতে। নীল থৈ থৈ নীলাম্বুরাশি আর ঢেউ-এর গর্জন বিকেল না হতেই ডাক দিচ্ছিল।

গৃহিণীকে ডেকে বললাম বেরুবার জন্যে প্রস্তুত হতে।

স্বর্গদ্বারের প্রান্তসীমায় একখানি বাড়ির দোতলা দু'খানি ঘর। সেখান থেকেও সমুদ্র দেখা যায়।

সারা রাত্রি ট্রেনে জেগে আসতে হয়েছে। অসম্ভ ভীড় ছিলো পুরী এক্সপ্রেসের সেকেণ্ড ক্লাশ কামরায় তারপর এসেই সংসার গোছানোর পালা। রান্নাবান্না গৃহিণী ক্লান্ত। বললেন, 'এরই মধ্যে কেন? সন্ধ্যে হোক'

বললাম, 'এখানে আসা কী চারদেয়ালে আবদ্ধ হবার জন্যে?'

'কেন, ঘর থেকেও তো সমুদ্র দেখা যাচ্ছে।'

'ঘরের জানালা দিয়ে সমুদ্র দেখা আর সমুদ্রতীরে ব সমুদ্রের ঢেউ গোনার মধ্যে অনেক তফাৎ।'

গৃহিণী রাজি হলেন না! বললেন, 'বড্ড পরিশ্রান্ত তারপর রাত্তিরের জন্যে আবার রান্নাবান্না আছে। তার চে কাজ সেরে একেবারে বেরুবো। রাত্রে বাড়ি ফিরবো।

অগত্যা তাই।

কিন্তু আমি আর থাকতে পারলাম না। কীসের যেন আকর্ষণ,—পায়ে পায়ে বেরিয়ে এলাম। স্বর্গদ্বার থেকে আরো পূর্বদিকে ফ্ল্যাগ স্টেশন।

দুপুরের রোদ থেকে বিকেলের দিকে বেলা গড়িয়ে চলেছে। সূর্য পশ্চিমের দিকে সরে সরে যাচ্ছে। তবুও বালিতে এখনো উত্তাপ। সমুদ্রের ঢেউএর ফেনায় পা ভিজিয়ে চলতে থাকি।

আশ্চর্য! একী!

'নীলসিন্ধু',—পাথরের বিবর্ণ ফলকের অস্পষ্ট রেখা আমার চোখের সামনে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠলো। 'নীলসিন্ধুর' আর সে জৌলুষ নেই। ভাঙা গেট,—সামনের লনে আগাছা ভর্তি। কয়েকটি ছাগল চরছে সেখানে। আর পড়ো ঘরগুলি হাঁ হাঁ করছে। দরজা-জানলা নেই—ছাদ আধখানা ঝুলে পড়েছে। ভিতরে ঢুকতে কেমন যেন সোঁদা সোঁদা গন্ধ, আবছা অন্ধকার। কয়েকটি বাদুড়ের ডানা ঝাড়ার শব্দে চমকে উঠলাম। খানিকটা অগ্রসর হতে দেখলাম ওপরে উঠবার সিঁড়ি। ভাঙা সিঁড়ির কয়েকটি ধাপ,—সেখানে স্যাওলার ঘন ছাপ। ফিরেই আসছিলাম, কিন্তু কীসের আকর্ষণে সেই ভাঙা সিঁড়ির ধাপে পা বাড়ালাম আবার। একটা পিয়ানোর অস্পষ্ট-স্বরের সঙ্গে মিহি চিকণ গলার ক্লান্ত সুর।

কিছুক্ষণের স্তব্ধতা আর আত্মবিস্মৃতি।

লম্বা একহারা চেহারা, ফর্সা ধবধবে রঙ, আয়ত নীল একজোড়া চোখ,—একটা স্পষ্ট তরুণীর মূর্তি পিয়ানোর চাবি টিপে ক্লান্ত সুরে রবীন্দ্র সঙ্গীতে আত্মবিভোর!

'রমাদি!'

চোখ রগড়ে দেখলাম, 'হ্যাঁ, 'নীলসিন্ধুর' পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার সেই রুগ্‌ণা রমাদি,—আরো পাণ্ডুর, আরো ধূসর!

মাত্র কয়েক পলকের জন্যে। ভয় হলো হয়তো ওঁর মা সেই শাসনের ভঙ্গিতে এক্ষুণি আমার সামনে এসে দাঁড়াবেন।

পায়ে পায়ে সেই স্যাওলাধরা সিঁড়ি বেয়ে আবার নীচে নেমে এলাম। না, রমাদির মা নেই। আগাছায় ভর্তি 'নীলসিন্ধু'র লনটিতে ছাগল চরছে। আর সমুদ্রের হাওয়া হুটোপুটি খাচ্ছে।

কিন্তু কী আশ্চর্য,—আমার হাতে একটা সবুজ আপেল কেন? ফিকে সবুজ আর রক্তবর্ণের ছটা।

আপেলটা কী তবে স্বর্গদ্বার থেকে আসবার সময় রমাদির জন্যে আমিই কিনেছিলাম?

আহ্বান

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাবি নিশিদিন আমি তো স্বাধীন, স্বাধীন আমার দেশ
কথা বলিবার আছে অধিকার একথা জানিতো বেশ।
যাহা সত্য তাহা বলিবারে তবে
মনে কেন মোর এত দ্বিধা হবে;
হাসিবে কেহবা হয়তো বাহবা নয়তো করিবে শ্লেষ
তবু বলে যাব জানিনা কি পাব বলার হবেনা শেষ।
যতদিন যায় দেখি শুধু হায় বেড়ে চলে অনাচার
যে করে শোষণ সেই মহাজন আজকের দুনিয়ার।
অনাহারে যারা কেঁদে শুধু মরে
ভাবেনাতো কেউ তাহাদের তরে।
শাসক সাজিয়া যে লয় কাড়িয়া কে করে
বিচার তার
তাহার শোষণে অসহায় জনে করে শুধু হাহাকার।

দিকে দিকে আজ শুনি যে আওয়াজ ক্ষুধার অন্ন চাই।
সাধুতা বুঝিগো লোপ পেল হায়
অসাধু সংখ্যা শুধু বেড়ে যায়।
তাইতো আঁধার ঘেরে চারিধার কোথা আলো
রোশনাই
ভরসা কে দেবে আঁখি মুছে দেবে নাই বুঝি কেহ নাই
তুমি তো আসিলে অ-সত্য নাশিলে হরিলে ভূভার যত
আজ তুমি কোথা হে মোর দেবতা ডাকি তোমা
অবিরত
অনাচার আর সহিতে না পারি
নেমে এস প্রভু পাপ-সংহারী।
মরুক কংস হউক ধ্বংস পাপ, অনাচার, ক্ষত
এস ধরাতলে যাক দূরে চলে আঁধার কালিমা যত।

"প্রাচ্যবাণীর" সাংস্কৃতিক সফর

পণ্ডিত শ্রীঅনাথশরণ কাব্যব্যাকরণতীর্থ

এই বৎসর "প্রাচ্যবাণী নাট্য সঙ্ঘ" দুটী বৃহৎ সাংস্কৃতিক সফরের ব্যবস্থা করিয়া শ্রীভগবানের কৃপায় প্রভূত সম্মান ও সমাদর লাভ করিয়াছে। প্রথমটীতে বিগত ইষ্টারের বন্ধে দিল্লীতে; এবং দ্বিতীয়টীতে বিগত পূজার বন্ধে মজঃফরপুর, মতিহারী, কাঠমুণ্ডুতে কয়েকটি সংস্কৃত নাট্যাভিনয়ের অতি সুন্দর ব্যবস্থাদি করা হয়।

দিল্লীতে সংস্কৃত নাট্যাভিনয়

দিল্লীতে পুণ্যশ্লোক ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী বহুদিন পূর্বেই তাঁর স্থাপিত কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত প্রাচ্য গবেষণাগার "প্রাচ্যবাণীর" একটা সুন্দর শাখা স্থাপিত করিয়াছিলেন; এইবার সেইখানে বহু বৃহৎ বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি হইয়াছে তত্রস্থ সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীমধুসূদন নন্দীর উৎসাহে।

এই বৎসর স্থির হয় যে, পূজ্যপাদ ডাঃ যতীন্দ্রবিমলের শেষ ইচ্ছানুসারে দিল্লীতে "প্রাচ্যবাণী" শাখার বার্ষিক অধিবেশন বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত করা হউক। তদনুসারে বিগত ইষ্টারের ছুটিতে ১২ই এপ্রিল, ১৯৬৫ আমরা মাতৃসমা অধ্যক্ষা ডাঃ রমা চৌধুরীর নেতৃত্বে দলবলসহ দিল্লী যাত্রা করি যুগপৎ হর্ষবিষাদ মিশ্রিত ভাব মনে লইয়া।

এবারে দিল্লীতে আমাদের চারটা সংস্কৃত নাটক অভিনয়ের সুব্যবস্থা করা হয়।

প্রথম দুটি সংস্কৃত অভিনয় হয় "দিল্লী প্রদেশ সংস্কৃত সাহিত্য-সম্মেলনের" তত্ত্বাবধানে দিল্লীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও অভিজাত প্রেক্ষাগৃহ "সাপ্রু হাউসে"। এই সুন্দর সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন সুবিখ্যাত শিল্পপতি শ্রীগিরিধারীলাল সরাফ্ ও শ্রীপ্রেমচাঁদ গুপ্ত এবং সম্পাদক ছিলেন কেন্দ্রীয় সংসদ সদস্যা সুবিখ্যাতা সমাজ সেবিকা শ্রীমতী সুভদ্রা যোশী ও সুবিখ্যাত ব্যবসায়ী শ্রীবেদপ্রকাশ খান্না।

"সাপ্রু হাউসের" ব্যবস্থাদি অতি সুন্দর। ডক্টর যতীন্দ্রবিমলের জীবিতাবস্থাতে ১৯৬২ সালের এপ্রিল মাসে প্রাচ্যবাণী কর্তৃক এই সুবিখ্যাত হলেই শ্রীজয়দয়াল ডাল-মিয়ার রামায়ণ বিদ্যাপীঠ ও ডাঃ রঘুবীরের Institute of International Culture এর উদ্যোগে "ভক্তি-বিষ্ণু-প্রিয়ম্" ও "বিমল-যতীন্দ্রম্" নামক দুইটি সংস্কৃত নাটক অতি সুন্দরভাবে অভিনীত হয়; এবং প্রথম দিনে পৌরোহিত্য করেন তৎকালীন উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ। তিনি প্রত্যেককে স্বহস্তে সই করিয়া সার্টি-ফিকেট অফ মেরিট দান করেন। এতদ্ব্যতীত, ১৯৬৩ এবং ১৯৬৪ সালে পর পর দুইবার নয়াদিল্লীস্থ রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের পুণ্য উপস্থিতিতে আমরা "অমর-মীরম্" ও "ভারত-বিবেকম্" নামক সংস্কৃত নাটক-দ্বয় অভিনয় করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলাম, এবং পরম স্নেহময় রাষ্ট্রপতি শেষোক্ত দিনে আমাদের আশীর্ব্বাদ স্বরূপ পাচশত টাকা দান করেন।

এবারে প্রথম দিন ১৪ই এপ্রিল ১৯৬৫ "শঙ্কর-শঙ্করম্" নামক অধ্যক্ষা ডাঃ রমা চৌধুরী কর্তৃক রচিত অদ্বৈত বেদান্তাচার্য শ্রীশঙ্করের পুণ্য জীবনীমূলক অভিনব সংস্কৃত নাটকটি বিশেষ সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়। পৌরোহিত্য করেন কেন্দ্রীয় ডেপুটি ইনফরমেশন মন্ত্রী শ্রীসি, আর পট্টভাই রমণ। দ্বিতীয় দিন ১৫ই এপ্রিল, ১৯৬৫ ডাঃ যতীন্দ্রবিমল বিরচিত স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্য জীবনীমূলক সংস্কৃত নাটক "ভারত-বিবেকম্" অতি সুন্দর-ভাবে অভিনীত হয়। পৌরোহিত্য করেন কেন্দ্রীয় ডেপুটি শিক্ষামন্ত্রী শ্রীভক্তদর্শন।

পরিশেষে সকলকে আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করেন অখিল ভারতীয় সংস্কৃত সম্মেলনের সুযোগ্য কর্ণধার ও সচিব ডাঃ মণ্ডন মিশ্র এবং কেন্দ্রীয় জয়েন্ট এডুকেশন সেক্রেটারী

শ্রীএল ও যোশী। শ্রীভগবানের কৃপায় উভয়দিনের অভিনয়ই উচ্চাঙ্গের হইয়াছিল।

দিল্লীতে আমাদের তৃতীয় ও চতুর্থ সংস্কৃত অভিনয় হয় ১৬ই ও ১৭ই এপ্রিল, ১৯৬৫ সুবিখ্যাত এম-পি ক্লাব হলে "প্রাচ্যবাণীর দিল্লী শাখার বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষ্যে। প্রথম দিনে পৌরোহিত্য করেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী শ্রীগোপাল রেড্ডী এবং দ্বিতীয় দিনে উড়িষ্যার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাব্। প্রথম দিনে সুবিখ্যাত পণ্ডিত ডাঃ এম-এস এ্যানে "ব্রহ্মবিদ্যা" সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দেন।

এবারের দিল্লী সফর সকল দিক হইতেই অতি সার্থক হয়, এবং আমাদের বহু নূতন বন্ধু-বান্ধব লাভ হয়। সংস্কৃত অভিনয় যে এত সহজবোধ্য ও চিত্তাকর্ষক হইতে পারে, তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া সকলেই বিশেষ আনন্দিত হন।

মজঃফরপুরে সংস্কৃত নাট্যাভিনয়

পাকিস্তানের সহিত অকস্মাৎ যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়াতে এবারের পূজাবকাশে আমরা আমাদের চিরাচরিত সাংস্কৃতিক সফরের আশা ত্যাগই করিয়াছিলাম সম্পূর্ণভাবে। অথচ, প্রায় দশ বৎসর ধরিয়া নিরবচ্ছিন্ন ভাবে পূজার ছুটীতে প্রাচ্যবাণী নাট্যসঙ্ঘ ভারতের বিভিন্ন স্থানে নাট্যাভিনয় করিয়া আসিতেছে। পরমা জননীর অতুল কৃপায় অকস্মাৎ যুদ্ধ বিরতি হওয়াতে এ বৎসরও শেষ পর্যন্ত আমাদের সাংস্কৃতিক সফর সম্ভবপর হইল। অক্লান্ত কর্মী ডাঃ রমার অদম্য উৎসাহে সাতদিনের মধ্যেই সমস্ত ব্যবস্থাদি হইল; এবং বিগত ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫, আমরা দলবলসহ মজঃফরপুরের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম।

বিশেষ আনন্দের বিষয় এই যে, আমাদের এইবার সাদর আহ্বান জানান মজঃফরপুরের সুবিখ্যাত রোটারী ক্লাব আমাদের প্রাণপ্রতিম যুদ্ধরত জোয়ানদের সাহায্যার্থ সংস্কৃত অভিনয় করিয়া অর্থ সংগ্রহের জন্য। ইহাতে আমরা সকলেই বিশেষ কৃতার্থ হইলাম। কারণ, একদিকে মজঃফরপুরস্থ রোটারী ক্লাব একটা অতি অভিজাতপূর্ণ ক্লাব। পূর্বে ইহাতে ভারতীয়গণ পদার্পণমাত্র করিতে পারিতেন না; এবং এইখানেই শ্রীক্ষুদিরাম বোমাবর্ষণ করেন কিংসফোর্ডকে হত্যার জন্য; এবং সেইজন্যে তাঁহার ফাঁসিও হয় এইখানেই। এখনও ইহার মাত্র ৩৬জন সদস্য এবং সকলেই সমাজের শীর্ষস্থানীয় লক্ষপতি। সাধারণতঃ যাঁহাদের আমরা আমাদের সংস্কৃত নাট্যাভিনয়ের দর্শক রূপে পাই তাঁহারা পণ্ডিতবর্গ, ভক্তজন, অধ্যাপক, ছাত্রবৃন্দ প্রভৃতি। কিন্তু ইহারা সংস্কৃত একেবারেই জানেন না; মজঃফরপুরে পূর্বে কোনোদিন সংস্কৃত অভিনয়ও হয় নাই; এবং ইহারা আজও অনেকেই ইয়োরোপীয় ভাবাপন্ন। অন্যদিকে, সংস্কৃত অভিনয় দ্বারা জোয়ানদের জন্য অর্থসংগ্রহও একটি সম্পূর্ণরূপে নূতন ব্যাপার। সেই জন্যই, সর্বদিক হইতেই আমাদের "মজঃফরপুর বিজয়" সত্যই একটী অতি আনন্দজনক ঘটনা নিঃসন্দেহে।

সত্যই শ্রদ্ধেয় রোটারিয়ানদের নিজের ভাষাতেই, তাঁহারা "Spell-bound" হইয়া গেলেন আমাদের সংস্কৃত অভিনয় দর্শনে; এবং তাঁহাদের নিজেদের ভাষাতেই ইহা তাঁহাদের "কল্পনারও অতীত" ছিল যে, সংস্কৃত অভিনয় এরূপ সরস-মধুর হইতে পারে। কি যে আদর-যত্ন, সম্মান-সমাদর তাঁহারা আমাদের করিলেন তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। এই আদর, এই সম্মান কি আমাদের নিজেদের জন্য? না, তাহা নহে। ইহা ডাঃ যতীন্দ্রবিমলের জন্য, ইহা সংস্কৃতজননীর জন্য। আমরা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র উপলক্ষ্যমাত্র।

আমরা এখানেও ১লা, ২রা অক্টোবর, ১৯৬৫, ডাঃ যতীন্দ্রবিমল বিরচিত সংস্কৃত নাটক "ভারত-বিবেকম্" এবং অধ্যক্ষা ডাঃ রমা বিরচিত সংস্কৃত নাটক "শঙ্কর-শঙ্করম্" অভিনয় করি; এবং দুই দিনই অভিনয় অত্যুৎকৃষ্ট হয় শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদে। ডাঃ রমার সুললিত ইংরাজী ভাষণেও সকলে বিশেষ মুগ্ধ হন।

কাঁহাকে ছাড়িয়া কাঁহার নাম করিব। সদাহাস্যানন "দাদা" শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সিভিল সার্জন ডাঃ শিশির রায় চৌধুরী, রোটারী ক্লাবের সভাপতি শ্রী এস, জি প্রসাদ, সম্পাদক শ্রীআর, জি, সিং, যুগ্ম সম্পাদক শ্রীমোহনলাল কেজ্‌রিয়াল, শ্রীজগদীশ রায় গুপ্ত, শ্রীজয়মঙ্গল শর্মা প্রভৃতির স্নেহ ভালবাসার তুলনা নাই।

মতিহারীতে সংস্কৃত নাট্যাভিনয়

মতিহারীতেও পূর্বে সংস্কৃতনাটক অভিনয় হয় নাই, যদিও ইহা পণ্ডিতপূর্ণ একটি সুন্দর স্থান। মতিহারীর সুবিখ্যাত

"ললিত-কলা পরিষদের" সস্নেহ উদ্যোগে ৩রা ও ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৬৫, মতিহারীর সুপ্রসিদ্ধ গোপাল সাহু বিদ্যালয়ের সুন্দর প্রেক্ষাগৃহে বিদ্বজ্জনসমক্ষে আমাদের উপরে উল্লিখিত সংস্কৃত নাটকদ্বয় সগৌরবে অভিনীত হয়, ও শ্রীভগবানের কৃপায় আমরা সকলকেই মুগ্ধ করিতে সমর্থ হই। দর্শকবৃন্দ সকলেই আমাদের অভিনয় দর্শনে এরূপ পরিতৃপ্ত হন যে, আমরা নিজেদের কৃতকৃতার্থ গণ্য করি।

এখানেও কাঁহাকে ছাড়িয়া কাঁহার নাম করিব? কি অসংখ্য নূতন বন্ধুলাভ আমাদের হইল; কি অপরিসীম তাঁহাদের আদর যত্ন, স্নেহ ভালবাসা। ললিত-কলা পরিষদের অধ্যক্ষ শ্রীরাজেন্দ্র কিশোর বর্মা, সচিব শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ সাহু, সংযোজক শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ সিংহ, সদস্য শ্রীরাধাকান্ত দুবে, শ্রীমদন প্রসাদ, শ্রীশুকদেও প্রসাদ বর্মা, অধ্যাপক শ্রীজনার্দন প্রসাদ, অধ্যাপক শ্রীগিরিজাদত্ত ত্রিপাঠী, ডাঃ লম্বোদর মুখোপাধ্যায়, আমাদের পূর্বসুহৃদ্ শ্রদ্ধেয় শ্রীসুরেশচন্দ্র সেন প্রভৃতির স্নেহ যত্নের কথা কোনোদিনও ভুলিবার নহে।

কাঠমুণ্ডু সফর

আমাদের নিত্যোৎসাহী স্নেহময়ী পরিচালিকা ডাঃ রমার নেতৃত্বে আমাদের দলের কয়েকজন নেপালস্থ কাঠমুণ্ডু পরিদর্শন করেন, এবং প্রচুর সমাদর সম্মান লাভ করেন। নেপালের ভারতীয় রাজদূত শ্রদ্ধেয় শ্রীমন্নারায়ণ, India Aid Mission-এর শ্রীযুক্ত অজয় প্রসাদ ঘোষ, Life Insurance Corporation-এর শ্রীযুক্ত অজয় শঙ্কর ভট্টাচার্য, কাঠমুণ্ডুস্থ রোটারী ক্লাবের সভাপতি শ্রীকালীপ্রসাদ গৌতম প্রভৃতির স্নেহ-ভালবাসা চিরকাল স্মরণযোগ্য।

উপসংহার

এবারের সাংস্কৃতিক সফর সকল দিক হইতেই অভূতপূর্ব। এই দিকে আমরা পূর্বে যাই নাই, এরূপ দর্শকবৃন্দও পূর্বে পাই নাই। অথচ কি আদরের সহিত তাঁহারা আমাদের গ্রহণ করিলেন। ডাঃ যতীন্দ্রবিমলের সেই মহাতত্ত্ব যে, সংস্কৃতও জনসাধারণের জনপ্রিয় ভাষা অনায়াসে হইতে পারে, তাহা আরেকবার নিঃসংশয়ভাবে পূর্ণ প্রমাণিত হইল। তিনি অকালে, অকস্মাৎ সংস্কৃতের জন্য প্রাণ দিয়াছেন বাহ্যতঃ। কিন্তু তত্ত্বতঃ, সেই মহাপ্রাণ আজও ভারতবর্ষের প্রতি অংশে অমর হইয়া রহিয়াছেন এবং সকলকে সঞ্জীবিত করিতেছেন অহরহঃ। তাঁহার মহাপ্রয়াণের পর আমরা ভারতের কত স্থানেই না ঘুরিলাম—দিল্লী, জয়পুর, জামনগর, দ্বারকা, ওখা, মজঃফরপুর, মতিহারী, মুঝৌলি, কাঠমুণ্ডু; ঘুরিলাম কত গ্রামাঞ্চলেও। কিন্তু সর্বত্রই দেখিলাম সেই একই দৃশ্য—যতীন্দ্রবিমলের চিরস্থায়ী আসন পাতা হইয়াই গিয়াছে দেশের চিত্তকেন্দ্রে; সকলের শ্রদ্ধায়, সকলের প্রীতিতে, সকলের হৃদয়ের চির অম্লান স্মৃতিতে অমর হইয়াই বিরাজ করিতেছেন সগৌরবে।
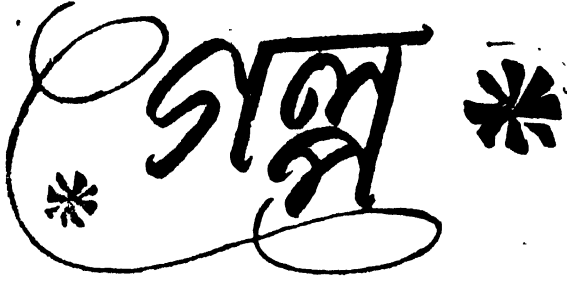
অনীতার মা

আশা গঙ্গোপাধ্যায়

শেষ পর্যন্ত মিসেস্ খাস্তগীর বা পারুলবালা ধরা পড়লেন। অবশ্য পুলিশের হাতে নয়। তবে পুলিশে তাঁকে দেওয়া হত যদিনা সেদিন তাঁর অষ্টাদশী কন্যা অনীতা তাঁর হয়ে দত্তগুপ্ত জুয়েলার্স কোম্পানীর মালিক মিঃ নীলাম্বর দত্ত-গুপ্তর কাছে সকাতরে সজল চোখে ক্ষমা প্রার্থনা করত।

সেদিন বিয়ে বাড়ীতে হট্টগোলের মধ্যে নতুন বৌটির উপহারের স্তূপ থেকে একটি রত্নখচিত মাথার ফুল উধাও হয়ে গেল! রমার বেশ মনে আছে সেই মূল্যবান্ সুদৃশ্য খোঁপার কাঁটাটি তার ছোটমাসী বার্মা থেকে এনে দিয়েছিল। দেবার সময় ছোট মাসি ওকে বলেছিল—

দেখ রমা, তোর জন্ম কি সুন্দর নতুন ডিজাইনের কাঁটা এনেছি এ-ধরণের প্যাটার্ণ এ দেশে পাওয়া যায় না। ইচ্ছে করলে তুই এটা শাড়ীতেও আট্ কাতে পারিস্।

সত্যিই খুসী হবার মত জিনিষটা!

সোনার জমির উপর সাদা আর লাল পাথর দিয়ে সুন্দর একটি প্যাগোডা! ভারি সূক্ষ্ম কাজ!

উপহারের জিনিষগুলি পাহারা দিচ্ছিলেন পারুল বালা—সম্পর্কে রমার খুড়-শাশুড়ী হয়।

উৎসবান্তে সকলে যখন নববধূকে নিয়ে খেতে চলে গেল রমার শাশুড়ী বললেন— তোমরা সকলে যাও —আমি থাকি। পারুল, তুমিও এবার যাও, সারা সন্ধ্যে জিনিষ আগলালে—একজায়গায় বসে রইলে—এবার একটু গায়ে হাওয়া লাগিয়ে এস।

না দিদি, আপনি বরং ছেলেবৌ মেয়ে জামাই আর ভাসুরঠাকুরকে নিয়ে একসঙ্গে ছাদে খেতে যান—আমি থাকছি।

তুমি খাবে না বুঝি?

পারুলবালা জিভ্ কাটলেন—

ওমা আমার খাবার জন্য আবার ভাবনা কি? আমি ত আর আপনাদের ওসব খাব না—আজ যে আমার জয় মঙ্গলবার। হঠাৎ পুরোদস্তুর নিষ্ঠাবতী হয়ে পড়লেন পারুলবালা!

রমার শাশুড়ী অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। সত্যিই ত। আজ জ্যৈষ্ঠমাস-মঙ্গলবার—সে কথা মনেই ছিলনা। তবে? পারুল আবার কবে থেকে জয় মঙ্গলবার সুরু করল! কি জানি? হবেও বা!

ছাদের থেকে নেমে এসে সকলে উপহারের দ্রব্যাদি দেখতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

গৃহিণী বললেন—পারুল খেলে না তুমি?

হ্যাঁ, দিদি। আমি এই ভাঁড়ারে বসে একটু দই-মিষ্টি খেয়ে নিয়েছি। এবার আমায় যেতে হবে—রাত বারোটা বাজল আপনার দেওরের শরীর ভাল নেই—আমাদের জন্য জেগে বসে আছেন দরজা খোলবার জন্য।

পারুলবালা আর মুহূর্ত অপেক্ষা করতে পারলেন না—হঠাৎ মনে পড়ে গেল পীড়িত স্বামীর কথা।

উপহারের সামগ্রী দেখতে দেখতে নতুনবৌ রমা বলে উঠল জানেন মা, আমার ছোট মাসী বার্মা থেকে কী সুন্দর একটা চুলের কাঁটা এনে দিয়েছে—

কই? কোথায় সে ফুল!

শাশুড়ী সমস্ত জিনিষ তোলপাড় করলেন—

ঠিক জান ত মা? তোমার ছোটমাসী সেটা কা'র হাতে দিয়েছিলেন?

ছল ছল চোখে রমা বলল—

মাসী আমার মাথাতে পরিয়ে দিতে গিয়েছিল—পারুল-খুড়ীমা বললেন বাক্সে রেখে দাও—হারিয়ে যেতে পারে।

ইস্ তখন যদি চুলে পরে নিতাম। এমন সুন্দর—এ দেশে পাওয়াই যায় না—

সকলের মনটা ভার হয়ে গেল।

কই? দাসদাসী কেউ ত এ ঘরে আসেনি? নিমন্ত্রিত ভদ্রমহিলারা ছাড়া এঘরে আর কেই বা ঢুকেছে বাইরের লোক?

ভোজবাজীর মত মিলিয়ে গেল রমায় ছোট মাসীর অত সাধের উপহারটা! কিন্তু বার বার লোকের চোখকে কি আর ফাঁকি দেওয়া চলে?

পারুলবালার একমাত্র মেয়ে অনীতার বিয়ে।

দোকানবাজার মা-আর মেয়ে করেন। বাড়ীতে ফিরে এসে দেখা যায়, লিষ্টের চেয়ে দু-চারটে জিনিষ বেশীই এসে গেছে।

ছোট দামী সেন্টের শিশিটা নিয়ে অনীতা বলে—

মা, এটা কখন কিনলে? বা! ঐ ব্রাশটা কোত্থেকে এল! আগে দেখিনি ত এই লোশনটা!

তুই চুপ কর ত! কোথা থেকে আবার আসবে মেয়ের জিজ্ঞাসাবাদের আর শেষ নেই? যা করছি দেখে যা অত কৈফিয়ৎ দিতে পারব না বাপু পেটের মেয়েকে?

নিরীহ শান্ত মেয়ে অনীতা বিরসবদনে চুপ কোরেই যায়। একটা সন্দেহ মনের মধ্যে আবছা ভাবে উঁকি ঝুঁকি মারে—কিন্তু সেটা এতই অসম্ভব আর অভদ্র যে জোর কোরেই অনীতা নিজের মনটাকে লাগাম ধরে ঘুরিয়ে নেয়।

সেদিন তার চোখে পড়েছিল দামী বেণারসী শাড়ীটার সঙ্গে রঙীন ক্রেপের জরীর বুটিদার ওড়না একটা। কই? দোকানে সেদিন মা ত শুধু শাড়ীখানাই কিনেছিল। ওর বেশ মনে আছে ওড়না ও নিজে পছন্দ করেনা বলে মাকে কিনতে নিষেধই করেছিল সেদিন।

অথচ! অথচ শাড়ীর বাক্সর মধ্যে লালরঙএর ওড়নাখানা সযত্নে ভাঁজ করা রয়েছে!

কখন কেনা হল? কি ভাবে এল সেটা! তবে কি—ছিঃ! কি. সে যা তা সন্দেহ করছে! অনীতা ভাবতেই নিজের মনটাকে শাসন করল অনীতা। ছি-ছি। আজকাল তার মনটা বড় কুটিল—নীচ হয়ে পড়ছে।

কিন্তু আবর্জনা পরিষ্কার না করলে সেখানে রোগের বীজাণু বাসা বাঁধে। বদ্ধ জলাতেই দূষিত মশকের জন্ম হয়।

সেদিন বৌবাজারের বিখ্যাত দত্তগুপ্ত জুয়েলার্স কোম্পানীতে মা আর মেয়ে অলঙ্কার পছন্দ করতে গেলেন। কাউণ্টারের উপরে মেলে ধরল সেলস্‌ম্যান, রকমারি গহনা—গোটা চার-পাঁচ ছোট-বড় নেক্‌লেস্, পাঁচ ছয় জোড়া ব্রেসলেট্—মুক্তার কণ্ঠী—চুড়, জড়োয়ার ইয়ারিং আঙটি ইত্যাদি। দোকানে অন্যান্য ক্রেতাও আছেন।

সকলেরই তাগাদা আছে—আজকালের মধ্যেই চাই—বিয়ের আর দেরী নেই।

ক্রমে ক্রমে ভীড়টা একটু হাল্‌কা হল। এখন মাত্র চারজন খরিদ্দার। পারুলবালা আর অনীতা। আর অপর একটি দম্পতী। দোকানের মালিকের ছেলে বিমলবাবু কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে কাস্টমারদের জিনিষ পছন্দ করাচ্ছেন।

আটটা প্রায় বাজে। সব কাউণ্টার বন্ধ হয়ে গেছে—এই একটি জায়গাতেই রয়েছে অলঙ্কারের স্তূপ।

অনীতার হাতে একটি সুদৃশ্য নেকলেস্ তুলে দিয়ে বিমলবাবু বললেন—যান দিদি, ওই আয়নাতে ধরে দেখুন, কি রকম মানাচ্ছে আপনার গলাতে—তারপর দরদাম হবে—

আয়নার সামনে গিয়ে অনীতা ডাকল—

বিমলবাবু—পিছনের টিপ্‌কলটা লাগিয়ে দিন—বড় শক্ত—এমন সময় একজন বেয়ারা এল সুগন্ধি পানজর্দা নিয়ে। অপর ভদ্রলোকটি পানপ্রিয় বোঝা গেল। তিনি গভীরভাবে পানজর্দায় মনোনিবেশ করলেন আর তাঁর স্ত্রী চেয়ে দেখলেন অনীতার প্রতিচ্ছায়ার দিকে—ঝক্‌ঝকে দর্পণের মধ্যে—সত্যিই সুন্দর দেখাচ্ছে। অলঙ্কার এই সব কণ্ঠের জন্যেই যেন তৈরী মনে হল।

পত্নীর বিমুগ্ধ দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে স্বামী বললেন—

কি? তোমার বৌমার জন্য একটা চাই নাকি?

বোধহয় মিনিট দুই-তিন হবে।

বিমলবাবু স্বস্থানে ফিরে এসে দাঁড়ালেন অনীতার নেকলেসের কলটা লাগিয়ে দিয়েই।

অনীতার পছন্দ হয়েছে বই কি।

পারুলবালা হেসে হেসে বললেন—

বিমলবাবু—আপনারই জিত হল! সবচেয়ে দামীটাই

মেয়ের পছন্দ হল শেষ পর্যন্ত। নাও, অনু—চট্‌পট্‌ সেরে নাও—শাড়ীর দোকানে যেতে হবে একবার—আটটা বাজে দোকান বন্ধ হয়ে যাবে আবার।

অনীতা অবাক! বলল—শাড়ীর দোকানে কেন?

ওই যে—সেদিনের বেণারসীখানা পছন্দ করলি যেখানা—মনে নেই? সেখানা ফেরবার পথে নিয়ে যাই—

সে আবার কোন্‌টা?

সরল মুখের ভাব অনীতার। সবই ত' কেনা হয়ে গেছে—বাকী ছিল এই গহনাগুলি—তাও ত হয়ে গেল। তবু প্রশ্ন করল—কোন্ বেণারসীর কথা বলছ মা?

প্রচণ্ড ধম্‌কে উঠলেন পারুলবালা—

অত প্রশ্নের কি আছে? তুমি কি সব গুণে রেখেছ কোন্‌টা কোন্‌টা কেনা হয়ে গেছে? এই নিন্ টাকাটা—

বিমলবাবুর দিকে একগোছা নোট এগিয়ে ধরলেন—

টাকাটা দেখে নিন্—

কে নেবে টাকা? বিমলবাবুর মাথায় ততক্ষণে রক্ত চড়ে গেছে। সমস্ত বাক্স গোছাচ্ছেন বার বার। চোখমুখের অবস্থা শোচনীয়।

দাঁড়ান মা একটু—একটা জিনিষ মেলাতে পারছি না—

পানাসক্ত ভদ্রলোকটি এগিয়ে এলেন—

কি পাচ্ছেন না মশাই?

এই দেখুন না—সাত জোড়া ইয়ারিং বার কোরে-ছিলাম—ছ'টা বাক্স রয়েছে—ছোট একবাক্স হীরের টপ পাচ্ছি না—

সে কি?—পারুলবালা আকাশ থেকে পড়লেন।

অনীতার বুকের মধ্যেটায় হঠাৎ কেন জানি না হাতুড়ির পাড় পড়তে লাগল যেন।

চকিতে মনে পড়ল বেণারসীর লাল ওড়নাখানার কথা—রমা বৌদির সেই বর্মী ডিজাইনের কাঁটা ফুলের কথা—ছোট সেই সুগন্ধি সেণ্ট আর সুদৃশ্য হেয়ার ব্রাশের কথা।

দূর ছাই! এসব কথা হঠাৎ ভাবছে কেন অনীতা? হীরের দুলের সঙ্গে এসব জিনিষের কি সম্পর্ক!

অন্ত মহিলাটি এগিয়ে এলেন—

বিমলবাবু—ভাল করে গুণে দেখুন—আমি ত কিছুই নিলাম না—হাতও দিইনি ওসবে—

দারুণ কুণ্ঠাভরে জিভ্ কেটে মাথা নাড়লেন বি[illegible] বাবু—হাত দুটি জোড়া কোরে—না, না না—অমন [illegible] মনে আনাটাও পাপ। খদ্দের আমাদের লক্ষ্মী—মা [illegible] আপনারা কিছু মনে করবেন না দয়া কোরে—আম[illegible] মনের ভুল—হুড়োহুড়িতে কোথায় রেখেছি—

খুঁজে দেখ্‌বেন তাহলে পরে—

পারুলবালা ত্রস্ত হয়ে উঠলেন—

এখন আমার টাকাটা নিয়ে মেমো দিন ত—দেরী [illegible] যাচ্ছে আমার শাড়ীর দোকানে—

কি বাজে কথা বলছ মা?

অকস্মাৎ যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল অনীতা। সুশীলা মেয়েটি অদ্ভুত স্বরে চেঁচিয়ে উঠল—

দেখছ ওঁদের কতবড় ক্ষতি হয়ে গেছে—অত [illegible] গহনাটা খুঁজে পাচ্ছেন না—আর তোমার যত অক[illegible] তাড়াহুড়ো—

স্বল্পভাষিণী মৃদু স্বভাবের কন্যার চোখের [illegible] তাকিয়ে ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধ বিমূঢ় হয়ে গে[illegible] পারুলবালা।

তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন বেশ [illegible] স্তিমিতস্বরে—দেখুন না ভাল কোরে খুঁজেটুজে—আম[illegible] আটকে রেখে ত লাভ নেই—

না, মা, সে কি বলছেন—

বিনীতস্বরে বললেন প্রপ্রাইটারের পুত্র—

আপনাদের আটকে রাখব কেন মিথ্যেমিথ্যি? বুঝতেই পারছেন—আটশ-ন'শ টাকা দামের হীরে[illegible] দুটো খুঁজে না পেলে কি রকম মনের অবস্থা হয়—

তা ও বটেই—

সহানুভূতির সুরে অপর ভদ্রলোকটি বললেন—মশাই, খুঁজুন ভাল কোরে—আমরা আছি এখন—নিজেই নিচু হয়ে এদিক-ওদিক খুঁজতে লাগলেন। রইল আপনার নেক্‌লেস্—

রুক্ষ স্বরে বললেন পারুলবালা নোটের গোছা ব[illegible] মধ্যে পুরতে পুরতে—

ভাল কোরে দেখে নিন জিনিষটা। পরে এসে এ[illegible] না হয় নিয়ে যাব যদি থাকে—আজ চললাম অ[illegible] আয় অনু—

দাঁড়ান !

যেন বজ্রপাত হল ঘরের মধ্যে। কোথা থেকে আবির্ভূত হলেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক—মাথা ভর্তি শুভ্র-কেশ, মুখে সুস্পষ্ট দৃঢ়তার ছাপ—চোখের দৃষ্টিতে তীব্র ঘৃণা !

বিমলবাবু নিজেই যেন চম্‌কে উঠলেন এই জলদগম্ভীর আদেশে।

অপ্রস্তুত কণ্ঠে বলে উঠলেন—কাকাবাবু কি বলছেন কাকে ?

ঠিকই বলছি বিমল—হরি সিং দরজা বন্ধ করো—বিশাল সাড়ে ছ' ফুট লম্বা পাঞ্জাবী দারোয়ানের দিকে নজর পড়ল সকলের।

অসম্ভব জোরে সমস্ত শরীরটা কেঁপে উঠল অনীতার।

দোকানের আবহাওয়া থমথমে। দরজা অর্থাৎ কোলাপ-সিবল্ গেট বন্ধ হয়ে গেল—ভিতরের কাঠের দরজাও।

পান-খোর ভদ্রলোকটি স্ত্রীর কাঁধে হাত রাখলেন ভরসা দেবার ছলে। কাকাবাবু—অর্থাৎ নীলাম্বর ব্যানার্জী যার হাতে দোকানের জন্ম হয়েছিল একদিন—যিনি বিমল-বাবুর পিতারও গুরু, যিনি এখন কোষাধ্যক্ষ—তিনি স্থির-নেত্রে পারুলবালার দিকে চেয়ে বললেন—দিন,—জিনিষটা বার কোরে দিন জামার ভিতর থেকে—

মা—আর্তস্বরে চেঁচাতে গিয়ে নিজেই হাত দিয়ে নিজের মুখটা চেপে ধরল অনীতা।

কি বলছেন ?—শেষ চেষ্টা করলেন পারুলবালা।

কোনও কথা নয়—পুলিশ ডাকতে বাধ্য হব যদি না দেন—কাউন্টারের ধারে রাখা টেলিফোনটার দিকে চেয়ে নিস্তব্ধ হয়ে রইলেন পারুলবালা—যেন পাথরের মূর্তি।

পারুলবালা যখন হাত সাফাই করছিলেন সেই চরম মুহূর্তটিতে ধরা পড়ে গেছেন পাশের ছোট, কাঁচের কুঠুরিটিতে উপবিষ্ট বিচক্ষণ নীলাম্বরবাবুর তীক্ষ্ণ ক্যামেরাতে।

বারবারই ফাঁকি দেওয়া চলে ?

পারুলবালার গায়ে জড়ানো ছিল দামী কাশ্মিরী —জিনিষটা লুকিয়ে ফেলা খুব কঠিন হল না। কঠিন হল কাজ হাঁসিল কোরে বামাল শুদ্ধ পড়া।

নিমেষে মুখখানা কালো হয়ে উঠল পারুলবালা অনীতা একবার সেই দিকে তাকিয়ে অন্তরের সমস্ত উজাড় কোরে দিয়ে চাপা কণ্ঠে বলে উঠল তীব্র ভাবে—

উঃ, মা। আমি যদি তোমার মেয়ে না হতাম !

তারপর উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ল নীলাম্বর পায়ের তলায়—আমাকে বাঁচতে দিন আপনারা। মা হয়ে হাজার বার ক্ষমা চাইছি আমি। আপনি কোরে আর লোক জানাজানি করবেন না—পু জানাবেন না—দোহাই আপনার। জিনিষটা ত পে গেলেন। আমার প্রতি একটু করুণা করুন আপনা আমি ওঁর সন্তান হবার জন্য সত্যিই খুব লজ্জিত—দুঃখি আমার এ রকম অপমান জীবনে কিছুতেই ঘুচবে না—

নীলাম্বরবাবু সেদিন অনীতার দুঃখ সত্যিই বুঝেছি হাত ধরে তুলে মাথায় হাত রেখে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছি পারুলবালার দিকে তাকিয়ে—

যান বাড়ী যান মা। এমন মেয়ের মা হয়ে আপনি, আপনাকে আমার আর কিছু বলবার নেই।

তারপর শুভ্রকেশ বৃদ্ধ অনীতার অশ্রুস্নাত মুখের দি চেয়ে বলেছিলেন—

যাও মা লক্ষ্মী, তোমার কথাই রইল। এই দোকা মধ্যে কে কজন আছি সেই কজন ছাড়া এ কথা আর ে জানবে না কোনও দিন।

সেকালের আমোদ-প্রমোদ

পৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আজ থেকে একশো বছর আগে বিলাতী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে-গড়া আজব-শহর কলিকাতায় দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে সেকালের দেশী-সমাজের আবালবৃদ্ধবনিতা সোৎসাহে আনন্দে মেতে উঠে বিপুল অর্থব্যয়ে এবং রীতিমত ধুমধাম-আড়ম্বরে দেবী-পূজার পুণ্য-অনুষ্ঠানের যে অভিনব-ব্যবস্থাদি করতেন, ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে রচিত নিপুণ সমাজচিত্রকার ও অনন্যসাধারণ সাহিত্যিক ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের সুবিখ্যাত গ্রন্থ "হুতোম প্যাঁচার নক্‌শায়' তার নিখুঁত-মনোরম সুস্পষ্ট-পরিচয় মেলে। একালের অনুসন্ধিৎসু-পাঠকপাঠিকাদের অবগতির উদ্দেশ্যে, সেকালের সে সব কৌতুহলোদ্দীপক বিচিত্র কীর্ত্তিকলাপের কিছু কিছু বিবরণ প্রসঙ্গক্রমে, নীচে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

(৺কালীপ্রসন্ন সিংহ রচিত "হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা" গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত)

...ক্রমে তাবৎ কলাবউয়েরা স্নান করে ঘরে ঢুকলেন। এদিকে পূজাও আরম্ভ হলো, চণ্ডীমণ্ডপে বারকোসের উপর আগাতোলা মোণ্ডাওয়ালা নৈবিদ্দি সাজান হলো. সঙ্গতি বুঝে চেলীর শাড়ি, চিনির থাল, ঘড়া, চুমকি ঘটি ও সোনার লোহা; নয় তো কোথাও সন্দেশের পরিবর্ত্তে গুড় ও মধুপর্কের বাটির বদলে খুরি ব্যবস্থা। ক্রমে পুজো শেষ হলো; ভক্তরা এতক্ষণ অনাহারে থেকে পু[...] শেষে প্রতিমাকে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন, বাড়ির গিন্নীরা [...] শুনে জল খেতে গ্যালেন; কারো বা নবরাত্তির। আমা[...] বাবুর বাড়ির পুজোও শেষ হলো প্রায়, বলিদানের উদ্[...] হচ্চে; বাবু মায় ষ্টাফ আদুড় গায়ে উঠানে দাঁড়িয়ে[...] কামার কোমর বেঁধে প্রতিমের কাছ থেকে পুজো[...] প্রতিষ্ঠা করা খাঁড়া নিয়ে কানে আশীর্ব্বাদী ফুল [...] হাড়কাঠের কাছে উপস্থিত হলো, পাশ থেকে এক মোসাহেব "খুটি ছাড়! খুটি ছাড়!" বলে চেঁচিয়ে উঠ[...] গঙ্গাজলের ছড়া দিয়ে পাঁঠাকে হাড়কাঠে পুরে দিয়ে এঁটে দেওয়া হলো, এক জন পাঁঠার মুড়ি ও আর জন ধড়টা টেনে ধল্লে—অমনি কামার "জয় মা! গো!" বলে কোপ তুল্লে, বাবুরাও সেই সঙ্গে "জয় [...] মা গো!" বলে প্রতিমের দিকে ফিরে চেঁচাতে লাগ[...] —ছপ্ করে কোপ পড়ে গ্যালো—গীজা গীজা গীজা [...] নাক্ টুপ্ টুপ্ টুপ্, গীজা গীজা গীজা গীজা, নাক্ টুপ্ টুপ্ শব্দে ঢোল, কাড়ানাগরা ও ট্যাম্‌টেমি [...] উঠ্‌লো; কামার সরাতে সমাংস করে দিলে পাঁঠার চেপে ধরে দালানে পাঠানো হলো, এদিকে এক মোসাহের সন্তর্পণে খর্পরের সরা আচ্ছাদন করে প্রতি[...] সম্মুখে উপস্থিত কল্লে, বাবুরা বাজনার তরঙ্গের হাততালি দিতে দিতে ধীরে ধীরে চণ্ডীমণ্ডপে উঠলে প্রতিমার সামনে দানের সামগ্রী ও প্রদীপ জ্বেলে [...]

হলে আরতি আরম্ভ হলো, বাবু স্বহস্তে ধবল গঙ্গাজল চামর বীজন কত্তে লাগলেন, ধুপ ধুনোর ধোঁয়ে বাড়ি অন্ধকার হয়ে গ্যালো, এইরূপে আধ ঘণ্টা আরতির পর শাঁক বেজে উঠলো, সবাবু সকলে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে বৈঠকখানায় গ্যালেন। এদিকে দালানে বামুনেরা নৈবিদ্দি নিয়ে কাড়াকাড়ি কত্তে লাগ্লো। দেখতে দেখতে সপ্তমীও ফুরালো। ক্রমে নৈবিদ্দি বিলি, কাঙ্গালী বিদায় ও জলপান বিলানোতেই সে দিনের অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত হয়ে গ্যালো, বৈকালে চণ্ডীর গানওয়ালারা খানিক ক্ষণ আসর জাগিয়ে বিদায় হ'লো—জগা স্যাকরা চণ্ডীর গানের প্রকৃত ওস্তাদ ছিল, সে মরে যাওয়াতেই আর চণ্ডীর গানের প্রকৃত গায়ক নাই; বিশেষত এক্ষণে শ্রোতাও অতিদুর্ল্লভ হয়েচে।

ক্রমে ছটা বাজলো, দালানের গ্যাসের ঝাড় জেলে দিয়ে প্রতিমার আরতি আরম্ভ করে দেওয়া হলো এবং মা দুর্গার শেতলের জলপান ও অন্যান্য সরঞ্জামও সেই সময় দালানে সাজিয়ে দেওয়া হলো—মা দুর্গা যত খান বা না খান, লোকে দেখে প্রশংসা কল্লেই বাবুর দশ টাকা খরচের সার্থকতা হবে। এদিকে সন্ধ্যার সঙ্গে দর্শকের ভিড় বাড়তে লাগলো, বাঙ্গাল দোকানদার, ঘুস্কী ও খানকীরা কুদে কুদে ছেলে ও আদ্‌বইসী ছোঁড়া সঙ্গে থাতায় থাতায় প্রতিমা দেখতে আসতে লাগলো। এদিকে নিমন্ত্রিতেরা সেজেগুজে টনাৎ করে একটা টাকা ফেলে দিয়ে প্রণাম কল্লে, অমনি পুরুত এক ছড়া ফুলের মালা নেমন্তন্নের গলায় দিয়ে টাকাটা কুড়িয়ে ট্যাকে গুঁজলেন, নিমন্তন্নেও হন্ হন্ করে চলে গেলেন। কলকেতা সহরের এই একটি বড় আজগুবি কেতা, অনেক স্থলে নিমন্ত্রিতে ও কর্ম্মকর্ত্তায় চোয়ে কামারের মত সাক্ষাৎও হয় না, কোথাও পুরোহিত বলে দ্যান "বাবুরা ওপরে, ঐ সিঁড়ি মশাই যান না!" কিন্তু নিমন্ত্রিত যেন চিরপ্রচলিত রীতি অনুসারেই "আজ্ঞে না, আরো পাঁচ জায়গায় যেতে হবে, থাক্" বলে টাকাটি দিয়েই অমনি গাড়িতে ওঠেন; কোথাও যদি কর্ম্মকর্ত্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, তবে গিরগিটের মত উভয়ে একবার ঘাড় নাড়ানাড়ি মাত্র হয়ে থাকে—সন্দেশ মেঠাই চুলোয় যাক্, পান তামাক মাথায় থাক্, প্রায় সর্ব্বত্রই সাদর সম্ভাষণেরও বিলক্ষণ অপ্রতুল—দুই এক জায়গায় কর্ম্ম-কর্ত্তা জরির মছলন্দ পেতে, সাম্নে আতরদান, গোলাপ সাজিয়ে পয়সার দোকানের পোদ্দারের মত বসে থাকে কোন বাড়ির বৈঠকখানায় চোহেলের হৈ হৈ ও হৈটৈ তুফানে নেমন্তন্নের সেঁধুতে ভরসা হয় না—পাছে কর্ম্ম তেড়ে কামড়ান। কোথায় দরজা বন্ধ, বৈঠক অন্ধকার, হয় ত বাবু ঘুমুচ্চেন, নয় বেরিয়ে গ্যা দালানে জনমানব নাই, নেমন্তন্নে কার স্মুখে যে প্র টাকাটি ফেল্‌বেন ও কি করবেন, তা ভেবে স্থির পারেন না, কর্ম্মকর্ত্তার ব্যাভার দেখে প্রতিমে প অস্তপ্রত হন। অথচ এ রকম নিমন্ত্রণ না কল্লেই এই দরুণ অনেক ভদ্রলোক আজকাল আর "সামাজি নেমতন্নে স্বয়ং যান না, ভাগ্নে বা ছেলেপুলের দ্বারা ক্রিয়েবাড়ীর পুরুতের প্রাপ্য কিম্বা বাবুদের ওৎকরা টা পাঠিয়ে দ্যান কিন্তু আমাদের ছেলেপুলে না থাকায় স্বয়ং গমনে অসমর্থ হওয়ায় স্থির করেছি, এবার প্রণামীর টাকায় পোষ্টেজ্ ষ্ট্যাম্প কিনে ডাকে পা দেবো, তেমন তেমন আত্মীয়স্থলে (সেফ অ্যারাইভ্যা জন্য) রেজষ্টরী করে পাঠান যাবে; যে প্রকারে টাকাটি পৌছানো নে বিষয়। অধ্যাপক ভায়া বিষয়ে অনেক সুবিধে করে দিয়েচেন, পুজো ফুরিয়ে তাঁরা প্রণামীর টাকাটি আদায় কত্তে স্বয়ং ক্লেশ থাকেন—নেমন্তন্নের পূর্ব্ব হতে পুজোর শেষে তঁ আত্মীয়তা আরও বৃদ্ধি হয়, অনেকের প্রণামী চাইতে অ পুজোর প্রুফ!

মনে করুন, আমাদের বাবু বনেদী বড়মানুষ; স্বতন্তর, আরতির পর বাণারসী জোড় পরে সভাসদ্ নিয়ে দালানে বার দিলেন, অমনি তকমা পরা বাঁকা য়ানেরা তলওয়ার খুলে পাহারা দিতে লাগ্লো; হ হুঁকোবরদার, বিবির বাড়ির বেয়ারা ও মোসা জোড়হস্ত হয়ে দাঁড়ালো কখন কি ফরমাস হয়। সাম্নে একটা সোনার আলবোলা, ডাইনে একটা পান্না ফুরসি, বাঁয়ে একটা হীরে বসান টোপ্‌দার গুড়গু পেছনে একটা মুক্তোবসান পেঁচুয়া পড়লো; বাবু অ কুড়ের কুকুরের মত ইচ্ছা অনুসারে আশে পাশে মুখ ও আড়ে আড়ে সাম্নে বাজে লোকের ভিড়ের দেখচেন—লোকে কোন্‌টার কারিগরির প্রশংসা

যে রকমে হোক, লোককে দেখান চাই যে, বাবুর রূপো সোনার জিনিষ অঢেল, এমন কি, বসাবার স্থান থাকলে আরো দুটো কুরসি বা গুড়গুড়ি ছাখান যেতো। ক্রমে অনেক অনাহূত ও নিমন্ত্রিত জড় হতে লাগ্‌লেন, বাজে লোকে চণ্ডীমণ্ডপ পুরে গেল, জুতো চোরে সেই লাক্ষাতরও-য়ালের পাহারার ভেতর থেকেও দু ঝুড়ি জুতো সরিয়ে ফেল্লে। কচ্ছপ জলে থেকেই ডাঙ্গাস্থ ডিমের প্রতি যেমন মন রাখে, সেইরূপ অনেকে দালানে বসে বাবুর সঙ্গে কথা-বার্ত্তার মধ্যে আপনার জুতোরও ওপর নজর রেখেছিলেন; কিন্তু ওঠবার সময় ছাখেন যে, জুতোরাম কচ্ছপের ডিমের মত ফুটে সরেচেন, ডাঙ্গায় ডিমের খোলার মত হয় ত এক পাটি ছেঁড়া চটি পড়ে আছে।

এদিকে দেখতে দেখতে গুড়ুম্ করে নটার তোপ পড়ে গ্যালো; ছেলেরা "ব্যোম কালী কল্‌কেত্তাওয়ালী" বলে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো। বাবুর বাড়ি নাচ, সুতরাং বাবু আর অধিক ক্ষণ দালানে বসতে পাল্লেন না, বৈঠকখানায় কাপড় ছাড়তে গেলেন, এদিকে উঠানের সমস্ত গ্যাস জেলে দিয়ে মজলিশের উদ্‌যোগ হতে লাগ্‌লো, ভাগ্নেরা ট্যাসল দেওয়া টুপি ও পেটি পরে ফপরদালালি কত্তে লাগলেন। এদিকে দুই এক জন নাচের মজলিশি নেমন্তনে আসতে লাগ্‌লেন। মজলিশে তয়ফা নাবিয়ে দেওয়া হলো। বাবু জরি ও কালাবৎ এবং নানাবিধ জড়ওয়া গহনায় ভূষিত হয়ে ঠিক একটি "ঈজিপশন্ মমী" সেজে মজলিশে বার দিলেন—বাই সারঙ্গদের সঙ্গে গান করে সভাস্থ সমস্তকে মোহিত কত্তে লাগ্‌লেন।

নেমন্তন্নেরা নাচ দেখতে থাকুন, বাবুরা ফররা দিন ও লাল চোখে রাজা উজীর মারুন—পাঠকবর্গ একবার সহরটার শোভা দেখুন—প্রায় সকল বাড়িতেই নানাপ্রকার রং তামাশা আরম্ভ হয়েচে। লোকেরা খাতায় খাতায় বাড়ি বাড়ি পুজো দেখে বেড়াচ্চে। রাস্তায় বেজায় ভিড়! মাড়ওয়ারী খোট্টার পাল, মাগীর থাতা ও ইয়ারের দলে রাস্তা পুরে গ্যাচে। নেমন্তন্নের হাতলাণ্ঠনওয়ালা বড় বড় গাড়ির সইসেরা প্রলয় শব্দে পইস্ পইস্ কচ্চে, অথচ গাড়ি চালাবার বড় বেগতিক! কোথায় সখের কবি হচ্চে, ঢোলের চাঁটি ও গাওনার চীৎকারে নিদ্রাদেবী সে পাড়া থেকে ছুটে পালিয়েচেন, গানের তানে ঘুমন্ত ছেলেরা মার কোলে ক্ষণে ক্ষণে চম্‌কে উঠ্‌চে। কোথাও পাঁচালি আরম্ভ হয়েচে, বওয়াটে পিল্ ইয়ার ছোকরারা ভরপুর নেশায় ভোঁ হয়ে ছড়া কাট্‌চেন ও আপনা আপনি বাহবা দিচ্চেন; রাত্তির শেষে শ্রাদ্ধ গড়াবে, অবশেষে পুলিসে দক্ষিণা দেবে। কোথায় যাত্রা হচ্চে, মণিগোঁসায়ের সং এসেচে, ছেলেরা মণিগোঁসায়ের রসিকতায় আহ্লাদে আটখানা হচ্চে, আশে পাশে চিকের ভেতর মেয়েরা উঁকি মাচ্চে, মজলিশে রামমশাল জল্‌চে, বাজে দর্শকদের বাতকর্ম্ম ও মশালের দুর্গন্ধে পুজোবাড়িতে তিষ্ঠন ভার, ধূপ ধুনোর গন্ধও হার মেনেচে। কোনখানে পুজো বাড়ীর বাবুরাই খোদ মজলিশ রেখেচেন—বৈঠকখানায় পাঁচো ইয়ার জুটে নেউল নাচানো, ব্যাং নাপানো, খ্যামটা ও বিদ্যাসুন্দর আরম্ভ করেচেন; এক এক বারের হাসির গররায় শিয়াল ডাকে ও মদন আগুনের তানে—দালানে ভগবতী ভয়ে কাঁপচেন, সিঙ্গি চোরাকে কামড়ান পরিত্যাগ করে ল্যাজ গুটিয়ে পালাবার পথ দেখ্‌চে, লক্ষ্মী সরস্বতী শশব্যস্ত! এদিকে সহরের সকল রাস্তাতেই লোকের ভিড়, সকল বাড়িই আলোময়।

এই প্রকারে সপ্তমী, অষ্টমী ও সন্ধিপুজো কেটে গ্যালো। আজ নবমী; আজ পুজোর শেষ দিন; এত দিন লোকের মনে যে আহ্লাদটি জোয়ারের জলের মত বাড়ছিল, আজ সেইটির একেবারে সারভাটা।

আজ কোথাও জোড়া মোষ, কোথাও নধর্ ইটা পাঁঠা, সুপারি, আক, কুমড়ো, মাগুরমাছ ও মরীচ বলিদান হয়েছে কর্ম্মকর্ত্তা পাত্র টেনে পাঁচো ইয়ারে জুটে নবমী গাচ্চেন ও কাদামাটি কচ্চেন, ঢুলীর ঢোলে সঙ্গত হচ্চে, উঠানে লোকারণ্য; উপর থেকে বাড়ির মেয়েরা উঁকি মেরে নবমী দেখচেন। কোথাও হোমের ধুমে বাড়ি অন্ধকার হয়ে গ্যাচে, কার সাধ্য প্রবেশ করে—কাঙ্গালী, রেওভাট ও ভিক্ষুকের পুজোবাড়ি ঢোকা দূরে থাকুক, দরজা হতে মশাগুলো পর্য্যন্ত ফিরে যাচ্ছে। ক্রমে দেখতে দেখতে দিনমণি অস্ত গ্যালেন, পুজোর আমোদ প্রায় সম্বৎসরের মত ফুরালো! ভোরাও ওক্তে ভয়রোঁ রাগিণীতে অনেক বাড়িতে বিজয়া গাওনা হলো। ভক্তের চক্ষে ভগবতীর প্রতিমা পরদিন প্রাতে মলিন মলিন বোধ হতে লাগলো, শেষে বিসর্জ্জনের সমারোহ সুরু হলো,—আজ নিরঞ্জন।

ক্রমে দেখতে দেখতে দশটা বেজে গ্যালো; দইকড়মা ভোগ দিয়ে প্রতিমার নিরঞ্জন করা হলো, আরতির পর বিসর্জ্জনের বাজনা বেজে উঠ্‌লো; বামুনবাড়ির প্রতিমারা সকালেই জলসই হলেন। বড়মানুষ ও বাজে জাতির প্রতিমা পুলিসের পাস মত বাজনা বাদ্দির সঙ্গে বিসর্জ্জন হবেন—এদিকে এ কাজ সে কাজে গির্জ্জার ঘড়িতে টুং টাং টুং টাং করে দুপুর বেজে গ্যালো, সূর্য্যের মৃদু তপ্ত উত্তাপে সহর নিম্‌কী রকম গরম হয়ে উঠ্‌লো, এলোমেলো হাওয়ায় রাস্তার ধুলো ও কাঁকর উড়ে অন্ধকার করে তুল্লে। বেকার কুকুরগুলো দোকানের পাটাতনের নীচে ও খানার ধারে শুয়ে জিব বাইর করে হাঁপাচ্চে, বোঝাই গাড়ির গরুগুলোর মুখ দে ফ্যানা পড়চে—গাড়োয়ান ভয়ানক চীৎকারে "শালার গরু চলে না" বলে ল্যাজ মলচে ও পাঁচনবাড়ি মাচ্চে; কিন্তু গরুর চাল বেগড়াচ্চে না, বোঝাইয়ের ভরে চাকাগুলি কোঁ কোঁ শব্দে রাস্তা মাতিয়ে চলেচে। চড়াই ও কাকগুলো বারাণ্ডা, আল্‌সে ও নলের নীচে চক্ষু মুদে বসে আছে। ফিরিওয়ালারা ক্রমে ঘরে ফিরে যাচ্চে, রিপুকর্ম্ম ও পরামাণিকরা অনেক ক্ষণ হলো ফিরেচে, আলু, পটোল! ঘি চাই! ও তামাকওয়ালা কিছু ক্ষণ হলো ফিরে গ্যাচে। ঘোল চাই মাখন চাই! ভয়সা দই! ও মালাই দইওয়ালারা কড়ি ও পয়সা গুনতে গুনতে ফিরে যাচ্চে, এখন কেবল মধ্যে মধ্যে পানিফল! কাগোজ বদল! পেয়ালা পিরিচ—বিলাতী খেলেনা বর্তন চাই পেয়ালা পিরিচ! ফিরিওয়ালাদের ডাক শোনা যাচ্চে—নৈবিদ্দি মাথায় পুজোবাড়ির লোক, পুজুরী বামুন, পটো ও বাজন্দার ভিন্ন রাস্তায় বাজে লোক নাই। গুপুস্ করে একটার তোপ পড়ে গ্যালো। ক্রমে অনেক স্থলে ধুমধামে বিসর্জ্জনের উদ্‌যোগ হতে লাগ্‌লো।...

... .

ক্রমে সহরের বড় রাস্তা চৌমাথা লোকারণ্য হয়ে উঠলো, বেশ্যালয়ের বারাণ্ডা আলাপীতে পুরে গ্যালো, ইংরাজী বাজনা, নিশেন, তুরুকসোয়ার ও সার্জ্জন সঙ্গে "প্রতিমারা রাস্তায় বাহার দিয়ে বেড়াতে লাগলেন—তখন "কার প্রতিমা উত্তম" "কার সাজ ভাল" "কার সরঞ্জাম সরেস" প্রভৃতির প্রশংসারই প্রয়োজন হচ্চে, কিন্তু হায়! "কার ভক্তি সরেস" কেউ সে বিষয়ে অনুসন্ধান করে না—কর্ম্মকর্ত্তাও তার জন্য বড় কেয়ার করেন না। এ দিকে; প্রসন্নকুমার বাবুর ঘাট ভদ্দর লোক গোছের দর্শক, ক্ষুদে ক্ষুদে পোশাক করা ছেলে, মেয়ে ও ইস্কুলবয়ে ভরে গ্যালো। কর্ম্মকর্ত্তারা কেউ কেউ প্রতিমে নিয়ে বাচ খেলিয়ে বেড়াতে লাগ্‌লেন—আমুদে মিন্‌সে ও ছোঁড়ারা নৌকোর ওপর ঢোলের সঙ্গতে নাচতে লাগ্‌লো। সৌখীন বাবুরা খ্যাম্‌টা ও বাই সঙ্গে করে বোট, পিনেস, বজরার ছাতে বার দিয়ে বস্‌লেন—মোসাহেব ও ওস্তাদ চাকরেরা কবির সুরে দু একটা রংদার গান গাইতে লাগ্‌লো।

বিদায় হও মা ভগবতি—এ সহরে এসো নাকো আর।
দিনে দিনে কলিকাতার মর্ম্ম দেখি চমৎকার॥
জষ্টিসেরা ধর্ম্মঅবতার, কায়মনে কচ্চেন সুবিচার।
এদিকে ধুলোর ভরে রাজপথেতে চেঁচিয়ে চেয়ে
চলা ভার।
পথে হাগা মোতা চলবে না, লহোরের জল
তুলতে মানা,
লাইসেন্সটেক্স মাথট চাঁদা, পাইখানার বালি
ময়লা রবে না।
হেল্‌থ অফিসর, সেতখানার মেজেষ্টর,
ইন্‌কমের আসেসর মাল্লে সবারে;
আবার গবর্ণরের শুয়ে দৃষ্টি সৃষ্টিছাড়া ব্যবহার।
অসহ্য হতেছে মা গো! অসাধ্য বাস করা আর।
জীয়ন্তে এই ত জ্বালা মা গো,
মলেও শান্তি পাবে না,
মুখাগ্নির দফা রফা কলেতে—করবে সৎকার।
হুতোম দাস তাই সহর ছেড়ে আস্‌মানে
করেন বিহার।

এদিকে দেখতে দেখতে দিনমণি যেন সম্বৎসরের জন্য পুজোর আমোদের সঙ্গে অস্ত গ্যালেন। সন্ধ্যাবধূ বিচ্ছেদ বসন পরিধান করে দেখা দিলেন। কর্ম্মকর্ত্তারা প্রতিমা নিরঞ্জন করে, নীলকণ্ঠ শঙ্খচিল উড়িয়ে "দাদা গো" "দিদি গো" বাজনার সঙ্গে ঘট নিয়ে ঘরমুখো হলেন। বাড়িতে পৌঁছে চণ্ডীমণ্ডপে পূর্ণঘটকে প্রণাম করে শান্তিজল

নিলেন, পরে কাঁচা হলুদ ও ঘটজল খেয়ে পরস্পর কোলাকুলি করেন। অবশেষে কলাপাতে দুর্গানাম লিখে সিদ্ধি খেয়ে বিজয়ার উপসংহার হলো। ক দিন মহাসমারোহের পর আজ সহরটা খাঁ খাঁ কত্তে লাগ্‌লো—পৌত্তলিকের মন বড়ই উদাস হলো, কারণ লোকের যখন সুখের দিন থাকে তখন সেটির তত অনুভব কত্তে পারা যায় না, যত সেই সুখের মহিমা দুঃখের দিনে বোঝা যায়।

"হুতোম প্যাঁচার নক্‌শায়" সেকালের দুর্গোৎসবের যে বিচিত্র-কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ পাওয়া যায়, সেটি হলো আসলে—খ্রীষ্টীয় উনবিংশ-শতাব্দীর কলিকাতার শহুরে-সমাজের চিত্র। কাজেই আজ থেকে একশো বছর আগে শহর থেকে দূরে পল্লীগ্রামাঞ্চলে দুর্গোৎসব-উপলক্ষ্যে সেখানকার সমাজের আবালবৃদ্ধবনিতা কিভাবে বাঙালীর একান্ত-প্রিয় এই সার্ব্বজনীন-অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত করতেন, সে বিষয়টি জানবার জন্য স্বতঃই আগ্রহ জাগে। তাই একালের কৌতূহলী-পাঠকপাঠিকাদের আগ্রহ-সন্তুষ্টির জন্য—১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব" নামে প্রাচীন পুস্তিকা থেকে প্রসঙ্গানুযায়ী কিছু অংশ নীচে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো। পুস্তিকাটি আকার-আয়তনে সামান্য হলেও, সেকালের পল্লী-সমাজের নিখুঁত চিত্রের তথ্য-বিবরণে সবিশেষ সুসমৃদ্ধ এবং তৎকালীন কৃতী-সাহিত্যিক ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের সুবিখ্যাত গ্রন্থ "হুতোম প্যাঁচার নক্‌শার' ছাঁচে রচিত। রচয়িতার আসল নাম—পণ্ডিত রামসর্ব্বস্ব বিদ্যাভূষণ··· আলোচ্য পুস্তিকায় সুরসিক লেখক আত্মপরিচয় গোপন করে "শ্রীযুক্ত দশ অবতারের এক অবতার" ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন। ৺রামসর্ব্বস্ব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নাম একালে অনেকের কাছেই অজানা হলেও, প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে সেকালের সমাজে তিনি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূজনীয় সংস্কৃত-শিক্ষক হিসাবে সবিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিলেন। কাজেই বিচক্ষণ পণ্ডিত ও কুশলী-সাহিত্যিক বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের রচিত নকশায় সেকালের 'পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব" অনুষ্ঠানের যে সব বিচিত্র চিত্তাকর্ষক তথ্য বিবরণের পরিচয় পাওয়া যায়, একালের অনুসন্ধিৎসু পাঠকপাঠিকাদের কাছে সেগুলি বিশেষ মূল্যবান হবে বলেই আমাদের ধারণা।

সেকালের সৌখীন-বিলাসী 'বাবু'
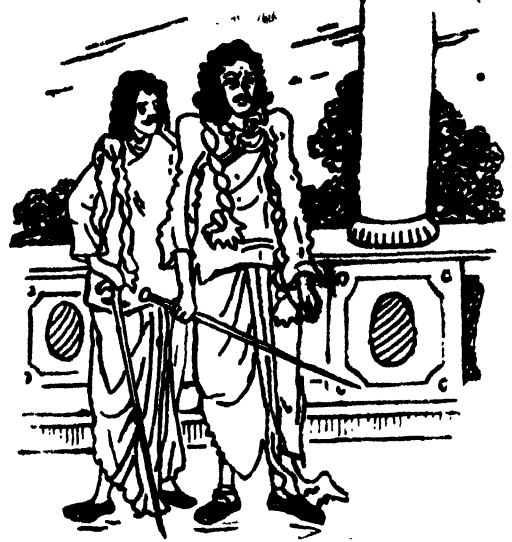
(৺রামসর্ব্বস্ব বিদ্যাভূষণ রচিত "পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব" পুস্তিকা হইতে উদ্ধৃত)

······১২৫৭ শাল ২৫শে আশ্বিন সোমবার। আজ ষষ্ঠী। গ্রামের চারদিকেই বাজনা বাদ্দি হচ্ছে, বাজন্দরেরা ঢোল পিঠে করে বাড়ি২ ঘুরচে, ঢাকীরা ছেঁড়া ঢাকে তালি দিয়ে বাজাতে২ ছুট্‌ছে। সজ্‌নাখাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তারা সেই অন্তর্দ্ধান করেছিল, কেউ বা "ধামা সারাবে গো" বলে বেতের আটি কাঁধে করে ভোমর নিয়ে পাড়ায়২ দেখা দিয়েছিল, কেউ বা ঢাক ফেলে জুতো গড়তে আরম্ভ করেছিল। দু-মাসের পর আজ তাদের আনন্দের দিন! পুজোবাড়িই বাজাবে, আর তিন দিন ভরপুর লুচিমণ্ডা খাবে। পাড়াগেঁয়ে পুজোয় তিন দিন লুচিমণ্ডার বড় দেখা শুনো নাই, বামনবাড়ি হলে কেবল ভাতের কেত্তন হয়, চাষাভুষোরা তাই খেয়ে থাকে; তবে সন্ধ্যাবেলা আরতির সময় এক সের ময়দার লুচি ভেজে দুর্গাকে দেখান হয়, শেষে বাড়ির ছেলেপিলেরা তাই খায়। তেতো-গুড়ের নারিকেল নাড়ু আর আধ-রাঙা মুড়্‌কি, এ তো অপর সাধারণের জন্য বরাদ্দই

আছে। কায়স্থ বা অন্যান্য জাতির বাড়ি দুপুরবেলা দু পাঁচ জন বামন খায়, তা চার হাত পা উচ্ছিষ্ট না করলে সে 'লুচি' ছেঁড়া যায় না, ও জল না খেলে গলা দে 'সন্দেশ' ওলে না। তিলি মালী গন্ধবেণের বাড়ি তাও ঘটে না। পল্লীগ্রামের পূজোর এই তো শ্রী, তাতে যে ঢাকী-ঢুলীরা লুচিমণ্ডা খেতে পাবে, সে মিছে কথা; তবে তাদের মনের আশা, আর হাজার হোক পুজো-লোকের বাড়ির দরজায় দুই২ কলার গাছ আর পূর্ণঘট, তার উপর আমের পল্লব ও এক একটি নারকেল দেওয়া হয়েছে। পাড়ার ছোঁড়ারা সব মরিয়া হয়ে নেচেকুঁদে বেড়াচ্চে; মা ভগবতীর আগমনে সর্ব্বত্রই আনন্দে পরিপূর্ণ। বিদেশী চাকরেরা সব "মাল্‌ভরা" ব্যাগ নিয়ে বাড়ি এসেছেন; পুজোর আমোদের সঙ্গে সঙ্গেই যত সন্ধ্যার আগমন হতেছে, তত তাঁদেরও আনন্দ বাড়চে, তাঁরা সদানন্দে প্রিয়তমার সহিত মধুপানে যামিনী-যাপন করবেন, কেউ বা ছুঁচো ধরে থাবেন। দেশের ছেলেরা নতুন শান্তিপুরে ধুতি ও ডুরে উড়ুনির বাহার দিয়ে খাতায়২ ঘুরচে, ক্ষুদে২ ছেলেরা সাজ পর্য়ে ল্যাজওয়ালা পাগড়ি মাথায় দিয়ে, গুরিয়া পুতুলের মত ঘুর২ করে বেড়াচ্চে। গয়লা, ছুতোর, কামার ও কুমারেরা কালা-পেড়ে কোরা ধুতি ও ধোয়া মল্‌মলের চাদর গায় দিয়ে চুল ফিরিয়ে বাবু সেজে বাহার মারচে। আজি তাদের আনন্দ, "আমাদের বাবুর বাড়ি দুর্গোৎসব!"

প্রায় দু-শ বৎসর হলো, আমাদের বাবুর পিতামহ নবাবের সরকারে চাকরি করে বেশ দশ টাকার সংগতি করে যান, তারপর স্বর্গীয় কর্ত্তামহাশয়ও নানা কলে-কৌশলে তা হতে বেশ রোজগার করেন; করে একখানি তালুক ও কিঞ্চিৎ জমি জমাৎ ও আবাদ করে যোত্রাপন্ন হয়ে উঠেন, কাজেই দোল দুর্গোৎসব রাস প্রভৃতি ফাঁক দিতেন না। আমাদের বাবু বিলক্ষণ হিন্দু, সুতরাং তাঁকেও পৈতৃক প্রথানুসারে সে সকলিই কর্ত্তে হয়, গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ সজ্জনদিগকেও বিদেয় আদায় দিতে হয়। এ ছাড়া সময়ে সময়ে বলাৎকার ও দাঙ্গাহাঙ্গামায়ও কিছু কিছু জরিমানা ব্যয় করে থাকেন। পুজোবাড়ির উঠানে পাইল খাটিয়ে তাতে সব ঝাড় লণ্ঠন টাঙান হয়েছে, লোকজন খুব শশব্যস্ত, কেউ বা প্রতিমায় সাজ পরাবার যা বাকি ছিল, পরিয়ে দিচ্চে, কেউ সিংগির বাচ্চের কেশর করে দেবে বলে তুলোতে সিঁদুর মাখাচ্চে, কেউ বা কার্ত্তিকের গোঁপ করে দিচ্চে, আর বলচে, দেখ, যেমন কার্ত্তিক, তার তেমনি মোঁচা গোঁপ হয়েছে। এদিকে বিকাল হয়ে আসতে লাগ্‌লো, সূর্য্যদেব দেখলেন লোকের আমোদ ভঙ্গ হয়, তাই ক্রমে ক্রমে আপনার তেজ গুড়িয়ে নিতে লাগলেন। ঢাকী ঢুলীরা ভাল ভাত খেয়ে, একবার সজোরে বাজিয়ে উঠ্‌লো। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ছুটোছুটি করে বাদ্দি শুনতে এলো। ক্রমে পুজো-বাড়ি লোকারণ্য। এমন সময় আমাদের বাবুদের বাড়িতে নহবৎ বেজে উঠ্‌লো। বাবুর বাড়ি পুজো, বড় জাঁক, ১৫ দিন থেকে নহবৎ বসেছে। এখানে লুচিমণ্ডার অভাব নেই, সাত দিন থেকে ভিয়েন চলছে, অনবরত মিষ্টান্ন তয়ের হচ্ছে। এখানে শুধু লুচিমণ্ডা কেন, খুঁজলে "বিক্‌ট্রিক পর্য্যন্ত মিলে। আমাদের বাবু গোঁড়া হিন্দু, এ কথা আগেই বলা হয়েছে, কিন্তু ছোটবাবু "বেহ্ম"। এমন কি স্বয়ং দেশে একটি ব্রাহ্মসমাজ করেছেন। রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশব সেনের উপর তাঁর বড় ভক্তি। আবার পূজা হলে অঞ্জলি না দিয়ে জল গ্রহণ করেন না। এবার "উপাসনার দিনটি' পুজার মধ্যে পড়াতে তাঁকে বৈকালে সমাজে গিয়ে চোখ বুজে "ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং" কর্ত্তে হবে, আবার আরতির সময় বাজনার তালে তালে হস্ততালি দিয়ে অবসানে দুর্গার শ্রীচরণে প্রণামও কর্ত্তে হবে। এ রকম ব্রাহ্মের অপ্রতুল নাই। আমাদের হুতোম দাদা বলে গিয়েছেন "ব্রাহ্ম হয়েও কেউ কেউ কালীপুজা করেন, কেউ বা ভূতচতুর্দ্দশীর দিন বাড়িতে প্রদীপ দেন।" আমরা দেখচি আজি কালি কেউ কেউ আবার আদালতে মিথ্যে সাক্ষীও দিয়ে আসেন। এইরূপ ব্রাহ্ম হতেই তো ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা কমে আসচে। ফলতঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম নিত্যধর্ম্ম, এবং অনেকেই প্রকৃত ব্রাহ্ম আছেন। যেমন ব্রাহ্মধর্ম্মে অনেক 'বক বিড়ালকে' দেখতে পাওয়া যায় সকল ধর্ম্মেই তেমন আছে, তাতে ধর্ম্মের দোষ কি? যা হোক, আমাদের বাবুর বাড়ি নহবৎ বাজতে কাকে বলে জানে না, বাবুদের কল্যাণে এই যা দেখে শুনে মিলে।

ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত। সজোরে নহবৎ বেজে উঠলো,

ফরাসরা গ্লাস সাফ করে তেল দিয়ে বাতিজ্বেলে দিবার উদ্‌যোগ কর্ত্তে লাগ্‌লো, পুজোর দালান, ধুনার ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে গেল। এ দিগে ছোট বাবুর বৈঠকখানা ইয়ারগোছের ব্রাহ্মসমাজের ভদ্রলোকে পরিপূর্ণ। তিনি সময় বয়ে যায় দেখে গ্লাস, জল ও কাক্‌স্ক্রুর জন্য চাকরদের গালাগালি দিতে লাগলেন, এই সকল দেখে শুনে দিনমণি লজ্জায় আস্তেই গাছের আগ্‌ডালে ২ ক্রমে ২ সরে পড়লেন; বঙ্গভূমি ছেলেদের এই সকল ব্যাভার দেখে, "কুলে কালি দিলে" বুঝে, ভাবতে ২ কাল হয়ে গেলেন; পাখিরে সব "দুও" দিতে লাগলো; চাঁদ এই সময় তামাসা দেখবার জন্যে জানালা দিয়ে এক একবার উঁকি মারতে লাগ্‌লেন আর হাসতে থাকলে। এমন সময় পুরোহিত মহাশয় তন্ত্রধার সঙ্গে বাবুর বাড়ি এসে উপস্থিত হলেন। তিনি বাবুর কাছ থেকে হবিষ্যের পয়সা নিয়ে গিয়ে দিব্বি মাছ ভাত খেয়ে বোধন কর্ত্তে এলেন। প্রথমে পা ধুয়ে বেলগাছে বোধন সেরে "ওঁ শ্মশানানলদগ্ধোঽসি পরিত্যক্তোসি বান্ধবৈঃ; ইদং নীরমিদং ক্ষীরমত্র স্নাহি ইদং পিব" মন্ত্র বলে প্রতিমার চক্ষুর্দ্দান করে বরণ করলেন। যাবার সময় বাড়ির গিন্নীকে বলে গেলেন, কাল সকাল ২ যেন উদ্‌যোগ হয়, প্রাতেই নবপত্রিকা স্নান। বাড়ির মেয়েরা বড় ব্যস্ত! কেউ পাঁচ কলাই ভিজুচ্চে, কেউ কেউ অধিবাসের উদ্‌যোগ করচে, কেউ বা নদীর জল, স্রোতের জল, পর্ব্বতমৃত্তিকা, বেশ্যাদ্বারমৃত্তিকা, এই সকল ভাগ করে ২ রাখচে। আমাদের বাবু দালানে বসে ভক্তিভাবে মা ভগবতীর চাঁদবদন নিরীক্ষণ করচেন, আর দু চার বেটা বরাখুরে "আহা! মার যে মূর্ত্তি, এমন কখন দেখি নি, বাবু! প্রতিমা যা, তা আপনার বাড়িই হয়ে থাকে, এমন প্রতিমে আর কোথাও দেখি নি। বেটা কুমোর যেমন চোখ চান্‌কেচে, তেমনি মুখশ্রী করেচে, আর চালচিত্তিরও তেমনি হয়েছে, বলচে, তাই অবাক্ হয়ে শুনছেন, আর আপনাকে ধন্যজ্ঞান করচেন। এদিকে ছোটবাবুর বৈঠকখানায় তবলায় চাঁটি পড়চে, আর "শিবাবা ২"। শব্দ উঠছে। ক্রমে বাবুর বৈঠকখানার ঘড়িতে টুনং করে দশটা বেজে গেল, বড়বাবুরও মৌতাতের সময় হয়ে এলো। বড়বাবু নিজে দলপতি, দলস্থ বামুন কায়েতদের জাত রাখবার ও জাত মারবার কর্ত্তা। সে দিন এক জন ব্রাহ্মণের ছেলে কল্‌কেতায় এসে মুসলমানের দোকানে পাঁউরুটি খেয়েছিল, তাইতে তাকে খৃষ্টান বলে, তার বাপকে জাতিভ্রষ্ট করেছেন; আর রামকেষ্ট বোস দানাপুরে কেরানিগিরি কর্ত্তেন, তিনি সেখানে তাঁর ছোট মেয়েটিকে স্কুলে পড়িয়েছিলেন, আর বিবিদের মত ঘাঘরা পরাতেন, তাইতে তিনি পুজার সময় বাড়ি এলে তাঁকে দলচ্যুত করেছেন। অতএব বড়বাবু তো সকলের সামনে মৌতাত ভাঙ্গতে পারেন না, সুতরাং দশটা বাজতেই তিনি মোসাহেবদের বিয়ের দিয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। এমন সময় ঘড়্ ঘড়্ শব্দে দুখানি গরুর গাড়ি বাবুর বাড়ির দরজায় লাগ্‌লো। বাবুরা গাড়ি থেকে "খাড়া রও" বলে একেবারে চেঁচিয়ে উঠলেন; বোধ হলো যেন কাকে গঙ্গাযাত্রা করান হচ্চে। ক্রমে তা হতেচার জন বাবু নামলেন; আর চার জন সেই গরুর গাড়ির উপরেই চিৎপাত হয়ে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় আয়েস মিটুচ্চেন; এমন, কি যদি গাড়োয়ান দুজন ও বাবুর বাড়ির দরওয়ান না থাকতো, তা হলে বাবুদিগকে রাত্রির মত সে সুখ থেকে বঞ্চিত করা কারো সাধ্য হত না। বাবুরা গাড়ি থেকে নামলেন বটে, কিন্তু কারো কারো বা শামলা গড়াগড়ি দিচ্চে, কারো মোজা ঝুলছে, কারো বা এক পাটি জুতাই পাওয়া যাচ্চে না। এঁরা সব কল্‌কেতার বাবু! এর মধ্যে মাছের টক ও কাঠের পুতুলও আছেন। এঁরা নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছেন!!! সকলেরই এক একটি কার্‌পেটের ব্যাগ আছে, তার মধ্যে একটি প্রকাণ্ড প্যাটরার ন্যায় চামড়ার ব্যাগ, তাতেই "নম্বর ওয়ান্" এক ডজন রেস্ত। কেবল তিনটি পথখরচ হয়েছে এই মাত্র!!

পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই অবগত থাকতে পারেন, সকল পল্লীগ্রামে ঘোড়ার গাড়ি বা পাল্‌কি পাওয়া যায় না; তবে রেইলওয়ের কল্যাণে অনেক গ্রামেই এক একটি পাকা রাস্তা হয়েছে, কিন্তু, সেই রাস্তা থেকে দুই এক মাইল ভিন্ন দিকে যেতে হলেই বর্ষাকালে কাদা জলে কষ্ট পেতে হয়, সুতরাং আমাদের কল্‌কেতার বাবুরা পথের মধ্যে গরুর গাড়ি তাই ভাড়া করেই এসেছিল। পাড়াগেঁয়ে ছেলেরা সহুরেদের চেয়েও ফচ্‌কে! সহুরে ছেলেরা স্কুলের ভয়ে "মাথাব্যথা, গা বমি" বলে পার পায়, কিন্তু পাড়াগেঁয়ে ছেলেরা বাঁশ-বনে বা কচু-ঝোপে

লুকিয়ে থাকে। "সে দিন এক জন পাড়াগেঁয়ে ছেলে পণ্ডিতকে জব্দ করবার জন্যে চেয়ারের পেছনে একটি প্রেক্ পুতে রেখেছিল; পণ্ডিত মহাশয় যেমন চেয়ারে ঠেস দিয়ে টেবিলে পা রেখে ঘুমুচ্চেন, অমনি আস্তে ২ সে তাঁর টিকিটি ধরে প্রেকে বেঁধে সাম্‌নে গিয়ে "তানা নানা" করে চেঁচিয়ে উঠেছে; পণ্ডিত মশায়ের ঘুম ভেঙ্গে গেল, তিনি যেমন তাড়াতাড়ি তাকে মারতে যাবেন অমনি তাঁর টিকিটি ছিঁড়ে কুটি কুটি হয়ে গেল, ছেলেরা হেসে উঠলো; পণ্ডিত মশায় অপ্রস্তুত হয়ে বসে পড়লেন।" এ সব বদমাইশি সহরের ছেলেরা বড় জানে না। যা হোক, সেই পাড়ার যত বওয়াটে ছেলে বাবুদের এই অবস্থা দেখে হাততালি আর হাসি টিট্‌কারি দিতে লাগ্‌লো। বাবুরা রেগে টং, মারতে উঠ্‌লেন, কিন্তু ক্ষমতা নাই, কাজেই তাঁদের মনের আগুন মনে রইল, "ঘ্যাষ্টি ভিলেজ গোটু হেল্‌" বলতে বলতে বাড়ির ভিতর ঢুকলেন। এদিকে ছোটবাবু কল্‌কেতার বাবুদের আগমনবার্ত্তা পেয়েই অমনি "মধুবাতা" পড়ে, দাঁড়া গো পান দেবার জন্যে সিঁড়ি পর্য্যন্ত ছুটে এলেন, আর "হেল্লো গুড্‌মর্নিং" বলে অভ্যর্থনা করলেন, আমোদের সীমা নাই, এতক্ষণের পর পূজাটা সার্থক হলো। ক্রমে আমোদ গড়াবার উদ্‌যোগ হতে লাগ্‌লো, প্রথম চেঁচামেচি, গোলমাল, গালাগালির পর আর কে কারে দেখে, সকলেই "পপাত ধরণীতলে।" এতক্ষণ কাহারও বা বানরের মত ছুটফটানি ধরেছিল, কেউ বা সিংহের মত তর্জ্জন গর্জ্জন করছিলেন, ক্রমে সকলেই কুম্ভকর্ণের পালা গেয়ে দিলেন। * * * * সুতরাং এই আমোদে আজকের রাতটি যেন এক মুহূর্ত্তের মত কেটে গেল। ইয়ার্কির আমোদের সঙ্গে সঙ্গেই নিশানাথ অস্ত গেলেন, কুমুদিনীনাথের দুর্দ্দশা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লেন। অন্ধকার স্থিরভাবে এতক্ষণ বাবুদের খেম্‌টা নাচ দেখছিলেন ও "পিরিত চিনেছ ভাল কোলা বেঙ" গান শুনছিলেন, কিন্তু যেই "মলিন বদন কেন রে তোর হেরি রে বাপ যাদুমণি" শুনেছেন, অমনি আর সাম্‌নে থাকতে না পেরে ভয়ে পালিয়ে গিয়ে জলের জালা আর পুজোবাড়ির ভাঁড়ার ঘরে লুকুলেন। কমলিনী ঘোমটা খুলে মুচকে হেসে হাতছানি দিয়ে প্রাণনাথকে ডেকে তামাশা দেখাতে লাগলেন, সূর্য্যদেবও বাবুদের বাঁদ-রামো দেখে রেগেই যেন রাঙা হয়ে উঠলেন, পাখিগুলো "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল" বলতে বলতে চলে গেল, আমাদের বাবুর বাড়িরও নবপত্রিকা স্নানের সময় হয়ে এলো। সজোরে ঢাক ঢোল বেজে উঠ্‌লো, নহবতে রকমারি বোল বাজতে লাগলো, ছোট ছোট ছেলেরা ঘুমে থেকে উঠে নেংটা হয়েই পুজোবাড়ির উঠোনে জমতে লাগলো, তাদের আর কাপড় পরবার অবকাশ হলো না। পুরুতঠাকুর তাড়াতাড়ি এসে কলাগাছ, হলুদগাছ প্রভৃতি একত্রে বেঁধে জোড়া বেলের পীনপয়োধর করে, নবপত্রিকা ঘাড়ে নিয়ে পেছনে২ বাজাতে২ চল্লো। ক্রমে গঙ্গাতীরে লোকারণ্য! ঘোষেদের বোসেদের মুখুয্যেদেরও নবপত্রিকা এসে জুটলো, ঢাকঢোলের বাদ্দি, ছোঁড়াদের চীৎকার আর কাঁসি ঘণ্টার শব্দে একেবারে নভঃস্থল যেন বিদীর্ণ হয়ে উঠলো ও গঙ্গার ওপার থেকে প্রতিধ্বনি হয়ে যেন "বাহবা" দিতে লাগলো। ক্রমে সহস্র কলসী ও সর্ব্বোষধি মহৌষধির জলে নবপত্রিকা স্নান করিয়ে শাড়ি পরিয়ে তাঁকে "কলাবৌ" করে দুর্গাপ্রতিমের পাশে গণেশের পাশে বেঁধে দেওয়া হলো। [ক্রমশঃ

কয়েক ঘণ্টা

মীরা রায়

ঘড়ির কাঁটাকে এগারটার ঘরের সামনে রেখে রাত্রির নিস্তব্ধতাকে ভেঙ্গে দিয়ে ট্রেণটা ষ্টেশনের বুকচিরে এগিয়ে এসে থামল। সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রত্যাশিত সোরগোলে ঝিমোনো ষ্টেশনটা জেগে উঠল। বড় জাংশান এটা, প্রায় সারারাতই জেগে থেকে একে যান্ত্রিক অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাতে হয়। ফেরীওয়ালাগুলো তাদের অভ্যস্ত স্বরে হেঁকে যেতে লাগল—ট্রেণটার কামরাগুলোর সামনে দিয়ে 'চাই বড়িয়া লাড্ডু' 'পান বিড়ি সিগারেট,' 'চা গরম' ইত্যাদি নানান অভিভাষণে। ওদের এই ব্যবসায়িক বৃত্তিতে কোনদিন ছন্দপতন ঘটেনা, সময় হলেই ঠিক টেপরেকর্ডারের মত একটানা বেজে চলে। ওয়েটিংরুমের পাশে নিজের ছোট চা বিস্কুটের দোকানে বসে নিখিলের অর্দ্ধজাগ্রত চেতনার কাছে ওদের এই হাঁকডাকগুলো বেশ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে, ফেরীওয়ালাগুলোর সঙ্গে সঙ্গে তাকেও, সচেতন হয়ে উঠে বসতে হয়। যাত্রীদের ওঠা-নামায় ষ্টেশনটা শব্দমুখর হয়ে ওঠে, এখনিই হয়ত কোন খদ্দের আসতে পারে তার দোকানে। ছোট দোকান হলেও তার বিক্রী খুব হয়, চা, বিস্কুট, লজেন্স, টফী, দুধ, পাউরুটি ইত্যাদি সবই রাখতে হয় দোকানে, ছোট ছেলে-মেয়ে নিয়ে আগত যাত্রীদের খুব সুবিধা হয় এ দোকানটা থেকে।

'এক কাপ চা আর দুটো বিস্কুট দিন তো' ট্রেণ থেকে নেমেই অমলেশ সরকার গিয়ে দাঁড়ালেন নিখিলের চাএর দোকানের সামনে—'গলাটা বড় শুকিয়ে উঠেছে, চা খেলে তবে একটু স্থির হয়ে বসতে পারব'। পিছনে মুখ ফিরিয়ে বোধহয় মালবাহী কুলিকে উদ্দেশ্য করেই বল্লেন, তোমরা ওয়েটিং রুমে যাও আমি চা খেয়ে যাচ্ছি'। কুলিটা তাঁর নির্দ্দেশমত মাল ও একটি সাত আট বছরের মেয়েকে নিয়ে ওয়েটিং রুমে ঢুকে গেল।

অমলেশ সরকারও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিখিলের দেওয়া চা বিস্কুটের সদ্ব্যবহার করে ওদের পিছু পিছু ঢুকে গেলেন। ট্রেণটা যতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল নিখিলের দোকানে খদ্দেরের আসাযাওয়ার ঘাটতি ছিল না। ট্রেণটা আবার আড়ামোড়া ভেঙ্গে চলতে সুরু করল, ষ্টেশনের সাময়িক জেগে-ওঠা সত্বাও আবার রাত্রির সুষুপ্তিতে ডুব দিল। বিস্কুটটিনের হাতলভাঙ্গা চেয়ারে বসে নিখিল রোজই এই ব্যাঘাত নিদ্রার বিরক্তিকর দুর্ভোগটা ভোগ করে, টানা ঘুমোবার তার উপায় নেই। এই দোকানটাই তার জীবনসংগ্রামে বেঁচে থাকবার একমাত্র অবলম্বন। পাকিস্থানে সর্বস্ব খুইয়ে এপারে এসেছে বলে তাকে গভর্ণমেণ্ট যত না বেশী দয়া করেছে, তার চেয়ে ঢের বেশী দয়া নিজেকে করতে হয়েছে, না হলে বাস্তু থেকেই শুধু উৎখাত হতে হোত না এই পৃথিবী থেকেও উৎখাত হতে হ'ত।

ট্রেণটা চলে যাবার পর নিখিল চোখ বুঁজে একটু ঘুমোতে চেষ্টা করল কিন্তু অমলেশবাবুর ডাকে আবার চোখ খুলতে হল। "শুনছেন মশায়, আমার মেয়েকে রাতের খাওয়াটা এইখানেই খাইয়ে নিই, এককাপ দুধ আর পাউরুটির ব্যবস্থা করে দিন তো। কৈ বুলা, এদিকে এসো এই চেয়ারটায় বসে খেয়ে নাও"—বলে তিনি নিজে একটা চেয়ারে বসলেন। তাঁর আহ্বানে ওয়েটিংরুম থেকে সেই মেয়েটি বেরিয়ে এসে নিখিলের সামনের চেয়ারটায় বসল। এইবারে নিখিলের ভালো করে নজরে পড়ল মেয়েটিকে, মুহূর্ত্তে ধ্বক করে উঠল তার বুকটা! সেই রকম মুখ, সেই রকম চোখ, সেই রকম অবয়ব, ঠিক তার মেয়ে জয়ার মত। জয়া কি আবার ফেরৎ এল? তাকে তো সে আহুতি দিয়ে এসেছে মানুষের পৈশাচিক উন্মত্ততার দাবানলে, ধ্বংসলীলার ঘোরাবর্ত্তে—একটি বুদ্বুদের মত সে ক্ষুদ্র সত্বাটুকু

চিরদিনের মত মিলিয়ে গিয়েছে। এই মুহূর্তটা তার স্মৃতির পাতাগুলোকে যেন মোচড় দিয়ে খুলে দিয়ে গেল, সেই রক্তাক্ত ইতিহাসের অধ্যায়টাকে, যে অধ্যায়টা ছিল তার সর্ব্বস্ব হারাবার নথিপুঁথির একটা বিরাট দলিল। এর আদিঅন্তে কেবল একটি বিয়োগান্ত ধ্বনিই রিণরিণিয়ে বাজত—সেটি হল মরণোন্মুখ এক বালিকার অন্তিম আকুল আবেদন 'বাবা বাবাগো।' আজও সে ডাক যেন নিখিলের কানে বজ্র হয়ে বাজে ও সহ্য করতে পারেনা—দুহাতে কাণ চেপে ধরে—চোখের সামনে ভেসে ওঠে জয়ার অন্তিম রক্তাক্ত মুখখানা। নিখিল ভুলতে পারেনা সেদিনের সেই সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা—যেদিন সমস্ত খুলনা সহরটা মৃত্যুর হাত ধরে যেন তাণ্ডব নৃত্যে মেতেছিল। চারদিকে মানবসভ্যতার চিতা জলছে, সেই অগ্নিসজ্জায় সমস্ত সহরটা লেলিহান হয়ে অসহায় মানুষ কীটগুলোকে নিশ্চিহ্ন করেদেবার জন্য চতুর্দ্দিকে বাহু প্রসারিত করেছে। তার এই লুব্ধ গ্রাস থেকে পালাবার জন্য নিখিল স্ত্রী অতসী ও মেয়ে জয়াকে নিয়ে মরীয়া হয়ে ছুটেছিল, কিন্তু রক্ষে পায়নি। অতসীকে মাঝপথে কারা জোর করে নিয়ে সরে পড়ল নিখিল আজও তাদের হদিশ পায়নি। জয়াকে নিয়ে ও গোপন জায়গায় সরে যাবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু মাথায় পেল প্রচণ্ড আঘাত, তার চোখের সামনে থেকে এই মরণোন্মত্ত মাতাল পৃথিবীটা বিস্মৃতির অতল তলে ক্রমে মিলিয়ে যাবার আগে শেষবারের মত চোখে পড়ল জয়ার দারুণ ক্ষতবিক্ষত রক্তস্রাবী মুখ আর তার অন্তিম চীৎকার 'বাবা বাবাগো'। নিখিলের মূর্চ্ছিত স্নায়ুর তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে অগ্নিস্বাক্ষরের জ্বালা ধরিয়েদিয়ে গেল, ইলেকট্রিকের শক খেয়ে যেন তা সমগ্র চেতনায় অস্বাভাবিক শিহরণ জাগিয়ে গেল, একটা গাঢ় অবলুপ্তির মাঝেও যেন ওর সমস্ত সত্বা জেগে উঠতে চাইল এই আহ্বানে, কিন্তু দারুণ যন্ত্রণায় তার স্মৃতির সমস্ত স্তরগুলো ভেঙ্গে চুরে তালগোল পাকিয়ে কি যেন হয়ে গেল সে আর কিছু বুঝতে পারেনি। যখন জ্ঞান হল তখন দেখল বন্ধু আনোয়ারের বাড়ীতে শুয়ে আছে। বাঁচতে সে চায়নি। জীবনপাত্র উজাড় করে সে পান করেছিল সর্ব্বস্ব বিয়োগের তীব্র হলাহল, কিন্তু আনোয়ারই বহু সেবা শুশ্রূষা করে তাকে ভালো করে তুলে হিন্দুস্থানে যাবার সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।

তারপর বহু সংগ্রামের বছর গুলো এক এক করে কেটে গিয়েছে। অবশেষে কি করে নিখিল এই ষ্টেশনে চা বিস্কুটের দোকান খুলে এই শহরে বসবাস করতে আরম্ভ করেছে তার ইতিহাসের পাতা খোলবার মানসিক শক্তি আর নিখিলের অবশিষ্ট নেই। দুনিয়ায় তার প্রিয়জনেরা কেউ নেই, তবুও বেঁচে থাকবার তাগিদে এবং জীবনের রুক্ষতাকে ভুলে থাকতে গিয়ে তাকে এই দোকানটাকেই অবলম্বন করে তার জীবনের সব সাধ সাধনার সমাধির ওপর একটা স্মৃতিস্তম্ভের চাকচিক্য রচনা করতে হয়। এই ষ্টেশনে বসেই সে প্রত্যক্ষ করে—অবিরাম জনস্রোতের জোয়ার ভাঁটা, বহুবার অনুসন্ধানী দৃষ্টি ফেলে খোঁজে—যদি এদেরই মাঝে হঠাৎ খুঁজে পায় হারিয়ে যাওয়া অতসীকে, কিন্তু আশা শুধু মনের কল্পনারসে পুষ্ট হয়ে বেঁচে থাকে, বাস্তব বারেবারে সে কল্পনাকে কঠিন উপহাস করে ফিরে যায়, নিখিলের বেলাতেও তাই হয়েছে। কিন্তু জয়ার জুড়িদার কাউকে সে দেখতে পাবে এ তার কল্পনারও অতীত ছিল। বুলার প্রতিটি অবয়ব যেন জয়ার প্রতিনিধিত্ব করছে। একটা অব্যক্ত বেদনা বুকটায় মোচড় দিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে নিখিলের গলা পর্য্যন্ত উঠে সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ল। কিছুক্ষণের জন্য সে আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়লেও নিমেষে নিজেকে সামলে নিয়ে অর্ডারমত খাবারের পাত্রগুলো বুলার সামনে টেবিলে ধরে দিয়ে ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার লোভ সে কিছুতেই দমন করতে পারল না। কোমলস্বরে প্রশ্ন করল, "তোমার নাম কি খুকী, কোথায় থাক তোমরা?"

উত্তরটা অমলেশবাবুই দিলেন, "ওর নাম বলাকা, আমরা বুলা বলে ডাকি। আর বলেন কেন—সারাদিন বাড়ীতে কেবল দুষ্টুমী করে, পড়া শোনার নামগন্ধও করেনা, তাই কনভেন্ট স্কুলে ওকে ভর্ত্তি করে দেবার জন্য নিয়ে যাচ্ছি। সেখানে বোর্ডিংএ থাকবে আর স্কুলে পড়বে। কলকাতায় মশাই নানা হুজুগে হাঙ্গামায় ছেলে মেয়েদের পড়াশোনা আজকাল কিছুই হয়না। তার ওপর এসব দিশী স্কুলের এ্যাসোশিয়েসানও খুব খারাপ—যেমন মাষ্টারের দল, তেমনি ছেলে মেয়েরা। ওদের ঐ সব জঘন্য পরিবেশে কি কোন ভদ্র ছেলে মেয়ে মানুষ হতে পারে? নাও বুলা খেয়ে নাও—আমি ততক্ষণ

তোমার বিছানা টিছানা গুলো পাতিগে” বলে তিনি পাশের ওয়েটিং রুমে গিয়ে ঢুকলেন।

বুলা বাপের অনুপস্থিতিতে যেন আগেকার আড়ষ্টতা কাটিয়ে বেশ সহজ হয়ে চেয়ারে বসল। একবার ওয়েটিং রুমের দিকে তাকাল তারপর আস্তে আস্তে বল্ল—আপনি তো জানেন না বাবা কেন আমায় স্কুলে দিতে নিয়ে যাচ্ছে। নতুন মা যে অনবরত খালি বাবাকে বলছিল—আমায় কোন দূরে বোর্ডিংএ পাঠিয়ে দিতে। আমি নাকি ভয়ানক দুষ্টু, নতুনমাকে কেবল জ্বালাতন করি তাই।” একটু খানি চুপ করে বিষন্ন চোখদুটো তুলে আবার বল্ল—নতুন মা আমায় বড় বকে, আমার বড় ভয় করে।” বোধহয় ওর বাড়ীতে ফেলে আসা কিছু ভয়ানক স্মৃতি মনের দরজায় হানা দিল।

নিখিল উঠে গিয়ে একটা প্যাকেটে করে কিছু বিস্কুট ও লজেন্স এনে ওর হাতে গুঁজে দিল—বল্ল ‘বুলা’ এগুলো তুমি খেও, নতুন মা তোমাকে বকেন কেন? তুমি তো খুব লক্ষ্মী মেয়ে। আমায় তোমার মনে থাকবে তো?” বলেই তার মনে হল প্রশ্নটা বুলার কাছে খুব অবান্তর করা হয়েছে। এক দিনের কয়েক মুহূর্ত্তের পরিচয়ে তাকে মনে রাখবার মত দাবী তার পিতৃস্নেহান্ধ মন কেন করে বসল? তার এই ঘনিষ্ঠতার মূল উৎস জানবার কথা তো বুলার নয়। কিন্তু বুলার এদিকে নজর নেই সে অযাচিতভাবে এতগুলো বিস্কুট লজেন্স পাওয়াতে এটুকু বুঝতে পেরেছিল, তার জীবনে নিত্য বিভীষিকা সৃষ্টিকারীদের মধ্যে অন্ততঃ এলোকটিকে ফেলা যায়না, এ যেন তাদের থেকে পৃথক। তাই অবাক বিস্ময়ে ও যখন নিখিলের দিকে তাকিয়ে রইল এবং ব্যথিত কণ্ঠে বল্ল “আপনি আমায় এত লজেন্স না চাইতেই দিলেন কি করে? বাড়ীতে কেউ চাইলেও দেয়না, আর নতুন মার কাছে তো চাইতেই ভয় করে।” তখন নিখিলের আর্ত্ত পিতৃত্ব যেন বোবা কান্নায় ভেঙে পড়ল। ও আস্তে আস্তে বুলার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল, প্রায় ফিসফিসিয়ে বল্ল, “কেন বুলা, তুমি তো ভারী ভালো মেয়ে, তবু নতুনমা তোমায় ভালো বাসেন না কেন? বাড়ীতে কি তোমায় কেউ ভালো বাসেনা?” ওর কণ্ঠস্বর ক্রমে গাঢ় হয়ে আসে, তার বুঝতে একটুও অসুবিধা হয়না—মাতৃহীনা এই মেয়েটার ওপর বিমাতার শাসনের স্বরূপটা কি ধরণের।

বুলার চোখ ছলছলিয়ে উঠে এইটুকু স্নেহের পরশে। মাথাদুলিয়ে বলে “নতুনমা আমায় একটুও ভালোবাসেনা, কেবল ধমকায়, আর বাবাকেও বড় ভয় করে। ওদের কাছে সারাদিন রাততো থাকি না। রতনদিদিই আমায় জামাপরায়, খাওয়ায়, রাতে নিয়ে শোয়, আর রতনদিদির ছেলে কালু সে আমার খুব বন্ধু। এরা দুজন আমায় কিন্তু খুব—খুব ভালোবাসে, কিন্তু নতুনমার সামনে আমরা ভয়ে কেউ কথা বলতে পারিনা। আমার যে সত্যিকারের মা ছিল সে নাকি ফুলের রথে করে ঐ যে আকাশ দেখছেন ঐ খানে চলে গেছে, আমি যদি বোর্ডিংএ থেকে খুব ভালোকরে পড়াশোনা করি তাহলে মা আবার আমার কাছে আসবে রতনদিদি সেই কথাই আমায় বলেছে।” বুলার যেন আর কোন সঙ্কোচ নেই, পরম আপনার জনভেবে সে নিখিলের সঙ্গে মন খুলে গল্প জুড়ে দিয়েছে। নিখিল ও পিতৃস্নেহের ডুবুরী নামিয়ে দিয়ে তার শিশুচিত্ত তোলপাড় করে তার স্মৃতিসম্পদ বার করে নিচ্ছিল, সে তার সমস্ত সত্ত্বা দিয়ে ভোগ করতে চাইছিল বুলার অবস্থিতি। মধুর আজ রাত্রের কয়েকঘণ্টার পরমায়ুটুকুকে কিন্তু তাতে ছেদ ঘটালেন অমলেশ সরকার “কৈ বুলা খাওয়া হল? চল রাত হয়েগেছে শোবে চল। কাল ভোরে উঠে আবার ট্রেণ ধরতে হবে, এত গল্প করলে ঘুমোবে কখন?” নিখিলের দিকে চেয়ে ঈষৎ হাসলেন “আপনারও খুব ধৈর্য্য আছে মশাই, বুলার সঙ্গে তখন থেকে বক্‌বক্‌ করছেন। খুব ভাব জমিয়ে নিয়েছেন, বাড়ীতে ও কারোর সঙ্গে কথা কয়না, এখানে আপনার সঙ্গে তো খুব কথা কইছে। গল্পের চোটে বুলার খাওয়া শেষ হয়নি দেখে দারুণ চটে গেলেন, রেগে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, নিখিল হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে দিল, বল্ল, আমি এক্ষুণি ওকে খাইয়ে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি, ওকে বকবেন না। ধীরে ধীরে নিখিল সব দুধ রুটিগুলো বুলাকে খাইয়ে দিল, ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে বল্ল “এবার ঘুমোও গিয়ে লক্ষ্মীমেয়ের মত কেমন?”

বুলার যাবার ইচ্ছা না থাকলেও যেতে হল, অমলেশবাবু ওর হাত ধরে টানতে টানতে ওয়েটিং রুমে ঢুকে

গেলেন। পিতৃত্বের অধিকারের শুষ্ক কর্তব্যের আড়ালে চাপা পড়ে গেল মেয়ের স্নেহবুভুক্ষু হৃদয়ের গোপন বার্তাটুকু —যে বার্তাটুকু এনে দিয়েছিল তার সমব্যথী একটি দরদী হৃদয়ের সন্ধান, বয়সের অসমতা, অনাত্মীয়ের পরিচয়হীনতা সেখানে অবান্তর হয়ে উঠেছিল। লজেন্স টফী ঘুষ দিয়ে নিখিল তার শিশুচিত্ত অতি অল্পসময়ের মধ্যেই দখল করে ফেলেছিল।

অমলেশ সরকার আবার বেরিয়ে এলেন, নিখিলের দোকানের সামনের চেয়ারটায় বেশ চেপে বসে বললেন— "বুঝলেন আমিও আপনার এখানে কিছু খেয়ে নি। ওয়েটিংরুমের পাশেই আপনার দোকানটা থাকায় আমাদের মত যাত্রীদের বেশ সুবিধেই হয়েছে মশায়। দিন, এক কাপ চা আর টোষ্ট।" চা খেতে খেতে কথা শুরু করলেন— "বুলাকে আবার গরমের ছুটিতে আনতে যাব, এই ষ্টেশান দিয়েই তো যাতায়াত করতে হবে, এখন যে কয় বছর ও কনভেণ্ট স্কুলে পড়বে। আপনার এই দোকানেই খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করব, আপনার সঙ্গে যখন জানাশোনা হল আর আপনার দোকানের চা'টিও ভারি স্বচ্ছ। আর বুলাতো বেশ আপনার সঙ্গে পরিচয় জমিয়েই নিয়েছে। বিদেশে বাঙ্গালীই বাঙ্গালীর ভরসা, কি বলেন? আমি যেখানেই বিদেশে গিয়েছি আগেই কোথায় বাঙ্গালী আছেন তাই খুঁজি?

যন্ত্রের মত সায় দিয়ে মাথা নাড়ে নিখিল। অর্ডারমত চা টোষ্টও সাপ্লাই করে, কিন্তু মন ছুটে চলে গিয়েছে ওয়েটিং রুমে ঘুমন্ত বুলার পাশে। রাত্রিকালীন স্বল্প আহার সেরে অমলেশ সরকার উঠে গেলেন বিশ্রাম নেবার জন্য।

নিখিল শূন্যদৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল চকচকে চাবুকের মত পড়ে থাকা রেল লাইন দুটোর ওপর। স্মৃতির চকচকে চাবুক আছড়ে পড়তে লাগল ওর মনোভূমিতে। এই ষ্টেশন দিয়েই বুলার গতিবিধি বেশ কয়েক বছরের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে গেল, আর তাকে দোকান সাজিয়ে বসে নীরব দর্শক হয়ে দেখতে হবে জয়ার স্মৃতির কুহকিনী রূপের এই খেলা! তার ঝিমিয়ে আসা সেই ভয়ঙ্কর স্মৃতি বারেবারে বুলার মধ্য দিয়ে নতুন জন্মলাভ করে তাকে নিষ্ঠুর উপহাস করে যাবে, আর সে ভাগ্যের ক্রীড়নক হয়ে ভোগ করে যাবে সেই দুর্ভোগ, এই দোকান পসারের কারবার চালিয়ে যাবে যন্ত্রের মত? না, না, সে পারবে না সহ্য করতে স্মৃতির এই ছদ্মবেশী আক্রমণ! জয়ার মৃত্যুতে আছে সত্যের নির্মমতা, কিন্তু এ আশার আশায় আছে হৃতসর্বস্বের বারংবার প্রবঞ্চনার গ্লানি। তার চিন্তার জাল ছিঁড়ে রাত দুটোর মেলট্রেণটা এসে দাঁড়াল। কিন্তু নিখিলের কাছে সব যেন বিস্বাদ হয়ে গেছে, ওর আর এক মুহূর্তও যেন দোকান চালাতে ইচ্ছে করলনা, ও সব কারবার তুলে দিয়ে চলে যাবে যেখানে তার জীর্ণ অতীত ব্যর্থ মৃত ভবিষ্যতের আর জন্ম দেবেনা!

খদ্দেরের আনাগোনায় আবার তাকে উঠতেই হল।

"শুনছেন, আমি আবার এলাম আপনার কাছে গল্প করতে" বুলা কখন ট্রেণের শব্দে জেগে উঠে বাইরে এসে তার দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছে। চমকে নিখিল তাকাল, "একি! তুমি উঠে এলে কেন? যাও শোওগে যাও।"

মাথা দুলিয়ে সজোরে প্রতিবাদ জানিয়ে ও বল্ল "আমার শুতে ভালো লাগছে না, আপনার সঙ্গে গল্প করতে আমার ভালো লাগছে। আপনি বেশ সুন্দর কথা বলেন। বাড়ীতে রতনদিদি ছাড়া আর কেউ এত সুন্দর করে আমার সঙ্গে কথা বলে না। আচ্ছা আপনি যে আমায় এত বিস্কুট লজেন্স দিলেন সবই আমি একলা খাব? বাড়ীতে যদি থাকতাম তাহলে রতনদিদি আর কালুকে দিয়ে খেতাম। স্কুলে যাচ্ছি, সেখানে তো অনেক আমার মত ছেলেমেয়ে আছে, তাদের সকলকে দিতে গেলে এই কয়টা লজেন্স বিস্কুট সব শেষ হয়ে যাবে, আমার একটাও থাকবে না।'

নিখিলের শিশিভর্ত্তি বিস্কুট লজেন্সগুলোর দিকে একবার লুব্ধদৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে একটু থেমে বল্ল 'আমি কিন্তু লজেন্স খেতে খুব ভালবাসি।"

নিখিল সস্নেহে ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিল, প্রায় ফিস-ফিসিয়ে বল্ল "তোমায় আমার সব বিস্কুট লজেন্সগুলো দিয়ে দেব, তুমি স্কুলে সকলকে ভাগ করে দিয়ে দিও কেমন? এ দোকানের সব লজেন্স বিস্কুট তোমার। আচ্ছা বুলা, আমায় তোমার মনে পড়বে তো?"।

এতোগুলো বিস্কুট লজেন্স সব তার! বুলার ছোট্ট মন এতবড় অবিশ্বাস্য ব্যাপারটা কিছুতেই মেনে নিতে

পারছিল না। বাড়ীতে কিছু চাইবার উপায় নেই, কিন্তু এই অজানা অচেনা লোকটা কয়েক ঘণ্টায় এত আপনার হয়ে উঠল যে না চাইতেই সবগুলো তাকে দিয়ে দিল? আনন্দে বুলা অধীর হয়ে উঠল, সবেগে মাথা নেড়ে বল্ল, "আপনি আমায় এত জিনিষ দিলেন আর আমি কি আপনাকে ভুলতে পারি? কিন্তু আপনি যে স-বগুলো আমায় দিলেন, আপনার কি রইল?'

বিষণ্ণ মেঘের ফাঁকে ফিকে রোদের ঝিলিক নেমে এল নিখিলের ঈষৎ হাসিতে, বুলার প্রশ্নটা তার জীবন-জিজ্ঞাসার বাঙ্ময় রূপ—কি তার রইল? "আমার আর কি হবে এত খাবারে বল? তোমার মত অনেক ছোট ছেলেমেয়েরা খাবে, তুমি খাবে তাই তো তোমাকে সব দিলাম।"

বুলার চিবুকটা তুলে ধরল নিখিল, জয়ার দ্বিতীয় রূপ—এ মুখখানাতে রয়েছে বাল্যের পবিত্র মাধুরী আর জয়ার মুখে অঙ্কিত ছিল মৃত্যুর রক্ত কলঙ্কিত চিহ্ন। শিউরে উঠে নিখিল ওর মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে অন্যদিকে মুখ ফেরাল।

ওদিকে বুলা প্রাণ খুলে গল্প আরম্ভ করে দিয়েছে, "জানেন যদি বাড়ী থাকতাম তাহলে কালুকে অর্ধেক দিতাম আর নিজে অর্ধেক খেতাম, কালুকে আমি খুউব ভালোবাসি। আপনাকেও আমার খুব ভাল লেগেছে, বাড়ী গিয়েই কালুকে আপনার কথা বলব", আরও কত কি বকছিল নিখিলের সব কানে যাচ্ছিল না। সে বুলার প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি কথাবার্ত্তা একান্তভাবে উপভোগ করছিল তার দৃষ্টির সামনে বুলার উপস্থিতি ছিল না, ছিল আর একজনের।

রাত ক্রমে গাঢ় হয়ে এল, আজ রাতে নিখিলের চোখে ঘুম নেই, কিন্তু সামনে বসে কথা কইতে কইতে বুলা ঢুলে পড়ছে দেখে নিখিল ধীরে ধীরে ওকে তুলে নিয়ে ওয়েটিংরুমে শুইয়ে দিয়ে এল। এ জীবনটাইতো ওয়েটিংরুম, কত মানুষের আনাগোনার দেখা শোনার প্রাণবন্ত স্বাক্ষর এ ধরে রাখে, দুদিনের জানাশোনার পর আবার যে যার গন্তব্য পথে চলে যায়! তার জীবনের ওয়েটিংরুমেও বুলা কয়েক ঘণ্টার জন্য বিশ্রাম নিল—কাল সকালেই এর মেয়াদ ফুরোবে, কে কোথায় চলে যাবে আর হয়ত দেখা হবেনা, সেই-ই তো আবার দেখা হবার ভয়ে পালিয়ে যেতে চায় এ জায়গা ছেড়ে বহুদূরে! কিন্তু কোথায় পালাবে? নিজের কাছ থেকে কি তার নিষ্কৃতি আছে?

ভোর হয়ে এসেছে, বুলাদের ট্রেণ আসতে আর বিশেষ দেরী নেই। ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিখিলের দোকানে চা এর খদ্দেরের ভীড় জমে। আজও প্রাত্যহিক রীতি-মত বহু লোক তার নিষ্ক্রিয় নিস্তব্ধ দোকানটার সামনে দিয়ে ব্যর্থ আশায় ঘুরে গেল। দোকানটার চারপাশ ঘিরে রয়েছে এক সমাধির শান্তি। কেউ নেই, দোকানের ঝাঁপ সব বন্ধ। নিখিল বোধহয় ষ্টেশানের অনতিদূরে ওর বাসাতে গিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। অন্যদিনও সে সকাল হলে বাড়ী যায়, কিন্তু এমন নিঃসহায় করে দোকানটাকে ফেলে দিয়ে যায়না, দোকানে তার ছোট চাকরটাকে বসিয়ে দিয়ে যায়। তার অনুপস্থিতিতে চাকরটাই দোকান চালায়।

অমলেশ সরকার যাত্রার প্রস্তুতি সমাপ্ত করে মালপত্র ও মেয়ে সমেত ওয়েটিং রুম থেকে বেরিয়ে এলেন। ঐ যে দূরের সিগ্‌নাল ডাউন হয়েছে, ট্রেণ আসছে। মালপত্র প্ল্যাটফর্মে নামিয়ে রেখে নিখিলের দোকানের সামনে এগিয়ে গেলেন। বুলাও গতরাত্রের প্রতিশ্রুতিমত বিস্কুট লজেন্সের আশায় এগিয়ে এল, কিন্তু কেউই তো নেই, দোকানই বন্ধ! ওর ছোট মনটা হতাশায় ভরে উঠল। কিন্তু দাঁড়াবার আর সময় নেই, সমস্ত ষ্টেশানটা কাঁপিয়ে ট্রেণটা এগিয়ে আসছে। ট্রেণ ধরবার ব্যস্ততায় অমলেশ সরকার নিখিলের অনুপস্থিতির কথা একদম ভুলে গিয়ে ছুটলেন কুলির আশায়। ঠেলাঠেলি, চেঁচামেচি, ছুটোছুটির মাঝেই কোনরকমে মেয়ে ও মালপত্র নিয়ে তিনি একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় গিয়ে উঠলেন, চোখের সামনে রইল ষ্টেশানের জনসমুদ্র। ক্রমে ট্রেণ ছাড়বার সময় হয়ে এল, হঠাৎ নিখিলের ডাকে চমকে অমলেশবাবু মুখ ফেরালেন জানলার বাইরে।

"একি আপনি? সকাল বেলায় দোকান বন্ধ করে কোথায় গেছলেন মশাই? বেশ আপনার কাছে এককাপ চা খাওয়া যেত।"

নিখিল প্রায় ছুটতে ছুটতে এসেছে হাতে রয়েছে গত-রাত্রের অমলেশবাবুরই দেওয়া খাবারের দাম সেই পাঁ

টাকার নোটটা। 'এ টাকাটা ফিরিয়ে নিন, বুলা যা খেয়েছে তার দাম আমি নিতে পারব না, দোহাই আপনার ধরুন এটা। নিখিলের স্বরটা যেন আর্ত বিলাপধ্বনির মত শোনাল—"শীগগির ধরুন, ট্রেণ এখনি ছাড়বে। আর বুলা, আমারই দোকানের সমস্ত বিস্কুট লজেন্স এ-বাক্সটায় প্যাক করে দিয়েছি, এটা তোমায় দিলাম, সবগুলো তোমার।" বলে পিছন ফিরে ছোঁড়া চাকরটার হাত থেকে একটা বড় প্যাকিং বাক্স নিয়ে জানলা গলিয়ে সীটের ওপর রাখল।

"এসব কি করছেন? খাওয়ার দাম ফেরৎ দিচ্ছেন, সব বিস্কুট লজেন্স দোকান উজাড় করে দিচ্ছেন এসবের অর্থ কি?" অমলেশবাবুর দুচোখভরা বিস্ময়। কিন্তু যন্ত্রযানটা এসব মানবিক অনুভূতির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করেই নড়ে উঠে চলতে সুরু করল। নিখিল ম্লান হেসে ব্যগ্র-ভাবে জানলার ফাঁক দিয়ে বুলার হাতখানা নিজের হাতে চেপে ধরল, এ হাসি যেন কান্নারই শরিক, 'বুলা আমায় তোমার মনে পড়বে তো?' বুলারও মনটা ভালো ছিল না, নীরবে মাথা নাড়ল। ট্রেণটা গতি বাড়িয়ে দিয়ে বুলার হাতটা থেকে নিখিলের হাতটা সজোরে ছিনিয়ে নিয়ে এগিয়ে গেল। একখানা ছোট হাতের উত্তাপে ওর হাতটা গরম হয়ে রয়েছে। দূরে ট্রেণের পিছনের লাল আলো দুটো যেন ওর জীবনের এই পূর্ণ বিশেষ কয়েক ঘণ্টার বিরতির নির্দেশ দিতে দিতে মিলিয়ে যাচ্ছে।

চিঠি

গোপালহরি বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেক পাহাড় বন পার হ'য়ে শেষে
চিঠি আসে—
সাগরের নীলে-ভেজা আঁকা বাঁকা রেখাঘন চিঠি
আমার প্রিয়ার মনো-অনুরাগে ভ'রে!
দূর দেশ থেকে তার তৃষাতুর দু'টি নীল চোখে
রাতের প্রদীপ ধরে লিখেছিল সে যে
থরো-থরো হৃদয়ের ভাষা
সবুজের রঙে-রাঙা কচি ভীরু ভালোবাসা ভরা
সে চিঠিকে নীল খামে পাঠিয়েছে সে যে
আমার প্রবাসী নামে!
কতো গ্রাম নদী মাঠ পার হ'য়ে হ'য়ে
সে চিঠি আজকে এলো—তার ভাষা
এখনো পড়িনি—এখনো খুলিনি তার
স্বপ্নশান্ত সেই নীলিমার, অনুভবে শুধু বুঝি
ভাষা তার ছেয়ে গেছে ওই
কৃষ্ণচূড়ার ফুলে ফুলে
কথা তার ব্যাপ্ত হ'য়ে গেছে যেন
নীলাকাশে তারায়-তারায়।
এই অনুভব কেন চিঠির প্রেয়সী-মনে
গানের সুরের মতো ঝরে
এই মধুময় বোধে কেন আজ পৃথিবী তন্ময়!
প্রিয়ার মাধবী-নামে চিঠি আসে—নীলখামে
সবুজ রেখার টানে কয়েকটি
কথা-ফোটা চিঠি,
সে চিঠির অনুভব ব্যাপ্ত হয় বিশ্ব-চরাচরে
আমার প্রিয়ার মন সুর হ'য়ে, মধু হ'য়ে ঝরে!

রামপ্রসাদের গান

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

গানের মাধ্যমে রামপ্রসাদ আত্মনিবেদন ক'রে গেছেন—বহুভাবে, বহুরূপে শ্যামা মায়ের চরণে। এই আত্মনিবেদনের সহজ সরল ভাবটি—চাষী, শ্রমিক, মজদুর—ধনী, দরিদ্র সকলের কণ্ঠেই যেন চিরমুক্তির মহামন্ত্র। দুঃখ-দারিদ্র্য, ঘাত-প্রতিঘাত নিয়েই জীবন। জীবন মৃত্যুর রহস্য অন্তহীন। এই অন্তহীনকে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করবার নামই সাধনা। সে সাধনার বেদীতে বসে মাতৃসাধক রামপ্রসাদ মায়ের সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছিলেন তার মায়ের গানে—বিশ্বমাতার বন্দনা সঙ্গীতে।

সাধক মাত্রেই নির্লোভ। লোভ তাদের একটাই আর সেইটা ঈশ্বর লাভ। তাই পার্থিব জগতের পরমার্থের জন্য রামপ্রসাদ কোনদিনই লালায়িত ছিলেন না। ঘর সংসার পুত্রপরিবার থাকা সত্ত্বেও—দিনরাত শত দারিদ্র্য তুচ্ছ করে শ্যামামায়ের চরণামৃত পানে বিভোর থাকতেন তাঁর সঙ্গীত-লহরী সর্বসাধারণের কাছে অতি সহজ সাধারণভাবে পরিবেশন করে।

'মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া
ভাবো শক্তি, পাবে মুক্তি
বাঁধো দিয়ে ভক্তিদড়া।'

এই গান একদিন বাংলার ঘরে ঘরে—পথে প্রান্তরে—সব জাতের সকল মানুষের কণ্ঠে আত্মমুক্তির মহাসঙ্গীত রূপে সুরায়িত হয়ে উঠেছিল। অমন অনেক কথিকা আছে যা মা মহামায়ার পরম কৃপারূপে প্রসাদকে ধন্য করেছিল—সার্থক হয়েছিল সাধকের একনিষ্ঠ সাধনা। যার অর্ঘ আজো পারিজাত হয়ে ফুটে আছে। থাকবেও চিরকাল। প্রসাদের গানে মুগ্ধ হয়ে কাশীর অন্নপূর্ণা গান শুনতে এসেছিলেন তাঁর পর্ণ কুটীরে।

"চাই না মাগো রাজা হতে
রাজা হবার সাধ নাই মাগো
দুবেলা যেন পাই মা খেতে!!"

মাকে আত্মনিবেদন করে প্রসাদ গেয়েছিলেন—

"আমার মাটির ঘরে বাঁশের খুটি মা
পাই যেন তার খড় জোগাতে
আমার মাটির ঘরই সোনার ঘর মা
কি হবে মা দালানেতে॥
(যদি) দালান কোঠায় রাখ মাগো
পারব না আর মা বলিতে॥

বাগদীর মেয়ে সেজে মা জগদ্ধাত্রী প্রসাদের নিরন্ন সংসারে অন্ন জুগিয়েছেন। মেয়ের বেশ ধরে প্রসাদের বেড়া বেঁধে গেছেন আদ্যাশক্তি মা নিজে। ভক্তের সঙ্গে ভক্তির এই যে বিচিত্র মিলন, এই যে মধুর সম্পর্কের বন্ধন—যা উপলব্ধির আনন্দে ফুটে রয়েছে রাঙা জবার মত—প্রসাদের অর্ঘ হয়ে—

"নয়ন থাকতে না দেখলি মন
এমন তোমার কপাল পোড়া
মা ভক্তেরে ছলিতে তনয়া রূপেতে
বেঁধে গেলেন ঘরের বেড়া॥"

একবার কৃষ্ণনগর পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন প্রসাদ কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে। যাবার সময় নদীপথে যেতে প্রসাদ গেয়ে চলেছিলেন তাঁর মনমাতানো মাতৃ সঙ্গীত। ঐ পথেই তখনকার বাঙলা বিহার উড়িষ্যার নবাব সিরাজদ্দৌলা নদীপথে ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন দলবল নিয়ে। সহসা নবাবের বজরা এসে ভীড়ল কৃষ্ণচন্দ্রের বজরারই পাশে। বিস্ময় বিহ্বল দৃষ্টি সকলের। নবাব জিজ্ঞেস করলেন, কে গাইছিল মহারাজা?

—রামপ্রসাদ। প্রসাদকে দেখিয়ে সভয়ে উত্তর দিলেন রাজা।

আমায় গান শোনাও ঠাকুর।

নবাবের অনুরোধে গজল, ঠুংরি—কয়েকখানি গান প্রথমে পরিবেশন করলেন রামপ্রসাদ।

বিরক্তির কণ্ঠে গান থামাতে বল্লেন নবাব। সকলে

বিস্ময়ে হতবাক্। ভয়ে ভয়ে কৃষ্ণচন্দ্র জিজ্ঞেস্ করলেন, নবাবের কি গান ভালো লাগেনি?

—না। ও গান আমি শুনতে চাইনি। অমন গান আমি রোজ দু'বেলা শুনি। তবে যে গান তুমি একটু আগে গাইছিলে ঠাকুর সেই গান শোনাও।

— মায়ের গান!

— হ্যাঁ হ্যাঁ ঠাকুর, মায়ের গান। আমি মুসলমান হ'তে পারি—কিন্তু আমিও ত মায়ের সন্তান। বীরদর্পে বলেছিলেন সেদিন একথা বাংলার শেষ নবাব। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম শহীদ। প্রাণের আবেগে অনুরুদ্ধ হয়ে প্রসাদ গেয়ে চললেন শ্যামা মায়ের গান। নবাবের চোখ ভরে উঠল জলে।

> "ভাই বন্ধু দারা সুত
> কেবলমাত্র মায়ায় ভরা।
> মলে সঙ্গে দিবে মেটে কলসী
> কড়ি দিবে অষ্ট কড়া॥"

সাধক আর ভাবুক মাত্রেই কম বেশী খামখেয়ালী হয়ে থাকে। আর সে পরিচয় প্রতিসাধকের জীবনচরিত অনুধাবন করলেই জানা যায়। কমলাকান্ত, বামাক্ষেপা, ত্রৈলঙ্গস্বামী, রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ—এঁরা সবাই মায়ের কাছে ছোট শিশুর মত আবদার করেছেন। আর মাও সেই আবদার রক্ষা করবার জন্যে চিরদিন ভক্তের বাসনা পূর্ণ করে নিজের মহিমা বজায় রেখেছেন। ভক্ত না থাকলে ভগবানের মহিমা প্রচার হয় না। তাই গাব-গাছে পদ্ম ফুটিয়ে মাতৃচরণে ভক্তি অর্ঘ্য দিতে পেরেছিলেন রামপ্রসাদ।

> "আমায় ছঁসনেরে শমন আমার জাত গিয়েছে।"
> যেদিন কৃপাময়ী আমায় কৃপা করেছে॥

মৃত্যুর শেষদিন পর্য্যন্ত প্রসাদ তাঁর গানের মাধ্যমে মাতৃ-পূজা করে গেছেন। সংসারী মানুষ হয়েও সংসারের নাগ-পাশ তাঁকে কোনদিনই সাধনাচ্যুত করতে পারেনি। স্ত্রী-পুত্র-ভাই-বন্ধু সবাইকে নিয়েই প্রসাদ নির্লিপ্ত ছিলেন শ্যামামায়ের চরণধ্যানে।

অথচ এই মাতৃসাধকের জীবনচরিত বাংলা সাহিত্যে আজ অবলুপ্তির পথ বেছে নিতে বসেছে। রামপ্রসাদের গানগুলির গভীরত্ব ও মূলভাবের মৌলিকতারদিকে সুধী-জনের দৃষ্টি যেন ক্ষীণ প্রসারিত। কেননা যাঁরা আজ প্রসাদী সঙ্গীত গান বা পরিবেশন করে থাকেন তাঁদের অনেকেই মনে হয় রামপ্রসাদের সব গানগুলির খোঁজ রাখেন না। অবশ্য এদিক দিয়ে ভাবতে গেলে রামপ্রসাদ সম্বন্ধে যে বইখানি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ্য সে বইখানি বহুদিন অপ্রকাশিত শাস্তি মাথায় করে।

স্বর্গত দয়ালচন্দ্র ঘোষ মহাশয় প্রসাদ সম্বন্ধে বহু গবেষণা করে আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে ঢাকার (বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তান) কোন এক মুদ্রণালয় থেকে 'প্রসাদ প্রসঙ্গ' প্রকাশ করেন। কিন্তু অদ্যাবধি তার আর কোন পুনর্মুদ্রণ সম্ভব হয়নি। অথচ আমাদের একটি জাতীয় সম্পদ আজ আমরা হারাতে বসেছি। এ সম্পদের পুনরুদ্ধার আজ আমাদের সর্বসাধারণের কর্তব্য।

> মায়ে যত ভালবাসে, বুঝা যাবে মৃত্যু শেষে।
> মোলে দণ্ড দুচার কান্নাকাটি, শেষে দিবে গোবর ছড়া॥
> অঙ্গেতে যত আভরণ, সকলই করিবে হরণ।
> দোসর বস্ত্র গায়ে দিবে, চার কোনা মাঝখানে ফাঁড়া॥
> যেই ধ্যানে একমনে, সেই পাবে কালিকা তারা।
> বের হয়ে দেখ কন্যারূপে, রামপ্রসাদের বাঁধছে বেড়া॥

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

৩

কড়া নাড়তে হল না। সদর দরজা খোলাই ছিল। দরজার সামনে সিপ্রা আর তপনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল শুভ্রা।

সিপ্রা বলল, 'কোথায় গিয়েছিলি দিদি?'

শুভ্রা একটু হেসে বলল, 'বেড়াতে।'

সিপ্রা বলল, 'তুই হাসছিস। এদিকে মা তো অস্থির। বারবার কেবল ঘরবার করছেন। মেয়ে কোথায় গেল, মেয়ে কোথায় গেল।'

শুভ্রা ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'কেন এত ব্যস্ত হবার কী আছে? রাত তো সবে আটটা। আমি তো টিউশনি সেরেও কোন কোন দিন এর চেয়ে বেশি রাত্রে ফিরি।'

বলতে বলতে ভিতরে ঢুকল শুভ্রা।

ভাড়াটে বাড়ির একতলায়, দুখানি ঘর। সেই সঙ্গে রান্না ঘর, বাথরুম। একফালি বারান্দা আর নীচে একটু উঠোনও আছে। একতলায় আর কোন সরীক নেই এই এক সুবিধা। বাড়িওয়ালা থাকেন দোতলায়। শুধু স্বামী স্ত্রী দুজনে। সন্তানাদি নেই। কিন্তু ঝগড়াঝাটি লেগেই আছে।

মা নাকি এতক্ষণ ধরে শুভ্রার জন্য উদ্বেগ জানাচ্ছিলেন। কিন্তু তার সাড়া পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার রান্নাঘরে ঢুকেছেন। রান্না ছাড়া আর কোন কিছুতে যেন তাঁর মন নেই।

ঘরে গিয়ে সাড়ি বদলাতে বদলাতে শুভ্রা নিজের মনেই হাসল। বুঝতে পারল—মার রাগ হয়েছে। রাগ হলে তিনি এমনি করে কাজের মধ্যে অন্যমনস্ক হতে চেষ্টা করেন। ছেলেমেয়ে কারো সঙ্গে কোন কথা বলেন না। বিশেষ করে শুভ্রার ওপরই তাঁর রাগটা যেন বেশি দেখা যায়। যত মান-অভিমানের পালা যেন বড়মেয়ের সঙ্গে। শুভ্রা নিজের মনেই একটু হাসল। তারপর সোজা চলে গেল রান্নাঘরে। মার পাশে গিয়ে বসল তাঁর গা ঘেঁষে।

নলিনী একটা আলুর তরকারি রান্না করছিলেন। কড়া থেকে চোখ না সরিয়ে বললেন. 'থাক, আমার আর অত সোহাগে দরকার নেই। যে মেয়ে আমার কথা শোনে না, অবাধ্যতার চূড়ান্ত করে ছাড়ে—'

শুভ্রা গম্ভীরভাবে বলল, 'সত্যি, তেমন মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা মোটেই উচিত নয়। দাও তাকে তাড়িয়ে।'

আরও সরে এসে শুভ্রা মাকে জড়িয়ে ধরল।

নলিনী আর রাগ করে থাকতে পারলেন না। মেয়ের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'ছাড় ছাড়। দুজনেই কড়ার মধ্যে পড়ে পুড়ে মরব।'

শুভ্রা হেসে বলল, 'না মা। অত ভয় কোরো না তোমার কড়া তত বড় কটাই নয়। কী রাঁধছ মা এই রাত্রে? তোমার রান্নাবান্না কি এখনো শেষই হল না। তুমি উঠে এসো। বাকিটুকু আমি রেঁধে দিচ্ছি।'

নলিনী বললেন, 'থাক, তোমাকে আর রাঁধতে হবে না। তুমি যাও ওদের ডেকেটেকে নিয়ে এসো। সারাদিনের মধ্যে বোধহয় কিছুই আর পেটে পড়েনি।'

শুভ্রা বলল, 'কী যে বল মা। দুপুরেই তো খেয়ে বেরিয়েছি। তারপর বিকেলে সেক্রেটারীর ওখানে আর এক দফায় ভূরিভোজ হয়ে গেল। রাত্রে বোধ হয় কিছু আর খেতেই পারব না।'

নলিনী বললেন, 'সে কি। কোথায় আবার খেয়ে এলি এত? সেক্রেটারীই বা কে?'

মার কাছে ব্যাপারটা আর গোপন রাখা যায় না। তাছাড়া গোপন রাখবার ইচ্ছাও শুভ্রার ছিল না।

সে মোটামুটি মায়ের কাছে সবই বলল। শুধু রামবাবুর আদর আপ্যায়নের পরিমাণটা বলবার সময় একটু কমিয়ে দিল পাছে মা কিছু মনে করেন। আর পথের দূরত্বটাও অনেকখানি হ্রাস করে আনল, পাছে মার ভয় আর আশঙ্কা আরো বেড়ে যায়।

নলিনী বললেন, 'তাহলে সব মিলিয়ে কতটা হবে রাস্তা?'

শুভ্রা বলল, 'মাইল দশেকের বেশি হবেনা মা। ইলেকট্রিক ট্রেনে কতক্ষণই বা আর লাগবে?'

নলিনী বললেন, 'তুই একা যাবি অতটা পথ?'

শুভ্রা বলল, 'একা যাব কেন মা? আরো একটি মেয়ে আছে। সে ওখানকার স্কুলে গান শেখায়। সেও যাবে। তা ছাড়া গাড়ি ভরতি লোকজন থাকবে। কোন ভয় নেই মা।'

নলিনী তরকারির কড়াটা নামিয়ে নিলেন। তারপর আর একটা বড় বাটিতে তরকারিটা ঢেলে রাখতে রাখতে বললেন, 'ভয় না থাকলেই ভালো। তবু যা করবার বুঝে শুঝে কোরো। মাথার ওপরে যিনি ছিলেন তিনি তো চলে গেছেন। এখন সব দায়িত্ব তোমাকেই নিতে হবে। মেয়ে হয়েও ছেলের কাজ করতে হবে তোমাকে।'

শুভ্রা বলল, 'মা তুমি কোন ভয় কোরোনা। আমার ওপর বিশ্বাস রেখো। আমি তো এখন আর ছোট নই। কাজকর্মের জন্যে বাইরেই বেরোই আর যাই করি নিজের মান-সম্মান রেখে চলবার মত আমার বুদ্ধি হয়েছে মা।'

নলিনী বললেন, 'তা আমি জানি। তুই যে আমার কত লক্ষ্মী মেয়ে তা কি আমার বুঝতে বাকি আছে? তবু কেউ যদি কিছু বলে তাই সাবধান থাকতে হয়। বটগাছের ছায়া তো সরে গেছে।'

মা কথায় কথায় বাবার কথা তোলেন। বাবা যে নেই একটি মুহূর্তও তিনি যেন তা ভুলে থাকতে পারেন না। ভুলে থাকতে পারেন না।

কিন্তু তিনি যে নেই এ কথা মেনে নিয়েই তো এগিয়ে যেতে হবে। নিজেকে তো শুধু অতীতের সঙ্গে বেঁধে রাখলে চলবে না। মা অবশ্য তাই দিলেন। বাবা মারা যাওয়ার পর মা প্রায় ছ'মাস নিজের ঘরের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে ছিলেন। কারো সামনে বেরোতেন না। নিজের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গেও বড় একটা কথা বলতেন না; একা একা ঘরের মধ্যে কাটাতেন। শুভ্রা ভাবে বাবার সঙ্গে তার তো মতবিরোধের শেষ ছিল না—মাঝে মাঝে ঝগড়াঝাটিও বেশ হত। কিন্তু ভিতরে ভিতরে স্বামীর ওপর টান যে তাঁর কত গভীর তা বাবা মারা যাওয়ার পর শুভ্রা বুঝতে পেরেছে। শুকিয়ে মা যেন আধখানা হয়ে গেছেন। আশঙ্কা হয়েছিল মাকে বোধ হয় আর বিছানা থেকে তুলতে পারবোনা। তিনিও বাবার মতই অসময়ে হঠাৎ একদিন চলে যাবেন। শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় দুর্ঘটনাটি অবশ্য ঘটেনি। মা নিজেকে সামলে নিয়ে ফের উঠে বসেছেন। এখনো অবশ্য বাইরে একটা বেরোন না। যা করবার ঘরে বসেই করেন। বাইরে বেরোয় ওরা তিন ভাইবোন। তারাই যা কিছু কিনবার কাটবার কিনে নিয়ে আসে। যেখানে যা কিছু খবর দেবার, খবর নেবার তারাই এনে দেয়। মাকে শুভ্রারা বাইরে যেতে দেয়না।

ওঁর নিজেরও এক ধরণের সঙ্কোচ আছে। তাঁর এই বেশ নিয়ে কারো কাছে যাওয়া যায়না, কারো সামনে দাঁড়ানো যায়না এমনি একটা অদ্ভুত ধারণা হয়ে গেছে মার। বিধবা হওয়াটা যেন পরম লজ্জাকর পরম অশুভ কর একটা ব্যাপার। এ ধারণা যে কত ভুল শুভ্রা কিছুতেই তা মাকে বুঝিয়ে উঠতে পারছেনা। মৃত্যু এক অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার। অকাল মৃত্যু নিশ্চয়ই দুঃখকর। তবু এ একটা দুর্ঘটনা ছাড়া কিছু নয়। এর সঙ্গে লজ্জা বোধ শুভ লক্ষণ অশুভ লক্ষণকে জড়িয়ে ফেলা কেন! কিন্তু যুক্তি দিয়ে মা যা বোঝেন অন্তর দিয়ে তা যেন গ্রহণ করতে পারেননা। হয়তো ধীরে ধীরে পারবেন। মাকে অবশ্য একেবারে শাদা থান পরতে দেয়নি শুভ্রা। আজকালকার বিধবারা অবশ্য তা কেউ পরেনওনা। শুভ্রার মাও কালো ফিতে পেড়ে শাড়ি পরেন। গলায় সরু হার আর হাতে এক গাছি করে চুড়িও রেখে দিয়েছেন। ছেলে মেয়েদের এই অনুরোধ রেখেছেন বলে শুভ্রা কৃতজ্ঞ। নইলে সত্যিই ওকে বড়ো বিশ্রী দেখাত। হঠাৎ দেখলে অন্য কারো অস্বস্তি লাগত, অশুভঙ্করী বলে মনে হত।

ভাই বোনদের সঙ্গে পাশাপাশি খেতে বসল শুভ্রা। বলেছিল 'মা আমি বরং একটু দেরি করে খাই। আমি না হয় তোমার সঙ্গে খাব মা।

কিন্তু নলিনী সে কথা শোনেননি। বরং উল্টে মেয়েকে ধমক দিয়েছেন 'আমার সঙ্গে আবার কী খাবি তুই। আমি তো খাব দুধ খই, না বাপু তোমরা এক সঙ্গেই বসে যাও। সকাল সকাল খেয়ে নাও সব।'

শুভ্রার মনে পড়ল কত ছেলে বেলা থেকে মায়ের এই রাগ শুনে আসছে 'সকাল সকাল খেয়ে নাও সব।'

কি দিনে কি রাত্রে মা তাদের দেরি করে খাওয়াটা পছন্দ করেননা। বরং তাড়াতাড়ি রান্না খাওয়ার পাট মিটিয়ে দিয়ে তিনি ঘরের অন্য কাজ করতে ভালোবাসেন। কিছু একটা সেলাই কি বোনা নিয়ে বসেন। সময় পেলে কোন একটা বই-টই নিয়ে বসতেও তাঁকে দেখা যায়। বয়স তো আর বেশি হয়নি মার। কত আর হবে। বড় জোর চল্লিশ বিয়াল্লিশ। কিন্তু এরই মধ্যে গল্প উপন্যাসে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছেন মা। তিনি ভ্রমণ কাহিনী পড়তে ভালোবাসেন যাতে দেশ বিদেশের কথা থাকে কি মহাপুরুষদের জীবন কাহিনী—যা পড়লে নিজের জীবনকেও উন্নত করতে ইচ্ছা হয়। মা বলেন, 'তোদের মত আমার বানানো গল্প ভালো লাগেনা।'

বাবা মারা যাওয়ার জন্যে নয়, তিনি থাকতেই মার এই রুচির বৈশিষ্ট্য আর বিভিন্নতা ছিল। শুভ্রা আর শিপ্রার কিন্তু বানানো গল্পকেই সত্য গল্প বলে মনে হয়। সত্য গল্পের মধ্যে তারা তেমন রস পায়না।

খেতে খেতে তিন ভাই বোনের মধ্যে কথা হতে লাগল।

শুভ্রার ছোট ভাই তপু ক্লাস নাইনে পড়ে। তার ধারণা যে হেতু সে বেটা ছেলে, বাবার অবর্তমানে গার্জিয়ান গিরিটা তারই প্রাপ্য। অথচ দিদি পট করে গদিটা নিজেই দখল করে বসেছে। কী অন্যায়। করলই বা এম, এ, পাশ। তাই বলে পুরুষের মত বুদ্ধিশুদ্ধি হয় নাকি মেয়েদের?

খেতে খেতে তপু বলল—দিদি অত পাড়াগাঁয়ে মাষ্টারি যে নেবে সত্যিই একা একা যেতে পারবে তো? না কি কারো একজনের সঙ্গে যেতে হবে?'

শুভ্রা হেসে বলল, 'আমি যদি বলি আমাদের তপু বাবুকেই সঙ্গে নেব তাহলে—তপুর খুব আনন্দ হয়! নিজের স্কুলে আর যেতে হয়না।'

তপু বলল, ঈস, বয়ে গেছে আমার ওই পচা পাড়া গেঁয়ে স্কুলে যেতে। তা ও আবার মেয়েদের স্কুল।'

শিপ্রা বি, এ, পড়ে। ছোট ভাইকে শাসন করবার অধিকার সে নিজের হাতেই রেখেছে। আর সবারই কাছে বড্ড বেশি আদর পায় তপু। শিপ্রা যদি ওকে একটু আধটু শাসন না করে ও নির্ঘাৎ বয়ে যাবে।

শিপ্রা তাই একটু ধমকের সুরে বলল, 'কি মেয়েদের স্কুল মেয়েদের স্কুল করছিস। মেয়েদের স্কুল বলে ছেলের আর গায়েই লাগেনা। দেখতে তো তালপাতার সিপাই। কিন্তু পৌরুষের বহর দেখ।'

তপু বলল, 'দাঁড়া, খেয়ে উঠি। তারপর কে তাল-পাতার সেপাই, আর কে তাসের বিবি এক্ষুণি টের পেয়ে যাবি।'

শিপ্রা মার দিকে তাকিয়ে নালিশের ভঙ্গিতে বলল,

'শোন মা, তোমার আদরের ছেলের কথা গুলি একবার শোন।'

নলিনী হেসে বললেন 'এই বুঝি খুনসুটি আরম্ভ হল তোদের? দিনরাত লেগেই আছে ঝগড়া। আর পারিনে বাবা।'

সদর দরজার কড়া নড়ে উঠল। এত রাত্রে আবার কে এল—শুভ্রাই গেল দেখতে। সবাইর আগে তারই পাওয়া শেষ হয়েছে। বেশি কিছু তো খেতে পারেনি, খায়ওনি। ভাই বোনদের সঙ্গে বসে বসে গল্প করছিল।

হাত ধুয়ে শুভ্রা এসে দোর খুলে দিল। একটি চারুদর্শন যুবক তার সামনে দাঁড়িয়ে। তার চোখে প্রসন্ন মুগ্ধ দৃষ্টি।

তাকে দেখে খুসি হলেও শুভ্রা একটু বিব্রত বোধ করল। মৃদুস্বরে বলল, শ্যামলদা, তুমি যে এত রাত্রে।'

শ্যামল বলল, নটা আবার একটা রাত নাকি? ডিউটি দিয়ে ফিরছিলাম। ভাবলাম তোমার খবর নিয়ে যাই। শুনে যাই আজকের অ্যাডভেঞ্চারটা।'

শুভ্রা একটু অনুযোগের সুরে বলল, 'অ্যাডভেঞ্চার আবার কিসের। কাল বুঝি শুনলে চলত না।

শ্যামল বলল, 'তা ও চলত। আচ্ছা যাই তাহলে।

'যাবে কেন। এসেছ যখন মার সঙ্গে একবার দেখা করে যাও। নইলে আমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে।'

'মানে কৈফিয়ৎটা তুমি আমাকে দিয়েই দেওয়াতে চাও।'

হেসে শুভ্রার পাশ দিয়ে ভিতরে ঢুকল শ্যামল।

শুভ্রা বলল, 'তুমি যাও। আমি দোরটা দিয়ে আসি।'

আসলে শুভ্রা এক সঙ্গে যাওয়াটা এড়িয়ে যেতে চায়।

[ক্রমশঃ

যে-গান শোনায়েছিলে

শ্রীশশাঙ্কশেখর হাইত

যে-গান শোনায়েছিলে নির্জন রাত্রির নিভৃতে
দেহের নিবিড় ঘনিষ্ঠতার অন্তহীন নিস্তব্ধ প্রান্তরে—
সুর তার বাজে আজো জ্যোৎস্নার নীরব সেতারে,
সেই গান শুনি আমি আজিও একান্ত মুগ্ধ চিতে।
সেই সুরে বিহ্বল রাত্রির নিস্তব্ধ নীলাকাশ
একান্ত অলক্ষ্যে আজো মনের দিগন্তে নেমে আসে
জ্যোৎস্নার সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে;
রজনীগন্ধার গন্ধে ভাসে
আজো সেই মদিরতা: তোমার গানের সুরে যার মুগ্ধ
নিবিড় প্রকাশ।

যে-গান শোনায়েছিলে মোরে—
স্বপ্ন হয়ে আসে সে যে রাতের ঘুমের মতন
নৈঃশব্দের ডানা মেলে নিনিমেষ আঁখি'-পরে নেমে;
সে-গানের জানালায় আজো ছবির মতন আছে থেমে
সে-দিনের চাঁদ আর তারা আর রাত্রি আর দূরের
অস্পষ্ট ঘন বন।

দক্ষিণ অ্যাং

শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

১৫

তিরুশিরাপ্‌পল্‌লী হতে তঞ্‌চাবূর্‌ মেল গাড়ীতে পৌনে দু-ঘণ্টার পথ। যখন তঞ্‌চাবূর্‌ পৌছলাম তখন রাত সাড়ে আটটা বেজে গেছে।

লজিঙ্‌ হাউস্‌-এ গিয়ে নিজের রুম্‌-এ ঢুকেই বিছানাটা পেতে ফেললাম। তারপর শ্রান্ত দেহটাকে এলিয়ে দিলাম। উদ্দেশ্য,—একটু বিশ্রাম।

সিত্তন্নবাসল্‌ যাওয়া আসায়, সারাদিনের ছুটাছুটিতে এতই ক্লান্তি জমে উঠেছিল যে, ঐ একটু বিশ্রাম নেওয়ার জন্য শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ঘুম ভাঙতেই জানলা দিয়ে দেখি আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। সূর্যের আগমনের বার্তা এসে গেছে।

ইংরেজ আমলে যা তাঞ্জোর নামে পরিচিত হয়েছিলো তমিল্‌ ভাষায় তারই সঠিক নাম—তঞ্‌চাবূর্‌। অন্যান্য অনেক জনপদের মত তঞ্‌চাবূর্‌ নামটিও পৌরাণিক কাহিনী প্রসূত। তঞ্‌চন নামে এক রাক্ষসের অত্যাচারে অতিষ্ঠ জনগণ এখানে আশ্রয় নিয়ে রক্ষা পেয়েছিলেন। তাই থেকে তঞ্‌চাবূর্‌ নামের উৎপত্তি। চোল্‌র রাজগণের রাজধানী হিসাবে তঞ্‌চাবূর্‌ ইতিহাস প্রসিদ্ধ।

পৌরাণিক যুগের রাজা কারৈক্‌কাল্‌ চোল্‌র বংশের প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু রাজা বিজয়ালয়-এর পূর্ববর্তী চোল্‌র রাজগণের ইতিহাস অজ্ঞাত।

পৌরাণিক যুগের চোল্‌র রাজগণকে বাদ দিয়েও সুদীর্ঘ চারশ বছর রাজত্ব করেন চোল্‌র বংশ।

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে রাজা বিজয়ালয়-এর রাজত্বকালেই তঞ্‌চাবূর্‌ প্রসিদ্ধি অর্জন করে।

বিজয়ালয়ের পর সিংহাসনারোহণ করেন তাঁর পুত্র আদিত্য (৮৭১—৯০৭ খৃঃ অঃ)।

পরবর্তী রাজগণ যথাক্রমে : পরান্তক (১ম), রাজাদিত্য, কণ্ডরাদিত্য, অরিঞ্জয়, পরান্তক (২য়), আদিত্য (২য়), সুন্দর বা উত্তম চোল্‌র, রাজরাজ (১ম), রাজেন্দ্র চোল্‌র (১ম), রাজাধিরাজ, রাজেন্দ্র দেব, রাজমহেন্দ্র, বীর রাজেন্দ্র ও অধিরাজেন্দ্র, রাজেন্দ্র চোল্‌র (২য়) বা কুলোত্তুঙ্গ, বিক্রম চোল্‌র, কুলোত্তুঙ্গ (২য়), রাজরাজ (২য়), রাজাধিরাজ (২য়), কুলোত্তুঙ্গ (৩য়), রাজরাজ (৩য়), রাজেন্দ্র চোল্‌র (৩য়)।

উত্তরে গঙ্গা হতে দক্ষিণে সিংহল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল চোল্‌র রাজ্য। ব্রহ্মদেশ, মালয় ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার কতকগুলি দ্বীপ পর্যন্ত চোল্‌রদের আধিপত্য প্রসারিত হয়েছিল।

পরমশৈব রাজরাজ (১ম), শিবপদশেখর উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। রাজরাজের যোগ্য উত্তরাধিকারী

তাঁর পুত্র রাজেন্দ্র। তিনি সিংহল পর্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তার করেছিলেন।

পুণ্যসলিলা গঙ্গাকে নিজ রাজ্যের অন্তর্গতা করার জন্য তিনি উত্তর-ভারত অভিযান করেন।

দু বছরের মধ্যেই তাঁর কলিঙ্গ ও দক্ষিণকোশল-বিজয় সম্পূর্ণ হয়। তারপর পশ্চিমবঙ্গের রাজা মহীপাল (১ম), দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের রণশূর এবং পূর্ববঙ্গের গোবিন্দচন্দ্রকে পরাভূত করে গঙ্গাকে স্বীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্তা করেন রাজেন্দ্র চোল্‌র।

ওই বিজয় গৌরবকে স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর নতুন রাজধানীর নামকরণ করেন 'গঙ্গৈকোন্ড—চোল্‌রপুরম্' অর্থাৎ গঙ্গাবিজয়ী চোলর-এর নগরী।

সুমাত্রা যবদ্বীপের অধিপতি শ্রীবিজয়ও রাজেন্দ্রের হাতে পরাজিত হয়েছিলেন। রাজেন্দ্রের এক শিলালেখ হতে জানা যায় যে, তিনি ব্রহ্মদেশ, মালয় উপদ্বীপ, লাক্ষাদ্বীপ ও মালদ্বীপে স্বীয় প্রভুত্ব প্রসারিত করেছিলেন। রাজেন্দ্রের সময় ভারতীয় নৌ-বাহিনী শৌর্য ও খ্যাতির চরমে পৌঁছেছিল।

মাদ্রাজ থেকে রেলপথে তঞ্চাবূর্‌র্-এর দূরত্ব ২১৮
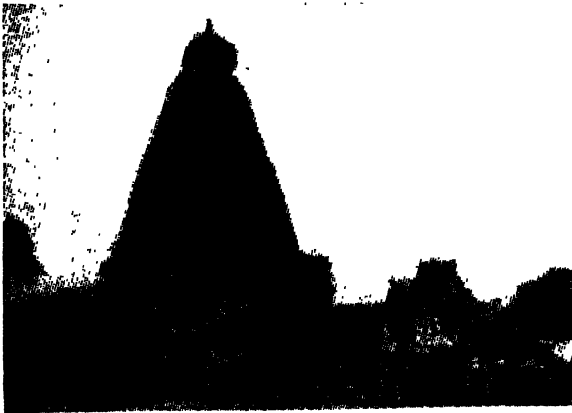
বৃহদেশ্বর মন্দির—তঞ্চাবূর্‌র

মাইল। এখানের মুখ্য দর্শনীয় বৃহদীশ্বর শিবের মন্দির। প্রতিষ্ঠাতা রাজরাজ (১ম)।

দেবালয়টি সম্পূর্ণ গ্রানাইট পাথরের তৈরী। এ অঞ্চলে এ-জাতীয় পাথর বা পাহাড়ের অস্তিত্ব না থাকায় মনে হয়, পাথরগুলি বহুদূর হতে আনা হয়েছিল।

মন্দিরটির উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব এর গর্ভগৃহের বিমান। বিমানটির উচ্চতা ২১৬ ফিট। (অর্থাৎ, কলকাতার অক্টোরলনি মনুমেণ্ট-এর চেয়ে ৫১ ফিট বেশী।) গোলাকার শিখরটির ওজন প্রায় ৮০ টন।

চার মাইল দূরের শারপপালম্ গ্রাম হতে মন্দির শীর্ষ পর্যন্ত এক পাহাড়ে চড়াই-এর মত পথ তৈরী করে গুরুভার ওই শিখরটি মন্দিরশীর্ষে ওঠানো হয়েছিল।

মন্দিরের বহির্গাত্রে নানা দেবদেবীর মূর্তি উৎকীর্ণ। গর্ভগৃহকে যে অলিন্দটি বেষ্টন করে আছে তার দেওয়ালে মনোরম কতকগুলি চিত্রপট। ঐ চিত্রগুলির মধ্যে, তথা সমস্ত মন্দিরটির ভিতর, শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে ত্রিপুরান্তকের বিশাল ছবিটি। কার্তিক গণেশ ও কালী সমভিব্যাহারে অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধরত ত্রিপুরান্তক।

অলিন্দে বহু সংখ্যক ঘোড়ার খুরের আকৃতিযুক্ত 'কুড়ু' বা ঘুলঘুলি চোল্‌র রাজগণের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

মন্দির গাত্রের একটি বুদ্ধমূর্তি বিস্ময় ও কৌতুহলের উদ্রেক করে।

দক্ষিণভারতের অনেক মন্দিরেই এরূপ বুদ্ধমূর্তি দেখা যায়। বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ।

দ্বাপর যুগ বর্ণনে আছে,—'তত্রাবতারৌ বলরামবুদ্ধৌ'। অর্থাৎ দ্বাপর যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন বুদ্ধদেব। উক্ত বুদ্ধই আদি বুদ্ধ,—বিষ্ণুর নবম অবতার। কপিলবাস্তুর গৌতম বুদ্ধ পরবর্তীকালীন।

হিন্দুমন্দিরে বুদ্ধের প্রতিকৃতি হিসাবে যে মূর্তিগুলি দেখা যায় সেগুলি মনে হয় গৌতম বুদ্ধের নয়। মূর্তিগুলি বিষ্ণুর নবম অবতার ঐ আদি বুদ্ধের।

কয়েকটি শিলালিপি হতে মন্দিরটির সমৃদ্ধি এবং এই মন্দিরের জন্য রাজরাজেশ্বরাদি চোল্‌র রাজগণের দানের কথা জানা যায়।

সারা চোল্‌র রাজ্যের নৃত্য-নাট্য-সংগীতাদির প্রাণকেন্দ্র ছিল বৃহদীশ্বরের নৃত্য-মণ্ডপ। প্রতি সন্ধ্যায় এখানে অনুষ্ঠিত হতো শাস্ত্রালোচনা, নৃত্য, গীত ও কথকতা। অনুষ্ঠানগুলির মাধ্যমে লোকশিক্ষারই ব্যবস্থা হতো। নগরবাসীরা নিত্য সমবেত হতেন মন্দির মণ্ডপে।

চোল্‌র রাজকুলের স্মৃতি-ধন্য তঞ্চাবূর্‌র্ উত্তরকালে
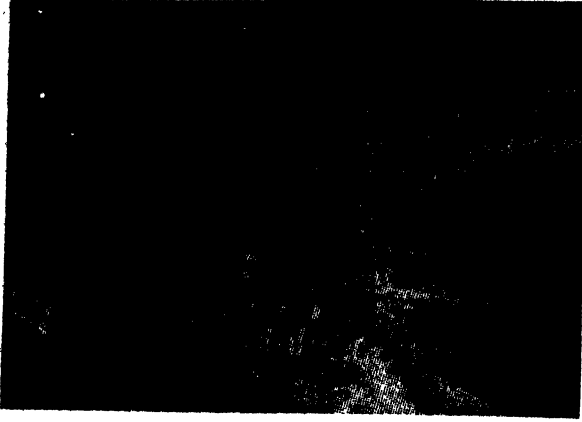
মারাঠা দরবারের অঙ্গসজ্জা—তঞ্জাবুর

হয়েছিল · নায়কগোষ্ঠীর এবং মহারাষ্ট্রীয় রাজগণের রাজধানী। শেষ রাজকুল চুটির সময়ে প্রায় তিনশ' বছরের চেষ্টায় তঞ্জাবুর-এ সৃষ্ট হয়েছিল বর্তমান ভারতের অন্যতম প্রাচীন গ্রন্থাগার—সরস্বতী মহল।

গ্রন্থাগারটিতে সংস্কৃত, তমিল্, তেলুগু ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষার এমন সব দুষ্প্রাপ্য পুঁথি, পুস্তকাদি আছে যা ভারতের অন্যত্র নেই।

মারাঠা দরবার কক্ষ এবং সঙ্গীতমহল তঞ্জাবুর-এ মারাঠা শাসকদের রেখে যাওয়া আর দুটি বিশিষ্ট স্মারণিক। সঙ্গীতমহলের প্রতিষ্ঠাতা রাজা সর্বজী।

রেভারেণ্ড C. V. Schwartz নামে ডেনমার্ক-এর কৃশ্চিয়ান যাজক, নাবালক সর্বজীর অভিভাবক হয়েছিলেন ও তাঁকে হৃতরাজ্য ফিরে পেতে সাহায্য করেছিলেন। তাই কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার অভিব্যক্তি স্বরূপ তঞ্জাবুর-এর বিখ্যাত Schwartz গির্জাটি নির্মাণ করেছিলেন সর্বজী। এই গির্জাটি একটি দ্রষ্টব্যবিশেষ।

তঞ্জাবুর্-এর আর একটি দ্রষ্টব্য—মাডমালিংকৈ। প্রহরীদের নগর পর্যবেক্ষণের জন্য নির্মিত ঐ ইমারতটি আজও অটুট।

দাক্ষিণভারতের অন্যতম ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নগরের মুখ্য দর্শনীয়গুলি শেষ করতে চার ঘণ্টার মত সময় লাগলো। বিকেলের প্যাসেঞ্জার্ ধরে তঞ্জাবুর্ ছাড়লাম।

গাড়ী চললো তিরুশিরাপ্পল্লী—মাদ্রাজ মেন্ লাইন্-এ, বিল্লুপ্পুরম্-এর দিকে।

শীতের প্রকোপ না থাকলেও বিকেলের দিকে সেদিন সামান্য একটু ঠাণ্ডার আমেজ ছিলো। কামরার একটা কোণে বসে জানলার শার্সিটা তুলে দিয়ে দেখতে লাগলাম দূরের গাছ, গ্রাম, পাহাড়, নদী কেমন করে এগিয়ে আসছে আমার কাছে। আমি একই জায়গায় বসে আছি।

তারা আসছে ছুটতে ছুটতে,—চলে যাচ্ছে পিছনে। ছিলো যা চোখের সামনে, তা হয়ে যাচ্ছে দৃষ্টির অগোচরে। আমি কিন্তু চোখ খুলেই আছি।

এখনকার এই যাত্রায়, এ রূপান্তর ঘটাচ্ছে আমার বাহক বাষ্পরথটি,—যদিও আমি নিষ্ক্রিয়।

এমনি করেই জীবন যাত্রায় চোখের সামনে নিয়ে আসে, দূরে সরিয়ে নেয়,—প্রদান করে, হরণ করে, আর এক রথ। সেই রথটি নিয়তি।

জীব নিষ্ক্রিয় থাকলেও সে ঘটিয়ে চলে পরিবর্তন,—জন্ম, মৃত্যু, আবির্ভাব, তিরোধান।

মাড মলিকৈ বা অবেক্ষণ তোরণ—তঞ্জাবুর

এই চিন্তাগুলি মনে কেমন একটা অদ্ভুত অনুভূতি ধরিয়ে দিচ্ছিলো।

একে একে পেরিয়ে যেতে লাগলাম—পপনাশম্,

দারাসুরম্, কুম্ভকোণম্, তিরু নাগেশ্বরম্, ময়ূরম্, আনন্দ তাণ্ডবপুরম্, চিদম্বরম্।

তামিল্ নাডুর এই দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের জায়গাগুলির নামে যেন সংস্কৃতের স্পর্শ।

আরও দেখা যায়—অচ্চরবাক্কম্, মাথুরান্তকম্, অন্নবরম্, পল্লাবরম্, তাম্বরম্, মাম্বলম্, মীনম্বাক্কম্, নুঙ্গম্বাক্কম্, কোডম্ বাক্কম্, অয়ক্কোণম্ কাঞ্চীপুরম্, মহাবলিপুরম্,—মায় ডালমিয়ার সিমেণ্ট কারখানার শহর ডালমিয়াপুরম্।

এই প্রসঙ্গে মাদ্রাজ প্রদেশের তথা দক্ষিণাপথের গ্রামাদি স্থানবাচক শব্দগুলির আলোচনা করা যেতে পারে।

নগর ও গ্রামগুলির নামের সঙ্গে মোটামুটি এই শব্দগুলি যুক্ত হতে দেখা যায়:

পুরম্ বা পুর্, উর্, কোট্টৈ, কোটা, কোট্, মলৈ, চেরি, বাক্কম্, পল্লী, কুডি, গুডি, পেট, পেটা, পট্টি, পটম, পট্টনম্ পটনা এবং নাড়ু।

(ক) পুরম্ ও পুর্ নগর বা শহর বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। যেমন,—কাঞ্চীপুরম্, মহাবলিপুরম্।

উত্তরভারতেও নগর বোঝাতে পুর শব্দের ব্যবহার দেখা যায়।

(খ) উর্ শব্দটির ব্যবহার সর্বাধিক।

প্রয়োগ,—বেলুর্ (বেল উর্) করূর্, বীরূর্, পেরম্বুর্, শাত্তুর্, তঞ্চাবুর্।

অর্থ,—গ্রাম।

বাঙলায় বেলুড় (র ?), নানুর, সিঙ্গুর, অথবা বিহারের উরবেল (গৌতমের বুদ্ধত্ব লাভের ক্ষেত্র)—এই নামগুলিতে যেন উর্ শব্দটির আভাস লক্ষিত হয়। আর্যাবর্তের এই পূর্বাঞ্চলে এক সময়ে যে দ্রাবিড়প্রভাব ছিল তা ঐতিহাসিকগণ সমর্থন করেন।

(গ) কোট্টৈ ও কোট্টা শব্দের অর্থ দুর্গ। কথাটি সংস্কৃত কোট্ট শব্দটির সমার্থবোধক। পুদুক্কোট্টৈ, শামল্ কোট্টৈ, কালিব কোট্টা, শেঙ্কোট্টৈ প্রভৃতি এর উদাহরণ।

উত্তর ভারতে ওই অর্থে গড় শব্দটিই বহুল ব্যবহৃত হলেও কোট শব্দটির প্রয়োগও কম নয়। উদাহরণ,—রাজকোট, পাঠানকোট, মঙ্গলকোট ইত্যাদি।

নামের সঙ্গে কোট বা গড় যোগের জন্য অনুমান করা যায় যে, বর্তমানে অস্তিত্ব না থাকলেও অবশ্যই কোন এক সময়ে স্থানগুলি দুর্গবিশিষ্ট ছিলো।

(ঘ) মলৈ যুক্ত নামগুলি শুধু দক্ষিণ ভারতেই দেখা যায়। যেমন,—তিরুমলৈ, তিরুবন্নামলৈ কুরুমলৈ, আনৈ মলৈ ইত্যাদি। মলৈ কথাটির অর্থ পাহাড়। পাহাড়ী জায়গার নামের সঙ্গেই শব্দটির সংযোগ দেখা যায়।

(ঙ) চেরি শব্দটির অর্থ বসতি। প্রয়োগ,—পুদুক্‌চেরি (পান্ডিচেরি), মট্টঞ্চেরি।

(চ) বাক্কম্ কথাটির অর্থ অঞ্চল। কোডম্ বাক্কম্, নুঙ্গম্বাক্কম্, ইত্যাদি এর উদাহরণ।

(ছ) পল্লী কথাটি সংস্কৃতে ব্যবহৃত পল্লী শব্দেরই অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

(জ) কুডি শব্দের অর্থ আবাস বা গ্রাম। সংস্কৃত কুড্য (কুডিয়) শব্দের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখা যায়। প্রয়োগ,—করৈক্কুডি, তুত্তুক্কুডি ইত্যাদি স্থান বিশেষে শব্দটি গুডি হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। যেমন মন্নার গুডি।

গুডির উচ্চারণ গুড়ি ধরলে শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি ইত্যাদি উত্তর বঙ্গীয় স্থানগুলির নামের 'গুড়ি' কথাটির অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়।

(ঝ) পেট্টৈ, পেট্, পট্টি, পট্টৈ, পট্টনম্ ও পট্না কথাগুলি সংস্কৃত পট্টনম্ শব্দের অনুগ।

উত্তর ভারতে, মহারাষ্ট্র অঞ্চলে শুধু পেট কথাটি ছাড়া আর কোথাওই উক্ত শব্দগুলির কোন ব্যবহার দেখা যায় না।

প্রয়োগের উদাহরণ,—জোলার্ পেট্টৈ, হাসপেট্, কোবিল্পট্টি, মসুলিপট্টম, বিশাখপট্টণম্, চেন্ন পট্না, শ্রীরঙ্গ পট্না।

উত্তর ভারতে সমার্থক পাটনা ও পাটন কথাটির ব্যবহার আছে। যেমন পাটনা (বিহারের রাজধানী), কেন্দ্রা পাটনা, (উড়িষ্যা), পাটন (গুজরাট)।

পাড়া বোঝাতে পট্টি কথাটির ব্যবহার উত্তর ভারতে ব্যাপক।

(ঞ) নডু কথাটি প্রবেশ অর্থে প্রযুক্ত হয়। যথা—তমিল্‌র নাড়ু।

যদিও তামিলকে সংস্কৃত ও সংস্কৃত-জাত সকল ভারতীয় ভাষা হতে সম্পূর্ণ পৃথক বলেই গণ্য করা হয় কিন্তু ভাষাটিতে দেখা যায় সংস্কৃত বা সংস্কৃতানুগ শব্দের প্রাচুর্য।

স্থানীয় অনেককে বলতে শুনেছি ব্রাহ্মণরাই ওই সংস্কৃত মিশ্রণের কারণ।

কিন্তু দেশ, গ্রাম ইত্যাদি বাচক শব্দগুলিকে সংস্কৃতের যে প্রয়োগ লক্ষিত হয় তাও কি ব্রাহ্মণদের কৃত?

ভাষাতত্ত্ববিদ্‌রা হয়তো এর সঠিক কারণ জানেন।

মনটা ডুবে ছিল গভীর চিন্তায়। হঠাৎ সচকিত হলাম কচিগলার সুরের ছোঁয়ায়।

অদূরে বসা পরিবারটির সঙ্গের বাচ্চা মেয়েটি তার বছর খানেকের ভাইকে কোলে নিয়ে আদর করে ছড়া কাটতে শুরু করেছে:

চিন্‌ন চিন্‌ন বোম্‌মৈ বোল্‌
চীনাক্‌কার-অ বোম্‌মৈ বোল্‌
এন্‌নৈক্‌ কন্‌টাল্‌ শিরিক্‌ কিয়াঽন্‌
এঙ্‌ কল্‌ঽ তম্‌বি পারুঙ্‌ কল্‌ঽ।
অম্‌মা বঽন্‌হু কোঞ্চ্‌ চবেঽ
অপ্‌পা অক্‌কিল্‌ কেঞ্চ্‌ চবেঽ
চুম্‌মা চুম্‌মা শিরিক্‌ কিয়াঽন্‌
শোকুত্তত তম্‌বি পারুঙবল্‌ঽ। *

রাত দেড়টায় গাড়ী পৌঁছলো বিঽলক্কপ্‌পুরম্‌। ওখানে গাড়ী বদল করে যখন তিরুবঽণণামলৈ পৌঁছলাম তখন ভোর পাঁচটা।

---

* অর্থাৎ: হাসে যেন চীনে-পুতুল
ছোট্ট আমার ভাই
করলে আদর মা
ডাকলে তারে বাবা
হাসে সে যে সদাই
এই ছোট্ট আমার ভাই।

[ক্রমশঃ

অনর্থক

কিংশুক

আমি চাই না কবিতার গতি
ব্যাকরণ বাহুল্যতার সংগতি
হোক্ তাতে যা-তা লাভ-ক্ষতি
ডুবে যাক চিন্তার স্রোতে ব্যাকরণ,
আমি থামাবো না চিন্তা ও ভাবের
বিস্ফোরণ।
ব্যাকরণ পথে চলা সে তো অনুকরণ
ও তো চিন্তা ও ভাবের সহমরণ
ব্যাকরণ পঞ্জীকায় অকারণ,
আমি জলব,—জ্বালাব উল্কা ও ধূমকেতু—
মিল ও অমিলের দিক্ কেউ সেতু।
আমার কবিতা চলে গড়মিল পথে
আমার চিন্তা ও ভাব চলে রকেটের রথে,—
ব্যাকরণ থাক্ পড়ে—না গেল সাথে?
আমার কবিতা-ছবি আঁকা সত্যের তুফান—
আমার লেখনী?—আত্মার কৃপাণ।
থাক্ পড়ে ব্যাকরণ মেকীর রেকাবীতে
ব্যাকরণ-দীপ যাক্ নিভে—সত্যের চিতাতে।
পড়ে থাক্ ব্যাকরণ দপ্তরী
আর আমার কবিতা?—সৃষ্টির কস্তুরী।
যে কবিতা দেখে ব্যাকরণ—
ওটা-তো পরীক্ষার্থীর পাশের উপকরণ।
কবির কবিতা বোঝেনা ছন্দ-যতি-সনেট
কবিতা-সৈনিক হাতে উদ্যত বেয়নেট।

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

জিজ্ঞাসু উৎসুক সুরে দীপেন বলেছে, 'কি-রকম?'

রমাদেবী যেন উত্তেজিতই হয়ে উঠেছেন, 'আপনাকে একটু আগে কলকাতার সেই লোকগুলোর কথা বলেছি না?'

'কোন লোকগুলোর?'

'সেই বদমাইসগুলো, যারা বিকেল হলে কলোনির চারপাশে শিয়ালের মত গন্ধ শুঁকে শুঁকে বেড়াত। তারপর রাত্রি হলে কলোনির মেয়েদের নিয়ে নরকে চলে যেত।'

'হাঁ হাঁ, মনে পড়েছে। কিন্তু—'

'কী?'

'তারা কী করেছিল?'

এবার উত্তেজনা যেন শীর্ষবিন্দুতে পৌচেছিল রমাদেবীর। অপ্রকৃতিস্থের মত তিনি বলে উঠেছিলেন, 'আমার সর্বনাশ করার জন্যে শকুনগুলো উঠে পড়ে লেগেছিল। কলোনির ঘরে ঘরে তারা দাগ ধরিয়েছে; পারে নি শুধু আমার ঘরে। সে জন্য চেষ্টার ত্রুটি ছিল না তাদের। তারা প্রথম প্রথম কী করত, জানেন?'

কিছু না বলে নিষ্পলকে শুধু তাকিয়েই থেকেছে দীপেন।

আগের মত একই সুরে রমাদেবী বলে গেছেন, 'আমার সঙ্গে চোখাচোখি হলেই গোছা গোছা নোট বার করে দেখাত; চোখের ইঙ্গিত করত। অর্থাৎ টাকার ফাঁদে আমাকে ফেলতে চাইত। আমি দেখেও ও-সব দেখতাম না, কিংবা এমন করে চোখ পাকিয়ে তাকাতাম যাতে ওরা পালাতে পথ পেত না। কিন্তু—'

রুদ্ধশ্বাসে দীপেন এবার বলেছে, 'কিন্তু কী?'

'ওরা যে কতবড় শয়তান, ওদের বুকের পাটা যে কত চওড়া তা আমি কি জানতাম!' বলতে বলতে একটু চুপ করেছেন রমাদেবী।

দীপেন কিছু বলে নি। মহিলার মুখ থেকে দৃষ্টিও সরায় নি।

এদিকে বেলা আরো বেড়ে গিয়েছিল। সূর্যটা কখন যে লম্বা পায়ে মাথার ওপর এসে উঠেছে, কারো খেয়াল ছিল না। বাগানের যে দিকটায় ঘন গাছগাছালি, সেখানে নিবিড় ছায়ার ছড়াছড়ি। সেখানে শান্ত আচ্ছন্নতা। শরতের সেই দুপুরেও সেখানে পাখি ডাকছিল, চোনাঘাসের জঙ্গলে ঝিঁঝিদের একটানা কনসার্ট শোনা যাচ্ছিল। একটা জলীয় স্নিগ্ধতা সমস্ত বাগানখানিকে বেষ্টন করে ছিল যেন। কিন্তু ঝাঁঝিতে আর পানায় রুদ্ধকণ্ঠ পুকুরটার ওপারে—যেখানে গাছপালা বিরল—সেখানে শরতের দুপুর উজ্জ্বল ঝাঁজালো রোদে যেন শিহরিত হচ্ছিল।

রমাদেবী কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হয়েই থেকেছেন বুঝি।

খুব সম্ভব তাঁর সত্তার কোন নিভৃত অংশে নিদারুণ প্রতিক্রিয়া চলছিল। হঠাৎ এক সময় তিনি আবার শুরু করেছেন, 'আপনাকে আগেই বলেছি মেয়েটাকে আমি আগলে আগলে রাখতাম। কলোনিতে তাঁবুর ভেতর থাকার ব্যবস্থা ছিল। সারা দিনই নীলা তাঁবুতে থাকত। স্নানের সময়টুকু ছাড়া তাকে বেরুতে দিতাম না। দোকান বাজার—অফিস থেকে ডোল আনা—যা যা দরকার সব আমিই করতাম। একদিন কী হল জানেন?'

'কী?' নিজের অজ্ঞাতসারে গলার মধ্য থেকে শব্দটা বেরিয়ে এসেছিল দীপেনের।

রমাদেবী বলেছেন, 'সেদিন দুপুরে কাছের একটা হাটে গেছি। সপ্তাহে একদিন মাত্র ঐ হাটটা বসত। কাজেই দিন সাতেকের মত চাল ডাল নুন তেল, সবই কিনে রাখতে হত। হাট থেকে ফিরেছিলাম, সন্ধ্যের সময়। ফিরে যা চোখে পড়েছিল তাতে প্রথমে বুকের ভেতরটা হিম হয়ে গিয়েছিল। তারপরেই সমস্ত রক্ত একলাফে মাথায় গিয়ে উঠেছিল।'

একরাশ উৎকণ্ঠা হৃদ্‌পিণ্ডের ওপর জমাট বেঁধে গিয়েছিল যেন। শঙ্কিত কাঁপা গলায় দীপেন বলেছেন, 'কী, কী দেখেছিলেন আপনি?'

'কী দেখেছিলাম!' বলেও কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ছিলেন রমাদেবী। তারপর প্রায় উদ্‌ভ্রান্তের মত বলতে শুরু করেছিলেন, 'দেখেছিলাম আমার মরণকে; আমার সর্বনাশকে। এতদিন দূর থেকেই সেই বদমাইসগুলো টাকার লোভ দেখিয়ে, ইসারা-ইঙ্গিত করে আমাকে ফাঁদে ফেলতে চাইছিল। কিন্তু পারে নি। সেদিন আমি হাটে গেছি। সেই সুযোগে তারা—'

আগের সুরেই দীপেন বলেছে, 'তারা কী করেছিল?'

দাঁতে দাঁত চেপে, কঠিন চোয়ালে, দপদপে শাণিত চোখে রমাদেবী বলেছেন, 'শকুনগুলো আমার তাঁবুর সামনে এসে উকি ঝুঁকি দিচ্ছিল,আর ফিসফিসিয়ে নীলাকে ডাকছিল। দেখে মাথাটা বুঝি খারাপই হয়ে গিয়েছিল আমার; হিতাহিত জ্ঞান ছিল না। হাটের সওদা আছড়ে ফেলে সোজা তাঁবুতে ঢুকে একটা বঁটি বার করে উন্মাদের মত ছুটে বেরিয়ে ছিলাম। গলার শির ছিঁড়ে চিৎকার করে বলেছিলাম, 'মেরে নিবি; আর কেয়োরা; বিষ্ঠাখেকো মড়ারা।' আমার সেই সময়কার চেহারা কেমন হয়েছিল বলতে পারব না। তবে এটুকু মনে আছে, এলো খোঁপাটা খুলে গিয়ে চুলগুলো আলুথালু হয়ে পিঠে ছড়িয়ে পড়েছিল। গায়ে ঠিকমত কাপড় ছিল না। আর চোখদুটো যেন জ্বলছিল। ক্যাম্পের লোকেরা পরে বলেছিল, 'সে সময় আমাকে নাকি মা কালীর মত দেখাচ্ছিল।'

'তারপর?'

'তারপর আর কি? আমার সেই মূর্তি দেখে নরকের পোকাগুলো উধাও হয়ে গিয়েছিল। ওরা পালালে কি হবে, আমি কিন্তু ছাড়িনি। সেই অবস্থাতেই সোজা চলে গিয়েছিলাম ক্যাম্পের অফিসে।'

'সেখানে কেন?'

'সেখানেই তো ক্যাম্পের অফিসার-ইন-চার্জ থাকে, সেখানে গিয়ে সমানে চিৎকার করেছিলাম, 'আপনি এর ব্যবস্থা করবেন কি, করবেন না?' অফিসার চমকে উঠে বলেছিলেন, 'কিসের?' আমি বলেছিলাম, 'দিনের পর দিন ক্যাম্পটা নরক হয়ে উঠছে। বদমাইসেরা এসে ঘরের মেয়েদের সর্বনাশের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সব দেখে শুনেও আপনি চোখ বুঁজে আছেন। কোন রকম প্রতিকার করছেন না। জানেন, শয়তানেরা আমার তাঁবুতে পর্যন্ত হানা দিয়েছে আজ। আপনি যদি এদের ক্যাম্পে আসা বন্ধ না করেন তা হলে আমাকে অন্য পথ দেখতে হবে।' অফিসার লোকটা কথায় বার্তায় ছিলেন চমৎকার। বলেছিলেন, 'কী পথ দেখবেন?' আমি বলেছিলাম,দেশে আইন আছে,আইনের যারা রক্ষক সেই পুলিশ আছে। আমি পুলিশের কাছে যাব।' একটু চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে অফিসার বলেছিলেন, 'পুলিশ!' আমি চিৎকার করছিলামই। গলার স্বর আরো এক পর্দা চড়িয়ে বলেছিলাম, 'হ্যাঁ হ্যাঁ পুলিশ! পুলিশ যদি কিছু না করে আমি মন্ত্রীদের কাছে যাব। দেশে কি গভর্ণমেণ্ট নেই।' অফিসার এবার হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'বসুন, বসুন।' বলেছিলাম, 'বসতে আমি আসিনি। শুধু স্পষ্ট জবাব চাই, আপনি এর বিহিত করবেন কিনা? আমি চাই ক্যাম্পের ভেতর ঐ বদমাইস-লোকগুলো যেন আর কখনও পা না দায়।' এবার অফিসার কিছু বলেন নি। তার আগেই তার পাশে বসে থাকা

আরেকটি ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠেছিলেন, 'কী ব্যাপার বলুন তো?' ভদ্রলোককে আমি চিনি না, আগে আর কোনদিন দেখি নি। তবে বেশ সুপুরুষ চেহারা; পোষাক-টোষাক চমৎকার। বয়সও নেহাতই কম।'

অসীম আগ্রহে দীপেন উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল। রমাদেবী একটু থামতে সে ফিসফিসিয়ে বলে উঠেছে, 'এই ভদ্রলোকই কি মণিময় দত্ত।'

রমাদেবী মাথা নেড়েছেন, 'হ্যাঁ।'

'মণিময় দত্ত তো বললেন, মস্ত বড় লোক। একটা প্রকাণ্ড অফিসের হর্তা-কর্তা-বিধাতা—'

'হ্যাঁ।'

'তা তিনি ওখানে—মানে ক্যাম্পে গিয়েছিলেন কেন?'

রমাদেবী উত্তর দেন নি।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সব কিছু মনে মনে বিশ্লেষণ করে নিয়েছে দীপেন। মণিময় দত্তের ব্যাপারে সে যদি মাত্রাছাড়া উৎসাহ দেখায় রমাদেবীর মনে সংশয়ের ছায়া পড়তে পারে। অতএব সে প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে যে কৌতূহলটুকু সঙ্গত এবং শোভন সে সম্বন্ধেই এবার প্রশ্ন করেছে, আচ্ছা, উনি তো আপনাকে জিজ্ঞেস করলেন 'কী ব্যাপার? তারপর কী হল?'

কি উত্তর দিতে গিয়ে হঠাৎ থমকে গেছেন রমাদেবী। এতক্ষণ বিচিত্র আচ্ছন্নতার মধ্যে তিনি যেন কথা বলছিলেন। আত্মবিস্মৃতির একটা ঘোর যেন তাঁকে চারদিক থেকে বেষ্টন করে ছিল। আচমকা সেই ঘোরটা কেটে গেছে। একটু আগের সেই উত্তেজনা, উদ্‌ভ্রান্তি, ক্ষিপ্ততা কিছুই আর অবশিষ্ট ছিল না। প্রথম দিন তাঁকে যেরূপে দীপেন দেখেছিল, বিমর্ষ, করুণ, ক্লান্ত দেখাতে শুরু করেছিল তাঁকে। সীমাহীন বিষাদের এক প্রচ্ছদ কেউ যেন তাঁর ওপর টেনে দিতে শুরু করেছিল। নিস্পৃহ মৃদু স্বরে তিনি বলেছেন, 'সে কথা শুনে কি লাভ!'

এই পরিবারটির সঙ্গে দত্তসাহেবের সম্পর্কের একটা সূত্র পাওয়া গিয়েছিল। সেটা ধরে এগুতে পারলে সম্পর্কের গভীরতা বোঝা যেতে পারে। সেটা জানবার এবং বুঝবার জন্য সেই মুহূর্তে তার বুকের মধ্যে অস্থির আগ্রহ দোলায়িত হচ্ছিল। দীপেন বলেছে, 'সব কিছুই কি লাভলোকসান দিয়ে যাচাই করে জানতে বুঝতে হয়? জানতে ইচ্ছা হচ্ছে। ধরুন না, নিছক কৌতূহল।' বলেই চকিত হয়ে উঠেছে সে। তার গলায় এ কোন উচ্চারণ! সুধাময় লাহিড়ীর আদর্শের ছাঁচে যে মানুষ ঢালাই হয়ে বেরিয়ে এসেছে, যার জীবনে, 'কেরীয়ার'ই হচ্ছে একমাত্র জপমন্ত্র, নিজের সুখের জন্য তৃপ্তির জন্য প্রতিমুহূর্তে যার হিসেবী পদক্ষেপ—সে এ কি বলে বসেছে! বিচিত্র একটি পরিবারের। (পৃথিবীর যে পথে দীপেনের চলাফেরা এতকাল সেখানে এমন পরিবারের দেখা মেলে নি। রমাদেবী বা তাঁর অসুস্থ স্বামী, নীলা চৌধুরী বা শীলা-এরা সবাই তার কাছে অপরিচিত এবং বৈদেশিক) সংস্পর্শে এসে এ কি তার ক্ষণিকের আত্মবিস্মরণ।

যাই হোক, রমাদেবী বলেছেন, 'অকারণ কৌতূহল মিটিয়ে কী হবে! যে-সব শুনলে আপনার মনই শুধু খারাপ হবে।'

'তবু বলুন।'

'না-না—জোরে জোরে প্রবলবেগে রমাদেবী এবার বলেছেন, 'এমনিতেই আপনাকে অনেক কষ্ট দেওয়া হয়েছে। তার পরিমাণ আর বাড়াতে চাই না।'

দীপেন বুঝেছিল, মণিময় দত্তের ব্যাপারে নিজের অজ্ঞাতসারে রমাদেবী যেটুকু বলে ফেলেছেন মাত্র সেটুকুই। তার বেশি আর একটি কথাও তিনি বলবেন না।

এদিকে পুকুরের ওপারে রোদের রঙ্ বদলাতে শুরু করেছিল। শরতের ঝিম-ধরা দুপুর তার সমস্ত দাহ হারিয়ে শিথিল আর অলস হয়ে পড়েছিল। কোথায় কোন একটা তারে অবসাদের সুর বেজে যাচ্ছিল যেন। চীনাঘাসের জঙ্গলে ঝিঁঝিদের একটানা বিলাপ থেমে গিয়েছিল; পাখিরাও আর তেমন ডাকাডাকি করছিল না। বাগানের যেদিকটায় গাছপালার ভিড় সেখানে ছায়ার টুকরোগুলো আরো নিবিড় হয়েছে।

অনেকটা সময় স্তব্ধতা। এর মধ্যে কেউ কথা বলে নি। না দীপেন, না রমাদেবী।

তারপর দীপেনই একসময় নীরবতা ভেঙেছে। অতর্কিতে একটা কথা মনে পড়তে বলে উঠেছে, 'আচ্ছা'—'কী?' বিষাদময় মহিলা তাঁর করুণ চোখদু'টি তুলে ধরেছেন।

'আপনি তো বলেছেন, আপনার মেয়ে মানে নীলা দেবী এখন বোম্বাইতে থাকেন।'

'হ্যাঁ। বোম্বাইর আন্ধেরী বলে একটা জায়গায়।'

'ঠিকানাটা জানেন? মানে রাস্তার নাম, কত নম্বর বাড়ি?'

'জানি। কেন?'

'ধরুন, আমি যদি কখনও বোম্বাই যাই, ওর সঙ্গে দেখা করতে পারি।'

একটু ইতস্তত করেছেন রমাদেবী। তারপর দ্বিধান্বিত সুরে বলেছেন, 'রাস্তার নাম নীলকান্ত যোশী রোড। বাড়িটার নম্বর আঠারোর বি।'

পকেট থেকে ছোট একটা ডায়রী আর কলম বার করে ঠিকানাটা লিখে নিয়েছে দীপেন। তারপর সেগুলো জায়গামত রাখতে রাখতে বলেছে, 'আপনাকে অনেকক্ষণ ধরে রেখেছি। আপনি অনুমতি করলে এবার আমি যেতে পারি।'

'আসুন—'

চীনাঘাসের জঙ্গল আর বাগানের ঘন গাছপালার মধ্য দিয়ে দীপেন খিড়কির দিকে হাঁটতে শুরু করেছিল। নিঃশব্দে রমাদেবীও তাকে অনুসরণ করেছিলেন।

অবশেষে খিড়কির সামনে এসে দরজা খুলে দীপেন বাইরে পা দিয়েছিল। আর সেই মুহূর্তে পেছন থেকে রমাদেবীর গলা শোনা গিয়েছিল, 'শুনুন—'

সামনের দিকে পা বাড়াতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে দীপেন। তারপর পেছন ফিরে উৎসুক জিজ্ঞাসু চোখে রমাদেবীর দিকে তাকিয়েছে।

একটু ইতস্তত করে রমাদেবী বলেছেন, 'একটা কথা—' এই পর্যন্ত বলেই তিনি থেমেছেন।

কাছে এগিয়ে এসে দীপেন বলেছে, 'কী কথা?'

তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন নি রমাদেবী। তাঁর চোখমুখ দেখে অনুভব করা গেছে, একটু আগের দ্বিধান্বিত ভাবটা পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারে নি। যাই হোক সমস্ত সংকোচ আর কুণ্ঠা সবলে দু'হাতে সরিয়ে দিতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লেগেছে। একসময় অর্ধস্ফুটে প্রায় মরিয়ার মত রমাদেবী বলে উঠেছেন, 'আপনি তো নীলার ঠিকানা নিলেন। তা সত্যি সত্যিই বোম্বাই যাবেন নাকি?

মনে মনে সেই মুহূর্তেই বোম্বাই যাবার জন্য পা বাড়িয়ে ছিল দীপেন। অসীম আগ্রহে বলতে যাচ্ছিল, নিশ্চয়ই সে বোম্বাই যাবে। পারলে সেদিনই রওনা হবে। কিন্তু পরক্ষণেই উৎসাহের সেই প্রবল ঢলটাকে থামিয়ে দিয়ে কিছুটা নিস্পৃহ সুরে বলেছিল, 'যেতেও পারি।'

যে আগ্রহকে দীপেন স্তব্ধ করে দিয়েছিল, এবার সেটাই শোনা গিয়েছিল রমাদেবীর গলায়। কাঁপা সুরে তিনি জানতে চেয়েছেন, 'কবে নাগাদ যাবেন?'

'দেখি।'

'আপনি যদি বোম্বাই যান আর নীলার সঙ্গে যদি দেখা হয়—'

ঈষৎ ঝুঁকে দীপেন বলেছে, 'তা হলে?'

রমাদেবী বলেছেন, 'তাকে একটা কথা বলবেন।'

'কী কথা?'

'বলবেন ভবানীপুরের যে ঠিকানায় মাসে মাসে সে টাকা পাঠিয়ে থাকে, আর যেন সেখানে না পাঠায়। কেন না, নীলার বাবা সে ঠিকানা জানতে পেরেছেন।'

অন্যমনস্কের মত দীপেন বলে উঠেছে, 'নীলাদেবী টাকা পাঠান!'

সেই চির-বিষাদের মূর্তিটি এবার যেন কিছুটা উত্তেজিত। তীক্ষ্ণ সুরে তিনি বলেছেন, 'টাকা না পাঠালে সংসার চলছে কী করে? এতগুলো লোকের খাওয়া-পরা, তার ওপর ঐ রুগীর (নীলার বাবা) চিকিৎসা—এ সবের খরচ কে জোগাবে?'

দীপেন চমকে উঠেছে। যে মেয়ের মৃত্যু সংবাদে সেই পক্ষাঘাত পঙ্গু রুগ্ন মানুষটি উৎফুল্ল—তারই পাঠানো টাকায় যে সংসারের জীবনস্রোত সচল থাকছে, এতগুলো মানুষের প্রাণধারণ সম্ভব হচ্ছে—এ যেন এক বিস্ময়কর করুণ প্রহসন। সম্ভবমত নীলার টাকা পাঠাবার খবর তার বাবা রাখেন না অথবা জানেন না।

অতর্কিতে আরেকটা কথা মনে পড়েছে দীপেনের। হয়ত পঙ্গু অসুস্থ মানুষটি জানতে পারবেন বলেই প্রতি মাসের সংসার-খরচ ভবানীপুরের ঠিকানায় পাঠিয়ে থাকে নীলা চৌধুরী। হয়ত কেন, নিশ্চয়ই তা-ই।

ভাবতে ভাবতে একসময় নিষ্পলক স্থির দৃষ্টিতে রমাদেবীর দিকে তাকিয়েছে দীপেন। এই মহিলা সংসারের

কোন ভূমিতে দাঁড়িয়ে আছেন ? স্বামী এবং সংসারের, এমন কি নিজেকে বাঁচানোর জন্যও কি অকরুণ আত্ম-প্রবঞ্চনার খেলাতেই না মেতেছেন তিনি ! স্বামীর পরিপূর্ণ বিতৃষ্ণা জেনেও সঙ্গোপনে অন্য ঠিকানায় নীলার টাকা তাঁকে হাত পেতে নিতে হয়। আবার দীপেনের মত আগন্তুককে দিয়ে মেয়ের মৃত্যু-সংবাদে স্বামীকে খুশীও করতে হয়। মহিলার মনের জগতে প্রতি মুহূর্তে কি সাত্মাতিক বিপর্যয় যে চলছে তা অনুমান করতে যাওয়াও যেন এক জটিল যন্ত্রণা। জীবনের পথে প্রতি মুহূর্তে কি বিচিত্র, কি কঠিন আর কি বিষাদময় তাঁর পদক্ষেপ !

রমাদেবী আবার বলে উঠেছেন, 'নীলাকে বলবেন এবার থেকে মাস মাস টাকা সে যেন কালীঘাটে ওর সেজ-মাসির ঠিকানাতেই পাঠায়।'

দীপেন মাথা নেড়ে জানিয়েছে, বলবে।

'আচ্ছা, তা হলে আজ আসুন—' বলে আর অপেক্ষা করেন নি রমাদেবী। খিড়কির দরজা ক্ষিপ্র হাতে বন্ধ করে দিয়েছেন।

সোনারপুরের সেই ঠিকানা থেকে বেরিয়ে দীপেন সোজা চলে গিয়েছিল দত্তসাহেবের কাছে। সোনারপুরে যা যা কথা হয়েছে যে সব মানুষের সংস্পর্শে সে এসেছে এবং যে বিচিত্র জটিল ঘটনার আবর্তে তাকে পাক খেতে হয়েছে—সব, সব কিছুই দত্তসাহেবকে বলেছে। কিছুই গোপন করে নি। সমস্তই উন্মুক্ত করে মেলে ধরেছে।

সব শুনে দত্তসাহেবই তাকে বোম্বাই আসতে বলেছেন। বোম্বাই এসে কী করতে হবে, সে সম্বন্ধে নির্দিষ্ট একটা ছকও ঠিক করে দিয়েছেন।

মাঝখানে একটা দিন। তারপরই বোম্বাইর ট্রেণ ধরেছে দীপেন। অবশেষে বঙ্গোপসাগরের কূল থেকে আরবসাগরের কূলে এসে পৌচেছে।

হোটেলের লাউঞ্জে কতক্ষণ যে নিজের মধ্যে মগ্ন হয়ে ছিল, দীপেন জানে না। কার ডাকে সে যেন চকিত হয়ে উঠল। মুখ ফেরাতেই দেখা গেল, একটা বয় দাঁড়িয়ে আছে।

বয়টা বলল, 'কি আপনার খানা এখন দেব ?'

দীপেন ব্যবস্থা করে নিয়েছে, তার খাবার তার কামরাতেই যেন দেওয়া হয়। ডাইনিং হলে হাটের মাঝখানে সে খেতে পারবে না। ব্যবস্থা মত বয়টা এসেছে।

সোফা থেকে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল দীপেন। বলল, 'দাও।' বলে একবার পেছন ফিরল।

পেছনে যতদূর চোখ যায়, একদিকে ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস ফ্লোরা ফাউণ্টেন পর্যন্ত—আরেক দিকে ধোবি তালাও থেকে সুদূর মেরিন ড্রাইভ পর্যন্ত শুধু আলো, আলো আর আলো। চারিদিকে যেন দীপান্বিতা চলেছে। আর তার মাঝখানে রাতের মোহিনীমায়া সেজে বোম্বাই বসে আছে।

[ক্রমশঃ

ব্রতের প্রয়োজনীয়তা

শ্রীমতী কমলা ভট্টাচার্য্য

কার্ত্তিকের ভারতবর্ষে শ্রীমতী বাণী চক্রবর্ত্তী এম-এ রচিত 'ব্রতের স্বরূপ' প্রবন্ধ পড়ে বড় আনন্দ পেয়েছি। একজন শিক্ষিতা বাঙলার মেয়ে যে ব্রতবিষয়ে এত তথ্যাভিজ্ঞ তা দেখে সত্যি সত্যি বিস্ময় ও পুলক অনুভব করছি। কিন্তু কোন কোন মহল থেকে ঠোঁট বাঁকানো উপেক্ষার সুরও শুনতে পাচ্ছি—'এখন কি আর ব্রত নিয়ে মাথা ঘামানো চলে? না তার জন্যে সময় আছে?' তাই বর্তমান প্রবন্ধটি লিখতে বাধ্য হচ্ছি।

ভারতে আচরিত ব্রতসকল সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর—প্রবৃত্তিমূলক ও নিবৃত্তিমূলক। তাদের আবার কামনামূলক আর প্রায়শ্চিত্তমূলক এই দুইভাগেও ভাগ করা যেতে পারে। কর্মের মূল প্রবৃত্তি। আমরা এমন কাজে প্রবৃত্ত হব, যাতে শুধু নিজের মঙ্গলই সাধিত হবে না—তাতে করে সমগ্র সমাজ, দেশ সকলে উপকৃত হবে। তাই ঋষিরা নির্দেশ দিয়েছেন অন্নোৎপাদন ব্রতের—'অন্নং ন নিন্দ্যাৎ। তদ্ ব্রতম্। অন্নং বহু কুর্ব্বীত। তদ্ ব্রতম্।'

অন্ন অর্থ শুধু ভাত নয়। অন্ন বলতে সমস্ত খাদ্য-দ্রব্যকে বোঝায়। অন্ন যাঁরা ফলায় তাঁরা কখনও নিন্দার পাত্র নয়। প্রকৃতপক্ষে তাঁরাই হচ্ছেন দেশের মেরুদণ্ড। তাঁদের প্রতি তাঁদের কাজের প্রতি অবহেলার জন্যেই ভারতকে অন্যদেশের দ্বারে অন্নের জন্য হাত পাততে হয়েছে। ঋষিনির্দিষ্ট পথে ব্রত পালনে উপেক্ষা করার যে আর সময় নেই তা বলার আর প্রয়োজন বোধ হয় নেই।

নিবৃত্তিমূলক বা প্রায়শ্চিত্ত মূলক ব্রত সকল থেকে বোঝা যাবে আমাদের সমাজে কিভাবে নীতির সৃষ্টি হয়েছে। কিভাবে নির্দিষ্ট হয়েছে সামাজিক রীতি—পাপ বোধ, পুণ্য বোধ। স্ত্রীপুরুষের সম্পর্কে নীতি-বিগর্হিত আচরণই পারিবারিক অশান্তির মূল। লেখিকার উদ্ধৃত আরও একটি শ্লোকের উল্লেখ করছি—

বিপ্রদুষ্টাং স্ত্রিয়ং ভর্তা নিরুন্ধ্যাদেকবেশ্মনি।
যৎ পুংসঃ পরদারেষু তচ্চৈনাং চারয়েদ্‌ব্রতম্॥

পুরুষ পরদারগামী হলে তাকে যে রকম প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, স্ত্রীলোক পরপুরুষ দূষিত হলেও তাকে সেইপ্রকার অর্থাৎ পুরুষের মত প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। কিন্তু আমাদের সমাজে তার অবস্থা বিপরীত। পুরুষের অপরাধ গণ্যই নয়,—নারীর অপরাধ সমাজচ্যুতির কঠিন শাসনে দুঃশাসিত। লম্পট বেশ্যাগামী পুরুষের সেবা করতে বাধ্য অবলা গৃহবধূ। অথচ তার পক্ষে চোখের কোন পলকের বিভ্রমই গুরুদণ্ডে দণ্ডনীয়। শ্রীমতী বাণী চক্রবর্ত্তী এই সকল শাস্ত্রনির্দেশ তুলে ধরেছেন নারী-জাতির সামনে। ভারতের নারী স্বকীয় অনুষ্ঠিত অপরাধের শাস্তি থেকে মুক্তি চায় না—সে চায় সমাজের কাছে সমান ব্যবহার। যে অপরাধে তার সমাজচ্যুতির গুরুদণ্ড,—সেই প্রকার শাস্তি মেনে নিতে হবে আজ

জল আনতে

ফটো : রামকিঙ্কর সিংহ

জল আনছে

ফটো : বিজয়া দাশগুপ্ত

ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

পুরুষকেও। এই হচ্ছে শাস্ত্রের নির্দেশ। এই নির্দেশ ভঙ্গ করে চলেছে পুরুষশাসিত সমাজ—তার ফলে কত শত নারীর জীবন আজ যন্ত্রণায় কাতর, রোগে জর্জরিত। প্রতিটি প্রগতিশালিনী নারীকে আজ ভাবতে হবে এই মহান ব্রতের কথা—ভাবতে হবে কি করে সমাজের পুরুষদের বাধ্য করা যায় এই ব্রত পালনে,—নিষ্ঠার জীবন যাপনে—দাম্পত্য ধর্ম পালনে—যাতে স্বাস্থ্যবান সবল শিশুর জন্ম সম্ভব হয় ভারতে। নইলে পাপাচারী বেশ্যা-গামী জনকেরা যে-সব রুগ্ন পীড়িত শিশুর জন্ম দেবে, তাতে না সম্ভব হবে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি—না সহজ হবে দেশের প্রতিরক্ষা।

তবে নারীদেরও প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য হচ্ছে শুদ্ধ জীবন যাপন করা। অনাচার, ব্যাভিচারের স্থান যেন পুংনারীর জীবনে না থাকে—সে দিকে যেন শিক্ষিত অশিক্ষিত সব নারীই লক্ষ্য রাখেন। দেশের নেতৃস্থানীয় স্ত্রী-পুরুষ সকলের দৃষ্টিই এবার আকর্ষণ করছি—'ব্রত পালনে'র প্রয়োজনীয়তার প্রতি। তাঁরা যদি উপলব্ধি করতে পারেন সামাজিক সাম্যপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা—বাধ্য করতে পারেন নারী পুরুষ সকলকে সুস্থ সরল নীতি-অনুগামী জীবনযাপনে—ঋষি প্রদর্শিত মহান্ ব্রতপালনে—তবেই দেশের যথার্থ কল্যাণ সম্ভব হবে।

প্রসূতি-পরিচর্য্যা ও শিশুমঙ্গল

ডাঃ কুমারেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-বি

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

প্রসূতির স্তন থেকে স্বাভাবিক উপায়েই দুগ্ধ-নিষ্কাষণ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তবে বিশেষ কোনো কারণে প্রয়োজন হলে, অভিজ্ঞ-বিচক্ষণ চিকিৎসক বা ধাত্রীর পরামর্শানুসারে আধুনিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানসম্মত কৃত্রিম-উপায়েও প্রসূতির স্তন-দুগ্ধ নিষ্কাষণ করা সম্ভব। সচরাচর যে সব কৃত্রিম উপায়ে প্রসূতির স্তন-দুগ্ধ নিষ্কাষণ করা হয়ে থাকে, সেগুলির মধ্যে 'ব্রেষ্ট-পাম্প' (Breast-pump) বা 'স্তন-শোষণী' যন্ত্রটিই আজকাল বিশেষ প্রচলিত হয়েছে। এ-ধরণের 'স্তন-শোষণী 'যন্ত্র' ব্যবহার করে কৃত্রিম-উপায়ে স্তন-দুগ্ধ নিষ্কাষণ করা—এমন কিছু দুঃসাধ্য-কঠিন বা ব্যয়বহুল ব্যাপার নয়। বাজারের যে কোনো ভালো ওষুধের দোকানে অল্প খরচেই এ-ধরণের সামগ্রী কিনতে পারা যায়। এমনি ধরণের কৃত্রিম-উপায়ে স্তন-শোষণের মোটামুটি রীতি হলো—বেশ ভালোভাবে হাত ধুয়ে, প্রসূতি তাঁর হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও অন্যান্য আঙুলগুলির সাহায্যে দুগ্ধ-নিষ্কাষণের উপযোগী স্তনটিকে ধরে, সেই স্তনের 'ভেলা'…অর্থাৎ বাদামী-রঙের গোলাকার অংশের উপর-ভাগ (পিছনের জায়গাটি) থেকে ক্রমশঃ সামনের দিকে…অর্থাৎ, স্তনের 'বোঁটা' বা 'চুষীর' (Nipple) পানে ধীরে ধীরে দোহনের ভঙ্গীতে চাপ দিয়ে টানলে দুধের ধারা প্রবহমান হবে। সে ধারা যদি অপর্য্যাপ্ত হয়, তাহলে সামান্যকাল বিশ্রামান্তে পুনরায় পূর্ব্বোল্লিখিত-প্রথায় স্তনটিকে হাতের আঙুলের সাহায্যে উঁচু করে ধরে মর্দ্দন-সংবাহন করলেই আরো খানিকটা দুধ নিষ্কাষিত হয়ে আসবে। তবে নবজাত-শিশুকে মিনিট কুড়ি সময় দুগ্ধদানের পর, উপরোক্ত-পদ্ধতিতে দু' মিনিটের বেশী দুগ্ধ-নিষ্কাষণের চেষ্টা না করাই ভালো। তাছাড়া শিশু দুর্ব্বল হলে, গোড়াতেই এমনি প্রথায় প্রসূতির স্তন-দুগ্ধ নিষ্কাষণ করে সযত্নে পরিষ্কার একটি পাত্রে তুলে রেখে, পরে দুধের বোতলে (Feeding Bottle) ভরে নিয়ে শিশুকে স্তন-দুগ্ধপানার্থে পান করতে দেওয়াই বিধেয়।

সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের ফলে, প্রসূতির স্তনে স্বভাবতঃই অনেকগুলি ছোট ছোট 'গ্রন্থি-কোষ' বা 'থলি' থাকে। এই সব 'গ্রন্থি-কোষ' বা 'থলিতে' স্তন-দুগ্ধ সঞ্চিত হয়ে ওঠে এবং প্রায় ১৫।২০টি ছোট ছোট নালীর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে স্তনের 'বোঁটা' বা 'চুষীর (Nipple) মাধ্যমে পরে বাইরে নিষ্কাষিত হয়ে আসে। স্তনদুগ্ধাধারে এই সব 'গ্রন্থি-কোষ' বা 'থলি' সাজানো থাকে স্তনের 'ভেলা' বা বাদামী রঙের গোলাকার অংশের ত্বক-চর্ম্মাবরণের ঠিক নীচেই…তাই 'ভেলার' উপরে ও আশপাশের অংশে চাপ দিলেই দুধের ধারা বাইরে বেরিয়ে আসে। বিশেষ কারণে কোনো সময় প্রসূতির স্তন-নিষ্কাশিত দুধ পরে ব্যবহারের জন্য সঞ্চয় করে রাখার আবশ্যক হলে, সে দুধটুকু সযত্নে পরিষ্কার একটি ঢাকনী-আঁটা পাত্রে ভরে নিয়ে ঠাণ্ডা বরফের চাঙড়ের উপর অথবা 'রেফ্রিজারেটার' (Refrigerator) বাক্সের ভিতরে সযত্নে তুলে রেখে দেওয়াই উচিত। কারণ, বিশুদ্ধ-পাত্রে ও ঠাণ্ডা জায়গায়

ঢাকা-চাপা দিয়ে না রাখলে, সঞ্চিত দুধটুকু অচিরেই নষ্ট ও খারাপ হয়ে যেতে পারে।

অনেক সময় দেখা যায়, প্রসূতির স্তনে পর্য্যাপ্ত দুধ থাকা সত্ত্বেও, নবজাত-শিশু স্তন্য-দুগ্ধপানে বিশেষ আগ্রহ-শীল নয়। এমনটি ঘটলেই...অর্থাৎ, শিশু যদি স্তন্য-পান করতে আগ্রহ বা ইচ্ছাপ্রকাশ না করে, তাহলেই বুঝবেন—শিশুর উদরে বায়ু-প্রবণতা বা বায়ু সঞ্চার হয়েছে। এ লক্ষণ দেখলেই, শিশুকে নিরাময় করে তোলার জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। অর্থাৎ, প্রসূতির কর্ত্তব্য—শিশুকে তাঁর নিজের বুকের উপর রেখে, শিশুর পিঠে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে সযত্নে মৃদুচাপ দিয়ে ধীরে (Massage) নবজাতকের উদরে-সঞ্চিত বায়ুটুকু সমুদয় নিষ্ক্রান্ত করে দেওয়া।

শিশুর স্তন্য-দুগ্ধ পানে অনিচ্ছা-প্রকাশের আরেকটি কারণ হলো—প্রসূতির স্তন্য-দুগ্ধের স্বল্পতা বা অভাব। এ অসুবিধা থেকে রেহাই পেতে হলে প্রসূতির উচিত প্রতিবার শিশুকে স্তন্য-দুগ্ধদানের ঠিক আগেই, হাতের আঙুলের সাহায্যে তাঁর স্তন টিপে দুধের ধারা যথাযথভাবে প্রবাহিত ও নিষ্কাশিত হচ্ছে কিনা, দেখে নেওয়া। কারণ, কোনো কারণে প্রসূতির স্তনে যদি দুধের স্বাভাবিক ধারা প্রবাহের ব্যতিক্রম বা অভাব ঘটে, তাহলে অনর্থক স্তন্যদান করে লাভ নেই।

অনেক সময় আবার শারীরিক গোলযোগের ফলে শিশুর মুখের ভিতরে ঘা হলেও, নবজাতকের স্তন্য-পানে অভিরুচি থাকে না। এ উপসর্গ নির্ণয়ের জন্য—প্রথমেই শিশুর ঠোঁট ও মুখের ভিতরেরঅংশ বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখা দরকার যে সেখানে কোনো শাদা বা লাল রঙের দাগ কিম্বা ঘা ফুটে বেরিয়েছে কিনা! শিশুর মুখে ঘা দেখা দিলেই অভিজ্ঞা ধাত্রী বা বিচক্ষণ চিকিৎসকের পরামর্শানুসারে কোষ্ঠসাফের জোলাপ-হিসাবে তাকে এক চামচ বিশুদ্ধ রেড়ির তেল বা 'ক্যাষ্টর-অয়েল' (Castor oil) খাইয়ে দেওয়া এবং ঘায়ের জায়গাতে অল্প একটু 'বোরো-গ্লিসারিন' (Boro-glycerine) সোহাগার খৈ আর মধু কিম্বা গ্লিসারিন মিশিয়ে প্রলেপ লাগানো আবশ্যক।

তাছাড়া অনেক সময় খুব বেশী সর্দ্দি-কাশি হলেও, নবজাত-শিশুর স্তন্যপানে বীতরাগ জন্মায়। এ লক্ষণ দেখলে সঙ্গে সঙ্গেই শিশুর নাক, মুখ, গলা ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখুন—সেখানে কোনো সর্দ্দি, কফ্ প্রভৃতি জমাট বেঁধে রয়েছে কিনা। সর্দ্দি জমে শিশুর নাক ময়লা ও বন্ধ হবার দাখিল হলে, অবিলম্বে বিশুদ্ধ জলপাই-তেলে (Pure olive oil) এক টুকরো পরিষ্কার তুলো ভিজিয়ে, সেই ভিজা-তুলোটির সাহায্যে সযত্নে-সাবধানে শিশুর নাকের নালি প্রভৃতি অংশ সাফ্-সুতরো করে দিলে রীতিমত উপকার হবে।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিপূরক-খাদ্যের উপর বেশী ঝোঁক থাকার ফলে, অনেক শিশুর আবার স্তন্য-পানের বিশেষ আগ্রহ থাকে না। তার কারণ, সম্ভবতঃ, শিশুকে বিশেষ ধরণের যে পরিপূরক-খাদ্য দান করা হয়ে থাকে সেটির স্বাদ মাতৃ দুগ্ধের চেয়েও অপেক্ষাকৃত অধিক মিষ্ট ও মধুর লাগে বলেই। তাছাড়া আরো দেখা যায় যে অনেক সময় দুধের বোতলের 'চুষী' বা 'বোঁটা'র মুখাগ্র-ভাগের ছিদ্র প্রসূতির স্তনের 'বোঁটা' বা 'চুষীর' চাইতে অপেক্ষাকৃত বড়-ছাঁদের হওয়ার দরুণ, শিশুরা সহজেই অল্প-চোষণের ফলে অধিক পরিমাণে দুধপান করতে পারে বলেই ক্রমশঃ স্তন্যপানে বীতরাগ হয়ে ওঠে। অথবা, দুধের বোতলের মাধ্যমে কৃত্রিম পরিপূরক-খাদ্য গ্রহণের সময়, বেশী পরিমাণে আহারের ফলে, শিশুর পেট এমনই ভরে থাকে যে স্তন্য-পানের জন্য তার আর বিশেষ কোনো আগ্রহ অভিরুচি থাকে না।

অনেক সময় প্রসূতির অন্যমনস্কতা বা অনবধানতার ফলে, স্তন্য-পানকালে, মলমূত্রাদি ত্যাগ করার জন্য শিশুরা রীতিমত ছটফট করে এবং ঠিকমতো দুধ খাওয়ার আগ্রহও প্রকাশ করে না। সুতরাং এ অসুবিধা যাতে না ঘটে, সেজন্য স্তন্যদানকালে প্রত্যেক প্রসূতিরই উচিত—দুগ্ধ-পানরত-শিশুকে মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে দেখা।

কোনো কোনো সময় আবার দেখা যায় যে 'চুষীটি' মুখের মধ্যে ঠিকমতো আয়ত্তাধীন বা যথাস্থানে না থাকার ফলে, দুগ্ধপানের অসুবিধা ঘটে বলেই শিশুরা অনেক ক্ষেত্রে স্তন্যপানে অনিচ্ছুক থাকে। তাছাড়া কখনো কখনো আবার এমন দৃষ্টান্তও নজরে পড়ে যে জন্মগত গঠন-বৈষম্যের দোষে কোনো কোনো শিশুর 'জিহ্বাটি নীচের চোয়ালের

সঙ্গে জোড়া লেগে থাকায় (Tongue-Tie) ও স্বাভাবিকভাবে নাড়াচাড়া করার অসুবিধার কারণে, সুষ্ঠু-ভঙ্গীতে স্তন্যপান করতে পারে না। এদেরই মতো জন্মগত ত্রুটির যে সব শিশুর তালু বা ঠোঁট বিভক্ত বা কাটা (Hare-lip) থাকে, স্বাভাবিক ভঙ্গীতে স্তন্যপান করতে তাদের অনেক অসুবিধা ঘটে। তবে এমন দৃষ্টান্ত অবশ্য হামেশাই চোখে পড়ে না এবং আধুনিক শল্যকারবিদ্ চিকিৎসকদের উন্নত-কর্ম্মদক্ষতার দৌলতে আজকাল অনেক ক্ষেত্রেই এ সব জন্মগত গঠনবৈষম্য ও ত্রুটি বিচ্যুতির আমূল সংস্কার-সাধনে এবং নিরাময়ের নানা রকম অভিনব উপায় আর পন্থা উদ্ভাবনা প্রসারের ফলে, মানব জাতির সবিশেষ উপকার সাধিত হয়েছে।

প্রসূতির স্তন্য দুগ্ধ খুব গাঢ় ঘন ও খাদ্যোপাদানের প্রাচুর্য্যে ভরপুর থাকলে, সে দুধ সামান্য পরিমাণে পান করলেই শিশুর পেট অল্পেই ভরে এবং সে বেশ সুস্থ সবল এবং খুশ মেজাজেই থাকে। তবে এ ধরণের দুধে শিশু সুস্থ সবল হয়ে উঠলেও, বেশীক্ষণ স্তন্যপান করানো বিধেয় নয়।

প্রত্যেক প্রসূতিরই উচিত—অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও ধাত্রীর পরামর্শানুযায়ী, তাঁর শিশুর বয়স, স্বাস্থ্য এবং ওজন অনুসারে স্তন্য দুগ্ধ এবং উপযুক্ত খাদ্যপ্রাণ উপাদান সম্বলিত সুষ্ঠু ও যথোচিত পরিপূরক খাদ্যের সুবন্দোবস্ত করা—তাহলেই দিনে দিনে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুও যে ক্রমশঃ সুস্থ সবল সুন্দর ও আনন্দোচ্ছল হয়ে উঠবে—সে কথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। [ক্রমশঃ

সুপর্ণা দেবী

প্রসাধনের আরেকটি নাম স্বাস্থ্যচর্চ্চা…এবং স্বাস্থ্যচর্চ্চার উদ্দেশ্যই হলো—নর নারী নির্বিশেষে প্রত্যেকেরই দেহ ও ত্বক সুস্থ, সবল, নীরোগ আর সুন্দর রাখা। জীবনে সুখে স্বচ্ছন্দে শান্তিতে বেঁচে থাকতে হলে, এটি তাঁদের সকলেরই নিত্যনৈমিত্তিক এবং একান্ত-পালনীয় কর্ত্তব্য। কাজেই স্বাস্থ্যকে বরাবর সুস্থ সবল, নীরোগ ও সুন্দর রাখার জন্য নিয়মিতভাবে নিত্য যেমন আহার, নিদ্রা, বিশ্রামের প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন প্রসাধন চর্চ্চারও। কারণ, প্রসাধনের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে—নারী-পুরুষের সৌন্দর্য্য বা রূপ-চর্চ্চার চিরাচরিত রীতিটি। প্রসাধনের সহায়তায় রূপ-চর্চ্চা—আধুনিক কালের রীতি নয়…এ রীতির প্রচলন পৃথিবীর বুকে মানব সভ্যতা বিকাশের আদিম যুগ থেকেই। তবে যুগে যুগে কালে-কালে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মানব সমাজে চিরা-চরিত এই রূপ প্রসাধননীতির উত্তরোত্তর যেমন উন্নতি ঘটেছে, তেমনি ক্রমান্বয়ে বহুবিধ প্রকরণেরও প্রসার প্রচলন হয়েছে। প্রাচীনকালে আমাদের দেশে যে সব প্রসাধন প্রকরণের প্রচলন ছিল, সেগুলির অন্যতম হলো—সুগন্ধি তৈল, অগুরু, চন্দন, গন্ধপুষ্পের পরাগ-কেশর, লোধ্র-রেণু, অলক্তক, নয়ন-কাজল, কর্পূর, ধূপ প্রভৃতি…তারপর মুসলমান আমলে ব্যবহার সুরু হলো—গন্ধপুষ্পের আতর, গোলাপ নির্য্যাস, কেওড়া, সুর্ম্মা, মেহেদী প্রভৃতি বিবিধ প্রকরণ…ইংরাজ শাসনকালে ক্রমশঃ প্রচলিত হলো—সাবান, পাউডার, ইউ-দি-কোলো, সেন্ট, স্নো, ক্রিম, রুজ,

লিপ্‌ষ্টিক, ম্যাস্‌কারা প্রভৃতি রূপচর্চ্চার নানা রকম উপকরণ। তবে সেকালে আমাদের দেশে পুরুষ ও নারী নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকেরই প্রসাধন বা রূপচর্চ্চা ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ত্তব্য এবং নিয়মিত সুষ্ঠু ও রুচিসম্মত অঙ্গ-প্রসাধনের ফলেই, তখনকার লোকসমাজে একালের মতো চর্ম্মরোগের এত বেশী প্রাদুর্ভাব ছিল না···বরং যথোচিত প্রসাধন ব্যবস্থাদি অনুশীলনের দৌলতে সেকালের অধিকাংশ নর-নারীরই স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য অক্ষয়-অটুট ও লাবণ্যোজ্জ্বল থাকতো সুদীর্ঘকাল। অধুনা চটকদার বিজ্ঞাপনের মোহে ভুলে অনেক সময় গুণাগুণের কথা বিবেচনা না করেই আমরা বাজার থেকে ভাল-মন্দ নানা রকম প্রসাধন সামগ্রী কিনে এনে হামেশাই ব্যবহার এবং রূপচর্চ্চা করি। তার ফলে, প্রায়ই অনেকের দেহে ও মুখে নানা রকম চর্ম্মরোগের উপসর্গ দেখা দেয়। এ সব উপসর্গের উপদ্রব থেকে দেহ-ত্বকের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য রক্ষা করতে হলে সযত্নে বিজ্ঞানসম্মত সুষ্ঠু বিধান অনুসারে সরেস ধরণের প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করাই উচিত।

কৈশোর-যৌবনের প্রারম্ভে নারী-পুরুষের মুখশ্রীতে অনেক সময় ছোট ছোট ফোড়ার মতো ছাঁদের 'Acne' বা 'ব্রণের' প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এগুলি হলো আসলে—বিশেষ এক ধরণের চর্ম্মরোগ। এমনি ধরণের 'ব্রণ' কেন হয়, আপাততঃ, তারই কথা বলি।

মানুষের দেহ-চর্ম্মে 'সিবেসাস্‌ গ্লাণ্ডিস্‌' (Sebaceous glands) নামে খুব ছোট-ছোট এক-রকম চর্ব্বিযুক্ত 'গ্রন্থি-কোষ' আছে। সেই গ্রন্থি-কোষ থেকে 'সিবাম্‌' বা চর্ব্বি-জাতীয় যে তৈলাক্ত-পদার্থ নিঃসারিত হয়, তার নিঃসরণ-পথের সঙ্গে দেহের লোমকূপগুলির ঘনিষ্ঠ-সংযোগ রয়েছে। কাজেই কোনো কারণে যদি এই 'সিবেসাস্‌-গ্ল্যাণ্ডের' স্বাভাবিক-ক্রিয়াকর্ম্মের কোনো গোলযোগ বা লোমকূপ-পথে চর্ব্বি-জাতীয় 'সিবাম্‌' পদার্থ নিঃসরণের কোনো ব্যতিক্রম ঘটে, তাহলেই দেহের যে সব অংশে 'সিবেসাস্‌-গ্ল্যাণ্ডের' প্রাচুর্য্য আছে, সেই সব জায়গাতেই সচরাচর 'ব্রণ', বা 'Acne' দেখা দেয়। আধুনিক শরীরতত্ত্ববিশারদেরা পরীক্ষান্তে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে মানুষের দেহে 'সিবেসাস্‌-গ্ল্যাণ্ডের' প্রাচুর্য্য সবচেয়ে বেশী থাকে—মুখে, বুকে এবং পিঠের উপরভাগে। সেইজন্ত মানুষের দেহের এই সব স্থান-বিশেষে সচরাচর ব্রণ, ফোড়া প্রভৃতির আবির্ভাব ঘটে।

'সিবেসাস্‌-গ্ল্যাণ্ডের' গোলযোগ ঘটে নানান কারণে··· স্থানাভাবের জন্য তার বিশদ-বিবরণ দেওয়া আপাততঃ সম্ভব নয়। তবে সচরাচর মানুষের মুখে ও দেহে, ব্রণ, ফোড়া প্রভৃতির আবির্ভাব, যে সব উপায়ে রোধ করা যায়, প্রসঙ্গক্রমে, তারই মোটামুটি কয়েকটি হদিশ দিয়ে রাখছি।

ব্রণ, ফোড়া প্রভৃতির উপদ্রব থেকে দেহ এবং মুখের শ্রীসৌন্দর্য্য অটুট অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য, প্রথমতঃ দরকার—নিত্য-নিয়মিতভাবে এবং স্বাস্থ্যসম্মত প্রথায় মুখশ্রী-পরিচর্য্যা, অঙ্গ-মর্দ্দন, এবং স্নানাদির ব্যবস্থা করা। তাছাড়া যথাযথ খাদ্য গ্রহণের দিকে সবিশেষ দৃষ্টিদান করাও একান্ত আবশ্যক। কারণ, খাদ্যবস্তুর মধ্যে প্রয়োজনানুযায়ী খাদ্যপ্রাণের অভাব হলেই, সচরাচর 'সিবেসাস্‌ গ্ল্যাণ্ডের' স্বাভাবিক ক্রিয়ার গোলযোগ ঘটে। এই কারণেই, সচরাচর যে সব নারী-পুরুষরা মুখে বা দেহে কুৎসিত ব্রণ এবং ফোড়ার উপদ্রব ভোগ করেন, বিচক্ষণ চিকিৎসক ও রূপচর্চ্চা-বিশারদেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, সেই সব ভুক্তভোগীদের খাদ্য-তালিকা থেকে চর্ব্বি-জাতীয় খাদ্যের প্রাচুর্য্য কমিয়ে বা সাময়িকভাবে বাদ দিয়ে যথোচিত পরিমাণে 'এ' জাতীয় খাদ্যপ্রাণ-যুক্ত (Vitamin 'A', খাদ্যের ব্যবস্থা করে থাকেন। ব্রণের আধিক্য হলে, খাদ্য-তালিকা থেকে 'চর্ব্বি' (Fat) ও 'শর্করা' (Sugar) জাতীয় উপাদান যথাসম্ভব কমিয়ে দেওয়া এবং যে সব খাদ্যে 'এ' খাদ্যপ্রাণের (Vitamin 'A') প্রাচুর্য্য আছে, সেগুলি গ্রহণ করা উচিত।'

খাদ্য-তালিকার দিকে সজাগ-দৃষ্টিদান ছাড়াও, নিত্য-নিয়মিত কোষ্ঠ-সাফ্‌ রাখাও একান্ত আবশ্যক। কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখার জন্য নিয়মিতভাবে প্রত্যহ অন্ততঃ পক্ষে আট-দশ গেলাস জল পান করা দরকার। তাছাড়া নিত্য-নিয়মিত হাল্‌কা-ধরণের সহজ-সরল পেটের পেশীর ব্যায়াম অভ্যাসেও কোষ্ঠকাঠিন্যের উপসর্গ থেকে রেহাই মিলবে। প্রসঙ্গক্রমে, কোষ্ঠ-পরিষ্কার রাখার উপযোগী কয়েকটি ঘরোয়া প্রক্রিয়ার কথা জানিয়ে রাখি। প্রথম উপায় হলো—প্রত্যহ প্রাতে ঘুম থেকে উঠে এক-পেয়ালা

ত্রিফলার জল নিয়মিতভাবে পান করা। ত্রিফলার জল বানানোর জন্য, প্রতি রাত্রে ঘুমুতে যাবার আগে এক পেয়ালা জলে বয়ড়া, আমলকী এবং দু' তিনটি হরিতকী ভিজিয়ে রেখে পরদিন প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের পর, সেই মিশ্রণটি পান করলেই সহজেই কোষ্ঠ-সাফ হবে। দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটি হলো—চায়ের চামচের ১ থেকে ৩ চামচ পরিমাণ হরিতকী বা শ্রীফল চূর্ণ এবং চায়ের চামচের ২ থেকে ৬ চামচ পরিমাণ চিনি নিয়ে এক গেলাস ঠাণ্ডা বা গরম জলের সঙ্গে মিশিয়ে প্রত্যহ সকালে শয্যাত্যাগের পর পান করলে কোষ্ঠকাঠিন্যের দুর্ভোগ দূর হবে সহজেই। তৃতীয় উপায়টি আরো সহজ-সরল ধরণের…অর্থাৎ, নিয়মিতভাবে প্রত্যহ প্রাতে ঘুম থেকে উঠে এক গেলাস গরম জলে পুরো একটি পাতিলেবুর রস মিশিয়ে পান করা। এ সব ঘরোয়া-প্রক্রিয়ার যে কোনোটির সহায়তায় কোষ্ঠ নিয়মিত পরিষ্কার রাখা সম্ভব। আজকাল বেশীর ভাগ সংসারেই নানা রকম জোলাপের বড়ি ও ঔষধাদি সেবন করে কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখার রেওয়াজ হয়েছে…এ সম্বন্ধে বিশদ-আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে মোটামুটিভাবে বলা চলে যে বহুবিজ্ঞাপিত এ সব জোলাপের বড়ি ও ঔষধাদি সেবনে উপকারের চেয়ে অপকারই ঘটতে দেখা যায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই। এ সবের পরিবর্তে উপরোক্ত ঘরোয়া-প্রক্রিয়াগুলি অনুসরণ করলে বরং ফল আরো ভালো পাওয়া যায় এবং ব্যয়বাহুল্যের সম্ভাবনা থাকে না।

অনেকের বদ-অভ্যাস আছে মুখের ব্রণ খোঁটা আর টেপা। এ অভ্যাস রীতিমত ক্ষতিকারক, এমন কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রাণ সংশয়ের কারণও হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, হাতের নখে অনেক সময় নানা রকম রোগের জীবাণু জমে, ব্রণ খোঁটার ফলে, অসাবধানতার ফলে, ক্ষত স্থানটি এই সব জীবাণুর সংস্পর্শে এসে সহজেই বিষাক্ত হয়ে উঠে। কাজেই এ কুঅভ্যাস সর্বতোভাবে বর্জন করাই উচিত। তবে ব্রণের আধিক্য দীর্ঘস্থায়ী এবং কষ্টদায়ক হলে অচিরেই সুচিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া একান্ত আবশ্যক।

পুঁতির কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

ছোট বেলায় খেলাচ্ছলে রঙীণ পুঁতি গেঁথে ছোট-বড় নানান্ ছাঁদের বিচিত্র-সৌখিন মালা রচনা করেননি, এমন মেয়ে আমাদের দেশে খুবই কম দেখা যায়। তবে রঙ-বেরঙের পুঁতির সাহায্যে শুধু মালা-গাঁথাই নয়, নানা ধরণের বিচিত্র-অভিনব 'পর্দা' 'টেবিল-ম্যাট' (Table mat) 'দেয়াল-চিত্র' (Wall-decoration) মহিলাদের ব্যব-
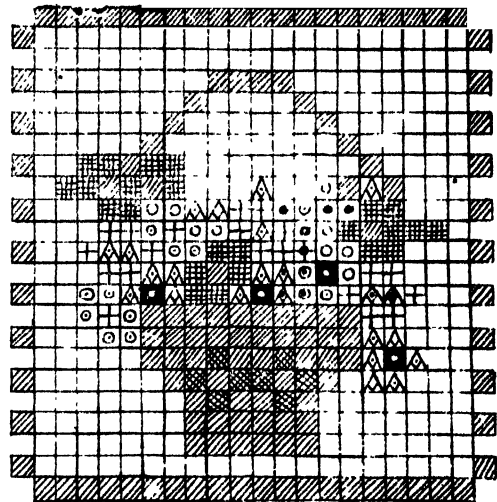
(১) নানা-রঙের পুঁতি সাজিয়ে নক্সা-বুননের ধারা

ব্যবহারোপযোগী 'হাত-ব্যাগ', 'ভ্যানিটি-কেস্' (Vanity-case) প্রভৃতি আরো যে সব সৌখিন-সুন্দর কারুশিল্প-সামগ্রী রচনা করা যায়, আপাততঃ, তারই কয়েকটির মোটামুটি হদিশ দিই।

প্রথমেই বলি—সহজ-সরল উপায়ে রঙ-বেরঙের পুঁতি গেঁথে অভিনব-ধরণে ঘর-সাজানোর উপযোগী দরজা, জানলার 'পর্দা, দেয়াল-চিত্র' কিম্বা 'টেবিল-ম্যাট' প্রভৃতি সৌখিন-সুন্দর কারুশিল্প-সামগ্রী রচনার কথা।

রঙ-বেরঙের পুঁতি গেঁথে, ৬৯৭ পৃষ্ঠার ১নং ছবিতে দেখানো নক্সা নমুনার (Decorative-pattern) ছাঁদে 'ফুলের সাজির' প্রতিলিপিটিকে 'পর্দা' 'দেয়াল চিত্র' অথবা 'টেবিল-ম্যাটের' উপরে রূপদান করবার জন্ম চাই—নীচের ২নং ছবিতে দু'দিক ফাঁপা 'নলের' (Hollow-pipe) মতো ছোট-বড় প্রয়োজনানুযায়ী আকারের নানা-রঙের কতকগুলি পুঁতি, শক্ত মজবুত এক বাণ্ডিল 'টোন্-সুতো' (Twine chord), গোটা দুয়েক কার্পেট-বোনার বা খাতা সেলাইয়ের উপযোগী মোটা ছুঁচ এবং একখানি কাঁচি।
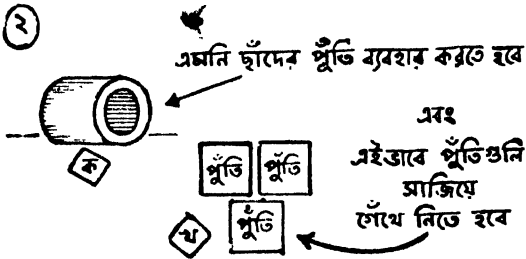
বিভিন্ন রঙের পুঁতির সাহায্যে সারি দিয়ে গাঁথা এ-ধরণের 'পর্দা' 'টেবিল-ম্যাট' ও 'দেয়াল-চিত্র' রচনা করা এমন কিছু কঠিনসাধ্য বা ব্যয়বহুল কাজ নয়। সযত্নে চেষ্টা করলে অল্পদিনেই শিক্ষার্থীরা অনায়াসে নিজের হাতে এ-ধরণের সৌখিন-সুন্দর বিবিধ কারুশিল্প সামগ্রী বানাতে পারবেন। তাছাড়া উপযোগিতার দিক থেকেও পুঁতির তৈরী অভিনব ধরণের 'পর্দা' টেবিল ম্যাটের মস্ত গুণ, জানলা দরজায় পুঁতির এই পর্দা ব্যবহার করলে, আবরু-রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে গৃহ সজ্জার শোভা যেমন শ্রী সৌষ্ঠবে অপরূপ হয়ে উঠবে, তেমনি গরমের দিনে রোদের তাপ থেকেও নিস্তার এবং আরাম পাবেন অনেকখানি। টেবিলে পুঁতির তৈরী এমনি 'ঢাকা' বা 'ম্যাট্' (mat) বিছিয়ে, তার উপর গরম পেয়ালা, কেৎলী, প্লেট প্রভৃতি রাখলেও টেবিল কিম্বা 'ম্যাটের' কোনো ক্ষতি হবে না। উপরন্তু, খাওয়াদাওয়ার সময়েও দিব্যি মনোরম সৌখিন পরিবেশ সৃষ্টি করে তুলবে। পুঁতির তৈরী এমনি ধরণের নক্সাদার দেয়াল চিত্রও সৌখিন সুন্দর অভিনব উপায়ে গৃহ সজ্জার পক্ষেও যে বিশেষ উপযোগী হবে, সে কথা নিঃসন্দেহেই বলা যেতে পারে। কাজেই নিছক সৌখিন খেয়াল মেটানোর উপায় ছাড়াও, আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক-জীবনেও পুঁতির তৈরী এ সব বিচিত্র কারুশিল্প সামগ্রীর যে বিশেষ মূল্য আছে, সে কথা অস্বীকার করা চলে না। সুতরাং ঘরসংসারের নিত্যনৈমিত্তিক কাজকর্মের অবসরে অল্প আয়াসে ও সামান্য ব্যয়ে এই ধরণের কারুশিল্প সামগ্রী রচনার ফলে, শিক্ষার্থীরা শুধু যে মানসিক তৃপ্তিলাভ করবেন তাই নয়, প্রয়োজনবোধে নিজেদের হাতে তৈরী এমনি ধরণের বিভিন্ন অভিনব কারুশিল্প সামগ্রী ভালো দামে বাজারে বিক্রী করতে পাঠিয়েও আজকালকার এই মাগ্যিগণ্ডার দিনে অনায়াসেই তাঁদের বৈষয়িক সমস্যা মেটানোরও সুযোগ পাবেন অনেকখানি।

প্রসঙ্গক্রমে, আপাততঃ পুঁতির 'টেবিল ম্যাট' বানানোর কলা কৌশলের কথা বলি।

ধরুন সারি দিয়ে রঙ বেরঙের পুঁতি গেঁথে উপরের ১নং ছবিতে দেখানো ফুলের সাজির নক্সানমুনার ছাঁদে বিচিত্র সৌখিন যে 'টেবিল ম্যাট' বানানো হবে, সেটি লম্বায় চওড়ায় পাঁচ ইঞ্চি মাপের। উপরের ১নং ছবিতে ফুলের সাজির নক্সা নমুনাটি দেখলেই সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারবেন যে বিভিন্ন বর্ণের পুঁতিগুলি সারসার গাঁথা রয়েছে—শুধু প্রয়োজনমতো পুঁতির রঙ বদলানো হয়েছে মাঝে মাঝে। তাছাড়া লক্ষ্য করলেই আরো বুঝতে পারবেন যে পুঁতিগুলি গাঁথাও হয়েছে একটু রকমারি ভঙ্গীতে—অর্থাৎ, মালার মতো বরাবর একই লাইনে পুঁতিগুলি গাঁথা হয়নি। 'টেবিল ম্যাট'টি আগাগোড়া রচিত হয়েছে—একটি পুঁতির মাথায় পাশাপাশি দুটি পুঁতি, সে দুটি পুঁতির মাথায় পুনরায় একটি পুঁতি এবং সেই একটির মাথায় আবার পাশাপাশি দুটি পুঁতি—এমনি পর্য্যায়ে বরাবর পুঁতির পর পুঁতি সাজিয়ে গেঁথে। শুধু ফুলের সাজির নক্সা নমুনার উপরের আর

নীচের প্রান্তসীমার পাড় দুটি রচনার জন্য পুঁতির পর পুঁতি সমান সোজা এবং মালা গাঁথার মতো ভঙ্গীতে বোনা হয়েছে। এভাবে পুঁতি গাথার পদ্ধতিটি আরো সুস্পষ্ট বুঝতে পারবেন—নীচের ৩নং ছবিটি দেখলেই।

শিক্ষার্থীদের কাজের সুবিধার জন্য আপাততঃ, সহজ সরল ছাঁদের ফুলের সাজির নক্সা নমুনাটি দেওয়া হলো। পুঁতির কারুশিল্পের কলা কৌশলগুলি কিছুদিন সযত্নে অভ্যাস করলেই তাঁরা অনায়াসেই নিজেদের পছন্দমতো যে কোনো নক্সা তুলে প্রয়োজনানুযায়ী ছোট বড় যে কোনো মাপেই এ-ধরণের 'টেবিল ম্যাট' 'পর্দা' 'দেয়াল চিত্র' প্রভৃতি বিবিধ সৌখিন সুন্দর অভিনব সামগ্রী তৈরী করতে পারবেন এবং তার জন্য কোন রঙের এবং কত পুঁতি লাগবে, ব্যক্তিগত-অভিজ্ঞতালাভের ফলে, তার হিসাবনিকাশ করাও আদৌ দুঃসাধ্য ঠেকবে না।

এবারে ফুলের সাজির যে নক্সা-নমুনাটি দেখানো হয়েছে, সেটির প্রতিলিপি 'টেবিল ম্যাটে' হুবহু ছাঁদে ফুটিয়ে তোলার জন্য কোথায় এবং কিভাবে কোন রঙের পর কোন রঙের পুঁতি গেঁথে বসাতে হবে, উপরের ১নং ছবিটিতে সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ মিলবে। তবে পুঁতির রঙ সম্পর্কে ধরা-বাঁধা নিয়ম নেই—শিক্ষার্থী-শিল্পীর ব্যক্তিগত রুচি এবং পছন্দ অনুসারে আগাগোড়া মানান সই ধরণে প্রয়োজনানুরূপ ব্যবস্থা করা চলবে।

উপরের নক্সা-নমুনামতো 'টেবিল-ম্যাট্' রচনার জন্য, পুঁতি গাঁথা সুরু করবেন বাঁ-দিক থেকে এবং লম্বালম্বি ভাবে। তাছাড়া নক্সার নীচের দিক থেকে পুঁতি গাঁথা সুরু করে উপরে গিয়ে লাইন শেষ করতে হবে। এ কাজের জন্য, এই হলো মোটামুটি নিয়ম। তবে স্থানাভাবের কারণে, এবারে বিশদ-আলোচনা সম্ভব হয়ে উঠলো না...তাই আগামী সংখ্যায় এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা দেবার বাসনা রইলো। [ক্রমশঃ

এমব্রয়ডারী সূচীশিল্পের নক্সা-নমুনা

সুমনা মৈত্র

'এমব্রয়ডারী' মানেই যে নিতান্ত জটিল ধরণের সূচী-শিল্প এমন ধারণা রাখা ঠিক নয়। অতি অল্প-আয়াসেও যে মনোরম-ছাঁদে 'এমব্রয়ডারী' সূচীশিল্পের কাজ করা যায়, এবারে তারই একটি সহজ-সরল নক্সা-নমুনা দেওয়া হলো। 'এমব্রয়ডারী' সূচীশিল্পের কাজ করে ঘরের পর্দা, টেবিল-ক্লথ, বিছানা ঢাকার চাদর, বালিশের ওয়াড়, সোফা-কৌচ-চেয়ারের আবরণী, কেৎলী-ঢাকা (Tea Cosy) খানা-টেবিলে পাতবার ন্যাপ্‌কিন্ প্রভৃতি ছাড়াও, মেয়েদের সৌখিন স্কার্ফ ও শাড়ীর পাড়, পেটিকোটের কিনারা ব্লাউসের হাতা ও পিঠের অংশ, ছোট ছেলেমেয়েদের ফ্রক, রম্পার-স্যুট, নিকারবোকার, শার্ট, জ্যাকেট প্রভৃতি নানান্ সামগ্রী অলঙ্করণের জন্য আলোচ্য-নক্সাটি ফুটিয়ে

তুলতে সময় বেশী লাগবে না এবং পরিশ্রমও কম হবে, অথচ সযত্নে সেলাই করতে পারলে, এমব্রয়ডারী-করা
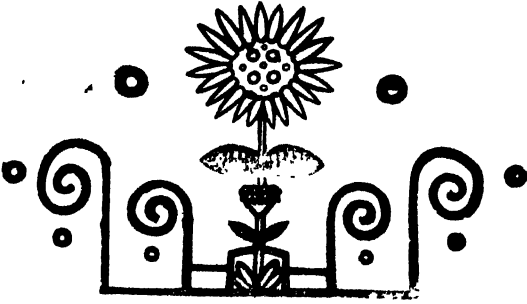
নক্সাদার জিনিষটি দেখে সকলেই শিল্পীর হাতের কাজের সবিশেষ সুখ্যাতি করবেন।

এমব্রয়ডারী-সূচীশিল্পের কাজ করে উপরের নক্সা-নমুনাটিকে রূপদানের জন্য—খদ্দর, লিনেন, ম্যাট্ জাতীয় বেশ মোটা এবং ফাঁক-ফাঁক বুননের কাপড়ই বিশেষ উপযোগী হবে। কিন্তু তাই বলে মোটা ধরণের ছাড়া মিহি-ছাঁদের অন্য কোনো কাপড়ের উপর যে এমব্রয়ডারী সেলাই দিয়ে এ নক্সাটি ফুটিয়ে তোলা যাবে না—এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। সেলাইয়ের গুণাগুণ আসলে নির্ভর করে, সূচী-শিল্পীর নিখুঁত পরিপাটি হাতের কাজ, আর যথাযথ ধরণের রঙীণ সুতো-কাপড় প্রভৃতি বেছে নেওয়ার রুচি ও পদ্ধতির উপর।

এমব্রয়ডারী-সূচীশিল্পের কাজ করে উপরের নক্সাটিকে সুন্দর-ছাঁদে ফুটিয়ে তুলতে হলে, কাপড়ের জমির সঙ্গে মানানসই দেখায়, এমনি বিভিন্ন রঙের পাকা-মজবুত রেশমী অথবা পশমী সুতো ব্যবহার করা ভালো। তবে এবারের নক্সাটি রচনার জন্য বেশ মোটা সুতো ব্যবহার করাই ভালো। অন্যথা সাধারণ সুতো দু' ফেরতা করে নিলেও চলবে। ধরে নেওয়া যাক্, উপরের নক্সাটি এমব্রয়ডারী করবার জন্য যে কাপড় বেছে নেওয়া হয়েছে, সেটির রঙ—ফিকে-গোলাপী (Pink) ধরণের। সুতরাং ফিকে গোলাপী রঙের জমিওয়ালা কাপড়ের উপরে মানানসই দেখানোর জন্য বেছে নিতে হবে নিম্নলিখিত বিভিন্ন বর্ণের রেশমী অথবা পশমী, সুতোর হালি। নক্সা-নমুনার মাঝখানে যে ফুলটি রয়েছে, সেটির পাপড়িগুলি বানাতে হবে সূর্য্যমুখী-ফুলের মতো হাল্কা-হলুদ রঙের সুতোয় এবং ফুলের ভিতরকার 'পরাগ-চক্রটি' রচনা করবেন ফিকে বাদামী রঙের সুতো দিয়ে। 'পরাগ-চক্রের ভিতরের ছোট ছোট গোলাকার অংশগুলির জন্য ফিকে কমলা রঙের সুতো ব্যবহার করতে হবে। ফুলের ডাঁটাটির জন্য বেছে নেবেন—গাঢ় সবুজ রঙের সুতো। বড়-পাতাগুলি রচনা করতে হবে—ফিকে-সবুজ রঙের সুতো দিয়ে...পাতার শিরা ও কিনারার জন্য ব্যবহার করবেন—গাঢ়-সবুজ রঙের সুতো। কুঁড়ির উপরকার ছোট ছোট গোলাকার অংশ রচনা করতে হবে—হাল্কা হলুদ রঙের সুতোয়। কুঁড়ির নীচের দিকের অংশ বানাবেন—ফিকে-সবুজ রঙের সুতোর ফোঁড় তুলে। কুঁড়ির নীচে ছোট-পাতা দুটি এমব্রয়ডারী করতে হবে—গাঢ়-সবুজ রঙের সুতোয় এবং ঐ ছোট-পাতা দুটির নীচে বাক্সের ছাঁদে যে নক্সাগুলি রচিত রয়েছে, সেগুলিও বানাবেন—গাঢ়-সবুজ রঙের সুতো দিয়ে। চৌকোণা বাক্সের ভিতরে ঘাসের ডগা কয়েকটি রচনা করবেন ফিকে-সবুজ রঙের সুতো দিয়ে এবং সবার নীচে নক্সাতে যে জমির রেখা ও দুই কিনারায় একজোড়া আলঙ্কারিক চিহ্ন দেখানো হয়েছে, সেগুলিকে ফুটিয়ে তুলতে হবে ঘন নীল অথবা গাঢ় লাল কিম্বা গাঢ় সবুজ রঙের সুতোর সেলাই দিয়ে। এই হলো, সুতোর রঙ বাছাই করে নেওয়ার মোটামুটি হদিশ।

এবারে বলি, কাপড়ের বুকে উপরের নক্সাটিকে এমব্রয়ডারী কাজ করে পরিপাটি সুন্দর ছাঁদে ফুটিয়ে তুলতে হলে, কোথায় কোন জিনিষটিতে কি ধরণের সেলাই দেওয়া দরকার—তারই মোটামুটি পদ্ধতির কথা।

ফুলটিকে রচনা করতে হবে আগাগোড়া 'লেজি-ডেজি-ষ্টিচ্' (Lazy-Daisy Stitch) সেলাই দিয়ে...ফুলের 'পরাগচক্রের জন্য—'ফ্রেঞ্চ-নট্' (French Knot) সূচীশিল্প পদ্ধতি অনুসরণ করবেন। পাতাগুলি সাধারণ 'ষ্টিচ' সেলাইয়ের ফোঁড় তুলে এবং পাতার শিরগুলিকে 'বাটন্-হোল্ ষ্টিচ্ (Button-hole Stitch) পদ্ধতিতে রচনা করতে হবে। ফুলের বোঁটা এবং জমির রেখা রচনার জন্য 'ষ্ট্রোক্-ষ্টিচ্' (Stroke-stitch) পদ্ধতিতে সেলাই করবেন। কুঁড়ির নীচেকার ছোট-পাতা দুটি এবং ঘাসের কচি ডগাগুলি বানানোর জন্য—'লেজি-ডেজি ষ্টিচ্' [Lazy-Daisy stitch] পদ্ধতিতে সেলাইয়ের কাজ করা প্রয়োজন।

এই হলো—এবারের নক্সা-নমুনাটিকে এমব্রয়ডারী করার মোটামুটি পদ্ধতি।

বারান্তরে, এমনি ধরণের আরো কয়েকটি সহজ সরল এমব্রয়ডারী-সূচীশিল্পের নক্সা-নমুনার পরিচয় দেবার চেষ্টা করবো।

—

সুধীরা হালদার

সন্দেশ আজকাল দুষ্প্রাপ্য·· তাই এবারে প্রিয়জনদের পাতে সাদরে পরিবেশনের উপযোগী বিচিত্র-মুখরোচক নতুন-ধরণের একটি ভারতীয় খাবার রান্নার কথা বলছি। অভিনব-সুস্বাদু মিষ্টান্ন-জাতীয় এই খাবারটির নাম—'ছানার পুরি'।

'ছানার পুরি' বানানোর জন্য যে সব উপকরণ প্রয়োজন, গোড়াতেই তার মোটামুটি ফর্দ্দ দিয়ে রাখি। অর্থাৎ, এ খাবারটি রান্নার জন্য চাই—আধসের ময়দা, একপোয়া জল-ঝরানো ছানা, আধপোয়া খোয়া-ক্ষীর, আধ ছটাক মিহি-চিনি, আন্দাজমতো পরিমাণে অল্প একটু ঘি আর দুধ, কিছু এলাচ-গুঁড়ো এবং কয়েক ফোঁটা গোলাপের আতর।

ফর্দ্দমতো উপকরণগুলি জোগাড় করে নিয়ে, রান্নার কাজে হাত দেবার আগে ময়দায় সামান্য একটু ময়ান দিয়ে ভালোভাবে মেখে নিন। তারপর জল-ঝরানো ছানার তালটিকে হাত দিয়ে আগাগোড়া বেশ ভালো-ভাবে এবং মিহি-ধরণে ঠেসে, ছানাটুকু ঐ ময়দার সঙ্গে মিশিয়ে দিন এবং আন্দাজমতো পরিমাণে অল্প একটু দুধ ঢেলে ময়দা আর ছানার 'মিশ্রণটিকে' পুনরায় হাত দিয়ে ঠেসে মেখে লুচির ময়দার মতো করে তুলুন। ময়দা আর ছানার 'মিশ্রণটিকে' এভাবে ঠেসে মেখে নেবার সময়েই, সেটিতে এলাচ-গুঁড়ো, চিনি এবং গোলাপের আতর মিশিয়ে নেবেন।

এমনিভাবে 'মিশ্রণটি' আগাগোড়া বেশ ভালোভাবে ঠেসে মাখা হলে, উনানের আঁচে রন্ধন-পাত্র চাপিয়ে ঘি গরম করে নিন এবং লুচি-বানানোর সময় যেমন পদ্ধতিতে কাজ করেন, ঠিক তেমনিভাবেই 'মিশ্রণের' তালটি থেকে প্রয়োজনমতো ছোট বা বড় মাপের কয়েকটি টুকরো বা 'লেচি' কেটে নিন। তারপর একের পর এক সেই 'লেচি-টুকরোগুলিকে' চাকি ও বেলনীর সাহায্যে ঈষৎ-মোটা ছাঁদে ফুলকো-লুচির আকারে বেলে নিয়ে, উনানের আঁচে বসানো রন্ধন-পাত্রে তপ্ত-তরল ছাঁকা-ঘিয়ে ভেজে ফেলুন। তাহলেই বেশ সহজ-সরল উপায়ে পরিপাটি-সুন্দর 'ছানার পুরি' মিষ্টান্ন বানানোর কাজ শেষ হবে।

প্রিয়জনদের পাতে সাদরে পরিবেশনের সময়, 'ছানার পুরি' খাবারটি যেন গরম-গরম থাকতেই দেওয়া হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখা একান্ত আবশ্যক। কারণ, ঠাণ্ডা বা জুড়ানো অবস্থার চেয়ে গরম থাকতেই এ খাবারটি পরিবেশন করলে, 'ছানার পুরি' আরো বেশী সুস্বাদু এবং মুখরোচক হয়ে উঠবে।

আগামীবারে এমনি ধরণের অভিনব-উপাদেয় আরেকটি ভারতীয় খাবারের রন্ধন-প্রণালীর পরিচয় দেবার চেষ্টা করবো।

মৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়

যেদিন প্রথম তোমায় দেখলাম, সেদিন তুমি বসেছিলে তোমার যোগ্য গাম্ভীর্য্য নিয়ে তোমার সিংহাসনে।

আমি এলাম অতি দীনভাবে, কুণ্ঠিত ভীত পদক্ষেপে এগিয়ে গেলাম তোমার কাছে, নত হয়ে স্বীকার কোরলাম তোমার বশ্যতা, তোমাকে বিরক্ত করার জন্যে চেয়েছিলাম ক্ষমা ক্ষীণকণ্ঠে।

তারপর ভয়ার্ত চোখে দেখে নিলাম চকিতে কেমন তোমার চোখের দৃষ্টি।

দেখলাম, আর সেই মুহূর্ত্তে ভেঙ্গে গেলো আমার সকল ভয়, সকল শঙ্কা। ভাবলাম—এই সেই বহুলোক-বর্ণিত ব্যাঘ্র? কিন্তু কোথায় তোমার রক্তবর্ণ চক্ষু? কোথায় তোমার মৃত্যু-বিভীষিকা-পূর্ণ তীক্ষ্ণ নখরযুক্ত থাবা? কোথায় তোমার রক্তপিপাসু জিহ্বা?

তুমি সুন্দর, তুমি উদার, তুমি শান্ত স্নিগ্ধ। তুমি যেন এক পরম বৈষ্ণব কবি। তোমার উন্নত প্রশস্ত কপালে ছোট্ট শ্বেতচন্দনের তিলকটি তোমায় করেছিলো, আরো মহান। গিয়েছিলাম ভয় নিয়ে, ফিরলাম শ্রদ্ধা নিয়ে।

তারপর তুমি এলে, আমার অতিসাধারণ আভিজাত্য-হীন নিরাভরণ ছোট্ট ঘরে, তোমার সকল ঐশ্বর্য্য বাহিরে রেখে আমারি মত রিক্ত হয়ে।

আমি বললাম, 'কোথায় তোমায় বসতে দেব? আমার নেই তো কোন রত্নাসন।'

তোমার ঈষৎ বাঁকা ঠোঁট আর হরিণ-শান্ত চোখ একটু হাসির ঝিলিক দিয়ে, যেন বললো—"রত্নাসন"? সে তো আছে আমার ঘরে. আসিনি আমি রত্নাসনের তরে, এসেছি আমি তোমার হৃদয়ে আসন নিতে।

কেঁপে উঠে বলি, "হৃদয় আসন! তাও নিয়েছে অন্যে, আমার হৃদয়ের সব ঐশ্বর্য্য নিঃশেষিত। আমার এই নিঃশেষিত পরাধীন হৃদয় জয় করে, কি হবে তোমার?"

তবুও তুমি এগিয়ে এলে ডাকলে নতুন নামে। বাড়িয়ে দিলে হাত, বললে, হাত পেতেছি কোন সম্পদ আমি চাই না, শুধু চাই তোমার পরাজিত রক্তাক্ত হৃদয়টি। তোমার ওই পরাজিত হৃদয় আমার গলায় দাও দুলিয়ে, অপরাজিতা ফুলের মালা হয়ে দুলুক আমার হৃদয়ের কাছে অনন্তকাল ধরে।

অপরাজিতা? তুমি ঠিক বলেছ, আমি পৃথিবীর সব যন্ত্রণা শোষণ করে হয়েছি, মৃত্যুহীন বর্ণ. কিন্তু মৃত্যুকে পরাজিত করে হয়েছি অপরাজিতা। আর ফুলের মতই, অন্যের করপীড়নে মলিন, ফুলের মত আমার সৌন্দর্য্য ক্ষণস্থায়ী, পাপড়িখসা ফুলের মত আমি মূল্যহীন।

আর তুমি? তুমি রত্ন, রত্নের মত তুমি অমূল্য। কারো নিষ্পেষণে তুমি গুঁড়িয়ে যাও না।

সৃষ্টির মূল্য দিতে তোমার দীপ্তি ম্লান হয় না। যুগ যুগ ধরে তুমি তোমার যোগ্য মূল্য পাবার অধিকারী।

তুমি পুরুষ আমি নারী, তুমি রত্ন, আমি ফুল। গাছ থেকে ফুল মাটিতে পড়লে সে অপবিত্র হয়ে যায়, আর রত্ন ধুলা থেকে কুড়িয়ে দেবতার আসন স জানো যায়।

রত্ন তুমি পুরুষ, নিজের ভাগ্যকে গড়ার অধিকার তোমার আছে ঈশ্বরের মত। আমি নিবেদিত এক নারী। তোমাকে দেওয়ার মত আছে একটা ব্যর্থ মন। আমি শুধু তাই তোমায় দিতে পারি। কিন্তু শুধু ওইটুকুই দিয়ে আমার মন তৃপ্ত হতে চায় না। জানি আর কিছু নেই, তবু দিতে চাই আরো কিছু, পেতে চাই তোমায় আমার একান্ত আপন করে। আমার শূন্য মন হতে চায় সম্রাজ্ঞী। রত্ন থাকে সম্রাজ্ঞীর বুকে, রত্ন তুমি আমার বুকে থেকে আমায় দাও সম্রাজ্ঞীর মর্য্যাদা। কিন্তু এশুধু কল্পনার কথা, কল্পলোকে যে মন বাস করে সেই মনের কামনা। বাস্তব মন বলে, রত্ন আমি—জন্মান্তরে চাই তোমায় আপন করে। আমরা আমাদের এই দেহ পালটে আবার আসবো এই

পৃথিবীতে। আমার সেই ছোট্ট দেহটিকে ঘিরে আসবে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত।

এমনি করে ঘুরে ঘুরে প্রকৃতি দেবী আমার দেহটিকে সাজাবে ষোলটি বসন্তের পুষ্পস্তবকে।

পরিপূর্ণ নিটোল একটি দেহ—যে দেহ কারো স্পর্শে শিহরিত হয়নি এমন একটি পবিত্র দেহমন নিয়ে একদিন দেখা পাবো তোমার। তোমার সেই দেহও হবে প্রভাতের সূর্য্যের মত পবিত্র নিষ্কলঙ্ক। বিশবছরের দুরন্ত গ্রীষ্মের তৃষ্ণা থাকবে তোমার বক্ষে। আমি আমার ষোলটি বসন্তের জমানো ফুলের মধুভরা পানপাত্র ধরবো তোমার তপ্ত ওষ্ঠে, তোমায় দিয়ে আমি হব ধন্য, তুমি হবে তৃপ্ত। আমাদের হবে মিলন। সে মিলন স্বীকৃতি পাবে সমাজে।

কিন্তু আমাদের মিলন কি দীর্ঘ হবে? সমাজের কাছে আমরা এক আত্মা বলে পরিচিত হবো, কিন্তু যখন আমি আর তোমার চোখে নতুন স্বপ্ন জাগাতে পারবো না, আমার দেহ যখন হারাবে সব সৌন্দর্য্য, তোমার শিশুর মাতৃত্ব কেড়ে নেবে আমার স্বাস্থ্য, তখন যদি অন্য কোন নারী তার রূপ যৌবনের জাল পেতে আমার কাছ থেকে তোমায় কেড়ে নেয়, তখন আমি কেমন করে সহ্য কোরবো তোমাকে হারানোর দুঃখ?

না, মানুষ হয়ে আর আসবোনা এই পৃথিবীতে, মানুষ বড় লোভী, বড় স্বার্থপর!

তবে কি হবো আমরা? তুমি কি হবে সমুদ্রের ঢেউ, আর আমি হবো বালুকণা? বারবার তোমায় উদ্দাম দুরন্ত ঢেউ ছুটে এসে আমায় ভাসিয়ে নেবে তোমার বুকে, আদর করে আবার ফিরিয়ে দেবে তীরে। আমার বালু-কণা-জন্ম কি সুখী হবে? নাঃ, হবে না।

আমি চাইনা বালুকণা হতে। সমুদ্রের তীর-ব্যাপী আছে অসংখ্য বালুকণা, তার প্রত্যেকটি হবে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী। "ওগো সমুদ্রবেশী রত্ন" তোমার অনন্ত ঢেউ যখন ওদের নিয়ে খেলা করবে তখন আমি যন্ত্রণায় আগুনের মত জ্বলতে থাকবো, আমার রৌদ্রতপ্ত বালীর দেহ চাইবে মৃত্যুর শীতল আলিঙ্গন। আমি হবোনা বালুকণা। তুমিও হবেনা সমুদ্র।

তবে?—তুমি হবে সমুদ্রঝিনুক, আমি হবো সেই ঝি নুকের মুক্তো। তোমার হৃদয়ের উত্তাপ দিয়ে আমায় রাখবে তোমার দেহের ভেতর একান্ত আপন করে। কেউ পারবে না তোমার আমার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে। আমি থাকবো তোমার বুকের মধ্যে নিশ্চিন্তে, একান্ত তোমার হয়ে। কিন্তু নিরাপদে থাকতে দেবে কি আমায় তোমার বুকে? হয়ত কোন মুক্তান্বেষী লোভী মানুষ সাগরের গভীর জলে ডুব দিয়ে তুলে আনবে তোমায় প্রখর সূর্য্যের আলোয়, তারপর তার নির্দ্দয় হাতে ঝিলিক দিয়ে উঠবে ইস্পাতের তীক্ষ্ণ বাঁকা ফলা, নিষ্ঠুর হাতে বসিয়ে দেবে তোমার হৃদ্‌পিণ্ডে, যেখানে আমি পরম নির্ভরতায় ঘুমিয়ে আছি। তোমায় আমায় হবে বিচ্ছেদ অনন্ত কালের। ওরা আমায় নিয়ে বাঁধবে সোনার পাতে, রাখবে ভেলভেটের বিছানায়, বন্দী করবে লোহার সিন্দুকে। তোমায় হারিয়ে আমি হব এক নিষ্প্রাণ কঠিন অশ্রুবিন্দু। ওই জমাট-বাঁধা চোখের জল হয়ে যুগ যুগ ধরে ভেলভেটের বিছানায় নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে মুক্তো হয়ে বসে থাকতে চাই না।

তার চেয়ে আমরা হবো একবৃন্তে দুটি ফুল। ভোরের আলো যখন পাতার ফাঁক দিয়ে ছড়িয়ে পড়বে আমাদের ওপর, তখন আমাদের পাঁপড়িগুলো আস্তে আস্তে খুলে যাবে। আমরা চোখ মেলবো একই সঙ্গে, সেই ভোরের রক্তিম আলোয় আমাদের হবে শুভদৃষ্টি। আমরা মুগ্ধ হবো একে অন্যকে দেখে। পাঁপড়ি দুলিয়ে আদর জানাবো পরস্পরকে। ভাববো জন্ম আমার সার্থক। আমরা বাঁধা আছি একবৃন্তে, এক আত্মা হয়ে। যেদিন সরে যাবো, সেদিনও ঢলে পড়বো একে অন্যের দেহে।

সহসা ভয় জাগে মনে—এতো সুখ কি হবে আমার ফুল-জীবনে? কি করে তা হবে? যদি কোন লোভী-হাত ছিনিয়ে নেয় তোমার কাছ থেকে আমায়, তখন কি হবে? তখন তোমার অদর্শনের যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাবো। সে হবে, মৃত্যুর আগে মৃত্যু যন্ত্রণা। দরকার নেই আমার ফুলের জন্মে।

তবে? তবে কি, তোমাকে পাওয়ার কামনা ব্যর্থ হবে? মৃত্যুর পরে আমার অতৃপ্ত আত্মা কি শুধু "রত্ন—রত্ন" বলে ডেকে বেড়াবে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে? না—তা কেন হবে?

মৃত্যুর পরে, আমার আত্মা তোমার আত্মা এক

হয়ে যাবে। আমাদের থাকবে না কোন দেহ, থাকবে না কোন রূপ, থাকবে শুধু দুটি সুন্দর মন।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামবে পৃথিবীর বুকে, আমরা বেরিয়ে পড়বো অনন্তের পানে। পথে পড়বে হয়ত কোন দেবালয়, আমরা দুলিয়ে দেব সেই দেবালয়ের ঝুলন্ত ঘণ্টাটি। ঘণ্টা বাজবে—টুং টাং শব্দে, সে হবে আমাদের দেববন্দনা।

এগিয়ে যাবো দূরে আরো দূরে—যেতে যেতে থেমে পড়বো, যেখানে উদার মাঠে গাছের তলায় চাঁদের আলোয় স্নান করে বসে আছে প্রেমিক-প্রেমিকা। খানিক স্তব্ধ হয়ে শুনবো ওদের গুঞ্জন, তারপর দুরন্ত বেগে উড়িয়ে দিয়ে যাবো প্রেমিকার আঁচল প্রেমিকের গায়ে।

আবার সুরু হবে আমাদের যাত্রা। গভীর রাত্রি, নিস্তব্ধ চারিদিক, পুরুষ জেগে উঠে চাইছে তার আপন নারীর কোমল দেহের উষ্ণ স্পর্শ। নারী তখন মাতৃত্ব নিয়ে বিব্রত। শিশু চাইছে মায়ের কোল, পুরুষ চাইছে তার প্রিয়াকে, দুয়ের মাঝে নারী যখন বিভ্রান্ত, আমরা তখন এগিয়ে যাবো শিশুটির কাছে স্নিগ্ধ শীতল, বাতাস-হাত বুলিয়ে দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেব তাকে—পুরুষ পাবে তার নারীকে।

আবার আমরা বেরিয়ে পড়ব নিরুদ্দেশ যাত্রায়। ভোরের আলোর পরশ পেয়ে জেগে উঠবে, পারুল চাঁপা, মল্লিকার দল। তুমি ছুটে যাবে উদ্দাম গতিতে, ওদের বৃন্তচ্যুত করে দেবতার পায়ে অর্ঘ্য দিতে।

আমি বাধা দেব তোমায়, বাতাস-স্বরে ফিস ফিস করে বলবো, রত্ন ওদের কোরনা মৃত্যুআঘাত, দেবতা চায় না ওদের অপমৃত্যু।

দেবতা চায় ওদের পরিপূর্ণ সুখী জীবন। যে জন্যে ওদের সৃষ্টি করেছেন তা পূর্ণ হলেই, ওগুলি দেবতা আপন হাতে ঝরিয়ে দেবেন, গ্রহণ কোরবেন ওদের আত্মা। রত্ন, তুমি কি বুঝতে পারছো না ওরা হৃদয় নিংড়ে গন্ধ পাঠাচ্ছে ভ্রমরের উদ্দেশ্যে। চল, আমরা ওদের মিষ্টি গন্ধ পৌঁছে দিয়ে বেরিয়ে পড়ি উদার অনন্ত আকাশের পানে—আমাদের সেই দ্বৈতগতি কেউ রুখতে পারবে না। পারবে না কেউ আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে।

আমরা হবো দেহহীন দুটি আত্মা। আমরা দুজনে মিশে থাকবো বাতাস হয়ে। আমরা হবো অনন্তকালের "বাতাস দম্পতী"।

চৌরঙ্গী

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

প্রথম রাতের আলো
জ্বলে সারি সারি,
কৃষ্ণদেহা চৌরঙ্গী সে
করে ঝলমল
স্রোতহীন কালো জল
ভরা খালে যেমন ঘুমোয়।
গুনীন্ ফকির যেন পার হয়ে যায়,
আমিও চলেছি পার হয়ে
চৌরঙ্গী সেই—কালো জলরাশি
সুকঠিন শুষ্ক স্রোতহীন।

তারপর মনে হলো
হঠাৎ এক নিদারুণ স্রোতে
আমি যে চলেছি ভেসে
ভাটার প্রখর এক টানে।
তারি ক্ষণ পরে দেখি
আমি আছি শুয়ে রাজপথের
মাঝখানে চিৎ হয়ে।
আমাকে ঘিরিয়া জনরাশি
বুঝিলাম হন্তারক টেক্সী এক
হেনেছে আঘাত।

তারপরে আমি এক
হাসপাতালের রুগী,
গঙ্গার দক্ষিণ তীরে
বেদনায় ছটফট করি
মৃত্যুর গহ্বর থেকে
এসেছি যে ফিরে।

শিয়রে গঙ্গার স্রোত
সেই স্রোতে বহে প্রাণধারা
হননও সে করে।
চৌরঙ্গীর স্রোতও শুধু হন্তারক নয়,
প্রাণধারা বহে তারও পরে।

প্রাণের প্রবল চঞ্চলতা
জীবনের অবারণ বেগ
সেই বেগে রয়েছে সংঘাত
সে-সংঘাতে মৃত্যু আসে।
জীবন আর মৃত্যু দুই
সাপ-সাপিনীর মত রয়েছে জড়ায়ে।
জীবনের সংবর্ত যেথা যত বড়
মৃত্যু সেথা তত বেশী রয়েছে ছড়ায়ে।

দুগ্ধ ও অন্যান্য খাদ্য—

বিদেশ হইতে গুঁড়া দুধ ও দুগ্ধজাত অন্যান্য খাদ্য প্রায় বন্ধ হইয়াছে। তাহার ফলে শুধু দুধের দাম বাড়ে নাই, দুধ একরূপ দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। দুধের এই অভাবের জন্য দেশবাসী প্রত্যেকে অল্প বিস্তর দায়ী। এতদিন পরে কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্যমন্ত্রী প্রত্যেক গৃহস্থকে নিজগৃহে গোপালনের জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে বাংলা দেশে প্রতি গৃহস্থই গোপালন করিতেন এবং গরু পোষা ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু গত ৫০ বৎসরে দেশের অবস্থার পরিবর্ত্তনের ফলে হাজার করা একজন গৃহস্থও বাড়ীতে গরু রাখেন না। আমরা জানি গৃহস্থের পক্ষে বাড়ীতে গরু রাখা নানা প্রকারে অসুবিধা-জনক, কিন্তু দুধের অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া প্রত্যেক গৃহস্থকে গোপালনের অসুবিধা দূর করিয়া গরু পোষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমাদের দেশে সরকারী ব্যবস্থায় দুগ্ধ উৎপাদনের যে চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে তাহা অতি সত্বর সাফল্য মণ্ডিত করা যাইবে না। কয়েকটি সমবায় দুগ্ধ উৎপাদন সমিতি গঠিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অতি কম। সে কথা চিন্তা করিয়া কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী যাহাতে গৃহস্থ গোপালন করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থায় মনোযোগী হইয়াছেন। সরকার হইতে গো-পালনের সাহায্য করা হইলে গৃহস্থ সে কার্য্যে উৎসাহী হইবে, এক-মাত্র সেই ব্যবস্থার দ্বারাই দুধের সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হইবে। পশ্চিমবঙ্গের পরলোকগত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মহাশয় ৬।৭ বৎসর পূর্ব্বে দেশের প্রত্যেক মানুষকে হাঁস, ছাগল প্রভৃতি পালন করিতে উৎসাহ দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সে সময়ে তিনি হাঁস ও ছাগল বিদেশ হইতে আমদানী করিয়া গৃহস্থের মধ্যে অল্পমূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। দেশবাসীকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ডিম ও মাংস খাওয়াইতে হইলে হাঁস ও ছাগলের পালন বর্দ্ধিত করা প্রয়োজন। দেশের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কাজেই হাঁস বা ছাগল পালন নিন্দনীয় কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরা গরু, ছাগল, হাঁস প্রভৃতি পুষিতে আরম্ভ করিলে শুধু দেশের খাদ্যাভাব দূর হইবে না, তাহাদের আর্থিক অবস্থারও উন্নতি হইবে। এ সকল কাজের জন্য অধিক স্থান বা মূলধনের প্রয়োজন হয় না। শুধু মানুষের উৎসাহ ও পরিশ্রমের একান্ত প্রয়োজন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁহার জীবনের শেষ দুই বৎসরে বহুবার বহু সভায় এই সকল কথা আমাদের শুনাইয়াছিলেন। পরি-পূরক খাদ্য হিসাবে নানারূপ ফলের চাষের কথাও বলা যায়। আম, কাঁঠাল, জামরুল, আতা, পেঁপে, পেয়ারা প্রভৃতি যদি দেশে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে মানুষ চালের ব্যবহার খানিকটা কমাইতে সমর্থ হইবে। বাংলায় বহু স্থানে নারিকেলের চাষ করিলে প্রচুর নারিকেল হয়। পরিতাপের বিষয় কলিকাতা শহরে কয়েক কোটি নারিকেল ডাব হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া আমাদের খাদ্যাভাব পূরণে বাধা দিতেছে। ভাতের ব্যবহার কমাইলে নারি-কেলকে আমরা খাদ্যরূপে ব্যবহার করিতে পারি। এইরূপ আরও বহু খাদ্য উৎপাদনের কথা বিধানচন্দ্র রায় প্রায়ই উল্লেখ করিতেন। বাংলাদেশে চীনাবাদাম ও কাজুবাদাম প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। তাহাও পরিপূরক খাদ্য হিসেবে কম উপকার করিবে না। কলা, আলু প্রভৃতি তো বাংলা-দেশে অন্যতম প্রধান খাদ্য। আমরা সে সকল খাদ্যের চাষের জন্য বিশেষ চেষ্টা করি না। বর্ত্তমানে যুদ্ধ যদি আমাদের খাদ্য উৎপাদনব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিতে পারে, তাহা হইলে আমরা এই ধ্বংসকারী যুদ্ধকে উপকারী বন্ধু বলিয়া মনে করিব।

শহীদ প্রফুল্ল চাকী—

পশ্চিমদিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জে বাংলার বিপ্লব আন্দো-লনের অন্যতম অগ্রগামী মৃত্যুঞ্জয়ী প্রফুল্ল চাকীর বাসস্থান

ছিল। কিন্তু দুঃখের কথা রায়গঞ্জে প্রফুল্ল চাকীর স্মৃতি রক্ষার কোন চেষ্টা হয় নাই। গত ২০শে ও ২১শে নভেম্বর রায়গঞ্জে বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের বিশেষ অধিবেশনে হুগলী জেলার ইতিহাস প্রণেতা শ্রীসুধীরকুমার মিত্রের প্রস্তাবে সেখানে প্রফুল্ল চাকীর স্মৃতিরক্ষার কথা আলোচিত হয়। সভাস্থলেই একজন কলিকাতাবাসী ও একজন রায়গঞ্জবাসী ভদ্রলোক স্মৃতিরক্ষা তহবিলে একশত টাকা করিয়া দান করিয়াছেন। স্থানীয় অধিবাসীগণও নানাভাবে বিপ্লবী বীরের স্মৃতিরক্ষা করিবার চেষ্টার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। আমরা মনে করি বীর চাকীর নামে শুধু রাস্তার নাম বা পার্কের নাম করা ছাড়াও যাহাতে তাঁহার জীবন কথা ছাত্র-ছাত্রীরা চিরকাল স্মরণ ও আলোচনা করে তাহার ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়। কয়েক হাজার টাকা সংগৃহীত হইলেই বার্ষিক পুরস্কার প্রদানের দ্বারা সে কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। আশা করি বিপ্লবী চাকীর স্মৃতিভাণ্ডারে দেশবাসীর দানের অভাব হইবে না।

বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন—

গত ২০শে ও ২১শে নভেম্বর পশ্চিম দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ শহরে এক বিশেষ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। রায়গঞ্জ যাতায়াতের পথ কষ্টসাধ্য হইলেও কলিকাতা হইতে ৫৬জন সাহিত্যিক ঐ অধিবেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ১৯শে রাত্রিতে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া তাঁহারা ২৩শে সকালে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। মূল সভাপতিরূপে শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (জরাসন্ধ), দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিরূপে সাংবাদিক শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত এবং বক্তারূপে কবি শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী, শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসু, ডাঃ মতিলাল দাশ, অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি, সম্মেলনের উদ্বোধকরূপে খ্যাতনামা নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায়, সম্মেলনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী, তিন সম্পাদক—শ্রীকেশব মুখোপাধ্যায়, শ্রীসন্তোষ রায় ও শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন।

তৃতীয় অধিবেশনে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী সভাপতিরূপে এবং বালুরঘাট কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীসুধীরকুমার করণ বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন। তাহা ছাড়া অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্থানীয় শিক্ষাব্রতী শ্রীমিহির মুখোপাধ্যায়, অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক স্থানীয় চিকিৎসক ডাঃ বৃন্দাবন বাগচী, অধ্যাপক শ্রীনির্ম্মল দাশ প্রভৃতিও সভায় ভাষণ দান করিয়াছিলেন।

অধিবেশনের শেষ দিকে স্থানীয় কয়েকজন কবি এবং কলিকাতার কয়েকজন কবি স্বরচিত কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন। রায়গঞ্জের অধিবেশনে কয়েকটি বিশেষত্ব লক্ষিত হইয়াছিল। তিনটি অধিবেশনেই প্রচুর দর্শক সমাগম হইয়াছিল এবং দর্শকগণ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সকল ভাষণ শুনিয়াছিলেন। এরূপ শান্তিপূর্ণ সাহিত্যসভা প্রায়ই দেখা যায় না। স্থানীয় উদ্যোক্তারা ৫৬জন সাহিত্যিকের বাসস্থান ও প্রাচুর্যাপূর্ণ আহারের ব্যবস্থা তো করিয়াছিলেনই, তাহা ছাড়া তাঁহাদের আন্তরিক আদর আপ্যায়ন সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। ৫জন সাহিত্যিক সস্ত্রীক যোগদান করিয়াছিলেন, এবং মহিলাদের দলে একজন কুমারীও ছিলেন। ফিরিবার পথে প্রতিনিধিরা ২২শে নভেম্বর আদিনা মসজিদ, গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ ও রামকেলি তীর্থ দেখিয়া আসিয়াছেন। মালদহে স্থানীয় সাহিত্যিক শ্রীকালীপদ লাহিড়ী তাঁহার স্বরচিত মালদহের ইতিহাস গ্রন্থ বহু সাহিত্যিককে উপহার দেন।

রেলের গার্ড সুকবি শ্রীশিবানন্দ সিংহ যাতায়াতের পথে ফরাক্কায় প্রতিনিধিদলকে নানাভাবে সাহায্য করিয়া সম্মিলনকর্তৃপক্ষের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা—

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকার কলিকাতা বালিগঞ্জ গোলপার্কে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্ত্তি স্থাপনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। রামকৃষ্ণ মিশন ঐ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাঁহারা সে কাজের ভার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপর অর্পণ করায় সরকার কলিকাতা কর্পোরেশনের নিকট এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন।

১০ লক্ষ হোমগার্ড—

সম্প্রতি দিল্লীতে ভারতের সকল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের এক সম্মেলনে স্থির হইয়াছে যে সারা ভারতে ১০ লক্ষ লোককে হোম গার্ডের কাজ শিক্ষা দেওয়া হইবে। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রীআই, এল, মিশ্র সম্প্রতি ঐ সংবাদ

প্রচার করিয়াছেন। হোমগার্ডদিগকে রাইফেল চালনা শিক্ষা দেওয়া হইবে।

ভারতে চীনা আক্রমণের আশঙ্কা—

চীন কর্তৃপক্ষ তিব্বতে ১৫ ডিভিশন সৈন্য মোতায়েন রাখিয়াছে। তার মধ্যে ছয়টি ডিভিশন ভারত, নেপাল, সিকিম ও ভূটান সীমান্তের কাছে রাখা হইয়াছে। লণ্ডনে বিভিন্ন দেশের অবস্থা সম্পর্কে এক আলোচনা সভায় এই তথ্য প্রকাশ করা হইয়াছে। তা ছাড়া চীনারা তিব্বতে ২৫টি বিমানঘাঁটি তৈয়ারী করিয়াছে। তাহার দুইটি হইতে হালকা বোমারু বিমান উড়িতে পারিবে। তিব্বতের ভিতর দিয়া চীন হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত দুইটি বড় রাস্তা তৈয়ার করা হইয়াছে। ঐ রাস্তা দিয়া সাত টন ভারী যানবাহন চলিতে পারিবে। চীনের মোট সৈন্য সংখ্যা ২২ লক্ষ ৫০ হাজার। অর্থাভাবে চীনারা আর নূতন সৈন্যবাহিনী গঠন করিতে পারে নাই। এই হিসাব হইতে বুঝা যায় যে কোন সময়ে চীনারা ভারত আক্রমণ করিতে পারে।

নূতন নৌ-সেনাপতি—

ভারতের নৌ-সেনাপতি শ্রীবি, এস, সোমার অবসর গ্রহণ করায় নয়াদিল্লীর National Defence Collegeএর কমাণ্ডার শ্রীএ, কে চ্যাটার্জ্জি নূতন নৌ-সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার বয়স ৫১ বৎসর। ১৯৩৩ সালে তিনি নৌ-বিভাগে যোগদান করেন। তিনি ব্রিটেনে সাবমেরিণ ধ্বংসের কাজে বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯৫৮ সাল হইতে তিনি নৌ-বাহিনীর সহকারী অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। ভারতের সেনা-বিভাগে শ্রীজয়ন্ত চৌধুরী ছাড়াও শ্রীচ্যাটার্জ্জী উচ্চতম পদলাভ করায় বাঙ্গালী মাত্রেই আনন্দিত হইবেন।

নেতাজীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা—

কলিকাতা ময়দানে রাজভবনের দক্ষিণে প্রতিষ্ঠার জন্য নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর এক বিরাট মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে। যাহাতে আগামী ২৩শে জানুয়ারী নেতাজীর ৭০তম জন্ম দিবসে ঐ মূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করা হয় সেজন্য উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে।

শৌর্য্যের জন্য পুরস্কার—

পাক-ভারত যুদ্ধে সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল জে, এন, চৌধুরি ও বিমানবাহিনীর অধ্যক্ষ এয়ারমার্শাল অর্জ্জুন সিং পদ্মবিভূষণ উপাধি লাভ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া ৪জন জেনারেল এবং বিমানবাহিনীর দু'জন পদস্থ অফিসার পদ্মভূষণ উপাধি পাইয়াছেন—তাঁহাদের নাম (১) হরবংশ সিং (২) কে, এস্ কাটোজ (৩) জে, এম, ধীলন। (৪) পি, এম জয় (৫) পি, সি, লাল, (৬) আর রাজারাম। তাহা ছাড়াও বহু উচ্চপদস্থ সৈনিক বিশিষ্ট সেবাপদক ও মহাবীরচক্র পুরস্কার পাইয়াছেন।

হলদিয়া বন্দরের জন্য অর্থ—

মেদিনীপুর জেলায় হলদিয়া নামক স্থানে যে নূতন বন্দর প্রস্তুত হইতেছে তাহাতে মোট ব্যয় হইবে ২০ কোটি টাকা। তার জন্য বিশ্বব্যাঙ্ক হইতে ১২ কোটি টাকা ঋণ পাওয়া যাইবে। বিশ্বব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ ঐস্থান দেখিয়া এবং পরিকল্পনা পরীক্ষা করিয়া ঐ ঋণ মঞ্জুর করিয়াছে। তাহারা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, অর্থমন্ত্রী শৈলকুমার মুখোপাধ্যায়, পরিকল্পনা সচিব সুলিনবরণ রায়, কলিকাতা পোর্টকমিশনারের চেয়ারম্যান শ্রীবি, বি, ঘোষ প্রভৃতির সহিত আলোচনা করিয়াছেন। হলদিয়া বন্দর ও তাহার সঙ্গে বিবিধ কারখানা তৈয়ারীর জন্য রাজ্যসরকার তথায় ১৭ বর্গমাইল জমি গ্রহণ করিতেছেন। হলদিয়া পশ্চিমবঙ্গের বহু সমস্যা সমাধানে সমর্থ হইবে।

যুদ্ধের কাজে ডাক্তার—

কিছুদিন পূর্ব্বে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল যে, সামরিক বিভাগে কাজের জন্য চিকিৎসক পাওয়া যাইতেছে না। সেজন্য সম্প্রতি সরকার আইন করিয়াছেন—সকল পাশকরা ডাক্তারকে তাঁহাদের কার্য্যকালের প্রথম ১০ বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ ৪ বৎসর সেনাবাহিনীর সেবায় যোগদান করিতে বাধ্য করা হইবে। আরও স্থির হইয়াছে যে, যে সকল ডাক্তার ৪ বৎসর পূর্ব্বে সামরিক বিভাগে যোগদান করিয়াছেন তাঁহারা যে বেতন পান সেই বেতন এখন যে সকল ডাক্তার তাহাতে যোগদান করিবেন তাঁহাদের দেওয়া হইবে। এই ব্যবস্থার ফলে নূতন ডাক্তারগণ অধিক বেতন লাভে সমর্থ হইবেন।

শোননদের উপর নূতন সেতু—

গত ২১শে নভেম্বর ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীগুলজারিলাল নন্দ ১৪ কোটি টাকায় নির্ম্মিত ৪৬১৭ ফিট দীর্ঘ ও

২২ফিট প্রশস্ত শোননদের উপর একটি নূতন সেতুর উদ্বোধন করেন। নূতন পুলটি বিহারের শোননদের উপর ডিহিরি নামক স্থানে নির্মিত হইয়াছে। নূতন পুল হওয়ায় ঐ অঞ্চলে শিল্প বাণিজ্যের অনেক সুবিধা বাড়িবে। বিহারের রাজ্যপাল শ্রীএম এ আয়েঙ্গার উৎসবে সভাপতিত্ব করেন।

প্রতিরক্ষার জন্য অর্থ সংগ্রহ—

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন গত ১ মাস যাবৎ প্রত্যহ নানাস্থানে সভা করিয়া চীন ও পাকিস্তানের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা সাহায্যে অর্থ ও সোনা সংগ্রহ করিতেছেন। এক একদিন তাঁহাকে ২।৩টি করিয়া সভায় বক্তৃতা করিতে হইতেছে। তাঁহার আবেদনে সাড়া দিয়া দেশের ধনী, দারিদ্র, পণ্ডিত, মুর্খ সকলেই নিজ নিজ সাধ্যমত অর্থদান করিতেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই ভ্রমণের ফলে তাঁহার সহিত জনগণের সংযোগের সুবিধা হইতেছে। স্বাধীন ভারতের মানুষ ক্রমে ক্রমে ঐক্যবদ্ধ হইয়া নিজেদের কর্তব্য পালনে অগ্রসর হইতেছেন ইহা দেশের পক্ষে আশা ও আনন্দের বিষয়।

সুরেশচন্দ্র পাল—

গত ১৫ই নভেম্বর ২৪ পরগণা নৈহাটী নিবাসী খ্যাতনামা দেশ সেবক সুরেশচন্দ্র পাল ৬৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি যৌবনে বিপ্লব আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন ও চার বৎসর বিনা বিচারে আটক ছিলেন; তাহার পর বি, এল পাশ করিয়া সারাজীবন বারাসত আদালতে ওকালতি করিতেন।

প্রথম বয়সেই তিনি নৈহাটী মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার ও পরে চেয়ারম্যান হইয়াছিলেন। ১৯৫২ সালে তিনি বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হন ও পরে বিধান পরিষদের সদস্য হইয়াছিলেন। তিনি সারাজীবন নৈহাটী অঞ্চলের বহু জন-হিতকর কাজের সহিত যুক্ত ছিলেন এবং অবিবাহিত থাকিয়া নিজের উপার্জিত প্রভূত অর্থ জনকল্যাণে দান করিয়াছেন।

পরলোকে ডঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা—

কলিকাতা আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট নিবাসী খ্যাতনামা ধনী, শিল্পপতি ও পণ্ডিত নরেন্দ্রনাথ লাহা গত ১৫ই নভেম্বর ৭৮ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন, তিনি মহারাজা দুর্গাচরণ লাহার পৌত্র ও রাজা হৃষিকেশ লাহার পুত্র ছিলেন।

ডঃ লাহা ১৮৮৭ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। মেট্রোপলিটান

পরলোকে ডঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা

ইনষ্টিট্যুসান ও প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি বিশেষ মেধাবী ছাত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ১৯১০ খৃঃ এম-এ ডিগ্রী লাভ করেন ও ১৯১৬ খৃঃ পি-আর-এস হন। ১৯২২ খৃঃ পি-এইচ-ডি ডিগ্রী লাভ করেন।

তিনি Studies in Ancient Hindu Polity, Promotion of learning in India, Aspects of Ancient Indian Polity প্রভৃতি গবেষণামূলক গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন।

ডঃ লাহা বেঙ্গল চেম্বার অফ্ কমার্সের প্রেসিডেন্টের পদে বহুদিন অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি কয়েক বৎসর কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার ছিলেন।

ডঃ লাহার লণ্ডনে ১৯৩০ ও ১৯৩১ সালে রাউণ্ড টেবল কন্‌ফারেন্সের সহিত সংশ্রব হইতে তাঁহার রাজনৈতিক ও

সামাজিক কার্য্যকলাপের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি দুই পুত্র, এক কন্যা, পুত্রবধূদ্বয়, ও পৌত্র-পৌত্রী রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ও জনসেবককে হারাইলাম।

নূতন চীফ্ সেক্রেটারী—

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চীফ্ সেক্রেটারী শ্রীরণজিৎ গুপ্ত অবসর গ্রহণ করায় স্বরাষ্ট্র সেক্রেটারী শ্রীমৃগাঙ্কমৌলি বসু আই, সি, এস, নূতন চীফ্ সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি গত ৩০ বৎসরের সরকারী চাকুরীতে বহু গুণ এবং কর্ম নিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন। আমরা বিশ্বাস করি, তাঁহার কার্য্যকালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শাসনবিভাগ উন্নততর হইবে। তাঁহার স্থানে অর্থ সেক্রেটারী শ্রীকুমুদ-কান্ত রায় আই-এ, এস, স্বরাষ্ট্র সেক্রেটারী নিযুক্ত হইবেন। আমরা উভয়ের এই পদোন্নতিতে তাঁহাদের অভিনন্দিত করিতেছি।

ব্রহ্মসূত্র কাব্যানুবাদ

পুষ্পাদেবী সরস্বতী শ্রুতিভারতী

জন্মাদ্যস্য যতঃ (১।১।২)

এই জগতের যাতে জন্ম স্থিতি লয়,
সেই কথা স্মরণেতে সদা যেন রয়।
যাহা হতে সৃষ্টি হয় সকল প্রাণীর,
যাঁর দ্বারা রয় বেঁচে জেনো তাঁরে স্থির।
মৃত্যুর পরেতে সবে যাঁর কাছে যায়,
সেই ব্রহ্ম, করো মন নিয়োজিত তাঁয়।

শাস্ত্রযোনিত্বাৎ (১।১।৩)

সকল শাস্ত্রের মূল ব্রহ্ম, জেনো হয়
জ্ঞানের আকর সেই শুদ্ধ সত্যময়!
সর্ব্বজ্ঞ ও যত কিছু সবের আধার।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়েও ক্ষয় নাহি যাঁর!

তৎ তু সমন্বয়াৎ (১।১।৪)

তৎ অর্থে যে শাস্ত্রেতে ব্রহ্মরে বুঝায়
তু কিন্তু ও সমন্বয়াৎ কার কথা কয়?
উপনিষদের কথা সার ব্রহ্মময়
তাঁরি ছবি হল আঁকা সকল সময়।
তাঁরে যাতে জানা যায় মূর্ত্ত ব্রহ্ম হন
তাঁরি কথা আলোচনা করে ঋষিগণ।
স্ফটিকেতে জবা ফুল যদি ধরা যায়।
শুভ্র স্ফটিকেরে দেখো লাল দেখা যায়।
তেমনি চৈতন্য কাছে বুদ্ধি যদি থাকে,
চৈতন্যরে বুদ্ধি বলি ভ্রম হয় তাকে।
চৈতন্যর উপাধিরে বুদ্ধি জেনো কয়
সে কারণ এই দুই এক কভু নয়।
শঙ্কর বলেন সবই ব্রহ্ম অনুগত
শাস্ত্র বাক্য সব কিছু ব্রহ্মেতে উদ্গত॥

ঈক্ষতের্না শব্দম্ (৫)

ঈক্ষতেঃ ঈক্ষতি ধাতু প্রয়োগ যে হয়
অশব্দম্ অর্থ জেনো বেদে যাহা নয়।
এরূপ প্রকৃতি কিংবা প্রধান যা আছে
জগত কারণ নয় যাতে সবে বাঁচে
জ্ঞানেন্দ্রিয় নাহি তবু সর্ব্বজ্ঞ যে জন
অবিদ্যা যাহাতে জ্ঞানবান্ জন।

গৌণশ্চেৎ ন আত্ম শব্দাৎ

গৌণ ভাবেতে ঈক্ষতি কথা বলে যদি বলে কেহ
গৌণশ্চেৎ—ন এই কথা মাঝে আত্মা শব্দ কাটায় সে সন্দেহ
জগৎ রূপেতে হব পরিণত চিন্তা করিয়া হয়
তেজ জল আর অন্ন মাঝেতে তিনটি রূপেতে রয়
জীবরূপ এই আত্মার দ্বারা তিন দেবতার মাঝে
এদেরি ভোগের তরেতে নামেতে স্থূল জগতেতে হয়ে
স্বরূপ আত্মা, চেতন সে জীব অচেতনে নাহি রহে
সৎ বস্তু এ সচেতন জন আলোচনা এই করে
গৌণ ভাবেতে বলা হয় নাই মুখ্য ভাবেই ধরে।

॥ ইন্দ্রাণী ॥

"পথিক"

এক

শান্ত কোলাহলহীন একটি পরিবার—দুটি প্রাণী; স্বামী-স্ত্রী। অত্যন্ত সুখী ওদের মন, মধুময় ওদের প্রতিদিনের ভোর। শয্যাত্যাগ করে হাত মুখ আচমন ক'রে সুযশা স্বামীকে প্রণাম করে, তারপর জানালার ধারে মেঝেতে দুটো আসন পেতে দু'জনে প্রার্থনায় ধূপ-দীপ-গন্ধে আর সঙ্গীতে পল্লীর জড়তা ভেঙ্গে দিয়ে দিনের কাজ সুরু করে। নিজের হাতে সুযশা ঘরের সব কাজ করে—স্বামী সুমথনাথও এ বিষয়ে স্ত্রীকে যতদূর সম্ভব সাহায্য করে।

সেদিন প্রার্থনার পর সুমথনাথ পড়ার টেবিলে বসে নিজের প্রবন্ধ বইয়ের প্রুফ দেখছেন। বিরাট একটা টেবিলের এক কোণে বসে সে কাজ করে—। সর্বত্র, ঘরের যেদিকে তাকানো যায়—বই আর বই। এরই মধ্যে সে ডুবে থাকে, আর এমনি ভাবেই সুযশা তার স্বামীকে সেবা করে। নিজে একটি মহাবিদ্যালয়ের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপিকা। রূপে ও গুণে আভিজাত্যের যেটুকু তার সহজাত—সবটুকুই স্বামী আনন্দে ও সেবায় নিয়োজিত করেছে। এতটুকু দীনতা নেই ওদের দু'জনের পাওয়া-না-পাওয়ার মাঝখানে। ঘরের কাজ দু'জনে ভাগাভাগি ক'রে সম্পন্ন করে। দু'কাপ চা আর কিছু খাবার সাথে নিয়ে সুযশা স্বামীর পাশে এসে বসলো।

"তোমার বইটা বেরুলে বহু ছাত্রছাত্রীর উপকার তো হবেই, সাধারণ পাঠকও মোহিতলাল সম্পর্কে উৎসাহী হবেন"—চায়ের কাপটা হাতে তুলে দিতে দিতে সুযশা বললো।

সুমথনাথ একটু স্মিতহাস্যে সুযশার দিকে তাকাল—কাছে টেনে ওর চিবুকে চুম্বন ক'রে বললে,'তোমার আনন্দ হয়েছে এতেই আমি খুশী—আমার সবটুকু পাওয়া'। আবার সুযশা কাছে এলো—মাথাটা স্বামীর বুকে এগিয়ে দিয়ে চোখ বু'জলো—অসীম নীরবতা, অনন্ত শান্তি, সীমাহীন তৃপ্তি ওর মুখে ও চোখে ঝলক্ দিয়ে গেল।

তখনও আকাশের রোদ ধরায় ছিটকে পড়তে বেশ একটু দেরী আছে।

"তুমি কাল শোবার সময় যে কবিতার ব্যাখ্যা সম্পর্কে জানতে চেয়েছ তা বলছি", হাতের প্রুফগুলি একপাশে সরিয়ে রেখে 'সঞ্চয়িতা' খুলে সুমথনাথ 'সাবিত্রী' কবিতাটি বের করল।

সুযশা তাড়াতাড়ি নিজের নোটবইটি খুলে কবিতার প্রয়োজনীয় কয়েকটি চিন্তাধারা অত্যন্ত গভীর মনোনিবেশের সহিত বুঝে টুকে নিল।

মাঝে মাঝে সুমথনাথ কবিতা বোঝাতে গিয়ে ভাবাবেগে এমন হ'য়ে যায়—তখন মনে হয় একটা জীবনের ঝংকার যেন সমগ্র পরিবেশকে গভীর কোন অন্য একলোকে নিয়ে যায়। আবৃত্তির কণ্ঠস্বর যেন প্রচ্ছন্ন ভাবটিকে আরও বেশী আরও মর্ম-ছোঁয়া অনুভূতিতে বিভোর করে দেয়। মাঝে মাঝে সুযশা নিজেকে হারিয়ে ফেলে সেই ঝংকারে।

জানালা দিয়ে আলো ছড়িয়ে পড়লো ঘরের সর্বত্র। সুমথনাথ বই বন্ধ করে সুযশাকে তাড়া করলো, বললো—"কত বেলা হয়েছে, তুমি এখনও বসে আছ? কই, থলে দাও, বাজারে যাই!"

"দিচ্ছি গো, দিচ্ছি!" সুযশা মুচ্‌কি হেসে খাতা-পত্তর গুছিয়ে ভেতরে গেল।

* * *

দুই

বাজার সেরে সুমথনাথ আবার সেই প্রুফ দেখতে

বসলো। নিচের ঘরে 'কলিং বেল' বেজে উঠ্‌লো। ঠিকা ঝি দরজা খুলে দিয়ে ভদ্রলোককে সাথে ক'রে উপরে এল, বলল, 'কর্তাবাবু, এক ভদ্রলোক আপনার সাথে দেখা করতে চান।'

'নিশ্চয়, আসুন—' ভেতরে আসুন!'

আগন্তুক হাতের সুটকেশটি মেঝেতে রেখে প্রণাম করতেই সুমথনাথ বল্‌লো, 'ঠিক আছে, কিন্তু ভাই, তোমাকে তো চিন্‌তে পারছি না!"

—"আপনি আমার বাবার শ্রদ্ধেয়—"

—তোমার বাবা—

—আমার বাবা অজিত গুপ্ত।

—'অজিত গুপ্ত'—একটু চিন্তা করবার পর 'ও, অজিত, তুমি অজিতের ছেলে। তা আগে বলতে হয়। অজিত এখন কোথায়, কেমন আছে? সুমথনাথ খোলা হাসিতে অত্যন্ত সহজ ভাবে কথাগুলো বল্‌লো।

—বাবা দুবছর আগে দেহরক্ষা করেছেন। আমরা চন্দননগরে থাকি। বাবার কাছে আপনার কথা অনেক শুনেছি—বহুবার ইচ্ছা হয়েছে দেখা করবো—কিন্তু সুযোগ পাইনি।

—অজিতকে আমি অত্যন্ত স্নেহ ক'রতাম। যদিও আমি বয়সে অনেক বড়, কিন্তু ব্যবহার ছিল ঠিক বন্ধুর মত। আনন্দ-বেদনায় ও আমার কাছে ছুটে আসতো—নানা প্রশ্নের উত্তর জানবার জন্য আমাকে ব্যস্ত করে তুলতো। তা তোমার নাম কি? তোমরা ক'ভাই-বোন।

—আমার নাম শোভন। আমার ছোট দু'ভাই এক বোন।

'শোভন' নামটা শুনে সুমথনাথ কেমন যেন আনমনা হ'য়ে গেল। কোন এক মুছে-যাওয়া অধ্যায়ের অত্যন্ত নিকটবর্তী হয়ে কত ছবি, কত কথা, কত রাত্রি ও দিনের বিচিত্র ঘটনা চোখে উপ্‌চে পড়তে লাগলো। নিজেকে তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে সুমথনাথ খুব সহজ হয়ে গেল।

শোভনকে কাছে টেনে নিয়ে বসালেন। নানা কথা জিজ্ঞাসাবাদের পর শোভন একটু নরম ভাবে সুমথনাথকে বললো, "জ্যাঠামশাই, বাবা মৃত্যুশয্যায় আমাকে একখানা চিঠি দিয়েছিলেন। সেই চিঠিখানা মা'র কাছে ছিল এতদিন। কোনদিন এর বিশেষ প্রয়োজন মনে করিনি। অস্পষ্ট ভাবে বাবা আমায় চিঠিটি হাতে দিয়ে বলেছিলেন 'খুব বিপদে পড়লে চিঠিটা পড়ো'। আজ আমার জীবনে, সংসারে একটা ভয়ানক বিপদ, অভাবনীয় দুর্ভাগ্যজনিত পারিবারিক অশান্তি—তাই মা'র কাছ হ'তে ঐ চিঠি নিয়ে পড়েছি"—এই বলে পকেট হতে ভাঁজ করা চিঠিটা সুমথনাথের হাতে দিল; 'আমাকে বলুন, আপনি সব জানেন; বরানগরের কৈলাস দত্তের স্ত্রীর সহিত আমার কি সম্পর্ক, কেন তিনি অফিসে, মাঠে, বাড়ীতে আমার সাথে দেখা করতে আসেন—আমার পারিবারিক শান্তি পর্যন্ত নষ্ট হ'তে চ'লেছে। মা পর্যন্ত নীরব। বার বার জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, বাবা নাকি শপথ করিয়েছিলেন তিনি যা জানেন তা কোনদিন প্রকাশ ক'রবেন না। জ্যাঠামশাই, আমি তাই ছুটে এসেছি আপনার কাছে। জগতে আজ আর আমার কেউ এমন আপনজন নেই, যার কাছে আমার জীবনের প্রচ্ছন্ন কোন কথা জানতে পারি, যিনি সাক্ষ্য দিতে পারেন!" চোখ দুটো শোভনের বেদনায় বন্যা হয়ে দেখা দিল। চিঠিটা খুলে পড়ল সুমথনাথ। চিঠির দুটো অংশ—প্রথম অংশে শোভনকে ও দ্বিতীয় অংশে সুমথনাথকে উদ্দেশ্য করে লেখা।

শোভন,

তোমার জীবনের গভীর বেদনায় এ পত্র খানি পড়িও। আমার জীবনের কিছু ঘটনা আছে যা বহু চেষ্টা ক'রেও সম্পূর্ণ মুছতে পারিনি। আমার অবর্তমানে যদি কোন দিন আমারই কারণে বেদনা পাও তবে তার সন্ধান করো। এর জন্য' তোমার মা'কে কিছুমাত্র বিব্রত করো না। আমার সব কথা জানেন এমন একজনকে আমি, এই পত্রে অনুরোধ করলাম, তিনি তোমায় সব বিস্তারিত বলবেন।

ইতি

শুভার্থী

তোমার বাবা

শ্রদ্ধেয় কবি দা,

পত্রবাহক আমার প্রথম পুত্র শোভন। আপনার

দেওয়া নাম। আমার জীবনের যে অংশটি শোভনের সহিত জড়িত তার সবটুকুর একমাত্র সাক্ষী আপনি। আপনার আশীর্বাদ ও নির্দেশে এতকাল এ দেহখানা বহন করেছি—আমার অবর্তমানে শোভনের সকল ভাবনা আপনার উপর রেখে গেলাম। আপনি আমার হয়ে ওকে সব বলবেন, যা পিতা হ'য়ে আমি বল্‌তে পারিনি, সুযোগও পাইনি। আজ হয়তো সময় হয়েছে—প্রতিশোধ নয়, শুধু সত্যকে আর একবার যাচাই করতে চাই আমার পুত্রের মাধ্যমে। আপনি ও বৌদি আমার প্রণাম ও শ্রদ্ধা গ্রহণ করবেন।

ইতি
আপনার
অজিত।

চিঠির শেষ অংশে ইংরাজীতে লেখা ছিল,

Sj. Sumath nath Roy
(Kabi Da)
156, P. G. M. Road
Calcutta—26

চিঠি পড়া শেষ হ'লে সুমথনাথ শোভনকে বললো,—'অবশেষে আমার উপর ভার এলো—তা সম্পূর্ণ করবো—তোমার বাবা ছিলেন অত্যন্ত অভিমানী, একান্তভাবে সত্যের প্রতি নিষ্ঠাবান। যা হোক—দু' চার দিন কলকাতায় আমার কাছেই থাক। সব বলব, সব বলব'।

সুযশা স্নানাদি সেরে ঘরে ঢুকে বলল, 'তোমরা দু'জনে স্নান সেরে ফেল। আমার রান্না প্রায় হয়ে গেছে।'

'আপনি আমার জ্যাঠাইমা? বাবা মার কাছে, আপনার কথা কত শুনেছি" শোভন এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করল।

'সুযশা, ও আমাদের অজিতের বড় ছেলে, শোভন। কলকাতায় এসেছে আমাদের এখানেই ক'দিন থাকবে।' সুমথনাথ বললো।

"তা বেশ! কিন্তু আর বেশী দেরী করলে কলের জল চলে যাবে। তোমার কাপড় তোয়ালে তেল এখানে রেখেছি, শোভন তোমার জন্য......"

না জ্যাঠাইমা, আমি প্রস্তুত হ'য়েই এসেছি।'

* * *

। তিন।

২০ বৎসর পূর্বে অজিত গুপ্তের কাছে যে ভয়-ভাবনা কথা সুমথনাথ উল্লেখ করেছিল আজ তা সত্যে পরিণত হল। এর জন্য সুমথনাথ প্রস্তুত ছিল না। ব্যক্তিগত জীবনে সে সাহিত্য আলোচনা একটু সামাজিক কল্যাণকর কাজে এবং অধিকাংশ সময় পুঁথিপুস্তকে নিজেকে নিয়োজিত রাখে। কোন সমস্যাজড়িত ঘটনায় নিজে এগিয়ে যেতে চায় না। অথচ এ জীবনটাতে বহু সমস্যার সমাধানে বিশেষ ভূমিকা সুমথনাথকে গ্রহণ করতে হয়েছে। সুযশার সাথে ওর পরিচয় এমনি কোন একটি ঘটনার মাধ্যমে। সুযশা তখন একটি ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রী। দেশ-বিভাগের পর একটি উদ্বাস্ত পল্লীতে ওদের দু'জনের পরিচয় প্রথমটা। খুব গভীর না হ'লেও সুযশা, সুমথনাথের নানা জটিল কর্মের ছায়াসঙ্গিনী। সাহিত্যের প্রতি মনোনিবেশ এবং প্রতিভা সুযশাকে বিশেষভাবে আলোড়িত করেছে সর্বক্ষণ। কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারেনি কোনদিন ও কি চায়।

এদিকে সুমথনাথও কোন বিশেষ ব্যাপার এলেই সুযশাকে ডাকত, ওর উপর নির্ভর করত। একদিন এমনি এক সাধারণ ঘটনায় দু'জনে খুব কাছে এল—বুঝতে পারল দু'জনের অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষা। যথাবিহিত ভাবে সুমথনাথ সুযশাকে বিয়ে করল; বিয়ের পর স্বামীর অকুণ্ঠ চেষ্টায় সুযশা বাঙ্‌লা সাহিত্যে এম, এ পরীক্ষায় ভালভাবে উত্তীর্ণা হ'ল—এবং কয়েকদিনের মধ্যে একটি মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপিকা পদে প্রতিষ্ঠিতা হ'ল।

স্বামীর প্রতি সুযশার নজর খুব বেশী। কোনদিন এতটুকু অসুবিধা যাতে না হয়, তার জন্য কতভাবে কত চিন্তা। স্বামী-স্ত্রীতে ওরা পরম সুখে পরম আনন্দে আছে।

রাত্রিতে শোবার সময় সুমথনাথ সুযশাকে বলল—'বড় সমস্যায় পড়েছি। অজিতের জীবনের প্রচ্ছন্ন ঘটনা কি ভাবে যে শোভনকে বলি! তা ছাড়া, যে মেয়েটিকে কেন্দ্র করে সে সব ঘটেছিল সে আজ বিধবা। একদিন বড় ঘরের গৃহিণী—একটি পুত্রও এসেছিল, কিন্তু রইল না—বর্তমানে এককভাবে জীবন-যাপন করছে নানা সেবাকর্মের মাধ্যমে।

সুযশাও ভাবে। কিন্তু স্বামীকে এর আগে এমনটা ক্লান্ত সে দেখেনি। তাই ওর ভাবনা স্বামীর কষ্ট লাঘবের জন্য। তাই বলে, 'আচ্ছা, তুমি তো আমায় সব বলেছ—আমি যদি শোভনকে ধীরে ধীরে বলে দি—তা হ'লে?'

"তা না হয় বললে, কিন্তু এর পরিণতি কি হবে একবার ভেবে দেখছ সুযশা?"

"সত্যকে তো চাপা দিয়ে রাখা যাবে না!" বলে সুযশা।

জানি, তা জানি, তাই তো আমি বিশ বছর আগে অজিতকে বলেছিলাম, বিয়ে করবার আগে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখ, যদি মেয়েটির মা বাবাকে রাজী করা যায়। কিছুতে শুন্‌লে না—আরও বললে, কবিদা, আপনি আমাকে ওকথা বলবেন না। আপনারা নারীর মাহাত্ম্য, সতীত্ব ধর্ম সম্পর্কে কত কথা লেখেন, পড়েন—কিন্তু আমার কাছে এ কোন নারী এল! নিজের সদ্যোজাত সন্তানকে বেদনাহীন হৃদয়ে অস্বীকার করে?—

জান সুযশা, সেদিন অজিতের চোখে অগ্নিবন্যা লক্ষ্য করেছিলাম—একটা দৃঢ়প্রত্যয় যেন ওর চেতনাকে গভীর ভাবে নাড়া দিয়েছে, শক্তি দিয়েছে। সেদিন আমি একান্তই স্তব্ধপ্রায়।"

দুজনেই চুপ। একটা নীরবতা যেন উভয়কে কিছুক্ষণের জন্য কেমন যেন নিঃসঙ্গ নির্জনতার বেদনায় আচ্ছন্ন করল—সুমথনাথ এগিয়ে গিয়ে সুযশার হাত ধরল—চোখে চোখ রেখে বলল, সুযশা তুমি কি এমন নিষ্ঠুর হতে পারতে?'

সুযশার চোখ দুটো ভেসে গেল। স্বামীর চিবুকে মুখখানা লুকিয়ে রেখে পরম নির্ভয়ে চুপ করে রইল।

বাতিটি নিভিয়ে দিল সুমথনাথ।

* * *

চার

সকালে সুমথনাথ ঠিক ক'রল—অজিত গুপ্তের প্রচ্ছন্ন ঘটনা সে একটি কাগজে বিস্তারিত লিখবে এবং সেটা শোভনকে দেবে। তাই যথাসম্ভব নির্জনতার মধ্যে এ বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে।

এদিকে শোভন ঘুম হতে উঠেই হাত-মুখ-ধুয়ে জ্যাঠামশাইয়ের পড়ার ঘরে এসে হাজির। সুযশা জলখাবার নিয়ে এ'ল। সুমথনাথ শোভনকে দেখেই খুব সহজভাবে বললেন, শোভন, তুমি যে জন্য আমার কাছে এসেছ তারজন্য আমাকে একটু সময় দিতে হবে। বহুদিন পূর্বেকার ঘটনা—স্মৃতি-মন্থন করতে হবে।' এ'-কটা দিন তুমি এখানে থাকতে পার। তবে একটা কথা তোমাকে বলছি, আমি যা জানি সবটুকু চেষ্টা করব লিখে বিস্তারিত করতে। কারণ তাতে তোমার সুবিধে হ'বে, তোমার বাবাকেও তৎ-সম্পর্কিত উল্লিখিত ঘটনাবলী সম্পর্কে নিজস্ব মত ও পথ বিবেচিত করতে। আবেগের উত্তেজনায় যাতে আমাদের সকল প্রচেষ্টা নষ্ট না হয় তার জন্য আমাকে ভাবতে হবে—তবে যা লিখব তা সবটাই সত্য, এবং যা সত্য তাই চিরকালের জন্য নির্লিপ্ত ভাবে রেখে যাব। এতটুকু ভয় বা সংকোচ তাতে আসবে না।"

সকলেই চুপ। একটা বোবা আশঙ্কা শোভনের হৃদয়কে ভারাক্রান্ত ক'রে তুলছে অনবরত। মুখে কিছু বলতে পারছে না, কিন্তু মানসিক অস্থিরতা দেহে মনে বেশ প্রভাব বিস্তার করছে।

সুযশা শোভনের খুব কাছে এসে মাথায় হাত বুলাতেই শোভন জ্যাঠাইমার মুখের দিকে তাকাল, কাপড়ে মুখ লুকিয়ে চাপা কান্নায় গুমরে উঠে বললে, জ্যাঠাইমা, আমি যে হারিয়ে যাচ্ছি! আমার সাথে সেই ভদ্রমহিলার কি সম্পর্ক, কেন ওকে দেখার পর রাগ হ'লেও কিছু বলতে পারিনি, মন প্রাণ যেন কোথাকার কোন সূত্রের ছিন্ন বেদনায় আচ্ছন্ন হ'য়ে আসে। বার বার নানাভাবে নিজেকে, মা'কে প্রশ্ন করেছি—কোথাও এতটুকু উত্তর পাইনি। শুধু অসহায় ভাবে ভেবেছি, কেঁদেছি। আজ আপনাদের কাছে এসে আমার মনে হচ্ছে তাঁর সাথে আমার কিছু একটা সম্পর্ক জড়িত। কি সে সম্পর্ক, আপনি আমায় বলুন, জ্যাঠাইমা।"

শোভনের বেদনা সুযশাকে, ওর মাতৃহৃদয়কে জাগিয়ে তুলল। বার বার ওর মাথা তুলে ধরতেই সুযশা কেমন যেন হয়ে যায়। সুমথনাথ অন্য ঘরে চলে যায়।

'শোভন, উনি তোমায় সব জানাবেন, একটু ধৈর্য ধর।' সুযশা আর্দ্র কণ্ঠে বলে।

"তা আমি সব জানব, কিন্তু তবু আপনি শুধু আমায়

বলুন, ও'র সাথে আমার কি সম্পর্ক।" শোভন আবার কাঁদতে কাঁদতে বলে।

"শোভন, শোন, যে ভদ্রমহিলার কথা তুমি বলছ তাকে আমি দেখিনি, বর্তমানে কোথায় আছেন তাও আমরা জানি না; তবে তোমার কথা শু'নে যতদূর আমার ধারণা তিনি তোমার······"

এগিয়ে আসে শোভন : আরও কাছে :

"আমার······"

···"তোমার মা,"

আবার সব নীরব।

* * *

॥ পাঁচ ॥

যেদিন সন্ধ্যায় সুমথনাথ শোভনের পিতা অজিতগুপ্তের অতীত জীবনের কাহিনীটি খুব সংক্ষেপে লিখেছে।

কুড়ি বছর আগের কথা। তখন অজিত টালীগঞ্জের এক বর্ধিষ্ণু পল্লীতে বাস করত। আমার সাথে সেখানেই নানা ঘটনায় ও প্রতিবেশীরূপে পরিচয়। খুব অল্প দিনের মধ্যে পল্লীর অনেকেই অনেকের খুব আপন হয়ে গেল। বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন রুচি ও স্তরের লোক, কিন্তু পরিবেশের প্রভাবে সকলেই যেন একই পরিবারস্থ লোক-জন। এমনি ভাবে পাড়ার একটি বাড়ীতে অজিত খুব যাওয়া আসা করত। অজিত তখন কলেজে পড়ে। অর্থ চিন্তা নেই, দাদারা ব্যবসা করেন—তাই ঢালা টাকা। তার সুযোগ পেত অজিত সবটুকু। সেই বাড়ীতে দু'টি মেয়ে, একটি ছেলে ও স্ত্রী সহ কালীপ্রসন্ন রায় বাস করতেন। কালীপ্রসন্নবাবু সাধারণ চাকুরী করতেন—স্বভাবতঃ অভাব তীব্র। এই অভাবের মাঝে ছোট মেয়েটি (বয়স ১৩।১৪) ফুটে উঠছে। অজিতের ভাল লাগল ইন্দ্রাণীকে। মা' বিশেষ বারণ করেননি। অর্থ সাহায্য মাঝে মাঝে ওদের সংসারকে স্বচ্ছলতা দিত। কিন্তু কেউ এতটুকু ভাবত না। এমনিভাবে চলে বহুদিন। বড় বোনের বিয়ের পর বাড়ীতে অবাধ গতি হ'ল অজিতের। ইন্দ্রাণীর কাছে কাছে অজিত; অজিতের জন্য কাতর ইন্দ্রাণী। ইন্দ্রাণী তখন স্কুলে দশম শ্রেণীতে পড়ে।

এমনি অবস্থায় বহু দ্বিপ্রহর, বহু সন্ধ্যা ইন্দ্রাণী আর অজিত—। বছর খানেকের মধ্যে একদিন যখন জানা গেল ইন্দ্রাণী মা' হতে চলেছে, তখন কালীপ্রসন্নবাবু সচেতন হলেন। স্ত্রীকে অভিযোগ করেন। কাহারও সাথে পরামর্শ না করে কালীপ্রসন্নবাবু ও তার স্ত্রী ঠিক করলেন, যেমন করেই হোক গর্ভনাশ করতে হবে। তার জন্য চাই অর্থ। অজিত যখন ব্যাপারটা জানতে পারল তখন প্রথমটা খুব ঘাবড়ে গেল; কিন্তু সত্যকে অস্বীকার করতে পারল না। বিরাট কলকাতায় ওর সব জানা নেই, কি করবে চিন্তার অন্ত নেই; কিন্তু 'গর্ভনাশ' এ কথাটা মোটেই ওর মনে এতটুকুও প্রশ্রয় পেল না। বরং ইন্দ্রাণীর মা সে সম্পর্কে কিছু বলতে এসেছে, অজিত ক্ষুব্ধ হয়েছে। ইন্দ্রাণীকে মা, বাবা খুব বোঝাচ্ছে; পাড়ার কলঙ্ক, ভবিষ্যৎ জীবনের কলঙ্ক ইত্যাদি। ইন্দ্রাণীও কেমন যেন কাঁচা মনে মা'র কথা ভাবে; বন্ধুরা জানতে পারলে কি বলবে! এত অল্প বয়সে জীবনের সব শেষ; ইত্যাদি ভাবতে ভাবতে প্রায় একরকম নিজে ঠিক করল গোপনে ডাক্তারের পরামর্শ নেবে, গর্ভনাশ করবে। কিন্তু অজিত অচল, অটল। সন্তানকে তার বাঁচাতে হবে। এত বড় সত্যের অপলাপ সে করতে দেবে না। তাই বলেছিলো—"ইন্দ্রাণী তুমি না মেয়ে, তোমরা না মা হ'বে—তোমাদের মুখ. দিয়ে একথা কেন?" ইন্দ্রাণী চুপ করে থাকে; তর্ক করতে চায় কিন্তু আবার চুপ থেকে যায়।

—এতদিন জেনেছি পুরুষরা লম্পট; মেয়েদের নিঃশেষ করে দিয়ে পালিয়ে যায়—কিন্তু আজ এ কি হল! পুরুষ কামনার দস্যুতা করে আত্মগোপন করে, নারী তার ফল ভোগ করে—সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ভাগ্যের হাতে নিজেকে সমর্পণ ক'রে মাতৃত্বের পরিচয় দান করে এসেছে। কিন্তু আজ এটা কি হ'ল—"অজিত ভাবে, উত্তেজিত হয় কিন্তু সত্য থেকে সরে যায় না, এতটুকু মান অপমান কলঙ্কের কথা ওর মনে আসে না।"

এত কথায়ও ইন্দ্রাণী রাজী হয় না। বরং সে বলে—'তুমি আমার যৌবন, জীবন, ভবিষ্যৎ সব শেষ করেছ'—

কিন্তু পাল্টা উত্তর অজিত দেয়নি। নিজের অন্যায়কে স্বীকার করে একা। শুধু সেদিন বলেছিল, 'ইন্দ্রাণী তুমি সন্তান নষ্ট করো না; আমি সন্তানকে প্রতিপালন

করবো। সন্তান প্রসবের জন্ত আমি যথারীতি দূরে ব্যবস্থা করবো, তুমি দয়া ক'রে আমার এ আবেদনটুকু রক্ষা কর; তোমায় কথা দিচ্ছি, কোনদিন তোমার ভবিষ্যৎ জীবনে এই সন্তান অন্তরায় হবে না। তুমি যেমনটি ছিলে, তেমনটি থাকবে। শুধু আমাকে আমার সন্তান দাও; আর এতটুকু তোমায় যন্ত্রণা দেব না—" অজিত সেদিন কেঁদেছিল।

ইন্দ্রাণীর বাবা পাশের ঘরে বসে সব শুনছিলেন। নরমস্বরে বলেছিলেন, 'অজিত, তুমি এখন যাও; যা হ'বে তোমাকে জানিয়ে হ'বে।'

কালীপ্রসন্নবাবুর ইচ্ছা ছিল অজিত-ইন্দ্রাণীর বিয়ে দিয়ে দেন। কিন্তু অজিতের বাড়ীর লোকে রাজী হবে না বুঝে ইন্দ্রাণী এবং ইন্দ্রাণীর মা তাতে বেঁকে বসল।

অজিত বালীতে একটি বাড়ী ভাড়া করল; সেখানে ইন্দ্রাণী ও ওর মাকে নিয়ে গেল। ভাল নার্সিংহোমে মোটা টাকা খর্চ ক'রে প্রসব করাবার সব ব্যবস্থা ও ক'রল। বাড়ীতে কেউ যাতে সন্দেহ না করে তার জন্ত অজিত পল্লীতে দিনের বেলায় আধমরা হ'য়ে ঘুরে বেড়াত; সন্ধ্যায় 'বন্ধুর বাড়ীতে শুতে যেতে হবে' এই ব'লে বালী চলে যেত, আবার ভোরবেলা ফিরে আসত।

২রা নভেম্বর ইন্দ্রাণীর ছেলে হ'ল—কিন্তু আশ্চর্য এই যে, ঐদিন রাত্রিতেই কাঁচা ঘায়ের বেদনা ও অসুস্থতা বহন করেই ইন্দ্রাণী মাকে সাথে করে নার্সিংহোম হ'তে ফিরে আসতে চাইল; নবজাত সন্তানের প্রতি এতটুকু ফিরে তাকাল না। অজিত সেদিন সর্বত্র অন্ধকার দেখল। কি করবে সে এই শিশুটিকে নিয়ে। কিন্তু নানা বিপর্যয়ের মধ্যেও তার একবারটি মনে হয়নি নবজাতককে সরিয়ে ফেলতে। নানা অনুনয়ের পর ইন্দ্রাণী ৭দিন রইল নার্সিংহোমে; তারপর মায়ের সাথে বালী ছেড়ে গেল। অজিত তখন একা। তার এ বিপদের কথা রণেন দাস বলে এক বন্ধু জানত। ঐদিনই সে খবর জানতে এসে অজিতকে দেখল ঘরের মেঝেতে শুয়ে, বুকে হাত দিয়ে চেপে রেখেছে নবজাত শিশুকে। খুব আস্তে নীরবে ঘরে এল—তারপর কাছে বসে অজিতের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলেছিল, 'অজিত, তোর ভয় নেই—আমার কাছে দে ওকে, আমার মাকে সব বলেছি; তিনি এ ছেলের ভার নেবেন। যতদিন না ও বড় হয় ওর দেখা-শোনার সব ভার আমাদের।'

বেদনা গ'লে ধারায় ঝরলো দু'চোখ বয়ে।

মাস দুই পর আমার কাছে একদিন এল। আমি তখন পড়ার ঘরে একা। বুঝতে পারলাম অজিত কি যেন বলতে এসেছে। নিজেই বললাম, কেমন আছ অজিত? কথাটা শেষ না হতেই সে আমার পা জড়িয়ে ধরে বললে, কবি-দা আজ আপনাকে একটা কথা বলব, আমাকে ঘৃণা করবেন না?'—আমি অত্যন্ত বিব্রত হলাম। বুকে জড়িয়ে ধরে বললাম, অজিত, চঞ্চল হয়েছ কেন? বল কি বলতে এসেছ, তোমাদের কবি-দাকে তো জান?

সব বললে। এমনভাবে সেদিন অজিত বললে, আমার পর্যন্ত বেদনা জেগেছিল; বিশ্বাস করতে পারছিলাম না —কেন ইন্দ্রাণী এমন হল—কি ক'রে সম্ভব মেয়েদের জীবনে এরূপ অন্যায়! পরক্ষণেই বললাম, অজিত, ইন্দ্রাণীকে দোষারোপ করো না। ও বুঝতে পারছে না; বয়স ওর কতটুকু!—সে বোধ যখন আসবে তখন দেখবে কান্নায় কান্নায় সে ছুটে বেড়াবে। মহাভারতের কুন্তির কথা মনে পড়ে?

তুমি যা করেছ, খুব শোভন কাজই করেছ। এর জন্ত তোমাকে আমার ভালবাসা, শ্রদ্ধা জানাই। আমি হয়ত এতটা পারতাম না।"

—'ছেলেটির নাম একটা করুন'—অজিত বলল।

—নাম! 'শোভন' এ নামই থাক—এর জীবনে তোমার ব্যবহার ও কৃতি শোভন বলেই ওর নাম 'শোভন'।

সকলের অন্তরালে থেকে থেকে অজিত এর ওর কাছ হ'তে পয়সা সংগ্রহ ক'রে সেই বন্ধুর বাড়ীতে পুত্রের সকল রকম ব্যবস্থা করছে। ইতিমধ্যে অজিত আই, এ পাশ করল—টাইপ শিখল—কিছুদিনের মধ্যে চাকুরিও পেল।

আর ঐ দিকে ইন্দ্রাণীও পাশ ক'রল, ভর্তি হ'ল কলেজে। ওদের কাছ হতে শুধু একদিন ইন্দ্রাণীর মা অজিতকে ডেকে বলেছিল, "যা হবার হয়ে গেছে, ছেলেটিকে আমায় দাও, ইন্দ্রাণীর বড় বোনের ছেলে নেই—ও বলেছে ওকে পালবে।"

সে দিনের এ কথার উত্তর অজিত দিয়েছিল—তবে খুব সংক্ষেপে—'আমি পিতা হয়ে তা পারি না।'

এমনিভাবে চলল জীবনের বিচিত্র রূপান্তর। তারপর বহুদিন দেখা নেই। একদিন সকালে একটা চিঠি এ'ল—'কবি-দা আমি বিয়ে করতে চাই'।

প্রমাদ গণলাম। লিখলাম, 'বিয়ে তোমার করা একান্ত প্রয়োজন এবং উচিত। এ বিষয়ে তুমি ইন্দ্রাণীর কথা একটু ভাবতে পার—হয়ত ইতিমধ্যে ওর মত পরিবর্তন হতে পারে—কালীপ্রসন্নবাবু তো রাজী ছিলেন—বর্তমান অবস্থায় তুমি যদি বল, আমি এগিয়ে গিয়ে তোমার ও ইন্দ্রাণীর বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারি। যদিও প্রশ্নটা সম্পূর্ণ তোমার উপর—: আমার ভয় হয়, ইন্দ্রাণী ছাড়া যদি আর কাউকে তুমি গ্রহণ কর—ভগবান না করুন, পরবর্তী জীবনে তোমার শোভনের কোন বিপদ হতে পারে। যা ভাল বুঝবে করবে—কবি-দা তোমার কাছেই থাকবে!'

উত্তর ওর পেয়েছিলাম। ওর একটি কথাই শুধু আজ মনে আছে; ও লিখেছিল, 'দুঃখ আসুক সহ্য করব—কিন্তু বঞ্চনা বা অনুগ্রহ আর আকাঙ্ক্ষা করি না।'

তারপর কয়েক দিনের মধ্যেই অজিত বিয়ে করল। সেই বিবাহিত স্ত্রীই তোমাদের বর্তমান মা—আমাদের সুষমা দেবী।

শোভন, তোমার মা ইন্দ্রাণী এখন কোথায় আছেন তা আমার জানা নেই। আমার যতটুকু স্মরণ হয়, ওর বিয়ে হয়েছিল বরানগরের কৈলাসচন্দ্র দত্তের সাথে। এর পরের কোন খবর আমার জানা নেই। যদি কোনদিন তাঁর সন্ধান পাও, অন্ততঃ নিজের অভিমান জয় করে একবার স্বীকৃতির প্রণাম দিও।

* * *

॥ ছয় ॥

মাতৃত্বের আদিম স্বাদ কি কখনো ভোলা যায়। শত-পুত্রেও সেই তৃপ্তি নেই, নেই তেমন ক'রে মা হবার আনন্দ।

কালীপ্রসন্নবাবু সেদিন যদি বা নরম, ইন্দ্রাণীর মা কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত।

সংসারে এমনিতর অঘটন ঘটে যাওয়ায় পাড়ায় খুব সচেতন হ'য়ে দিন কাটাতে হয় ওদের। খুব একটা মেশামেশি ইন্দ্রাণী আর ক'রে না। পড়াশোনা ছাড়া যতক্ষণ অবসর পায় সেটুকু মায়ের কাছে কাছে থাকে, পাছে কোন অসংলগ্ন কথা বা চিন্তা এসে ওর চিত্তকে বিব্রত ক'রে। বাড়ীতে কেউ এলে ইন্দ্রাণী নিজেকে যতটা সম্ভব আত্মগোপন ক'রে রাখে। কথা খুব কম বলে, বন্ধুরা তার জন্য ওকে নানা ভাবে অভিযোগ ক'রে—কিন্তু ইন্দ্রাণী এমন ভাণ ক'রে যে, সে লেখাপড়া ছাড়া এখন বিশেষ কিছুতে জড়াতে চায় না। সিনেমা থিয়েটার প্রায় বন্ধ।

প্রাণ খুলে হাসতে চায়, কিন্তু কোথায় যেন হোঁচট্ খায়। স্বতঃ-উৎসারিত আবেগে এদিক ওদিক দৌড়াতে চায়, এটা ওটার জন্য মন কেমন যেন একটু নড়ে উঠে—কিন্তু তখনই একটি কথা মনে হয়—সব যেন বিবর্ণ হয়ে যায়। আলগা হাসিতে ঘরে ফিরে এসে কখনো বিছানায় মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ে, কখনো বা ভেতরের ঘরের বারান্দায় পায়চারি করে। হঠাৎ দু'একদিন অজিতকে দেখতে পায়—একটু সরে যায় ইন্দ্রাণী, আড়ালে লুকিয়ে রাখে নিজেকে মাথা হেঁট করে—কত কি ভাবে, তারপর একটা কি যেন ভাবতে ভাবতে আবার বইপত্তর নিয়ে বসে।

এমনি ভাবে চলল কয়েক বৎসর। বয়স বাড়ল, মাতৃত্বের ক্রোড়ায় যেন বিরাট শূন্যতা ওর সর্বস্ব জুড়ে দেখা দিতে লাগল। যৌবনের স্বাভাবিক প্রকাশ যদিও সর্ব অঙ্গে ছড়িয়ে আছে কিন্তু লাবণ্যের মাধুরিমা যেন কোথায় একটু দ্বিধাগ্রস্ত। মাঝে মাঝে কোন এক অদৃশ্য হাতছানি ওর জোড়া বুকে তছ্‌নছ্ করে দিয়ে লুকিয়ে যায়—তখন একান্তভাবে কেমন যেন উৎকণ্ঠা সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করে ক্লান্ত করে দেয়, অবশ হয়ে যায় ওর সর্বস্ব। বুঝতে সে পারে—কিন্তু কি যে করবে, কি করা উচিত খুব একটা খুঁজে পায় না নিজের মধ্যে।

তাই সেদিন ইন্দ্রাণী মাকে বলেছিল,—মা তোমরা আমার বিয়ের জন্য এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? আমি তো তোমাদের ছোট মেয়ে, আরও একটু লেখাপড়া ক'রে তোমাদের দেখবো, সেবা করবো—সেই তো ভাল—তা ছাড়া···" শেষ করতে পারল না ইন্দ্রাণী।

ইন্দ্রাণীর মার সেদিনের কথার উত্তর ওকে খুব একটা প্রফুল্লতা দিল না। "মেয়ে বড় হয়েছে, তোমার বিয়ে না

দিলে আমাদের কুৎসা হবে ?' উত্তরে কিছু না বলে ইন্দ্রাণী অন্যত্র চলে গেল। মাও পিছন পিছন গেলেন—নিকটে এসে বলেন, 'ইন্দ্রাণী, তুমি কি…'

…"মা আমার ছেলে বেঁচে আছে—সেখানেই আমাকে কথাটা কেড়ে নিয়ে ইন্দ্রাণী মাকে বললে, কিন্তু নিজেও শেষ করতে পারলে না। চোখ দুটো বাঁধ ভাঙা জলে ভেসে গেল।

…"না, না, ইন্দ্রাণী আজ আর তা হয় না—তুমি ভুলে যাও, ভুলে যাও সে সব দিনের কথা—এখন তোমাকে নূতন জীবন যাপন করতে হবে—এতদিনের আমার সকল সাধনা, সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে—যদি তুমি স্থির না হও—তা ছাড়া তোমাকেও বাঁচতে হবে, তাই তোমার চাই শক্তি। যা হবার নয়, তা নিয়ে ভেবে ভেবে নিজের সর্বনাশ ডেকে এনো না ইন্দ্রাণী।"

…"ভুলতে পারছি কই ? দীর্ঘ কয়েক বৎসর অবিশ্রাম চেষ্টা চলেছে ভুলে যাবার—শৈশবের গ্লানি যে আজ আমার সর্ব অঙ্গ জুড়ে দেখা দিতে চায়—মা, তুমি মা হয়ে আমাকে কেন অন্য পথ দেখালে—আমি যে একটা বিরাট মিথ্যাকে বহন করে চলেছি, এর জন্য আমাকে একদিন পথে নেমে আসতে হবে—তা আমি জানি।…" কাঁদতে কাঁদতে কেমন যেন হয়ে যায় ইন্দ্রাণী।

কিন্তু ইন্দ্রাণীর আজ আর কোন পথ নেই ; সে যদি ফিরে যেতে চায় ছেলের জন্য, সেখানেও তার স্থান নেই। সুতরাং ইন্দ্রাণীর মা নানাভাবে ও কথায় ওর চিত্তকে আবার দখল করলো—মেনে নিল মার সকল কথা এবং চিন্তা।

কালীপ্রসন্নবাবু এ বিষয়ে একেবারেই দূরে সরে থাকতে চান। সাংসারিক ঝামেলায় নিজেকে জড়াতে সম্পূর্ণভাবে বীতরাগ। কিন্তু ইন্দ্রাণী সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত তার সংসারে হয়েছে তাকে স্বীকার করতে না পারলেও এর প্রতিবাদ তিনি কোনদিন করেননি। মাঝে মাঝে মেয়েকে একলা পেলে দু'চার কথা বলতে চেষ্টা করেন কালীপ্রসন্নবাবু। তিনি বলেন—"মেয়েদের সবচেয়ে বড় ধর্ম সন্তানকে স্বীকার করা এবং তার জন্য আপন সুখ ও আনন্দ উজাড় করে দিয়ে 'মা' এই সত্যে সর্বস্ব সঁপে দেওয়া।'

কিন্তু তাতেও খুব একটা লাভ হ'ল না। অবশেষে মাতুলালয়ের সহযোগিতায় ইন্দ্রাণীর বিয়ের ব্যবস্থা হ'ল বরানগরের কৈলাস দত্তের সহিত। যথাবিহিত সমাদরে ও অনুষ্ঠানে উৎসব পালিত হ'ল। ইন্দ্রাণী বৈধজীবনের সুখানন্দের বিচিত্র কল্পনায় মশগুল্—নূতন ক'রে জীবনের আস্বাদনে ভরপুর।

॥ সাত ॥

ইন্দ্রাণীর সংসারে সবটাই যেন অফুরন্ত। স্বামী-স্ত্রীর নবজীবনের দিনলিপি মধুময় ; সংশয়হীন যৌবনের সহজাত উদ্দীপনায় ওদের হৃদয় ভরপুর। এমন আস্বাদন, এমন তীব্রতা জীবনে এর আগে যেন লাভ হয় নাই ! চলতি পথে মাঝে মাঝে কখনো বা ইন্দ্রাণী একটু সব কিছু হ'তে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, জীবনসত্যের শুকিয়েযাওয়া সেই ঘায়ে হঠাৎ এলোমেলো হয়ে যায় বাধাহীন গতিতে। তখনই সব যেন কেমন একটা আল্‌গা বলে বোধ হয়—চোখে দু' ফোটা জল জমে উঠ্‌তে চাইলেও তা ঝরতে সাহস করে না—আজ ইন্দ্রাণী এমন করে পাওয়া স্বামী-সংসারকে মিথ্যা ক'রে দেবে না—তাই তো খুব আস্তে আস্তে নিজের অগোচরের উত্তাপকে চাপা দিয়ে বলে, 'সব মিথ্যে, সব বাজে, ও সব চিন্তা করাও আমার পাপ…ইত্যাদি নানা কথায় সংসারের কাজে জোর করে লেগে যায়—আবার সব ঠিক হ'য়ে যায়—ইন্দ্রাণী সংসারের, স্বামী আত্মীয়স্বজন পরিবৃতা সুন্দরী বধূ।

মা হ'বার সময় 'নার্সিংহোমে'র ডাঃ সোম সন্দেহ প্রকাশ করছিলেন, বলেছিলেনও ইন্দ্রাণীকে। ইন্দ্রাণী সেদিন অস্বীকার করতে না পারলেও খুব সহজভাবে স্বীকার করেনি। গৃহে ফিরবার সময় ইন্দ্রাণী সব বলেছিল আর কেঁদেছিল। এ কান্না জীবনের সব সম্পদ উজাড় করে দিলে, ডাঃ সোমও স্থির থাকতে পারেনি সেদিন। নিজেই বলেছিল, 'আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন, আমার দ্বারা আপনার কোন ক্ষতি হবে না। যদি কোনদিন আমার প্রয়োজন হয়, আমাকে জানাবেন, নিজের ছোট ভাইয়ের মত করে জানাবেন।

॥ আট ॥

নবজাত শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে ইন্দ্রাণী যেদিন গৃহে এল, সেদিন সমস্ত পরিবার যেন তপস্যালব্ধ আশীর্বাদের আনন্দে মেতে উঠল। সর্বত্র একটা বাঁধভাঙা হাসি ও

কর্মের উৎসাহ। স্বামী কৈলাস দত্ত সকলের অন্তরালে ঘুরে, মাঝে মাঝে ইন্দ্রাণীকে—নবজাত পুত্রটিকে দেখার জন্য ছুটে যায়। ওদের সুখ ও আনন্দের প্রকাশ হয় শুধু চোখে চোখে মিষ্টি হাসিতে।

খুব খরচ ক'রে' পাড়াশুদ্ধ সকলকে নিমন্ত্রণ ক'রে শিশুপুত্রের নামকরণ হল—উৎসব হ'ল জন্মদিনের। ইন্দ্রাণীর পেছনে ফিরে তাকাবার এতটুকু অবসর ছিল না।

এমনি আনন্দে ও নব নব কল্পনায় ওদের সংসার এগিয়ে চলে। মাঝে মাঝে অনন্ত অবসর ইন্দ্রাণীর চেতনাকে একটু নাড়া দিতে চেষ্টা করে। জোর ক'রে ইন্দ্রাণী সব মন থেকে সরিয়ে দেয় নবলব্ধ পুত্রকে বুকে জড়িয়ে চুম্বনে চুম্বনে। কিন্তু রঙের দাগ কি ভোলা যায়—জমে থাকা বেদনা হঠাৎ সকল বাঁধ ভেঙ্গে লাল হয়ে উঠে—অকারণ বেগে সব তছ্‌নছ্‌ ক'রে দিয়ে যেতে চায়। তখন সব যেন কেমন এলোমেলো—সবটাই একটা বিড়ম্বনা। কেবল কান্না আর কান্না—এ কান্নার শেষ নেই, নেই ক্লান্তি।

ইন্দ্রাণীও কাঁদে—মুখ লুকিয়ে কাঁদে—গোপনে সকলের মধ্যে থেকেও কাঁদে—আবার জোর ক'রে নিজেরই মধ্যে বলে উঠে, "তা এমন একটু-আধটু হয়েই থাকে—তার জন্য এ জীবনের ব্রত করে পাওয়াকে কিছুতেই মলিন ক'রতে দেবো না—আমার স্বামী, পুত্র সংসার ভেসে যেতে দেবো না, দেবো না, সব মিথ্যে, মিথ্যে"—অবসন্ন হ'য়ে পড়ে ইন্দ্রাণী।

এমনিভাবে জীবনের ঘা মাঝে মাঝে জেগে ওঠে, আবার প্রশমিত হয়। কিন্তু মানসিক গ্লানি ইন্দ্রাণীর চেতনাকে শুদ্ধ করতে পারেনি কোনদিন।

স্বামীকে একমাত্র দেবতা জ্ঞান ক'রে যথাযথ সেবা ও নিষ্ঠার মাধ্যমে সংসার সুন্দর করে তুলছে।

কৈলাসবাবু ব্যবসায়ী। অত্যন্ত সাধারণভাবে জীবনের শুরু হয়েছিল। আজ পত্নীর ভাগ্যে ব্যবসা ভাল চলছে। তবে খুব পরিশ্রম। ভোর ৭টায় বেরিয়ে রাত ১১টায় বাড়ী আসেন। সারাটা দিন ইন্দ্রাণী সংসারের সকল কাজ নিজের হাতে সম্পূর্ণ করে—নিজের হাতে দুপুরের খাবার তৈরী করে দোকানে পাঠিয়ে দেয়। রাত্রিতে একা জেগে থাকে স্বামীর জন্য—প্রসাদ লাভ ক'রে—সেবা করে।

'তোমার শরীর খুব খারাপ হয়েছে—ক'দিন বিশ্রাম কর।'

সারাদিন খুব খাটুনী—রাত্রিতে ফিরে তোমাকে পাশে দেখতে পেলে সব ক্লান্তি আমার শেষ হয়ে যায়—তা ছাড়া খোকা এসেছে—ওর জন্য পরিশ্রম করতে হবে বৈকি ?'

বলতে বলতে কৈলাসবাবু ইন্দ্রাণীর হাত দুটো নিজের বুকের কাছে টেনে আনে।

চল কদিন আমরা বাইরে ঘুরে আসি। তোমার শরীর তখন বেশ বিশ্রাম পাবে—ইন্দ্রাণী বলে।

'বলছো! বেশ, এবারের পূজার সময় আমরা বাইরে যাব।

নয়

মানুষের জীবনের কত স্বপ্ন, কত আকাঙ্ক্ষা—কিন্তু শক্তি পরিমিত।

সেবার কলকাতা 'মহামারী নগর' বলে ঘোষিত হ'ল। অনেকে অনেক আপনজন হারিয়েছে—ইন্দ্রাণী ওর নবজাত পুত্রকেও। কলেরা—১০ ঘণ্টার মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেল। অনেক চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু থাকবার নয় যে—তাকে ধরে রাখা গেল না।

আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে ইন্দ্রাণী ; মাটীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চোখের জল ফেলে ইন্দ্রাণী : কেউ সমবেদনা জানাতে এলে দূরে সরে যায়—মাঝে মাঝে দরজা বন্ধ করে দিয়ে একা একা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়। কৈলাসবাবু কাছে আসতেই ইন্দ্রাণী ওর পায়ে লুটিয়ে পড়ে কাঁদে আর বলে, 'ওগো আমার খোকাকে ফিরিয়ে এনে দাও, ফিরিয়ে এনে দাও।' তারপর আবার কান্না, আর কান্না।

কৈলাসবাবুর চোখ দুটোও জলে ঘোলা হয়ে যায়। অনেক চেষ্টা করে নিজের বেদনা গোপন করে স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'ইন্দ্রাণী' যা হবার হয়ে গেছে—তুমি যদি এমনভাবে ভেঙ্গে পড় তবে আমি কার মুখ চেয়ে ঠিক থাকব। বল, বল ইন্দ্রাণী। আবার আমাদের খোকা আসবে—তুমি এমন করে কেঁদে কেঁদে আমাকে অসহায় করে দিও না।'

আরও বেশী বেগে কেঁদে বলে ইন্দ্রাণী—"ওগো, আমার সে ভাগ্য নেই—খোকা আর আমাদের আসবে না,' আমি

হতভাগী," বুকে কিসের একটা বেদনা বহন ক'রে সবটুকু প্রকাশ করতে পারে না—আবার কেঁদে উঠে।

'কি হয়েছে ইন্দ্রাণী! আমায় বল, আমায় বল ইন্দ্রাণী—"

মাথা নেড়ে স্বামীর বুকে মাথা লুকিয়ে কাঁদে ইন্দ্রাণী—কোন কথা বলে না।

প্রতিবেশিনী ইন্দ্রাণীকে তুলে নিয়ে যায়। কৈলাসবাবু একা বসে থাকে। বুঝতে যে পেরেছে—কিন্তু তবুও যেন বিশ্বাস করতে চায় না—ওদের আর সন্তান হবে না।

দশ

এর কিছুদিন পরই কৈলাসবাবু অসুস্থ হলেন। রক্ত-চাপ বৃদ্ধিতে হঠাৎ রাস্তায় অচৈতন্য হয়ে নার্সিং হোমে। ইন্দ্রাণী পুত্রশোক ভুলে গিয়ে বিশেষ অনুমতিতে রাত-দিন স্বামীর শয্যার পাশে। অপলক উৎকণ্ঠায় দীর্ঘ দুই মাস স্বামীর পরিচর্যা করে ইন্দ্রাণী। কিন্তু সব ব্যর্থ করে দিয়ে কৈলাসবাবু সরে পড়লেন। শুধু যাবার সময় স্ত্রীর হাত দুটো দিয়ে চোখ দুটো জড়ায়ে কি যেন বলতে গিয়ে আর বলতে পারলেন না।

ইন্দ্রাণী আজ একা। খুব নিজের বলতে এ সংসারে ওর আর কেউ রইলো না। পিত্রালয়ে মা বাবা বেঁচে—কিন্তু ইন্দ্রাণী সেদিক হতে একটু আলগা থাকতে চায়।

আত্মীয় পরিজন যাঁরা রয়েছেন, ইন্দ্রাণী তাদের খুব একটা পেতে চায় না। স্বামীর যা কিছু ছিল যতটা সম্ভব স্বামীর নামে, ছেলের নামে নানা বিদ্যালয়ে দান করে শোকের অবসন্নতাকে জয় করতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু এমন শূন্যতা কি কখনো কোনো সান্ত্বনায় শান্ত হয়? তবু ইন্দ্রাণী সব ভুলে থাকতে চায়, গান গায়, নানা সেবা কার্যে নিজেকে জড়িয়ে রাখে।

এমনিভাবে কয়েকটি বৎসর কাটিয়ে দিল। মাঝে মাঝে নিজের কথা চিন্তা করতে গিয়ে শুধু কেঁদে কেঁদে তার সমাধান করে। সে কান্না স্মৃতিচারণ নয়, গত জীবনের দেনা-পাওনায় যেদিকটা ওর সবচেয়ে খালি রয়ে গেছে তার জন্য।

এমনি একদিন অবসন্ন চিত্তে ইন্দ্রাণী ঘরে বসে আছে। দুয়ারে বৈরাগী এসেছে—'বাল্যলীলায়' দু'চার পদ কীর্তন করে 'মা ভিক্ষে দাও' বলে হাঁক করতেই ইন্দ্রাণী অত্যন্ত শ্রদ্ধাবনতা হয়ে নিকটে এসে তার সেবা করল।

'মা, আপনার বড় দুঃখ, তাই না!' ভিখারী আবেগে বললো।

ইন্দ্রাণী চুপ করে রইলো—তাকিয়ে রইলো সেই ভিখারীর দিকে। মুখে একটু সলজ্জ হাসি। "আপনি মহাভারত পড়ুন মা, দেখবেন শোকে শান্তি পাবেন।"

কথাটা কেমন যেন বুকে নাড়া দিল। হঠাৎ একটা আলোর রেখা যেন অদৃশ্যলোক হতে ইন্দ্রাণীর শোকাগারে ঝলক দিয়ে গেল। খুব ভাল লাগলো, মনের মতন বলে মনে হল। একটু চুপ করে রইল। ভিখারী চ'লে গেলে সে ঘরে ঢুকেই 'মহাভারত' অন্বেষণে মনোনিবেশ করলো।

সেই থেকে ইন্দ্রাণীর আর্তির সান্ত্বনা মহাভারত। সুযোগ পেলেই মহাভারতে নানা কাহিনীর বিস্তারে মন যুক্ত হয়ে থাকে। নূতন ক'রে একটা জীবনী শক্তি প্রতি-দিন ইন্দ্রাণী তা থেকে লাভ করছে। আজ আর কোন মানসিক গ্লানি নেই, শুধু একটা স্তব্ধ সেবা-পরায়ণা মনের চারিপাশে ঘুরছে সে আজ একনিষ্ঠা।

এমনিভাবে শোকের জড়তা ও নিঃসঙ্গতার দুঃসহ ক্ষোভ হ'তে নিজেকে মুক্ত করলো ইন্দ্রাণী। সবই ভুলে গেছে সে, শুধু সকল কর্মে নিজেকে, একান্তভাবে উৎসর্গী-কৃত ক'রে দিয়ে আনন্দ পায়। সংসার বলতে আজ আর ওর কোন আপনজন নেই, কিন্তু অপরের সংসারের দুঃখ-বেদনাকে নিজের মাথায় তুলে নিয়ে মাঝে মাঝে চলতে চায়—চলেও ইন্দ্রাণী। মাঝে মাঝে 'মহাভারতের' চরিত্র-উপাখ্যানে নিজেকে গভীরভাবে জড়িয়ে ভাবে। বছরে একবার অন্তত 'কাশী' যাওয়া চাই।

পঁচিশে বৈশাখ। পাড়ায় রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের আয়োজন প্রতিবারের মত এবারও চলেছে। এ উৎসব 'জাতীয় উৎসব'। তাই চাঁদা তুলে তুলে পাড়ায় পাড়ায় রবীন্দ্র-সঙ্গীত, রবীন্দ্রনাটক ইত্যাদির আয়োজন করা হয়। ইন্দ্রাণীর কাছে চাঁদা চাইতে এসেছে ওরা। 'কি কি হ'বে উৎসবে?' প্রশ্ন করলো সে।

'এবার আমরা রবীন্দ্রনাথের 'কর্ণকুন্তিসংবাদ' নাট্য-কাব্যটি পরিবেশন করবো।'

'তাই বুঝি! তা বেশ ভালই হবে। কুন্তি সাজবে কে?' ইন্দ্রাণী খুব সহজভাবে ওদের জিজ্ঞেস করলো। "বীণাদি। একদিন আসবেন আমাদের মহড়ায়?"

"না ভাই, আমার সময় কোথায়। এই নাও আমার চাঁদা, সময় পেলে উৎসবে অবশ্য যাবো।"

ওরা চলে গেলে ইন্দ্রাণী কি যেন একটা ভাবলো। দরজা বন্ধ ক'রে সঞ্চয়িতা খুলে 'কর্ণকুন্তিসংবাদ' আবৃত্তি করতে লাগলো। মহাভারতের কর্ণ-কুন্তিউপাখ্যান একদিন ইন্দ্রাণীকে বেশ চঞ্চল করেছিল। আজ আবার সেই ক্ষণ হঠাৎ রোমাঞ্চ দিয়ে উঠলো ওর সর্ব অংগে। সমাধানের পথ নেই; শুধু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে বসে থাকা ছাড়া। তাছাড়া ইন্দ্রাণী আজ ক্লান্ত। অতীতের ভুলভ্রান্তির নানা কাহিনী স্মরণ করতে পাওয়া ওর পক্ষে আর সম্ভব নয়। যখন খুব বেদনা পায়, গৃহ-দেবতার চরণে দীপ জ্বালিয়ে কিছু ফুল ছড়িয়ে দিয়ে ধ্যানস্থ হয়ে কিছুক্ষণ সর্ববন্ধনমুক্ত হয়ে যায়। তারপর নিজেকে পুনরায় প্রতিদিনের কর্মশালায় আহুতি দান করতে এগিয়ে যায়।

এগার

রজনীগন্ধার আর চন্দনধূপের শুচিতায় একটা স্নিগ্ধ সুন্দর পরিবেশে রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের আয়োজন। পাড়ার ছেলেরা খুবই মার্জিত। জানা গেল, 'কর্ণকুন্তিসংবাদ' নাট্যকাব্যটি এবার হ'বে না. কারণ বীণাদি হঠাৎ খুবই অসুস্থ হয়েছেন। তাই রবীন্দ্রসঙ্গীতের মাধ্যমে এবং কিছু আলোচনায় এবার উৎসব শেষ করতে হবে। উৎসাহ কিছুটা নষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু তাই ব'লে একেবারে হাল ওরা ছাড়েনি। খবরটা কি ক'রে পহুঁছিল ইন্দ্রাণীর কাছে। বেশ একটা বেদনায় ওর বুকটা নাড়া দিয়ে উঠল।' কিন্তু ও কি করতে পারে! চুপ থেকে যায়।

দুপুরে ডাক্তার সোম ইন্দ্রাণীর সাথে দেখা করতে এসেছে।. মাঝে মাঝে আসে। ডাক্তার সোমই বর্তমানে ইন্দ্রাণীর শুভার্থী। রবীন্দ্রজন্মোৎসবসমিতির সভাপতি, তাই উৎসবে তার উপস্থিতি দরকার—সময় করে ইন্দ্রাণীর খবর নিয়ে যেতে এসেছে।' কথায় কথায় ডাক্তার সোম বলল, 'এবার ২৫শে বৈশাখের ভাল একটা বিষয় উৎসবের অঙ্গ করেছিলেম কিন্তু তা পরিবেশন করা সম্ভব হবে না।'

'শুনেছি, কিন্তুআর কেউ নেই, কুন্তির রোল করে?' ইন্দ্রাণী বেশ আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করলো।' "থাকলেও এই সময়ে সেই রিস্ক নেওয়া উচিত হবে না।"

'কর্ণ কে করবে?—'

'আমার পরিচিত একটি ছেলে, খুব ভাল রবীন্দ্র-কবিতার আবৃত্তি করে।'

টেবিলের উপর 'সঞ্চয়িতা' ছিল। পাতা উলটাতে উলটাতে 'কর্ণকুন্তিসংবাদ' অংশে নির্দেশিত কাগজের ভাঁজ দেখে ডাক্তার সোম জিজ্ঞাসা করলো—"সে কি, আপনি দেখছি 'কর্ণকুন্তিসংবাদ' পড়ছিলেন আজ! বড় বিস্ময় বোধ হচ্ছে?"

ইন্দ্রাণী একটু লজ্জিত হ'লো—একটু ভয়ও পেলো। এগিয়ে এসে বলল, "না, সে কিছু না। এমনি দেখছিলাম।"

ডাক্তার সোমের বুঝতে দেরী হ'ল না। শুধু একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললো, 'আমি অসহায়, কিছু করতে পারলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করতাম।'

কিছুক্ষণ উভয়ে চুপ।

ইন্দ্রাণী সরবত এনে দিল। ডাক্তার সোমের যাবার সময় সে বললো, 'কর্ণ যে করবে ওকে সঙ্গে করে যদি আপনি ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যে আনেন তবে একবার কুন্তির রোলটা চেষ্টা করে দেখতে পারি।' "আপনি কুন্তির রোল করবেন? আমার সাধ সার্থক হবে তবে? আমি ছেলেটিকে নিয়ে আসছি। কবির জন্ম উৎসব আজ সার্থক হবে। আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে কি বলবো"—ডাক্তার সোম উৎফুল্লভাবে কথাগুলো বলে বেরিয়ে গেল।

সন্ধ্যায় যথাবিহিতভাবে 'জন্মোৎসব' আরম্ভ হ'ল। অভূতপূর্ব এক অনির্বচনীয় 'নাট্যকাব্য' পরিবেশন এর পূর্বে কোথাও কেউ দেখেছে বলে মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথের চিন্তার বাস্তব রূপায়ণ আজ যেন সবাই মর্মালোকে নূতন এক জীবনের কান্না ও হতাশার প্রত্যক্ষ করলো।

ইন্দ্রাণী অভিনয় শেষ হওয়ার সাথে সাথে কাহারো 'অভিনন্দন' পাবার পূর্বেই গৃহে চলে এলো। সকলেই ওর

খোঁজ করছিলো—দেখতে চাইলো—কিন্তু ডাক্তার সোম সবাইকে অনুনয় করে ক্ষান্ত করলো।

বার

সারা রাত ইন্দ্রাণী ঘুমোতে পারেনি। কতবার চেষ্টা করেছে—কিন্তু কেন যেন ছেলেটির মুখখানা উৎসুক অভিমানে ওর চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। কে সেই ছেলে, শুধু একটা অভিনয় মাত্র নয় বইকি? কিন্তু কেন বার বার বুকের ভেতরটা ভেঙ্গে চুরমার হতে চাইছে ঐ ছেলেটির জন্য। নিজেকে সংযত করে ইন্দ্রাণী, মাথায় জল দেয়, চোখ-মুখ জলে ঠাণ্ডা ক'রে আবার শুতে যায়—কিন্তু মনে হয় আবার সেই চোখ দু'টি জোড়া বুকের মাঝখানে অনড়, অচল যেন দীপ্ত অভিমানে।

ভোরে শয্যা ত্যাগ করেই ইন্দ্রাণী ডাক্তার সোমকে ফোন করলো—কোন উত্তর পেলো না। ঠাকুরের কাছে নিত্যপূজায় বসে ইন্দ্রাণী সেদিন বেশ আনমনা হয়ে গেল। বার বার ভুলে গেল নিয়ম, ভুলে গেল ভগবানের সেবার বিচিত্র চর্চা। কেবল ছেলেটির মুখখানা ভেসে উঠ্ছে। "কে এই ছেলে"—কাঁদে ইন্দ্রাণী। মাথা হেঁট করে দেবতাকে অস্ফুট ভাষায় হৃদয়ের সহস্র আবেগে জিজ্ঞাসা করে সে—"কে এই ছেলে?" কেন আমার হৃদয় আজ এত চঞ্চল হ'য়েছে ওর জন্য?"

কেউ কোথাও নেই। সব আজ শুদ্ধ। এতদিনের প্রচ্ছন্ন কামনা আজ এক মুহূর্তে সকল বাঁধ ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে চায়।

আবার কাঁদে ইন্দ্রাণী। "হে ভগবান, এ আমায় কি করলে! আজ কেন আমার মন এত দুর্বল হয়ে গেল, ভগবান, ভগবান" বল্‌তে বল্‌তে গৃহদেবতার চরণে শ্লথদেহে পড়ে যায়।

ইন্দ্রাণীর শরীর কেমন আছে জানবার জন্য ডাক্তার সোম সকালে এসেছিল। ইন্দ্রাণীকে অভিনন্দন জানাইলে ইন্দ্রাণী অত্যন্ত বিনীতভাবে কাতরকণ্ঠে অসহায়ের মত জিজ্ঞাসা করল, "ডাক্তারবাবু, একটা কথা বলবো?...

"বলুন, নিশ্চয় বলুন"

"সারা রাত ঘুমোতে পারিনি—পাগলের মত রাত জেগেছি—ঠাকুর পুজো ও করতে পারলাম না ভোরে—সর্ব অংগ আমার অবশ হ'য়ে যাচ্ছে, ডাক্তারবাবু—বলুন কালকের কর্ণচরিত্রের ছেলেটি কে? কি তার পরিচয়? কোথায় থাকে? বার বার চোখ বুজতেই ওর মুখখানা আমার বুকে ফুটে ওঠে, জ্বালা করে, মন আমার অসহায়ের মত কেবল চেয়ে থাকে—। আমাকে এর পরিচয় কিছু দিতে পারেন?"

এমনভাবে ইন্দ্রাণীকে ডাক্তার সোম কোনদিনই দেখেনি। চরিত্রে একটা বিশেষ শক্তি ওর ছিল, ছিল একটা গভীর ব্যক্তিত্ব। কিন্তু সব যেন কোথায় শেষ হ'য়ে গেল। একেবারেই অন্য ধরণের বলে আজ মনে হচ্ছে।

কিন্তু ছেলেটির সাথে এর কি সম্পর্ক? ডাক্তার সোম ভাবে, কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর ডাক্তার সোম বললে, ও আমার পুরোনো পাড়ায় থাকতো। খুব ভাল ছেলে। নাম শোভন গুপ্ত, ওর বাবা আমার দাদার বন্ধু। আপনি বলেন তো আর একদিন শোভনকে আপনার এখানে নিয়ে আসবো?"

'তা আন্‌তে হ'বে না—ওর আর কোন পরিচয় আপনি জানেন।'

"তা বিশেষ কিছু জানি না। ওর বাবা অজিত গুপ্ত। আমাদের বাড়ীতে দাদার কাছে আসতেন...সেই সূত্রে একটু আলাপ ছিল।"

ইন্দ্রাণীর আর সংশয় রইলো না। এতদিন যে কথাটা চেপে রেখেছিল আজ আর তা পারলে না। 'ডাক্তারবাবু ওর বাবার নাম কি বললেন..."

ইন্দ্রাণী কেঁদে কেঁদে মাটিতে দেহখানা লুটিয়ে দিল। ডাক্তার সোম স্তম্ভিত হয়ে গেল। বুঝতে তার দেরী হ'ল না। কিন্তু ভাবনায় বিব্রত। ঘরের মেঝেতে চুপ করে বসে রইল অনেকক্ষণ। তারপর চলে গেল।

তের

ডাক্তার সোমের সহযোগিতায় ইন্দ্রাণী অবশেষে শোভনের সব পরিচয় পেয়েছে। ডাক্তার সোমও যথাসম্ভব এ বিষয়ে ইন্দ্রাণীকে শুধু সাহায্যই করে নাই, মাতা পুত্রের পুনর্মিলনের জন্য সক্রিয়ভাবে এগিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু ইন্দ্রাণীর তাতে আপত্তি ছিল। নূতন করে কোন কিছুতে সে জড়াতে আজ আর চায় না। তবুও মহত্ত্বের

শুধা ওকে মাঝে মাঝে এমন করে তোলে যে, নিজে বেরিয়ে যায় শোভন যেখানে কাজ করে, যেখানে শোভন বন্ধু-বান্ধবের সাথে খেলা করে—এমন কি কোথাও না দেখতে পেলে বাড়ী পর্য্যন্ত যায় ভিখারিণীর মত।

শোভন এর কিছুই জানে না। সে একবার মাত্র দেখেছিলো—তাও অভিনয়ে। ভদ্রমহিলা মাঝে মাঝে শোভনের কাছে এসে আনমনে তাকিয়ে থাকতো—তার প্রতি ওর একটা সহজ করুণা জাগতো। তার সাথে ওর কি পরিচয় সম্বন্ধ শোভন তা জানতো না। প্রয়োজনও ছিল না জানার। শুধু মাত্র একজনকেই অফিসে, মাঠে এমন কি বাড়ীর সম্মুখে দেখতো। এই পর্য্যন্ত। ওকে একদিন কিছু দিতে চাইল শোভন, চোখ গড়িয়ে জল বুকের কাপড়টা ভিজিয়ে দিয়ে ইন্দ্রাণী নিজেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিল।

ডাক্তার সোম এ সবই লক্ষ্য করতো। নীরবে দাঁড়িয়ে সেও কেঁদেছিলো—কিন্তু কিছু করবার উপায় ওর ছিল না—ইন্দ্রাণীর বারণ।

শোভনের মা সুষমা দেবী এসব লক্ষ্য করেছেন। লুকিয়ে লুকিয়ে তিনি সব দেখেছেন। শোভন একদিন মাকে বলেছিল—"মা, এক ভদ্রমহিলা প্রায়ই আমার অফিসে, মাঠে এমন কি বাড়ীতে আমার সাথে দেখা করতে আসে, আমার দিকে স্থির হয়ে তাকিয়ে থাকে; কাছে যেতেই জড়সড় হয়ে পালিয়ে যায়।"

সুষমা দেবীর বুঝতে বিন্দুমাত্র দেরী হ'ল না। তবুও কিছুটা সংশয় ছিল।

একদিন শোভনকে তিনি ডেকে বলেন. 'শোভন, যিনি তোমার সাথে দেখা করতে আসেন ওকে কোনদিন অবজ্ঞা করো না; পারো তো আমার মত মর্যাদা ওকে দিও…" সুষমা চুপ হয়ে যায়। নিজেকে একটু সরিয়ে নেয়।

সেদিন শোভন খুব বিব্রত হ'ল। 'তোমার মত মর্যাদা দিব, কেন? তিনি আমাদের কে? বল, বল মা তিনি কেন এমন ভাবে ছায়ার মত আমার অনুসরণ করেন?'

সুষমা বাক্যহীন। শুধু চোখ বুজে থাকে, আর শোভনকে আদর করতে করতে অন্যত্র চলে যায়।

শোভনের রক্ত কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেল। সংসারে জিজ্ঞাসা করে ও মায় কাছ হতে কোন উত্তর পায় না—অথচ সেই ভদ্রমহিলাকেও অস্বীকার করতে পারছে না। একটা অশান্তি যেন ওর মন-প্রাণ দেহ জুড়ে বহন করছে অনবরত।

একদিন এমনিভাবেই শোভন ডাক্তার সোমের বাড়ী গেল সেই ভদ্রমহিলার সংবাদ জানবার জন্য। ডাক্তার সোম 'কিছু জানেন না' বললেন। আর ইন্দ্রাণী প্রতি বৎসরের মত এবারও কাশী চলে গেছে।

* * *

চৌদ্দ

মাতুলালয়ের কিছু বিষয় সম্পত্তি শোভন পেয়েছে। চন্দননগরে তাই ওরা সব চলে গেল। সেখান থেকে প্রতিদিন শোভন কলকাতায় অফিস করার জন্য যাওয়া-আসা করে। সময় পেলে সে ডাক্তার সোমের কাছে যায়—নানাভাবে ইন্দ্রাণীর সহিত ওর পরিচয়সূত্রটি আবিষ্কার করতে চেষ্টা করে। কিন্তু ডাক্তার সোম অসম্ভব নীরবতা শোভনের উৎসাহ ও আগ্রহকে তীব্র করে তুলছে।

অবশেষে মার কাছ হতে চিঠি সংগ্রহ করে শোভন সুমথনাথবাবুর কাছে গেল—এবং প্রকৃত সত্য সে যেদিন লাভ করলো সেইদিনই একবার ডাক্তার সোমের কাছে দেখা করল, বললো—ডাক্তারবাবু, আমি সব জেনেছি। আমি ওঁর গর্ভজাত প্রথম পুত্র। কিন্তু আজ তিনি কোথায়? কেমন করে জানবো বা জানাবো আমার মা আজও বেঁচে আছেন। ছোটবেলায় একবার পাশের বাড়ীর লোকদের কাছে শুনেছি আমার মা হারিয়ে গেছেন। বাবাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—তিনিও বলেছেন—'নেই'। তারপর যার স্নেহে, ভালবাসায় ত্যাগে আমি বড় হ'তে চলেছি ওঁকেই আমার 'মা', একমাত্র জননী বলে মেনে নিয়েছি—অনন্ত আরাম যেন তখন আমার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে এক নূতন লোকে নূতন শক্তিদান করেছে। কিন্তু আজ, আজ ডাক্তারবাবু, আমার যে সব হারিয়ে যেতে বসেছে! আমার হারিয়ে যাওয়া মাকে খুঁজে পেয়েছি। কি ভাবে ওর কাছে আমি যাব? শুনেছি তিনি আজ অন্য ঘরের, আমাকে কি তিনি বুকে তুলে নেবেন? ডাক্তারবাবু, আমার সাথে আপনিও চলুন কাশী। একবার আবার দূর হতে আমার মাকে দেখে আসবো—কোন দাবী নিয়ে যাব না, কোন কথা বিশেষ

নিজে যেচে বলবো না—শুধুমাত্র চোখে দেখে 'মা' এই বলে অভ্যস্ত মৃদু স্বরে ডাকবো। নূতন করে আর কোন বিপদ আজ আমি ডেকে আনবো না। আমার পিতার সাথে ওঁর কি সম্পর্ক এবং কি ভাবেই বা তার যবনিকা পড়েছিলো, সবটাই এই দেখুন এই কাগজে আমার জ্যাঠামশাই লিখে রেখে দিয়েছেন—আমি সব জানতে পেরেছি। কোন অভিযোগ বা অভিমান নিয়ে যাবো না। যা আমি হারিয়ে পেয়েছি তার এতটুকু মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হতে দেবো না। এ বিষয়ে আমার মা'র পরিপূর্ণ সম্মতি পেয়েই আপনার কাছে এসেছি—যদি সম্ভব হয় তবে দয়া করে আমার সাথে চলুন।"

শোভনের চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে জল। কিন্তু অমিত তেজ ও দীপ্তি ওর বেদনাকে আবেগে ততটা কাবু করতে পারেনি। সে কাঁদে, তবে সে কান্নায় নিজেকে হারিয়ে ফেলেনি।

পনর

সুমথনাথ, সুযশা, ডাক্তার সোম, সুষমা দেবী এবং শোভন কাশী গিয়েছিল। ওরা সবাই দূর হতে ইন্দ্রাণীকে দেখেছে। দেখেছে শিব মন্দিরে মন্দিরে, গংগার ঘাটে ঘাটে আর্তজনের সেবায় আর মণিকর্ণিকার ঘাটে নীরব তন্ময়তায়। শোভন শুধু বালকের মত কাঁদছে, কিন্তু সাহস করেনি সব ভেঙ্গে চুরমার করে আবার নূতন করে বাঁচতে। দূর থেকেই ও সর্ব-মন-প্রাণে 'মা মা' বলে শুধু ডেকেছে। পিতার সেই অঙ্গীকার 'তোমার ভবিষ্যৎ জীবনে এ সন্তান অন্তরায় হবে না' শোভনের অক্ষরে অক্ষরে মনে আছে। সব আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও শোভন সুষমাদেবীকে বুকে জড়িয়ে কাঁদে, কত কথা জিজ্ঞাসা করে। সুষমাদেবী এগিয়ে দেয় ছেলেকে মায়ের কাছে যেতে—কিন্তু শোভনের মনে নূতন করে কিছু পাবার তীব্রতা কম।

কাশীতে একান্তে ডাক্তার সোম সুমথনাথকে সঙ্গে করে ইন্দ্রাণীর সহিত দেখা করেছিল, বলেছিল সব। ইন্দ্রাণীও আজ ক্লান্ত, শুধু পরিচয় লাভের বেদনাকে বহন করে বাকী কটা দিন এই বিশ্বেশ্বরের চরণে নিজেকে সঁপে দিয়ে যেতে চাইছে।

সুমথনাথকে প্রণাম করে ইন্দ্রাণী বললো—কবিদা ইন্দ্রাণী পরাজিত, আমার প্রণাম গ্রহণ করবেন।

'তুমি শোভনকে চাও ?" সুমথনাথ খুব আস্তে আস্তে বললো।

অনেকক্ষণ ভাবলো ইন্দ্রাণী। চোখের সামনে ভেসে উঠলো আর্ত মানুষের অসংখ্য মুখ, কানে বেজে উঠলো মন্দিরের ঘণ্টা—কে যেন ইন্দ্রাণীকে বলছে, 'সামনে তোমার পথ, এগিয়ে এসো, অনন্ত মানুষ তোমার জন্য অপেক্ষা করছে—তারা সব হারিয়ে তোমাকেই খুঁজেছে।'

চোখ বুজে সুমথনাথের বুকে মাথা রেখে বলল ইন্দ্রাণী—"কবিদা, আর নয়, আর নয়, শোভনকে বড় করুন, সুষমাদেবীকে আমার শ্রদ্ধা জানাবেন, বাকী কটা দিন আমি এখানেই কাটিয়ে দেবো।"

নিকটে দাঁড়িয়ে ডাক্তার সোম। চোখ দুটো জলে ভেসে গেছে। ইন্দ্রাণী কাছে এসে বলল—ডাক্তারবাবু, আমি আর ফিরব না। আমার নিজের বলতে কিছুই নেই। ঐ বাড়ীটায় একটা ইস্কুল করতে যদি পারেন চেষ্টা করবেন, আর পাড়ায় রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব ভাল করে করবেন। মানুষের অন্ধকারজীবনের আলো কবির সাহিত্যে রয়েছে, তা জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে সকল কালো আলো করে দিন আপনারা।"

ষোল

শোভন মা'র নামে কাশীর ঠিকানায় মনিঅর্ডার করলো। মাস দুই পরে সে টাকা ফেরৎ এলো—লেখা ছিল 'সেই নামে ও ঠিকানায় কেউ নেই'।

প্রয়োজনে পরিবর্ত্তন

শ্রীজ্ঞান

তোমাদের সকলেরই কিছু না কিছু সখ আছে। এখানে আমি সখ বলতে ইংরাজিতে যাকে "হবি" (Hobby) বলে তাই বলছি। এই সখ বা 'হবি' নানা রকমের হয়ে থাকে। কেউ হয়ত ডাক টিকিট জমাতে ভালবাস, তাই বিভিন্ন দেশের ডাক টিকিট সংগ্রহ করে এলবাম্ ভর্ত্তি কর এবং সেজন্য অর্থ, সময় ও উদ্যম ব্যয় করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হও না। অনেকের পুরাণ মুদ্রা সংগ্রহের সখ থাকে এবং সেজন্য অনেক পরিশ্রমে ঐতিহাসিক মুদ্রা সংগ্রহ করে থাক। কারুর হয়ত পাখী পোষার সখ আছে এবং অর্থ ব্যয় করে নানা ধরণের পাখী কিনে খাঁচা ভর্ত্তি করে রাখ। আবার মাছের সখও অনেকের থাকে। ছোট ছোট কাঁচের আধারে (aquarium) নানা রংএর, নানা আকারের, নানা জাতের মাছ কিনে এনে অনেক তদ্বির, তদারক করে তাদের বাঁচিয়ে রাখ। কুকুরের সখও আবার কারুর কারুর থাকে। ভাল জাতের কুকুর পুষে তার পিছনে অর্থ ব্যয় করে সযত্নে, সস্নেহে পালন কর। কেউ কেউ আবার ফোটোগ্রাফি ভালবাস এবং এই ব্যয়সাধ্য সখটির জন্যে অনেক অর্থব্যয়ও করে থাক। এ ছাড়া আরও নানা রকমের সখ বা "হবি" তোমাদের অনেকেরই আছে। এর মধ্যের একটি বিশেষ সখের বিষয় এবার উল্লেখ করছি এবং এই সখটি প্রয়োজনের সময় কিরূপ কাজে লাগে তাও তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

তোমাদের মধ্যে অনেকেই আছ যারা প্রকৃতিকে অর্থাৎ গাছ, পালা, ফুল, ফল ইত্যাদি ভালবাস এবং অনেকের হয়ত বাগান করার সখও আছে। তবে বেশীর ভাগ ফুলের বাগানই করে থাক। ফুল সকলকারই প্রিয় এবং সকলেই ভালবাসে, তাই ফুলের বাগানের সখও প্রশংসনীয়। কিন্তু ফুল হচ্ছে সম্পূর্ণই সখের জিনিষ। সাধারণ মানুষের বাস্তব জীবনে এর প্রয়োজন খুব বেশী নেই। বর্ত্তমানের সমস্যা সঙ্কুল বাস্তব জীবনের নানা প্রয়োজনের মধ্যে ফুলের স্থান যেন ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। শুধু ফুল কেন সব রকম সখই এখন অহেতুক বলে গন্য হচ্ছে; কারণ দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনগুলি মেটাতেই সাধারণ লোকে হিম্‌সিম্ খেয়ে যাচ্ছে—সখ করবে কি করে? কিন্তু একটু চিন্তা করলেই দেখা যায় এই "হবি" বা সখকেও চেষ্টা করলে সঙ্কটের সময় জীবনের বিশেষ কোনও প্রয়োজন মেটাবার কাজে লাগান যেতে পারে। যেমন ধর ফুলের বাগান করার সখ। এই সখটি যাদের আছে তারা যদি ফুলের বদলে সবজী বা ফল মূলের বাগান করে, তবে এই খাদ্যসঙ্কটের দিনে নিজ পরিবারের খাদ্য সমস্যার কিছুটা সুরাহা হয়। এতে বাগান করার সখও মেটে এবং নিজ পরিশ্রমে এবং চেষ্টায় উৎপাদিত সবজী ও ফলমূল, নিজে খেয়ে এবং অপরকে খাইয়ে পরিতৃপ্তিও পাওয়া যায়।

কলিকাতায় যারা থাক তাদের বাড়ীতে সামান্য একটু

যদিও যদি থাকে তো সেখানেই এই রকম সবজী বা ফলের বাগান করার চেষ্টা করতে পার। জায়গা না থাকলে বড় বড় মাটির টবেতেও নানা রকম সবজী ফলাতে পার, যদিও তা খুব সামান্যই হবে তবুও সবজী ফলাবার আনন্দ তোমরা লাভ করবে, আর সেই সঙ্গে ফসল ফলাবার শিক্ষাও কিছুটা হাতে নাতে লাভ করতে পারবে। কলিকাতার বাইরে শহরাঞ্চলে বা গ্রামে যারা থাক তাদের বাড়ীতে বা আশে-পাশে জমি থাকা খুবই সম্ভব। তারা চেষ্টা করলে এই সব জমিতে প্রচুর সবজী বা ফলমূল ফলাতে পার। এবং আগেই বলেছি তাতে তোমরাই শুধু আনন্দ পাবে না, অপরেও তোমাদের হাতের ফলান ফলমূল, শাকসব্জী খেয়ে আনন্দ পাবে।

এখন সব সময় মনে রাখবে যে দেশের দুর্দ্দিন চলছে। খাদ্য সমস্যা ছাড়াও আরও নানা সমস্যার মধ্যে দিয়ে আমরা এখন চলেছি। তার ওপর দেশের দুই প্রান্তে শত্রু ওৎ পেতে রয়েছে। তাদের মোকাবিলা করবার জন্যে আমাদের সকলকেই সব সময় প্রস্তুত থাকতে হবে—সতর্ক থাকতে হবে, সজাগ থাকতে হবে। এ সময়ে শুধু সখের জন্যে অযথা অর্থ ও সময় নষ্ট করা চলে না। সব কিছুকেই এখন কাজে লাগাতে হবে—সখকেও এখন প্রয়োজনে পরিবর্ত্তিত করতে হবে।

***

জর্জ্জ এলিয়ট্
রচিত

সাইলাস্ মারনার্

সৌম্য গুপ্ত

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)
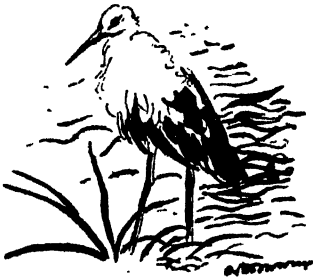
নিরালা-নির্জ্জন কুটীরের কোণে একা বসে সাইলাস্ এতক্ষণ নিজের চিন্তায় এমনই তন্ময়-বিভোর ছিল যে ইতিমধ্যে সময় গড়িয়ে গিয়ে সন্ধ্যা পার হয়ে কখন রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে—সে খেয়ালটুকুও ছিল না। হঠাৎ হুঁশ হতেই, সাইলাস্ তাকিয়ে দেখলে—কুটীরের সদর-দরজাটা তখনও পর্য্যন্ত ঠায় খোলা পড়ে রয়েছে! সাইলাসের মনটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো!…সর্ব্বনাশ!… দিগ্বিদিকের জ্ঞান হারিয়ে এমন আন্‌মনা হয়ে সে বসে-ছিল এতক্ষণ—এই সুযোগে যদি ঐ খোলা-দরজার ফাঁকে সন্ধ্যার আবছা-আঁধারে বাইরে থেকে কোনো ফন্দীবাজ চোর ছ্যাচোড় এসে নিঃশব্দে ঘরে সেঁধিয়ে আবার তার কোনো দামী জিনিষ সরিয়ে সট্‌কে থাকে…তাহলেই তো…

কথাটা মনে হতেই সাইলাসের অন্তরাত্মা শিউরে উঠলো!…বাস্তবিকই সেবারেও এমনি আঁধার-রাতেই ঘরের দরজা খোলা পেয়ে আচম্‌কা কোথা থেকে বদ-মায়েশ এক চোর এসে কোন ফাঁকে চুপিচুপি ভিতরে সেঁধিয়ে সাইলাস্ বেচারীর সযত্নে সঞ্চিত অত সাধের সোনার মোহরগুলি সরিয়ে বেমালুম সট্‌কে পড়েছিল—সে লোকসানের জ্বালা আজও ভুলতে পারেনি এতটুকু!…

এ দুর্ভাবনা মনে জাগার সঙ্গে সঙ্গে সাইলাস্ এক মুহূর্ত্তও স্থির হয়ে বসে থাকতে পারলো না…তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সন্দিগ্ধ-দৃষ্টিতে নিস্তব্ধ-নিঝুম আবছা আলো-আঁধারেভরা ঘর-দোরের চারিদিকে এলোমেলো ছড়িয়ে রাখা প্রত্যেকটি জিনিষপত্রের খুঁটিনাটি হিসাব মিলিয়ে ঠাওর করে দেখলো—তার অন্যমনস্কতার সুযোগে বাইরে থেকে আবার কোনো চতুর-চোর এসে চুপিচুপি ভিতরে সেঁধিয়ে ঘরের জিনিষপত্র কিছু সরিয়ে বেমালুম সটকে পড়েছে কিনা!…কিন্তু না…চুরির চিহ্ন-মাত্রও নজরে পড়ে না কোথাও…ঘরের জিনিষপত্র সবই—যেখানে যেমন ছিল, ঠিক তেমনি আছে। ঘরের চারিদিকে জিনিষপত্রের হিসাব মিলিয়ে দেখতে দেখতে সাইলাসের হঠাৎ মনে হলো—প্রচণ্ড শীতের দাপটে হিমে-ঠাণ্ডায় হাত-পা-শরীর সব যেন কালিয়ে যাবার দাখিল হয়ে উঠেছে। ঘরের কোণে জ্বালিয়ে-রাখা আগুনের চুল্লীর পানে তাকাতেই সাইলাস্ দেখলে—সন্ধ্যা থেকে একনাগাড়ে এতক্ষণ জলে-পুড়ে চুল্লীতে সাজানো কাঠের কুঁদো দুটি প্রায়-নিভন্ত হয়ে এসেছে। কাজেই কাঠের কুঁদো দুটিকে ঠিকমতো সাজিয়ে জড় করে আবার বেশ গন্‌গনে-আঁচে জ্বালিয়ে তোলার জন্য সাইলাস্ আগুনের চুল্লীর পানে এগিয়ে এলো, এমন সময় হঠাৎ তার নজরে পড়ল—সামনেই ঘরের মেঝের একপাশে ছড়ানো রয়েছে ঝকঝকে সোনার মতো একরাশ কি যেন জিনিষ!

সাইলাস্ চমকে উঠলো।… তাই তো, এত অঢেল সোনা…তার অজান্তে কখন কে আচম্‌কা এমনভাবে ফেলে রেখে গেছে এখানে!…এ সবই হয় তো, তার সেই হারানো সোনা—গ্রামের লোকজনেরা যেমন বলেছিল—পুরোনো-বছরের শুভ-সন্ধিক্ষণে ঈশ্বর স্বয়ং করুণাভরে বুঝি এতদিনে সত্যিই সেই হারানো ধন ফিরিয়ে দিয়ে সাইলাসের মনোস্কামনা পূর্ণ করলেন শেষ পর্য্যন্ত!…আনন্দে-উত্তেজনায় সাইলাসের দেহে-মনে অদ্ভুত এক শিহরণ জাগলো…আবেগ-কৌতুহলে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে আগুনের চুল্লীর সামনে ঘরের মেঝের উপর ছড়ানো উজ্জ্বল ঝকঝকে সেই সোনালী-স্তূপের কাছে এগিয়ে এসে সযত্নে-আগ্রহ-ভরে সেগুলিকে স্পর্শ করবার জন্য মাটির পানে ঝুঁকে হাত বাড়াতেই, শক্ত কন্‌কনে সোনার মোহরের বদলে সাইলাসের হাতের মুঠোয় ঠেকলো—তুল্‌তুলে নরম আর পশমের মতো গরম বিচিত্র অদ্ভুত একরাশ ঘন কোঁকড়া কেশ-গুচ্ছের স্পর্শ!

সাইলাস্ তো অবাক!…এ আবার কি আজব কাণ্ড ঘটলো!…বিস্ময় কৌতূহলভরে ঘরের মেঝের উপরে সোনালী রঙের সেই আজব বস্তুটিকে ভালোভাবে পরখ করে দেখবার উদ্দেশ্যে আরো কাছে সরে আসতেই সাইলাস্ স্পষ্টই বুঝতে পারলে যে, সেটি আসলে—সুন্দর ফুটফুটে ছোট্ট একটি শিশু-কন্যা…মাথায় তার একরাশ কোঁকড়া সোনালী কেশের গুচ্ছ…ক্লান্তিতে বেচারী মেঝেতেই দেহ এলিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। বয়সের ফলে সাইলাসের দৃষ্টিশক্তি ইদানীং কতকটা ক্ষীণ হয়ে পড়ার দরুণ আবছা অন্ধকারে দূর থেকে আগন্তুক এই ঘুমন্ত শিশুটির সোনালী-কেশদাম দেখে সে গোড়ায় সোনার মোহরের স্তূপ বলে ভুল করেছিল বটে; কিন্তু সে ভুল ভাঙলেও, ফুলের মতো ফুটফুটে সুন্দর অজানা-অচেনা নিতান্ত-অসহায় একরত্তি ছোট্ট-মেয়েটিকে…এবং কখন কোন ফাঁকে এমন নিরালা-নির্জ্জন প্রান্তরে হঠাৎ নিশুতি-রাতে একা কোথা থেকে এখানে এসেই বা হাজির হলো কিভাবে? তাছাড়া আজ সন্ধ্যা থেকে সে তো ঠায় ঘরেই বসে রয়েছে…ঘর ছেড়ে এক মুহূর্ত্তও বাইরে বেরোয়নি কোথাও! তাহলে?…ব্যাপারটা আগাগোড়া কেমন যেন হেঁয়ালির মতো অস্পষ্ট-আজব মনে হলো সাইলাসের কাছে…অনেক ভেবে-চিন্তে কোনো কিছু কুল-কিনারাই সে ঠাওর করতে পারলো না।

সাইলাস তখন ভাবলো—সে বোধহয় স্বপ্ন দেখছে!…ঘরের মেঝের উপর ঘুমে অচেতন ঐ ফুটফুটে-সুন্দর মেয়েটির চেহারা দেখতে ঠিক যেন সাইলাসের নিজের ছোট বোনটির মতো!—আহা, সে বেচারী যদি আজ বেঁচে থাকতো!…ছোটবেলায় তার সেই আদরের শিশু-বোনটিকে কোলে-পিঠে নিয়ে কত যত্নে…কত আশায় মানুষ করে তুলছিল…কিন্তু এমনই পোড়াবরাত যে শেষে ভগবান নিজেই একদিন আচম্‌কা তার কোল থেকে নিতান্ত নির্ম্মমভাবেই ছিনিয়ে কেড়ে নিয়ে গেলেন অত আদরের সেই একরত্তি ছোট্ট বোনটিকে। তার কথা

সাইলাস্ বেচারী আজও ভুলতে পারেনি! তাই বহুদিন আগে হারানো তার সেই আদরের ছোট্ট-বোনটিকেই সে আজ স্বপ্নের ঘোরে চোখের সামনে দেখতে পেয়েছে!

ব্যাপারটা আসলে সত্যি, না মনের ভুল—ভালোভাবে পরখ করে দেখার উদ্দেশ্যে, সাইলাস্ যেই আগুনের চুল্লীর দিকে এগিয়ে গিয়ে কাঠের কুঁদো দুখানাকে জ্বলন্ত-শিখার আরো কাছে ঠেলে দিয়ে আলোর আভা বাড়িয়ে তুলতে সুরু করেছে, এমন সময় হঠাৎ তার কানে ভেসে এলো—ছোট্ট শিশুর কান্নার আওয়াজ। সাইলাস্ সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমন্ত শিশুটির পানে তাকালো···দেখলে, শিশুটি সদ্য ঘুম থেকে জেগে উঠে মেঝেতে-বিছানো জীর্ণ-পুরাতন চটের ওভারকোটের উপর পা ছড়িয়ে বসে কাঁদছে আর অসহায়ভাবে অপরিচিত কুটীরের চারিদিকে তাকিয়ে ব্যাকুল-কণ্ঠে 'মা···মা···' বলে ডেকে অধীর-উদ্বেগে কাকে যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। অজানা-অচেনা হলেও, ভীত-চকিত আগন্তুক-শিশুটিকে এমন অসহায়-ভাবে কাঁদতে দেখে, সাইলাস্ আর স্থির থাকতে পারলো না···সে তাড়াতাড়ি ছুটে এসে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলে···হরেক রকমের আবোল-তাবোল কথা বলে, স্নেহভরে আদর করে ঘরের এদিকে-সেদিকে ছড়ানো টুকিটাকি নানান্ জিনিষপত্র দেখিয়ে ফুলের মতো ফুটফুটে-সুন্দর ছোট্ট মেয়েটির মন-ভোলানোর কত কি চেষ্টা করতে লাগলো। তবু সেই ছোট্ট-শিশুটির কান্না আর থামে না···কেবলই সে তার মাকে খোঁজে আর ডাকে!

সাইলাসের হঠাৎ মনে হলো—এতক্ষণ বাদে ঘুম থেকে উঠে শিশুটির হয়তো ক্ষিদে পেয়েছে—তাই সে এমনিভাবে কাঁদছে আর কেবলই তার হারিয়ে-যাওয়া মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে! কিন্তু সাইলাসের ঘরেই বা খাবারদাবার এমন কি আছে যে এই দুধের বাছাকে খাইয়ে তার ক্ষিদের জ্বালা মেটাবে!···ভাবতে ভাবতে সাইলাসের মনে পড়লো—তাই তো···নতুন বছরের পার্বণ বলে আজ বিকালেই তো গ্রামের পাড়াপড়শীদের কার গিন্নী এসে তাকে সদ্য একবাটি পায়েস উপহার দিয়ে গেছেন···পরে সুবিধামতো সময়ে খাওয়া যাবে'খন মতলব করে, সে পায়েসের বাটি তো সাইলাস্ সযত্নে ঘরের কোণে খাবারের আলমারীতে তুলে রেখে দিয়েছিল···বরং সেই পায়েসটুকু খাইয়েই আপাততঃ ছোট-শিশুটির ক্ষিদের জ্বালা জুড়োনো তো থাক্···তারপর পাড়াপড়শীদের কারো বাড়ী থেকে দরকারমতো দুধ, ফল, খাবারদাবার জোগাড় করে এনে ভালোভাবে খাওয়ানোর বন্দোবস্ত হবে'খন।

এই ভেবে সাইলাস্ তখনি ছুটে গিয়ে তার খাবারের আলমারী থেকে সেই পায়েসের বাটি এনে, সুগন্ধি-পায়েসের সঙ্গে সামান্য চিনি মিশিয়ে আরো সুস্বাদু বানিয়ে সযত্নে চামচে করে তুলে ছোট্ট-শিশুটিকে পরম-আদরে খাইয়ে দিতে লাগলো। সুমিষ্ট-পায়েসের স্বাদ পেতেই শিশু কান্না ভুলে গিয়ে নিশ্চিন্ত-আরামে সাইলাসের কোলের উপর বসে সোৎসাহে বাটির সবটুকু পায়েসই খেয়ে ফেললো। খাওয়াদাওয়ার পালা শেষ হতেই, সে দিব্যি মনের আনন্দে সাইলাসের কোল থেকে নেমে পড়ে আপন-খেয়ালে টলমল করে ছুটে সারা ঘরখানা চক্কর দিয়ে বেড়াতে সুরু করলে! সাইলাস্ও মুগ্ধ-অবাক হয়ে অপলক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতে লাগলো—অজানা-অচেনা এই আগন্তুক-শিশুর বিচিত্র-চঞ্চল সহজ-সুন্দর আজব লীলা-খেলা। অবাধ-স্ফূর্তিতে ছুটোছুটি করে বেড়ানোর সময়, শিশুটি হঠাৎ মেঝেতে বসে পড়ে বড়-বড় সাগর-নীল চোখ দুটি মেলে সাইলাসের মুখের পানে সজল-দৃষ্টিতে তাকিয়ে তার পায়ের পুরোনো-ছেঁড়া জুতোজোড়া ধরে রীতিমত টানাটানি সুরু করে দিলো। শিশুর আসল মতলবটা কি ঠাওর করতে না পেরে, সাইলাস্ কৌতূহলভরে এগিয়ে এসে তাকে সস্নেহে বুকে তুলে নিয়ে পায়ের ছোট্ট জুতোজোড়া পরখ করে দেখলে! তাই তো, দু'পাটি জুতোই তো দেখছি, আগাগোড়া ভিজে সপ্‌সপ্ করছে!···এমন ভিজে-জুতো পায়ে?···মেয়েটি হয় তো এতক্ষণ তাহলে বাইরে পথে ঐ বরফের স্তূপ মাড়িয়ে হেঁটে এসেছে—এ কথাটা তো সাইলাসের খেয়াল হয়নি কোনো সময়েই!

এ চিন্তা মনে জাগার সঙ্গে সঙ্গেই শিশু-কন্যাটিকে কোলে নিয়ে সাইলাস কৌতূহলভরে এগিয়ে এলো কুটীরের সদর-দরজায়। সেখানে এসেই খোলা-দরজার ফাঁকে বাইরে তুষারাচ্ছন্ন-পথের পানে তাকাতেই, সাইলাস্

লক্ষ্য করলে—বরফের স্তূপের বুকে দিব্যি সুস্পষ্টভাবে ফুটে রয়েছে ছোট্ট-শিশুটির পায়ের জুতোর দাগ! সাইলাস সন্ধদৃষ্টিতে সেই জুতোর দাগগুলি লক্ষ্য করছে, এমন সময় বাইরে নিরালা-নিস্তব্ধ প্রান্তরের প্রান্তে দূরে ঘন কালো অন্ধকার ঝাঁকড়া একসারি বুনো জংলী ঝোপের দিকে হাত বাড়িয়ে আগন্তুক শিশু-কন্যাটি ব্যাকুল-কণ্ঠে আবার আগের মতোই 'মা…মা…' বলে ডাকতে সুরু করে দিলে! শিশুর মুখে আবার এই ডাক শুনে সাইলাসের কৌতূহল বাড়লো। সে তখন সেই ছোট্ট মেয়েটিকে কোলে নিয়ে বাইরে বরফের স্তূপের উপর শিশুর পায়ের জুতোর ছোট-ছোট দাগগুলি অনুসরণ করে বরাবর এগিয়ে এলো তুষারাচ্ছন্ন প্রান্তরের প্রান্তে দূরের সেই বুনো-জংলী ঝোপঝাড়ের কাছে। সেখানে এসে হাজির হতেই সাইলাস দেখলো—সামনেই ঝোপের ধারে কনকনে-ঠাণ্ডা বরফে ঢাকা জমিতে ছিন্নমূল লতার মতোই ক্লান্ত অবসন্ন দেহ তার লুটিয়ে নিস্পন্দ-নিথর অচৈতন্য-অবস্থায় পড়ে আছে—জীর্ণ-মলিন বসনাবৃতা অজ্ঞাত কুলশীলা এক রমণী।

অপরিচিতা সেই রমণীকে দেখেই সাইলাসের বুকে-জড়ানো সেই শিশু-কন্যা তার ছোট্ট হাতখানি বাড়িয়ে ব্যাকুল-কণ্ঠে আবার ডাক দিলো—"মা মা ওমা"

শিশুর সে ডাকের উত্তরে কিন্তু কোনো সাড়া মিললো না…নিরালা-নিস্তব্ধ সেই প্রান্তরের দূর প্রান্তসীমা থেকে সাইলাসের কানে শুধু একটা ক্ষীণ প্রতিধ্বনির সুর ভেসে এলো—আ…আ… আ…

। ক্রমশঃ

চিত্রগুপ্ত

এবারে শোনো—বিচিত্র আজব আরেকটি মজার খেলার কথা।
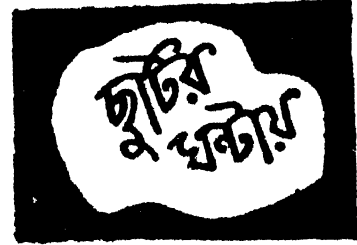
ধরো, কেউ যদি তোমাদের বলে যে, এক গামলা জলের উপর অন্য কোনো পদার্থ না মিশিয়ে রেখে দাউ দাউ করে আগুন জ্বালাতে পারে। তাহলে তোমরা কি জবাব দেবে? তোমরা নিশ্চয়ই বলবে—এ আবার কখনো সম্ভব নাকি! এমন অসম্ভব কাণ্ড ঘটানোর আজব কাহিনী তো কেবল রূপকথাতেই শুনতে পাওয়া যায়…বাস্তব জীবনে চোখের সুমুখে এ ধরণের আজগুবী ঘটনা ঘটতে দেখেছে তেমন কোনো লোকেরও সন্ধান মেলে না কোথাও সহজে! কাজেই জলের বুকে এমনভাবে দাউ দাউ করে আগুন জ্বালানোর কারসাজি—নিতান্তই অবিশ্বাস্য এবং অদ্ভুত ব্যাপার বলেই ধারণা হয়।

কিন্তু এমন ধারণা রাখা ঠিক নয়। কারণ, বিজ্ঞানের বিচিত্র কীর্তিতে এমন আজব উপায় আছে, যার দৌলতে অনায়াসেই জলের উপর জলন্ত আগুনের শিখা সৃষ্টি করে তোলা যায়। তোমরা হয়তো ভাবছো—সে আবার কি অদ্ভুত উপায়! তাহলে শোনো—সে উপায়ের আসল পরিচয় পেতে হলে, গোড়াতেই গোটা কয়েক সাজ-সরঞ্জাম জোগাড় করে নেওয়া দরকার। অর্থাৎ, বিজ্ঞানের এই আজব মজার খেলাটি হাতে কলমে পরখ করে দেখার জন্য চাই—জল-ভরা একটি কাঁচের পাত্র, এক শিশি 'ঈথার্' (Ether), এক টুকরো কাগজ আর এক বাক্স দেশলাই। এই সব সাজ-সরঞ্জাম জোগাড় হবার পর 'জলের বুকে আগুন জ্বালানোর' আজব কারসাজি দেখানোর পালা।

সে কারসাজি দেখানোর সহজ উপায় হলো—উপরের ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে, তেমনি ধরণের জল-ভরা একটি কাঁচের পাত্রে অল্প একটু 'ঈথার্' ছড়িয়ে দাও। তারপর দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে কাগজের টুকরোটিতে আগুন ধরিয়ে নিয়ে, জ্বলন্ত কাগজের টুকরোটিকে 'ঈথার্'-মেশানো জলের পাত্রের ভিতরে ফেলে দাও। তাহলেই দেখবে—পাত্রের ভিতরে রাখা 'ঈথার্' মেশানো জলের বুকে লেলিহান শিখা মেলে আগুন জ্বলতে সুরু করেছে।

এমনটি কেন হয়—জানো?···কাঁচের পাত্রের জলের বুকে 'ঈথার্' ছড়িয়ে থাকার ফলে।···অর্থাৎ, আগুন আসলে জলের বুকে জ্বলে না—জ্বলে, জলের উপর ছড়ানো পরম দাহ্য-পদার্থ (Highly Inflamable) 'ঈথারের' স্বচ্ছ আস্তরণের (Thin-layer) সংস্পর্শে আসামাত্রই। দর্শকেরা সবাই তো আর এ খেলার আসল রহস্যটি জানে না, কাজেই আসরে কারসাজি দেখানোর সময় জল-ভরা কাঁচের পাত্রের ভিতরে জ্বলন্ত কাগজের টুকরোটি ফেলে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই জলের বুকে লেলিহান আগুনের শিখার অভিনব নৃত্য-লীলার দৃশ্যটিই শুধু তাঁদের নজরে পড়ে··· ইতিপূর্ব্বে নেপথ্যে লোকচক্ষুর অন্তরালে খেলোয়াড় মশাই যে বুদ্ধি খাটিয়ে কাঁচের পাত্রের জলে 'তরল-ঈথার্' (Liquid Ether) ছড়িয়ে রেখেছেন, সে কারচুপিটি রয়ে যায় সকলের অজানা।

এই হলো—আজব কায়দায় 'জলের উপর আগুন জ্বালানোর' রহস্যময়-লীলার আসল পরিচয়।

আগামী সংখ্যায় নতুন ধরণের এমনি আরেকটি মজার খেলার হদিশ দেবার বাসনা রইলো।

মনোহর মৈত্র

১। দেশলাই-কাঠি সাজানোর আজব-হেঁয়ালি ঃ
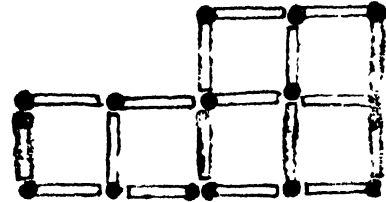
উপরের ছবিতে একের পর এক—ষোলোটি দেশলাই-কাঠি জোড়া দিয়ে সাজিয়ে রেখে, ছয়টি সমান-ছাঁদের 'চতুষ্কোণ-ঘর' (six squares of equal size) রচনা করা হয়েছে। এবারে মগজের বুদ্ধি খাটিয়ে উপরের ঐ 'চতুষ্কোণ ঘরগুলি' থেকে মাত্র দুইটি দেশলাই-কাঠিকে এমন কায়দায় স্থান-পরিবর্ত্তন করে সরিয়ে সাজাও যে ষোলোটি-কাঠির কোনোটি যেন জোট ভেঙে আলাদা হয়ে কিম্বা বাদ পড়ে না যায় এবং কেবলমাত্র সেই কাঠি দুইটির স্থান পরিবর্ত্তনের ফলে, উপরের ছয়টি 'চতুষ্কোণ-ঘরকে' সহজেই অবিচ্ছিন্নভাবে চারটি 'চতুষ্কোণ-ঘরে' কমিয়ে আনা চলে। যদি পারো, তাহলে এক টুকরো কাগজে কালি-কলমের আঁচড় টেনে দেশলাই-কাঠি সাজিয়ে-বসানোর নতুন কায়দাটির হুবহু-নক্সা এঁকে চটপট পাঠিয়ে দাও আমাদের দপ্তরে। তোমাদের বুদ্ধির পরিচয় পেলে আগামী সংখ্যায় ছাপার অক্ষরে নাম-ধাম প্রকাশ করে সবাইকে জানিয়ে দেবো—কত বড় বাহাদুর হয়ে উঠেছো তোমরা।

২। 'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা :

২। দু'অক্ষরে নাম সে জাতির—
ব্রহ্ম-রাজ্যেবাসা—
উল্‌টে দিয়ে, গুড়িয়ে নিলে,
খাদ্য হয় তা খাশা !

রচনা : ধীরেন্দ্রনাথ মোদক (বাঁশবেড়িয়া)

৩। তিন অক্ষরের কথা—আমাদের রাষ্ট্রভাষায় ভারতের একটি সম্প্রদায়-বিশেষের নাম বুঝায়। প্রথম অক্ষর বাদ দিলে—গাছের ডালে সুস্বাদু এক রকমের ফল হয়ে ঝুলে থাকে ; শেষের অক্ষর বাদ দিলে—মানুষের পায়ের তলায় বিশেষ এক-ধরণের চর্ম্মরোগ বুঝায় ; এবং মাঝের অক্ষরটি যদি বাদ দেওয়া যায়, তাহলে সচরাচর ছোট ছেলেমেয়েদের পক্ষে রীতিমত কষ্টদায়ক বিশেষ এক-ধরণের সংক্রামক-ব্যাধির নাম হয়। বলো তো সে কথাটি, আসলে কি ?

রচনা : শিখারাণী বাগচী (পূর্ব্ব-পুটিয়ারি)

গতমাসের 'ধাঁধা আর হেঁয়ালির' উত্তর ঃ
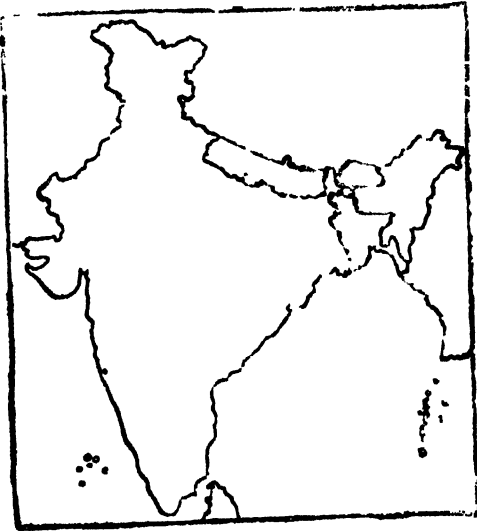
উপরের ছবিটি দেখলেই এ ধাঁধার সঠিক পরিচয় মিলবে।

২। দাস

৩। পাটলিপুত্র

গতমাসের তিনটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

কুলু মিত্র (কলিকাতা), হাবলু, টাবলু, সুমা ও পুতুল (হাওড়া), অমিতাভ, কবি ও লাড্ডু হালদার (দিল্লী), পুপু ও ভুটিন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা,) রাণা, বুনা লিপিকা ও গৌর দেব (চুচুড়া), সৌরাংশু ও বিজয়া আচার্য্য (কলিকাতা), বাপি, বুতাম, ও পিন্টু গঙ্গোপাধ্যায় (বোম্বাই), পিন্টু ও ফণী সাহা(কলিকাতা) সুনীরা ও সঞ্জীব মুখোপাধ্যায় (লক্ষ্ণৌ), শিবাজী ও বাপ্পা রায় (কলিকাতা), রিনি ও রনি মুখোপাধ্যায় (কাইরো), অমিয়, প্রশান্ত, সুনীত, ভাস্কর, অমৃত, রাণা, কৃষ্ণলাল, শিবু, মৃণাল ও দিব্যকান্তি (গড়িয়া), ইন্দুবালা, সুবর্ণলতা ও বৈকুণ্ঠ দেবশর্ম্মা (কলিকাতা), সত্যেন, মুরারি, সঞ্জয়, সুনীল ও অমিয় (ভিলাই), বুবু ও মিঠু গুপ্ত (কলিকাতা)।

গতমাসের দুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

শর্ম্মিষ্ঠা ও সঙ্ঘমিত্রা রায় (কলিকাতা), ফণী, সুমিতা ও অশোক গঙ্গোপাধ্যায় (পুণা), ইন্দ্র, শচীন, কল্যাণ, রঞ্জত, বিমান, বিশ্বতোষ ও বিমল (কলিকাতা), রমেন্দ্র, সুধীর, বিজয়েন্দ্র ও বিনয়েন্দ্র সিংহ (হাজারীবাগ), দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় (দিল্লী), কালীচরণ, নন্দরাণী ও মায়া (বারুইপুর), শীতাংশু, সুধাংশু, হিমাংশু ও হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)।

গতমাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

বিশ্বনাথ ও দেবকীনন্দন সিংহ (গয়া), পাপু, ছোটন ও অরু (কলিকাতা), শ্যামা, ঋষি ও খুশী (উত্তরপাড়া সতী, রেণুকা ও কমলা (কলিকাতা), রবীন রায় (বোম্বাই)।

ঢোলকের মতো গড়নের যে বিচিত্র বাদ্যটি দেখছো, সেটি হলো — আমাদের ভারতবর্ষের আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত লোকজনদের বিশেষ প্রিয় লোক-সঙ্গীত চর্চ্চার অন্যতম উপকরণ। এ বাদ্য যন্ত্রের আওয়াজ খুবই মনোমুগ্ধকর। আমাদের দেশের আদিবাসী-সমাজে এই বাদ্য-যন্ত্রের প্রচলন অতি প্রাচীন কাল থেকেই এবং আজো এর কদর রয়েছে সমানভাবেই।

বেহালার মতো ছাঁদের এই অতিকায় তার-যন্ত্রটির নাম — 'ভায়োলন-সেলো' (Violoncello) ... চলিত-ভাষায় সঙ্গীত-কলারসিক মহলে এ বাদ্য-যন্ত্রটিকে সচরাচর 'সেলো' (cello) বলা হয়। পাশ্চাত্য সঙ্গীত-জগতে এ বাদ্য-যন্ত্রটির রীতিমত আদর ও ব্যবহার আছে, বিশেষভাবে 'ঐক্যতান' বা 'অর্কেষ্ট্রা' (Orchestra) সঙ্গীত-বাদ্যের আসরে। এ যন্ত্রটির ব্যবহার অনেকদিন থেকেই চলে আসছে।

ফুঁ-দিয়ে বাজানোর এই বিচিত্র-ধরণের বাঁশীর মতো বাদ্য-যন্ত্রটির নাম হলো — 'বিউগ্যল' (BUGLE)। এটি হলো পাশ্চাত্য দেশের এক রকমের শিঙা-জাতীয় বাঁশী। অতি প্রাচীন আমল থেকেই পাশ্চাত্য-অধিবাসীরা এই শিঙা-জাতীয় বাঁশী ব্যবহার করে আসছেন — বিশেষভাবে কোনো কিছু ঘোষণা করবার জন্য। সামরিক কুচকাওয়াজ, মৃগয়া-অভিযান প্রভৃতি অনুষ্ঠানে অধুনা 'বিউগ্যল'-ধ্বনির রীতিমত রেওয়াজ দুনিয়ার সর্ব্বত্রই প্রচলিত হয়েছে।

যুগের ধারা

প্রাচীন-পন্থী পিতা : ফের যদি তোমার ঐ আলট্রা-মডার্ন কলেজের বন্ধুটিকে এ বাড়ীতে দেখি, তাহলে ওকে আমি গুলিকরে মারবো!...

আধুনিকা কন্যা : না বাবা... থাক্‌!...কালকের দিনটা আর কিছু কোরো না, লক্ষ্মীটী!...কাল ও আমাকে 'হোটেল মোম্বাসায়' খাওয়াবে আর সিনেমা দেখতে নিয়ে যাবে!...টিকিট কিনেছে...সিট্‌ রিজার্ভ!...

শিল্পী—পৃথ্বী দেবশর্ম্মা
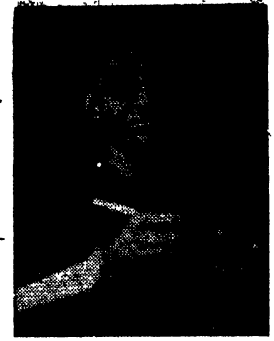
খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

দিল্লী ক্লথ মিলস কাপ :

কর্পোরেশন ষ্টেডিয়ামে ১৯৬৫ সালের দিল্লী ক্লথ মিলস ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে হায়দরাবাদের অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিস ২—০ গোলে হায়দরাবাদের পুলিস লাইন্সদলকে পরাজিত করে। ১৯৬৫ সালের হায়দরাবাদের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিসদল শীর্ষস্থান এবং সেণ্ট্রাল পুলিস লাইন্স দল তৃতীয় স্থান পেয়েছিল। ১৯৬৪ সালের ডি সি এম কাপ ফাইনালে অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিস দল ক'লকাতার মহমেডান স্পোর্টিংদলের কাছে পরাজিত হয়েছিল। অপরদিকে সেণ্ট্রাল পুলিস লাইন্স ১৯৫৯ সালের প্রতিযোগিতায় ডি সি এম কাপ জয়ী হয়েছিল।

আলোচ্য বছরের প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী ক'লকাতার ফুটবল দলগুলির মধ্যে গত বছরের কাপ বিজয়ী মহমেডান স্পোর্টিং এবং ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব সেমি-ফাইনাল পর্য্যন্ত উঠেছিল। একদিকের সেমি-ফাইনালে অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিস দল ২—০ ও ১—০ গোলে ইষ্টবেঙ্গলকে এবং অপরদিকের সেমি-ফাইনালে সেণ্ট্রাল পুলিস লাইন্সদল ২—০ ও ০—০ গোলে মহমেডান স্পোর্টিং-দলকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে ওঠে। প্রতিযোগিতার নতুন নিয়ম অনুসারে এবারের সেমি-ফাইনালে দুইদলের মধ্যে দু'বার ক'রে খেলা হয়েছিল।

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল ফাইনাল :

১৯৬৫ সালের আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ইণ্টার-জোন ফাইনালে পূর্ব্বাঞ্চল বিজয়ী ক'লকাতা ১—০ গোলে দক্ষিণাঞ্চল বিজয়ী ওসমানিয়া দলকে পরাজিত ক'রে উপর্যুপরি তিন বছর এবং প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সর্ব্বাধিক দশবার (রেকর্ড) আশুতোষ মুখার্জি শীল্ড বিজয়ের গৌরব লাভ করেছে। এই নিয়ে ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দল ১২বার ফাইনালে খেললো।

আলোচ্য বছরের প্রতিযোগিতার জোন ফাইনালে পূর্ব্বাঞ্চলে ক'লকাতা ২—০ গোলে যাদবপুরকে, পশ্চিমাঞ্চলে জব্বলপুর ২—০ গোলে বোম্বাইকে, উত্তরাঞ্চলে দিল্লী ১—০ গোলে পাঞ্জাবকে এবং দক্ষিণাঞ্চলে ওসমানিয়া ২—১ গোলে মহীশূরকে পরাজিত ক'রে মূল প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে উঠেছিল। একদিকের সেমি-ফাইনালে ক'লকাতা ১—০ গোলে দিল্লীকে এবং অপরদিকের সেমিফাইনালে ওসমানিয়া ২—১ গোলে জব্বলপুরকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে উঠেছিল।

জাতীয় মহিলা হকি ফাইনাল :

পুণাতে ১৯তম জাতীয় মহিলা হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে মহীশূর ৪-১ গোলে মাদ্রাজকে পরাজিত ক'রে উপর্যুপরি ৬ বছর লেডী রতন টাটা কাপ জয়ী হয়েছে।

সেমি-ফাইনালে মহীশূর ২-২ ও ৩-০ গোলে বোম্বাইকে

এবং মাদ্রাজ ২-০ গোলে গত বছরের রানার্স-আপ মহারাষ্ট্রকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে উঠেছিল।

আন্তঃজেলা ফুটবল ফাইনাল :

১৯৬৫ সালের আন্তঃ জেলা ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে ২৪ পরগণা জেলা দল ১-০ গোলে হুগলীকে পরাজিত ক'রে মোট পাঁচবার উমেশ মজুমদার কাপ জয়ী হয়েছে।

বিশ্ব ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা ঃ

ইরাণের তেহেরানে অনুষ্ঠিত অষ্টম বিশ্ব ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতার এবং সেই সঙ্গে অনুষ্ঠিত এশিয়ান ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতার ফাইনাল ফলাফল :

দেশের জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষ এই দুই অনুষ্ঠানে শেষ পর্যন্ত যোগদান থেকে বিরত থাকে।

বিশ্ব ভারোত্তোলন

১ম পোল্যাণ্ড (৩৪ পয়েণ্ট); ২য় রাশিয়া (৩২ পয়েণ্ট); ৩য় জাপান (১৮ পয়েণ্ট)

এশিয়ান ভারোত্তোলন

১ম ইরাণ (৪০ পয়েণ্ট); ২য় জাপান (৩৪ পয়েণ্ট); ৩য় ইরাক (৩১ পয়েণ্ট); ৪র্থ সিরিয়া (১১ পয়েণ্ট); ৫ম তাইল্যাণ্ড (৭ পয়েণ্ট) এবং ৬ষ্ঠ ফিলিপাইন (৩ পয়েণ্ট)।

এ্যাথলেটিক টেষ্ট :

উজবেকিস্থানের (রাশিয়া) এক এ্যাথলেটিক দল ভারত সফরে এসে ভারতবর্ষের সঙ্গে যে চারটি এ্যাথলেটিক টেস্টে যোগদান করে তার সংক্ষিপ্ত ফলাফল :

প্রথম টেস্ট : মাদ্রাজের রাজরত্নম স্টেডিয়ামে আয়োজিত এই প্রথম টেস্টে ভারতবর্ষ ২০১-১৭৫ পয়েন্টে জয়ী হয়। পুরুষ বিভাগে ভারতবর্ষ ৯টি এবং উজবেকিস্থান ৬টি অনুষ্ঠানে জয়লাভ করে। মহিলাদের সকল অনুষ্ঠানেরই শীর্ষস্থান লাভ করে উজবেকিস্থান। তাছাড়া রেকর্ড ভাঙ্গার সমস্ত গৌরবও লাভ করে উজবেকিস্থানের এ্যাথলীটরা। পাঁচটি অনুষ্ঠানে নতুন ভারতীয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়—পুরুষদের হাইজাম্প, পোলভল্ট ও হাতুড়ি নিক্ষেপে এবং মহিলাদের সটপুট ও ৪-১০০ মিটার রিলে অনুষ্ঠানে।

এশিয়ান ব্যাডমিণ্টন :

লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত পুরুষদের দলগত এশিয়ান ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার ফাইনালে মালয়েশিয়া ৪—১ খেলায় তাইল্যাণ্ডকে পরাজিত ক'রে উপর্যুপরি দু'বার টঙ্কু আব্দুল রহমন স্বর্ণ কাপ জয়ী হয়েছে। ভারতবর্ষ ৩—০ খেলায় জাপানকে পরাজিত ক'রে প্রতিযোগিতার তৃতীয় স্থান পায়। মালয়েশিয়ার প্রখ্যাত তিনজন খেলোয়াড় হুয়াং, এন বুন পি এবং কে সি চে দলের সঙ্গে আসতে পারেননি; ফলে মালয়েশিয়ার পক্ষে শক্তিশালী দল গঠন করা সম্ভব হয়নি। প্রতিযোগিতায় এই আটটি দেশ—মালয়েশিয়া, তাইল্যাণ্ড, ভারতবর্ষ, জাপান, হংকং, ফিলিপাইন, নেপাল এবং সিংহল যোগদান করেছিল। সেমি-ফাইনালে মালয়েশিয়া ৩—২ খেলায় ভারতবর্ষকে এবং তাইল্যাণ্ড ৩—২ খেলায় জাপানকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে উঠেছিল। মালয়েশিয়া বনাম ভারতবর্ষের সেমি ফাইনাল খেলায় মালয়েশিয়া উপর্যুপরি তিনটি খেলায় জয়ী হ'লে তারা ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করে। তারা বাকি দুটি খেলায় অংশ গ্রহণ করেনি, ফলে ভারতবর্ষকে ঐ দুটি খেলায় জয়ী ঘোষণা করা হয়। তাইল্যাণ্ড বনাম জাপানের সেমিফাইনাল খেলাতেও তাইল্যাণ্ড ৩—১ খেলায় অগ্রগামী হয়ে শেষ খেলায় যোগদান করেনি। ফলে জাপানকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।

ডেভিস কাপ :

১৯৬৫ সালের আন্তর্জাতিক ডেভিস কাপ লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার ইন্টার জোন ফাইনালে স্পেন ৩—২ খেলায় ভারতবর্ষকে পরাজিত ক'রে চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে। স্পেনের বারসিলোনার রয়েল টেনিস ক্লাবের ক্লে কোর্টে এই ইন্টার-জোন ফাইনাল খেলার আসর বসেছিল। স্বদেশের ক্লে কোর্ট এবং পরিচিত পরিবেশে খেলবার সুযোগ পেয়ে স্পেন তার পুরো সদ্ব্যবহার করে নিয়েছে। প্রতিযোগিতার নিয়মানুসারে এই খেলাটি ভারতবর্ষ অথবা কোন নিরপেক্ষ দেশে হ'তে পারতো; কিন্তু স্পেনের কাছ থেকে মোটা টাকার সেলামীর প্রস্তাব পেয়ে ভারতীয় লন্ টেনিস এসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা

ভারতবর্ষ অথবা অষ্ট্রেলিয়াতে খেলবার অধিকার ছেড়ে দিয়ে বারসিলোনার এই ক্লে কোর্টেই খেলতে রাজী হ'ন। স্পেনের খেলোয়াড়রা ক্লে কোর্টে অজেয়; অপরদিকে ভারতীয় খেলোয়াড়রা ক্লে কোর্টে খেলতে মোটেই অভ্যস্ত নন।

এখানে উল্লেখযোগ্য, ডেভিসকাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলবার সৌভাগ্য স্পেন এই প্রথম লাভ করলো। গত তিন বছরের ডেভিস কাপের খেলার ফলাফলের হিসেব নিলে দেখা যাবে, স্পেনের সাফল্য মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। ১৯৬২ সালের প্রথম রাউণ্ডে জার্মানীর কাছে, ১৯৬৩ সালে ইউরোপীয়ান জোনের সেমি-ফাইনালে ইংল্যাণ্ডের কাছে এবং ১৯৬৪ সালের প্রথম রাউণ্ডে ডেনমার্কের কাছে স্পেন পরাজিত হয়েছে। আলোচ্য ১৯৬৫ সালের প্রতিযোগিতায় ইউরোপীয়ান জোনের খেলায় স্পেনকে দেওয়া হয়েছিল পাঁচ নম্বর স্থান। ১৯৬৫ সালের প্রতিযোগিতায় স্পেনের এই অভূতপূর্ব সাফল্যের প্রধান কারণই হ'ল স্বদেশের ক্লে কোর্ট। তারা সাতটি দেশের সঙ্গে খেলে আজ চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে উঠেছে। বারসিলোনার ক্লে কোর্টে খেলার সুবিধা পেয়ে তারা ৬টি দেশকে পরাজিত করেছে। ইণ্টার জোন সেমি-ফাইনালে স্পেনের কাছে শক্তিশালী আমেরিকার ১—৪ খেলায় শোচনীয়ভাবে পরাজয়ের অন্যতম কারণই হ'ল বারসিলোনার ক্লে কোর্ট। অপরদিকে গত চার বছরে স্পেনের তুলনায় ভারতবর্ষের খেলার ফলাফল অনেক বেশী উজ্জ্বল। ভারতবর্ষ গত চার বছরে তিনবার (১৯৬২-৬৩ ও ১৯৬৫) মূল প্রতিযোগিতার ইণ্টার-জোন ফাইনালে খেলেছে।

এশিয়ান ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা :

লক্ষ্মৌতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার ব্যক্তিগত বিভাগে ভারতবর্ষ দুটি, বৃটেন তিনটি, থাইল্যাণ্ড একটি এবং মালয়েশিয়া মিক্সড ডাবলসে বৃটেনের সঙ্গে একটি খেতাব পায়। বৃটেনের কুমারী এ্যাঞ্জেলা বেয়ারস্টো মহিলাদের সিঙ্গলস ও ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলস খেতাব জয়ী হয়ে 'ত্রিমুকুট' সম্মান লাভ করেন।

ফাইনাল ফলাফল

পুরুষদের সিঙ্গলস : দীনেশ খান্না (ভারতবর্ষ) ১৫-৩ ও ১৫-১১ পয়েণ্টে সঙ্গব রত্তনুসোর্ণকে (থাইল্যাণ্ড) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : কুমারী এ্যাঞ্জেলা বেয়ারস্টো (বৃটেন) ১১-৬ ও ১১-৪ পয়েণ্টে ১৯৬৫ সালের অল-ইংল্যাণ্ড সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান কুমারী উর্সুলা স্মিথকে (বৃটেন) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : নরোং পর্ণচিম এবং সি চামকাম (থাইল্যাণ্ড) ১৫-৮ ও ১৫-১০ পয়েণ্টে তান ই খাঁ (মালয়েশিয়া) এবং তেমসাখাদিকে (থাইল্যাণ্ড) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস : কুমারী উর্সুলা স্মিথ এবং বেয়ারস্টো (বৃটেন) ১৮-১৩ ও ১৫-১১ পয়েণ্টে কুমারী টি এস ইয়ং এবং কুমারী আর এস আংকে (মালয়েশিয়া পরাজিত করেন।

বালকদের সিঙ্গলস : গৌতম ঠক্কর (ভারতবর্ষ) ১৫-৬, ৮-১৫ ও ১৫-৭ পয়েণ্টে টেমশাকদি মহাকনককে (থাইল্যাণ্ড) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : কুমারী এ্যাঞ্জেলা বেয়ারস্টো (বৃটেন) এবং তান ই খাঁ (মালয়েশিয়া) ৬-১৫, ১৫-৩ ও ১৫-২ পয়েণ্টে কুমারী উর্সুলা স্মিথ (বৃটেন) এবং সি চামকামকে (থাইল্যাণ্ড) পরাজিত করেন।

রাশিয়া বনাম ভারতবর্ষ :

ভারত সফররত রাশিয়ান ফুটবল দল ভারতবর্ষের সঙ্গে তিনটি প্রদর্শনী ম্যাচ খেলে জয়ী হয়েছে। এই দলটি জাতীয় দল বা প্রথম বিভাগের নিয়মিত ফুটবল দল নয়। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম অঙ্গ-প্রজাতন্ত্র রুশ-ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত যোগটি ফুটবল ক্লাবের থেকে তরুণ খেলোয়াড়দের সংগ্রহ ক'রে এই দলটি গঠন করা হয়েছে।

নিউ দিল্লীর কর্পোরেশন ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত প্রথম খেলায় রাশিয়া ২—১ গোলে ভারতবর্ষকে পরাজিত করে। প্রথমার্দ্ধের ১২ মিনিটে ভারতবর্ষের রাজিন্দরমোহন খেলার প্রথম গোলটি দেন। বিরতির সময় ভারতবর্ষ ১-০ গোলে অগ্রগামী ছিল। দ্বিতীয়ার্দ্ধের ২৭ মিনিটে রাশিয়ান দলের লেফট আউট পুকভ গোল শোধ দেন এবং কয়েক মিনিট পর রাইট আউট ভোইনভ দলের জয়সূচক গোলটি দেন।